২৩শ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

(১৩৫১ সাল—বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা)

সম্পাদক

শ্রীযামিনীমোহন কর

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' বৈদ্যুতিক রোটারী-মেসিনে
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২৩শ বর্ষ] ১৩৫১ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

বিষয়ানুক্রমিক

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

চিত্র-সূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

ধাতু-পরিচয় :—

দেশ-বিদেশের চিত্র :—

বিশিষ্টগণের চিত্র :—

বাক্যবল :—

স্বাস্থ্য-চিত্র :—

জন্ম—২০শে ফাল্গুন, ১২৯৭] সতীশচন্দ্র [মৃত্যু—১৩ই বৈশাখ, ১৩৫১

অশ্রু-অর্ঘ্য

ওঁ নমো

ভগবতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়

"ঠাকুর!

লীলামাধুর্য্যে বিশ্বে জ্ঞানালোক সম্প্রসারণের জন্য তুমি আসিয়াছিলে, আবার সমষ্টি-সমুদ্রে বিলীন হইয়াছ। ভক্তগণের হৃদয় তোমার বিভায় উদ্ভাসিত। ক্রমাগত ভোগের অবসাদে আর্ত্ত-জগৎ আবার যখন শান্তি ও মুক্তির ভিখারী হইবে, করুণাময় তুমি, তখন আবার তোমার পুণ্য-আবির্ভাবে জগৎ ধন্য হইবে—সুপবিত্র হইবে।

"এই বসুমতী তোমার, বসুমতীর ক্ষুদ্র পরিবার তোমার চির-আশ্রিত—তোমার আশীর্ব্বাদে বসুমতীর জীবন-সাধনা সার্থক হউক! তোমার যোগ্য স্তবের ভাষায় তুমিই ত' বঞ্চিত করিয়াছ দেব! দীন ভক্তের অসম্পূর্ণ পূজাই আজ গ্রহণ কর।"—সতীশচন্দ্র

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের স্বত্বাধিকারী ও মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল-বিয়োগে বাঙ্গালা দেশ এক জন দিক্‌পাল হারাল। দেশের উৎকৃষ্ট সাহিত্যকে দরিদ্র দেশবাসীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া তাঁর এক বিরাট কীর্ত্তি। তাঁর কাছ থেকে অনেক আশা ছিল। তাঁর অকস্মাৎ তিরোধানে দেশের এবং সাহিত্যের যা ক্ষতি হ'ল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি তাঁর আত্মার ঊর্দ্ধগতি কামনা করি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী প্রিয়দর্শন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকালে তিরোধানে আমরা বিশেষ সন্তপ্ত হইয়াছি। তাঁহার পিতা ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁহারই আশীর্ব্বাদে 'বসুমতী' ও গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগের প্রবর্ত্তন দ্বারা জীবনে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র পিতার আরব্ধ কার্য্যের আশাতীত উন্নতি বিধান করিয়া নিজ কর্ম্মকুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অদর্শনে বঙ্গমাতা এক জন কৃতী সন্তান হারাইলেন।

সতীশচন্দ্র ("খোকা") শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন এবং পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে মধ্যম কন্যা-বিয়োগের পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল, এবং সম্প্রতি একমাত্র উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান্ রামচন্দ্রের অকাল-মৃত্যুতে একেবারে মুহ্যমান হইয়াছিলেন। তাই বুঝি ভগবান তাঁহাকে নিজ শান্তিময় ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননী ও রুগ্না পত্নী বর্ত্তমান। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করুন এবং সতীশচন্দ্রের চারি কন্যা, বালিকা পুত্রবধূ ও তাহার শিশুকন্যার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ বিধান করুন।

মাধবানন্দ

সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ।

সতীশচন্দ্র

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের স্বত্বাধিকারী ও প্রাণস্বরূপ এবং মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন; তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ এক জন কৃতী ব্যবসায়ী ও প্রকৃত সাহিত্য-দরদী হারাইল। মাত্র মাসাধিক কাল পূর্ব্বে সতীশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র রামচন্দ্রের অকাল বিয়োগ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত তাঁহার দেহ ও মনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। পর পর পুত্র ও পিতার বিষাদময় অকাল তিরোধানে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির শ্মশানের মত শূন্য হইয়া গেল। এইরূপ শোকাবহ ঘটনার তুলনা বিরল।

সতীশ বাবুর পিতা বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ছিলেন। বসুমতী প্রতিষ্ঠায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহলাভ করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র মাত্র ১২ বৎসর বয়সে পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করেন ও নিজের অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা ও নিপুণ ব্যবসায় বুদ্ধিতে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। বাঙ্গালা ভাষায় সংবাদপত্র পরিচালনে তিনি এক নবযুগ আনয়ন করেন। বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র মুদ্রণ কার্য্যে তিনিই প্রথম রোটারী যন্ত্র ব্যবহার করেন এবং রয়টারের সংবাদ পরিবেশন বসুমতীর দ্বারাই সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি কিছু কাল ইংরেজী বসুমতীও পরিচালনা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। মাসিক বসুমতীও তিনিই প্রবর্ত্তিত করেন। এক্ষণে উহা তাঁহার পরিচালনা এবং সম্পাদনা গুণে সুবিখ্যাত বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাগুলির অন্যতম বলিয়া পরিগণিত।

তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি—সুলভে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রচার। পিতা উপেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহু খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকের গ্রন্থাবলী সুলভে প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের লেখার সহিত এই দরিদ্র বাঙ্গালা দেশের পাঠকদের সহিত তিনি পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছেন। মধু, বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের যে সকল দিগ্বিজয়ী প্রতিভা বঙ্গভাষাকে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে—বিপুল গৌরবমণ্ডিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির সেই সকল মহাপুরুষের অমর লেখনীপ্রসূ গ্রন্থাবলী সুলভে প্রকাশ ও প্রচার করিয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিতরণ করিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ক ও সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থরাজির সহিত সাধারণের পরিচয়ও তাঁহার জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে।

পিতার ন্যায় সতীশ বাবুও পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় গুরুভক্তি ও পিতৃভক্তি আজিকার দিনে দেখা যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সামাজিক জীবনে তিনি সংযত স্বভাব ও রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। প্রাচীনপন্থিসুলভ অমায়িক ও মধুর ব্যবহার দ্বারা তিনি সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে এত বড় প্রতিভাশালী ব্যক্তির কর্ম্ম-জীবনের অবসান ঘটিল। বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য! সতীশ বাবুর অকাল বিয়োগে বৃদ্ধা জননী, সদ্যপুত্র-শোকাতুরা সহধর্ম্মিণী, সদ্যবিধবা পুত্রবধূ ও কন্যাগণ যে মর্ম্মান্তিক শোকপ্রাপ্ত হইলেন তাহা প্রকাশ করা যায় না। তাঁহাদের সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমি তাঁহাদিগের প্রতি ও বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের সেবকগণের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কর্ম্মার্জ্জিত ধামে

কর্ম্মবীর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বুধবার ১৩ই বৈশাখ দিবা দ্বিপ্রহরে যখন সহসা দুঃসংবাদ কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল যে, বসুমতী-গত-প্রাণ কর্ম্মবীর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাণাধিক পুত্র ৺রামচন্দ্রের অনুগমন করিয়াছেন, তখন ব্যাপারটা বিস্ময়কর বোধ না হইলেও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। স্বর্গত সতীশ বাবু দীর্ঘ দিন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন—মধ্যে তাঁহার জীবন-সংশয়ও ঘটিয়াছিল—অকস্মাৎ মহাকালের আহ্বানে তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত তরুণ পুত্র রামচন্দ্র মহাপ্রয়াণ করিলেন—এ শোক রোগাতুর পিতার হৃদয়ে সহ্য না হইবারই কথা! তবে সতীশ বাবু যে এত শীঘ্র—এত অতর্কিত ভাবে চলিয়া যাইবেন—ইহাও স্বপ্নের অগোচর ছিল।

শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবুর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় মাত্র আট বৎসর পূর্ব্বে—আমার পিতামহ-প্রতিম রস-সাহিত্যিক-বর স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের গৃহে। দেবেন্দ্র বাবু তখন সতীশ বাবুরই অনুরোধে 'শ্রীকৃষ্ণ' রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি রস-রচনা (গল্প) একত্র সংগৃহীত করিয়া উহা 'চঞ্চরিকা' নামে প্রকাশিত করিবার প্রস্তাবও সতীশ বাবু করিয়াছেন, ও সেই প্রসঙ্গে তখন তিনি মধ্যে মধ্যে দেবেন্দ্র বাবুর গৃহে গমনাগমন করিতেন। সেই সময় সতীশ বাবুর সঙ্গে যে পরিচয়ের সূচনা, মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহা নিবিড় স্নেহ-বন্ধনে রূপান্তর লাভ করিয়াছিল। আর এক দিক্ দিয়াও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্নেহভাজন রামচন্দ্র তখন সদ্যঃ প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিয়াছে। পুত্রের মধ্যস্থতায় পিতার সহিত পরিচয় দৃঢ়তর হইল। তাহার পর ক্রমশঃ

সে পরিচয় যে অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ বর্ত্তমানে অপ্রকাশিত থাকাই ভাল।

সতীশ বাবুর অদম্য কর্ম্মশক্তি ও নানাবিধ কুশলতার ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত যোগ্যতা বা অধিকার আমার নাই। সে ইতিহাস বসুমতীরই বিগত চল্লিশ বৎসরের গরিমময় ইতিহাস। তাহার ধারাবাহিক বিশ্লেষণ বহু-মানভাজন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহোদয়ের লেখনী-মুখেই সকলে প্রত্যাশা করিয়া থাকেন।

দরবার-বেশে সুসজ্জিত সতীশচন্দ্র

সতীশ বাবুর প্রথম কর্ম্মজীবন আমাদের দেখিবার সুযোগ হয় নাই। তবে আমরা যেটুকু দেখিয়াছি, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম যে—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও তিনি কর্ম্মকে কোন দিন উপেক্ষা করেন নাই। একমাত্র পুত্রের বিয়োগের পরও তিনি বসুমতীর তত্ত্বাবধানে উপেক্ষা প্রকাশ করিতেন না। তবে পুত্র-বিরহের আঘাত তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ বাজিয়াছিল। আর পুত্রের কথাই এ কয় দিন তাঁহার জপমালা হইয়াছিল। গত পয়লা বৈশাখ তাঁহার স্বহস্তলিখিত যে পত্রখানি পাই, তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

"...আমি ও আমার স্ত্রী এখনও বাঁচিয়া আছি—আরও কত দিন থাকিব বলিতে পারি না! (হায়! কে জানিত—এ পত্র লিখিবার পর আর দুইটি সপ্তাহও তাঁহাকে ইহলোকে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিতে হইবে না!)...একটি সংবাদ জানিবার জন্য কয় দিন আপনাকে পত্র লিখিব মনে করিতে-ছিলাম—সামর্থ্যের অভাবে পারি নাই।...আপনার অবসর মত সংবাদ লইয়া পত্রদ্বারা জানাইলে বাধিত হইব।...

১। ৺রামচন্দ্র (হায় সন্তানবৎসল পিতৃহৃদয়! এখনও পর্য্যন্ত 'শ্রীমান্' ব্যতীত কেবল 'রাম-চন্দ্র' উচ্চারণ আমাদেরই যখন বাধ-বাধ ঠেকে, তখন পিতা কোন্ প্রাণে ৺রামচন্দ্র লিখিবেন!) ঈশান বৃত্তি কত টাকা কোন্ তারিখে পাইয়াছিলেন?

২। এম্‌.এ পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

কোনরূপ মেডেল পাইয়াছিলেন কি না, এবং তাহা কবে?

৩। বি-এ পাশ জন্য তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম্-এ পড়িবার জন্য কোনরূপ স্কলারসিপ বা পুরস্কার পাইয়াছিলেন কি না?"

সংক্ষিপ্ত পত্র—কোনরূপ ভাবোচ্ছ্বাস ইহাতে নাই। রামচন্দ্রের তিরোভাবের পর ইহাই তাঁহার আমাকে লিখিত প্রথম পত্র—অথচ ইহাতে কি সংযম! তথাপি প্রশ্ন তিনটির ছত্রে ছত্রে পুত্রশোকাহত পিতৃহৃদয়ের আকুল হাহাকার যেন মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর ১৯-৪-৪৪ (৬ই বৈশাখ) তারিখে তাঁহার আর একখানি পত্র পাই—ইহা অবশ্য তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত নহে। তবে ইহাই তাঁহার আমাকে লিখিত শেষ পত্র। ইহাতে তিনি বৈশাখের প্রবন্ধের কপি সত্বর পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন ও ইহাতেও একটি প্রশ্ন ছিল—"বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ বৎসর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা শেষ হয় ও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা আরম্ভ হয়?"

যে প্রবন্ধের নিমিত্ত তিনি তাগাদা দিয়াছিলেন, সে প্রবন্ধও তাঁহারই ইচ্ছায় আমি কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পূর্ব্বে মাসিক বসুমতীতে লিখিতে আরম্ভ করি। উহার প্রথম পর্ব্ব—'রসে'র পরিচয় সমাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় পর্ব্বে 'ভাব' প্রকরণ সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহে এ প্রবন্ধের সূচনা, তিনি তাঁহার সমাপ্তি দেখিয়া যাইলেন না—ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়! এ প্রবন্ধের উপসংহার আর হইবে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। কারণ, উপর্য্যুপরি দুইটি 'অভাবে'র আঘাতে 'ভাব' যে আর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, তাহা মনে হয় না। কিন্তু যাক্, সে ব্যক্তিগত অবান্তর কথা!

শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবুর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যটি আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইত—তাহা তাঁহার লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা। তিনি যে কেবল স্বয়ং কর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ম্মনিপুণ ছিলেন—আজীবন প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে আর্থিক সমৃদ্ধির তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি বুঝিতে পারিতেন—কাহার ভিতর কতটুকু ও কি ভাবের কর্ম্মশক্তি নিহিত আছে। আর তিনি জানিতেন যে, কোন্ উপায়ে এই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সুপ্ত কর্ম্মশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারা যায়। কাহাকে দিয়া কোন্ প্রকার কার্য্য কি পরিমাণে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা তিনি লোক দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন; ও কেবল বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না—কার্য্য আদায় না করিয়া ছাড়িতেন না। তাঁহার এই শক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির আজিকার এই প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

এ ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হইবে। সতীশ বাবু যখন দেবেন্দ্র বাবুর নিকট 'শ্রীকৃষ্ণ' রচনার প্রস্তাব করেন, তখন দেবেন্দ্র বাবুর পরিবারবর্গ (স্ত্রী-পুত্র-কন্যা) সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে—নিদারুণ পীড়ায় ও বার্দ্ধক্যে তিনি চলচ্ছক্তিরহিত। আমাদের মনে হইত—সতীশ বাবু কেন বৃথা এ মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধকে উৎপীড়ন করিতেছেন!—ইঁহার দ্বারা কি আর এ অতিমানুষ কর্ম্ম এ বয়সে সম্ভব হইবে! কিন্তু হইল ত! দেবেন্দ্র বাবুর 'শ্রীকৃষ্ণ' বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারের অতুলনীয় সম্পদ্। কিন্তু এ রত্ন আহরণের কৃতিত্ব ছিল সম্পূর্ণ ভাবে সতীশ বাবুর নিজস্ব। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—সতীশ বাবু সমান ভাবে উৎসাহ ও তাগাদা দিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়াই গ্রন্থখানি সমাপ্ত হইতে পারিয়াছিল। এই এক শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের সম্বন্ধেই সতীশ বাবু বোধ হয় দেবেন্দ্র বাবুকে খুব কম হয় ত তিন চারি শত পত্র লিখিয়াছিলেন! আর কত বার যে স্বয়ং দেবেন্দ্র বাবুর গৃহে আসিয়াছিলেন, তাহারও ইয়ত্তা নাই। অথচ এ জাতীয় কার্য্য তাঁহার দৈনন্দিন কত শত করিতে হইত, তাহার সন্ধান কে রাখে!

যাহা যথার্থ সৎসাহিত্য, তাহা যতই দুরূহ বা পারিভাষিক হউক না কেন,—সতীশ বাবু তাহার উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করিতে ও সমাদর দানে কোন দিন পরাঙ্মুখ হন নাই। তাই বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের গ্রন্থ-সূচীতে—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় সম্পাদিত 'বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ', পণ্ডিতবর শ্রদ্ধেয় ভূতনাথ সপ্ততীর্থ-সম্পাদিত সমগ্র 'মীমাংসাদর্শন' ইত্যাদির ন্যায় অতি নীরস ও কঠিন দার্শনিক গ্রন্থাদিরও সন্নিবেশ দেখা যায়। এই কারণেই সতীশ বাবু মাসিক বসুমতীতে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে দিয়া ভগবান্ পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে'র সুবিস্তৃত বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাকাল শাস্ত্রী মহোদয়কেই প্রথমে কবলিত করিলেন। তাহার পর বৎসর ঘুরিল না—বসুমতীর বীজাঙ্কুর সবই নিঃশেষিত হইয়া গেল! বিধাতার এ কি লীলা কে বলিবে।

বসুমতী ছিল সতীশ বাবুর প্রাণস্বরূপ। কিন্তু রামচন্দ্র ছিলেন তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়ান্—পুত্র যে পিতারই আত্মা! পুত্রের জীবদ্দশায় পিতা হয়ত ইহা ততটা অনুভব করেন নাই। কিন্তু পুত্রবিয়োগের পর এ সত্য আর গোপন রহিল না। তাই বসুমতীর আজীবনব্যাপী আকর্ষণও পুত্রের অনুগমনে উন্মুখ পিতাকে রোধিতে পারিল না। দুই মাস ধরিয়া দুই দিকে আকর্ষণ চলিল। অবশেষে পুত্রের আকর্ষণই জয়লাভ করিল।

সস্ত্রীক সতীশচন্দ্র

পুত্রশোকার্ত্ত অশান্ত পিতৃহৃদয়ের দারুণ দাবদাহ নির্ব্বাপিত হইল বটে! কিন্তু বসুমতীর কর্ণধারের মুখাপেক্ষী—এতগুলি অসহায় প্রাণীর অধুনা গতি কি হইবে—একমাত্র বিধাতাই জানেন!

শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবুর বৃদ্ধা জননী—একমাত্র পৌত্র ও একমাত্র পুত্রের বিয়োগে যে অবস্থায় উপনীতা হইলেন, তাহা কল্পনারও অতীত! সতীশ বাবুর সহধর্ম্মিণী স্বয়ং কঠিন রোগাতুরা। তাহার উপর উপর্য্যুপরি পতি-পুত্রের তিরোভাবে যে শোচনীয় দশা তাঁহাকে আশ্রয় করিল, বোধ হয়, শ্রীরামচন্দ্র-জননী কৌশল্যাও তাহা কোন দিন অনুভব করেন নাই! আর স্বর্গত রামচন্দ্রের বালিকা পত্নী ত আজ সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়হারা! পরিশেষে হিন্দুমাত্রেরই একান্ত আপনার ও গর্ব্বের—'বসুমতী' আজ ভিত্তিহীন হইয়া উঠিল! দুই মাস পূর্ব্বে যে আশঙ্কার ছায়া-মূর্ত্তি দূর হইতে নয়নপথে পড়িয়াছিল—আজ তাহা যেন স্ফুটতর মূর্ত্তি পরিগ্রহে সমীপবর্ত্তী হইতে চাহিতেছে! শ্রীভগবানের শ্রীচরণপ্রান্তে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—সে দুর্দ্দিন যেন জাতির জীবনে কোন দিন না আসে। ঊর্দ্ধলোকগত শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবুর আত্মা পরলোকে পুত্র-সমাগমে শান্তিলাভ করিয়া তথা হইতে তাঁহার প্রাণ-স্বরূপিণী বসুমতীর চিরকল্যাণ বিধান করুন!—তাঁহার বংশের অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অঙ্কুর কয়টি যেন আর কোন বিপদে বিপন্ন না হয়!

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

কর্ম্মবীর সতীশচন্দ্র

আজ সতীশচন্দ্র লোক-লোচনের অন্তরালে অনন্তে অন্তর্হিত! যাঁহার করস্পর্শে এক দিন অবসন্ন 'বসুমতী' জাগিয়া উঠিয়াছিল, যাঁহার অদম্য শ্রমদীপ্তিতে 'বসুমতী'র অঙ্গ সুশোভিত ও সুসজ্জিত হইয়াছিল, আজ সেই কর্ম্মবীর সতীশচন্দ্র চিরতরে অস্তমিত!

পিতা উপেন্দ্রনাথের সত্য-সঙ্কল্পের দীপ্ত-আলোক সতীশচন্দ্ররূপে বঙ্গগগনে উদিত হইয়া বসুমতীর অঙ্গ উদ্ভাসিত করিয়াছিল, আজ সেই সতীশচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানে সাহিত্য-আকাশ সত্যই অন্ধকারময়! সতীশচন্দ্র তাঁহার জীবন-আলোক সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন—প্রাণপ্রতিম এক-মাত্র পুত্র রামচন্দ্রের অন্তরে, তাই তরুণ কান্তি রামচন্দ্রের অকাল বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবনদীপ ক্ষীণ হইতে হইতে অচিরেই চিরনির্ব্বাপিত হইল!

বঙ্গজননীর হৃদয়ের অমূল্য নিধি, বিদ্বৎ-সমাজের নয়নমণি, সকল বিরোধের সমন্বয়-সুধানিধি—সেই সতীশ-চন্দ্রকে হরণ করিয়া কঠোর কালপুরুষ আজ বাঙ্গালার বক্ষঃস্থলে বজ্রাঘাত করিল! বর্ষব্যাপী যে দুর্দ্দিন বাঙ্গালার উপর দিয়া চলিয়াছে, লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন-আহুতির সহিত—সেই দুর্দ্দিনকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিল—এই পিতা-পুত্রের জলন্ত মরণানলশিখা।

সতীশচন্দ্রের মত অনলস নিস্তন্দ্র কর্ম্মবীরকে হারাইয়া বঙ্গদেশ আজ দীনতার গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইল!

কর্ম্মকে ব্রহ্মজ্ঞানে যদি কেহ উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সতীশচন্দ্রের নাম প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়। তারুণ্যের প্রথম আলোকপাতে—তাঁহার কর্ম্ম-জীবন আরব্ধ হয়। উপেন্দ্রনাথ তখন 'বসুমতী' লইয়া বিব্রত। তাঁহার উচ্চ আশা—আকাঙ্ক্ষার সহিত অবস্থার সামঞ্জস্যবিধান সম্ভবপর হয় নাই, সতীশচন্দ্র তখনই সেই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এদিকে আসিল—বিবাহের প্রস্তাব, শুনিবামাত্র—কর্ম্মপ্রিয় সতীশ-চন্দ্র বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন! পিতার একান্ত আগ্রহ জানিয়া তিনি পুনরায় গৃহে ফিরিলেন—বিবাহ সংঘটিত হইল। এই বিবাহের পর হইতেই তাঁহার অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন সূচিত হইল। লক্ষ্মীরূপিণী পত্নীর সৌভাগ্যে ধীরে ধীরে অর্থাগম হইতে লাগিল। এ সৌভাগ্য উপেন্দ্রনাথ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার বিয়োগের পর সমস্ত ঋণ-পরিশোধ করিয়া সতীশচন্দ্র পিতৃ-সঙ্কল্পিত ব্যবসায়ে পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করিলেন।

অকপট সাধনার ফল অবশ্যম্ভাবী। সতীশচন্দ্র বিদ্যালয়ের বিদ্যা তেমন ভাবে অর্জ্জন করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহার বিদ্যার্জ্জনের সুপ্ত বাসনা পুত্রের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু যে কার্য্যের অকপট সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—তাহার পূর্ণ সিদ্ধি তিনি লাভ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র পুস্তক প্রকাশ বা সংবাদপত্র পরিচালনায় তিনি যে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি ছিল—সাহিত্য-রচনায়, সাহিত্য-বিচারে ও তাহার রসগ্রহণে।

'মাসিক বসুমতী'র প্রত্যেক প্রবন্ধটি পাঠ বা শ্রবণ এবং নির্ব্বাচন নিজেই করিতেন। কঠোর তুলাদণ্ড ধরিয়া প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচার করিতেন। এ বিষয়ে কোন সংশয় হইলে হেমেন্দ্র বাবু ও সৌরীন্দ্র বাবুর মত গ্রহণ করিতেন। যে সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আজও বাঙ্গা-লীর স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এই 'বসুমতী'র অঙ্কে পালিত হইয়াছিলেন—সেই ভুবন, জলধর, সুরেশ, পাঁচকড়ি, শশিভূষণ সত্যেন্দ্র, সরোজ, দীনেন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ নিয়মিত ভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, কুমুদ, নবকৃষ্ণ প্রভৃতি কবিবৃন্দের সাময়িক সহযোগিতাও স্মরণীয়। 'বসুমতী'র সতীর্থ ইংরেজী সংবাদপত্র 'সার্ভেন্টে'র শ্যামসুন্দর, প্রমথনাথ প্রভৃতির সম্বন্ধ এখনও দেশবাসী ভুলে নাই। এ সমস্তই সতীশচন্দ্র বা 'খোকাবাবু'র আন্তরিক সাধনার সফলতা।

সতীশচন্দ্রের জীবনগতি এক অপরূপ কর্ম্মপদ্ধতির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। একমাত্র তাঁহারই চেষ্টায় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাচীন ঝঙ্কার একত্র প্রকাশ পাইয়াছে। এক দিকে লঘু সাহিত্যের রসধারা অন্য দিকে শাস্ত্রগ্রন্থের গম্ভীর জলধি-গর্জ্জন; একাংশে আধুনিক রুচি-বৈচিত্র্য—অপরাংশে পুরাতন ভাবপ্রবাহ—এই দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি একমাত্র 'বসুমতী'র নীতিতেই সন্ধান পাওয়া যায়।

পূজ্যপাদ তর্করত্ন ও তর্কভূষণ মহাশয়ের মতভেদমূলক শাস্ত্রবিচার—নিবদ্ধ হইয়াছে শুধু সতীশচন্দ্রের যত্নে। 'বঙ্গবাসী'র অবসাদ-দর্শনে দুঃখিত তর্করত্ন মহাশয় আর কোন সংবাদপত্রের সহিত নিজনাম জড়িত করিতে চাহেন নাই, কিন্তু সতীশচন্দ্র পূজ্যপাদ তর্কভূষণ মহাশয়ের মতবাদের একটা উত্তর দিবার আগ্রহ জন্মাইয়া দিয়া তর্করত্ন মহাশয়কে লেখনী ধারণে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার দ্বারা 'শঙ্করাচার্য্য গ্রন্থাবলী' দুই খণ্ড সম্পাদন করাইয়াছিলেন। 'বঙ্গবাসী'র আরব্ধ কার্য্য—'শাস্ত্রপ্রকাশ' যাহা রুদ্ধ হইয়াছিল, 'বসুমতী' তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করায় সতীশচন্দ্রের উপর তর্করত্ন মহাশয় অত্যন্ত সন্তোষ পোষণ করিতেন। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকগণের গ্রন্থাবলী প্রকাশ—'বসুমতী'র এক অতুলকীর্ত্তি, বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াও 'বসুমতী'র যশঃ-সৌরভ দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

বিশ বৎসর ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার সহিত মিশিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে,—কর্ম্মকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা, জাতীয়তা-বোধ, আহরণ-শক্তি, গুণগ্রাহিতা, আত্ম-সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ এবং বিনয়-সৌজন্যে সতীশচন্দ্র ছিলেন অতুলনীয়। এমনই কর্ম্মনিমগ্ন ছিলেন যে, কোন দিন নিজ স্বাস্থ্যের জন্য কর্ম্মবিষয়ে উদাসীন হইতেন না। তাঁহার ভয় ছিল—রুগ্না স্ত্রীর জন্য, তাঁহার ভয় ছিল—পুত্র-কন্যার জন্য। সংসারের এইরূপ ভয়ের কথা প্রায়ই পত্রে লিখিতেন। তাঁহাকে তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—'এখন ভাল আছি।'

জাতীয়তাবোধের ফলে তিনি অনেক বার অভিযুক্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি নিজের হীনতা স্বীকার করেন নাই। এ বিষয়ে হেমেন্দ্র বাবুর মত নির্ভীক সম্পাদকের সহযোগিতা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আহরণ-শক্তি—মধুকরবৃত্তি অপেক্ষাও বিচিত্র। যেখানে যাহার যতটুকু বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা তিনি আয়ত্ত করিতে যত্নের ত্রুটি করিতেন না, ইহা তাঁহার গুণগ্রাহিতারও পরিচয়।

আমার দ্বারা তিনি একটি ভৃগুসংহিতার সংস্কৃত মূল হইতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, এই ব্যক্তি দ্বারা ভাগবত অনুবাদ করাইতে হইবে। তাঁহারই প্রেরণায় 'বসুমতী'র ভাগবত প্রথম খণ্ড অনুবাদ করি। এইরূপ বহু ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িয়া কর্ম্মসাফল্যলাভ করিয়াছে।

তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার একান্ত মমত্ববোধ ছিল। নিত্য উপাসনা হইতে তিনি কোন দিন বিরত হ'ন নাই, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একান্ত ভক্ত ছিলেন। শুনিয়াছি—মৃত্যুর পূর্ব্বেও বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"আমিই রামচন্দ্রের মৃত্যুর কারণ হইয়াছি—আমি ত তাহাকে ভাল করিয়া গায়ত্রীজপ শিখাই নাই।" তাঁহার এক জন বিশিষ্ট বন্ধু ও সুলেখক কোন এক প্রবন্ধে বাঙ্গালার স্মার্ত্ত-মুকুটমণি রঘুনন্দনকে বৃথা আক্রমণ করিয়াছিলেন,—তিনি তাহাতে অন্তরে ব্যথা পাইয়া আমাকে তাহার প্রতিবাদের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন। তদনুসারে 'গোত্র ও প্রবর' প্রবন্ধ ১৩৩৮।৩৯ সালের 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়। কবি নজরুল ইসলামের প্রসিদ্ধ গীতি-কবিতা 'জাতের নামে'র উত্তরে আমিও একটি 'জাতের নামে' কবিতা রচনা করিয়া সতীশচন্দ্রকে শুনাইয়াছিলাম। আমি জানিতাম—ইহা প্রকাশযোগ্য নহে, কিন্তু সতীশচন্দ্র সাগ্রহে তাহা (১৩৩৯—আষাঢ়) 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত করিলেন। তিনি ইহাই বলিলেন যে,—'সংস্কৃতির দুইটি দিক্‌ই দেখা উচিত'। এই ভাবে অনেক বার দেখিয়াছি—তাঁহার হৃদয়টি ছিল শ্রদ্ধায় পূর্ণ। যে কোন কার্য্যে বাহির হইবার আগে গুরু-মহারাজকে প্রণাম করিতে কখনও ভুলিতেন না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-রূপে—আমাদের প্রতি যে বিনয় সৌজন্য দেখাইতেন, তাহাতে আমরা নিজেরাই সঙ্কুচিত হইতাম, কিন্তু তিনি বিরত হইতেন না।

কোন কোন সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে কর্ত্তব্যে কঠোর বলিয়া মনে হইত। বস্তুতঃ, কার্য্যে কোনরূপ ক্ষতি কাহারও দ্বারা ঘটিলে—তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এমনই তাঁহার অপূর্ব্ব মেধা ছিল যে, নিম্নতম কর্ম্মচারী হইতে উচ্চতম পদাধিকারী পর্য্যন্ত সকলেরই কার্য্যের প্রতি সমান ভাবে দৃষ্টি রাখিবার সামর্থ্য ছিল। এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই ছিল তাঁহার কর্ম্মসিদ্ধির মূলমন্ত্র।

অন্য সময়ে সতীশচন্দ্র একেবারে মাটীর মানুষ। মাতৃভক্তি—পত্নীপ্রেম ও পুত্রকন্যা-স্নেহে যেমন মধুর, তেমনই ভদ্রতায় ও সৌজন্যে কোমল ছিলেন।

আজ তাঁহার মত সৎপুরুষের অভাবে সত্যই সংসারের শূন্যতা অনুভূত হইতেছে। আজ তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহার পুত্র-বিয়োগ-বিধুর হৃদয়ে শ্রীভগবান্ শান্তি-প্রদান করুন। মনে হয়, পিতা-পুত্র আজ একত্র মিলিত হইয়াছেন, আর বিয়োগ-বেদনা নাই। কিন্তু স্বর্গে থাকিয়া তিনিই আজ তাঁহার প্রিয়পরিজনের হৃদয়ে শান্তি-বারি-সেকে তাঁহার বিয়োগ সহ্যবেদন করিয়া দিন।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দৈনিক বসুমতীর সর্ব্বস্ব এবং মাসিক বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তিরোধানে আমি যে অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, সতীশ বাবু অতি শৈশবকালেই আমার সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। তিনি কিছু দিন আমার কাছে ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি আমার নিকট প্রথমে Gray's Elegy পড়িবার প্রস্তাব করেন। আমি তাহাতে সম্মত হই। সেই সময় আমি তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাই। তিনি বলেন যে, তাঁহার ইংরেজী ভাষায় অধিকার খুব অধিক নাই, কিন্তু আসল ভাবটা বুঝাইয়া দিলে তিনি তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। তৎপূর্ব্বে তিনি স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঠ করিতেন। আমি তাঁহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়া বুঝিয়াছিলাম,—তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা অসাধারণ। ইংরেজী ভাষায় তখন তাঁহার অধিকার অধিক না থাকিলেও তিনি উচ্চ ভাব গ্রহণে বিশেষ সমর্থ ছিলেন। সে কথা মনে হইলে আজ ঘোর কষ্ট হয়। তাঁহারই প্রতিভা প্রভাবে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের আজ এত উন্নতি। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় এবং যত্নে দৈনিক বসুমতী জন্মগ্রহণ করে। এ বিষয়ে স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা সতীশচন্দ্রের উৎসাহ অনেক অধিক ছিল। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পরদিনই উপেন্দ্র বাবু আমার নিকট 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একখানা দৈনিক সংস্করণ বাহির করিবার প্রস্তাব করেন। কতকগুলি বিশিষ্ট কারণে আমি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি নাই। কিন্তু সতীশ বাবু নাছোড়বান্দা। তিনি বলিলেন যে, তিনি ঐ সকল অসুবিধা দূর করিয়া দিবেন। শেষে যুদ্ধ বাধিবার দুই দিন পরেই আমি এবং শ্রীযুত দুর্গানাথ ঘোষাল কাব্যতীর্থ উভয়ে বর্ত্তমান 'দৈনিক বসুমতী' প্রথম বাহির করি। সে সময়ে সতীশ বাবুর উৎসাহ দেখে কে? আজ সেই সতীশ বাবুর অকালে মহাপ্রয়াণের ফলে যে 'দৈনিক বসুমতী'র সেবকদিগের নয়নে শোকাশ্রুর প্লাবন বহিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

কিশোর বয়সে সতীশচন্দ্র

বসুমতী পত্রিকার এবং বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের উন্নতিসাধনই সতীশ বাবুর জীবনের ধ্যানজ্ঞান ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা কত ঐকান্তিক ছিল, তাহা একটি ব্যাপার হইতেই বুঝা যাইবে। যে সময়ে আমি 'বঙ্গবাসী' হইতে 'বসুমতী'তে যোগদান করি, সে সময়ে কলিকাতা সহরে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' প্রায় বিক্রয় হইত না। হকারেরা সাপ্তাহিক বসুমতী লইতে চাহিত না। কলিকাতায় উহার প্রচার বৃদ্ধি করিবার জন্য সতীশ বাবুর বিশেষ ব্যাকুলতা ছিল। এক দিন তিনি আমাকে কি করিলে কলিকাতায় উহার প্রচার বৃদ্ধি হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তখন স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় 'বসুমতী'র সম্পাদক ছিলেন। 'দৈনিক বসুমতী' তখন ছিল না। আমি তাঁহাকে ভাল ভাল ব্যঙ্গ-চিত্র (Cartoon) ও কবিতা দিতে বলি। কথাটা সতীশ বাবুর মনে লাগিয়াছিল। উহা করাতে কয়েক সপ্তাহ মধ্যে কলিকাতায় উহার প্রচার দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সুরেশ সমাজপতির মৃত্যুর পর তাঁহার 'সাহিত্য' হস্তান্তরিত করিবার প্রস্তাব হয়। সতীশ বাবু উহা লইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তদানীন্তন নায়কের সম্পাদক ৬পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় উহা অন্য হস্তে নীত হয়। সতীশ বাবু তখনই 'মাসিক বসুমতী' প্রকাশিত করেন। সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষই তখন ইহার সম্পাদন-ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে আজ ২২।২৩ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। আজ সে 'সাহিত্য' আর নাই। কিন্তু সতীশ বাবুর চেষ্টায় সেই 'মাসিক বসুমতী' আজ মাসিকপত্রের শীর্ষস্থানে রহিয়াছে। ইহাতে সতীশ বাবুর সংবাদপত্রাদি পরিচালনে অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সতীশচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দর প্রবন্ধাদি লিখিতে পারিতেন। তিনি প্রথমে তাঁহার ভাষাকে অত্যন্ত অলঙ্কৃত করিতেন, ইদানীং তাহা অনেকটা সংযত হইয়া আসিয়াছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে দৈনিকে এবং প্রতি মাসেই মাসিকে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ দাঁত
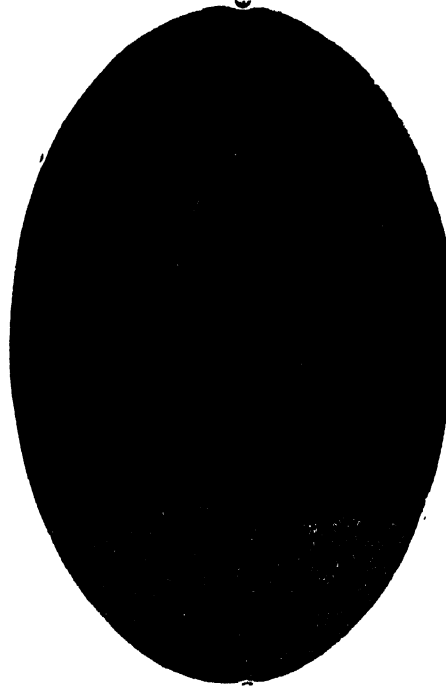
থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। সতীশ বাবু থাকিতে আমরা তাঁহার মর্য্যাদা সম্যক্ ভাবে বুঝিতে পারি নাই। তিনি ছিলেন কর্ম্মবীর। কর্ম্মেই ছিল তাঁহার আসক্তি এবং আনন্দ। কর্ম্ম করিতে তাঁহার কখনই ক্লান্তি বোধ হইত না। এমন কি, কর্ম্ম করিতে করিতে তিনি স্নানাহার পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। তাঁহার হৃদয় কঠোর ছিল না। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি সময় সময় কঠোরতা প্রকাশ করিলেও অনেক সময় তিনি সে জন্য ব্যথিত হইতেন।

সতীশ বাবুর ধর্ম্মবিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল ছিল। সনাতনী মতের দিকে তাঁহার একটু ঝোঁকও ছিল। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, এবং প্রত্যহ পূজা-পাঠ করিতেন। কোন কাজে যাইবার সময় রামকৃষ্ণদেবের প্রতিমূর্ত্তিকে নমস্কার করিয়া বাহির হইতেন।

আজ সতীশ বাবু গিয়াছেন। এ সময়ে এই শোক-কাতর মন লইয়া তাঁহার কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে। তিনি বাঙ্গালী জাতিকে স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে—তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্ব্বল চিত্ত মানুষ আমরা—আমরা তাঁহার জন্য শোকাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া পারি না। কিন্তু তিনি আসিয়াছিলেন ভগবানের বাণী লইয়া—এই কঠোর কর্ম্ম-ভূমিতে কর্ম্ম করিতে। তাঁহার কর্ম্ম শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন তিনি ক্লান্তি পরিহার করিবার জন্য শান্তিধামে গিয়াছেন।

Peace is God's direct assurance
To the souls that win release
From this world of hard endurance—
Peace, he, tell us, only Peace.

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

—

মহাপ্রাণ সতীশচন্দ্র

বিশিষ্ট কর্ম্মীর পরলোক গমনে সমাজ তাঁর কর্ম্মজীবন নানা দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করে। বসুমতীর স্বত্বাধিকারী গুণী, মানী এবং ধনী সতীশচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে ঐ রকম বহু অলোচনার অবসর হয়েছে। কিন্তু বন্ধুত্বের দাবী ব্যক্তিত্বকে ছাড়িয়ে যায়। যেখানে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিল, সে ক্ষেত্রে সুমিত্রের স্নেহ ভাগীরথীর কুলু কুলু স্বরের রেশটুকু স্মৃতিকে পবিত্র করে কিন্তু অভাব হয় উৎপীড়ক। সতীশচন্দ্রের পরলোক গমন তাই আমার পক্ষে তীব্র মর্ম্মবেদনা সৃষ্টি করেছে। তার আদর আপ্যায়ন স্নেহ ও শ্রদ্ধা ছিল মধুর। বিনয় ছিল তার সামাজিক সংস্পর্শের পটভূমি। সে পৃথিবীর কোন্ [illegible] সম্পদ ছিল, সেকথা, দেশের এবং জাতীয় সাহিত্যের অগ্রগমনে সতীশচন্দ্রের সাহচর্য্যের পরিমাণের কথা আজ মনে পড়ে না। স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে তার অমায়িক সরলতা, তার আন্তরিক বন্ধুত্ব। তার কথা মনে হলে অনুভূতি আসে বিরাট ক্ষতির। আবেগের স্বার্থই চিত্তে রাঙিয়ে তোলে অভাবের ছবি। সতীশচন্দ্র ছিল আমার দরদী বন্ধু। তাই আমার কনিষ্ঠোপম সতীশচন্দ্রের পরলোক গমনের কু-সংবাদ সকল দর্শন, সকল বুদ্ধি, মানবদেহের নশ্বরতার সকল সিদ্ধান্ত ভুলিয়ে দিয়ে শোকের অভিযান রোধ করতে পারেনি। যেখানে প্রাণের টান সেথায় শোকের নিরর্থকতার দার্শনিক বিচার আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। বহু আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত এবং প্রতিপালিত আপনার জন আজ সতীশচন্দ্রের শোকে অভিভূত; কারণ, তার আন্তরিকতা এবং দরদ ছিল অনবদ্য।

তার সকল গুণের আধার, সান্ধ্য-জীবনের প্রদীপ একমাত্র সুকুমার রামচন্দ্রের স্বল্প জীবনের অবশেষ শেলের মত সতীশচন্দ্রের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করেছিল। সে আঘাত হল মক্ষম। সেই চরম শোকের প্রতিঘাত প্রতিরোধ করতে পারেনি সতীশচন্দ্র। তাই ভাঙ্গা বুক তার দেহটিকে ভেঙ্গে তাকে অনন্ত পথে নিয়ে গেল। তথা-কথিত জ্ঞানীর বিচারে শোক নিরর্থক। কিন্তু আবেগই মনুষ্যত্ব, দরদই মহাপ্রাণের পরিচায়ক। মনুষ্য-জীবনে জ্ঞান হতে আবেগ ছোট নয়—কারণ অনুরাগ সহজাত, জ্ঞান কৃষ্টি-প্রসূত। শেখা বিদ্যা হ'তে প্রকৃতির দাবী জীবের উপর বড়। তাই পুত্রশোক সহজ খাদে কূল ভাসিয়ে, সতীশচন্দ্রের অকূল অনন্ত-সাগরে মহাযাত্রার কারণ হয়েছিল, এ-ধারণা সাধারণ।

দেশ এবং সমাজের পক্ষ হ'তে আলোচনা করলে অল্প দিনের মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রফুল্লকুমার এবং বসুমতীর সতীশচন্দ্রের মৃত্যু, অকল্যাণের সূচনা। আমাদের দুঃস্থ জাতীয় জীবনের প্রগতির প্রধান সহায়ক সংবাদপত্র। বাঙ্গালীর সাহিত্য অগ্রগমন করেছে মাসিক এবং সাময়িক পত্রের অনাবিল সাহিত্য-সেবায়। ঈশ্বর গুপ্তের আমল হতে অদ্যাবধি সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকা সমৃদ্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যের কি উপকার করেছে, সে কথা বিশ্ব-বিশ্রুত। বলা বাহুল্য, যখন আমাদের সজ্ঞজীবনের এ দিক্‌টার বিশদ আলোচনা হবে, তখন দৈনিক ও মাসিক বসুমতীর অবদান বিশেষ প্রশংসা লাভ করবে। বসুমতীর বীজ বপন করেছিলেন শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। কিন্তু তাঁর যত্নে পালিত সাহিত্য-মহীরুহ কৃতী সন্তানের সেবায় প্রসার লাভ করেছে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। আজ সে বৃক্ষ ফলে-ফুলে সুশোভিত। তার শীতল ছায়ায় বহু সাহিত্যিক

বাণীর সেবায় আত্ম-নিয়োগের অবসর লাভ করেছে। এই সাফল্যের একমাত্র কারণ উপযুক্ত কর্ম্মী নির্ব্বাচনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। এ বিষয়ে সতীশচন্দ্র ছিল বিচক্ষণ। যাঁদের হাতে দৈনিক এবং মাসিক বসুমতী পরিচালনের গুরু-ভার ন্যস্ত আছে, তাঁদের কৃতিত্বে বসুমতীর অকল্যাণ হবে না, এ বিশ্বাস কল্পনা-প্রসূত নয়। সতীশচন্দ্রের স্মৃতির প্রেরণা তাঁদের উৎসাহ দেবে।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির এক অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান। বঙ্গবাসী এবং হিতবাদী প্রভৃতি সু-গ্রন্থ প্রচারের পথ-প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু বসুমতী সে শুভকার্য্যে সবিশেষ সাফল্য লাভ করেছে। সাফল্য মাত্র বসুমতীর পক্ষ হ'তে নয়—সাফল্য সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের। কারণ, এঁদের প্রচেষ্টা ব্যতীত গৃহস্থের ঘরে রত্ন বিরাজ করত না। এ কর্ম্মেরও অনুষ্ঠাতা ছিলেন সতীশচন্দ্রের পিতৃদেব। কিন্তু আপনার উৎসাহে, কর্ম্মক্ষমতায় বিচক্ষণ ব্যবসা-বুদ্ধিতে এবং প্রশংসনীয় সৎসাহসে সতীশচন্দ্র বসুমতী-সাহিত্য-ভাণ্ডারকে উন্নত করেছেন।

আজ বঙ্গসাহিত্যসেবী, বিভিন্ন কর্ম্মের কর্ম্মী যাঁরা এই বিশাল বসুমতী প্রতিষ্ঠানে জীবিকা উপার্জ্জন করছেন তাঁদের প্রতি সতীশচন্দ্রের ব্যবহার ছিল মিষ্ট। তাঁরাও আজ শোকসন্তপ্ত!

আজ বহু আঁখি সতীশচন্দ্রের শোকে অশ্রু-ভারাক্রান্ত। তাঁর রোরুদ্যমানা জননী, বিধবা পত্নী, পুত্রবধূ এবং স্নেহের কন্যাদের প্রবোধ দেবার চেষ্টা হবে ধৃষ্টতা, এ শোকে ভগবান্ তাঁদের সান্ত্বনা দেবেন। এবং সতীশ-চন্দ্রের পুণ্য-স্নেহ-ভাগীরথীর ধারা তাঁদের সকল সন্তাপ ধুয়ে দেবে, এই প্রার্থনা ব্যতীত আর আমাদের কর্ত্তব্য নাই। শান্তির বারি শোকাশ্রুকে পবিত্র করুক, জগদীশ্বরের কাছে আমার এই দীন নিবেদন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

সতীশ-বিলাপ

কয়েক দিন আগে শ্রীমান্ রামচন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যুতে স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। শোকের সেই ধাক্কা এবং বিস্ময় কাটিতে না কাটিতে, সেই অভিভূত অবস্থাতেই সম্মুখে ঘোর রবে আবার অশনিপাত হইল; প্রিয় বন্ধু শ্রীযুত সতীশচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইলাম। এ বার হতজ্ঞান হইয়া পড়িলাম; বাক্‌রোধ হইয়া পড়িল। উপর্য্যুপরি এরূপ দুর্দ্দৈব আমার দীর্ঘ জীবনে আর দেখি নাই; ইহাই প্রথম দেখিলাম।

পিতা ও পুত্রের এইরূপ পর পর আকস্মিক প্রয়াণের মধ্যে মনে হয়, একটা গভীর দৈব-রহস্য নিহিত আছে, যাহা আমাদের ন্যায় অল্পজ্ঞান মানবের পক্ষে বুঝা কঠিন। নারায়ণের এ রহস্যময় বিধানের মধ্যে প্রবেশ করা আমাদের সাধ্যাতীত। 'বসুমতী'র এই অচিন্ত্যনীয় দুর্দ্দৈবে কথা চিন্তা করিতে আমার শক্তিতে কুলাইতেছে না। যতটুকু ভাবিতেছি, তাহাতেই মাথা গোলমাল হইয়া যাইতেছে; হতভম্ব হইয়া পড়িতেছি——'এ কি হইল! এ কি হইল!'—এই কথা তিনটি আমার অন্তরের অলিতে গলিতে হা-হা করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আমাকে যেন পাগলের মত করিয়া তুলিতেছে! আমি কি-ই বা বলিব, কি-ই বা লিখিব!

প্রাণাধিক শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দিবার পর দশরথ যেমন শেষ শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর উঠেন নাই, তেমনি সতীশচন্দ্রও কি তাঁহার প্রাণাধিক রামচন্দ্রকে চিরতরে বিদায় দিয়া তাহারই পথানুসরণ পূর্ব্বক অমর-ধামে চলিয়া গেলেন!

আমার ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি সাহিত্যক্ষেত্রের বাহিরে ছিলাম। মাত্র ১৬-১৭ বৎসর হইল ইহার ভিতরে প্রবেশলাভ করিয়াছি। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই যাঁহাদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ-সংশ্রব হয়, তাহার মধ্যে সতীশ বাবু অন্যতম। আমার সাহিত্য-সেবার মধ্য দিয়া এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আমি লিখিয়াছি, তাহার অধিকাংশই তাঁহার সম্পাদিত 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সহিত আলাপ করিবার বা সংশ্রব রাখিবার আমার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। এবং সেই সুযোগের ফলে তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্মশক্তি ও গুণরাশির যে সব পরিচয় আমি পাইয়াছি, তাহা লিখিতে গেলে একখানি সম্পূর্ণ 'মাসিক বসুমতী'তেও কুলায় না। তবে মনের এ অবস্থায় তাহা লিখাও অসম্ভব। এইটুকু মাত্র বলি যে তিনি দেবতা——না, দেবতা নয়, তিনি দেবতা ছিলেন না, তিনি মানুষ হইয়াই জন্মিয়াছিলেন এবং মানুষই ছিলেন। তবে, তেমন মানুষ খুবই কম দেখা যায়। কাজে-কর্ম্মে, সদ্ব্যবহারে, দয়ায়, ভদ্রতায় তিনি এক জন পূর্ণ মানব ছিলেন। তাঁর কর্ম্মশক্তি এবং আদর্শ অতি মহান্ ছিল। আজ শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রার্থনা করি, তাঁর আত্মা স্বর্গীয় শান্তি ও কল্যাণের অধিকারী হউক।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

কৃতী ও কর্ম্মী সতীশচন্দ্র

বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সাপ্তাহিক 'বসুমতীর' কার্য্যা-লয় যখন গ্রে ষ্ট্রীটে একটি দ্বিতল বাটীতে অবস্থিত এবং স্বনামধন্য পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সম্পাদক, তখন আমি শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত 'বসুমতী' ও 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের' প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচিত হই। আমি তখন সুবি-খ্যাত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগে নব-নিযুক্ত যুবক সাংবাদিক। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি

উপেন্দ্রনাথের স্নেহাকর্ষণে সমর্থ হই। অনেক প্রকার বিজ্ঞপ্তি-পুস্তিকা প্রভৃতির ইংরেজী বাঙ্গালা তরজমা আমি অবসর সময়ে করিতাম। রায় বাহাদুর জলধর সেন যখন 'বসুমতীর' সম্পাদক এবং দীনেন্দ্রকুমার রায় সহকারী সম্পাদক, তখন আমার 'ভাইজাগ ভ্রমণ' কাহিনী 'বসুমতী'তে স্থান পায়। এই সময়ে উপেন্দ্রনাথের আহিরীটোলা ভবনে আমি কিশোর সতীশচন্দ্রের প্রথম দর্শন ও পরিচয় লাভ করি। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' হইতে 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকায় কর্ম্মপ্রাপ্তির পর 'বসুমতীর' সহিত আমার সক্রিয় সংশ্রবের অবসান ঘটে, কিন্তু উপেন্দ্রনাথের স্নেহ এবং সতীশচন্দ্রের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকে। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং স্বর্গত সত্যেন্দ্রকুমার বসু মহোদয়গণের সম্পাদনা কালে 'বসুমতীর' সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সৌহৃদ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ইতিমধ্যে উপেন্দ্রনাথের তিরোধানে সতীশচন্দ্র কর্ম্মভার গ্রহণ এবং ক্রমান্বয়ে দৈনিক, মাসিক, বার্ষিক (পরে শারদীয়া) 'বসুমতীর' প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের 'দৈনিক বসুমতীর' সম্পাদকরূপে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের পরে পণ্ডিতবর প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তীর সাহচর্য্যে ইংরেজী দৈনিক 'বসুমতীর' প্রতিষ্ঠা এবং কিছু কাল তাহার পরিচালনাও সতীশচন্দ্রের অদম্য উদ্যম, উৎসাহ, কর্ম্মপ্রবণতা এবং অক্লান্ত প্রযত্নশীল প্রচেষ্টার পরিচায়ক। বৈদ্যুতিক রোটারি মেসিনে বাঙ্গালা সংবাদপত্র মুদ্রণ, বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র কর্ত্তৃক রয়টারের তার নিয়মিত ভাবে গ্রহণ করিবার অভিনব প্রথা সতীশচন্দ্রের সৎসাহস ও দূরদৃষ্টির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার গবেষণামূলক অর্থনৈতিক এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক প্রবন্ধ ছাপিয়া পাঠক-পাঠিকাবর্গকে তরল বিষয়ের পরিবেশনের সহিত গভীর বিষয়ের আলোচনা দ্বারা চিন্তাশীল, স্বদেশবৎসল ও স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি আস্থাবান্ এবং অনুরাগ-সম্পন্ন করিবার রীতি তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। আমি 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' ত্যাগ করিয়া 'কমার্শ' নামক ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রিকায় যোগদান করি, তখন তিনি আমাকে ঐ সকল বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। তখন আমি বিভিন্ন ইংরেজী সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলাম; সুতরাং কার্য্যারম্ভ করিতে পারি নাই। পরে আমি 'কমার্শ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারি-পরিবর্ত্তন ও স্থানান্তরকরণের ফলে বোম্বাই-প্রবাসী হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। দুরারোগ্য বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হইয়া হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য বশতঃ আমি যখন 'কমার্শ' হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করি, তখন তিনি পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আমিও তদবধি সাধ্যানুযায়ী প্রবন্ধ লিখিতেছি। তাঁহার প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-দক্ষতা ছিল অসাধারণ। প্রবন্ধ-সম্ভারে 'মাসিক বসুমতী' চিরদিন গরিষ্ঠ। সর্ব্ববিষয়ে অসমসাহসিক অগ্রগতিই ছিল সতীশচন্দ্রের উদ্যমশীলতার বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থাদির বাঙ্গালা অনুবাদ-সাহায্যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালী মহলে জাতীয় কৃষ্টিগত শিক্ষা-প্রদানকার্য্যে 'বসুমতী' পত্রিকাই অগ্রণী ছিল। উপেন্দ্রনাথও সেই পথ অনুসরণে বিবিধ হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্ববিদ্যা সর্ব্বজনপরিচিত, এবং প্রাচীন ও নবীন মনীষী বাঙ্গালা-লেখকগণ-রচিত সদ্‌গ্রন্থাবলীকে জনসাধারণের প্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে যে 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—সতীশচন্দ্রের অনন্যচিত্ত অধ্যবসায়ের ফলে আজ তাহা ক্ষুদ্র বীজ হইতে উৎপন্ন সুবিস্তৃত বহু শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত মহা মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। সংবাদপত্র সাহায্যে দেশসেবা ও দেশবাসীর স্বদেশপ্রবণতা প্রবর্দ্ধিত করিবার কার্য্যেও সতীশচন্দ্র পিতৃ-প্রবর্ত্তনার প্রচুর ও প্রভূত প্রসার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার মেধা যেমন তীক্ষ্ণ ছিল, প্রকৃতিও তেমনি মধুর ছিল। বন্ধুবাৎসল্যে তিনি সর্ব্বদা সোদরতুল্য ছিলেন। আত্মীয় বন্ধুর আপদে বিপদে তাঁহার সমবেদনা ছিল প্রচুর। গত বিজয়া দশমীর পরদিবস তিনি আমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন! কে জানিত তখন,—আর আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটিবে না! শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ বসুর (ব্যাঙ বাবু) ভবনে মধ্যে মধ্যে বহু বন্ধু-বান্ধবের উপস্থিতিতে কত প্রীতিকর আলাপ-আলোচনা আমাদের চলিত, তাহার অন্ত নাই। সতীশচন্দ্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞপ্তি লিখিবার তাঁহার একটি অপূর্ব্ব নিজস্ব ভঙ্গী ছিল। যেমন হাস্যরসে, তেমনি ভক্তিরসে পরিপ্লুত, তাঁহার ভাষা ও ভাব ছিল যেমন গম্ভীর তেমনি লীলা-চঞ্চল। প্রকাশক হিসাবে ব্যবসা-ক্ষেত্রে আর্থিক সততা এবং প্রত্যেক অর্থী-প্রার্থীর প্রাপ্য প্রদান-তৎপরতা ছিল অসীম। মৎপ্রণীত "জীবনরহস্য" ও "মোহ-মুক্তি" পুস্তকদ্বয়ের প্রকাশকরূপে তাঁহার ব্যবহার ছিল উদার ও সরল। সতীশচন্দ্রের মৃদুতা ও সততা প্রভৃতি গুণে বহু লোক বহুল পরিমাণে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত ছিল। আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধু। নিদারুণ কন্যা-পুত্র-শোকে বিদীর্ণ হৃদয়ে তাঁহার অকাল-বিয়োগ-ব্যথা আমি পরম আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথার ন্যায় অনুভব করিতেছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সতীশচন্দ্র

বসুমতীর সতীশচন্দ্র···আমাদের প্রিয়বন্ধু সতীশচন্দ্র আজ আর ইহলোকে নাই! তাঁহার এই আকস্মিক তিরোধানে আমরা স্তম্ভিত!

দু'মাস পূর্ব্বে তাঁর একমাত্র বংশ-তিলক রামচন্দ্রের অকাল-বিয়োগ ঘটে। সে-শোকে তাঁকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা ছিল না! আজ তাঁর এই অপ্রত্যাশিত তিরোধানে মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেছে!

লেখক বলিয়া সতীশচন্দ্র বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। সে প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনাও তাঁর ছিল না! তবু বহু রচনা-সম্ভারে তিনি বাঙ্‌লা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সে-সব রচনায় নিজের নামের ছাপ দিতে সতীশচন্দ্রের কুণ্ঠা ছিল অনেকখানি। কুণ্ঠার কারণ জানি না! কেন না, যুক্তি, ভাষার ছন্দ এবং ভাবের সঙ্গতি হিসাবে সে-সব রচনা এতটুকু তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয় নয়।

কিন্তু রচনার কথা ছাড়িয়া দিই—বাঙ্‌লার সাহিত্য-সেবীরা তাঁর কাছে বহু ভাবে ঋণী; সে-ঋণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সতীশচন্দ্রের নানা গুণের কথা সবিস্তারে বলিবার মতো মনের অবস্থা আমার নয়! কারণ, তিনি ছিলেন আমার সোদরপ্রতিম অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর অকাল-বিয়োগে তাঁর কথা বলিয়া প্রকাশ্যে শোকোচ্ছ্বাস-ঘোষণায় ব্যথার ভার লঘু হইবে না! এ ব্যথা আমার একান্ত নিজস্ব। বাহিরে জনসভায় তাঁর যে-পরিচয় অপরিজ্ঞাত, সেই সম্বন্ধে শুধু দু'-চারিটা কথা বলিতে চাই। যে-কথা বলিব, সে শুধু তাঁকে স্মরণ করিয়া—তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে। ভাষার ছটায় তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বলিতে বসিয়া নিজেকে খাড়া করিয়া তুলিব, এমন ধৃষ্টতা-প্রকাশের মূঢ়তা আমার নাই!

সতীশচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ইংরেজী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। তিনি তখন বয়সে কিশোর। সদ্য বি-এ পাশ করিয়া আমি ল' পড়িতেছি,—ষ্টার থিয়েটারে রসরাজ অমৃতলাল তখন অধ্যক্ষ; এবং অমৃতলালের আগ্রহে আমার লেখা একখানি রঙ্গনাট্যের অভিনয় হইতেছে ষ্টার থিয়েটারে। সতীশচন্দ্রের পিতা ৺উপেন্দ্রনাথের বসুমতী কার্য্যালয় তখন গ্রে ষ্ট্রীটে। আমার লেখা দু'-চারিটি ছোট গল্প ৺সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের 'সাহিত্য' পত্রিকায় ছাপা হইতেছিল। সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদক সুরেশচন্দ্র; তাঁর মারফৎ উপেন্দ্র-নাথের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এবং তাঁহারি কথায় আমার লেখা রঙ্গনাট্য বসুমতী পুস্তক বিভাগে বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখি। সেই সূত্রে বসুমতী অফিসে যাতায়াত। যখনই যাইতাম, দেখিতাম, উপেন্দ্রনাথের পাশে কিশোর সতীশচন্দ্রকে।

দু'টি চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, মুখে অমায়িক হাসি, নম্র বয়ন। সেই আমাদের প্রথম পরিচয়। তার পর তাঁর বিবাহ হয় এবং এই বিবাহ-সূত্রে হয় আমার সঙ্গে কুটুম্বিতা। তার পর মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণের আসরে তাঁর সঙ্গে দেখা হইত—কথাবার্ত্তা হইত। সে-সব আসরে সাহিত্য সম্বন্ধে অবশ্য আলোচনার সুবিধা ঘটে নাই!

১৩২৯ সালে সতীশচন্দ্র প্রথম মাসিক বসুমতী প্রকাশ করেন। আমি তখন বন্ধুবর ৺মণিলালের সঙ্গে ভারতীর সম্পাদক। ওকালতির মোহে পরে আমাকে 'ভারতীর' সম্পাদনা ত্যাগ করিতে হয়; আমার সাহিত্য-সাধনাও একরূপ বন্ধ হয়।

১৩৩৪ সালে সতীশচন্দ্র আমার গৃহে আসিয়া আমাকে তাগিদ দিতে লাগিলেন—নিজের কাগজ নাই। মাসিক বসুমতীর জন্য গল্প লিখুন।

তাঁর জোর তাগিদে জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার নূতন করিয়া গল্প লেখা ধরিলাম এবং "জয়-যাত্রা" নামে একটি গল্প লিখিয়া তাঁর হাতে দিলাম। না চাহিতেই সে গল্পের জন্য যে-দক্ষিণা দিলেন, তার 'রেট' একটু অভাবনীয় রকমের।

তার পর তাগিদ আর থামিল না। আমার গৃহে প্রায় আসিতেন। তাগিদের উপর তাগিদ চলিল। সে তাগিদ উপেক্ষা করা গেল না। লেখায় কেমন মাতিয়া উঠিলাম। সতীশচন্দ্রের তাগিদে মাসিক বসুমতীর নিত্য-সেবার কাজে তাঁর সঙ্গে ক্রমে অন্তরঙ্গতা ঘটিল।

১৩৩৬ সালে আষাঢ় মাসে রসরাজ অমৃতলালের মৃত্যু হয়। সে বৎসর পূজার পূর্ব্বে সতীশচন্দ্র বলিলেন—মাসিকের পূজা-সংখ্যায় অমৃতলাল প্রতি-বৎসর একটি করিয়া satirical রচনা লিখিয়া দিতেন। এ-বৎসর তিনি নাই—আপনাকে কিছু satirical লেখা দিতে হইবে। কুণ্ঠিত হইয়া বলিলাম,—Satire-এ হাত মক্সো করি নাই!

হাসিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন—করেন নাই বলিয়া করিবেন না, এমন হইতে পারে না। আমার কথায় সুরু করুন।

সতীশচন্দ্র ছাড়িলেন না। আমাকে satire লিখিতে হইল। লিখিলাম 'প্রমত্ত মর্ত্ত্যলোক'। লেখার নীচে নাম দিতে সঙ্কোচ—নাম দিলাম বৈকুণ্ঠ শর্ম্মা। কিন্তু এ ছদ্ম-নাম টেঁকে নাই। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে-লেখার তারিফ করিলেন। সতীশচন্দ্র তখন বৈকুণ্ঠ-নামের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া আসল নাম প্রকাশ করিয়া দিলেন।

তার পর তিনি লেখায় আমাকে বিরাম দেন নাই। মাসিকের জন্য নানা বিষয়ে লিখাইয়াছেন। দৈনিক

বসুমতীর জন্য প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমাজনীতি সাহিত্য বিজ্ঞানের কলমেও নিত্য বহু লেখা লিখাইয়াছেন। কাছারির কাজের পর অবসর পাইলেই বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে যাইতাম। চা, জলখাবার, পাণ—এ-সবে তাঁর কি যত্ন ছিল! আতিথ্যে তাঁর নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। আদর-আপ্যায়নে ছিল অকৃত্রিম অনুরাগ। কাছারির কাজের পর বসুমতী অফিসে তাঁর ঘরে বসিয়া সাহিত্য সম্বন্ধে নিত্য কত আলোচনা হইয়াছে। সে-আলোচনার ফলে নিত্য নূতন প্রেরণা পাইয়াছি। সাহিত্য-সেবায় তাঁর নিষ্ঠা দেখিয়া নিজের ত্রুটি বুঝিয়া সংশোধনের প্রয়াস পাইয়াছি। বিদায়ের ক'দিন পূর্ব্বেও তাঁর পীড়া যখন তাঁকে একেবারে শয্যাশায়ী করিয়াছে, তখনো আমাকে চিঠি লিখিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন—মাসিক বসুমতীর উৎকর্ষ-সাধনের সম্বন্ধে দু'জনে কত কথা হইয়াছে! একমাত্র কৃতী পুত্রের বিয়োগ-বেদনা বুকে ধরিয়াও বসুমতীর সেবায় তিনি এতটুকু শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। বহু সাহিত্য-সেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমি জীবনে লাভ করিয়াছি—কিন্তু সতীশচন্দ্রের মতো এমন নিষ্ঠা কাহারো দেখি নাই।

এক কথায় বসুমতী ছিল তাঁর সর্ব্বস্ব! পুত্র-পরিজন, বিষয়-সম্পত্তি—এ সবের দিকেও যদি বা ত্রুটি ঘটিত, বসুমতীর কাজে কখনো ত্রুটি লক্ষ্য করি নাই। বসুমতীর সেবা—বসুমতীর উৎকর্ষ-সাধন ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান! অফিসে নিত্য সেই বেলা এগারোটায় আসিয়া বসা এবং বসিয়া একটানে কাজ করা সেই বেলা সাড়ে পাঁচটা-ছ'টা পর্য্যন্ত—বেলা চারিটায় উপর-তলা হইতে চা আসিত, সেই সঙ্গে কোনো দিন দু'টি সন্দেশ বা টোষ্ট রুটি। আর ঐ একটানা কাজ! একটি দিনের জন্য ব্যতিক্রম ছিল না। বৈষয়িক কাজে কোনো দিন যদি দু'-ঘণ্টা বাহিরে যাইতেন তো ফিরিবা মাত্র আবার বসুমতীর কাজ। এতখানি অধ্যবসায় ও শ্রমশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম!

খাতার ছোট্ট হিসাবটুকু মিলানো হইতে বসুমতীর ছাপার কাজ যাহাতে নিখুঁৎ হয়, সে সব দিকে কতখানি লক্ষ্য ছিল! তার উপর মাসিক প্রকাশিত হইবামাত্র নিজের হাতে লেখকদের জন্য তাঁদের লেখার ফাইল বাছিয়া ঠিক করিতেন; ফাইলের সঙ্গে সঙ্গে লেখার দক্ষিণা লেখকদের চাহিবার পূর্ব্বেই নিজে হইতে পাঠাইয়া দিতেন। বলিতেন, যার যা পাওনা, ফেলিয়া রাখিলে অস্বস্তি ধরে। ও-কর্ত্তব্য সদ্য সদ্য চুকাইয়া দিতে পারিলে শান্তি পাই!

ব্যবসায়ী-হিসাবে এই তৎপরতা বাঙালী মাত্রেরই অনুকরণযোগ্য!

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির কি করিয়া এমন বিরাট রূপে গড়িয়া তুলিলেন—একা, সে কাহিনী আরব্য উপন্যাসের গল্পের চেয়েও আশ্চর্য্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না! কত দিন আমায় গল্পচ্ছলে বলিয়াছেন—এমন অবস্থা গিয়াছে যে কাল কি আহার করিব, সে সংস্থান নাই! ভাবিয়া চিন্তিয়া খাটিয়া খুটিয়া চেষ্টা করিয়াছি, পরমহংসদেবের কৃপায় সুরাহা হইয়াছে। চার-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলেন, বসুমতী অফিস ক্লোজ করিয়া দিই—সারা জীবন খাটিব যদি, বিশ্রাম করিব কবে? কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবি, এত লোক এই সাহিত্য-মন্দিরকে অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন, তাঁদের অসুবিধা ঘটিবে! ক্লোজ করিবার উপায় নাই। এত বড় দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়াছি—আর পাঁচ জনের কথা ভাবিয়া এ-দায়িত্ব নামানো চলে না।

কর্ম্মচারীদের মধ্যে দেখিয়াছি, কেহ-কেহ গুরুতর অপরাধ করিয়াছে…criminal offence পর্য্যন্ত—আমরা বলিয়াছি, পুলিশে দিন। তাহাতে বলিতেন, পুলিশে দিলে জন্মের মতো নষ্ট হইবে! কর্ম্মচারীদের অসম্ভব গাফিলিতে কতবার বলিয়াছেন, তোমাদের হিসাব চুকাইয়া সরিয়া পড়ো বাপু, এখানে আর পোষাইবে না। কিন্তু পরের দিন দেখিয়াছি, সেই লোকই যথাস্থানে বসিয়া কাজ করিতেছে।

যত দোষ করুক, কাহাকেও চাকরি হইতে বড় একটা বরখাস্ত করিতেন না। এমন বহু ঘটনা দেখিয়াছি।

তাঁর চরিত্রে মায়া-মমতা ছিল খুব বেশী। এই মায়া-মমতার ফলে বহু লোক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বহু টাকা ভাঙ্গিয়াছে—এবং সে টাকার খেশারতীও অনেকে দিতে পারে নাই; সে খেশারতীর ভার সতীশচন্দ্র সহিয়াছেন!

তাঁর সখ্য ছিল অকৃত্রিম। এ সখ্য-প্রীতির বহু পরিচয় পাইয়াছি। খুব একটি সামান্য ঘটনার কথা বলি।

গত বড়দিনের পূর্ব্বে এক দিন সকালে দু'জনে চুঁচড়ায় গিয়াছিলাম। ভোরে সতীশচন্দ্র আমার বাড়ীতে গাড়ী করিয়া উপস্থিত হন; এবং তাঁর গাড়ীতে আমাকে তুলিয়া যাত্রা। ফিরিবার পথে আমাকে বলিলেন—মাহেশে এক সন্দেশের দোকান আছে। সে-দোকানে যেমন সন্দেশ তৈয়ারী হয়, এমন আর কোথাও নয়!

শুধু মুখের কথা নয়! সেই দোকানে নিজে গিয়া তখন আধ মণ সন্দেশ কেনেন। আমার জন্য পাঁচ সের, নিজের বাড়ীর জন্য পাঁচ সের এবং তাঁর বৈবাহিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের (ভারতবর্ষ) বাড়ীতে দিবার জন্য দশ সের! এমন ঘটনা এই এক বার নয়, বহু বার ঘটিয়াছে।

বন্ধুদের গৃহে বিবাহ-উপনয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সতীশচন্দ্র আসিয়া সহকারিতা করিতেন। নিজে

জিনিষপত্র কিনিয়া জোগান্ দিবার ভার লইতেন। কতখানি উদার ও দরদী মন হইলে মানুষ এ দায় ঘাড়ে লয়, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা বুঝিবেন।

এমনি কত কথাই আজ মনে পড়িতেছে! এত বড় কৃতী, এমন ধনী—অথচ আচারে-ব্যবহারে সতীশচন্দ্র ছিলেন খুব সাদা-সিধা! বিলাসিতা বা বাবুয়ানার ধার ধারিতেন না!

দেবদ্বিজে ভক্তি থাকিলেও তাঁর মন ছিল প্রগতির উৎসাহে ভরা। দ্বিতীয়া কন্যা (আজ স্বর্গগতা) আই-এ পাশ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, বি-এ পড়াইবেন। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিয়া সে-কন্যাকে অকালে হরণ করিলেন। পুত্র রামচন্দ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অসাধারণ মেধাবী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এমন ব্যাপারে বহু পিতা গর্ব্বে কত আস্ফালন করেন। কিন্তু সতীশচন্দ্রের মুখে পুত্রের কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটি কথা কখনো শুনি নাই। কনিষ্ঠা কন্যাদের শিক্ষা-তালিকায় সঙ্গীতাদির চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রার্থীকে তিনি কখনো ফিরান নাই!

আজ তাঁর এত কথা মনে পড়িতেছে যে কোন্‌টা রাখিয়া কোন্ কথা বলিব, সে-বিচার দুঃসাধ্য। নানা ভাবে তাঁর সঙ্গে মিশিয়া সে-মনের যে-পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁর উপর আমার শ্রদ্ধা-প্রীতির সীমা নাই! এত শীঘ্র তাঁহাকে হারাইব, কল্পনা করি নাই!

কিশোর বয়স হইতেই আমার সাধ ছিল মহাকবি সেক্সপীয়রের নাট্যগ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ করিব। কিন্তু ছাপিবে কে? আমার এ ইচ্ছার কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র সাগ্রহে সে-ভার লইলেন। দু'টি খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, বাকীগুলিও প্রকাশ করিবেন। কাগজের নানা অসুবিধায় তাহা ঘটে নাই। সম্প্রতি ক'খানি খুব প্রয়োজনীয় গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছিলেন—আমার সঙ্গে পরামর্শাদি হইয়াছিল। সে গ্রন্থ-প্রকাশে দেশের বেকার-সমস্যা-সমাধানের খানিকটা উপায় মিলিত —কিন্তু আজ তাঁর আকস্মিক তিরোধানে সে কাজ হয়তো অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল!

আজ মনে জাগিতেছে, তাঁর বিপুল কর্ম্মশক্তি এবং বিচক্ষণতার কথা! সে-কথায় মনে হয়, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ বিভাগে টাটা-সাহেব যেমন কর্ম্মবীর ছিলেন, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির গড়িয়া তোলায় সতীশচন্দ্রের কর্ম্মতৎপরতাও তেমনি অসাধারণ।

তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আজ দু'-চারিটি মাত্র কথা লিখিলাম। সতীশচন্দ্রের কাছে বাঙ্‌লা দেশ ঋণী। বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, রমেশচন্দ্র, প্রভাতকুমার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—ইঁহাদের অমর রচনাবলী সুলভে প্রচার করিয়া সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাহা সুপ্রাপ্য করিয়া বাঙালীকে তিনি যে-ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বাঙালী আজ সে-ঋণ স্মরণ করিয়া সতীশচন্দ্রের প্রতি কি ভাবে শ্রদ্ধা জানাইবেন, জানি না।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সতীশচন্দ্রের স্মৃতি

সতীশচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইল সহজে তাহার পূরণ হইবে না। তিনি ছিলেন বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও পুরোহিত। এই বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির বঙ্গদেশের একটি প্রধান জ্ঞান-প্রতিষ্ঠান। ভারতীর ভক্ত সেবকগণ সাহিত্যসৃষ্টি করেন। সেই সাহিত্যের যথাযোগ্য প্রচার না হইলে জাতির ও দেশের পক্ষ হইতে তাহা ব্যর্থ। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি জ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য—সুলভে সেই সাহিত্যের প্রচার করা। আমাদের দেশে বিভিন্ন জ্ঞান-প্রতিষ্ঠান হইতে কিছু কিছু সাহিত্য-গ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে—কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বেশী নয় এবং মূল্যাধিক্যের জন্য সেগুলি সর্ব্বজনের অধিগম্য হয় নাই। সতীশচন্দ্রের বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির এ হিসাবে দেশের যে উপকার করিয়াছে—তাহা কোন জ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের বা বিদ্বৎসঙ্ঘের দ্বারা সম্ভব হয় নাই। আজ যে বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-গ্রন্থগুলি ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে—আজ যে বাংলার আপামর সাধারণ ধনিদরিদ্রনির্বিশেষে শিক্ষিত অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছে—প্রত্যেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহেও বঙ্গসাহিত্যের এক একটি লাইব্রেরি গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে—তাহা চিরসারস্বত সতীশচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে। আমার মত দরিদ্র শিক্ষক যে শয্যা হইতে হাত বাড়াইলেই বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির নাগাল পাইতে পারে, তাহা কেবল সতীশচন্দ্রের কৃপায়। তাই বলিতেছিলাম—সতীশচন্দ্রের অভাব এ দরিদ্রদেশে সহজে বিদূরিত হইবে না।

সতীশচন্দ্র ছিলেন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ ব্রাহ্মণ। হিন্দুর জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য তাঁহার অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, সংস্কার, ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার এই শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই আমার সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল।

সতীশচন্দ্রের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল ২৪ বৎসর ধরিয়া। ছাত্রজীবনে যে সকল সাহিত্যরথীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম,—সাহিত্যচর্চ্চার প্রথমাবস্থায় যাঁহাদের নিকট আমি সহায়তা ও উৎসাহ লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন আমার পরমাত্মীয় অভিভাবকের মত। ইনিই

আমাকে সতীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেন। আর সতীশচন্দ্র আমাকে এক দিকে বসুমতীর মারফতে বাংলার পণ্ডিতসমাজের সহিত—অন্য দিকে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের মারফতে বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনার সহিত পরিচিত করাইয়াছিলেন। এই উপকারের জন্য আমি তাঁহার কাছে চির ঋণী। ইহারই ফলে মাসিক বসুমতীর সহিত আমার বাইশ বৎসর ধরিয়া ঘনিষ্ঠতা। আমার রচনা দিয়াই মাসিক বসুমতীর প্রথম সংখ্যার সূত্রপাত। আমার রচনার প্রতি সতীশচন্দ্রের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল—ইহা হইতেই অনুমেয়। তার পর এই বাইশ বৎসর ধরিয়া প্রায় প্রতি মাসেই আমি সতীশচন্দ্রের প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। তাঁহার অনুরোধে বহু লেখাই লিখিয়াছি। কত বার অভিমান করিয়া তাঁহাকে অপ্রিয় কথাও শুনাইয়াছি—দুই একবার রাগ করিয়া লেখা দেওয়া বন্ধও করিয়াছিলাম। কিন্তু লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও তাঁহার কোন অভিমান ছিল না। সতীশচন্দ্র কিছুতেই বিচলিত হইতেন না। তাঁহার শিষ্ট ও মিষ্ট আচরণে মুগ্ধ হইয়া দুই মাসের বেশী রাগ অভিমান পোষণ করিবার উপায় ছিল না। মানুষের হৃদয় জয় করিবার শক্তি ছিল তাঁহার অসীম।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি অবলম্বনে আমি যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলাম—সেগুলি যেমন দীর্ঘায়ত—তেমনি সংস্কৃত-শব্দবহুল। সেগুলির জন্য আমার ভাগ্যে প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জুটিয়াছিল। এই সকল কবিতার পক্ষপাতী যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্রই অগ্রগণ্য। সতীশচন্দ্র যদি এই কবিতাগুলির সমাদর না করিতেন—তাহা হইলে এগুলি প্রকাশিতই হইত না। রসিক-সমাজে না হউক, বিদ্বৎ-সমাজে আজ আমার গঙ্গা, হিমালয়, অশ্বত্থ, আদিত্য ইত্যাদি কবিতা অনাদৃত নয়। অতএব এইগুলির প্রকাশ ও প্রচারের জন্য আমি সতীশচন্দ্রের নিকট ঋণী। সতীশচন্দ্রকে আমি আমার সাহিত্য-সাধনার পরম বন্ধু এবং পরম সহায় মনে করি।

সতীশচন্দ্র আমাকে তাঁহার অন্তরঙ্গ জন বলিয়া মনে করিতেন। তাই তাঁহার গৃহের প্রত্যেক পূজা-পার্ব্বণ ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করিতেন। অনেক পত্রিকারই সেবা করিয়াছি—দীর্ঘকাল ধরিয়া, কিন্তু কোন পত্রিকার স্বত্বাধিকারী বা সম্পাদকের সঙ্গে এই শ্রেণীর অন্তরঙ্গতা জন্মে নাই।

উপযুক্ত কৃতী সন্তানকে আপনার আসনে বসাইয়া যদি তিনি আজ বিদায় লইতেন—তাহা হইলেও আমরা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু বিধাতা সে সান্ত্বনা হইতেও আমাদের বঞ্চিত করিয়াছেন। রামচন্দ্রকে হারাইয়া সতীশচন্দ্রের দীর্ঘজীবন লাভ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিয়াছে। ইহা লইয়া বিধাতার সঙ্গে বিরোধ আমাদের নাই।

কেবল হতভাগ্য দেশের পক্ষ হইতে বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—রামচন্দ্র ও সতীশচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে এই জাতির যে ক্ষতি হইল তাহার পূরণ কিসে হইবে?

শ্রীকালিদাস রায়

—

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বঙ্গজননীর সুসন্তান সৎসাহিত্যসেবী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৫৩ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন কৃতী পুরুষ। তাঁহার ৩০ বৎসরের কর্ম্মজীবনে অকপট সাহিত্য-সেবা-ব্যবসায়ে বসুমতী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বসুমান্ করিয়াছেন—তাঁহার অর্থসিদ্ধি সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছে। "সাহিত্যসেবী দুঃস্থ হয়" এই প্রবাদ-বাক্য তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

অহো! কি নিদারুণ দুঃখ। তাঁহার একমাত্র পুত্র রামচন্দ্রের অকাল-মৃত্যুর সূত্র ধরিয়া দারুণ প্লুরিসি ব্যাধি মৃত্যু-ব্যাধিরূপে পরিণত হইল! নৃপতি দশরথ রাম-শোকে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। রাম ভিন্ন দশরথের অন্য আরও ভুবনবিখ্যাত ভরতাদি তিন পুত্র ছিলেন, রামচন্দ্রও চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে প্রত্যাগমন করিতে পারেন, কৈকেয়ীর প্রতি তদীয় প্রদত্ত বরে এ আশ্বস্তিও ছিল। তথাপি তিনি পুত্রশোক সহ্য করিতে পারেন নাই। পুত্রশোক লোকের এমনই বজ্র-কঠোর!

অহো! সতীশচন্দ্রের পুত্র-শোক এতই তীব্র হইয়াছিল যে, একমাত্র পুত্র রামের অকাল-অন্তর্ধানে তিনি শোক সহ্য করিতে না পারিয়া পরলোকে প্রয়াণ করিলেন।

সতীশ বাবু! আপনি স্বর্গে সুখে বাস করুন। স্বর্গ শোক-মোহের অতীত। সেখানে পুত্রশোকের অসহ্য যাতনার প্রবেশাধিকার নাই! আপনি শান্তিতে তথায় থাকুন। মর্ত্ত্য-মানব আমরা—আপনার অদর্শনে আমাদের ইহাই একমাত্র সান্ত্বনা।

> সুজনঃ খলু দেবমানভাক্
> স্বজনোঽয়ং হি দ্যুসদাং সুসম্মতঃ।
> ভুবি তেন ন চিরং স বর্ত্ততে
> দিবি দেবৈঃ সহ মোদমর্হতি॥

সুজন দেবগণের সম্মানভাজন; নিজের জন মনে করিয়া সজ্জনকে স্বর্গবাসী দেবগণ সম্মানিত করিয়া থাকেন,—তাঁহাদের একটা বিশেষ দৃষ্টি তাঁহাদের প্রতি পতিত থাকে। এ জন্য তথাবিধ উত্তম লোক ভূতলে দীর্ঘায়ু হইয়া আটক থাকেন না; স্বর্গে গিয়া দেবগণের সহিত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীরাম শাস্ত্রী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সতীশচন্দ্রের অকাল-মৃত্যুতে সংবাদপত্রসেবী ও সাহিত্যিক-মহল বিষণ্ণ হইয়াছেন। দীর্ঘকাল অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি অল্পবয়সেই বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম মানিয়া চলিতেন এবং আহার-বিহারে সংযত জীবন যাপন করিতেন। ধনিসমাজসুলভ কোন বিলাসিতাই তাঁহার ছিল না। একমাত্র পুত্রের অকাল-মৃত্যুই তাঁহার সমস্ত বল হরণ করিয়াছিল। রামহারা রাজা দশরথের মতই রামচন্দ্রকে হারাইয়া পুত্র-বৎসল সতীশচন্দ্র দেহত্যাগ করিলেন। পর পর এই দুই শোচনীয় মৃত্যুর আঘাতে 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে'র যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্র বালক বয়স হইতেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তমণ্ডলীর আদর্শে মানুষ হইয়াছেন। ঐ মণ্ডলীর মধ্যে কিশোর বয়স হইতেই আমার সহিত তাঁহার পরিচয়। বেলুড় মঠ-মন্দিরে ঠাকুরের জন্মোৎসব দিবসে সতীশচন্দ্র প্রতি বৎসর ভক্তবৃন্দকে পান-তামাকে আপ্যায়িত করিতেন। তাঁহার সেই সময়ের অমায়িক ব্যবহার ও শিষ্টাচার রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী কোন দিনই ভুলিবেন না। বৃহৎ রামকৃষ্ণ-পরিবারের অতি দীনতমের সহিতও তিনি আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিতেন। যখন চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকা বসুমতী প্রেসে ছাপা হইত, তখন হইতেই আমি তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসি। সেই সময় হইতেই নিরলস ও নিরভিমান "খোকাবাবু"র প্রীতি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। তখন সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে আমার সবেমাত্র প্রবেশলাভ ঘটিয়াছে; আমার রচিত স্বামিজীর জীবনী পাঠ করিয়া তিনি আনন্দিত হইয়া আমাকে কত উৎসাহ দিতেন।

'দৈনিক বসুমতী' যখন হেমেন্দ্রপ্রসাদের সম্পাদনা ও সতীশ বাবুর পরিচালনায় উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে, তখন আমরা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সূচনা করি। 'আনন্দবাজারে'র রাজনৈতিক মত যতটা না হউক, সামাজিক ব্যাপারে বসুমতীর সহিত মতানৈক্য ছিল। সেই মতভেদ কোন দিনই ব্যক্তিগত প্রীতির সম্পর্ককে মলিন করে নাই। আমার সাংবাদিক-জীবনের প্রারম্ভে হেমেন্দ্রপ্রসাদের উপদেশ ও উৎসাহদান ভুলিবার নহে। প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্র হইলেও খোকাবাবু আমার রচনার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন। এরূপ ঔদার্য্য এই স্বার্থময় জগতে কত বিরল! যখন সতীশ বাবু 'মাসিক বসুমতী'র প্র[illegible] করিলেন, তখন তিনি আমাকে মাসিকে লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। বসুমতীর মাসিক ও বার্ষিক সংখ্যায় আমার অনেকগুলি গল্প ও অন্যান্য রচনা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

'বসুমতী-সাহিত্য মন্দিরে'র বহুমুখী কর্ম্মধারার বিস্তার আমাদের জীবনকালেই ঘটিয়াছে। বার বৎসর বয়সে পিতার কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া সতীশচন্দ্র নিজেকে একান্ত ভাবে বসুমতীর সেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে ব্যবসায়-বুদ্ধির সহিত নব নব উদ্ভাবনী-শক্তির আশ্চর্য্য সমাবেশ ঘটিয়াছিল। সুলভে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্র সাহিত্যের অনুবাদ প্রচার তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র যে কালে ছিল না মতবাদ প্রচারের বা সম্পাদকীয় মন্তব্যের রসরচনা ছিল, সেই সময় তিনি প্রকৃত সংবাদপত্ররূপে বসুমতীকে গড়িয়া তোলেন। প্রথম মহাযুদ্ধেই 'বসুমতী' জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সতীশচন্দ্রই প্রথম ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষ সংবাদ লইয়া দ্রুত মুদ্রণ ও বহুল প্রচারের জন্য তিনিই প্রথম রোটারী যন্ত্রে বাঙ্গালা কাগজ ছাপিবার ব্যবস্থা করেন। যে কালে বাঙ্গলা দেশে অর্থাৎ কলিকাতা সহরে বহু সংবাদপত্রের পরিচালন-নৈপুণ্যের অভাবে অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, সেই সময় বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি বসুমতীর ক্রমোন্নতি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। এত বড় বিরাট ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হইলে সব সময় সকলের মনোরঞ্জন করা যায় না। সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর পক্ষে উহা আরও কঠিন। তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগ অনেকের নিকট ভুল ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবলের নিকট—রাজশক্তির নিকট তিনি ব্যক্তিগত ভাবে তো নহেই, তাঁহার সংবাদপত্র এবং সম্পাদককে কখনও নত হইতে দেন নাই—এমনি একটা কিছু দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রে ছিল—যাহা আজ তাঁহার অভাবে আমরা সকলেই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সেবক সতীশচন্দ্রের কীর্ত্তি বাঙ্গলার ইতিহাসের একটা অধ্যায়। বাঙ্গালার শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত বিশেষ ভাবে দরিদ্র-নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর মধ্যে জ্ঞান ও সাহিত্যরস পরিবেশন করিয়া তিনি জাতীয় সংস্কৃতিকে উন্নত করিয়াছেন এবং জাতীয় অভ্যুদয়ের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। তাই তাঁহার অগণিত গুণমুগ্ধের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া ধন্য হইলাম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

সতীশচন্দ্র

'বসুমতী'-সাহিত্য-মন্দিরের স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক শ্রদ্ধাভাজন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে ব্যক্তিগত ভাবে আমি গভীর দুঃখ অনুভব করিতেছি। কৃতী ও গুণবান্ পুত্রবিয়োগের শোক তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্যের পক্ষে অসহনীয় হওয়াতে বোধ হয় এইরূপ অকালে তাঁহার জীবনের অবসান ঘটিল।

স্বদেশী যুগে আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসিয়া সামান্য কর্ম্মিরূপে দেশের কাজে যোগদান করি, তখনই সতীশ বাবুর পিতা স্বর্গীয় উপেন্দ্র বাবু এবং 'বসুমতী'র তদানীন্তন সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষের সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে এবং কালক্রমে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। আমার প্রথম জীবনে তাঁহাদের নিকট হইতে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ-ভাবে বহু প্রকার সাহায্য লাভ করি। আমার জীবনে দেশ ও দশের সেবার কার্য্যে সে-কালের 'বসুমতী'র নিকট আমি যে সাহায্য পাইয়াছি, তাহার জন্য আমি চিরদিন ঋণী থাকিব। স্বর্গীয় উপেন্দ্র বাবুর সহিত আমার যে সম্পর্ক ছিল, সেই দিক্ দিয়া সতীশ বাবু আমার নিকট বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন।

'বসুমতী'-সাহিত্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্র বাবু সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা দেশের স্বল্পবিত্ত সুবৃহৎ পাঠক-সমাজের মধ্যে খ্যাতিমান লেখকের লেখা পুস্তকাকারে সুলভ মূল্যে প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা করেন। তাঁহার জীবনকালেই তদানীন্তন সাহিত্যরথীদের গ্রন্থাবলী সুলভ মূল্যে প্রচারিত হয় এবং সতীশ বাবু তাঁহার কার্য্যকালে তাঁহার পিতৃদেবের পরিকল্পনা ও আদর্শকে বিশদ ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে পরিস্ফুট করিয়া তুলেন। ইহার জন্য বাঙ্গালী পাঠকসমাজ সতীশ বাবুর নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবে। তাই আমার মনে হয়, তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের এক জন সাংবাদিকের অভাব ঘটিল সত্য; কিন্তু 'বসুমতী' এযাবৎ কাল বাঙ্গালা দেশে সুলভে যে সৎ-সাহিত্যের বিপুল প্রচার ও প্রসার করিয়া আসিয়াছে, তাহার অভাব পূর্ণ হওয়া খুবই কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রভৃতির রচনা যে ভাবে বাঙ্গালা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার মূলে ছিল 'বসুমতী'র সুলভে সৎসাহিত্য প্রচারের আদর্শ। আমি আশা করি, সতীশ বাবুর অবর্ত্তমানে যাহাদের উপর 'বসুমতী'-সাহিত্য-মন্দিরের পরিচালনা-ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহারা সেই মহান্ আদর্শ অনুসরণ করিয়া স্বর্গীয় সতীশ বাবুর স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

একই পরিবারে উপর্য্যুপরি এই প্রকার দুইটি জীবনের শোকাবহ ও শোচনীয় অবসান সত্য সত্যই মর্ম্মন্তুদ। আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এবং 'বসুমতী'র কর্ম্মি-বৃন্দকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

সতীশচন্দ্র

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমন প্রত্যেক বঙ্গসাহিত্যসেবী ও বঙ্গসাহিত্যপ্রেমীর নিকট আত্মী-য়ের মৃত্যুর মত লাগিবে! বাঙ্গালা সাহিত্য যে বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে পৌছিতে পারিয়াছে এবং চিরতরে বাঙ্গালীর হৃদয়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তজ্জন্য 'বসুমতী'-সংশ্লিষ্ট সাহিত্য-মন্দিরের পরিচালক হিসাবে সতীশচন্দ্রের কৃতিত্বকে সকলেই স্বীকার করিবেন। এখন বাঙ্গালার পক্ষে বিশেষ করিয়া বড়ই দুঃসময় যাইতেছে। সতীশ বাবুর উপযুক্ত পুত্র রামচন্দ্র—যাঁহার সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতি অনেক কিছু উচ্চ আশা পোষণ করিতেছিল তাঁহার অকাল প্রয়াণের মত পারিবারিক ও জাতীয় শোকের ধাক্কা ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের সকলকেই মোহ ও অবসাদগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। Unfulfilled promise অর্থাৎ অপূর্ণ কৃতিত্বের এক হৃদয়দাহক দৃষ্টান্ত-স্থল হইয়া, রামচন্দ্র আত্মীয়বর্গ ও দেশবাসিগণকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন! তাহার পরে সতীশচন্দ্রের এই অনপেক্ষিত তিরোধান!

উপযুক্ত একমাত্র পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে যে দুর্বিষহ শোক এবং জীবনের ব্যর্থতার মধ্যে তিনি পড়িয়াছিলেন, দেশবাসী অনুকম্পা ও সহানুভূতির সঙ্গে তাহা বুঝিয়া-ছিল; কিন্তু ইহলোকে সে শোকের সান্ত্বনা না পাইয়াই বুঝি সেই সান্ত্বনার সন্ধানে সতীশচন্দ্র মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের, বাঙ্গালীর সাহিত্যিক ও ধার্মিক এবং অন্যবিধ সংস্কৃতির পরিপোষক এক জন দিক্‌পালের পতন হইল; তাঁহার স্থান পূরণ করিবার নহে। যে অনপনেয় ক্ষতি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির ঘটিল, তাহাকে বাঙ্গালী জাতির জীবনে এক প্রধান দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। সতীশচন্দ্রের আত্মা পরলোকে শান্তি প্রাপ্ত হউক, ইহা আমাদের সকলের আন্তরিক প্রার্থনা। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আকুল সহানুভূতি জ্ঞাপন করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করিবার নাই। তাঁহার অনুপ্রাণনায় 'বসুমতী' যে কার্য্যভার লইয়া চলিতেছিল, দেশের ও দশের দিক্ হইতে তাহার সংরক্ষণ হউক, শ্রীভগবানের নিকট বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষের জনগণের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শুদ্ধি

(গল্প)

১

শীতের মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণে পরিণত হইতেছে। কলিকাতার যে অংশে ব্যবসার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত, সেই অংশে নানারূপ যানের বাহুল্য ও তাহাদিগের দ্রুত গতায়াত দেখিলে বাঙ্গালায় দারুণ দুর্ভিক্ষের কথা অনুমান করাও দুঃসাধ্য হয়। কেবল সেই অংশের রাজপথও পুলিসের নির্ম্মম চেষ্টা সত্ত্বেও ছিন্ন জীর্ণবাস দুর্গতশূন্য হয় নাই। তবে কেবল সেই অংশই নহে, পরন্তু সমগ্র কলিকাতা হইতে দুর্গতদিগকে বলপ্রয়োগ করিয়াও বিতাড়িত করিবার—শ্মশান বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা হইতে বাঙ্গালার অন্নবস্ত্রাভাবের প্রমাণ প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিবার জন্য সচিবদিগের উগ্র চেষ্টা কয় দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নূতন বড়লাট ভারতবর্ষে আসিয়াছেন—তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীর নজীর নাকচ করিয়া কলিকাতায় আসিবেন।

যে স্থানে রাজপথ—ব্যবসাকেন্দ্র হইতে আসিয়া গড়ের মাঠের পার্শ্বের পথে মিলিত হইয়াছে, তথায় বহু যান পুলিসের নির্দ্দেশে স্থির হইয়া ছিল—পুলিসের সঙ্কেতে আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

একখানি বড় মোটর গাড়ী সর্ব্বাগ্রে যাইতেছিল। গাড়ীখানি যেমন চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে—তাহার পঞ্জাবী চালকের বেশ তেমনই সুন্দর। গাড়ীর আরোহী তিন জন—দুইটি তরুণী, এক যুবক। যুবক বাঙ্গালী—তাহার পরিধানে য়ুরোপীয়ের বেশ; তরুণীরা দুই জনই ফিরিঙ্গী—গণ্ডে গোলাপী রং—ওষ্ঠাধরে রক্ত বর্ণের প্রলেপ, তাহারা যেন সরস কথায় ও সরস ব্যবহারে যুবককে তুষ্ট করিবার জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অকারণ হাসিতে চঞ্চল হইয়া যেন ঢলিয়া পড়া, চোখের খেলা—এ সকলেই তাহাদিগের বিলাস-চাতুরী প্রকট হইতেছিল।

সহসা যুবকের দৃষ্টি রাজপথের পরপারে একখানি আচ্ছাদনহীন বড় মোটর যানে ও তথায় লোক-সমাবেশে আকৃষ্ট হইল। পুলিস ও সরকারের দুর্গত-বিতাড়ন-কার্য্যে নিযুক্ত কতকগুলি লোক এক দল দুর্গতকে তাড়াইয়া আনিয়াছিল—তাহাদিগকে যানে তুলিয়া কলিকাতা হইতে বাহিরে পাঠাইয়া দিবে। কন্যা মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রোদন করিতেছিল, মা আর্ত্তনাদ করিতেছিল—সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া লোকগুলি তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কায করিতেছিল। যাহারা ভিখারী—দুর্গত—দুঃস্থ তাহাদিগকে কয় জন দয়া করে? বিশেষ এ ক্ষেত্রে দয়ায় ও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে বিরোধ ছিল। লোকগুলি বলপ্রয়োগ করিতেও দ্বিধানুভব করিতেছিল না। এক অস্থিচর্ম্মসার—মলিনজীর্ণবাস স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক যানে তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল—বৃদ্ধা আর্ত্তনাদ করিতেছিল।

যুবক দেখিল, দেখিয়া যেন আর সব ভুলিয়া গেল, আফিসের দুই জন টাইপিষ্ট তরুণীকে সে যে হোটেলে আহারের জন্য লইয়া যাইতেছিল তাহা আর তাহার মনে রহিল না। সে যেন পাগলের মত চালককে বলিল—"রোখো! রোখো!" কিন্তু তখন যানের শ্রেণী চলিয়াছে—সহসা যানের গতি স্তব্ধ করিলে পশ্চাতের যান তাহাতে আঘাত করিবে। সে জ্ঞান যুবকের ছিল না। সে চালককে আঘাত করিয়া আবার বলিল, "রোখো! রোখো!" চালক বিস্মিত হইল—হোটেলে যাইবার পূর্ব্বেই কি তাহার প্রভু মদিরা পান করিয়া আসিয়াছে? সে যানের শ্রেণী ছাড়াইয়া এক পার্শ্বে যাইয়া যান গতিহীন করিতে না করিতে যুবক যানের দ্বার খুলিয়া লাফাইয়া পড়িল এবং ছুটিয়া যাইয়া যাহারা স্ত্রীলোকটিকে বলপূর্ব্বক যানে তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদিগের নিকটে যাইয়া উগ্র স্বরে তাহাদিগকে প্রৌঢ়াকে ছাড়িয়া দিতে বলিল। তাহারা বিস্মিত ও বিরক্ত হইল; কারণ, তাহারা সরকারের চাকর—ক্ষমতা-গর্ব্বে প্রমত্ত। তাহারা বিরত হইল না দেখিয়া যুবক তাহাদিগের এক জনকে প্রহার করিল। তখন যে ব্যক্তি লোকগুলিকে আদেশ দিতেছিল সে বলিল, "তুমি কে? জান—তুমি সরকারের লোকের কাযে বাধা দিতেছ?" সঙ্গে সঙ্গে কয় জন কনষ্টেবল ও অন্য কয় জন যুবককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা যুবককে মারিতে মারিতে থানায় লইয়া চলিল। অবশিষ্ট লোক বলপূর্ব্বক রোরুদ্যমানা প্রৌঢ়াকে যানে তুলিল। যান চলিয়া গেল। যুবক পথে বহুক্ষণ প্রৌঢ়ার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল।

২

যুবককে গ্রেপ্তার করা সরকারের দুর্গতাপসারণকারীদিগের পক্ষে "সাপের ছুঁচো গিলার" মতই হইল। তাহার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার যানচালক যানে তাহার আফিসের ফিরিঙ্গী টাইপিষ্ট দুই জনকে লইয়া তাহার আফিসে ফিরিয়া গেল এবং তথায় তাহার ইংরেজ কর্ম্মচারী এঞ্জিনিয়ার সব শুনিয়া তাহার ইংরেজ এটর্নীর প্রতিষ্ঠানে গেল। ফলে মিষ্টার দেবেশ দাসকে যখন থানার "ছোট বাবু" দাঁড় করাইয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিতেছিলেন তখনই পুলিস কমিশনারের আফিস হইতে টেলিফোনে কোন নির্দ্দেশ পাইয়া তাঁহার উগ্র ভাব—বর্ষার বারিপাতে শুষ্ক মৃত্তিকার মত—কোমল হইয়া গেল এবং তিনি "আসামীকে" যেরূপ শ্রদ্ধা দেখাইয়া চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিলেন, তাহাতে অভিযোক্তারা প্রমাদ গণিল। অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিয়াও কিন্তু তিনি "আসামীকে" গারদে পাঠাইলেন না এবং অভিযোগকারী সরকারী কর্ম্মচারীটিকেও যাইবার অনুমতি দিলেন না। তিনি এক টুকরা কাগজে কি লিখিয়া থানার দারোগাকে গৃহের দ্বিতলে তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশে পাঠাইয়া দিলেন এবং তখন তাঁহার বিশ্রামের সময় হইলেও দারোগা ব্যস্ত হইয়া আফিসঘরে আসিয়া বসিলেন।

অল্পক্ষণ পরে দেবেশের ইংরেজ এটর্নী পুলিসের এক জন সহকারী কমিশনারকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন এবং থানার কনষ্টেবল হইতে দারোগা সকলেই কমিশনারকে সেলাম করিয়া সন্ত্রস্ত ভাব দেখাইলেন। সহকারী কমিশনার দেবেশের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পাঠ করিলেন এবং দেবেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিষ্টার দাস, আপনি কি দুর্গতদিগকে অপসারণের কাযে নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীদিগের কাযে বাধা দিয়াছেন?"

দেবেশ বলিল, "যদি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের—আমাদিগের মাতা ও ভগিনীদিগের উপর অযথা বলপ্রয়োগের অত্যাচারে বাধা দিলে তাহা অপরাধ হয়, তবে আমি সে অপরাধ করিয়াছি।" তাহার কথায় ও স্বরে দৃঢ়তা ও অন্যায়ের সম্বন্ধে অভিযোগ।

কমিশনার অভিযোগকারীকে জেরা করিয়া ঘটনার বিষয়

জানিলেন। তিনি দেবেশকে বলিলেন, "মিষ্টার দাস, আপনার মত সম্ভ্রান্ত ও সুপরিচিত লোকের কথা আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না। এই ঘটনার বিষয় আমি দপ্তরে রিপোর্ট করিব। হয়ত একটা কোন ভুল হইয়াছে। আপনাকে মুক্ত করিতেছি।"

দেবেশ বলিল, "আমি মুক্তি চাহি না—প্রতীকার পাই কি না, দেখিতে চাহি; তবে সে প্রতীকার আমার জন্য নহে, আমার দেশের যে সকল স্ত্রীলোকও নির্ম্মম লাঞ্ছনা ভোগের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাদিগের জন্য।"

কমিশনার এটর্নীর সহিত পরামর্শ করিলেন; তাহার পরে দেবেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আপনার সম্বন্ধে কি করিতে বলেন?"

দেবেশ বলিল, "আমি যদি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অধিকারী মিষ্টার দেবেশ দাস না হইতাম, তবে যে দুর্গতদিগকে আপনারা শৃগাল-কুকুরের মত ব্যবহার করিয়া তাড়াইতেছেন, তাহাদিগেরই এক জন হইতাম, তবে আপনারা আমার কাযে আমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতেন, তাহাই করুন। আমি যে স্থানে আমার কথা বলা প্রয়োজন, তথায় বলিব—অন্যত্র নহে।"

কমিশনার আবার এটর্নীর সহিত পরামর্শ করিলেন। তিনি পার্শ্বের কক্ষে যাইয়া কক্ষ হইতে আর সকলকে বাহির করিয়া দিয়া দেবেশকে ও তাহার এটর্নীকে তথায় আনিয়া দেবেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অভিযোগকারী আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। ঘটনায় যবনিকাপাত হইতে দিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে?"

দেবেশ বলিল, "আমার বক্তব্য আমি আদালতে বলিব।"

এটর্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন এমন করিতেছেন?"

রোষ-কঠোর কণ্ঠে দেবেশ বলিল, "যে দুর্গত লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তিনি—দামোদরের বন্যায় সর্ব্বস্বান্ত দেবেশ দাসের নিরুদ্দিষ্টা জননী।"

কমিশনার ক্ষণমাত্র স্তম্ভিত রহিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"সর্ব্বনাশ!" তাঁহার মুখভাবে বুঝা গেল, তিনি চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়াছেন। তিনি অল্পক্ষণ কি ভাবিলেন; তাহার পরে একক থানার আফিসঘরে যাইয়া এজাহারের খাতায় কি লিখিলেন এবং যে ঘরে দেবেশ ও তাঁহার এটর্নী ছিলেন, তথায় আসিয়া দেবেশকে বলিলেন, "ভাল। আপনি কাল বেলা ১১টায় পুলিস আদালতে হাজির হইবেন।"

এটর্নীর সঙ্গে দেবেশ চলিয়া গেল—তাহার দৃষ্টিতে ক্রোধ, মনে বিক্ষোভ।

তাঁহাদিগের যান চলিয়া যাইবার পরে কমিশনার দুর্গত লাঞ্ছন চাকরীয়াকে বলিলেন, "আঙ্গুল ফুলে ত কলাগাছ হয়েছ। ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নাই যে ঐ রকম লোককে মারতে মারতে ধরে এনেছ!"

সে ব্যক্তি বলিল, "উনিই ত আগে মেরেছেন।"

ধমক দিয়া কমিশনার বলিলেন, "ওহে—কোথাও কিল মারিতে হয়, কোথাও কিল খেয়ে কিল চুরী করতে হয়। লোকটা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে—ওর ম্যানেজার ইংরেজ; আর দেখলেই ত এটর্নীও তাই—তোমার মত কালা আদমী নয়।"

কমিশনার থানা হইতে বাহির হইয়া সরাসরি সরকারের দপ্তর-খানায় গমন করিলেন। যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তাহা অবিলম্বে উপর-ওয়ালাদিগকে জানান তিনি প্রয়োজন মনে করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ঘটনাটিতে রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে চাঞ্চল্য-সঞ্চার হইবে এবং সংবাদ পাইলে অবস্থাহেতু অসন্তুষ্ট জনমত যে ভাবে সংবাদপত্রে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা প্রীতিপ্রদ হইবে না।

৩

থানা হইতে এক বার তাহার আফিসে যাইয়াই দেবেশ আপনার গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহার মনের মধ্যে যাহা হইতেছিল, তাহা বোধ হয় অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বে আগ্নেয়গিরির অন্তরে তাপে দ্রবীভূত ধাতব দ্রব্যাদির চাঞ্চল্য। সেই চাঞ্চল্যেরই মত তাহার হৃদয়ে চাঞ্চল্য কেবল উগ্র ও রুষ্ট বন্যায় ধ্বংস করিতেই ব্যস্ত ছিল।

ক্রমে সেই ভাব কিছু শান্ত হইল। সে শান্তির কারণ বেদনা। সে তাহার নিরুদ্দিষ্টা মাতাকে পাইয়াও হারাইল! আর কি সে তাঁহাকে পাইবে? মা'র কি দশা! তিনি কি কষ্টই পাইয়াছেন। মা'র সেই দুর্দ্দশার সহিত তাঁহার বিলাসসজ্জাবহুল গৃহের আর ব্যসনদুষ্ট জীবনের কি অসামঞ্জস্য!

এক বৎসরের কিছু অধিক কালের ঘটনাসমূহ তাহার নিকট চলচ্চিত্রের দ্রুতগামী ঘটনার মত প্রতিভাত হইতে লাগিল। সে দরিদ্রের পুত্র—একমাত্র সন্তান—পিতামাতার স্নেহের সম্বল। তাহার জন্মের পূর্ব্বে তাহার পিতামাতার একাধিক সন্তান শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাহার পিতামহী দেবগ্রামে ঠাকুরের কাছে "মানত" করিয়াছিলেন, পুত্রবধূর পরবর্ত্তী সন্তান জীবিত থাকিলে তাহার পঞ্চম বর্ষে তাহাকে লইয়া আসিয়া তথায় পূজা দিবেন—আপনি সমগ্র পথ "দণ্ডী কাটিয়া" অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া যে স্থান পাইবেন তথা হইতে আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া—এইভাবে যাইবেন। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। আর দেবতার অনুগ্রহে সে বাঁচিয়াছিল বলিয়া তাহার নামকরণ তিনিই করিয়াছিলেন—দেবদাস। সে-ই তাহা পরে দেবেশে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। তাহার বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়—পিতামহী পুত্রের পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে একটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—সে তাহাতেই পড়িয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। উচ্চ শিক্ষা লাভের কল্পনা তাহার ছিল না; কারণ, পৈত্রিক জমীজমা—চাষ আবাদ এ সকল অতিক্রম করিয়া তাহার মাতার বা তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা দূরগামী হইত না। গ্রামেই—স্বশ্রেণীর প্রতিবেশীর কন্যার সহিত তাহার পিতামহী তাহার বিবাহ দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা তাঁহার পুত্রের, পুত্রবধূর ও পৌত্রের কল্পনাতীত ছিল। কাযেই চাঁপা যে তাঁহার পুত্রবধূ হইবে ইহা শাশুড়ীর ও স্বামীর মৃত্যুর পরেও, দেবেশের মাতা স্থির জানিতেন—দুই পরিবারে কুটুম্বিতা বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই স্থায়ী হইয়াছিল। ক্ষুদ্র গ্রাম—সঙ্কীর্ণ সমাজ—কয়টিমাত্র পথ; চাঁপার সহিত দেবেশের যখন-তখন দেখা হইত। যখন উভয়ে বাল্য অতিক্রম করিয়া কৈশোরে উপনীত হইয়াছিল, তখন সাক্ষাতে এ উহাকে এড়াইতে চাহিত—"পাছে লোকে কিছু বলে"—কিন্তু দর্শনে উভয়েরই মুখে লজ্জার ভাব ফুটিয়া উঠিত—উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইলে নত হইবার পূর্ব্বেই দেবেশ যেমন—জোয়ারের জলে আপূর্য্যমান নদীর মত চাঁপার

সৌন্দর্য্য না দেখিয়া দৃষ্টি নত করিতে পারিত না, চাঁপা তেমনই বশিষ্ঠদেহ দেবেশের হাস্য-প্রফুল্ল মুখের স্মৃতি মনে লইয়া যাইত।

দেবেশ যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, কখন গ্রামে তাহার সম্ভ্রম আরও বর্দ্ধিত হইল। দেবেশের মাতা পুত্রের বিবাহ দিয়া ঘরে বধূ আনিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন; এ বার স্থির করিলেন, "ঘোড়া বছর" অতীত হইলেই তাহার বিবাহ দিবেন। সেই কয়টা মাসই তাঁহার দীর্ঘকাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দেবেশের ও চাঁপারও কি তাহাই মনে হইতেছিল না? তাহারা পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল, তাহা সার্থক করিবার আগ্রহে আপনাদিগের সংসার রচনার স্বপ্ন দেখিতেছিল। সে সংসার কল্পনার বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, সুখের কিরণে সমুজ্জ্বল। তাহাতে দুঃখের স্থান নাই।

তখন যুদ্ধে ব্রহ্ম জয় করিয়া জাপান বাঙ্গালার ও আসামের সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে—তথায় সে স্তম্ভিত অবস্থায় অবস্থান করিবে কি না, তাহাই সমর-বিশেষজ্ঞগণ আলোচনা করিতেছেন। এ দিকে মার্কিণী সেনা ও সমর-সরঞ্জাম বাঙ্গালা ও আসাম রক্ষার আয়োজন করিতেছে—কেবল রক্ষাই নহে, বাঙ্গালায় ঘাঁটী করিয়া ব্রহ্ম ইংরেজের জন্য জয়ের আয়োজনও হইতেছে। দেবেশের বাসগ্রাম হইতে মাত্র কয় মাইল দূরে একটি বিমান-ক্ষেত্র নির্ম্মিত হইতেছিল। গ্রামের অন্য কয় জন যুবকের সহিত দেবেশ এক দিন তাহা দেখিতে গিয়াছিল। বিমানক্ষেত্রের বিদেশী এঞ্জিনিয়ার বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ। তিনি শ্রমিকদিগকে একটা কাযের বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন—শ্রমিকগণ বুঝিতে পারিতেছিল না। দেবেশ যতটুকু ইংরেজী জানিত, তাহাতে এঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য বুঝিয়া তাহা শ্রমিকদিগকে বুঝাইয়া দিল। এঞ্জিনিয়ার তাহাকে চাকরী করিতে বলিলেন—বেতন দৈনিক ৫ টাকা। দৈনিক ৫ টাকা বেতন লাভ দেবেশের স্বপ্নাতীত ছিল; সে চাকরী লইল। প্রতিদিন ৫ টাকা! তাহার মাতারও চাকরীতে আপত্তি হইল না। দেবেশ প্রতিদিন প্রাতঃকালে চাকরীস্থলে যাইত, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ৫ টাকা লইয়া ফিরিত। এইরূপে ২ মাস কাটিল—কায চলিতে লাগিল। কিন্তু আসামে বড় কাযের ব্যবস্থা করিবার জন্য এঞ্জিনিয়ারের তথায় যাইবার আদেশ আসিল। তিনি দেবেশকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। দেবেশ যখন ইতস্ততঃ করিতেছিল, তখন তিনি তাহাকে যে বেতন দিতে চাহিলেন, তাহাতে তাহার দ্বিধা দূর হইয়া গেল—মাসিক ৫ শত টাকা। তাহার মাতার দ্বিধা ঐ প্রস্তাবে দুর্ব্বল হইলেও একেবারে দূর হইল না। দেবেশ তাঁহাকে বুঝাইল, তিনি তাহার বিবাহের যে দিন স্থির করিয়াছেন, তাহার অন্ততঃ পক্ষকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ ৩ মাস মাত্র কায করিয়া দেড় হাজার টাকা লইয়া সে ফিরিয়া আসিবে। মা ছেলের কথায় বিশ্বাস করিলেন। দেবেশ চলিয়া গেল—কেহ বলিল, "পাতর-চাপা ত নহে—পাতা-চাপা কপাল"; কেহ বলিল, "খোদা যখন দেন, তখন ছপ্পর ফুঁড়েও দেন।"

আসামে দেবেশের সত্যই কল্পনাতীত অর্থলাভ হইতে লাগিল। বেতনই সামান্য হইয়া দাঁড়াইল—"উপরি" অধিক। সে এঞ্জিনিয়ারের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন—ঠিকাদারের দল তাহার মধ্যস্থতায় এঞ্জিনিয়ারের নিকটে যাইত—মধ্যস্থতার জন্য তাহাকে প্রভূত অর্থ দিত। প্রথম প্রথম সে টাকা লইতে সে সঙ্কোচানুভব করিত; কিন্তু লোভ বিবেকবুদ্ধিকে বুঝাইল—সে ত টাকা চাহিয়া লয় না—ঠিকাদাররাই দেয়। এঞ্জিনিয়ার অনেক টাকা পাইতেন এবং তাহা তাহার বেনামীতে ব্যাঙ্কে যাইত—ব্যাঙ্কের টাকা ব্যাঙ্কের মূল আফিসে কলিকাতায় যাইত এবং দেবেশের নামেই জমা হইত।

দেবেশ মাতাকে বলিয়া আসিয়াছিল, ৩ মাস পরেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তাহাকে ৩ মাসও অপেক্ষা করিতে হইল না—তৃতীয় মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই জাপানী বিমান হইতে বর্ষিত বোমায় এঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু হইল। দেবেশ গৃহাভিমুখগামী হইল।

গৃহ! গৃহ কোথায়? দামোদরের বন্যার যে সংবাদ সে সংবাদপত্রে পাইয়াছিল, তাহাতে সেই বন্যার ধ্বংস-লীলা অনুমান করা যায় না। সে কলিকাতা হইতে গ্রামে যাইবার জন্য যাত্রা করিল—জানিল, রেল লাইন ভাসিয়া গিয়াছে—ট্রেণ সে পথে যায় না। বহু চেষ্টায় ট্রেণে, নৌকায় ও পদব্রজে যে স্থানে গ্রাম ছিল সে তথায় গেল। গ্রামের চিহ্নমাত্র নাই—যে স্থানে গ্রাম ছিল, তথায় জল-বিস্তার। গ্রামবাসীদিগের কোন সংবাদ কেহ দিতে পারিল না—কে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, কেহ জানে না।

দেবেশ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। তাহার জীবন ঐ জলরাশিরই মত উদ্দেশ্যহীন—আকর্ষণ-হীন। কয় দিন সে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু মানুষ শূন্যহৃদয়ে উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করিতে পারে না। অর্থের জন্য সে বিদেশে গিয়াছিল—সে অর্থ পাইয়াছে, অর্থ—আরও অর্থ উপার্জ্জন করিবে। সে বড় ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিল। তাহার কোন পরিচিত লোকও নাই—আত্মীয়-স্বজন ত পরের কথা। হৃদয়ের শূন্যতা কাযের বাহুল্যেও দূর হইত না। তাই সে সুরায় ও ব্যসনে সব ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এই ভাবে কয় মাস কাটিল—ব্যবসায় অসাধারণ উন্নতি হইল—সঙ্গে সঙ্গে বিলাস ও ব্যসনও বাড়িতে লাগিল।

সেই সময় এক দিন পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ঘটিল।

৪

অনিদ্রায়, চাঞ্চল্যে, বেদনায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া দেবেশ প্রভাতে আদালতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার সঙ্কল্প ছিল, আদালতে সে অনাচারের বিবরণ বিবৃত করিবে। তাহার বক্তব্য সে লিখিয়া লইয়াছিল।

সেই দিন প্রাতে সংবাদপত্রে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইল—গড়ের মাঠে দুর্গত-সংগ্রহে অনাচারের একটি অভিযোগ সরকার পাইয়াছেন। সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত চাকরীয়া তাহার প্রদত্ত ক্ষমতা অতিক্রম করিয়াছিল—সেজন্য তাহার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইল। সে তাহার ক্ষমতা অতিক্রম করায় সরকার দুঃখিত।

আদালতে উপনীত হইয়া তাহার ইংরেজ এটর্ণী তাহাকে জানাইলেন—তাহার বিরুদ্ধে কোন মামলা নাই। এটর্ণীর ভাব দেখিয়া দেবেশের মনে হইল, তিনি পূর্ব্বেই বিষয়টি অবগত ছিলেন—বিষয়টি যাহাতে আলোচিত না হয়, যাঁহারা দুর্গত দূরীকরণের জন্য দায়ী তাঁহারা সেই জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না।

তাহার পরে দেবেশ তাহার এটর্ণীকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কি তাহার মাতাকে পাইবে না? তিনি তাহার সঙ্গে যথাস্থানে

গমন করিলেন—তিনি প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কলিকাতার বাহিরে যে দুর্গতাশ্রয়ে দেবেশের মাতাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তথায় যাইয়া তাঁহাকে আনিবার অনুমতি-পত্র আনিয়া দেবেশকে দিলেন। দেবেশ আর কোন কথা না বলিয়া মোটর-চালককে সেই স্থানে দ্রুত যাইতে নির্দ্দেশ দিয়া মোটরে উঠিল।

মোটর যান দেবেশকে লইয়া কলিকাতার পরে হাওড়া অতিক্রম করিয়া গেল—প্রায় ১০ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামে পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া চালক তাহার নির্দ্দেশানুসারে গ্রামের মধ্য দিয়া গাড়ী লইয়া চলিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই গাড়ী দুর্গতাশ্রয়ে উপনীত হইল। আশ্রয়! কয়খানি দীর্ঘ চালা—বেড়াও শেষ হয় নাই—মাঠের শীতল বাতাসের প্রবেশ অবারিত। দেখিলেই বুঝা যায়, ব্যবস্থা শেষ না করিয়াই দুর্গতদিগকে আনিয়া কলিকাতায় দুর্গত নাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সেই সকল চালার মধ্যে সুস্থ কিন্তু দুর্ব্বল, ব্যাধিগ্রস্ত, কঙ্কালসার—নানা অবস্থার নারী শিশু ও কতকগুলি পুরুষকে রাখা হইয়াছে। তাহাদিগকে একখানি করিয়া কাপড় ও একখানি করিয়া সূতী কম্বল এবং একখানি করিয়া পাতিবার জন্য চট দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহাদিগের স্নানের ব্যবস্থাও হয় নাই; ডাক্তারখানা আছে—তাহাতে ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ আবশ্যক ঔষধই নাই; স্থানটিতে প্রবেশ করিলেই দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। দুর্গতদিগের আহারের কি ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা দেখিবার আগ্রহ দেবেশের হইল না। সে জানিল, পূর্ব্ব-রাত্রিতে বেড়াবিহীন চালায় আসিয়া একটি শৃগাল এক জন দুর্গতকে দংশন করিয়া গিয়াছে—সে, বোধ হয়, আমিষ-সন্ধানে আসিয়াছিল।

সেই আশ্রয়ে মাতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইল। কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না—উভয়েরই চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল।

দেবেশ মা'কে লইয়া গাড়ীতে তুলিল। পূর্ব্বদিনের কর্ম্মচারী-দিগের তাঁহাকে বলপ্রয়োগে স্থানান্তরিত করার কথা মা'র মনে পড়িল। দেবেশের যান গৃহাভিমুখে চলিল।

যান দেবেশের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল—পুত্রের অনুসরণ করিয়া মাতা গৃহে প্রবেশ করিলেন—গৃহ ও গৃহসজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি তোমার বাড়ী?"

দেবেশ বলিল, "হাঁ, মা"। পূর্ব্বদিন মা'র যে অবস্থা সে দেখিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া সে যেন ঐ কথা বলিতে কুণ্ঠানুভব করিতেছিল।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "চাঁপার অদৃষ্টে নাই—সে সম্ভোগ করতে পারল না। কোথায় যে ভেসে গেল!"

ঘরের কুলুঙ্গীতে যদি মড়ার মাথা থাকে—তবে উৎসবানন্দের মধ্যে কুলুঙ্গীর আবরণ খসিয়া পড়িলে আনন্দকারীরা তাহা দেখিয়া যেমন চমকিয়া উঠে—আমাদিগের মনের কোণে যে বিষয় গোপন থাকে তাহা প্রকাশ পাইলে আমরা তেমনই শিহরিয়া উঠি। মাতার কথায় পুত্রের তাহাই হইল। চাঁপা—তাহার বাল্যের পরিচিত—তাহার যৌবনের স্বপ্ন; তাহাকে কেন্দ্র করিয়া দেবেশের কল্পনা ভবিষ্যৎ জীবন রচনা করিবে, স্থির করিয়াছিল। তাহার মনে ছিল, চাঁপা তাহার গৃহিণী, সচিব, শিষ্যা—সব হইবে। সে আজ কোথায়? আর সে যে জীবনে অভ্যস্ত ছিল তাহা নিশ্চিহ্ন দেখিয়া সে এই কয় মাস কি করিয়াছে! সে বিলাসে বেষ্টিত হইয়া ব্যসনে তাহার হৃদয়ের শূন্যতা পূর্ণ করিবার প্রয়াস করিয়াছে—গ্রামের গৃহের মত তাহার সরল জীবনের পবিত্র আদর্শও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। গৃহ আবার হইয়াছে; কিন্তু সেই পবিত্র আদর্শ যে কলঙ্ককালিমাকলুষিত হইয়াছে—তাহা ত ধৌত হইবার নহে!

সে অনুতাপ অনুভব করিল।

পূর্ব্বরাত্রিতে সে এক কারণে ঘুমাইতে পারে নাই, সে দিন রাত্রিতে সে অন্য কারণে ঘুমাইতে পারিল না।

৫

পরদিন দেবেশ আফিসে গেল না—ম্যানেজার আসিয়া কয়টি বিষয়ে তাহার নির্দ্দেশ লইয়া যাইলেন। তাহার পরদিন মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কর?"

দেবেশ বলিল, "ব্যবসা।"

"দোকানে যাও না?"—তাঁহার ব্যবসার কল্পনা দোকান অতিক্রম করিতে পারে নাই।

দেবেশ বলিল, "ভাল লাগছে না। মা, ভাবছি ব্যবসা বন্ধ করব।"

"কেন, বাবা? আমার শ্বশুর বলতেন, পুরুষ মানুষ ব'সে না থেকে বেগার খাটে, সে-ও ভাল। তাঁ'র ছেলে সেই উপদেশে জীবন কাটিয়ে গেছেন! ব্যবসা বন্ধ করবে কেন?"

দেবেশ মাতার কথা শিরোধার্য্য করিল বটে, কিন্তু তাহার কর্ম্মচারীরা যেমন, তাহার পরিচিত ব্যক্তিরাও তেমনই দেখিল, সে আর পূর্ব্বের দেবেশ নাই—তাহার পরিবর্ত্তন সকলকেই বিস্মিত করিল। সে ব্যসন বর্জ্জন করিল—গাম্ভীর্য্য তাহার চটুলতার স্থান অধিকার করিল। সে যথাসময়ে আফিসে যাইত এবং কায শেষ হইলেই মাতার কাছে গৃহে ফিরিয়া আসিত।

দেবেশের মাতা পুত্রের গৃহের বিলাসের ও বাহুল্যের পরিবেষ্টনে আপনার অবস্থিতির অসঙ্গতি অনুভব করিতেছিলেন। সেই গৃহের বিরাটত্ব ও বাহুল্য যেন তাঁহাকে অভিভূত—পীড়িত করিতেছিল। তিনি এক দিন পুত্রকে বলিলেন, "দেবেশ, আমাকে কাশীতে কি বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দাও।"

দেবেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, মা?"

"বাবা, এই ক'মাস যা' দেখেছি, যা' সহ্য করেছি সে যেন একটা দুঃস্বপ্ন—কা'র অন্ন খেয়েছি, কোথায় কোথায় ভিক্ষা করেছি—মনে করলে শিউরে উঠতে হয়। আমি তীর্থস্থানে গিয়ে থাকব—যদি তা'তে পাপ দূর হয়।"

"মা, তুমি ত কোন পাপ কর নাই—বাধ্য হয়ে তুমি হয়ত ভিখারীর মত খেয়েছ, থেকেছ; কিন্তু পাপ যদি কেউ ক'রে থাকে, তবে আমিই করেছি। তোমাদের আর পাব না মনে ক'রে সব দুঃখ হ'তে অব্যাহতি পা'বার জন্য যে জীবন যাপন করেছি, তা'র পাপ ত প্রক্ষালিত হ'বার নহে। চল আমিও তোমার সঙ্গে যা'ব—তোমার সেবা করে যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।"

মা ভাবিতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "দেবেশ, তুমি যে ব্যথা ভুলবার জন্যই তা' করেছ। যদি পাপ ক'রে থাক, তবে কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই?"

দেবেশ বলিল, "তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ক'রে অপরাধমুক্ত হই।"

তাহার পরে সে বলিল, "ক' দিন তোমার কথায় কাযে বা'র হচ্চি বটে, কিন্তু মদের নেশার মতই আমার পয়সার নেশা ছুটে গেছে। এ কায আর ভাল লাগে না।"

"পয়সার সদ্ব্যবহার কর। সেকালে লোক পয়সা উপার্জ্জন ক'রে লোকের ইহকালের সুবিধার জন্ত পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করতেন, পরকালের গতির জন্য দেবালয় করতেন। এ বার যে অবস্থা তা'তে লোককে পাপ হ'তে—মৃত্যু হ'তে রক্ষা করবার কত প্রয়োজন —তা'র জন্ম কত অর্থ চাহি!"

"আমি যদি তা' করি, তুমি আমার কাছে থাকবে; আমাকে কাযে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করবে—আবার তুমি ছেলেকে ছেড়ে যা'বে না?"

বলিতে বলিতে দেবেশের নেত্রে অশ্রু উথলিয়া উঠিল—কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মা বলিলেন, "বাবা, তুমিই যে আমার সব। তুমি যদি মা'কে ছাড়তে না চাহ, আমার সাধ্য কি তোমাকে ছেড়ে যা'ব? এই অবস্থা কেটে গেলে তোমাকে সংসারী ক'রে, তবে আমি ছুটী লব।"

দেবেশ বলিল, "মা, সে কথা আর ব'ল না। তোমরা ত আমাকে সংসারী করবার আয়োজনই ক'রে রেখেছিলে—সে আয়োজন যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখন আর তা'র প্রয়োজন নাই। সংসারী হবার সাধ আমার আর নাই—তোমার চাঁপার মতই তা' অদৃষ্টের বন্যায় ভেসে গেছে।"

মা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

৬

সত্যই দেবেশের পয়সার নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল; কারণ, সে যে সেই নেশার অনুশীলন করিয়া তাহার বশ হইয়াছিল, সে অন্য কাযের অভাবে। মা'র কথায় সে যেন নূতন কাযের সন্ধান পাইল—সে দুর্গতদিগের জন্য সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিবে। দুর্গতদিগের অবস্থা সে তাহার মাতাকে দেখিয়া বুঝিয়াছিল। তাহার মাতাই উপদেশ দিলেন, যে স্থানে তাহাদিগের গ্রাম ছিল, তাহারই নিকটে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হউক; কারণ, কলিকাতায় সে কায করিবার অনেক লোক আছে—গ্রামের দিকে হয়ত কেহই নাই।

দেবেশ মাতার পরামর্শই শিরোধার্য্য করিল।

অর্থের অভাব ছিল না; কাযেই দ্রুত সব ব্যবস্থা হইয়া গেল। যত দিন যাইতে লাগিল, তত ব্যবস্থা বাড়াইতে হইতে লাগিল; কারণ, সাহায্য করিবার লোক অল্প—সাহায্য লইবার লোক অনেক—অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কেন না, দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালার শতকরা ১০ জনকে ভিখারী করিয়াছিল।

মা বলিলেন, "দেবেশ, বাবা, আমি সেবাকেন্দ্রেই থাকি।"

দেবেশ বলিল, "মা, তুমি থাকলে আমাকেও থাকতে হ'বে।"

শেষে স্থির হইল, দেবেশ সপ্তাহে ৩ দিন মা'কে লইয়া কেন্দ্রে যাইবে; আর তথায় আবশ্যক সংখ্যক কর্ম্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবক কায করিবে। স্বেচ্ছাসেবকরা যে কায করিত, তাহা অসাধারণ—দুর্গতগণ যেমন অন্ন পাইয়া দৌর্ব্বল্য-মুক্ত হইতে লাগিল, বস্ত্র পাইয়া পরিচ্ছন্ন হইল, তেমনই স্বেচ্ছাসেবকদিগের ব্যবহারে প্রীতিলাভ করিতে লাগিল।

পক্ষকাল যাইতে না যাইতে চিকিৎসাগারের কায বাড়িল—আরও চিকিৎসক, পথ্য ও ঔষধ আনিতে হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের অভাব অনুভূত হইল। দেবেশ সে অভাব রাখিল না। শুশ্রূষাকারিণী আনিয়া দুর্গতদিগের মধ্য হইতেই শুশ্রূষাকারিণী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিল। দেবেশের মাতা যে দিন আসিতেন, সে দিন হাসপাতালেই অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন—দেবেশ অন্যান্য কায দেখিত।

উভয়ে যে দিনই আসিতেন, সেই দিনই দেখিতেন—হাসপাতালে নূতন রোগী নীত হইয়াছে। যে সকল রোগীর সুস্থ হইবার সম্ভাবনা অল্প তাহাদিগকে এক স্বতন্ত্র ঘরে রাখা হইত। এক দিন দেবেশের মাতা আসিয়া দেখিলেন, একটি নূতন রোগীর অবস্থা শোচনীয়। সে এত শীর্ণ যে তাহার মস্তকে দীর্ঘ জটায় পরিণতপ্রায় কেশ না থাকিলে তাহাকে সহসা স্ত্রীলোক বলিয়া বুঝা যায় না। দেহের আর সকল অংশ শীর্ণ—যেন শুষ্ক; কেবল পদদ্বয় স্ফীত হইয়াছে—এত স্ফীত যে স্থানে স্থানে চর্ম্ম ফাটিয়া গিয়াছে। ডাক্তার বলিলেন, দেহ ঐরূপ—তাহাতে আবার ফুসফুসে তরল পদার্থ সঞ্চিত হইয়াছে—বাঁচিবার আশা নাই। শুনিয়া দেবেশের মাতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সে দিন একাধিক বার দেবেশের মাতা ঐ রোগীকে দেখিতে গমন করিলেন—সেই সংজ্ঞাশূন্যাব মুখে কোন স্মৃতি—কোন সাদৃশ্য যেন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল; অথচ সে স্মৃতি কোন্ স্থানের তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, সে সাদৃশ্য কিসের তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না। এইরূপ অবস্থায় মনে যে অশ্বস্তির উদ্ভব হয়, তাহাই লইয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন; কিন্তু সেই অশ্বস্তি-ভাব যেন কেবলই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি কিছুতেই তাহা হইতে অব্যাহতি পাইলেন না।

পরদিন দেবেশ সাহায্যদান কেন্দ্রে যাইতে পারিল না—মা তথায় লোক পাঠাইয়া রোগীর সংবাদ লইলেন—তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই, কেবল অবস্থার যে আরও অবনতি হয় নাই তাহাই "মন্দের ভাল।" তাহার পরদিন হাসপাতালে যাইয়া দেবেশের মাতা জানিলেন, সে দিন প্রাতে রোগী একবার চক্ষু উন্মত করিয়া চাহিয়াছিল—দৃষ্টিতে যেন জ্ঞানের আভাস ছিল; কিন্তু তাহার পরেই আবার তাহার সংজ্ঞালোপ হইয়াছে; কেবল ফুসফুসে তরল পদার্থ কমিতেছে এবং জ্বরও কম। আশঙ্কার সঙ্গে একটু আশা লইয়া দেবেশের মাতা কলিকাতায় ফিরিলেন। কিন্তু তাহার মুখে তিনি যে সাদৃশ্য দেখিয়া তাহার সন্ধান পাইতেছিলেন না, সেই সাদৃশ্য কেবলই তাঁহাকে চঞ্চল করিতে লাগিল। তাহার পরে যে দিন তাঁহাদিগের কেন্দ্রে যাইবার কথা, সে দিন কোন অতর্কিত কাযে দেবেশ যাইতে পারিল না—মা চঞ্চল হইয়া রহিলেন। পরদিন মা যাইয়া হাসপাতাল-ঘরে প্রবেশ করিলে রোগী একবার তাঁহার দিকে চাহিল; তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু পতিত হইল। তিনি যাইয়া রোগীর কাছে শুশ্রূষাকারিণীর আসনে বসিলেন; সস্নেহে তাহার কপালে করতল রাখিয়া স্নেহ-স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কষ্ট হচ্ছে, মা?"

রোগী একটু নীরব থাকিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, "মা, আমি চাঁপা।"

এ বার দেবেশের মাতার চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিয়া রোগীর কপালে পতিত হইল। চাঁপা চক্ষু মুদ্রিত করিল; সে কি সেই অশ্রুতে স্নিগ্ধ-সান্ত্বনা পাইল?

যাইবার সময় হইলে দেবেশ যখন মাতাকে ডাকিল, তখন মা বাহিরে আসিয়া তাহাকে বলিলেন, তিনি সে দিন যাইবেন না।

দেবেশ বলিল, "সে কি! শোবার খা'বার কোন ব্যবস্থা নাই।"

"তা' হ'ক,বাবা, হিন্দুর বিধবার উপবাসকে ভয় নাই। আর দেখ, ক' মাস যে অবস্থায় কাটা'তে হয়েছে—তা'তে—এ ত রাজবাড়ীতে বাস।"

"কেন তুমি এমন করছ, মা?

মা ছেলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যে রোগীর কথা ক' দিন বলেছি, আজ বুঝেছি, সে—চাঁপা।"

দেবেশের মুখ বিবর্ণ—যেন রক্তশূন্য হইয়া গেল। অল্পক্ষণ ভাবিয়া সে বলিল, "কাল সকালে আমিই এসে তোমাকে নিয়ে যা'ব।" সে ভাবিবার অবসর সন্ধান করিতেছিল।

দেবেশ চলিয়া যাইলে তাহার মাতা আসিয়া চাঁপার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন ; ঔষধ পথ্য প্রদানের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তাহার ফলে ডাক্তার, শুশ্রূষাকারিণীরা, ভৃত্যগণ—সকলেই কর্ত্তব্যে অধিক মনোযোগী হইল।

৭

দেবেশ ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেল এবং কেবলই ভাবিতে লাগিল, জীবন-নাটকে এ কি নূতন অঙ্কে যবনিকা উঠিল ? সমস্ত রাত্রি চিন্তায় কাটাইয়া সে পরদিন প্রত্যূষেই যাইয়া মাতাকে লইয়া আসিল ও অপরাহ্নে আবার লইয়া গেল।

এইরূপে ১০ দিন কাটিল। যে মরুভূমিতে প্রায়ই বারিবর্ষণ হয় না, তাহার তপ্ত বালুতে জল পড়িলে তাহা যেমন দ্রুত শোষিত হয়, তেমনই চাঁপার ঔষধে সাধারণতঃ অনভ্যস্ত—অনাহারক্লিষ্ট দেহে ঔষধ ও পথ্য দ্রুত শোষিত হইতেছিল। ১০ দিন পরেই ডাক্তাররা মত দিলেন, তাহাকে রোগীর যানে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া চলিতে পারে। দেবেশের মাতা যখন চাঁপাকে বলিলেন, পরদিন তাহাকে গৃহে লইয়া যাইবেন, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল —"মা, বাড়ী গ্রাম কি আছে ?"

দেবেশের মাতা বলিলেন, "বোধ হয় নাই।"

"তবে কোথায় নিয়ে যা'বেন মা ?"

"দেবেশের বাড়ীতে—কলিকাতায়।"

এত দিন সে দেবেশের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই —লজ্জা তাহার জিজ্ঞাসাপথ রুদ্ধ করিয়াছিল। আজ দেবেশের জীবিত থাকার কথা শুনিয়া সে শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করিল—নিরুদ্বিগ্ন হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর আর সকলের সন্ধান কি পাওয়া গেছে ?"

দেবেশের মাতা তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "আমি এসেছি ; তোমার সন্ধান পাওয়া গেল—আমারও তোমারই মত দুর্দ্দশা গিয়েছে—দেবেশেরও দুর্ভোগ কম যায় নাই। সে সব পরে শুনবে। যে দেবনাথ ঠাকুরের দয়ায় দেবেশকে পেয়েছিলাম, তাঁ'রই দয়ায় আবার তা'কে পেয়েছি—তোমাকেও পেলাম। তাঁ'র দয়ায় সবই সম্ভব হয়—মা, তাঁ'কে ডাক ; মঙ্গল হ'বে।"

তাহা শুনিয়া চাঁপা চক্ষু মুদিত করিয়া দেবতার চরণে প্রার্থনা জানাইল।

৮

চাঁপা দেবেশের মাতার সহিত দেবেশের গৃহে আসিল—একান্ত বিস্ময়ে সেই গৃহের সজ্জা প্রভৃতি দেখিতে লাগিল। দেবেশের মাতা—আপনার অভিজ্ঞতায়—তাহার মনোভাব অনুভব করিতে পারিয়া বলিলেন, "দেবেশ ফিরে এসে দেখেছিল, আমারও কোন সন্ধান নাই—তোমারও নাই ; তখন, মানুষ বিনা উদ্দেশ্যে বাঁচতে পারে না তাই, সে ব্যবসা আরম্ভ করে ; তা'তে তা'র কি হয়েছে, তা' এই দেখতে পাচ্ছ। তা'র অর্থেই সাহায্যকেন্দ্র চলেছে ও চলছে।"

সপ্তাহকাল মধ্যে চাঁপা সুস্থ হইয়া উঠিল, তাহার পরে তাহার অনাহারে ও রোগে শীর্ণ দেহ—জোয়ারের জলে নদীর মত আবার যৌবনের লাবণ্যে দ্রুত পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। কেবল তাহার মুখে ও দৃষ্টিতে আর যৌবনের চাপল্য ফিরিল না।

দেবেশের মাতা পূর্ব্বব্যবস্থানুসারে চাঁপার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে ব্যস্ত হইলেন ; তিনি দেবেশকে বলিলেন, "বাবা, তুমি বলেছিলে, তোমার সংসারী হ'বার সাধ, চাঁপার মতই, অদৃষ্টের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু যে অদৃষ্ট তা'কে নিয়ে গিয়েছিল, সে-ই আবার তা'কে তোমার কাছে দিয়ে গেছে—ফুল যে জলে ভেসে গিয়েছিল, সেই জলেই ফিরে এসেছে। এই বার তোমাদের বিয়ে দিয়ে আমি ছুটী ল'ব।"

দেবেশ বলিল, "মা, একটু ভেবে দেখি।"

মা বলিলেন, "আমি তোমার মা ; আমিই ভেবে এ কথা বলছি।"

মা জানিতেন, চাঁপা পার্শ্বের কক্ষে ছিল। সে যাহাতে শুনিতে পায়, এমন ভাবেই তিনি ছেলেকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

চাঁপা তাঁহার কথা শুনিয়াছিল। কিন্তু শুনিয়া তাহার মনের মধ্যে যে ভাব উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল, তাহা বুঝি দামোদরের বন্যার জলোচ্ছ্বাসেরই মত।

সেই দিন সন্ধ্যায় দেবেশের মাতা যখন মালা জপ করিতে যাইলেন, তখন দেবেশ চাঁপাকে তাহার বসিবার ঘরে ডাকিয়া আনিল। সে চাঁপাকে বলিল, "চাঁপা, মা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে ব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু বাঙ্গালায় ফিরে এসে আমার আর কেহ নাই দেখে আমি সব ভুলবার জন্য যে জীবন যাপন করেছি, তা' আমি তোমাকে জানান আমার কর্ত্তব্য ব'লে মনে করি। আমি—"

বাধা দিয়া চাঁপা বলিল, "মা'র দুর্ভোগের কথা আমি শুনেছি—তিনি তোমার কথাও আমাকে বলেছেন ; আমার কথাও তিনি শুনেছেন।" একটু চেষ্টা করিয়া লজ্জা জয় করিয়া সে বলিল, "যখন মৃত্যু এসে সম্মুখে দাঁড়াল, তখন এক বার জন্মস্থান দেখবার আকর্ষণ আমাকে এমন আকৃষ্ট করল যে, সে আকর্ষণ এড়াতে পারলাম না—কিন্তু পথেই পড়ে রইলাম। সেই অবস্থায় আমাকে যেখানে নিয়ে গেল—সেখানে তোমার যে কীর্ত্তি দেখেছি, তা'তে তোমার স্ত্রী হ'বার সম্বন্ধে অযোগ্যতা আমি ভাল ক'রেই বুঝেছি। কিন্তু তুমি আমাকে বিবাহ কর আর না-ই কর—তা'তে আমার আর কিছু আসে যায় না। কারণ, জ্ঞান হওয়া অবধি আমি জানি, তুমিই আমার স্বামী! সেই বিশ্বাস নিয়েই এই ক'মাস সব দুঃখ, সব কষ্ট সহ্য করেছি—তা'তেই সব বিপদ, সব প্রলোভন অতিক্রম করতে পেরেছি। আমি জানি, আমি তোমার—"

বলিতে বলিতে চাঁপার কণ্ঠ অশ্রুবাষ্পে যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া পড়িল।

দেবেশের প্রশংসমান দৃষ্টি তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

* * *

পরদিন মা যখন দেবেশকে আবার বিবাহের কথা বলিলেন, তখন সে বলিল, "তুমি যা' বলবে, আমি করব ; কিন্তু এক সর্ত্তে।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সর্ত্ত, বাবা ?"

"তুমি ছুটী পা'বে না।"

"তোমরা ছুটী না দিলে আমি কেমন ক'রে পা'ব ?"

তাহার পরে তিনি দেবেশকে বলিলেন; "কাল সকালে আমি আর চাঁপা গঙ্গাস্নান ক'রে আসব—প্রায়শ্চিত্ত ক'রে শুদ্ধ হ'ব।"

দেবেশ বলিল, "আমিও তা'ই করব।"

"তোমায় কিছু করতে হ'বে না।"

"তা' হ'বে। মা, মন যখন শুদ্ধ হ'তে চায়, তখন তা'র দরকার থাকে।"

সে দিন অপরাহ্নে যখন দেবেশের মাতা সাহায্যদান কেন্দ্রে গমন করিলেন, তখন সঙ্গে কেবল দেবেশই গেল না—চাঁপাও গেল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সুর-শিল্পী পতঙ্গম

ধূলি-ধূসর ধরণীর বুকে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তরে-কান্তারে মাঠে-ঘাটে আমরা বিরামবিহীন বিচিত্র সুর-ঝঙ্কার শুনিতে পাই—যেন লক্ষ লক্ষ দক্ষ বাদক বা সুরশিল্পী অলক্ষ্যে বসিয়া তন্ত্রীযন্ত্রযোগে সুর সাধনা করিতেছে। এই বিরামবিহীন ঝঙ্কারকে আমরা ঝিল্লী-রব বা ঝিঁঝিঁর ডাক বলিয়া জানি; কিন্তু পল্লী পার্শ্ববর্তী বৃক্ষবল্লীবাসী সেই ঝিল্লিকুলের বিশেষ কোন তত্ত্ব আমরা জানি না। "ঝিল্লি-মন্দ্র-মুখরিত তন্দ্রামগ্ন নিশি"—কবি বা ভাবুকদের অন্তরে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বিচিত্র ভাবধারা সঞ্চারিত করিতেছে।

ঝিল্লী একপ্রকার নয়, কয়েক প্রকার পতঙ্গম। এখানে ঝিল্লী বলিতে আমরা সকল সুর-শিল্পী পতঙ্গমকেই বুঝিব। সাধারণতঃ আমরা ইংরেজী ক্রিকেট শব্দের অনুবাদে ঝিল্লী শব্দ ব্যবহার করি; কিন্তু নিসর্গের নৈশ আসরে যারা সুর-সাধনা করে, তাদের সকলেই ক্রিকেট জাতীয় পতঙ্গম নয়। ঝিল্লীর ঝঙ্কার মনোযোগ সহকারে শুনিলে বুঝিতে পারিব, ঐ ঝঙ্কার একই প্রকার সুরের সমষ্টি নয়; উহার মধ্যে বিভিন্ন সুর বিদ্যমান রহিয়াছে। বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন সুরে গাহিতেছে বা বাজাইতেছে, ইহা আমরা স্পষ্টই অনুভব করি। উদারা, মুদারা ও তারা—এই তিনপ্রকার সুরের বা স্বর-স্তরের কথা সকলেই জানেন। মন দিয়া ঝিল্লী-রব শুনিলে এই ত্রিবিধ স্তরের সুরই আমাদের শ্রুতিগোচর হইবে। সুর-শিল্পী পতঙ্গমদের কেহ উদারায় সুর সাধনা করে, কেহ মুদারায় বা মধ্যবর্তী সুরে বাদ্যযন্ত্র বাজায়, কেহ সর্ব্বোচ্চ তারায় বা তারস্বরে সুরচর্চ্চা করে।

সঙ্গীতশিল্পী পতঙ্গদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। এই তিনটির ইংরেজী নাম সিকেডা, গ্রাস-হপার ও ক্রিকেট। গ্রাস-হপার বা গঙ্গা-ফড়িংদের দুটি বড় সম্প্রদায় আমরা দেখিতে পাই। আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিভেদের জন্য ইহাদিগকে বিভিন্ন পতঙ্গম বলিয়া অভিহিত করিলে অন্যায় হইবে না। ইহাদিগকে বিভিন্ন জাতি বলিয়া ধরিলে সুর-শিল্পী পতঙ্গমদিগকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হয়। সঙ্গীতকারী গঙ্গা-ফড়িংগুলি খর্ব্বশৃঙ্গ ও দীর্ঘশৃঙ্গ—এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

'সিকেড্যা' জাতীয় ঝিল্লীর সহিত ভারতবাসীর বিশেষ পরিচয় আছে। আমাদের দেশের সুরশিল্পী পতঙ্গমদের মধ্যে সিকেড্যা বিরাট ও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহাদের একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট হয়। অন্যান্য সুর-শিল্পী পতঙ্গমের দ্বারা প্রাবৃটের প্রকৃতির ধারাধৌত প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে বিরাট সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে গ্রীষ্মের দুঃসহ গুমটের মধ্যে সিকেড্যা যে গীতচর্চ্চা করে, তাহাকে সেই কীর্ত্তনের সুন্দর গৌরচন্দ্রিকা বলিয়া অভিহিত করা চলে। সুতরাং নিস্তব্ধ নিদাঘ-নিশীথে নিসর্গের আসরে যাহারা সুর-সাধনা করে, তাহাদের অধিকাংশই সিকেড্যা শ্রেণীর পতঙ্গম, সন্দেহ নাই। সিকেড্যাদের সহিত প্রাচীন গ্রীকজাতিরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। গ্রীকগণ এই সঙ্গীত-বিশারদ পতঙ্গমদিগকে 'টেট্টিক্স' আখ্যায় অভিহিত করিত। তাহারা এই শ্রেণীর ঝিল্লীরব শুনিতে এত ভালবাসিত যে, ইহাদিগকে পাখী-পোষার প্রণালীতে পিঞ্জরে পুরিয়া রাখিত। শুধু পুরুষ পতঙ্গম পোষা হইত; কারণ, সঙ্গীতকারী অন্যান্য পতঙ্গমদের স্ত্রীজাতির মত স্ত্রী-সিকেড্যারা সম্পূর্ণ বাক্‌শক্তি-বিহীন। এই জন্যই এক জন গ্রীক কবি বলিয়াছিলেন—"সিকেড্যারা সুখী, কারণ বাক্‌শক্তি-হীন জীবন-সঙ্গিনী লইয়া তাহাদিগকে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়।" মুখরা পত্নী লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করার বিড়ম্বনা স্মরণ করিয়াই কবি এ-কথা বলিয়াছেন সন্দেহ নাই। সিকেড্যাদের মধ্যেও কয়েকটি সম্প্রদায় আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সুর-সাধনার প্রণালী না হোক, সুর স্বতন্ত্র। সিকেড্যাদের দেহের সঙ্গীতকারক যন্ত্রগুলি অত্যন্ত জটিল। ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সমগ্র প্রাণিজগতে এরূপ জটিল সঙ্গীতকারক যন্ত্র আর আছে কি-না, সে বিষয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন।

সিকেড্যাদের দেহের নিম্নাংশে এক জোড়া লম্বমান অংশ দৃষ্ট হয়। এই লম্বমান প্রত্যঙ্গগুলির প্রত্যেকটি একপ্রকার ডিম্বাকার
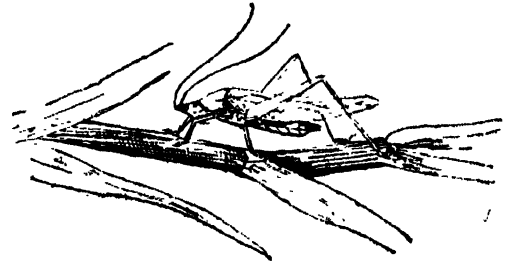
সূক্ষ্মাগ্রশীর্ষ ক্যাটিডিড বা দীর্ঘশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িং

ঝিল্লীকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। এই ঝিল্লী ইহাদিগের দেহে সুদৃঢ় ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে এবং দেখিতে অনেকটা ড্রাম বা ঢাকের মাথার মত। সিকেড্যাদের কোন কোন সম্প্রদায়ের শরীরে এই ঝিল্লী রহিয়াছে বটে, কিন্তু আচ্ছাদক লম্বমান প্রত্যঙ্গটি নাই। যে প্রক্রিয়ায় বাদক ঢাক বা ঢোল বাজায়, সিকেড্যারা সেইরূপ ভাবে এই ঢক্কাকার ঝিল্লীটিকে বাজাইয়া সুর সৃষ্টি করে না; ইহাদের দেহের অভ্যন্তর-ভাগে অবস্থিত এবং এই ঝিল্লীর সহিত সংযুক্ত পরাক্রান্ত প্রকাণ্ড দুটি পেশীর দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয়। ঐ দুটি পেশী কর্ত্তৃক সঞ্চারিত সুতীব্র স্পন্দনের ফলে বাদ্যযন্ত্রাকার ঝিল্লীটি স্বতঃই বাজিয়া ওঠে। ঢক্কার নীচে একটি বড় গহ্বর আছে। এই গহ্বর বাতাসের জন্য। ইহা ছাড়া বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রীর ন্যায় আরও কয়েকটি ঝিল্লী আছে। ঢক্কাকার প্রধান ঝিল্লীটি স্পন্দনের ফলে বাজিয়া উঠিলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ঝিল্লীগুলিও স্পন্দিত ও ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে। এই পতঙ্গমের সমগ্র উদর-প্রদেশটি প্রায় শূন্যগর্ভ বলিয়া বাদ্যযন্ত্রস্বরূপ ঝিল্লীগুলি হইতে স্পন্দনের ফলে অজ্ঞাত সুর বা শব্দ-নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়। কমাইবার বা বাড়াইবার পক্ষেও ইহা সহায়ক হয়। মোটের উপর ইহাদের আচ্ছাদক লম্বমান প্রত্যঙ্গ পাকস্থলীটি নলের মত আকার-বিশিষ্ট—বাদ্যযন্ত্রসমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই কার্য্যে পাকস্থলী সাহায্য করে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। স্ত্রী-পতঙ্গমদের বাদ্যযন্ত্রবৎ এই সকল প্রত্যঙ্গ একেবারেই নাই, তাহা নয়; আছে। তবে উহা সেরূপ পরিণত বা কর্ম্মক্ষম অবস্থায় বিদ্যমান নাই এবং যে পরাক্রান্ত পেশী এই সকল যন্ত্রের বুকে স্পন্দন জাগাইয়া

সঙ্গীত-তরঙ্গ সমুত্থিত করিবে, এই জাতীয় স্ত্রী-পতঙ্গমদিগের অঙ্গে তাহা দেখা যায় না। পতঙ্গম-সঙ্গীতসজ্ঘের গৌরচন্দ্রিকা-গায়ক সিকেড্যা—আনন্দময় সুললিত সুর-লহরীর রহস্য-জাল আজও পর্য্যবেক্ষণপরায়ণ পণ্ডিত সম্যকরূপে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। এই সঙ্গীত-ঝঙ্কার সমুত্থিত করিবার উদ্দেশ্য কি—পণ্ডিতরা এখনও তাহার সন্ধান পান নাই। হইতে পারে, স্ত্রী-পতঙ্গমদিগকে আকৃষ্ট করাই এই সুর-তরঙ্গ তুলিবার উদ্দেশ্য। যেমন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদের আকর্ষণ করিবার জন্য বাঁশরীতে অপূর্ব্ব সুর জাগাইয়া তুলিতেন, তেমনই এই পতঙ্গমদের সঙ্গীতের উদ্দেশ্য অঙ্গনাদের চিত্তাকর্ষণ। অবশ্য বিধাতাপুরুষ অন্তরালে বসিয়া এই ঘটকালী ঘটাইতেছেন। এই আকর্ষণ-প্রয়াস, এই আহ্বান, সম্মিলিত হইবার এই উদগ্র আকাঙ্ক্ষা—শুধু সিকেড্যাদের মধ্যে নয়, জীব-জগতের সর্ব্বত্রই চলিতেছে। তবে সিকেড্যারা যেমন সুন্দর সঙ্গীতের সুরে প্রণয়-ভাগিনীকে আহ্বান করে, সকলে সেরূপ করে না। বিভিন্ন প্রাণী
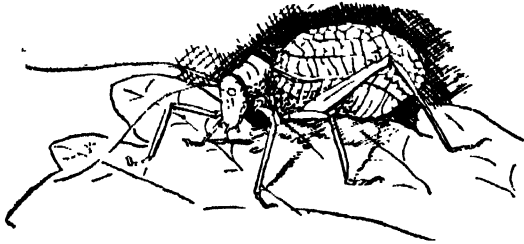
উত্তর আমেরিকাবাসী ক্যাটিডিড
(সুরশিল্পী পতঙ্গমদিগের মধ্যে ইহারা সঙ্গীত-সাধনায় সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ বলিয়া বিখ্যাত)

বিভিন্ন উপায়ে স্ত্রী-জাতিকে আকৃষ্ট করে। হইতে পারে, এই সুর-লহরী পতঙ্গমের অন্তরস্থ আনন্দ-নির্ঝরের প্রকাশ বা চিত্ত-বিনোদনের চেষ্টা। খুব খুশী হইলে আমরা যেমন গান গাই, তেমনই উহারাও গায় কি না কে বলিতে পারে!

দীর্ঘ শৃঙ্গ এবং খর্ব্ব শৃঙ্গ,—গঙ্গা-ফড়িংদের এই দুই শ্রেণীর উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। সবুজ তৃণরাজিতে ও সলিলসিক্ত শস্যক্ষেত্রসমূহে ইহারা সুরসাধনা করে। দীর্ঘ-শৃঙ্গ গঙ্গা-ফড়িংদের আর এক নাম ক্যাটিডিড। এই দুই প্রকার গঙ্গা-ফড়িং এবং ক্রিকেট বা খাশ ঝিঁঝিঁ পোকা, এই তিনটি 'অর্থপটেরা' নামক পতঙ্গমশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। খর্ব্বশৃঙ্গ গঙ্গা-ফড়িংদের পারিবারিক বা বংশগত নাম 'এক্রিদাইদি'। দীর্ঘশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িংদের বংশগত আখ্যা 'লোকাষ্টাইদি'। 'লোকাষ্টাইদি' নাম অনেকের মনে ভ্রম জাগাইতে পারে যে শস্যাদির অশেষ অনিষ্টকারক 'লোকাষ্ট' বা পঙ্গপাল নামক পতঙ্গমগণ এই জাতীয়। কিন্তু তাহা নয়। পঙ্গপালদের খর্ব্বশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িং বা এক্রিদাইদি জাতীয় পতঙ্গমদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। সকল খর্ব্বশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িং সুরশিল্প-সাধনায় সক্ষম নয়। এই শ্রেণীর পতঙ্গমদের সাধারণতঃ গম্ভীর প্রকৃতির প্রাণী বলিয়া মনে হয়। অবশ্য সকল খর্ব্বশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িংয়ের প্রকৃতি এক নয়। এই জাতের কোন কোন সম্প্রদায়ের পতঙ্গম আমাদের মত দিনে জাগিয়া থাকে এবং রাত্রে ঘুমায়—তাহারা এইরূপ নিসর্গের নৈশ আসরে যোগ দিয়া সুর-ঝঙ্কার কিরূপে করিবে? সকলের পক্ষে নিস্তব্ধ রাত্রিই সুর-সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময়। পঙ্গপাল সম্প্রদায়ের খর্ব্বশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িং সুর-সাধনা করে কি না এমন প্রশ্ন আমাদের মনে জাগিতে পারে। এক প্রকার শব্দ ইহারা করে বটে, কিন্তু সে শব্দকে সুর বলা চলে না। তবে স্বজাতির নিকট সেই শব্দ সুমধুর সুর বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া অসম্ভব নয়। বোম্বাই অঞ্চলে এক প্রকার পঙ্গপাল মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। পতঙ্গমদের মধ্যে পঙ্গপালরা যেরূপ যাযাবর প্রকৃতির, আর কোন সম্প্রদায় তেমন নয়। ইহারা এক দেশ হইতে অন্য দেশে, সেখান হইতে দেশান্তরে উড়িয়া যায় এবং শস্যাদির উপর বসিয়া শস্য খাইয়া মানুষের অশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। পঙ্গপাল-সম্প্রদায়ের পতঙ্গমদের দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গের সৈন্য-সজ্ঘের সহিত তুলনা করিলে অন্যায় হইবে না। বোম্বাই অঞ্চলে যে সব পঙ্গপাল সময়-সময় দেখা দেয়, তাহাদের দ্বারা এক প্রকার সুর-সাধনা অবস্থাবিশেষে শুনা যায়।

পঙ্গপালদের সৃষ্ট সুর তেমন উচ্চ নয়। সারঙ্গীর সুরের সহিত এই পতঙ্গমদের সঙ্গীতের তুলনা চলে। খর্ব্বশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িংরা সাধারণতঃ অনুচ্চ সুর তোলে। প্রশ্ন হইতে পারে, এই সারঙ্গীর ন্যায় সঙ্গীত-যন্ত্রটির কাজ পঙ্গপাল প্রভৃতি খর্ব্বশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িংরা কোন্ প্রত্যঙ্গের দ্বারা সাধন করে, পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিব, ইহাদের সম্মুখের পাখা-গুলিই সারঙ্গীর কাজ করে। বেহালা, সারঙ্গ প্রভৃতি তন্ত্রী বা তারের যন্ত্র বাজাইতে হইলে ছড়ের দরকার। এই জাতীয় পতঙ্গমের পশ্চাতের পাগুলি ছড়ের কাজ করে। ইহাদের পিছনকার পায়ের উরুদেশে দন্তবৎ একপ্রকার অংশ আছে। সম্মুখের পাখার প্রান্ত ও পায়ের এই দন্তাকার অংশ পরস্পর ঘর্ষিত হইলে এক প্রকার শব্দ বা সুরের সৃষ্টি হয়। মন দিয়া শুনিলে শব্দটিকে 'তসিক—তসিক—তসিক্' এইরূপ বোধ হয়। অন্যের নিকট যাহাই হোক, এই জাতীয় স্ত্রী-পতঙ্গমদিগের নিকট পুরুষ-পতঙ্গমদের এই শব্দ সুললিত সঙ্গীত বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া অসম্ভব নয়।

বৃক্ষবাসী ঝিঁঝিঁপোকা বা ট্রি-ক্রিকেট। পক্ষদ্বয়ের নিম্নে অবস্থিত (এ-চিহ্নিত) গর্ত্তাকার অংশ দেখা যাইতেছে। ঝিঁঝিঁ পোকাদের বাদ্যযন্ত্র বাজাইবার ছড়টি পক্ষের তলদেশে থাকে।

'মেন্ত্রথেটিস' নামক আর এক জাতের গঙ্গাফড়িং আছে। ভারতে এই শ্রেণীর একটিমাত্র সম্প্রদায় দেখা যায়। ইহাদের বাদ্যযন্ত্র বাজাইবার ছড়ের অনুরূপ প্রত্যঙ্গটি পায়ের সহিত সংলগ্ন না থাকিয়া সম্মুখের পাখার সঙ্গে সংলগ্ন। পায়ের যে দন্তশ্রেণীবৎ অংশের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐরূপ অংশ ইহাদের পুরোভাগের প্রত্যেক পাখায় দেখা যায়। ইহাদের সারঙ্গসদৃশ যন্ত্রটি পাখায় না থাকিয়া পায়ে থাকে। সুতরাং মেন্ত্রথেটিসদের সঙ্গীত-জনক যন্ত্রটি পঙ্গপালাদির

তুলনায় বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত। কতকগুলি গঙ্গাফড়িং উত্তেজিত হইলে এক প্রকার শব্দ সহকারে ভূতল হইতে উত্থিত হয়। এই শব্দ শুধু পক্ষ হইতেই উদ্ভূত হয়। আমেরিকার 'ক্র্যাকার লোকাষ্ট' পঙ্গপাল এই শ্রেণীর পতঙ্গম। ইহাদের কোন কোন সম্প্রদায়ের এই শব্দজনক শক্তি এত বিস্ময়কর যে, সময়ে সময়ে সিকি মাইল দূর হইতে ইহাদের পক্ষ-সঞ্চালন-সম্ভূত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

অর্থপটেরা-জাতীয় সুরশিল্পী পতঙ্গমদের ভিতর 'ক্যাটিডিড'ই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। দীর্ঘশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িং ক্যাটিডিড। সুদীর্ঘ শুণ্ডাকার প্রত্যঙ্গটি দেখিলে অন্যান্য গঙ্গাফড়িং হইতে ইহাদের পার্থক্য বুঝা যাইবে। আমরা যেমন সম্মুখের এই সূত্রবৎ শৃঙ্গাকার বা শুণ্ডাকার অংশটি ত্বকের সাহায্যে অনুভব করি, তেমনই পতঙ্গমদের অনুভবেন্দ্রিয়। ক্যাটিডিডদের সুতীব্র অনুভূতির আধার সুকোমল সূত্র-সদৃশ এই সুদীর্ঘ শৃঙ্গাকার প্রত্যঙ্গটি ইহাদের ললাটদেশ হইতে বাহির হইয়াছে। অন্যান্য গঙ্গাফড়িংয়ের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য পায়ের সন্ধি-সমূহের সংখ্যাধিক্য হইতেও বুঝা যায়। খর্ব্বশৃঙ্গ
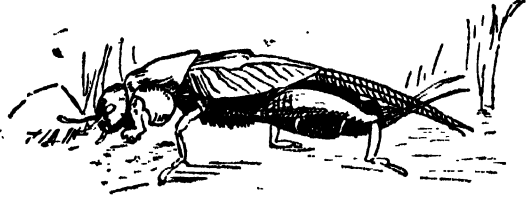
মোল-ক্রিকেট বা ছুঁচো-ঝিঁঝিঁ (ইহারা মাটিতে গর্ত্ত করিয়া বাস করে) ইহারা মাথার গুঁতা মারিয়া মাটির ঢেলা চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে

গঙ্গাফড়িংদের পায়ে তিনটি মাত্র সন্ধি বিদ্যমান; কিন্তু ক্যাটিডিড বা দীর্ঘশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িংদের চারটি সন্ধি দৃষ্ট হয়। খর্ব্বশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িংরা বিষয়-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির মত বিলাসিতা বা বাবুয়ানার ধার ধারে না। চলিবার সময় তাহারা সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক ব্যক্তির মত পায়ের সকল অংশ ভূমিতে স্থাপন করে। কিন্তু ক্যাটিডিড ভাবপ্রবণ বিলাসী বাবুর মত আলগা ভাবে ভূতলে পা ফেলে। পায়ের তলদেশের তিনটি সন্ধিকে তাহারা বিচরণের সময় ব্যবহার করে; প্রান্তের সন্ধিটি উঁচু করিয়া রাখে। এই তিনটি সন্ধির সহিত এক প্রকার অংশ সংযুক্ত আছে। এই অংশের জন্য বৃক্ষের পত্রাদির উপর চলিতে ইহাদের অসুবিধা হয় না।

নিস্তব্ধ রাত্রিই সুরশিল্পীদের শিল্প-সাধনার সময়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পতঙ্গম সঙ্গীত-শিল্পী ক্যাটিডিডরা রাত্রে সঙ্গীতচর্চ্চা করিয়া থাকে। রঙ্গালয়ের অভিনেতা বা গায়কদের মত ইহারা দিনে ঘুমায় এবং রাত্রে নিসর্গের রঙ্গালয়ে সঙ্গীতশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে মাতিয়া ওঠে। ইহাদের ব্যবহার মার্জ্জিতরুচি সম্ভ্রান্ত-বংশীয় সভ্য-ভব্য লোকের মত। অন্য দিকে খর্ব্বশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িংদের সমাজের নিম্নস্তরের নর-নারীর সহিত তুলনা করা চলে। ইহারা সঙ্গীতশিল্প-সাধক হিসাবেও নিম্নস্তরের লক্ষ্য। ক্যাটিডিডদের মধ্যে পতঙ্গম-সুলভ সুর-শিল্প-সাধনার চরমোৎকর্ষ আমরা দর্শন করি। তবে ইহাও সত্য যে, দীর্ঘশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িংরা সকলেই সুদক্ষ সুর-শিল্পী নয়। ইহাদের কয়েকটি সম্প্রদায় নিম্ন-শ্রেণীর শিল্পী। কয়েকটি সুদক্ষ সুরশিল্পী সম্প্রদায়ের দ্বারা সমগ্র জাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে বলিলে ভুল হইবে না। ক্যাটিডিডদের শরীরস্থ সঙ্গীতযন্ত্রগুলি অন্যান্য গঙ্গাফড়িংএর সুরপ্রসূ প্রত্যঙ্গ হইতে ভিন্ন প্রকারের। ক্যাটিডিডদের দেহের বাদ্যযন্ত্রে আমরা এক প্রকার ড্রাম বা ঢক্কা এবং এক প্রকার ছড় দেখিতে পাই। অবশ্য যাহা ছড়ের সাহায্যে বাজাইতে হয়, তাহাকে তন্ত্রীযন্ত্র বলিলেই ঠিক হয়; কিন্তু পতঙ্গমদের সঙ্গীতপ্রসূ প্রত্যঙ্গের বেলায় ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। ইহাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্রটিকে তন্ত্রী না বলিয়া ড্রাম বলিয়া অভিহিত করিলেই ঠিক হয়। এই ঢক্কার গায়ে ছড়াকৃতি প্রত্যঙ্গটি আঘাত করিলে এক প্রকার ঝঙ্কার নির্গত হয়। এইরূপ আঘাত এক প্রকার স্পন্দন সৃষ্টি করে এবং সেই স্পন্দন হইতে সঙ্গীত সম্ভূত হয়। ক্যাটিডিড জাতীয় স্ত্রীপতঙ্গমরা শুধু সমঝদার শ্রোতার কাজ করে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন—স্ত্রীপতঙ্গমরা পুরুষ
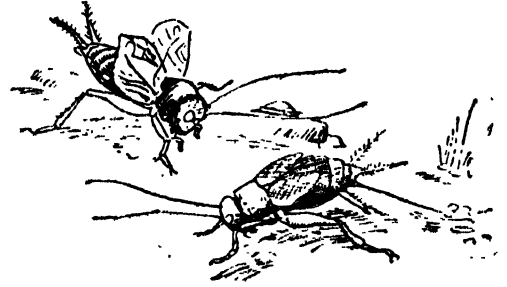
গ্রাউণ্ড ক্রিকেট বা ভূতলবাসী ঝিঁঝিঁ (স্ত্রী-পুরুষ) সঙ্গীতকারী পুরুষ পতঙ্গমটি পাখা তুলিয়া সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতেছে; শ্রোতা স্ত্রী-পতঙ্গমটি নীচে বিচরণ করিতেছে

পতঙ্গমদের অসমসাহসিক কার্য্যে উত্তেজিত করিয়া অবশেষে সেই কার্য্য সাধনের পথে বাধা উৎপাদন করে। সত্য হইলে ইহা বিস্ময়জনক, সন্দেহ নাই।

পুরুষ পতঙ্গমদের দক্ষিণ-পক্ষের তলদেশে ঢক্কাটি অবস্থিত। এই বাদ্যযন্ত্রটি ধারণ করিবার জন্য ঐ স্থানটি কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কতকগুলি সুদৃঢ় শিরার সাহায্যে এই ঝিল্লীতে গঠিত বাদ্যযন্ত্রটি সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম হইতে পারিয়াছে বলা চলে। ঢক্কার নিকটে পক্ষের বহিঃপ্রান্তে খানিকটা অংশ উঁচু এবং সে অংশ কোমল নয়। বাদ্য বাজাইবার ছড়টি বাম পক্ষে। বাম পক্ষে একটি ঢক্কাও দেখা যায়; তবে এই ঢক্কাটি তেমন পরিণতি লাভ করে নাই। দক্ষিণ পক্ষে যে উচ্চাংশ তাহার অব্যবহিত ঊর্দ্ধে ছড়টি বিরাজিত। ক্যাটিডিডরা যখন পক্ষ গুটাইয়া রাখে, তখন তাহাদের বাম পক্ষটিকে দক্ষিণ পক্ষের ঠিক উপরে দেখা যায়। ঐ সময়ে ছড়টি ঐ উচ্চাংশের অব্যবহিত উপরে বিরাজ করে। এইরূপ অবস্থায় এই পতঙ্গম যদি পার্শ্বের দিকে পক্ষ পরিচালিত করে, তাহা হইলে ছড়টি ঐ উচ্চাংশের সহিত ঘর্ষণের ফলে এক প্রকার শব্দ বাহির হয়। এই শব্দের সুর ও পরিমাণ এই উচ্চাংশটির উপর নির্ভর করে না। ঘর্ষণের ফলে ঐ ঢক্কার ঝিল্লীগুলিতে যে স্পন্দন সঞ্চারিত হয়, তাহাতেই সুরের সৃষ্টি।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী এই দীর্ঘশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িং বা ক্যাটিডিডদের সকলেই সম্পূর্ণ একই প্রকার সঙ্গীতজনক যন্ত্রের অধিকারী

নয়। অবশ্য স্থুল-দৃষ্টিতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায়, বিভিন্ন শ্রেণীর ক্যাটিড্ডিদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। তবে যন্ত্রের পার্থক্য অপেক্ষা সুরের পার্থক্যই আমরা অধিক দেখিতে পাই। একই বাদ্যযন্ত্র হইতে অসংখ্য প্রকার সুর নির্গত হইতে পারে ইহা সত্য; কিন্তু এই সঙ্গীতশিল্পী পতঙ্গমদের প্রত্যেকে একটি মাত্র সুরের সহিত পরিচিত। সেই একটি সুরে তাহারা সামান্য বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিতে পারে ইহাও সত্য। এক একটি সুরের সাধনা ইহারা পুরুষানুক্রমে করিয়া আসিতেছে। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত এই বাদ্যযন্ত্র বাজাইবার কৌশল ইহাদের কাহারও কাছে শিখিতে হয় না। সে শিক্ষা বা দক্ষতা ইহাদের সম্পূর্ণ সহজাত। তবে পতঙ্গমশিশু পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করিবামাত্র সুর সাধনা সুরু করিয়া দেয়, তাহা নয়। বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে ইহাদের সুরজনক যন্ত্র পরিণতি লাভ করে না। যখন বাদ্যযন্ত্র বাজাইবার সামর্থ্য পূর্ণোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তখনই পতঙ্গম শিল্পী সুর-চর্চ্চা আরম্ভ করে।

ক্যাটিড্ডি শ্রেণীর পতঙ্গম অন্যান্য দেশে থাকিলেও সর্ব্বপ্রথম উত্তর আমেরিকাতেই ইহাদের দেখা গিয়াছিল। অনেকে মনে করেন, ইহারা আমেরিকার আদি-বাসী। ক্যাটিড্ডি নামটিও আমেরিকায়
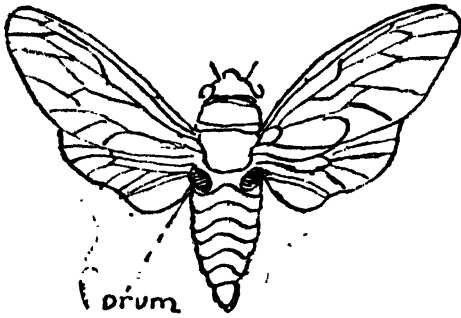
সিকেড্যা (ড্রাম বা ঢক্কা প্রদর্শিত হইয়াছে)

জন্ম-লাভ করিয়াছে। অবশ্য দীর্ঘশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িং ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই আছে। আমাদের বিশ্বাস, এই জাতীয় পতঙ্গমের অন্তর্গত একটি বা কয়েকটি সম্প্রদায় আমেরিকায় সর্ব্বপ্রথম দেখা যায়। আমেরিকাবাসী ক্যাটিড্ডিরাই সুরসাধনায় সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ। বৈজ্ঞানিকগণ আমেরিকাবাসী ক্যাটিড্ডিদের 'পেট্রোফিলা ক্যামেলিফোলিয়া' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ইহারা সুর-সাধনায় এমন গভীর ভাবে নিমগ্ন থাকে যে অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করিবার প্রবৃত্তি ইহাদের দেখা যায় না। আমেরিকাবাসী ক্যাটিড্ডিরা দক্ষতম পতঙ্গম-সুর-শিল্পিরূপে সমগ্র জগতে যেরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছে, অন্য কোন পতঙ্গমের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই। ক্যাটিড্ডি —এই নামটির কারণ কি, সে প্রশ্ন কেহ কেহ করিতে পারেন। "ক্যাটি—ক্যাটিডি—ক্যাটিড্ডি" এইরূপ গান গায়, এই হইতে এই অদ্ভুত নামের হেতু। "ক্যাটি—ক্যাটি শি—ডি, ও ক্যাটি—শি—ডি—নট্" ঐ গানের ভিতর মধ্যে মধ্যে এরূপ বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয় বলিয়াও কথিত।

ভারতবর্ষে সূক্ষ্মাগ্রশীর্ষশালী এক প্রকার ক্যাটিড্ডি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুর-সাধনায় ইহারাও নিপুণ। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদের নাম দিয়াছেন 'কনসেফালাস'। এই সুর-শিল্পী পতঙ্গমদের ললাট-দেশের আকৃতিই এই আখ্যার কারণ। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ললাট যেমন সম্মুখে আগাইয়া থাকে, এই পতঙ্গমদের ললাটও কতকটা সেইরূপ ভঙ্গীতে আগাইয়া আসিয়াছে বলা চলে। বর্ষার সময় ভারতবর্ষের শষ্পশ্যাম মাঠের বুকে এই জাতীয় পতঙ্গম প্রায় দেখা যায়। কনসেফালাস ইণ্ডিকাস ও কনসেফালাস প্যালিডাস, এই দুই প্রকার সূক্ষ্মাগ্র-শীর্ষশালী দীর্ঘশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িং ভারতবর্ষে বাস করে। ইহাদের আবাস-স্থল হইতে 'জিপ্—জিপ্—জিপ্' সুর-সংযুক্ত শব্দ নির্গত হয়। অনেক সময় সুর শুনা যায়, কিন্তু কোথা হইতে সুর আসিতেছে বা কে সুর-সাধনা করিতেছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। শ্রোতার মনে হইতে পারে, সকল দিক হইতে সুর উঠিতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্থানবিশেষে অবস্থিত পতঙ্গমের দেহস্থ বাদ্যযন্ত্র হইতে উহা সমুত্থিত হয়।

শুনিলে মনে হয়, শিল্পী নিজের সৃষ্ট সুরটিকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতেছে। কেহ প্রশংসাসূচক করতালি না দিলেও সুর-শিল্পী
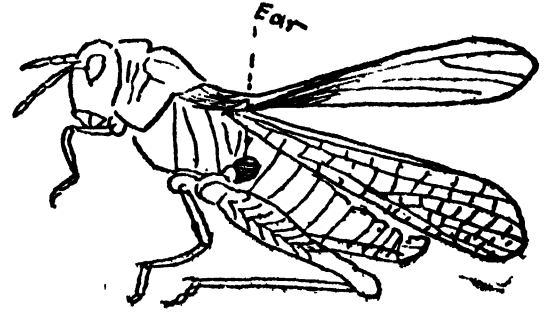
গঙ্গাফড়িংয়ের শ্রুতিরন্ধ্র (খর্ব্বশৃঙ্গ গঙ্গাফড়িং)
ইহার চিহ্নিত গহ্বরাকার স্থানটিই এই জাতীয় পতঙ্গমের শ্রবণেন্দ্রিয়

পতঙ্গমটি একই সুর পুনঃ-পুনঃ উচ্চারণ করে। কখন কখন মুহূর্ত্তের জন্য সুর থামে। থামিবার পর সুরটি প্রায় উচ্চতর হইয়া পড়ে। অনেকে দ্বিগুণতর হইয়া থাকে বলিয়া অনুমান করেন। অন্যান্য কয়েক সম্প্রদায়ের ক্যাটিড্ডি অরণ্যে বাস করে। ইহারা পারিপার্শ্বিকের সহিত এমন মিশিয়া যায় যে, ইহাদের অস্তিত্ব আদৌ উপলব্ধি হয় না। ইহাদের ধূসর বা বাদামী রঙের দেহের সহিত বৃক্ষ-বল্কলের বর্ণের বিস্ময়কর সাদৃশ্য বিদ্যমান। বনবাসী ক্যাটিড্ডি-দের একটি সম্প্রদায় বৃক্ষে না থাকিয়া ভূতলে, বৃক্ষচ্যুত পত্রপুঞ্জের মধ্যে অবস্থান করে। ইহারা মেকোপোডা এলংটা আখ্যায় অভিহিত। এই পর্ণরাশিবাসী পতঙ্গমদের বর্ণ বৃক্ষচ্যুত শুষ্ক পত্রের মত। মেকোপোডাদের কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে না দেখিলেও ইহারা সুনিপুণ শিল্পী। ইহারা পক্ষের বক্ষে এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র বহন করিতেছে। এই বাদ্যযন্ত্র পূর্ণবিকশিত। এই জাতীয় স্ত্রীপতঙ্গম দেহের প্রান্তদেশে এক প্রকার ভীষণ-দর্শন প্রত্যঙ্গ বহন করে। তাহা দেখিতে অনেকটা তরবারির ন্যায়; কিন্তু এ তরবারি আঘাতের জন্য নয়। বৈজ্ঞানিকগণ স্ত্রী-পতঙ্গের এই প্রত্যঙ্গটিকে ওভি পজিটর নাম দিয়াছেন। স্ত্রী-পতঙ্গমরা ইহাদের সাহায্যে বৃক্ষপত্রে বা তৃণগাত্রে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে ডিম্ব রক্ষা করে।

ভারতবাসী সুর-শিল্পী পতঙ্গমদের মধ্যে ক্রিকেটকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। অবশ্য ঝিল্লী বলিলে এ দেশে ক্রিকেটদেরই বুঝায়। সম্ভবতঃ সুর-সাধক পতঙ্গমদের মধ্যে ভারতবর্ষে ইহাদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের সহিতও ইহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সন্ধ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গৃহের চতুর্দ্দিকে যাহারা সুরসাধনা করে, তাহাদের অধিকাংশই ক্রিকেট। গৃহবাসী ক্রিকেটদের কথা আমরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনা হইতেও জানিতে পারি। তাঁহারা ইহাদিগকে গ্রিলাস আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এই শব্দ হইতে সমগ্র ক্রিকেট জাতি গ্রিলিডি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্যাটিডিড ও ক্রিকেট—ইহাদের আকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করিবার মত। এই পার্থক্য প্রধানতঃ পাখা ও পায়ে পরিস্ফুট। ক্রিকেটদের সৃষ্ট উচ্চ সুর পক্ষের দ্রুতস্পন্দনের পরিণতি। সাধারণতঃ দক্ষিণ পক্ষ বাম পক্ষের উপর রাখিয়া সুর সৃষ্টি করে। একটি পক্ষের প্রান্ত ঢক্কার কাজ করে এবং অপর পক্ষের প্রান্তের দ্বারা ছড়ের কার্য্য সাধিত হয়, বলা চলে। উভয়ের সঙ্ঘর্ষে সঞ্জাত স্পন্দনের ফলে একপ্রকার উচ্চ, তীব্র ও স্থায়ী সুর নির্গত হয়। ছড়টি পাখার উপরে না থাকিয়া তলদেশে থাকে। এই জাতীয় স্ত্রী-পতঙ্গমদের পাখায় যেমন অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা হালের ন্যায় বিরাজিত, সঙ্গীতকারী পুরুষ পতঙ্গমের পাখায় তেমন দেখা যায় না। পুরুষ পতঙ্গমের পাখায় কতকগুলি সুদৃঢ় ঝিল্লী বা তন্ত্রী থাকে। এইগুলি তন্ত্রী বা ড্রামের কাজ করে।

এক প্রকার কৃষ্ণকায় বৃহৎ ক্রিকেট বা ঝিঁঝিঁপোকা ভারতবর্ষে দেখিতে পাই। ইহারা মাটির নীচে বাস করে এবং দিনের বেলায় নীড় হইতে বাহির হয় না। যখন ইহাদের গুহাগৃহগুলি বর্ষার বারিধারায় ডুবিয়া যায়, তখনই ইহারা বাধ্য হইয়া বাহিরে আসে। অন্য সময় গুহাগৃহের দ্বারদেশে বসিয়া সুতীব্র সুরে সঙ্গীতসাধনায় রত থাকে। আমরা মনোযোগ সহকারে শুনিলে নৈশ নীরবতার ভিতর অবিশ্রাম ঝঙ্কৃত ঝিল্লিদের সঙ্গীতের ভিতর কতকগুলি গায়ককে সর্ব্বোচ্চ সুরে গাহিতে শুনিব। ইহারাই কৃষ্ণকায় ক্রিকেট। ইহাদের সুর এত উচ্চ ও তীব্র যে, অনেকের নিকট শ্রুতিকঠোর মনে হইতে পারে। কোন পতঙ্গম সুর-শিল্পীই এমন সমুচ্চ সুর বাহির করিতে পারে না। এই জাতীয় ক্রিকেট ব্রাকিট্রাইপিস পোরটেনটোসাস। মোলক্রিকেট বা ছুঁচো-ঝিঁঝি স্বতন্ত্র শ্রেণীর কীট। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম গ্রিলোটালপা গ্রিলো। গ্রিলোর অর্থ ক্রিকেট এবং টালপার অর্থ ছুঁচো। ছুছুন্দরসুলভ স্বভাবের জন্যই এই সকল পতঙ্গম এই আখ্যা পাইয়াছে। ছুঁচো-ঝিঁঝিঁরা মাটিকে চষিয়া ফেলিতে পারে। ইহাদের শরীরের শক্তিশালী পেশীবহুল সম্মুখাংশটি শাবলের কাজ করে এবং ইহারা মস্তকের দ্বারা ঢুঁ বা গুঁতা মারিয়া মাটির ঢেলা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। মাটি লইয়া ইহাদের কারবার। মলিন মাটির বুকেই ইহাদের সারা জীবন কাটিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সুর-সাধনার বাসনা ইহাদের মধ্যে জাগিয়া ওঠে। ইহারা একই সুর এক মিনিটে এক শতবার বাহির করে বলিয়া কথিত। সেই জন্য ইহাদের সঙ্গীতকে সকলে একঘেয়ে মনে করেন।

এক জাতীয় ক্রিকেট শস্যক্ষেত্রে বাস করে। ইহারা উৎসাহশীল খোসমেজাজী—মোল ক্রিকেট বা ছুঁচো ঝিঁঝিঁদের মত বিষাদগম্ভীর প্রকৃতির নয়। ক্ষেত্রবাসী ঝিল্লীরা উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতশিল্পী না হইলেও সঙ্গীতচর্চার প্রবল প্রবৃত্তি ইহাদের আছে। আর একপ্রকার ঝিঁঝিঁপোকাকে বৃক্ষবাসী ঝিল্লী বলা চলে। সন্ধ্যার ছায়ায় ধরণী যখন ধূসর হইয়া আসে, বৃক্ষবাসী ঝিল্লিকুল অমনই সুরসাধনা সুরু করিয়া দেয়। ইহাদের সুরের সহিত আমরা সুপরিচিত বটে, কিন্তু সুরশিল্পীদের সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য অনেকেরই ঘটে নাই। যদি কোন সময়ে কোন কারণে কোন শিল্পী আমাদের গৃহে অনাহূত আবির্ভূত হয় এবং সুরের খেলা দেখাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সুরের অত্যন্ত তীব্রতার জন্য তাহারা আমাদের উচ্চ প্রশংসা পাইতে পারে না। ভারতের বৃক্ষবাসী ঝিল্লিদের মধ্যে ওশিয়ানথাস ইণ্ডিকাস নামক
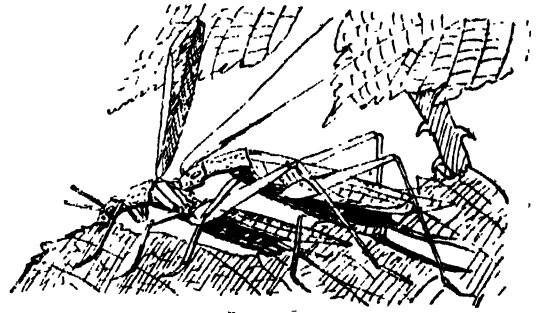
ঝিল্লী-দম্পতী (ক্রিকেট)। স্ত্রী-পতঙ্গম পুরুষ-পতঙ্গমের পৃষ্ঠ হইতে এক প্রকার পদার্থ চুষিয়া লইতেছে

সম্প্রদায়ের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। ইহাদের দেহ কোমল এবং রঙ ফিকে সবুজ।

পতঙ্গমদের সঙ্গীতজনক যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে স্বতঃ প্রশ্ন জাগিতে পারে, ইহাদের শ্রুতিশক্তি আছে কি-না? শব্দ গ্রহণ করিবার কোন উপায় বা অঙ্গ তাহাদের দেহে বিদ্যমান আছে কি না, এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া সহজ নয়। আমাদের যেমন মাথার পাশে শ্রবণেন্দ্রিয় আছে, পতঙ্গমদের অবশ্য তাহা নাই, কিন্তু কতকগুলি পতঙ্গমের মধ্যে এমন কতকগুলি প্রত্যঙ্গ দেখা যায়, যাহার কাজ শব্দ গ্রহণ করা। ইহাদের এই প্রত্যঙ্গগুলি মস্তকের পার্শ্বে না থাকিয়া হয় দেহ কাণ্ডের পার্শ্বে অবস্থিত, নয় তো পায়ের সহিত সংলগ্ন। গঙ্গাফড়িংদের এই জাতীয় অঙ্গটি কতকটা আমাদের কানের মতই এবং উহা তাহাদের উদরদেশের পার্শ্বে বিরাজিত। আমাদের কর্ণযন্ত্রের ন্যায় ইহাতেও একটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের উপর আমাদের কর্ণপটহের অনুরূপ একটি ঝিল্লী বিস্তৃত রহিয়াছে। এই কর্ণপটহের নীচে কতকগুলি কোষাকার অংশ আছে। ইহাদিগকে বায়ুকোষ বলা চলে। ইহা ছাড়া এখানে অনুভূতি সম্বন্ধীয় কতিপয় জটিল যন্ত্র বিদ্যমান। সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে ইহারা যে গঙ্গাফড়িংয়ের শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় যন্ত্রাবলী, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

এ বিষয়ে ভিয়েনাবাসী অধ্যাপক রেগানের গবেষণা বিশে

উল্লেখযোগ্য। সুর-শিল্পী পতঙ্গমদের স্ত্রীজাতির শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া ইনি সুগভীর গবেষণা করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরীক্ষক বা গবেষক পণ্ডিতদের মতে পুরুষ পতঙ্গমদের সুর-সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য স্ত্রী-পতঙ্গমদিগকে আকৃষ্ট করা। স্ত্রী-পতঙ্গমদের শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকিলে এ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। অধ্যাপক রেগান তাঁহার গবেষণাগারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার পতঙ্গম লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তিনি পুরুষ পতঙ্গমদের সৃষ্ট সুরে স্ত্রী-পতঙ্গমদিগকে আকৃষ্ট হইতে এবং পুরুষ পতঙ্গমের নিকটে আসিতে দেখিয়াছিলেন। কান না থাকিলে এ-টান কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? স্ত্রী ও পুরুষ পতঙ্গমকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে রাখিয়া এবং উহাদিগকে টেলিফোনের সাহায্যে আদান-প্রদান করিবার সুযোগদান করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন, স্ত্রী-পতঙ্গমটি ঠিক সেই সময় রিসিভারের নিকটে আসিয়া শুনিত—যে সময়ে পুরুষ পতঙ্গম ট্রান্সমিটারের বক্ষে সঙ্গীত সঞ্চারিত করিত। ইহার পর তিনি মধ্যবর্ত্তী তাড়িত-তরঙ্গটি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন এক প্রান্তে অবস্থিত পুরুষ পতঙ্গমটি সুরসাধনা করিলেও অপর প্রান্তবর্ত্তী স্ত্রী-পতঙ্গম কোনও প্রকার সাড়া দিতেছে না! আর একটি পরীক্ষা তিনি করিয়াছিলেন। কোন স্ত্রী-পতঙ্গমের শ্রবণেন্দ্রিয় বলিয়া অনুমিত প্রত্যঙ্গটিকে তাহার শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন, পুরুষ পতঙ্গমের সঙ্গীতের সুরে কোনরূপ সাড়া সে প্রদান করিতেছে না। এই সকল পরীক্ষা কতকগুলি সমস্যার সমাধানে সহায়ক হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় নূতন সমস্যারও সৃষ্টি করিয়াছিল। কোন কোন সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পতঙ্গমের মধ্যে তিনি শ্রবণেন্দ্রিয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু উহাদের পুরুষদের ভিতর সঙ্গীত-চর্চ্চার কোন লক্ষণ দেখেন নাই। অন্য দিকে কোন কোন সুর-শিল্পী সম্প্রদায়ের স্ত্রীজাতির নিদর্শন শ্রুতিশক্তির কোন চিহ্ন তিনি পান নাই। অধ্যাপক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এমন কতকগুলি পতঙ্গম আছে—যাহারা সঙ্গীতসাধনা করে; কিন্তু সেই সঙ্গীতের অতি সূক্ষ্ম সুর আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু স্ব স্ব সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পতঙ্গমদের উহা গ্রহণের সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ স্ত্রী-পতঙ্গম না শুনিলে পুরুষ-পতঙ্গমের সঙ্গীত-সাধনার কোন সার্থকতা থাকে না। অধ্যাপক ইহাও বুঝিয়াছিলেন—আমরা খুঁজিয়া পাই আর না পাই, সুর-শিল্পী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত স্ত্রী-পতঙ্গমদের শ্রবণেন্দ্রিয় নিশ্চয় আছে। মোটের উপর, পতঙ্গম-রাজ্যের বহু বিস্ময়কর রহস্যের যবনিকা এখনও উত্তোলিত হয় নাই। এই যবনিকা তুলিয়া সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইলে প্রবলতর অনুসন্ধান, সূক্ষ্মতর পর্য্যবেক্ষণ ও গভীরতর গবেষণার প্রয়োজন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

প্রভেদ

গোধূলি-রঙীন আকাশের তলে
অতীত যুগের পাতা ছিঁড়ে আজ
ভাসাই স্মৃতির সিন্ধু-জলে।

সে দিন পৃথিবী ছিল না এমন দুর্ব্বহ
সন্ধ্যা-সমীর করিত না হাহাকার,—
রূপসী জোছনা আনিত না কোনো দিন
ব্যাধির বীজাণু-ভার!
বৈশাখী রাতে দিগন্তে চেয়ে থাকা
ছিল না এমন শঙ্কা-মূর্চ্ছা-মাখা!
নির্বাত নীল গগনাঙ্গন ঘিরে
বিহগ-কণ্ঠ জাগিত চতুর্দিকে—
ফিরিত না নভে বোমারু-বিমানগুলি
শ্মশান করিতে সুন্দরী পৃথ্বীকে!
সে দিন ছিল না আমাদের এই ধরা
নির্ম্মম এতখানি!
মানুষের বুকে ছিল প্রীতি, ছিল প্রেম,
ছিল নাকো হানাহানি!
অনন্ত-ব্যাপী হিংসার এ কি লীলা
স্বার্থের সংঘাতে,
বিষায়ে দিয়েছে মৃত্তিকা, বায়ু, জল!

ছিন্ন হয়েছে কালের দশনাঘাতে
শিব, সুন্দর, কল্যাণ—সব আজি!
সত্যের রাঙা রক্ত করিয়া পান
নাচিছে ধরণী মুণ্ডমালিনী সাজি!
ইন্দ্রধনুর ইন্দ্রজালের মত
মিথ্যার হাসি জাগে দিগন্তে ছলি'-
ন্যায়ের দেবতা অধর্ম-যূপ-মূলে
দিয়েছে আত্মবলি!
আত্মত্যাগের আদর্শ আজি
ধর্ষিত পৃথিবীতে—
সাম্যের বাণী, সভ্যতা চুরমার!
বিশ্ব-মানবতার
দিকে দিকে দেখি সুরু হয়ে গেছে
ক্ষমাহীন ব্যভিচার!
ক্ষুব্ধ কৌতূহলে
অতীত যুগের পাতা ছিঁড়ে তাই
ভাসাই স্মৃতির সিন্ধু-জলে।

এস, এ, জাফর

(উপন্যাস)

তেরো

খুব প্রত্যুষে কুসুমিয়া জেগে উঠলো এবং রাত্রিটা যে নিরাপদে কেটেছে, এ জন্য ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ হৃদয়ের অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো ছোট একটা সঙ্গীতে। তার মধুর কণ্ঠস্বর প্রভাতের স্নিগ্ধ-শীতল বাতাসে তরঙ্গায়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো পাহাড়ের কন্দরে-কন্দরে। তার প্রতিধ্বনি করেই যেন পাখীগুলো পরক্ষণে উদাস ভাবে গেয়ে উঠলো।

দেহ বন্ধন-মুক্ত করে কুসুমিয়া নেমে পড়লো গাছ থেকে তার ঝুড়ি নিয়ে। আবার সুরু করতে হবে দিনের অভিযান পূর্ণ উদ্যমে। দিনের উজ্জ্বল আলোয় চারি দিক্ উদ্ভাসিত। যে-গাছটিতে আশ্রয় নিয়েছিল, সে-গাছের দিকে এক বার তাকালো। তাকিয়ে চমকে উঠ্‌লো। দেখলো, গাছের উঁচু ডালে ঝুলছে চার-পাঁচটা নর-মুণ্ড! প্রত্যেকটি মুণ্ডের চোখে তীর-বেঁধা! একটা মুণ্ডে কাঠের শিং লাগানো! এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো এবং আতঙ্কে হাত-পা যেন ঝিমিয়ে এলো। সে ভাবতে পারলো না, এই গাছটার উপর ব'সে কি করে সে রাত্রি কাটিয়েছে! কোনো ভূত-প্রেত একটি বারও তার সামনে উদয় হলো না? মনে পড়লো মিচিনের কথা। মিচিন তাকে কথা-প্রসঙ্গে বলেছিল, কনিয়াক্ সম্প্রদায়ের নাগারা শত্রু মেরে তাদের মাথা কেটে সেগুলো গ্রামের প্রান্তে কোনো উঁচু গাছে এমনি ভাবে কখনো কখনো ঝুলিয়ে রাখে। সে-কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, সে-সম্বন্ধে কুসুমিয়ার মনে এতটুকু সন্দেহ রইলো না। মানুষের উপর মানুষ এমন নৃশংস আচরণ কোন্ প্রাণে করে, সে তা ভেবে পেলো না।

এই বীভৎস দৃশ্য দেখে সে বুঝতে পারলো, খুব নিকটেই নাগা-বস্তি। এখানকার বর্ব্বর লোকদের সামনে পাছে পড়তে হয়, এই আশঙ্কায় সে প্রাণপণে ছুটে চললো তার গন্তব্য পথ ধরে নিজেকে যথাসম্ভব বন-জঙ্গলের আড়ালে রেখে। মুংরি যে-পথের কথা বলে দিয়েছিল, সেই পথ ধরেই সে চলতে লাগলো।

পথে এক জায়গায় কিছু বন-ফল সংগ্রহ করে তাতেই ক্ষুধা-নিবৃত্তি করতে হলো। বাঁশের চোঙায় করে ঝর্ণার জল সঙ্গে নিয়ে চলছিল, সুতরাং পানীয়ের অভাব হয়নি। তা ছাড়া পাহাড়ের বুকে অগণিত জল-ধারা অবিরাম বয়ে যাচ্ছিল প্রায় সর্ব্বত্র।

অপরাহ্ণে অকস্মাৎ সে এসে পড়লো এক দল সশস্ত্র নাগার সামনে। এরা নাগা-রাজার সীমান্ত দেশের রক্ষী ও চর। শত্রুপক্ষীয় কোনো লোকের উপস্থিতির সংবাদ রাজার কাছে দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়া এদের কাজ। রক্ষীরা প্রয়োজন হলে লড়াই করবার জন্যও প্রস্তুত থাকে।

কুসুমিয়াকে নাগা মেয়ে মনে করে তারা তার সঙ্গে দু'-একটা কথা বললো। সে তাদের কথার জবাবে বিশেষ কিছু না ব'লে সেখানে বসে পড়লো—যেন ভয়ানক পরিশ্রান্ত এমনি ভাব দেখিয়ে। কিছুক্ষণ পরে গম্ভীর ভাবে সে এক দুঃখের কাহিনী বানিয়ে তাদের বললো, সে চলেছে রাজার কাছে নিবেদন করতে ইংরেজ গভর্ণ-মেণ্টের উপর শোধ নিতে যেন মোটেই বিলম্ব করা না হয়। তার পর সে জিজ্ঞেস্ করলো—"যে জংলি পুলিশটাকে ধরে আনা হয়েছে, তাকে কেটে ফেলা হয়েছে তো?"

উত্তরে এক জন রক্ষী বললো,—"হবে। তবে এখন তাকে বন্দী রাখা হয়েছে।"

—"শুধু বন্দী করে রেখেছে? দুষ্টু পুলিশকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হয়নি। দেখো, সে আবার পালিয়ে না যায়।"

—"না, না, পালানো অত সহজ নয়।"

—"এ সব পুলিশকে একটুও বিশ্বেস নেই! পাহারা-দারের চোখে ধূলো দিয়ে এক ফাঁকে এমন বেরিয়ে যাবে, তার পর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই লোকটা পালিয়ে গেলে আমার ভাইএর মৃত্যুর শোধ নেওয়া শক্ত হবে। রাজার কাছে গিয়ে আমি তাই বলবো।"

এই নাগা মেয়ের কথায় প্রতিশোধ নেবার যে ঐকান্তিক ব্যগ্রতা প্রকাশ পেলো, তার অকৃত্রিমতায় বিশ্বাস করে রক্ষী বল্‌লে—"তুমি মিছিমিছি ভয় করছো! সে পালিয়ে যাবে? হুঁঃ, জিজ্ঞিনটুং পাহাড়ের গায়ে যে গুহা, সে গুহার কড়া পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে পালানো সহজ নয়!"

ফাঁকি দিয়ে পালানো সহজ না হতে পারে! কিন্তু এই অতি-প্রয়োজনীয় গুপ্ত-সংবাদটুকু এত সহজে পাওয়া যাবে, কুসুমিয়া কল্পনা করেনি। তার উপর যখন জানতে

পারা গেল, জংলি পুলিশকে শুধু বন্দী করে রাখা হয়েছে, এখনও হত্যা করেনি, তখন কুসুমিয়ার বুকের উপর থেকে যেন একটা পাহাড়ের ভার নেমে গেল। সে ভাবলো, ভগবানের কৃপা হলে এখনও হয়তো তাঁর উদ্ধার হতে পারে!

রক্ষীদের আর বিশেষ কিছু না বলে কুসুমিয়া আস্তে আস্তে আবার উঠে পড়লো। এবং রওনা হবার সময় শুধু বললো, অনেকখানি পথ যেতে হবে, তাই বিলম্ব করা উচিত হবে না।

রক্ষীরা তাকে কোনো বাধা দিল না এবং সন্দেহও করলো না। পাহাড়িয়া জাতদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে অনেকখানি। তারা ইচ্ছা-মতো প্রায় সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে বেড়াতে পারে—এতে কেউ সন্দেহ করে না। নাগা মেয়ের বেশ ছিল বলেই কুসুমিয়া রক্ষীদের চোখে ধূলো দিয়ে এমন চলে যেতে পারলো!

কুসুমিয়ার উৎসাহ বেড়ে গেলো—পথ চলার শ্রম তাকে আর ক্লান্ত করে তুলছে না! তার একমাত্র লক্ষ্য, কি করে তাড়াতাড়ি গন্তব্য স্থানে পৌছুবে। এরই মধ্যে সে অনেক দূর চলে এসেছে। এখন এমন একটা জায়গা দিয়ে চলেছে, যার চারি দিকে উঁচু পাহাড় আর নিবিড় অরণ্য। আরো কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর দু'-এক জন পথিকের দেখা মিললো। এক জায়গায় সে দেখলো, একটি পাহাড়ী মেয়ে মোটা এবং দীর্ঘ বাঁশের চোঙা নীচু করে ধরে আর-একটি তৃষ্ণার্ত্ত পাহাড়ী মেয়েকে জল ঢেলে দিচ্ছে এবং সেই মেয়েটি দু'হাতে অঞ্জলি ভরে সেই জল পান করছে।

সন্ধ্যার একটু আগে ঝরণার কাছে পৌছুলে চার-পাঁচ জন পাহাড়ী স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো; তারা সেখানে বসে বিশ্রাম করছিল কি গল্প-সল্প করছিল সে বুঝতে পারেনি। তাদের এক জনকে দেখে কুসুমিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হলো—সে যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি এবং তার গড়নও উঁচু স্তরের। নানা রকম সুন্দর ফুলের সাজে ভূষিত এ-মেয়েটি সেখানকার বন যেন আলো করে বসেছিল! তার দেহের বর্ণে এবং মুখের কান্তিতে তাকে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়। কুসুমিয়া ভাবলো, এ হয়তো নাগা রাজার কোনো আত্মীয়া। কিন্তু নাগা-বংশে এমন সুরূপা মেয়ে জন্মায়? নাগা-দেশে এসে এ পর্য্যন্ত সে অনেক নাগা-মেয়ে দেখেছে, এমন সুন্দর লাবণ্যশ্রী কিন্তু কারো দেখেনি! কুসুমিয়ার ধারণা, নাগা-কুকিরা নরাকারে পশু, চূড়ান্ত অসভ্য! তাদের স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে ভালো স্বাস্থ্য ছাড়া দেহ-সৌন্দর্য্যের উপাদান আর কিছু নেই। সুতরাং এই মেয়েটিকে দেখে তার বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। মেয়েটিও কুসুমিয়াকে দেখে তার দিকে অপলক-নেত্রে তাকিয়ে রইলো—স্তব্ধ বিস্ময়ে।

নীরবতা ভঙ্গ করে কুসুমিয়াই শেষে প্রথম কথা বললো। ঐ মেয়েটির কাছে বসে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো। উত্তরে মেয়েটি জানালো, সে নাগা-রাণীর পরিচারিকা—নাম ঝিম্‌লি এবং তার সঙ্গের মেয়েরা হচ্ছে ঝিম্‌লির সহচরী।

ঝিম্‌লির সাদর আহ্বানে কুসুমিয়া তার আরো কাছে এগিয়ে বস্‌লো এবং সপ্রশংস নয়নে তার ফুলের গহনাগুলোর দিকে বার-বার তাকাতে লাগলো। ঝিম্‌লি তা লক্ষ্য করে সহচরীদের বল্‌লো, এই রকম কিছু ফুল নিয়ে আয় তো।

অদূরেই অনেক ফুলগাছ—সহচরীরা তখনই ফুল আনবার জন্য উঠে গেল।

দু'-চার কথার পর কুসুমিয়া বুঝ্‌তে পারলো, ঝিম্‌লির মন আছে এবং সে-মন একান্ত সরল। রাজ-বাড়ীর এ মেয়েটি নিশ্চয় অনেক খবর রাখে ভেবে কুসুমিয়া কথা তুললো সেই জংলি-পুলিশ সম্বন্ধে। ঝিম্‌লি দুঃখ ক'রে বললো, ঐ পুলিশকে ধরে এনে কোথায় যে বন্দী করে রেখেছে, সে তা জানে না এবং সব-চেয়ে ভয়ের কথা এই যে, ওকে না কি অনাহারে রেখে মেরে ফেলা হবে! তার পর নিশ্বাস ফেলে সে বললো, মানুষকে মানুষ মেরে কেমন করে আনন্দ পায়, সে তা আজ পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারলো না। ঝিম্‌লির মনোভাব আরো স্পষ্ট ভাবে জানবার অভিপ্রায়ে কুসুমিয়া ঝিম্‌লির কথার প্রতিধ্বনি তুলে বল্‌লো, "আমিও ভাবতে পারি না, পুরুষ-লোকেরা মানুষ খুন করে কেমন করে আনন্দে নেচে ওঠে এবং এ কাজকে গৌরবের কাজ বলে ভাবে!"

ঝিম্‌লি তার মনোমত উক্তি শুনে কুসুমিয়ার উপর প্রসন্ন হলো এবং নিঃসংকোচে চুপি চুপি বলে ফেললো, ঐ জংলি পুলিশ যদি এই নিষ্ঠুর নাগাদের কবল থেকে কোনো রকমে পালিয়ে যেতে পারে, তাহলে সে খুব খুশী হবে। কিন্তু সে জানে না, কোথায় তাকে আটক করে রাখা হয়েছে।

ঝিম্‌লি প্রতাপের অশুভ কামনা করে না, এ সম্বন্ধে কুসুমিয়ার মনে কোন সন্দেহ রইলো না। কুসুমিয়া ভাবলো, ঝিম্‌লি রাজবাড়ীর পরিচারিকা—এক জন পরিচারিকার মনোভাব যে সব সময় কর্ত্তা বা কর্ত্রীর মনোভাবের অনুরূপ হবে তার কোনো অর্থ নেই; বিশেষ, মানুষের প্রাণ-নাশের ব্যাপারে স্ত্রীলোক মাত্রেরই বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করা স্বাভাবিক। তাই সে তখন অকপটে বললো, ঝিম্‌লির মতো সে-ও ঐ লোকের মঙ্গল কামনা করে এবং ঝিম্‌লির যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে তারা দু'জনে মিলে তার উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারে, আর যদি উদ্ধার করা সম্ভব না হয়, অন্ততঃ লোকটা যাতে অনাহারে না মারা যায়, এমন ব্যবস্থা করা যায় না? তার

পরেই সে ঝিম্‌লির কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বললো,—আমি আস্‌বার সময় পথে জানতে পেরেছি, জংলি আপিসের বাবুকে রাখা হয়েছে জিজ্ঞিনটুং পাহাড়ের এক গুহায়।

ঝিম্‌লি চমকিত হয়ে কুসুমিয়ার একটা হাত জোরে চেপে ধরে বল্‌লো,—"সত্যি? আশ্চর্য্য, আমার একটুও সন্দেহ হয়নি অমন নির্জ্জন জায়গায় তাকে রাখা হয়েছে! তবে সেখানে নিশ্চয় খুব কড়া পাহারার বন্দোবস্ত আছে। তা হোক—সেখানে গিয়ে একবার দেখতে হবে পাহারার বন্দোবস্ত কি রকম এবং কোনো উপায়ে বন্দীর জন্য কিছু খাবার পাঠানো যায় কি না। জায়গাটা খুব দূরে নয়,—চলো, আজই রাত্রে একবার চেষ্টা করে দেখি। তুমি যদি চাঁদ ওঠ্‌বার একটু পরে এইখানে আবার আসো, তাহলে এখানেই আমার দেখা পাবে। কিন্তু তুমি থাকো কোথায়?

—"আমি এখানে এই প্রথম এসেছি, কোথায় থাক্‌বো এখনো ঠিক করিনি—যা হয় একটা ব্যবস্থা কোরে নেবো।"

—"তার চেয়ে বরং এক কাজ করো,—কাছেই আমার এক বুড়ো ওস্তাদ আছে, তার বাড়ীতে যদ্দিন ইচ্ছা তুমি থাকতে পারবে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। খাওয়া-দাওয়া সেরে কোনো কৌশলে আবার এখানে চলে এসো।"

—"তাই করবো।"

—"কিন্তু তোমায় কি বলে ডাক্‌বো?"

—"আমার নাম মহুয়া।"

—"ঐ—আমার সঙ্গের মেয়েরা আস্‌চে। চলো, এখন আমার সঙ্গে ওস্তাদের বাড়ী।"

ঝিম্‌লির সহচরী বা পাহারাওয়ালীরা এক রাশ ফুল নিয়ে হাজির হলো। ঝিম্‌লি সেগুলো দিল মহুয়াকে। তার পর দু'জনে এগিয়ে চললো।

তার ওস্তাদ মিতু-পিলাঙয়ের বয়স প্রায় সত্তর বছর। ঘরের সাম্‌নে ছোট বারান্দায় বসে সে একটা লম্বা নল মুখে লাগিয়ে তামাক টান্‌ছিল। ঝিম্‌লিকে এদিকে আস্‌তে দেখে বুড়োর মুখ-চোখ আনন্দের হাসিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। মিতু-পিলাঙ্‌ ঝিম্‌লিকে খুব স্নেহ করতো। সংসারে তার আর কেউ ছিল না, তাই সে তার সকল স্নেহ ঢেলে দিয়েছিল ঝিম্‌লির উপর। তার মত নিপুণ তীরন্দাজ নাগাদের মধ্যে খুব কম। ক'বছর হাঁপানি কাসিতে ভুগ্‌ছে বলে কর্ম্ম-ক্ষেত্র থেকে সে অবসর নিয়েছে। ঝিম্‌লি এরই কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখতো এবং বুড়ো খুব আগ্রহে তীর-নিক্ষেপের কৌশল তাকে শিখিয়েছিল। ঝিম্‌লির অসাধারণ নৈপুণ্যে সে বিস্মিত হয়ে এক দিন বলেছিল, লক্ষ্য-বেধ-প্রতিযোগিতায় বুড়ো নিজেই তার কাছে হেরে যাবে। ওস্তাদকে ঝিম্‌লি খুব শ্রদ্ধা করে—সম্মান করে।

ওস্তাদের বাড়ীতে এসে বুড়োকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মহুয়াকে দেখিয়ে ঝিম্‌লি বল্‌লো,—"আমার এই বহিন্‌টি ক'দিন তোমার কাছে থাকবে—তোমার সেবা করবে—তোমার কোনো অসুবিধা হবে না তো?"

—"আরে বেটি, তোর বহিন্‌ থাকবে, অসুবিধা হইবে কেনে?"

—"চাঁদের জোছনায় পাহাড়ে বেড়াবার ওর ভারি সখ্‌—বেড়াতে দিয়ো ওকে।"

—"সেজন্য তোর ভাব্‌তি হবে না বেটি। এখন বসে একটুখানি ভালো মধু খেয়ে যা—তোর জন্যি চাক্‌ ভেঙ্গে মধু আনি রেখেছি।"

বলেই বুড়ো ঘরের ভিতর থেকে একটা বাঁশের চোঙা এনে ঝিম্‌লির মুখের কাছে ধরলো। ঝিম্‌লি মধু খেতে খুব ভালোবাসে বলে বুড়ো তার জন্য মধু সংগ্রহ করে রেখেছিল। ঝিম্‌লি হাঁ করলো, বুড়ো চোঙা থেকে খানিকটা মধু ঢেলে দিল তার মুখে,—তার পর ঝিম্‌লির বহিনের মুখেও দিল। খুশী-মনে ঝিম্‌লি তখন বিদায় নিয়ে চলে গেল। কুসুমিয়া রইলো বুড়োর বাড়ীতে।

চৌদ্দ

রাত তখন প্রায় দেড় প্রহর। কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ার চাঁদ পুব-আকাশের পথে খানিকটা উঠেছে। বাঁশ-বনের পাতার ফাঁক দিয়ে অসংখ্য রূপোলি রেখা ধারালো তীরের মতো যেন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘুমন্ত পাহাড়ের প্রশান্ত বুকের ওপর। বিশেষ কোনো উৎসবের ব্যাপার না থাকলে নাগা-বস্তির লোকেরা সাধারণতঃ রাতের প্রথম ভাগে আহারাদি শেষ করে শুয়ে পড়ে।

জোছনায় একটু বেড়িয়ে আসবার ছলে কুসুমিয়া মিতু-পিলাঙের অনুমতি নিয়ে চলে এলো সেই ঝরণার ধারে—যেখানে অপরাহ্নে ঝিম্‌লির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না—কথামতো ঝিম্‌লি খুব শীগ্‌গির এসে হাজির হলো। তার সহচরীরা এখন সঙ্গে না থাকলেও সে একেবারে নিঃসঙ্গ ছিল না। কুসুমিয়া দেখ্‌লো, ঝিম্‌লির হাতে একটা ছোট ঝুড়ি এবং কাঁধের ওপর বসে রয়েছে খুব লম্বা-হাত ঘোর-কালো-রংএর একটা ছোট জানোয়ার। এটা ছিল ঝিম্‌লির পেয়ারের পোষা উল্লু—"টিয়ারা"।

টিয়ারার দিকে মহুয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঝিম্‌লি বললো:—"একে দেখে ভয় করো না—টিয়ারা ভারী শান্ত। মানুষের মতো ওর বুদ্ধি, এবং আমার কথা শুনে কাজ করে। যে কাজে আমরা এখন যাচ্ছি, তাতে কোনো রকম সাহায্যের দরকার হলে টিয়ারাকে

দিয়ে হয়তো তা হতে পারবে। এখন চলো সেই দিকে যাই।"

মন্নুরী (কুসুমিয়া) যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। দু'জনে তখন খুব মৃদু স্বরে কথা বলতে বলতে ঝিম্‌লির নির্দ্দেশ-মতো চলতে লাগলো।

জোছনা-রাতে পাহাড়ের দৃশ্য বাস্তবিক মনোরম, কিন্তু ঝিম্‌লি বা মন্নুয়ার মনের অবস্থা তখন এমন ছিল না যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করে! দু'জনের মন প্রতাপের নিদারুণ অবস্থার চিন্তায় বিভোর। প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বেশি কথা বলা মন্নুয়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না নাগা-ভাষায় তেমন দক্ষতা নেই বলে। সাধারণ কথা-বার্ত্তাই কোনো রকমে সে চালিয়ে নিতে পারতো।

প্রায় তিন মাইল পথ চলে তারা গিরি-সঙ্কটের মতো এক জায়গায় পৌছুলো। উঁচু পাহাড়ের বুক চিরে সাত-আট হাত প্রশস্ত একটা ক্ষুদ্র ঝরণা-স্রোত এখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। স্রোতের জল গভীর নয়, হয়তো আট-দশ ইঞ্চি।

পাহাড়টা আগাগোড়া কালো পাথরের,—যেন কোনো নৈসর্গিক বিপ্লবে অতীত কালে তার বিশাল প্রস্তর-বপু খাড়া ভাবে দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এখনও সেই ভাবে রয়ে গেছে।

ঝিম্‌লি অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে স্রোতের জলে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে প্রবাহের উল্টো দিকে এগিয়ে চললো এবং মন্নুয়াকে ঐ ভাবে তার অনুসরণ করতে বললো। পাহাড়ের ফাটলের ফাঁক দিয়ে জোছনার আলো নীচে পর্য্যন্ত পৌছুতে পারেনি। পরিচিত পথ বলে ঝিম্‌লি মন্নুয়ার হাত ধরে এই অন্ধকারেও নিরাপদে এগুতে পারলো এবং প্রায় সম্পূর্ণ নিঃশব্দে। গভীর অন্ধকারে স্থানটুকু ছিল মাত্র কুড়ি-পঁচিশ হাত দীর্ঘ,—তার পরই বেশ প্রশস্ত খোলা জায়গা—মাঝখানের উঁচু ভূমিতে দু'-তিনটে বড় গাছ। এক দিকে পাহাড়ের বুক বিদীর্ণ করে ঝম্-ঝম্ গম্-গম্ রবে ঝরে পড়ছে ছোট একটা জল-প্রপাত প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচু থেকে। এই জলই স্রোতের ধারায় বয়ে যাচ্ছিল বাইরে ফাটল-পথে।

খোলা জায়গার মাঝখানে গাছের তলায় শুয়ে ছিল আট-দশ জন নাগা,—বোধ হয়, তারা ঘুমুচ্ছিল। অদূরে পাহাড়ের গা ঘেঁসে তীর এবং বর্শাধারী দু'জন লোক পাহারা দিচ্ছে। আধ-জোছনার ক্ষীণ আলোয় এই অবস্থা দেখতে পেয়ে ঝিম্‌লি মন্নুয়ার কানের কাছে মুখ এনে বললো:—"এই পাহাড়ের নামই জিঞ্জিন্-টুং। ঐ যে দু'টো লোক পাহারা দিচ্ছে ওদের ঠিক পিছনেই আছে ছোট একটা গহ্বর। এখানে আমি অনেক বার এসেছি পাহাড়ের গা থেকে জল পড়া দেখতে। অন্ধকারের মধ্যে আমরা যদি দক্ষিণ দিক্ ঘুরে এগিয়ে যাই, তাহলে ঐ গহ্বরের কাছাকাছি যেতে পারবো। পাহারাদাররা জোছনায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে আমাদের দেখতে পাবে না। চলো, আমরা এগুই। তোমার খপর সত্য বলে মনে হচ্ছে, না হলে এখানে পাহারার বন্দোবস্ত থাকতো না।"

ক'মিনিটের মধ্যেই দু'জনে এসে পৌছুলো গহ্বরের খুব কাছে—মাত্র দশ-পনেরো হাত দূরে। সেখান থেকে তারা স্পষ্ট দেখতে পেলো, বড় ভারী পাথর চাপা দিয়ে প্রবেশ-পথ বন্ধ করা হয়েছে। ঐ পাথরের উপরে আর পাশের দিকে সামান্য একটু ফাঁক—সে ফাঁক দিয়ে শুধু বাতাস যেতে পারে! মানুষের সাধ্য নেই ভিতরে ঢোকে বা ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে!

ঝিম্‌লি তার ঝুড়িতে করে কিছু মিষ্টি ফল, কিছু খাবার আর ফুল এনেছিল। ছোট গামছার মতো কাপড়ে সেগুলো বেঁধে সেই পুঁটলিটা সে দিল তার টিয়ারার হাতে এবং ইঙ্গিত করে তাকে সেই গহ্বর দেখিয়ে দিল।

ইঙ্গিত পেয়ে টিয়ারা পুঁটলি-হাতে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো গহ্বরের দিকে পাহাড়ের গা বয়ে। পাহারাদার দু'জন তখন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। উল্লুকটা যে চুপি চুপি এসে উপরের ফাঁক দিয়ে গহ্বরে ঢুকলো, তারা ত' টের পেলো না।

অনশন-ক্লান্ত দুর্ব্বল-দেহ প্রতাপ জীবন্ত সমাধি-ক্ষেত্রে শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় মেঝেয় প্রস্তর-শয্যায় মোহাবেশে পড়ে ছিল। এখান থেকে কেউ তাকে উদ্ধার করবে, সে ভরসা তার ছিল না। কে-বা তার খোঁজ পাবে? এই অফুরন্ত পাহাড়ের তরঙ্গায়িত দেহের কোন্ অজ্ঞাত কোণে তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, বাইরের লোক সে সন্ধান পাবে কি করে? আজ তিন দিন হয়ে গেল, তার আহার মেলেনি, কেউ এসে তার খোঁজও নেয়নি। নাগারা তাকে এখানে কয়েদে রেখে কোথাও পালিয়ে যায়নি তো? না, তা নয়,—কাছেই পাহারাদারদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে,—গহ্বরের মুখ-চাপা পাথরের ফাঁক দিয়ে যমদূতের মতো কালো ছায়া দিনে দু'-চার বার তার কারা-কক্ষে আরো যেন ঘনিয়ে উঠছে। তবু তার আহার মিলবে না কেন? তবে কি তাকে অনাহারে মেরে ফেলা এদের উদ্দেশ্য? হয়তো তাই। কিন্তু প্রতাপ সম্পূর্ণ নিরুপায়—একেবারে অসহায়! যে বড় পাথর দিয়ে গহ্বরের মুখ ঢাকা, অনেক বার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করে প্রতাপ দেখেছে, সে-পাথর নাড়ানো যায় কি না, কিন্তু তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এ অবস্থায় আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা ভিন্ন তার আর অন্য কিছু করবার ছিল না! সম্পূর্ণ অনাহারে ক'দিন বা মানুষ বাঁচতে পারে?

সে রাত্রে প্রতাপ হতাশ হৃদয়ে অবসন্ন দেহে কাৎ হয়ে পড়েছিল। কতক্ষণ সেই ভাবে ছিল, তার ধারণা নেই। অকস্মাৎ মনে হলো যেন কি একটা বস্তু তার দেহের উপর ঝপ্ করে পড়লো। দোর-চাপা পাথরের উপর দিক্‌কার ফাঁক দিয়ে তখন জোছনার ক্ষীণ রশ্মিছটা গহ্বরের মধ্যে খানিকটা আলো করেছিল। সেই আলোয় প্রতাপ দেখলো, তার বুকের কাছেই প'ড়ে রয়েছে একটা পুঁটলি, আর অদূরে গহ্বরের ভিতরের দেয়াল ঘেঁষে লম্বা হাত-পা ছড়িয়ে ঘোর কালো চেহারার বিরাট একটা মাকড়সার মতো জীব! এর আকস্মিক আবির্ভাবে প্রতাপ ভয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠ্‌ছিল—কিন্তু পরক্ষণে স্থির ভাবে দেখে বুঝ্‌তে পারলো, আগন্তুক জীব মাকড়সা নয়—উল্কু। এদিক্‌কার পাহাড়ে এ জাতের অনেক জানোয়ার দেখা যায় এবং প্রতাপ জানতো, উল্কু হিংস্র প্রকৃতির নয়। তখন খানিকটা নির্ভয়ে সে পুঁটলিটা হাতে তুলে নিল এবং ধরেই বুঝ্‌তে পারলো, এর মধ্যে আছে খাবার জিনিষ। ক্ষুধার্ত্ত প্রতাপ মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে সেটা খুলে তার মধ্যে পেলো কতকগুলো পাকা কলা, শসা, জামরুল আর চ্যাপটা-ধরণের ক'খানা রুটি— তা ছাড়া এক-ছড়া সুগন্ধি ফুলের মালা। তখন তার চিন্তার অবকাশ ছিল না। রুটি আর ফলগুলো সে ক'মিনিটের মধ্যে শেষ করলো,—সর্ব্বশেষ জামরুল চিবিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করলো। এই আহারে তৃপ্ত হয়ে সে শান্তি এবং আরামের নিশ্বাস ফেললো।

এতক্ষণে তার ভাববার সময় হলো। অবশ্য তার যে-রকম আহার মিলেছে, নাগাদের কাছ থেকে এ রকম খাদ্য কখনো আসেনি। তবে কি এগুলো নাগারা পাঠায়নি? খাদ্যের সঙ্গে রয়েছে আবার এক-ছড়া ফুলের মালা! কি মধুর গন্ধ সে মালার! মালাটি হাতে নিয়ে প্রতাপ ভাবতে লাগলো। উল্কু টিয়ারা এতক্ষণ এক জায়গায় একই ভাবে চুপ করে ছিল! প্রতাপের খাওয়া শেষ হবার একটু পরেই সে গহ্বর থেকে চুপি-চুপি বেরিয়ে গেল।

প্রতাপ ভেবে দেখলো, নাগাদের মধ্যে তার এমন কোনো বন্ধু কেউ নেই যে, তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য এত-খানি আগ্রহ করবে—একমাত্র ঝিমলি ছাড়া! ঝিমলি নাগা-রাণীর পরিচারিকা। পরিচারিকার ক্ষমতা কতটুকু! নিশ্চয় সে নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারে না। তবু ঝিম্‌লিই কি তাকে গোপনে এ খাবার পাঠিয়েছে একটা উল্কুর মারফৎ? ফুলের মালাটি কি তারই হাতের? কিন্তু খাবার জিনিষের সঙ্গে ফুলের মালা কেন? সভ্য সমাজের কোনো মেয়ে এ রকম অবস্থায় হয়তো এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠাতো দু'ছত্র সংবাদ—দু'টো আশার কথা, উদ্ধার-সম্ভাবনার একটু ইঙ্গিত! কিন্তু ঝিম্‌লি লেখা-পড়া জানে না, তাই লেখার বদলে হয়তো পাঠিয়েছে ফুলের মালা—প্রতাপ যেন বুঝ্‌বে যার কাছ থেকে খাবার যাচ্ছে, সে তাকে ফুল দিয়ে হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আর প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করেছে! সঙ্গে সঙ্গে জানাচ্ছে, প্রতাপের কথা সে ভোলেনি!

উল্কুর আবির্ভাবে প্রতাপ অনেকটা আশ্বস্ত হলো এই ভেবে যে, সম্ভবতঃ অনাহারে তাকে মরতে হবে না,—তার হিতৈষী বন্ধু এই কৌশলেই প্রতিদিন আহার জোগাতে পারবে,—অবশ্য পাহারার চোখ এড়িয়ে উল্কু যত দিন আসা-যাওয়ার সুবিধা পাবে। কিন্তু এ ভাবে চলবে কত দিন? তার পর? নাগারা যখন দেখবে, না খেয়েও লোকটা বেশ বেঁচে আছে, তখন তাদের মনে সন্দেহ জাগবে না? দরবারের সময় নান্দু তাকে তখনই হত্যা করবার জন্য উৎসুক হয়েছিল—শুধু রাজার আদেশের প্রতীক্ষা! এখন সুযোগ পাবা মাত্র মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে সে তার পৈশাচিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে। ঝিম্‌লি তখন প্রতাপকে বাঁচাতে পারবে? রাজার আদেশ ব্যর্থ করে দেবার মতো শক্তি বা সাহস সামান্য এক পরিচারিকার থাকা সম্ভব? তেমন কিছু করতে গেলে সে নিজেই হবে ভীষণ বিপন্ন। এমনি নানা দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতাপ অবশেষে তন্দ্রাভিভূত হলো!

পনেরো

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে তার কর্ম্মস্থল থেকে দুর্ব্বৃত্ত নাগারা ধরে বেঁধে নিয়ে গেছে, এ সংবাদে গভর্ণমেণ্ট রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠলো। এমন বিদ্রোহজনক ব্যাপার উপেক্ষা করা চলে না। রাজ্য-রক্ষা এবং রাজ-শক্তির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য—তার উপর এই অসভ্য জাতিদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে এক দল মিলিটারী ফৌজ পাঠানো হলো কল্‌কাতা থেকে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় "নাগা-অভিযান" বলে এ-ব্যাপারের উল্লেখ না থাকলেও এই অসভ্যদের শাসিত করবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে এমন অনেক অভিযানের আয়োজন করতে হয়েছে এবং একাধিক স্থলে উভয়-পক্ষে ছোটখাটো সংঘর্ষও ঘটে গেছে।

এই উপলক্ষে যে ফৌজ পাঠানো হয়েছিল তারা এসে প্রথমে ক্যাম্প করলো শ্রীহট্ট টাউনের মাঝখানে এক বড় ময়দানে। আসাম-অঞ্চলে তখন রেল-গাড়ীর প্রচলন হয়নি,—মেঘনা এবং সুরমা নদী বয়ে ক'খানা ষ্টীমার সে সময়ে কল্‌কাতা এবং শ্রীহট্টে অনিয়মিত ভাবে যাতায়াত করতো। কাজেই ডেপুটী-কমিশনারের তার পাওয়া সত্ত্বেও এ ফৌজের শ্রীহট্টে পৌঁছুতে অনেক বিলম্ব হলো। সে দিন শ্রীহট্ট জেলার মতো জায়গায় যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা

কেউ কখনো ভাবতে পারতো না,—সুতরাং টাউনের বুকের উপর অকস্মাৎ এক দল ফৌজের আবির্ভাবে জন-সাধারণ এক অজানিত আতঙ্কে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল! ফৌজদলের ক্যাম্পের কাছ দিয়েই ছিল ছেলেদের স্কুলে যাবার রাস্তা। অনেক ছেলে ভয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছিল—কিন্তু ফৌজের আচরণে ভয় করবার মতো কিছু লক্ষিত হয়নি। লেখক নিজে তখন শ্রীহট্ট টাউনের ছাত্র—এই সৈন্যদলের ক'জনের সঙ্গে তাঁর আলাপও হয়েছিল। দু'দিন মাত্র অবস্থানের পর শ্রীহট্ট থেকে সৈন্যদল কাছাড়ের দিকে রওনা হলো!

(ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন সেন

বৈষ্ণবমত-বিবেক

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

মধুগন্ধি শতদলরাজির সৌরভে আকুল ভ্রমর যেমন মধুলোভে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রকৃতি দেবী তাহার নিমন্ত্রণের বার্ত্তা বহন করেন—হৃৎসরোজে ভগবৎপ্রেমের কমল প্রস্ফুটিত হইলে তেমনই তাহার মধুময় সৌরভ-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই পরম-রসিক শ্রীগোবিন্দ ও তাঁহার অনুগত সাধুগণ ভক্তের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন। শ্রীআনন্দ-কানন ও গৌরীপীঠরূপে শ্রীশ্রীবারাণসী ধামে যেখানে স্বয়ং বিশ্বগুরু বিশ্বেশ্বরদেব জীবগণকে তারকব্রহ্ম নাম দিয়া উদ্ধার করেন, সেই নাম-মহিমার প্রকটক্ষেত্রে—শ্রীল তপনমিশ্র যখন প্রেমময়কে দর্শনের আকুল উৎকণ্ঠায় শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমাশ্রুর বিসর্জ্জন করিতেছিলেন এবং যখন ভক্তি-মন্দাকিনীর অমৃত-নীরে সঞ্জীবিত হইয়া তাঁহার হৃদয়-শতদল বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল তখন মূর্ত্তিমান্ আনন্দরসময়-বিগ্রহ স্বর্ণকান্তি অরুণবসনধারী শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তপনমিশ্র তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে পরম সমাদরে স্বগৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার সেবায় গৃহবিত্ত ও নিজের শিশুপুত্র রঘুনাথ ভট্টকে নিযুক্ত করিলেন। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিয়া তাঁহাকে নিজ জন্মজন্মান্তরের আরাধনার বস্তু বলিয়া চিনিয়া তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও নিজের পাত্রাবশেষ প্রসাদ-দানে তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন।

মুদ্রিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের কোন কোন গ্রন্থে দেখি, মহাপ্রভু যখন পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণে নিজের পড়ুয়া শিষ্যগণের সহিত বাহির হইয়াছিলেন, তখন পদ্মাতীরবর্ত্তী রামপুর গ্রামে উপস্থিত হইলে সে গ্রামের অধিবাসী তপনমিশ্র নামক জনৈক সারগ্রাহী ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ স্বপ্নের বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। তিনি সাধ্যসাধনতত্ত্ব নিরূপণ না করিতে পারিয়া নিজ ইষ্টদেবের শরণ গ্রহণ করিয়া দিবারাত্র নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে এক দিন রাত্রিশেষে তিনি স্বপ্নে দেখেন যেন এক জন দেবতা আসিয়া বলিতেছেন, "তুমি আর চিন্তা করিও না। মন স্থির করিয়া নিমাঞি পণ্ডিতের নিকট গমন কর। তিনি মনুষ্যরূপী নারায়ণ, তিনিই তোমার অবলম্বনীয় সাধনার বিষয়ে উপদেশ করিবেন।" তপনমিশ্র নিজ গ্রামে নিমাই পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলে নিমাই পণ্ডিত তাঁহাকে ষোলনাম বত্রিশাক্ষরের তারকব্রহ্ম মন্ত্র উপদেশ পূর্ব্বক নাম-সঙ্কীর্ত্তনই যে কলিযুগের ধর্ম্ম, ইহা জানাইয়া নামরূপী শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতে আজ্ঞা করেন। অতঃপর চৈতন্যদেব তাঁহাকে বারাণসী ধামে গমন করিয়া অবস্থিতি করিতে বলেন এবং সেই স্থানেই যথাসময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এরূপ আশ্বাস প্রদান করেন। তপন-মিশ্র শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে বারাণসীতে গমন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই বারাণসী ধামেই তাঁহার পুত্র রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

এই বৃত্তান্তটি শ্রীচৈতন্যভাগবতের হস্তলিখিত কোন পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রকাশ করিয়াছেন।* আমরাও কোন পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথিতে এই অংশ পাই নাই। তথাপি তপনমিশ্রের পূর্ব্ববৃত্তান্ত-সম্বন্ধে নূতন তথ্য বলিয়া ইহা শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর জীবনী-লেখকগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাদেশ পাইয়াই বারাণসীতে বাস করুন অথবা নিজেই সাধনানুকূল তীর্থবাসের আগ্রহে আসিয়া ৺কাশীধামে অবস্থিতি করুন, এইখানেই তাঁহার পুত্র রঘুনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে পুরীধামে কিছু কাল অবস্থানের পর যখন ঝাড়খণ্ডের পথে শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছিলেন, তখন শ্রীকাশীধামে তিনি তপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিতেন এবং চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেন বলিয়া পরম প্রামাণিক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ পাই।†

শ্রীচৈতন্যদেব যখন বারাণসীতে আগমন করিয়া তাঁহার সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত মণিকর্ণিকায় স্নান করিতেছিলেন, তখনই তপনমিশ্র তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া রোদন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তপন মিশ্রকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া তপনমিশ্রের গৃহে আগমন করিলেন। তপনমিশ্র শ্রীচৈতন্যদেবের

---

* শ্রীচৈতন্যভাগবত—১০ম অধ্যায় তৃতীয় সংস্করণ।

† শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ।

পাদোদক লইয়া সবংশে পান করিলেন এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের দ্বারা পাক করাইয়া প্রভুকে ভিক্ষা দিলেন। প্রভু ভিক্ষা-গ্রহণের পর শয়ন করিলে মিশ্রপুত্র রঘুনাথ তাঁহার পাদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন এবং তপনমিশ্রও সবংশে মহাপ্রভুর "শেষান্ন" গ্রহণ করিলেন; প্রভু এইবার মিশ্রের আগ্রহে মাত্র দশ দিন কাশীধামে অবস্থান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। ইহার পরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পথে তিনি দুই মাস কাশীধামে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ মিশ্রের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দকে ভক্তিপথে আনয়ন করেন এবং রাজমন্ত্রী সনাতন রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিলে দুই মাস ধরিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবের করণীয় যাবতীয় বিষয়ের উপদেশ দেন। বলা বাহুল্য, শ্রীল সনাতনকে উপলক্ষ করিয়া যে উপদেশ প্রদত্ত হইল, ভক্তবর তপনমিশ্র, সৌভাগ্য-বান চন্দ্রশেখর, স্নিগ্ধ-হৃদয় প্রভুর ভক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও প্রভুর নিতান্ত নিজ-জন রঘুনাথ ভট্টও তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন না। শ্রীচরিতামৃতের মধ্যলীলায় বিংশ হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পাঁচটি অধ্যায়ে শ্রীমহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে বৈষ্ণবের করণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রায় সকল কথাই অপূর্ব্ব যোগ্যতা-সহকারে আলোচিত হইয়াছে।

১৪৩৭ শকাব্দের শেষভাগে শ্রীচৈতন্যদেব বারাণসী হইতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া ঝাড়খণ্ডের পথে শ্রীনীলাচলে প্রত্যাগমন করেন। মহা-প্রভু যখন শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবন-গমনের আদেশ দিয়া রাত্রিকালে উঠিয়া পুরীধামের অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন বারাণসী ধামে পাঁচ জন তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের নাম তপন-মিশ্র, তৎপুত্র রঘুনাথ, চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া ও মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত ব্রাহ্মণ। ইঁহারা সকলেই শ্রীসনাতন গোস্বামীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। মহাপ্রভু কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না, বলিলেন, "যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি পরে আমাকে দেখিতে নীলাচলে আসিও। এখন আমি একাকী ঝারিখণ্ড-পথে নীলাচলে যাইব।" এই কথা শুনিয়া সনাতন-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ইঁহাদের প্রতি আকর্ষণ কত প্রবল এবং তাঁহার বিয়োগ-ব্যথায় ইঁহারা কিরূপ অধীর হইয়াছিলেন, তাহা ইঁহাদের এই অবস্থা হইতেই বুঝা যায়।

এই সময়ে বালক রঘুনাথের বয়স একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছেন এবং যাঁহাকে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মের এক জন প্রধান কর্ম্মী মনোনীত করিয়াছেন, সেই বালক রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের বিয়োগে যে কি প্রকার অধীর হইলেন, তাহা বর্ণনাতীত। যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে পিতৃমাতৃ-সেবা করিতে আজ্ঞা দিয়া গিয়াছিলেন। এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তিনি পিতামাতার আদেশে শাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। রঘুনাথ স্বভাবতঃই সুকণ্ঠ ছিলেন। অনুমান হয়, তিনি উপযুক্ত সঙ্গীত-শিক্ষকের নিকট এই সময়ে সঙ্গীত-বিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। অচিরেই তিনি তাৎকালিক প্রচলিত কাব্যব্যাকরণাদিতে এবং সম্ভবতঃ কাশীর মত দার্শনিক বিদ্যার কেন্দ্র-স্থলে—কোন কোন দর্শনেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বালক রঘুনাথ ক্রমে যুবক হইলেন। তখন তিনি পিতা-মাতার আজ্ঞা লইয়া গৌড়দেশের পথে সম্ভবতঃ শ্রীল চৈতন্যদেবের জন্মস্থান ও ভক্তপার্ষদগণের পূর্ব্ব-লীলাস্থলী শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনান্তে পুরী-ধামে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার সঙ্গে একটি পালি ছিল। ৮কাশীধাম হইতে যাত্রা করিবার সময় তাঁহার এক জন কায়স্থ সঙ্গী জুটিয়া গেল। ইঁহার নাম রামদাস বিশ্বাস। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক, বৈষ্ণব, মুখে নিরন্তর রাম-নাম জপ করিতেন। ইনি পথে রঘুনাথকে পাইয়া ভক্ত ব্রাহ্মণ-বালক জ্ঞানে ইঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া রঘুনাথের পালি পর্য্যন্ত বহন করিতে লাগিলেন; পরম বিনয়ী রঘুনাথের আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না। যখন রঘুনাথ পুরীধামে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন, মহাপ্রভু তখন রঘুনাথকে পরমাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার থাকিবার বাসা-ঘর স্থির করিয়া দিলেন এবং সে দিন নিজের পাত্রাবশেষ প্রসাদ রঘুনাথকে দান করিলেন। পরে রঘুনাথকে স্বরূপ-দামোদরপ্রমুখ ভক্তগণের সহিত মিলিত করিয়া দিলেন। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে এইরূপে আট মাস কাল বাস করিলেন। তিনি ঐ সময়ে প্রায়ই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করি-তেন। রঘুনাথ অতি সুন্দররূপে রন্ধন করিতে পারিতেন। রসমর্ম্মজ্ঞ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন যে, "রঘুনাথ যাহাই রন্ধন করিতেন তাহাই অমৃতের সমান হইত।" শ্রীচৈতন্যদেবও এই নিমন্ত্রণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার পাত্রাবশেষ প্রসাদ রঘুনাথের জন্য রাখিয়া দিতেন। রঘুনাথ সেই প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইতেন। পরম প্রেম-ভরে শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে এই রন্ধনকার্য্য যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবা, রঘুনাথ তাহা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

রঘুনাথ আট মাস শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কিতে বাস করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-প্রমুখ প্রধান প্রধান ভক্তগণের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাদের স্নেহ, কৃপা ও আশীর্ব্বাদপাত্র হইলেন। রথাগ্রে নৃত্যশীল মহাভাবের প্রতি-মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিয়া তিনি ভাব ও রসের স্বরূপ উপলব্ধি করিলেন। বিরহ-ভাবে বিহ্বল মহাপ্রভুকে দেখিয়া শ্রীভগবদ্বিরহ যে কি বস্তু, তাহা তিনি শিখিলেন। ভাবের প্রতীকরূপ ভাগবত-পাঠে নিরত শ্রীল গদাধর পণ্ডিতকে দেখিয়া তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলামাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভাবাবেগের তীব্রতা বুঝিতে পারিলেন। এক দিকে মূর্ত্তিমান ষোলকলায় পরিপূর্ণ মহাভাবস্বরূপ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, অন্য দিকে রসভাবের পরিপোষক গোপীগণের ভাবে পরিপূর্ণ সেবা-পরায়ণ স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরামানন্দ রায়-প্রমুখ ভক্তবর্গকে দেখিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনের স্বরূপ যে কি, তাহা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব এই প্রকারে রঘুনাথকে কাছে রাখিয়া শিক্ষাদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বারাণসী ধামে তাঁহার পিতামাতার চরণান্তিকে প্রেরণ করিলেন। বারাণসীতে ফিরিয়া পাঠাইবার সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

অষ্ট মাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
'বিভা না করিহ' বলি নিষেধ করিলা॥
বৃদ্ধ পিতা মাতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥

পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তাঁর গলে।
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তাঁরে দিলা।
প্রেমে গরগর ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা।
স্বরূপাদি ভক্ত ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু আজ্ঞা পাঞা।
— অন্ত্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

সংসারের পাপতাপ-বর্জ্জিত স্নিগ্ধ-হৃদয় চিরকুমার ভক্ত রঘুনাথ ভট্টকে শ্রীচৈতন্যদেব যে উপদেশ দান করিলেন, তাহার সহিত ধনী জমিদারের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ দাসকে প্রদত্ত উপদেশের তুলনা করিলেই অধিকারিভেদে শ্রীচৈতন্যদেব কি প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিতেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। রোগভেদেই সদ্বৈদ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেবও কুলীনগ্রামী গৃহস্থ ভক্তগণকে, বৈরাগ্য ও ভজননিষ্ঠার আদর্শ পুরুষ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে ও পরম-সুকুমার প্রেমার্দ্র সিক্ত ব্রহ্মচারী রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপদেশ দান করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রাধিপ যেমন বাছিয়া বাছিয়া রাজ্যরক্ষার জন্য ও পরবল প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন সেনাপতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্যদেবও সেই প্রকারে বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও প্রচারের জন্য যাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা যোগ্যতর আর কেহ হইতে পারিতেন, এ-কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এই সকল যোগ্যতম লোককে তিনি কি ভাবে সুগঠিত করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাও শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্টের সহিত আচরণে বুঝিতে পারা যায়। যিনি শ্রীবৃন্দাবনে ভাগবত পাঠ করিয়া ভক্তহৃদয়ে ভাগবত-ধর্ম্মের মূল উৎস প্রবাহিত করিয়া দিবেন, কিরূপ স্নেহভরে তাঁহার হৃদয় শোধন করিয়া সুগঠিত করিতে হয়—শ্রীরঘুনাথ ভট্টের প্রতি উপদেশের ও আচরণের দ্বারা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাহাই ব্যক্ত করিলেন।

ভাবে গদগদ চিত্ত রঘুনাথ বারাণসী ধামে পিতামাতার চরণান্তিকে উপস্থিত হইয়া যিনি তাঁহাকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার পিতামাতা উভয়েই পরলোকের পথে যাত্রা করিলেন। চারি বৎসরের মধ্যে এইরূপে সংসারের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রঘুনাথ ভট্ট হৃদয় ভরিয়া তাঁহার হৃদয়ের দেবতার পদে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার আদেশ "আর একবার নীলাচলে আসিও" এই কথা স্মরণ করিয়া অবিলম্বে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবারও আট মাস কাল শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া তাঁহাকে যাহা শিক্ষা দিবার ছিল, দিতে লাগিলেন। এইবার তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভাগবত পাঠের উপযুক্ত শিষ্য হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। ভাবাবিষ্ট ভাবে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যে ভাবে ভাগবত পাঠ করিতেন, রঘুনাথ ভট্ট তন্ময় চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীল রামানন্দ রায়কে লইয়া শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-মাধুরী আস্বাদন করিতেন এবং ব্রজের শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমের স্বরূপ বিচার করিতেন, তাহাতে উজ্জ্বল রসের স্বরূপ এবং শ্রীবৃন্দাবনের ব্রজবধূগণের উপাসনা-পদ্ধতি তাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিত হইল। মহাপ্রভুর নিজের আচরণের দ্বারা তাঁহার এই ভাব ও রসের উৎকর্ষ জ্ঞান স্ফূর্ত হইলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আট মাস পরে তাঁহাকে আদেশ করিলেন, যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ! যাহ বৃন্দাবনে।
তাহাঁ যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে।
ভাগবত পঢ় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান।
এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা।
চৌদ্দহাথ জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা পানবিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা।
সে মালা ছুটা পান প্রভু তাঁরে দিলা।
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা।
—অন্ত্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ

প্রেমময়-তনু শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত ইহাই যে তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ এবং ইহাই যে তাঁহার শেষ কৃপাদেশ, তাহা কি রঘুনাথ বুঝিতে পারেন নাই? শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরূপ-সনাতনপ্রমুখ ভক্তবৃন্দকে শ্রীভাগবত-সুধারসে অভিষিঞ্চিত করিবার জন্য তাঁহার নিজের শক্তি রঘুনাথে সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে রঘুনাথ

রঘুনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হৃদয় জুড়াইলেন। কিন্তু অচিরেই নীলাচলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র অস্তমিত হইবার সংবাদে মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীল গোবিন্দদেব প্রকট হইলেন। শ্রীরূপ রঘুনাথকে লইয়া সেই সেবার উৎসবে মাতিলেন। শ্রীল মদনগোপালদেব শ্রীল সনাতন-প্রমুখ ভক্তবৃন্দকে লইয়া চাঁদের হাট বসাইলেন। শ্রীল দাস-গোস্বামী, কাঞ্চনগড়িয়ার দ্বিজ হরিদাস, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীজীব প্রমুখ ভক্তবৃন্দ একে একে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ইঁহাদিগকে শ্রীভাগবতামৃত রসে ডুবাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। বিষয়ের কালিমা, পাপতাপের মালিন্য চিরশুদ্ধ চিরকুমার রঘুনাথকে কোনও দিন স্পর্শমাত্র করিতে পারে নাই; ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্র জ্যোতিতে তাঁহার সুকুমার কান্তি আরও মনোরম হইয়াছিল; তাঁহার উপর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপাসুধাবৃষ্টিতে তাঁহার অন্তর প্রেমভক্তিতে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল; ইহার উপর সঙ্গিতরসে উচ্ছ্বসিত মধুর কণ্ঠে সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিয়া তিনি সর্ব্ববেদান্তশিরোমণি শ্রীভাগবতের যে রসময়ী ব্যাখ্যা করিতেন—সে যেন মরধামে মানুষের জন্য নহে! শ্রীগোবিন্দকে ও গোবিন্দ-পদ-কমলের মধুকরগণকে শুনাইবার জন্যই তিনি শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেন। একে ত ভাগবত নিগমকল্পতরুর শ্রীশুকমুখামৃত দ্রবযুক্ত গলিত ফল, তাহাতে আবার দ্বিতীয় শুকোপম রঘুনাথের ব্যাখ্যা—সেই ব্যাখ্যার সহিত নানা রাগরাগিণী-সমন্বিত প্রেমোচ্ছ্বাস-পরিপূর্ণ কণ্ঠ, তাহার সহিত প্রেমাশ্রুপ্লাবিত পবিত্র দৃষ্টি ও ভাবাবেগপূর্ণ ক্রন্দন—শ্রোতাও আবার শ্রীরূপ সনাতন লোকনাথ ভূগর্ভ রঘুনাথদাস হরিদাস কাশীশ্বর গোপাল ভট্ট শ্রীজীব কৃষ্ণদাস কবিরাজপ্রমুখ ভক্তচূড়ামণিগণ—স্থান শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য লীলা-ভূমি শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দের সম্মুখস্থিত সুবিখ্যাত "গোলকুঞ্জ" এখানে এই ভাগবতব্যাখ্যার যে অমৃতপ্রবাহ ছুটাইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেব

ভক্তগণের হৃদয়পদ্মে উদিত হইবেন—এ কথা কি আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে? এই ভাগবত-ব্যাখ্যায় যে রসের প্রবাহ ছুটিল, তাহারই তরঙ্গ আমরা অদ্যাপি শ্রীবৃহত্তোষণী, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীবিদগ্ধমাধব, শ্রীললিতমাধব, শ্রীদানকেলিকৌমুদী, শ্রীদানকেলিচিন্তামণি, শ্রীমুক্তাচরিত, শ্রীমাধব-মহোৎসব ও শ্রীগোপালচম্পূ প্রমুখ গ্রন্থাবলীতে সামান্য ও বিশেষ ভাবে দেখিতে পাই। এই ভাগবত-পাঠ ও ব্যাখ্যার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। তথাপি রসিকভক্ত-মুকুটচূড়ামণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার যে আভাসমাত্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সুরক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা উদ্‌ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—

"রূপগোসাঞির সভাতে করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন॥
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র কণ্ঠ রোধে বাষ্প, না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ,
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে-শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে॥"

—অন্ত্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীবৃন্দাবনধামে, পুরীধামে, হরিদ্বারে, নবদ্বীপে ও কলিকাতায় ভক্ত সমাজে আমরা বক্তৃতা, কথকতা, কীর্ত্তনগান যাহা শুনিতে পাইতাম, কালস্রোতে লোকের প্রকৃতি-বিপর্য্যয়ে তাহা ক্রমে বিরল হইয়া আসিতেছে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহার মূল শ্রীভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা। শ্রীভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যার সঞ্জীবনী শক্তিই হরি-কথার মূলাধার। যেখানে হরি-কথা কীর্ত্তিত হয় ও শ্রীভাগবত পাঠ হয়, শ্রীভগবান নিজেই সেই স্থানের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ!"

"হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে বা যোগীদিগের হৃদয়েও প্রকটরূপে অবস্থান করি না। আমার ভক্তগণ যেখানে আমার কথা গান করেন, আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকি।" শ্রীবৃন্দাবনের গোবিন্দ-মন্দিরের প্রাঙ্গণে শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর ভাগবতপাঠ শুনিয়া এ-কথা আপামর সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারিত।

শ্রীরূপ-সনাতন এই অনুগত ভক্তচূড়ামণির উপর শুদ্ধ শ্রীভাগবতপাঠের ভার অর্পণ করেন নাই, উপযুক্ত অধিকারীকে দীক্ষা দান করিবার ভারও তাঁহারা ইঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট শ্রীবৃন্দাবনে গেলে গোবিন্দজীর প্রথম মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই মন্দির অতি ক্ষুদ্র। এই মন্দির ভগ্ন হইবার উপক্রম হইলে রঘুনাথ ভট্ট তাঁহার কোন ধনী শিষ্যকে বলিয়া গোবিন্দের একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন এবং বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণেও ঐ শিষ্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবকে বিভূষিত করেন, এ-কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের সম্মুখে যে জগমোহন গঠিত হইল, তাহা "গোলকুঞ্জ" নামে অভিহিত হইত। সেই স্থানে বসিয়া তিনি ভক্তজন-সমন্বিত শ্রীগোবিন্দদেবকে ভাগবত শুনাইতেন।*

এখন কথা উঠিতে পারে যে, এই রঘুনাথ ভট্টের গুরু কে ছিলেন? অনেকেই মনে করেন, শ্রীচৈতন্যদেবই শ্রীল রঘুনাথ ভট্টের দীক্ষাগুরু। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি সকল ভক্তেরই মূলগুরু। তাঁহার ভক্তগণ ভাবানুরূপ ভক্তির দ্বারা তাঁহার মধ্যেই তাঁহাদের অভীষ্টদেবকে দর্শন করিতেন। শ্রীজীবের পিতা অনুপম ও মুরারিগুপ্ত তাঁহাকেই শ্রীরামচন্দ্ররূপে দর্শন করিয়াছিলেন। প্রত্যুত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রত্যেক পরিবারের গুরুপ্রণালী শ্রীচৈতন্যদেব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, পরমভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-গতপ্রাণ শ্রীতপনমিশ্রই রঘুনাথ ভট্টের আচার্য্য-গুরু ও দীক্ষা-গুরু।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে শ্রীভাগবত পাঠ ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য নিত্যকৃত্য সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন যে, তিনি কাহারও নিকট হইতে গ্রাম্যবার্ত্তা শুনিতেন না বা নিজ জিহ্বায় গ্রাম্য-বার্ত্তা উচ্চারণ করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ-কথা ও পূজা-অর্চ্চনাদিতে তাঁহার সমস্ত দিবস ও রাত্রি (অষ্টপ্রহর) অতিবাহিত হইত। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, তিনিও সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে মাত্র চারি দণ্ড নিদ্রা যাইতেন। তাহাও কোন কোন দিন ঘটিয়া উঠিত না। ইনি বুঝিতেন যে, বৈষ্ণবমাত্রেই ভগবদ্‌ভজনপরায়ণ, অতএব এই সরল বিশ্বাসে তিনি কোন বৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিতেন না। ইনি শ্রীকৃষ্ণকথায় অর্থাৎ কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তিতে এবং পূজা বা অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তিতেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন।

একে একে যেমন শ্রীবৃন্দাবনের আকাশে ভক্তজ্যোতিষ্কমণ্ডলী উদিত হইয়াছিলেন, তেমনই উপযুক্ত সময় অতিক্রান্ত হইলে তাঁহারা একে একে অস্তমিত হইতে লাগিলেন।.........সম্ভবতঃ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাবের কিঞ্চিৎ পরেই—শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমার পূর্ব্ববর্ত্তী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে নিজ-সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন। শাস্ত সমাহিত নির্জ্জনতা-প্রিয় নিস্পৃহ রঘুনাথ ভট্টের সমাধি শ্রীচৌষট্টি মোহান্তের সমাজ-বাড়ীতে দেওয়া হইল। শ্রীরঙ্গনাথজীর দেব-মন্দিরের সন্নিকটে এই সমাজ-বাড়ী অবস্থিত। এখনও অসংখ্য ভক্ত এই সমাজ-বাড়ীতে এই সমাধি-স্থলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকেন। এই সমাধি-মন্দিরটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একটি তীর্থরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত; কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এই সমাজ-বাড়ীটি একরূপ উপেক্ষিত ও অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই স্থানে যখন বহু বাঙ্গালী ভক্তের সমাধি রহিয়াছে, তখন এই স্থানটি রক্ষা করিবার ভার বাঙ্গালী সুধীগণের গ্রহণ করা উচিত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)

---

* অনেকে মানসিংহ-নির্ম্মিত গোবিন্দমন্দির দর্শন করিয়া এই মন্দিরকেই রঘুনাথ ভট্টের শিষ্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দির ভাবিয়া মানসিংহকে শ্রীরঘুনাথ ভট্টের শিষ্য বলিয়া ভুল করেন। মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গোবিন্দ-মন্দির এই মন্দিরের পরে ১৫১২ শকাব্দে নির্ম্মিত হয়।

স্বয়ম্বরা

(গল্প)

কি একটা পর্ব্বে হাইকোর্ট বন্ধ। কোর্টের খ্যাতনামা উকীল মজুমদার সাহেব ঢিলে পায়জামা কোট পরিয়া সুসজ্জিত হল-ঘরে আরাম-কেদারায় বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন।

প্রভাতে মক্কেলের শুভাগমনে তাঁহার সংবাদপত্রে মন দিবার অবকাশ হয় নাই। দিবা-নিদ্রার অভ্যাস নাই, আহারান্তে কাগজ লইয়া বসিয়াছেন।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। গৃহিণী সুমিত্রা বালক-পুত্র তিতু, মিতুকে লইয়া বিশ্রাম-সুখে শয়ান। ক্ষণকালের জন্য দাস-দাসীদের কলরব থামিয়াছে। মজুমদার সাহেবের খাস-মহলের খাস বেয়ারা শুধু প্রভুর হুকুমের অপেক্ষায় পর্দ্দা-ঢাকা দ্বারদেশ অধিকার করিয়া তন্দ্রায় ঢুলিতে-ছিল। এমন সময় মজুমদার সাহেবের একমাত্র আদরিণী কন্যা লতিকা উঁচু-হিলের জুতায় খুট-খুট শব্দ করিয়া ঘরে ঢুকিল।

মজুমদার সাহেব মুখের পাইপ নামাইয়া মেয়ের পানে চোখ তুলিলেন।

মেয়ে বাপের বাহুমূলে নাড়া দিয়া কলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "আমি তিনটের শো'তে 'মেট্রোয়' যাচ্ছি বাবা। মা ঘুমিয়েছেন, তাঁকে বলে যেতে পারলাম না। উঠ্‌লে তুমি বলো। ছবি শেষ হলে আমায় আবার একটু নিউ মার্কেটে যেতে হবে। বেশী দেরী করবো না। আটটার ভেতরে ফিরবো।"

মজুমদার সাহেব সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কার সঙ্গে যাচ্ছ লোটি?"

"যাচ্ছি শঙ্কর, হীরক, প্রবীর বাবুদের সঙ্গে। ওদের তিন জনকে আজ আমার দেখাবার পালা। তুমি বাবা এখন একেবারে অকেজো হয়েছ—মোটরের পেট্রোল জোগাড় করতে পারো না। রোজ রোজ আমি আর ট্রামে ঘুরতে পারবো না, তোমায় বলে দিচ্ছি।"

মজুমদার সাহেব হাসিয়া জবাব দিলেন, "শীগ্‌গির কিছু পেট্রোল পাওয়া যাবে। কিন্তু তুমি তিন জনাকে সঙ্গী করেছো—অনিরুদ্ধকে বাদ দিলে কেন? আমি চাই অরুকেও তুমি খাতির-যত্ন করো। অরু আমার বন্ধু অনাদির ছেলে। ছেলেটি ভালো।"

লোটি তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট বাঁকাইয়া উত্তর করিল, "তোমার বন্ধু জ্যেঠামণির ছেলে হয়েছেন বলে উনি যে আমারো অন্তরঙ্গ বন্ধু হবেন, তার কোন মানে আছে বাবা? একগুঁয়ে স্বভাবের জন্যেই অরু বাবুকে আমার পছন্দ হয় না। উনি সঙ্গে থাকলে সকলের আমোদ মাটী। না দেবে হাসি-গল্পে যোগ, না বল্‌বে মন খুলে দু'টো কথা। যা করতে যাই না কেন তাতেই করবে বারণ। ভাবখানা পৃথিবী-শুদ্ধ লোক যেন ওঁর ছাত্র, উনি মাষ্টার মশাই।"

"অত বড় পণ্ডিত, প্রোফেসর, ওর ভাবভঙ্গী একটু গম্ভীরই হবে লোটি, তাতে তোমার বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। অরু যা করে, তোমার ভালোর জন্যে। ওর মতো অকৃত্রিম বন্ধু তোমার আর কেউ থাকতে পারে না।"

"হাঁ, বাবা, তোমার যেমন কথা! আমার অন্য বন্ধুরা অরু বাবুর চেয়ে আমাকে ঢের বেশী ভালোবাসে। তুমি বড্ড একচোখো, তোমার বন্ধুর ছেলের ওপরেই শুধু টান। ওঁকে তুমি বাড়িয়ে বলতে চাও। যারা আমার কাছে আসে, তারা সবাই ওর ওপরে ছাড়া নীচে নয়। শঙ্কর বাবু ব্যারিষ্টার। হীরক বাবু আমেরিকা থেকে ডেণ্টিষ্ট হয়ে এসেছে। প্রবীর বাবু জাপানে কাচের কারখানায় কাজ শিখে ফিরেছে।—আর উনি কি করেছেন? কোণে বসে বই মুখস্থ করে পরীক্ষা দিয়েছেন। বাইরেও যাননি, পালিশও হননি। সেই জন্যেই আমার ভাল লাগে না।"

"ভাল না লাগলেও অরুকে অশ্রদ্ধা করো না লোটি; ও ছেলের ভেতর বস্তু আছে। এক দিন আমিও তোমার মত বাইরের চাকচিক্য পছন্দ করতাম, এখন বয়স হয়েছে—অনেক দেখে-শুনে খাঁটি-মেকি চিন্‌তে শিখেছি।"

মেয়ে দুই হাতে বাপের গলা জড়াইয়া স্কন্ধে মাথা রাখিয়া আবদারের স্বরে কহিতে লাগিল, "না বাবা, তোমার বয়েস হয়নি। এত তাড়াতাড়ি তোমাকে আমি বুড়ো হতে দেব না। তুমি আগে ভাল ছিলে—এখন মার মন্ত্রণায় একেবারে সেকেলে হয়ে যাচ্ছ।"

পিতা নিরুত্তরে কন্যার পিঠ চাপড়াইয়া আদর করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ আদর করা হইল না।

লনে জুতার শব্দ শুনিয়া লোটি চকিতা হরিণীর মত পিতাকে ছাড়িয়া দিয়া বাহিরে যাইতে যাইতে কহিল, "ওরা এসেছে বাবা, আমি যাচ্ছি! মাকে বলো।"

মাকে বলিতে হইল না। তিনি মেয়ের খোঁজেই স্বামীর নিকট আসিয়াছিলেন, দূর হইতে লোটির বিদায়-সম্ভাষণও তাঁহার কাণে গিয়াছিল। তিনি স্বামীকে কোন কথা না বলিয়া বিরক্ত ভাবে বাতায়নে দাঁড়াইলেন।

দ্বিপ্রহর অবসান-প্রায়। অপরাহ্ণের কর্ম্ম-কোলাহল ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করিতেছে। জনবিরল পথের গায়ে গাছের ছায়া হেলিয়া পড়িয়াছে। সেই ছায়া-ঘন পথ ধরিয়া লোটি চলিয়াছে। তাহার পাশে লোটির বন্ধুরা। লোটির রঞ্জিত অধরে, কাজলটানা চোখে, মূল্যবান্ বসন-ভূষণে বেলা-শেষের রৌদ্ররশ্মি ঝকমক করিতেছে।

পথের বাঁকে ট্রামের লাইন। দেখিতে দেখিতে লোটি অদৃশ্য হইয়া গেল। মা একটা ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর নিকটে আসিয়া বসিলেন।

বেয়ারা পাইপে তামাক ভরিয়া দিয়া গেল।

মজুমদার সাহেব পাইপ টানিতে টানিতে বলিলেন, "লোটি মেট্রোয় গেল ; তুমি ঘুমিয়েছিলে, তোমায় বলে যেতে পারেনি।"

সুমিত্রা গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "ঘুমের ওজর মিছে, সারা দিন কিছু আমি ঘুমিয়ে কাটাইনি। আমি মানা করবো বলেই আমাকে আগে বলেনি। এটা তুমিও জানো, আমিও জানি ; কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, এমনি ধিঙ্গি করে মেয়েকে আর কত দিন রাখবে ? ছেলেবেলা থেকে তুমি যে অত সাহেবীয়ানা করে এসেছ, তাতে তুমি কিন্তু সাহেব হওনি, তোমার মেয়েও মেম হয়নি। এ দেশ বিলেত নয়। যাদের সঙ্গে মেয়ে অষ্টপ্রহর ঘুরছে, তাদের কারুকে ধরে ওর বিয়ে দাও। আমি লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি পাই ?"

"তোমার লজ্জা পাবার মত কোন কাজ তো লোটি করেনি। ওকে আমি লেখাপড়া শিখিয়েছি, সকলের সঙ্গে মেলামেশার স্বাধীনতা দিয়েছি। এর মধ্যে দোষের কিছু নেই, তবে বড় হয়েছে ; বিয়ে দরকার। যাদের সঙ্গে লোটি মেশে, তাদের ভেতরে কাকে ওর বেশী পছন্দ সেটা তোমারি জানা উচিত। আমি তো সবগুলিকেই যোগ্য পাত্র মনে করি। অনাদির ইচ্ছে, অরুর সঙ্গে লোটির বিয়ে দেয়, কিন্তু তাদের-আমাদের ইচ্ছায় তো হবে না, আমি চাই লোটি স্বয়ম্বরা হোক !"

"সেকালের পচা পুরোনো বাংলা স্বয়ম্বরা শব্দটা ব্যবহার করো না। ইংরেজি কোর্টশিপ বলো ! হাঁ, তুমি তো সকলকেই যোগ্য পাত্র মনে করবে ! যোগ্যের নমুনা যে তোমার তিনটি রত্ন ! এক জন ব্যারিষ্টারি পাশ করে পৃথিবী জয় করেছেন ; যেমন চালিয়াৎ তেমনি অহঙ্কারী। আর দু'টোর আমেরিকা-জাপানের ছাপ ছাড়া কি আছে ? মেয়ে তোমার আদরের—তুমিই তার বর-মাল্যের ব্যবস্থা করে আমাকে বলো। আমি বরণ-ডালা সাজাব।"

মজুমদার সাহেব সাহেবী ভাবাপন্ন হইলেও আসলে মানুষ ভাল, নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির। তাই স্ত্রীর উগ্র-মূর্তির সম্মুখে তিনি যেন দীপ-শিখার মত হঠাৎ নিবিয়া গেলেন। অ্যাস্ট্রের উপরে হাতের পাইপ রাখিয়া মৌন হইয়া মাথার চুল টানিতে লাগিলেন।

সুমিত্রা আড়চোখে স্বামীকে নিরীক্ষণ করিয়া আবার আরম্ভ করিলেন, "এক্ষুনি এর মীমাংসা তোমাকে করতে হবে না। শঙ্কর হীরক প্রবীর যাকে তোমাদের দু'জনের পছন্দ, ঠিক করো—করে' মাঘ মাসেই বিয়ে দাও।"

মস্তকের স্বল্প চুলগুলি টানিতে টানিতে মহা চিন্তান্বিত হইয়া মজুমদার সাহেব বলিলেন, "তোমাতে লোটিতে পরামর্শ করে যাকে লোটি চায়, আমাকে বলো। তুমি তিন জনের কথাই বললে অরুর নাম করলে না কেন ? সে আমার বন্ধুর ছেলে। তাকে আমি খুব স্নেহ করি।"

"স্নেহ করলে কি হবে ? তাকে তোমাদের মেয়ের মনে ধরবে না। বিদেশের পালিশ যার নেই, এ সাহেব-বাড়ীতে সে যে অচল।"

মজুমদার সাহেব আহত হইয়া প্রতিবাদ করিলেন, "ছিঃ ছিঃ ! কি যে বল ! ছেলেবেলা থেকে আমার একটু ইয়ে—তা তুমি সে সব অভ্যাস প্রায় ছাড়িয়ে এনেছ। অরুকে কেন আমি অপছন্দ করবো ? তবে কথা হচ্ছে, লোটি হবে স্বয়ম্বরা তার ইচ্ছার ওপরেই সব নির্ভর করচে।" বলিয়া মজুমদার সাহেব অত্যন্ত বিপন্ন ভাবে চুরুট টানিতে লাগিলেন।

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সুমিত্রার রাগ জল হইয়া গেল। তিনি স্বামীর হাত ধরিয়া সহাস্যে কহিলেন, "সোলার টুপির কল্যাণে যে ক'টা চুল বাকী আছে তাও টেনে তুলে আর নেড়া বুড়ো হয়ো না। বার বার লোটি লোটি করছো কেন ? তুমিও তো একটা মানুষ, মানুষের মত মানুষ—জ্ঞান-বুদ্ধির অভাব নেই—কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করছো। ভাল-মন্দর বিচার-বোধ তোমারো আছে। মেয়ে কাকে চাইবে সে পরের কথা, জামাই হিসাবে তুমি কাকে পেলে সুখী হবে—তোমাতে আমাতে সে আলোচনা হওয়া দরকার।"

"নিশ্চয় দরকার, অবশ্য দরকার। সত্যি কথা তোমাকে বলতে কি, লোটিকে স্বয়ম্বরা হবার স্বাধীনতা দিলেও আমার মন অরুকে চায়। সে আমার বন্ধুর ছেলে, বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্। তবে তুমি কাকে পেলে খুশী হবে, সেটাও ভাববার বিষয় !"

"আমার খুশী-অখুশীর যদি কোন দাম থাকতো তা হলে লোটিকে তুমি এমন ভাবে তৈরী করতে না ! যাক্, যা হবার হয়েছে। আজ সে ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞাসা করবো। বেলা গেছে। তুমি এখন ধড়া-চূড়ো ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে ভদ্দর হও, আমি তোমার চা দিতে বলি।"

২

রাত্রি আটটা। তিতু মিতু গৃহ-শিক্ষকের নিকটে তার-স্বরে পড়া করিতেছে। মজুমদার সাহেব তখনো বেড়াইয়া ফেরেন নাই। সুমিত্রা নিভৃতে আলোর নীচে বসিয়া সোয়েটার বুনিতেছিলেন।

লোটি পায়ের জুতা খুলিয়া মায়ের অধিকৃত গালিচার উপরে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা ও একটা ফুলের বড় তোড়া

রাখিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, "মা, তোমার জন্তে কি সুন্দর জিনিস এনেছি—চেয়ে দেখো।"

মা চোখ না তুলিয়া নিবিষ্ট মনে বুনিতে লাগিলেন।

মেয়ে মুহূর্ত্ত-কাল মাকে নিরীক্ষণ করিয়া মার পশ্চাৎ হইতে তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া কোলে লুটাইয়া পড়িল।

সুমিত্রা হাতের শেলাই রাখিয়া কহিলেন, "কাজের সময় বিরক্ত করো না। যাও, সরে যাও। বেলা আড়াইটে থেকে রাত আটটা অবধি যাদের সঙ্গে ঘুরে এলে তাদের সঙ্গেই ন্যাকাপনা করগে।"

ডাঁটা-সমেত রজনীগন্ধার গুচ্ছ মায়ের নাকের নিকটে ধরিয়া হাসিয়া মেয়ে কহিল, "কেন তুমি রাগ করছ মা? ভাল পাউডার আর স্নো-ক্রীম্ খুঁজতে আমার দেরী হয়ে গেল। পোড়া যুদ্ধের জন্য ভাল জিনিস কি পাওয়া যায়? যে দোকানে ঢুকি,—খালি আজে-বাজে জিনিস দেখিয়ে দোকানদার বক্তৃতা দেবে! সাত দোকান ঘুরে খুঁজে-পেতে আনতে সময় লাগে।—আমি কি ওদের সঙ্গে সাধে আড্ডা দিই মা? বাবার সময় নেই, গাড়ীর পেট্রোল নেই, ভাই দু'টো একেবারে বাচ্ছা;—কাজেই ওরা না থাকলে আমার যে কোন কাজ হয় না।"

মা বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন, "কথার ছিরি শুনে বাঁচি না। পয়সা দিলে না কি জিনিস মেলে না? তোমার মত বয়সের মেয়ে কোন্ ঘরে ছেলের দলে ঘুরে বেড়ায়? তোমার লজ্জাও নেই, সঙ্কোচও নেই!"

"লজ্জা-সঙ্কোচের কি হয়েছে মা? আমিও মানুষ, ওরাও মানুষ। আজে-বাজে কেউ নয়, আমার বন্ধু। বন্ধুদের নিয়ে যাই, তাতেও তুমি দোষ ধরো! তুমি একেবারে সেকেলে হয়ে গেছ মা।"

মা কহিলেন, "আমি তোমার দোষ ধরতে চাই নে। আগে তুমি বিয়েটা সেরে নিয়ে যত খুশী বন্ধু-সম্মিলন করো, আমি কথা কইবো না। অজানা অচেনাদের খোঁজ না করে আমার মতে তোমার বন্ধুদের ভেতরেই কাউকে বেছে নাও। অন্য মেয়েরা এমন সুযোগ-সুবিধা বড় একটা পায় না। তোমার ভাগ্যে স্বঘরের এতগুলো ছেলে হাতের কাছে রয়েছে, এ কম কথা নয়!"

লোটি উল্লাসিত হইয়া উত্তর করিল, "তুমি ঠিক ধরেছ মা। সত্যি, এতগুলো ছেলেকে কাছে পাওয়া মজার বৈ কি! নীলা বলে, বাবা আমার নামে বাড়ী করে দিয়েছেন শুনে ওরা আনা-গোনা করে। আমার কিন্তু নীলার কথা বিশ্বাস হয় না। বাড়িয়ে বলা ওর স্বভাব। আসলে সব্বাই আমায় ভালোবাসে দেখে নীলার হিংসা হয়। তোমরা বিয়ে-বিয়ে করে ক্ষেপে উঠেচ,—ওরাও বিয়ের কথা বলে—কিন্তু কাকে রেখে কাকে যে আমি বিয়ে করবো তা' ভেবে পাই না। এক অরু বাবু বাদে ওদের তিন জনকেই আমার খুব পছন্দ হয়।"

"কি পছন্দ লোটি?" বলিতে বলিতে মজুমদার সাহেব বেড়াইয়া ফিরিলেন।

লোটি মাকে ছাড়িয়া বাবাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—"শোন বাবা, মা আমাকে বিয়ে করতে বলছেন, তুমিও বলেছ, শঙ্কর বাবুরা তিন জনেই দিন-রাত বিয়ে-বিয়ে করছেন। মুস্কিল হয়েছে আমার, আমি কাকে রেখে এখন কাকে বিয়ে করি? সব চেয়ে ভাল হয় একদম বিয়ে না করা। মা কখনো তা' বুঝবেন না। তুমি মাকে বুঝিয়ে দাও না বাবা!"

"না লোটি, তা হয় না। বিয়ে সকলেই করে, তোমাকেও করতে হবে। আমি অনাদির ওখান থেকে ফিরছি—সেখানে শুনে এলাম, অরুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। অলিকপুরের রাজকন্যার সঙ্গে।"

লোটি কৌতুকে-কৌতূহলে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "এইবার জ্যেঠামণির ছেলে জব্দ হবেন। যেমন সনাতনী মতবাদ, খুঁতখুঁতে স্বভাব, তেমনি রাজবাড়ীর একটা হাবা-গোবা কথামালার গোপালের গল্প-পড়া মেয়ে নিয়ে জ্বলে মরুন!"

মজুমদার সাহেব উত্তর দিলেন, "রাজকন্যা শুনেই তুমি এত অশ্রদ্ধা করছো! কেন লোটি, রাজার মেয়ে হলেই কি তাকে হাবা-গোবা মূর্খ ধরতে হবে? অলিকপুরের রাজকুমারী এম-এ পাশ, রাজার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। দেখতেও না কি দেবী-প্রতিমার মত সুন্দরী। গায়ের রং চাঁপাফুলের মত। আমি অনাদিকে বলে এলাম, 'কোনক্রমে এ মেয়ে যেন হাত-ছাড়া না হয়। তাড়াতাড়ি দিন ঠিক কর'।"

সুমিত্রা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় মথিত করিয়া কত দিনের কত আশার স্বপ্ন মনে পড়িতে লাগিল। দুই বাল্য-বন্ধুর নিবিড় প্রণয়, বন্ধু-পত্নীদের মধ্যে প্রীতি-সখ্য। দুই পরিবারের ছেলে-মেয়ের সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা, আকাশ-কুসুম চয়ন করিয়া কামনার মাল্য রচনা! কত মাহেন্দ্র-ক্ষণ দ্বারে আসিয়াছিল—মেয়ের শিক্ষার অজুহাতে স্বামী তাহা ফিরাইয়া দিয়াছেন! সে মাহেন্দ্রক্ষণ এ-জীবনে আর আসিবে না! লোটির বিরক্তি-বিরাগে অরু তাহার ভিন্ন পথ বাছিয়া লইল। এ দোষ অরুর নয়, লোটির। অপর পক্ষ স্নেহসম্পন্ন উদার। তাহাদের দোষ নাই—তাহারা অপেক্ষা করিয়াছে। যত অনিষ্টের মূল মেয়ে আর তাহার বাপের কুশিক্ষা।

মার বিষণ্ণ ভাব লক্ষ্য করিয়া লোটির হাসিমুখ মলিন হইল। সে ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, "বি-এ পাশ করে আমি এম-এ পড়তে চেয়েছিলাম, তোমরাই তো আমাকে

এম-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হতে দিলে না। মিছিমিছি ক'টা মাস নষ্ট হলো। আমি কিন্তু কালকেই এম-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হব। ওদের বাড়ীতে এম-এ পাশ বৌ আসবে, তোমার বাড়ীতে এম-এ পাশ মেয়ে থাকবে না? আচ্ছা, অলিকপুরের রাজকুমারীর নাম কি?"

"নাম শুনিনি মা, বিয়ের পরে নাম জানতে পারবে, দেখতেও পাবে। এম-এ পড়তে চাও, পড়ো, তবে প্রাইভেট পড়াই সুবিধা। তোমার যে সাবজেক্ট, অরুরো তাই, সেই তোমাকে পড়িয়ে দেবে।"

"তোমার আদরের অরু! অরুর কাছে আমি পড়তে চাইনে বাবা। কথায় কথায় মুরুব্বিয়ানা! গুরু-মশাইগিরি আমার ভাল লাগে না! আমি—"

মেয়ের কথায় বাধা দিয়া মা তিক্ত স্বরে কহিলেন. "আর এম-এ পড়ে কাজ নেই! যে বিদ্যা হয়েছে তাই ধুয়ে জল খাও। অরু তোমাকে পড়াবে, তার দায় পড়েছে! আজ বাদে কাল সে রাজার জামাই হবে। ঘর-আলো-করা বৌ রেখে তার কাজ-কর্ম্ম রেখে সে আসবে রণকালীর খাঁড়ায় শাণ দিতে!"

লোটি শ্যামলা। সুমিত্রা রাগিলে তাহাকে রণকালী বলিতেন, ইহাতে লোটির কোন দুঃখ-পরিতাপ ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ মায়ের তিরস্কারের মধ্যে সেই রণ-কালীর উল্লেখ লোটি সহিতে পারিল না। তাহার হৃদয় ভারা-ক্রান্ত হইয়া চোখে জল আসিল। যে অরু তাহার নিতান্ত অবজ্ঞা-তাচ্ছিল্যের পাত্র, তাহার অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে লোটির হৃদয়ে পূর্ব্বেই মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল—এখন সেই মেঘ হইতে ঝর-ঝর ধারে বারি ঝরিতে লাগিল।

মা তীর-নিক্ষেপ করিলেন; বাবা তীরবিদ্ধ বালিকাকে বুকে চাপিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "ছি লোটি, মায়ের কথায় কি কাঁদে? মায়েরা অমনি করেই বলেন। তুমি পড়তে চাইলে অরু নিশ্চয় তোমাকে পড়াতে আসবে।"

"আমি পড়তে চাইনে, কারো আসাও চাইনে।" বলিয়া লোটি সবেগে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। মজুমদার সাহেব ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "দেখ, লোটিকে তুমি যা-তা বলো না—তোমার কাছে এই আমার অনুরোধ। লোটির বয়সের শিক্ষার বিচার করো না। ওর অন্তঃকরণ এখনো শিশুসুলভ। যে ক'টা দিন জ্ঞান-বৃক্ষের ফলের আস্বাদ না পায়, সে ক'টা দিন ওকে শান্তিতে থাকতে দাও। লোটিকে আমি বড় আদরে-যত্নে বাড়তে দিয়েছি।"

সুমিত্রা অতিশয় অপ্রতিভ হইলেন। লোটি তাঁহাদের প্রথম সন্তান—কত স্নেহে-মমতায় তাঁহারা উহাকে প্রতি-পালন করিয়াছিলেন। মাতা-পিতার স্নেহ-সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত সে বিকশিত হইয়াছে। তাহার জন্মের বহু পরে তিতু-মিতুর আর্বিভাব হইলেও লোটি সকলের উপরে।

সুমিত্রা কুণ্ঠার সহিত বলিলেন, "আদর-যত্নে তুমি একা ওকে মানুষ করোনি—আমিও করেছি। করেছি বলেই ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশী ভাবনা হয়। ওকে সাধারণ লোকে বুঝবে না, চিনবে না বলেই অরুকে আমি মনে-প্রাণে চেয়েছিলাম। তোমাদের স্বয়ম্বরার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা কখনো জানতে দিইনি। অরু স্থির শান্ত, চরিত্রবান্, সে ওকে ঠিকমত চালনা করতে পারতো—লোটি তাকে নিতে পারলে না, সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিলে, এ যে আমার কত দুঃখের, তা তোমাকে বলতে চাইনে।"

"দুঃখ করো না, লোটির ভাল হবে। তোমার আমার আশীর্ব্বাদ বৃথা হবে না।" বলিয়া মজুমদার সাহেব মেয়ের সন্ধানে গেলেন।

৩

রাত্রে লোটির সুনিদ্রায় বোধ হয় ব্যাঘাত হইয়াছিল, তা না হইলে অত ভোরে সে কখনো বিছানা ছাড়ে না! মা সবে ভাঁড়ারে ঢুকিয়াছেন। মেয়ে দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মা, বেয়ারা কোথায়? তাকে আমি এক-বার ওদের বাড়ীতে পাঠাব।"

মা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাদের বাড়ী?"

"জ্যেঠা-মণির বাড়ী।"

"অরুর বিয়ের সব খবর ভাল করে জানাবার জন্যে বুঝি তাকে চিঠি লিখ্‌ছিস? আমি বলি, চিঠি না পাঠিয়ে তুই কাকেও সঙ্গে নিয়ে ওদের বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আয়। কত দিন সেখানে যাসনে, গেলে তোর জ্যেঠামণি মা-মণি কত খুশী হবেন। রাজকুমারীর ফটো বোধ হয় এসেছে, গিয়ে দেখে আয়, নামও শুনে আয়?"

লোটি ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপ জবাব দিল, "না"।

মা আর কিছু না বলিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

মজুমদার সাহেব ছেলে-মেয়েদের লইয়া টেবিলে খাইতে ভালবাসিতেন। সুমিত্রা স্বামীর অনেক কিছু অভ্যাস ছাঁটিয়া-কাটিয়া এটা বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি সাম্‌নে থাকিয়া সকলের খাওয়ার তদ্বির করিতেন, নিজে সঙ্গে খাইতেন না। পিতার দক্ষিণে লোটির স্থান, বামে তিতু-মিতুর।

ফুলকপির ডালনা দিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে লোটি ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানে কহিল, "দেখ বাবা, তোমরা কেবল আমারি দোষ দেখ—জ্যেঠামণির ছেলের রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে, তাতে তাকে তো আমার আনন্দ জানানো উচিত! আমি অরু বাবুকে চিঠিতে তা জানিয়ে এ বেলা এখানে চা খেতে ডেকেছিলাম। ও এমন অভদ্র যে আমার চিঠির কোন উত্তর না দিয়ে বেয়ারাকে বলে দিয়েছে—'দশটায় আমার ক্লাস নিতে হবে, যেতে পারবো না'। সাধে কি আমি দেখতে পারি না—

শঙ্কর হীরক প্রবীর বাবু—ওরা কিন্তু এমন নয়। আমি না ডাকতেই হাজির—ডাকলে নিজেদের হাজার কাজ ফেলে রেখে ছুটে আসে। তাদের সঙ্গে মিশি বলে মার যত রাগ! মেশার অযোগ্য হলে—তাকে যে বাদ দিতে হয়, মা সেটা মানতে চান না।"

মজুমদার সাহেব মাছের কাঁটা বাছিতে বাছিতে বলিলেন, "তুমি তাকে ডাকো না, তাই সে রাগ করে আসেনি। তোমারই উচিত তার রাগ ভাঙ্গানো। রবিবারে তার ছুটী, আমি পেট্রোলের যোগাড় করে দিচ্ছি—তুমি তাকে বেড়ানোর নেমন্তন্ন করো—সে আসবে।"

ভ্রমণের আনন্দে লোটির ঘন কালো আঁখি-তারকা আনন্দে নাচিতে লাগিল। সে মজুমদার সাহেবের গা ঘেঁষিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল হাস্তে বলিল, "তুমি পেট্রোল পাবে,—কি মজা, বাবা! আমি খেয়ে উঠে সকলকে চিঠি লিখবো। সত্যি বাবা, তুমি খুব ভাল, পেট্রোল কিন্তু বেশী করে চাই—আমি যাব দূরে—অনেক দূরে।"

তিতু-মিতু জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের নিয়ে যাবে তো দিদি? আমরাও বেড়াতে যাব।"

দিদি ভ্রূভঙ্গী করিয়া ছোট ভাই দু'টিকে ধমক দিল, "হাঁ, একরত্তি ছেলে সব বেড়াতে যাবি কি? চার দিকে সোলজারদের গাড়ী, যুদ্ধের সরঞ্জাম—এ সময় কেউ না কি ঘরের বার হয়?"

তিতু-মিতু ক্ষুণ্ণ হইয়া নীরবে খাইতে লাগিল। মা মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

রবিবার আসিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না।

সে-দিন প্রভাতে লোটির বন্ধুদের আগমনে চায়ের টেবিলে ঝড় বহিতে লাগিল। আকাশে কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির লেশও ছিল না। প্রকৃতির প্রফুল্ল প্রসন্ন মূর্তি—অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি—শীতের জড়তা তখনো হেমন্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

সকলের শেষে অরু আসিয়া আসরে অবতীর্ণ হইল। লোটির হৃদয় আজ আনন্দে-উৎসাহে পূর্ণ—পুলকের দক্ষিণ সমীরণে অরুর প্রতি তাহার বিরাগ-বিদ্বেষ ক্ষণকালের নিমিত্ত মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল।

লোটি অরুকে সাদরে আহ্বান করিল, "এস, এস—এ ধারের চেয়ারে এসে বসো। তোমার চা ঢেলে দিচ্ছি—তোমাকে না ভোরে আসতে বলেছিলাম। এত দেরী করলে কেন? দেখ দেখিনি বাইরে চেয়ে চার দিকে রোদে ভরে গেছে! এঁরা সবাই তোমার জন্তেই অপেক্ষা করছেন।"

অরু হাসিয়া বলিল, "আমার জন্ম অনর্থক বোসে না থেকে তোমরা বেরিয়ে পড়লেই পারতে। আমি নিতান্ত ভেতো বাঙ্গালী। আমার কি সময়ের জ্ঞান আছে? এ অকেজো অভাজনকে বর্জ্জন করে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

শঙ্কর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল, "আর বিনয়ে দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে। আজকের উৎসবের তুমি হলে পাণ্ডা! একটা গোটা রাজত্ব তার সঙ্গে রাজকুমারীকে শিকার করতে যাচ্ছ, তাই তোমাকে অভিনন্দিত করতে মিস্ মজুমদার এই আয়োজন করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও তোমাকে আমাদের আন্তরিক আনন্দ জানাচ্ছি।"

হীরক বলিল, "আপনি মহা ভাগ্যবান্ অরু বাবু! শুনেছি, আপনার ভাবী পত্নী যেমন রূপসী, তেমনি বিদুষী! আপনার সৌভাগ্যকে আমি সাধুবাদ দিচ্ছি।"

প্রবীর কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, "বড় সুখী হয়েছি অরু বাবু, আমার অকৃত্রিম প্রীতি আপনাকে নিবেদন করছি।"

সকলের আনন্দের অভিনয়ে লোটির উল্লাসের দীপ্তি সহসা যেন নিবিয়া গেল। সে অরুর দিকে চাহিয়া বিবর্ণ বিরস স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি অলিকপুরের রাজকুমারীর নামটা জানতে চেয়েছিলাম, তা আমাকে তুমি একছত্র লিখেও জানালে না! নাম জানলে হয়তো চিনলেও চিনতে পারতাম।"

অরু কহিল, "তাঁকে চিনবে কি করে? তিনি তো কখনো স্কুল-কলেজে পড়েননি। প্রাইভেট পড়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন।"

শঙ্কর কহিল, "এঁর নাম জানতে চাওয়া সত্ত্বেও তুমি নাম জানাওনি, এ তোমার ভারী অন্যায় হয়েছে। প্রাইভেট পড়লেও গেজেটে পাশের নাম বেরিয়েছে তো! পর্দানসীন রাজকুমারীর নামটাও কি পর্দানসীন?"

শঙ্করের বলিবার ভঙ্গীতে সকলেই কৌতুকের হাসি হাসিল—লোটি সে-হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

স্নিগ্ধ দৃষ্টি বারেক লোটির সর্বাঙ্গে বুলাইয়া অরু উত্তর করিল, "নাম কারুর পর্দানসীন নয়। তাঁর নাম হলো কল্পনা।"

শঙ্কর কহিল, "পদবী?"

হীরক বলিল, "রাজা রাজকুমারীর নামের সমুদ্রে আপনি কি তলিয়ে গেছেন? আর কিছু জানবার দরকার বোধ করেননি?"

প্রবীর জিজ্ঞাসা করিল, "চোখে দেখেছেন? না, বাঁশী শুনেই পাগল হয়েছেন?"

"দেখেছি বৈ কি! শুধু বাঁশী শুনে নয়।" বলিয়া অরু লোটির ম্লান মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় সকলের রহস্যালাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়া মজুমদার সাহেব আসিয়া আসরে উপনীত হইলেন।

মজুমদার সাহেব সকলকে তাড়া দিয়া বলিলেন, "বেলা

ন'টা বাজে—গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, তোমাদের খাবার জল সব গাড়ীতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবেলা যদি তোমরা বেরুতে না চাও, তা হলে এখানেই স্নান সেরে দু'টো ভাত খেয়ে নিয়ে তার পর বেরিয়ো।"

সকলে চায়ের টেবিল ছাড়িয়া তাড়াহুড়া করিয়া মোটরে গিয়া বসিল।

মজুমদার সাহেব গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া লোটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোন্ দিকে যাওয়া ঠিক করেছ ?"

লোটি নির্লিপ্ত উদাস স্বরে উত্তর করিল, "তা তো ঠিক করিনি বাবা।"

হাসির মৃদু গুঞ্জনের সহিত তিন বন্ধু তিনটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—বারাকপুর, দমদম, শিবপুর। লোটি সকলের সকল সমস্যার সমাধান করিয়া সোফার রামেশ্বরকে আদেশ করিল—"গঙ্গার ধার দিয়ে খিদিরপুরে চলো।"

রাজপথের ধূলা উড়াইয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

৪

খিদিরপুরে লোকে লোকারণ্য। যত না মানুষ, ততোধিক গাড়ী গোরু লরির বিপুল সমারোহ। বড় বড় মাল-বোঝাই জাহাজে গঙ্গাবক্ষ আচ্ছন্ন।

এক ছায়াবহুল বট-গাছের নীচে গাড়ী রাখিয়া সকলে নামিয়া পড়িল। কেবল নামিল না বিমনা লোটি। নাকে সুগন্ধ-সুবাসিত রুমাল চাপিয়া সে বন্ধুদের আগ্রহে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "মা গো, এর ভেতরে আমি নামতে পারবো না, আমার গা ঘিন-ঘিন করছে। চলুন সকলে আগে ফাঁকায় গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

ফাঁকায় আর যাওয়া হইল না। অকস্মাৎ চারি দিক সচকিত সকম্পিত করিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে 'সাইরেন' বাজিয়া উঠিল।

ব্যাধভয়ে ভীত মৃগের মত দলে দলে লোক বস্তীর দিকে তাঁবুর দিকে প্রাণভয়ে ছুটিতে লাগিল।

শঙ্কর হীরক প্রবীর শুষ্ক স্বরে চিৎকার করিয়া কহিল, "নেমে আসুন মিস্ মজুমদার, শীগ্গির নেমে আসুন। ওই যে জাপানী প্লেন দেখা যাচ্ছে! চলুন কুলি-বস্তিতে যাই।

স্থির শান্ত ভাবে লোটি কহিল, "ও ব্যারাকে গিয়ে ইঁদুরের মত অপঘাতে মরার চেয়ে এখানে মরা ঢের ভাল। আপনারা যান, আমি গাড়ীতে বেশ আছি।"

লোটির মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিন বন্ধু যে কোথায় সরিয়া গেল, কাহারো আর সন্ধান মিলিল না। যাহাকে লোটি কখনো বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে নাই, সেই কেবল না সরিয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিল।

লোটি বলিল, "তুমি যে গেলে না ? যাও, চলে যাও, নিজের প্রাণ বাঁচাও। আমার কাছে থাকতে হবে না, আমার কাকেও দরকার নেই। রামেশ্বরকে দেখ্ছি না, সে-ও কি ওদের সঙ্গে চলে গেছে ?"

বেহারী রামেশ্বর মোটরের তলা হইতে সাড়া দিল, "জী হুজুর, হাম হাজির হায়।"

প্রভুভক্ত ভৃত্যের হাজিরের অবস্থা দেখিয়া লোটি ও অরু হাসিতে লাগিল,—কিন্তু তাহাদের হাসি অধিক কাল স্থায়ী হইল না। সহসা প্রলয়ের বিষাণের সহিত শত-সহস্র বিদ্যুতের জ্বালা লইয়া ঊর্দ্ধ হইতে বিশ্বধ্বংসকারী অগ্নিগোলক নিম্নে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ইহার পরের ঘটনা লোটি জানে না।

* * *

মধ্যাহ্নে লোটির লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সে তাকাইয়া দেখিল—মোটরের গদিতে সে শুইয়া আছে, নিকটে অরু। রামেশ্বর গাড়ীর অনতিদূরে গাছ-তলায় বসিয়া। খিদিরপুর ছাড়িয়া তাহারা এ কোথায় আসিয়াছে ? জনশূন্য বসতিশূন্য ছায়া-স্নিগ্ধ এক মাঠের মধ্যে। সম্মুখে মজিয়া-যাওয়া নদীর ক্ষীণ স্রোত-ধারা ঝির-ঝির করিয়া বহিতেছে। গভীর অরণ্যের মধ্য হইতে বন-বিহগের করুণ কাকলি প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নের অলস বায়ু-তরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে।

লোটি উঠিয়া বসিতে পারিল না। শিহরিয়া গদির গায়ে হেলিয়া পড়িল।

অরু তাহার জলসিক্ত চুলগুলি সুন্দর সুগঠিত কপালের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া সস্নেহে কহিতে লাগিল, "ভয় কি লোটি ? ভয়ের আর কিছু নেই। বোমার শব্দে তোমার ফিট হয়েছিল, তাই তোমাকে নিয়ে এতক্ষণ বাড়ী যেতে পারিনি। কাকা বাবু, কাকীমা না জানি কত ব্যাকুল হয়ে আছেন,—রাস্তা থেকে তাঁদের ফোন করে দেব। এইবার আস্তে আস্তে গাড়ী চালিয়ে চল আমরা যাই।"

লোটি চুপে চুপে বলিল, "আর একটু বাদে যাব, এখনো আমার মাথা ঝিম্-ঝিম্ করছে। তুমি সঙ্গে আছ—বাবা-মা খুব ব্যস্ত হবেন না। আজ আমি জানতে পেরেচি, তুমি সঙ্গে না থাকলে ওদের সঙ্গে বাবা-মা আমাকে কেন ছেড়ে দিতে চাইতেন না। ওদের সঙ্গে তোমার তফাৎ কত, আজ আমার জানতে বাকী নেই। না জেনে না বুঝে আমি তোমার কাছে যে অন্যায় করেছি, তুমি তা মাপ করতে পারবে ?"

"ছিঃ লোটি, এ কি বলছ! অন্যায় কিসের ? মাপই বা কিসের ?"

"আমার কত অন্যায়, তুমি জানো না। আমি কেবলি ভাবছি, এর পরে আবার যদি বেড়াতে বেরুই, আবার যদি বোমা পড়ে, তাহলে আমকে এমন করে রক্ষা করবে কে ? কল্পনা এলে তুমি কি আমার ডাকে আর আসবে ?"

"কেন আসবো না লোটি ? আমাকে তোমার দরকার হলে আমি তোমার কাছে-কাছেই থাকবো।"

আবেগে আবেশে লোটি উঠিয়া বসিল। অরুর একখানা হাত মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল; "সত্যি তুমি আমার কাছে থাকবে? কল্পনা কি থাকতে দেবে? আমি ওদের কাকেও চাই না, তোমাকে চাই! কিন্তু কল্পনা—"

অরু লোটির ধরা হাতে একটুখানি চাপ দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কল্পনা থাকুক, তুমি তা হলে আজকে স্বয়ম্বরা হলে—কেমন?"

"তোমার সঙ্গে তো হতেই চাচ্ছি কিন্তু কল্পনা—" লোটি আর বলিতে পারিল না। মুখ নত করিল।

অরু তাহার নত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া স্নিগ্ধ-কোমল স্বরে কহিতে লাগিল, "তোমার ভয় নেই লোটি, কল্পনা 'কল্পনাই।' আমার দোষ নেই, তোমার বাবা আর আমার বাবা দুই বন্ধু পরামর্শ করে কল্পনা রচনা করেছিলেন। আমি করেছিলাম স্বয়ম্বর-সভায় তোমাকে কামনার কল্পনা!"

এতক্ষণে লোটির ক্লান্ত-করুণ মুখে যৌবনের আগুনের আভা লাগিল।

শ্রীগিরিবালা দেবী

ভারতের পঞ্চম যুদ্ধ-বাজেট

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক দুই-দুই বার প্রত্যাখ্যাত, রাষ্ট্রসভা কর্ত্তৃক গৃহীত এবং বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া ভারতের পঞ্চম যুদ্ধ-"বাজেট"-সম্পর্কিত আইনের পাণ্ডুলিপি (Finance Bill) আইনে পরিণত হইয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদের প্রত্যাখ্যান অর্থনৈতিক কারণে নয়; রাজনৈতিক কারণে! স্বায়ত্ত-শাসনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নাই, রাজস্ব নিয়ন্ত্রণের অধিকার নাই, আয়-ব্যয় বরাদ্দ আমাদের আয়ত্ত-বহির্ভূত; অথচ, আমাদিগকে আমলাতন্ত্র কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট নির্দ্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত ঋণভার, করভার ও ব্যয়ভার মঞ্জুর করিতে হইবে! এই অসঙ্গত অসমীচীন ও অস্বাভাবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতের মনোনীত জাতীয় প্রতিনিধিগণের তীব্র প্রতিবাদ—যুদ্ধ "বজেটের" দুই-দুই বার প্রত্যাখ্যান!

কেন্দ্রীয় পরিষদের "বাজেট" বিতর্ক অধিবেশনে বিভিন্ন সভ্য ভারতের পঞ্চম যুদ্ধ-"বাজেট"কে বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। মুস্লিম লীগের সম্পাদক স্যার ইয়ামিন্ খাঁ বলিয়াছেন—Hopeless—নৈরাশ্যপ্রদ; বোম্বাইএর সুপ্রসিদ্ধ যমুনাদাস মেটা বলিয়াছেন—Bold and bloody—রূঢ় এবং নৃশংস; মান্দ্রাজের কৃষ্ণমাচারী বলিয়াছেন—Bullish—স্বৈরী; পঞ্চনদের সর্দ্দার মঙ্গল সিং বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন—Pickpocket—পকেটমার। রাষ্ট্রসভার সভ্য বিহারনিবাসী হুসেন ইমাম সাহেবের ভাষা আরও তীব্র। তিনি বলিয়াছিলেন—There is no word to apply to the budget except robbery—একমাত্র লুঠ ব্যতীত আর কোন কথাই এই বাজেটের প্রতি প্রযুজ্য নহে। সভাপতি Robbery শব্দটিকে পরিষদে ব্যবহারোপযোগী নহে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলে ইমাম সাহেব বাজেটকে Dishonest অসাধু আখ্যা প্রদান করেন। সুতরাং ভারতের পঞ্চম যুদ্ধ-বাজেট যে কোন সম্প্রদায়েরই অনুমোদন লাভ করে নাই তাহা নিশ্চিত। গত দুই বৎসরে যুদ্ধ-ব্যয়ের অপরিসীম বৃদ্ধিহেতু কর-বৃদ্ধি, ঋণ-বৃদ্ধি এবং আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা বৃদ্ধি ইহার বিশেষত্ব।

ভারতের পঞ্চম যুদ্ধ-বাজেট অর্থাৎ অগ্রিম আয়-ব্যয় হিসাব-বিবরণী যে বিপুল ঘাটতি প্রকট করিবে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘাটতিকে মাত্র বিপুল আখ্যা দিলেই ইহার বিষম বিপুলতা উপলব্ধি হয় না। বস্তুতঃ, বিগত (১৯৪৩-৪৪) এবং বর্ত্তমান (১৯৪৪-৪৫) উভয় বৎসরের ঘাটতির পরিমাণ আমাদিগকে বিমূঢ় করিয়া দেয়। ভারতের আয়ের তুলনায় যুদ্ধ-ব্যয়-ঘটিত ঘাটতি মাত্র বিপুল নহে; পরন্তু মারাত্মক;—আমাদের সাধ্যাতীত। দুই বৎসর যুদ্ধ-ব্যয়ের বৃদ্ধি ছয় শত কোটিরও উর্দ্ধে এবং ঘাটতির পরিমাণ প্রায় তিন শত কোটি টাকা!

গত ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের ঘাটতির পরিমাণ ১২.৪৩ কোটি। এই বৎসরের রাজস্ব বাজেটে অনুমিত অঙ্ক অপেক্ষা ৩৫.৫০ কোটি অধিক না হইলে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইত ১২৭.৯৩ কোটি টাকা! বর্ত্তমান ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের ঘাটতির অঙ্ক ৭৮.২১ কোটি। ইহার সহিত ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের সংশোধিত হিসাবে রাজস্বের বৃদ্ধি ৩০.৪৭ কোটি টাকা যুক্ত হইলে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইত ১০৮.৬৮ কোটি টাকা! যাহা হউক, ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের ১২.৪৩ কোটি এবং ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের ৭৮.২১ কোটির সহিত ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দের নিট্ ঘাটতি ১১২.১৭ কোটি যোগ দিলে তিন বৎসরের ঘাটতি দাঁড়ায় ২৮২.৮১ কোটি টাকা! এই অঙ্ক যুদ্ধ-পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকারের যে আয় ছিল, তাহার দ্বিগুণেরও অধিক! ঘাটতির এই ক্রমবৃদ্ধি অবশ্য যুদ্ধব্যয়হেতু। যুদ্ধ-পূর্ব্বে ভারতের মৌলিক সংরক্ষণ ব্যয় বরাদ্দ ছিল মাত্র ৩৬.৭৭ কোটি! আজ এই অঙ্ক বর্ত্তমান সংরক্ষণ বাজেটের শতকরা ১৫ অংশ মাত্র! পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত বৎসরের বাজেটে অর্থ-সচিব সংরক্ষণ বাজেটকে রাজস্ব ও মূলধন-মূলক (Revenue and Capital)—এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। এই দুই ভাগের একুন অঙ্কের হিসাব ধরিলে মৌলিক সংরক্ষণ বাজেট বরাদ্দের শতকরা অংশ ১৫ হইতে ১২ সংখ্যায় নামিয়া যায়।

সঠিক অঙ্কে প্রকাশ করিলে অতীত বর্ষের (১৯৪৩-৪৪) সংশোধিত সংরক্ষণ বাজেট রাজস্ব ও মূলধনমূলক উভয় বিভাগের একুনে দাঁড়ায় ৩০১ কোটি টাকা। বর্ত্তমান (১৯৪৪-৪৫) বর্ষের অঙ্কও ঐরূপ। সুতরাং দুই বৎসরের সংরক্ষণ ব্যয়ের সমষ্টি ৬০০ কোটি

টাকা ! ইহার মধ্যে ভারতের যুদ্ধ প্রয়োজনে গত বৎসরের সংশোধিত হিসাবের অঙ্ক ২০৪.৫৩ কোটি এবং চলতি বৎসরের আনুমানিক অঙ্ক ২১৫.৫৮ কোটি। গত বৎসরের অঙ্ক-বাজেটে-ধৃত সমষ্টি হইতে ৭৭.৫২ কোটি অধিক এবং চলতি বৎসরের বাজেটে-ধৃত অঙ্ক গত বৎসরের সংশোধিত সমষ্টি হইতে ১১ কোটি বেশী। গত বৎসরের বাজেটে-ধৃত (Original) এবং সংশোধিত (Revised) সংরক্ষণ ব্যয়ের এই বিস্তৃত ব্যবধান কয়েকটি কারণে ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান কারণ, বিমান বাহিনীর বিস্তার। কথা ছিল, এই ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ ভারত সরকারকে বহন করিতে হইবে ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র ব্যয়ই ভারতের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। অজুহাত এই যে, এই ব্যয় ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত সমষ্টি (Ceiling) অপেক্ষা কম। সুতরাং ভারতীয় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের মতে গত বৎসরে প্রবর্দ্ধিত বিমান বাহিনী ভারতের স্থানীয় সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয়। অনুরূপ অজুহাতে ভারতে বিমান-ক্ষেত্রাদি নির্ম্মাণার্থ যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহারও পূর্ণাংশ ভারতকে বহন করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে অবশ্য ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, ইহারও অর্দ্ধেক ভারতের অংশে পড়িবে। বর্ত্তমান বিধান ভারতের সহিত যুক্তরাজ্যের যুদ্ধ-ব্যয় সংক্রান্ত বাঁটোয়ারার ব্যতিক্রম ঘটায় নাই। এই আর্থিক বাঁটোয়ারার (Financial Settlement) বিধান এই যে, ভারতের ভৌগোলিক সীমার অভ্যন্তরে ভারতের সংরক্ষণ প্রয়োজনে যে ব্যয় ঘটিবে, তাহা ভারতকে বহন করিতে হইবে। মোট ব্যয়ের অবশ্য একটি শীর্ষ-সীমা (Maximum limit in ceiling) নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সীমা নির্দ্ধারণ করেন ভারতের জঙ্গীলাট। এই নিরিখ নির্দ্ধারণের সময়ে জঙ্গীলাট বাহাদুরের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সামরিক প্রয়োজনের দিকে। সুতরাং এই ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়ভার বহিবার সামর্থ্য ভারতের আছে কি না, তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় না। ইহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই যে, গত দুই আর্থিক বৎসরে (১৯৪৩—৪৫) যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রাপ্ত ইজারা-ঋণান্তর্গত দ্রব্যসামগ্রী এবং পরিচর্য্যার (Goods and services) বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রকে আদান-প্রদান-মূলক সাহায্যকল্পে ৭০ কোটি পরিমিত প্রকাণ্ড দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। রহস্যের বিষয় এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের এই ইজারা-ঋণ-সরবরাহের উপকারিতা সম্বন্ধে ভারতের অর্থ-সচিব এখনও সন্দিহান !

ভারতের বাজেট-নির্দ্ধারিত অ-সামরিক ব্যয় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য খুবই সামান্য। এই ব্যয়ের নির্দ্ধারণ জাতীয় সমুন্নতি বিধানের পরিবর্ত্তে শাসন-সৌকর্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। তথাপি আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, দুর্ভাগ্য ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত বাঙ্গালার আর্ত্তনাদে ভারতের অর্থ-সচিব সমুচিত কর্ণপাত করিবেন। গত বৎসরের প্রচণ্ড ব্যয়ের প্রশমনকল্পে তাঁহার সাহায্যের পরিমাণ ৩ কোটি টাকা এবং চলতি বৎসরের জন্য মাত্র ১.৫ কোটি টাকা ! শুধু তাহাই নয়, ভারতের অর্থ-সচিব বিধান দিয়াছেন যে, আয়ের চেয়ে যে-দেশের ঋণ-সমষ্টি কম, সে দেশকে কখনই অতি-বিপন্ন বলা যায় না। বাঙ্গালার বার্ষিক আয় ২২ কোটি টাকা এবং তাহার ঋণ-ভার ১৪ কোটি টাকা মাত্র। সুতরাং বাঙ্গালা কেন্দ্রীয় খয়রাৎ ব্যতীত আত্ম-প্রচেষ্টায় অনতিবিলম্বে আয়-ব্যয়ের সমতা সম্পাদন করিতে সমর্থ। ভারতের অর্থ-সচিব একবার হিসাব করিয়া দেখিবেন কি, কেন্দ্রীয় সরকার কত রাজস্ব বাঙ্গালা হইতে শোষণ করেন ? তাঁহার ৪.৫ কোটি টাকা সাহায্যের বিনিময়ে তিনি বাঙ্গালাকে তাহার প্রদেয় দায় হইতে মুক্তি দিবেন কি ? সকলেই জানেন যে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কারের পরে মেষ্টন-বাটোয়ারা (Meston Award) বাঙ্গালার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কারের পরে নিমেয়ার-বাটোয়ারা তাহার কিঞ্চিৎ প্রশমন করিয়াছিল। বাঙ্গালা বহু বর্ষ ধরিয়া বহু অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারকে যোগাইয়াছে, আজ বাঙ্গালার অতি দুর্দ্দিনে কেন্দ্রীয় সরকার তাহার প্রতি বিমুখ ! সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙ্গালা আজি নরকঙ্কালে পরিপূর্ণ !

এখন আমরা ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত অর্থ সচিবের নূতন কর-ধার্য্য নীতি ও রীতির আলোচনা করিব। ঘাটতি হিসাবে ভারতের বর্ত্তমান বাজেট পঞ্চম ; কিন্তু কর-বৃদ্ধি হিসাবে ইহা দশম। অর্থ-সচিব চা, কাফি ও সুপারীর উপর পাউণ্ড (অর্দ্ধ সের) প্রতি দুই আনা হিসাবে তিনটি নূতন কর-ধার্য্য করিয়াছেন। চা আজ সর্ব্বজন-প্রিয়। চা-পানের বিরুদ্ধে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রচণ্ড প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চা-এর ব্যবহার বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। চা শুধু তৃষ্ণা নয় ; চায়ে ক্ষুধা নিবারণ করে। তাহার উপর চায়ে শ্রমক্লান্তি এবং অবসাদ ঘোচে— ক্ষণেকের জন্য মনও প্রফুল্ল হয়। এ জন্য ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে শ্রমশীল মাত্রেরই চা খুব প্রিয় পানীয়ে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং চা-এর উপর কর নির্দ্ধারণ করিলে দীন-দরিদ্রের উপর পীড়ন ঘটে। চা-এর মত সুপারীও ধনী-নির্দ্ধন-নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রেরই প্রিয় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য সম্ভোগ-দ্রব্য। তামাকও তাই ; সুতরাং তামাকের উপর উৎপাদন শুল্কের (Excise) দ্বিগুণ বৃদ্ধিতে দরিদ্রগণ নিপীড়িত হইবে। এগুলি হইল পরোক্ষ (indirect) কর।

প্রত্যক্ষ (direct) কর সম্পর্কে যাহাদের বার্ষিক আয় দুই হাজার টাকার কম, তাহাদিগকে আয়-কর হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া অর্থ-সচিব স্বল্পবিত্ত চাকুরীজীবী সম্প্রদায়ের মহৎ উপকার করিয়াছেন। পূর্ব্বে দেড় হাজার টাকার উপর আয়কর ধরিবার ব্যবস্থা ছিল। এখন দুই হাজার টাকার কম আয়ের উপর আয়-কর দিতে হইবে না। দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়ের কর সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই ; কিন্তু বাধ্যতামূলক ভাবে আয়-কর জমা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দশ হাজার টাকার অধিক আয়ের উপর বাড়তি করের (Sur-charge) হার ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হইয়াছে। দশ হাজার হইতে পনেরো হাজার পর্য্যন্ত বাড়্তি কর ষোল পাই হইতে বাড়াইয়া ১৮ পাই করা হইয়াছে এবং ইহা মৌলিক (basic) ২৪ পাই হারের উপরে। পনর হাজার টাকার আয়ের উপর কুড়ি পাই হইতে বাড়াইয়া ২৪ পাই করা হইয়াছে এবং ইহাও মৌলিক ত্রিশ পাই হারের উপর। এই শেষোক্ত হার কোম্পানী সমূহের উপর এবং যে সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ হারে (Maximum rate) আয়-কর আদায় করা হইবে, সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাধ্যতামূলক "যত্র আয় তত্র দান" (Pay as you earn) ব্যবস্থায় করদাতা ত্রৈমাসিক আয়-কর অগ্রিম দিবেন এবং তাহার উপর শতকরা দুই টাকা হারে সুদ পাইবেন। বর্ত্তমান আমদানী-শুল্কের উপর যে শতকরা কুড়ি টাকা বাড়্তি কর (Surcharge) ধার্য্য আছে, তাহা আরও এক বৎসর কাল স্থায়ী থাকিবে।

তামাক ও সুরাসারের (Spirits) বাড়্তি কর এক-পঞ্চমাংশ হইতে অর্দ্ধ অংশে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

সর্ব্বোচ্চ করের (Super Tax) ক্ষেত্রে ৩৫,০০০৲ হইতে দুই লক্ষের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাড়্তি দায়ে (Central-sur-charge on the slab) অর্দ্ধ আনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সমিতি কর (Corporation Tax) এক আনা হইতে বাড়াইয়া তিন আনা করা হইয়াছে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট হারে প্রদত্ত লভ্যাংশ ব্যতীত কোন কোম্পানীর যে-পরিমিত টাকা বিতরিত হইবে না, তাহার উপর টাকা-প্রতি এক আনা হারে আসান (Rebate) দেওয়া হইবে। বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে এই বিশেষ নিয়ম করা হইয়াছে যে, তাহাদের সম্মিলিত আয় ও সর্ব্বোচ্চ কর টাকা প্রতি ৬৩ পাইতে সীমাবদ্ধ থাকিবে। এই ব্যবস্থা ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দেও প্রযোজ্য; অতিরিক্ত লাভ-করের (Excess profits Tax) বর্ত্তমান শতকরা সাড়ে ৬৬ অংশ হারের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। উহার ফিরতী (Refund) দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে তাহারও কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান অতিরিক্ত আয়-করের যে এক-পঞ্চমাংশ সরকারের নিকট বাধ্যতামূলক ভাবে জমা রাখার ব্যবস্থা আছে, তাহার উপর টাকা-প্রতি আরও ১৯ পয়সা জমা রাখা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, অতিরিক্ত লাভের উপর অতিরিক্ত কর এবং অবশিষ্ট লাভের উপর আয় ও সর্ব্বোচ্চ কর প্রদানের পর উদ্বৃত্ত অর্থকে আটক রাখা হইবে, যাহাতে সেই টাকা বাজারে বিস্তৃত হইয়া দ্রব্য-মূল্যের বৃদ্ধি ঘটাইতে না পারে। এই অতিরিক্ত জমা অগ্রিম অনিশ্চিত কর-নির্দ্ধারণ (Provisional assessment) সম্পর্কে। ইহাতে কি সুবিধা হইবে তাহা আমরা সঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, ভারতে অতিরিক্ত লাভ-কর নিরূপণ-প্রণালী ভারতীয় শিল্পের অবস্থা ও প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীন। যুদ্ধের পর প্রদেশ সমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে অর্থসচিব অ-কৃষি (Non-agricultural) সম্পত্তির উপর মৃত্যুকর বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাব সমীচীন সন্দেহ নাই; কিন্তু জাতীয় শাসনতন্ত্র ব্যতীত বর্ত্তমান শাসন-যন্ত্রের হস্তে এই অর্থের অযোগ্য ও অযথা ব্যয়ের প্রচুর সম্ভাবনা। যাহা হউক, এই সকল ব্যবস্থার ফলে আমাদের চলতি বৎসরের ঘাট্তি ৭৮·২১ কোটি হইতে ৫৪·৭১ কোটিতে অবনমিত হইবে। অর্থাৎ নূতন ও বর্দ্ধিত করের দ্বারা লব্ধ ২৩·৫ কোটি টাকা দ্বারা আমাদের মোট ঘাট্তি শতকরা ৩০ অংশ মাত্র হ্রাস হইবে।

জাতীয় শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিলে জাতীয় শাসন পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল অর্থ-সচিব দীন-দরিদ্রের উপর নিষ্ঠুর ভাবে আপতিত কর-ভার পরিহার করিয়া ভারতের যথার্থ রাজস্বের অঙ্ক নির্দ্ধারণ করিতেন; এবং তদতিরিক্ত ব্যয়-ভার সার্ব্বভৌম শাসন-শক্তির স্কন্ধে অর্পণ করিতেন। এবং সেই ব্যবস্থাই সমীচীন হইত। শতকরা মাত্র ত্রিশ অংশ ঘাট্তি নূতন করের দ্বারা অপনীত না করিয়া অর্থসচিব সম্পূর্ণ ঘাট্তির পূরণ ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পাদিত করিতে পারিতেন। তাহাতে বর্ত্তমান পুরুষের উপর যে গুরুভার প্রদত্ত হইতেছে তাহার কথঞ্চিৎ প্রশমন হইতে পারিত। গত তিন বৎসরে যে ঘাট্তি নূতন অথবা বর্দ্ধিত করের দ্বারা পূরণ করা যায় নাই তাহার পরিমাণ ২৫৯·৩১ কোটি টাকা। ইহার বিপুলতা নিঃসন্দেহে ভীতিপ্রদ! ব্যয়সঙ্কোচের পরিবর্ত্তে সরকার অজস্র ব্যয় বৃদ্ধি করিতেছেন; ইহার শেষ নাই—সীমা নাই!

বর্ত্তমান বাজেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য চারটি। প্রথম, বিলাতের ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধব্যয় বণ্টনার্থ আর্থিক বন্দোবস্ত (Financial settlement)। এই ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় নূতন যুদ্ধ-পরিচালন অধিনায়কত্বের (South East-Asia Command) প্রতিষ্ঠায় ভারতের সংরক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধিও পায় নাই; হ্রাসও হয় নাই। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস ও ধারণা যে, যুদ্ধ-ব্যয়ের অংশ বণ্টনে ভারতের প্রতি গভীর অবিচার করা হইয়াছে। এত দিন যে ব্যয়ের বণ্টন স্থগিত রাখা হইয়াছিল, এখন তাহা ভারতের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। ভারতের আত্মসংরক্ষণ নিশ্চিতই ভারতের দায়িত্ব; কিন্তু বর্ম্মা-মালয় প্রভৃতির উদ্ধার-সাধন ভারতের স্বার্থের অনুকূল হইলেও সরাসরি ভারতের দায়িত্ব নহে। ভারতকে এ নিমিত্ত কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু সে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারেন, তেমন যোগ্য জাতীয় শাসনতন্ত্র ও অর্থ-সচিব কোথায়?

বর্ত্তমান বাজেটের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে অনুসৃত মুদ্রা ও মূল্যস্ফীতি নিবারণার্থ সরকারের বিভিন্ন বিলম্বিত প্রচেষ্টা। এই স্ফীতি নিবারণের দুইটি প্রধান উপায়:—কর-বৃদ্ধি এবং ঋণ-গ্রহণ। যুদ্ধব্যয় নির্ব্বাহার্থ যুদ্ধজনিত বৃত্তি-ব্যবসায়ে অকস্মাৎ লব্ধ আয়ের উপর কর-নির্দ্ধারণই সঙ্গত। যুদ্ধকালে প্রধানতঃ, রাষ্ট্রমাত্রেরই অবলম্বন যে তিনটি রাজস্ব,—অর্থাৎ আমদানী, রপ্তানী (Customs) ও অন্তর্দ্দেশীয় (Excises) শুল্ক এবং আয় (Income) কর,—তাহারই উপর চাপ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধির সহিত অর্থ-সচিব গত বৎসর তামাক ও বনস্পতি ঘৃতের উপর নূতন কর ধার্য্য করিয়াছিলেন। এ বৎসর তামাকের কর আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং চা, কাফি এবং সুপারীর উপর নূতন কর ধার্য্য করা হইয়াছে। এগুলি দীন-দরিদ্রের নিত্য প্রয়োজন। কিন্তু যখন আমদানী-রপ্তানী-শুল্কের হ্রাস ঘটে, এবং তাহার প্রত্যক্ষ কারণ স্বদেশী শিল্পের সমুন্নয়ন, তখন অন্তর্দ্দেশীয় শুল্কের প্রতি রাষ্ট্রপতিদের দৃষ্টি অনিবার্য্য! এ বিষয়ে আমাদের বর্ত্তমান অর্থ-সচিব ভবিষ্যৎ জাতীয় অর্থ-সচিবদের গতি-পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যুদ্ধকালে যুদ্ধ-ব্যয় অপেক্ষা যুদ্ধান্তে শান্তি-সংস্থাপন ব্যয় কোন ক্রমে ন্যূন নয়, বরং ক্ষেত্র-বিশেষে অনেক অধিক। সুতরাং লঘু করভারের দিন চিরতরে অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর করবৃদ্ধিই আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যফল। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সমুন্নয়ন দ্বারা দেশবাসীর বর্ত্তমান হীন ও ক্ষীণ জাতীয় জীবনধারাকে উন্নত করিতে হইলে করভার অথবা ঋণ-ভার কিংবা যুগপৎ উভয় ভারেরই বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। বিবেচনা করিতে হইবে, কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত কম ক্লেশকর! সঙ্গে সঙ্গে সরকারী দপ্তরখানার ব্যয়বাহুল্যতাকে বিশেষ খর্ব্ব করিতে হইবে। কিন্তু সে প্রচেষ্টার কোথাও ক্ষীণ আভাসমাত্র লক্ষিত হইতেছে না।

মুদ্রা ও মূল্য-স্ফীতি নিবারণার্থ সরকার প্রধানতঃ দুইটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন—মুদ্রা-বাহুল্য সঙ্কোচ ও দ্রব্য-মূল্য শাসন। কর-বৃদ্ধি, ঋণ-গ্রহণ এবং কিয়দংশে স্বর্ণ-বিক্রয় দ্বারা সরকার যুদ্ধজনিত কার-কারবারে অর্জ্জিত অতিরিক্ত অর্থকে নিষ্ক্রিয় রাখিয়া

বাজারে প্রাপণীয় স্বল্প পরিমিত দ্রব্যসামগ্রীর অযথা মূল্য-বৃদ্ধি নিবারণের প্রচেষ্টা করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রীকে সরকারী বণ্টনায়ত্তে আনিয়া দ্রব্য-মূল্যের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ; কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে এই নীতি সুফল প্রদান করে নাই ; ফলে মাল-বাঁধাই ও চোরা বাজারের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মুদ্রা ও মূল্যের অযথা বৃদ্ধির মূল কারণ আমরা পূর্ব্বে নির্দেশ করিয়াছি। ভারত হইতে মিত্রশক্তিগণকে প্রদত্ত যুদ্ধোপকরণাদির মূল্য বিলাতে ষ্টার্লিং-সংস্থিতিকে প্রবৃদ্ধ করিতেছে এবং এ দেশে তদ্বিনিময়ে কাগজের নোটের অযথা অবাধ প্রচলন ঘটিতেছে। ভারতে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বর্ণ বিক্রয় দ্বারা মিত্র কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের এখানকার ব্যয় কিয়ৎ পরিমাণে সরাসরি নির্ব্বাহ করিতেছেন বটে ; কিন্তু ইহাতেও ভারত প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার ফলে ভারতের রৌপ্যমুদ্রা ষ্টার্লিং-এর সহিত সংযুক্ত হয়। তখন স্বর্ণের মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। ভারতের দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোক তখন তাহাদের সমস্ত স্বর্ণ বিক্রয় করে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রই এখন সে স্বর্ণের অধিকারী। সম্প্রতি যুদ্ধের অভিঘাতে ভারতে স্বর্ণের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্তু যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণের মূল্য তদপেক্ষা অনেক কম। এখন যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে ভারতে প্রচলিত অত্যুচ্চ হারে স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থলাভ করিতেছেন। ইহা নীতি-বিরুদ্ধ। বলা বাহুল্য, ভারতের সর্ব্বনাশ-সমুৎপন্ন এই অর্থ কাহার ভাগে ও ভোগে লাগিতেছে, সে রহস্য অর্থ-সচিব তাঁহার বাজেট-বক্তৃতায় প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। স্বর্ণের বিনিময় মূল্য ৪৫৲ টাকা এবং ইহা যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ; অথচ তাঁহারাই এখন ৮০৲ টাকা মূল্যে ভারতে স্বর্ণ বিক্রয় করিতেছেন। এই স্বর্ণ, অনায়াসে নির্দ্ধারিত বিনিময়-মূল্যে ভারত সরকারকে দেওয়া যাইতে পারিত। বাজার প্রচলিত প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিবার সাধু উদ্দেশ্য তাহাতেও সফল হইত না কি ? এরূপ ভাবে স্বর্ণ বিক্রয় না করিয়া অধিকতর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ উচিত ছিল না কি ?

এইবার আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ গ্রহণ প্রকরণের সাফল্যের প্রতি মনোযোগ দিব। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে গত ১লা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ভারত সরকার ৫৪৭ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করিয়াছেন ; তন্মধ্যে ২৭১ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে শেষ বারো মাসে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী হইতে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সংরক্ষণ ঋণের পরিমাণ ১১৫ কোটি টাকা। ষ্টার্লিং ঋণের পরিবর্ত্তে ভারতীয় ঋণের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ অতি সন্তোষজনক। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই ঋণের পরিমাণ ১৩ কোটি টাকা। নিয়মিত সুদের পরিবর্ত্তে অর্দ্ধ-বাৎসরিক পুরস্কার সংশ্লিষ্ট তমসুকের (Prize Bonds) ফলাফল বাজেট দাখিলের পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই, তবে অল্প স্বল্প মিত সঞ্চয়ের সরকারী সংরক্ষণ ঋণে নিয়োজন (Invastment of small savings) বিশেষ আশাপ্রদ এবং এইরূপ স্বল্প সঞ্চয়কে অধিকতর পরিমাণে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত অর্থ-সচিব মফস্বলে দপ্তরী হিসাবে গোমস্তা নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রা ও মূল্যস্ফীতি নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় করবৃদ্ধি, ঋণ-গ্রহণ কিংবা স্বর্ণ-রৌপ্য বিক্রয় নহে। এই অনিষ্টের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। ভারতবর্ষ হইতে ক্রীত যুদ্ধোপকরণ ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য প্রদান মিত্রশক্তি কর্ত্তৃপক্ষের নিজস্ব দায়িত্ব হওয়া প্রয়োজন। যত দিন তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ টাকার ষ্টার্লিং বিনিময় মূল্যে বিলাতে জমা দিয়া ভারত সরকার তদ্বিনিময়ে অজস্র কাগজের নোট ছাপিয়া বাজারে ছাড়িবেন, তত দিন মুদ্রাস্ফীতি রুদ্ধ হওয়া অসম্ভব। কাগজের নোট ও রৌপ্য মুদ্রার বাজার প্রচলনের একটি সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। অজস্র কাগজের নোট ছাপিয়া এবং তথাকথিত রৌপ্য-মুদ্রার ধাতব মূল্যের হ্রাস করিয়া উভয়ের বাজার-সম্ভ্রম লঘু হইতে লঘুতর করিলে মুদ্রা-স্ফীতি ও মূল্য-স্ফীতি—এই সমস্ত অনিষ্টের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই ঘটিতে থাকিবে। মিত্রশক্তি সমূহ যত দিন সরাসরি ভারতের আর্থিক বাজারে ঋণ গ্রহণ না করিবেন এবং আমাদের বিলাতে সঞ্চিত ক্রমবর্দ্ধমান ষ্টার্লিং-সংস্থিতি দ্বারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বৈদেশিক কার-কারবার ও সম্পদ-সম্পত্তি ভারতবাসীর স্বত্বাধিকারে সমর্পিত না হইবে, তত দিন মুদ্রা ও মূল্য-স্ফীতির অবসান ঘটিবে না।

এই ষ্টার্লিং-সংস্থিতি সম্বন্ধে ভারতের বিশেষ উৎকণ্ঠার কারণ আছে। শুভ লক্ষণ এই যে, অর্থ-সচিব গত বৎসরের বাজেট-বক্তৃতায় বিলাতী কর্ম্মচারী প্রভৃতির ভবিষ্যৎ অবসর-বৃত্তি (Pension) ও সংস্থান-ভাণ্ডার (Provident Fund) প্রভৃতি হইতে প্রাপ্য অর্থের নিমিত্ত বিলাতে একটি মোটা টাকা কায়েমী ভাবে পৃথক্ রাখিবার এবং যুদ্ধান্তে শিল্প সমুন্নয়ন সাধনার্থ একটি ভাণ্ডার (Industrial Development Fund) সংস্থাপনের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এ বৎসর তাহার উল্লেখ করেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে যুদ্ধান্তে যুদ্ধোত্তর সংগঠন সমুন্নয়নার্থ একটি ডলার ভাণ্ডার (Dollar Fund) সংস্থাপনের অতি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাই বর্ত্তমান বাজেটের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধোত্তর সংগঠন সমুন্নয়নের নিমিত্ত আমাদের কিছু দেশ-বহির্ভূত অর্থ-সংস্থানের (External Finance) প্রয়োজন। লণ্ডনে যেমন ষ্টার্লিং-সংস্থিতি, আমেরিকায়ও আমাদের তদ্রূপ একটি ডলার-সংস্থিতি অত্যাবশ্যক। যুদ্ধোত্তর কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-প্রয়োজনে নূতন নূতন কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম এবং আমাদের দেশে পাওয়া যায় না এমন উপাদান উপকরণ বিভিন্ন দেশ হইতে আনিতে হইবে। যে দেশে সহজে ও সুলভে যে প্রকার দ্রব্যাদি পাওয়া যাইবে, সেইখান হইতে তাহাই কিনিতে হইবে। ইহাই অর্থ-নীতিসম্মত উপায়। সুতরাং অন্যান্য দেশেও তত্তদ্দেশীয় মুদ্রা প্রকরণে কিছু কিছু অর্থ-সংস্থান ভাল। যুক্তরাজ্যে এবং যুক্ত-রাষ্ট্রে এইরূপ অর্থ-সংস্থান অত্যাবশ্যক। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আমাদের সম্বন্ধ এখন অতি নিবিড়। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আমাদের একটি স্বতন্ত্র আদান-প্রদান মূলক চুক্তি হইবার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। বিশেষ কারণে তাহা এখন স্থগিত আছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে অর্থ-সচিবের মন্তব্যে খানিকটা হেঁয়ালি প্রচ্ছন্ন আছে। অর্থ-সচিব বলিয়াছেন—বিদেশে কিছু অর্থ-সংস্থানের কথা বৃটিশ সরকারের সহিত আলোচিত হইয়াছে, এবং সে আলোচনা হইয়াছে—In connection with the acceptance by India of the general principle of the extension of reciprocal aid to raw materials and foodstuff—অর্থাৎ কাঁচা-মাল ও খাদ্যসামগ্রী সম্পর্কে অন্যোন্যসাপেক্ষ সাহায্যের বিস্তারকল্পে। এই প্রসঙ্গে ভারত যে কি সাধারণ নীতি অঙ্গীকার ও গ্রহণ করিয়াছে, তাহা প্রকট নয়! ভারতের কাঁচামালের সমস্যা বিষম জটিল। সে আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে। যাহা হউক, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ সহানুভূতির সহিত ভারত সরকারের এই যুদ্ধোত্তর উন্নয়নের নিমিত্ত এখন হইতেই কিছু অর্থ-সংস্থানের প্রচেষ্টা অনুমোদন করিয়াছেন। পরস্পর-সাপেক্ষ সাহায্য-প্রকরণের অঙ্গরূপে এখন হইতে প্রতি বৎসর ভারতের রপ্তানী

বাণিজ্য-সম্ভূত ডলারের কিছু অংশ পৃথক করিয়া রাখা হইবে। এই সংস্থান আমাদের সাম্রাজ্যিক সমষ্টিগত ডলার সংস্থিতি (Empire Dollar Pool) হইতে নিষ্পাদিত চলতি ডলার প্রয়োজনের (Current dollar requirements) সহিত সংস্পর্শশূন্য এবং বর্ত্তমান ষ্টার্লিং ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট বন্দোবস্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইবে। এই সংস্থিতিও ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয়ত্তে একটি স্বতন্ত্র ডলার হিসাবে গচ্ছিত থাকিবে এবং যুদ্ধান্তে ভারতের যৎতৎক্ষণাৎ প্রয়োজনে প্রাপ্তব্য হইবে। এই সকল জটিল হিসাবের রহস্য দুর্ভেদ্য। শুধু তাহাই নহে, আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-বিধানের সহিত যুদ্ধান্তে এই সকল অর্থ-সংস্থিতির সুশৃঙ্খল পরিশোধের যে কুটিল সম্পর্কের ইঙ্গিত অর্থ-সচিব করিয়াছেন তাহাও গভীর সমস্যা-সঙ্কুল। যাহা হউক, আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতি সম্পর্কে এই ডলার-সংস্থান ভবিষ্যৎ-প্রয়োজনের অনুকূল হইতে পারে।

যুদ্ধ-প্রয়োজনে মিতব্যয়িতার বালাইশূন্য উত্তরোত্তর অকুণ্ঠিত অপরিমিত ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ভারতের করভার অত্যধিক বাড়িয়াছে। এত বাড়িয়াছে যে, কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারতের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র স্যার হেনরি রিচার্ডসনকেও বলিতে হইয়াছে যে, গত চারি বৎসরে যেরূপ ব্যাপকভাবে ক্রম-বর্দ্ধমান করবৃদ্ধির গুরুভার জন-সাধারণের উপর আপতিত হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ-করবৃদ্ধির সম্ভাব্য ও সম্ভবনীয় সামর্থ্যের হ্রাস পাইতেছে। ইহা অতীব সত্য। ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম পাদ পর্য্যন্ত আমাদের রাজস্ব ৮৪ কোটি হইতে ৩০৮ কোটিতে উন্নীত হইয়াছে, এবং এই দুই সংখ্যার অন্তর ২২৪ কোটি টাকা কর-ধার্য্যের দ্বারা আদায় হইয়াছে। ইতোমধ্যে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের ব্যয়ের খুঁট-অঙ্ক (Cost of living in dex) যুক্তরাজ্যে বাড়িয়াছে শতকরা ২৫ অংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র শতকরা ১৫ অংশ ; কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতে বাড়িয়াছে শতকরা ২০০ হইতে ৩০০ অংশ। করবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে সংরক্ষণ-ঋণে অধিকতর পরিমাণে অর্থ আকর্ষণের নিমিত্ত কেহ কেহ সুদের হার বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছিলেন। অর্থ-সচিব তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। ব্যাঙ্কের সুদের বর্ত্তমান হারের তুলনায় কারকারবারের লভ্যাংশ অনেক বেশী। এই নিমিত্ত আমাদের নাম-মাত্র সুদে সঞ্চিত ষ্টার্লিং-সংস্থিতির অর্থে ভারতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিদেশী সম্পদ-সম্পত্তিসমূহকে দ্রুত ভারতবাসীর স্বত্বাধিকারে সমর্পণ উভয় দেশের অর্থ-নৈতিক ও রাজ-নৈতিক কল্যাণের অনুকূল। এ পর্য্যন্ত দ্রব্য-মূল্যের শাসন ও বণ্টন এবং যুদ্ধলাভ জনিত প্রভূত অর্থকে নিষ্ক্রিয় করিয়া বাজার-বিভ্রাটের প্রশমন-নীতি কিছু ফলোপধায়ক হইয়াছে বটে ; কিন্তু প্রশমন ও প্রতিকারের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। প্রশমনের পরিবর্ত্তে প্রতিকার বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় শিল্প বণিক সমিতি সমবায় (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) গত মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নয়া দিল্লীতে তাঁহাদের বাৎসরিক অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অতি সমীচীন। সমবায়ের মতে আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতি হইতে ভারতে অবস্থিত বৃটিশ বণিক কারবারগুলিকে (British Commercial Investments) ভারতের জাতীয় অধিকারে হস্তান্তরিত করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার নিমিত্ত বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে এমন একটি অঙ্গীকার লইতে হইবে যে, যদি যুদ্ধকালে, কিংবা যুদ্ধান্তে স্বর্ণের নিরিখে ষ্টার্লিংএর মূল্য হ্রাস পায়, তাহা হইলে বৃটিশ সরকার আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষতি পূরণ করিবেন। নূতন ডলার-সংস্থিতি সম্পর্কে সমবায়ের অভিমত এই যে, আমাদের টাকাকে ষ্টার্লিংএর সহিত শৃঙ্খলিত করিবার ফলে আমরা সমস্ত স্বর্ণ ও ডলার বাজারসম্ভ্রম (credit) এবং ডলার—তলপ সম্পর্কীয় ক্রয় বা সরবরাহ-আদেশের (Dollar Requisition Order) সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। সমবায়ের দাবী এই যে, ভবিষ্যতে বাণিজ্য জমা-খরচের উদ্বৃত্ত জমা, কিংবা অন্য যে-কোন প্রকারে হউক আমাদের প্রাপ্য ডলারকে ভারতের হিসাবে জমা দিতে হইবে এবং তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আইনের আবশ্যক সংশোধন প্রয়োজন।

বর্ত্তমান বাজেটের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য—বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-সংক্রান্ত গবেষণার নিমিত্ত দশ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা। কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রসারের নিমিত্ত উন্নত বিজ্ঞানসম্মত উপায়-উপকরণের প্রয়োজন ; বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কর্ম্মপদ্ধতি ব্যতীত তাহা সম্ভবপর নয়। কিন্তু গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে সুসমঞ্জস্য দূরদর্শী পরিকল্পনা আবশ্যক। যুদ্ধোত্তর সংগঠন-সমুন্নয়ন-পরিকল্পনা-ক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য যুদ্ধমান দেশ অপেক্ষা বহু পশ্চাতে আছি। সম্প্রতি সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন,—কিন্তু অতি বিলম্বে। যুদ্ধের প্রারম্ভে যাহার সুসঙ্গত সূচনা কর্ত্তব্য ছিল,—অধুনা যুদ্ধের প্রায় অন্তিমকালে তাহার কল্পনা-জল্পনা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এই প্রসঙ্গে বোম্বাই-এর শিল্পরথিগণের পরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা ইহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি। দেশাভ্যন্তরে সর্ব্ববিধ আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের আশু উৎপাদন-বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নতির একমাত্র উপায়।

মোটের উপর এ বৎসরকার বাজেটের বিধি-ব্যবস্থার ফলে দেশের ও দেশবাসীর দুর্গতি দূর হওয়া দূরে থাকুক, সর্ব্বসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা আরও বাড়িবে। ভারতে অপরিসীম যুদ্ধ-ব্যয়-বৃদ্ধি ভারতের অর্থ-সামর্থ্যের অতীত। সংরক্ষণহেতু ভারতের সাধ্যাতীত অতিরিক্ত ব্যয়ভার সর্ব্বভৌম ও মিত্র শক্তিবর্গের বহন করা বিধেয়। ভারতের আত্ম-সংরক্ষণার্থ ন্যায়সঙ্গত ব্যয়ের অনুপাতে ভারতের করভার অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যধিক। এ বিষয়ে অর্থ-সচিব পূর্ব্বে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। অতিরিক্ত লাভ-করের সমস্ত অংশকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিবার ফলে শিল্প-সমৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে। আয়কর ও সমিতিকর বৃদ্ধির পরিণামও ভবিষ্যৎ শিল্প-সম্প্রসারণের পক্ষে ক্ষতিকর। যুদ্ধান্তে যখন প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হইবে, তখনই অর্থের অভাব-অনটনে শিল্প-সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে। মুষ্টিমেয় ধনীর ধনবৃদ্ধি অগণিত দরিদ্রের দারিদ্র্য বৃদ্ধির প্রশমন কিংবা প্রতিকার করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা দ্রুত আর্থিক অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছি। আমাদের ভবিষ্যৎ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ; অভাব অনটন এবং মারীভয় আমাদের নিত্য-সহচর। দরিদ্রের ক্রন্দন মাত্র সম্বল, এবং অনশনে মৃত্যুই তাহার নিষ্ঠুর নিয়তি। সে নিয়তি হইতে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে ? অর্থ-সচিবের উপদেশ—Save and lend—পুঁজি কর এবং ঋণ দাও। ঋণ অবশ্য সংরক্ষণ-সঙ্কল্পে ; কিন্তু যাহাদের অন্নবস্ত্রের প্রচণ্ড অভাব, তাহারা সঞ্চয় করিবে কোথা হইতে ?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সমর-বিদ্যার শিক্ষা-পদ্ধতি

বৈজ্ঞানিক যুগে যুদ্ধবিদ্যা সব দিক্ দিয়া শেখা দরকার,—নহিলে 'হা-রে-রে-রে' হাঁক্ দিয়া লক্ষ-কোটি লোক জড়ো করিয়া তাদের লইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে হানা দিলে কোনো ফল হইবে না। এ যুগে বৈজ্ঞানিক

পথে বাক্স-মাইন পোঁতা

পদ্ধতিতে যন্ত্রে এবং অস্ত্র-শস্ত্রে প্রত্যহ উৎকর্ষ-সাধন চলিতেছে। তার উপর গতির বেগ বাড়িয়াছে কত! "আজ খুলনায় কাল

বেতার বার্তাবহ

কলিকাতায়"—এ যুগে ফৌজের এটুকু পথ চলায় সিদ্ধি-লাভের কোনো সম্ভাবনাই নাই। যুদ্ধ-বিদ্যা শিখানো হয় যুদ্ধের পূর্ণ-আয়োজন করিয়া তাহারি চূড়ান্ত অভিনয়ে। শিক্ষার্থীদের লইয়া দু'টি দল খাড়া করা হয়—দু'দলে থাকে অধ্যক্ষ, অধিনায়ক এবং ফৌজ-বাহিনী। শুধু অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অভিনয় নয়—অভিনয়-ক্ষেত্রে রেডিয়ো-অপারেটর, ট্যাঙ্ক, ডাক্তার, নার্স—সকলেরই ভূমিকা বাদ যায় না। এক দল আসিয়া হানা দিবে—অন্য দল করিবে তাদের প্রতিরোধ। প্রথম দল যে-পথে আসিবে, তাদের সেই চলার পথে দ্বিতীয় দল নকল মাইন পুঁতিয়া রাখে। এ মাইনগুলির অর্থ কাঠের বাক্স বা নকল মাইন। সে-বাক্সের মধ্যে ভরা থাকে তরল ধূম। বিপক্ষ দল আসিবামাত্র তাদের গাড়ীর বা পায়ের চাপে বাক্স ভাঙ্গিয়া যায় এবং তরল ধূম-বাষ্প ও জল উদ্গীর্ণ হইয়া আকাশকে কালো করিয়া তোলে!

স্ট্রেচার-বাহী

যুদ্ধাভিনয়ে রেডিয়োর বার্তাবহ নিভৃত অন্তরালে বসিয়া যন্ত্র চালাইয়া আসন হইতে শত্রু পক্ষের সংবাদ রচনা করে। অভিনয়ে বন্দীদের ধরা হয়, ধরিয়া দলের পিছনে বন্দী-বাহিনীর জিম্মা করিয়া দেওয়া হয়। এ অভিনয় যুদ্ধে হতাহতদের সত্যকার মতই স্ট্রেচারে তুলিয়া অভিনয়-হাসপাতালে বহিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এ ভাবে যুদ্ধ-বিদ্যা শিখাইবার ফলে সকলেই সব কাজে বেশ পারদর্শী হয়। যেমন হয় সকলের ক্ষিপ্র গতি, তেমনি তৎপরতা।

নেক্‌টাইয়ের নীচে পকেট

টাকা-কড়ি সঙ্গে লইয়া নিরাপদে ঘোরার জন্য জার্মাণ শিল্পীরা পকেট-ওয়ালা নেকটাই তৈয়ারী করিয়াছে। নেকটাইয়ের নীচে এ পকেট লুকানো থাকে। এ পকেটে নোট রাখা চলে—কার্ড, ছোট পেন্সিলও রাখা চলে। টিপ-বোতাম আঁটিয়া পকেট বন্ধ করা হয়। এ নেকটাই গলায় আঁটিলে পকেটে নোট-কার্ড থাকার দরুণ অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবে না।

নেক্‌টাইয়ে পকেট

সাধের তরণী

ছুটির দিনে দূরে গিয়া কোনো দীঘি বা নদীর বুকে যুগলে প্রমোদ-তরণী বাহিয়া যদি আনন্দ উপভোগ করিতে চান, তবে মার্কিণ শিল্পীর তৈয়ারী ভাঁজ-করা তরণীর অর্ডার দিন। ব্যাগে ভরিয়া এ তরণী লইয়া দীঘি বা নদীর তীরে চলিয়া যান্। তরণীতে দু'জনের

যুগলে তরী বাওয়া

শী তৃতীয়ের জন্য ঠাঁই নাই—ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী! ীর কূলে গিয়া ব্যাগ হইতে তরী খুলিয়া কাঠগুলি যথাস্থানে াটিয়া ফিট করুন—তার পর জলে তরী ভাসাইয়া গান ধরুন

ভাসলো তরী সকালবেলা···জলখেলা
মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাবো রঙ্গে!

তুষার দেশে প্যারাশুট-বাহিনী

বরফে ঢাকা বিপক্ষ-প্রান্তর—প্যারাশুট-ফৌজ সে বরফের বুকে নামিয়া চলিতে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবে না, এ জন্য তুষার-প্রান্তরে ব্যবহারের জন্য তৈয়ারী হইয়াছে হালকা 'স্কাই'। দু'ভাগে ভাগ করিয়া

কাঁধে ঝোলে   দু'পাশ আঁটা

এই স্কাই প্যারাশুট-ফৌজ কাঁধে ঝুলাইয়া বহন করিতে পারে। তুষার-ক্ষেত্রে নামাইয়া দু'মিনিটে দু'পাশ আঁটিয়া লইলে স্বচ্ছন্দ বিচরণে বাধা ঘটে না।

বিরাম-আসন

াগানে বা ছাদে বিরাম-অবসর যাপন করিতে বসিয়াছেন—বন্ধু-াান্ধব আসিলেন—তাঁদের জন্ত চাই পানীয় সরবৎ কিম্বা চা! দগানে চা য়ে ' প য়া লা কিম্বা ববতের গ্লাস া খি বা র জন্ত া ত ন্ত্র কোন তপায়া- ট বি ল ানিতে গেলে াসুবিধার এক-শষ! সে অসু-বধা-মোচনের জন্ত বলাতী শিল্পীরা তৈয়ারী করিতেছে ক্যাম্প-চে য়া রে র স হি ত সংলগ্ন শেলফ্। শেলফ্-যুক্ত এ চেয়ার খুব হালকা। শেলফে অনেকগুলি পেয়ালা গ্লাস ও বোতল ধরে; তার উপর শেলফের সঙ্গে আছে ছাই-ঝাড়া পাত্র—ধূমপায়ীর সুবিধা-কল্পে।

চেয়ারের সঙ্গে শেলফ্

বিপদ-বারণ ঝর্ণা

যুদ্ধের মর্শুমে যন্ত্রশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে আগুন লাগিয়া বিপত্তি ঘটিবার আশঙ্কা প্রতি পদে। সে বিপত্তি মোচনের জন্য মার্কিন যন্ত্র-

ছাদ-ঝর্ণা
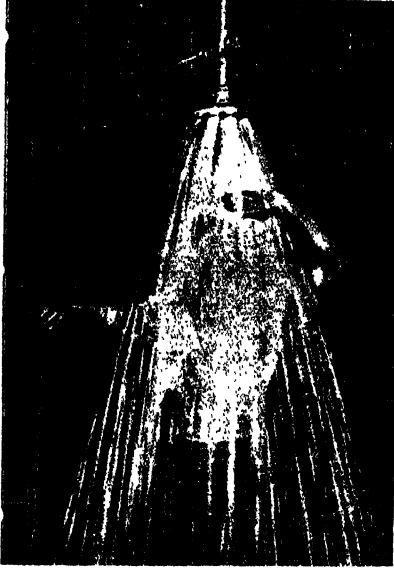
শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বহু বিপদ-বারণ ঝর্ণা বসানো হইয়াছে। প্রয়োজন-মাত্র চেন্ টানিলে জলের ঝর্ণা ঝরিবে। কারখানা-ঘরগুলিতে এমন বহু ঝর্ণা সংলগ্ন করা হইয়াছে। রঙ, কালি এবং বিবিধ রাসায়নিক লইয়া যে-সব কারখানার কাজ চলে, সে-সবে আগুন লাগার ভয় সব চেয়ে বেশী। সেই সব কারখানা আজ এ ঝর্ণার কল্যাণে অনেকখানি নিরাপদ হইয়াছে।

জাহাজে অগ্নিবৃষ্টি

আট-ন' মণ ওজনের গোলা ছোটে

ইস্পাতের দেওয়াল

পঁচিশ মাইল লম্বা ইস্পাতের দেওয়াল—এমন কথা কখনো শুনিয়াছেন? আমেরিকায় এ দেওয়াল তৈয়ারী হইতেছে—দেশ-রক্ষার উদ্দেশ্যে! অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে সমগ্র মার্কিণ ফৌজ যদি বাহিরে যাইতে বাধ্য হয়, তখন সে অবসরে বিপক্ষ আসিয়া আমেরিকায় হানা দিতে পারে তো! তেমন বিপত্তি ঘটিলে এই ইস্পাতের দেওয়ালে দেশ রক্ষা পাইবে। এ দেওয়ালে শত্রুর কামানের গোলা বিঁধিবে না। দেওয়ালকে কামানে সজ্জিত রাখা হইতেছে। অল্প-সংখ্যক লোক ইস্পাতের দেওয়ালের অন্তরালে থাকিয়া সেই কামানের শক্তিতে
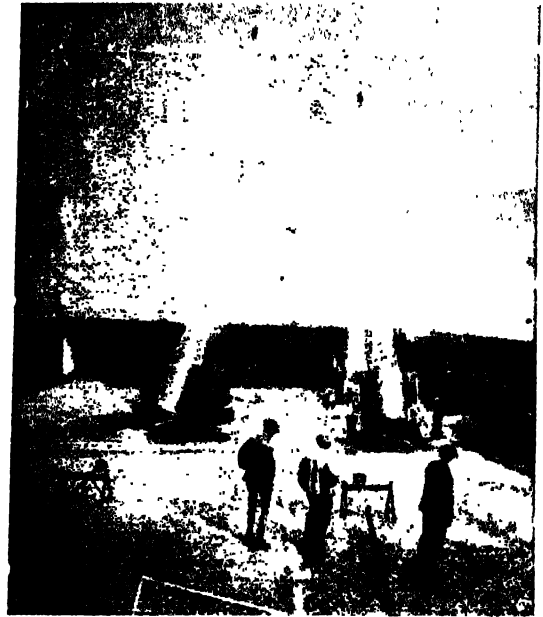
গোলা ছোটে ত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত

১৫৫ মিলিমীটার কামান

শত্রুকে বিধ্বস্ত করিতে বেগ পাইবে না। দেওয়ালের জন্য কামান তৈয়ারী হইয়াছে তিন-রকম। প্রথম—১৫৫ মিলিমীটার কামান—এ কামানের গোলা ওজনে এক মণ সাত সের—দশ মাইল দূরে গিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে। দ্বিতীয়—১৬ ইঞ্চি বেড়ের কামান—এ কামানের গোলা ছোটে ত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত। এ গোলায় শত্রুর অতি-বড় যুদ্ধ-জাহাজও নিমেষে পুড়িয়া ছাই হইবে। তৃতীয়—১৮ ইঞ্চি কামান। এ কামান হইতে আট-ন' মণ ওজনের গোলা দেড় মাইল পথ ছুটিয়া গিয়া ধ্বংস-লীলা সাধিতে সমর্থ!

অতিকায় কামান-গাড়ী

শিকাগোর সমর-বিভাগ হইতে যে অতিকায় কামান-গাড়ী তৈয়ারী হইতেছে, তার আকার দেখিলে আতঙ্কে অভিভূত হইতে হয়!
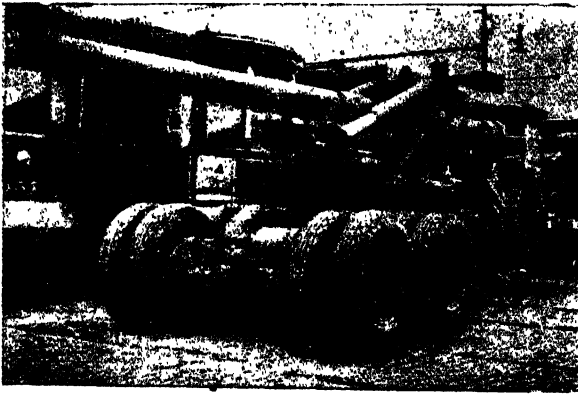
কামান-গাড়ী

এ গাড়ীতে যে কামান থাকে, তার গোলা সুদূর পনেরো মাইল দূরবর্ত্তী বিপক্ষ-দুর্গ, সেনা, পরিখা অর্থাৎ সর্ব্ব-রকমের লক্ষ্য বিঁধিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারে।

চকিত-আলোর উৎস

যুদ্ধের ফৌজ চলে অনির্দ্দেশ অনিশ্চিত ক্ষেত্রে। বন-বাদাড়, জলা, পাহাড়-প্রান্তর—কখন কোথায় গিয়া এ-ফৌজ ছাউনি ফেলিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই! অন্ধকার রাত্রে সম্পূর্ণ অজানা জায়গায় গিয়া ছাউনি ফেলিতে হইলে আলোর ব্যবস্থা চাই সর্ব্বাগ্রে, নহিলে কোনো কাজ করা সম্ভব হইবে না। এ জন্য বহু গবেষণায় মার্কিন বিমান-বিভাগ আলোর যে উৎস সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার কার্য্যকারিতা অপরূপ। এ উৎসের দৌলতে দু'দণ্ডের মধ্যে যে কোনো প্রান্তর-পথে আলোর বন্যা

আলোর বন্যা
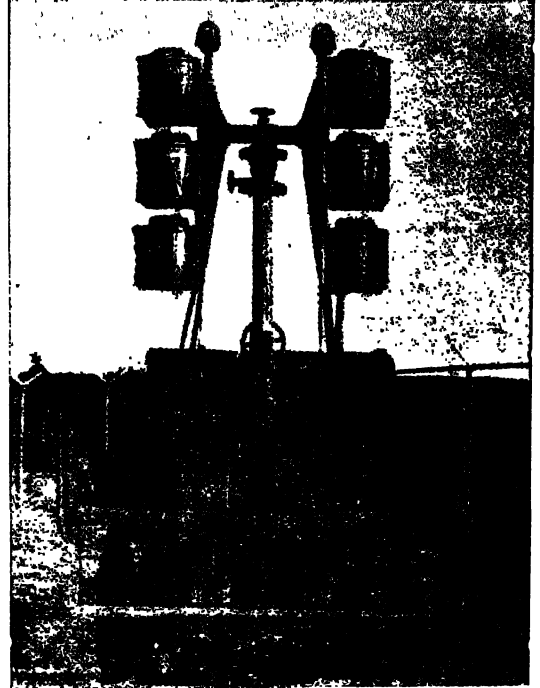
বহানো যায়! ট্রাক-গাড়ীর উপরে আছে আলোর যন্ত্র। এ যন্ত্র চলে পেট্রোলের শক্তিতে। যন্ত্রে দেড়-হাজার ওয়াটের এক-একটি করিয়া ছয়টি বাতি সংলগ্ন আছে। পুলি-যোগে এ-সব বাতি যেমন বহু উর্দ্ধে তোলা যায় আকাশ-প্রদীপের মত, তেমনি ইচ্ছামাত্র নামাইয়া সমতল ভূমে রাখা চলে। বাতি, তার, যন্ত্র—এগুলি প্যাক করিয়া ট্রাকে ভরিয়া গাড়ীর উপরে তুলিয়া বহন করা হয়। এ আলোক-যন্ত্রের কল্যাণে ফৌজকে কোথাও আর আলোর জন্য এতটুকু দুশ্চিন্তা বা অস্বাচ্ছন্দ্য আজ ভোগ করিতে হয় না!

প্রতিধ্বনি

তোমার অমিয়-গীতি উৎসারিয়া সুধাকণ্ঠ হতে
সৃষ্টি করি অপরূপ আনন্দের মধু প্রস্রবণ
ধারায় ধারায় আসি উচ্ছ্বসিত দুর্নিবার স্রোতে
ভাসাইয়া লয়ে গেল জর্জ্জরিত হিয়া, রিক্ত মন।
চকিতে মুছিয়া গেল পুঞ্জীভূত যত অবসাদ,
মনে হলো বিশ্ব যেন বাঁধা ওই গীতি-মূর্চ্ছনায়;
লভিলাম তার পর জীবনের নূতন আস্বাদ,
তোমার সঙ্গীতালোকে হেরিলাম চির-অজানায়।

তুমি তো মানবী নও, দেবী তুমি, সঙ্গীত-রূপিণী,
অবিরাম কণ্ঠে তাই খেলা করে শত শত সুর;
নিঃশব্দে মূরছি পড়ে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী,
সচকিত বিশ্ব-হিয়া বিমোহিত বিরহ-বিধুর।
তোমার সঙ্গীত যেন সপ্তস্বরা বাঁশীর ঝঙ্কার
রণিয়া-রণিয়া ওঠে মুক্ত নীল উদার অম্বরে,
পূর্ণিমায় জ্যোৎস্না-রাতে সুগভীর প্রতিধ্বনি তার
আজো যেন শুনিতেছি নিরজনে নিভৃত অন্তরে!

শ্রীরঘুনাথ ঘোষ

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

বিরাম-সাধনা

'প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত'! এ-কথা কতখানি সত্য, তা আমাদের নিত্য দিনের চলায়-ফেরায়, বসায় দাঁড়ানোয়, কাজে-কর্ম্মে, ঘুমে-জাগরণে আমরা মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করি। সর্দ্দি-কাশি, কোমরে ব্যথা, গা-ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌, পায়ে বেদনা, মাথা ধরা, মাথা ব্যথা, ঘুমে চোখ ভরিয়া থাকা—এ-সব উপসর্গ বিনা-নোটিশে কখন আসিয়া উদয় হইবে, তার যেন কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই! এই তো গেল দেহের উপসর্গ—তার উপর আছে মন! একটু বেশী খাটাখাটুনি গেল,—একটু মান, একটু অভিমান—অমনি মনের বল এমন বিকল হইল যে সে-মন লইয়া না পারা যায় লেখাপড়া করিতে, না পারি গান গাহিতে! এত সাধের সিনেমা-থিয়েটার—গ্লানি অবসাদ ঘুচাইয়া তারাও মনে এতটুকু রেখাপাত করিতে পারে না!

ব্যায়াম-সাধনায় দেহকে স্বচ্ছন্দে গড়িয়া তুলিলেও মনুষ্য-জন্ম উপভোগ করিতে অনেক বাধা! কাজ কর্ম্ম, বিরাম-বিনোদনের পদ্ধতি আমাদের জানা চাই; এবং জানিয়া সেই পদ্ধতিতে জীবনকে চালাইতে পারিলে দেখিব, হাতের কাজ যেমন পড়িয়া থাকে না—শরীরে যেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না—মনও তেমনি সব সময়ে সুস্থ-স্বচ্ছন্দ রহিয়াছে! দেহ-মনের স্বাস্থ্য-ছন্দ—বাদ্যযন্ত্রের মত বজায় রাখিতে হয়। এডিশন এ-তত্ত্ব মানিতেন বলিয়া দিনে আঠারো ঘণ্টা কাজ করিয়াও ক্লান্তি বোধ করিতেন না! চিত্রশিল্পী ভ্যান্ ডাইকের চিত্ত ও চিত্রের নিত্য-নব কল্পনায় বিভোর হইতে পারিত!

থাকিয়া থাকিয়া মন যে আমাদের অবসন্ন হয়—মাথা-ধরার যাতনায় আমরা কাতর হই,—অনেকে বলিবেন—যাও, দু' মাইল ঘুরিয়া এসো, মন ভালো হইবে, মাথা ধরা ছাড়িয়া যাইবে,—এ ব্যবস্থায় আমাদের পেশীর অবসাদ-জড়তা কাটে, তার ফলে মন এবং মাথা সুস্থ হয়, সত্য; কিন্তু সব সময়ে বা সকলের পক্ষে ঘর ছাড়িয়া দু' মাইল ঘুরিয়া আসা কি সম্ভব?

কাজেই ঘরে বসিয়া দেহ-মনের এই অস্বাচ্ছন্দ্য-মোচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আজ সেই ব্যবস্থার কথা বলিতেছি।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের দল বলেন—দেহ-মনের সর্ব্ব-প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাস্থ্য-মোচনের সব চেয়ে ভালো ব্যবস্থা Relaxation অর্থাৎ শিথিল ভাব। অর্থাৎ গাড়ী-টানার পর ঘোড়ার লাগাম খুলিয়া দিলে ঘোড়ার যেমন ক্লান্তি ঘোচে, আমাদেরো তেমনি নিত্য নিয়মিত ভাবে পেশীগুলার বাঁধন খুলিয়া দেহকে শ্লথ অলস ভাবে এলাইয়া বিরাম দিতে হইবে। মনকেও এমনি বিরাম দেওয়া প্রয়োজন। বিরাম-কালে দেহ যেমন খাটিবে না, মনকেও তেমনি চিন্তামুক্ত রাখিতে হইবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই Relaxation বা শ্লথ-শিথিলীকরণে দেহ যেমন সুস্থ স্বচ্ছন্দ থাকিবে—তেমনি তার গঠনের সৌকুমার্য্য বা বর্ণশ্রী ম্লান মলিন হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

কি ভাবে তনু শিথিল করিয়া এই বিরাম উপভোগ করিতে হয়, এবারে সেই কথা বলি।

১। খাটের উপর মাথা উঁচু করিয়া বালিশে মাথা রাখিয়া পাশে দু'টি বালিশে রিষ্ট কোমল রাখিয়া এবং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত শিথিল ভাবে রাখিয়া শয়ন,—দুই পদতল জোড়া থাকিবে—তার পর একবার ডান্ পা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫ গণিয়া নামানো; সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা তোলা, ডান পা নামানো—এমনি ভাবে দুই পা ক্রম-পর্য্যায়ে তোলা-নামা করিবেন পাঁচ মিনিট।

২। এবার মাথার বালিশ ফেলিয়া বিছানায় মাথা নীচু রাখিয়া—দু' পা উঁচু করিয়া এবং ছবির ভঙ্গীতে শয়ন। শুইয়া একবার ডান হাত ঊর্দ্ধে তোলা, পরক্ষণে নামানো—তার পর বাঁ হাত তোলা এবং নামানো। দু'হাত এমনি ভাবে তোলা-নামা করিবেন পাঁচ
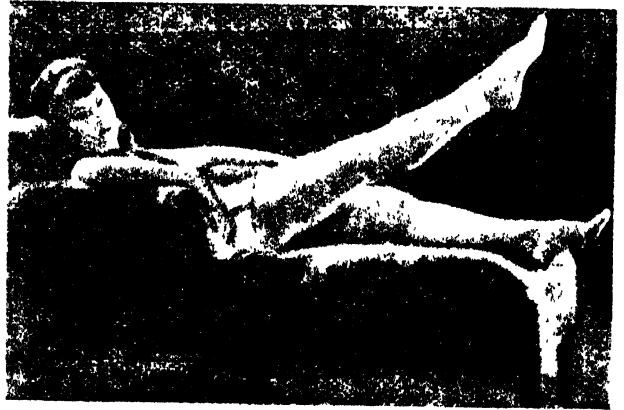
২। মাথা নীচু

মিনিট। সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেলাইয়া ফিরাইতে হইবে একবার ডান দিকে, পরের বার বাঁ দিকে।

এ দু'টি ব্যায়ামে গায়ে-পায়ে-হাতে-পিঠে কোনো দিন জড়তা বা বেদনা বোধ করিতে হইবে না; বাতের ভয় জীবনে থাকিবে না।

৩। মাথা নীচু করিয়া দুই পা উঁচুতে রাখিয়া দু'দিকে দু'হাত প্রসারিত করিয়া শয্যায় শয়ন; তার পর ঊরুর পর হইতে কোমর
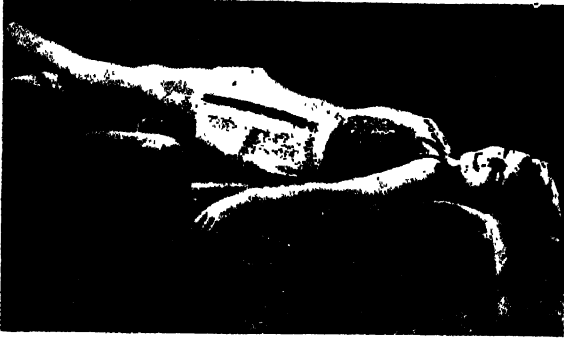
৩। দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত

পর্য্যন্ত জঘন-দেশ একবার ঊর্দ্ধে তুলিবেন, পরক্ষণে নামাইবেন। এ ব্যায়াম করিবেন পাঁচ মিনিট।

৪। পা উঁচু এবং মাথা নীচু করিয়া শুইয়া—৪নং ছবির

৪। মাথা-ঘাড় তোলা-নামা

ভঙ্গীতে ঘাড়-মাথা তোলা-নামা করিবেন প্রায় পাঁচ মিনিট। দেহভঙ্গী দেখাইবে ঐ ছবিতে যেমন, অমনি ডোঙ্গার মত।

৫। এবার ৫নং ছবির ভঙ্গীতে দু'দিকে দু'হাত ঝুলাইয়া দিয়া মাথা নীচু এবং পা উঁচু করিয়া বিছানায় পড়িয়া নিশ্চল ভাবে

৫। দু হাত ঝুলাইয়া

অবস্থান প্রায় পাঁচ মিনিট। এ ব্যায়ামে পায়ের তলার দিক হইতে সারা দেহে রক্ত চলাচল করিবে। পা থাকিবে সুস্থ; পায়ে কোনো দিন ঝিনঝিনি ধরিবে না—সারা দেহে জুৎ থাকিবে।

পারিবারিক ঐক্য

সংসার করতে বসে আমরা সর্ব্বাগ্রে চাই শান্তি। টাকা-কড়ি গহনা-গাঁটী বা প্রভুত্বে শান্তি মেলে না!

এ কথায় সংসারের গড়ন এবং পরিচালনার সম্বন্ধে কথা ওঠে!

পরিবার যেখানে নিজেকে, স্বামীকে আর নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে—সেখানে যদি স্বামি-স্ত্রী-ছেলেমেয়ের মধ্যে মনের ঐক্য থাকে, পরস্পরের উপর পরস্পরের দরদ-মায়া থাকে—তবেই শান্তি! নাহলে স্বামী চলেছেন নিজের খেয়ালে—ছেলেমেয়েরা যা-খুশী করে বেড়াচ্ছে—খাওয়ায়-পরায়-আচরণে মা-বাপের মতের বা ইচ্ছার ধার দিয়ে যাচ্ছে না, তাতে বাড়ীতে অশান্তি-বিরোধের আর সীমা থাকে না।

পরিবার যেখানে ভাশুর-দ্যাওর, ভাজ এবং তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে—সেখানে পরস্পরের মন বুঝে, সকলের সঙ্গে মন মিলিয়ে বাস করায় অনেকখানি সংযম, অনেকখানি ত্যাগ-স্বীকার প্রয়োজন। সে-কালের মানুষ এ ত্যাগ স্বীকার করতেন। তাঁদের মনে স্বার্থপরতার বিষ যে-কারণেই হোক, এ-যুগের মত এতখানি পুঞ্জিত হয়ে ওঠেনি - তাই সে-কালে একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিল শক্তিতে-সম্পদে সমৃদ্ধ। এ-কালে আমাদের মন এমন হয়েছে যে, বান্ধব-বান্ধবীর ছেলেমেয়ে কিম্বা তাঁদের নানা রুচি-বিচ্যুতি আমরা সয়ে থাকতে পারি—তাঁদের জন্য দু'-চার পয়সা অপব্যয়ও যদি হয়, তাতেও আমাদের মনে বাজে না—কিন্তু ভাশুর-দ্যাওরের ছেলেমেয়ে কিম্বা জায়েদের বেলায় স্বামীর রোজগার থেকে যদি দু'-চারটে টাকা খরচ হয়, তাহলে সেটুকু অসহ্য লাগে- বিরোধের সুর তুলি।

আমাদের আর একটা দোষ আছে। নিজেদের বাপের বাড়ীর সম্বন্ধে কতখানি আমাদের মায়া-মমতা দরদ-অনুরাগ! বাপের বাড়ীতে ভাই-বোনদের ছেলের পৈতেয় বা মেয়েদের বিয়েয় স্বামীর কাছে বেশ দামী উপহারের ব্যবস্থার জন্য লক্ষ-রকম আবদার তুলি—অথচ ভাশুর-দ্যাওরের ছেলেমেয়েদের বেলায় উপহার দিতে আমাদের মন সঙ্কুচিত হয়। এ কথা কেন ভাবি না—আমাদের বাপের বাড়ীর দিকে স্বামীর অনুরাগ সম্বন্ধে এতখানি প্রত্যাশা করি দাবী আছে বুঝে—তখন স্বামী কেন প্রত্যাশা করবেন না যে তাঁর ভাই-বোন, ভাইপো-ভাইঝীদের বেলায় আমাদের মন মায়া-মমতায় অকুণ্ঠ হবে না?

বিশেষ করে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার দিন কি এখনো আসেনি? স্বামীর ভায়েদের তুচ্ছ করে' তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে শুধু স্বামি-পুত্র নিয়ে যে-সংসার আজ আমরা গড়ে তুলছি, তাতে সংসার শক্তিহীন হচ্ছে। টাকার বল যত-বড়ই হোক, স্নেহ-মায়া-মমতা তুচ্ছ করবার নয়! আমার স্বামীর আয় বেশী, দ্যাওর-ভাশুরের আয় কম—আমার স্বামীর দৌলতে ওঁরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবেন কেন—এ মনোভাবে মোটর কেনার সুযোগ হয়তো মিলতে পারে, কিন্তু ছেলেমেয়েদের মনে দেইজী-গিরির বিষ ঢেলে দেবো! এমনি পার্টিশনের আড়ালে যে-বাড়ীর ছেলেমেয়েরা মানুষ হচ্ছে—তারা দেখছে বড় রুইমাছ বা আর-কিছু উপহার পেলে আমরা পাড়া-প্রতিবেশীকে কিম্বা দূরে নিজেদের বাপের বাড়ীতে তার ভাগ পাঠাবার জন্য উদগ্রীব, অথচ দ্যাওর-ভাশুরদের তা থেকে বঞ্চিত করি—এই মনোভাব নিয়ে বড় হয়ে তারা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হবেই!

মোটর-গাড়ীর ইতিহাস

আজ যে মোটর গাড়ীর দৌলতে আমাদের সুদীর্ঘ পথের পাড়ি স্বচ্ছন্দ সুখময় এবং সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, সে গাড়ীর কথা আমাদের এ দেশে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ছিল কল্পনা ও স্বপ্নের অগোচর! তোমরা জন্মিয়া ইস্তক মোটর-গাড়ী দেখিতেছ বলিয়া হয়তো মোটর-গাড়ী তোমাদের মনে তেমন বিস্ময় জাগাইতে পারে না—কিন্তু এ গাড়ী প্রথম যে-দিন এ দেশে দেখা দিয়াছিল, সে-দিন বিস্ময়ে আমরা হতভম্ব হইয়াছিলাম। দেশের নিরক্ষর সম্প্রদায় এ গাড়ীকে বলিত—হাওয়া-গাড়ী! মনে পড়ে, একবার আমাদের সামনে এক দল কুলি-মজুর যখন এই মোটর-গাড়ী দেখিয়া আনন্দে-বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল, হাওয়া-গাড়ী—তখন আমাদের ইংরেজ প্রোফেসর তাদের ভুল বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন,—হাওড়া-গাড়ী নয়—বলো মোটর-গাড়ী!

কিন্তু সে কথা যাক্! এই মোটর-গাড়ীর ইতিহাস—অর্থাৎ কবে কোথায় জন্ম লইয়া পথে বাহির হইল এবং কি-মূর্ত্তিতে প্রথম এ গাড়ী দেখা দিয়াছিল, পরে ক্রমোন্নতির ফলে আজিকার এই শ্রী এবং স্বচ্ছন্দ গতি লাভ করিয়াছে, সে-ইতিহাস রূপকথার মত উপভোগ্য।

আমেরিকার লশ এঞ্জেলেশে এক জন সৌখীন ধনীর বাস। তাঁর নাম লিণ্ডলে বথওয়েল। ক' বিঘা জমি জুড়িয়া তাঁর কমলা লেবুর বাগান আছে। সেই বাগানে মস্ত শেড্ তুলিয়া সেই শেডে তিনি রাখিয়াছেন অসংখ্য মোটর-গাড়ী,—সেই প্রথম-উদয়ে যে-দেশে এ গাড়ী দেখা দিয়াছিল, সে গাড়ী হইতে সুরু করিয়া পর-পর উৎকর্ষ-লাভে মোটর-গাড়ী যত-রকম রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—সব ছাঁদের একখানি করিয়া গাড়ী। অর্থাৎ বংশ-ধারা-ক্রমে তিনি মোটর-গাড়ী কিনিয়া রাখিয়াছেন—সে যেন এক বিরাট প্রদর্শনী।

টায়ারের ক্রমোন্নতি

প্রথম যখন এ-গাড়ী দেখা দেয়, তখন তার চেহারা এমন ভদ্র ছিল না! বুনো মানুষের সঙ্গে সহুরে মানুষের আকারে-প্রকারে যে প্রভেদ, প্রথম আদি-গাড়ীর সহিত এ যুগের আধুনিক গাড়ীর প্রভেদ তার চেয়েও যেন বেশী! প্রথম দিনের সে-গাড়ী পদে-পদে বিকল হইত; তার-উপর চালাইতে বেগ পাইতে হইত অনেকখানি এবং তার শীট্ এখনকার ড্রয়িং-রুমের মতন স্বচ্ছন্দ ছিল না! তাছাড়া ষ্টার্ট লইতে গাড়ী এত রকমের কর্কশ রব তুলিত—চলিবার সময়েও সে রবের কচিৎ বিরাম ঘটিত। তার উপর তখনকার গাড়ীর গতি-বেগ ছিল কম—এখনকার গাড়ীর নিঃশব্দ বিচরণ এবং অতি ক্ষিপ্র গতির কল্পনাও কেহ সে-যুগে করিত না!

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার পথে সর্ব্ব-প্রথম মোটর-গাড়ী দেখা দেয়। সে গাড়ী চলিয়াছিল বাষ্পযোগে। গাড়ীর আকার ছিল খানিকটা ফিটনের মত! ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে চেহারায় কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল; কিন্তু প্রাণ বা গতিশক্তির নির্ভর রহিল বাষ্পের উপর।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পেট্রোলে প্রাণের সন্ধান মেলে এবং পেট্রোলের জোরে এ গাড়ী তখন নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিল। ষ্টিয়ারিং-গিয়ারের প্রথম আবির্ভাব হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। সে ষ্টিয়ারিং ছিল বাইসিক্ল্ হ্যাণ্ডেলের মত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ষ্টিয়ারিং যোগ করার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর মাথায় উঠিল আচ্ছাদন বা হুড। চাকা ছিল লোহার, চাকায় রবারের অলঙ্কার বা টায়ার ছিল না।

উপর হইতে: শীয়ার; ফোর্ড; মিচেল; বুইক্
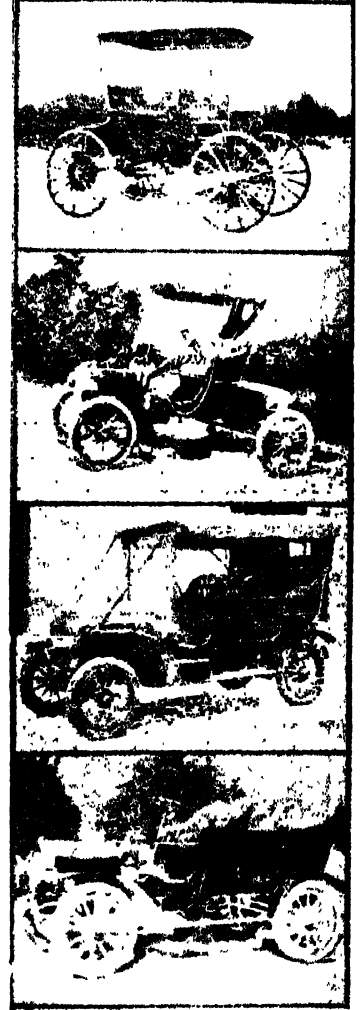
১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পেট্রোলের উপর হেনরি ফোর্ড গাড়ীর প্রাণ বা গতিশক্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি আজিকার এই ষ্টিয়ারিংয়ের প্রবর্ত্তন করিলেন! ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মিচেল এবং বুইক চার-পাঁচ শীটের বড় গাড়ী তৈয়ারী করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতিতেও অনেকখানি উন্নতি সংসাধিত হইল। গাড়ীর আকার ও আসন বাড়িলেও সে-গাড়ীতে দরজা ছিল না। গাড়ীতে দরজা

আঁটা হইবে কি না, তাহা লইয়া নানা কারিগরে বিতর্ক চলিল প্রায় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত। যাঁরা দরজার পক্ষে, তাঁরা বলিলেন, দরজা লাগাইলে বাতাসকে খানিকটা রুদ্ধ করিয়া গাড়ীতে স্বচ্ছন্দে বসিয়া গাড়ি-কার্য্য সমাধা হইবে। যাঁরা দরজার বিরোধী, তাঁরা
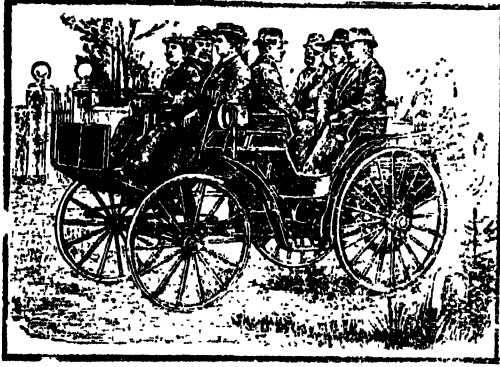
১৮৯৭এর গাড়ী

বলিলেন, দরজা আঁটিলে আশঙ্কা আছে। এ্যাকসিডেণ্ট ঘটিলে যাত্রীরা নির্বিবাদে গাড়ী হইতে লাফাইয়া বাহির হইতে পারিবে না।

১৯০৪এর গাড়ী
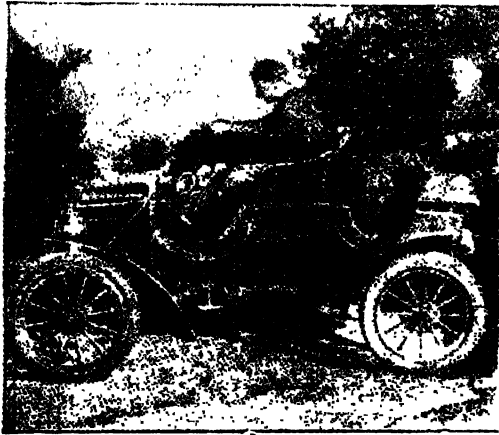
মিচেল কোম্পানিই প্রথমে গাড়ীর সামনে-পিছনে দু'দিকে চারটি দরজা আঁটিয়া এ বিতর্কের নিষ্পত্তি সাধন করেন।

এঞ্জিন এবং গ্যাশ-ট্যাঙ্ক কোথায় বসাইলে ঠিক হয়, তাহা লইয়াও পূর্ব্বে বহু পরীক্ষা চলিয়াছিল। এ পরীক্ষার পর বুইক কোম্পানি এঞ্জিন বসাইল সীটের নীচে,—গ্যাস-ট্যাঙ্ক হুডের নীচে।

লোহার-চাকায় গাড়ীর গতি বাড়িতেছিল না—তার উপর বন্ধুর পথে বহু বিঘ্ন। তখন চাকায় টায়ার লাগানোর পরীক্ষা চলিতে লাগিল। প্রথমে তৈয়ারী হইল সরু টায়ার। চাকাও ছিল বড়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে অড্‌সমোবাইলের চাকায় টায়ার পরানো হইল—সঙ্গে সঙ্গে সব কোম্পানি করিল টায়ারের প্রবর্ত্তন। বৈজ্ঞানিক-বিধিসঙ্গত টায়ার প্রথম লাগানো হয় বুইকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেরিকান মোটর-গাড়ীতে ছিল সরু ছাঁদের টায়ার। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে টায়ারের ছাঁদ হইল মোটা; এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে 'বেলুন'-টায়ারের প্রবর্ত্তন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ৫'২৫ ইঞ্চি টায়ারের আবির্ভাব। এই টায়ার এখনো সচল। এ টায়ারের জান্ খুব; এবং একখানি টায়ারে ৫০০০ মাইল পাড়ি চালানো কঠিন নয়। বেলুন-টায়ারের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে মোটর-বিহারে অপরূপ স্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হইল। তার পর হইল গাড়ীর আসনে স্বাচ্ছন্দ্য আরাম-বিধান। চেহারার সৌন্দর্য্য-বিকাশে প্রত্যেক কোম্পানির সাধনার আজ বিরাম নাই! এবং এই সাধনায় মোটর-গাড়ীর দাম কমিয়াছে অসম্ভব হারে। দাম আরো কমিবার সম্ভাবনা ছিল—সঙ্গে সঙ্গে মোটরের আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধি! যদি এই কালান্তক যুদ্ধ না ঘটিত তাহা হইলে হয়তো আমাদেরো গাড়ী কিনিবার সামর্থ্য হইত।

নাহঙ্কারাৎ পরো রিপু

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং—তোমরা রাগ করো না,—একালে তোমরা বিদ্যায় যত পারদর্শী হচ্ছো, বিনয়ের মাত্রা ঠিক সেই পরিমাণে তোমাদের মন থেকে সরে-সরে যাচ্ছে! অতিদর্পে হতা লঙ্কা—এ শুধু কথার কথা নয়। তোমরা একালে মনোবিশ্লেষণ করতে শিখেছো—ঐ ছোট্ট সংস্কৃত কথাটুকুর মানে বুঝে দেখো!

আমাদের দেশে একটা গ্রাম্য কথা চলিত আছে,—বাবারও বাবা আছেন! এ কথার অর্থ হলো এই যে, নিজেকে যত বুদ্ধিমান বলেই ভাবো না কেন, সব সময়ে মনে রেখো, তোমার জ্ঞানের সীমা আছে গণ্ডী আছে! সে গণ্ডীর বাইরে কোথায় কি আছে যখন জানো না, তখন বুদ্ধির দর্প করো কি সাহসে?

আমার মত লিখিয়ে নেই, আমার মত ভাবুক নেই, আমার মত দূরদর্শী নেই—এ-অহঙ্কার কারো সাজে না! এই যে লেখার, চিন্তাশীলতার বা দূরদর্শিতার মাপ করছো, এ মাপ করা তো নিজের মাপ-কাঠিতে! তোমার মাপ-কাঠিটির কি-দাম, তার নির্ণয় হতে পারে বহু জনের বিচারে!

অহঙ্কার জিনিষটা কেবলি দোষের, তা বলি না। অহঙ্কার আসলে ভালোই। যার মনে অহঙ্কার আছে—অধঃপতন থেকে সে রক্ষা পেতে পারে ঐ অহঙ্কারের দৌলতে। অহঙ্কারের জোরে কত লোক দারিদ্র্যে জীর্ণ হয়েও চুরি-জুয়াচুরি প্রভৃতি অপকর্ম্ম করে না—ভিক্ষাবৃত্তিতে নিজেকে নিয়োগ করতে পারে না! অহঙ্কারে মানুষ ছ্যাবলামি করতে পারে না। সুতরাং মনে অহঙ্কার থাকা ভালো—তাতে মানুষ হবার সম্ভাবনা থাকে। যার মনে অহঙ্কার নেই, তার পক্ষে বড় হবার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু অহঙ্কার প্রকাশ অর্থাৎ জাঁক করা—তাতে মূঢ়তা জাহির হয়। জাঁক করায় সকলে ব্যঙ্গ করে, ঘৃণা করে। ঘৃণাই হওয়া কাম্য নয়, নিশ্চয়।

এক জন নৈয়ায়িকের মনে মনে অহঙ্কার ছিল, তিনি সর্ব্বজ্ঞ! সব জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেছেন! এক দিন তিনি নৌকোয় করে নদী পার হচ্ছিলেন। নৌকোর মাঝি বেচারা কখনো টোলে পড়েনি! টোলে পড়া কি, বেচারী 'অ-আ' অক্ষরও শেখেনি। তাকে নিয়ে পণ্ডিত মশাই জ্ঞানের পরিচয় দিতে লাগলেন। সদর্পে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। মাঝি বেচারী কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না। পণ্ডিত মশাই তাচ্ছিল্য করে তাকে বললেন—

তোমার জীবনটাই মিথ্যা, বাপু! কিছুই জানো না! তার পর আকাশে দেখা দিল মেঘ—সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠলো। নদীতে তুফান—নৌকো টলমল করে! মাঝি তখন বললে,—সাঁতার জানেন পণ্ডিত মশাই? পণ্ডিত মশাই সভয়ে বললেন,—না বাবা! মাঝি বললে—এত বিদ্যা শিখে ঐ একটি সাঁতার-বিদ্যা না শেখার ফলে আপনার জীবন যে একেবারে এবার মিথ্যা হবে! তার পর নৌকো-ডুবি হয়ে পণ্ডিত-মশাইয়ের ভাগ্যে ঘটলো জল-সমাধি। অত জ্ঞান এবং জ্ঞানের অহঙ্কার নিয়েও তিনি প্রাণরক্ষা করতে পারলেন না।

জ্ঞানের বা বুদ্ধির দর্প যে কারো সাজে না, পণ্ডিত মশাইয়ের করুণ কাহিনী থেকে এটুকু সহজে আমরা বুঝতে পারি।

আজ-কালকার ছেলে-মেয়েদের মুখে জাঁকের বহর বেড়ে চলেছে, দেখি। তাদের বিশ্বাস, মা-বাপের চেয়েও তারা বেশী বোঝে। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে মা-বাপের চেয়ে ছেলে-মেয়েরা বেশী শিক্ষা পেয়েছে। তা পেলেও সব বিষয়ে মা-বাপের চেয়েও তারা বড়—এ কথা কি ঠিক? মা-বাপ জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তার দাম কতখানি!

আমাদের ছেলেবেলায় এক জন খুব বড় উকিলকে বলেছিলুম—আপনার বাবার চেয়ে আপনি ঢের বেশী বিদ্বান, না? আপনার বাবা তো শুধু এণ্ট্রান্স পাশ করেছিলেন—আর তিনি করেন অফিসে কেরাণীর কাজ! আপনি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ স্কলার—ইউনিভার্সিটির সব এগ্‌জামিনে ফার্ষ্ট হয়েছেন! তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন,—এতগুলো এগ্‌জামিন পাশ করবার সুযোগ আমার বাবাই আমাকে দেছেন। তাঁর বেলায় তিনি নানা কারণে এ সুযোগ পাননি! বেশী পাশ করলেও সব বিষয়ে আমি বাবার পরামর্শ নিয়ে চলি। তাঁর চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশী, এ কথা আমার মনে জাগে না। আমি জানি, আমি শুধু অনেকগুলো পাশ করেছি মাত্র। আমার বাবাও সুযোগ পেলে এতগুলো পাশ করতে পারতেন।

এই মহানুভব ভদ্রলোক পরে হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন! তাঁর এ-কথার অর্থ যদি বুঝতে পারো, তা হলে বুঝবো, তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি সত্যি তারিফ পাবার যোগ্য।

অতি-দর্প যেমন ভালো নয়, অতি-বিনয়ও তেমনি খারাপ। সব সময়ে মনে রেখো এই বাংলা ছড়াটি—

অতি বড় হয়ো না, ঝড়ে পড়ে যাবে।
অতি ছোট হয়ো না, ছাগলে মুড়াবে।

জীবনে এই নীতি মেনে চলা উচিত। চললে সুখ পাবে, শান্তি পাবে।

তোমার একটা-গুণ আছে বলে' সে-গুণের অহঙ্কার যখনই তোমার মনে জাগবে, তখনি মনকে বুঝিয়ে বলবে, আমার এ-গুণ আছে, কিন্তু পৃথিবীতে এত লোক, তাদের অন্য অন্য কত গুণ আছে। এই ভাবে মনকে যদি ঠিক করতে পারো তাহলে দর্প-অহঙ্কার প্রকাশের অর্থাৎ জাঁক করার মূঢ়তা থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব হবে। অহঙ্কারে মানুষের পতন অবশ্যম্ভাবী। যিনি বড় উকিল, বড় লেখক, বড় সমালোচক—যেদিন ওকালতি, লেখা বা সমালোচনার দর্প করবেন, সেদিন থেকে তাঁর ওকালতির বিদ্যায় ধরবে ঘুণ—লেখায় ঘটবে অসতর্ক স্বেচ্ছাচারিতা—সমালোচনায় আলোচনা মুছে নিশ্চিহ্ন হবে—এ কথা কতখানি সত্য, বড় বড় লোকের শোচনীয় পতন-কাহিনী আলোচনা করলেই তা বুঝতে পারবে।

অশোক-গুচ্ছ

(ফরাসী লেখক ফারনান্দ বিসিয়ারের রচিত গল্পাবলম্বনে)

১

শিশু যুবরাজ মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে চিকিৎসকগণ রোগীকে পরীক্ষা করিয়া এক-বাক্যে বলিয়াছিলেন—তাঁহাদের যাহা সাধ্য তাহা তাঁহারা করিয়াছেন; যুবরাজের জীবনের আর কোন আশা নাই। তাঁহাদের অভিমত শুনিয়া সম্রাট্ তাঁহাদের সকলকেই কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া আদেশ দিয়াছিলেন—পরদিন তাঁহাদের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে। ইহাই তাঁহাদের অযোগ্যতার শাস্তি।

সম্রাট্ দেশের অন্যান্য চিকিৎসকগণকে যুবরাজের চিকিৎসার জন্য আহ্বান করিলে দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে বহু বিজ্ঞ বৃদ্ধ চিকিৎসক শুভ্র দাড়ির নিশান উড়াইয়া যুবরাজের মৃত্যু-শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু যুবরাজের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই জানাইলেন—রাজপুত্রের অন্তিম-কাল উপস্থিত, চিকিৎসায় তাঁহার আরোগ্যলাভের আশা নাই; এবং তাঁহাদিগের চিকিৎসা-শাস্ত্রে এই প্রকার অদ্ভুত রোগের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে আনাইয়াও কোন ফল হইল না। সম্রাট্ সক্রোধে আদেশ করিলেন, এই সকল ভণ্ড চিকিৎসকের গলদেশ রজ্জুবদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে নগরের রাজপথ দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে এবং রাজদূতগণ অশ্বারোহণে তাহাদের পুরোবর্ত্তী হইয়া ঘোষণা করিবে—ইহারা দেবতার বংশধরের প্রাণ-রক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় অতি-কঠোর নির্য্যাতন-সহকারে নিহত হইবে!

অতঃপর সম্রাট রাজকীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মস্তকে কিরীট ও হস্তে তীক্ষ্ণধার তরবারি ধারণ করিয়া যুবরাজের শয্যাপ্রান্তে আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু অশ্রুহীন। তাঁহার ধারণা হইল—তিনি যুবরাজের পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহস পাইবে না।

সম্রাটের সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ বর্ম্মে আবৃত দেহে যুবরাজের শয়ন-কক্ষে পাহারা দিতে লাগিল। অদূরে মার্ব্বল-মণ্ডিত প্রশস্ত সোপানশ্রেণীর উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান পিত্তল-নির্ম্মিত সারসসমূহের ওষ্ঠে স্থাপিত দীপাধারগুলিতে উজ্জ্বল আলোকমালা প্রজ্বলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতে লাগিল। সুদৃশ্য শিরস্ত্রাণধারী অশ্বারোহী সৈন্যগণ তীক্ষ্ণাগ্র বর্শা উদ্যত করিয়া প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতে লাগিল। ধনুর্ব্বাণধারী সৈন্যগণ প্রাসাদের ছাদে সমবেত হইয়া গগনবিহারী মেঘমালা লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। দামামা-বাদকগণ প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে রণ-দামামা ও ডিণ্ডিম বাজাইতে আরম্ভ করিল। সম্রাটের ধারণা হইল—এই প্রকার বিরাট আয়োজনে যমদূতেরা প্রাণভয়ে প্রাসাদ-সন্নিধানে আসিতে পারিবে না।

নগরমধ্যেও নগরবাসিগণের দৈনিক কার্য্যে বাধা ঘটিল। নৌকাসমূহ পাল গুটাইয়া নদীতীরে রজ্জুবদ্ধ, বাজারের দোকানগুলির

খায় রুদ্ধ। পাষাণ-নির্ম্মিত এক বিশালকায় বুদ্ধ-মূর্ত্তি একটি পদ্মপত্রে উপবিষ্ট। এই মূর্ত্তির যুগল হস্ত একত্র সন্নিবিষ্ট পদযুগলের উপর সংস্থাপিত। নগরের নর-নারীবর্গ মশালের আলোয় বিপুল বাদ্যধ্বনির মধ্যে মাটীতে মুখ গুঁজিয়া, উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া সেই দেবমূর্ত্তির সম্মুখে পড়িয়া সশব্দে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

অন্য দিকে সম্রাটের প্রাসাদের শয়ন-কক্ষে স্বর্ণসূত্র-খচিত চীনাংশুকে আবৃত-দেহ যন্ত্রণা-ব্যথিত যুবরাজ নিস্তব্ধ ভাবে শায়িত। তাঁহার শীর্ণ বক্ষস্থল ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতেছিল; অসাড় দন্তশ্রেণীর ভিতর হইতে মধ্যে মধ্যে অব্যক্ত আর্ত্তধ্বনি নিঃসারিত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয় আন্দোলিত করিয়া তিনি যেন তাঁহার শ্বাসরোধকারী কোন অদৃশ্য ভার অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই কক্ষের অদূরবর্ত্তী অন্য এক কক্ষে সহচরীবৃন্দে পরিবৃতা সম্রাজ্ঞী মেঝের উপর নতজানু উপবিষ্ট ছিলেন, এবং তাঁহার রোদনধ্বনি রেশমী পর্দ্দা ও পিত্তল-নির্ম্মিত দ্বার ভেদ করিয়া মরণাহত যুবরাজের কর্ণগোচর হইতেছিল। যুবরাজ ধীরে ধীরে পিতার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, এবং আয়ত নেত্রদ্বয় তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করায় চক্ষে অস্বাভাবিক দীপ্তি প্রতিভাত হইল। পিতাকে অস্ফুট স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহার মাতা তাহার রোগশয্যা-পার্শ্বে আসেন নাই কেন, এবং সৈন্যমণ্ডলী তীক্ষ্ণ-ধার অস্ত্রে সজ্জিত থাকিলেও কি কারণে তাঁহার রোগযাতনা হ্রাস করিতে অসমর্থ হইয়াছে? সম্রাট্ তাহার এই প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার সৈনিকগণকে ইঙ্গিত করিবামাত্র অশ্বারোহীরা তাহাদের হাতের বর্শা সবেগে আন্দোলিত করিতে লাগিল এবং ধনুর্ব্বাণধারী সৈনিকগণ প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে দামামাগুলি আরও প্রচণ্ড শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। সম্রাট্ তখন তাঁহার পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "যুবরাজ, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে ঘুমাও, তোমার বিশ্বস্ত সৈনিকগণ তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত আছে।"

কিন্তু যুবরাজের চক্ষুর্দ্বয় অধিকতর বিস্ফারিত হইল, এবং তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশঃ মৃদু হইয়া আসিল।

২

সহসা সেই কক্ষের সোপানশ্রেণীর প্রান্তে কাহারও পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ সক্রোধে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার বিনানুমতিতে কে তাঁহার প্রাসাদ-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সম্রাট পুত্রের হাত ছাড়িয়া কোষবদ্ধ অসি-মুষ্টি স্পর্শ করিলেন। সেই সময় এক জন সৈনিক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

সম্রাট্ তাহাকে সক্রোধে বলিলেন, "শীঘ্র বল্, কে আমার প্রাসাদে অনধিকার প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছে?"

সৈনিক আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিল, "সম্রাট্, সে এক বৃদ্ধ।"

সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি তাহার প্রার্থনা?"

সৈনিক বলিল, "শুনিলাম, সম্রাট্‌কে সে কোন জরুরী কথা বলিতে আসিয়াছে।"

সম্রাট্ এবার ক্রোধের পরিবর্ত্তে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কি! আমাকে সে তাহার জরুরী কথা বলিতে আসিয়াছে? আমার পূর্ব্বপুরুষের সৌভাগ্য বটে! আমি যে কি কারণে এখনও তোমার ও তোমার সহযোগী সৈনিকগণের কাঁধে মাথা রাখিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! যাও, তোমার ঘাঁটীতে ফিরিয়া যাও, আমি পরে তোমার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা করিব।"

সৈনিক ভয়কম্পিত দেহে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। অন্যান্য সৈনিক তাহাদের ভাগ্যফল জানিবার জন্য মুক্ত তরবারি-হস্তে সেই স্থানে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সেই সময় এক জন বৃদ্ধ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সম্রাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার শ্মশ্রুরাশি তুষারশুভ্র। তাহা তাঁহার নাভিদেশ পর্য্যন্ত প্রলম্বিত। তাঁহার পরিধানে রেশমি পরিচ্ছদ, দীর্ঘকালের ব্যবহারে তাহা জীর্ণ, বিবর্ণ। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বংশ-নির্ম্মিত সুদীর্ঘ যষ্টি, বামহস্তে শুষ্কপ্রায় অশোক-গুচ্ছ।

বৃদ্ধকে তাঁহার সম্মুখে সরল বংশযষ্টির ন্যায় দণ্ডায়মান দেখিয়া সম্রাট্ ক্রোধে হুঙ্কার ছাড়িলেন; কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহার ক্রোধে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রসারিত হস্তে বলিলেন, "আমি আপনার পীড়িত পুত্রের প্রাণরক্ষা করিতে আসিয়াছি শুনিয়া আপনার অনুচরগণ আমাকে এখানে প্রবেশ করিতে দিয়াছে সম্রাট্!"

সম্রাট্ বিচলিত স্বরে বলিলেন, "কি বলিলে? আমার পীড়িত পুত্রের জীবন-রক্ষা করিবে—তুমি?"

উত্তর হইল, "হাঁ, আমি।"

অতঃপর বৃদ্ধ সম্রাটের ক্রোধ-রক্তিম মুখের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে যুবরাজের শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন।

সম্রাট্ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "শোন বৃদ্ধ, যদি তোমার কথা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে যাহারা তোমাকে এখানে আসিতে দিয়াছে অগ্রে তাহাদের সকলেরই প্রাণ বধ করিয়া আমার কোটালকে আদেশ করিব, সে তোমার দেহার্দ্ধ মাটীতে পুঁতিয়া অবশিষ্টাংশ কুকুর দিয়া ছিঁড়িয়া খাওয়াইবে।"

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমার এই প্রাচীন বয়সে আত্মা ও দেহের যোগসূত্র এতই সূক্ষ্ম ও জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে যে, তোমার প্রদত্ত শাস্তি তাহার আর কি অধিক ক্ষতি করিবে?"

সম্রাটের ইঙ্গিতে প্রহরীরা যুবরাজের শয্যাপ্রান্ত হইতে সরিয়া দাঁড়াইলে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে তাঁহার শয্যার নিকট উপস্থিত হইলেন।

তিনি মুমূর্ষু যুবরাজের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি ঠিক সময়েই আসিয়াছি। যদি তোমার সৈনিকগণ আমার আগমনে বাধা দান করিত, তাহা হইলে তোমার পুত্র ইহার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিত।"

সম্রাট্ সভয়ে বলিলেন, "এখন উপায়?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি এই যে অশোক-গুচ্ছ আনিয়াছি, ইহা তোমার পুত্রের বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলে তাহার দেহে জীবনী-শক্তির পুনঃসঞ্চার হইবে।"

সম্রাট আদেশ করিলেন, "সেইরূপই করা হউক।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি প্রথমে জানিতে চাই—ইহার বিনিময়ে আমি সম্রাটের নিকট কি পাইব?"

৩

ক্রোধে সম্রাটের চোখ-মুখ লাল হইল; তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "ওরে হতভাগা, আমার পুত্র

মৃত্যুশয্যাশায়ী, মরণোন্মুখ। এ সময় আমার নিকট পুরস্কারের দাবী করিতে তোর সঙ্কোচ নাই? তুই জানিস্—আমিই সকলের মালিক?"

বৃদ্ধ অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "হাঁ, হয়ত আমাদের সকলের জীবনের; কিন্তু আমাদের ইচ্ছা পরিচালিত করিবেন সম্রাটের সে শক্তি নাই।"

সম্রাট্ বলিলেন, "তোমার স্মরণ থাকা উচিত—ঐ শয্যাশায়ী বালক তোমার সম্রাটের পুত্র হইলেও স্বর্গবাসী দেবগণের সন্তান।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "প্রত্যেক বালকই দেবতার পুত্র। আর যদি তুমিও দেবতা হও তাহা হইলে এই বৃদ্ধের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন কি?"

সম্রাট বলিলেন, "আমার ইচ্ছা হইতেছে, এই মুহূর্ত্তে তোমাকে হত্যা করিয়া তোমার ঐ শুষ্ক পুষ্পস্তবক হস্তগত করি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সম্রাটকে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমি মৃত্যুভয়ে কাতর নই। আমি এখন এরূপ বৃদ্ধ হইয়াছি, এত কাল ধরিয়া আমি জীবিত আছি যে, চিরশান্তি লাভ ভিন্ন অন্য কামনা আমার নাই। কিন্তু আমার এই ঔষধে ফললাভ করিতে হইলে আমার স্বহস্তে ইহা প্রয়োগ করা প্রয়োজন।"

সম্রাট্ বলিলেন, "তাহা হইলে বল বৃদ্ধ,—কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা তোমার প্রার্থনীয়, এই মুহূর্ত্তেই তাহা তোমাকে প্রদান করা হইবে।"

বৃদ্ধ বলিলেন; "অর্থ কেবল অহঙ্কার বৃদ্ধি করে। যদি অর্থই আমার কাম্য হইত তাহা হইলে শাস্ত্রোপদেশের অনুসরণেই আমি প্রচুর অর্থলাভ করিতে পারিতাম। আমি গিরিগুহাবাসী যোগী, আমি যৎসামান্য ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করি। নির্ঝরের নির্ম্মল জলে আমার পিপাসা নিবৃত্তি হয়। সম্রাটের ধনভাণ্ডারে বিপুল অর্থ থাকিতে পারে—কিন্তু আমি মনে করি, সম্রাট্ অপেক্ষা আমি অধিকতর ধনবান্। অধিকতর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।"

সম্রাট্ বলিলেন, তবে তুমি কি সম্মানের প্রার্থী?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তাহারই বা প্রয়োজন কি! উহা যুবকগণের প্রিয় ক্রীড়নক। এ বয়সে সম্মান আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না।"

সম্রাট দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "শোন বৃদ্ধ, তুমি সম্মান চাও না, কিন্তু তোমার জন্য আমি এক বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করাইব, এক শত স্বর্ণস্তম্ভের উপর তাহার গগনস্পর্শী চূড়া বিরাজ করিবে! শত শত স্বর্ণদীপের উজ্জ্বল প্রভায় তাহার অভ্যন্তর-ভাগ দিবারাত্রি আলোকিত হইবে। তাহার মধ্যে আমি তোমার স্বর্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিব। চারণগণ সেই মন্দিরে বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিবে। যে ব্যক্তি তোমার স্বর্ণমূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত না করিবে, আমি তাহার প্রাণদণ্ড করিব।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই মন্দির নির্ম্মিত হয়। কোন মানুষই দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, এবং তাহার পূজা করিতে কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা কাহারও কর্ত্তব্য নয়।"

"তবে তুমি কি চাও? তুমি যে আদেশ করিবে, তাহাই পালিত হইবে।"—এই কথা বলিয়া সম্রাট্ বৃদ্ধের সম্মুখে সর্ব্বপ্রথম মস্তক অবনত করিলেন। তাহার পর মৃদু স্বরে বলিলেন, "তবে কি আমার সাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশ এবং আমার এই বিশাল প্রাসাদ অধিকার করিতে চাও?"

বৃদ্ধ এবারও মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে যুবরাজ অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাঁহার হাত-পা আড়ষ্ট হইল এবং বক্ষের স্পন্দন রহিত হইল।

যুবরাজ প্রাণত্যাগ করিলেন।

সম্রাট্ আর্ত্ত স্বরে বলিলেন, "আমার পুত্রের মৃত্যু হইল!" তিনি তাঁহার রাজদণ্ড বৃদ্ধের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "যদি আমার সাম্রাজ্যই তোমার প্রার্থনীয় হয়, তবে এই রাজদণ্ড গ্রহণ কর বৃদ্ধ! যে হতভাগ্য তাহার পুত্রকে মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না, সাম্রাজ্যের অধিকার তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র! উহা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি।"

সম্রাট তাঁহার পুত্রের শয্যাপ্রান্তে মস্তক অবনত করিয়া মৃত পুত্রের হস্ত চুম্বন করিলেন; এবার তাঁহার উভয় চক্ষু হইতে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল।

সম্রাটের সৈনিকগণ সম্রাটকে এই সর্ব্বপ্রথম রোদন করিতে দেখিয়া গভীর বিস্ময়ে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল! দামামা-ধ্বনি সহসা নীরব হইল। সেই সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদে নিবিড় স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। সকলেই যেন মোহাচ্ছন্ন! তাহাদের মধ্যে কেবল সেই বৃদ্ধই একাকী দণ্ডায়মান রহিলেন। উজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মহামূল্য আসবাবপত্রে প্রতিফলিত হইল। প্রাসাদ-প্রান্তস্থ সুবিস্তীর্ণ উপবন সুমধুর বিহঙ্গ-কাকলীতে মুখরিত হইতে লাগিল। বিহঙ্গকুলের হর্ষ-সঙ্গীত ভিন্ন কোন দিকে শব্দ মাত্র শ্রবণ-গোচর হইল না!

অতঃপর বৃদ্ধ বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহার হস্তস্থিত অশোক-গুচ্ছ প্রথমে মৃত যুবরাজের বিবর্ণ ওষ্ঠে, পরে তাঁহার নিস্পন্দ বক্ষে স্পর্শ করাইলেন! মুহূর্ত্ত মধ্যে বিস্ময়কর ফল লক্ষিত হইল! রাজপুত্রের নিস্পন্দ হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল, বিবর্ণ মুখমণ্ডল শোণিত-রাগে রঞ্জিত হইল এবং তাঁহার হস্তপদের অবসাদ বিলুপ্ত হইল।

যুবরাজের দেহে প্রাণসঞ্চার হওয়ায় তিনি মাথা তুলিয়া সবিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সকলকে নতজানুতে সেই কক্ষে বসিয়া-থাকিতে দেখিয়া সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমার শিক্ষকের সঙ্গে কি এখনও আমার বাগানে বেড়াইতে যাইবার সময় হয় নাই?"

সম্রাট উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আশ্চর্য্য! অতি অদ্ভুত ব্যাপার! ছেলে আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে!"

তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আবেগ-ভরে পুনঃ পুনঃ তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন; তাহার পর সৈনিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা সম্রাজ্ঞীকে ডাকিয়া আন, তাহার পর নগরে মহোৎসবের ঘোষণা কর। আমার আদেশ, সকলে রাজকীয় উৎসবে যোগ দান করিবে। যুবরাজের প্রাণরক্ষা হইয়াছে; আজ রাত্রিকালে রাজধানী আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইবে। রাজকোষের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রাসমূহ দরিদ্রগণের জন্য নগরের পথে পথে বর্ষিত হইবে। দেবালয়সমূহের ঘণ্টাগুলি দিবারাত্রি ধ্বনিত হইবে এবং চারণগণ উচ্চৈঃস্বরে দেবমহিমা কীর্ত্তন করিবে।"

অনন্তর সম্রাট বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আর তোমার কথাও আমি ভুলিব না বৃদ্ধ! আজ হইতে তুমি আমার সিংহাসনে আমার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিবে। তোমার প্রত্যেক আদেশ সম্রাটের আদেশের ন্যায় পালিত হইবে।"

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না সম্রাট্, কোন দ্রব্যেই আমার প্রয়োজন নাই। আমার একমাত্র প্রার্থনা, আমি যে স্থান হইতে আসিয়াছি, সেই স্থানে আমাকে প্রত্যাগমন করিতে দেওয়া হউক। আমি শীঘ্রই চিরশান্তি লাভ করিব—এইরূপই আমার আশা। আমি যুবরাজের জীবন রক্ষা করিয়াছি—এ-কথাও সত্য নয়। সম্রাট্, আপনি স্বয়ং তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। কারণ, আপনি দেবগণকে এমন দুইটি দ্রব্য দান করিয়াছেন, যাহা তাঁহাদের হৃদয় অনুকম্পায় পূর্ণ করিতে পারে। আপনি জানু নত করিয়াছেন, এবং অশ্রুপাত করিয়াছেন।"

অতঃপর বৃদ্ধ সৈনিকমণ্ডলীর ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহিরে চলিলেন। সৈনিকগণ তাহাদের অস্ত্র অবনত করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সম্রাটকে বলিলেন, "এ-কথা কোন দিন বিস্মৃত হইও না যে, তোমাদের সকলের উপর এক জন সুমহান্ মালিক আছেন—তাঁহার নিকট এক বিন্দু অশ্রু তোমার সৈনিকগণের সকল অস্ত্র-শস্ত্র অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, এবং তোমার রাজমুকুট ও রাজকোষের সমস্ত ধনরত্ন অপেক্ষা তাহা অধিক মূল্যবান্।"

বৃদ্ধ অদৃশ্য হইলে সম্রাট্ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "দেবতা তুমি, আমাকে তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশেরও অবসর দিলে না প্রভু! তোমাকে কিছুই আমার অদেয় ছিল না! কিন্তু পার্থিব সাম্রাজ্য তোমার নিকট তুচ্ছ!"

দীনেন্দ্রকুমার রায়

মধু-জ্যোৎস্না

[গল্প]

ভালো ভাবেই বি-এ পাশ করি। যে-কলেজ হইতে পাশ করি, সেখানে কোন বিষয়ে 'অনার্স কোর্স' ছিল না, তাই শুধু কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়াছিলাম। অর্থের অসংস্থান, কাজেই কি করিব, ঠিক করিতে পারিতেছি না। এমন সময় আমাদের সাহিত্য-সভায় আর্ট সম্বন্ধে এক দিন এক প্রবন্ধ পড়িলাম।

আমি নব্য নই, নবতম মনোভাবও আমার নাই। আমি বলিয়াছিলাম, সার্থক ও সুন্দর আর্ট আত্মার অভিব্যক্তি। আর্ট যেখানে মানুষকে মহৎ প্রকাশের দিকে পরিচালিত না করে, সেখানে তাহা ব্যর্থ। সুন্দর সেইখানেই সুন্দর, যেখানে সে আত্মাকে উর্দ্ধগামী করে; মানুষকে মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। মানুষের আত্মাকে যাহা অধোগামী করে, যাহা উর্দ্ধাভিযানের পথে বাধা দেয়, সে-আর্ট সৌন্দর্য্য নয়, সত্যের অন্তরায়!

রাধামাধবপুরের জমিদার নিত্যনারায়ণ বাবু সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের গ্রামে একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন। স্কুলের জন্য এক জন শিক্ষক খুঁজিতেছিলেন। আমার প্রবন্ধ-পাঠের পর আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুমি আমাদের শিক্ষায়তনে যেতে রাজী আছো?"

সুযোগ পাইলাম! তাঁহাকে অবহেলা করা আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না, তথাপি বলিলাম,—"কিন্তু আমি এম-এ পাশ করতে চাই···জীবনের সমস্ত উচ্চাশা বিসর্জ্জন দিতে পারি না।"

নিত্যনারায়ণ বাবু বলিলেন,—"তার অসুবিধা হবে না, আমি তার সুযোগ করে দেবো—"

"তাহলে আমি রাজী আছি।"

এই আলোচনার কয়েক দিন পরে তল্পি-তল্পা বাঁধিয়া রাধামাধবপুরে আসিলাম। নিত্যনারায়ণ বাবুর বাড়ীটি চমৎকার। দু'টি মহল—সদর এবং অন্দর। দুই মহলের মাঝে বড় নাটমন্দির। বাহিরের ঘরে আমার স্থান হইল।

বাড়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সামান্য। আহারের সময় ঘণ্টা পড়ে—শুনিয়া খাইতে যাই আমলাবর্গের সহিত। অবশ্য সকালবেলায় তাড়াতাড়ি যাইতে হয়, তখন একা বসিয়া ভোজন শেষ করি। ক'দিন পরে হঠাৎ নিত্যনারায়ণ বাবুর দুই মেয়ের সহিত দেখা হইয়া গেল। আমি যে ঘরে থাকি ও পড়াশুনা করি, তাহার ও-ধারের ঘরে মেয়েরা পড়াশুনা করে। আমি পরীক্ষার্থী বলিয়া আমাকে তাদের পড়ানোর ভার দেন নাই।

সে-দিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা—পড়ায় মন ছিল না—বাহির হইয়া একটু বেড়াইব ভাবিতেছি, নাটমন্দিরের পাশে ফুলের বাগান। সেখানে অজস্র গোলাপ ফোটে। তাহারই পাশে পায়চারি করিতেছিলাম।

মেয়েরা আসিল—বড়টি অষ্টাদশী, ছোটটি ষোড়শী। সেই চন্দ্রালোকে তাহাদিগকে বেহেস্তের পরীর মত সুন্দর দেখাইতেছিল। যৌবনের ললাম-লাবণ্যে বড়টি ঝলমল করে, ছোটটি তত সুন্দর নয়। তাহার উপর

বড়র চোখে-মুখে বয়ঃসন্ধির লজ্জাতুর রক্তিমা। বড়র নাম সন্ধ্যা, ছোটর নাম এলা। সন্ধ্যার প্ররোচনায় এলা বলিল, "মাষ্টার-মশাই, আমাদের ক'টা ফুল তুলে দিন না!"

এলার দিকে না চাহিয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিলাম! তাহার জ্যোতির্ম্ময় চোখে কৌতুকের আভাস! আমি স্বল্প-ভাষী, কাব্যচর্চ্চা করি···বাক্‌চাতুর্য্য জানি না। বলিলাম, —"ফুল কি হবে?"

এলা বিনম্র স্বরে বলিল,—"দিদি খোঁপায় পরবে।"

বাক্য-ব্যয় না করিয়া ফুল তুলিয়া দিলাম।

পল নিরনের অর্দ্ধ-বিকশিত ফুল! ফুল লইয়া দু'জনে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। দু'জনের চাপা হাসি ও উচ্ছ্বাস ফাল্গুনের দক্ষিণ বাতাসে ভাসিয়া আসে—হাসির কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমি হতবাক্ চাহিয়া থাকি!

পরে শুনিয়াছিলাম এবং জানিয়াছিলাম—নিত্য-নারায়ণ বাবু বাড়ীর মধ্যে বলিয়াছিলেন—"নীরেন ভারী ভালো ছেলে। এলার সঙ্গে তার বিয়ে দিলে মন্দ হয় না।" জমিদার-গৃহিণী বলিয়াছিলেন, "বিদ্যে নিয়ে কি হবে? যার ঘরে লক্ষ্মী নেই, তার হাতে আমি মেয়ে দেবো না!"

দুই বোনে এ-কথা শুনিয়াছিল। সন্ধ্যা এলাকে বলিয়াছিল, "তুই মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে কথা কইতে পারবি না—সে তোর হবু বর।"

এলা বলিয়াছিল,—"খুব পারবো।"

ইহা লইয়া দুই বোনে বাজি হয়। এলা বাজি জিতিল। আমি কিন্তু এ-কথা জানিতাম না।

মধুমাধবীর সেই রাত্রে সন্ধ্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া-ছিলাম। বাহিরে মধু-জ্যোৎস্না—আমার হৃদয়েও সন্ধ্যা মধু-জ্যোৎস্না আনিয়া দিল। প্রথম সাক্ষাতে প্রেম হয়, কাব্যে পড়িয়াছি, কিন্তু আমার জীবনে তাহা সত্য হইয়া উঠিল।

স্বচ্ছ কোমল জ্যোৎস্না। রহস্যময় শুভ্রতায় জগৎ যেন হাসিতেছে! বর্ণ-বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীর আদিম নর যেন আমি,—আর আদিম নারী সন্ধ্যা! বিস্ময়ের কাব্যের এই তো জাগরণ! আমি কবি নই, শিল্পী নই, রূপ-কার নই—এই যে অনুভূতি, ইহা আর্ট? ইহা সত্য?

শেলীর কাব্যে পড়িয়াছি—

পতঙ্গ তারার পানে চায় প্রেম-ভরে
রাত্রি ছোটে নিরন্তর উষসীর তরে।
পাড়ি দিয়ে দুঃখময় মর্ত্ত্যের পাথার
এ যেন সুদূর লোকে ঊর্দ্ধ অভিসার!

আপনারা হাসিতেছেন?

কিন্তু জীবনে কেবল প্রভুত্বের ক্ষমতার বিশ্বাসেরই স্থান আছে, তা নয়! রসেরও স্থান আছে। রসের স্পর্শ যখন আসে, জীবন তখন মধুময় হইয়া ওঠে। রসের আয়নায় জগৎ রূপময় হইয়া ওঠে!

সন্ধ্যাকে সে দিন সত্যই ভালো বাসিয়াছিলাম। কিন্তু এ ভালোবাসা এক-পক্ষে,—তাহা জানিতাম। আমি আমার ভালোবাসার রূপে রাঙাইয়া সব দেখিতাম। তাই ভাবিতাম, সন্ধ্যার নয়নের বাণী···প্রেমের!

ইহার পরদিন পড়া ভুলিলাম, স্কুলের কাজ ভুলিলাম —যেন এক গোলকধাঁধায় ঘুরিতে লাগিলাম।

যাওয়া-আসার পথে অজানিতে সন্ধ্যার দিকে চাহিতাম, কিন্তু তাহার দৃষ্টিপথে পড়িবার পূর্ব্বেই চোখ ফিরাইতাম। এই সময় মনে হইত, সন্ধ্যার চোখে কুটিল কৌতুকের হাসি!

কিন্তু সে কৌতুককে আমি মধুময় রসের প্রকাশ মনে করিতাম। বাস্তবতা নয় জানি! কিন্তু কি তাহাতে ক্ষতি! অবাস্তব যদি হৃদয়ে আনন্দের মধু-পসরা উজাড় করিয়া দেয়, তবে বাস্তবের প্রয়োজন কি?

মিথ্যা ও ভ্রম এই অবাস্তবকে আরো ঘোরালো করিয়া তুলিল। জমিদারের নায়েব সদাশিব বাবুকে বিশেষ আমল দিই নাই। বৃদ্ধের মাথায় টাক পড়িয়াছে, কিন্তু চোখের জ্যোতি কমে নাই। সে জ্যোতি যেন রঞ্জন-রশ্মির মত হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করে!

এমনিতে বৃদ্ধ মৃদুভাষী। এত দিন বিশেষ কোন আলাপ-পরিচয়ও হয় নাই।

স্তিমিত প্রদীপালোকে কবিতা লিখিব ভাবিতেছিলাম —কবিতার নাম হইবে রূপসী।

সে রূপসী থাকে নদীপারের গাঁয়ে! রাখাল যখন ধেনু চরায়, বাঁশী বাজায়, তখন নদীতীরে তার নীল আঁচলের রেখা কেতনের মত ওড়ে, জ্যোৎস্নায় যখন মাঠ-বাট ভরিয়া যায়, তখন তার বাঁশীর সুরে সুদূর প্রাসাদের বাতায়ন খোলে···আর চোখে পড়ে তার আবছায়া মূর্ত্তি! এইটুকুই সম্বল, রাখাল তাহাতেই তৃপ্ত!

বৃদ্ধ তক্তাপোষের পাশে যে চেয়ারখানি ছিল, তাহাতে বসিয়া বলিলেন, "কি করছেন?"

থতমত খাইয়া উত্তর দিলাম···"আজ্ঞে কিছু নয়··· এমনই···"

আমার অসংলগ্ন আলাপে তিনি কি ভাবিলেন, তিনিই জানেন। কিন্তু আমার চিত্ত-বিক্ষেপের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন, "বাবাজী, আপনি খুব ধীমান্। বিলাত গেলেই আপনার প্রতিভার পরিচয় দিতে পারবেন···"

হাসিলাম। বলিলাম,—"জানেন ত আমার অবস্থা!"

"সাধারণ গৃহস্থের ছেলে, তা জানি। কিন্তু আমি উপহাস করবার জন্য বলছিনে।"

কৌতূহল জাগ্রত হইল। বলিলাম,—"তবে?"

"মহারাজ গুণগ্রাহী। তিনিই আপনাকে পাঠাবেন।"

"আমি গরীব বটে, কিন্তু কারও দান গ্রহণ করতে পারবো না।"

"দান নয় বাবাজী···যৌতুক! আপনি ভেবে দেখুন, ···মায়েদের দেখেছেন···শিবের মত ভাগ্য না হলে এমন মা-ভগবতী সহজে মেলে না।···আপনি ভেবে দেখুন···"

বৃদ্ধ বাক্যান্তর না করিয়া উঠিলেন।

আমি ভাবিতে বসিলাম। জীবনে এই যে সুবর্ণ সুযোগ আসিল···ইহা কাহার ভাগ্যে? আমার? না, সন্ধ্যার?

ছায়া-ছবির মত নানা ছবি স্বপ্নালু আমার চোখে ভাসিয়া যায়।

সে-দিনের মধু-জ্যোৎস্না-পূর্ণিমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য যে-দিন সন্ধ্যার বধূবেশে মিলিত হইবে, সে-দিনের সেই দীপ্ত মাধুরী আমার চোখে ভাসিতে লাগিল!

ক'দিন পরের কথা···নিত্যনারায়ণ বাবু অন্দরের পাঠ-কক্ষে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এই বৈশাখেই সন্ধ্যার বিয়ে ঠিক হলো। জামাই ডেপুটি হয়েছে। দশ দিন ছুটি নিয়ে আসবে···তোমার যদি মত হয়, তবে এলার বিয়েও এই সঙ্গে দিতে চাই।"

এ কি বিস্ময়! এ কি পরিবর্ত্তন!

অবশ্য সদাশিব বাবু সন্ধ্যার কথা বলেন নাই··· কিন্তু আমি যে সন্ধ্যাকে ভালোবাসিয়াছি···তাঁহার আলাপে সন্ধ্যাকেই পাইব, এই ভরসা করিয়াছিলাম! সে স্বপ্ন আজ বাস্তবের রূঢ় স্পর্শে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন, "না, এতে তোমার লজ্জার কারণ নেই! অবশ্য তোমার অভিভাবকদের কাছে কথা উত্থাপন করবো! কিন্তু তার আগে তোমার মত জানতে চাই।···রূপে-গুণে তারা অযোগ্য নয়। কিন্তু তবু তাদের যারা বরণ করবে···তারা যেন তাদের শ্রদ্ধায়-সম্ভ্রমে বরণ করে, এই আমি চাই। বিভূতির সঙ্গে সে-বার দেওঘরে আমাদের পরিচয়, সেই-খানেই সন্ধ্যার বিয়ে ঠিক হয়।"

বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে গিয়াছিলাম, উদ্বাহু বামনের সে দুরাশা দুরাশাই! আমার সমস্ত মুখ লজ্জায় বেদনায় পাংশু হইয়া গেল। আত্মস্থ হইয়া আমি বলিলাম,···"আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনার মেয়ের যোগ্য নই।"

নিত্যনারায়ণ রায় অভিমানে আরক্ত হইয়া উঠিলেন। উদ্গত ক্রোধ কষ্টে চাপিয়া তিনি বলিলেন—"সদাশিব কিন্তু অন্য রকম বলেছিল।"

"তিনি ভুল বুঝেছিলেন হয়তো!"

এই কথা বলিয়া না দাঁড়াইয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

যে স্বপ্ন-জগৎ গড়িতেছিলাম, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু বাহিরে ভাঙ্গে, ভাঙ্গুক, অন্তরে সে-স্বপ্ন চিরন্তন হইতে পারে!

সদাশিব ফিরিয়া আসিলেন, অনেক বুঝাইলেন, আমি কিন্তু সম্মতি দিতে পারিলাম না।

তাহার পরদিন স্কুলের চাকরিতে ইস্তফা দিয়া বিদায় লইয়া আসিলাম। আসিবার সময় এলার লজ্জানত দৃষ্টি দেখিয়া দুঃখ হইল! সন্ধ্যার চকিত দৃষ্টিও ক্ষুরধার-শাণিত তরবারির মত! ধিক্কারে ঘৃণায় যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে!

তাহার পর অনেক ঋতু অনেক বৎসর কাটিয়াছে। জীবনের সহজ পথে আসিয়া সহজ জীবন যাপন করিতেছি। বাঁধা-ধরা জীবনের মাঝে আনন্দহীন আবেগহীন যে জীবন সাধারণ বাঙ্গালী যাপন করে, আমারও সেই এক-ঘেয়ে আড়ষ্ট জীবন!

কিন্তু সেই এক ফাল্গুন-রাত্রির মধু-জ্যোৎস্না কি মিথ্যা? রূপলক্ষ্মীর দিব্য লাবণ্য সে-দিনের সেই যৌবন-অমৃত-রসে যে আনন্দ দিয়াছিল, তাহা কিছু নয়?

না, বারংবার বলিব, মিছা নয়। প্রমোদবনে যে সন্ধ্যা ম্লান হইত, সে আজ শুধু সুন্দর নয়, সে আজ অনুপম! প্রাত্যহিকতার গ্লানি তাহাকে মলিন করিবে না, অভাবের অঙ্কুশ-তাড়না তাহাকে কুৎসিত করিবে না! সে তাহার ভুবনমোহন রূপে আমার হৃদয়ে অম্লান জ্যোতি বর্ষণ করিবে! সে আমার হৃদয়ের চির-ফাল্গুনের মধু-জ্যোৎস্না!

কেহ বলিবে, অবাস্তব, কল্পনা, ভাব-বিলাস! জানি। কিন্তু এইখানেই রসের সার্থকতা! শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়াই রস সার্থক হইয়া ওঠে।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)

দানের বিচার

আপন ক্ষুধার অন্ন যে দেয় পরের জন্য
স্বার্থশূন্য সার্থক সে দান।
যশ অর্জ্জনের তরে বিত্তবান্ দান করে—
নহে কভু তাহার সমান।

মোহম্মদ নওলকিশোর বোগরাবী

বিরহ

দেখা হলো তার সাথে; কহিলাম, আমি সেই কবি।
সে কহিল, কোথা গেল বাঁশী তব কবিতা-করবী?
ভাসিয়া নয়ন-জলে নিবেদিনু, তুমি কাছে নাই—
আমিও মনের ভুলে সে-সকল হারায়েছি তাই!

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত।

রণ-সজ্জা

আমেরিকার সমস্ত যন্ত্র-শিল্পী আজ রণসজ্জা-রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। যুদ্ধের জয়-পরাজয় যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ণীত হইবে, সত্য—কিন্তু যোগ্য সজ্জা-উপকরণ জোগাইতে না পারিলে জয়ের আশা দুরাশায় পর্য্যবসিত হইতে পারে! বিজয়-সাফল্যের সম্ভাবনা এই শিল্প-কেন্দ্রে নবজাগ্রত অঙ্কুরিত হইতেছে।

বিপক্ষ-দল বহুকাল পূর্ব্ব হইতে সমর-সজ্জা করিতেছিল—সকলের অলক্ষ্যে; তাই যুদ্ধের প্রথম অঙ্কে তারা বহু ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করিতে পারিয়াছে। ১৯৩০ হইতে জাপান এবং ১৯৩৩ হইতে জার্ম্মানি যুদ্ধের জন্য উপকরণ-সজ্জা প্রস্তুত করিতেছিল; তাহারি জন্য কয়েকটি সাম্রাজ্য তাহাদের করতলগত হইয়াছে। প্রকাশ্য সমর-ঘোষণার সময় হইতে বৃটেন এবং আমেরিকা সমর-সজ্জার আয়োজনে মনোনিবেশ করিয়াছে।

ক্রাইশ্‌লার-ট্যাঙ্ক

রণদেবতা এবার বিরাট ক্ষুধা লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ! 'ময় ভুঁখা হুঁ' চীৎকার তুলিয়া সে একেবারে সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতেছে! গ্রাম-নগর, রাজ্য-জনপদ, নর-নারী, বালক-বালিকা,—ঘোড়া, গরু, মহিষ, মেষ—এ সব জঠরে ভরিয়াও রণ-দেবতার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে না—মানবের বহু আরাধনা, বহু তপস্যায় লব্ধ সভ্যতা, শিল্প-সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, পাঠাগার-মিউজিয়ম, স্থপতি-কলার যত কিছু মহিমা-নিদর্শন,—অর্থাৎ যেখানে যাহা কিছু ছিল গৌরব-মহিমায় মণ্ডিত কীর্ত্তিস্বরূপ, সে-সমস্তই প্রায় রণদেবতার ক্ষুধানলে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!

সমর-সূচনামাত্রে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট (১৯৪২ জানুয়ারী) আদেশ করিয়াছিলেন—আমেরিকার প্লেন চাই ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৬০০০০; ১৯৪৩-এ চাই ১২৫০০। ট্যাঙ্ক চাই ১৯৪২-এ ৪৫০০০; ১৯৪৩-এ ৭৫০০০। বড় বড় সদাগরী-জাহাজ চাই ১৯৪২-এ ৮০০; এবং ১৯৪৩-এ ১৫০০।

শুধু ইহাই নয়,—সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্য যোগ্য-পরিমাণ যুদ্ধ-জাহাজ; নানা-ছাঁদের কামান-বন্দুক, শেল; বোমা; টর্পেডো; বিস্ফোরক, প্যারাশুট এবং সার্চ্চ-লাইট চাই! তার উপর চাই লক্ষ লক্ষ ফৌজ; এবং সে ফৌজের জন্য জুতা-মোজা-নেকটাই হইতে সুরু করিয়া তাঁবু, খাদ্য-পানীয়, ঔষধ-পথ্য, ব্যাগ,—অর্থাৎ কি নয়?

ফৌজের চাহিদা-তালিকায় দেখা যায়, তাদের জন্য নিত্য মজুত রাখা চাই নব্বই লক্ষ ব্যারাক-ব্যাগ; এক কোটি নেকটাই; এক কোটি আশী হাজার গেঞ্জি-ফতুয়া ও আণ্ডার-সার্ট; এবং মোজা সাত কোটি লক্ষ জোড়া। জার্ম্মাণ এবং জাপানী আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ ও বিচূর্ণ করিতে দেশ-বিদেশে মার্কিণ ফৌজ পাঠানো হইতেছে—সে ফৌজের জন্য জাহাজ, ট্রাক, ট্যাঙ্ক, কামান-বন্দুক হইতে সুরু করিয়া তাদের অশন-বসন পাঠানোর সুব্যবস্থা আমেরিকা যে ভাবে সম্পাদন করিয়াছে, সে কাহিনী পড়িলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এ কাহিনী গত বর্ষের

১৪০০০ টন ওজনের চাপ-যন্ত্র

'মাসিক বসুমতী'র চৈত্র সংখ্যায় "যুদ্ধের ভাণ্ডারী" নামক সচিত্র সন্দর্ভে বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

আজ আমরা সেই সব সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ারীতে যে সমারোহ চলিয়াছে, তাহারি বৃত্তান্ত বলিতেছি।

আমেরিকা যেন যাদুমন্ত্র জানে! সেই মন্ত্রবলে সমগ্র সাম্রাজ্য আজ বিরাট কারখানায় পরিণত হইয়াছে! যন্ত্র-শিল্প আজ তার শক্তি লইয়া দিকে দিকে কাজের মোড় ফিরাইয়াছে। ৩১টি প্রদেশে নূতন কারখানা বসিয়াছে। কারখানার সংখ্যা ১৮৬! যাঁরা তখনকার আমেরিকা দেখিয়াছেন, তাঁরা বলিতেছেন, আজিকার আমেরিকা হইয়াছে **World's largest machine shop.**

আমেরিকায় মোটর-গাড়ীর কারখানা সংখ্যাতীত। সে সব কারখানায় আজ আর বিলাস-বিচরণের জন্য মোটর-গাড়ী তৈয়ারী হইতেছে না; সেখানে তৈয়ারী হইতেছে লাখে-লাখে এয়ার-ক্রাফট্ এঞ্জিন, ট্যাঙ্ক, মেসিন-গান, শেল্, এরোপ্লেনের বিভিন্ন কলকজা ও অংশ; এরোপ্লেন, মিলিটারী ট্রাক, স্কাউট-কার এবং জীপ্।

কলিকাতায় আমরা আজ নূতন ধরণের যে সব ছোট ছোট টুয়ার-মডেলের মোটর-গাড়ী দখিতেছি, সেগুলির নাম জীপ। এই জীপ আজ আমেরিকার অসংখ্য কারখানায় লাখ-লাখ কোটি-কোটি সংখ্যায় তৈয়ারী হইতেছে।

বুইকের তৈয়ারী প্লেন-এঞ্জিন-পরীক্ষা

যেখানে যত পড়ো জমি, ক্ষেত-খামার ছিল, জলা বা মাঠ ছিল—সেখানে উঠিয়াছে বিরাট্ দৈত্যপুরীর মত বড় বড় অসংখ্য কারখানা; —এবং সে সব কারখানায় লক্ষ লক্ষ লোক দিবারাত্র খাটিয়া কাজ করিতেছে। 'রবিবারের ছুটী'—এ কথা আজ গল্প-কথায় পর্য্যবসিত। উইলো রান্ নামক এক অন্তরীপে প্রসিদ্ধ মোটর-শিল্পী হেনরি ফোর্ডের জমিদারী। এ-অন্তরীপে তিনি চল্লিশখানি গ্রামের পত্তন করিয়াছিলেন! সে সব গ্রাম ঘিরিয়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন মোটর-গাড়ীর অসংখ্য ছোট ছোট কারখানা; তিন হাজার মোটর-গাড়ী রাখিবার বড় বড় বহু গুদাম, বহু পল্লী-বিদ্যালয় এবং আদর্শ কৃষিক্ষেত্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এখন সমগ্র অন্তরীপ জুড়িয়া যে বড় কারখানা তৈয়ারী হইয়াছে, সে কারখানায় তৈয়ারী হইতেছে শুধু মিলিটারী ট্রাক, প্লেন ও বমার। কারখানায় বড় বড় পাঁচ হাজার যন্ত্র বসিয়াছে; এবং এ যন্ত্রের সংখ্যা নিত্য বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রেসিডেণ্টের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমেরিকার প্রকাণ্ড রেলগাড়ী-নির্ম্মাতা কোম্পানি সর্ব্বপ্রথম ট্যাঙ্ক-নির্ম্মাণে উদ্যোগী হইয়াছিল; তার পর বহু কোম্পানি এ পথের পথিক হইয়াছে। বিখ্যাত ক্রাইশ্‌লার-মোটর-কারখানায় মিলিটারী গাড়ী ও ট্যাঙ্ক তৈয়ারী হইতেছে। এ-সব কারখানায় যে সব কারিগর কায করিতেছে, তাদের দেখিলে মনে হয় যেন কলের মানুষ! রুটিন
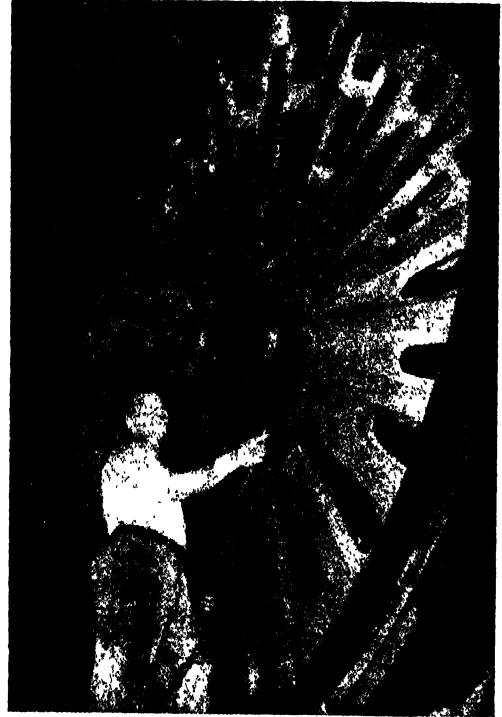
দশ ফুট টায়ার তৈয়ারীর কৌশল

ধরিয়া কাজ করিতেছে। কাজের সময় হাসি-গল্প বা ফাঁকি নাই! আশ্চর্য্য একাগ্রতা। তার পর লাঞ্চের সময় দিব্য খোশ-মেজাজে
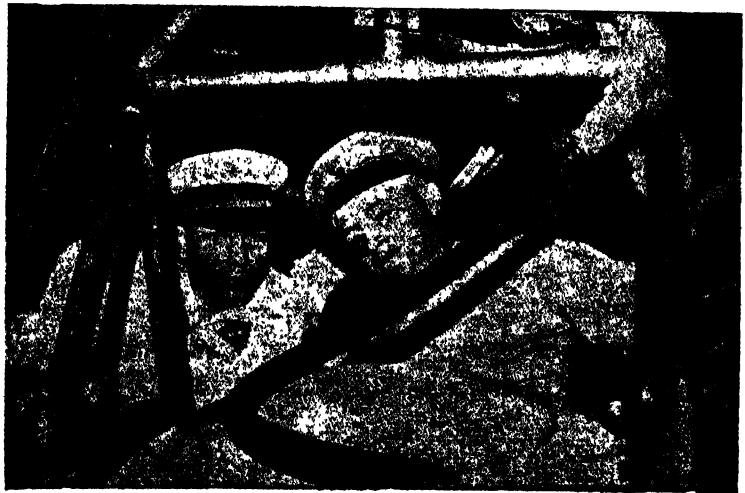
বমারের বল্-টারেট্ পরীক্ষা

দল বাঁধিয়া সকলে বসিয়া গল্প করিতে করিতে খোশা ছাড়াইয়া কমলা লেবু খাইতেছে।

ট্যাঙ্কের মধ্যে বসিয়া সেনারা খাওয়া-দাওয়া করিবে—সেইখানেই তাদের বিশ্রাম এবং শয়ন; এবং সেই ট্যাঙ্কে থাকিয়াই আক্রমণ-প্রতিরোধ! এক কথায় ঐ ট্যাঙ্কই আজ তাহাদের সমস্ত পৃথিবী!

কার্টরিজ-পরীক্ষায় কিশোরী কর্ম্মী
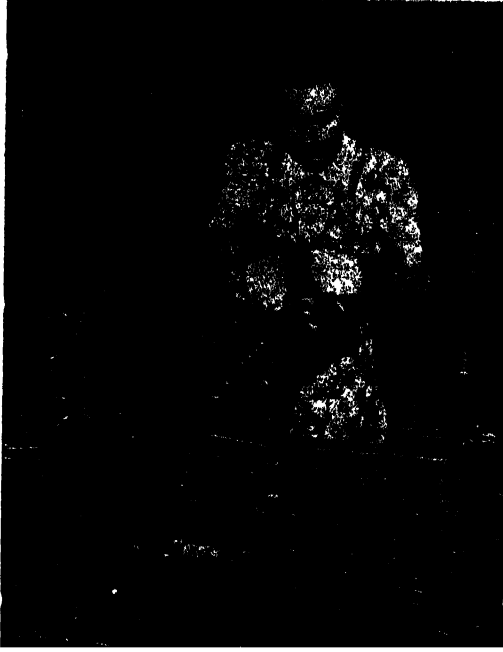
—ট্যাঙ্ককে লইয়াই তাদের জীবন! সেজন্য ট্যাঙ্ক তৈয়ারী হইতেছে সকল রকম স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের উপযোগী করিয়া।

উড়ন-দুর্গ—ফ্লাইং ফোর্ট্রেশ

যে সব কারিগর মোটর-গাড়ী তৈয়ারী করিত, ট্যাঙ্ক বা কামান-বন্দুক তৈয়ারীর কল্পনাও তাদের মনে কখনো স্থান পায় নাই। কামান-বন্দুক-ট্যাঙ্কের বিদ্যাও তাহারা জানিত না! কিন্তু প্রয়োজন ঘটিবামাত্র সেই সব কারিগর অচিরে এ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া বিরাট উদ্যমে কাজে নামিয়াছে।

এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট ছিল আমেরিকান্ শিল্পীর কাছে আকাশ-

রাইফেল-শিল্পী গারাণ্ড

কুসুমের মত। দেশে এ শিল্পের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না—এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট-কামান জিনিষটিও বড় সহজ ব্যাপার নয়—'আকারসদৃশো প্রজ্ঞা' অর্থাৎ আকারে-প্রকারে রাক্ষসের মত। সে কামান এবং তার ভারী গাড়ী, মাউণ্ট, অগ্নি-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এবং রিকয়েল-সরঞ্জাম-সমেত আশ্চর্য্য নিপুণ ভাবে তৈয়ারী হইতেছে। প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছিলেন, এ কামান চাই ১৯৪২-এ বিশ হাজার এবং ১৯৪৩-এ ৩৫০০০। প্রেসিডেণ্টের সে-কথাকে মার্কিণ শিল্পীরা সফল ও সার্থক করিয়াছে। বিলাসী আমেরিকার পক্ষে ইহা অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, সন্দেহ নাই! ট্যাঙ্ক, এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট্ কামান—এ সবের মধ্যে কার্টরিজ যাহাতে না তাতিয়া ওঠে, সেজন্য রেফ্রিজারেটরের মধ্যে কার্টরিজ রাখিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত পাকা।

যে-সব কারিগর পূর্ব্বে তৈয়ারী করিত মোটর-গাড়ীতে ব্যবহারের জন্য স্পার্ক-প্লাগ, তারা এখন মেসিন-গান্ তৈয়ারী করিতেছে! এ যেন সেই বংশীধারীর অসি ধরার মত!

উইলো রানে বমার তৈয়ারী করিবার পূর্ব্বে হেনরি ফোর্ড তাঁর শত শত এঞ্জিনীয়ারকে প্রশান্ত-মহাসাগর-উপকূলের কন্‌শলিডেটেড্ এয়ার-ক্রাফ্‌ট কর্পোরেশনের কারখানায় পাঠাইয়াছিলেন কাজ

শিখিতে ; তাঁরা সে কাজ শিখিয়া আসিলে তার পর উইলো রানে বমারের কারখানা খোলা হয়।

উইলো রানে ফোর্ডের কারখানায় যে-সব প্লেন তৈয়ারী হইতেছে, সেগুলির এঞ্জিন কিন্তু তৈয়ারী হইতেছে বুইকের কারখানায় ; এবং বুইকের কারখানা এই এঞ্জিন-তৈয়ারীর জন্য প্রাট হুইটনী কোম্পানির সাহায্য লইতেছে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলিয়া এই সব বড় বড় কোম্পানি আজ সহযোগিতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। এই সহযোগিতার গুণেই যুদ্ধ-সরঞ্জাম-নির্ম্মাণে আশ্চর্য্য ক্ষিপ্র-কারিতা ও তৎপরতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে জনকয়েক তরুণ এঞ্জিনীয়ার প্লেন-শিল্পে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ডোনাল্ড ডগলাশ, এবং ফিলিস্ জনশনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা আজ যথাক্রমে ডগলাশ এয়ার-ক্রাফ্‌ট্ ও বোরিং এয়ার প্লেন কোম্পানির অধ্যক্ষ। ইউনাইটেড এয়ার-ক্রাফ্‌ট্ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রেণ্ট-সূলোর বিগত মহাযুদ্ধে ছিলেন বিমান-বিভাগে বিচক্ষণ ক্যাপ্‌টেন। ইঁহাদিগের অভিজ্ঞতা এবং উদ্যোগের ফলে এখন বিমানপোত-বিভাগের কাজ প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধে বিমান-বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন গ্লেন মার্টিন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম গ্লাই-

বিমান-ফৌজের শিক্ষায়তন

সাবমেরিণের যম সৃষ্টির তিন অবস্থা

নানা আকারের এবং নানা ছাঁদের প্লেন-ট্যাঙ্ক-বমার প্রভৃতির নির্ম্মাণে যন্ত্রপাতির আকারে এবং প্রকারেও বিরাট পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। সে সব যন্ত্রপাতি, মায় কলকব্জা, স্ক্রূপ, পেরেক প্রভৃতি সরঞ্জাম-পত্র যোগ্য পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে ছোট-বড় অসংখ্য কারখানায়। তার উপর প্রত্যেকটি সরঞ্জামের উৎকর্ষ-সাধন-কল্পে বৈজ্ঞানিক-শিল্পীদলে গবেষণার সীমা নাই! এরোপ্লেনের আকার দিনের পর দিন বাড়ানো হইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোন্ ট্যাঙ্কে প্লেনে-বমারে কি অসুবিধা ঘটিতেছে, তাহার প্রতিকার করিয়া যান প্রভৃতিকে সর্ব্ব-অসুবিধা-মুক্ত করিয়া তোলায় অধ্যবসায়েরও অন্ত নাই।

ডার নির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় আজ মার্কিণ বিমান-বিভাগের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। এখন যত মিলিটারী প্লেন তৈয়ারী হইতেছে, সে-সবের অধ্যক্ষতার ভার গ্লেন মার্টিনের উপর।

বিমান-পোতের কারখানায় স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতেছে। ছোট-খাট অংশগুলি বাছিয়া পরীক্ষা করা, প্যাক করা—এ কাজে মেয়েদের অসাধারণ পটুতা। বোমার মিহি তার জড়ানোর কাজ মেয়েদের একচেটিয়া! মেয়েদের ছোট হাতে এ-কাজ নিখুঁৎ সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদিত হইতেছে। অভিজাত বংশের মেয়েরাও এ কাজ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এ কাজে তাঁদের এতটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচ নাই।

প্লেন-ফ্যাক্টরির কারিগর লাঞ্চের সময় সিনেমা দেখিতেছে

যুদ্ধ-জাহাজের প্রোপেলার

প্লেনের এঞ্জিনে ছোট-বড় বিভিন্ন অংশ আছে প্রায় ন'হাজার। তৈয়ারী করিবার পর এগুলিকে পালিশ করিয়া এঞ্জিনের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা—সে বড় সহজ কাজ নয়। এ-কাজে যেমন অভিনিবেশের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পটুতার। কারিগরের দল অল্প দিনেই সে পটুতার অধিকারী হইয়াছে।

প্লেনের এঞ্জিন তৈয়ারী হইবামাত্র সে-এঞ্জিনের টেম্পারেচার, গতিবেগ, প্লেনের উপর পেট্রোল এবং বাতাস প্রভৃতির ক্রিয়ার প্রভাব—ডাক্তার যেমন আমাদের হার্ট ও লাঙ্‌স্ পরীক্ষা করেন, তেমনি ভাবে পরীক্ষা করা হয়। তার পর এঞ্জিনের সৌষ্ঠব সাধন করা হয়।

আমেরিকায় এখন যে সব প্লেন তৈয়ারী হইতেছে, সে-গুলির শক্তি দুই হাজার অশ্ব-শক্তির অনুরূপ।

আর্দ্রতায় ধাতুর দেহে মরীচা ধরে। প্লেন তৈয়ারী হইবামাত্র তার এঞ্জিনে তাই ভালো রকম অয়েল-গ্রীজ করিয়া রাখা হয়। এখন

প্লেনের প্রাণ তার এঞ্জিনে এবং প্রোপেলারে; কিন্তু একই যন্ত্রে প্লেন এবং এঞ্জিন-প্রোপেলার তৈয়ারী হয় না। তার উপর প্লেনের হার্ট বা হৃদয় হইল ঐ এঞ্জিন! এঞ্জিন হালকা হওয়া চাই; শক্তিমান্ হওয়া চাই। নহিলে প্লেন ভারী হইবে রেলোয়ে-এঞ্জিনের মত। কাজেই প্লেনের এঞ্জিন-নির্মাণে এ দু'দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

এঞ্জিনের দেহ আগাগোড়া প্লায়োফিল্মের আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখা হয়—আচ্ছাদনের মধ্য হইতে বাতাস বাহির করিয়া দিয়া তার পর সেগুলিতে রীতিমত শীল আঁটা হয়। ইহার উপর প্লেনের মধ্যে ডী-হাইড্রেটিং রাসায়নিকে সিক্ত একখানি গোলাপী কার্ড সংলগ্ন থাকে। এঞ্জিনে আর্দ্রতা লাগিলেও কার্ডের রঙ যদি নীল হইয়া যায়, তবে বুঝিতে

হইবে, এঞ্জিন ঠিক আছে—আর তার জন্ম কোথাও গোলযোগ ঘটে নাই।

এঞ্জিনের পর প্রোপেলার-নির্ম্মাণেও অসাধারণ অভিনিবেশের প্রয়োজন—প্রোপেলারের জোরেই প্লেনকে ইচ্ছামত ওড়ানো সম্ভব।

জন গারাণ্ড আজ প্রায় ৮০ জাতের রাইফেল তৈয়ারী করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। গারাণ্ডের আদি-বাস ছিল কানাডায়। ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে—গারাণ্ডের বয়স ছিল তখন পনেরো বৎসর—গারাণ্ড আসেন যুক্তরাজ্যে। ষ্টীম-এঞ্জিন দেখিয়া বালক গারাণ্ডের মস্তিষ্কে প্রেরণা জাগে এবং বাষ্পীয় শক্তি লইয়া তিনি নানা রকম পরীক্ষা সুরু করেন। সে পরীক্ষার ফলে আজ তিনি যে রাইফেল নির্ম্মাণ করিতেছেন, সে সব রাইফেল গারাণ্ড-রাইফেল নামে প্রখ্যাত। এই গারাণ্ডের কারখানায় মার্কিণ কারিগরদের হাতে এখন দিনে অন্ততঃ এক এক হাজার সংখ্যায় রাইফেল প্রস্তুত হইতেছে। অর্থাৎ মিনিটে একখানি করিয়া বলিলে অত্যুক্তি হইবে না! এ কারখানায় স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া কত হাজার লোক খাটিতেছে, তাব সংখ্যা হয় না! কারখানায় বিভিন্ন শিল্পীদের কাজ এমন চুল-চেরা ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া যে হাতে-হাতে বিদ্যুদ্গতিতে কাজ হইতেছে।

প্লেন, বমার, কামান-বন্দুক যে-পরিমাণেই তৈয়ারী হউক, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে এবং অনেক বেশী ক্ষিপ্র ভাবে তৈয়ারী

টায়ার তৈয়ারী

হইতেছে এ-সবে ব্যবহারের জন্ম বাড়তি অংশসমূহ বা spare parts. চাহিদার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে সকল রকমের দ্রব্যই তৈয়ারী হইতেছে।

কামান বন্দুক প্লেন বমারের সঙ্গে সঙ্গে তৈয়ারী হইতেছে জাহাজ—যুদ্ধ-জাহাজ, মাল-চালানী, সদাগরী এবং যাত্রী জাহাজ। জাহাজী সমারোহের কথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

আমেরিকার ছোট-বড় সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানই যুদ্ধের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে। শত্রু-নিপাতের উদ্দেশ্যেই যে এমন ঘটিয়াছে, তাহা
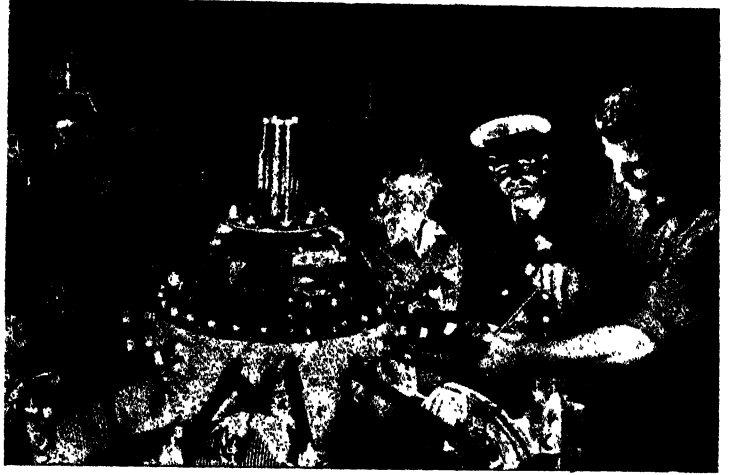
সাইক্লোন্-বমারের পাওয়ার-প্ল্যাণ্ট

নয়! ব্যবসা রক্ষা করিতে গেলে যুদ্ধের সরঞ্জাম-উপাদান তৈয়ারী করা ছাড়া সেখানে এখন গত্যন্তর নাই। বে-সামরিক চাহিদার

বোমা তৈরী। এ বোমা মাথায় উঁচু মানুষের সমান

কাজে ধাতু-সংক্রান্ত কোনো-কিছুর ব্যবহার আজ নিষিদ্ধ। কাজেই জীবিকার্জ্জনের জন্ম সমর-সজ্জায় যোগ না দিলে চলিবে না। ছোট-খাট প্রতিষ্ঠানগুলি তাই সামরিক কনট্রাক্টরদের কাজ করিতেছে—সাব-কনট্রাকটার রূপে।

ইণ্ডিয়ানায় ষ্টোভের বড় কারখানা ছিল। সে-কারখানায় আজ ষ্টোভের পরিবর্ত্তে শুধু লাইফবোট তৈয়ারী হইতেছে। যাহারা টেলিফোন পার্টস তৈয়ারী করিত, তারা তৈয়ারী করিতেছে মেসিনগানের নানা অংশ; ছিপ-নির্ম্মাতা কোম্পানিরা তৈয়ারী করিতেছে বমারের অংশ: এবং যারা তৈয়ারী করিত ফ্রাইং-প্যান এবং ডিম-পোচার, তারা এখন এয়ারপ্লেনের ফ্ল্যাপ-হিঞ্জ এবং অন্যান্য অংশ তৈয়ার করিতেছে।
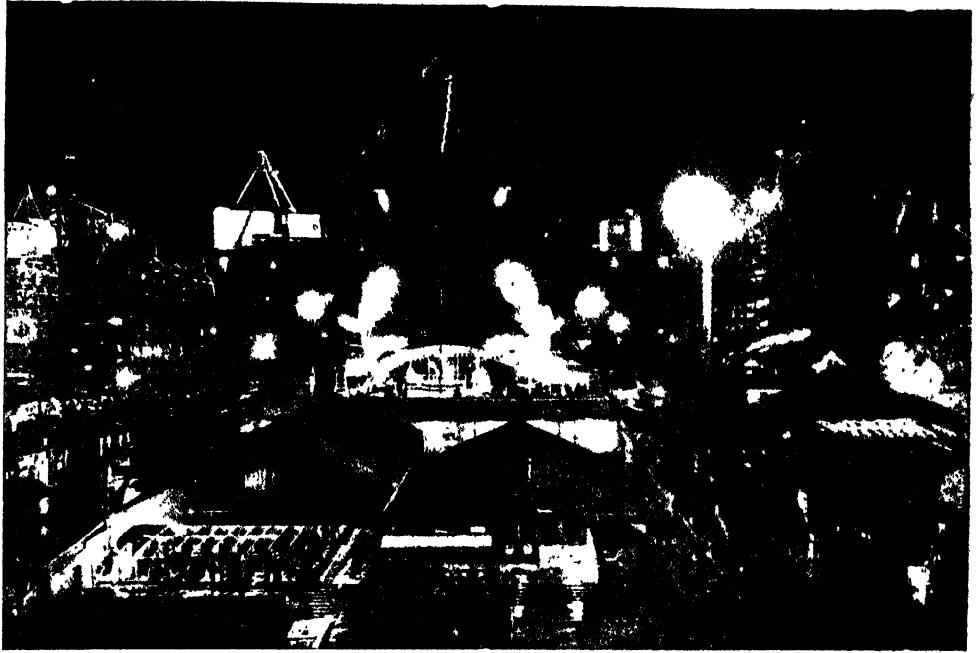
সদাগরী জাহাজের জন্ম

ইলেকট্রিক-ফ্যান কোম্পানি, রুজ-ব্রুম-পাউডার-নির্ম্মাতা, জমাট-দুগ্ধ-শিল্পী—এ সব কোম্পানি আজ চিরাচরিত ব্যবসা ছাড়িয়া তৈয়ারী করিতেছে কেহ বা মেসিন-গান, কেহ বা এরোপ্লেন বমারের পার্টস্!

গাড়ীর কারখানায় এ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফ্ট্ কামান তৈয়ারী

কারখানার কারিগর হিসাবে এক-একটি পরিবার আসিয়া কাজে নামিয়াছে। কোথাও পিতা-পুত্র, কোথাও মা ও মেয়ে, কোথাও ভাই-বোন, স্বামি-স্ত্রী। গ্রেন মার্টিনের একটি প্রতিষ্ঠানে একই পরিবারের আঠারো জন লোক বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিতেছে!

তাই বলিয়া কাজে কেহ ফাঁকি দেয় না কি? দেয়। মেঘের পালে "কৃষ্ণ মেঘ" থাকিবেই! তেমনি কাজের কারবারেও ফাঁকিবাজি চলে। কেহ ফাঁকি দিলে কয়েকটি কোম্পানি ফাঁকিবাজদের গাফিলি বা জরিমানা করে না, ফৌজ-বিভাগে যোগ দিয়া যারা বিদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছে, এমন সব বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনে বিরহিণী পত্নী, বাগ্দত্তা প্রণয়িনী বা ভগ্নীদের এবং ফাঁকিদারদের সামনে তাদের উদ্দেশ করিয়া বলে,—কাজে এদের গা নাই। আমি কাজ চাই—নহিলে তোমাদের প্রিয়জনেরা বিদেশে যুদ্ধ করিতে পারিবে না—শত্রুর হাতে বন্দী হইবে, নয় প্রাণ হারাইবে। অতএব ফাঁকিদারদের ছুটী দিয়া তোমরা আসিয়া তাদের কাজ করো। এ কথায় না কি বহু ফাঁকিদারের মন ফিরিয়াছে, কাজে উৎসাহ জাগিয়াছে।

যে-সব কারিগর কাজ করিতেছে, তাদের সঙ্গে কারখানায় নিত্য শত শত তরুণ-তরুণীকে লওয়া হইতেছে শিক্ষানবীশীর কাজে। সহর-মফঃস্বল হইতে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির অফিসে ১০০০০ জন নূতন শিক্ষানবীশ এখন যুদ্ধ-সরঞ্জাম তৈয়ারীর কাজ করিতেছে।

এই সব কারিগরের নিকট হইতে উদ্ভাবনী-কৌশলের 'আইডিয়া' চাওয়া হইতেছে। যার আইডিয়ায় কাজ হইবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। এমনি ভাবে একটি কোম্পানি ছ' মাসে প্রায় পনেরো হাজার আইডিয়া বা Suggestions পাইয়াছে—আর এক কোম্পানি

পাইয়াছে ৫০০০ নূতন আইডিয়া। এ সব আইডিয়া যারা দিয়াছে, তাদের মধ্যে ১৬১৯ জনকে সফল suggestions-এর জন্ম পনেরো হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে!

শিল্পরাজ্যে অভাবনীয় আবিষ্কার এ ভাবে ঘটিবে কি না, বলা যায় না; তবে এই ভাবে আইডিয়া-সংগ্রহের ফলে বহু শিল্পের উৎকর্ষ সংসাধিত এবং বহু অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে।

প্রয়োজনের তাগিদেই পৃথিবীতে আজ এতখানি বৈজ্ঞানিক উন্নতি ঘটিয়াছে। সুতরাং আজিকার এই আত্মরক্ষা এবং বিপত্তি-মোচনের তাগিদে বিজ্ঞান নানা দিকে নূতন নূতন পথের সন্ধান দিতেছে। এই সব নূতন পথে মানুষের জন্ম কত স্বাচ্ছন্দ্য কত সম্পদ আসিয়া উদয় হইবে, কে তাহা বলিতে পারে?

এই যে খাদ্য-পানীয়কে ডী-হাইড্রেট্ করিয়া কত অপব্যয় বাঁচিয়াছে, —মানুষের পুষ্টিলাভ কত অল্পে আজ সম্ভব হইয়াছে! সুতরাং রণ-দেবতা সংহার-মূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দিলেও সে যে বহু সম্পদ, বহু স্বাচ্ছন্দ্যও বহিয়া আনিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফটোগ্রাফি লইয়া মানুষ এত কাল কত কীর্ত্তি করিয়াছে! আজ সেই ফটো-যন্ত্রাদি এয়ার-ক্রাফ্‌ট এবং অটোমোবাইলকে কত বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছে!

যুদ্ধ-সরঞ্জাম জোগাইতে আমেরিকা অনেকখানি আরাম-বিলাস স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়াছে। সে-ত্যাগ নিষ্ফল হয় নাই। পরিবর্ত্ত বা substitution-রীতিতে তারা আর এক দিক দিয়া যে সম্পদ গড়িয়া তুলিতেছে, সে-সম্পদে পৃথিবী সমৃদ্ধ হইবে।

এই প্রসঙ্গে মার্কিন-বাহিনী-সাপ্লাই-সার্ভিসের অধ্যক্ষ লেফটেনাণ্ট-জেনারেল সমারভেল বলিয়াছেন—হিটলারের দৌলতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে আমেরিকা আজ যেন ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে! হিটলার যখন চাকায় ভর করিয়া যুদ্ধে নামিল, তখন আমাদের কর্ম্মচক্রে লক্ষ্য পড়িল, চাকার শক্তি বাড়িল! হিটলার যখন পৃথিবী ধ্বংস করিতে ওয়াগন ছাড়িল, তখন আমেরিকাকে সে কত নব পথের সন্ধান দিল! তার পর হিটলার যখন যুদ্ধকে তুলিল প্লেনে-বমারে চড়াইয়া ঊর্দ্ধ আকাশে, তখন আমেরিকা আকাশের সঙ্গে পূর্ণ ভাবে মিতালী করিবার আশ্চর্য্য প্রেরণা পাইল! অর্থাৎ ধরণীর ও মানব-সভ্যতার শত্রু হইলেও হিটলার এই ধ্বংস-লীলার অনুষ্ঠান করিয়া নূতন যে প্রেরণা জোগাইয়াছে, তাহার জোরে মানুষ হইবে শক্তিমান্, আত্ম-নির্ভরশীল, উদ্যোগী এবং নিরলস। কাজেই সে-হিসাবে হিটলারকে উদ্দেশ করিয়া ভাবী কাল হয়তো এক দিন সাধুবাদ দিয়া বলিবে—কত অজানারে জানাইলে তুমি!—জীবনকে নিরঙ্কুশ উপভোগ্য করিয়া তুলিতে জ্ঞান-রাজ্যের কত নব-নব দ্বারই না মুক্ত করিয়া দিলে!

বৈশাখবরণ

এসো পুণ্য মাস,
নিয়ে এস স্বস্তি, স্বাস্থ্য, সান্ত্বনা, আশ্বাস।
জীর্ণ-দারু তরু-অঙ্গে উদ্ভেদিয়া প্রাণ-কিশলয়,
ফলের কুহরে কোষে করি সুধারসের সঞ্চয়,
তেয়াগিয়া মলয় নিশ্বাস,
এসো পুণ্য মাস।

এসো হে বৈশাখ,
চাতকের কণ্ঠে কণ্ঠে শোন ঘন ডাক।
দিগন্তে মেদুর করি নব স্নিগ্ধ মেঘের মালায়
উড়াইয়া ঝঞ্ঝা-বায়ে মৃতবর্ষ-জঞ্জাল-জ্বালায়,
নিঙাড়িয়া মেঘের মৌচাক,
এসো হে বৈশাখ।

তুমি পুণ্যশ্লোক,
যুগে যুগে দূর কর কালের নির্মোক।
পুরাতন খাতা ছিঁড়ি নূতনের কর অঙ্কপাত,
নৈরাশ্য-শঙ্কায় রুদ্ধ দ্বারে দ্বারে কর করাঘাত।
ঘরে ঘরে মহোৎসব হোক,
এসো পুণ্যশ্লোক।

শান্তি-সূক্ত গাও,
'সংহর সংহর রোষ' রুদ্রেরে শুনাও।
তব স্বস্তি-বাকে পুন স্তব্ধ হোক রুদ্রের তাণ্ডব,
ইন্দ্রপ্রস্থে জন্ম দিক নির্বাপিত বিদগ্ধ খাণ্ডব।
শান্তিবারি চৌদিকে ছিটাও
শান্তি-সূক্ত গাও।

শ্রীকালিদাস রায়।

(২২) অপস্মার—দেব-যক্ষ-নাগ-ব্রহ্মরাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচাদি-দ্বারা আবিষ্ট হওন, অনুস্মরণ, উচ্ছিষ্ট, শূন্যগৃহ-বাস, অশুচি-পদার্থ-সংসর্গ, কালান্তরাপাত, ব্যাধি ইত্যাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন। স্ফুরণ, উৎকম্প, দীর্ঘশ্বাস, ধাবন, পতন, স্বেদ, স্তম্ভ, মুখে ফেন-নির্গমন, জিহ্বা-পরিলেহন ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয়।

এ প্রসঙ্গে দুইটি আর্য্যা—

ভূত-পিশাচাদি-দ্বারা গৃহীত হওয়ায় অথবা তাহাদিগের অনুস্মরণের ফলে উচ্ছিষ্টসেবন, অথবা শূন্যাগার-গমনে, কালান্তরাতিপাত-বশতঃ, ও অশুচি-সেবা-দ্বারা অপস্মার জন্মে।

সহসা ভূমিতে পতন, উৎকট কম্প, মুখে ফেন-নির্গম, সংজ্ঞাহীন ভাবে উত্থান—এইগুলি অপস্মারের বাহ্য রূপ (১)।

(২৩) সুপ্ত—নিদ্রা-দ্বারা অভিভূত অবস্থা। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-ভোগ, মোহ, ক্ষিতিতলে শয়ন, হস্ত-পদাদি অঙ্গের প্রসারণ, অনুকষণ ইত্যাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন। নিদ্রা-সঞ্জাত এই সুপ্ত ভাবের অভিনয়—উচ্ছ্বাস, অবসন্ন গাত্র, অক্ষি-নিমীলন, সর্ব্বেন্দ্রিয়-সম্মোহন, স্বপ্নায়িত ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা কর্ত্তব্য।

এ প্রসঙ্গে দুইটি আর্য্যা—

নিদ্রাভিভব, ইন্দ্রিয়োপরম, মোহন ইত্যাদি হইতে সুপ্ত সঞ্জাত। অক্ষি-নিমীলন, উচ্ছ্বাস, স্বপ্নায়িত-জল্পন ইত্যাদি দ্বারা উহা অভিনেয়।

উচ্ছ্বাস-যুক্ত নিশ্বাস, ঈষৎ অক্ষি-নিমীলন, নিশ্চেষ্টতা, সর্ব্বেন্দ্রিয়-সম্মোহন ইত্যাদি ক্রিয়াদ্বারা সুপ্তকে স্বপ্নের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত (২)।

---

(১) "অপস্মারো নাম—দেবযক্ষনাগব্রহ্মরাক্ষসভূতপ্রেতপিশাচগ্রহণানুস্মরণো (…পিশাচাদীনাং গ্রহণাদনুস্মরণাৎ) চ্ছিষ্টশূন্যাগারসেবনাশুচিকালান্তরাপত্তিপতনব্যাধ্যাদিভি (কান্তারাতিপাতধাতুবৈষম্যাদিভি) বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তস্য স্ফুরিতনিশ্বসিতোৎকম্পিতধাবনপতনস্বেদস্তম্ভবদনফেনজিহ্বাপরিলেহনাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ (দুরিতকম্পিতনিশ্বসিত…স্বেদবদনফেনহিক্কা-জিহ্বা……)।

অত্রার্য্যে ভবতঃ—

ভূতপিশাচগ্রহণানুস্মরণোচ্ছিষ্টশূন্যগৃহগমনাৎ।

(ভূতপিশাচস্মরণ-গ্রহণানুচ্ছিষ্ট……)

কালান্তরাতিপাতাদশুচেশ্চ ভবত্যপস্মারঃ॥ ১১৩॥

সহসা ভূমৌ পতনং প্রবেপনং (প্রকম্পনং) বদনফেনমোক্ষশ্চ।

নিঃসঙ্গস্যোত্থানং (নিঃসঙ্গাভ্যুত্থানং) রূপাণ্যেতান্যপস্মারে॥ ১১৪॥

—নাঃ শাঃ, বরোদা সং, ৭ম অঃ, পৃঃ ৩৭১

কালান্তরাতিপাত—ভোজনাদি যথাসময়ে না করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া অপস্মার উৎপাদন করে।

(২) "সুপ্তং নাম নিদ্রাভিভবঃ; ইন্দ্রিয়বিষয়োপগমনমোহনক্ষিতিতলশয়নপ্রসারণানুকর্ষণাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। নিদ্রাসমুত্থং তদুচ্ছ্বসিতসন্নগাত্রাক্ষিনিমীলনসর্ব্বেন্দ্রিয়সম্মোহনোৎস্বপ্নায়িতাদিভিরনুভাবৈরভিনয়েৎ। (কাশী সংস্করণে—সুপ্তং নাম নিদ্রাসমুত্থম্। তদুচ্ছ্বসতিনিশ্বসিত……ইত্যাদি পাঠ দৃষ্ট হয়।)

(২৪) বিবোধ—আহারের পরিণাম, নিদ্রাচ্ছেদ, স্বপ্নসমাপ্তি, তীব্র শব্দ, স্পর্শ—ইত্যাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন। জৃম্ভণ, অক্ষি-মর্দ্দন, শয্যাত্যাগ, হাত ছোড়া, আঙ্গুল মটকান ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা অভিনেয়।

এ প্রসঙ্গে একটি আর্য্যা—

আহারের বিপরিণাম, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি বিভাব-সম্ভূত প্রতিবোধ জৃম্ভণ, বদন-অক্ষি-মর্দ্দন ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা অভিনেয় (৩)।

(২৫) অমর্ষ—যাহার অধিক বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, ধন, বল ইত্যাদি আছে, তাহার দ্বারা তিরস্কৃত বা অপমানিতের অমর্ষ জন্মিয়া থাকে। শিরঃকম্পন, অধিক স্বেদনির্গম, অধোমুখে চিন্তা, ধ্যান, অধ্যবসায়, উপায় ও সহায়ের অন্বেষণ ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা ইহা অভিনেয়।

অত্রার্য্যে ভবতঃ—

নিদ্রাভিভবেন্দ্রিয়োপরমণমোহনৈর্ভবেৎ সুপ্তম্।

অক্ষিনিমীলনোচ্ছ্বসনৈঃ স্বপ্নায়িতজল্পিতৈঃ কার্য্যঃ॥ ১১৬

সোচ্ছ্বাসৈর্নিশ্বাসৈর্মন্দাক্ষিনিমীলনেন নিশ্চেষ্টঃ।

সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্মোহাৎ সুপ্তঃ স্বপ্নৈশ্চ যুঞ্জীত"॥ ১১৭

— নাঃ শাঃ, ৭ম অঃ, বরোদা সং, পৃঃ ৩৭২

ইন্দ্রিয়বিষয়োপগম—অধিক পরিমাণে বিষয়াসক্তির ফল নিদ্রা। মোহন—মাদকদ্রব্য বা অন্য কোন কারণে চিত্ত মোহগ্রস্ত হইলে নিদ্রা জন্মে। প্রসারণ অনুকর্ষণ—হাত-পা ছড়ান ও গুটান। উচ্ছ্বসিত—দীর্ঘশ্বাস। সন্নগাত্র—অবসন্ন গাত্র। উৎস্বপ্নায়িত—স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কথা বলা বা নানারূপ শারীরিক ক্রিয়া করা। স্বপ্নায়িত-জল্পন—ঘুমের ঘোরে স্বপ্নাবস্থায় কথা বলা। মন্দাক্ষিনিমীলন—স্বপ্ন-দর্শনকালে চোখ পূরা বোজা থাকে না—অল্প বোজা থাকে—অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র।

যে ব্যক্তি সুপ্তের অভিনয় করিবে, তাহাকে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস সহ স্বাভাবিক শ্বাস ফেলিতে হইবে। তাহার চক্ষু ঈষৎ নিমীলিত থাকিবে। আর নিশ্চেষ্ট থাকিলেও তাহাকে মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন-দর্শনের ভাব দেখাইতে হইবে।

(৩) "বিবোধো নাম—আহারপরিণামনিদ্রাচ্ছেদ (দুঃ)স্বপ্নান্ততীব্রশব্দস্পর্শশ্রবণাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তমভিনয়েজ্জৃম্ভণাক্ষিপরিমর্দ্দনশয়নমোক্ষণাদিভিরনুভাবৈঃ (তং জৃম্ভণাক্ষিমর্দ্দনশয়নমোক্ষাঙ্গবদনভুজাবক্ষেপণাঙ্গুলিত্রোটনাদিভিরনুভাবৈরভিনয়েৎ।)

অত্রার্য্যা ভবতি—

আহারবিপরিণামাচ্ছব্দস্পর্শাদিভিশ্চ সম্ভূতঃ।

প্রতিবোধস্ত্বভিনেয়ো জৃম্ভণবদনা (বলনা) ক্ষি-

পরিমর্দ্দৈঃ"॥ ১১৯—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৭২

আহার-পরিণাম—অতিরিক্ত বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজনের পরিণামে অন্নাদি বিকার জন্মিলে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। নিদ্রাচ্ছেদ—অনিদ্রা—রোগ-বিশেষ (insomnia)। স্বপ্নান্ত—স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ উহা শেষ হইলে চট্ করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তীব্র শব্দ শ্রবণে অথবা স্পর্শেও নিদ্রা ভাঙ্গে। জৃম্ভণ—হাই-তোলা। অক্ষি-পরিমর্দ্দ—চোখ রগড়ান। শয়ন-মোক্ষণ—শয্যাত্যাগ।

এ প্রসঙ্গে দুইটি সংগ্রহ-শ্লোক—

বিদ্যা-শৌর্য্যবলাধিক্যসম্পন্ন ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক আক্ষিপ্ত নরগণের উৎসাহ-সংযোগ-বশতঃ অমর্ষ জন্মিয়া থাকে।

পণ্ডিত ব্যক্তি উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে অধোমুখে চিন্তা, শিরঃকম্পন, স্বেদ-নির্গম ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উহার প্রয়োগ করিবেন (৪)।

(২৬) অবহিত্থ—ইহার আকার-প্রচ্ছাদনাত্মক। লজ্জা-ভয়-পরাজয়-গৌরব-জিহ্মতা ইত্যাদি বিভাব-সঞ্জাত। অন্যথা কথন, অন্যথা অবলোকন, কথাভঙ্গ, কৃত্রিম ধৈর্য্য ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয় (৫)।

এ প্রসঙ্গে একটি মাত্র সংগ্রহ-শ্লোক দৃষ্ট হয়—

ধৃষ্টতা-কুটিলতাদি বিভাব-সম্ভূত অবহিত্থ ভয়াত্মক ভাব-বিশেষ। অগণনা-দ্বারা উহা অভিনেয় ও অতিরিক্ত উত্তর না দিয়া উহার অভিনয় কর্ত্তব্য (৬)।

(২৭) উগ্রতা—চৌর্য্য, অভিগ্রহণ, নৃপাপরাধ, অসৎ-প্রলাপ ইত্যাদি বিভাব হইতে সঞ্জাত। বধ-বন্ধন-তাড়ন-নির্ভৎসন ইত্যা অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয়। এ প্রসঙ্গে একটি আর্য্যা—

চৌর্য্য-অভিগ্রহণ-নৃপাপরাধাদি হইতে উগ্রতা জন্মে। বধ-বন্ধ তাড়নাদি অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয় (৭)।

(২৮) মতি—নানা-শাস্ত্র-বিচিন্তন, উহাপোহ ইত্যাদি বিভা হইতে উদ্ভূত। শিষ্যোপদেশ, অর্থ-বিকল্পন, সংশয়চ্ছেদ ইত্যা অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয়।

এ প্রসঙ্গে একটি শ্লোক—

নানা শাস্ত্রার্থবোধ হইতে নরগণের মতি জন্মিয়া থাকে শিষ্যোপদেশ, অর্থ-ব্যাখ্যানাদি-দ্বারা উহা অভিনেতব্য (৮)।

(২৯) ব্যাধি—বায়ু-পিত্ত-কফ-সন্নিপাত-সম্ভূত। জ্বরাদি ইহার বিশেষ রূপ মাত্র। জ্বর আবার—দ্বিবিধ—(১) সশীত ও (২) সদাহ। সশীত জ্বরের লক্ষণ—সর্ব্বাঙ্গের কম্পন, উৎকট কম্প, হাত-পা গুটাইয়া থাকা, অগ্নি-তাপ লইবার ইচ্ছা, রোমাঞ্চ, হনুদেশের বিকৃত ভাবে সঞ্চালন, নাসিকা-সঙ্কোচন, মুখশোষ, ক্রন্দন, অশ্রুপাত ইত্যাদি। ঐ সকল অনুভাব-দ্বারাই সশীত জ্বরের অভিনয় কর্ত্তব্য। সদাহ জ্বরের লক্ষণ—কর-চরণাদি অঙ্গ বিক্ষেপ, মাটিতে শয়নের ইচ্ছা, চন্দনাদি অনুলেপন ও শীতল বস্তুর অভিলাষ, ক্রন্দন, মুখশোষ, উৎক্রোশ। ঐ সকল অনুভাব-দ্বারা উহার অভিনয় কর্ত্তব্য। এই জ্বর ব্যতীত অন্যান্য যে সকল

---

(৪) "অমর্ষো নাম-বিদ্যৈশ্বর্য্য (ধন) বলাধিকৈরধিক্ষিপ্তস্যাবমানিতস্য বা সমুৎপদ্যতে। তমভিনয়েচ্ছিরঃকম্পনপ্রস্বেদনাধোমুখচিন্তনধ্যানাধ্যবসায়োপায়সহায়ান্বেষণাদিভিরনুভাবৈঃ (তস্য শিরঃকম্পনস্বেদাধোমুখবিচিন্তনাধ্যবসায়ধ্যানোপায়ান্বেষণাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ)।

অত্র শ্লোকৌ —

আক্ষিপ্তানাং সভামধ্যে বিদ্যাশৌর্য্য-(বিদ্যৈশ্বর্য্য) বলাধিকৈঃ।

নৃণামুৎসাহসংযোগাদমর্ষো (নৃণামুৎসাহসম্পন্নো

হ্যমর্ষো) নাম জায়তে ॥ ১২১ ॥

উৎসাহাধ্যবসায়াভ্যামধোমুখবিচিন্তনৈঃ।

শিরঃপ্রকম্পস্বেদাদ্যৈস্তং প্রযুঞ্জীত পণ্ডিতঃ (নাট্যবিৎ)" ॥ ১২২ ॥

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৭২-৭৩

অমর্ষ—অসহনশীলতা, ক্রোধ। কাহারও অপর অপেক্ষা অধিক বিদ্যা-ঐশ্বর্য্য-শৌর্য্য-ধন-বল ইত্যাদি থাকিলে যদি তজ্জনিত গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প-বিদ্যাদি-বিশিষ্টকে অপমান করে, তাহা হইলে অপমানিত ব্যক্তি অপমানকারীর প্রতি অমর্ষভাবাপন্ন হইয়া থাকে। অমর্ষের উদ্রেক হইলে শিরঃকম্প, ঘর্ম্মনির্গম ইত্যাদি উহার কার্য্য (ফল) দৃষ্ট হয়। অধ্যবসায়—দৃঢ়নিশ্চয়। উপায় ও সহায় অন্বেষণ—উপায় অচেতন; সহায় চেতন; যথা—ক্ষুধানিবৃত্তির উপায় ভোজন; আর ক্ষুধানিবৃত্তির সহায়—যে ভোজন করাইয়া থাকে।

(৫) "অবহিত্থং নাম—আকারপ্রচ্ছাদনাত্মকম্। তচ্চ লজ্জাভয়াপচয়গৌরবজৈহ্ম্যাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তস্যান্যথাকথনাব-(বি) লোকিত কথাভঙ্গকৃতকধৈর্য্যাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

—নাঃ শাঃ; পৃঃ ৩৭৩

আকার—বাহ্য আকার—"ইঙ্গিতো হৃদ্গতো ভাবো বহিরাকার আকৃতিঃ"। আকার-প্রচ্ছাদন—ইহার দুই প্রকার অর্থ করা চলে—(১) বাহ্য আকার গোপন—ছদ্মবেশ, আত্মগোপন ইত্যাদি উপায়-দ্বারা; (২) মনের ভাব এরূপে গোপন করা যে বহিরাকৃতি দেখিয়া কেহ যাহাতে মনোভাব বুঝিতে না পারে।

(৬) "ধার্ষ্ট্যজৈহ্ম্যাদিসম্ভূতমবহিত্থং ভয়াত্মকম্ (ভয়ানকম্)।

তচ্চাগণনয়া কার্য্যং নাতি (তানি) চোত্তরভাবণাৎ ॥

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৭৩

তচ্চাগণনয়া কার্য্যং নাতিচোত্তরভাবণাৎ—ইহার অর্থ বেশ স্পষ্ট নহে। তবে এরূপ একটা করা যায়—কাহাকেও গণনার মধ্যে না আনিলে অথবা কাহারও কথার বেশী উত্তর না দিলে ইহার অভিনয় সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(৭) "উগ্রতা নাম—চৌর্য্যাভিগ্রহণনৃপাপরাধাসৎপ্রলাপাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তাঞ্চ বধ-বন্ধন-তাড়ন-নির্ভৎসনাদিভিরনুভাবৈরভিনয়েৎ। অত্রার্য্যা ভবতি—

চৌর্য্যাভিগ্রহণবশান্নৃপাপরাধাদথোগ্রতা ভবতি।

বধবন্ধতাড়নাদিভিরনুভাবৈরভিনয়স্তস্যাঃ ॥" —নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৭৪

চৌর্য্যাভিগ্রহণ—(১) চৌর্য্য, (২) অভিগ্রহ অর্থাৎ আক্রমণ। অথবা—চৌর্য্য-জনিত অভিগ্রহণ। গৃহে চৌর্য্য অথবা দস্যু প্রভৃতির আক্রমণ ঘটিলে, অথবা চৌর্য্যকালে চোরগণ-কর্ত্তৃক আক্রমণ ঘটিলে উগ্রতা জন্মে। নৃপাপরাধ—(১) নৃপগণের নিকট অপরাধ, (২) নৃপ-কর্ত্তৃক অপরাধ অর্থাৎ উৎপীড়ন। এই উভয় কারণে উগ্রতা জন্মে।

(৮) "মতির্নাম—নানাশাস্ত্রবিচিন্তনোহাপোহাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তামভিনয়েচ্ছিষ্যোপদেশার্থবিকল্পনসংশয়চ্ছেদনাদিভিরনুভাবৈঃ। ভবতি চাত্র শ্লোকঃ—

নানাশাস্ত্রার্থবোধেন (নানাশাস্ত্রবিনিষ্পন্না) মতিঃ

সঞ্জায়তে নৃণাম্।

শিষ্যোপদেশার্থকৃতস্তস্যাস্ত্বভিনয়ো ভবেৎ" ॥

—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৭৪

উহাপোহ—স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিচার, অন্বয়-ব্যতিরেক-যুক্তি-দ্বারা বস্তুনির্দ্ধারণ, মনন। অর্থ-বিকল্পন—বিষয়ের বিবিধ কল্পনা—নানা বিষয়ক কল্পনা।

ব্যাধি—মুখের বিকার, গাত্র-স্তব্ধতা, ত্রস্ত নয়ন, দীর্ঘশ্বাস, উচ্চ শব্দ, (স্তনিত), উৎক্রোশ, কম্প, ক্রন্দন—ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা সেগুলির অভিনয় করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে একটি সংগ্রহ-শ্লোক দৃষ্ট হয়—

বিস্রস্ত অঙ্গ, গাত্র-বিক্ষেপ ও মুখ বিকূণন ইত্যাদি দ্বারা সাধারণ ভাবে সকল প্রকার ব্যাধির অভিনয় বুধগণ করিবেন (৯)।

(৩০) উন্মাদ—ইষ্টজন-বিয়োগ-বিভব-নাশ-অভিঘাত-বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-প্রকোপ ইত্যাদি বিভাব হইতে জাত। নিষ্কারণ হাস্য ও রোদন, উৎক্রোশ, অসম্বদ্ধ প্রলাপ, শয়ন, উপবেশন, স্থিতি, ধাবন, নৃত্য, গীত, পাঠ,—ভস্ম-ধূলি-লেপন, তৃণ-নির্ম্মাল্য-কুৎসিত বস্ত্র-ছিন্ন চীরখণ্ড ও ঘট-কপাল-শরাবাদি আভরণ ধারণ, উপভোগ, ও অন্যান্য বহুবিধ অনিয়মিত চেষ্টা ও অনুকরণাদি বিভাব হইতে ইহা উৎপন্ন।

এ প্রসঙ্গে দুইটি আর্য্যা উদ্ধৃত হইয়াছে—ইষ্টজন-বিয়োগ-বিভব-নাশ, অভিঘাত, বাত-পিত্ত-কফ-প্রকোপ ও নানা প্রকার চিত্তবিকার হইতে উন্মাদের উৎপত্তি।

বিনা কারণে—হাস্য, রোদন, উপবেশন, গান, ধাবন, উৎক্রোশ ও অন্যান্য বিকারাত্মিকা চেষ্টা-দ্বারা উন্মাদ-ভাবের অভিনয় কর্ত্তব্য (১০)।

(৩১) মরণ—ব্যাধি অথবা অভিঘাত হইতে সঞ্জাত। ব্যাধিজ—অন্ত্র-যকৃৎ-শূল-দোষবৈষম্য-গণ্ড-পিটক-জ্বর-বিসূচিকাদি হইতে উদ্ভূত। অভিঘাতজ—শস্ত্রাঘাত, সর্পদংশন, বিষপান, শ্বাপদ, গজ-তুরগ-রথ-পশু-যান-পতনাদি-সম্ভূত।

এই দুই প্রকার মরণের অভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণও এই স্থলে উক্ত হইয়াছে।

(১) বিষণ্ণ গাত্র, বিস্তারিত অঙ্গ, হস্তপদ সঞ্চালন, নিমীলিত-নয়ন, হিক্কা, শ্বাস, পরিজনগণের অপেক্ষা না রাখা (পরিজনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করা) অব্যক্ত অক্ষর-কথন—ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা ব্যাধিজ মরণের অভিনয় কর্ত্তব্য।

এ প্রসঙ্গে একটি সংগ্রহ-শ্লোক আছে।—সকল প্রকার ব্যাধি-জনিত মরণের একই ভাবে অভিনয় কর্ত্তব্য—বিষণ্ণগাত্রতা, নিশ্চেষ্টতা ও ইন্দ্রিয়হীনতা—এইগুলি সকল ব্যাধি হইতে জাত মরণের সাধারণ অনুভাব।

পক্ষান্তরে, অভিঘাতজ মরণে নানারূপ অভিনয় দেখান উচিত। যথা—শস্ত্রক্ষতে—সহসা ভূমি-পতন, কম্প, স্ফুরণ ইত্যাদি দ্বারা অভিনয় কর্ত্তব্য। আবার সর্পদংশনে বা বিষপানে বিষবেগ নিম্নোক্ত উপায়ে দেখাইতে হইবে—কৃশতা, কম্প, দাহ, হিক্কা (মুখে) ফেনোদ্গম, স্কন্ধভঙ্গ, জড়তা ও পরিশেষে মৃত্যু—এই আটটি বিষবেগ।

এ প্রসঙ্গে দুইটি শ্লোক ও একটি আর্য্যা সংগ্রহরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।—

(১) প্রথম বিষবেগে—কৃশতা, (২) দ্বিতীয়ে—কম্প, (৩) তৃতীয়ে—দাহ, (৪) চতুর্থে—হিক্কা, (৫) পঞ্চমে—(মুখে) ফেনোদ্গম, (৬) ষষ্ঠে—স্কন্ধভঙ্গ, (৭) সপ্তমে—জড়তা ও (৮) অষ্টমে—মরণ।

শ্বাপদ-গজ-তুরগ-রথ ইত্যাদি জনিত ও পশুযান-পতন-সঞ্জাত মরণ শস্ত্রাঘাতজ মরণের ন্যায় অভিনেয়। এ সকল প্রকার মরণে গাত্র-সঞ্চারের কোন অপেক্ষা থাকে না।

নানা অবস্থাত্মক মরণের বিবরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে (১১)।

---

(৯) "ব্যাধির্নাম—বাত-পিত্তকফসন্নিপাতপ্রভবঃ। তস্য জ্বরাদয়ো বিশেষাঃ। জ্বরস্ত খলু দ্বিবিধঃ—সশীতঃ, সদাহশ্চ। তত্র সশীতো নাম—(সশীতস্তাবৎ) প্রবেপিতসর্বাঙ্গোৎকম্পননিকুঞ্চনা-(কুঞ্চিত) গ্নাভিলাষরোমাঞ্চহনুব (চ) লননাসাবিকূণন (বিঘূর্ণন) মুখশোষণ-পরিদেবিতাদিভি (রোমাঞ্চাস্রানেকপরিদেবনাদিভি) রনুভাবৈরভিনয়েৎ (অভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ)। সদাহো নাম (সদাহঃ পুনঃ)—বিক্ষিপ্তাঙ্গ (বিক্ষিপ্তবস্ত্র) করচরণভূম্যভিলাষানুলেপনশীতলাভিলাষপরি-দেবনমুখশোষোৎক্রুষ্টাদিভিরনুভাবৈঃ (শীতাভিলাষপরিদেবিতোৎ-ক্রুষ্টাদিভিঃ)। যে চান্যে ব্যাধয়স্তেঽপি খলু মুখবিকূণনগাত্রস্তম্ভ-প্রস্তাক্ষিনিঃশ্বসনস্তনিতোৎক্রুষ্টবেপনা (পরিদেবনা) দিভিরনুভাবৈর-ভিনেয়াঃ।

অত্র শ্লোকো ভবতি—

সামান্যতস্তু ব্যাধীনাং কর্ত্তব্যোঽভিনয়ো বুধৈঃ।
স্রস্তাঙ্গগাত্রবিক্ষেপৈস্তথা (রুজা) মুখবিকূণনৈঃ।
(মুখবিঘূর্ণনৈঃ)" ।—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৭৪-৭৫

বিকূণন—সঙ্কোচন। পরিদেবন—আর্ত্তভাবে ক্রন্দন। উৎক্রোশ—নাম ধরিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার বা ক্রন্দন। স্তনিত—শব্দ করা।

(১০) "উন্মাদো নাম—ইষ্টজনবিয়োগবিভবনাশব্যসনাভিঘাতবাত-পিত্তশ্লেষ্মপ্রকোপাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তমনিমিত্তহসিতরুদি-তোৎক্রুষ্টাসম্বদ্ধপ্রলাপ-শয়িতোপবিষ্টোত্থিত-প্রধাবিতনৃত্য-গীতপঠিতভস্ম-পাংশ্বধূলনতৃণনির্ম্মাল্যকুচেলচীরঘটকপালশরাবভরণধারণোপভোগৈরনে-কৈশ্চানবস্থিতৈশ্চেষ্টানুকরণাদিভি (রন্যৈশ্চানবস্থিতচেষ্টাকরণাদিভি) রনুভাবৈরভিনয়েৎ। অত্রার্য্যে ভবতঃ—

ইষ্টজনবিভবনাশাদভিঘাতাদ্বাতপিত্তকফকোপাৎ। বিবিধাচ্চিত্ত-বিকারাদুন্মাদো (বিবিধাৎ পিত্তবিকারাদুন্মাদো) নাম সম্ভবতি ।১২২।

অনিমিত্তরুদিতহসিতোপবিষ্টগীতপ্রধাবিতোৎক্রুষ্টৈঃ। অন্যৈশ্চ বিকারকৃতৈরুন্মাদং সম্প্রযুঞ্জীত" ।১২৩।

—নাঃ শাঃ, ৩৭৫-৭৬

নির্ম্মাল্য—দেবপূজার পুষ্পাদি। কপাল—নর-কপাল, অথবা ঘটের অবয়ব (ভাঙ্গা খোলা)। পিত্তবিকার ও চিত্তবিকার—দুইটি পাঠের মধ্যে শেষেরটিই ভাল বোধ হয়।

(১১) "মরণং নাম—ব্যাধিজমভিঘাতজং চ। তত্রান্ত্রযকৃচ্ছূলদোষ-বৈষম্যগণ্ডপিট(ড)কজ্বরবিসূচিকাদিভি (বিভাবৈ) র্যদুৎপদ্যতে তদ্ব্যাধি-প্রভবম্। অভিঘাতজং তু শস্ত্রাহিদংশবিষপানশ্বাপদগজতুরগরথ-পশু-যানপাত (পবন) বিনাশপ্রভবম্। এতয়োরভিনয়বিশেষান্ (বং) বক্ষ্যামঃ (বক্ষ্যামি)—তত্র ব্যাধিজং নাম বিষণ্ণগাত্রব্যায়তাঙ্গ-বিচেষ্টিতনিমীলিতনয়নঃ হিক্কাশ্বাসোপেতমনবে (পে) ক্ষিতপরিজন-মব্যক্তাক্ষরকথনাদিভিরনুভাবৈরভিনয়েৎ। (বিষণ্ণগাত্রমপ্যায়তাঙ্গ-বিচেষ্টিত···শ্বাসোৎপতন···)।

অত্র শ্লোকো ভবতি—

ব্যাধীনামেকভাবো হি মরণাভিনয়ঃ স্মৃতঃ।
বিষণ্ণগাত্রৈর্নিশ্চেষ্টৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ বিবর্জ্জিতঃ ।১৩৫।

অভিঘাতজে তু নানাপ্রকারা অভিনয়বিশেষাঃ। শস্ত্রক্ষতা-হিদষ্টবিষপীতগজাদিপতিতশ্বাপদহতাঃ।। যথা তত্র শস্ত্রক্ষতে তাবৎ

(৩২) ত্রাস—বিদ্যুৎ-উল্কা-অশনি ; পতন-নির্ঘাত-জলধর-মহাসত্ত্ব-পশুরবাদি বিভাব-সম্ভাত। অঙ্গ-সঙ্কোচন-উৎকম্প-কম্প-স্তম্ভ-রোমাঞ্চ-গদ্‌গদ প্রলাপাদি অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয়।

সহসা ভূমিপতনবেপনস্ফুরণাদিভিরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। অহিদষ্টবিষপীতয়োর্বিষবেগো যথা (অহিদষ্টে তু বিষপীতে বা বিষবেগে যথা) কার্শ্যবেপথুবিদাহহিক্কাফেনস্কন্ধভঙ্গজড়তামরণানীত্যষ্টৌ বিষবেগাঃ।

অত্র (অনুবংশ্যৌ) শ্লোকৌ ভবতঃ—
কার্শ্যং তু প্রথমে বেগে দ্বিতীয়ে বেপথুর্ভবেৎ।
দাহং তৃতীয়ে হিক্কাং চ চতুর্থে সম্প্রযোজয়েৎ ॥ ১৩৬ ॥
ফেনঞ্চ পঞ্চমে কুর্য্যাৎ ষষ্ঠে স্কন্ধস্য ভঞ্জনম্।
জড়তাং সপ্তমে কুর্য্যাদষ্টমে মরণং ভবেৎ ॥ ১৩৮ ॥
অত্রার্য্যা ভবতি—
শ্বাপদগজতুরগরথোদ্ভবস্ত পশুযানপতনজং বাপি।
শস্ত্রক্ষতবৎ কুর্য্যান্নবে (পে) ক্ষিতগাত্রসঞ্চারম্ ॥
ইত্যেব (বং) মরণং জ্ঞেয়ং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
প্রযোক্তব্যং বুধৈঃ সম্যগ্‌, যথা ভাবাঙ্গচেষ্টিতৈঃ ॥
(বাগঙ্গচেষ্টিতৈঃ) ॥ ১৪০ ॥—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৭৭-৩৭৮

দোষ—উৎকট রোগ। বৈষম্য—ধাতুবৈষম্য—বায়ু-পিত্ত-কফের বৈষম্য। গণ্ড—গোদ গণ্ডমালা ইত্যাদি গ্রন্থি-স্ফীতি (gland). পিটক (পিণ্ডক)—বিষফোড়া। বিসূচিকা কলেরা। শ্বাপদ-হিংস্র পশু, ব্যাঘ্রাদি-শ্বাপদগজতুরগ-রথ—ইহাদিগের আক্রমণে বা রথ চাপা পড়িয়া মৃত্যু ঘটে। পশুযানপাত—পশুর পৃষ্ঠ হইতে অথবা যান হইতে পতনে মৃত্যু।

বিষণ্ণ গাত্র—অবসন্ন গাত্রাবয়ব। ব্যায়তাঙ্গ—অঙ্গ এলাইয়া পড়িয়াছে—এই ভাব। বিচেষ্টিত—ছটফট্ করা। হিক্কা—হেঁচ্‌কী। অনবেক্ষিত-পরিজন—আপনার লোকেরা ডাকিলেও সাড়া না দেওয়ার ভাব। অব্যক্তাক্ষরকথন—অস্ফূট প্রলাপ—বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা। স্কন্ধভঙ্গ—ঘাড় লট্‌কাইয়া পড়া—মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ।

এ প্রসঙ্গে একটি সংগ্রহ-শ্লোক—
মহাভৈরব নাদাদি হইতে ত্রাস সমুৎপন্ন হয়। বিত্রস্ত অঙ্গ, অক্ষিনিমেষ ইত্যাদি দ্বারা উহা অভিনেয় (১২)।

(৩৩) বিতর্ক—সন্দেহ বিমর্শ বিপ্রতিপত্তি ইত্যাদি বিভাব-সম্ভূত বিবিধ বিচার, প্রশ্নোত্তর-নির্ণয়, মন্ত্রগোপন ইত্যাদি অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয়।

এ প্রসঙ্গে একটি সংগ্রহ-শ্লোক—
বিচারণাদি হইতে সম্ভূত, সন্দেহের আতিশয্য-স্বরূপ বিতর্ক—শিরোভ্রূক্ষেপ-কম্পনাদি-দ্বারা অভিনেয় (১৩)।

তেত্রিশটি ব্যভিচারি-ভাব বা সঞ্চারিভাবের বিবরণ এই প্রসঙ্গে সমাপ্ত হইয়াছে। আগামী সংখ্যায় সাত্ত্বিক ভাবের বিবরণ প্রদান-পূর্ব্বক নাট্যশাস্ত্রোক্ত এই ভাব-প্রকরণ সমাপ্তির ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

---

(১২) "ত্রাসো নাম—বিদ্যুদুল্কাশনিনিপাতনির্ঘাতাম্বুধর(দর)-মহাসত্ত্ব(বসত্ব)দর্শনপশুরবাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তমভিনয়েৎ সংক্ষিপ্তাঙ্গোৎকম্পনবেপথুস্তম্ভরোমাঞ্চগদ্‌গদপ্রলাপাদিভিরনুভাবৈঃ; অত্র শ্লোকো ভবতি—
মহাভৈরবনাদাদ্যৈস্ত্রাসঃ সমুপজায়তে।
ত্রস্তাঙ্গাক্ষিনিমেষৈশ্চ (ত্রস্তাঙ্গার্দ্ধনিমেষাদ্যৈঃ)
তস্য ত্বভিনয়ো ভবেৎ" ॥ ১৪২ ॥—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৭৮
সংক্ষিপ্তাঙ্গ—অঙ্গসঙ্কোচন। অর্দ্ধনিমেষ—অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু।

(১৩) "বিতর্কো নাম—সন্দেহবিমর্শবিপ্রতিপত্ত্যাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তমভিনয়েদ্ বিবিধবিচারিতপ্রশ্নসম্প্রধারণমন্ত্রসংগ্রহণাদিভিরনুভাবৈঃ (বিবিধবিচারিতসংজ্ঞাসম্প্রহারণ……)।
অত্র শ্লোকো ভবতি—
বিচারণাদিসম্ভূতঃ সন্দেহাতিশয়াত্মকঃ (সন্দেহজননাত্মকঃ)।
বিতর্কস্ত্বভিনেয়ঃ স্যাচ্ছিরোভ্রূক্ষেপকম্পনৈঃ ॥
(বিতর্কঃ সোঽভিনেয়স্ত………) ॥ ১৪৪ ॥
—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৭৮—৭৯

বিমর্শ—বিচার। বিপ্রতিপত্তি—বিচার্য্য বিষয়, বিরুদ্ধ বিষয়, বিরোধ। সম্প্রধারণ—নির্ণয়। মন্ত্র—মন্ত্রণা। সংগূহন—গোপন করা। শিরোভ্রূক্ষেপকম্পনৈঃ—শিরঃকম্প ও ভ্রূবিক্ষেপ।

নববর্ষে

অমৃতঘট পূর্ণ বিষে! অন্ধ অমা-রাত্রি জাগে!
আলোর কুসুম ফোটে না আর মুগ্ধ ব্যাকুল আঁখির আগে!
আকাশ আঁধার ভুবন আঁধার, স্তব্ধ আকুল অন্ধকারে—
শুনছি শ্মশান-শিবার ধ্বনি মোদের নীরব বন্ধ দ্বারে।
শুনছি বসে শ্মশানচারী প্রেত-পিশাচের অট্টহাসে;
হিংসা-দ্বেষ আর বর্ব্বরতায় পরাণ কাঁপে বিকট ত্রাসে!
শ্মশান-ভূমির বীভৎসতায় লক্ষ মানুষ আজকে কাঁদে—
নিশ্বাস-রোধী অন্ধকারে করুণ ব্যাকুল আর্ত্তনাদে!
শব-সাধনায় বসবে তুমি অনাগত সাধক কবে?
শ্মশান-ভূমির বীভৎসতা স্পর্শে তোমার ধন্য হবে!

জাগবে মহা-শক্তিরূপা অন্ধকারে জাগবে বিভা—
আঁখির আগে প্রকট হবে লক্ষ-কোটি সূর্য্য-নিভা!
মিলিয়ে যাবে আঁধার রাতের প্রেত-পিশাচের অট্টহাসি,
উঠবে বেজে মধুর সুরে চতুর্দ্দিকে আলোর বাঁশী!
অমিয়-ঘট পূর্ণ হবে কানায় কানায় সুধার ধারে!
স্বর্গ সে-দিন ব্যাকুল স্নেহে আসবে নেমে মোদের দ্বারে!
সেই সুদিনের আশায় রহি, অনাগত সাধক তুমি
আসবে কবে? ধন্য হবে এই নিদারুণ শ্মশান-ভূমি!
গাইব তোমার জয়ধ্বনি সে-দিন নবীন মহোৎসবে—
বীর্য্যশালী দীপ্ত সাধক, আঁধার দেশে আসবে কবে?

শ্রীমতী নীলিমা নাগ

অশ্রু-অর্ঘ্য

সামাজিক মানুষ সতীশচন্দ্র

জানি, মানুষ চিরঞ্জীবী নয়। এক দিন বিদায় নিয়ে যেতেই হবে। বিচ্ছেদমাত্রই শোকাবহ। কিন্তু এই শোক মর্ম্মভেদী হয়ে ওঠে, যখন পরিচিত কোনও প্রিয়জন অসময়ে আমাদের পরিমণ্ডল হ'তে তিরোহিত হয়ে যান। আজ তাই বহু মানুষের সঙ্গে আমাদেরও বজ্রাহত করেছে সতীচন্দ্রের এই অকাল-বিয়োগ।

মহাকালের অনন্ত প্রবাহে একটি মানুষের জীবনস্রোত সাগরের বুকে বুদ্‌বুদের মতো! নিমেষে উদয়, নিমেষে বিলয়। বুদ্‌বুদ জলের সঙ্গে মিশে যায়। কোনও চিহ্ন সে রেখে যায় না পরবর্ত্তী কালের ফলকে। কিন্তু মানুষের জীবন-প্রদীপ নিবে গেলেও সংসারের আলো একেবারে নিষ্প্রভ হয় না। বংশগত শোণিত-সূত্রে উজ্জ্বল হয়ে থাকে তার স্মৃতি সন্তান-সন্ততির ভিতর দিয়ে পুরুষানুক্রমের ধারায়।

যেখানে বংশানুক্রমের ধারা হারিয়ে ফেলে তার সূত্র মহাকালের মরুপথে, সেখানেও অমর হয়ে থাকে মানুষের স্মৃতি—মানুষের জীবন—তার নিজের অক্ষয় কীর্ত্তির মধ্যে। নিজ জীবনের কীর্ত্তির মধ্যে নিজেকে জীবিত রেখে যেতে পারেন তাঁরাই সংসারে—যাঁরা অসাধারণ মানুষ। বংশানুক্রমের মধ্যে নিজেকে রেখে যান প্রায় সকল মানুষই, এমন কি জীব জন্তুরাও। কিন্তু সতীশ বাবু তাঁর জীবনকে—তাঁর স্মৃতিকে—নিজের সারা জীবনের কর্ম্ম-তপস্যাময় কীর্ত্তির মধ্যে অক্ষয় করে রেখে যেতে পেরেছেন। এ যাঁরা পারেন সংসারে তাঁরাই মৃত্যুঞ্জয়ী।

'বসুমতী' মাসিকপত্র, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং 'বসুমতী সাহিত্য-মন্দির'কে কর্ম্মবীর সতীশচন্দ্র তাঁর নিজের অপরিসীম গুণে, অনলস পরিশ্রমে ও নিয়ত যত্নে এমন একটি সুবৃহৎ ও সুলভ লোক-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলেছিলেন যে, নিঃস্ব বাঙালী জাতির জীবনে এ একটি গর্ব্ব করবার মতো বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সতীশচন্দ্রের স্বল্পায়ু জীবনের এ যেন এক কীর্ত্তি-সৌধ। একে যদি দেশের লোক বাঁচিয়ে রাখতে পারে সতীশচন্দ্রের স্মৃতি বাঙলার বুকে চিরজাগ্রত থাকবে।

সতীশ বাবুর কর্ম্মময় জীবনের কৃচ্ছ্র সাধনা বাঙলা দেশের সমস্ত কিশোর ও তরুণদের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত বলে মনে করি। তরুণবয়স্ক সতীশচন্দ্র পিতা উপেন্দ্রনাথের আকস্মিক অকাল-বিয়োগের পর কেবলমাত্র বসুমতী সাহিত্যকে বিরাট ক'রে গড়ে তোলবার ভারই নিজের স্কন্ধে তুলে নেননি তার সঙ্গ নিয়েছিলেন ব্যবসায়ে বারংবার ক্ষতিসঞ্জাত পিতার বিপুল ঋণভার। পিতার সার্থক সন্তান ছিলেন তিনি। পিতার জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, পিতার মনের বিরাট কল্পনা ও মহান্ আদর্শকে নিজের স্বল্পায়ু জীবনের অতুলনীয় কর্ম্মকুশলতার গুণে মূর্ত্ত, সত্য ও সার্থক করে গিয়েছেন তিনি।

বহু পুণ্যফলে সতীশচন্দ্রের মতো এমন পিতৃ-পিতামহের আদর্শানুযায়ী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সদাচারী নির্ম্মলচরিত্র ও একান্ত পিতৃ-মাতৃভক্তিপরায়ণ পুত্রলাভ কোনও কোনও পিতা-মাতার ভাগ্যে ঘটে। সতীশচন্দ্রের শোকাতুরা বৃদ্ধা মাতা আজ সংসারত্যাগিনী। তাঁর তুল্য সৌভাগ্যশালিনী অপিচ দুর্ভাগ্যবতী নারীও কোনও পরিবারে কদাচিৎ দেখা যায়।

পারিবারিক জীবনে সতীশচন্দ্র ছিলেন আদর্শ পতি, আদর্শ পিতা, আদর্শ শ্বশুর এবং আদর্শ কুটুম্ব। তরুণ বয়সে একদা সতীশচন্দ্র সংসার ত্যাগ করে গিয়ে সন্ন্যাসী গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিবাগী পুত্রকে বহু কষ্টে মাতা সংসারে ফিরিয়ে আনেন। গুরুর আদেশে সংসারবিরাগী সতীশচন্দ্রকে জীবনের কর্ম্মযোগ সম্পন্ন করবার জন্য সংসারে ফিরে আসতে এবং বিবাহ করে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করতে হয়েছিল। তাই বার বার এই কথাই আজ মনে জাগছে যে, সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্যের অমরক-জীবনের প্রয়োজন কি আজ ফুরিয়ে এসেছিল?

গুরুকৃপায় পত্নী পেয়েছিলেন সতীশচন্দ্র এক অসাধারণ গুণশালিনী নারীকে—যিনি স্নিগ্ধ লাবণ্যময়ী, প্রিয়ভাষিণী এবং সর্ব্ববিষয়ে একান্ত দায়িত্ববোধ-সম্পন্না। আদর্শ হিন্দু পত্নীর প্রত্যেক প্রয়োজনীয় গুণ যে তাঁর মধ্যে সহজাতরূপে বর্ত্তমান ছিল, এ কথা যাঁরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। দেবদ্বিজে ভক্তিমতী, শ্বশুরকুলের মর্য্যাদার প্রতি দায়িত্ববোধযুক্তা, পতির ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সহচারিণী পত্নী লাভ করে সতীশচন্দ্রের দাম্পত্য-জীবন হয়েছিল সর্ব্বরকমে সার্থক। সন্ততি মধ্যে পাঁচটি কন্যা ও একটিমাত্র পুত্র লাভ করেছিলেন তিনি। সেই এক পুত্রই তাঁর শত পুত্রের উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল—বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, চরিত্রগুণ ও ব্যবসায়-প্রতিভার গুণে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়েও তাঁর পুত্র রামচন্দ্র ছিলেন প্রিয়দর্শন। সতীশচন্দ্রের প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়েছিল প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক এবং 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র ও শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্রের সহিত। এই বিবাহ দেশে একটা সাড়া জাগিয়েছিল সে-দিন। 'ভারতবর্ষ' ও 'বসুমতীর' এই শুভ সংযোগ সতীশচন্দ্রের জীবনের প্রথম সামাজিক কাজকে সকলের নিকট সে-দিন প্রশংসনীয় করে তুলেছিল।

জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের দীর্ঘকাল পরে বহু আশা ও আনন্দ নিয়ে তিনি তাঁর বড় আদরের বড় গৌরবের

সুযোগ্য বংশধর রামচন্দ্রের বিবাহ দিয়ে কিশোরী পুত্রবধূ ঘরে নিয়ে এলেন। সপ্তাহকাল ধ'রে সে কি আনন্দ উৎসব—সে কি বিপুল সমারোহ! কিন্তু এ আনন্দ তাঁর বেশী দিন স্থায়ী হল না। মেধাবিনী ও বিদুষী দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী প্রীতিলতার (ডলি) আকস্মিক অকাল-মৃত্যু সতীশচন্দ্রের আনন্দ-উজ্জ্বল সুখের সংসারে সর্ব্বপ্রথম বিষাদের যে কালো ছায়া ঘনিয়ে তুলে শোকের ঝঞ্ঝা বইয়ে দিয়েছিল, সে অশ্রুসিক্ত আঁধার-তিমির আর সম্পূর্ণ বিদূরিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি তাঁর সংসার থেকে। প্রীতির বিয়োগ-বেদনার ক্ষত মিলিয়ে যেতে না যেতে বিনামেঘে বজ্রপাতের চেয়েও নিদারুণ ও আকস্মিক ভাবে তাঁর নয়নের মণি একমাত্র বংশধর সুস্থ সবল শ্রীরামচন্দ্র মাত্র কয়েক দিনের রোগ-ভোগে সংসার থেকে চিরবিদায় নিলেন।

এই দুর্ঘটনার পর দু'টি মাসও অতিবাহিত না হ'তে সতীশচন্দ্রের এই অকস্মাৎ মহাপ্রয়াণ আমাদের মনে অতীত পৌরাণিক যুগের এক অনুরূপ শোকাবহ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। রাজ্যাভিষেকের আনন্দোৎসবকে অকস্মাৎ বিষাদের ঘন আঁধারে ডুবিয়ে দিয়ে অযোধ্যা-পতি দশরথের প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্র যে-দিন বনবাসে যাত্রা করেন, পুত্রগতপ্রাণ দশরথ রাম-বিরহে যে শোকশয্যা নিয়েছিলেন সেই শয্যাতেই জীবন ত্যাগ করেছিলেন। রামের বিচ্ছেদ-বেদনা তিনি সহ্য করতে পারেননি। পুত্র-শোকাতুর সতীশচন্দ্রও যেন তাঁর বড় স্নেহের বড় আদরের সন্তান এবং বিরাট বসুমতী প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ পরি-চালক রামচন্দ্রের অপ্রত্যাশিত বিয়োগ-বেদনা সহ্য করতে না পেরে অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

সন্তানবৎসল সতীশচন্দ্রকে পুত্র-কন্যার মুখ চেয়ে অনেক কিছুই সহ্য করতে দেখেছি। তাঁর সেই অপরি-সীম ত্যাগস্বীকার, ধৈর্য্যশীলতা ও ক্ষমাগুণ দেখে বিস্মিত মনে ভেবেছি, এমন অকাতরে সকল বেদনা ও আঘাত যিনি নিঃশব্দে সহ্য করতে পারেন তিনি সাধারণ বা সামান্য মানুষ নন। তিনি সাধুপুরুষ এবং মহানুভব ব্যক্তি।

আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব এমন কি পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্ম-চারীরাও অনেকে তাঁকে নানা রকমে বেদনা দিয়েছে, তাঁর বিশ্বাসে আঘাত করেছে, সমস্তই তিনি ধীর প্রসন্ন-মুখে সহ্য করেছেন। সতীশচন্দ্রের ক্ষমা ও উদারতা তাঁর একাধিক অবিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে কারাবাস থেকে রক্ষা করেছে।

সতীশচন্দ্র ছিলেন সনাতনপন্থী হিন্দু। কিন্তু তাঁর মধ্যে সংকীর্ণ গোঁড়ামি ছিল না। তিনি ছিলেন স্বধর্ম্ম-পরায়ণ এবং দেব-দ্বিজ ও গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান। সদাচারী সতীশচন্দ্র ছিলেন বিলাস-ব্যসন হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত। সামাজিক কাজ-কর্ম্মে ও পূজা-পার্ব্বণে তিনি মুক্তহস্তে ব্যয় করতেন। স্বকীয় উপার্জ্জনে যথেষ্ট ধনের অধিকারী হয়েও তাঁর মতো নিরহঙ্কার, বিনয়ী, অনাড়ম্বর মানুষ অল্পই চোখে পড়ে। তাঁর মুখে লেগে থাকতো সদাপ্রসন্ন স্নিগ্ধ সহজ হাসি। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের আপদে-বিপদে, রোগে-শোকে, উৎসবে-আনন্দে তাঁকে সর্ব্বাগ্রে ছুটে আসতে দেখেছি। যখনই যেখানে দেখা হয়েছে আগেই এগিয়ে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। প্রচুর বিত্তশালী অথচ আত্মাভিমানশূন্য অকপট—নম্র মানুষ সতীশ বাবুর তুল্য সত্যই বিরল।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমাদের আদর্শের সঙ্গে তাঁর আদর্শের মিল ছিল না। সাহিত্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ রক্ষণশীল আর আমরা চিরদিনই সংস্কারপন্থী। এই মতান্তর কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনও দিনই মনান্তর সৃষ্টি করতে পারেনি। মতের অনৈক্য সত্ত্বেও আমরা তাঁর শ্রদ্ধা, সম্মান ও সমাদর থেকে কখনও বঞ্চিত হইনি। তাঁর একান্ত আগ্রহে আমরা 'বসুমতী'তে মাঝে মাঝে লেখা দিয়েছি। আমাদের কথ্য ভাষার রচনা তিনি বহু আয়াস স্বীকার করে সযত্নে সাধুভাষায় রূপান্তরিত করে নিয়ে ছাপতেন। এ থেকে তাঁর আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক সুদৃঢ় নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের প্রতি তাঁর এই সৌহার্দ্য ও প্রীতি, তাঁর ভিন্নপন্থীদের প্রতি অবিরাগ ও পরমতসহিষ্ণুতা গুণের নিদর্শনরূপেই উল্লেখ করা যায়।

সতীশ বাবু আজ ইহলোকে নেই। তাঁর জন্য শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করতে বেঁচে আছেন সংসারে তাঁর বৃদ্ধা মাতা, মৃত্যুমুখিনী শোকার্ত্তা পত্নী, বালবিধবা পুত্রবধূ, অজ্ঞান শিশু পৌত্রী, বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তিনটি কুমারী বালিকা কন্যা। যাঁর ইচ্ছায় ও আদেশে সংসারত্যাগী সতীশ বাবু সংসারে ফিরে এসে বিরাট বসুমতী-সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান এক হাতে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরই দুর্নিবার ইচ্ছায় হয়ত আজ এই মর্ম্মান্তিক অবস্থা সংঘটিত হ'ল। আমরা ক্ষীণদৃষ্টি ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ। সংসারের অনেক কিছুই দেখতে পাই না, অনেক কিছুরই অর্থ বুঝি না। তবে সংসারে সব কিছুই যে এক অদৃশ্য শক্তির অমোঘ ইচ্ছায় ঘটছে এটা যেন সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করতে পারা যায়। সতীশ বাবুর স্ত্রী যে তাঁর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী—এ কথা আগেই বলেছি। বিধাতা যদি তাঁকেও অসময়ে আকস্মিক ভাবে তুলে না নেন, তা'হলে সতীশ বাবুর কোনও কর্ম্ম—কোনও পরি-কল্পনা—যদি অসমাপ্ত থেকে গিয়ে থাকে, তার সুচারু সমাপ্তির জন্য আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। কিন্তু প্রিয়তমা কন্যা ও প্রাণাধিক পুত্রবিয়োগের পর থেকে সতীশচন্দ্র ও তাঁর পত্নীর শারীরিক অবস্থা এমন হয়ে পড়েছিল যে, কে আগে কে পরে যাত্রা করবেন নির্ণয় করা কঠিন হয়ে উঠেছিল চিকিৎসকদের পক্ষেও।

ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, একমাত্র তিনিই জানেন। আমরা

ঐকান্তিক চিত্তে প্রার্থনা করি, তাঁর শেষ অসমাপ্ত কাজগুলি যেন সুচারুরূপে সমাপ্ত হয়। করুণাময় ভগবান আমাদের এই সুহৃদ্-পরিবারের নিদারুণ শোকানলে শান্তি-বারি বর্ষণ করুন।

শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী

সতীশচন্দ্রের বিয়োগে

সতীশ বাবুর মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্য ও হিন্দু-শাস্ত্র প্রচারের পক্ষে যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল তাহা আর পূরণ হইবার আশা দেখা যাইতেছে না। শ্রীমান্ রামচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলেও এতটা হতাশ হইতে হইত না।

গত মাঘ মাস হইতে পিতৃদেবের (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের) স্বাস্থ্যের অবস্থা বিশেষ খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি নিজে পত্র লিখিতে অক্ষম। সতীশ বাবুর বৃদ্ধা জননী ও পত্নীকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন, তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না! কেবল শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের চরণ-প্রান্তে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন, তাঁহার কৃপায় এই দুঃখ-সমুদ্র তাহারা যেন পার হইয়া যাইতে পারে।

শ্রীবৈদ্যনাথ দেবশর্ম্মা

সতীশের কথা আর জিজ্ঞাসা করিব না। তাঁহার সম্বন্ধে বলিবার অনেক আছে—৪৫ বৎসরেও শেষ হইবে না। কিন্তু সে স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিবার আমার আর শক্তি নাই—আমিও তাঁহার অনুসরণ করিতেছি।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সংবাদপত্রের শ্রদ্ধাঞ্জলি

আনন্দবাজার পত্রিকা

বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসার-কল্পে সতীশচন্দ্রের দান দীর্ঘকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র মুদ্রণ-কার্য্যে তিনিই প্রথম রোটারী যন্ত্র ব্যবহার করেন। পিতা উপেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকের গ্রন্থাবলীর সুলভ সংস্করণ করিয়া তিনি তাহা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসারকল্পে তাঁহার এই প্রয়াসের মূল্য সামান্য নহে।

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড

সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের প্রভূত ক্ষতি হইল। তাঁহার পত্রগুলির মারফৎ এবং প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দ্বারা তিনি এই প্রদেশের অমূল্য সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থাবলী বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরকে চিরস্মরণীয় এবং বঙ্গবাসীর নিকট আদরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র-সমূহ জনসাধারণে প্রচার করিয়া সতীশচন্দ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের গভীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি অক্লান্ত-কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত শ্রমের ফলেই বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির একটি সমৃদ্ধিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারিয়াছে। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ও উহার সাফল্যের জনক সতীশচন্দ্রের নিকট বাঙ্গালা বিশেষ ভাবে ঋণী।

অমৃতবাজার পত্রিকা

সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্রের দান ব্যতীতও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে প্রভূত দান রাখিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী পাঠক-সাধারণ সে জন্য চিরকাল তাঁহাকে স্মরণ করিবে। তিনি অনুবাদসহ প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্যাদির এবং শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি ও ঔপন্যাসিকদিগের উপন্যাস ও কাব্যের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ঐগুলিকে জনসাধারণের সহজলভ্য করিয়াছেন। পিতার ন্যায় সতীশ বাবুও শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন। অমায়িক ও মধুর ব্যবহার দ্বারা তিনি সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

ষ্টেট্‌সম্যান

'বসুমতী' প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী ও 'মাসিক বসুমতীর' সম্পাদক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অল্প বয়সেই পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করেন। এই ব্যবসা এই প্রদেশে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রকাশের একটি কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। বিখ্যাত বাঙ্গালী গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ দ্বারা ঐগুলিকে জনপ্রিয় করিয়া এবং বিবিধ বিষয়ে বহু পুস্তক প্রকাশ করিয়া 'বসুমতী' বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সেবা করিয়াছেন।

যুগান্তর

বাঙ্গালাদেশের দৈনিক সংবাদপত্র-জগতে 'বসুমতী' প্রাচীন কাগজগুলির অন্যতম। বাঙ্গালা কাগজের জন্য 'রোটারী' মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন ও 'রয়টারের' সংবাদ পরিবেশন 'বসুমতীর' দ্বারাই সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠকগণ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ রাখিবে তাঁহার এই দরিদ্র দেশে অত্যন্ত সস্তায় বাঙ্গালা সাহিত্যের দিক্‌পালবৃন্দের গ্রন্থাবলী প্রচার। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আমলে 'বসুমতী'র এই সমস্ত উন্নতি ও দান ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

নবযুগ

'বসুমতী' ও বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের স্বত্বাধিকারী এবং 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জির মৃত্যু সংবাদে আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। তিনি বসুমতী প্রতিষ্ঠানের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়া উহাকে এই প্রকার বিরাট অবস্থায় উন্নীত করিয়াছেন! বাংলার সংবাদপত্রিকাসমূহের উপর দিয়া যেরূপ ধারাবাহিক ভাবে বিপদের ঝড় বহিয়া চলিয়াছে, তাহাতে শঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে। 'বসুমতী'র ভাবী যোগ্য নবীন পরিচালক রামচন্দ্রের পরলোকগমনের পরই 'বসুমতী'র একমাত্র যোগ্য পরিচালক সতীশ বাবুর ডাক আসিল, বাংলা সংবাদপত্রিকার পক্ষে ইহাকে আমরা গুরুতর বিপর্য্যয় বলিয়া মনে করিতেছি!

আজাদ

বাংলার সংবাদপত্র-জগতে সতীশ বাবুর ৪০ বৎসরের দান নানা দিক্ দিয়া শুধু উল্লেখযোগ্য নহে, গৌরবময়ও বটে। তাঁহার পরলোক গমনে সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

স্রোত বহে যায়

[উপন্যাস]

১১

সুশীল ফিরিয়া চাহিল। অখিলকে দেখিয়া কহিল,—অখিল! এখানে কি মনে করে!

অখিলের মাথার মধ্যে সব কেমন তালগোল পাকাইয়া একাকার হইয়া গেল! যা ভাবিয়া আসিয়াছিল···

সুশীলের পানে তাকাইয়া কোনো মতে বলিল—বিপিনের কাছে দরকার ছিল!···সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিল কদমের দিকে। কদমের দৃষ্টিতে যেন তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা ঝিক্-ঝিক্ করিতেছে!

অখিল বলিল—বিপিন আছে?

কদম বলিল—না।

অখিল আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইল না···ঝড়ের মুখে কুটার মতো ছিটকাইয়া যেন বাহির হইয়া গেল!

সুশীল বলিল—পরেশ মামার এ-ছেলেটি বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। খুব উড়নচণ্ডী। পরেশ মামা যেমন গুড়ে-পড়া মাছি টিপে তার পেটের গুড়টুকু বার করে নেন···অখিল ঠিক তার উল্টো!

মৃদু হাস্যে কদম বলিল—হ্যাঁ···এ নিয়ে বাড়ীতে খুব বকাবকি হয়।

সুশীল বলিল—তুমি কি করে জানলে?

কদম বলিল—আমার বাপের বাড়ী ওদের বাড়ীর পাশেই তো। বাপের বাড়ী কদিচ-কখনো গেলে শুনি!···

সুশীল বলিল—কলকাতায় এ্যামেচার-পার্টি খুলেছে। অখিল তাতে প্লে করে। এ্যাক্টিং মন্দ করে না।

কদম শুনিল। মনে মনে বলিল, ষ্টেজে না দেখিলেও এখানে অখিলের অভিনয়-কৌশলের সে যে পরিচয় মাঝে মাঝে পায়···

মুখে কোনো কথা বলিল না···নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।···

সুশীলও নিস্তব্ধ···আর কি কথা কহিবে?

এমনি স্তব্ধ ভাবে অনেকক্ষণ কাটিল।

তার পর সুশীল তার ঘড়ি বাহির করিয়া সময় দেখিল। স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া বলিল—ছ'টা বেজে গেছে···আরো মিনিট পনেরো দেখি। তার পর ক্ষণকাল উৎকর্ণ থাকিয়া আবার বলিল—ঘরের মধ্যে সাড়া নেই। বোধ হয়, ঘুমিয়েছেন···ঘুমোলেই সেরে যাবে।

কদম বলিল—তাই! আমারো দেখা আছে! মিছিমিছি আপনি আর কতক্ষণ বসে থাকবেন! আমার ভাগ্য তো তাতে বদলাতে পারবেন না। আপনি আসুন···

সুশীল বলিল—তোমারো কাজ আছে তো!···ছেলে-মেয়েদের দেখছি না যে?

কদম বলিল,—যে যার নিজের তালে ঘুরছে···বাড়ীতে বড় থাকে না তো কেউ।

—ভারী বেয়াড়া···না?

কদম কোনো জবাব দিল না···শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

সুশীলের মনে হইতেছিল, হায় রে, বাঙালীর মেয়ে···বাঙালী পুরুষ কবে যে মানুষ মনে করিয়া তোমাকে মর্য্যাদা-সম্ভ্রম দিবে!

বলিল—আমি এখন মামীমার ওখানে যাচ্ছি। বাড়ী ফেরবার সময় আর একবার খপর নিয়ে যাবো'খন! তবে এ কথা বলে যাচ্ছি, বিশ্বাস করো···ভয়ের কিছু নেই।

কদম বলিল—তবু এক এক সময় যে রকম করেন, ভয়ে আমি কাঁটা হয়ে থাকি!

মৃদু হাস্যে সুশীল বলিল,—তোমার এ-ভয় চিরকালের জন্য যেতে পারে, যদি এক কাজ করো···

সাগ্রহে কদম প্রশ্ন করিল—কি কাজ?

সুশীল বলিল—উনি এমন উপদ্রব সুরু করলে তুমি যদি রুদ্রাণী মূর্ত্তি ধরতে পারো!···মানে, শাসন করতে হবে। পুরুষের সব জুলুম আমাদের ঘরের মেয়েরা নিঃশব্দে সহ্য করে বলে' তাদের দুঃখের আর অন্ত থাকে না!···কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ···পারবে কি কড়া হতে? শুধু স্বামীর দুর্ব্যবহারে নয়—এই ছেলেমেয়েদের জুলুম-জবরদস্তিতেও। মানুষ শক্তের ভক্ত···এ কথা খুব সত্য বলে জেনো!···আচ্ছা, আমি তাহলে আসি।

কথাটা বলিয়া সুশীল দাওয়ায় উঠিল, বাহির হইতেই ঘরের দিকে একবার চাহিল। তার পর দাওয়া হইতে নামিয়া কদমকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—ঘুমোচ্ছেন। নাক ডাকছে। আর চৌকিদারী করতে হবে না। তোমার যা নিত্যকর্ম্ম, তাই করো গে, যাও!

সুশীল বাহির হইয়া গেল।

কদম চাহিয়া দেখিল। তার পর সুশীল চোখের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে দাওয়ায় সিঁড়ির উপরে বসিয়া পড়িল।

মনের মধ্যে এত রকমের কথা আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল···মনে রীতিমত কলরব···সে কলরবে কদম সংসারের কাজকর্ম্ম ভুলিয়া গেল।

ঘড়িতে আটটা বাজিল। মেজো ছেলে আর বড় মেয়ে আসিয়া বাড়ী ঢুকিল।

মেজো ছেলে বলিল—চুপ করে বসে আছো যে! ভাতের কত দেরী? ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে।

বড় মেয়ে বলিল—আমি রাত্রে খাবো না। বাবুদের বাড়ী থেকে খেয়ে আসছি। কিছুতে ছাড়লো না সরো পিসিমা।

কদমের হুঁশ হইল। তাইতো···এতখানি রাত্রি হইয়া গিয়াছে! উনুনে এখনো আগুন পড়ে নাই!

বলিল—ওঁর অসুখের জন্য কাজকর্ম্ম কিছু করতে পারিনি। এখনি রেঁধে দিচ্ছি···

মেজো ছেলে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—উনুনে এখনো আগুন জ্বলেনি দেখছি! এখন উনুন জ্বেলে তুমি রাঁধতে বসবে···তার মানে? খেতে দেবে সেই দু'ঘণ্টা পরে!··· বাবা রে বাবা···দিন-দিন তুমি যা হচ্ছো···যেন মহারাণী স্বর্ণময়ী!

এ তো সামান্য কথা! এ-কথা কদমের গায়ে বিঁধিল না। এ কথার চেয়ে কত আরো রূঢ় কদর্য্য কথা নিত্য তার উপর বর্ষিত হয়···পাণ হইতে এতটুকু চুণ খশিবার জো নাই! এতগুলি লোকের মন রাখিয়া কি কষ্টে তাকে দিন কাটাইতে হয়···পুরাণ-মহাভারতে যোগী-ঋষিদের কৃচ্ছ্র-সাধনের কথা পড়িয়াছে···কিন্তু কদমের সংসার-কৃচ্ছ্র-সাধনের সঙ্গে যোগী-ঋষিদের সে কৃচ্ছ্র-সাধনের তুলনাও হয় না!

মেজো ছেলের শ্লেষ গায়ে না মাখিয়া কদম ছুটিল রান্নাঘরে।

কাঠ জ্বালিয়া উনানে জ্বলন্ত কাঠ গুঁজিয়া ধোঁয়ার ভারে আচ্ছন্ন দুই চোখ···কর্‌কর্ করিতেছে···জলে ভরিয়া একশা!

ওদিক হইতে সেজ ছেলের সাড়া পাওয়া গেল। সেজ ছেলে বলিল—তোমরা চুপ করে বসে আছো যে! রান্না হয়নি বুঝি?

মেজো ছেলে বলিল—না।

সেজ ছেলে হুঙ্কার তুলিল—হারুণ-উল-রশিদের বেগম করছিলেন কি?···শুয়ে-শুয়ে নভেল পড়ছিলেন নিশ্চয়! ···ভালো আপদ···ন' পাড়ায় যাত্রা হবে···খেয়ে সেখানে যাবো, ঠিক করে আসছি···বলিতে বলিতে সেজ ছেলে আসিয়া মার-মূর্ত্তিতে রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইল।

ধোঁয়ায় জ্বলিয়া কদমের দু'চোখে তখন শ্রাবণের ধারা···হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া উনুনে পাখার বাতাস করিতেছিল।

সেজ ছেলে হুঙ্কার তুলিল—এতক্ষণ কি করছিলে শুনি?···এখন ঢুকেছেন এত-রাত্রে রান্না করতে!···ইচ্ছা হচ্ছে লাথি মেরে হাঁড়ি-কুঁড়ি সব ভেঙ্গে দি!

কদম ভয়ে কাঠ! প্রহার এখনো খায় নাই। কিন্তু ছেলেরা যে রকম হুমকি দিয়া আসে···তাহাতে মনে হয়, ইহার চেয়ে প্রহার বুঝি ভালো।

কদম কথা কহিল না। জানে, বিনয় করিয়া মিনতি করিয়া যদি কোনো কথা বলে, রক্ষা থাকিবে না! পিতৃ-পুরুষকে পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়া গালির কদর্য্য পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে ছাড়িবে না!

কদমকে নির্ব্বাক্ নিরুত্তর দেখিয়া সেজ ছেলে গজ্-গজ্ করিতে করিতে বাহিরে গেল। উঠানে গিয়া কদমের উদ্দেশে শাসাইতে ছাড়িল না। বলিল,—চুলের ঝুঁটি ধরে এক দিন ফেলে দিয়ে আসবো বাপের বাড়ীতে···দেখি, ওঁর কেশব ঠাকুর কি করে রক্ষা করেন!

বিন্দুমতীর কাছে ও-বাড়ীর উৎসবের রিপোর্ট শেষ করিয়া সুশীল তুলিল কেশব ঠাকুরের কথা।

শুনিয়া বিন্দুমতী বলিলেন—এ রোগ ভট্‌চায্যি মশায়ের নতুন নয়, বাবা। আগেও এমন ঘটেছে বলে আমি শুনেছি!

সুশীল বলিল—তাই ভাবি মামীমা···কি গড্ডলিকা-প্রবাহে আমরা ভেসে চলেছি! শুদ্ধাচারেই যদি এত নিষ্ঠা, তাহলে এ-সব অনাচার এমন প্রশ্রয় পায় কি করে?···কেশব ঠাকুরের বৌ··· তোমাদের জানা মেয়েটি ···বাচ্ছা মেয়ে···আমাদের চেয়ে বয়সে কত ছোট! অথচ কি নিগ্রহ ও-বেচারীকে সইতে হয়, বলো তো!···নিগ্রহের খানিকটা আমি দেখে এলুম···তা'ও কতটুকুনের জন্য!··· এক দিকে ঐ আদর্শ পতিদেবতার ঝক্কি···অন্য দিকে কেশব ঠাকুরের হতভাগা একপাল অকাল-কুষ্মাণ্ড ছেলে-মেয়ে। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয়, জানো?

—কি?

—গল্পের সেই আবু হোসেন যেমন এক দিনের জন্য বাদশাহী পেয়েছিল, তেমনি এক দিনের জন্য আমি যদি পাই এই বাঙলা দেশটাকে শাসন করার ভার!

হাসিয়া বিন্দুমতী বলিলেন—রাখ্ তোর ও সব স্বপ্ন-কথা।···মেনিকে দেখে এলি রে, আসবার সময়?

—দেখে এলুম বৈ কি! বিয়ের নামে মেয়েদের মনে কত আহ্লাদ হয়···কত শাড়ী পাবে, গয়না পাবে, তার আহ্লাদ···তা সে আহ্লাদ মেনির কৈ? যেন অত্যন্ত মন-মরা হয়ে আছে!

নিশ্বাস ফেলিয়া বিন্দুমতী বলিলেন,—মানুষের ভাগ্য, বাবা! ভগবান করুন, যে-ঘরে যাচ্ছে, সে-ঘরে যেন মনের সুখে থাকে চিরদিন!···আশীর্ব্বাদ ছাড়া আমরা আর কি করতে পারি, বলো!

১২

আলিস মেম-সাহেবের স্কুলের একটু এদিকে গাঙ্গুলিদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির। মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন মস্ত কম্পাউণ্ড। কম্পাউণ্ডে ফুল-ফলের বাগান

…প্রকাণ্ড দীঘি। কর্ত্তারা এ-সব দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। এবং এই দেবোত্তরকে অবলম্বন করিয়া গাঙ্গুলিদের জ্ঞাতি শিবকৃষ্ণর দিনগুলি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতেছে।

শিবকৃষ্ণ বিবাহ করে নাই। বাঙলা দেশে অন্নবস্ত্র বা মনুষ্যত্বের যত অভাব থাকুক, বাঙালী-পুরুষের পক্ষে স্ত্রীর অভাব কোনো কালে ঘটিবার আশঙ্কা নাই! তবু শিবকৃষ্ণ কেন বিবাহ করে নাই, কেহ বলিতে পারে না।

দেবতা লইয়া থাকিতে হয় বলিয়া একমাত্র দেবতাকেই সে অবলম্বন করিয়াছে, তা নয়। তার অবলম্বন নিস্তারিণী। নিস্তার পরাণ কৈবর্ত্তের বিধবা ভগ্নী।

নিস্তারের অন্ন খাইয়া ঠাকুর-দেবতার পূজা করিবে —ইহা লইয়া গ্রামে দু'-চার বার ঘোঁট হইয়াছিল। কিন্তু সে আন্দোলন শিবকৃষ্ণকে মন্দিরের আসন হইতে সরাইতে পারে নাই! তার কারণ, শিবকৃষ্ণর প্রতিভা এবং শক্তি। শিবকৃষ্ণ না করিতে পারে, এমন কাজ নাই। মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করা হইতে সর্ব্ববিধ অপকর্ম্ম করিতে তার কোথাও জোড়া মিলিবে না! তা ছাড়া শিবকৃষ্ণর পিতামহ ছিলেন জমিদার-বাড়ীর ভাগিনেয়। বংশানুক্রমে তারা যাহাতে কায়েমি থাকে, কর্ত্তারা সেই উদ্দেশ্যেই এ-বংশকে বিগ্রহের সেবায়েৎ নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। নিস্তারের অন্নকে কেন্দ্র করিয়া তাকে মন্দির হইতে হঠাইতে চাহিলে আদালতে উকিল-পেয়াদার পিছনে ঘুরিতে বহু পরিশ্রম বহু ব্যয়,—কে তাহা বহন করে! তা ছাড়া সে-পরিশ্রমের ফলে পাই-পয়সা লাভের সম্ভাবনা নাই…এমনি নানা কারণে আদালতের পথে কেহ অগ্রসর হয় নাই।

সে-দিন ইস্কুলের ছুটির পর দশ-বারোটি ছেলে মিলিয়া সভা করিয়াছিল। সেই সভায় রিপোর্ট পেশ হয়—শিব-মন্দিরের বাগানে পেয়ারা যা ফলিয়াছে…গন্ধে বাতাস একেবারে ভরপুর! তাই সেই সুগন্ধি পাকা পেয়ারার লোভে পাঁচ-সাতটি ছেলে সাহসে বুক বাঁধিয়া পেয়ারা গাছে চড়িয়াছিল।

বৈকালের দিকে নিস্তার চলিয়াছিল দীঘির ঘাটে গা ধুইতে। ছেলেদের পেয়ারা-লুণ্ঠন দেখিয়া সে তার সনাতনী ভাষায় ছেলেদের মা-বাপকে ইতর গালি দিয়া উচ্চকণ্ঠে ভৎর্সনা সুরু করিয়া দিল—এই সব চোর-ডাকাত ছেলে-দের যম ভুলিয়া আছে কি করিয়া! যমকে কড়া গালি দিতেও ছাড়িল না।

নন্দর ছেলে সিধু গাছের ডালে বসিয়া নিস্তারের এ স্পর্দ্ধায় জলিয়া উঠিল। হাতের নাগালে ছিল বড় একটা ডাঁশা পেয়ারা। চকিতে সেটা ছিঁড়িয়া নিস্তারকে তাগ করিয়া সে পেয়ারা ছুড়িল।

পেয়ারা আসিয়া লাগিল সবেগে নিস্তারের রগে। পড়িবামাত্র তার মাথা ঘুরিয়া গেল…সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নীচে মাটীটা যেন সরিয়া দু'-ফাঁক হইয়া গেল। টাল্ রাখিতে না পারিয়া নিস্তার তার মোটা দেহ লইয়া সেই মাটীর উপরে…

আনন্দে-গর্ব্বে ছেলের দল হাসিয়া লুটিফাটা! সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলে উচ্চকণ্ঠে মন্তব্য করিল—কুমড়ো গড়াচ্ছে ছাখ্ রে, পুতনা রাক্ষসী!

স্থূল বপু এবং কদর্য্য দেহের জন্য ছেলেরা আড়ালে নিস্তারকে বলিত পুতনা রাক্ষসী! আড়ালে তারা এ নাম দিলেও লোকের মুখে এ-নামের কথা নিস্তারের কাণে পৌঁছিতে বাকী ছিল না!

একে চুরি, তার উপর পুতনা বলিয়া শ্লেষ! ভূমি-শয্যা হইতে উঠিয়া নিস্তার একেবারে রণরঙ্গিণীর মতো তাথৈ-নৃত্য জুড়িয়া দিল। নৃত্যের সঙ্গে তাল রাখিয়া মুখে এমন সব গালি বাহির হইতে লাগিল যে তার কালিতে আকাশ পর্য্যন্ত নিমেষে কালো হইয়া উঠিল!

এ-অপমান ছেলেরা সহিবে কেন? গাছ হইতে লাফ দিয়া নামিয়া সকলে আসিয়া নিস্তারকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। …সপ্তরথীর ব্যূহে অভিমন্যুর মতো…নিস্তার প্রমাদ গণিল।

এ রকম দাঁড়াইয়া থাকিলে কি যে না ঘটিবে…অথচ ব্যূহ ভেদ করিবে, তারো উপায় নাই! নিস্তার তারস্বরে গালি পাড়িতে লাগিল।

ছেলেদের দলে বয়সে সবার বড় জয়চাঁদ। সে এ-গ্রামের ছেলে নয়। নিস্তারের মাথায় তালের নুটীর মতো অল্প ক'গাছা চুল ছিল, সেই চুলের ঝুঁটি ধরিয়া নিস্তারকে সবেগে দু'পাক ঘুরাইয়া দিয়া সে বলিল—ফের যদি গাল দিবি তো তোর ঐ থোঁতা মুখ ভোঁতা করে মাটীতে ঘষে দেবো মাগী!

—কী! আমাকে বলিস্ মাগী! হতভাগা…

তোড়ে গালি-বর্ষণ চলিল।

জয়চাঁদ মরিয়া হইয়া উঠিল। নিস্তারকে মাটীতে ফেলিয়া তার পিঠে সজোরে সে লাথি মারিল। নিস্তারের ঠোঁট কাটিয়া রক্তারক্তি!—রক্ত দেখিয়া ছেলেরা ভয় পাইল। কোনো মতে জয়চাঁদকে টানিয়া ছাড়াইয়া চকিতে সকলে বাগান হইতে পলাইয়া বাহির হইয়া গেল।

বকিতে বকিতে নিস্তার আসিল বাড়ী। কাঁধে গামছা ফেলিয়া শিবকৃষ্ণ উবু হইয়া বসিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে-ছিল…নিস্তার আসিয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া তার দুর্দ্দশার কাহিনী বিবৃত করিল। শিবকৃষ্ণ কাঠ হইয়া বসিয়া কাহিনী শুনিল। তার পর বলিল—নিশ্চয় তুই খুব গাল দিয়েছিস্!

চোখ পাকাইয়া নিস্তার বলিল—না, গাল দেবে না? পাকা পাকা এক-গাছ পেয়ারা···সে-দিন হাবলা এক-কুড়ি পেয়ারা হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে আমাকে দেড় টাকা এনে দেছে। কাল হাট-বার···এসে আবার দু'কুড়ি নিয়ে যাবে বলে গেছে! এবারে দু'-কুড়িতে তিন-তিনটে টাকা পাওয়া যাবে! আর সেই সব পেয়ারা একেবারে বাঁদরের মতো খেয়ে নির্ম্মূল করে দিচ্ছে! গাল না দিয়ে মাথায় তুলে পূজো করবো? বটে!

কথায় কি তোড়! সে তোড়ে শিবকৃষ্ণ বুঝি বা ভাসিয়া যায়!

কোনো মতে তোড়ের মুখে শিবকৃষ্ণ বলিল—মুখে রক্ত দেখছি যে তোর!

ছেলেদের উদ্দেশে কদর্য্য গালি দিয়া নিস্তার বলিল—বকেছি বলে আমাকে ধরে' যা নয় তাই! মাটীতে ফেলে লাথি মারলে!···আবার বলে, মাগী! আমায় বলে, পুতনা রাক্ষসী!···এর বিহিত যদি না করো, তাহলে তোমার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে আজই আমি চলে যাবো বগলার বাড়ী···আর কখ্খনো ফিরবো না। হ্যাঁ···

নিস্তারের বোনের মেয়ে বগলা। পাশের গ্রামে তার শ্বশুর-বাড়ী!

শিবকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিল। ছেলেদের সঙ্গে বিবাদ ···তার বিহিত শিবকৃষ্ণ কি করিয়া করিবে? তাও ছেলেরা আবার পাদরীদের ইস্কুলের! ও-ইস্কুলের কর্ত্তারা খাশ্ বিলাতী সাহেব-মেম। দেখিয়াছে তো, যাত্রার জুড়িদের মতো সাদা আলখাল্লা-পরা ইয়া দাড়িওয়ালা টক্টকে রঙের সব সাহেব নিত্য ও-ইস্কুলে আসা-যাওয়া করে।

শিবকৃষ্ণ বলিল—কেন যে ঐ সব দস্যি ছেলেপুলের সঙ্গে তুই লাগতে যাস্!

নিস্তার বলিল—আমি লাগতে গেছি, বটে! বাড়ী চড়াও হয়ে এসে চুরি-চামারি করবে তা সয়ে থাকবো, এমন কৈবর্ত্তর মেয়ে আমি নই! রাখো তোমার হুঁকো-কলকে! তামাক খাওয়ার নিকুচি করেছে! ওঠো, যাও। ইস্কুলে গিয়ে বলো, সব চুরি করতে আসে··· তার উপর খুন-খারাপী করে···এর বিহিত চাই, নাহলে আমরা থানা-পুলিশ করবো।

নিস্তারের প্ল্যান শুনিয়া শিবকৃষ্ণ চিন্তিত হইল! মুখে এ-কথা বলা সহজ, কিন্তু পাদরী সাহেবদের সামনে গিয়া নালিশ করা! বিশেষ ঐ থানা-পুলিশের ভয় দেখানো! থানা-পুলিশকে সে জানে···কি চীজ্! থানা-পুলিশকে কতখানি সে এড়াইয়া চলে!

নিস্তার বলিল—খুঁটী হয়ে বসে রইলে যে তবু! ওঠো! বলিয়া শিবকৃষ্ণর হাতের হুঁকো টানিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল।

শিবকৃষ্ণ দেখিল, নিরুপায়! ওদিকে রাম, এদিকে দুরন্ত রাবণ! সে যেন সেই রামায়ণের মারীচ কুরঙ্গ!

নিশ্বাস ফেলিয়া শিবকৃষ্ণ বলিল—ক'জন এসেছিল?

—কে আর গুণে দেখেছে? তবু দশ-বারো জন হবে।

—কাকেও চিনতে পারবি? সাহেবরা যদি বলে, কারা গিয়েছিল, চিনিয়ে দাও···ক'জনের জন্য সব ছেলেদের সাজা দিতে পারে না তো।

মুখ ভ্যাংচাইয়া নিস্তার জবাব দিল—ওঃ, একেবারে সত্যপীর! আমাকে মেরে ধুমসে হাড়-গোড় ভেঙ্গে দিয়ে গেল···এখানে বসে চুল চিরে ন্যায়-বিচার চাইছেন! তোমাকে যদি মা'রতো? যাবে কি না, বলো? নাহলে আমি থানায় না যাইতো দিব্যি রইলো!

শিবকৃষ্ণ মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—কাকেও চিনতে পারবিনি? আইনের কথা বলছি আমি।

—কেন চিনবো না? ঐ নন্দ মিস্ত্রী···ওর ছেলে সিধু ছিল! চিনতে পারবো না?

অকূলে যেন কূল মিলিয়াছে···শিবকৃষ্ণ বলিল,—নন্দর ছেলে ছিল ও-দলে?

—হ্যাঁ···হ্যাঁ···হ্যাঁ। এখনো বসে বসে ধ্যান করবে না কি?

—না, আমি উঠছি···

শিবকৃষ্ণ উঠিল। বলিল—তামাকটা একবার···ঘুম ভেঙ্গে উঠলুম···কেমন আচ্ছন্ন ভাব···

নিস্তার আবার ঝঙ্কার তুলিল। শিবকৃষ্ণ সে ঝঙ্কারের বেগে ময়লা উড়ানি কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

স্কুলের ছুটী হইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ···আলিস বেড়াইতে বাহির হইতেছিল।

ফটকের বাহিরে শিবকৃষ্ণ। আলিস পথে বাহির হইলে শিবকৃষ্ণ বিনয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া সসম্ভ্রমে বলিল,—আমার একটু নিবেদন ছিল মেম-সাহেব···

মৃদু হাস্যে আলিস বলিল—আমাকে মেম-সাহেব বলবেন না দয়া করে···আমি বাঙালীর মেয়ে।

শিবকৃষ্ণ বলিল—তা হোক, মানে, আপনাদের মান্য করি কি না।

হাসিয়া আলিস বলিল—মান্য বুঝি শুধু মেম-সাহেবকেই করতে হয়! বাঙালীর মেয়েদের মান্য পাবার যোগ্য মনে করেন না?

কথায় বুদ্ধির কি দীপ্তি! শিবকৃষ্ণ এতটুকু হইয়া গেল ···নিস্তারের হুঙ্কার-ঝঙ্কারে মনে যে সাহসটুকুর সঞ্চার হইয়াছিল···যে-সাহসে ভর করিয়া এ-পথটুকু চলিয়া আসিয়াছে···আলিসের কথায় সে সাহস ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল!

শিবকৃষ্ণ কিছু বলিতে পারিল না···চুপ করিয়া রহিল।

আলিস বলিল—কি বলতে এসেছেন, বলুন···

দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বিনয়ে নুইয়া পড়িয়া শিবকৃষ্ণ বলিল—মানে, ছেলেদের যদি আপনি মানা করে দ্যান—ঠাকুর-বাড়ীর বাগান আছে জানেন তো…ঐ আটটা শিব-মন্দির, সেই মন্দিরের লাগাও…বাগান…

কথার স্রোত এই পর্য্যন্ত আসিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল।

আলিস বলিল—বলুন…ছেলেরা কি করেছে?

শিবকৃষ্ণ বলিল—বাগানে পেয়ারা হয়েছে অজস্র—কাশীর পেয়ারা…ঠাকুরের সেবায় লাগে কি না…ছেলেরা গিয়ে যখন-তখন গাছে চড়ে পেয়ারা পাড়ে…তাই…মানে…

আলিস বলিল—বটে! তাহলে তাদের খুব অন্যায়। পরের বাগানে গিয়ে ফল পাড়া! আমি তাদের মানা করে দেবো। তা, কোন্-কোন্ ছেলে গিয়েছিল, নাম বলতে পারেন? নাম বললে সুবিধা হয়।

শিবকৃষ্ণ ধাঁ করিয়া নন্দর ছেলে সিধুর নাম বলিয়া দিল।

আলিস বলিল—নন্দ বাবুর ছেলে সিধু!…বেশ, বলবো! কিন্তু নন্দ বাবুর ছেলেটি তো ভালো মানুষ।

শিবকৃষ্ণর অসহ্য ঠেকিল…নন্দকে বাবু বলিয়া মেম-সাহেবের এই মর্য্যাদা-দান!

জবাব দিল—ছেলেটার বাপ ছোটলোক মিস্ত্রী তো…

ছোটলোক কথাটা আলিসের ভালো লাগিল না। মৃদু হাস্যে আলিস বলিল,—নন্দ বাবু মিস্ত্রীর কাজ করেন বলে' তাকে ছোটলোক বলছেন…কিন্তু নন্দ বাবুর আচার-ব্যবহার যা দেখেছি, তেমন এখানকার অনেক মানী ভদ্র লোকেরও দেখিনি। আপনি কিছু মনে করবেন না…মানুষ ছোট কাজ করে বলেই কি তাকে 'ছোট' দেখতে হয়?…

কথাটা বলিয়া আলিস মনে মনে অপ্রতিভ হইল…গায়ে পড়িয়া এ কথা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? কিন্তু বলা হইয়া গেছে…কথা ফিরাইয়া লওয়া চলে না। তবু…

আলিস বলিল—আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনারা যে ভাবে ছোট-বড়র বিচার করেন, আমরা হয়তো ঠিক সে ভাবে করতে পারি না। কিন্তু ও-কথা থাক্…আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ছেলেরা যাতে আর ঠাকুর-বাড়ীর বাগানে না যায়, আমি তাদের ভালো করেই বুঝিয়ে বলবো'খন।

—বেশ—বেশ, তাহলেই হলো! মানে…

নিস্তারকে গিয়া বড়-মুখ করিয়া বলিতে পারিবে, কাজ হাশিল হইয়াছে…ইহাতেই খুশী হইয়া শিবকৃষ্ণ ত্রস্তে চলিয়া গেল।

আলিসও পথ ধরিয়া…বেড়াইতে বেড়াইতে আসিল বিন্দুমতীর গৃহের সামনে।

হঠাৎ মনে হইল, একবার গিয়া ও-বাড়ীতে বসা যাক।

বাগানে ঢুকিল।…বাহিরের দিকে টানা বারান্দা। বারান্দায় বসিয়া বিন্দুমতী আর সুশীল কথা কহিতেছিল।

আলিসকে দেখিয়া বিন্দুমতী বলিল…এসো মা…

আলিস আসিয়া বিন্দুমতীর পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

বিন্দুমতী বলিলেন—মাদুরে বসো।

আলিস বসিল।

সুশীল চলিয়া যাইতেছিল, আলিস বলিল—আমি এলুম বলে আপনি চলে যাচ্ছেন!

সুশীল বলিল—না, মানে, আপনারা কথাবার্ত্তা কইবেন—

আলিস বলিল—এমন বিশেষ কথা বলতে আসিনি। আপনার যদি অসুবিধা না হয়, আপনি স্বচ্ছন্দে এখানে থাকতে পারেন!

সস্মিত হাস্যে বিন্দুমতী বলিলেন—আমার ভাগনে…ওর নাম সুশীল। আমার মেয়ের বিয়েতে এসেছে। আমাকে ও ভালোবাসে বড্ড…তাই আমার কাছেই থাকে বললে চলে।…

তার পর তিনি আলিসের পরিচয় দিলেন। এখানে মিশনরী-সাহেবরা যে-স্কুল খুলিয়াছে, আলিস সে-স্কুলের হেড মিস্ট্রেশ।

সুশীল বলিল—আমাদের লজ্জার কথা মামীমা। দেশে এত বড় বড় সব ধনী লোকের বাস! নামডাকওয়ালা এত জমিদার! সব রকমের ঘোঁট করতে জানেন, কিন্তু স্কুল খোলবার কথা কারো মনে জাগলো না…স্কুল খুললো এসে পাদরী সাহেবরা!

তার পর সুশীল চাহিল আলিসের পানে, বলিল,—যে সব ঘরকে আমরা ভদ্র-ঘর বলি, সে সব ঘর থেকে আপনারা ছেলেমেয়ে পাচ্ছেন? না, যাদের বলি অভদ্র আর ইতর…তাদের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যা দান করেই স্কুলের মান রাখছেন?

হাসিয়া আলিস বলিল—যা বলেছেন! এ জন্য আমি কারো বাড়ী যেতে বাকী রাখিনি। পুরুষ-মানুষদের সঙ্গে কথা হয় না…বাড়ীর মধ্যে মেয়েদের কাছে গিয়ে এত করে বলি, তাঁরা বলেন, ও সব বিষয়ে তাঁরা কিছু জানেন না! ও-সবের মালিক পুরুষরা।

একটা রূঢ় কথা বুক হইতে কণ্ঠে ঠেলিয়া আসিতেছিল…সে-কথা সুশীল বলিতে পারিল না। শুধু বলিল—আপনাদের স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠালে জাত যায় যদি! আপনারা বাইবেলও পড়াচ্ছেন তো?

সলজ্জ কণ্ঠে আলিস বলিল—পড়ানো হয়।

সুশীল বলিল—আমাদের কি জানেন, নিজেদের স্কুলে রামায়ণ-মহাভারত পড়াবো না, আর…মাপ করবেন… আপনি বোধ হয় খৃশ্চান! বাঙালীর মেয়ে…নাম শুনছি আলিস…

আলিস বলিল—আমার ঠাকুর্দ্দা খৃশ্চান হয়েছিলেন—সেই রেভারেণ্ড কেষ্টমোহন ব্যানার্জীর আমোলে! তিনি তাঁরি ছাত্র ছিলেন।…আপনি কলকাতায় থাকেন, বোধ হয়?

সুশীল বলিল—কলকাতায় থাকি না…তবে লেখা-পড়ার জন্য কলকাতাতেই আমার জীবনের সব কটা দিন কেটেছে।

হাসিয়া বিন্দুমতী বলিলেন—ডেঁপো ছেলে! জীবনের সব-কটা বছরই যেন কেটে গেছে! ওর কথা শোনো কেন মা! ওর বয়স এই হলো আটাশ-উনত্রিশ!

সুশীল বলিল—না মামীমা, গেল-মাঘে আমি তিরিশে পড়েছি।

আলিস বলিল—কলকাতাতেই যখন পড়তেন, তখন আমার বাবার নাম করলে চিনতে পারবেন বোধ হয়।

সাগ্রহে সুশীল প্রশ্ন করিল—কি নাম বলুন তো?

আলিস বলিল—আমার বাবা ছিলেন ফ্রী-চার্চে টীচার …তাঁর নাম মিষ্টার জোশেফ মিত্তির।

সুশীল বলিল—নাম জানি বৈ কি। এণ্ট্রান্স-এগ্জামিনেশনে ওঁর কাছেই আমার ইংলিশের ফার্ষ্ট পেপারের খাতা পড়েছিল যে। আমাকে অনেক নম্বর দিয়েছিলেন… একশো-কুড়ির মধ্যে একেবারে একশো-সাত! তাঁর নাম আমি জীবনে ভুলবো না। আপনি তাঁর মেয়ে বটে! দেখুন তো, এই একটি কথায় পরিচয় কত ঘনিষ্ঠ হলো!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শোক-সংবাদ

পরলোকে সরোজনাথ ঘোষ

২৮শে বৈশাখ প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রীযুত সরোজনাথ ঘোষ তাঁহার চেতলা বাসভবনে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল পাকস্থলীর পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। সরোজ বাবু দীর্ঘকাল মাসিক বসুমতীর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে তাঁহাদিগের শোকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

ডাঃ সি বিজয়রাঘব আচারিয়া পরলোকে

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ সি বিজয়রাঘব আচারিয়া কিছু কাল যাবৎ রোগে ভুগিয়া ৬ই বৈশাখ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৪ বৎসর হইয়াছিল।

পরলোকে অতুলচন্দ্র

ঢাকা জিলার বিখ্যাত বোলঘরের ঘোষ-বংশে অতুলচন্দ্রের জন্ম হয়। ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাক্সন্স অফিসে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন। গত ৬ই মার্চ্চ কলিকাতায় ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নী, দুই কন্যা ও একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ অনীশচন্দ্র ঘোষ বর্ত্তমান। তাঁহার বড় জামাতা শ্রীযুক্ত পবিত্রচরণ গুহ এবং কনিষ্ঠ জামাতা মিঃ যতীন্দ্রনাথ দত্ত উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার পিতা পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

পরলোকে প্রফুল্লকুমার সরকার

৩১শে চৈত্র বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ৫টার সময় আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। কিছু কাল যাবৎ তিনি বহুমূত্রের পীড়ায় ভুগিতেছিলেন।

নদীয়া জিলার কুষ্টিয়া মহকুমায় কুমারখালি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পাবনা জেলা-স্কুল হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেনারল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসন হইতে বি-এ পাশ করেন ও বাঙ্গালায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বঙ্কিমপদক লাভ করেন। পরে আইন পাশ করিয়া ফরিদপুরে ওকালতী করিতে থাকেন।

প্রফুল্লকুমার সরকার

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢেনকানল ষ্টেটের বর্ত্তমান শাসকের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পরে ঐ রাজ্যের দেওয়ানের পদ লাভ করেন।

তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া মতিলাল ঘোষের অধীনে কিছু দিন অমৃতবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে দোলপূর্ণিমার দিন তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদনায় আনন্দবাজার পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। কিছু কাল পরে শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের উপর সম্পাদনার ভার ন্যস্ত করা হয়। ৬ই জানুয়ারী ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করিলে প্রফুল্ল বাবু পুনরায় ঐ পত্রের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সংবাদপত্র-জগতের যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষবাণী

পুরাতন বর্ষ বিদায় গ্রহণ করিল। নববর্ষের স্বাগত সঙ্গীত তো আজ কণ্ঠ দিয়া বাহির হয় না! প্রাণে নিরাশার দুঃসহ বেদনা, চোখে জল। দৈন্য দুর্ভিক্ষ মহামারীর প্রকোপে সুজলা শ্যামলা বঙ্গভূমি আজ শ্মশানে পরিণত।

রাষ্ট্রের ভার যাঁহাদের হস্তে, দেশের প্রতি তাঁহারা বিমুখ। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দেশবাসীর স্বার্থকে তাঁহারা করিতেছেন পদদলিত। দলাদলি ভেদাভেদ ভুলিয়া এক-মন এক-প্রাণ হইয়া দেশের সেবা করিবার নাই তাঁহাদের সৎ-সাহস।

শিক্ষাক্ষেত্রেও দুর্ভিক্ষ। শিক্ষকেরা অনেক স্থানে বেতন পাইতেছেন না, যাঁহারা পাইতেছেন তাঁহাদের বেতন এত কম যে, তাহাতে দু'বেলা পেট-ভরা আহার জোটে না। ফলে শিক্ষাদানে হইয়াছে তাঁহাদের আন্তরিকতার অভাব। সকল সময় বাজারে পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায় না, ছাপাইবার কাগজ নাই। মূল্যও বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার উপর আবার মাধ্যমিক শিক্ষা বিল!

ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ এবং করবৃদ্ধির বেড়াজালে ব্যবসা চালান এবং শিল্পের উন্নতি অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। দেশীয় ব্যবসা ভারতরক্ষা আইনের নাগপাশে জর্জ্জরিত মৃতপ্রায়; কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের স্বার্থ রহিয়াছে সুরক্ষিত।

দেশীয় বস্ত্র-বয়ন-শিল্প প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। বস্ত্রের জন্য থাকিতে হয় কলওয়ালাদের মুখ চাহিয়া। সুবিধা বুঝিয়া তাহারা এমন মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে যে বহু দরিদ্র চাষী ও গৃহস্থকে ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে। রোগ হইলে ঔষধ-পথ্য কিনিবার অথবা ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য নাই। দুর্ভিক্ষে যাহারা মরিয়াছে তাহারা যেন মরিয়া বাঁচিয়াছে। কিন্তু যাহারা অর্দ্ধমৃত নিঃসহায় অবস্থায় এখনও বাঁচিয়া আছে তাহারা গৃহহীন, অন্ন-বস্ত্র-ঔষধহীন অবস্থায় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে পথে-ঘাটে, উন্মুক্ত আকাশের তলে। স্বার্থান্ধ অতিলোভীরা দৃক্‌পাতও করিল না তাহাদের দেশবাসীর দুর্দ্দশার পানে। যেখানে ভাই হইল পর, বন্ধু হইল শত্রু, সেখানে সহানুভূতি চাহিব কাহার কাছে?

ভারত-সচিব জানাইয়াছেন, বাঙ্গালা দেশে দুর্ভিক্ষে লোক মরিয়াছে প্রায় ৭ লক্ষ। বাঙ্গালীরা নাটকপ্রিয়, সব কথাই বাড়াইয়া বলা তাহাদের স্বভাব। বাঙ্গালা দেশের প্রধান-সচিবও সেই সুরে সুর মিলাইলেন। অথচ যাঁহারা দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অঞ্চলগুলিতে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, মৃত্যুসংখ্যা ২৫ লক্ষের কম নয়। দুর্ভিক্ষের সূচনাতেই বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলী বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় খাদ্য তল্লাসী করিয়া জানাইলেন, দেশে আহার্য্যের অভাব। অথচ বহু ব্যবসায়ীদের গুদামে তখন মাল মজুত ছিল। সে দিকে তাঁরা দৃক্‌পাতও করিলেন না। দোষ পড়িল দরিদ্র চাষীদের ঘাড়ে। তারাই না কি মাল আটকাইয়া রাখিয়াছে। দুর্ভিক্ষ আসন্ন জানিয়াও সময় থাকিতে কেন নিবারণের প্রচেষ্টা ও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই, তাহার সদুত্তর আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না! দেশের লোকের তাই বিশ্বাস, এ দুর্ভিক্ষ ভগবানের মার নহে—মানুষের দ্বারাই হইয়াছে ইহার সৃষ্টি এবং পুষ্টি। দুর্ভিক্ষের পর মড়ক ও মহামারী অবশ্যম্ভাবী। তাহার প্রতিবিধানের জন্য কি পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হইয়াছে? বাঙ্গালায় আজ দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য। কত শিশু দুগ্ধের অভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে। শিশুদের জন্য দুগ্ধের বন্দোবস্ত করাটা কি সরকার প্রয়োজন মনে করেন না?

খাদ্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গালা সরকারের উদাসীনতা দেখিয়া ভারত সরকারকেই রেশনিং-এর দিন স্থির করিতে হইল। কিন্তু দিন স্থির করিলে কি হইবে, ব্যবস্থা করিবেন তো এখানকার কর্ত্তারা। ফলে রেশন হইল অথাদ্য অগ্নিমূল্য অথচ পর্য্যাপ্ত নহে। আজও হিন্দু বিগ্রহের ভোগ ও নৈবেদ্যের চাউল পাওয়া গেল না। ও-দিকে লবণ ও কয়লা দুষ্প্রাপ্য। বাঙ্গালা সরকার রেল বিভাগের উপর দোষ চাপাইয়াই খালাস। মন্দ নয়!

সর্ব্বদলীয় সচিবমণ্ডলী শ্বেতাঙ্গ-স্বার্থের অনুকূল নহে বুঝিয়া স্যার জন হার্বার্ট নাটকীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া মৌলভী ফজলুল হককে সরাইয়া সাহেব দলের প্রিয়পাত্র খাজা স্যর নাজিমুদ্দীনকে গদীতে বসাইলেন। ঘটনাটা ইতিহাসে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। নূতন সচিব-মণ্ডলী গঠিত হইল ১৩ জন সচিব, ৩০ জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী এবং চার জন হুইপ লইয়া। অনেকগুলি লোকের পাঁচ শত টাকা মাহিনার চাকুরী জুটিল। কিন্তু এই ব্যয়বৃদ্ধির ফল ভোগ করিতে হইতেছে দরিদ্র বাঙ্গালা দেশকে। ইহাকে ভোটক্রয়ের ব্যবস্থা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

বাঙ্গালাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এ কথা আজ বহু লোকই বলিতেছেন। দুর্ভিক্ষে অনেকেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কি হইবে? ক্ষুধার তাড়নায় অনেক নারী অনন্যোপায় হইয়া কুপথগামিনী হইয়াছে। অনেকে দুর্ব্বৃত্তদের হাতে পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। বহু অভিভাবক সন্তানদিগকে আহার দিতে না পারিয়া তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছে। জাতির পক্ষে ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? সরকার জানাইয়াছেন যে, অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের আহার ও বাসের ব্যবস্থা করা হইবে, এরূপ নির্দ্দেশই শুনা যাইতেছে, কাজে কত দূর কি হইল বলা শক্ত!

সংবাদপত্র জনমতের প্রতিধ্বনি। ভারতরক্ষা আইন জনমতের অভিব্যক্তি অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। খাদ্য-সমস্যার আলোচনা করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। চারি ধারে এই নিষেধের নাগপাশ কেন? দেশবাসীর কণ্ঠ রুদ্ধ করিলেই কি শাসন-ভিত্তি সুদৃঢ় হয়? মনের মধ্যে যে অব্যক্ত বেদনা ও অপমান পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দূর করিবার এই কি প্রকৃষ্ট উপায়?

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উপর দিয়া এক প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। একে একে রামানন্দ বাবু, প্রফুল্ল বাবু, রামচন্দ্র ও সতীশ বাবুর মত কর্ম্মবীর চলিয়া গেলেন। কি দুর্ভাগ্য! ভগবানও কি আজ আমাদের প্রতি বিরূপ! না জাতীয় অবনতির এই প্রায়শ্চিত্ত!

আজ অভাব কেবল খাদ্যদ্রব্যের নহে—অভাব মনুষ্যত্বের সহানুভূতির, সৎসাহসের। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ ঘটিলে অপর লোক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই বিবাদ মিটাইয়া না দিয়া তাহাতে আরও ইন্ধন সংযোগ করে। আমাদের এই দুর্দ্দশায় নিজের শক্তির উপরই নির্ভর করিতে হইবে। যে রাষ্ট্রপরিচালকরা দেশবাসীর মনের সঙ্গে সংযোগ না রাখিয়া কেবল রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের দ্বারাই শাসন চালাইতে চান, তাঁহাদের কাছে সহানুভূতি আশা করা দুরাশা মাত্র। তাই নববর্ষে ভগবৎ

চরণে এই নিবেদন, দেশবাসীরা স্বার্থ, দলাদলি, ক্লীবত্তা ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হউক দেশের কাজে। গৃহাভ্যন্তরীণ মনোমালিন্যের কথা ভুলিয়া একত্র হউক জন্মভূমির লজ্জা নিবারণ প্রচেষ্টায়। কোটি কোটি লোকের বুক-ফাটা মর্ম্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস যেন জাগাইয়া তোলে জাতির সুপ্ত মনুষ্যত্বকে, ধিক্কার দেয় স্বার্থপরতার নীচতাকে।

কলিকাতায় মেয়র নির্ব্বাচন

১৩ই বৈশাখ অপরাহ্ণে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম অধিবেশনে বিদায়ী ডেপুটী মেয়র শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দার কলিকাতার মেয়র ও মিঃ মহম্মদ রফিক ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নব-নির্ব্বাচিত মেয়রের বয়স মাত্র ৩১ বৎসর। তিনিই সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অল্প-বয়স্ক মেয়র। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য এবং কলিকাতার এক জন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। ডেপুটী মেয়রও এক জন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। তিনি মুসলিম চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি এবং বিগত ১৪ বৎসর যাবৎ কর্পোরেশনের সদস্য। আমরা উভয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, তাঁদের অধিনায়কত্বে আগামী বৎসরে কর্পোরেশনের কার্য্য সুপরিচালিত হইবে।

কলিকাতার পথে আবর্জ্জনা স্তূপ

কলিকাতার পথে ঘাটে যে ভাবে আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহা সত্যই বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরীর পক্ষে লজ্জার বিষয়! দেশবাসী দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত, অনাহারে অর্দ্ধমৃত, স্বাস্থ্যহীন। পথে-ঘাটে আবর্জ্জনা মহামারীর সূচনা করিতেছে। বাঙ্গালার গভর্ণর মিষ্টার কেসী স্বয়ং মেয়রের সহিত নগর পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। সহরের আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে বাঙ্গালা সরকার ও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অবিলম্বে ১ শতাধিক লরী, জখম গাড়ী মেরামতের জন্য কলকব্জা ও পেট্রোলের বর্ত্তমান বরাদ্দ অপেক্ষা মাসে ৪ হাজার হইতে ৫ হাজার গ্যালন পেট্রল অতিরিক্ত চাওয়া হইয়াছে। আবর্জ্জনা পরিষ্কারের জন্য শ্রমিকদের সংখ্যা ১ হাজার হইতে বাড়াইয়া দেড় হাজার করিবার, আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করিবার, রাস্তা হইতে ভিক্ষুক অপসারণের, ডাষ্টবিনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ডাষ্টবিনের নিকট চৌকী দিবার ব্যবস্থা করিবারও প্রস্তাব করা হইয়াছে। বাঙ্গালা সরকার কর্পোরেশনকে মোট ৭৮ খানা লরী দিয়াছেন। অতিরিক্ত পেট্রল বরাদ্দের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছে। আশা করি, কর্পোরেশনের নব-নির্ব্বাচিত মেয়র, ডেপুটী মেয়র ও সভ্যগণ শীঘ্রই এই মহানগরীকে আবর্জ্জনামুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

কলিকাতার পথে দুর্ঘটনা

২৭শে বৈশাখ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তর কালে স্বরাষ্ট্র-সচিবের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী প্রকাশ করেন যে, দ্রুত এবং অসতর্ক ভাবে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে গাড়ী চালাইবার ফলে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ হাজার সাত শ আটটি দুর্ঘটনা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ২৫৬ জন মারা গিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

কলিকাতাবাসীর ব্যয়ের হার বৃদ্ধি

বোম্বাইতে ব্যয়ের হার বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা প্রায় ১৬০ ভাগ, মাদ্রাজে ১৪৮ ভাগ আর কলিকাতায় ১৯৭ ভাগ। কলিকাতায় এত ব্যয়বৃদ্ধির কারণ কি? অনেকে মনে করেন, বাঙ্গালা সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিপদে বাধা দিবার চেষ্টা, ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত লাভের লোভ এবং সরকারের চোরাবাজার দমনের অক্ষমতাই এই ব্যয়বৃদ্ধির কারণ। বাঙ্গালায় সকল বস্তুরই মূল্য বাড়িয়াছে; কমিয়াছে কেবল মনুষ্য-জীবনের মূল্য।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

২১শে বৈশাখ ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে এক বিরাট জনসভায় বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতিগণ এবং জননেতৃবৃন্দ প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, যুদ্ধ এবং মহামারী জনিত যে দুর্দ্দিন বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহার দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ এই বাদ-প্রতিবাদমূলক বিলটি দেশের উপর চাপাইতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। দেশের শিক্ষার পবিত্রতাকে কলুষিত করিবার জন্য তাহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করাইবার এই নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন জ্ঞান-শিক্ষার পরিপন্থী। এই সম্পর্কে সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এক বিবৃতিতে বলেন—দুর্ভিক্ষের সমস্ত মারাত্মক পরিণাম এখনও বাঙ্গালায় শেষ হয় নাই। ইহার পর শত্রু যখন বাঙ্গালার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত, তখন প্রদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিলটির আলোচনা স্থগিত রাখিলে কাহারও কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধের পর সচিবগণ ও শিক্ষা-ব্রতিগণ একত্র হইয়া বাঙ্গালার পক্ষে প্রকৃত মঙ্গলকর একটি বিল স্বচ্ছন্দে রচনা করিতে পারিবেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হাওড়া টাউন হলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পরিষদে বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলটি যদি আইনে পরিণত হয় তাহা হইলে দেশবাসী সেই আইন সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করিবেন তাহা জানিতে চান। তিনি আরও বলেন যে, বিলটি আইনে পরিণত হইলেই আন্দোলন শেষ হইবে না, বরং এমন তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইবে যাহাতে আইন কার্য্যকরী না হইতে পারে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, প্রদেশের ইতিহাসে যখন সর্ব্বাপেক্ষা এক সঙ্কটময় সময় চলিয়াছে, তখন ব্যবস্থা পরিষদে এক নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উত্থাপিত করিবার উদ্যোগ করা হইয়াছে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বিল সম্বন্ধে জনসাধারণের মতপ্রকাশের কোন সুযোগ না দিয়া বিলটি তাড়াহুড়া করিয়া পাশ করান হইবে। এখন কি উহা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হয় নাই? এই বিল গৃহীত হইলে উহা শুধু শিক্ষার মূলেই কুঠারাঘাত করিবে না, উপরন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিও বিনষ্ট হইবে।

যদি ইঁহাদের স্থায় শিক্ষাব্রতীর মতও শিক্ষা বিল সম্বন্ধে অবজ্ঞাত হয় তবে লোক কি মনে করিবে? তাহা যেন মিষ্টার কেসী বাঙ্গালার এই সঙ্কটকালে বাঙ্গালার গভর্ণরের দায়িত্ব লইয়া বিবেচনা করেন। বাঙ্গালার যেন সকল দলে ঐক্য বজায় থাকে।

এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও ২৭শে বৈশাখ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শিক্ষা-সচিব মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সংক্রান্ত প্রস্তাবের পক্ষে দীর্ঘ লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, জনমত সংগ্রহের জন্য বিলটি প্রচার করা সঙ্গত। সাধারণের চেষ্টাতেই এ দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই বিলের ফলে সাধারণ চেষ্টা বন্ধ হইবে। মিঃ চারুচন্দ্র রায় বলেন যে, বিলে মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তারের কোন বিধান নাই, তবে ইহাতে নিয়ন্ত্রণ ও ধ্বংস করিবার প্রচুর বিধান আছে। ইহার ফলে জাতীয়তার পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার হইবে। তিনি এই বিলকে 'জাতিনিধনকারী' বিল বলিয়া অভিহিত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের রিপোর্টে সরকারকে বিলটি পরিত্যাগ করিবার অনুরোধ জানান হইয়াছে।

অন্নবস্ত্রের দুর্ভিক্ষের অবসানের পূর্ব্বেই শিক্ষার দুর্ভিক্ষ আসন্নপ্রায়। ইহাকেও কি ভগবানের মার বলিয়া মনে করিতে হইবে?

—

পঞ্জাব ও মসলেম লীগ

পঞ্জাবের গভর্ণর সচিব ক্যাপ্টেন শৌকৎ হায়াত খাঁনকে বিতাড়িত করিয়াছেন। তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত কেবল ২ জন সচিবকে বিতাড়িত করা হইয়াছে—

(১) সিন্ধু প্রদেশে আল্লাবক্স (২) পঞ্জাবে শৌকৎ হায়াত খাঁন।

আল্লাবক্সের অপরাধ তিনি সরকারের কার্য্যের প্রতিবাদে সরকারের প্রদত্ত উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদচ্যুতিতে কোন ত্রুটিলেপ ছিল না। কিন্তু সরকারী বিবৃতি অনুসারে শৌকৎ হায়াত খাঁনের বিতাড়নের কারণ সচিবের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া অন্যায়াচরণ। সম্প্রতি পঞ্জাব হইতে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহাতে মনে হইতেছে, মিসেস দুর্গাপ্রসাদকে পদচ্যুত করাই ক্যাপ্টেন শৌকৎ হায়াত খাঁনের বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ নহে। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, কোন দক্ষ গোয়েন্দা পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অভিযোগসমূহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান-ভার পাইয়াছেন এবং অনুসন্ধান করিতেছেন। তিনি না কি লাহোর কর্পোরেশন হইতে কতকগুলি নথী চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

এই ব্যাপারে মসলেম লীগ যে ভাব দেখাইতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই উপভোগ্য। তাঁহারা বলিতে চান যে, মসলেম লীগের অনুকূলে কাজ করায় শৌকৎ হায়াত খাঁন বিতাড়িত হইয়াছেন। ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ, তাহা হইলে এত দিন বাঙ্গালার সচিবরাও বিতাড়িত হইতেন। লীগ সমিতি প্রধান-সচিবের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। ১২ই মে তারিখের মধ্যে তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৩ই মে বিচারের দিন। অভিযোগের ফর্দ্দও প্রকাশিত হইয়াছে। একটিতে বলা হইয়াছে—"দেখা যাইতেছে তুমি পঞ্জাবের প্রধান-সচিব মালিক খিজির হায়াত খাঁন সাম্প্রদায়িক দল গঠনের ও পরিচালনের প্রয়োজন স্বীকার কর না। অথচ নিখিল ভারত মসলেম লীগের ও তাহার প্রাদেশিক শাখা সমূহের অধীনে ব্যবস্থাপক সভাসমূহে ও বাহিরে মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র জাতি স্থির করিয়া কাজ করাই লীগের উদ্দেশ্য।"

যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার অনুরক্ত ভক্ত নহে—মসলেম লীগের মতে সে অপরাধী। দেখা যাক, লীগের বিচারালয়ে প্রধান-সচিবের দণ্ডের কি ব্যবস্থা হয়?

এই ব্যাপার লইয়া লীগ পঞ্জাবে যে সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভের সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময় বিবেচনা করিয়া সে সম্বন্ধে পঞ্জাবেরও কেন্দ্রী সরকার কি করিবেন? এই 'গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়লদের' লইয়া অনেক অশান্তি হইবার সম্ভাবনা।

—

ফরিদপুর অনাথ আশ্রম

ফরিদপুরে অনাথ আশ্রমের জন্য শিশু-মনস্তত্ত্ব জানা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রয়োজন। মুসলমান প্রার্থীদিগকেই গুরুত্ব প্রদান করা হইবে। মুসলমানী বিদ্যাবিশারদ হওয়া প্রয়োজন•••নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন মিষ্টার করিম, ফরিদপুর জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট্।

১৯শে চৈত্র বাঙ্গালার গভর্ণর মিষ্টার কেসী বলিয়াছিলেন—"বেসরকারী অনাথ আশ্রমের বিস্তার সাধন ব্যতীত সরকারের অস্থায়ী আশ্রমে সহস্র সহস্র পিতৃ-মাতৃহীন বা পরিত্যক্ত শিশু পালিত হইতেছে।"

আশা করা যায় যে, ফরিদপুরের এই আশ্রমটি মুসলমান ধর্ম্মে অনাথদিগকে দীক্ষিত করিবার কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইবে না।

—

অতিরিক্ত কর

করভার-প্রপীড়িত ভারতবাসীর উপর আবার নূতন কর বসান হইল। এই অতিরিক্ত ভার সহনে ভারতবাসী সক্ষম কি না, তাহা সরকার বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন মনে করিলেন না। বলা হইয়াছে যে, চা, সুপারী ও তামাক অত্যাবশ্যক নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই চা, সুপারী ও তামাক ব্যবহার করে।

শিল্প গঠনের জন্য কর দিতে হইবে। ফলে শিল্পের প্রসার ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা।

ইংলণ্ডের অনুরূপ ভারতবর্ষেও সামরিক ও অসামরিক ব্যয় সম্পর্কে তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ব্যয় সঙ্কোচ হইবে। ফলে ভারতরক্ষা ব্যাপারে আরও অধিক অর্থব্যয় করা সঙ্গত হইবে। ভারতের জনসাধারণ দরিদ্র। ক্রমাগত করের উপর কর বসাইয়া তাহাদের জীবন দুর্ব্বিষহ করিয়া তোলা হইয়াছে। এ অবস্থায় সাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার লাঘব না করিয়া পুনরায় কর চাপান অযৌক্তিক।

গত বৎসর খাদ্য-সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিতে না পারায় বাঙ্গালায় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। মিষ্টার আমেরী বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষের জন্য বিধাতা দায়ী। কিন্তু ইহা ভগবানের সৃষ্ট নয়। ইহা মানুষের সৃষ্ট। এই অতিরিক্ত কর অর্দ্ধমৃত দেশবাসীর উপর বোঝার উপর শাকের আটির অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

—

মহাত্মা গান্ধীজীকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি

সমগ্র দেশবাসীর সমবেত প্রার্থনা ভগবানের কাণে পৌঁছিয়াছে। ভারতীয়দের দাবীতে ভারত সরকার অবশেষে সাড়া দিয়াছেন। ২৩শে বৈশাখ সকাল ৮টায় মহাত্মা গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কর্ণেল ভাণ্ডারী তাঁহাকে তাঁহার গাড়ীতে পর্ণকুটীরে লেডী থ্যাকারসির বাস-ভবনে লইয়া যান। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে এই স্থানে গান্ধীজী তাঁহার ২১ দিন-ব্যাপী প্রায়োপবেশন করেন। গান্ধীজীর মুক্তির ব্যাপার লইয়া ভারতের সর্ব্বত্র অসন্তোষের সৃষ্টি না করিয়া পূর্ব্বেই তাঁহাকে মুক্তি-দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সরকার বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিতেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, যেন তাঁর দুর্ব্বল ও অবসন্ন শরীর শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে সারিয়া উঠে। আমরা আশা করি, সরকার আর একটি সিদ্ধান্ত উপযুক্ত সময়েই গ্রহণ করিবেন। রাজনৈতিক অচল অবস্থা সমাধানের শীঘ্রই প্রচেষ্টা করা হইবে। ২১শে বৈশাখ ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী বিলাতে পার্লামেন্টে বলিয়াছিলেন, তিনি কিছুতেই কারারুদ্ধ ও মুক্ত কংগ্রেসীদিগকে বৈঠকে মিলিত হইতে দিতে পারেন না। আর তাহার পরদিনই লর্ড ওয়াভেল তাঁহার শাসন পরিষদের বৈঠক না ডাকিয়াই গান্ধীজীকে মুক্তি দানের আদেশ প্রচার করিয়াছেন। তাহাতেও মিষ্টার আমেরী পদত্যাগ করেন নাই।

মহাত্মা গান্ধী

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, গান্ধীজীর স্বাস্থ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দান করা হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার গিল্ডার, কুমারী মীরা বেন, শ্রীযুত প্যারীলাল ও ডাক্তার সুশীলা নায়ারের স্বাস্থ্যের অবস্থাও যে উদ্বেগজনক এমন কোন সংবাদ তো শুনা যায় নাই! নীতিটা যে কি, তাহা যেন স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে না। মুক্তির কারণ যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। তিনি যে মুক্তি লাভ করিয়াছেন ইহাতেই আমরা আনন্দিত। কেবলমাত্র ভারতের স্বাধীনতার জন্যই নহে, বিশ্বশান্তির জন্য আজ তাঁহার রোগমুক্ত সুস্থ জীবনের প্রয়োজন। আমরা আশা করি, মুক্ত অবস্থায় হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি আরও বহু দিন দেশের সেবায় নেতৃত্ব করিবেন।

বোম্বাই ডকে বিস্ফোরণ

১লা বৈশাখ বৈকাল ৪টার সময় ডকে অবস্থিত একখানি জাহাজে অকস্মাৎ আগুন ধরিয়া যায় এবং আয়ত্তে আনিবার পূর্ব্বে গোলা বারুদ রাখিবার স্থানে অগ্নিবিস্তারের ফলে দুই বার বিস্ফোরণ ঘটে তাহার ফলে সংলগ্ন গুদামেও অগ্নি বিস্তৃত হয়। অগ্নি-নির্ব্বাপক দল, সৈন্যদল এবং এ, আর, পি অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগের চেষ্টায় অবস্থা আয়ত্তে আসে। আহতদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরেই বোম্বাইয়ের গভর্ণর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং কিছু সময় তথায় অবস্থান করেন। প্রকাশ যে, ৩৪৭ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং সহস্রাধিক ব্যক্তি আহত ও সহস্র সহস্র পরিবার গৃহহীন হইয়াছে। কারণ নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটী গঠন করা হইয়াছে। তদন্তের ফলাফলের জন্য দেশবাসী উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবে।

কোহিমা রণাঙ্গন

আসাম-ব্রহ্ম রণাঙ্গন হইতে এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা ৩০শে চৈত্র ১৩৫০ সালে জানাইয়াছিলেন যে, জাপ-সৈন্যদিগকে প্রথম বার ইম্ফলের উত্তর-পশ্চিমে যুদ্ধ করিতে দেখা গিয়াছে। মনে হয়, ৭ শত মাইলব্যাপী ইম্ফলের সমতল ভূমির চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত করাই শত্রুর উদ্দেশ্য।

১লা বৈশাখ ১৩৫১ সালে জানান—অত্র ইম্ফলের দক্ষিণ-পশ্চিমে জাপ-বাহিনীর সহিত দ্বিতীয় বার সঙ্ঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২রা বৈশাখ—এখন ইম্ফলের সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে। ইম্ফলের সমতল ভূমি অঞ্চলে যুদ্ধের ইহাই প্রথম সংবাদ। কয়েকটি স্থানে জাপ-সেনা ইম্ফল সহর হইতে সোজাসুজি ৮ মাইলেরও কম দূরে উপনীত হইয়াছে। ইম্ফলের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিষেণপুর-শিলচর রোড অঞ্চলে অধিক সংখ্যক জাপ-সেনার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ পাকিয়া উঠিতেছে।

৩রা বৈশাখে প্রকাশ, সম্মিলিত পক্ষের সৈন্যগণ বিষেণপুরের পশ্চিমে শিলচর পথের নিকটে জাপ-সৈন্যগণকে একটি স্থান হইতে বিতাড়িত করে।

৪ঠা বৈশাখ—জাপানীরা এখন ৭৫০ বর্গ-মাইল পরিমিত ইম্ফল উপত্যকা ও কোহিমার পূর্ব্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের চতুর্দ্দিক্‌কার পর্ব্বতে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ছড়াইয়া আছে।

৭ই বৈশাখের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ ডিমাপুর হইতে অগ্রসর হইয়া কোহিমা অঞ্চল-রক্ষী সৈন্যগণের সহিত সংযোগ-স্থাপন করিয়াছে। ইম্ফল সমতলভূমির উত্তর-পূর্ব্বে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে।

৮ই বৈশাখে প্রকাশ, কোহিমার নিকট জাপ-সৈন্য-সমাবেশ বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১০ই বৈশাখ—দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া কমাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র হইতে ইস্তাহারে প্রকাশ, কোহিমা হইতে ডিমাপুর পর্য্যন্ত রাস্তার অনেক স্থান এখনও বিপন্ন থাকিলেও বর্ত্তমানে উন্মুক্ত হইয়াছে। কোহিমার

যে অবরুদ্ধ বাহিনী কোহিমা অবরোধের চেষ্টা বার বার ব্যর্থ করিয়াছে, তাহাদিগকে সাহায্যদান ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

১৫ই বৈশাখে প্রকাশ- জাপানীরা যে ইম্ফলের উপর আক্রমণের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতেছে, সে বিষয়ে অতি অল্প সন্দেহই আছে। মে মাসের মাঝামাঝি বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে নিশ্চিত এই আক্রমণ হইবে। বর্ত্তমান নীরবতা ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ।

১৬ই বৈশাখ এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন— এক উচ্চ টিলায় প্রবল জাপ-বাহিনী সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদিগের অবস্থান-ক্ষেত্রের উন্নতি হইতেছে। ইম্ফলের পশ্চিমে বিষেণপুর-শিলচর রোড বরাবর ইম্ফল হইতে ৮০ মাইল দূরে কোংপি অঞ্চলে প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে।

১৮ই বৈশাখে প্রকাশ, ইম্ফল আক্রমণের জন্য জাপানীদিগের উদ্যোগ চলিতেছে। বিষেণপুরের নিকট জাপানীদের পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ করা হইয়াছে।

১৯শে বৈশাখ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, প্যালেলে জাপ সৈন্যদলের আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

২০শে বৈশাখ প্রকাশ যে, সম্মিলিত সৈন্য কর্ত্তৃক কোহিমার উত্তরে একটি সুরক্ষিত জাপ অবস্থান-ক্ষেত্র অধিকৃত হইয়াছে। কোহিমা অবরুদ্ধ হইয়াছে।

২১শে বৈশাখের খবর—বৃহস্পতিবার রাত্রি তিনটার সময় কোহিমা অঞ্চলের জাপ-অধিকৃত অংশের উপর প্রধান বৃটিশ আক্রমণ আরম্ভ হয়। আমাদিগের ট্যাঙ্কগুলি নাগাদিগের গ্রাম কোহিমার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে।

২৫শে বৈশাখ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া কমাণ্ডের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, আসাম রণাঙ্গনের সকল অঞ্চলে জাপানীরা এখন সাধারণ ভাবে আত্মরক্ষামূলক পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। শত্রুপক্ষ হৃত স্থান পুনরুদ্ধারের জন্য প্রবল ভাবে পাল্টা আক্রমণ করিতেছে এবং প্রত্যেক বারই তুলনায় তাহাদিগের অত্যধিক ক্ষতি হইতেছে।

২৭শে বৈশাখ বলা হইয়াছে, কোহিমা অঞ্চলে আমাদিগের সৈন্যগণ কোহিমার উপকণ্ঠে জাপ ঘাঁটীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়।

২৮শে বৈশাখে প্রকাশ যে, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম হইতে আরাকান, কোহিমা ও ইম্ফল অঞ্চলে ১৫ হাজারের অধিক জাপ-সৈন্য নিহত হইয়াছে। কোহিমায় জাপানীরা উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ চালাইতেছে এবং প্রবল আঘাত পাইতেছে। বিষেণপুরে যেখানে শিলচর রোড ইম্ফল-টিড্ডিম রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সংযোগ স্থলের উপর জাপানীদিগের লোলুপ দৃষ্টি রহিয়াছে।

২৯শে বৈশাখ দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া কমাণ্ডের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, কোহিমার দক্ষিণ উপকণ্ঠের পাহাড়গুলিতে অবস্থিত শত্রুর সুদৃঢ় ঘাঁটীগুলি হইতে শত্রুসৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিবার প্রচেষ্টা প্রাথমিক ভাবে সফল হইয়াছে।

৩০শে বৈশাখ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া কমাণ্ডের ইস্তাহারে প্রকাশ, প্যালেল অঞ্চলে প্যালেল-টামু রোডের উত্তর অংশ আয়ত্বে আনিবার জন্য জাপানীরা দৃঢ়তার সহিত আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে।

পরলোকে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের স্বত্বাধিকারী ও মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩ই বৈশাখ বুধবার মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অকালে পরলোক গমন করেন।

সতীশ বাবু কিছু কাল যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। একমাত্র পুত্রের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর আঘাত তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধা জননী, সদ্য পুত্রশোকাতুরা সহধর্ম্মিণী, সদ্য বিধবা পুত্রবধূ ও কন্যাগণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অকালে পুত্রের অনুসরণ করিলেন।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সতীশ বাবুর পিতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরমহংস দেবের শিষ্য ছিলেন। বসুমতী প্রতিষ্ঠায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহ লাভ করেন। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে সতীশচন্দ্র পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং নিজ অধ্যবসায়ে প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উন্নতি করেন। বাঙ্গালা দৈনিক পত্র মুদ্রণে তিনিই প্রথম রোটারী যন্ত্র ব্যবহার করেন এবং রয়টারের সংবাদ পরিবেশন বসুমতীর দ্বারাই সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়। পিতা উপেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার বহু খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী ও বহু মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থের সঠিক বঙ্গানুবাদ সুলভে প্রকাশ ও প্রচার করিয়া বাঙ্গালার পাঠক-সমাজকে তিনি চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

তাঁহার অকাল বিয়োগে বাঙ্গালা দেশ এক জন প্রকৃত সাহিত্যসেবী, অক্লান্তকর্ম্মী এবং নিপুণ ব্যবসায়ী হারাইল। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে শান্তি দান করুন, ভগবৎচরণে এই প্রার্থনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—নানাবিধ অনিবার্য্য কারণে বাণ্মাসিক সূচীপত্র বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী"—রবীন্দ্রনাথ

| শিল্পী—মিষ্টার টমাস

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

[দেখা-শোনা স্মৃতি-কথা]

বাড়ীতে নারায়ণ ছিলেন,—তখন প্রায় সকল ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের বাড়ীতেই থাকতেন। আমার মাতুলের উপরই তাঁর পূজার ভার ছিল। আমি রাণী রাসমণির বাগানে তাঁর দেবালয় বা কালীবাড়ী-সংলগ্ন উদ্যানে ফুল তুলতে যেতাম। কারো মানা ছিল না, অনেকেই যেতেন। ফুল তুলে কারো আশ মিটত না, বাগানের ফুলও কমত না। কত বাগানই ত দেখেছি, কিন্তু গন্ধ-পুষ্পের—(যুঁই, বেলি, চামেলি, নবমল্লিকা, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ প্রভৃতির) এমন প্রাচুর্য্য ও সমারোহ কোথাও দেখি নাই।

সেই সময় ঠাকুরকেও কত দিন দেখে থাকব। কিন্তু তখন বিশেষ ভাবে তাঁকে লক্ষ্য করবার কোন কারণও ছিল না, করাও হয় নাই। কারণ থাকলেও আমার তা জানা ছিল না, আর পাঁচ জনের মতই তাঁকে দেখে থাকব। বাগানে যাতায়াত মাত্রই ছিল।

এ সব প্রায় ৭০ বছর পূর্ব্বের কথা, সব কথা স্মরণ করে বলা কঠিন। শুনেছি, সাধনায় সিদ্ধিলাভান্তে পাগলের মত তিনি চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতেন, এক স্থানে স্থির থাকতে পারতেন না। দক্ষিণেশ্বর, এঁড়েদা, বেলঘর—সর্ব্বত্রই ঘুরতেন। কত বারই দেখে থাকব, চিনতাম না, লক্ষ্যও করিনি।

দক্ষিণেশ্বরের ৺নবীনচন্দ্র নিয়োগীর বাড়ী নীলকণ্ঠের যাত্রা হয়, তিনি শুনতে এসেছিলেন, আমিও গিয়েছিলুম। ভক্ত নীলকণ্ঠের সঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ। তিনি ভাব দমন করে থাকলেও ভাবান্তর ঘটে। তখনো চিনিনি। ভাগ্য—সময় না হ'লে সাড়া দেয় না। আমার স্বগ্রামের বন্ধু—দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ-চৌধুরী-বাড়ীর ছেলে—যোগী চৌধুরী ভায়া যাত্রা শুনতে এসে থাকবেন। বড় ঘরের, গভীর মনের ছেলে। আজ মনে হয়, তাঁর প্রাণ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের পথ খুঁজছিল। সে দিনকার সেই ভাবের ক্ষেত্রে ঠাকুরের কৃপায় ঐ যাত্রাই তাঁকে অভীষ্ট যাত্রা-পথের ইঙ্গিত দেয়। এটি আমার অনুমান।

যোগী ভায়ার কথাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করবার আমার একটু স্বার্থ আছে। তিনিই দক্ষিণেশ্বরের একমাত্র যুবা—যিনি সব থাকতে সংসারের সকল বাধা ছিন্ন করে ঠাকুরের শরণাপন্ন হন ও তাঁর অন্তরঙ্গ হন। পরে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় থাকেন ও তাঁর ২।৩টি অন্তরঙ্গের প্রধান ছিলেন। স্বামীজি তাঁকে সম্মানের চক্ষে দেখতেন। যোগী (স্বামী যোগানন্দ) দেহরক্ষা করলে। কঠোর সাধনায় তাঁর দেহ ভঙ্গ হয় ও অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম দেহত্যাগ করে যান। দেহ রক্ষা করলে স্বামীজি চিন্তিত ভাবে বলেছিলেন—"Begining of the end"—শ্রীশ্রীমাও বলেছিলেন—"বাড়ীর একখানা ইট খসল, এবার সব যাবে।"

দক্ষিণেশ্বরকে একা যোগানন্দই ধন্য করে গেছেন।

সে যুগটি ছিল বাংলার উন্নতিমুখী যুগ। কেশব সেনের যুগও বলা চলে,—ধর্ম্ম-সংস্কারের যুগও বলতে পারা যায়। কেশব বাবুর অসামান্য বাগ্মিতা ও প্রতিভা তখন কলেজের চিন্তাশীল যুবকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। ঠিক সেই

সময় কেশব বাবুই তাঁর 'Sunday Mirror' পত্রিকায়—"The Duckhineswar Jogi" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা একটু বিস্তৃত ভাবে প্রথম প্রচার করেন ও সাধারণের গোচরে আনেন। লোকটি যে "অশিক্ষিত," সে কথাও তাতে ছিল। তিনি সত্যই প্রচার করেছিলেন।

সেটা ছিল নব আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিতের নব নব আশার উদ্দীপন-সময়। তাই বড় কেউ সহসা অশিক্ষিত লোকের প্রতি তেমনি আকৃষ্ট হননি বলে মনে হয়। কেশব বাবু কিন্তু নিজে আসতেন। পরে, সত্যোপলব্ধির জন্য যাঁরা সত্যই চঞ্চল বা ব্যাকুল ছিলেন, তাঁরা দু'-এক জন করে আসতে আরম্ভ করেন। তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় রাম দত্ত মহাশয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি পরিচিত প্রিয়-দের সংবাদ ও আশ্বাস দেন। কেশব বাবু ঠাকুরকে তাঁর সমাজেও নিয়ে যান। সেখানে তাঁর সমাধি হয়, সে অবস্থা তাঁরা সকলে দেখেন। দক্ষিণেশ্বরে ভক্তের হাট বাড়তে থাকে।

মাষ্টার মশাই (শ্রীম) মহেন্দ্র গুপ্ত ১৮৮২তে আসেন, হাতে একখানি Wordsworth থাকত। ক্রমে তাঁর সঙ্গে বা তাঁর কাছে শুনে অনেকেই আসেন। তার পূর্ব্ব হতেই কোন্নগরের মনোমোহন বাবু আসতেন। তাঁর সঙ্গে ট্রেণে আমার আলাপ হয়। কি ধীর শান্ত-মধুর প্রকৃতিই ছিল তাঁর। পরে জেনেছিলুম—তিনি রাখাল মহারাজের শ্যালক। এইরূপ অনেকেই ছিলেন, বোধ করি, বিবাহিত সংসারী বলে তাঁদের উল্লেখ বড় পাওয়া যায় না।

১৮৮০তে আমার বন্ধু দক্ষিণেশ্বরের—৺হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথকে পাই। নরেন্দ্রনাথ শরৎ (সারদানন্দ মহারাজ) হরিদাসের College mate ছিলেন। নরেন্দ্রনাথকে সেই প্রথম দর্শনেই নানা কারণে মুগ্ধ হই—রূপে, রহস্যে, আলাপে প্রাণ-খোলা ব্যবহারে তাঁকে dont care sort of young prodigyরূপে পেয়ে অবাক হয়ে—বয়স-সুলভ আনন্দ উপভোগ করি। তাঁর পরিচয় পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকি। বয়সে আমার প্রায় সমবয়সী—কিছু বড়। কিন্তু তর্কে ঘেঁশে কে! সমস্যা সমাধানে—সব-জান্তা! পরে বুঝেছিলুম—সে সব হাসি-তামাসার পশ্চাতে মূর্ত্তিমন্ত জ্ঞানী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

সকলে একত্রে রাণী রাসমণির বাগানে যাওয়া যায়। সে দিন গঙ্গার ধারে পোস্তায় বসে' আড্ডা দেওয়াই চলে। বোধ করি, সে দিন ঠাকুরের ঘরে ঢোকা হয়নি, নরেন্দ্রেরও তেমন আগ্রহ ছিল না, ঘরে জনতাও ছিল। ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। সেই দিনই কি অন্য দিন। নরেন্দ্রের সাড়া পেয়ে

এক জন এসে ডাকলেন—"ঠাকুর দেখতে চাচ্ছেন।" সকলে যাওয়া গেল। এক জন গানের কথা তোলায়

শ্রীমা

—ঠাকুর গান শুনতে চাইলেন। নরেন্দ্র যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত, বলবা মাত্রই গাইলেন। সত্যই সুধাবর্ষী ভাব-বিভোর কণ্ঠ। আশ্চর্য্য ছেলে, কোনো বিষয়ে ইতস্ততঃ নেই! দু'লাইন না শুনতেই ঠাকুরের সমাধি হয়ে যায়। শেষ ঠাকুর বলেন—"আবার এসো।" পরে নরেনের সঙ্গীত বা সুরে স্তব ও গীতাপাঠাদি শুনে ঠাকুর বলেছেন—"সুমধুর বংশীধ্বনি শুনে সাপ যেমন ফণা তুলে স্থির হয়ে থাকে, নরেন্দ্র গাইলে হৃদয়ের মধ্যে যিনি আছেন, তিনিও তেমনি চুপ করে শোনেন।"

আমি ঠিক বলতে পারি না, এইটিই নরেন্দ্রের প্রথম দর্শন ছিল কি না, সম্ভবতঃ প্রথমই হবে। তবে সকলেই লক্ষ্য করতেন—নরেন্দ্রকে পেলে বা দেখলে, ঠাকুরের একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন হ'ত,—বুক-ভরা আনন্দ মুখময় প্রকাশ পেত। নরেন্দ্র কিন্তু ঘুরে বেড়াতেন, আবার আসতেন। জিজ্ঞাসাদি বড় করতেন না। হাজরার আসন ছিল ঘরের বাইরে, দোরের কাছে, উত্তর বারান্দায়। নরেন্দ্র কিন্তু প্রথম থেকেই ঠাকুরের যেন চোখের মণি বা আলো ছিলেন। কত দিনই বলেছেন—"বেড়াচ্ছে যেন খাপ-খোলা তলোয়ার। কি যে করবে ঠাউরে উঠতে পাচ্ছে না—স্থির হতে পাচ্ছে না"—ইত্যাদি।

সাহায্য দরকার হ'লে মাষ্টার মশাই ছিলেন—উভয়ে উভয়কে যেন বুঝতেন। মুখ ধোবেন, ঝাউতলা কি পঞ্চবটী যাবেন, মাষ্টার মশাই জল, গাড়ু, গামছা নিয়ে চলেছেন। যেতে যেতে দু'-চারিটি কথা হত। এই ভাবে তিনি প্রিয়দের তৈয়ের করতেন। আবার ঘরে কি বাইরে কদাচিৎ দু'-একটা রহস্যের কথাও হয়ে যেত, তাও মাষ্টারকে উপলক্ষ করে। তার মধ্যে কি আন্তরিক ভালবাসাই প্রচ্ছন্ন থাকত। বাইরের লোক উপভোগ করত মাত্র, মাষ্টার মশাই কৃতার্থ হয়ে যেতেন। পরে কত দিনই ভেবেছি, যখনি যাই ঠাকুরের ঘরটিতে, আগন্তুক ভক্তেরা তাঁকে ঘিরে আছেন, ঈশ্বরীয় কথা শুনছেন। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভগবানকে লাভ করা সম্বন্ধে, তার উপায় সম্বন্ধে কথাই তিনি কইতেন—অনর্গল ও অবাধ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সন্ধ্যায় উঠে কিছুক্ষণের জন্য গঙ্গাদর্শনে যেতেন ও মন্দিরে প্রণাম করে ফিরতেন। ঘরেও যে সব দেবদেবীর ছবি ছিল—যীশু, প্রহ্লাদ, ধ্রুব পর্য্যন্ত—সকলকে প্রণাম করে খাটে বসে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ

স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ)

অবস্থায় থাকতেন। আবার সেই ঈশ্বরীয় কথা, অন্য কথা শুনি নাই। ভাবতুম, ত্যাগী কুমার ভক্তদের ধ্যান-ধারণা-শিক্ষা-দীক্ষা, যোগিসুলভ ক্রিয়াদির উপদেশ তবে কখন হয়। শুনেছি তাঁদের কা'কে কা'কে [illegible]

রাত্রে থেকে যেতে বলতেন। পঞ্চবটীই ছিল তাঁদের সাধন-মঞ্চ—Night School. সে সব দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেনি। বিবাহিতদের সে সৌভাগ্য ছিল না, তাঁরা নিজেরাই বাড়ী ফিরতেন। মাষ্টার মশাইয়ের কথা জানি না, তাঁর কথা স্বতন্ত্র।

তখন ঠাকুরের ইচ্ছামত আসর জমতে আরম্ভ হয়েছে। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। সত্যানুসন্ধানী কুমার যুবকেরা অনেকেই এসেছেন ও আসছেন। সবাই প্রায় আমাদের বয়সী, কিন্তু প্রবল অনুরাগী। অনেকেই কেশব বাবুর সমাজে কিছু কিছু trained তখন বৈদেশিক শিক্ষার জোয়ার এসেছে, মিল, স্পেন্সার, হেক্সলী, কমটি-পড়া ছেলেরা বা লোকেরা বেরিয়েছেন। দর্শনের সুদর্শন তাঁদের করায়ত্ত! ইচ্ছায় বা কারো অনুরোধে তাঁরাও ঠাকুরকে দেখে যেতে আসেন। এমন প্রশ্ন করেন, যার মীমাংসা হয়নি বা তাঁরা পাননি। উত্তরে তিনি একটি সহজ সাধারণ কথা বলেন। তাঁরা বিস্মিত হয়ে ভাবেন—"এই ত মিটে গেল"! নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন, কিন্তু বেশী খোলসা করে নেবার জন্যে কা'কেও দ্বিতীয় বার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতে কেহ দেখেছেন কি না জানি না। আমি দেখি নাই।

তাঁর রোগের সময় ডা: মহেন্দ্র সরকার মশাই আসতেন, বয়সে বড় ছিলেন বলেই হোক্ বা যে কারণেই হোক, ঠাকুরের সঙ্গে এক তিনিই "তুমি তুমি" বলে কথা কইতেন। সন্দেহভঞ্জনার্থে তিনিই কেবল তর্ক তুলে কোনো বিষয়ে দু'-তিন বারও জেরা করতেন। শেষ প্রণাম করে বিদায় হতেন! বলতেন—"তুমি আমাকে 'যাদু' করেছ। দেখো না Call-ফল্ সব ভুলে তোমার কাছেই বসে আছি, দু'শো টাকা মাটি করলে! তুমি এসব শিখলে কবে, কোথায়?" ইত্যাদি।

ঠাকুর সম্বন্ধে অনেক কথাই—অনেকে বলেছেন—"ধর্ম্মসমন্বয়" "যত মত তত পথ"।—"দেশ, জাতি, ভাষা, ভেদ থাকলেও সকলের উদ্দেশ্যই এক—সেই ভগবান্ লাভ"। ব্রহ্ম ও শক্তি এক,—প্রভেদ কোথায়? কি দ্বৈত, কি অদ্বৈত, কি সাকার, কি নিরাকার, কি প্রতিমা পূজা ইত্যাদি যেন খোলসা করে দিতে এসেছিলেন। দিয়েও গেছেন। সবই ঠিক কথা। কিন্তু সেই কঠিনতর জটিল বিষয়গুলি এক জন অজ পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোকের মুখে শুনে, খোলসা হ'ল কি করে? প্রমাণ,—পরিচালিত চিন্তাশীল যুগে, সুধীরা তা নীরবে স্বীকার ক'রে নিলেন কি করে? এইটিই আমার বড় কথা বলে মনে হয়।

স্বামী যোগানন্দ (যোগী মহারাজ)

তিনি দু'-একটি কথায় উত্তর দিতেন—ঘরোয়া কথায় ঘরোয়া উদাহরণে। মা যেন ছেলেকে বলে দিচ্ছেন—ব্রহ্ম কি, শক্তি কি, ফিরে জন্ম হয় কেন, কাদের হয় না, ইত্যাদি গভীর কথা। ছেলেরা তাই হাঁ করে শুনছে, প্রতিবাদ নেই, বিশ্বাসে বাধা নেই। ও-পাড়ার হরি মতিও যেমন শুনছে, কলেজের কালীচরণও তেমনি শুনছেন। "ওটা কি করে হয়, ভাল বুঝতে পারছি না" এমন কথা বা তর্ক কারো মুখে কয় জন শুনেছেন জানি না!

স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ)

স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ)

এত ভালবাসা ! কেন তিনি আমাদের দেহ, মন, আত্মার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন ?"—এ ভালবাসার অর্থ প্রকাশ পেয়েছিল ঠাকুরের মর্ত্ত্যদেহ রক্ষার পরে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবার পর বৃন্দাবনে গোপিকাদের অবস্থা আমরা পড়ি ও ব্যাকুল হই। ঠাকুরের অভাবে তাঁর ভক্তদের (বিশেষ ত্যাগী-ভক্তদের) অবস্থা অনেকেই দেখেছেন। সে অবস্থা বর্ণনাতীত।

নরেন্দ্রনাথ সন্দেহ সত্ত্বে, অর্দ্ধপথে নীরব থাকবার পাত্র ছিলেন না। সে ছেলে সাক্ষাৎ ভগবানের কাছেও গোঁজামিলে "আজ্ঞে হাঁ" বলবার পাত্র ছিলেন না। তাঁর কাছে ফাঁকির খাতির ছিল না, বড় জোর দ্বিতীয় বার বলেছেন—"ওটা হয় না"! ঠাকুর বলেছেন—তবে এটা হয় কি করে বুঝে দেখুন, বলে একটা কিছু বলেছেন মাত্র। আর বলতে হয়নি। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত যাচাই করতে কসুর করেননি, অতবড় তর্কসিন্ধু লোকও দেখিনি। ঠাকুর তাতে সন্তুষ্টই হতেন। তাই না আপন সত্তা তাতেই রেখে "ফকির হলুম" বলে চলে যান! নরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর অর্জ্জুন। শিক্ষাহীন গুরুর কাছে শিক্ষিতের এ পরাজয় বা জয় হ'ল কি করে!

বেদ বেদান্ত সবই ছিল ও আছে এবং থাকবে। কিন্তু সে সমুদ্রের মাথা-ভাঙ্গা ঢেউ কাটিয়ে পার হওয়া অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য। তাই বা কয় জনের পক্ষে? ঠাকুরের সহজ প্রচলিত কথাই মন্ত্রের কাজ করেছে। ঝরণার ধারার মত স্বচ্ছ অনাবিল, সে ধারা কলুকজ্জার বিচিত্র পথ দিয়ে আসত না। মূর্খ ও শিক্ষিত সকলেরি সহজবোধ্য ছিল। তিনি "সুষুনী" শাককে কখনো "সুনিষণ্ণক" বলে কাকেও নিদ্রাহীন করে যাননি! তাঁর বলার সঙ্গে শ্রোতার চেষ্টার বিরোধ থাকত না।

আর তাঁর ভালবাসা, তার তুলনা নেই! রাখাল মহারাজ বলেছেন—"গুরু মহারাজ যেমন ভালবাসতেন, তত কি বাপ মা ভালবাসে? আমরা তাঁর কি করেছি যে

মহেন্দ্র গুপ্ত (মাষ্টার মশাই)

যুবকদের যে কতটা হারালে তা হয়, সে কথা কে বলবে—তার উদাহরণ খুঁজে পাই না। দেহ আছে, তার স্পন্দনও আছে,—প্রাণ নাই।—"কি হোলো, কি করি,

কোথায় যাব, কি নিয়ে থাকব,"—সংজ্ঞাশূন্য, আছাড়ি বিছাড়ি অবস্থা! পরে নরেন্দ্রনাথের পরিচালনায়, ক্রমে তাঁরা প্রকৃতিস্থ ও আশ্বস্ত হন। সেই পুরুষসিংহের এক একটি কথায় তাঁদের বিক্ষিপ্ত মন বল পায়। রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সেই বিক্ষিপ্ত বিপন্ন অবস্থার সময় বাড়ী ফেরার প্রসঙ্গে মাষ্টার মশাইকে বলেছিলেন—"তা নরেন্দ্র বেশ বলে—"রামকে পেলুম না বলে কি শ্যামের সঙ্গে ঘর করতেই হবে, আর ছেলে-পুলের বাপ হতেই হবে!" সন্ন্যাসী ও নারী সম্বন্ধে কথায় রাখাল মহারাজ বলেন—

কি অসীম যন্ত্রণাই হজম করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরীয় কথার অন্ত ছিল কি? কেউ এলে আমরা বিরক্ত হতুম, সাক্ষাতে বাধা দিতুম। মনে আছে—বলতেন,—"আসতে দাও, কতদূর থেকে এসেছে—জানো! কিসের জন্যে, কি পাবার লোভে?" আবার ঈশ্বরীয় কথা চলতো, পারছেন না—তবুও। সে কষ্ট দেখে আমরাই তাঁকে দেহ ছাড়াই, বলতে বাধ্য হই—"আর কষ্ট পাবেন না। যাক্ তাঁর গুরুদত্ত প্রভাবেই ঠাকুরের অভিপ্রায় মত মনস্থির করে সব এগিয়ে যান,—পাহাড়ে বনে জঙ্গলে,

ভূদেব মুখোপাধ্যায়
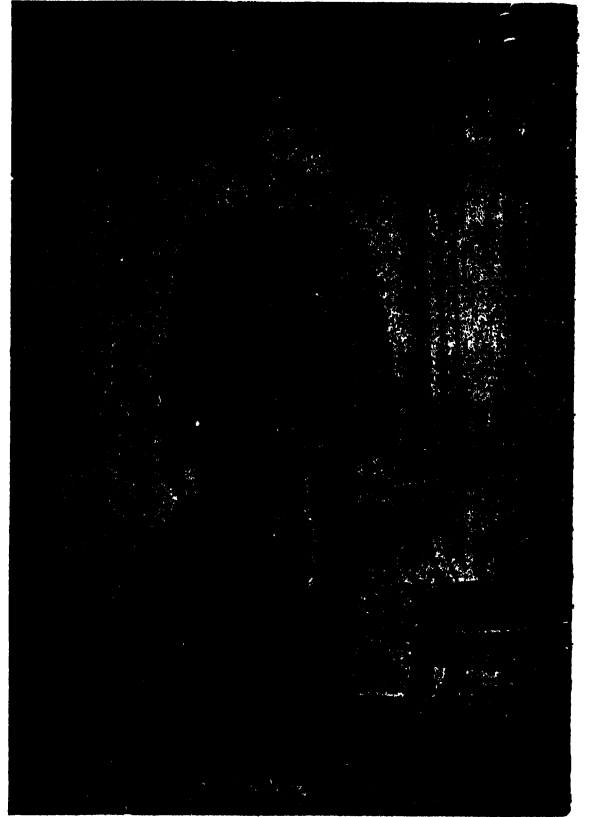
কেশবচন্দ্র সেন

অনেকে মনে করেন মেয়েমানুষ না দেখলেই হল,—মাথা নীচু করে গেলেই হল। নরেন্দ্র কাল রাতে বেশ বললে—"যতক্ষণ আমার কাম ততক্ষণই স্ত্রীলোক; তা না হলে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ থাকে না—ইত্যাদি।"

স্বামীজি (নরেন্দ্র) আরো বলেন—"রাজা (রাখাল মহারাজ) তাঁর ভালবাসার কথা বলচ? সে ভালবাসা মানুষে সম্ভব নয়, কোথাও পাবে না। রোগের সময় দেখেছ ত'—ইচ্ছা করলেই চলে যেতে পারেন, কিন্তু পারতেন না। কেন? জানতেন—ছেলেরা যে অনাথের মত পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, কোথায় ডুবুবে।

তীর্থে কৃচ্ছ্রসাধনায় দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেন। পরে ও ক্রমে যা হয়েছে তা আজ বিশ্বের সম্মুখে বর্ত্তমান। সে কথা আর বিস্তৃত উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। যোগ্যেরা সাধন ভজনে, কাজে কর্ম্মে, সেবায় সাহায্যে ও গ্রন্থমধ্যে তার পরিচয় যথাসম্ভব পরিস্ফুট করে চলেছেন। শ্রীম-কথিত কথামৃত ঠাকুরের আদি পরিচয়ে পুষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ববিজয়ী বাণীই সেই মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্তি, ও জগতের বিস্ময়। ভারতের ভাবী সঞ্জীবনী।

নরেন্দ্রনাথ বহু প্রমাণ পেয়ে বুঝেছিলেন, ঠাকুরের ইচ্ছায় বা স্পর্শে অভীষ্ট লাভ মুহূর্ত্তেই সম্ভব। কিন্তু

ঠাকুরের তা মনঃপূত ছিল না। তিনি এমন মানুষ গড়তে এসেছিলেন বা চেয়েছিলেন, যারা নিজের শক্তিতে অগ্নিপরীক্ষায় সিদ্ধ হবে, তবে তাদের দ্বারা কাজ হবে, তারা আবার শত শত কর্ম্মী, তৈয়ের করে এই ধারা-টিকে বাড়িয়ে চলবে। সাধক, কর্ম্মী, সেবক এক হ'য়ে যাবে, কর্ম্ম ত্যাগ করে তা হয় না,—হবে না। তখন তারা দেশ-বিদেশকে আকৃষ্ট করবে। সকলেরি প্রাণ যা চায়, যা খোঁজে, সেই পরম ও চরম বস্তু ভারতেই তারা পাবে। দেয়ার মধ্যে পাওয়া অপেক্ষা করে থাকে ও আছে।—স্বামীজির এসব অন্তরের কথা. বিশেষ স্থলে ও প্রয়োজনে প্রকাশ পেতো। আরো বলেছেন—"ঠাকুর আমাদের সেই পথই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আমি তাঁকে কতটুকুই বা বুঝেছি। বন্ধুভাবে "দীনবন্ধু" এসেছিলেন, তাঁকে বোঝবার সামর্থ্য কোথায়?" ইত্যাদি।

*　　*　　*

ঠাকুরের তিরোধানের পর দক্ষিণেশ্বরের তরুণদের অনুরোধে তাঁদেরি এক জনকে নিয়ে তখনকার লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক ভিক্ষার্থে, আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন সুধী-প্রবর ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চুঁচুড়া ভবনে উপস্থিত হই। ভাগীরথী-কূলে তাঁর প্রেস ও বাগান-বাড়ীতে তাঁকে পাই। তাঁর তখন বৃদ্ধাবস্থা, এক-মনে লেখাপড়ার কাজ করছিলেন। আমা-দের দেখেই কাজ ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণ শুনে নমস্কার করে নিজেই বসবার আসন পেতে দিলেন। আমরা তাঁর নাতির বয়সী। বললুম, "করছেন কি?" যাক্ সে অনেক কথা। হাত মুখ ধুতেই হল, কিছু খাইয়ে, পরে—কোথা থেকে কি কাজে আসা, জিজ্ঞাসা করলেন। পুস্তক ভিক্ষার কথা শুনে বললেন—আমার চারখানি প্রবন্ধ-পুস্তবই প্রেসে, তাদেরি প্রুফ্ দেখছিলুম। Address রেখে যাও, মাসখানেক পরে পাবে কিন্তু "এডুকেসন গেজেটের" পোষ্টেজ ব্যয়টা জমা দিতে হবে, নচেৎ আমি গেলে কেউ পাঠাবে না। আমি আর বেশী দিন থাকবো না ইত্যাদি। অবাক হয়ে শুনছিলুম আর তাঁকে দেখছিলুম। রূপে, বর্ণে, বিদ্যায়, দৈর্ঘ্যে (সাড়ে ছয় ফিট ছন্দের) তেমন পুরুষ আর কয়টিই বা দেখেছি!

পঞ্চবটী

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির

সহসা জিজ্ঞাসা করলেন—"বললে না দক্ষিণেশ্বরে বাড়ী,"—"আজ্ঞে হ্যাঁ"। "রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখেছ?"—"আজ্ঞে হ্যাঁ দেখেছি"। "আমার ভাগ্যে ছিল না বাবা। ভগবান আমাকে কৃপা করে সবই দিয়েছিলেন, কোনো অভাবই ছিল না, কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে ঘটে না। আমি শুনেছিলুম, নিরক্ষর লোক, ভেবেছিলুম—তাঁর কাছে আর নূতন কি শুনবো।" ইত্যাদি অনেক কথা। "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পড়ার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, বিশেষ বৈদেশিকদের দর্শনাদি দেখার। কারণ, তাঁরাই এখানকার জগতে বিদ্যা, বুদ্ধি প্রতিভায় প্রধান। তার কিছু বাকি রেখেছি বলেও

বোধ হয় না। পাশের ঘর কয়টি তাঁদের পুস্তকই দখল করে আছে, দেখে যেও। তাতে দার্শনিকদের চিন্তার অসীম প্রয়াস পুঞ্জীভূত আছে, কিন্তু সত্য বস্তুলাভে আমার সন্দেহ মেটেনি, শান্তি পাইনি। এই যে সব কীটদষ্ট ছেঁড়া তালপত্র মাদুরের ওপর ছড়ান রয়েছে, শেষ ওর মধ্যেই আমি শান্তির আভাস পেলুম। গরীব দেশ, এ যুগে ও জঞ্জাল কেউ রাখেনি—অভাবে ও স্থানাভাবে। অনেক কিছু পশ্চিমে চলে গেছে, অল্পই সংগ্রহ করতে পেরেছি। ও থেকে কিছু কিছু উদ্ধারের চেষ্টা পাচ্ছি। দিনও আমার ফুরিয়ে গেছে—বড় জোর মাস দশেক আছি। এখন পরমহংসদেবের কথা কিছু কিছু পড়ে—সেই সিদ্ধ, পাওয়া-লোক হারিয়ে হায় হায় করছি মাত্র। ভাগ্য আমাকে কি বঞ্চনাই করেছে! এখন আর তাঁকে কোথায় পাব? আমি সামান্য লোক—সর্ব্বস্ব বিনিময়ে যদি তাঁকে আধ ঘণ্টার জন্যেও পেতুম!" নীরব ও অন্যমনস্ক হলেন।

সে কি মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ! তাঁর সে অবস্থা, কথায় সে করুণ ভাব ও সুর, আমি প্রকাশ করতে পারলুম না। তিনি তখন আত্মবিস্মৃত। ভুলে গিয়েছিলেন, কাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করছেন। সত্যানুসন্ধানী মহতের হৃদয়াবেগ তখন অনুশোচনায়, ক্ষোভে আত্মহারা। "সত্য" স্থান কাল পাত্রের মুখ চেয়ে চলে না।

পরে অনেক কথাই হ'য়েছিল। বাড়িয়ে ফল নেই। তাঁর তিনটি ঘর-ঠাশা নির্ব্বাচিত পুস্তকের লাইব্রেরী দেখিয়ে, গেট পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন! সেটা ছিল ১৮৯৫এর শেষ। কয়েক মাস পরে 'হিতবাদী' পত্রিকায় তাঁর ছবি দেখে চমকে যাই। না পড়েই হিসেব করে দেখি—নয় মাস কয়েক দিন হয়েছে, তিনি সাধনোচিত লোকে চলে গেছেন। অশোক-স্তম্ভ পরে দেখেছি কিন্তু বাংলার সে স্তম্ভকে ভুলতে পারিনি। পরমহংসদেবের প্রতি সে শ্রদ্ধা, সে বিশ্বাস ও তাঁকে না দেখার সে আন্তরিকতা-পূর্ণ আক্ষেপ, মহতেই সম্ভব ছিল।

যা একটু লিখলুম তার সবই যে আমার নিজের দেখা, —৬০।৭০ বৎসর পরে এমন কথা বলবার আমার স্পর্দ্ধা ও সাহস নেই! কিছু কিছু পড়া বা কোনো কথা মিশে গিয়ে থাকবে—কারণ, সে সব যেন "আপন" হয়ে গিয়েছে। তাই ঠাকুরের কথা লিখতে আমি সত্যই সঙ্কোচ বোধ করি, অলক্ষ্যে অনুমানও এসে পড়ে। প্রাণে তারা সহজেই সাড়া দেয়। তিনি সর্ব্বদাই বলতেন—সত্যকে ধরে থাকা ঈশ্বর লাভের সহজ উপায়।

ক্ষমাভিক্ষু

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামণী

সত্য ও ন্যায়ের পথে চলিয়াছে ধীর,
দম্ভী কি দর্পীর কাছে নোয়ায়নি শির।
রোধিতে অন্যায়, পাপ আর অত্যাচার,
নিত্য ব্যয় করিয়াছে শক্তি আপনার।

সদা স্বার্থ-শূন্য, সবে দীনতা বিনয়,
জীবনে সে একজনে করিয়াছে ভয়।
ভাব, ভগবান্ লয়ে কাটাতো সময়,
অপরের অনুগ্রহ-আকাঙ্ক্ষী সে নয়।
মমতায় পূর্ণ হৃদি, চরিত্র নির্ম্মল,
বিবেক বিশুদ্ধ, দূরদর্শী ও সরল।
সহিয়াছে কত ক্লেশ মিথ্যা অপবাদ,
অত্যাচারী কাছে নিত্য সে নিরপরাধ।
দয়া তার উচ্ছ্বসিত, দান অকুণ্ঠিত,
চিরদিন ক্ষমতার অতিরিক্ত দিত।
ছিল মর্য্যাদক, দিত হয়ে হৃষ্টমতি—
ধনাঢ্যকে আশীর্ব্বাদ, গুণাঢ্যকে নতি।

সদাই উৎসব তার—আনন্দ অপার,
পুণ্য গৃহে নিত্য হতো অতিথি-সৎকার।
ঘটাইয়া দুষ্ট দুষ্কৃতির পরাজয়,
অগর্ব্বিত—দিত পল্লীবাসীরে অভয়।
করেছে দুর্জ্জন সাথে সতত বিবাদ,
গ্রামকে পবিত্রতর দেখা তার সাধ।
তার ভক্তি উপদেশ দুঃখে নেত্র-নীর,
গোটা তার গ্রামটিরে করেছে মন্দির।
অখ্যাত সে তবু তার বক্ষের সৌরভ,
সর্ব্বকাল সর্ব্বজাতি দেশের গৌরব।
ইচ্ছা হয় যশ তারে দিয়ো বা না দিয়ো,
ভগবান্ প্রিয় তার, সে তাঁহার প্রিয়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

[উপন্যাস]

ষোল

উক্কু টিয়ারার সাহায্যে দিনে-রাতে দু'বেলায় আহার পৌঁছুতে লাগলো প্রতাপের কাছে। দিনের বেলা পুঁটলির বদলে উক্কুর হাতে দেয়া হতো বেশ বড় এক-ছড়া কলা—কেউ দেখলেও সন্দেহ করবে না! টিয়ারা খুব সন্তর্পণে এসে পাহারার অগোচরে সেগুলো গহ্বরে পৌঁছে দিয়ে যেতো। এই ভাবে আরো ক'দিন কাটলো। আর এক দিন পরেই গহ্বরের দ্বার খুলে দেখা হবে, অনাহারে প্রতাপের মৃত্যু হয়েছে কি না।

নান্দু প্রায় প্রতিদিনই এসে ঝিম্‌লিকে বিরক্ত করে যায় তার সেই প্রস্তাব নিয়ে এবং প্রতাপ যে অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে আছে, তার বাঁচবার সম্ভাবনা মোটে নেই, এ সংবাদও বেশ বিনিয়ে বিনিয়ে বলে যায়। প্রতাপের অনশন-দণ্ডের দশ দিনের দিন সকালে সে এসে ঝিম্‌লিকে বললো :—"কাল সকালে জিঙ্গিন্-চুং পাহাড়ের গহ্বর-দ্বার খোলা হবে—তখন বেরুবে জংলি পুলিশের লাশ। রাজা খুশী হয়ে তখনই সে লাশ বিলিয়ে দেবে সেনাদের ভোজের জন্য। কি মজাই হবে! জংলি পুলিশের একটা ছুঁচো-চরেরও ঐ দশা হয়েছে। তুই শুন্‌লিনি মোর কথা, যদি ও-কুত্তাটা এখনো না ম'রে থাকে, তা হলে আমি তাকে ছেড়ে দিতে পারি—তুই যদি আমার কথা-মতো চলিস্।"

ঝিম্‌লি কোনো জবাব না দিয়ে ছুটে চলে গেল। তার মাথা বন্-বন্ করে ঘুরতে লাগলো নান্দুর ভয়ঙ্কর কথা শুনে। বাকি দিন আর রাতটা কাটলেই গহ্বরের দোর খোলা হবে, তখন প্রতাপকে জ্যান্ত দেখলে রাজার রাগের সীমা থাকবে না। হয়তো তখনি হুকুম দেবে, বর্শায় বিঁধে তাকে মেরে ফেলবার জন্য।

উপায়? এইটুকু সময়ের মধ্যে কি করে তাকে গহ্বর থেকে সরিয়ে কোনো নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখা যায়? সে একা এমন কঠিন কাজ করতে পারবে? অসম্ভব! তখন মনে পড়লো সেই নাগা মেয়ে মন্নুয়ার কথা। সে নিশ্চয় এ-কাজে সাহায্য করবে। কিন্তু ঝিম্‌লি তো একেবারে বোকা মেয়ে নয়—সে বুঝতে পেরেছে প্রতাপের উপর ও-মেয়েটার কি-ভয়ানক মমতা; না হলে এত কষ্ট করে কোন্ সুদূর বস্তি থেকে ও এখানে আসবে কেন? এই মেয়েটা শেষে প্রতাপকে নিয়ে যাবে? দারুণ ঈর্ষ্যায় তার মন আচ্ছন্ন হলো। না, সে মন্নুয়ার সাহায্য চাইবে না—তার সাহায্য নেবে না। অপরাহ্নে তার সঙ্গে ঝিম্‌লির দেখা করার কথা, কিন্তু ঝিম্‌লি দেখা করতে যাবে না, সে তাকে এড়িয়ে চলবে।

কিন্তু প্রতাপকে বাঁচানো? সময় চলে যাচ্ছে—শীগ্‌গির উপায় করা চাই। ঝিম্‌লি অস্থির হয়ে উঠলো। সে জানতো, তীর-ধনুক নিয়ে সে একা পাহারার লোক-গুলোকে অনায়াসে নিপাত করতে পারে, কিন্তু মানুষ হয়ে মানুষকে কি করে সে হত্যা করবে? বিশেষ এই নিরপরাধ লোকগুলোকে? এ কল্পনায় সে যেন শিউরে উঠলো। কিন্তু প্রতাপকে উদ্ধার করতে হলে প্রথমে চাই এই লোকগুলোকে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং অকর্ম্মণ্য করা। হত্যা ছাড়া অন্য কি উপায়ে তা সম্ভব হতে পারে? ঝিম্‌লি এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য ক'ঘণ্টা অনেক ভাবলো! অবশেষে একটা উপায় মনে জাগলো।

মন্নুয়ার সঙ্গে অপরাহ্নে তার যেখানে দেখা করার কথা, ঝিম্‌লি সে সময় চলে গেল ঠিক তার উল্টো দিকে। যথাসময়ে মন্নুয়া এসে ঝিম্‌লির প্রতীক্ষা করতে লাগলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন তার দেখা মিললো না, মন্নুয়া তখন একটু আশ্চর্য্য এবং চিন্তিতও হলো। কারণ, এখানে এসে অবধি প্রতিদিন এ জায়গায় সে ঝিম্‌লির দেখা পায়—দু'জনে যুক্তি-পরামর্শ করে—এক দিনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঝিম্‌লি না আসায় তার মনে নানা দুশ্চিন্তা উপস্থিত হলো। এ-ও সে ভাবলো, হয়তো রাণীর বিশেষ কোনো কাজে সে আটক পড়েছে—তাই আসবার সুযোগ পায়নি—হয়তো এতে চিন্তা করবার বিশেষ কিছু নেই। তবু প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করে শেষে সে চিন্তিত মনে ঘরে ফিরে গেল।

এ দিকে সন্ধ্যার কিছু পরেই এক জন নাগা ক'টা বাঁশের চোঙা পিঠে করে হাজির হলো জিঙ্গিন্-চুং পাহাড়ের গহ্বরে পাহারাওয়ালাদের কাছে। এসে তাদের বললো, সেনাপতি নান্দু তাদের কাজে খুশী হয়ে তাদের জন্য চোঙা-ভর্ত্তি খুব ভালো মদ পাঠিয়েছে। পাহারার

লোকগুলো আনন্দে লাফিয়ে উঠলো এবং তখনই চোঙা নিয়ে সকলে মিলে পান সুরু করলো। ক'মিনিট পরে উঠ্‌লো তাদের উচ্চ কণ্ঠে সঙ্গীত, তার পর তাণ্ডব নৃত্য। এমন আনন্দের নৃত্য তারা কখনো নাচেনি—এমন তীব্র মদও তারা কখনো পান করেনি। দু'ঘণ্টার মধ্যে সব-ক'টা চোঙার মদ নিঃশেষ হয়ে গেল এবং তার একটু পরেই নাচ-গানের তাণ্ডবতা শিথিল হয়ে পাহারাওয়ালারা একে একে মাটীতে লুটিয়ে পড়লো—নিশ্চেতনের মতো। পাহারার একটি প্রাণীও আর দাঁড়িয়ে রইলো না।

প্রতাপ তার গুহা-কারাগার থেকে বুঝতে পারলো না বাইরে পাহারার লোকরা এত আনন্দ-উৎসব করছে কেন! তার আশঙ্কা হলো, এই উৎসবের শেষেই বুঝি তার উৎসর্গের ব্যবস্থা! দারুণ উৎকণ্ঠায় সে ছটফট্ করতে লাগলো। তার পর প্রচণ্ড উন্মাদনার অবসানে যখন অকস্মাৎ আবার নিবিড় স্তব্ধতা—পাহাড়-প্রদেশ যেন নির্জ্জীব, প্রতাপের চিন্তা-ক্লিষ্ট চিত্ত আশু বিভীষিকার আশঙ্কায় নিস্পন্দ হয়ে গেল। বিপদ যেন তাকে একে-বারে চেপে ধরেছে তার কণ্ঠরোধ ক'রে! মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত চলে যেতে লাগলো সহজ ভাবেই—কোনো বিপদের বিভীষিকা সে মুহূর্ত্তগুলোকে বিদীর্ণ করে তুললো না! প্রতাপের বুকের উপর থেকে ক্রমে নেমে যেতে লাগলো আশঙ্কার গুরু ভার!

সতেরো

প্রায় মধ্যরাত্রি। প্রতাপ তখনও জেগে, নিদ্রার সম্ভাবনা আজ মোটেই ছিল না। বনের পশু-পক্ষীর বিকট চীৎকার মাঝে মাঝে তাকে সচকিত করে তুলচে। এমন সময় হঠাৎ তার কাণে বাজলো একটি কোমল কণ্ঠের ধ্বনি! বিস্ময়ে সে কাণ খাড়া করে রইলো। তখন স্পষ্ট শুনতে পেল বাইরে থেকে কে যেন বল্‌চে :—"আমি ঝিম্‌লি। এখনি তোমাকে পালাতে হবে এখান থেকে। পাহারার লোক সব মদ খেয়ে মরার মতো পড়ে আছে। দরজার পাথরটাকে জোর করে ঠেলে দাও—এ দিক থেকে আমিও ঠেলছি।"

ঝিম্‌লির কণ্ঠ শুনে প্রতাপ চট করে উঠে বসলো—তার পর বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দের উচ্ছ্বাস-ভরে বলে উঠলো :—"তুমি ঝিম্‌লি? পালাতে বল্‌চো আমাকে? কি করে পালাবো? এত বড়ো পাথর সরানো যাবে না।"

—"সরাতেই হবে—যেমন করে পারো। একটা লোহার ডাণ্ডা এনেছি, পাশ দিয়ে গলিয়ে দি,—এই দিয়ে পাথর সরানো যায় কি না ছাখো।"

প্রতাপ এর পূর্ব্বে বহু বার চেষ্টা করেছে গুহা-মুখের এই পাথরটাকে স্থানচ্যুত করবার জন্ত; কিন্তু শক্তিতে কুলোয়নি! এখন লোহার ডাণ্ডা পেয়ে তার আশা এবং উৎসাহ অনেকখানি বেড়ে গেল। প্রাণপণে সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রতাপ ভিতর দিক থেকে এবং ঝিম্‌লি বাইরে থেকে কিছুক্ষণ চেষ্টা করলো কিন্তু পাথর সম্পূর্ণ অচল অটল রইলো! প্রতাপ হতাশ হয়ে ব'সে পড়লো।

জ্যোৎস্নায় চারি দিক্ তখন আলো হয়ে আছে। ঝিম্‌লির ভয় হতে লাগলো, পাহারার একটা লোকও যদি জেগে ওঠে তাহলে আর রক্ষা নেই। এমন সময় হঠাৎ তার চোখ পড়লো পাথরটার তলার দিকে। সে দেখলো, এক-টুকরো ছোট পাথর দিয়ে যেন বড় পাথর-টাকে ঠেকিয়ে রাখা হ'য়েছে—সে নীচু হয়ে বসে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলো। ঐ ছোট পাথরটুকুকে সরাতে পারলেই বড় পাথর সরানো সহজ হবে। ক'মিনিট সজোরে টানাটানি করার ফলে ঝিম্‌লি সেটাকে এক পাশ দিয়ে বার করে আনতে পারলো—তার সমস্ত অঙ্গ বয়ে ঘামের স্রোত বইছে যেন! পর-মুহূর্ত্তে সোৎসাহে প্রতাপকে বললো,—"আর একবার চেষ্টা করো। বড় পাথরটার তলার দিকে যে পাথরের ঠেকা ছিল, তুলে নিয়েছি। এখন লোহার ডাণ্ডা দিয়ে তোমার বাঁ-দিকটা জোরে ঠেলে দাও, আমি এ দিক থেকে টান্‌চি।"

দু'জনের সমবেত চেষ্টায় পাথর একটু একটু করে সরতে আরম্ভ করলো। আরো প্রায় পোনেরো মিনিটের চেষ্টায় এক জন মানুষ বেরুবার মতো ফাঁক হলো। সেই ফাঁকে প্রতাপ হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো, বেরিয়ে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো মুক্ত আকাশ-তলে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে। সামনেই মুক্তিদাত্রী ঝিম্‌লি শঙ্কাকুল ব্যথা-কাতর করুণ দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে! প্রতাপ স্থির করতে পারলো না, এই মুক্তিদাত্রীর কাছে আনত হয়ে সে তার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাবে, না তার দু'খানা হাত ধরে তাকে টেনে আনবে একেবারে নিজের বুকের উপর! সে নির্ব্বাক্ হয়ে শুধু তাকিয়ে রইলো অপলক দৃষ্টিতে ঝিম্‌লির সুন্দর মুখখানির দিকে। ভাবের এই বিহ্বলতা থেকে প্রতাপকে সচেতন করে ঝিম্‌লি বললো :—"এম্‌নি করে দাঁড়িয়ে থাকলে চল্‌বে না। পাহারার লোকেরা কখন জেগে ওঠে, ঠিক নেই। চলে এসো আমার সঙ্গে—কোন কথা না বলে।"

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রতাপের একখানা হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চললো গিরি-শঙ্কটের পথে।

নির্বিঘ্নে সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করে নীরবে খানিকটা পথ তারা এগিয়ে গেল। অবশেষে প্রতাপের মুখে কথা ফুটলো। সে বল্‌লো :—"ঝিম্‌লি, তুমি কে জানি না, তবে তুমি যে নাগাদের মেয়ে নও, আমার উপর তোমার এই দরদ দেখেই তা বুঝছি। কোন নাগা নিজের জীবন বিপন্ন

করে আমার উদ্ধারের চেষ্টা করতো না,—অনাহার-মৃত্যু থেকে আমায় বাঁচাবার জন্য খাবার পাঠিয়ে দিতো না! তোমার পাঠানো ফুলের মালা এই ভাখো আমি বুকে রেখেছি। আজ যদি মরে যাই, তবু শান্তি পাবো এটি নিয়ে। এত করে আমায় গুহা থেকে বার করে আন্‌লে—এর পর? কোথায় পালাই? কেমন করে পালাই? যেখানে যাই, তোমাকে এই অসভ্যদের কাছে কিছুতেই আমি রেখে যাবো না।"

প্রতাপ আবেগ-ভরে অনর্গল এমনি নানা কথা বলে যেতে লাগলো। ঝিম্‌লি চুপ করে শুনলো এবং অবশেষে একটা নিশ্বাস ফেলে বললো :—

"ঝিম্‌লির কথা ভুলে যাও,—সে পাহাড়ী মেয়ে পাহাড়েই থাকবে। ইচ্ছা থাকলেও সে যেতে পারবে না।"

—"কেন পারবে না? তুমি নিশ্চয় রাণীর কেনা-গোলাম নও!"

—"তা ঠিক জানি না, তবে জানি যে আমি চলে গেলে আমার জন্য রাণীমার প্রাণ যাবে। আর…"

ঝিম্‌লি হঠাৎ থেমে একেবারে থমকে দাঁড়ালো এবং পর-মুহূর্ত্তেই একান্ত ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বল্‌লো :—"সর্ব্বনাশ, সাম্‌নে কতগুলো লোক—এদিকে আসচে,—পালানো আর হলো না। হায় হায়, তোমায় বুঝি আর বাঁচাতে পারলুম না।"

প্রতাপের মনে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল ঝিম্‌লিকে জিজ্ঞেস্ করবে বলে, কিন্তু কথা বলার সুযোগ ঘট্‌লো না। পাহাড়ের একটা মোড় ঘুরে দশ-বারো জন নাগা তখনি এসে পড়লো একেবারে তাদের সাম্‌নে। পাহাড়ের ফাটলের পথ অতিক্রম করে প্রতাপ আর ঝিম্‌লি দু'শো গজের বেশী এগোয়নি, এমন সময় এই বাধা এমন আকস্মিক ভাবে! দুর্ভাগ্যক্রমে এরা ছিল সেনাপতি নান্দুর দলের ক'জন দুর্দ্ধর্ষ লোক এবং প্রতাপের বিচারের দিন দরবারে উপস্থিত ছিল বলে প্রতাপের চেহারা তাদের জানা ছিল। প্রতাপকে দেখতে পেয়েই তারা চীৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। ঝিম্‌লিকে পিছনে রেখে প্রতাপ কিছুক্ষণ তাদের বাধা দিল, কিন্তু এতগুলো লোকের সঙ্গে একা লড়াই করে তাদের হটানো সম্ভব হলো না। অল্প সময়ের মধ্যেই নাগারা প্রতাপকে বেঁধে ফেললো; ঝিম্‌লিকেও রেহাই দিল না। তার পর কিছুক্ষণ পরামর্শের পর বন্দী দু'জনকে নিয়ে তারা ফিরে চললো রাজ-বাড়ীর দিকে।

আঠারো

গভীর রাত্রে রাজা লি-ওয়াঙ্ আবার দরবার আহ্বান করলো। দরবারে এবার কি প্রচণ্ড উত্তেজনা! প্রতাপ এবং ঝিম্‌লি ছাড়া এবার আর এক জন নূতন আসামী আছে—রাণী জুমেলা স্বয়ং! এ দরবারে প্রতাপের উপর আর দয়া-মায়া নয়! সরাসরি বিচারে তার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হলো। ঝিম্‌লি এবং রাণী জুমেলাকে আপাততঃ রাজ-বাড়ীতে দু'টি আলাদা জায়গায় আটক করে রাখার ব্যবস্থা হলো,—এদের অপরাধের বিচার হবে পরে—আর এক দিন।

প্রতাপের পলায়নের চেষ্টায় রাজা খুব ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিলেও সে আদেশ পালন সম্পর্কে রাজার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি জেগে উঠলো। লি-ওয়াঙ্ বুঝেছিল, বৃটিশ-রাজের এক জন কর্ম্মচারীকে এ ভাবে হত্যা করলে একটা বড় রকমের বিভ্রাটের সৃষ্টি হবে! এমন ভাবে এ কাজ নিষ্পন্ন করতে হবে—যাতে নাগাদের উপর কোনো সন্দেহ না জাগে, অথচ শত্রু-নিপাতে বিঘ্ন না ঘটে! এ সম্বন্ধে যথোচিত আদেশ পেয়ে রক্ষীরা প্রতাপকে নিয়ে চলে গেল।

খবর চলে বাতাসের আগে আগে। নাগা বস্তিতেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। গুহা থেকে প্রতাপের পলায়ন এবং আবার গ্রেপ্তারের সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যেই বস্তিতে বস্তিতে ছড়িয়ে পড়লো। কুসুমিয়ার কাণেও এ খবর পৌঁছুতে দেরি হলো না। প্রতাপের জন্য এখন তার দারুণ দুশ্চিন্তা হলো। পলাতক বন্দীকে আবার গ্রেপ্তার করে এই নর-রাক্ষসরা কি তাঁকে আর জ্যান্ত রাখবে? কি করে প্রতাপ জিজ্ঞিন্-চুং পাহাড়ের নিভৃত গুহার প্রহরীদের চোখে ধূলো দিয়ে বেরুতে পেরে-ছিল এবং কি ভাবে আবার ধরা পড়লো, এ সব বিবরণ সে জানতে পারলো না। তার মন আরো খারাপ হলো ঝিম্‌লিকে দেখতে না পেয়ে।

কিন্তু এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকলে চল্‌বে না। প্রতাপ এখনো বেঁচে আছে কি না, থাকলে কোথায় তাকে আবার লুকিয়ে রাখা হলো, এ-সব খবর জানবার তার আর কোনো উপায় ছিল না। ঝিম্‌লির সঙ্গে একটি বার দেখা হলে হয়তো অনেক খবর জানা যেতো এবং সে একটা উপায় বলে দিতে পারতো।

কিন্তু ঝিম্‌লি গেল কোথায়? প্রতাপের উদ্ধারের জন্য ঝিম্‌লির যে রকম আগ্রহ দেখা গিয়েছিল, হঠাৎ সে সব একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল? ঝিম্‌লি কি আর বাইরে আসবার অনুমতি পাচ্ছে না? অসম্ভব নয়। কুসুমিয়ার মনে মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহ হলো না যে ঝিম্‌লি স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ বন্ধ করেছে। সে নিজেকে একান্ত অসহায় বোধ করলো, কিন্তু যে সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে প্রতাপের উদ্ধারের জন্য সকল প্রকার কষ্ট এবং বিপদ বরণ করে এই নর-রাক্ষসদের দেশে এসেছে, সে সংকল্পের দৃঢ়তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? বিপদ ঘনীভূত হয়ে

আসুচে দেখে তার সংকল্প আরো দৃঢ় হয়ে হৃদয়ে নূতন বল এবং সাহস এনে দিল।

প্রতাপের সন্ধানে সে একাই বেরুবার জন্য প্রস্তুত হলো। বেরুবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে মিতু-পিলাঙ্‌ খুব বিষণ্ণ মনে তাকে সংবাদ দিল, জংলি দারোগার সঙ্গে ঝিম্‌লিও ধরা পড়েছে এবং ঝিম্‌লিকে রাজবাড়ীতে না কি কয়েদ করে রেখেছে! এ সংবাদ দেবার সময় বৃদ্ধের দু'চোখ সজল হয়ে উঠেছিল। মিতু-পিলাঙ্‌ জংলি দারোগার সম্বন্ধে আর কোনো খবর দিতে পারলো না। ঝিম্‌লির কয়েদ হবার সংবাদে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে কুসুমিয়া বেরিয়ে পড়লো আরো সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টায়।

বাইরে এসে প্রথমেই সে ভাবলো ঝিম্‌লির কথা। সে ঠিক অনুমান করলো, ঝিম্‌লিই প্রতাপকে গুহা থেকে উদ্ধারের সহায়তা করে থাকবে! কিন্তু এ কাজে সে কুসুমিয়ার সাহায্য নিল না কেন? এমন কি, তাকে একটু খবরও দিল না কেন? ঝিম্‌লির কাছে সে এ রকমটা প্রত্যাশা করেনি। আবার ভাবলো, ঝিম্‌লি হয়তো এমন অবস্থায় প্রতাপের উদ্ধারের চেষ্টায় বেরিয়েছিল, যখন কুসুমিয়াকে সংবাদ দেবার সময় বা সুবিধা মেলেনি—এ ব্যাপারে ঝিম্‌লির উপর তার কোনো রকম বিরাগ জাগলো না, বরং তার মন বিমর্ষ হলো এই ভেবে যে, প্রতাপের উদ্ধারের চেষ্টায় নিজেকে বিপন্ন করবার গৌরব একমাত্র ঝিম্‌লিরই রইলো! কিন্তু তখনই আবার ঝিম্‌লির কঠোর পরিণামের আশঙ্কায় চিন্তাকুল হলো। নাগারা তার এ রকম গুরু অপরাধ কখনো ক্ষমা করবে না, নিশ্চয় তার কঠিন মৃত্যুর ব্যবস্থা করবে,—হয়তো প্রতাপ আর ঝিম্‌লি দু'জনকে একসঙ্গে হত্যা করবে কিংবা ক'রে ফেলেছে! কুসুমিয়া পাগলের মতো যে দিকে দু'চোখ যায়, সেই দিকে চললো। মনে মনে সংকল্প করলো, কাউকে আর কিছু জিজ্ঞেস্‌ ক'রবে না, নাগা-রাজ্যের সর্ব্বত্র সে ঘুরে দেখবে, ওদের দু'জনের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় কি না।

সারা দিন ঘুরে কোন সংবাদই সে সংগ্রহ করতে পারলো না, তবে এটুকু বুঝতে পারলো, সমস্ত নাগা সম্প্রদায়ের লোক যেন হঠাৎ খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তবে কি বৃটিশ-রাজ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এদিকে আসবার উদ্যোগ করেছে? কুসুমিয়া কিছুই বুঝতে না পেরে ইংরেজ সৈন্যদের যে পথে আসবার সম্ভাবনা, সেই পথের দিকে চললো। বনের পথে যদি কোনো নাগা সৈন্যের সঙ্গে দেখা হয়—কৌশলে তার কাছ থেকে কোনো সংবাদ বের করা যায় এই ভরসায়।

বৈকালে সে এসে পৌঁছুলো এক নাগা-বস্তির কাছে। বস্তির মধ্যে না গিয়ে সে বনে লুকিয়ে রইলো, কিছুক্ষণ পরেই দেখলো, বস্তির পুরুষরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দক্ষিণ-মুখে রওনা হয়ে গেল। কি উদ্দেশ্যে কোথায় গেল, তা সে জানতে বা বুঝতে পারলো না। বন থেকে বেরিয়ে খুব সন্তর্পণে সে বস্তির দিকে চললো। সামনে একখানি সুন্দর ঘর। ঐ ঘরের দিকে তাকালো,—যা দেখলো, তাতে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল! কুসুমিয়া আশা করেছিল, কোনো নাগা মেয়ে বা শিশুদের দেখতে পাবে ঐ ঘরে—কিন্তু তার চোখে পড়লো মালার আকারে ঝুলোনো শতাধিক নর-মুণ্ড! তাদের কোনো কোনোটায় আবার বন-মহিষের শিং বসানো! এই বিভীষিকা দেখে সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল—এক পা আর এগোতে চাইলো না, রোমাঞ্চিত দেহে সেইখানেই বসে পড়লো। এতগুলো নর-মুণ্ড নিয়ে ঐ ঘরে যে ব্যক্তি বাস করতে পারে, সে রাক্ষস না হয়ে পারে না,—কুসুমিয়ার মনে ঐ রকমই একটা ভয়ানক ধারণা হলো। সে জানতো না, এ ঘরটা ছিল এই নাগা-বস্তির অবিবাহিত যুবকদের সাধারণ গৃহ (Bachelors' Hall)—যুবকরা এই ঘরটিকে সাজিয়ে রাখতো তাদের প্রত্যেকের বীরত্বের নিদর্শন নর-মুণ্ড দিয়ে এবং এই ঘরেই এ-সব নিদর্শন দেখে নাগা-যুবতীরা মনোনয়ন করতো তাদের যোগ্য প্রণয়ীকে।

বস্তিতে কুসুমিয়ার আর যাওয়া হলো না। নাগা পুরুষরা যে দিকে গেছে, সে দিকেও গেল না,—সে চললো এবার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে।

অপরাহ্নের সূর্য্য তখনও অস্তমিত হয়নি। পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তখনও দিনান্তের শেষ রশ্মির লুকোচুরি খেলা চলেছে। চলতে চলতে কুসুমিয়ার হঠাৎ নজর পড়লো একটা উঁচু জায়গায়, সেখানে নাগা-রাজার মতো এক জন লোক দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হলো। ওখানে রাজা একা কি করছে? তার কেমন সন্দেহ হলো। যতটা সম্ভব গা-ঢাকা দিয়ে সে সেই দিকে এগুতে লাগলো। দাঁড়ানো লোকটার দেহের শুধু উপরের অংশ সে দেখতে পাচ্ছিল এবং তার মনে হচ্ছিল লোকটা যেন একখানা বড় পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে কি দেখছে। পাহাড়টা শিলাময়—চারি দিকে ছোট-বড় পাথর ছড়ানো। কুসুমিয়া ঐ সব পাথরের আড়ালে নিঃশব্দে এগিয়ে মূর্ত্তির প্রায় কাছাকাছি এলো। তখন আড়াল থেকে নিবিষ্ট ভাবে ঐ লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বিস্ময় বোধ করলো নাগা-রাজার এমন উন্নত নাসিকা সুঠাম মুখাবয়ব দেখে! রাজার পোষাক-পরা এ লোকটা তবে রাজা নয়,—আর কেউ? তাই তো! এ যে ফরেষ্টার প্রতাপসিংহ নাগা-রাজার বেশে দাঁড়িয়ে! আশ্চর্য্য! কুসুমিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁকে চিনতে পারেনি। সে তখন বড় রুক্ষ পাথরের উপর দিয়ে দ্রুত লাফিয়ে

লাফিয়ে চলে মূর্ত্তির একেবারে সাম্‌নে এসে হাজির হলো।

নাগা-পোষাকে কুসুমিয়াকে এই দুর্গম স্থানে এমন আকস্মিক ভাবে দেখে প্রতাপ প্রথমে তাকে চিন্‌তে পারলো না—শুধু তার দিকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইলো। কুসুমিয়া ব্যস্ত ভাবে বলে উঠলো:—"এই বিশ্রী পোষাকে আপনাকে প্রথমে চিনতে পারিনি! ভগবান আছেন! নাহলে এত খোঁজার পর আপনার সন্ধান পেতুম না।"

সূর্য্যোদয়ে কুয়াশা যেমন মিলিয়ে যায়, কুসুমিয়ার কণ্ঠস্বর তেমনি মিশিয়ে গেল! প্রতাপের ছদ্ম-পোষাকের আবরণ মুহূর্ত্তে উন্মোচন করে দিল। বিস্ময়ে ভয়ে প্রতাপ বলে উঠলো—"কুসুমিয়া, তুমি এখানে! এই ভীষণ শত্রু-পুরীতে? কি ভয়ানক দুঃসাহস তোমার। পালাও এখান থেকে, এখনি পালাও, এক মুহূর্ত্ত দেরি করো না।"

—"যদি পালাই আপনাকে সঙ্গে নিয়ে পালাবো,—ফেলে নয়। কিন্তু আপনি এখানে এ রকম একলা দাঁড়িয়ে কি করছেন?"

—"কি করছি? বৃটিশ সৈন্যের গুলীতে মরবার জন্য নাগাদের রাজা সেজে গুলীর প্রতীক্ষা করছি। একবার পিছনে এসে ছাখো, আমি কি ভাবে দাঁড়িয়ে আছি।"

প্রতাপের দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে যে কিছু রহস্য আছে, কুসুমিয়া তা সন্দেহ করতে পারেনি। সে তাড়াতাড়ি সাম্‌নের বড় পাথরখানা পরিক্রমণ করে পিছনের দিকে গিয়ে দেখলো, প্রতাপকে একটা মজবুত খুঁটির সঙ্গে খাড়া ভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে, তার হাত দু'টোও পিছনের দিকে বাঁধা। এই অবস্থায় সে-যে একটু নড়া-চড়া করবে, তারো জো ছিল না!

কুসুমিয়া তখনই তার ছোরা বার করে বাঁধনগুলো কেটে প্রতাপকে মুক্ত করলো। মুক্ত হয়ে প্রতাপ বল্‌লো,—"তোমার চেষ্টায় মুক্ত হলাম বটে কুসুমিয়া, কিন্তু এ দেশ থেকে কি পালানো যাবে? চারি দিকে শত্রু। ওদের চোখ এড়ানো অসম্ভব! পালাতে গেলেই আবার ধরা পড়ে চরম নির্য্যাতন ভোগ করতে হবে। এ মুক্তি—মুক্তি নয়।"

—"এ দেশের ঘন জঙ্গলই আমাদের আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করবে—আপনার জন্য সাধারণ নাগা-পোষাক এনে দেবো,—কোনো অসুবিধা হবে না।"

—"তুমি আমার জন্য যা করলে, তার তুলনা নেই। তুমি যে কি কঠোর সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছ, তা বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু তুমি জানো না, এ দেশের লোক কত নৃশংস। এখনো সময় আছে কুসুমিয়া, তোমার এই ছদ্ম-বেশে তুমি হয়তো নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু আমি সঙ্গে থাকলে তুমিও বিপন্ন হবে।"

কুসুমিয়া কাতর অথচ সুদৃঢ় কণ্ঠে বললো:—"আপনাকে ফেলে যাবার জন্য যে আমি আসিনি, তা অবশ্য বুঝতে পাচ্ছেন। আর বিপদের কথা যা বলুচেন সে বিপদ বরণ করেই তো আমি বেরিয়েছি। আবার যদি বিপদ আসে, আপনার সঙ্গেই সে বিপদ ভোগ করবো।"

—"এ তোমার মনের কথা হতে পারে কিন্তু সুবুদ্ধির কথা নয়।"

—"মনের দাবীর কাছে আর সব তুচ্ছ নয়?"

—"এ নিয়ে তর্ক করার সময় নেই। আমি অনুনয় করে আবার বল্‌চি কুসুমিয়া, লক্ষ্মীটি, যদি একান্ত একলা পালাতে না চাও, অন্ততঃ আমার সঙ্গ এবং সংস্পর্শ ছেড়ে আড়ালে থেকে বরং আমার অনুসরণ করো। আমি চেষ্টা করবো যাতে চট্‌ করে বৃটিশ পুলিশ বা সৈন্যদের আশ্রয়ে যেতে পারি।"

—"সে এখনো দূরে—তার আগে এখান থেকে নির্ব্বিঘ্নে সরে পড়া চাই। আপাততঃ চলুন একসঙ্গে বেরুই।"

এর উপর আর কথা বলা চললো না। কুসুমিয়া যে অনুরাগ-বশে জীবন পণ করে প্রতাপের জন্য এমন সঙ্কটাপন্ন অভিযানে বেরিয়েচে, তার গভীরতার কথা ভেবে প্রতাপ অভিভূত হলো। তার দুঃখ বোধ হ'তে লাগলো সে কুসুমিয়াকে কখনো অনুরাগের চোখে দেখেনি। প্রতাপের হৃদয় অধিকার করে বসেছে ঝিম্‌লি—রহস্যময়ী ঝিম্‌লি! যার প্রকৃত পরিচয় সে জানে না। ঝিম্‌লির জীবনের রহস্যময় আবেষ্টন যেন প্রতাপকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আজ জীবন-মরণের সন্ধি-ক্ষণে এ সব চিন্তার অবকাশ না থাকলেও কুসুমিয়ার এই অভাবনীয় আবির্ভাবে প্রতাপের মনে জেগে উঠেছিল ঝিম্‌লির কথা।

নাগারা প্রতাপকে সেখানে যে ভাবে শক্ত করে বেঁধে রেখে গিয়েছিল, সে অবস্থায় তার পালাবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং তার উপর পাহারা রাখার প্রয়োজনও হয়নি। তারা জান্‌তো, নাগাদের প্রধান আড্ডা আক্রমণ করতে হলে বৃটিশ সৈন্যদের আসতে হবে এই পথে এবং এসে যখন দূর থেকে তারা দেখবে পাহাড়ের চূড়ায় নাগা-রাজা দাঁড়িয়ে আছে, তখন তার উপর গুলী চালাতে তারা মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবে না। সুতরাং নাগা-রাজার বেশে প্রতাপ বৃটিশের গুলীতেই মারা যাবে। বৃটিশ বাহিনী পাহাড়ের পথে যে এই দিকেই এগিয়ে আস্‌বে চরের মুখে এ সংবাদ রাজার কাছে আগেই পৌঁছেছিল। সে সংবাদ পাওয়ার ফলেই নাগা-কুকিদের সব সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধের আয়োজন চলছিল। প্রতাপের উপর এখানে কোনো পাহারার

ব্যবস্থা থাকলে কুসুমিয়ার সাধ্য ছিল না সেখান থেকে তাকে মুক্ত করে।

পালাবার প্রথমেই প্রতাপের সাজানো রাজ-বেশের অদ্ভুত আভরণগুলো একটি একটি করে খুলে রাখা হলো,—তার পরিধানে রইলো শুধু নিজের পরিচ্ছদের যেটুকু দেহের নিম্নার্দ্ধমাত্র আবৃত করে, সেইটুকু। সুতরাং প্রায় সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহেই তাকে এখন বেরুতে হলো পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথ ধরে। প্রাণের ভয়ে বনের ভিতর দিয়ে দু'জনে ছুটতে আরম্ভ করলো নাগা-বস্তির বিপরীত দিকে।

প্রায় দু'ক্রোশ পথ চলে প্রতাপ অবসন্ন দেহে বসে পড়লো—দু'দিনের অনাহারে তার দেহে আর শক্তি ছিল না। কুসুমিয়া এতক্ষণ এ কথা একবারও ভেবে দেখেনি, তাই ব্যথিত চিত্তে কাতর কণ্ঠে প্রতাপকে বললো,—"আমার খুব অন্যায় হয়েছে, আপনার আহারের ব্যবস্থা না করে। আমার এই ঝুড়িতে সামান্য কিছু খাবার আছে, আপাততঃ এই দিয়ে কোনো রকমে ক্ষুধা নিবৃত্তি করুন। ঝরণা থেকে আমি জল এনে দিচ্ছি।"

একটা দেবদারু গাছের তলায় বসে দু'জনে কিছু খেয়ে নিল। খাবার সময় প্রতাপের আবার মনে পড়লো ঝিম্‌লির কথা। পাহাড়ের গুহায় কয়েদ থাকার সময় ঝিম্‌লিই তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল উক্কুর হাতে আহার পাঠিয়ে। আজ তার প্রাণরক্ষা করলো কুসুমিয়া শুধু আহার জুগিয়ে নয়, মরণ-বন্ধন থেকে মুক্ত করে। ঝিম্‌লিও তাকে গুহা থেকে উদ্ধার করেছিল,—নান্দুর আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিল। সব কথাই তার মনে পড়লো।

কিন্তু ঝিম্‌লি কোথায়? তার কি হলো? সে কি বেঁচে আছে? প্রতাপের পলায়নে সে সাহায্য করেছিল —তাকে কি নাগারা কখনো ক্ষমা করবে? প্রতাপ মনে মনে নিজেকে সহস্র বার ধিক্কার দিতে লাগলো। তার সংস্পর্শে এসে ঝিম্‌লি আর কুসুমিয়া দু'জনের জীবনই ধ্বংসের পথে এসেছে! কি দুর্ভাগ্য তার!

কিন্তু স্থির ভাবে চিন্তা করার সময় নেই, এখনি আবার ছুটে পালাতে হবে। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য না হোক, —কুসুমিয়াকে বাঁচাবার জন্য! কিন্তু ঝিম্‌লিকে বাঁচাবার জন্য সে কিছু করতে পারে না। এর চেয়ে লজ্জার ব্যাপার আর কি আছে? ঝিম্‌লিকে বন্দী করে রাখার পরে তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হয়েছে সে খবরও সে নিতে পারলো না। ঘটনা-স্রোত প্রবল বেগে প্রতাপকে ঠেলে নিয়ে চল্‌লো তার অব্যাহত গতি-মুখে!

অজানা পাহাড় প্রদেশের অচেনা বনের ভিতর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব বল্‌লেও হয়। বিশেষ যেখানে পাহাড়ীদের চোখ এড়িয়ে চল্‌তে হবে! দু'ঘণ্টায় তারা চার মাইলের বেশি এগোতে পারলো না। কোনো দিক্ থেকে কোনো রকম সন্দেহজনক শব্দ শুনলে সভয়ে তাড়াতাড়ি তারা আশ্রয় নিয়েছে গভীর বনের ভিতরে, কিন্তু যে পাহাড়-অঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্র দিন-রাত সতর্ক পাহারা চল্‌ছে, সেই পাহাড়ের বুকের উপর দিয়ে দু'টি লোকের পালিয়ে যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। আর খানিক দূর যাবার পরই তারা পড়লো একেবারে একদল নাগা সৈন্যের প্রায় মুঠোর মধ্যে!

কুসুমিয়া প্রথমে ঠিক করেছিল, প্রতাপকে কোনো নিরাপদ স্থানে ঘণ্টা কয়েকের জন্য রেখে সে মিতু-পিলাঙের বাড়ী থেকে একটা পুরানো নাগা-পোষাক নিয়ে আসবে প্রতাপের জন্য, কিন্তু প্রতাপকে মুহূর্ত্তের জন্য চোখের আড়াল করতে শেষে তার সাহস হলো না।

প্রতাপ আবার বন্দী হলো। কুসুমিয়াকেও ছেড়ে দেওয়া হলো না। সৈন্যেরা বন্দী দু'জনকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো আবার রাজার কাছে। প্রতাপকে আবার বন্দী অবস্থায় আনীত দেখে রাজার ক্রোধ চরমে উঠলো। তখনই দামামা বাজিয়ে দরবার ডাকা হলো।

দামামার গুরু-গম্ভীর ধ্বনি শুনে দরবারের সদস্যেরা যে যেখানে ছিল ছুটে এলো রাজ-বাড়ীর সুমুখের ময়দানে। মুহূর্ত্তে সেখানে তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হলো, কিন্তু লি-ওয়াঙের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই সব গোলমাল গেল থেমে।

নাগা-সৈন্যদের নেতা প্রথমেই বর্ণনা করে বললো, কোথায় কি অবস্থায় জংলি পুলিশ এবং তার সঙ্গের এই মেয়েটাকে পাওয়া গেছে। কুসুমিয়াকে কেউ চিনতে পারলো না। সে যে নাগা-সম্প্রদায়ের মেয়ে, এ সম্বন্ধেও সকলের যথেষ্ট সন্দেহ হলো। এই মেয়েটার সাহায্যেই যে প্রতাপ মুক্তিলাভ করেছে তা বুঝতে পেরে সকলের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পড়লো কুসুমিয়ার উপর। প্রতাপের এটা হলো দ্বিতীয় বার পলায়নের চেষ্টা! সুতরাং তার জন্য কঠিনতর শাস্তি কঠিন ভাবে প্রয়োগ করতে হবে—এই হলো দরবারের অভিমত। দু'জনের প্রতি প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হলো এবং দু'জনেরই প্রাণ নিতে হবে জীবন্ত অবস্থায় ফুটন্ত জলে নিক্ষেপ করে। প্রতাপের সম্বন্ধে আর একটা আদেশ হলো এই:—ফুটন্ত জলে নিক্ষেপ করবার আগে প্রতাপের হাত-পা বেঁধে তার পিঠে এক-কুড়ি বেত্রাঘাত হবে।

উচ্চ চীৎকারে আনন্দ-ধ্বনি তুলে দরবারের সদস্যবর্গ এবং সমবেত জন-মণ্ডলী রাজার এই আদেশের সমর্থন এবং অনুমোদন জানাল। (ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন সেন

ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থরচনার কৌশল

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

২) অধিকরণের দ্বিতীয় অবয়ব "বিষয়ের" পরিচয়

অধিকরণের দ্বিতীয় অবয়ব বিষয় বলিতে বিচার্য্য শ্রুতিবাক্য, বা শ্রুত্যুক্ত বিষয়বিশেষ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে যে শ্রুতিসঙ্গতির কথা বলা হইয়াছে, তাহার অনুরোধে প্রত্যেক অধিকরণের বিষয়বাক্য —কোন শ্রুতিবাক্য বা শ্রুত্যুক্ত বিষয়-বিশেষই হইয়া থাকে। যেহেতু, এই ব্রহ্মসূত্ররচনার একটি উদ্দেশ্য—শ্রুতিবাক্যের মীমাংসার দ্বারা দার্শনিক তত্ত্বসমুদায়ের নির্ণয় করা। এই কারণে ইহার প্রত্যেক অধিকরণে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যেরই মীমাংসা থাকে। আর তাহার ফলে জীব-জগৎ, ঈশ্বর, মুক্তি ও তাহার সাধন প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়ের নির্ণয় করা হয়। অন্যান্য দর্শনে যেমন স্বাধীন ভাবে যুক্তিতর্ক ও অনুভব প্রভৃতির সাহায্যে দার্শনিক বিষয়ের মীমাংসা থাকে, এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে সেরূপ করা হয় না, যুক্তিতর্ক এবং অনুভব প্রভৃতিকে শ্রুতিসিদ্ধান্তের অনুকূল করা হয়। শ্রুতিবিরুদ্ধ যুক্তি-তর্ক ও অনুভবের স্থান ইহাতে নাই। এমন কি, যুক্তি-তর্ক অনুভবকে শ্রুতিপ্রমাণের সমান আসনও দেওয়া হয় না। শ্রুতি-প্রমাণের স্থান বেদান্তমতে সকলের উপরে। তদ্রূপ লৌকিক বিষয়ে শ্রুতিকে প্রমাণই বলা হয় না, উহাকে তখন অনুবাদকের মধ্যে গণ্য করা হয় অবশ্য শ্রুতিবাক্যের অর্থনির্ণয় করিবার জন্য যুক্তি-তর্ক ও অনুভবের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় বটে, কিন্তু সেই যুক্তি-তর্ককে লোক এবং বেদসাধারণ ভাবেই গ্রহণ করা হয়। তাহাও বেদ-নিরপেক্ষ ভাবে গৃহীত হয় না।

এই কারণে এই ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণেই শ্রুতিবাক্য বা শ্রুত্যুক্ত বিষয়-বিশেষকেই "বিষয়বাক্য"রূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যেমন প্রথম অধিকরণের বিষয় সমগ্র বেদান্ত অথবা "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্য, দ্বিতীয় অধিকরণের বিষয়বাক্য "যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম" এই তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাক্য। এরূপ তৃতীয় অধিকরণের বিষয়বাক্য "অস্য মহতঃ ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ এব এতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ" এই বৃহদারণ্যক উপনিষদের বাক্য। তদ্রূপ চতুর্থ অধিকরণের বিষয় সমগ্র বেদান্ত, কোন বাক্য-বিশেষ নহে। এইরূপ সমগ্র প্রথমাধ্যায়ে কোন শ্রুতিবাক্য বা সমগ্র বেদান্তই বিষয় হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদে সর্ব্বত্র প্রথম অধ্যায়ের সমন্বয়টি বিষয়।

" " দ্বিতীয় " সাংখ্য, কাণাদ, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তটি বিষয়।

" " তৃতীয় " জগৎ ও জীববিষয়ক শ্রুতিবাক্যাবলী বিষয়।

" " চতুর্থ " করণ-বিষয়ক শ্রুতিবাক্যাবলী বিষয়।

তৃতীয় " সাধনবিষয়কশ্রুতি বাক্যাবলী বিষয়।

চতুর্থ " সাধনের ফলবিষয়ক শ্রুতিবাক্যাবলী বিষয়।

শ্রুতি-সঙ্গতিতে সংশয় ও সমাধান

কিন্তু এই কথায় একটি সংশয় হয় যে, যখন এই গ্রন্থের "অবিরোধ" নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরমত খণ্ডন নামক দ্বিতীয় পাদে, যেখানে সাংখ্যমত, যোগমত, বৈশেষিকমত, বৌদ্ধমত, জৈনমত, শৈবমত ও পাঞ্চরাত্রমত বা ভাগবতমত এই আটটি মতের যুক্তি-তর্ক ও অনুভবের খণ্ডন করিয়া বেদান্তমতের সহিত তাহাদের অবিরোধ প্রদর্শন করা হইয়াছে, সেখানে ত কোন ভাষ্যমধ্যে কোনও অধিকরণের বিষয়রূপে কোনও শ্রুতিবাক্যাদি প্রদর্শিত হয় নাই, যেমন প্রথম অধিকরণে সাংখ্যমত খণ্ডনকালে সাংখ্যসিদ্ধান্তকেই বিষয় বলা হইয়াছে, বৈশেষিকমত খণ্ডনকালে বৈশেষিক সিদ্ধান্তকেই বিষয় বলা হইয়াছে, এইরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে আটটি অধিকরণে সাংখ্যাদি আটটি মতবাদকেই বিষয় বলা হইয়াছে, কোন শ্রুতি-বাক্যকে বিষয়রূপে প্রদর্শন করা হয় নাই। সুতরাং এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র শ্রুতি-মীমাংসামুখে দার্শনিকতত্ত্বের নির্ণয় করা—এ কথা বলা যায় কি করিয়া? আর তজ্জন্য ইহার সর্ব্বত্র শ্রুতিসঙ্গতি আছে, ইহা বলা সঙ্গত হয় কি করিয়া?

এতদুত্তরে বলা হয় যে, উক্ত আটটি খণ্ডিত মতই বেদমূলক মত। উহাদের মূল বেদমধ্যেই আছে; তবে পূর্ব্বপক্ষরূপেই আছে। সিদ্ধান্ত-মতকে পুষ্ট করিবার জন্যই পূর্ব্বপক্ষরূপে উহাদিগকে বেদমধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। এজন্য এস্থলে শ্রুতিসঙ্গতি আছে শ্রুতি-সঙ্গতির লঙ্ঘন করা হয় নাই। চার্ব্বাকাদি অন্য যে সব মত খণ্ডিত হয় নাই, তাহারাও বেদমূলক মত, তবে তাহারা ব্যাসদেবের সময়েই বেদবিরোধী বেদনিন্দক মতবাদে পরিণত হওয়ায় তাহারা এস্থলে খণ্ডিত হয় নাই। বৌদ্ধজৈন-মত ব্রহ্মসূত্ররচনাকালে বেদনিন্দক মতে পরিণত হয় নাই বলিয়া তাহারা খণ্ডিত হইয়াছে। ইহাই এই স্থলে বিশেষ। ভাষ্যমধ্যে উক্ত আটটি মতের মূল শ্রুতি প্রদর্শিত না হইলেও উহা আবিষ্কার করিতে কষ্ট হয় না। ভাষ্যকারগণের এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিতই আছে। এই ইঙ্গিত অন্য প্রসঙ্গ হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। বস্তুতঃ, সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, পঞ্চদশী, বেদান্তসার প্রভৃতি গ্রন্থে চার্ব্বাকাদি বহু অবৈদিক বা বেদনিন্দক মতবাদের মূল শ্রুতিও প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদের খণ্ডন করা হইয়াছে। যেমন পুত্রই আত্মা এই মতবাদী অতিপ্রাকৃত মতের মূলশ্রুতি "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" বলা হয়। দেহাত্মবাদী চার্ব্বাক মতের মূলশ্রুতি "স বা পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ"। এজন্য তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।১।১ বাক্য দ্রষ্টব্য। ইন্দ্রিয়াত্মবাদী চার্ব্বাকমতের মূল শ্রুতি "তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরম্ এত্য উচুঃ' (ছা উঃ ৫।১।৭), প্রাণাত্ম-বাদী চার্ব্বাক মতের মূল শ্রুতিঃ "অন্য অন্তরঃ আত্মা প্রাণময়ঃ" (তৈঃ উঃ ২।২।১), মন আত্মবাদী চার্ব্বাক মতের মূল শ্রুতি "অন্য অন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ" (তৈঃ উঃ ২।৩।১), বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতের মূল শ্রুতি "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" (তৈ উঃ ২।৪।১), শূন্যবাদী বৌদ্ধমতের মূল শ্রুতি "অসৎ এব ইদম্

অগ্রে আসীৎ" (ছাঃ উঃ ৬।২।১)। এইরূপ অন্যান্য মতবাদেরও মূল শ্রুতি ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে যে কোন ব্যক্তি আবিষ্কার করিতে পারেন। সুতরাং ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য যে শ্রুতিমীমাংসা-মুখে দার্শনিকতত্ত্বের নির্ণয় করা, অর্থাৎ উহার প্রত্যেক অধিকরণের বিষয়বাক্য যে শ্রুতিবাক্য বা শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বিষয়-বিশেষ, তাহাতে কোনও সন্দেহই হয় না; আর তজ্জন্য ব্রহ্মসূত্রের কোনও অধিকরণে শ্রুতিসঙ্গতির অভাব নাই।

শ্রুতি সাহায্যে দার্শনিকতত্ত্ব নির্ণয়ে শঙ্কা ও সমাধান

যদি বলা হয়—দার্শনিক তত্ত্বের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইলে কেবল উক্ত সাংখ্যাদি আটটি মতবাদের খণ্ডন করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন করিলেই ত হইতে পারে না, অপর যাবতীয় দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা করা আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহা ত ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থমধ্যে সূত্রকার ভগবান্ ব্যাসদেব করেন নাই। অতএব এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য—শ্রুতি-মীমাংসামুখে দার্শনিকতত্ত্ব নির্ণয় করা—ইহা কি করিয়া বলা যায়?

এতদুত্তরে বলা যায় যে, এই গ্রন্থে উক্ত আটটি মতের বিচার করিলেও শিষ্টের অপরিগৃহীত অর্থাৎ অবৈদিক যাবতীয় মতকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এজন্য মহর্ষি সূত্রকার ব্যাসদেব দুইটি পৃথক্ সূত্রই রচনা করিয়াছেন। সেই সূত্র দুইটি যথা—"এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা: ব্যাখ্যাতা:" (১।৪।১৮) এবং "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতা:" (২।১।১২) অর্থাৎ এই সাংখ্যমত খণ্ডন দ্বারা অন্যমতও খণ্ডিত হইল, এবং এতদ্দ্বারা শিষ্টের অপরিগৃহীত অন্য মতও খণ্ডিত হইল, ইত্যাদি। ইহার কারণ, যাবতীয় দার্শনিক মতবাদের বীজ বেদমধ্যেই আছে। বেদই সকল মতবাদের আকর বা মূলপ্রস্রবণ। অধিক কি, বর্ণাত্মক ভাষার এবং সকল প্রকার লোকব্যবহারও বিনির্গত হইয়াছে। এই কথা ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম-সূত্র ১।৩।২৮ সূত্রের ভাষ্যে শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণের দ্বারা প্রতি-পাদিত করিয়াছেন। অতএব শ্রুতি-মীমাংসামুখে দার্শনিকতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া এই বেদান্তসূত্র গ্রন্থে লৌকিক অলৌকিক সকল তত্ত্বের মীমাংসা করা হইয়াছে। শ্রুতিমীমাংসামুখে এ কার্য্য না করিলে এই সকল তত্ত্বের মীমাংসা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইত না।

বৌদ্ধ-জৈনমত খণ্ডনের আবশ্যকতা

কিন্তু তাহা হইলেও এ কথায় আর একটি অসামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। সেটি এই যে, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি মতখণ্ডনের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈনমত খণ্ডন করা হইল কেন? সাংখ্য এবং যোগাদি মতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনমতে তাহা স্বীকার করা হয় না, কিন্তু চার্বাক মতে যেরূপ বেদের নিন্দা দেখা যায়, সেইরূপ বেদনিন্দাও এই বৌদ্ধ জৈনমতে দেখা যায়। চার্বাকাদির মত শিষ্টের অপরিগৃহীত বলিয়া যদি বিশেষ ভাবে খণ্ডনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধ জৈনমতকে সেইরূপ খণ্ডনের অযোগ্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের বিশেষ ভাবে খণ্ডন না করিলেই ত সঙ্গত হইত?

এতদুত্তরে বলা যায় যে, বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রাচীন ও নবীন ভেদে দুইরূপ দেখা যায়। এই কথা বৈদিক শাস্ত্রমধ্যে এবং বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রমধ্যেই উক্ত আছে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন-মতে বেদের প্রামাণ্য অস্বীকৃত হইত না। কিন্তু নবীন বৌদ্ধ ও জৈন-মতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, অধিকন্তু নিন্দাই করা হইয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনমতে বেদনিন্দা নাই বলিয়া উহারা সাংখ্য ও যোগাদিমতের সমকক্ষ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, এই কারণেই সাংখ্যাদি মতের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈনমতের খণ্ডন সূত্রমধ্যে দেখা যায়। চার্বাকাদি মত কিন্তু সম্পূর্ণ বেদবিরোধী। বেদমূলক মত বলিয়া আর তজ্জন্য নিতান্ত অশিষ্টমত বলিয়া বিশেষ ভাবে সূত্রমধ্যে সাংখ্যাদি মতের ন্যায় বা বৌদ্ধ-জৈনাদি মতের ন্যায় খণ্ডিত হয় নাই। চার্বাকাদির মত বৌদ্ধ-জৈনাদি মত অপেক্ষা নিন্দিত মত। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন, নবীন বিভাগ দ্বারাও বেদবিরোধিতার তারতম্য নাই।

যদি বলা হয়, ভাষ্যমধ্যে বৌদ্ধ ও জৈনমত বিবৃত করিবার জন্য নবীন বৌদ্ধ ও জৈন আচার্য্যগণের বাক্যাদি তবে কেন গৃহীত হইয়াছে? যেমন বৌদ্ধমতের পরিষ্কার করিবার জন্য খৃষ্টীয় ৫ম ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দিঙ্ নাগ ধর্ম্মকীর্ত্তি বসুবন্ধু প্রভৃতি নবীন বৌদ্ধাচার্য্যের বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। জৈনমতের পরিষ্কার করিবার জন্য সমন্ত ভদ্র আচার্য্যেরও বাক্য ভামতী মধ্যে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অতএব ভাষ্যমধ্যে নবীন প্রাচীন বৌদ্ধ জৈনমতের মধ্যে কোন ভেদজ্ঞান করা হয় নাই বলিতে হইবে। আর তজ্জন্য বৌদ্ধ ও জৈনমতের প্রাচীন নবীন বিভাগ করিয়া প্রাচীন বৌদ্ধ জৈনমতকে সাংখ্যাদি বেদমূলক অবৈদিক মতের সমকক্ষ বলা সঙ্গত হয় না? ইত্যাদি।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন মত-মূলকই নবীন মত হয় বলিয়া প্রাচীন মতেরই পরিষ্কার করিবার জন্যই ভাষ্যাদিমধ্যে নবীন বৌদ্ধ জৈন আচার্য্যের বাক্যাদি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। নবীন প্রাচীন ভেদ নাই বলিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে—এরূপ নহে। নবীন বৌদ্ধ জৈনমতে বেদনিন্দা থাকিলেও প্রাচীন বৌদ্ধ জৈনমতে বেদনিন্দা নাই—এজন্য তাহাদিগকে সাংখ্যাদি মতবাদের সমকক্ষ জ্ঞান করিতে কোন বাধা হয় না।

বৌদ্ধ জৈনাদিমতের প্রাচীন নবীন ভেদ

যদি বলা হয়, বৌদ্ধ ও জৈনমতে যে প্রাচীন নবীন ভেদ আছে, তাহার নিদর্শন কোথায়? কিরূপ প্রমাণে এই কথা বলিতে পারা যায়?

এতদুত্তরে বলা যায় যে, বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থমধ্যে এবং বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রগ্রন্থমধ্যে উভয় স্থলেই এই নবীন প্রাচীন ভেদের নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা—

বৈদিক গ্রন্থে বৌদ্ধজৈনমতের নবীনপ্রাচীনভেদ

বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থমধ্যে বলা হইয়াছে—আদি বুদ্ধ, বিষ্ণুর শরীর হইতে উৎপন্ন পুরুষবিশেষ। তাঁহার নাম "মায়ামোহ"। একথা বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশে বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ভগবানের কীকট দেশে (গয়ার নীকটবর্ত্তী দেশে) বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইবার কথা আছে। এই দুইটি কথা হইতে বুদ্ধ এক জন নহেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। জয়দেব-কৃত ভগবানের দশ অবতারের প্রসিদ্ধ স্তবের মধ্যে বুদ্ধকে ভগবানের অবতার বলা হইয়াছে। অনান্য পুরাণে অনুরূপ কথাই আছে। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদের ২৪ সূত্রে

অর্থাৎ "আকাশে চ বিশেষাৎ" এই সূত্রে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য প্রথমে বেদপ্রমাণ দ্বারা আকাশের ভাবত্ব সিদ্ধ করিয়া বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিয়াছেন। তৎপরে যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা এবং পরিশেষে সুগত বুদ্ধের বাক্য দ্বারা আকাশের ভাবত্ব সিদ্ধ করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন। এস্থলে দেখা যায়, সকল বৌদ্ধই যদি বেদকে প্রমাণ জ্ঞান না করিতেন, তাহা হইলে ভাষ্যকারের পক্ষে বেদপ্রমাণ প্রদর্শন ব্যর্থ হইয়া যায়। বস্তুতঃ, উক্ত স্থলে যে সব সূত্র দ্বারা বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইয়াছে, সেই স্থলে "আকাশে চ বিশেষাৎ" এই সূত্র ভিন্ন কোন সূত্রেই বেদপ্রমাণ প্রদর্শন করা হয় নাই। এই হেতু বৈদিক মতাবলম্বীর জন্য উক্ত সূত্রে বেদপ্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বৌদ্ধের —জন্য নহে—এরূপ কল্পনা করাও সঙ্গত হয় না।

তাহার পর সুগত বুদ্ধের বাক্য দ্বারা বৌদ্ধমত খণ্ডন করায় বৌদ্ধমতমধ্যে যে মতভেদ আছে, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। এই মতভেদ এস্থলে বৌদ্ধমতের নবীন প্রাচীনভেদ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। অমরকোষমধ্যে সর্ব্বজ্ঞ সুগত বুদ্ধ ও শাক্যমুনি বুদ্ধের মধ্যে ভেদ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। আচার্য্য বসুবন্ধুও তাঁহার অভিধর্ম্ম-কোষে আকাশের ভাবত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অথচ সূত্রকার ব্যাসদেব আকাশকে আবরণাভাব এবং প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং অপ্রতিসংখ্যানিরোধের মত অভাব বা নিরুপাখ্য নহে বলিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতেছেন। সুতরাং ব্যাসদেবের সময়ের বৌদ্ধমত এবং বসুবন্ধু প্রভৃতির সময়ের বৌদ্ধমত যে অভিন্ন নহে, তাহা বেশ বুঝা যায়। এইরূপ নানা কারণে বৈদিক ধর্ম্মের গ্রন্থেও বৌদ্ধ-মতের নবীন প্রাচীন ভেদ বেশ বুঝা যায়।

বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেও বৌদ্ধ-জৈন মতে নবীন-প্রাচীন ভেদ

তার পর বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থেও বৌদ্ধমতের নবীন প্রাচীন ভেদের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন বৌদ্ধমতের অতি প্রাচীন গ্রন্থ লঙ্কাবতার সূত্রে আছে—"বিরজ" নামে এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধ লঙ্কাধিপতি রাবণকে উপদেশ দিতেছেন। তাহাতে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞানবাদ বা শূন্যবাদই পাওয়া যায়। তিনিই ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন—এইরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণীও করিতেছেন। এতদ্দ্বারাও সিদ্ধ হয়, বিরজ বুদ্ধ প্রাচীন এবং গৌতম বুদ্ধ তাহার পরবর্ত্তী। লঙ্কাধিপতি রাবণের কথা এই গ্রন্থে থাকায় এই রাবণকে রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই রাবণ বৌদ্ধমতে যেমন পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হন, তদ্রূপ বৈদিক মতেও পরম পণ্ডিত বলিয়া স্বীকৃত হন। বৈদিক মতে ইনি মহাযাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বিশ্বশ্রবার পুত্র। বৈদিক মন্ত্রবলে যজ্ঞ দ্বারা ইনি দেবগণকে ভৃত্যকার্য্য করিতে বাধ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহার কৃত বেদভাষ্য, বৈশেষিকভাষ্য, আয়ুর্ব্বেদভাষ্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ছিল বলিয়া বহু গ্রন্থে উল্লেখ দেখা যায়।

বিষ্ণুপুরাণের বুদ্ধোৎপত্তি-বোধক বাক্যের সহিত একবাক্যতা করিলে এই বিরজ বুদ্ধকেই আদি বুদ্ধ বিষ্ণুর শরীরোৎপন্ন পুরুষ বলিবার পক্ষে কোন বাধা দেখা যায় না। বৌদ্ধদিগের সুখাবতীব্যূহ নামক অতি প্রাচীন গ্রন্থে বুদ্ধকে নারায়ণ বলা হইয়াছে। এই সব কারণে বিষ্ণুপুরাণের আদি বুদ্ধকে নারায়ণ-শরীরোৎপন্ন বলায় "বিরজ" বুদ্ধের সহিত এই নারায়ণ বুদ্ধের অভেদ সম্ভাবনাই বলবতী হয়। অন্য বৌদ্ধগ্রন্থে আছে ২৪ জন বুদ্ধের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ ত্রয়োবিংশ। চতুর্বিংশতি বুদ্ধ—মৈত্রেয় নামক বুদ্ধ, তিনি ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবেন। ব্যাসদেবের সময় ক্রকুচ্ছন্দ নামক এক জন বুদ্ধ ছিলেন। ইঁহার সময় বিশ্বকোষ অভিধানে দেখা যায় ৩১০১ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ। অর্থাৎ প্রায় কলিযুগের আরম্ভ-সময়। ইহার পর কনক মুনি, কশ্যপ প্রভৃতি বুদ্ধের কথা শুনা যায়। এই কারণে বৌদ্ধমতে প্রাচীন নবীন ভেদ কল্পনা করা অসঙ্গত কার্য্য হইতে পারে না। শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ নামক গ্রন্থে আছে, "বেদের" "নিমিত্ত নামক শাখাতে যখন বুদ্ধের কথা রহিয়াছে তখন ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধকে ভগবান্ বলিয়া আদর করিবেন না কেন?" ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়—বেদমান্যকারী বৌদ্ধ এক দল ছিলেন। কারণ, যাঁহারা বেদের "নিমিত্ত শাখা" অনুসারে চলিতেন, তাঁহারা বৈদিকদিগের দৃষ্টিতে যেমন বৈদিক, বৌদ্ধের দৃষ্টিতে তদ্রূপ বৌদ্ধও বটে। অতএব বেদমান্যকারী এক দল বৌদ্ধের কল্পনা অসঙ্গত হয় না।

বৈদিক দর্শন ছয়খানি আলোচনা করিলে দেখা যায়, বহু স্থলে বৌদ্ধমতকে লক্ষ্য করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থির করা হইতেছে। বস্তুতঃ, বৈদিকগণের পুরাণ মহাভারত রামায়ণ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থে বৌদ্ধমতের কথা আছে। ইহা দেখিয়া আধুনিক পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন অনেকে ঐ সব গ্রন্থকে গৌতম বুদ্ধের পরবর্ত্তী বলিতে চাহেন। কিন্তু ইহার দ্বারা বৈদিক বুদ্ধিসম্পন্ন অনেকেই আবার বৌদ্ধমতের প্রাচীন নবীন ভেদই কল্পনা করেন। বস্তুতঃ, বৈদিক গ্রন্থে যে বৌদ্ধমতের উল্লেখ আছে, ঠিক্ সেই বৌদ্ধমত বর্ত্তমান বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় না। বৈদিকের কথিত বৌদ্ধমত এবং আধুনিক বৌদ্ধকথিত বৌদ্ধমতের মধ্যে একটু প্রভেদই দৃষ্ট হয়। এজন্য বৌদ্ধমতের নবীন প্রাচীন ভেদ অসঙ্গত কল্পনা হইতে পারে না।

তাহার পর প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে বেদের নিন্দা নাই, কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধগ্রন্থে বেদনিন্দা আছে। অথচ গৌতম বুদ্ধও কোন স্থলে বেদনিন্দা করিতেছেন, ইহাও দেখা যায় না। প্রত্যুত, তিনি ব্রাহ্মণের প্রশংসাই করিয়াছেন। এইরূপ বহু কারণে বৌদ্ধ-মতের নবীন প্রাচীন ভেদ কল্পনা সঙ্গতই হয়। আর এরূপ হইলে ব্রহ্মসূত্রের "আকাশে চ বিশেষাৎ" ২।২।২৪ সূত্রের সঙ্গতি হয়। প্রাচীন বৌদ্ধমতে আকাশ অবস্তু বলিয়া বিবেচিত হইত। বৈদিকগণ তাহা খণ্ডন করেন। পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ এমন কি গৌতম বুদ্ধ এবং বসুবন্ধু প্রভৃতি তাহা দেখিয়া আকাশকে আর অবস্তু বলিলেন না, ইত্যাদি। আর এই কারণেই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে সাংখ্যমত, যোগমত, ইত্যাদি বেদমূলক অবৈদিক মতের খণ্ডনের সঙ্গে বৌদ্ধমতও খণ্ডন করা হইয়াছে। এই বৌদ্ধমতটি প্রাচীন বৌদ্ধমত, চার্বাকাদি মতের ন্যায় নবীন বেদ-নিন্দাকারী বৌদ্ধমত নহে। চার্বাকাদিমতে নবীন প্রাচীন ভেদ থাকিলেও তাহারা বেদমূলক হইয়াও সর্বদাই বেদনিন্দাকারী। ব্যাসের সময়েই তাহারা বেদনিন্দাকারী হইয়াছিল। এই কারণে চার্বাকাদির মত ব্রহ্মসূত্রমধ্যে খণ্ডিত হয় নাই। বৈদিকগ্রন্থে যে চার্বাকাদির বেদমূলকত্ব প্রদর্শিত হয়, তাহাতে তাহাদের বেদনিন্দার অভাব প্রমাণিত হয় না। সকল মতই বেদমূলক বলিয়া উহা

প্রদর্শিত হয় মাত্র। চার্বাকগণ কখনই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, উহা বৈদিকগণই স্বীকার করেন মাত্র।

জৈনমতেও এই নবীন প্রাচীন ভেদ দেখা যায়। প্রাচীন জৈন-গ্রন্থে বেদনিন্দা নাই। আদি জিন জৈনমতে ঋষভদেব। সেই ঋষভদেব বৈদিকমতে বিষ্ণুর অবতার। একথা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেই দেখা যায়। জৈনমতের উৎপত্তিও বিষ্ণুপুরাণের ৩য় অংশে বৌদ্ধমতের উৎপত্তির সঙ্গে দেখা যায়। ইহাদের মতেও জিন বা তীর্থঙ্কর চতুর্বিংশতি। মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর। বৌদ্ধগ্রন্থে আছে, ইহার সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মহাবীর বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। এই কারণে বৌদ্ধ ও জৈনমতে নবীন প্রাচীন ভেদ কল্পনা অসঙ্গত হয় না। আর তজ্জন্য প্রাচীন বৌদ্ধ জৈনমত বেদমান্যকারী মত বলিয়া সাংখ্যমত ও যোগাদিমতের সঙ্গে তাঁহাদের মতও ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থমধ্যে খণ্ডিত হইয়াছে। এই হেতুই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে শ্রুতিমীমাংসামুখে বেদমান্যকারী সমুদায় দার্শনিক মতের সহিত অবিরোধ প্রদর্শনোদ্দেশ্যে ইহাদের মতের যুক্তির দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং বেদ-অমান্যকারী চার্বাকাদি মতের যুক্তিদোষ প্রদর্শন করা হয় নাই। আর এই কারণেই এই সব মতের অনুকূল বা অবলম্বন শ্রুতিবাক্যকে বিষয়বাক্যরূপে ভাষ্য-মধ্যে প্রদর্শিত না হইলেও ইচ্ছা করিলে তাহা প্রদর্শন করিতে পারা যায়। আর তজ্জন্য ব্রহ্মসূত্রের কোনও অধিকরণেই শ্রুতিসঙ্গতির অভাব নাই। সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের যাবতীয় অধিকরণের বিষয়বাক্য কোন শ্রুতিবাক্য বা শ্রুত্যুক্ত বিষয়-বিশেষই হইয়া থাকে। এজন্য এই বিষয়ে লক্ষ্যহীন হইলে ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের অধিকরণার্থ বা সূত্রার্থ যথার্থরূপে বুঝিতে পারা যাইবে না। এই কারণে এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে প্রত্যেক বিচারমধ্যে একটি বিষয়-বাক্য অবলম্বন করা ব্যাসদেবের এই গ্রন্থ রচনার কৌশল বলিতে হইবে। অধিক কি, এই বিষয়-বাক্য নির্ণয় অনেক সময় সূত্রমধ্যস্থ পদ দ্বারা অথবা সূত্রের আলোচ্য বিষয় দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। এই কৌশলটির প্রতি দৃষ্টিহীন হইলে ব্রহ্মসূত্রের বিচার্য্যবিষয় নির্ণয়ে ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা হয়।

(৩) অধিকরণের তৃতীয় অবয়ব সংশয়ের পরিচয়

অধিকরণের তৃতীয় অবয়ব "সংশয়" বলা হয়। বিষয়ের পরই ইহার স্থান। কারণ, সংশয় না হইলে তত্ত্বনির্ণয়াত্মক বিচারই সম্ভবপর হয় না। এই সংশয় অধিকরণের বিষয়বাক্য অবলম্বনে প্রদর্শন করা হয়। যেমন ব্রহ্মসূত্রের "জন্মাদ্যধিকরণ" নামক দ্বিতীয় অধিকরণের বিষয়বাক্য হয় "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য। তদবলম্বনে "সংশয়" প্রদর্শন করা হয় এই যে, "জন্মাদি ব্রহ্মের লক্ষণ কি না?" এইরূপ সমুদায় অধিকরণেই বিষয়বাক্য অবলম্বনে যে সংশয় প্রদর্শন করা হয়, তাহাই অধিকরণের তৃতীয় অবয়ব বলা হয়। এই সংশয় কোন স্থলে ভাবাভাবাত্মকরূপে দুইটি কোটি বিশিষ্ট হয়, যেমন "ব্রহ্মের লক্ষণ আছে কি নাই", এবং কোন স্থলে, যেমন চতুর্থ সমন্বয়াধিকরণে এই সংশয় দুইটি ভাব কোটিক হয়, যেমন—বেদান্ত কর্ম্মাঙ্গ কর্ত্রাদিপর কিংবা নিত্য-সিদ্ধ ব্রহ্মপর। এইরূপ কোন স্থলে তিনটি বা চারিটি ভাব বস্তু অবলম্বনে সংশয় করা হয়। যেমন প্রতর্দনাধিকরণ নামক একাদশ অধিকরণে চতুষ্কোটিক সংশয় করা হয়। যথা—"প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা" এই শ্রুতিবাক্যরূপ বিষয়ে সংশয় হয়—এখানে "প্রাণ" শব্দে বায়ু কিংবা ইন্দ্রদেবতা, অথবা জীব, অথবা পরমাত্মা। এইরূপ সংশয় প্রত্যেক অধিকরণে, সেই অধিকরণের বিষয়বাক্য হইতে উত্থাপিত করা হয়। এই সংশয়ের প্রথম কোটি বা কোটিগুলি হইতে পূর্ব্বপক্ষ রচনা করা হয়, এবং শেষ কোটি হইতে সিদ্ধান্তপক্ষ রচনা করা হয়। যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক, এই অধিকরণের চতুর্থ অবয়ব পূর্ব্বপক্ষটি কিরূপ হয়।

(৪) অধিকরণের চতুর্থ অবয়ব পূর্বপক্ষের পরিচয়

অধিকরণের চতুর্থ অবয়ব পূর্বপক্ষ। ইহা পূর্বোক্ত সংশয়ের মধ্যে যেটি অনভীষ্ট কোটি তাহাই হইয়া থাকে। যেমন দ্বিতীয় "জন্মাদ্যধিকরণে" সংশয় হইয়াছিল—"জন্মাদি ব্রহ্মের লক্ষণ কি না?" ইহার মধ্যে "জন্মাদি ব্রহ্মের লক্ষণ নয়" এই অনভীষ্ট কোটি এবং "জন্মাদি ব্রহ্মের লক্ষণ" ইহাই অভীষ্ট কোটি। এই অনভীষ্ট কোটিটি এই অধিকরণের পূর্বপক্ষ এবং অভীষ্ট কোটিটি সিদ্ধান্তপক্ষ।

কিন্তু এই পূর্বপক্ষ প্রদর্শন কালে কেবল অনভীষ্ট কোটিটির উল্লেখ মাত্র যে করা হয়, তাহা নহে। পরন্তু, সেই সঙ্গে তাহার হেতু প্রভৃতি বেদান্তসম্মত ন্যায়াবয়বগুলিও প্রদর্শন করা হয়। সেই বেদান্ত-সম্মত ন্যায়াবয়ব বলিতে—

(১) প্রতিজ্ঞাবাক্য, (২) হেতুবাক্য এবং (৩) উদাহরণবাক্য এই তিনটি বাক্য বুঝায়, অথবা—

(১) উদাহরণবাক্য, (২) উপনয়বাক্য এবং (৩) নিগমন বাক্য—এই তিনটি বাক্যকে বুঝায়। ইহাদের দৃষ্টান্ত যদি দিতে হয় তাহা হইলে—

(১) প্রতিজ্ঞাবাক্য যেমন "পর্বতটি বহ্নিমান্।"

(২) হেতুবাক্য যেমন—"যেহেতু তাহাতে ধূম রহিয়াছে"

(৩) উদাহরণবাক্য যেমন—"যাহা যাহা ধূমবান্ তাহা বহ্নিমান্ যেমন রন্ধনশালা" অথবা—

(১) উদাহরণবাক্য যেমন—"যাহা যাহা ধূমবান্ তাহা বহ্নিমান্, যেমন রন্ধনশালা"

(২) উপনয়বাক্য,যেমন—"এই পর্বতটিও সেইরূপ বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্"

(৩) নিগমনবাক্য, যেমন—সেই হেতু পর্বতটি বহ্নিমান্।

এইরূপ তিনটি ন্যায়াবয়ব প্রদর্শন করা হয়। ন্যায়মতে যেমন ন্যায়া-বয়ব বলিতে (১) প্রতিজ্ঞাবাক্য, (২) হেতুবাক্য, (৩) উদাহরণবাক্য, (৪) উপনয়বাক্য (৫) নিগমনবাক্য এই পাঁচটি বাক্যকে বুঝায়, বেদান্তমতে কিন্তু সেরূপ বুঝায় না। বেদান্তমতে এই পাঁচটির মধ্যে প্রথম তিনটি বাক্য, অথবা শেষ তিনটি বাক্যকে বুঝায়। অর্থাৎ বেদান্তসম্মত ন্যায়াবয়ব বলিতে প্রতিজ্ঞা হেতু এবং উদাহরণ, অথবা উদাহরণ উপনয় ও নিগমন বুঝায়। তথাপি এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারটিই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, এবং সংক্ষেপের অনুরোধে বহু স্থলে প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যই প্রদর্শিত হয়। যেমন প্রথম জিজ্ঞাসা অধিকরণে—

সঙ্গতি—উপোদ্‌ঘাত সঙ্গতি।

বিষয়—বেদান্তবাক্য দ্বারা ব্রহ্মবিচার।

সংশয়—বেদান্তবাক্যদ্বারা ব্রহ্মবিচার কর্ত্তব্য কি কর্ত্তব্য নহে?

পূর্বপক্ষ—বেদান্ত বাক্য দ্বারা ব্রহ্মবিচার কর্ত্তব্য নহে।

ইহার হেতু—যাহা সন্দিগ্ধ হয় এবং প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়, তাহাই বিচার্য্য হয়, ব্রহ্ম সন্দেহের বিষয়ও নহে, আর ব্রহ্মবিচারের

কোন প্রয়োজন অর্থাৎ ফলও নাই। ব্রহ্ম যে সন্দেহের বিষয় নহে. তাহার আবার কারণ, ব্রহ্ম স্পষ্ট ভাবেই অহম্ এই জ্ঞানের আশ্রয় হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি হয় না। সংক্ষেপানুরোধে এখানে পূর্বপক্ষমধ্যে কেবল প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্যমাত্রই প্রদর্শিত হইল। তদ্রূপ দ্বিতীয় জন্মাদ্যধিকরণে—

সঙ্গতি - আক্ষেপ নামক সঙ্গতি।

বিষয়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই শ্রুতিবাক্য।

সংশয়—জন্মাদি ব্রহ্মের লক্ষণ কি না?

পূর্বপক্ষ—জন্মাদি ব্রহ্মের লক্ষণ নহে।

ইহার হেতু জন্মাদি জগতের ধর্ম্ম, ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে। এখানেও সংক্ষেপের অনুরোধে প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্যমাত্র প্রদর্শিত হইল।

যাহা হউক, পূর্বপক্ষটি সংশয়ের মধ্যস্থ অনভীষ্ট কোটিই হয়। আর সেই পূর্বপক্ষমধ্যে বেদান্তসম্মত ন্যায়াবয়ব প্রথম তিনটি মাত্র প্রদর্শিত হয়, অথবা সংক্ষেপের অনুরোধে দুইটিমাত্র ন্যায়াবয়ব প্রদর্শিত হয়, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রসম্মত পাঁচটি ন্যায়াবয়ব প্রদর্শিত হয় না। এই পূর্বপক্ষ সাধারণতঃ পূর্ববর্ত্তী অধিকরণের সিদ্ধান্তপক্ষকে অবলম্বন করিয়াই করা হয়। যেখানে একটি সূত্রে একটি অধিকরণ রচিত হয়, যেমন প্রথম চারিটি অধিকরণে এক একটি সূত্রে এক একটি অধিকরণ হইয়াছে, সেখানে পূর্বপক্ষ উহ্য থাকে। কিন্তু যেখানে একাধিক সূত্রে একটি অধিকরণ রচিত হয়, সেখানে অনেক স্থলে এক বা একাধিক সূত্রই পূর্বপক্ষের জন্য রচিত হয়। যেমন পঞ্চম ঈক্ষত্যধিকরণে পূর্বপক্ষের জন্য পৃথক্ সূত্রই দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে একই সূত্রে পূর্বপক্ষ ও তাহার সিদ্ধান্ত উভয়ই থাকে। কোথাও বা প্রথমে পূর্বপক্ষ তদুত্তরে সিদ্ধান্তী যাহা বলিতে পারেন তাহা বলিয়া তাহারও খণ্ডন করিয়া পূর্বপক্ষ স্থাপন করা হয় এবং শেষকালে মুখ্য সিদ্ধান্তের সূত্র রচনা করা হয়। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থপাঠের সময় এইরূপ পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষের কথা স্মরণ থাকিলে বিচারের মর্ম্ম গ্রহণে ভ্রমের সম্ভাবনা অল্প হয়। এইবার দেখা যাউক অধিকরণের পঞ্চম অবয়বটি কিরূপ—

(৫) অধিকরণের পঞ্চম অবয়ব সিদ্ধান্তপক্ষের পরিচয়

অধিকরণের পঞ্চম অবয়ব সিদ্ধান্তপক্ষ। ইহাও পূর্বপক্ষের ন্যায় অধিকরণের সংশয় নামক অবয়বের কোটিদ্বয়ের মধ্যে অভীষ্টকোটিই হইয়া থাকে। অনভীষ্ট কোটিটি পূর্বপক্ষ হইয়া থাকে। আর তজ্জন্য পূর্বপক্ষের ন্যায় ইহাতেও প্রতিজ্ঞা হেতু ও উদাহরণ বাক্য নামক তিনটি অবয়ব থাকে, অথবা উদাহরণ উপনয় ও নিগমন নামক অবয়ব তিনটি থাকে। কিন্তু সংক্ষেপের অনুরোধে প্রায়ই প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্যই প্রদর্শিত হয়। এই হেতুবাক্যমধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পূর্বপক্ষে যে হেতুদোষ থাকে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই হেতুদোষ প্রদর্শনের জন্য ন্যায়শাস্ত্রের হেত্বাভাস ছল জাতি ও নিগ্রহস্থানের জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। পূর্বপক্ষের হেতুর এই যে দোষ প্রদর্শন, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধান্তপক্ষের দৃঢ়তা সাধন। এই জন্যই বিচারক্ষেত্রে স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করাই রীতি। ইহা না করিলে বিচারের পূর্ণতা সাধিত হয় না। অবশিষ্ট কথা পূর্বপক্ষের ন্যায় বুঝিতে হইবে। এইবার দেখা যাউক, অধিকরণের ষষ্ঠ অবয়ব ফলভেদের পরিচয় কিরূপ?

(৬) অধিকরণের ষষ্ঠ অবয়ব ফলভেদের পরিচয়

অধিকরণের ষষ্ঠ অবয়ব ফলভেদ। এই ফলভেদের ফলে অধিকরণের পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ হইতে অন্য একটি দূরবর্ত্তী প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অধিকরণের পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষে অধিকরণে সাক্ষাৎ ফল জানা যায়, কিন্তু ফলভেদে তৎসম্পর্কিত অন্যরূপ ফল সিদ্ধ হয়। এজন্য এই ফলভেদের মধ্যে আবার পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষের উল্লেখ থাকে। যেমন পূর্বপক্ষে ফলভেদ এবং সিদ্ধান্তপক্ষে ফলভেদ। যেমন প্রথম "জিজ্ঞাসা" নামক অধিকরণে পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নহে, সিদ্ধান্তপক্ষ ব্রহ্মজিজ্ঞাস্য; কিন্তু ফলভেদের পূর্বপক্ষে ব্রহ্মবিচার শাস্ত্র আরম্ভণীয় নহে; এবং ফলভেদের সিদ্ধান্তপক্ষে—ব্রহ্মবিচার শাস্ত্র আরম্ভণীয় ইত্যাদি। এইরূপ সর্বত্র ফলভেদে দূরবর্ত্তী অন্যফলের লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ "ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য নহে, ইহা হইতে শাস্ত্র আরম্ভণীয় নহে" পূর্বপক্ষে পাওয়া গেল এবং "ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য ইহা হইতে শাস্ত্র আরম্ভণীয়" এই সিদ্ধান্তপক্ষে পাওয়া গেল। এইরূপে অধিকরণের পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ হইতে যাহা জানা যায়, ফলভেদের পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ হইতে অন্য দূরবর্ত্তী বিষয়টিও অবগত হওয়া যায়।

ইহাই হইল অধিকরণের ছয়টি অবয়বের পরিচয়। সূত্রমধ্যে এই ছয়টি বিষয় অস্পষ্ট ভাবে বা লুক্কাইত ভাবে থাকে। সূত্র হইতে সূত্রার্থ অবগত হইয়া অধিকরণের এই ছয়টি অবয়ব পৃথক্ ভাবে বুঝিতে পারিলে সূত্রার্থ পূর্ণরূপে বুঝা হয়। এমন কি, ভাষ্যমধ্যেও এই ছয়টি অবয়ব পৃথক্ ভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। ছয়টি অবয়বের দুইটি তিনটি বা চারিটি মাত্র কোথাও কোথাও প্রদর্শিত হয়। ভাষ্যের টীকা ও সূত্রের বৃত্তিমধ্যেই এই সব বিষয় পূর্ণরূপে আলোচিত হইতে দেখা যায়। এই কৌশলটি অবগত না হইলে ব্রহ্মসূত্র পাঠ অসম্পূর্ণ থাকে। ব্রহ্মসূত্রের নানা মতের বহু ভাষ্য আছে। ভাষ্যকারগণ ব্রহ্মসূত্র হইতে নিজমতের সমর্থনের জন্য এই অধিকরণের অবয়ব সমূহ অন্যরূপ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্তের অন্যথা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানিতে হইলে এই অধিকরণ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইহাই হইল ব্রহ্মসূত্র রচনার দ্বিতীয় কৌশল। এইবার দেখা যাউক, ব্যাসদেবের তৃতীয় কৌশলটি কিরূপ—

তৃতীয় কৌশল

(ক) যেখানে একটি সূত্রের দ্বারা একটি অধিকরণ হয়, সেখানে সেই সূত্রটি সিদ্ধান্ত-সূত্রই হয়। যেমন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ অধিকরণ এক একটি সূত্র দ্বারাই রচিত হইয়াছে বলিয়া তাহারা সিদ্ধান্ত-সূত্রই হয়।

(খ) যেখানে একাধিক সূত্র দ্বারা অধিকরণ হয়, সেখানে কখন সব সূত্রগুলিই সিদ্ধান্ত হয়। যেমন পঞ্চম অধিকরণে সাতটি সূত্রই সিদ্ধান্তসূত্র।

(গ) কখনও বা কতকগুলি সূত্র পূর্বপক্ষ সূত্র এবং কতকগুলি সিদ্ধান্ত-সূত্র হয়। যেমন ১।৪।৬ অধিকরণে প্রথমটি সিদ্ধান্ত সূত্র, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রদ্বয় পূর্বপক্ষ সূত্র, এবং চতুর্থ সূত্রটি সিদ্ধান্ত-সূত্র।

(ঘ) অধিকরণ-শেষে সিদ্ধান্ত-সূত্রই থাকে। কিন্তু একটি স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যেমন ৪।৩।৫ অধিকরণ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম সূত্র পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তপক্ষ, এবং ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সূত্রগুলি পূর্বপক্ষ সূত্র হইয়াছে। এস্থলে পূর্বপক্ষ অনুমোদিত মতান্তর বলিয়া গণ্য করাই বোধ হয় সূত্রকারের অভিপ্রায়।

(ঙ) যেখানে সিদ্ধান্ত-সূত্রদ্বারা অধিকরণ আরম্ভ হয়, সেখানে পূর্বপক্ষ উহ্য থাকে। যেমন ১।১।৫ অধিকরণ অথবা ১।১।৬ অধিকরণ। এইরূপ অধিকরণ সম্বন্ধে নানারূপ কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

চতুর্থ কৌশল

সিদ্ধান্ত-সূত্রে সাধারণতঃ নিষেধার্থক "তু"শব্দ অথবা "ন" শব্দ প্রভৃতি কোন না কোন শব্দ থাকে। যেখানে একটি অধিকরণে একাধিক সূত্র থাকে, সেখানে যে সূত্রে "তু"শব্দ এবং "ন" থাকে সেইটি সিদ্ধান্ত-সূত্র হয় বলিয়া তাহার পূর্বসূত্রগুলি পূর্বপক্ষ-সূত্র হইয়া যায়। পূর্ব-পক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ-সূত্র নির্ণয়ের ইহা একটি কৌশল। যেমন ২।১।৩ অধিকরণে প্রথম দুইটি সূত্রের পর "দৃশ্যতে" তু ২।১।৬ সূত্রটি থাকায় প্রথম দুইটি সূত্র পূর্বপক্ষ-সূত্র হইল। অবশ্য কোন কোন সিদ্ধান্ত-সূত্রমধ্যেই পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ দুইটিই থাকে। যেমন "বিকার-শব্দাৎ ন ইতি চেৎ ন প্রাচুর্য্যাৎ" ১।১।১৩ এখানে শেষ অংশ সিদ্ধান্তপক্ষ।

পঞ্চম কৌশল

বাদরায়ণ নামযুক্ত সূত্রে, নিজ নাম বাদরায়ণ থাকায় তাহা সিদ্ধান্ত-সূত্রেই হয়। আর যেখানে জৈমিনি প্রভৃতি অন্য নাম থাকে, সেখানে সেগুলি পূর্বপক্ষ-সূত্রেই হয়। কোথাও বা মতভেদের জ্ঞাপক মাত্র হয়। যেখানে কাশকৃৎস্ন নাম থাকে, সেখানে সেটি সিদ্ধান্ত সূত্র বলা হয়। যেখানে শেষকালে পূর্বপক্ষ সূত্র থাকে, যেমন ৪।৩।৫ অধিকরণ, সেখানে এই পূর্বপক্ষও গ্রহণীয় মতভেদ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ষষ্ঠ কৌশল

যেখানে সূত্রমধ্যে কোনও আচার্য্যের নাম থাকে না, সেখানে সর্ব্ববাদিসম্মত সনাতন সিদ্ধান্ত কথিত হইতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। এজন্য যেখানে কোন উল্লেখযোগ্য মতভেদ থাকে, সেই স্থলেই সেই সেই মতপ্রবর্ত্তকের নাম থাকে। এজন্য যেখানে নিজ নাম থাকে, সেখানে সে মতটি তাঁহার নিজ মত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এজন্য নাম যেখানে না থাকে, সেখানে সনাতন সিদ্ধান্ত উক্ত হইতেছে বুঝিতে হইবে।

সপ্তম কৌশল

এই গ্রন্থে শ্রুতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। তাহার পর স্মৃতি এবং তাহার পর প্রত্যক্ষ অনুমানাদির স্থান। প্রতিবাদীর নিকট যে যুক্তি দোষাবহ নহে, স্বমতেও সেইরূপ যুক্তি দোষাবহ বিবেচনা করা হয় না। এজন্য সূত্রে যেমন "স্বপক্ষ দোষাৎ চ" ২।১।১০ এবং ২।১।২৯ সূত্রে প্রদর্শন করিতে পারা যায়।

অষ্টম কৌশল

এ গ্রন্থে স্মৃতিপ্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং মহাভারতকে সর্ব্বপ্রধান স্থান প্রদান করা হইয়াছে। তৎপরে মনুসংহিতার স্থান বলা যায়। এজন্য "স্মরন্তি চ" ২।৩।৪৭ সূত্রে মহাভারতের বাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়, ৩।১।১৪ সূত্রে মনুসংহিতা বাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়, ৪।১।১০ সূত্রে ভগবদ্গীতা বাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়, "স্মর্য্যতে চ" ৪।২।১৪ সূত্রে মহাভারতবাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়, "স্মর্য্যতে অপি চ লোকে" ৩।১।১৯ সূত্রে মহাভারত বাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়, "অপিচ স্মর্য্যতে" ১।৩।২৩ সূত্রে ও গীতাবাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়। ২।৩।৪৫ সূত্রে ও গীতাবাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়। ৩।৪।৩০ সূত্রে মহাভারত বাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়, ৩।৪।৩৭ সূত্রেও মহাভারত-বাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়, "স্মৃতেশ্চ" ১।২।৬ সূত্রে গীতাবাক্য এবং ৪।৩।১১ সূত্রে কোন অনাবিষ্কৃত স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়। অর্থাৎ পাঁচটি স্থলে মহাভারত-বাক্য, একটি স্থলে মনুবাক্য, ৪টি স্থলে গীতাবাক্যের গ্রহণ দেখা যায়। এক স্থলে একটি স্মৃতিবাক্যের আকর পাওয়া যায় নাই।

নবম কৌশল

যাঁহারা বেদ মান্য করেন না, তাঁহাদের মতবিচার এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। এজন্য বেদমান্যকারী সাংখ্যাদি বিপক্ষের মত বিচার-কালে তাঁহাদের মতের অবৈদিকত্ব প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইতে দেখা যায়। তথাপি তাঁহারা বেদ মান্য করেন বলিয়া তাঁহাদের মত স্মৃতি ও যুক্তির দ্বারাও খণ্ডন করা হইয়াছে। আর চার্বাকাদি একেবারেই বেদ মান্য করেন না বলিয়া তাঁহাদের মতের কোন প্রতিবাদই করা হয় নাই। সেই সকল মত শিষ্টের অপরিগৃহীত বলিয়া ব্যাখ্যাত অর্থাৎ পরিত্যক্তই হইয়াছে।

দশম কৌশল

সম্প্রদায়ক্রমে প্রাপ্ত সূত্রব্যাখ্যা এই গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। এজন্য বোধ হয় কোথায় পাদ শেষ হইয়াছে, তাহার কোন চিহ্ন প্রদর্শন করা হয় নাই। কোন কোন স্থলে পাদসঙ্গতির যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, তাহাও এই সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার অনুরোধেই হইয়াছে বলা হয়।

এইরূপ বহু কৌশল এই গ্রন্থে অবলম্বিত হইয়াছে। নিপুণ ভাবে আলোচনা না করিলে এই সকল কৌশল প্রতিভাত হয় না। ভাষ্যের টীকা এবং সূত্র-বৃত্তিমধ্যে এই সব বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়। এই সব কৌশলের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া এই ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করিলে আশানুরূপ ফললাভ হয় না। বস্তুতঃ, এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে সর্বপ্রকার দার্শনিক মতেরই জ্ঞান থাকা আবশ্যক হয়। বিশেষতঃ, ছয়খানি আস্তিক দর্শন এবং ছয়খানি নাস্তিক দর্শন এবং উপনিষদের জ্ঞান একান্ত ভাবে আবশ্যক হয়।

বর্ত্তমানে ইহার যে সব ভাষ্য পাওয়া যায় তাহার মধ্যে শাঙ্কর-ভাষ্যই প্রাচীন। এই ভাষ্যমধ্যে আমাদের জাতীয় দার্শনিক চিন্তার একটি অপূর্ব্ব ইতিহাস নিহিত আছে। পরবর্ত্তী বহু ভাষ্যে শাঙ্কর-ব্যাখ্যা খণ্ডনে বিশেষ যত্ন দেখা যায়। কিন্তু শাঙ্কর-ভাষ্যের এমনই উৎকর্ষ যে, সে সকল কথার উত্তর শাঙ্করভাষ্যমধ্যেই বর্ত্তমান। কেবল সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন। পরবর্ত্তী ভাষ্যকারগণ শাঙ্করভাষ্যের পূর্ব-পক্ষকে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব মত পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে আমরা দেখিব, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থপাঠের পূর্ব্বে কোন্ গ্রন্থ পাঠ করা অন্ততঃ পক্ষে আবশ্যক।

চিদ্ঘনানন্দ পুরী

নামের মাহাত্ম্য

[গল্প]

১

নাম-করা সাহিত্যিক শ্রীনটবর ঘোষাল। কলমের একটি খোঁচায় কা'কে মারেন, কা'কে ধরেন, কা'কে করেন পরলোকের যাত্রী! সকলেই ভয়ে তটস্থ···লোকটি সামান্য নয়।

সেদিন সন্ধ্যা হতে তখনও কিছু দেরী, অস্তরাগের শেষ রাগিণীর চিহ্নটুকু ছড়িয়ে আছে সারা আকাশের বুকে। টেবিলের উ পর ঝুঁকে বসে আছেন শ্রীনটবর ঘোষাল। চোখের সামনে খোলা রবীন্দ্রনাথের "জাপান-যাত্রী।"

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"জাপানীদের কবিতা, গল্প, উপন্যাস সব কিছুর-ই মধ্যে লুকিয়ে থাকে একটা গভীর ভাব। সে ভাবের আবেগ সকলের মনকে মাতিয়ে তোলে, রাঙিয়ে তোলে রূপে রসে গন্ধে···"

বইখানা মুড়ে রেখে চোখ বুজে নটবর ভাবতে লাগলেন···কি লেখা যায়? নতুন একটা কিছু লিখতে হবে। বাঙ্গলা দেশের সব-কিছু লেখা সেই "থোড়-বড়ি খাড়া" আর "খাড়া-বড়ি-থোড়!" এ হেন সাহিত্য-সমাজকে সমৃদ্ধ করতে হবে···উন্নত করতে হবে নতুন কিছু লিখে! লেখা এমন কি শক্ত!

অতিরিক্ত চিন্তার ফলে হাতের কলম রইলো স্তম্ভিত। কিন্তু না, কিছু লিখতেই হবে! আচ্ছা, প্রথমে কবিতা দিয়ে চেষ্টা করা যাক্···এই যে জাপানী কবিতা···মাত্র তিনটি লাইনে :—

"শরৎ কাল
পচা ডোবা
একটি কাক!"

কম কথার মধ্যে কি গভীর ভাব! অতএব···চট করে একটা খাতা টেনে নিয়ে নটবর লিখলেন—

"বঙ্গদেশ
কৃষককুল
জীবন্মৃত"

ভাব এসে গেছে! সে-ভাবের বন্যায় নটবর ঘোষাল ভেসে চললেন···

"বৈঠকখানা	"পথের ধারে	"একটি মেয়ে
চাঁদের আলো	ফুলের কুঁড়ি	চুলের রাশি
হাস্নুহানা"	পথিক-ভ্রমর"	রঙ্গীন শাড়ী"

জাপানী কবিতা তিন লাইনে! আচ্ছা, নটবর ঘোষাল যদি দু'টি লাইনে লেখেন? আরো কম কথায় আরো সুস্পষ্ট···একটু ওরিজিন্যালিটি থাকবে। কলম রেখে মাথাটা চেপে ধরলেন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—সেদিন কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে···তার পর চৌরঙ্গীর মোড়ে এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে নূতনত্ব প্রচুর! অপূর্ব্ব বললেও খুব বেশী বলা হয় না! যদি সেটিকে ভাব দেওয়া যায়? প্রথমে ধরা যাক···না, তিন লাইন হয়ে যাচ্ছে!

হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল :—"জাপানী প্লেন ভীষণ বোমা"···কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ হলো না। তিনটি লাইন চাই-ই। না হলে···

"বুকে বল	"জাপান বর্ডার	"জ্যোৎস্না রাত
শক্ত শিবির	ছোট্ট ঘর	নবীন প্রিয়া
বিদ্রোহ"	শান্তি নীড়"	জাপান বর্ডার"

নাঃ—হচ্ছে না! হাতের কাগজ-কলম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুম্‌দাম শব্দে নটবর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শব্দ শুনে নটবরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুলতা ওপরে এল স্থূল দেহ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে। কেউ কোথাও নেই! টেবিলের উপর পড়ে আছে একটা ডায়েরী, তারই ছেঁড়া একখানা পাতায় কি সব লেখা। সুলতা দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল তার উপর। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—"হুঁ।" সেটা রাগের, কি দুঃখের, কি আনন্দের ধ্বনি ঠিক বোঝা গেল না।

সাহিত্যিক স্বামী সুলতার, সাধারণতঃ যা হয়···এক জন রাঁধে-বাড়ে কাজকর্ম্ম করে, আর এক জন খান-দান, বসে বসে লেখেন। কেউ কারো মনের খবর পান না!

২

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিনতা নিজের ঘরে বসে কার্পেটের উপরে পশমের ফুল তুলছিল, হঠাৎ সামনে সুলতাকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

"কি রে হঠাৎ···" উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে দাঁড়াল বিনতা।

কিছু না বলে সুলতা হাতের কাগজটা বিনতার হাতে দিল।

"কি?"

"ছাখো তোমরা। আমি আর কি বলবো? জামাই-বাবু বাড়ী আছেন?"

"আছেন।" পড়্‌তে পড়্‌তে বিনতা উত্তর দিলে।

"কিছু বুঝতে পারলে?"

"কাকে মনে করে লিখেছে যেন বোধ হয়!"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে। মনে মনে হয়তো কিছু ইচ্ছে আছে···কে জানে!" সুলতার চোখে মেঘের বাষ্প!

"তাইতো···নটবর ভাবিয়ে তুললে দেখছি! শেষে এই বুড়ো বয়সে একটা কেলেঙ্কারী করবে না কি?"

দুই বোনের চিন্তাগ্রস্ত আলোচনার মাঝখানে সুপ্রকাশ এসে দাঁড়ালো।

"ব্যাপার কি ছোট-গিন্নী? হঠাৎ এই সাত-সকালে আবির্ভাব! কর্ত্তা কোথায়?"

সুপ্রকাশের রসিকতার কোন উত্তর না দিয়ে সুলতা চুপ করে রইলো।

"এই ছাখো"—বিনতা সবিস্তারে সব বলে গেল।

সুপ্রকাশ চুপ করে শুনলো। বললে,—"হুঁ।"

সে "হুঁ"র সঙ্গে সুলতার "হুঁ"র কোনো তফাৎ নেই!

সজল চোখে সুলতা জানালো,—"জামাইবাবু, এর বিহিত করুন। আপনি আমার দাদার মত…শেষকালে কাকে নিয়ে জাপানে পালিয়ে যাবে না তো?"

"বিহিত আমি করতে পারি—সুবিধেও আছে—পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর যখন! কিন্তু রাজী হবে ছোট-গিন্নী?"

"কেন রাজী হবো না? কি করবেন বলুন?"

"শোনো এই আমার প্ল্যান!" সুপ্রকাশ চুপি চুপি সুলতাকে কি বল্‌লো।

শুনে সুলতা বল্‌লেন, "অত হাঙ্গাম করে শেষে জেলটেল হবে না তো?"

"না গো না।"

"শেষকালে আবার কি একটা ফ্যাসাদ্ বাধাবে?" বিনতা বল্‌লো।

"মেয়েরা সব সমান! একটু যদি হিউমারের জ্ঞান থাকে! বলছি আমি ভায়াকে এবার সাহিত্যের আওতা থেকে যদি না সরিয়ে আনতে পারি তো কি বলেছি! আমি যা বলেছি ছোট-গিন্নী, তুমি ঠিক সেই রকম ভাবে সব কিছু করবে, বুঝলে?"

বুঝলে কি হবে, মেয়েদের মন, তার উপর সুলতা একটু ভীতু। কিন্তু সত্যই যদি কেউ ওর নবীন প্রিয়া থাকে? শেষকালে কি…অতএব জব্দ হওয়াই ভালো…গোড়াতেই!

অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে সুলতা যখন বাড়ী ফিরে এলো, তখন নটবর ঘোষালের বসবার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। এ-রকম প্রায় থাকে কিন্তু আজ…সে দিকে চেয়ে সুলতার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এলো। জামাইবাবু যত আশ্বাসই দিন—পুলিসের লোক! হয়তো কাল খানাতল্লাসীর পর ঐ ঘর থেকে বেরোবে বারুদের স্তূপ, গাদা পিস্তল, আরও কত কি! তার পর…

৩

তখনও ভালো করে ভোর হয়নি…বসবার ঘরের জানলা দিয়ে নটবর ঘোষাল দেখলেন, সারা বাড়ী পুলিসে ঘেরাও করেছে। তারই জন্ম চারি দিকে একটা বিশ্রী কোলাহল।

ব্যাপার কি? রাত দু'টো থেকে এই ভোর চারটের মধ্যে এমন কি অঘটন ঘটে গেল? সাহিত্য-ভাণ্ডারে দান করবার মত নটবর ঘোষাল এখনও কিছু লিখে উঠতে পারেননি! সম্পাদকরা অনবরত নতুন কিছু লেখা চেয়ে পাঠাচ্ছে, তার জন্ম দুশ্চিন্তার সীমা নেই—আর তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে কাল বসবার ঘরেই সারা রাত কাটিয়ে দু'টোর সময় ঘুমিয়ে পড়েছেন! এর মধ্যে?

দরজায় ঘা পড়লো—"নটবর ঘোষাল বাড়ী আছেন? দরজা খুলুন। আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে।"

ওয়ারেন্ট? নটবর ঘোষালের নামে? হতেই পারে না!

জান্‌লা দিয়ে বল্‌লেন—"ভুল করেছেন মশাই। এ বাড়ী নয়।"

"হ্যাঁ, এই বাড়ীই। দরজা যদি না খোলেন, তাহলে দরজা ভাঙ্গতে বাধ্য হবো। আমাদের ওপর সেই হুকুম আছে।"

নটবর ঘোষাল…ওয়ারেন্ট…কিন্তু জ্ঞানতঃ নটবর কোন দিন কিছু অপরাধ করেনি! তবে কি সুলতা…? সুলতা নাম ভাঁড়িয়ে নটবর ঘোষালের নামে কিছু করেছে? একালের মেয়ে…কোথায় কাকে হয়তো কি চাঁদা…

বাড়ীতে তো আর কেউ নেই! কিন্তু সুলতা তো সে রকম মেয়ে নয়! তবে? দরজায় দুমদাম্ ধাক্কা…হতবুদ্ধি হয়ে দরজা খুলে দিতেই এক জন অফিসার এসে নটবরের হাতে হাত-কড়া লাগিয়ে দিলেন। ততক্ষণে পাড়ার লোকজনে বাড়ীটা হয়ে উঠেছে সরগরম। চোখে জল এসে গেল নটবর ঘোষালের।

ক্ষীণ স্বরে বল্‌লেন, "আমি তো মশাই শুধু লিখি। ধর্ম্মতঃ জ্ঞানতঃ কোন দিন…"

বাধা দিয়ে অফিসার বল্‌লেন, "শুধু লেখার জন্যই আপনাকে অ্যারেষ্ট করা হলো! ফিফথ্ কলাম্‌নিষ্ট হয়ে সাঙ্কেতিক ছক্ লিখে জাপানে পাঠাচ্ছেন, আর বলছেন, আপনি শুধু লেখেন! সব খবর এখান থেকে পাঠিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ করছেন, সে খেয়াল আছে?"

ফিফ্‌থ কলাম্‌নিষ্ট! সাহিত্য-চর্চ্চার মানে কি এত দিন পরে এই হলো? হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেল্‌লেন নটবর ঘোষাল। ও-পাশ থেকে একটি ছেলে বল্‌লে, "রীতিমত স্পাইং। বাঙ্গলা দেশটা ভর্ত্তি হয়ে গেছে এই ধরণের লোকে—এরা সব খবর পাঠায়।"

দু'জন কনেষ্টবলের হাতে হাতকড়া-শুদ্ধ নটবরকে সঁপে দিয়ে অফিসারটি বল্‌লেন, "তোমাদের জিম্মায় এঁকে রেখে আমরা যাচ্ছি ওঁর ঘরদোর সব সার্চ্চ করতে।"

নিরুপায় নটবর…দু'হাত বাঁধা.. চোখের জলও ভালো করে মুছতে পারছেন না! চোখের জল নাকের

জলের সঙ্গে মিশে গোঁফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে! ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছে—তবু কান্না থামাতে পারছেন না, চোখ-মুখ মুছতেও পারছেন না—ত্রিবেণীর স্রোত বয়ে চলেছে যেন সবেগে!

ভীড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো নটবরের ভায়রা-ভাই সুপ্রকাশ। হাতে কালো মরক্কো-চামড়ায় বাঁধানো একটা খাতা! নটবরের ডায়েরী, একেবারেই নিজস্ব! পিছনে বিনতা দিদি। ডায়েরীর একটা ছেঁড়া পাতা হাতে নিয়ে সুপ্রকাশ নটবরের চোখের সামনে ধরলো, তার পর বললে—"কি আরম্ভ করেছ হে? দিন-রাত্তির বসে বসে সাহিত্য-চর্চ্চা করছো? এর নাম সাহিত্য-চর্চ্চা?"

"কি হয়েছে দাদা?" নটবর প্রশ্ন করলে।

"কি হয়েছে দাদা? ন্যাকামো! খুব ঝানু লোক! চুপি-চুপি একলাটি বসে এই সব সঙ্কেতিক ছক্ লিখে কোথায় পাঠানো হচ্ছে শুনি? যাও এবার দ্বীপান্তরে। শেষকালে কি না ফিফথ কলামনিষ্ট। আরে ছ্যা!"

সুলতা এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে! সকলের সাড়াশব্দ পেয়ে ছুটে এসে নটবরের পায়ের উপর পড়লো আছাড় খেয়ে!

"হ্যাঁ গা, দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে কি জাপানে পালাতে চাও?"

সুলতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিনতা বললে,—"যদি সইতেই না পারবে···যদি তোমার ঐ কোথাকার কে এক শাঁকচুন্নী-প্রিয়াকে নিয়ে পালাবার মতলব ছিল··· তাহলে দ্বিতীয় পক্ষে আবার বিয়ে করেছিলে কেন? লজ্জা করে না মুখ তুলে কথা বলতে?"

"সত্যি বুঝতে পারছি না দিদি! কোথায় আবার পালাতে গেলুম!"

"ন্যাকা···জানেন না যেন!"

বিনতার কথায় বাধা দিয়ে সুপ্রকাশ অটুট গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে তর্জ্জন করে উঠলো—"চুপ···চুপ···একেবারে চুপ! মনে রেখো, আমি এখন পুলিসের ইনস্পেক্টর··· তোমার ভায়রা ভাই নই···অনেক দায়িত্ব আমার মাথায়। এ-সব কি লিখেছ? জাপানী প্লেন···জাপান···বর্ডার···"

সবিস্ময়ে নটবর তাকিয়ে দেখলেন, তাঁরই কল্পনা-প্রসূত জাপানী কবিতার নকল-করা ছোট ছোট অনেক-গুলো কথার সমষ্টিতে ভরা একখানি ছেঁড়া পাতা হাতে নিয়ে সুপ্রকাশের অনর্গল বকুনির স্রোত বয়ে চলেছে।

"এই ত্যাখো তোমার সাঙ্কেতিক কথার মানে আমরা ধরে ফেলেছি। এই যে···"

রুদ্ধ নিশ্বাসে নটবর পড়ে গেলেন,—"বঙ্গদেশের কৃষক-কুল যখন জীবন্মৃত, তখন বৈঠকখানায় চাঁদের আলো আর হাস্নুহানার গন্ধ গায়ে মেখে ফুলের রাশি নিয়ে রঙীন শাড়ী পরে এলো একটি মেয়ে। বুকে বল নিয়ে বিদ্রোহ করে পালাবে শত্রু-শিবির থেকে···সঙ্গে যাবে সেই মেয়ে। জাপানী প্লেনে করে যাবে জাপান বর্ডারে···চারি দিকে ভীষণ বোমা···তারই মধ্য দিয়ে গিয়ে জাপান বর্ডারে বাঁধবে দু'জনে ছোট্ট ঘর—শান্তির নীড়!"

"কি হে কথা বলছো না যে! বড় আরাম, না? নিভৃত কুঞ্জ···"

"দোহাই দাদা, ও আমার কবিতা!"

ভীষণ রেগে উঠলো সুপ্রকাশ—"ফের বাজে কথা! কবিতা আমরা পড়িনি কোন দিন? কবিতা লেখা শেখাচ্ছ? কবিতার মধ্যে হাজারটা শুধু জাপান!"

"বঙ্গদেশও তো আছে।"

"বঙ্গদেশ? কোথাকার কে এক নবীন প্রিয়া—তাকে নিয়ে পালাবার মতলবে জাপানীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র হচ্ছে! লেখার নামে এই কীর্ত্তি!···কেন, সুলতা কি অপরাধ করলে শুনি?"

"দাদা, এবারকারের মত আমাকে উদ্ধার করুন··· আর কোন দিন···"

"কোন কথা নয়। এই রামসিং, নিয়ে চলো থানা!"

"কি বিপত্তি! আমার কথা শুনুন···"

"আবার কি? সে সব শুনবো কোর্টে।"

সুলতা আর থাকতে পারলো না···হাজার হোক স্বামী! সর্ব্বসমক্ষে স্বামী-নির্য্যাতন!

মিনতির সুরে সুপ্রকাশকে বললে—"বলতেই দিন্ না জামাইবাবু···কি বলতে চায়!"

নটবর যেন অকূলে কূল পেলেন—"হ্যাঁ, শুনুন আগে আমার কথা···"

"আচ্ছা বলো···কি বলতে চাও···"

"দেখুন, জাপানী কবিতার অনুকরণে কবিতা লেখবার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিলো। সেই জন্যই হয়েছে ঐ কথা-গুলোর সৃষ্টি···"

ও-পাশ থেকে বিনতা বলে উঠ্লো—"বিশ্বাস হয় না বাপু। যে তোমার জাপান···তাও আর কিছু নয়, জাপানী কবিতা! জাপান বর্ডার···নবীন প্রিয়া··· এ সব তো ভালো নয়।"

নটবর আর্ত্তনাদ করে উঠ্লেন,—"নবীন প্রিয়া আর কেউ নয়···আপনারই বোন শ্রীমতী সুলতা দেবী···আর জাপান বর্ডার জাপানের সীমান্তে নয়···নতুন উঠেছে এক রকম শাড়ী···জাপানী ছবি-আঁকা, ফুল-ফল লতাপাতা··· এই সব। যেমন মহীশূর বর্ডার, কানপুর বর্ডার, বোম্বাই প্রিন্টের শাড়ী আছে···এও তেমনি জাপানী বর্ডার শাড়ী। সেদিন চৌরঙ্গীতে দেখলুম, একটি মেয়েকে পরে যেতে··· ···কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেটেও দেখেছি কতকগুলো। ইচ্ছে ছিল সুলতার জন্য একটা কিনে আনবো।··ভারী সুন্দর দেখতে"···

এই ব্রহ্মময় নটবরের বসবার ঘর থেকে অফিসার দু'জন বেরিয়ে এসে সুপ্রকাশকে বল্লেন—"কৈ মশাই···আপত্তি-জনক তো কিছু দেখলুম না।"

"আপত্তি-জনক কিছু থাকলে তো দেখবেন! মাথার মধ্যে ঘুরছিলো তিন লাইনের জাপানী কবিতা,··· চোখের ওপর ভাসছিলো জাপান বর্ডার শাড়ী···তার ওপর লোকজনের জাপান-ভীতি···এই ত্রেরস্পর্শ মিলে আজ আমার এই অবস্থা। নমস্কার আর্ট-সৃষ্টির পায়ে!"

সুলতা সভয়ে একবার সেই অফিসার দু'টির হাতের দিকে চেয়ে দেখলে। না, গাদা পিস্তল, বারুদ-টারুদ নেই তো! বাঁচা গেল। তা হলে সত্যই কিছু নয়।

সুপ্রকাশ এগিয়ে এসে নটবরের হাতকড়া খুলে দিতে দিতে বললে,—"আর্ট সৃষ্টি করতে পারো কিন্তু দোহাই তোমার, দুর্ব্বোধ্য করো না। এমন জিনিষ লিখো না যা লোকে পড়ে বুঝতে পারবে না। আমরা যদিও অনুমান করেছিলুম যে, এটা ঐ জাতীয় কিছু-একটা হবে! মোদ্দা আর কারুর হাতে পড়লে তোমার হয়তো সত্যিকারের দ্বীপান্তর হতো!"

"সে কথা আর বলতে! সাহিত্য-চর্চ্চা করতে গিয়ে আমার মত অবস্থায় বোধ হয় আর কেউ পড়েনি।"

নটবর ঘরে এসে ঢুকলেন। পিছন-পিছন এলো সুলতা, বিনতা ও সুপ্রকাশ। সকলের কৌতূহলোদ্দীপক চোখের সামনে একটা বই তুলে নিয়ে নটবর দেখালেন, তার পর সহাস্যে বল্লেন,—"যত নষ্টের মূল রবীন্দ্রনাথের এই 'জাপান-যাত্রী'। এই থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলুম—নতুন কিছু সৃষ্টি করবার সঙ্কল্প!"

বাঙ্গলার সাহিত্য-সমাজ ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হবার সুযোগ পেয়েও তা হারাতে বাধ্য হলো শুধু নাম-মাহাত্ম্যে!

শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ

সাগর-কন্যা

আমি যেন কোন্ বিদেশী রাখাল পথ হারাবার ছলে
পথের প্রান্তে বেঁধেছি রাতের বাসা;
যারে খুঁজিলাম অনন্ত কাল গোধূলি-আকাশ-তলে,
সহসা কি আজ পাঠালো সে ভালোবাসা!
এই মুহূর্ত্ত রবে না, রবে না জানি—
আবর্ত্ত বেগে ভেসে যাবে এই বাণী;
প্রভাতের দেশে সহসা নিমেষে এ আলো মিলাবে দূরে,
ছায়া-চঞ্চল জীবনের লীলা বাজে রাখালিয়া সুরে।

তোমার আমার দু'জনার মাঝে সুদূর কালের নদী—
ব্যাকুল অশ্রু ঢেউয়ে ওঠে ছল-ছল;
না বলা ভাষায় হৃদয়-বেদনা সেখানে পাঠাই যদি,
জেনো সেই মোর নিবেদন-অঞ্জলি!
চাঁদের সুধায় জেগে ওঠে পারাবার,
উদ্বেল হিয়া নীরবে বহিবে ভার;
তুমি যেন কোন্ সুন্দরিকা মেয়ে, মানস-সায়র-কূলে
বাসর-সন্ধ্যা জাগায়ে রেখেছো! আসিবে কি পথ ভুলে?

অস্তগিরির ওপারে রয়েছে সাগর-কন্যা-দেশ,
পাতালপুরীতে সাগরিকা মেয়ে জাগো!
আলেয়া কি জ্বলে মণি-কবরীতে,—পথ কি হবে না শেষ?
অন্ধ চলেছি রজনীগন্ধা গো!
তুমি চলে যাও তেপান্তরের পারে,
আমি ঢেউ হয়ে খুঁজে খুঁজে মরি কারে?
শেষ হলে খেলা সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যা-তারার রূপে
আমার জীবন-দিগন্ত-নভে দেখা দিয়ো চুপে চুপে!

শ্রীকরুণাময় বসু

আভ্যুদায়িক

বাঁশী ভেঙ্গে গেল, তার গেল ছিঁড়ে, তবু কাণে রবে রেশ!
আজও ভালো লাগে স্বপনের ঘোর আধ-জাগ্রত ঘুমে?
রজনীগন্ধার মালা গাঁথা, কবি, আজিও হবে না শেষ!
মৃত্যু-সাগর গর্জ্জে শোনোনি জীবনের বেলাভূমে?

নীল-নয়নার আঁখিতারাতলে এঁকো না নিজের নাম;
সামনে শ্মশান! বুকে ওড়ে শুধু শকুন মৃত্যুদূত।
আজ বাজারেতে ইস্পাত চাই, নাই জীবনের দাম,
রঙ্গীন পেয়ালা চিড় খেয়ে গেছে, বিস্বাদ ভাম্র্থ।

সভ্য নরের কণ্ঠ ভরেছে বিষে, তারই ছাপ মুখে—
কোথা পাবে আজ উৎসব-ঘন রজনী দীপান্বিতা?
নীল মৃত্যুর ডাক শোনা যায় নীল সাগরের বুকে,
দীপ্ত আকাশে জ্বলে শুধু আজ দিবসের শেষ চিতা।

ম'রে ম'রে যারা জিতেছে মরণ, দেখ কবি! চোখ খুলে
সেই শবদল দু'বাহু বাড়ায়ে মাগে জীবনের দাবী।
নিঃশেষে যারা দিল প্রাণরস সভ্যতা-তরুমূলে—
আজ তারা মাগে সঞ্চিত সেই ভাণ্ডার-দ্বার-চাবী।

আজ তারা চায় পাওনা-দেনার হিসাব, আখেরী আজ।
বন্ধ্যা রজনী? ক্ষোভ নাই, আসে আঁধারের অবসান!
কত শতকের মুখোস টুটেছে, ধূলায় জীর্ণ সাজ—
জীবনের স্রোতে বান ডাকে, কবি, গাও জীবনের গান।

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান-জগৎ

পোষাকের নিখুঁৎ মাপ

গায়ে নিখুঁৎ-ফিট্ করিবে, এমন পোষাক মাপ লইয়া ক'জন দর্জ্জী বানাইতে পারে? পোষাকের মাপ-সম্বন্ধে যাঁদের খুঁৎখুঁতানির অন্ত থাকে না, তাঁরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন—বিলাতের দর্জ্জীরা পোষাকের মাপ লইতে বৈজ্ঞানিক কৌশলে থার্মো-প্লাষ্টিকের ছাঁচ গড়িয়া লইতেছে। অঙ্গের যেখানে টোল বা ঢিলা-ঢালা বা উঁচু ঝিঁক থাকুক না কেন, রেখায়-রেখায় এ-ছাঁচের দৌলতে সে-সবের উপর দিয়া নিখুঁৎ মাপ লইয়া নিখুঁৎ পোষাক তৈয়ার করিতেছে। এ ছাঁচে মাপ লওয়ার ফলে পোষাক তৈয়ারী করিতে সময় লাগে কম; যিনি পোষাক তৈয়ারী করান, তাঁকে একটি বারও গায়ে পোষাক চড়াইয়া 'ট্রাই' দিতে হয় না। রবার ও মোম দিয়া এ প্লাষ্টিক তৈয়ারী হইতেছে। কাপড়ের থানের মত, প্লাষ্টিকের থান কাটিয়া দর্জ্জীরা খরিদ্দারের অঙ্গে চাপাইয়া গায়ের রেখায় রেখায় মিলাইয়া পোষাকের মাপ লয়। পূর্ণ-অঙ্গের মাপ লইতে সময় লাগে আধ ঘণ্টা। চার প্রস্থ প্লাষ্টিকে মাপ লওয়া হয়—দু' প্রস্থ সামনের দিকে এবং দু'-প্রস্থ পিছন দিকে আঁটিয়া। সন্দেশের জন্ত যেমন ছাঁচ ব্যবহার করা হয়, ঠিক সেই রীতিতে। পোষাক তৈয়ার হইয়া গেলে এ-ছাঁচকে পিটিয়া প্লাষ্টিকের থানটুকুর পুনরুদ্ধার করা চলে—তার পর সে প্লাষ্টিকে আবার লওয়া হয় নূতন গায়ের মাপ।

প্লাষ্টিকে গায়ের মাপ লওয়া

যুদ্ধের বিমান-ফটো

এবারকার এ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নানা জাতের ফৌজ ও নানা অস্ত্রশস্ত্রের উপর আর একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে; সে বিভাগটির নাম বিমান-ফটো-বিভাগ। এ বিভাগের কাজ—প্লেনে চড়িয়া বিপক্ষ-ক্ষেত্রের ফটো তুলিয়া বেড়ানো। সে ফটো দেখিয়া বিপক্ষের উদ্যোগ-আয়োজনের পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ফটোগ্রাফার ফটো তুলিয়া পাঁচ মিনিট বাদে ফিল্মগুলি স্বদলের ছাউনিতে প্যারাশুট সাহায্যে ফেলিয়া দেয়; ছাউনিতে যে ফটো-বিভাগ আছে, সে-বিভাগের কর্ম্মচারীরা সেই ফিল্ম তখনি ডেভেলপ করে; ডেভেলপ হইবামাত্র সে ফটোর বহু প্রতিলিপি ছাপিয়া নানা বিভাগে পাঠানো হয় বিমান-ডাকে অথবা দ্বিচক্রবাহী হরকরার মারফৎ। ছাউনিয়ে প্লেনের সঙ্গে আঁটা আছে ক্যাম্বিশে-কাঁপানো 'ডার্ক-রুম'; সেই ডার্ক-রুমে বসিয়া কর্ম্মীরা ফিল্ম ডেভেলপ করে। এ ব্যবস্থায় বিপক্ষের উদ্যোগ-আয়োজনের সংবাদ যেমন সঠিক ভাবে পাওয়া যায়, তেমনি সে সংবাদ ছাপিতে বা প্রচার করিতে এতটুকু বিলম্ব ঘটে না।

ফাঁপা ডার্ক-রুম

ফিল্ম-ডেভেলপিং

অতিকায় বিমান-পোত

প্রায় চার বৎসরের গবেষণা-অধ্যবসায়ের ফলে আমেরিকার বিমান-বিভাগ ২২০০ অশ্বশক্তি-যুক্ত অতিকায় বিমানপোত-নির্ম্মাণে আশ্চর্য্য

বী—১১ বিমান-পোত

পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। এ বিমান-পোতের নাম "বী-১১"—এত বড় সামরিক বিমানপোত পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই! ন'সেকেণ্ড মাত্র সময়ে এ পোত মাটীর বুকে ১৫০০ ফুট মাত্র সবেগে ছুটিবার পরেই আকাশে উঠিতে এবং চকিতে বিপুল বেগে নামিতে পারে। এ পোতের পাখা দু'খানি ২১২ ফুট দীর্ঘ; এবং একখানি বিমান-পোতে প্রায় ১২৫ টন করিয়া পেট্রোল ধরে; বোমা ধরে প্রায় সাত-আট শত টন্ ওজনের। এ পোতের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০০ মাইল।

ফৌজ-পার-করা বোট

ফৌজকে নদী পার করাইতে মার্কিন সমর-বিভাগ লক্ষ লক্ষ মজবুত বোট তৈয়ারী করিতেছে। এ বোটের নাম "এ্যাসল্ট বোট (assault
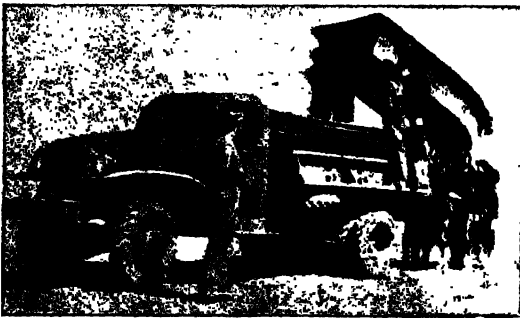
এ্যাসল্ট-বোট

boats)"। এক-একখানি বোটের ওজন আড়াই মণ। ট্রাকের উপর প্রায় শ'খানেক বোট থাকে যাত্রী-বাহিনীর সঙ্গে। পথে নদী থাকিলে ট্রাক হইতে এই বোট নামাইয়া বোটে করিয়া ফৌজকে নদী পার করানো হয়। তাছাড়া নদীর বুকে পর-পর এই সব বোট সাজাইয়া এঞ্জিনীয়ারের দল সেতু রচিয়া তোলেন। বোট-সেতুর উপর দিয়া ভারী ভারী কামান-গাড়ী ও ট্রাক পার করাইতে কোনো অসুবিধা ঘটে না।

অচলের চরণ-চালনা

পক্ষাঘাতে যাদের চলিবার শক্তি নাই—বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হয়, তাঁদের সচল করিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার মিলান বেরি প্রতিষ্ঠান বহু গবেষণায় বিশেষ ছাঁদের ব্রেশ এবং জুতা তৈয়ারী করিয়াছেন। কাঁধের উপর দিয়া এই ব্রেশ ঝুলাইয়া ব্রেশের দুই প্রান্তের ফিতার সঙ্গে ইঁহাদের তৈয়ারী এ-জুতা পায়ে আঁটিয়া পক্ষাঘাত-গ্রস্ত বহু রোগী পায়ে হাঁটিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ব্রেশ ও জুতা

জুতা বেশ চওড়া গড়নের—কাজেই চলিবার সময় টলিয়া পড়িবার ভয় থাকে না ; ব্রেশের জন্য পা ঠিক ভাবে ফেলা যায়। এই ব্রেশ ও জুতার কল্যাণে রোগী ধীরে ধীরে পেশী-গুলিকে চালনা করিতে সমর্থ হন। এ ব্যবস্থায় অচল পা খানিকটা সচল হইবার সঙ্গে সঙ্গে জুতার মাপ যথাযথ ছোট করা হয়। এই ব্রেশ ও জুতার সাহায্যে ইন্ফ্যান্টাইল-প্যারালিসিস্-এর বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

প্যারাশুটের কৌশল-শিক্ষা

দ্বিচক্র-বাহিনী

আমেরিকার নব-প্রবর্ত্তিত দ্বিচক্র-বাহিনী এ যুদ্ধে বিদ্যুৎগতিতে কর্ত্তব্য সমাধা করিতেছে। বর্ম্মে আপাদ-মস্তক আবৃত এ ফৌজের সঙ্গে আছে 'সাব-মেসিন গান।' মোটর-বাইকে চড়িয়া উল্কার বেগে এ বাহিনী রণক্ষেত্রে নামিয়া চকিতে বিনাশ সাধন করিয়া ছায়ার মত ক্ষেত্রান্তরালে অপসৃত হইতে পারে! বিপক্ষ-পক্ষ পূর্ব্বাহ্ণে যেমন এ বাহিনীর গতির আভাস পায় না, চকিত-তিরোধানও তেমনি বিপক্ষের কাছে পরম বিস্ময়!

দ্বিচক্র-বাহিনী

প্যারাশুট-বাহিনীর শিক্ষা

এই যে আজ প্লেনে তুলিয়া দিক্‌দিগন্তে ফৌজ পাঠানো হইতেছে, তাদের কাজ প্যারাশুট ধরিয়া বিপক্ষ-ক্ষেত্রে নামিয়া অতর্কিতে প্রলয়-লীলা সাধন! সে-বাহিনীর অবতরণ যাহাতে নিরাপদ এবং সুনিশ্চিত হয়, সে সম্বন্ধে কত ভাবেই যে তাদের ঝাঁপ খাওয়া শিখিতে হয়, সে কাহিনী রীতি-মত রোমাঞ্চকর! শিক্ষার প্রথম পর্ব্বে চার জন করিয়া শিক্ষার্থীকে নিরা-পদ আসনে বসাইয়া প্যারাশুটে সে-আসন কায়েমি করিয়া বাঁধিয়া সামান্ত উঁচু জায়গা হইতে ভূমে নিক্ষেপ করা হয়। প্যারাশুট নিক্ষেপে এমন কৌশল যে, তাহাতে নবীন শিক্ষার্থী-দের এতটুকু বিপত্তি ঘটে না! তার পর এ শিক্ষা খানিকটা অভ্যাস হইয়া গেলে আসন খুলিয়া শিক্ষার্থীকে শুধু প্যারাশুট-যোগে ১৫০ ফুট উঁচু জায়গা হইতে নামিতে হয়। উর্দ্ধ পথের মাত্রা তার পর ক্রমে বাড়াইয়া একেবারে আকাশস্পর্শী করা হয়। শিক্ষার্থীর মনে এত দিনে দুর্জ্জয় সাহস জাগে এবং প্যারাশুটকে সে নিরাপদে চালাইতে সমর্থ হয়।

কালান্তক-বোমা

ব্রিটিশ সমর বিভাগ কালান্তক মহা-কাল সদৃশ এক-জাতের বোমা তৈয়ারী করিয়াছে। এ বোমার এক-একটির ওজন এক টন করিয়া। এ বোমা
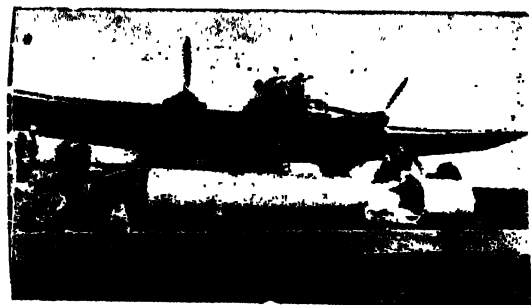
কালান্তক বমার

যে সব বাড়ী-ঘরের উপর পড়ে, সে সব বাড়ী-ঘর চকিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। বোমার ধ্বংস-কার্য্য যতক্ষণ চলে, ততক্ষণ আগুনের লাল-শিখা অত্যুগ্র ভাবে জ্বলে। প্রলয়-কার্য্য সমাধার সঙ্গে সঙ্গে আলো আপনা হইতে নিবিয়া যায়। এ বোমায় আগুনের তুফান ওঠে না! বোমা যার উপর পড়ে, তাহাকেই শুধু চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয়।

লণ্ডনের ক্লক-টাওয়ার

লণ্ডনের ক্লক-টাওয়ার পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য বস্তু। যুদ্ধের দৌরাত্ম্যে এ ক্লক-টাওয়ারকে তার উচ্চাসন হইতে নামাইয়া পথে মাটীর উপর
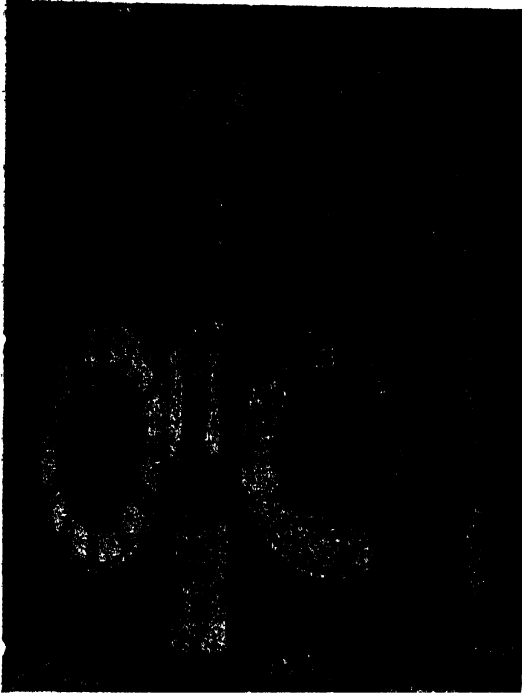
ঘড়ির মধ্যে বার্ত্তা-ষ্টেশন

বসানো হইয়াছে। ঘড়ির মধ্যকার কলকব্জা প্রভৃতি সব খুলিয়া লইয়া এই বিরাট ঘটিকা-যন্ত্রটিকে "বার্ত্তা-ষ্টেশনে" পরিণত করা হইয়াছে।

পালঙ্ক-বৈচিত্র্য

বিছানায় সুখ-শয়নে শুধু আরাম-নিদ্রা উপভোগ নয়, অর্দ্ধশায়িত ভাবে থাকিয়া লেখাপড়া, সাজ-প্রসাধন করা—সব কাজ চলিবে বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবে, এই উদ্দেশ্যে মার্কিন শিল্পীরা তৈয়ারী করিতেছে বিনোদ-পালঙ্ক! এ পালঙ্কে বিছানা পাতা; তার উপর পালঙ্কের মাথার দিকে আছে শেল্‌ফ—শেল্‌ফে বই রাখুন, কাগজ-কলম-পেন্সিল রাখুন; শয্যার নীচে ড্রয়ার আছে, সেই ড্রয়ারে রাখুন জামা কাপড় জুতা—তার উপর আবার মাথার দিক্‌কার তাকে রেডিয়ো-সেট রাখুন, ঘড়ি টেলিফোন রাখুন! অর্থাৎ জীবনকে উপভোগ করিবার উপযোগী সর্ব্ববিধ সরঞ্জাম রাখা চলে। এ পালঙ্ক কিনিলে শয়ন-কক্ষের উপর বসিবার

সব-কাজে-লাগা পালঙ্ক

কামরার প্রয়োজন থাকিবে না। পালঙ্কের দৌলতে শোয়া-বসা, আনন্দ-বিরাম-উপভোগ মায় কাজ-কর্ম্ম চলিবে স্বচ্ছন্দ ভাবে।

টেবিলের মধ্যে টেবিল

মার্কিণ-শিল্পীর কীর্ত্তি! কৌটার মধ্যে যেমন কৌটার প্রচলন ছিল, তেমনি ভাবেই পর্য্যায়ক্রমে ছোট বড় এক-হালি টেবিল তৈয়ারী
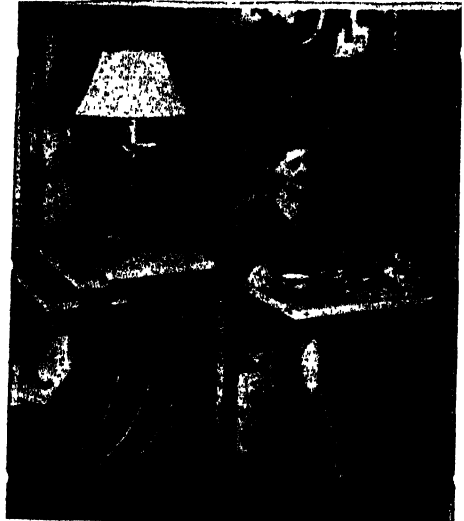
ভাঁজে-ভাঁজে সাজানো টেবিল

করিতেছে মার্কিন শিল্পীর দল। আবরণের মধ্যে একসঙ্গে থাকে-থাকে সাজানো চার-পাঁচখানি করিয়া হাল্‌কা টেবিল! যখন যে-সাইজের টেবিলের প্রয়োজন, স্বচ্ছন্দে টানিয়া বাহির করিয়া ব্যবহার করুন।

এলায়িত তনু

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য অটুট রাখিতে চাহিলে কোনো কাজে তাড়াহুড়া করা চলিবে না ; এবং যত কাজই আমরা করি না কেন, কাজের পর বিশ্রাম চাই-ই চাই। তাঁরা বলেন, স্বাস্থ্য ভালো থাকিলে গাছপালা ফল-ফুল যেমন পরিপুষ্ট সুন্দর দেখায়, মানুষের দেহখানিও তেমনি স্বাস্থ্যের দৌলতে হয় শোভন-সুন্দর।

গত বৈশাখ মাসে আমরা বিরাম-সাধনার কথা বলিয়াছি ; এবারেও বিরাম-সাধনা সম্বন্ধে আরো কটি কথা বলিব।

এই যে রাত্রে বিছানায় শুইয়া অনেকের চোখে ঘুম আসে না—শুইয়া এ-পাশ ও-পাশ করেন ; তার পর হাত-পা জ্বালা করা, কোমর কামড়ানো, পা-টন্‌টন্, মাথা-ধরা, রগ্-ঝন্‌ঝন্ প্রভৃতি উপসর্গ, এ-সব ভাব দেখা দিলে বুঝিতে হইবে আমাদের দেহ চায় বিরাম-

১। ডান পায়ের গোড়ালি তুলিয়া

২। পিঠ নোয়াইয়া

বিশ্রাম। এই বিরাম-বিশ্রাম-সাধনাও শিখিতে হয়।

দেহ-মনের স্বাস্থ্য ভালো থাকিলে সুনিদ্রা হইবে—এবং ঘুম-ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে সব অবসাদ-গ্লানি ঘুচিয়া দেহ হইবে তাজা, কর্ম্মক্ষম। এ সুখে যাঁরা বঞ্চিত নন, পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞের মতে they are of attractive, often of magnetic personality স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে তাঁদের কর্ম্ম-শক্তি যেমন অপরূপ, সুষমা-শ্রী এবং লাবণ্য-হিল্লোলে তাঁদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও হয় তেমনি শোভন সুন্দর।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর—অথবা সংসারের কাজে যাঁদের খাটা-খাটুনির তেমন বালাই নাই, তাঁদের পক্ষে—সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রসাধনাদির প্রাক্কালে কয়েকটি ব্যায়াম-বিধি পালন করা উচিত। সেই ব্যায়াম-বিধির কথা বলিব।

১। সারা দেহ বেশ আলগা করিয়া সিধা হইয়া দাঁড়ান ; তার পর ডান পায়ের গোড়ালি তুলিয়া ডান হাতখানি বক্র ভাবে ১নং ছবির ভঙ্গীতে তোলা-নামা করুন ধীরে ধীরে ; পরে ডান পা মেঝেয় সমতল ভাবে রাখিয়া বাঁ পায়ের গোড়ালি তুলিয়া বাঁ হাত বক্র করিয়া তোলা ও নামানো। এ ব্যায়াম করিতে হইবে ধীরে ধীরে। কবিরা যাকে বলেন, 'অলস শিথিল ভঙ্গী'—ঠিক তেমনি ভাবে। পাঁচ মিনিট এ ব্যায়াম করিবেন।

২। তার পর ২নং ছবির ভঙ্গীতে পিঠ নোয়াইয়া সামনে ঘাড় হেলাইয়া দু'হাত পর্য্যায়ক্রমে দুলানো—হাঁটুতে হাত ঠেকিবে। বাঁ হাত বাঁ হাঁটুতে, ডান হাত ডান হাঁটুতে ঠেকিবে। এ ব্যায়াম করিবেন পাঁচ মিনিট।

৩। এবার বেশ আলগা ভাবে দাঁড়াইয়া—সারা দেহ আলগা রাখিয়া একটু পিছনে হেলিয়া ৩নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত প্রসারিত করিয়া সামনে-পিছনে ধীরে ধীরে দুলান্ প্রায় পাঁচ মিনিট।

৪। চারের পর্ব্বে আলগা ভাবে দাঁড়াইয়া সারা দেহখানিকে ধীরে ধীরে একবার ডান দিকে, পরের বার বাঁ দিকে ৪নং ছবির

৩। দুই হাত প্রসারিত

ভঙ্গীতে দুলান্—যখন বাঁ দিকে দেহ দুলাইবেন, তখন ডান পা বেশ সুদৃঢ় থাকিবে ; বাঁ পা সামনে আগাইয়া দিবেন এবং বাঁ হাত আসিবে পিছনে। (৪নং ছবি দেখুন)।

বাঁ পা থাকিবে সুদৃঢ় খাড়া ; ডান পা সামনের দিকে আগাইতে হইবে এবং ডান হাত আসিবে পিছনে। এ ব্যায়ামও করা চাই পাঁচ মিনিট।

৫। এবার সারা দেহ যেন এলাইয়া পড়িয়াছে, হাতে পায়ে জোর নাই এমনি ভাব—এমনি ভাবে ৫নং ছবির ভঙ্গীতে পা টানিয়া টানিয়া ঘরে চলিয়া বেড়াইবেন প্রায় পাঁচ মিনিট। এ ব্যায়ামে সুগভীর ক্লান্তির অবসান হইবে এবং রাত্রে নিদ্রা হইবে বেশ গাঢ়।

৬। ষষ্ঠ পর্ব্বে সামনের দিকে মাথা ঝুঁকাইয়া শিথিল দেহ লইয়া ৬নং ছবির ভঙ্গীতে সামনের দিকে চলিবেন—তার পর পিছন দিকে ঝুঁকিয়া [illegible] ভঙ্গীতে চলা—পর্যায়ক্রমে একবার ডান দিকে পরে বাঁ দিকে মাথা ঝুঁকাইয়া এমনি শিথিলিত তনু বহিয়া চলা—এ ব্যায়াম করিবেন পাঁচ মিনিট।

৭। এবার ৭নং ছবির ভঙ্গীতে কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত সামনের দিকে ঝুঁকিয়া সামনে পিছনে চলা—প্রায় পাঁচ মিনিট।

এ কয়টি ব্যায়াম-বিধি যদি নিত্য পালন করেন, তাহা হইলে দেহে-মনে কখনো ক্লান্তি বোধ করিবেন না এবং ক্লান্তির জন্য সৌন্দর্য্যশ্রীর অপচয় ঘটিবার আশঙ্কা থাকিবে না।

৫। দেহ যেন এলাইয়া পড়িয়াছে

৪। একবার ডান দিকে

৬। সামনের দিকে

৭। কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত

নিদ্রার গুণ

দেহ-মন সুস্থ রাখতে হলে আহার এবং ব্যায়ামের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন নিদ্রার। বিছানায় শোবামাত্র যাঁদের চোখে ঘুম আসে, রাত্রে সে ঘুম ভাঙ্গে না—তাঁদের সৌভাগ্যের সীমা নাই! রাত্রে যাঁর নিদ্রার কোনো ব্যাঘাত ঘটে না, তাঁর দেহ-মনের স্বাস্থ্য যে ভালো, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনো কারণ থাকতে পারে না। দেহে রোগ এবং মনে উৎকণ্ঠা-জনিত অশান্তি থাকলে সুনিদ্রা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি নিদ্রার ব্যাঘাত যদি ঘটে, সুনিদ্রা না হয়, তাহলে তার ফলে দেহ-মনের অস্বাস্থ্য ঘটবেই। এই কারণে বিশেষজ্ঞেরা বলেন, নিদ্রা আমাদের সাধনার সামগ্রী—নিদ্রার জন্য সাধনা করা চাই! নিদ্রার সাধনা করতে হলে কয়েকটি 'নেতি'-নিয়ম মানতে হবে। বিশেষজ্ঞদের সেই 'নেতি'-বিধি নাকি নিদ্রা-সাধনার অমোঘ মন্ত্র।

তাঁরা বলেন :—

গায়ে ভারী লেপ কাঁথা চাপিয়ে বা কতকগুলো জামাজোড়া এঁটে শয়ন করবেন না,—কখনো না। একখানা চাদর এবং শীতের দিনে হালকা একখানা লেপ বা কম্বল গায়ে দেবেন। রোগেও এই ব্যবস্থা। একে তো তোষক-বালিশের জন্য শয্যা স্বভাবত একটু গরম —তার উপর গায়ে এক-গাদা চাদর বা লেপ চাপালে বিছানা আরো গরম হবে—সে কারণে সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবে। নিদ্রা-কালে গায়ে বাতাস লাগা চাই ; তবে জলো বা ঠাণ্ডা বাতাস সরাসরি না গায়ে লাগে,—সে বিষয়ে সাবধান।

শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্ব-ক্ষণে আহার অবিধেয়। এমন অভ্যাস যদি মজ্জাগত করে থাকেন তবে তা ত্যাগ করুন। শুতে যাবার সময় এক পেয়ালা গরম দুধ, না হয় এক গ্লাস জল (ঠাণ্ডা জল নয়) পান করলে খুব উপকার পাবেন।

শোবার ঠিক আগে কোনো রকম শারীরিক ব্যায়াম-সাধনা বা সমস্যা-ভঞ্জনের চেষ্টা করবেন না। আঁট-সাঁট জামা-কাপড় শয়ন-কালে বর্জ্জনীয়।

শুয়ে যদি ঘুম না আসে, তাহলে ঐ যে ঘড়ির পেণ্ডুলামের শব্দ শোনা কিম্বা ১ থেকে ১০০ পর্য্যন্ত অঙ্ক গোণা প্রভৃতি চলতি উপদেশ আছে, সে উপদেশ মানবেন না। তাতে মনকে খাটাতে হয়।

পোষা কুকুর বিড়াল পাখী—রাত্রে এগুলিকে শয়ন-ঘরে রাখবেন না। এমন ভাবে শয্যা বিছোবেন যেন ভোরের রৌদ্র এসে না মুখে লাগে! অসমতল শয্যায় বা ছেঁড়া মাদুরে বা সতরঞ্চে শয়ন করবেন না। 'এ্যালার্ম-ক্লক' বাজিয়ে ঘুম ভাঙ্গানোর ব্যবস্থা ভালো নয়।

ঘুমের ঔষধকে বিষ বলে জানবেন। সে বড়িতে দু'রাত্রি হয়তো চোখে ঘুম আসবে—কিন্তু দেহখানি জীর্ণ হয়ে যাবে।

নিদ্রা সম্বন্ধে কোন রকম নকল বিধি-নিয়ম মানতে গেলে নিদ্রা-সুখের আশা জন্মের মত খোয়াতে হবে।

বিছানায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে নিদ্রা-সাধনা—সম্পূর্ণ অনুচিত। এ কদভ্যাস ত্যাগ করবেন। বই পড়ায় মনের পরিশ্রম হয় অনেকখানি—বইয়ের পাতায় চোখ মেলে রাখলে নিদ্রা চোখের কাছে ঘেঁষতে পারবে না!

যদি বলেন, বই পড়তে পড়তে চমৎকার ঘুম আসে তো—তার উত্তরে বলবো, দু'-চার মাস বা দু'-চার বছর হয়তো ঘুম আসবে, তার পর ঘুমের কণাও আর চোখের ত্রিসীমায় ঘেঁষবে না।

ঘুমের জন্য সময় রুটিনে বেঁধে নির্দ্দিষ্ট রাখবেন। আজ মজলিস ছিল বলে রাত্রি একটার পর শুতে গেলুম—কাল নিঃসঙ্গ বলে শয্যায় আশ্রয় নিলুম রাত্রি নটায়—তার পরের দিন থিয়েটার দেখে ফিরে রাত্রি তিনটায় শয়ন—এত-বড় অনিয়মে নিদ্রার সঙ্গে সম্পর্ক শুধু রহিত হবে, তা নয়; দেহ-মন অস্বাস্থ্যে জর্জ্জরিত হবে। এ ব্যবস্থায় যাকে বলে Slow poisoning—তাই ঘটে।

যত-বড় বিপদের আশঙ্কা থাকুক, যত উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ—বিছানায় শুয়ে সব দুশ্চিন্তাকে মন থেকে বিদূরিত করতে হবে। দুশ্চিন্তা করলে দুর্ভোগ কাটবে না—বিপত্তি-মোচনের উপায়ও নিরূপিত হবে না।

এক কথায় বলি, সুস্থ দেহ-মন নিয়ে যদি বাঁচতে চান, তবে নিদ্রাকে কদাচ উপেক্ষা অবহেলা করবেন না।

ঘটেছিল

গল্পে, উপন্যাসে, কিম্বা সভায় বাক্-পটুতায়, কল্পনা বাস্তবের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে, যদি অত্যুক্তি সুষ্ঠু কিম্বা ন্যায্য হয়। অর্থাৎ কল্পনা এক বাস্তবকে অন্য পরিবেশে প্রক্ষেপ করতে পারে, যদি প্রক্ষিপ্ত খাপছাড়া না হয়। না হ'লে কুটীরের উপর তাজমহলের চূড়া কেটে বসালে যেমন দৃষ্টিকটু ও বিসদৃশ হয়, গল্প তেমনি হয় শ্রীহীন আরব্য উপন্যাসে প্রদীপ ঘসলে দৈত্য আসতো। সে দিনে সে ঘটনা ছিল মনোরম কিন্তু উৎকট। তাকে কেহ বাস্তবের চিত্র ব'লে নিত না, আজও নেয় না। ম্যাজিক কারপেট বা যাদু ঘোড়ার অবস্থাও তদনুরূপ, কিন্তু আজকের দিনে একটু গুছিয়ে বলতে পারলে, বিজলী-প্রবাহের প্রভাবে, প্রদীপ জেলে অসুর-দর্শন ক্রীতদাস ডাকা যায়। কার্পেট বা অশ্ব না হ'ক হাজার হাজার উড়ো-জাহাজ পৃথিবীটাকে নিয়ে ন'কড়া ছ'কড়া করছে। ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ আজ বালিনধ্বংসী বোমারুদের কৃতিত্বে ম্লান-গর্ব্ব। দূর-দূরান্তের অদৃশ্যদের বক্তৃতা ও সঙ্গীত প্রতিক্ষণে শোনা সম্ভব। অতীতের বীরত্বের হুঙ্কার মাত্র রণপ্রাঙ্গণে কর্ণকুহরে প্রবেশ করত। আর আজ হিটলার, গোবেল, টোজো প্রভৃতির ব্যর্থ নিনাদ—তেন্ করেঙ্গা, তেন্ করেঙ্গা—গোয়ালঘরে শোনা যায় যদি তথায় একটা রেডিও যন্ত্র থাকে। সুতরাং কোন্ ঘটনা বাস্তবিক ঘটতে পারে, তা নির্ভর করে স্থান ও কালের উপর।

পাত্র সম্বন্ধে যাকে অঘটন মনে হয়, তা চিরদিন ঘটতে পারে। কারণ, অনবদ্য পর্য্যবেক্ষণেও মনের কর্ম্মক্ষেত্রের সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর মনের কর্ম্মের বিধিও সর্ব্বজনীন নয়—সব মন এক নিয়মে কাজ করে না। এক জনের গালে চড় মারলে সে অন্য গাল পেতে দেয়। অন্য এক ব্যক্তির গালে চড় মারলে, সে প্যালিয়ে গিয়ে দূর হ'তে গালিবর্ষণ করে, সুবিধা পেলে একটা ইটের টুকরা ছোড়ে। আবার চপেটাঘাতের প্রতিশোধে কত লোক আততায়ীর প্রাণ বধ করে।

মনোভাবের অনির্দ্দিষ্ট বিকাশের উপর প্রবচন প্রতিষ্ঠিত—গল্প হ'তে সত্য বিস্ময়কর—'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্শন'। মানুষের বহু আচরণ তার নিজেরই কল্পনাতীত। রবিবারে যে দেশ-প্রেমিক দেশপ্রিয় পার্কে ফুকারিয়া বলে—'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়'—সোমবার প্রাতে সে সংবাদপত্রে সমর সমাচার পাঠ করে উদ্রেকে বলতে পারে—কাজ কি হাঙ্গামায়? স্বাধীনতার সহগামী যদি হয় যুদ্ধ-বিগ্রহ, ইংরেজ পাহাড়ের আড়াল নিরাপদ। নভেলে মনোভাবের নানা রূপ দেওয়া যায়। তাতে গল্প উৎকট হয় না। সিড্নী কার্টনের মত কত নায়ক প্রেমের হাড়িকাঠে প্রাণ দিয়েছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, প্রথম সংখ্যা "অর্চ্চনায়" আমি এক ব্যঙ্গ-কবিতা লিখেছিলাম। এক মহাপ্রেমিক প্রেয়সীর মনোনয়নের আবেদনে পর্ব্বত লঙ্ঘন প্রভৃতি প্রতিশ্রুতির অনেক অসম্ভব উচ্ছ্বাসে, ইমোসানের আন্তরিকতা প্রকাশ করেছিল। প্রেমের বৈঠকে ও কাণ্ডগুলাও অসম্ভব নয়, কারণ, তার কিছু দিন পরে এক অভিনেত্রী-প্রেমোন্মাদ হাওড়া পুলের উপর হ'তে বিরামদায়িনী জাহ্নবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। লোকটাকে কয়েক জন অরসিক মাল্লা হেঁচড়ে টেনে তীরে তুলেছিল। তার মরা হল না। প্রসিদ্ধ অভিনেত্রীর মুখের দরদের বাণী তার তাপিত প্রাণ শীতল করেছিল কি না, সে সমাচার সে দিনের সংবাদপত্র সরবরাহ করেনি। তবে পুলিস তাকে আত্মহত্যার প্রয়াসের অভিযোগে হাকিমের বিচারাধীন করেছিল এবং সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে তিরস্কার করে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য, ঐ ঘটনার পরে এবং পূর্ব্বে বহু হতাশ প্রেমিক ভাঙ্গা প্রাণ জলে ফেলে দিয়েছে। বলছিলাম আমার ব্যঙ্গ কবিতার কথা। আমার কবিতার হিরোর উচ্ছ্বাসের প্রত্যুত্তরে তার অতি-প্রিয় বলেছিল—তোমাকে গ্রহণ করতে আপত্তি নাই, কিন্তু অগ্রে ফেল কাটি দাড়িটি তোমার। ফরাসী ফ্যাসনের দাড়ি। সখের শ্মশ্রু। তাকে কি কাটা যায়? সর্ব্বোপরি, এমন উচ্ছ্বাসের ঐ জবাব। যুক্তি এলো প্রেমের আসরে। যুবক বললে—দেখি তবে দাড়ি সহ বরিবে কোন জন!

মনস্তত্ত্বের দিক হ'তে এমন বিকাশ কি অসম্ভব? হাস্যাস্পদ হবার ভয়ে লেখক এমন সব মনোভাব কৌতুক রচনার মারফত পরি-বেশন করে। আজ বলি। গল্পটা মোটামুটি সত্য। এর নায়ক আমার এক বন্ধু। সে আমলে তরুণের তরুণীর সাথে অবাধ মেলা-মেশা সম্ভব-পর ছিল না। বেচারা এক তরুণীকে বিবাহ করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিল মুখোমুখি নয়—এক আত্মীয়ার মারফত। মহিলাটি বলে-ছিল—তোর দাদার যে দাড়ী। আগে কামাতে বলিস্। এই বিদ্রূপের ফলে উষার আলোয় শিশিরকণার মত তার প্রেম উবে গিয়েছিল। আমার কর্ম্ম-জীবনের অভিজ্ঞতায় এমন সব বিচিত্র মনো-ভাবের পরিচয় পেয়েছি, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে যাদের আজগুবি মনে হয়।

আমি এ প্রবন্ধে কতকগুলি সত্য ঘটনা বিবৃত করব। সত্য অর্থাৎ মূল সত্য। স্থান, কাল পাত্রের নাম কাল্পনিক। গল্পের মানুষদের চেনবার চেষ্টা বৃথা হবে; কারণ, চেনাবার উদ্দেশ্য আমার নয়। কেবল একই ঘাতে মানব-মনের প্রতিঘাত বিভিন্ন এই তত্ত্ব প্রমাণ করবার প্রয়াসে, এ প্রবন্ধ লেখা। কেবল একই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া, মানুষ-বিশেষে বিভিন্ন। অনেক ক্ষেত্রে স্ব-বিরোধী ভাবের বিকাশ প্রত্যক্ষ হয় একই কর্ম্মে—একই লোকের আচরণে।

ধরুন পিতৃ-ভক্তি। সকল শ্রেণীর লোক পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করে, নিজের মন্দ কাজ তাদের জানতে দেয় না, চুরি, জুয়াচুরির মধ্যে তাদের টানতে চায় না। অথচ জানি, এক'জন তার বাপকে পুড়িয়ে মেরেছিল। অর্থের জন্য ধনী পিতা কিম্বা নিঃসঙ্গ জননীর উপর জুলুমের কাহিনী আদালতে প্রায় শোনা যায়। এক কু-কর্ম্মী এক বারাঙ্গনাকে মা সাজিয়ে, মাতৃ-সম্পত্তি বন্ধক দিয়েছিল। সে দিন ঐ কর্ম্ম এক জন করেছিল বেশ্যাকে স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিয়ে। আবার স্ত্রীর অভিযোগে যখন তার এবং তার ক'জন সহকর্ম্মীর জেল হল, এক দল নবীন উকীল বললে, আচ্ছা তো স্ত্রী। আর ভিন্ন দল বললে—বেশ করেছে।

রড্রিগ্‌স্‌রা কলিকাতার ভদ্র এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবার। জ্যেষ্ঠ ফ্র্যাঙ্ক নিজ উপার্জ্জনে নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেছে। সে স্ত্রী এল্‌সী এবং পুত্র কন্যা নিয়ে নূতন বাড়ীতে বাস করে। বৃদ্ধ রড্রিগস সপরিবারে দু'টি পুত্র নিয়ে পুরাতন গৃহে থাকে। তারা ধর্ম্মপ্রাণ। পুত্রবধূটিও ভক্তিমতী। মাঝে মাঝে বুড়া-বুড়ীকে ধোরে আনে নিজের বাড়ীতে এবং নিত্য কিছু না কিছু উপঢৌকন পাঠায়। ফ্র্যাঙ্ক কাজের লোক। সারা সপ্তাহ কুলির মত খাটে। কিন্তু শনি, রবিবার বন্ধু-বান্ধবের সাথে বসে একটু আনন্দ করে। আনন্দ জোগায় সুরা—ব্রাণ্ডি, হুইস্কি। এল্‌সী ধরতে পারলে বোতল কেড়ে নেয় কিন্তু স্বামীকে শোধরাতে পারে না।

শীতের সন্ধ্যা। বড়দিনের আর পাঁচ দিন বাকী। শনিবার, এল্‌সী ফর্দ্দ করছিল উপঢৌকনের। কিন্তু স্বামী কোথায়? কে তাকে বাজারে নিয়ে যাবে—ফ্র্যাঙ্কেরই পুত্র কন্যা পিতা, মাতা, ভগ্নী মারী ডিসান্টোর প্রীতির জন্য এ ফর্দ্দ।

হঠাৎ তার দেবর জিমি এলো। ভীষণ উদ্বেগ, রুক্ষ কেশ। —ফ্র্যাঙ্ক কোথা?

—তোমার ভাইয়ের রবিবাসরের সংবাদ তুমি রাখ, জিমি। কেন কি ব্যাপার?

ব্যাপার? পিতার অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। জ্ঞান নাই! ডাক্তার ডাকতে গেছে হ্যারী। মা বললেন একটু ব্র্যাণ্ডী দিতে। ব্র্যাণ্ডী আছে? ব্যাড্‌লাক এল্‌সী।

পৃথিবীর কোথাও কোনো গণ্ডগোল হলে, এল্‌সী তার জন্য ফ্র্যাঙ্ককে দায়ী করত। ওঃ মাই! ব'লে সে স্বামীর উদ্দেশে অপ্রিয় কথা বললে। পূর্ণ এক বোতল এক্‌স্ নম্বর ওয়ান কম্পিত হস্তে দিল দেবরের হাতে।

—দৌড় জিমি দৌড়। ওঃ মাই! ফ্রাঙ্কের কি আচরণ। আর তার নিজের পিতা। ওঃ গড্।

দেবর তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সম্মত হল না। বললে—তুমি কাপড় ছাড়। যদি আমার আসতে বিলম্ব হয়, জেনো বাবা সামলে উঠেছেন। ফ্র্যাঙ্ক এলে তুমি এসো।

সে ছুটলো।

এল্‌সী হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলে—যীশু, ত্রাণকর্ত্তা, বৃদ্ধকে রক্ষা কর। সকল মঙ্গল মাত্র তোমার করুণা ও প্রসাদ।

শীতের আমেজ দিয়েছে। ফ্র্যাঙ্ক একটু আনন্দ করছিল বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। সন্ধ্যার পর হোটেলে পানাহার করে বড়দিনকে আবাহন করতে হবে, এ সিদ্ধান্ত হ'ল সর্ব্ববাদি-সম্মত। সে বাড়ী গেল কাপড় ছাড়তে আর কিঞ্চিৎ অর্থ আনতে।

তাকে দেখে বরষার ধারার মত বারি-প্রবাহ এল্‌সীর গণ্ডস্থল ভাসিয়ে দিলে। শান্ত গৃহ-কোণে ধ্বনিত হল, বাজের কড় কড় শব্দের মত বচন-নির্ঘোষ। ফ্র্যাঙ্ক অকেজো, নিষ্ঠুর, পিতৃ-হন্তা এবং মাতাল।

অনেক কষ্টে সে যখন ব্যাপারটা বুঝলে, ফ্র্যাঙ্ক রড্রিগ্‌স্ বিষণ্ণ হল। তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে, স্ত্রীকে নিয়ে এক ফেটিন্ গাড়ীতে সে গেল স্টুটারকীন্ লেন, পিতৃ-ভবনে। ভাববার কথা। আহা! কত আদরে কত স্নেহে বৃদ্ধ তাকে প্রতিপালন করেছে। যদি না দেখতে পায়! তার বুক কেঁপে উঠলো।

এল্‌সী ভাবছিল সেই দিনের কথা, যে দিন নববধূরূপে শুভ্র আবরণে সে এদের গৃহে এসেছিল। সে ঢাকার মেয়ে। কলিকাতার লোক তাকে বিদ্রূপ করবে কি না কে জানে। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ীর স্নেহের ধারা নিরন্তর তাকে প্রীত করেছে। ফ্র্যাঙ্ক উদার, স্নেহময়, প্রেমিক, কিন্তু তার সঙ্গীরা? ওঃ ভগবান্, তাদের ক্ষমা করুন।

তারা যখন স্টুটারকীন লেনে পৌঁছিল, বড় মেম বেতের আরাম-কেদারায় বসে স্বামীর জন্য গলাবন্ধ বুনছিল। বৃদ্ধ রড্রিগস শান্ত ভাবে বসে বৃদ্ধার শিল্প-কুশল অঙ্গুলি-হিল্লোল উপভোগ করছিল। বার্দ্ধক্যে পরিতৃপ্তিই তো স্বর্গসুখের অগ্রদূত। মনের একটা বোঝা নেমে গেল—পুত্রের এবং পুত্রবধূর। যথোচিত আনন্দ সম্ভাষণের পর, এল্‌সী জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। শ্বশুর একটু মৃদু তিরস্কার সহ

করলে। এত বড় আক্রমণের পর বিছানা ছেড়ে বারান্দায় বসা, বিপদের আবাহন। না, না! সেফটি ফার্ষ্ট। আবার আক্রমণ হলে সর্ব্বনাশ!

আক্রমণ?

পরে সকল কথা প্রকাশ পেলে। শীতের হাওয়ায় বৃদ্ধ বলীবর্দ্দের মত সবল ও সুস্থ বোধ করছে, এ কথা ব্যক্ত করলে।

ওঃ! তাহলে পিতার বিপদের মিথ্যা সমাচারে প্রবঞ্চনা করে জিমী মদের বোতল হস্তগত করেছে। ফ্র্যাঙ্ক ছুটলো—বাকীটুকু নিজের জন্য সংগ্রহ করতে। বৃদ্ধেরা আনন্দে উচ্চহাস্য করলে—পুত্রদের কুশল বুদ্ধিসাফল্যর গর্ব্বে, কি পুত্রবধূর ভক্তিতে এ কথা বলা কঠিন। কারণ, তারা সস্নেহে এল্‌সীর মুখ-চুম্বন করে বল্‌লে—ভালো মেয়ে!

মনস্তত্ত্বের দিক্ থেকে এ হাসির গল্প। দু'জন কনিষ্ঠ এবং ভগিনীপতি ডিসাস্তো, যতটকু মাল তখনও শেষ করতে পারেনি, ফ্র্যাঙ্ক সেটুকু শেষ করলে। তার দোষ কি? অত বড় উদ্বেগের পর মনকে চাঙ্গা করতে গেলে ঔষধের প্রয়োজন।

এরা সবাই ধার্ম্মিক। পরিবারে স্নেহ ভালবাসা বা ভক্তির অভাব ছিল না। পিতার আসন্ন মৃত্যুর মিথ্যা সমাচারে মদের বোতল হস্তগত করা এবং মাত্র এল্‌সী ব্যতীত সবার পক্ষে ব্যাপারটাকে বড়দিনের কৌতুক বলে গ্রহণ করা—সাধারণ দৃষ্টিতে অপ্রকৃত মনে হয়। কিন্তু এ ব্যাপার ঘটেছিল।

মানুষের যৌন মনোভাব নানা বিচিত্র খাদে বহে। বহু দিন পূর্ব্বে মন্মথ-মন্দিরে ইংরেজ মনীষা নামক প্রবন্ধে আমি কতকগুলি প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখকের প্রেম-বৈচিত্র্যের কাহিনী বিবৃত করেছিলাম। আমার সামাজিক এবং কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতায় জেনেছি, বিশ্ব-সংসারে বাস্তবিক প্রেমের গতি উদ্‌ভ্রান্ত। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি প্রৌঢ় প্রেমের দায়ে সাজানো সংসার ত্যাগ করে। একই রমণী সমান ভাবে পতি এবং উপপতির সেবা করে এবং তাদের এক জনের মৃত্যুতে অন্য জন কাঁদে। শিক্ষক ছাত্রীর পাণিগ্রহণ করে! তবে, প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রীর তরুণ ছাত্রের সহিত উদ্বাহের সমাচার এদেশে পাইনি। এ অধ্যায়ে রকমারি কুৎসিত ব্যাপার ঘটে। পুলিস কোর্টে, পাড়ার মজলিসে, গ্রামের পঞ্চায়তে যে সব বীভৎস কাহিনী শোনা যায়, সামাজিক সৌজন্যের বিধি-নিষেধে তাদের বর্ণনা অসম্ভব। কাম-সম্ভোগের যে পশু-প্রবৃত্তিকে মানুষ প্রেম মনে করে, তার প্ররোচনায় কত নরহত্যা হ'য়েছে, তার ইয়ত্তা নাই। পিতৃ-ধনে, জননীর অলঙ্কারে, অবিবাহিতা ভগিনীর যৌতুকের গহনায় এই নীচ-বৃত্তি বহু গণিকার পাপের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। অপর পক্ষেও পিতার, ভ্রাতার বা স্বামীর সম্পত্তি চুরি করে বহু ভদ্র-ঘরের যুবতী উপপতির সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। স্বামিগৃহ না ছেড়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক অতি উচ্চ বংশের কুলবধূ পঞ্চাশ হাজার টাকার অলঙ্কার দান করেছিল প্রেমিককে। পুলিস সেগুলি উদ্ধার করেছিল। কিন্তু কলঙ্কের ভয়ে যুবকটিকে শ্রীঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেনি।

অবশ্য যৌন সংঘটনের ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে নবীন বাঙ্গালী-সমাজ এক-মত নয়। অনেকের অভিমত—প্রেম, প্রেম। এ পবিত্র শিখার আবার বৈধ অবৈধ বিচার কি? প্রগতি সাহিত্য প্রেমের বৈধাবৈধ জাতিভেদ অবলুপ্ত ক'রে জনপ্রিয় হ'য়েছে।

বলা বাহুল্য, যৌন আকর্ষণ স্বাভাবিক। বস্তুতঃ ব্যক্তি-জীবনের পূর্ণতা—প্রেম। যৌন-মিলন তার সূচনা। কিন্তু এর এক কুৎসিত দিক আছে, সেটা পূর্ণতার সাধনার পক্ষে বিষাক্ত। যৌ[ন] আকর্ষণকে দমন করা, সমাজ-তন্ত্রের বিজ্ঞ-সিদ্ধান্ত। কারণ, সমা[জ] চায় মানুষের শক্তিকে নানারূপে ফুটিয়ে তুলতে। সমাজ পায়রা খোপ নয়। মাত্র কপোত-কপোতীর বক্‌বকানিতে সজ্ঞাশ্রমে[র] গগন-পবন মুখরিত হ'লে মানব-সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। তাতে[ও] শান্তি নাই। ঈর্ষা এবং পল্লবগ্রাহিতাও পশু-সংস্কার। ইন্দ্রিয় লালসার এরা সহযোগী।

জীবতত্ত্ব প্রমাণ পেয়েছে যে, যৌন-মিলনের আকাঙ্ক্ষা মানুষে[র] কর্ম্মক্ষমতা বৰ্দ্ধিত করে। সমাজ সেই শক্তিস্রোতকে ভিন্ন খাদে বহিয়ে, তারুণ্যের সাহচর্য্যে নিজের আদর্শের দিকে অগ্রগমন করে। জৈব সংস্কারের প্রেরণা উপেক্ষা করতে শিখেছিল বলে মানুষ প্রকৃতি[র] বহু লুকানো রহস্য-কথা অবগত হ'য়েছে।

মাত্র স্বভাবের প্রেরণায় কাজ করে পশু। তাকে দমন করে মানুষ। তাই প্রত্যেক সমাজ মনুষ্যের আদিম কাম-সম্ভোগের এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণার সহজাত বৃত্তিকে সংযত করতে শিক্ষা দেয়। মাত্র শিক্ষা দেয় না, কঠোর নিয়মের নিগড়ে বেঁধে তাকে প্রতিহত করে। সে নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে যে মানুষ নিজেকে সংযত করতে পারে না, কোনো মহৎ কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব। কারণ, স্রোতে ভাসায় কোন শক্তির আবশ্যক হয় না। স্রোত হতে রক্ষার রহস্য, শক্তির আবাহন। এ শক্তি মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব, পশু-সংস্কার তার সন্ধান পায় না।

অপ্রতিহত অবৈধ যৌন-ব্যাধি বাস্তব জগতে কত ক্ষতি করেছে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতবর্ষের এক সম্প্রদায়-বিশেষের কথা আলোচনা করলে। এদের তরুণ-তরুণীর স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত অন্য ভারতীয় সম্প্রদায়ের সমবয়স্ক হতে উন্নত। এ সম্প্রদায়ের লোক এতাবৎ পক্ষপাতিত্বের ফলে চির দিন সরকারী এবং বেসরকারী কর্ম্ম লাভের সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু তাদের সমাজের প্রধানরা তাদের যৌন-বৃত্তিকে সংযত করতে চেষ্টা করেনি। এক তো প্রতি-যোগিতা-প্রসূত কর্ম্ম-শক্তির অভাব, তার উপরে যৌবনের উন্মেষ হতেই "ম্যাসিং গার্ল" কু-প্রথা। ফলে এত সুবিধা সত্ত্বেও এ সমাজের লোক ভীষণ অনুন্নত। সমাজের প্রকৃত অধঃপতনের জন্য প্রধানেরা আক্ষেপ করে। আমি তাদের অনেকের মুখে আজকাল অবরোধ-প্রথার উপকারিতার কথা শুনি! সমাজ হিসাবে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ তাদের অনেকের মহা ক্ষতি করেছে। সমাজের এক শ্রেণীর রমণীর যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতাই এই মহা ক্ষতির কারণ।

আমাদের বাঙ্গালী সমাজে জ্ঞাতি-বিরোধ নানা অঘটন ঘটায়। এসব দ্বন্দ্বে সাধারণ মনস্তত্ত্বের বিধি-নিয়ম খাটে না। তুচ্ছ কারণে হাস্যাস্পদ ঘটনার উদ্ভব হয়। এক প্রসিদ্ধ বংশের বর্ষীয়সী ক্ষুধার্ত্ত ভ্রাতুষ্পুত্রদের বাড়া ভাতে একবার কুৎসিত আবর্জ্জনা ফেলেছিল। এ মনোবৃত্তি বিকাশের বহু বিচিত্র ঘটনা নিশ্চয়ই মানুষমাত্র অবগত। মধ্যযুগের বহু রাজন্য এবং শক্তিশালীদের জীবনকথা অপবিত্র পাপের ইতিহাস।

বহু দিন পূর্ব্বে আমরা কলিকাতার এক ধনী পরিবারের গৃহ-বিবাদের জঘন্য পরিণতির মামলা মোকদ্দমায় নিযুক্ত হয়েছিলাম। পুলিস কোর্টে এবং হাইকোর্টে এক কালে তাদের বহু সত্য ও কল্পিত বিবাদ বিচারাধীন হয়েছিল। ভায়েরা পরস্পরের বিরুদ্ধে

দোষারোপ করে ক্ষান্ত হয়নি। বাড়ীর বড়-বৌকে শ্বশুর উইলে অনেক বিষয় সম্পত্তি দান করেছিল। ছোট ভায়েরা এফিডেভিটে মৃত-পিতা এবং ভ্রাতৃ-জায়ার অবৈধ আচরণের দোষারোপ করে উইল বাতিল করবার প্রার্থনা করেছিল। আমরা ছিলাম বড় তরফের উকীল।

হিংসা, ঘৃণা, এবং বৈরিতা এদের নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। একই বাপের সঞ্চিত ধন ভাগ হয়ে উকীল কৌন্সুলী এবং এটর্নীর গৃহে প্রবেশ করছিল। উভয় পক্ষের বহু অকেজো সহায়ক ও তদ্বিরকার জুটলো। তারা উপযুক্ত ইন্ধনে জ্ঞাতি-বিরোধের অগ্নি-শিখাকে ব্যাপক ও প্রোজ্জ্বল করলে।

হঠাৎ এক দিন সকালে আমার মক্কেল তার বিবাদী মধ্যম ভ্রাতাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে এলো। কি ব্যাপার! অহি-নকুল একত্র!

ক্রন্দন এবং উচ্ছ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে বোঝা গেল বিবদমান একটি ভাই রাত্রে হৃদ্‌রোগে প্রাণ-ত্যাগ করেছে।

এর পর মামলা চলে না। সত্য কথা। যমালয়ের সাম্য-বাদের অমোঘ-মন্ত্রের মত জগতের কোনো নায়কের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী কস্মিনকালে অত আশু ফলপ্রদ হয় না।

কিন্তু আমার রোরুদ্যমান মক্কেল মামলা মেটাবার যে প্রধান কারণ দিলে, তা আজিও আমার কাণে ঝঙ্কার দেয়। ভাঙ্গা গলা আঁখি-নীর তার আন্তরিকতা প্রমাণ করেছিল।

—যেটা ছিল আসল কু-চক্রী, সে নেই; এদের সঙ্গে কি মামলা করব, কেশব বাবু। সব মামলা তুলে নিন। ভগবান মামলা লড়বার ভাইটিকে কেড়ে নিয়ে বাদ সেধেছেন।

এই কারণ বিশ্লেষণ করলে মনো-বিজ্ঞানের সূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

তাই বলছিলাম—যা ঘটে তা' কল্পনার অতীত। ব্যোমের মত মানব-মনের ব্যাপকতা। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা হ'তে এমন সব দৃষ্টান্ত খুঁজে বার করা যায়, ধীর হয়ে ভাবলে, যাদের খাপছাড়া এবং অচিন্তনীয় মনে হয়। সত্যই 'ট্রুথ ইজ ষ্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকসন' এবং একথাও সত্য যে প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান মানুষ।

অবশ্য ঘটনা-চক্র অনেক কল্পনাতীত অঘটনের জনক। সে দিন এক জনের পাকা ছাদ ফুঁড়ে তার সামনে ঘটনা-চক্র এক প্রকাণ্ড সোনার তাল ফেলেছিল। লটারীতে অর্থলাভ হয়, অজ্ঞাত আত্মীয়ের অকাল মৃত্যুতে ভিখারী ধন-কুবের হয়! 'পুরুষস্য ভাগ্যং এবং স্ত্রিয়া-শ্চরিত্রম্'—অনেক ক্ষেত্রে কল্পনাতীত পরিণতি ঘটায়। ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে ঘটনা-চক্র। পরিবেশের প্রভাব চরিত্রের উপর অল্প নয়। কিন্তু চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, মনের বল বা দুর্ব্বলতা, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

পাথুরিয়া কয়লা-সমস্যা

গত ১৩৫০ সালে আমরা যে সকল দ্রব্যের প্রচণ্ড অভাব-অনটন ভোগ করিয়াছি, কয়লা তাহাদের অন্যতম। এখনও কয়লা-সঙ্কট প্রচণ্ড ভাবে চলিতেছে এবং কত দিন চলিবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

যেমন রন্ধনশালায়, তেমনি কল-কারখানায় পাথুরিয়া কয়লা ইন্ধন-রূপে অত্যাবশ্যক; সুতরাং যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ইহার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। যুদ্ধ-প্রয়োজনে যে ছয় শত প্রকার দ্রব্যাদি আবশ্যক, তন্মধ্যে প্রধানতম মূল ও স্থূল উপাদান-উপকরণের পুরোভাগে ইহার স্থান। এই নিমিত্তই আমাদের নূতন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল শ্বেতাঙ্গ-বণিক-সমিতি-সঙ্ঘের গত বাৎসরিক অধিবেশনে তাঁহার সর্ব্ব-প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন:—"কয়লা-শিল্পের ও সমগ্র যুদ্ধ-প্রচেষ্টার অত্যাবশ্যক খাদ্য (Essential food) এবং আমরা এই উভয়ের কোনটিকেই অনশন কিংবা পুষ্টিহীনতা (malnutrition) ভোগ করিতে দিতে পারি না।" কয়লার প্রচণ্ড অভাব-অনটন উপলক্ষেই এই উক্তি।

গত শীতের প্রারম্ভে কয়লার অভাব-অনটন এরূপ প্রচণ্ড হইয়াছিল এবং খনি হইতে উত্তোলন এতাদৃশ কমিয়া গিয়াছিল যে, সর্ব্বত্র আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। তখন আমাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, খনি-মজুরগণ চাষের কার্য্যে চলিয়া যাইবার ফলে শ্রমিকের অভাবে কয়লার যথেষ্ট উত্তোলন ঘটিতেছে না। চাষের কার্য্যে ব্যতীত কয়লাক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে সংরক্ষণ প্রচেষ্টামূলক পূর্ত্ত ও ইমারৎ কর্ম্মে অপেক্ষাকৃত লঘুশ্রমের কার্য্যে অধিকতর পরিমাণ মজুরীর লোভেও বহু শ্রমিক খনির কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। তৎ-পূর্ব্বে রেলপথের ভাঙ্গনের ফলে বাঙ্গালায় কয়লার আমদানী এক প্রকার রুদ্ধ হইয়াছিল। সম্প্রতি খনি হইতে উত্তোলনের সুব্যবস্থা হেতু কয়লার স্বল্পতা কিঞ্চিৎ দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু মালগাড়ীর অপ্রাচুর্য্যতার ফলে পুনরায় কয়লার অভাব-অনটন প্রচণ্ডরূপে অনুভূত হইতেছে। সুতরাং জনসাধারণের দুঃখের অবধি নাই। যখন মাল-গাড়ীর প্রাচুর্য্য, তখন কয়লার অপ্রাচুর্য্য এবং যখন কয়লার প্রাচুর্য্য, তখন মালগাড়ীর অপ্রাচুর্য্য। সুতরাং দুঃখের এই চক্রাবর্ত্তে আমরা বিধ্বস্ত। বিধাতার ভাগ্যচক্রে দুঃখের সহিত সুখ আবর্ত্তিত হয়; কিন্তু এই যুদ্ধজনিত ঘটনাচক্রে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখই আবর্ত্তিত হইতেছে। আজ চাউলের অভাব, কাল ডাইলের অভাব, আর এক দিন সর্ষপ-তৈলের অভাব, অন্য দিন কেরোসিন তৈলের অভাব, কোন দিন নারিকেল তৈলের অভাব এবং মধ্যে মধ্যে পাথুরিয়া কয়লার তীব্র অভাব! কোন প্রকারে আহার্য্য দ্রব্যের যোগাড় হইলে ইন্ধনের অভাব; আবার ইন্ধনের সরবরাহ হইলে রন্ধনের উপকরণের অভাব!

রন্ধনশালা, কল-কারখানা এবং যুদ্ধপ্রয়োজনে পাথুরিয়া কয়লার অভাব-অনটন প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি এক জন কয়লা-আমীন (Coal Commissioner) নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং একটি কয়লা-শাসন-প্রণালী (Coal Control Scheme) অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালী অনুযায়ী রেলপথে কিংবা অন্যান্য প্রকার গাড়ীর সাহায্যে পরিবাহিত কয়লাকে সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত

মূল্যে বণ্টন করা হইবে। এই নির্দ্ধারিত মূল্যই খনি-মালিক ও কয়লার খরিদ্দারগণের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির ভিত্তি হইবে। এই প্রণালীকে নিরঙ্কুশ ভাবে কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে যে সকল খনি হইতে কয়লা উত্তোলন দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ নহে, সেই সকল খনির কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। কয়লা-শিল্প ও কারবারে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া একটি কয়লা-শাসনমণ্ডলীও (Coal Control Board) গঠিত হইয়াছে। যুদ্ধ-সঙ্কটকালে সামরিক ও বেসামরিক দ্রব্যসামগ্রীর শাসন নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন ব্যতীত সর্ব্বসাধারণের অভাব-অভিযোগ দূর করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু শাসন-নিয়ন্ত্রণ সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ না হইলে সুফল প্রদান করে না। যুক্তরাজ্যে পাথুরিয়া কয়লা-নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জাতীয় উৎপাদন আট মিলিয়ন টন পরিমাণে কম হইয়াছিল। সুতরাং ভারত সরকারের শাসন-নিয়ন্ত্রণ ফল যে কল্যাণকর হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, রেলপথে কয়লা পরিবহনের (Transport) সু-বন্দোবস্ত এবং খনি হইতে প্রয়োজনের অনুরূপ উত্তোলন-মাত্রা রক্ষা করিতে না পারিলে কয়লা-পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং পরিবহন ও উত্তোলন-পথে যে সকল অন্তরায় ঘটিয়াছে তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিদূরিত করিতে হইবে।

যুদ্ধহেতু, বিশেষতঃ ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে প্রবল শত্রুর সহিত সঙ্ঘর্ষের নিমিত্ত সামরিক প্রয়োজনে সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ চলাচলের জন্য ভারতীয় রেলপথগুলির অধিকাংশ মালগাড়ী নিযুক্ত আছে। সুতরাং অসামরিক প্রয়োজনে কয়লা পরিবহনের নিমিত্ত উপযুক্ত পরিমাণ মালগাড়ীর অভাব ঘটিতেছে। যুদ্ধপরিস্থিতি হেতু রেলপথগুলি নূতন মালগাড়ী কিংবা এঞ্জিন প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে, কিংবা পুরাতন ভগ্ন অথবা জীর্ণ গাড়ীগুলিরও যথাবিধি সংস্কার করিতে পারিতেছে না। কারণ, এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যে পুরাতন গাড়ীগুলি মেরামত করিবার উপযুক্ত খণ্ডাংশেরও আমদানী দুর্ঘট। বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে সরকার যদি ভারতীয় শিল্পী বণিক্ প্রভৃতির ঐকান্তিক প্রার্থনা অনুযায়ী এ দেশে রেলপথের সর্ব্ব-প্রকার গাড়ী ও এঞ্জিন প্রস্তুত-প্রয়োজন-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সহায়তা করিতেন, তাহা হইলে আজ এঞ্জিন কিংবা যাত্রী ও মালগাড়ী প্রভৃতির অভাবে সামরিক ও অ-সামরিক উভয়বিধ প্রয়োজনে যাত্রী ও মাল পরিবহনের কোন অসুবিধা ঘটিত না। কিন্তু যাহারা দায়ে ঠেকিয়াও শিখে না, তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা অনিবার্য্য। ফলে, শুধু অ-সামরিক নহে, সামরিক শিল্প-প্রচেষ্টাও বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে। যাহা হউক, এত দিনে ভারত সরকারের চৈতন্যোদয় হইয়াছে এবং ভারতে এঞ্জিন প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত হইতেছে। সে দিন কলিকাতায় বিভিন্ন শিল্প-বণিক-সমিতিগুলির সহিত আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে যুদ্ধ-পরিবহন মন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন যে, বর্ত্তমান প্রয়োজন সাধনার্থ বিদেশ হইতে এঞ্জিন প্রভৃতি যথাসম্ভব আমদানী করিলেও ভারতে ঐ সকল যানের নির্ম্মাণ-শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। এবং সরকারের এই সদভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত ঐ প্রকার কারখানা স্থাপনের সকল প্রকার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। যুদ্ধান্তে শিল্প-বাণিজ্যের তেজী অথবা মন্দা অবস্থাও সরকারের এই প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিতে পারিবে না।

কিন্তু সে ত ভবিষ্যতের কথা। বর্ত্তমান অভাব-অনটন ও তদানুষঙ্গিক দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতিকার কিরূপে হইবে? মধ্যে মধ্যে মৃদু ও খর পোড়া কয়লার অভাবে গৃহস্থের রন্ধনশালা ও শিল্পীর কলকারখানা চুল্লী জ্বলিতেছে না; তাহার আশু প্রতিকার কি? যানবাহন-মন্ত্রী স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, রেলওয়ে বোর্ডকে বর্ত্তমানে দুইটি প্রবল অভাবের সহিত তীব্র সংগ্রাম করিতে হইতেছে;—প্রথম, কয়লাক্ষেত্রে উত্তোলনের স্বল্পতা এবং দ্বিতীয়—রেলপথে মালগাড়ীর স্বল্পতা যুদ্ধোপকরণ যুদ্ধযাত্রী ও খাদ্যসামগ্রী পরিবহনের নিমিত্ত অধিকাংশ মালগাড়ী এখন নিযুক্ত। কিন্তু শিল্পের প্রয়োজনও কোন অংশে ন্যূন নহে। শিল্পের সুপরিচালন ব্যতীত সামরিক ও অসামরিক উভয়বিধ উপাদান-উপকরণ ও আহার্য্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর সুনিয়ন্ত্রিত সরবরাহ সম্ভবপর নহে। সুতরাং শিল্প প্রয়োজনে এবং সাধারণ-গৃহস্থের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনে খর ও মৃদু পোড়া কয়লার সরবরাহ নিয়মিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া অত্যাবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতাতে কয়লা-আমীন মিঃ পি, সি, ইয়ংএর সভাপতিত্বে বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র ও কতিপয় বণিক্‌সমিতির প্রতিনিধিবর্গের একটি বৈঠক বসিয়াছিল। কি প্রকারে বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতা তাহার প্রয়োজনানুরূপ কয়লা পাইতে পারে, তন্নির্দ্ধারণই ছিল এই বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য। ক্রেতা যাহাতে নির্দ্ধারিত মূল্যানুযায়ী তদুপযুক্ত গুণবিশিষ্ট কয়লা প্রাপ্ত হয় এবং এই সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার অভিযোগের ত্বরিত প্রতিকার পাইতে পারে, তদ্বিষয়েও আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। সম্প্রতি ১লা জুন হইতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক খনির খাদ-মুখে বিভিন্ন প্রকার কয়লার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন এবং সেই দিন হইতেই কয়লাক্ষেত্র হইতে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়-কেন্দ্রে কয়লা পরিবহনের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কয়লাক্ষেত্রে শিল্প প্রভৃতির প্রয়োজনানুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ উত্তোলন এবং উত্তোলিত কয়লার সুনিয়মিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পরিবহনের উপরেই শিল্পী বণিক্ ও গৃহস্থের অভাব ও ক্ষতিপূরণ নির্ভর করিবে। কিন্তু যানবাহন-মন্ত্রী এই দুই বিষয়েই ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন। আমরা যত দূর জানি, সরকার এ পর্য্যন্ত কয়লাক্ষেত্রে উত্তোলন বৃদ্ধি নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। খনি হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উত্তোলন বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং ভাবী ক্ষয় ও ক্ষতি-পূরণার্থ সম্ভবমত খণ্ডাংশ (Spare parts) যথাসম্ভব সত্বর তৎপরতার সহিত আমদানী প্রয়োজন। সুচারুরূপে খনিগুলির কার্য্য পরিচালন এবং তাহাদের কর্ম্মপরিধির প্রসার সাধনার্থ লৌহ ও ইস্পাত-নির্ম্মিত উপাদান উপকরণ সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন। সরকারের তরফ হইতে খনি-মালিকগুলিকে এইরূপ একটি নিশ্চয়তা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন যে, তাহারা যথাপ্রয়োজন উত্তোলন বৃদ্ধি করিলে যুদ্ধান্তে বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে তাহার অবশ্যম্ভাবী মন্দার ফলে তাহারা যেরূপ প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে তাহাদিগকে তদ্রূপ বিপ্লব-বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে না। কয়লা-শিল্প এখন সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে মূল ও স্থূল শিল্প (Key Industry)। দিন দিন এই শিল্পের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে ও পাইবে; এবং এই শিল্পের উন্নতি ও অবনতির উপর ভারতের অন্যান্য

শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিতেছে ও করিতে থাকিবে। উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং অতিরিক্ত খণ্ডাংশ প্রভৃতির আমদানী অথবা উৎপাদন, কয়লা-শিল্পের পক্ষে শ্রমিকের সংখ্যা ও স্বাস্থ্য-সামর্থ্য রক্ষণাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। যেমন যন্ত্রপাতি, তেমনি শ্রমিক ও পরিবহন সমস্যা. ইহার কোনটির প্রতিই কেন্দ্রীয় সরকার ইতিপূর্ব্বে কখনও সমুচিত মনোযোগ প্রদর্শন করেন নাই।

ঘটনাচক্রে, সামরিক ও অ-সামরিক উভয়বিধ প্রয়োজনে কয়লার বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত চাহিদার মুখে যখন কয়লাক্ষেত্রে শ্রমিকের অভাবে, উত্তোলনের পরিমাণ হ্রাসহেতু সর্ব্বত্র কয়লার অভাব-অনটন তীব্র ভাবে সর্ব্বপ্রকার গৃহস্থালী ও কল-কারখানার কর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটাইল এবং যুদ্ধ-শিল্পও ব্যাহত হইবার উপক্রম করিল, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের সুপ্ত চৈতন্য অকস্মাৎ উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ, গত ১৩৫০ সালে সর্ব্ববিধ কর্ম্মে ইন্ধনের গুরুতর অভাব যেরূপ তীব্র ও তীক্ষ্ণ ভাবে অনুভূত হইয়াছিল এরূপ পূর্ব্বে আর কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ। এখনও আমাদের অভাব ঘুচে নাই। যেমন বিভিন্ন শিল্পে, তেমনি অগণিত গৃহস্থ-গৃহে কয়লার অভাবে আমরা সর্ব্বদা কয়লার অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতেছি। কয়লা-শিল্পের অল্প বিস্তর দুঃখ-দুর্দ্দশা চিরদিনই আছে, কিন্তু গত বৎসর এই শিল্পের প্রতি জনসাধারণ ও কর্ত্তৃপক্ষের যেরূপ তীব্র মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, এমন আর পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। যেমন উত্তোলন-ক্ষেত্রে, তেমনি শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্য ও স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রচুর ছিদ্র ও ত্রুটি রহিয়াছে। এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য যদি কাহাকেও দায়ী করিতে হয়, তাহা হইলে সেই দায়িত্বের অংশ বণ্টনে সরকারের দোষ-ত্রুটির অংশ প্রচুর। অতি প্রয়োজনীয় কয়লা-শিল্পের প্রতি সরকারের পরম শৈথিল্য বর্ত্তমান পীড়াদায়ক পরিস্থিতির মূল কারণ। কয়লা-শিল্পের চরম অবনতির সময়েও কয়লার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ-ক্রেতা সরকারই এই অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানভূত ইন্ধনের মূল্য বলপূর্ব্বক মুনাফাহীন পর্য্যায়ে অবনমিত করিয়াছিলেন। খনি-মালিক এবং খনি-মজুর উভয়েই এই অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির কুফল ভোগ করিয়াছে। পাঠকের অবিদিত নাই যে, প্রতি বৎসর রেলগাড়ী চালাইবার নিমিত্ত সরকার প্রচুর পরিমাণে কয়লা খরিদ করেন এবং সর্ব্ব-নিম্ন মূল্যের প্রতি রেলওয়ে বোর্ডের লক্ষ্য হেতু প্রতিযোগী বিক্রেতাগণ (Tenderers) মোটা ক্রয়চুক্তি (Contract) লাভ করিবার আশায় পরস্পরের গলা কাটিবার অভিপ্রায়ে অতি সামান্য মাত্র মুনাফা রাখিয়া শিল্পের সর্ব্বনাশকর কম মূল্যে বিক্রয়-প্রস্তাব (Lowest quotation of prices) প্রেরণ করেন। সরকার খোস্ মেজাজে যে মূল্য-হার গ্রহণ করেন, বাজারে অন্যান্য ক্রেতারাও তাহাদের চাহিদা যতই অধিক থাকুক না কেন, তদপেক্ষা অধিক মূল্য কেহই দিতে স্বীকার করে না। সুতরাং সরকারের গৃহীত হারই নির্দ্ধারিত মূল্য-মানে পর্য্যবসিত হয়। এই প্রতিযোগিতার কুহকে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জার্ডিন্ স্কীনার কোম্পানীর এক চতুর কয়লা-কর্ম্মচারী ক্রয়-চুক্তির ক্রমবর্দ্ধমান পরিমাণ অনুযায়ী মূল্য-মানকে ক্রম-নিম্নগামী করিয়া (on a sliding scale) বাজী জিতিয়াছিলেন; অর্থাৎ, সর্ব্বোচ্চ ক্রয়-চুক্তি হস্তগত করিয়াছিলেন। সমব্যবসায়িবর্গের গলাকাটা ব্যতীত এই ফন্দীর আর কি নাম দেওয়া যাইতে পারে। কয়লা-শিল্পের প্রতি সরকারের বর্ত্তমান সতর্ক-সস্নেহ দৃষ্টি সমর-সঙ্কটের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কিন্তু বহু দিনের অবহেলা-ঘটিত জটিল পরিস্থিতি অকস্মাৎ ক্ষিপ্র কর্ম্ম-তৎপরতার ফলে মুহূর্ত্তেই বিদূরিত হয় না; হইতে পারে না।

যাহা হউক, গত বৎসরে কয়লা-শিল্পে প্রধান সমস্যা ঘটিয়াছিল উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খনি হইতে উত্তোলনের ক্রম-বর্দ্ধমান স্বল্পতা। প্রাচ্য ভূখণ্ডে সমরপরিচালনার্থ ভারতের ভৌগোলিক অবস্থিতি যুদ্ধের কর্ম্মকেন্দ্র হিসাবে ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারত এখন বহু যুদ্ধশিল্পের পরিচালন ক্ষেত্র। শত সহস্র শিল্পে শত সহস্র যুদ্ধোপকরণ উৎপাদিত হইতেছে। সুতরাং কৃষি শিল্প প্রভৃতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সকল শিল্পের মূল-ইন্ধন কয়লার চাহিদা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের, এবং এমন কি বিগত মহাযুদ্ধের সময়কার চাহিদা অপেক্ষা বর্ত্তমান চাহিদা সহস্র গুণে অধিক; কিন্তু চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত যোগান তাল রাখিতে পারে নাই। পরন্তু, কয়লাক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস, যুদ্ধ-প্রয়োজনে অধিকতর সংখ্যায় মালগাড়ী নিয়োজনের ফলে কয়লা পরিবহনার্থ মালগাড়ীর প্রচণ্ড অনটন এবং উপযুক্ত পরিমাণে ভাণ্ডার-সঞ্চিত দ্রব্যাদির (Stores) এবং প্রয়োজনানুযায়ী মেরামৎ প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত আবশ্যক মত খণ্ডাংশের (spare parts) অভাব কয়লাশিল্পকে পঙ্গু করিয়া উত্তোলনের পরিমাণ অতিমাত্রায় হ্রাস করিয়াছিল।

সকলেই জানেন, কয়লাক্ষেত্রের শ্রমিকেরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। চাষ এবং ফসলের সময় তাহারা দলে দলে কয়লা-ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গ্রামে যাইয়া কৃষিক্ষেত্রে মনোনিবেশ করে। প্রতি বৎসর এই দুই সময় খনি হইতে উত্তোলন-কার্য্য প্রভূত পরিমাণে ব্যাহত হয়। গত বৎসরে আবার অন্য প্রকার উপসর্গও ঘটিয়াছিল। গত বৎসর ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তের অনতিদূরবর্ত্তী দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করিবার নিমিত্ত সরকারী সংরক্ষণ পূর্ত্তকর্ম্মাদিতে বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেনানিবাস, বিমান-ঘাঁটী প্রভৃতি সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সরকারের ঠিকাদারেরা উচ্চ মূল্যে শ্রমিক নিযুক্ত করিতে বাধ্য হয়। ফলে কয়লাক্ষেত্রের শ্রমিকেরা স্বল্প বেতনে কঠোর পরিশ্রম-সাপেক্ষ খনির তিমিরগর্ভস্থ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর বেতনে ভূমির উপরিভাগে ইমারৎ নির্ম্মাণাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। মুক্ত আলোকে ও বাতাসে এইরূপ কর্ম্ম যে সহজ-সাধ্য, তাহা নহে। শ্রমিকদের পক্ষে তদপেক্ষাও সুবিধাজনক ব্যাপার ছিল এই যে, খনি-গর্ভে স্ত্রী-মজুরদের কর্ম্ম নিষিদ্ধ বলিয়া তাহারা নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোক ও কর্ম্মক্ষম পুত্রকন্যাদির সহিত একত্রে কর্ম্ম করিতে পারিত না। কিন্তু ভূমির উপরিস্থ সরকারী সংরক্ষণ কর্ম্মে সে অসুবিধা ছিল না। সেখানে তাহারা স্বচ্ছন্দে আপন পরিবার পরিজনের সহিত কর্ম্ম করিতে পারিত। খনি-পরিচালকদের আবেদনে-নিবেদনে সরকারের এই দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং কয়লা-শিল্পের তত্ত্বাবধানকারী শ্রম-সচিব তাঁহার বিশিষ্ট পরামর্শদাতাদের সহিত কয়লাক্ষেত্রে যাইয়া খনিগুলি পরিদর্শন করেন। গত ডিসেম্বর মাসে তাঁহারা শ্রমিকদিগের বাসস্থান; স্বাস্থ্যাবস্থার চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শ্রমিক ও খনি-মালিকদিগের প্রতিনিধিগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন।

এই পরিদর্শন ও পর্য্যালোচনার ফলে শ্রমিকদিগের মজুরীর হার ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত মৌলিক হারের দ্বিগুণ করা হয়। তাহাদের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির সরবরাহের সহজ ও সুলভ বন্দোবস্ত করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত মজুরেরা অভাবের পূরণ হয় এমন স্বল্প আয়েই পরিতুষ্ট। অনেক সময় প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইলেই তাহারা নিত্যকর্ম্মে শৈথিল্য প্রদর্শন এবং সময় সময় কয়লাক্ষেত্র ত্যাগ করে। সুতরাং অতিরিক্ত উপার্জ্জনের সাহায্যে যাহাতে তাহারা একটু স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম ভোগ করিবার নিমিত্ত তাহাদের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ্য ও ভোজ্যদ্রব্য লাভ করে তাহার আশু ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগী হয়েন। কিন্তু যুদ্ধপরিচালনার্থ আশু ও অবশ্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বহুবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার নিমিত্ত এই ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করিতে বিলম্ব ঘটে। ফলে তাহাদের সচরাচর প্রয়োজনীয় সাধারণ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ হইলেই তাহারা কর্ম্মে অনুপস্থিত হইতে অথবা কয়লাক্ষেত্র ত্যাগ করিতে আরম্ভ করে।

পক্ষান্তরে, সামরিক প্রয়োজনে কয়লাক্ষেত্র হইতেও নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রীত হওয়ার ফলে, শ্রমিকদিগের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনের উপযোগী আহার্য্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যেরও অভাব-অনটন ঘটে। খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়মিত ভাবে সরবরাহের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সরকার নির্দ্ধারিত বিধি-ব্যবস্থার কিছু-কিছু পরিবর্ত্তনের জল্পনা-কল্পনায় বহু সময় অতিবাহিত করেন। নানাবিধ নিয়ম নীতির ঘন-ঘন পরিবর্ত্তনের ফলে মজুরদের জীবনযাত্রা দিন দিন এরূপ জটিল হইয়া উঠে যে, সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত শ্রমিকেরা দিনের পর দিন তাহাদের দাবী ও প্রাপ্য কি এবং .কতটুকু, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হয়। অনেক সময় তাহারা মনে করিতে বাধ্য হয় যে, তাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেছে তাহা হইতেও যেন তাহারা বঞ্চিত হইতেছে। এই নিমিত্ত ভারতীয় খনি-শিল্পসভার (Indian Mining Association) গত মার্চ্চ মাসের বার্ষিক অধিবেশনে সুযোগ্য সভাপতি মিঃ পেটারসন সরকারের নিকট অনুনয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মজুরীর হার এবং মজুরদের দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক খাদ্য-পরিমাণের সূক্ষ্ম বিচার-বিতর্কে সময় অতিবাহিত না করিয়া সরকার যদি পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সত্বর কার্য্যারম্ভ দ্বারা শ্রমিকদের অবশ্য প্রয়োজনীয় আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির সরবরাহ বাধাবিঘ্ন-শূন্য করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় ও চিন্তা লঘু করেন এবং কয়লাক্ষেত্র হইতে সামরিক প্রয়োজনেও খাদ্যসংগ্রহ-প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে কয়লাশিল্পের প্রভূত উপকার হয়।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সরকারের আদেশ-অনুরোধ অনুযায়ী খাদ্যতালিকা, মজুরী-তালিকা প্রভৃতি বিবিধ হিসাব-নিকাশ দাখিল করিতে এবং বিভিন্ন সভা-সমিতি ও বৈঠকে যোগদান করিতে খনিগুলির উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের এরূপ অযথা সময় অপব্যয়িত হয় যে, তাঁহারা খনি হইতে শীঘ্র শীঘ্র প্রচুর পরিমাণে কয়লা উত্তোলনের মহৎ কার্য্যে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারেন না। এমন কি, সরকারী খনি-বিভাগের প্রধান ও সহকারী পরিদর্শকদ্বয়কেও নানা স্থানে ঘোরাঘুরি করিতে হয়; ফলে কয়লা-শিল্পকে সাহায্য করিবার আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। গত বৎসর কয়লাক্ষেত্রে শ্রমিকদিগের আহার্য্য যোগান একটি (সমস্যায় দাঁড়াইয়াছিল। দেশব্যাপী অভাব-অনটন এবং নিদ দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালায় সহস্র সহস্র লোকের অনশন-মৃত্যুকালে শ্রমিকদি তাহাদের সাধ্যায়ত্ত মূল্যে আহার্য্য সরবরাহ খনি-মালিকদিগের (দুরূহ হইয়াছিল; তথাপি তাঁহারা বহু ক্লেশ ও ক্ষতি স্বীকার ক যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার ক ক্ষেত্রের আহার্য্য-সঙ্কটের তুলনায় বিহারের কয়লাক্ষেত্রের অবস্থা হ স্বচ্ছল ছিল। যাহা হউক, বহু দিনের বহু জল্পনা-কল্পনা বিচার-বিতর্কের ফলে ভারত সরকারের শ্রমিক-কল্যাণ তত্ত্বাবধা কর্ম্মচারী মিঃ নিম্বকার ধানবাদে মাসাধিক কাল অবস্থিতির পরে ম মজুরদিগের আহার্য্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রত্যে শ্রমিক নিজের ও ভরণ-পোষণযোগ্য পরিজনের জন্য নির্দ্ধা মৌলিক খাদ্য-বরাদ্দ (Basic ration) ব্যতীত প্রত্যেক দি কর্ম্মান্তে অর্দ্ধ সের তণ্ডুল বিনামূল্যে পাইবে। প্রত্যেক পূর্ণ-ব ব্যক্তির মৌলিক সাপ্তাহিক হিস্যা (Quota of ration) জ চারি সের। তাহাদিগের প্রতিপাল্য পরিজনবর্গের জন্য নির্দ্ধা হিস্যা সংগ্রহ করিবার জন্য শ্রমিকগণকে কিছু অর্থসাহায্য করিবা ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন নিয়মিত ভাবে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বা উপযোগী ভোগ্য ও ভোজ্যদ্রব্যাদি (Consumer's goods) পাইলে কয়লাশিল্পের মঙ্গল। শ্রমিকগণের মজুরী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ ভোজ্যদ্রব্যের সরবরাহ নির্ব্বিঘ্ন ও নিয়মিত না হইলে মুস্কিল ঘটিবে

এখন আমরা কয়লা-শিল্পের দ্বিতীয় সমস্যা এবং খরিদ্দা গণের প্রধান সমস্যা, কয়লা-পরিবহনের ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচ করিব। যুদ্ধপরিস্থিতি হেতু রেলকর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে কয়লা-শিল্পে প্রয়োজনানুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ মালগাড়ী যোগান দেওয়া কঠি হইয়াছে। সামরিক প্রয়োজন মিটাইয়া দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রদে সমূহে খাদ্যদ্রব্য পরিবহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া কয়লা-শিল্পে আবশ্যক পূরণ প্রায় অসম্ভব; কারণ, রেলগাড়ীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ভারতে তাহা প্রস্তুত হয় না। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু, ভাঙ্গাচুরা জোড়া দিবার উপযু খণ্ডাংশও দুর্লভ। সুতরাং রেলকর্ত্তৃপক্ষের সামর্থ্য সঙ্কীর্ণ! অথ শিল্পের দাবী প্রচণ্ড। ভারতের বড় রেলপথগুলি (Broad gauge মাইল প্রতি যত টন মাল পরিবহন করে, তাহাতে কয়লার অং শতকরা ৪২ ভাগ। সুতরাং রেলপথে কয়লা-পরিবহন একটি ব সমস্যা। খনি হইতে উত্তোলনের স্বল্পতা হেতু এই সমস্যা অধিকত জটিল হইয়াছে। বাঙ্গালা ও বিহারের কয়লাক্ষেত্রে অপরিচ্ছিন্ন ভা খালি মালগাড়ী যোগান দিতে হয়। তাহার ফলে অপেক্ষাকৃত ক দরকারী মাল পরিবহনে ব্যাঘাত ঘটে। যদি মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে অধিকতর পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ও বিহার হইতে দীর্ঘ-পথ অতিবাহন করিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে কয়লা বহন করিতে হয় না। ফলে, মালগাড়ীর চলাচল দ্রুত হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম দরকারী মাল পরিবহনে বিশেষ অন্তরায় ঘটে না। এই সকল অসুবিধার নিমিত্ত সম্প্রতি রেলপথে কয়লার পুঁজি (Stocks) অসঙ্গতরূপে কম পড়িয়াছিল এবং তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এই পরিস্থিতির এখনও বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

যাহা হউক, কয়লাক্ষেত্রে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা, শ্রমিকদিগের মজুরী বৃদ্ধি, খাদ্য পরিবেশনের মৌলিক বরাদ্দের উপরে প্রতি শ্রমিকের জন্য বিনামূল্যে অর্দ্ধ সের চাউল প্রদানের ব্যবস্থা এবং খনির অভ্যন্তরে স্ত্রী-মজুরদিগকে কর্ম্মের অধিকার প্রদান করিয়া খনি হইতে অধিকতর পরিমাণে কয়লা উত্তোলনের প্রচেষ্টা সফল হইলেই মঙ্গল। কিন্তু বিলাতের অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত। সেখানে উৎপাদন-ভাতা (Output bonus) ব্যবস্থার ফলে গত ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই এবং ভাতা লাভও কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে। সেখানকার এক জন বৃহৎ খনি-পরিচালকের অভিজ্ঞতা এই যে, মজুরী বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন কমই হয়। ইহার কারণ সম্পূর্ণরূপে মনোবিজ্ঞান-সম্মত। অভাবই মানুষকে কঠোর কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয়। পক্ষান্তরে, অভাব মোচন হইলে পরিশ্রমের প্রবৃত্তি হ্রাস পায়। ভারতের খনি শ্রমিকদিগের মনোবৃত্তিও তদনুরূপ। পক্ষান্তরে, মজুরী বৃদ্ধি, শ্রমিকদিগের শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ-বিধান-ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, সাজ-সরঞ্জাম ও উপাদান-উপকরণ প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি এবং বহুবিধ করবৃদ্ধির ফলে খনিপরিচালনের ব্যয় (Wotking expenses) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়লার মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে। লভ্যাংশকে সম্পূর্ণরূপে সরকারী সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় সংরুদ্ধ করিবার ফলে নিঃস্ব ও স্বল্পবিত্ত খনিগুলির কার্য্যকরী মূলধনের অভাব প্রযুক্ত তাহাদের কর্ম্ম-প্রবর্দ্ধন-প্রবৃত্তি হ্রাস পাইতেছে। সামর্থ্যের সঙ্কোচ ঘটিলে উত্তম ব্যর্থ হয়, উৎসাহ অবসাদে পরিণত হয়। সুতরাং কয়লাশিল্পের ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক না হউক, বিশেষ আশাপ্রদ নহে। যুদ্ধপ্রচেষ্টার অবসানে অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সরকারী শাসন-নীতির ফলও সংশয়জনক।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভস্থ গোস্বামী

প্রথম পরিচ্ছেদ

যাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বপ্রথমে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম শ্রীলোকনাথ ও ভূগর্ভ। ইহাদের মধ্যে ভূগর্ভের পিতৃপরিচয় পাওয়া যায় না; মাত্র জানা যায় যে, তিনি চির-কুমার ব্রহ্মচারী এবং শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রিয়তম শিষ্য। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর বংশ-পরিচয়ের যে ধারা পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার আদিপুরুষ ভরদ্বাজগোত্রীয় সুপ্রসিদ্ধ মেধাতিথি। ইনি কান্যকুব্জ হইতে আদিশূরের যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন। পরে ইঁহার পুত্র শ্রীহর্ষও কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। এই শ্রীহর্ষের পুত্র শ্রীগর্ভ, তৎপরে যথাক্রমে শ্রীগর্ভ হইতে শ্রীনিবাস, তৎপুত্র আরব, তৎপুত্র ত্রিবিক্রম, তৎপুত্র কাকমিশ্র, তৎপুত্র সাধু বা ধাধু, তৎপুত্র জলাশয়, তৎপুত্র সুরেশ্বর, বা বাণেশ্বর, তৎপুত্র গুহ বা গুঁই, তৎপুত্র মাধব আচার্য্য, তৎপুত্র কোলাহল বা ফুলাই সন্ন্যাসী, তৎপুত্র উৎসাহ। উৎসাহ ও তাঁহার সহোদর ভ্রাতা গরুড় মুখুটী সম্বন্ধে প্রেমবিলাসের চতুর্ব্বিংশ বিলাসে দেখা যায়—

"তাঁর পুত্র উৎসাহ গরুড় মুখুটী।
বল্লাল-সভায় কৌলীন্য পায় পরিপাটী।"

ইহার পরে উৎসাহ কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইবার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আহিতও শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হন। এই আহিত হইতে উদ্ধব ও তৎপুত্র শিরো বা শিরোভূষণের উদ্ভব। শিরো বা শিরোভূষণের জ্যেষ্ঠ পুত্র নৃসিংহ ওঝা ইনি ফুলিয়াতে বাস করেন। শ্রীরামায়ণের গ্রন্থকার শ্রীকৃত্তিবাস পণ্ডিত বা কৃত্তিবাস ওঝা ইঁহারই বৃদ্ধ প্রপৌত্র। শিরো বা শিরোভূষণের কনিষ্ঠ পুত্র দিবাকর বা ছাকর কাচনায় বাস করেন। ইঁহার বংশে সারঙ্গ—তৎসুত ধর্ম্ম—তৎপুত্র পুরাই বা পুরুষোত্তম—তৎপুত্র জগন্নাথ—তৎপুত্র গোবিন্দ—ও তৎপুত্র পরমানন্দ বা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী আবির্ভূত হন। ছাকর বা দিবাকরের পৌত্র ধর্ম্ম বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমায় চিত্রানদীর তীরবর্ত্তী তালেশ্বর গ্রামে বসতি করেন। কিন্তু পদ্মনাভ বা পরমানন্দ নানা উৎপাতে বিব্রত হইয়া এই স্থান হইতে উঠিয়া যাওয়ার নিকটবর্ত্তী তালখড়ি গ্রামে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

এই তালখড়ির নাম নরোত্তমবিলাসে ও প্রেমবিলাসে তাখাড়ি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তালখড়ি নামই বর্ত্তমানে সুপ্রসিদ্ধ। ভক্তি-রত্নাকরে তালগেড়া নাম দেখা যায়। যাহা হউক, এই তালখড়িতে পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর ঔরসে তৎপত্নী সাধ্বী সীতাদেবীর গর্ভে চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম ভবনাথ, দ্বিতীয়ের নাম পূর্ণানন্দ বা প্রগলভ, তৃতীয় চিরকুমার ব্রহ্মচারী লোকনাথ গোস্বামী এবং চতুর্থ রঘুনাথ। পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর বংশলতা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—
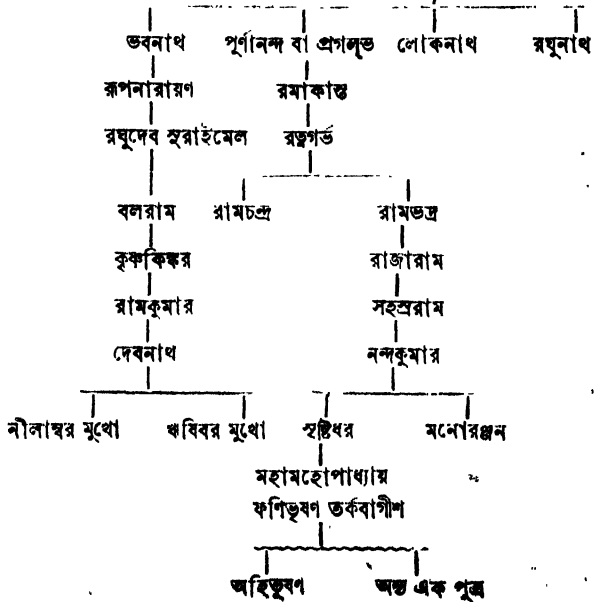
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী শিশুকাল হইতেই বিদ্যাচর্চ্চার জন্য নবদ্বীপে অবস্থান করিতেন। বোধ হয়, এইখানেই তাঁহার সহিত শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নীর নামও সীতা এবং পদ্মনাভের পত্নীর নাম সীতা ছিল। বোধ হয় পরিণত বয়সে উভয় পরিবারের ঘনিষ্ঠতার ইহাও একটি কারণ। সম্ভবতঃ এই ঘনিষ্ঠতার ফলেই পদ্মনাভের পরিবারের মধ্যে বৈষ্ণবোচিত ভক্তিভাবের বিস্তৃতি ঘটে—যে হেতু "নরোত্তম-বিলাসে" দেখিতে পাওয়া যায়—

"যৈছে পদ্মনাভ তৈছে তাঁর পত্নী সীতা ;
পরম বৈষ্ণবী যেঁহো অতি পতিব্রতা।"

পদ্মনাভও বহুজন্মের সুকৃতির ফলে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়া যাইতেন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে বিগলিত অশ্রুধারায় সুশোভিত হইত।

পদ্মনাভের ও সীতার ন্যায় সৌভাগ্যবান্ দম্পতির গৃহেই লোকনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকনাথ পিতার তৃতীয় পুত্র। তাঁহার অগ্রজাত ভ্রাতৃদ্বয়ও বিদ্যায় বা প্রতিভায় বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু লোকনাথ বাল্যকাল হইতেই শান্ত স্বভাব ও হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তিনি শৈশব হইতেই পিতামাতার আচরণ হইতে হরিভক্তির উচ্চ আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনিও উপযুক্ত বয়সে বিদ্যাশিক্ষায় অনুরক্তির পরিচয় প্রদান করেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি পিতার নিকট শিক্ষালাভ করেন, তৎপরে কিঞ্চিৎ অধিক বয়স হইলে তিনি সম্ভবতঃ তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপে বা শান্তিপুরে আগমন করিয়াছিলেন।

তখন নবদ্বীপে ও শান্তিপুরে বিদ্যাবিলাসের অভাব না থাকিলেও শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসের অভাব ছিল। এই জন্য শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য ঐ সময়ে শান্তিপুরে বাস করিলেও তথায় বিদ্যাপীঠ স্থাপন পূর্ব্বক নবদ্বীপেও একটি টোল স্থাপন করেন। যখন ভক্ত পিতা পদ্মনাভের সহিত শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের পরিচয় ছিল, তখন লোকনাথ যে অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন এইরূপ সম্ভাবনাই সমধিক। পরন্তু, শিশুকাল হইতেই শান্তস্বভাব ভক্তিপ্রবণ লোকনাথ অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট অধ্যয়নে সম্যক্‌রূপে শাস্ত্রে জ্ঞানবান হইয়া শ্রীভগবদ্ভক্তিই যে জীব-জীবনের চরম লক্ষ্য, ইহা হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হয়েন। শ্রীল নবদ্বীপে যখন লোকনাথ অধ্যয়ন করেন তখনও নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নাই। এই সময়ে নবদ্বীপে বা শান্তিপুরে নিমাই পণ্ডিতের সহিত লোকনাথের দেখা হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।* কারণ, ঐরূপ বিবরণ তাৎকালিক কোনও প্রামাণিক পুস্তকে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, লোকনাথ অল্প বয়সেই তাৎকালিক প্রচলিত বিদ্যা অর্থাৎ ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রে বিচক্ষণ হইয়া পিতামাতার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। একে তরুণ বয়স, মনোমুগ্ধকর রূপ, তাহার উপর শাস্ত্রজ্ঞানের বিচক্ষণতার সহিত বিনয়পূর্ণ প্রসন্ন মধুর ভাবে তিনি দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রিয় হইয়াছিলেন।

লোকনাথ দেশে আসিবার পূর্ব্বেই অথবা দেশে আসিবার অব্যবহিত পরেই শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের একখানি টীকা রচনা করেন। শ্রীভাগবতের টীকা রচনা করা অল্প পাণ্ডিত্যের পরিচয় নহে। সুতরাং লোকনাথ যে সর্ব্বশাস্ত্রে এবং বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভাগবতের টীকা রচনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই টীকাটি না কি শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যের আদেশেই লিখিত হয়। পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই এই টীকার কথা সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করেন, নতুবা কোনও প্রামাণিক বা আধুনিক বৈষ্ণবগ্রন্থে এই টীকাটির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। (Catalogue of Sanskrit Manuscripts by Mahamahopadhyaya Haraprasad Sastri Vol V. Purana no 3624 published from the Royal Asiatic Society of Bengal.)

যাহা হউক, ভক্তিরসে লোকনাথ এই প্রকার প্রবীণতা লাভ করিবার পরেই শ্রীনবদ্বীপের বিখ্যাত নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে বহির্গত হন। কিন্তু মুরারি গুপ্তের করচা, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতা'দি গ্রন্থ আলোচনা করিলে তিনি এই ভ্রমণকালে যে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন ইহা বুঝিতে পারা যায় না। বরং মনে হয়, তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থলে গমন করিয়া তাঁহার অনুপম পাণ্ডিত্যবলেই বহু অধ্যাপককে টোল করিয়া দিয়া ও বহু সংস্কৃত শিক্ষার্থীকে সংস্কৃত ব্যাকরণাদিতে শিক্ষাদান করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে সংস্কৃত-চর্চ্চার বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ সময়ে তিনি কোথায় কোথায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া নানাপ্রকার মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। চৈতন্য-ভাগবতের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাতের কোনও উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার পূর্ব্ববঙ্গে তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাতের উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ঐবারে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীহট্ট গমন করিয়া স্বীয় পিতামহীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রেমবিলাসের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐবার তিনি স্বরূপ-দামোদরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আসামের এগারসিন্দুর গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী ভিটাদিয়া গ্রামের অধিবাসী লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর গৃহেও গমন করেন। এইরূপে যখন নানাবিধ গ্রন্থকর্ত্তার মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ সম্বন্ধে নানাবিধ কাহিনী দেখা যায়, তখন অদ্বৈতপ্রকাশের মধ্যে ঐরূপ ভ্রমণের এক অভিনব কাহিনী থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ঐ বর্ণনা বৈষ্ণবজনগণের লোভনীয় শ্রীচৈতন্যদেবের ও অচ্যুতানন্দের মহিমা-প্রকাশক উপাখ্যানে "অদ্বৈতপ্রকাশ" সমাপ্ত হইলেও ঐতিহাসিকগণ অন্য প্রমাণের অভাবে ও বিশেষতঃ অদ্বৈতপ্রকাশের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির আকারে পুঁথিখানিকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

* শ্রদ্ধেয় পরলোকগত অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় "অদ্বৈত-প্রকাশ" নামক একখানি অপ্রামাণিক এবং সম্ভবতঃ কাল্পনিক গ্রন্থকে প্রামাণিকরূপে বহুমানন করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং অদ্বৈতের শান্তিপুরের টোলে অদ্বৈতের নিকট নিমাই পণ্ডিতকে ছাত্ররূপে স্থাপন করিয়া তাঁহার সহিত লোকনাথের সতীর্থতা সম্পাদন করিয়াছেন। অদ্বৈতের বেদাধ্যাপনা ও "বেদপঞ্চানন" উপাধি, তখনকার কালের উপযোগী না হইলেও অদ্বৈতপ্রকাশে বিদ্যমান। বিশ্বম্ভরের বেদপাঠের উপাখ্যান ও অন্য অনেক সরলচিত্ত ভক্তিপ্রবণ

অনুসারে ভ্রমণের সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব তালখড়িতে পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর গৃহে গমন করিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে রাত্রে এক মহাসভায় তর্কচূড়ামণি নামক এক জন মহাপণ্ডিতকে তিনি তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। আমরা এই বর্ণনাকে আদৌ প্রামাণিক বলিয়া মনে করি না এবং লোকনাথকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থান হইতে পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন, ইহাও আমরা প্রকৃত ঘটনার বিরোধী বলিয়া মনে করি।

যাহা হউক, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন, এবং ইহার কিছু দিন পরে তিনি গয়াধামে গমন করিয়া ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দীক্ষা গ্রহণের পরই তাঁহার অভূতপূর্ব্ব ভক্তিভাবের প্রাবল্য প্রকাশ পাইতে থাকে এবং ইহার পর হইতেই তাঁহার অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, গদাধর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, মুরারি, মুকুন্দ ও হরিদাস প্রভৃতি ভক্তবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে থাকে। এই সময়ের প্রেমবিহ্বল অবস্থা দর্শন করিয়া নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের অনুগামী ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে কোনও মহাপুরুষ বা শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া অনুভব করিতে থাকেন।

এই সময়ে ক্রমে ক্রমে লোকনাথের মাতৃদেবীর ও কিয়ৎকাল পরে তাঁহার পিতারও পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। লোকনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় ঐ সময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকনাথ ঐ সময়ে বিবাহ করেন নাই। পিতামাতার মৃত্যুতেই লোকনাথের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। বোধ হয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণও এই সময়ে লোকনাথকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু লোকনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—এক দিন রাত্রিকালে শুভ অবসরে তিনি নবদ্বীপে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার ধন দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেবের আকর্ষণ যে কত শক্তিশালী আমরা তাহা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর—রাজবৎ ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাবৎ সহধর্ম্মিণী ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করাতে তাহা বুঝিতে পারি। লোকনাথের যদিও ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য ছিল না এবং যদিও তাঁহাকে অন্য দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য বিবাহিতা স্ত্রী ছিল না, তথাপি তাঁহার জীবনে এই আকর্ষণ-লীলার অভিব্যক্তি নিতান্ত অল্প নহে।

নরোত্তমবিলাসে দেখিতে পাই—লোকনাথের—

"নিরন্তর আরাধয়ে কৃষ্ণের চরণ।
ভক্তিবলে করে সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ॥
পিতামাতা অদর্শন হৈলে কত দিনে।
মনের বৃত্তান্ত জানাইলা বন্ধুগণে॥
বিষয় সংসার সুখ ত্যজি মলপ্রায়।
প্রভু সন্দর্শনে যাত্রা কৈলা নদীয়ায়॥"

—প্রথম বিলাস।

এই পরমানন্দঘন লীলাপুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্যদেবই যে তাঁহার সাধনার ধন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার প্রভাবে সে জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়াছিল। তাই চুম্বকের আকর্ষণে নির্ম্মল লৌহখণ্ডের মত তিনি নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের সন্দর্শনে বহির্গত হইলেন। সম্ভবতঃ লোকনাথ স্বীয় পিতৃদেব পরমভক্ত পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর নিকটই দীক্ষা-গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আরাধনায় নিযুক্ত হন। নির্ম্মল আরাধনার ফলেই শ্রীচৈতন্যদেবে তাঁহার এই আকর্ষণ সুদৃঢ় হইয়াছিল। প্রেমবিলাসের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায় যে, লোকনাথ অগ্রহায়ণ মাসের অর্দ্ধরাত্রিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আট ক্রোশ পথ চলিয়া সকালে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব গদাধর শ্রীবাস মুরারি-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সহিত বসিয়াছিলেন, লোকনাথ যাইয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। লোকনাথ প্রভুপদে প্রণাম করিলেই শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে কোলে করিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় বলিতে লাগিলেন—

"অহে লোকনাথ তুমি মোরে পাসরিয়া।
কিরূপে বঞ্চিলে কাল কোন্ দেশে যাঞা॥"
ইহা বলি কাঁদে গৌর কোলে করি তাঁরে।
'হেন বুঝি বিধি নিধি মিলাইল মোরে॥
অন্ধ হইয়া আছি আমি সকল পাসরি'।
লোকনাথ কান্দে প্রভু পদযুগ ধরি॥

প্রেমবিলাস—৭ম বিলাস।

এই প্রকারে ভক্ত প্রভুর পায়ে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং প্রভুও ভক্তকে আত্মসাৎ করিলেন। এইখানেই লোকনাথের সহিত শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ও শ্রীল অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি প্রভুগণের মিলন হইল; যথা প্রেমবিলাসে—

"নিত্যানন্দ অদ্বৈত আদি সবার মিলন।
প্রণাম করিলে তাঁরে দিলা আলিঙ্গন॥
এইরূপে পঞ্চ রাত্রি প্রভুর মিলন।
বহু কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করে আস্বাদন॥"

প্রেমবিলাস—৭ম বিলাস।

এইরূপে পাঁচ দিন স্বীয় সঙ্গে রাখিয়া লোকনাথকে দেখাইয়া, শিখাইয়া বুঝাইয়া তিনি যে শ্রীবৃন্দাবনলীলার গূঢ় ভাব আস্বাদন করিতে আসিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। শ্রীরাধিকার প্রেমের মহিমা ও মাধুর্য্যের গভীরতা ইত্যাদি এক এক করিয়া বুঝাইয়া কলিযুগে শ্রীবৃন্দাবনধামের এই আনন্দবার্ত্তা লোককে বুঝাইবার জন্য যে অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামের লুপ্ত তীর্থ-মহিমার পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন, তাহা লোকনাথকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন। নরোত্তমবিলাসের ও প্রেমবিলাসের ভাব ও বর্ণনা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেব ঐ সময়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, এ সঙ্কল্প একরূপ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনের গোপীগণ যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়াছেন, সেই মাধুর্য্যময় ভজনের উচ্চাদর্শের ভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের মন পরিপূর্ণ। সেই ভাবস্রোতে যে লোকনাথ ভাসিয়া যাইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা, গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা ও তাঁহার যূথের ভজন-বৈশিষ্ট্য, এবং পরমপুরুষার্থরূপী প্রেমধনই যে জীবের একমাত্র স্বরূপগত প্রয়োজন—এই পাঁচ দিন ধরিয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাহা লোকনাথকে অনুভব করাইবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিলেন। প্রেমবিলাসে আছে যে, লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর, তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীরাধিকার মঞ্জুমালী

নাম্নী প্রিয়সখী ; শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার উপদেশের দ্বারা ও অলৌকিক উদ্বোধনী শক্তির দ্বারা লোকনাথের হৃদয়ে সেই পূর্ব্বভাব জাগ্রত করিয়া দিলেন এবং লোকনাথকে তাঁহার পূর্ব্বস্থলী শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলেন। যথা—

"লোকনাথ পাসরিলে আপন স্বভাব।
কে তুমি তোমার বাস যেই মত ভাব।
যে মুখে তোমরা বৈস যথানাম তোর।
যাহার সেবন কর হইয়া বিভোর।
মঞ্জুলালী সখী পূর্ব্ব রাধার সঙ্গিনী।
অঙ্গবিলেপন সেবা পরায় কিঙ্কিণী।
রাধিকার সঙ্গে থাকহ নিরবধি।
দাসী অভিমানে সেবা অনুক্ষণ সাধি।
রাধিকার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী মন।
এইরূপে খ্যাত সঙ্গী সেবাপরায়ণ।"
শুনিতে প্রভুর মুখে সব স্ফূর্ত্তি হৈল।
নিরীক্ষণ করি মুখ কান্দিতে লাগিল।
"সেই রসে মত্ত হৈয়া থাক সেই স্থানে।
মোর প্রাণ রক্ষা কর যাও বৃন্দাবনে।
গিরিকুণ্ড গোবর্দ্ধন জাবট বর্ষাণ।
সঙ্কেতে নিভৃতকুঞ্জ যত লীলাস্থান।
বাস কর সেই স্থানে সুখ পাবে মনে।
মোর মায়া ছাড়ি পথে করহ গমনে।
তোমার যে জন্মস্থানে তাহা বাস করি।
ভজন স্মরণ কর কিশোর কিশোরী।
চিরঘাট রাসস্থলী কদম্বেরি সারি।
তার পূর্ব্বপাশে কুঞ্জ পরম মাধুরী।
তমাল বকুল বট আছে সেই স্থানে।
বাস কর সেই স্থানে সুখ পাবে মনে।
রাসস্থলী বংশীবট নিধুবন স্থান।
ধীর-সমীরণ মধ্যে করিবে বিশ্রাম।
যমুনাতে স্নান কর অযাচক ভিক্ষা।
ভজন স্মরণ কর জীবে দেহ শিক্ষা।
তুমি সিদ্ধ হও তোমার হইবে যে শাখা।
তাহার যে গণ হবে তার নাহি লেখা।—ঐ,৭ম বিলাস।

এই প্রকারে লোকনাথকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের এই আদেশের পূর্ব্বেই শ্রীবৃন্দাবন লীলা মধুরিমা আস্বাদ করিবার যোগ্যতা ও অধিকার লোকনাথের তাঁহারই কৃপায় হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনের নিত্য-পরিকরের পক্ষে নিত্য লীলার অনুভব স্বাভাবিক, লোকনাথেরও তাহা হইয়াছিল। এই জন্যই তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের প্রিয়শিষ্য ভূগর্ভও লোকনাথের সঙ্গী হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকৃত হইলেন।* ভূগর্ভ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আদেশ ভিক্ষা করিলে তিনিও প্রীত মনে তাঁহাকে আদেশ দিলে ভূগর্ভ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন গমনে লোকনাথের সঙ্গী হইলেন। দুই জনেই শ্রীকৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে বহু পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ পুনরায় আজ সংক্ষেপে এই সময়ের শ্বাপদ-সঙ্কুল জন-সঙ্গবিরল শ্রীবৃন্দাবনের কথা আলোচনা না করিলে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ও শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর এই বৃন্দাবন যাইবার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে না। সুলতান মামুদের সময় হইতে পুনঃ পুনঃ মুসলমানের আক্রমণে ঐ সময়ে বৃন্দাবন জনত্যক্ত অরণ্যে পর্য্যবসিত। বৃন্দাবনের সুপ্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহগুলি লুক্কায়িত। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থলী সমূহ লুপ্ত। মাত্র ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী অরণ্যসঙ্কুল ব্রজমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত লোকবহুল স্থানে শ্রীল গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের গাঁঠুলী-প্রমুখ গ্রামগুলির নিকট—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরিভাগে গোবর্দ্ধননাথ গোপালের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ স্থানের গ্রামবাসীদিগের উদ্যোগে ও উৎসাহে কোনওরূপে দুই জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সেবকের অধিনায়কত্বে গোবর্দ্ধননাথের সেবার সৌষ্ঠব স্থাপন করিয়া শ্রীল গোপালদেবের স্বপ্নাদেশে তিনি বঙ্গদেশ হইয়া সাক্ষীগোপালে ও পুরুষোত্তমধামে গমন করিয়াছেন। ইহার কিছু পরেই শ্রীল গোবর্দ্ধননাথের সেবায় বল্লভাচার্য্যের কয়েকটি শিষ্য ও বল্লভাচার্য্য নিজে নানারূপে সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ডাদি স্থানে অল্পে অল্পে আবার ব্রজবাসিগণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল। কিন্তু বৃন্দাবনে তখন তীর্থযাত্রীর সংঘট আদৌ নাই বলিলে চলে। সুশাসনের অভাবে তখন রাজপথে দস্যুর ভীষণ উপদ্রব। সর্ব্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব লোকনাথ ও ভূগর্ভের মত ব্রাহ্মণকুমারদ্বয়কেও তখন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে অতিশয় বেগ পাইতে হইয়াছিল।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম ত্যাগ করিয়া লোকনাথ ও ভূগর্ভ রাজপথ ধরিয়া রাজমহলে পৌঁছিলেন। সেই স্থান হইতেই প্রবল দস্যুভীতি পথের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। শিষ্ট বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ সকলেই এই তরুণ ব্রাহ্মণ দুইটিকে এই পথে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞা পাইয়াছেন—তাঁহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেই হইবে। অতঃপর তাঁহারা নানাবিধ বিচার করিয়া তাজপুরের পথ ধরিয়া পূর্ণিয়ায় উপনীত হইলেন। এই পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া তাঁহারা অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। যখন তাঁহারা অযোধ্যায় গিয়াছেন—তখনও পথের দুর্গমতার জন্য তাঁহারা বৃন্দাবনে পৌঁছিতে পারিবেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহে ব্যাকুল হইয়াছেন। যাহা হউক, কিছু দিন পরে তাঁহারা লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে তিন দিনে আগ্রা ও আগ্রা হইতে দ্বিতীয় দিবসে গোকুলে পৌঁছিয়া তাঁহারা এত দিনে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে পারিবেন বলিয়া নিশ্চিত প্রতীতি ঘটিল। ইহার পর-দিনই তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া জীবন ধন্য হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন। অতঃপর তাঁহারা দুই জনে উন্মত্তের ন্যায় ব্রজলীলা স্মরণ করিয়া ব্রজমণ্ডলের লীলাস্থলী সমূহ দর্শন করিয়া

---

* পূর্ব্বলীলায় ভূগর্ভ 'নান্দীমুখী' ছিলেন। এই জন্যই এই দুই জনের মিলন উপযুক্তই হইয়াছিল। প্রেমবিলাস বলিতেছেন,—

"মঞ্জুলালী নান্দীমুখী হয় মহাপ্রীত।
গৌরাঙ্গ দিলেন সঙ্গ জানি সুনিশ্চিত।"

বেড়াইতে লাগিলেন। ব্রজবাসিগণ এই দুই সুকুমার ব্রাহ্মণ যুবককে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তাঁহাদের অযাচক বৃত্তি ও অদ্ভুত প্রেম দেখিয়া সকলেই ইঁহাদিগকে ভোজ্যাদি দানে সেবা করিয়া "কৃতার্থ হইলাম" বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ইঁহারাও পূজ্য জ্ঞানে ব্রজবাসিগণের প্রতি সমাদর পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। এই দুই জন ব্রহ্মচারীর নিষ্ঠাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের রীতি দেখিয়া ব্রজবাসিগণ বিস্মিত হইত এবং সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁহাদিগকে নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য আনিয়া দিত। প্রেমবিলাস বলিতেছেন —

"কত দ্রব্য আনে লোক দূর গ্রাম হইতে।
শত সহস্র লোক তাহা না পারে খাইতে॥
অতি বিরক্ত কারে কিছু না কহে বচন।
ব্রজবাসী যত লোক জানে প্রাণসম॥
তিলেক দর্শন করি না রহে জীবন।
যেই আজ্ঞা করেন তাহা করেন পালন॥"

—৭ম বিলাস।

ইহাতে ত' তাঁহাদের সাধন-ভজন ও জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হইল; কিন্তু এতদপেক্ষাও এক গুরুতর কর্ত্তব্য ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদের এই কার্য্যের সহায় ত' কিছুই নাই। ব্রজমণ্ডলের প্রাচীন জনপদ বহু বার উজাড় হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধগণের নিকট হইতে কুলক্রমাগত ঐতিহ্য সংগ্রহ করিতে হয়, কিন্তু সেরূপ পুরুষানুক্রমে যাঁহারা ব্রজমণ্ডলের ঐতিহ্য সম্বন্ধে জ্ঞানবান্—তেমন বৃদ্ধগণও যবনের অত্যাচারের ভয়ে দূরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্র ও সদাচার ত' মথুরাভূমি হইতে ম্লেচ্ছের ও যবনের অত্যাচারে একরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে; তীর্থগুরু ব্রজবাসিগণও পলায়ন করিয়া দূরে স্বাধীন হিন্দু রাজ্যে বাস করিতেছেন,—এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের কার্য্যের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। তথাপি বহু চেষ্টায় তাঁহারা যাহা বুঝিতে পারিলেন তাহারই করচা (notes) করিয়া রাখিতে লাগিলেন। এইরূপে অনুসন্ধান-কার্য্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়ে লোকনাথ শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কিছু দিন পরেই সংবাদ পাইলেন, শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমন করিয়াছেন এবং তথা হইতে দক্ষিণদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

যদিও লোকনাথ ও ভূগর্ভকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইবার সময় শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন, "তোমরা শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার কর, আমিও শীঘ্রই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া মুকুন্দসেবায় জীবন সার্থক করিব।"—কিন্তু তথাপি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি প্রথমে নীলাচলে ও তথা হইতে দক্ষিণদেশে যাওয়ায় শ্রীচৈতন্যদেব বুঝি শ্রীবৃন্দাবন আগমনের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ গোস্বামী মহাপ্রভুর দর্শন লালসায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। উৎকণ্ঠার প্রাবল্যে শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া তাঁহারা দক্ষিণদেশে মহাপ্রভুর দর্শন পাইবেন,এই আশায় দক্ষিণদেশে যাত্রা করিলেন। প্রাণের প্রবল আকর্ষণে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের পথ-বিপথ জ্ঞান ছিল না; কিন্তু প্রয়াগের পথে আসিয়া মগধ ও বাঙ্গালা হইয়া তাঁহারা যে উড়িষ্যার পথে দক্ষিণদেশে যান নাই—ইহা একরূপ নিশ্চিত। কারণ, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বারাণসী ও বঙ্গদেশে অথবা উড়িষ্যায় তাঁহাদের পরিচিত বহু ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা। আমাদের মনে হয়, তাঁহারা কাণপুরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত যমুনা নদীর তীর দিয়া গমন করিয়া ঐ স্থান হইতে মধ্য-ভারত দিয়া নর্ম্মদার তীর অবলম্বনে কতক দূর অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান হায়দরাবাদ রাজ্যের ভিতর দিয়া মহীশূর রাজ্যের অন্তবর্ত্তী শ্রীরঙ্গপত্তনে আসিয়া পড়েন। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা দক্ষিণদেশের তীর্থগুলি একে একে সকলই ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের সংবাদ অনেক বিলম্বে পাইয়াছিলেন। এই জন্য শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পরে তাঁহারা দক্ষিণদেশ গমনে প্রবৃত্ত হন। দক্ষিণদেশে মহাপ্রভু যে প্রেমের বন্যা বহাইয়া আসিয়াছিলেন লোকনাথ ও ভূগর্ভ তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনলাভ ও সঙ্গলাভ তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না। কিন্তু তাঁহারা দক্ষিণদেশের তীর্থে তীর্থে গ্রামে গ্রামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অলৌকিক প্রেমের যে 'স্পর্শ' তাঁহাদিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই স্পর্শ পাইয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইলেন এবং তিনি যে অচিন্ত্য শক্তিশালী ভগবান, তাহা বুঝিতে পারিয়া পরমা নির্বৃতি লাভ করিলেন। ভজনপরায়ণ শ্রীসম্প্রদায়ের বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া তাঁহাদের ভজনের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল এবং সাক্ষাৎ দর্শনলাভই যে কৃপার চরমোৎকর্ষ নহে, ইহা তাঁহারা হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সম্ভবতঃ তত্ত্ববাদী বা মধ্বসম্প্রদায়ের অনেক মঠেও তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সেবার নিষ্ঠা দর্শন করিয়া তাহার আদর্শ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন।

একে ত' তাঁহারা অনেক বিলম্বে দক্ষিণ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার দীর্ঘকাল ধরিয়া তীর্থস্থান দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তাঁহাদের সুদীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কিছু দিন পরেই শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণের ডুরী যে শ্রীরূপ-সনাতনই গৌড়ের রাজধানীতে বসিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন, ইহা তিনি প্রথম বার যখন শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার উদ্দেশ্যে নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া নানা বিঘ্নসঙ্কুল পথে মুসলমান অধিকারীকে কৃপা করিয়া ক্রমশঃ গৌড়ের পথে অগ্রসর হইয়া রামকেলিতে রূপ-সনাতনকে আত্মসাৎ করিয়া কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত যাইয়া লোকসংঘট্টভয়ে শ্রীবৃন্দাবনে না যাইয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগত হইলেন, তখনই তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন।

পর-বৎসরেই শ্রীচৈতন্যদেব ৺বিজয়াদশমীর পরদিনেই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক জন ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পাচক ও ভৃত্যের সহিত রাত্রিশেষে অতিপ্রত্যূষে ঝারিখণ্ডের বনপথে যাত্রা করিয়া যথাসময়ে ৺কাশীধামে পৌঁছিলেন। তথায় তাঁহার পরমভক্ত তপনমিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহার আগ্রহে বৈদ্য চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক তপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ পুরঃসর কিছু দিন অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে থাকিবার কালে তিনি সুবুদ্ধি রায়কে মথুরায় প্রেরণ করেন।* বলপূর্ব্বক মুসলমানের

* এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন (মধ্য ২৫শ পরি) —"পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড় অধিকারী। হুসেন খাঁ সৈয়দ

কড়োয়ার জল খাওয়াইয়া গৌড়েশ্বর হুসেনসাহ এই সুবুদ্ধি রায়ের জাতিচ্যুতি ঘটান। সুবুদ্ধি রায় দেশের পণ্ডিতদিগের নিকট প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাহিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত বিধানের কঠোরতায় হতাশ হইয়া বারাণসীতে আগমন করিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহেন। তাঁহারাও তপ্ত ঘৃত পানে প্রাণত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দেন। * কিন্তু সুবুদ্ধি রায়ের এত সহজে প্রাণত্যাগ করিবার সুবুদ্ধি হইল না; তিনি শ্রীচৈতন্যদেব বারাণসীধামে আসিতেছেন শুনিতে পাইয়া তাঁহার আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব আসিয়া ব্রাহ্মণ সুবুদ্ধি রায়কে যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলেন তাহাতে সুবুদ্ধি রায়কে প্রাণত্যাগ করিতে হইল না। তাহাতে সুবুদ্ধি রায়কে শ্রীমথুরাধামে যাইয়া নিষ্কিঞ্চন ভাবে জীবন যাপন করিয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে হইল।

মথুরায় আসিয়া সুবুদ্ধি রায় গৌড়দেশীয় তীর্থযাত্রিগণের আশ্রয়স্থলরূপে পরিগণিত হইলেন। কিন্তু সুবুদ্ধি রায় যখন মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া যাইবার পর মথুরা-বৃন্দাবনে আসিলেন, তখন লোকনাথ ও ভূগর্ভ দক্ষিণ দেশে তীর্থাবলী ভ্রমণ করিতেছেন ও তথায় শ্রীচৈতন্যদেবের অনুসন্ধান করিতেছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব যখন শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন, তখনও লোকনাথ ও ভূগর্ভ দক্ষিণদেশে থাকায় তাঁহাদের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হইল না। শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন ভ্রমণ শেষ করিয়া যখন প্রয়াগে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন ও যখন শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের সহিত সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তখনই দক্ষিণদেশ হইতে লোকনাথ ও ভূগর্ভ শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহাদের অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাদিগকে পান নাই, ইহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে বিশেষ অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবনেই অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন; তাঁহারা বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবেন, এ বিষয়ে তাঁহার আদেশ ছিল না।

শ্রীবৃন্দাবন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-স্থান। বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপর যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গোলোকের নিত্যলীলা পরিকরগণকে লইয়া—শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমলীলা প্রকাশ করেন। ঐ লীলাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একমাত্র ধ্যানের বিষয়—মথুরালীলা বা দ্বারকার ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা শ্রীচৈতন্যদেব ধ্যান করিবার বিধান দেন নাই। * শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াই এই বৃন্দাবনধামের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি নবদ্বীপে গৃহাশ্রমে থাকিতেই আদর্শ চরিত্র ব্রহ্মচারী ভক্ত লোকনাথ ও ভূগর্ভকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার পরেই তিনি রামকেলি হইতে শ্রীরূপ-সনাতনকে বৃন্দাবনের ভার প্রদান করিবার জন্যই সংগ্রহ করেন। তৎপূর্ব্বে দক্ষিণদেশে গমন করিয়া শ্রীগোপাল ভট্টকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই আত্মসাৎ করেন। বারাণসী হইতে সুপ্রবীণ সুবুদ্ধি রায়কে তিনি ঐ উদ্দেশ্যেই শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তপনমিশ্রের পুত্র মনস্বী ভক্ত শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে উত্তরকালে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীভাগবতের প্রচারক পদের জন্য শিক্ষাদানপূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠাবান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেবক ভক্তরূপে তিনি শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীকে সর্ব্বপ্রথমেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। অথচ যখন তিনি নিজে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন তখন এই দুই জন তথায় অনুপস্থিত। এই জন্য শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ মহাপ্রভুর আদেশ না লইয়া শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া দক্ষিণদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুসন্ধানে যাইবার জন্য আপনাদিগকে অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াই অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীপ্রয়াগে অবস্থিতি করিতেছেন। তখনই তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে যাইবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। কিন্তু 'নরোত্তমবিলাসের' আখ্যানে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া পুনরায় বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া অগত্যা তাঁহারা আর প্রয়াগে গমন করিলেন না। শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ জীবনে আর ঘটুক বা না ঘটুক, তাঁহারা তাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ সেবাকেই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন। তদবধি তাঁহারা আর কখনও শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

করে তাঁহার চাকরী। দীঘি খোদাইতে তারে মনসিব কৈল। ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল। পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হৈল। সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহো বহু কষ্ট দিল। তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে। সুবুদ্ধি রায়েরে মারিবারে কহে রাজা স্থানে। রাজা কহে—আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা। তাহাকে মারিব আমি ভাল নহে কথা। স্ত্রী কহে জাতি লহ, যদি প্রাণে না মারিবে! রাজা কহে—জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে। স্ত্রী মরিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা। কড়োয়ার পানী তার মুখে দেয়াইলা।"

* পরবর্ত্তী কালে মহা প্রতিভাশালী স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা অল্পায়াসসাধ্য করেন:—যথা "অজ্ঞানতঃ চণ্ডালস্পৃষ্টোদকপানে ত্র্যহসাধ্যং সান্তপনং তদশক্তৌ কার্ষাপণৈকো দেয়ঃ।" চণ্ডাল ও ম্লেচ্ছ এক প্রকার সমপর্য্যায়।

* শ্রীল কবিকর্ণপূরের ও তাঁহার পিতা শিবানন্দ সেনের গুরু শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তীর "চৈতন্যমতমঞ্জুষা" নামক অপ্রকাশিত শ্রীভাগবতের টীকার প্রথম শ্লোকে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে:—যথা—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রমমলং ভাগবতং পুরাণং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো পরঃ নঃ।"

অনুবাদ:—ব্রজপতি নন্দের নন্দন—শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য, শ্রীবৃন্দাবনই তাঁহার ধাম, ব্রজগোপীগণ যে উপাসনা করিয়াছেন সেই রমণীয় উপাসনাই অবলম্বনীয়া, অমল পুরাণ শ্রীভাগবতই ইহার শাস্ত্র এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ। ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মত, এবং ইহাতেই আমাদের আদর।

জাহাজের জন্ম-কথা

অস্ত্র-শস্ত্রাদি-নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ-নির্ম্মাণেও আমেরিকার মনোযোগ এতটুকু শিথিল হয় নাই। এ যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়, আমেরিকায় সমুদ্র-গামী জাহাজের সংখ্যা ছিল তখন মাত্র ১১০০। এই ১১০০খানি জাহাজের মধ্যে দুই শতখানি যায় সামরিক বিভাগের হাতে,—এই দুই শত জাহাজে সমর-বিভাগের সৈন্য-সামন্ত এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম-রশদাদি বহা হইত।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরও দু'হাজার সমুদ্র-গামী জাহাজের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। উপলব্ধি হইবামাত্র বিপুল উদ্যমে কাজ সুরু হইল।

যেখানে যত জাহাজের কারখানা আছে, সে সব কারখানা অস্ত্র-ঝঞ্ঝনায় যেন মাতিয়া উঠিল। দিবারাত্রি কাজ চলিল—নিমেষ

ধূম-নল

[বি]শ্রাম নাই! দু'হাজার নূতন জাহাজ চাই—বড় বড় জাহাজ! [শু]ধু জাহাজ নয়; এই দু'হাজার জাহাজের নানা বিভাগে কাজ করিবার [জ]ন্য লোক চাই ১৫০০০ অফিসার এবং মাঝি-মাল্লা-চাকর লইয়া [না]বিক-বিভাগেও চাই আরো ৬০০০০ লোক।

এক-একখানি জাহাজের সৃষ্টি—সে যেন রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার! [প্র]থমে হয় জাহাজের জন্য নক্সা রচনা। একখানি-দু'খানি নক্সা নয়; [দু]'শো পাঁচশো নক্সা। ছোট-খাট বা মাঝারি সাইজের জাহাজের [নক্সা] নয়—অতিকায় জাহাজের নক্সা! সে নক্সায় দেখানো হয়—[ক]োথায় কতখানি স্বাচ্ছন্দ্য! এই সব নক্সার পরীক্ষা চলে কড়া-[ক্রা]ন্তি-হিসাবে। যে-নক্সা পছন্দ হয়, সে-নক্সা দেখিয়া মডেল

গতিবেগ প্রভৃতির পরিমাপ করা হয়। এক-একখানি জাহাজের জন্য পঁচিশ-ত্রিশখানি করিয়া মডেল লইয়া পরীক্ষা চলে। এ পরীক্ষায় যে মডেল উত্তীর্ণ হয়, সেই মডেলকে আদর্শ করিয়া তবে জাহাজ গড়ার পালা!

জাহাজে সব-রকমের দ্রব্য-সামগ্রী বহা হয়। সেই সব দ্রব্য-সামগ্রীর আকার-প্রকার বুঝিয়া জাহাজ গড়িতে হয়। যে-জাহাজে যাত্রী বহা হইবে, সে-জাহাজের আকার-প্রকারের সহিত তরল পদার্থ-বাহী, অস্ত্র-শস্ত্রবাহী, মালপত্র-বাহী জাহাজের আকারে-প্রকারে পার্থক্য রাখা চাই; তার উপর যাত্রী বুঝিয়াও জাহাজের আকারে-প্রকারে পার্থক্য রাখিতে হয়। ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাশ, কেবিন—এ-সবের স্থান রাখিতে হয় যাত্রীর অবস্থা ও পদ-মর্য্যাদা বুঝিয়া।

মুখোশ-আঁটা ওয়েল্ডার

মালপত্রের বিভিন্নতা হিসাবেও জাহাজী-সভায় শ্রেণী-বিভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে। Liquid অথবা dry cargo অর্থাৎ তরল অথবা শুষ্ক মাল —দু'রকম সামগ্রীর জন্য এক ছাঁচের জাহাজ গড়িলে চলিবে না। Dry বা শুষ্ক মালের তালিকায় দেখি বাক্স-বন্দী বা প্যাক-বন্দী দ্রব্য-সামগ্রী; হিম-সঞ্জাত (refrigerated) মাছ-মাংস, ফলমূল; লোহা-ইস্পাতের তৈয়ারী জিনিষ এবং যন্ত্রপাতি, কলকব্জা প্রভৃতি। ক্রেটে-ভরা বাইসিকল, রেলোয়ে-এঞ্জিন, ৭০ ফুট লম্বা মোটর-বোট এবং এরোপ্লেন বা ট্রাক-ট্যাঙ্ক প্রভৃতি—এগুলিকেও dry বা শুষ্ক মালের পর্য্যায়ে ধরা হইয়াছে। এ সব মালের জন্য জাহাজের খোলকে সে-সব ধারণের উপযোগী করা হইতেছে। এ-সব মাল জলিতে [illegible] ডেবে

জাহাজ তৈয়ারী করা হইতেছে। জাহাজের যে নক্সা বা মডেল তৈয়ারী করা হয়, সে নক্সা ও মডেলের পরীক্ষা-কালে লক্ষ্য রাখা হয়—এই মডেলের জাহাজ প্রয়োজনানুরূপ আকারে গড়িয়া তুলিলে মালের ভারসমেত ঝড়-ঝাপ্‌টায় তুফানের দুর্য্যোগ কাটাইয়া নিরাপদে পাড়ি দিতে সমর্থ হইবে কি না,—তুফানে জাহাজ টলমল করে; টলমলানিতে উল্টাইয়া না যায়, টলমলানিতে জাহাজের মালপত্র বা লগেজ উল্টাইয়া পড়িলে বিপত্তির সৃষ্টি হইবে! এ-সব পরীক্ষাতেও সাফল্যসহ উত্তীর্ণ হওয়া চাই। যে মডেলের জাহাজ এত ধোপ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে মনে হয়, সেই মডেলই সার্থক বলিয়া গৃহীত হয়।

'আমেরিকা' নামে যে প্রকাণ্ড মাল-জাহাজ সদ্য তৈয়ারী হইয়াছে, সে জাহাজের গলুইয়ের জন্য ৫৫খানি ছোট মডেল লইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল; তার পর একখানির বাছাই হয়।
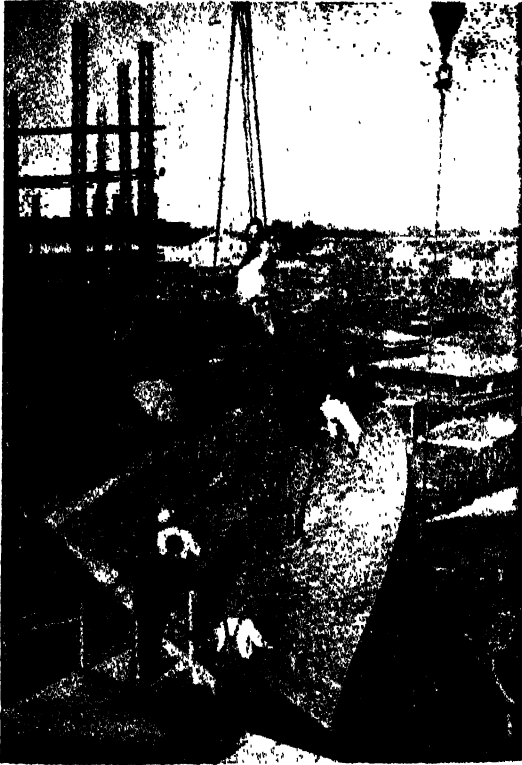
জাহাজের পিছন্‌কার অংশ

ইহা হইল সদাগরী বা যাত্রী-জাহাজের কথা। এক-একখানি যুদ্ধ-জাহাজের জন্য যে কত নক্সা সংগৃহীত হয়, তার ঠিক-ঠিকানা নাই। এই সব কাগজী-নক্সার ওজন দাঁড়ায় প্রায় এক টন। কাগজে কত লেখাজোখা টানিয়া তার পর জাহাজের আকার-প্রকারের বাছাই-কার্য্য সমাধা হয়; তার পর সুরু হয় নির্ব্বাচিত নক্সা ধরিয়া সেই নক্সার অনুরূপ মডেল তৈয়ারী। নৌ-বিভাগের প্রধান পূর্ত্ত-শিল্পী সিড্‌নি ভিনসেণ্ট বলেন,—"ইণ্ডিয়ানা" যুদ্ধ-জাহাজের জন্য বহু সহস্র নক্সা আঁকা হইয়াছিল। এক-একখানি নক্সা প্রায় ১৫ ফুট দীর্ঘ। এই নক্সাগুলির সমষ্টিগত ওজন দাঁড়াইয়াছিল প্রায় ৪১ টন। এক-একখানি অতি-সাধারণ ট্যাঙ্কার বা মালবাহী আকার দাঁড়ায় বড় বড় সহরের টেলিফোন-ডাইরেক্টরির মত বিরাট একখানি গ্রন্থ!

মনোনীত হইলে জাহাজের নক্সা প্রথমে যায় লফ্‌ট্ বিভাগে। কল্পিত জাহাজের আকার-প্রকার সুদীর্ঘ রেখায় এই লফ্‌টের মেঝেয় আঁকিয়া তোলা হয়। এই ছবিতে কল্পিত জাহাজের প্রত্যেকটি অংশ সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত হইলে নানা বিভাগের শিল্পীরা এই ছক বা প্যাটার্ণ দেখিয়া লম্বা কাঠ কাটিয়া জুড়িয়া গলুই হইতে মাস্তুল পর্য্যন্ত গড়িয়া তোলে। তার পর এই সব অংশ জুড়িয়া কাঠের বা পেষ্টবোর্ডের কঙ্কালে আসল জাহাজের আদ্‌রা গড়িয়া তোলা হয়। এক-একটি আদ্‌রা গড়িতে ব্যয় হয় প্রায় বারোশ' টাকা। এই কাঠের বা পেষ্ট-বোর্ডের মডেল-জাহাজের ওজন প্রায় দশ হাজার টন। একখানি মডেলের নির্ম্মাণে যেখানে এত সমারোহ, সেখানে দু'হাজার জাহাজের নির্ম্মাণ-কার্য্যে কি ব্যাপার ঘটে, ভাবিলে

মোটা-মোটা শিকল তৈরী

বিস্ময়ের সীমা থাকে না! বড় বড় দর্জ্জীরা যেমন পোষাক তৈয়ারী করার আগে কাগজের ছক্ তৈয়ারী করিয়া সেই ছক্-অনুযায়ী পোষাক তৈয়ারী করে, কাঠের বা পেষ্ট-বোর্ডের ছক দেখিয়া জাহাজ-শিল্পীরা তেমনি জাহাজ-নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা করে। জাহাজ তৈয়ারী হইলে লোহার বা ইস্পাতের চেন, প্রোপেলার, নোঙ্গর—এগুলি অন্য শিল্পীদের দ্বারা তৈয়ারী করানো হয়।

যে-সব কারখানায় আসল জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে, সেখানে জাহাজের বিভিন্ন অংশ-নির্ম্মাণের জন্য নানা বিভাগ খোলা হইয়াছে। সে-সব বিভাগে বিভিন্ন শিল্পীর দল দিন-রাত প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে। এক-একটি অংশের আকার যেমন বিরাট, ওজনেও

সঙ্গে সঙ্গে ভারী ক্রেনযোগে বা অন্য উপায়ে সেগুলি পরবর্ত্তী বিভাগে পাঠানো হইতেছে—পর্য্যায়ানুযায়ী কাজটুকু সমাধা করিবার উদ্দেশ্যে! ফিটার, ওয়েল্ডার, ড্রিলার, রিভেটিয়ার—এমনি বিভিন্ন শিল্পীর সহযোগিতায় কি নিঃশব্দে সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ চলিতেছে, এবং জাহাজ-নির্ম্মাণের বিরাট কার্য্য সংসাধিত হইতেছে, দেখিলে মনে হইবে যেন মায়াপুরীতে কোনো শক্তিমান্ দেবতা মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন; আর সেই মন্ত্রে এত জাহাজ জন্ম লাভ করিতেছে!

বড় বড় ক্রেনে মাল তোলে

যারা ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করে, তাদের মুখে লোহার মুখোশ আঁটা। কি কঠিন কাজ না তাদের করিতে হয়! প্রাণ লইয়া খেলা! আগুন জ্বলিতেছে—আগুন ছিটকাইতেছে—সে আগুনের একটি কণা যদি মুখের কোথাও লাগে তো ফল হইবে সাংঘাতিক। লোহার মুখোশ না আঁটিলে কাজ করিতে পারিবে না। চোখের কাছে আছে রঙীন কাচের পরকলা। চোখে না দেখিলে কি করিয়া কাজ করিবে? তার উপর আগুনের অত্যুজ্জ্বল রশ্মি! চোখ সে অত্যুজ্জ্বল রশ্মিতে ঝলশিয়া নষ্ট হইবে! তাই রঙীন কাঁচের আবরণীতে দৃষ্টিকে নিরাপদ সহনীয় করা হয়।

গলুই-গড়ার ভারা

জাহাজ-নির্ম্মাণে ওয়েল্ডারের কাজের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কুইন মেরি নামে যে ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ তৈয়ারী হয়, সে জাহাজে rivets (স্ক্রু)-এর সংখ্যা এক কোটির উপর,—কিন্তু আমেরিকায় যে সব জাহাজ এখন তৈয়ারী হইতেছে, তাহাতে একটিও পেরেক বা স্ক্রুপ নাই! ওয়েল্ডিংয়ের দ্বারা বিভিন্ন অংশ জোড়া হইতেছে। তার ফলে জাহাজগুলি হইতেছে অনেক বেশী হালকা এবং মজবুত। ইহাতে জলের বুকে তাদের গতিবেগও
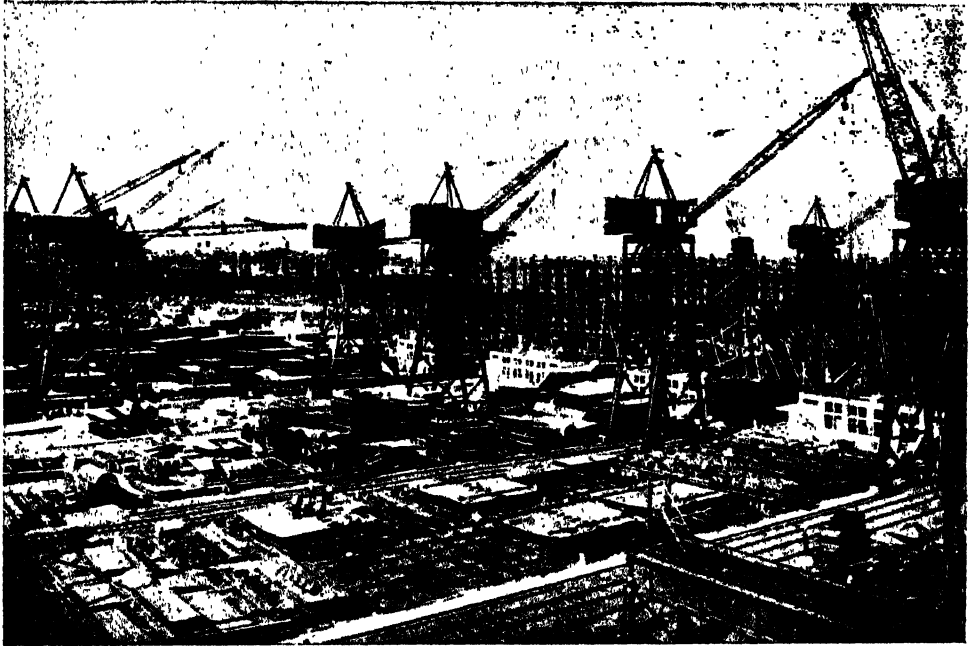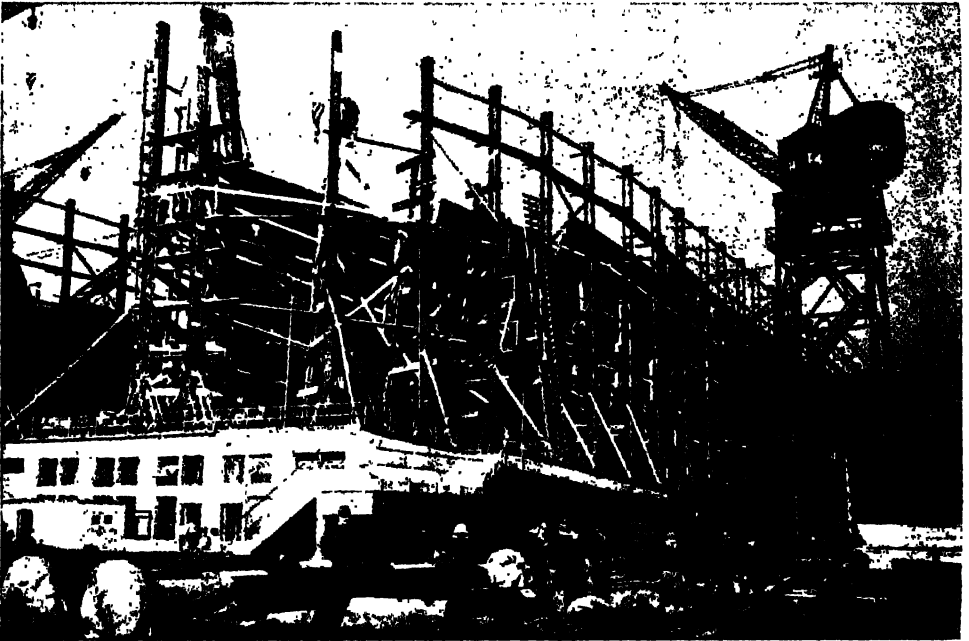
ক্রেন—বাঁয়ে ডেষ্ট্রয়ার ও ডাহিনে দু'খানি যাত্রী-জাহাজ মেরামত হইতেছে

সমুদ্রগামী জাহাজ (১৮৮২)

আমেরিকার আধুনিক জাহাজী কারখানার চেহারা দেখিলে চমক লাগিবে। জাহাজের ভারী অংশগুলি এক-বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে শূন্য-পথে ঝুলন্ত অবস্থায় পরিচালিত হইতেছে। জাহাজের নানা অংশ নানা জায়গায় স্বতন্ত্র ভাবে তৈয়ারী হইতেছে। এ সব অংশ পরিচালিত হইতেছে অন্য জাতের ক্রেনের সাহায্যে। এক জাতের ক্রেন চলে শূন্যপথ দিয়া—অংশগুলিকে যেন বিড়াল ছানার মত ঝুলাইয়া লইয়া যায়। আর এক জাতের ক্রেন মাটী হইতে অংশগুলিকে তুলিয়া রেল-পথে আনিয়া জড়ো করে; তার পর মাল-গাড়ীতে তুলিয়া সেগুলি চালান দেওয়া হয়।

যে বিরাট প্রাঙ্গণে নানা অংশ জুড়িয়া পরিপূর্ণ জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে, সে প্রাঙ্গণের পরিধি প্রায় বিশ লক্ষ মাইল! নানা অংশ সংলগ্ন করিবার দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, যেন বিধাতা-পুরুষ বসিয়া সেকালের কোন অতিকায় প্রাণীর সৃষ্টি করিতেছেন! প্রাণী বলিলে দোষ হইবে না—কারণ, প্রাণীর দেহে যেমন শিরা-উপশিরা আছে, অস্থি-পঞ্জর আছে, জাহাজেও তেমনি। বৈদ্যুতিক তারগুলি জাহাজের নার্ভস্! মাইল-মাইল দীর্ঘ পাইপগুলি জাহাজের শিরা-উপশিরা! জল, তৈল এবং বাষ্প জাহাজের রক্ত! এই রক্তের স্বচ্ছন্দ প্রবাহের উপর জাহাজের প্রাণ-শক্তি নির্ভর করিতেছে।

অনেকখানি বাড়াইতে পারা গিয়াছে। ওয়েলডিংএ জাহাজের গায়ে ছিদ্র করিবার প্রয়োজন হয় না। ওয়েলডিংয়ের কাজ হইতেছে হাতে; কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে শুধু অটোমেটিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। রিভেট্-যোগে ট্যাঙ্কার-নির্মাণে সময় লাগিত পাকা দুই শত দিন—ওয়েলডিংয়ে সেই ট্যাঙ্কার এখন ১৭ দিনে নির্মিত

মেরামতী-কাজে আগুনের ফোয়ারা

নির্ম্মীয়মাণ জাহাজের অংশ

বোট-ডেকের পরীক্ষা

শতকরা ৬০ বা ৮০ ভাগ কাজ সম্পূর্ণ হইলে জাহাজকে শুষ্ক ডকে নামানো হয়। তার পর তৈয়ারী হয় কাঠ দিয়া কেবিন, সেলুন ও ডেক; তার পর হয় আলোক-ব্যবস্থা, চলন-পথ, টেলিফোন-

ডকের কারিগরদল
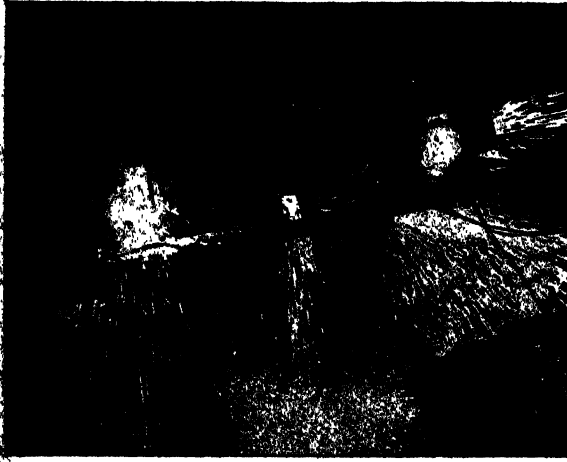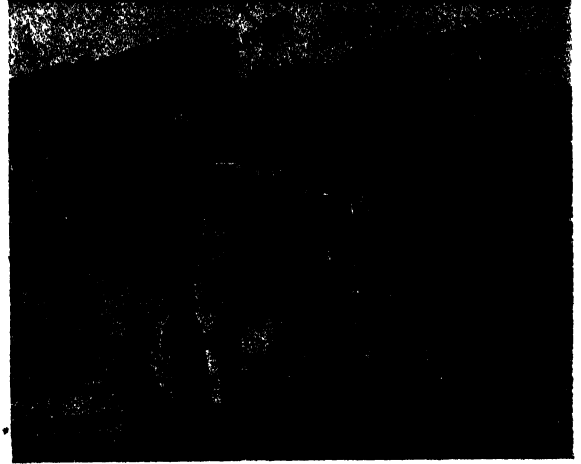
সরঞ্জাম ও কেবিনের আসবাব-পত্রের ব্যবস্থা। অগ্নি-নিবারক ব্যবস্থা হয় সবশেষে।
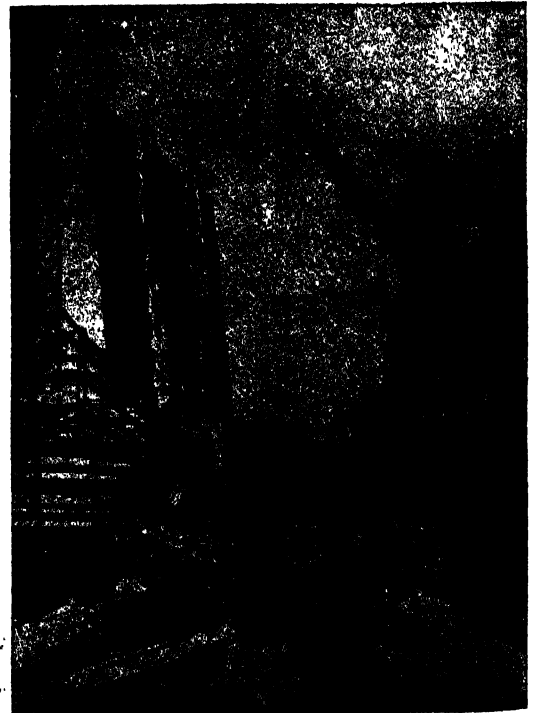
তলা তৈয়ারী—দু'পাশে ক্রেন ও ভারা
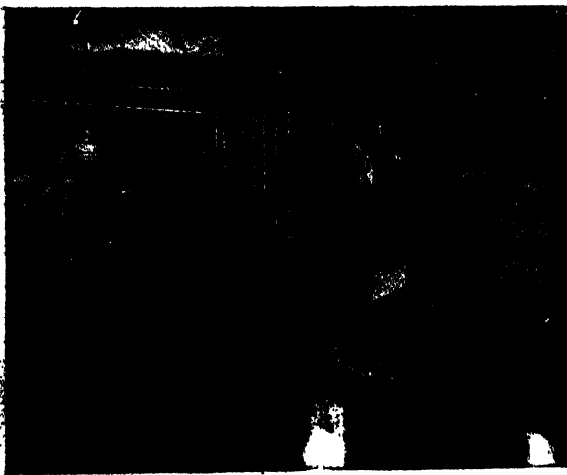
জলহীন শুষ্ক জায়গায় জাহাজের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা করিতে হয়; জলে জাহাজ তৈয়ারী হইতে পারে না। উঁচু ঢালু জায়গা

সিমেন্ট দিয়া বাঁধাইয়া যে-জমি তৈয়ারী হয়, সেই জমিই জাহাজ-নির্ম্মাণের উপযোগী।

নির্ম্মাণের পর কি করিয়া জাহাজকে জলে ভাসানো হইবে, সে সম্বন্ধে গোড়া হইতে প্ল্যান করিয়া রাখা চাই ! গল্পের রবিনশন

নূতন সী-৩ জাহাজ

ক্রুশো জল হইতে বহু দূরে বসিয়া নৌকা তৈয়ারী করিয়া সে-নৌকা জলে ভাসাইতে বিলক্ষণ বেগ পাইয়াছিলেন ! কাজেই শুক্‌নো ডাঙ্গায় জাহাজ তৈয়ারী করিলেও সে-ডাঙ্গা যদি জলাশয় হইতে দূরে হয় তো জাহাজ ভাসানো প্রায়-অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

ক্রেনে ঝুলাইয়া কামান আনিয়া যুদ্ধ-জাহাজে ফিট্ করা

জাহাজের তলদেশ বা keel প্রথমে মেঝের তৈয়ারী করিতে হয়। মোটা-মোটা ভারী এবং মজবুত বহু কাষ্ঠখণ্ডের উপর ভর রাখিয়া এই তলদেশের গঠন সুরু হয়। সিমেন্টের মেঝেয় কাঠের কুঁদাগুলি সাজাইয়া তার উপর গড়িতে হয় জাহাজের keel—তার পর দেহের বাকী অংশ পর-পর আঁটিয়া জুড়িতে হয়। জলের কোলে থাকে সিমেন্ট-করা জমি ; সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে অত্যধিক

৪০০ টন হাইড্রলিক প্রেশ্—ইস্পাতকে পাত্ করিয়া দেয় !

ভারের জন্ম জাহাজ হেলিয়া জলে না পড়ে, সে জন্ম ইস্পাতের টাই-প্লেট দিয়া নোঙর আঁটিয়া জাহাজকে খাড়া রাখিতে হয়। নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইলে জলে নামাইবার সময় এসেটিলিন টর্চ্চের আলোয় এই প্লেটগুলি পুড়াইয়া দেওয়া হয়—অমনি সঙ্গে সঙ্গে

জলের কোলে কাঠ পাতিয়া জাহাজ তৈয়ারী

বন্ধনমুক্ত জাহাজ জলে গিয়া নামে। জাহাজকে যখন জলে নামানো হয়, শিল্পী ও উদ্যোক্তাদের তখন কি ভিড় জমে। শিল্পীদের এত কালের কর্ম্মপ্রয়াস সার্থক হইয়াছে—তাদের মিলিত জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়া ওঠে।

যে মুহূর্ত্তটিতে জাহাজ জলে নামে, সে মুহূর্ত্তটুকু জাহাজের জীবনে বড় সঙ্গীন ! জলের স্পর্শ পাইবামাত্র জাহাজ কাঁপিতে থাকে—
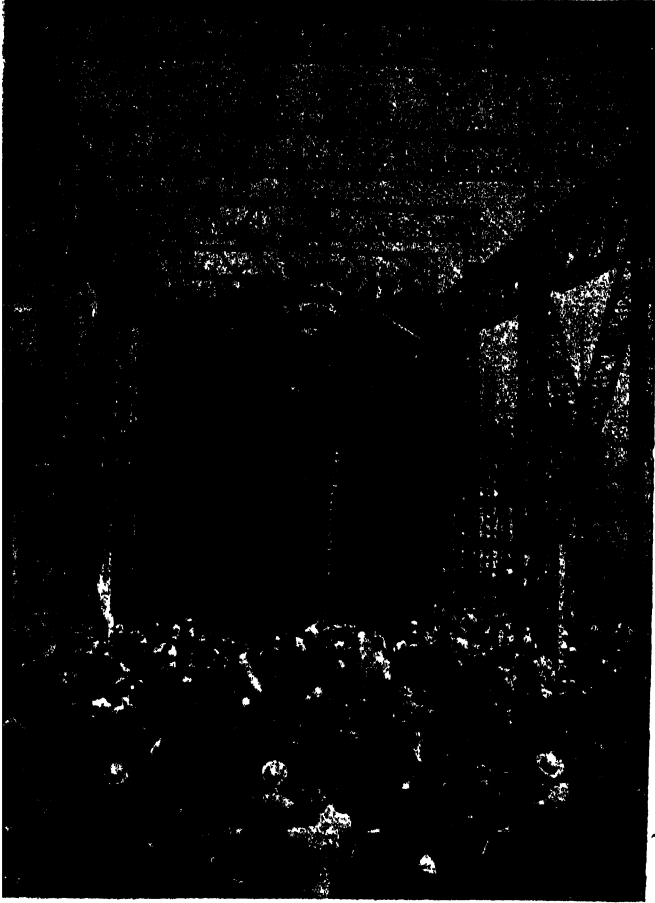
তৈয়ারী জাহাজ জলে চলে

জাহাজের সকল অংশ হইতে এত-রকমের শব্দ ওঠে—মনে হয়, মানব-শিশুর মত জন্ম লাভ করিয়াই প্রাণের স্পন্দনে সে উল্লসিত হইয়া কান্না-হাসির দোলায় দুলিয়া উঠিয়াছে! তার পর একবার মাঝ-দরিয়ায় ভাসিয়া গেলে সে আর মানুষের তোয়াক্কা রাখে না! দুরন্ত ছেলের মতই মাতিয়া ওঠে! টাগ, বা নোঙর লইয়া তখন তাকে আয়ত্তাধীনে আনিতে হয়।

বড় জাহাজের জন্ম-ব্যাপারে যে সমারোহ চলে, সামরিক ছোট জাহাজের জন্ম-ব্যাপারেও তার এতটুকু ব্যতিক্রম নাই। খবরা-খবর দেয়া-নেয়ার জন্য জাহাজে এখন টেলিগ্রাফ, বেতার-শেট আছে। তাহা থাকিলেও নিশান (Flags) ও জোরালো বাতির আলোর সাহায্যেও খবরা-খবর দেয়া-নেয়া চলে। নিশানের সাহায্যে খবর দেওয়ার রীতি প্রাচীন মিশরেও ছিল। এখন সদাগরী জাহাজে দেখানো হয় আন্তর্জাতিক নিশান—এ নিশানে সদাগরী জাহাজ বুঝায়। এ নিশান-সঙ্কেত বিখ্যাত ক্যাপটেন ফ্রেডারিক মারিয়াট ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রবর্ত্তিত করেন। তার পর এ সঙ্কেতে প্রভূত উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নিশান-সঙ্কেত সম্বন্ধে ওয়াশিংটনে যে আন্তর্জাতিক সভার অধিবেশন বসে. সেই অধিবেশনে বিভিন্ন সঙ্কেতের বিভিন্ন অর্থ করিয়া সমস্ত জাতি মিলিয়া তাহার সুদীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

জন্য আছে দশটি বিভিন্ন সঙ্কেত। নিশানে বর্ণমালা এবং এই সংখ্যা ছাপিয়া জাহাজের পরিচয় প্রদান করা হয়। এই সব অক্ষর ও সঙ্কেত সাজানোর বৈশিষ্ট্যে জাহাজের কি অবস্থা তাহা বাহিরে প্রচার করা হয়। তালিকা-গ্রন্থে ঐ সব অক্ষর ও সংখ্যার যথাযথ অর্থ সুস্পষ্ট মুদ্রিত আছে। নিশানের গায়ে ইংরেজী N-O দেখিলে বুঝিতে হইবে. জাহাজে আগুন লাগিয়াছে; যাত্রীদের চটপট জাহাজ হইতে সরাও। R-Y অক্ষরে বুঝাইবে যাত্রীরা বিদ্রোহ করিয়াছে। K Z N J O J C T V অক্ষরে বুঝিতে হইবে বোম্বেটের দল জাহাজ আক্রমণ করিয়া ক্যাপ্‌টেনকে খুন করিয়াছে। এক একটি অক্ষরেও এমনি বিভিন্ন অর্থ সূচিত হয়।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম যে বাষ্পীয় জাহাজ (steam ship) তৈয়ারী হয়, সে বাষ্পীয় পোত আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া সাভানো হইতে লিভারপুলে গিয়াছিল। আটলাণ্টিক পার হইতে এ ষ্টীমারের সময় লাগিয়াছিল ২১ দিন ১১ ঘণ্টা। সে ষ্টীমারে ছিল জল-কাটা চাকা এবং মাস্তুল। তার পর বাষ্পীয় জাহাজ সম্বন্ধে নানা উৎকর্ষ হইয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এ সাধনার চরম ফল লাভ হয়। বাষ্পের জন্য কয়লার পরিবর্ত্তে খনিজ তেলের প্রচলন এই সময়ে হয়। তার পরে বাষ্পীয় জাহাজে টার্বিন-এঞ্জিন সংযোগ করা হইলে তার জোরে বাষ্পীয় পোতের গতিবেগ সমধিক বর্দ্ধিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে

ষ্টীমারের দাঁড
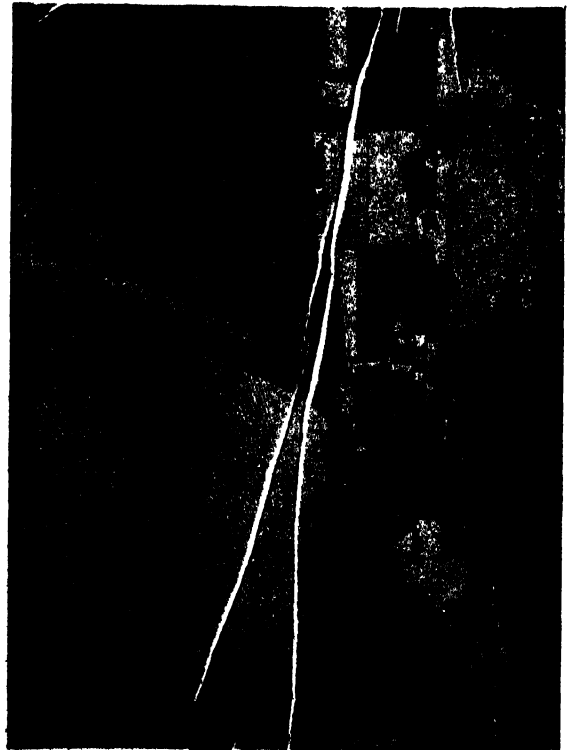
গীয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। গীয়ারের দৌলতে এঞ্জিনের শক্তি আরো বাড়িয়াছে। জাহাজের জন্য গীয়ার নির্ম্মাণ যেমন কষ্টকর তেমনি ব্যয়সাধ্য। গীয়ার তৈয়ার করিতে টন-টন ওজনের ইস্পাতের প্রয়োজন এবং নির্ম্মাণের পর গীয়ারের আকার দাঁড়ায় মানুষ-সমান উঁচু। এত-বড় গীয়ারকে চাঁছিয়া ছুলিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া ঘষিয়া মাজিয়া তার গায়ে খুব মিহি দাঁত বাহির করা হয়—ঘড়ি ও অণুবীক্ষণের মত মিহি দাঁত। গীয়ারের দাঁতগুলি হয় মাপে এক ইঞ্চির দশ-সহস্রতম (১।১০০০০) ভাগ। দাঁত ছুলিবার সময় পাছে ইস্পাত বাড়ে বা কমে, এজন্য যন্ত্র কক্ষটিকে সম টেম্পারেচারে রাখা প্রয়োজন।

নৌবিভাগের শিক্ষালয়

মানুষের মত জাহাজের ব্যাধি আছে এবং সে ব্যাধিতে মানুষের মত জাহাজেরও চিকিৎসা প্রয়োজন। রঙে ও মেরামতীতে জাহাজের পরমায়ু বাড়ে। ব্রুকলিনের রবিন্স ড্রাইডক এণ্ড রিপেয়ার কোম্পানি এ কাজে অসাধারণ পারদর্শী। এখানকার কারখানায় কত ছাঁদের ব্রিটিশ জাহাজ মেরামত হইয়া নব-শক্তিতে সঞ্জীবিত হইতেছে, তার সংখ্যা নির্ণয়াতীত। মার্কিন জাহাজেরও সংখ্যা নাই। কারখানার সহিত শিক্ষালয় আছে। সে শিক্ষালয়ে জাহাজের আধিব্যাধির খুঁটানাটি ও সেগুলোর পরিচর্য্যার সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়।
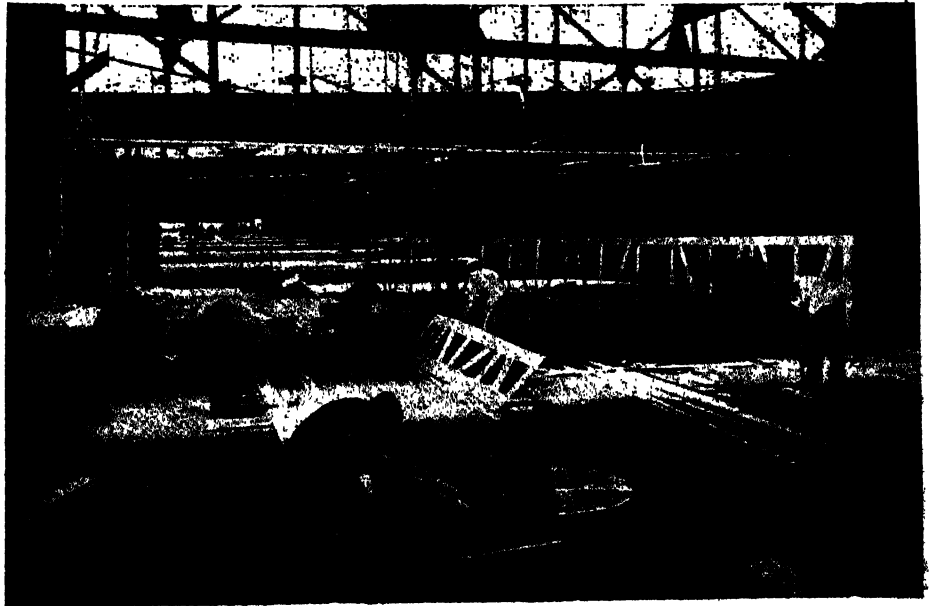
লফ্‌টের মেঝে

জাহাজের নির্ম্মাণ এবং মেরামতীর কাজের জন্য বিশাল ডকের প্রয়োজন। জীর্ণ জাহাজকে প্রথমে জল-ভরা ডকে আনা হয়, তার পর পাম্প করিয়া নিমেষে ডকের জল নিষ্কাশিত করিয়া শুষ্ক ডকে চলে মেরামতীর কাজ। মাপে এই সব ডক বড় বড় হ্রদ বা দীঘির সমান। পাম্পের এমন শক্তি যে ডকের উনচল্লিশ লক্ষ গ্যালন জল এক ঘণ্টায় নিঃশেষে নিষ্কাশিত হইয়া যায়।

ঢেউ

(গল্প)

এক

স্তব্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া বাসুদেব নিশ্বাস ফেলিল।

জ্যেঠাইমা তাহাকে অযথা বকিয়াছেন। সে ত কোন অন্যায় করে নাই; সকালবেলা বই লইয়া পড়িতে বসিয়াছিল, সেজদা' কেন তার কাণ ধরিয়া তাকে চেয়ারের উপর দাঁড় করাইয়া দিল? বইয়ের একখানা সাদা পাতায় সেজদা'র হাঁ করিয়া পড়া মুখস্থ করিবার ভঙ্গি সে শুধু নকল করিয়াছিল মাত্র। তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ সেজদা' ছবিটা তো কালি দিয়া কাটিয়াই দিয়াছে, উপরন্তু তাহার পৃষ্ঠদেশে সজোরে কয়েক ঘা চপেটাঘাত পর্য্যন্ত করিয়াছে, তাহাতেও রাগ না পড়ায় মায়ের নিকট গিয়া কাঁদুনি গাহিয়া আসিয়াছে। জ্যেঠাইমাও নিরপেক্ষ বিচার করিলেন না। তিরস্কার করিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইবার আদেশ দিলেন এবং জ্যেঠামহাশয় কাছারি হইতে ফিরিয়া তাহাকে কিরূপ সম্বর্দ্ধনা করিবেন, তাহারও ইঙ্গিত তিনি ভাল করিয়া ব্যক্ত করিলেন।

চৈত্রের দ্বিপ্রহর। রৌদ্র মাথায় উঠিয়াছে। সম্মুখের শস্যহীন শূন্য প্রান্তর দিগন্ত ব্যাপিয়া খাঁ খাঁ করিতেছে। গোবিন্দজীর মন্দিরের সম্মুখে দীঘির তীরবর্ত্তী আমগাছের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল অনেক কথা সে ভাবিতেছিল। সকালবেলা হইতে উপবাসী। কেহ একবার অনুরোধ করে নাই, ডাকিতেও আসে নাই এবং এতক্ষণেও হয়তো বাড়ীতে তাহার খোঁজ পড়ে নাই। চারি দিকে একবার ক্লান্ত দৃষ্টি বুলাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বাগানের সরু পায়ে-চলা পথ ধরিয়া সে চলিতে লাগিল। আমগাছগুলির শাখা কচি কচি আমের ভারে নত হইয়া পড়িয়াছে, বৃন্তচ্যুত সুপক্ব জামে গাছের তলা ছাইয়া গিয়াছে; কাঁটালের-ইঁচোড়ের সোঁদা গন্ধে বাতাস মাতিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সে দিকে বাসুর লক্ষ্য ছিল না। সে সম্পূর্ণ যেন নির্ব্বিকার।

পিতামাতার কথা বাসুর মনে পড়ে না। দূর-সম্পর্কীয় জ্যেঠামহাশয়ের বাড়ী শিশুকাল হইতে আদরে অনাদরে স্নেহে বিতৃষ্ণায় মানুষ হইতেছে। শৈশব হইতেই সে খুব দুরন্ত। এই তেরো বৎসর বয়সেও তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় নাই।

চলিতে চলিতে পেয়ারা-গাছ-তলায় আসিয়া বাসু থমকিয়া দাঁড়াইল। তার পর কি ভাবিয়া সামনের উঁচু ঢিপিটায় উঠিয়া দূরে বেতঝোপের ওপাশে বন্যলতা আগাছা প্রভৃতিতে ভরা একটা প'ড়ো জংলা জায়গার দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। জ্যেঠাইমার কাছে শুনিয়াছি, ঐখানেই তাহাদের বাড়ী ছিল; ঐখানেই না কি প্রতি বৎসর দোল, দুর্গোৎসবের শানাই বাজিত—যাত্রাওয়ালারা সীতাহরণ মনসামঙ্গলের পালা গাহিয়া গ্রামবাসীদের মুগ্ধ করিত, হাজার হাজার লোক তাহাদের বাড়ীর নিমন্ত্রণ খাইয়া পরিতৃপ্ত হইত। এখনো হয়তো গ্রামের কোন বৃদ্ধ এ পথ দিয়া যাইবার সময় অতীতের সে উজ্জ্বল দিনগুলার কথা স্মরণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া যায়! [illegible] আর দাঁড়াইতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যে যেন [illegible], সে সেই ঢিপি হইতে নামিয়া পেয়ারা-গাছের [illegible] পড়িল। পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। অর্দ্ধ-শুষ্ক একটা কাঁচা পেয়ারা সম্মুখে পড়িয়াছিল। তাহাই তুলিয়া চিবাইতে লাগিল। চিবাইতে চিবাইতে মায়ের অস্পষ্ট মূর্ত্তি চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ দুইটি টল্‌টলে অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। পেয়ারাটা মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। তার পর হাত দু'খানি বুকে চাপিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল। কিছু কাল পরে পেয়ারাটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দু'হাতে মুখ গুঁজিয়া সে গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

* * * *

জ্যেঠামহাশয়ের প্রহার এবং জ্যেঠাইমার তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়া বাসু রাত্রে দোতলায় আপনার ঘরে বিছানায় পড়িয়া ছিল। দক্ষিণের খোলা জানালার বাহিরে উভয় চোখের ম্লান দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সে একটু সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিল। জলভারহীন শুভ্র মেঘ মৃদু চন্দ্রালোকিত আকাশে ভাসিয়া যাইতেছে, অস্ফুট আলো-অন্ধকারের এই নিঃশব্দ রহস্য সে যেন নূতন চোখে নূতন করিয়া দেখিতে লাগিল।

'বাসু?'

কে যেন ডাকিল। বাসু পাশ ফিরিয়াছিল, উত্তর দিল না।

'বাসু—ঘুমিয়েছিস্ ভাই?'

কণ্ঠস্বরে বাসু চিনিয়াছিল, কহিল—'না বৌদি।'

এই বৌদি বাসুর জ্যেঠ-তুত ভাই হিরণের স্ত্রী সাবিত্রী। ক'মাস পূর্ব্বে শ্বশুরবাড়ীতে নূতন 'ঘর করিতে' আসিয়াছে। গলার স্বর খাটো করিয়া সাবিত্রী কহিল—'খাবি?'

'খাব'; বলিয়া বাসু উঠিয়া বসিল। চাহিয়া দেখিল, হাতে এক বাটি দুধ লইয়া সাবিত্রী খাটের এক পাশে বসিয়া আছে।

'কিন্তু...'

সাবিত্রী বলিল, 'খাবি, তার মধ্যে আবার কিন্তু কি?'

কি ভাবিয়া বাসু হঠাৎ বলিয়া উঠিল—'না, আমি খাবো না। বৌদি, দুধ তুমি নিয়ে যাও—নিয়ে যাও বৌদি। লক্ষ্মীটি, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি।'

সাবিত্রী তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া অনুনয়ের সুরে বলিল,—"লক্ষ্মী ভাইটি, খা। অভিমান করছিস্ তুই কার ওপরে। সারা দিন উপোস ক'রে আছিস্—কে তোকে খেতে বারণ করেছিল বল্‌তো।'

বাসু গম্ভীর হইয়া বলিল,—'জ্যেঠাইমা।'

'জ্যেঠাইমা? কখ্‌খনো না। পাজী ছেলে, তিনি তোকে সারা দিন উপোস করে থাকতে বলেছিলেন?'

'বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, আমাকে যে খেতে দেবে তার সঙ্গেও তাঁর বোঝা-পড়া হবে বলেছিলেন।'

সাবিত্রী অজ্ঞতার ভঙ্গি করিয়া বলিল,—'তাই না কি? বোঝা-পড়া কি রকম হবে?'

জানালার দিকে আবার মুখ ফিরাইয়া বাসু বলিল,—'তা জানিনে।'

তাহার অবিচল গাম্ভীর্য্যে সাবিত্রী হাসিল। হাসিয়া বলিল,—'পাগল! জ্যেঠাইমা কি সত্যি তা বল্‌তে পারেন? রাগ ক'রে হয়তো ও-কথা বলে থাকবেন। তা কেন তুই ও-রকম দুষ্টুমী করিস্?'

দুই হাতে সাবিত্রী বাসুর মাথাটা কোলে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া কহিল, 'খা, লক্ষ্মী ভাইটি, আমি বল্‌ছি, কিছু হবে না।'

বাসু এবার রীতিমত বিস্মিত হইয়া বৌদির মুখের দিকে চাহিল। এত কাল সে শুধু লাঞ্ছনা, তিরস্কার এবং রুক্ষ ব্যবহারই সকলের নিকটে পাইয়া আসিতেছিল। স্নেহের এত বড় অধিকারে সে শিশুকাল হইতেই বঞ্চিত। দুই চোখের প্রগাঢ় দৃষ্টি মেলিয়া স্তব্ধ ভাবে সে শুধু চাহিয়া রহিল।

বাসুর জ্যেঠামহাশয় অবিনাশ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হিরণ ছয় মাস পূর্ব্বে যে দিন সাবিত্রীকে নববধূরূপে গৃহে লইয়া আসে, সেই দিনই শত উৎসুক চক্ষু ও সঘন শঙ্খধ্বনির মধ্যে এই পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকটি সাবিত্রীর কৌতূহল দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সুপক্ক আমের মত তাহার রং, কোঁকড়ানো কালো চুল, এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্য সুন্দর তার দু'টি চোখ। আর, বাড়ীর সর্ব্বত্রই সে বিরাজ করিতেছে। ঝগড়ায়, খেলায়, উৎসবে বাসু সকলের অগ্রগামী। কথায় তার অজস্র বৈচিত্র্য, মাথায় কত রকমের অদ্ভুত ফন্দি-ফিকির; তাহার সজীবতায় এবং সরলতায় সাবিত্রী মুগ্ধ হইয়াছিল। কৌতূহলভরে সে তাহার সমবয়স্ক পাশের একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'ও ছেলেটি কে ভাই,—ঐ যে ফর্সা রঙ, মাথায় কোঁকড়া কালো চুল?'

মেয়েটি হাসিয়া বলিল,—'ও তো আমাদের বাসু।'

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, 'বাসু? কে বাসু?'

উত্তর হইল, 'কে আবার? দুষ্টুর শিরোমণি বাসু।'

সেই দুষ্টুর শিরোমণিকে এখন চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সাবিত্রী সহজ স্বরে বলিল,—'থাক্। ব'সে ব'সে আর ভাবতে হবে না; লক্ষ্মী ছেলেটির মত এটুকু এখন খেয়ে নাও দেখি।'

বাসু বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল, উত্তর দিল না।

সাবিত্রী হাসিয়া তাহার মুখখানা নিজের দিকে ঘুরাইয়া চাহিয়া দেখিল, চোখ দু'টি জলে ভাসিয়া গিয়াছে। সাবিত্রী সেই দিক হইতে চোখ সরাইয়া লইয়া বলিতে লাগিল, 'এম্‌নি এক দিন রাত্তিরেই তো রাজপুত্র ডালিমকুমার পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে কত দেশ, কত পাহাড় পার হ'য়ে তেপান্তরের মাঠের শেষে এম্‌নি একটা মস্ত নদীর ধারে এসে পড়েছিলেন। রাজপুত্র ঘোড়া থামিয়ে দেখ্‌লেন, মহাবিপদ! চার দিকে ভয়ঙ্কর অন্ধকার! তার উপর সামনে প্রকাণ্ড নদী—রাজপুত্র ভয়ে ঘেমে একেবারে যেন নেয়ে উঠ্‌লেন।'

ভয়ে ভয়ে রাজপুত্রের নিদারুণ অবস্থাটি মনে মনে চিন্তা করিয়া বাসু বলিয়া উঠিল—'তার পর?'

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—'বা রে ছেলে, গল্প পেলে আর কথা নেই! আগে খেয়ে নে, তার পর বল্‌ছি।'

বাসু লজ্জিত হইয়া কহিল,—'খাচ্ছি, তুমি বলো, রাজপুত্র কোথায় যাচ্ছি[illegible]?'

'সে অনে—ক দূরে—রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে।'

এমন সময় বাড়ীর ঝি বিন্দু আসিয়া কহিল,—'বৌদিদি, মা তোমাকে ডাকছে গো।'

উৎকণ্ঠিত স্বরে সাবিত্রী কহিল,—'কেন রে?'

'তা জানি না কি।'

অনিচ্ছা সত্বেও সাবিত্রীকে বলিতে হইল—'আচ্ছা, তুই যা। আমি যাচ্ছি।'

বিন্দু চলিয়া গেলে বাসু কহিল—'তুমি চট্ ক'রে জ্যেঠাইমার কথাটা শুনে এসো বৌদি,—তার পর খেয়ে গল্প শুনব।' কিন্তু সাবিত্রী তাহাকে পূর্ব্বেই খাওয়াইয়া যাইতে চাহিল। তথাপি বাসু রাজি না হওয়ায় অগত্যা তাহাকে যাইতে হইল।

নীচে আসিয়া দেখিল, ভুবনেশ্বরী মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছেন এবং তাহারই সম্মুখে পিসশাশুড়ী তৈল-প্রদীপের আলোকে ভাগবত পাঠ করিতেছেন।

সাবিত্রীকে দেখিয়া ভুবনেশ্বরী কহিলেন—'ডেকে পাঠিয়েছিলুম, একটা কথা আছে, বৌমা। বোসো।'

সাবিত্রী সেইখানেই মেঝের উপর বসিলে তিনি কহিলেন—'কথাটা তেমন কিছু নয়—অবিশ্যি তুমি রাগ করো না, মা। আমাকে বলতে হোল দেখেই বল্‌ছি। গুরুজন যাদের শাসন করেন, তাদেরই মঙ্গলের জন্যে তা করেছেন। এ নিজেকে শাস্তি দেওয়া নয়। নইলে গুরুজন শাস্ত্র বলেছেন কেন? কিন্তু ঐটে অনেকে ভুল করে মা, তারা ভাবে, শাস্তি দিচ্ছে! তাদেরই জন্যে ঐ সব ছেলে-মেয়েগুলোর পরকালও ঝর্‌ঝরে হ'য়ে ওঠে।'

সাবিত্রী লজ্জায় যেন মরিয়া গেল, ইহার প্রত্যেকটি কথা যে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে। 'অথচ দেখ',—ভুবনেশ্বরী আবার আরম্ভ করিলেন—'বাসুটা আজকাল যে কি রকম সাঙ্ঘাতিক দুষ্টু হ'য়ে উঠেছে, ব'লে শেষ করা যায় না। এমন দিন নেই যে-দিন ওর নামে নালিশ হয় না। কর্ত্তাকে আমি বলেছি, হয় এ রত্নটিকে বিদেয় করো, না হয় বাড়ীর আর সব ছেলেদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা কর। নইলে, একা ওর জন্যে এ বাড়ীর সবগুলো ছেলে উচ্ছন্নে যাবে, এ আমি ব'লে রাখছি। কি বলো তুমি, ঠাকুর-ঝি?' এই বলিয়া তিনি ভাগবতপাঠিকার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

কিন্তু যাহার বিরুদ্ধে এত কথা বলা হইল এবং যাহাকে বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিবার বড়যন্ত্র চলিতেছিল সে ছেলেটি সত্যই তত মন্দ নয়। স্কুলেও লেখাপড়ায় তাহার যথেষ্ট সুনাম আছে। তাহার তুলনায় এ বাড়ীর অন্যান্য ছেলেদেরও দুষ্টামীর অন্ত নাই। তথাপি ভুবনেশ্বরী তাহাকে কিছুতেই সুনজরে দেখিতে পারেন না। তাঁহার সন্তানদের চেয়ে ঐ গলগ্রহ ছেলেটা শ্রেষ্ঠ, ইহা তাঁহার মাতৃহৃদয় কিছুতেই স্বীকার করিতে চায় না। তবে বাসুর চরিত্রের প্রধান দোষ এই যে, নালিশ করা তাহার স্বভাব নয়। সে অন্যায় সহ্য করিবে, তবু মুখ ফুটিয়া নালিশ করিবে না। বাড়ীর অন্যান্য ছেলেরা এ সুযোগ ছাড়িবে কেন? তাহারা নির্ব্বিবাদে বাসুর মাথায় সব দোষ চাপাইয়া ভালো মানুষ সাজিয়া অব্যাহতি লাভ করে।

এই ক' মাসে সাবিত্রীও ইহা জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু প্রতিবাদে শাশুড়ীর সম্মুখে একটি কথা কহিতেও সাহস বা প্রবৃত্তি হয় নাই। ভুবনেশ্বরী তাহার নিকট হইতে কিছু শুনিবার আশা করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; কিন্তু অপর পক্ষকে সম্পূর্ণ নীরব দেখিয়া বাধ্য হইয়া শেষে বলিলেন, 'রাত হ'য়েছে, আর ব'সে থেকো না মা, যা হবার তা পরে হ'বেখন। তুমি বামুন-ঠাকরুণকে ব'লে জায়গা ক'রে তোমার শ্বশুরকে খেতে দাওগে।'

বাসু ওদিকে অন্ধকার ঘরে একা বসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করিতে লাগিল বৌদিদির আগমন। কিন্তু বৌদিদি আসিল না। না আসিবার কোন কারণ বাসু খুঁজিয়া পাইল না। এখন তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর ছিল না, কিন্তু কি যেন একটা ব্যথায় পেটের ভিতরটা ঝিন্ ঝিন্ করিতেছিল। সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, বিছানাতেই উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

দুই

দিন কয়েক পরে এক দিন সকালবেলা পড়ি-কি-মরি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সতু পিতৃ-সমীপে নিবেদন করিল, এইমাত্র বাসুকে সে ছিদেম বৈরাগীর আখড়ায় স্বচক্ষে তামাক খাইতে দেখিয়া আসিয়াছে, বাসুকেই সত্য-মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন না কেন বাবা?

ঘটনাটি সংক্ষেপে এই;—আজ সকালে দু'জনেই স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে গোটাকয়েক জামরুলের লোভে শ্রীদাম বৈরাগীর আখড়ায় হানা দিয়াছিল। আখড়াটি কায়েত-পাড়ার রাস্তার ঠিক সম্মুখেই অবস্থিত। তাহার পশ্চাতে নদী। গ্রামের মধ্যে এই স্থানটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। আশে-পাশে মাত্র কয়েক ঘর নিম্ন জাতির বাস। আখড়ার চারি পাশে বৈরাগী ঠাকুরের স্বহস্তকৃত নানাবিধ তরিতরকারীর বাগান এবং ফুলের চারা ব্যতীত তাহার ছোট খড়ের ঘরের সংলগ্ন প্রশস্ত আঙ্গিনায় তুলসীমঞ্চের পাশের প্রবীণ জামরুল গাছটিই ছিল গ্রামের ছেলেদের সবচেয়ে প্রিয় আকর্ষণ। তা' ছাড়া সময়ে অসময়ে এই দিকে আসিয়া ছেলেরা আসর জমাইলেও বৃদ্ধ খুসী বই অসন্তুষ্ট হইত না। এই গাছ হইতে গোটাকয়েক কাঁচাপাকা জামরুল পাড়িয়া তাহা ভাগ করিতে গিয়া দু'জনে বচসা হয়, এবং ক্রমে তাহা লইয়া হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। শেষে ছিদেম ঠাকুর মীমাংসা করিয়া দিলেও রাগ করিয়া সতু সবগুলি জামরুল মাটিতে ফেলিয়া ছুটিয়া পিতৃসমীপে গিয়া উক্ত নালিশ দায়ের করিল।

অবিনাশ চৌধুরী বৈঠকখানায় বসিয়া খাতাপত্র দেখিতেছিলেন। পুত্রের কথা শুনিয়া মুখ তুলিয়া তিনি বলিলেন, 'কি হয়েছে?'

'ছিদেম বৈরাগীর আখ্ড়ায় বাসু তামাক খাচ্ছে।'

খাতাপত্র ফেলিয়া অবিনাশ গর্জ্জিয়া উঠিলেন; 'তামাক খাচ্ছে? হারামজাদা, পাজি, শুয়ার, ডেকে নিয়ে আয় তাকে আমার নাম ক'রে।'

সতু খুসী হইয়া ডাকিতে যাইবার ছুতা করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলে অবিনাশ তাকিয়ায় ঠেস দিয়া গড়্গড়ার নলটা তুলিয়া লইয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন। একেই তো দূর-সম্পর্কীয় এই ভ্রাতুস্পুত্রটিকে বাড়ীতে আশ্রয় দান করায় গৃহিণীর মন ভারী এবং মুখ অপ্রসন্ন আছে, তাহার উপর নিত্য অভিযোগে অভিযোগে তাঁহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তথাপি তাহাকে তিনি কিছুই বলিতে পারিতেন না। তাহার সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া সব ভুলিয়া যাইতেন। কিন্তু আজ এই অসম্ভব কথা শুনিয়া সর্ব্বশরীর জলিয়া যাইতে লাগিল। কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া উঠিয়া তিনি অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'শুনেছ? বাসুর কীর্ত্তি? সে তামাক ধরেছে!'

ভুবনেশ্বরী দাওয়ায় বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন, বলিলেন—'বেশ্ তো।' খাসা খবর, শুনে কাণ জুড়িয়ে গেল! আজ আনুলে তামাকের খবর। কাল এনো গাঁজার, পরশু মদের! তার পরদিন এমনি আর কিছু। এর পর এক দিন এসে খবর দিও, এ বাড়ীর সতু, টুকু, নান্টু, দাশু এরাও ওর দলে ভিড়েছে।'

কর্ত্তা রাগিয়া উঠিলেন—'কখ্খনো না। এমন হ'তেই পারে না।'

ভুবনেশ্বরী ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—'কি হ'তে পারে না?'

'তুমি হাসছো? আমি—আমি আজ ঠিক ব'লে রাখ্লুম, কাল সকালেই ওকে তাড়াবো। আমার বাড়ীতে থেকে খেয়ে প'রে আমার বাড়ীর ছেলেদের মাথা—'

কথা শেষ হইল না—কথার মাঝখানে বাসু আসিয়া দেখা দিল। আসিয়াই সে জ্যেঠাইমার পানে চাহিল—মুখের যে ভাব দেখিল, বুঝিল,—কিছু একটা ঘটিয়াছে, সে আর বিলম্ব না করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে উপরে উঠিয়া গেল। সাবিত্রী তখন কি একটা কাজে নীচে নামিতেছিল, বাসুকে দেখিয়া কহিল, 'কি রে?'

হাসিয়া বাসু দুই পকেট-ভর্ত্তি জামরুলগুলা দেখাইয়া কহিল,—'অনেক জামরুল এনেছি; বৌদি, খাবে?'

'খাবো। এদিকে আয়, শোন্।' বলিয়া সাবিত্রী তাহার হাত ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল।

'তুই না কি তামাক খেয়েছিস্?'

'তামাক?' বাসু যেন আকাশ হইতে পড়িল। সাবিত্রী তাহার নিজের মুখ বাসুর মুখের অতি সন্নিকটে আনিয়া আঘ্রাণ লইল, কিন্তু তাম্রকূটের কোন গন্ধই পাইল না। পুনরায় আঘ্রাণ করিল, এবারেও পাইল না। না পাইয়া বিস্মিত হইল। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এইমাত্র বাড়ীর মধ্যে এত বড় অঘটন ঘটিতেছে, আসলে তাহা যে কত বড় মিথ্যা, তাহা সে ছাড়া আর কেহ জানিল না।

বাসু চুপি চুপি বলিল, 'কি, বৌদি?'

'কিছু না। বাঃ, বেশ জামরুলগুলো তো। আমাদের বাড়ীর উঠোনে, জানিস্, খুব ভালো একটা কুল গাছ আছে, তার কুল কি, এত বড়-বড়! আর তেমনি মিষ্টি।'

বাহির হইতে ভুবনেশ্বরীর গলা শোনা গেল এবং পরক্ষণে তিনি ঘরে পা দিয়া বাসুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'ছিদেম ঠাকুরের আখ্ড়ায় গিয়ে কি করেছিস্ তুই?'

ভয়ে ভয়ে বাসু কহিল,—'কিছু করিনি তো?'

'কিছু করিস্নি?' ভুবনেশ্বরী চেঁচাইয়া উঠিলেন।

'না।'

'না? তামাক খেয়েছে কে? হতভাগা কোথাকার, মিথ্যে কথা বল্তে লজ্জা করে না?'

বাসু চমকাইয়া উঠিল। এ প্রশ্ন বৌদিও কিছুক্ষণ পূর্ব্বে করিয়াছিল, জ্যেঠাইমাও করিতেছে; অথচ কেন করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল,—'আমি জানিনে জ্যেঠাইমা, আমি তো কিছু করিনি।'

'কিছু করেননি। একেবারে ভালো মানুষ। দেখ্লে বৌমা, মিথ্যে কথা এমন সাজিয়ে বল্বে, যে কার বাপের সাধ্যি ধরে! হাতে-নাতে ধরা প'ড়লো, তবু স্বীকার কর্বে না!'

সাবিত্রী ইহাতে সায় না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। বাসু কাঁদিয়া বলিল—'কে হাতে-নাতে ধরা প'ড়েছে? আমি? কখ্খনো না। কে ধরেছে বলো?'

ভুবনেশ্বরী মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, 'আর ন্যাকামো করতে হবে না। ঢের হয়েছে। সতু কিছু না দেখে এসে বলেনি—সে তোর মত নয়।'

রুদ্ধ নিশ্বাসে বাসু কহিল—'মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা জ্যেঠাইমা! ওতে আমাতে একসঙ্গে জামরুল পাড়তে গিয়েছিলুম—ডাকো তুমি ওকে।'

ভুবনেশ্বরী হাত নাড়িয়া কহিলেন, 'আর সাক্ষী-সাবুদে কাজ নেই বাপু। আজ থেকে তোকে ভালয় ভালয় বলছি, কখখনো আর তুই সতু, টুকু, নান্টু, এদের কারো সঙ্গে কথা কইতে পাবিনে। শুধু ওরা কেন, এ বাড়ীর কারো সঙ্গে তুই মিশতে পাবিনে। খাবার সময় এসে দু'টি খাবি—আর যেখানে, যার সঙ্গে খুসী গিয়ে নেশা-ভাং করিস্, কেউ কিচ্ছু বলবে না। যে দিন দেখবো এর নড়চড় হয়েছে সেই দিনই ঠিক জানিস্, এ বাড়ীর অন্ন-জল তোর উঠবে।' এই বলিয়া তিনি যেমন ভাবে আসিয়াছিলেন, তেমনই বেগে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। বাসু হতভম্ব ভাবে সেইখানেই কতক্ষণ দাঁড়াইয়া কোঁচার খুঁট দিয়া চোখের জল মুছিল। তার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। আজ আর তাহাকে কেহ সান্ত্বনা দিতে আসিল না—অশ্রু তাহার চক্ষু-প্রান্তে শুকাইয়া গেল।

দিন কয়েক এমনি করিয়া কাটিল। মুখ বুজিয়া মাথা নীচু করিয়া কাহারো সহিত বাক্যালাপ না করিয়াই সে দিন কাটাইতে লাগিল। আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসে কুলায় নাই।

বর্ষা আসিল। মাঠ, ঘাট, পুকুর জলে ভরিয়া গেল। ধান-গাছগুলি জলের উপর মাথা উঁচু করিয়া বাতাসে দুলিয়া উঠিল। কূলে কূলে ভরিয়া-ওঠা নদীর বুকে দেশ-বিদেশের রঙ্গীণ পাল উড়িল। গ্রীষ্মের শুষ্কা শীর্ণা বসুন্ধরা আবার সরস সুন্দর সাজে সজ্জিত হইল।

এই বর্ষায় এক দিন দুপুরবেলা খিড়কির পুকুরে ছিপ ফেলিয়া বাসু উপরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—এমন চুপ-চাপ করিয়া থাকিলে যদি জ্যেঠাইমার রাগটা যায়, মন্দ কি? সে আর কোন-কিছু করিবে না, কাহাকেও কিছু বলিবে না, ভালো হইয়া চলিবে। কিন্তু বৌদি? বৌদিও যে তাহার উপর রাগ করিয়াছে! নিশ্চয় করিয়াছে, নহিলে বৌদি কথা বন্ধ করিল কেন? তাহার মনে হইল, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে, বৌদি, কেন তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ? কিন্তু না, তাহা হইলে জ্যেঠাইমার আদেশ অমান্য করা হইবে! ইহাতে যদি তিনি আরও রাগিয়া যান্? সে আর ভাবিতে পারিল না। দৃষ্টি নামাইয়া লইয়া ধান-ক্ষেতের উপর দিয়া দূরে নদীর ধারে চটকলের কালো উঁচু চিম্‌নির মুখ হইতে উত্থিত ধূম্ররাশির পানে চাহিল। বুকের যে গুরুভার নামাইতে ছিপ লইয়া পুকুর-ঘাটে আসিয়াছিল তাহা নামিল না; বরং তাহার মন আরও বেশী ভারী হইয়া উঠিল।

এক হাতে তালি বাজে না; বাসু ভুবনেশ্বরীর আদেশে বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে কথা না কহিলেও তাহারা বাসুকে ছাড়িল না; তাহারা বাসুকে কথা কহাইতে বাধ্য করিল। এবং সে সংবাদ ভুবনেশ্বরীর জানিতে দেরী হইল না। যাহারা যাচিয়া বাসুর সঙ্গে আলাপ করিয়াছিল, তাহারাই গিয়া ভুবনেশ্বরীকে সংবাদ দিল, বাসু গায়ে পড়িয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিয়াছে।

গৃহিণী চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, 'বাসু?'

বাসু চুপি চুপি পলাইতেছিল—ডাক শুনিয়া জ্যেঠাইমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

'তোকে না আমি ওদের সঙ্গে মিশতে বারণ করেছিলুম?'

'ছোড়দা বললে যে—'

'ছোড়দা বললে? কি বললে?' ভুবনেশ্বরী ধমকাইয়া উঠিলেন।

বাসু কাঁচুমাচু হইয়া কহিল, 'আমাকে ডেকে নিয়ে গেল—'

'কখখনো ডাকেনি! তুই ওদের কু-মৎলব দিয়ে নিয়ে গেছিস্। না হলে এত বড় বুকের পাটা ওদের নয়। বল্, কেন নিয়ে গিয়েছিলি?' বলিতে বলিতে রাগ বাড়িল—তিনি বাসুর গালে সজোরে একটি চড় বসাইয়া দিলেন। সাম্‌লাইতে না পারিয়া বাসু মাটিতে পড়িয়া গেল। ভুবনেশ্বরী বলিয়া উঠিলেন, 'আহা বাছা রে' ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান! ননীর পুতুল! থাকগে, কাজ কি আমার মার-ধোর ক'রে? যে এনেছে, ভাত-কাপড় দিচ্ছে সে যা খুসী করুক—আমার কি? যা ওঠ, এখানে পড়ে থেকে—আর ঢঙ করতে হ'বে না।' এই বলিয়া তিনি বাসুর কাণ ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিতে টানিতে রান্নাঘরের পিছনে বাড়ীর শেষ সীমানায় লইয়া গিয়া একটা আমগাছ-তলায় দাঁড় করাইয়া রাখিলেন।

আমগাছের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড ডোবা। বর্ষায় এখন কানায় কানায় জলে পরিপূর্ণ। জলের ধারে হোগ্‌লা এবং কুশ গাছের ফাঁকে ফাঁকে গর্ত্তে বসিয়া কোলা ব্যাঙরা গলা ফুলাইয়া ঘ্যাঙর ঘ্যাং করিয়া ডাকিতেছে। ডোবার ঐ পাড়ে অনেক দূরে আকাশের গায়ে হঠাৎ ঝক্ ঝক্ করিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চারি দিক কাঁপাইয়া বজ্রধ্বনি হইল। কতক্ষণ পরে আস্তে আস্তে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বৃষ্টি শুরু হইল—পরে জোরে, আরো জোরে বৃষ্টি আসিল। আমগাছের পাতা বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জলের ফোঁটাগুলি বাসুর মাথায় পড়িতে লাগিল। বাসু নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া আছে—পায়ের তলায় জল জমিয়া জমিয়া ক্রমে সম্পূর্ণ পা দু'খানা সে জলে ডুবিয়া গেল।

তাহার যেন নড়িবার শক্তি নাই, কাহাকেও ডাকিবার শক্তি নাই, চোখ বুজিবার ক্ষমতাও যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! এই ভাবে কতক্ষণ কাটিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না; সহসা আলোর একটু ক্ষীণ রশ্মি তাহার দেহ স্পর্শ করিল। সে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, কে আলো লইয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহার দিকে আসিতেছে। 'বৌদির' কণ্ঠ! কিন্তু উত্তরে বাসুর শুষ্ক কণ্ঠ হইতে একটা কথাও বাহির হইল না। সাবিত্রী আলো ঘুরাইয়া অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া চারি দিকে খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে আসিয়া বাসুকে আবিষ্কার করিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সাবিত্রী চম্‌কাইয়া উঠিল। দু' ঘণ্টা ধরিয়া যে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গেল তাহা মাথায় করিয়া এইখানে, এমনই ভাবে বাসু দাঁড়াইয়া। কাছে আসিয়া বাসুর কাঁধে হাত রাখিয়া ডাকিল, 'বাসু?'

সে স্পর্শে বাসুর যেন চেতনা হইল। নির্নিমেষ নেত্রে অনেকক্ষণ সাবিত্রীর মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল। তার পর ডাকিল—'বৌদি?' সঙ্গে সঙ্গে তাহার দু'চোখ বহিয়া হু হু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। তাহার অবসন্ন কম্পিত হাত দু'খানি বাড়াইয়া সাবিত্রীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতে লাগিল। ভিজা জামা-কাপড়, ভিজা দেহ—বাসু কাঁপিতেছিল। সাবিত্রী শক্ত করিয়া

তাহাকে ধরিয়া সহানুভূতিভরে বলিল—'বাসু, কি হ'য়েচে? অত কাঁপ্‌ছিস্ কেন?'

'আমি ভূত দেখেছি বৌদি। ওরা এতক্ষণ আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। এখনো যায়নি, ঐ দ্যাখো চার দিকে।'

সাবিত্রী সভয়ে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্তূপীকৃত ভগ্ন বৃক্ষ-শাখাগুলি দেখিতে পাইয়া সান্ত্বনা দানের জন্য বলিল,—'ভূত আবার কি? ও সব কিছুই নয়। ডালগুলো ভেঙ্গে প'ড়েছে, তাই ভয় পেয়েছিস্!'

বাসু বলিল, 'না।'

সে 'না' বলিল,—কিন্তু সাবিত্রী সব বুঝিল। সে এতক্ষণ এই-খানে দাঁড়াইয়া ছিল, এত বড় ঝড়-বৃষ্টি তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে! বাসুর অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া এই দুর্ভাগা ছেলেটির জন্য তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

সাবিত্রী বলিল,—'চল, আর দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নে। বর্ষাকাল, এই রাত্রি, আয় আমার সঙ্গে।'

বাসুকে প্রায় এক রকম টানিয়াই সাবিত্রী তাহাকে দোতলায় নিজের ঘরে লইয়া গিয়া তাহার ভিজা জামা-কাপড় ছাড়াইয়া লইল এবং বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া নিজে খাটের একপাশে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর বলিল,—'আচ্ছা, বাসু, ঝড় উঠ্‌তেই পালিয়ে এলিনে কেন? একলা কখনো এমন সময়ে অন্ধকারে জঙ্গলে থাক্‌তে আছে? কিন্তু ও-সব কথা থাক, ঘুমো, আমি আলো নিবিয়ে দিই।'

আলো নিবাইয়া দিয়া সাবিত্রী খাটের পাশে বসিয়া রহিল—নিঃশব্দে অনেকক্ষণ। ঘড়িতে ঠং ঠং শব্দে এগারোটা বাজিল, আকাশে মেঘ কাটিয়া চাঁদ উঠিয়াছে; মৃদু কিরণধারায় মুক্ত প্রকৃতি পরিপ্লাবিত হইতেছে। দিগন্ত প্রসারিত ধান্যক্ষেত্রে আউস ধানের শীষগুলি উদ্দাম নৈশ বায়ু-প্রবাহে আন্দোলিত আলোড়িত। হঠাৎ বাসু ডাকিল, 'বৌদি।'

সাবিত্রী বলিল, "ঘুমোস্‌নি বাসু!"

বাসু বলিল,—"না। ঘুম আসছে না।"

'কি ভাবছিস্ বাসু?'

'ভাবছি, এখানে আমি আর থাকবো না।'

সাবিত্রীর বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। বলিল, 'এখানে থাক্‌বিনে, কোথায় যাবি?'

বাসু কহিল, 'যেখানে হোক এক জায়গায়। কত লোকে তো বিদেশে যায়, আফিসে চাক্‌রী করে, আমিও তাই ক'র্‌বো।'

সাবিত্রী উৎকণ্ঠা গোপন করিয়া প্রশান্ত ভাবে বলিল,—'বোকা ছেলে, লেখাপড়া না শিখলে কে তোকে চাক্‌রী দেবে? তোর বড়দা বি-এ পাশ করেছে, তবে তো চাক্‌রী পেয়েছে। লেখা-পড়া শেখ, ভাল ক'রে পাশ্-টাশ কর। দেখিস্ কত ভাল ভাল চাক্‌রী তখন আপনা হতেই জুটে যাবে রে।'

বাসু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল, 'জ্যেঠাইমা রাগ করেন, রোজ বকাবকি করেন। আমি তাঁর আপদ বালাই, সংসারে আর কোথাও আমার জায়গা নেই, তাই তাঁর ঘরে বসে অন্ন ধ্বংসাচ্ছি, এই সব বলেন, আমি তাঁর এত খোঁটা আর সইতে পারছিনে, বৌদি। আমি কোথাও চ'লে যাবো, তাহলে জ্যেঠাইমারও হাড় জুড়োবে।'

সাবিত্রী ভয় পাইল। বাসুর মনে আজ ঝড় উঠিয়াছে। যে নিষ্ঠুর নির্য্যাতন প্রতিদিন তাহাকে সহ্য করিতে হইতেছে, আজ এত দিন পরে তাহার অন্তর সে জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, কত বড় আঘাত পাইলে, কি ভাবে নিষ্পেষিত হইলে একটি নিরাশ্রয় অসহায় বালকের মন এইরূপ চঞ্চল হইয়া উঠে, সাবিত্রী তাহা বুঝিতে পারিল। হয়তো বাসু অভিমানভরে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে কোথায় যাইবে? কোথায় আশ্রয় পাইবে? ভয়ানক খেয়ালি সে, হয়তো বা সত্যই সে সকলের অজ্ঞাতসারে আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অকূলে ভাসিয়া যাইবে। সাবিত্রীর কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে সঙ্কল্প করিল, কিছুতেই বাসুকে যাইতে দিবে না। যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিবে। তাহার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত গ্লানি নিঃশেষে মুছাইয়া দিয়া দুই বাহুর অন্তরালে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিবে—যত দিন না সে বড় হয়—যত দিন না সে লেখাপড়া শিখিয়া সংসারে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার শক্তি লাভ করে।

কিছু কাল চিন্তার পর ধীরে ধীরে সে বলিল,—'বাসু, একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস্ ক'রবো, সত্যি বল্‌বি?'

'বলবো। তোমাকে কি কোন কথা লুকাতে পারি, বৌদি! তুমি ছাড়া আমার মুখের দিকে তাকায় এমন আর কে আছে?'

'আমাকে তুই ভালোবাসিস্?'

বাসু মুখ নত করিয়া বলিল,—'বাসি, খুব ভালোবাসি।'

'তাই বুঝি আমাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে চাইচিস্? আমাকে একা ফেলে তুই যেতে পারবি?—তোকে দেখ্‌তে না পেলে আমার যদি কষ্ট হয়, তবু যাবি?'

'মানুষ বুঝি বিদেশে যায় না?'

'এই রকম করে যায়?' সাবিত্রী বাসুর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল।

বাসু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'আমি তো আর সত্যি সত্যি চ'লে যাচ্ছি না—তোমাকে শুধু জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম, তুমি কি বলো তাই শোনবার জন্যে।'

সাবিত্রী আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'বেশ, তা হ'লে মিথ্যে ক'রেও কিন্তু ও কথা আর মুখে আন্‌তে পাবিনে; কেমন? মনে থাকবে?'

বাসু কি কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সাবিত্রীর চোখের দিকে চাহিয়া সে নীরব রহিল। শেষে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—'আচ্ছা।'

'ঠিক্?'

'হাঁ।'

'আমি যা বল্‌বো, শুনবি?'

'শুনবো।'

সাবিত্রী সহাস্যে তাহার কপালে, চোখে, মুখে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, 'এই তো লক্ষ্মী ছেলে। কে বলে বাসু কথা শোনে না? বাসুর মত ভাল ছেলে আর একটিও নেই।'

লজ্জায় বাসু বালিসে মুখ লুকাইল।

তিন

বাড়ীতে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। সকলের মুখে আনন্দের আভাস এবং হাসির রেখা পুনরায় দেখা দিয়াছে। ভুবনেশ্বরীকেও আজকাল ঝি-চাকরদের উপর সকল সময় খড়্গহস্ত হইতে দেখা যায় না। বাড়ীর ছেলেদের শাসনও প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

ছেলে-মহল মহা খুসী। অপরিসীম আনন্দে তাহারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ অখিলের সহিত তাহাদের ভাব হইয়াছে। অখিল সাবিত্রীর ছোট ভাই; কিছু দিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে। অখিল সহুরে ছেলে। তাহার চাল, চলন, আচার-ব্যবহার সকলই অন্য-রকম। গল্প বলিয়া আসর জমাইবার শক্তি তাহার অদ্ভুত। সম্ভব অসম্ভব নানা কথায় সকল সময়েই তাহার মুখে যেন খৈ ফুটিত। এই নবাগত সহুরে ছেলেটির উপর সমগ্র ছেলে-মহল এক দিনে ঝুঁকিয়া পড়িল।

এক দিন বিকালে তাহারা ধানক্ষেতের উপর নৌকা ভাসাইয়া জলবিহার করিতেছিল। আমন ধানের কচি কচি পাতাগুলি সব্‌সব্ করিয়া দুই পাশ দিয়া সরিয়া যাইতেছিল। বাতাসে কচুরীপানার দল এক দিক হইতে অন্য দিকে ভাসিয়া যাইতেছিল এবং সমস্ত দৃশ্যটির উপর অস্তমান তপনের লোহিত রশ্মি মেঘে মেঘে প্রতিফলিত হওয়ায় শুভ্র মেঘগুলি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার আকাশে ভাসমান বুনো-হাঁসের ঝাঁক দেখাইয়া সুধাংশু বলিল, 'আচ্ছা ভাই অখিল, অনেক কথাই তো বল্‌লে; তোমাদের ক'লকাতায় সন্ধ্যে-বেলায় আকাশ দিয়ে ওরা এমনি করে উড়ে যায়?'

অখিল চটপট উত্তর দিল, 'হাঁ, আমাদের ওখানে বিকেলে পায়রার ঝাঁক যে ভাবে ওড়ে তা দেখবার জিনিষ। আর কটাই বা উড়ে গেল? কিন্তু আমাদের ক'লকাতায় পায়রা যখন ওড়ে, তখন আকাশের দিকে চাইলে আকাশ দেখা যায় না! লক্কা, গোলা, সেরাজ কত তাদের নাম, আর একরকম পায়রা আছে জান—সেগুলো পেখম ধরে ময়ূরের মত নাচে, দেখে চক্ষু জুড়ায়।'

ছেলেরা সব হাসিয়া উঠিল। বাসু ঘাড় তুলিয়া কহিল, 'ও-তো পায়রা নয়, বুনো হাঁস। কোন বিলে উড়ে যাচ্ছে।' এ কথায় অখিল অপদস্থ হইলেও কিন্তু তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভের ন্যায় উত্তর করিল, 'হ্যাঁ, জানি—জানি; সে কথা তো বলিনি। তোমরা বক্ দেখেছ? সাদা বক্? বড়-গঙ্গার উপর দিয়ে যা ওড়ে।'

সতু মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, 'তাই তো, আমরা ও-সব কোত্থেকে দেখ্‌বো বল? চেয়ে দেখ তো ওটা কি জানোয়ার?' অখিল চাহিয়া দেখিল, তাহাদের নৌকা ধানক্ষেতের যে পাশ দিয়া চলিয়াছিল, তাহারই একটু দূরে জলের মধ্যে একটি অর্দ্ধ প্রোথিত বাঁশের মাথায় একটি সাদা বক্ এক পায়ে ভর দিয়া পরম ধার্ম্মিকের মত নিস্পৃহ ভাবে বসিয়া ছিল। অখিল অন্য কথা পাড়িল। সে বায়োস্কোপ দেখিয়াছে, ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি, কোনো ছবি বাদ দেয় নাই। খেলার মাঠে সে দিন মোহনবাগানের সঙ্গে মহামেডান স্পোর্টিংএর ড্র হইয়াছিল, যে দিন মারামারির সময় সে যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল তাহা দেখিয়া একটা মোটরওয়ালা-ইংরেজ তাহাকে বিলাতে লইয়া যাইবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া কি টানাটানি! ইডেন্ গার্ডেনে এম সি সির সঙ্গে ক্রিকেট খেলার দিনে অমরনাথের মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল। অমরনাথের নাম শুনিয়াছ? শোন নাই? পাড়াগেঁয়ে ভূত কি না! আর একবার সে ছাদের উপর ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে ঘুড়ির সুতা দিয়া একখানা এয়ারোপ্লেন টানিয়া ছাদে নামাইয়াছিল, ছাদ হইতে মাটিতে পড়িয়াই এয়ারোপ্লেনখানা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়াছিল, আর তার পাইলট সাহেবটাকে তো খুঁজিয়াই পাওয়া গেল না। এয়ারোপ্লেনের এই দুর্ঘটনার জন্য সরকার কাছে কি বকুনিই না খাইতে হইয়াছিল।

কথা শুনিয়া ছেলেরা পরস্পর মুখ-চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল—এয়ারোপ্লেন ফেলিয়া দিয়াছে—কি অসাধারণ তাহার শক্তি!

বাসু বলিল—'আমরা যখন ক'লকাতায় গিয়েছিলুম, দোতলা বাসে চ'ড়েছিলুম, না ছোড়্‌দা?'

সুধাংশু হাল ধরিয়া বসিয়াছিল—সে বলিল—'হ্যাঁ।'

'দোতলা বাস্?' অখিল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—'ওতো বড্ড সেকেলে। নূতন ট্রাম দেখেছ? গদি আঁটা।'

'হাঁ।'

'আচ্ছা, দোতলা ট্রাম? তা আর দেখ্‌তে হয় না' বলিয়া সে সকলের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

বাসু মৃদু স্বরে সুধাংশুর পানে চাহিয়া কহিল, 'দোতলা ট্রাম, সে আবার হয় না কি, ছোড়্‌দা?' সুধাংশু হাসিয়া কহিল—'কি জানি ভাই, শুনিনি তো। বিলেতে হয়তো থাক্‌তে পারে।'

এমনি করিয়া তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল। হাস্যে, কলহে, আমোদে গল্পে। এত দিন যে একটা বিশ্রী আবহাওয়া বাড়ীর মধ্যে জাঁকিয়া বসিয়াছিল তাহা হঠাৎ যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ডে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

দিন যায়। দেখিতে দেখিতে সবুজ ধানের ক্ষেত হরিৎ হইল। গৃহস্থের ভবনে ভবনে হাসির ঢেউ উঠিল। দোয়েল শ্যামার শিসে বাতাসে শিহরণ জাগিল। পথে পথে শেফালির হাসি ছড়াইয়া দিয়া বর্ষার শেষে আবির্ভাব হইল শরৎ। উঠান ভরিয়া ধান জমা হইয়াছে। চাষীরা যে যাহার ক্ষেত হইতে ধান কাটিয়া ঘরে তুলিতেছে। গ্রামের পথ, ঘাট, বাতাস আজ ধানের গন্ধে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। কাল নবান্ন যে। তাইতো আজ নূতন ধান, নূতন ফুল, নূতন আলোর এত আয়োজন। গাঙের বুকে ভাটিয়াল গানে আর বাঁশীর সুরে রাত্রি নামিয়া আসিল, আশ্চর্য্য সুন্দর নীল ফুলের রাত্রি—আর আলোয় আলোয় রূপালী স্রোতে পৃথিবী ভাসিয়া গিয়া ফুটিয়া উঠিল চিরকালের অতীন্দ্রিয় গোলাপ, চির যুগের উচ্ছ-অলস তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বপ্ন।

কিন্তু অঘটন যখন ঘটে, বোধ করি বা এমন দিনেই ঘটে। কারণ, পরদিন অতি প্রত্যূষেই কর্ত্তা অবিনাশ চৌধুরী বাহির মহল হইতে হন্ত-দন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া গৃহিণীকে কহিলেন, 'আমার আংটিটা পেয়েছ? হীরের আংটি?'

'হীরের আংটি?' ভুবনেশ্বরী চোখ কপালে তুলিলেন—'কোথায় রেখেছিলে?'

স্ত্রীর কথা শুনিয়া অবিনাশ বাবু সেইখানেই ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি যাহা ভাবিয়া আসিয়াছিলেন তাহাই হইল। তথাপি বলিলেন, 'কাল সন্ধ্যেবেলা ওষুধ খাবার সময়ে খুলে ফরাসের উপরে রেখেছিলুম। তার পর ফিরে আঙুলে দিতে আর মনে নেই।'

'ভাল ক'রে মনে ক'রে দ্যাখো। আর কোথাও কিছু করনি তো?'

'না। আমার বেশ মনে আছে, সেইখানেই রেখেছিলুম।'

ভুবনেশ্বরী গালে হাত দিয়া বলিলেন, 'তা'হলে নীচে পড়ে যায়নি তো? তক্তপোষের তলাটা ভাল করে খুঁজে দেখেছিলে?'

'হাঁ, হাঁ। বাক্স, পেঁট্‌রা, তক্তপোষ সব খুঁজে খুঁজে আমি হয়রাণ হ'য়ে গিয়েছি।'

নিমেষের মধ্যে সমস্ত বাড়ীতে সাড়া পড়িয়া গেল। পুনরায় ফরাস তুলিয়া ভাল করিয়া দেখা হইল। ক্যাশবাক্স, কোটের পকেট, খাটের তলা কিছুই বাদ গেল না। তথাপি হীরক অঙ্গুরীর কোন সন্ধানই মিলিল না। ভুবনেশ্বরীর পরামর্শ মত বাসুকে ডাকাইয়া লোভ দেখান হইল—প্রহার করিয়া মুখ দিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া হইল—অবশেষে হাত বাঁধিয়া গাছের ডালে ঝুলাইয়া পর্য্যন্ত রাখা হইল। তথাপি অঙ্গুরীর কোন হদিস্ মিলিল না।

কর্ত্তা-গৃহিণী দু'জনেই হায়-হায় করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা হাঁক-ডাক করিয়া বাড়ীতে প্রচার করিলেন, যে কেহ অঙ্গুরী নিয়াছে তিন দিনের মধ্যে সে তাহা ফিরাইয়া না দিলে ভিন্ গাঁ হইতে গুণিন্ আনাইয়া নল চালাইয়া চোর ধরা হইবে। মন্ত্রবলে চোরের নাক-মুখ দিয়া গল্ গল্ করিয়া রক্ত বাহির হইতে থাকিবে।

এ কথা শুনিয়া সকলের মনেই আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। এ ব্যাপার লইয়া সারা গ্রামে বিপুল কলরব পড়িয়া গেল।

রাত্রে সাবিত্রীর কি মনে হইল। অখিলের সুটকেস্ খুলিয়া এক এক করিয়া কাপড়-জামাগুলি সব বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। অনেক কাগজপত্র, একটি পেন্সিল, দুইটি রেড্ইঙ্ক নিব্, এক কৌটা কালো কোবরা জুতোর কালি, কয়েকটি সেফটিপিন্ এবং পাঁচটি টাকা বাহির হইল। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল আর কিছুই ন্যই। কিন্তু পুনরায় সমস্ত গুছাইয়া তুলিয়া রাখিতে গিয়া সাবিত্রী অকস্মাৎ আঁৎকাইয়া উঠিল। যে ভয় করিয়াছিল তাহাই হইল! কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে সেই হীরক অঙ্গুরী—যাহা লইয়া সকাল হইতে বাড়ীতে ঝড় বহিতেছে। তাহার মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। খোলা সুটকেশের সম্মুখে নির্ব্বাক্ বিমূঢ় হইয়া সে বসিয়া রহিল, এবং অগণ্য নক্ষত্র সমেত সমস্ত আকাশখানা তাহার চোখের উপরে যেন দুলিতে লাগিল।

'অখিল?'

'আমি তখন অত বুঝিনে সেজদি। ভেবেছিলুম, একটু হয়রাণ করিয়ে ফিরিয়ে দোব।'

'তা হ'লে পরে যখন অনেক ক'রে বলা হোল, বার ক'রে দিস্নি কেন?'

'কি ক'রে দেবো? তোমার শ্বশুর—এমন হৈ-চৈ করতে লাগ্লেন, মার-ধোর সুরু করলেন যে আমার ভয় লেগে গেল।'

সাবিত্রী কহিল—'সর্ব্বনাশ করেছিস্ তুই। যা শীগ্‌গীর যা,—এখনো সময় আছে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

'তা হয় না,—সেজ্দি। ভাববে, আমি সত্যি সত্যি নিয়েছিলুম।'

আর্ত্ত কণ্ঠে সাবিত্রী বলিয়া উঠিল, 'তা হ'লে?'

'তা হ'লে কি হবে, সেজ্দি। পরশু নল চালিয়ে আমাকে ধরে ফেলবে—তার চেয়ে কালই আমি ক'লকাতা চ'লে যাই।'

তাহার কথা শুনিয়া সাবিত্রী তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'কেন? পালাবে কেন? বাপ-মার মুখ উজ্জ্বল করতে এসেছো লক্ষ্মীছাড়া, পাজি কোথাকার।'

'তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, সেজ্দি। এবারটি আমাকে রক্ষা ক'রো।'

সাবিত্রী কোন উত্তর দিল না। সুটকেশটি বন্ধ করিয়া যথাস্থানে গুছাইয়া দিয়া গিয়া খাটের উপরে শুইয়া পড়িল। তাহার মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছিল।

'সেজদি?'

সাবিত্রী ধম্‌কাইয়া উঠিল; 'ফের সেজ্‌দি সেজ্‌দি করছিস্ এখানে দাঁড়িয়ে? যা, আমার সামনে থেকে তুই।'

অখিল ভয় পাইবার ছেলে নয়। সে গেল না—আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যখন সাবিত্রীর তরফ হইতে আর একটাও প্রত্যুত্তর আসিল না, তখন বাধ্য হইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সাবিত্রী বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। কি করিবে? ঘটনা যদি প্রকাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে শুধু যে অখিলের অপমান তা নয়। তাহার পিতা-মাতা এমন কি সে নিজে পর্য্যন্ত আর কি করিয়া এ বাড়ীতে ইহার পর মুখ দেখাইবে? দুঃখে, লজ্জায়, রাগে তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

'কি হয়েছে বৌদি? শুয়ে কেন?'

মুখ না তুলিয়াই সাবিত্রী কহিল, 'আঃ, তুই আবার জ্বালাতে এলি, বাসু? আমার অসুখ করেছে, তুই যা।'

'কি অসুখ? কপালে একটু হাত বুলিয়ে দেবো?' বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। সাবিত্রী কোন কথা বলিল না। সহসা তাহার যেন সকল দ্বন্দ্ব অবসানের পথ আবিষ্কার হইয়া গেল; আশার আলোকে তাহার দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সাবিত্রী ধীরে ধীরে কহিল, 'বাসু, আচ্ছা তুই সে দিন চলে যেতে চেয়েছিলি না?'

ব্যাকুল হইয়া বাসু বলিয়া উঠিল, 'তুমি এখনো সে কথা মনে করে ব'সে আছ, বৌদি? বল্‌লুম না, মিছিমিছি করে বলেছিলুম। তাই ভেবে ভেবে বুঝি তোমার অসুখ করেছে? তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি,—তোমাকে না বলে আমি কোথাও যাব না।'

'সে কথা বলছি না। ধর, সত্যি যদি তোকে সে দিন চলে যেতে বল্‌তুম তো কোথায় যেতিস্?'

বাসু উদাস সুরে কহিল, 'কোথায় আবার? যে দিকে দু'চোখ যায়।'

'ভয় করতো না?'

'ভয়? হ্যাঁ, ভয় একটু কর্‌তো বই কি।'

সাবিত্রী একবার একটু দ্বিধা করিল, তার পর সহসা বলিয়া ফেলিল—'বাসু, তোকে একটা কথা বলি। আমি অনেক করে ভেবে দেখলুম, তোর আর এ বাড়ীতে থাকা উচিত নয়। মনের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক লড়াই করেছি, আমি অনেক তর্ক করেছি—কিন্তু এই একটা মীমাংসা ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেলুম না।'

বাসু স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার পর ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, 'তুমি চলে যেতে বলছো?'

সাবিত্রী চোখ বুজিল। যেন নীরবে কোন আঘাত সহ্য করিয়া বলিল—'তা ছাড়া কোন উপায় তো আমি দেখিনে, না হলে কি যে ঘটবে—এত বড় সংসারটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বাসু, তোর হাত ধরে বলছি—এদের সকলকে বাঁচাতে হলে—এ সংসারটাকে শ্মশান করে ফেলতে না চাইলে—তুই চলে যা—তুই চলে যা ভাই। এতগুলো লোকের মান, সম্ভ্রম, যা-কিছু সব তোর একটু কথার উপর নির্ভর করে আছে—বল্, আমার কথার উত্তর দে, ভাই?'

ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া বাসু কহিল—'বেশ, তাতে আর কি?

যাবো।' শুনিয়া সাবিত্রীর দু'চোখ জলে ভরিয়া গেল, মৃদু স্বরে কহিল—'এ আমি জানতুম্। কিন্তু কেন যে এতগুলো অমঙ্গলের সৃষ্টি হল, আর কেন যে তোকে চলে যেতে হচ্ছে জানিস্?'

'না। জানিনে। জানতেও চাইনে—শুধু এক দিন যে তুমি আমার দুঃখের দিনে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলে—সান্ত্বনা দিয়েছিলে—সেই তোমারই কথায় আমি বিদায় নিচ্ছি।' তার পর একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, 'সংসারে মায়ের আদর জানিনে—ভাই-বোনদের ভালোবাসা তা-ও জানিনে—কিছুই জানবার সুযোগ জীবনে ঘটেনি। তার পর এক দিন তুমি এলে, তোমাকে পেলুম। তুমি আমার সব দিক্ দিয়ে সকলের অভাব পূরণ ক'রে দিয়েছিলে—আমাকে ঘিরে রেখেছিলে। কিন্তু আজ যাবার দিনে তোমাকেও একটা কথা রাখ্‌তে হবে যে।'

ধরা-গলায় সাবিত্রী কহিল—"কি?"

'তোমার খুব কষ্ট হবে জানি। তবু আমার যাবার সময় চোখের জল ফেলো না।'

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন সাবিত্রী আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। দুই হাতে আঁচলে মুখ ঢাকিয়া হৃদয়ের পুঞ্জীভূত দুঃসহ বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

ঘণ্টাখানেক পরে বাসু ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, সে প্রস্তুত। সাবিত্রী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, পূর্ব্বে যে কাপড় পরা ছিল তাহাই পরিধানে, কেবল মাত্র একটি সার্ট গায়ে দিয়া আসিয়াছে; পায়ে সেই পূজার সময়ের দেওয়া পামসু জুতোটা। চমকাইয়া কহিল—'এই বেশে এখনই কোথায় যাচ্ছিস্?'

বাসু হাসিল বলিল,—'এখনই যাবো, বৌদি! আমার মাথার ঠিক নেই জান তো? খানিক পরে আবার হয়তো মন বেঁকে বস্‌বে। অনেক দিন তোমাদের পায়ে অনেক অপরাধ করেছি এর বোঝা আর বাড়াতে চাইনে—আর পারিনে।' একটু থামিয়া সে পুনরায় কহিল,—'তুমি একটু উঠে দাঁড়াও, বৌদি।'

সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইলে বাসু দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। অনেকক্ষণ উঠিল না। সাবিত্রী অনুভব করিল, তাহার দুই পায়ে বাসুর তপ্ত অশ্রু গলিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কথা কহিতে পারিল না, নড়িল না, স্তব্ধ হইয়া মৃতের মত তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। আর তাহার সমস্ত অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল।

কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। নিশ্চল, প্রস্তর-মূর্ত্তির মত শুধু দাঁড়াইয়া রহিল।

বাসু উঠিয়া মুখ তুলিয়া শান্ত গলায় কহিল,—'বৌদি, আসি তবে।' বলিয়া দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, 'জ্যেঠাইমারা অপরাধে আমার এমন গুরুতর ব্যবস্থা কর্‌লেন—আমি সে দোষে দোষী নই। আমি সত্যি আংটি নিইনি।' তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল, বৌদিও বুঝি তাহাকে এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে, তাই যাইবার পূর্ব্বে এই কথাটাই সে জানাইয়া দিয়া গেল।

আকাশে অনেকক্ষণ মেঘ করিয়াছিল, এবার বৃষ্টি নামিল। বাসু ত্রস্তপদে সকলকে নির্ব্বিঘ্ন, নিশ্চিন্ত করিয়া—কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া একাকী এই ঝড়-বাদলে অজানা পথে বাহির হইল। রাত্রির অন্ধকারে তাহাকে কেহ দেখিল না—কেহ জানিল না। তাহার আজন্ম-পরিচিত এই গ্রাম, এই বাড়ী সব পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দু'চোখ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। পথের দু'-ধারে ধান-ক্ষেতের জল স্থানে স্থানে বাড়িয়া পায়ের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মাথার উপর অবিশ্রান্ত বারিধারা—সম্মুখে এতটুকু দৃষ্টি চলে না।

কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আপন মনে সে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আর সাবিত্রী! যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনিই নিষ্পলক নেত্রে জানালার বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে।

জানালা দিয়া প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বৃষ্টি আসিয়া গায়ে পড়িতে লাগিল। তার পরে বাতাসের বেগ বাড়িল। বৃষ্টি আরও প্রবল হইয়া আসিল। ঝন্ ঝন্ করিয়া ঘরের জানালাগুলা খুলিয়া গিয়া হু-হু শব্দে জল ও বাতাস ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিছানা, মেঝে সব ভিজিয়া গেল। সাবিত্রী তেমনই প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। তীরের মত তীক্ষ্ণ বৃষ্টিধারা আসিয়া তাহার শরীরে বিঁধিতেছে, চুল, আঁচল, বাতাসে উড়িয়া কাঁপিতেছে। ইন্দ্রিয়ের সমস্ত শক্তি দুই হাতের মুঠির মধ্যে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে স্থির নিষ্কম্প। তার পর কোন্ এক মুহূর্ত্তে হঠাৎ চেতনা হারাইয়া সে মেঝের উপরে আছড়াইয়া পড়িল।

* * * *

বাসু যখন ষ্টীমার-ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল—তখন পূবের আকাশ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। মেঘের লেশ নাই। কলিকাতাগামী ষ্টীমারখানা পূর্ব্ব হইতে ঘাটে ভিড়ানো ছিল। ছোট ষ্টেশন্। যাত্রীর তেমন ভীড় নাই। সে ধীরে ধীরে একখানা টিকিট কিনিয়া ষ্টীমারে গিয়া উঠিল।

নদীর উপর আকাশের বুক চিরিয়া ষ্টীমারের 'হুইসেল' বাজিল। তাহার চক্রগতিতে ফেনিল জলরাশি আলোড়িত হইয়া পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল। বাসু অকূলে ভাসিয়া চলিল।

ষ্টীমার চলিয়াছে। বাসু দাঁড়াইয়া আছে ডেকের উপর—দু'চোখের নির্নিমেষ দৃষ্টি পশ্চাতে ফেলিয়া আসা তার সেই দুঃখ-সুখের স্মৃতিঘেরা গ্রামখানির উপর নিবদ্ধ—ক্রমে ক্রমে গ্রামখানি অস্পষ্ট আবছায়ায় মিলিয়া চোখের সামনে হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বাসু একটা নিশ্বাস ফেলিল—কণ্ঠে তাহার অজ্ঞাতে মৃদু স্বর জাগিল—'বৌদি!'

শ্রীসন্তোষকুমার রায়

অষ্ট স্থায়ি-ভাব ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সাত্ত্বিক ভাব বর্ণনার পর মহর্ষি ভরত অষ্ট 'সাত্ত্বিক' ভাবের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। প্রথমেই একটি অতি সঙ্গত প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই আটটি বিশিষ্ট ভাবের 'সাত্ত্বিক' নাম হইল কেন? অপর ভাবগুলি কি সত্ত্ব বিনাও অভিনীত হইয়া থাকে, আর কেবল কি এই আটটি ভাবের অভিনয়েই সত্ত্বের প্রয়োজন,—যে ইহাদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে 'সাত্ত্বিক' (১)?

উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন—তাহাই বটে। যদি প্রশ্ন করা যায়—কিরূপে উহা সম্ভব? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—'সত্ত্ব' বস্তুটি মনঃসম্ভূত। উহার স্বরূপ—সমাহিত মন। এ কারণে বলা হয় যে—মনের সমাধি অবস্থায় 'সত্ত্ব'—নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এই সত্ত্বের যে বিভিন্ন স্বভাব—রোমাঞ্চ-অশ্রু-বৈবর্ণ্যাদি স্বরূপ—বিভিন্ন ভাব-ভেদে সেগুলির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ও অন্যমনাঃ হইলে আর ঐ সকল বিভিন্ন স্বভাব প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না (২)।

ইহা হইল বাস্তব জগতে সত্ত্বোদ্রেকের প্রক্রিয়া। এইরূপ লোক-স্বভাবের অনুকরণেই নাট্যের সত্ত্ব উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। নাট্যাভিনয়ে প্রবৃত্ত (প্রযুক্ত) (৩) সুখ-দুঃখাদি-জনিত ভাবসমূহকে এরূপ সত্ত্ব-বিশুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, যাহাতে ঐগুলিকে যথাযথ-স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। দুঃখ-ভাবটি রোদনাত্মক। যে নট স্বয়ং অন্তরে দুঃখানুভব করিতেছে না, সেই অদুঃখিত নট-কর্ত্তৃক কিরূপে ঐ দুঃখভাবের অভিনয় যথাযথ ভাবে প্রদর্শিত হওয় সম্ভব? আবার সুখ-ভাবটি প্রহর্ষাত্মক। অন্তরে যে বস্তুতঃ অসুখিত, এরূপ নট-কর্ত্তৃক নিপুণ ভাবে ঐ সুখ-ভাবের অভিনয়ে বাহ্যতঃ প্রকাশন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সাত্ত্বিক ভাবের সবগুলিই যথার্থ দুঃখিত বা সুখিত নট-কর্ত্তৃক প্রদর্শনীয়। দৃষ্টান্তরূপে বলা চলে—যথার্থ দুঃখগ্রস্ত-কর্ত্তৃক অশ্রুর অভিনয় কর্ত্তব্য। যথার্থ সুখভাবে ভাবিত-চিত্ত নট-কর্ত্তৃক রোমাঞ্চ প্রদর্শনীয়। এইরূপ নিয়ম অপর সাত্ত্বিক ভাবগুলির পক্ষেও প্রযোজ্য। এই কারণে—যথার্থ তদ্ভাব-ভাবিত নট-দ্বারা এই ভাবগুলি প্রদর্শনীয় বলিয়াই ইহারা 'সাত্ত্বিক' নামে অভিহিত হইয়া থাকে (৪)। যথার্থতঃ তদ্ভাব-ভাবিত না হইলে নট এই ভাবগুলির নিপুণ ভাবে প্রদর্শনে সমর্থ হন না।—অন্য ভাব হইতে এই শ্রেণীর ভাবগুলির ইহাই বৈশিষ্ট্য।

১ স্তম্ভ, ২ স্বেদ, ৩ রোমাঞ্চ, ৪ স্বরভেদ, ৫ বেপথু (কম্প), ৬ বৈবর্ণ্য, ৭ অশ্রু ও ৮ প্রলয়—এই আটটি সাত্ত্বিক ভাব।

ক্রোধ-ভয়-হর্ষ-লজ্জা-দুঃখ-শ্রম-রোগ-তাপ-আঘাত-ব্যায়াম-ক্লান্তিজনক ব্যাপার ও সম্পীড়ন হইতে স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্মের উদ্রেক হইয়া থাকে।

হর্ষ-ভয়-রোগ-বিস্ময়-বিষাদ-রোষ-মদ ইত্যাদি হইতে স্তম্ভ বা স্তব্ধ ভাব জন্মে।

শীত-ভয়-হর্ষ-রোষ-স্পর্শ-জরা হইতে কম্পের উৎপত্তি।

আনন্দ ও ক্রোধবশে—ধূম, অঞ্জন-প্রয়োগ, জৃম্ভণ, ভয়, শোক, অনিমেষ দৃষ্টিপাত, শীত, রোগ ইত্যাদি কারণে অশ্রু উদ্গত হইয়া থাকে।

মহর্ষির বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—স্থায়িভাব ও ব্যভিচারি-ভাবগুলির কৃত্রিম অনুকরণ করা অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য; পক্ষান্তরে, সাত্ত্বিক ভাব-সমূহের অভিনয়ে প্রদর্শন তত দূর অনায়াসসাধ্য নহে। বস্তুতঃ, নটের মনে রতি-হাস প্রভৃতি স্থায়ি-ভাবের উদয় না হইলেও সে বাহ্যতঃ রতি-ভাবাদি প্রদর্শন করিতে পারে, অন্তরে সেই সেই ভাবের উদয় না হইলেও হাস্য-ভয়-ঘৃণা প্রভৃতি ভাবও বাহিরে মুখাদির বিকার-দ্বারা দেখান যাইতে পারে। কিন্তু অন্তরে যথার্থ হর্ষভাবের উদয় না হইলে কোন কৃত্রিম উপায়েই শরীরে রোমাঞ্চের আবির্ভাব করান যায় না। অথবা, অন্তরে যথার্থ ভয়-ভাবের উদ্রেক ব্যতীত মুখে বিবর্ণতা আসিতে পারে না। অথবা, অন্তরে যথার্থ লজ্জা-দুঃখাদির আবির্ভাব ব্যতিরেকে ইচ্ছামাত্রই কৃত্রিম ঘর্ম্মের উদ্গম হওয়া অসম্ভব (বিশেষতঃ যদি উহা গ্রীষ্মকাল না হইয়া শীতকাল হয়)। এই কারণেই মহর্ষি বলিয়াছেন যে, অন্তরে তত্তদ্ভাবে ভাবিত হইলেই সাত্ত্বিক ভাবের অভিনয়ে প্রদর্শন সম্ভব—অন্যথা নহে। আর এই কারণেই ইহাদিগের নাম হইয়াছে 'সাত্ত্বিক' (সত্ত্ব—মনোভাব-বিশেষ)।

---

(১) "অত্রাহ—কিমন্যে ভাবাঃ সত্ত্বেন বিনাভিনীয়ন্তে যস্মাদুচ্যন্তে এতে সাত্ত্বিকা ইতি (সত্ত্বেন বিনাভিধীয়ন্তে যত এতে সাত্ত্বিকা ইত্যুচ্যন্তে)" ?—নাঃ শাঃ, বরোদা সং, পৃঃ ৩৭৯, (ব্র্যাকেটে কাশীর পাঠান্তর)।

(২) অত্রোচ্যতে—এবমেতৎ। কস্মাৎ? ইহ হি সত্ত্বং নাম মনঃপ্রভবম্। তচ্চ সমাহিতমনস্ত্বাদুচ্যতে মনসঃ সমাধৌ সত্ত্বনিষ্পত্তির্ভবতীতি। তস্য চ যোঽসৌ স্বভাবো রোমাঞ্চাশ্রুবৈবর্ণ্যাদিলক্ষণো যথাভাবোপগতঃ, স ন শক্যোঽন্যমনসা কর্ত্তুমিতি।—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৭৯-৩৮০ [অত্রোচ্যতে ইহ সত্ত্বং নাম মনঃপ্রভবম্। তচ্চ সমাহিতমনস্ত্বাদুৎপদ্যতে। মনঃসমাধানাচ্চ সত্ত্বনিবৃত্তির্ভবতি (?)। তস্য চ যোঽসৌ স্বভাবঃ স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাশ্রুবৈবর্ণ্যাদিকো ন দৃশ্যতে মনসা কর্ত্তুমিতি লোকস্বভাবানুকরণত্বাচ্চ নাট্যস্য সত্ত্বমীপ্সিতম্"—কাশী সং, পৃঃ ১৫]

সমাহিত—একাগ্রভাবে স্থাপিত।

(৩) মূলে আছে—"নাট্যধর্ম্মীপ্রবৃত্তাঃ"। নাট্যধর্ম্মী—লোকধর্ম্মীর (reality) নাট্যে অনুকরণ।

(৪) "লোকস্বভাবানুকরণাচ্চ নাট্যস্য সত্ত্বমীপ্সিতম্। কো দৃষ্টান্তঃ—ইহ হি নাট্যধর্ম্মীপ্রবৃত্তাঃ সুখদুঃখকৃতা ভাবাস্তথা সত্ত্ববিশুদ্ধাঃ কার্য্যাঃ যথা স্বরূপা ভবন্তি। [অত্রাহ কো দৃষ্টান্ত ইতি চেৎ, অত্রোচ্যতে—ইহ হি নাট্যধর্ম্মঃ প্রবৃত্তঃ সুখদুঃখকৃতো ভাবঃ তথা—সত্ত্ববিশুদ্ধাধিষ্ঠিতঃ কার্য্যো যথা স্বরূপো ভবতি।] দুঃখং নাম রোদনাত্মকং তৎ কথমদুঃখিতেন সুখং চ প্রহর্ষাত্মকমসুখিতেনাভিনয়েৎ? এতদেবাস্য (সর্ব্বং) দুঃখিতেন প্রহৃষ্টেন বাশ্রুরোমাঞ্চৌ প্রদর্শয়িতব্যাবিতি কৃত্বা সাত্ত্বিকা ভাবা ইত্যভিব্যাখ্যাতাঃ"। (নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৮০-৮১) ["তত্র দুঃখং নাম……অসুখিতেনাভিনেতুং শক্যত ইতি সত্ত্বমীপ্সিতমিতি কৃত্বা সাত্ত্বিকো নাম ইতি ভাবঃ। এতদেবাস্য সত্ত্বং যদ্ দুঃখিতেন সুখিতেন বা অশ্রুরোমাঞ্চৌ দর্শয়িতব্যাবিতি ব্যাখ্যাতম্"—কাশী সং—পৃঃ ১৫]

শীত-ক্রোধ-ভয়-শ্রম-রোগ-ক্লম-তাপাদি কারণ-জনিত বৈবর্ণ্য।

স্পর্শ-ভয়-শীত-হর্ষ-ক্রোধ-রোগ হইতে রোমাঞ্চ দেখা দেয়।

ভয়-হর্ষ-ক্রোধ-জরা-রুক্ষতা-রোগ-মদ-জনিত স্বরভেদ।

শ্রম-মূর্চ্ছা-মদ-নিদ্রা-অভিঘাত-মোহাদি হইতে প্রলয় উৎপন্ন হইয়া থাকে (৫)।

এইরূপে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের বিভাব-সমূহ পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে প্রদর্শনের পর মহর্ষি ইহাদিগের প্রত্যেকটির অনুভাব বা কর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন।

সংজ্ঞাহীন, কম্পনহীন, শূন্য জড়াকৃতি-রূপে অবস্থিত থাকিয়া অবসন্ন গাত্রাবয়বগুলি-দ্বারা স্তম্ভের অভিনয় কর্ত্তব্য।

ব্যজন-গ্রহণ, স্বেদাপনয়ন (ঘর্ম্মমার্জ্জনা), বায়ু-সেবনের অভিলাষ ইত্যাদি ক্রিয়া-দ্বারা স্বেদের অভিনয় দর্শনীয়।

মুহুর্ম্মুহুঃ কণ্টকিত হইবার ভাব, উল্লুকসন, পুলক ও গাত্রস্পর্শ দ্বারা রোমাঞ্চ অভিনেয়।

ভিন্ন প্রকার গদ্‌গদ-নিস্বন-দ্বারা স্বরভেদ অভিনেয়।

মুখের বর্ণ-পরিবর্ত্তন ও নাড়ী-পীড়ন-দ্বারা বৈবর্ণ্য অতিপ্রযত্ন-সহকারে অভিনেতব্য—ইহার অভিনয় অতি দুষ্কর।

বাষ্পাম্বু-পরিপ্লুত নেত্র, নেত্র-সম্মার্জ্জন, মুহুর্ম্মুহুঃ অশ্রুকণা-পাত ইত্যাদি দ্বারা অশ্রুর অভিনয় কর্ত্তব্য।

নিশ্চেষ্ট, নিষ্কম্প ভাব, শ্বাস অব্যক্তপ্রায়, মহীতলে পতন—ইত্যাদি ভাব-দ্বারা প্রলয় অভিনেয় (৬)।

এই একোনপঞ্চাশৎ ভাব। (স্থায়িভাব ৮, ব্যভিচারি-ভাব—৩৩, ও সাত্ত্বিকভাব ৮—মোট ৪৯) মহর্ষি-কর্ত্তৃক নাট্যশাস্ত্রের সপ্তমাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ইহাদিগের কোন্ কোন্‌টি কোন্ কোন্ রসে প্রযোজ্য—তাহাও অতঃপর কথিত হইতেছে।

শঙ্কা, ব্যাধি, গ্লানি, চিন্তা, অসূয়া, ভয়, বিস্ময়, বিতর্ক, স্তম্ভ, চপলতা, রোমাঞ্চ, হর্ষ, নিদ্রা, উন্মাদ, মদ, স্বেদ, অবহিত্থ, প্রলয়, বেপথু, বিষাদ, শ্রম, নির্ব্বেদ, গর্ব্ব, আবেগ, ধৃতি, স্মৃতি, মতি, মোহ, বিবোধ, সুপ্ত, ঔৎসুক্য, লজ্জিত (লজ্জা), ক্রোধ, অমর্ষ, হাস, শোক, অপস্মার, দৈন্য, মরণ, রতি, উৎসাহ, ত্রাস, বৈবর্ণ্য, রুদিত, স্বরভেদ, শম (?) ও জড়তা—এই ছেচল্লিশটি (৭) ভাব—অর্থাৎ কেবল আলস্য—উগ্রতা ও জুগুপ্সা এই ভাবত্রয়-বর্জ্জিত অপর সকল ভাবই—শৃঙ্গারের উদ্ভাবক। এগুলি স্ব-স্ব-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া অবসরক্রমে স্থায়িভাব, সঞ্চারি-ভাব ও সাত্ত্বিক-ভাব—এই সকল নামে অভিহিত হইয়া থাকে (৮)।

গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, চপলতা, সুপ্ত, নিদ্রা, অবহিত্থ—এইগুলির প্রয়োগ হাস্য-রসে কর্ত্তব্য।

নির্ব্বেদ, চিন্তা, দৈন্য, গ্লানি, অশ্রু, জড়তা, মরণ, ব্যাধি—করুণ-রসের উপযোগী ভাব।

গর্ব্ব, অসূয়া, মদ, উৎসাহ, আবেগ, অমর্ষ, ক্রোধ, চপলতা, উগ্রতা—রৌদ্রে প্রযোজ্য ভাব (৯)।

---

(৫) "ক্রোধভয়হর্ষলজ্জাদুঃখশ্রমরোগতাপঘাতেভ্যঃ।
ব্যায়ামক্লমধর্ম্মৈঃ স্বেদঃ সম্পীড়নাচ্চৈব ॥ ১৪৯ ॥
হর্ষভয়রোগবিস্ময়বিষাদরোষাদি (বিষাদমদরোষ)
সম্ভবঃ স্তম্ভঃ।
শীতভয়হর্ষরোষস্পর্শজরাসম্ভবঃ কম্পঃ ॥ ১৫০ ॥
আনন্দামর্ষাভ্যাং ধূমাঞ্জনজৃম্ভণাদ্ ভয়াচ্ছোকাৎ।
অনিমেষপ্রেক্ষণতঃ (শোকানিমিষপ্রেক্ষণ) শীতা-
দ্রোগাচ্চবেদাশ্রম্ ॥
শীতক্রোধভয়শ্রমরোগক্লমতাপজং চ বৈবর্ণ্যম্।
স্পর্শভয়শীতহর্ষৈঃ ক্রোধাদ্রোগাচ্চ রোমাঞ্চঃ ॥ ১৫২ ॥
স্বরভেদো (স্বরসাদো) ভয়হর্ষক্রোধজরারৌক্ষ্যরোগমদ-
জনিতঃ। (…ক্রোধজ্বররোগমদজনিতঃ)।
শ্রমমূর্চ্ছামদনিদ্রাভিঘাতমোহাদিভিঃ প্রলয়ঃ ॥
নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৮১

(৬) "নিঃসংজ্ঞো নিষ্প্রকম্পশ্চ স্থিতঃ শূন্যজড়াকৃতিঃ ॥
(নিশ্চেষ্টো…স্মিতশূন্য…)।
স্কন্নগাত্রতয়া চৈব স্তম্ভং ত্বভিনয়েদ্বুধঃ (নিঃসংজ্ঞস্তব্ধ-
গাত্রশ্চ স্তম্ভং) ॥
ব্যজনগ্রহণাচ্চাপি স্বেদাপনয়নেন চ (ব্যজনগ্রহণাচ্চাপি)।
স্বেদ এবাভিনেতব্যস্তথা বাতাভিলাষতঃ (স্বেদস্যাভিনয়ো
যোজ্যঃ) ॥
[কাশীর সংস্করণে পূর্ব্বে 'স্বেদ' পরে 'স্তম্ভ' প্রদত্ত
হইয়াছে।]

মুহুঃ কণ্টকিতত্বেন তথোল্লুকসনেন চ।
পুলকেন চ রোমাঞ্চং গাত্রস্পর্শেন দর্শয়েৎ (রোমাঞ্চস্ত্বভি-
নেয়োঽসৌ গাত্রসংস্পর্শনেন চ) ॥
স্বরভেদোঽভিনেতব্যো ভিন্নগদ্গদনিস্বনৈঃ।
বেপনাৎ স্ফুরণাৎ কম্পাৎ বেপথুং সম্প্রদর্শয়েৎ ॥
[কাশী-সংস্করণে পূর্ব্বে 'বেপথু', তৎপরে 'স্বরভেদ, শেষে রোমাঞ্চ]
মুখবর্ণপরাবৃত্ত্যা নাড়ীপীড়নযোগতঃ।
বৈবর্ণ্যমভিনেতব্যং প্রযত্নাত্তদ্ধি দুষ্করম্
(প্রযত্নাদঙ্গসংশ্রয়ম্) ॥
বাষ্পাম্বুপ্লুতনেত্রত্বান্নেত্রসম্মার্জ্জনেন চ।
মুহুরশ্রুকণাপাতৈরাস্রং ত্বভিনয়েদ্বুধঃ ॥
(নেত্রসম্মার্জ্জনৈর্বাষ্পৈরশ্রু ত্বভিনয়েদ্ বুধঃ)
[কাশী-সংস্করণে 'অশ্রু' পূর্ব্বে, পরে 'বৈবর্ণ্য']
নিশ্চেষ্টো নিষ্প্রকম্পত্বাদব্যক্তশ্বসিতাদপি।
মহীনিপাতনাচ্চাপি প্রলয়াভিনয়ো ভবেৎ ॥
(মেদিনীপতনাচ্চাপি…)—নাঃ শাঃ, পৃঃ ৩৮২-৮৩। উল্লুকসন, পুলক, রোমাঞ্চ—এই শব্দগুলি সবই একার্থক।

(৭) গণনায় পাওয়া যাইতেছে—সাতচল্লিশটি। 'শম' বাদ দিলে ছেচল্লিশ হয়।

(৮) কাশী সংস্করণে ধরা হইয়াছে—গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, চপলতা, সুপ্ত, নিদ্রা, অবহিত্থ, বেপথু, আলস্য, উগ্রতা ও জুগুপ্সা—এই ভাবগুলি ব্যতীত অপর ভাব সকল শৃঙ্গারে প্রযোজ্য—কাশী সং, নাঃ শাঃ, পৃঃ ৯৬-৯৭ (৭।১০৭-১০৮)

(৯) গর্ব্ব, অসূয়া, উৎসাহ, আবেগ, মদ, ক্রোধ, চপলতা, হর্ষ, উগ্রতা—রৌদ্রে প্রযোজ্য (কাশী সং ৭।১১৩, পৃঃ ৯৭)

অপস্মোহ, উৎসাহ, আবেগ, হর্ষ, মতি, উগ্রতা, অমর্ষ, মদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, ক্রোধ, অসূয়া, ধৃতি, গর্ব্ব, বিতর্ক,—বীর-রসে প্রযোক্তব্য ভাব (১০)।

বেপথু, স্বরভেদ, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদ, স্তম্ভ, মরণ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য,—ভয়ানকে প্রযোজ্য (১১)।

অপস্মার, উন্মাদ, বিষাদ, মদ, মৃত্যু, ব্যাধি, ভয়,—এইগুলি বীভৎসে প্রযোজ্য ভাব।

স্তম্ভ, স্বেদ, মোহ, রোমাঞ্চ, বিস্ময়, আবেগ, জড়তা, হর্ষ ও মূর্চ্ছা—এই ভাবগুলি অদ্ভুত-রসে প্রযোক্তব্য।

মহর্ষি এই স্থলে তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের সপ্তমাধ্যায় ভাব-প্রকরণের উপসংহার-মুখে বলিয়াছেন—কোন কাব্যেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে একটি রস একটি ভাব, একটি প্রবৃত্তি বা একটি বৃত্তি প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহা দৃষ্ট হয় না। বহু ভাব সমবেত হওয়ার ফলে সমষ্টিরূপে উদ্ভূত যে ভাবরূপটি বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাই স্থায়ী—উহাই তদনুকূল রসে পর্য্যবসিত হয়; আর অন্যান্য অল্পস্থায়ী ভাবগুলিকে সঞ্চারি-ভাব বলিয়া গণ্য করা হয় (১২)।

যাহারা স্থায়িভাব ও রসকে দীপিত করিয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তাহাদিগের নাম 'সঞ্চারী' ভাব। উহারাও স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া উহারা বিভাবানুভাব-সঞ্চারি-ভাব সংযুক্ত হইলে রসে পরিণত হয়। অতএব, স্থায়ী ভাব সাত্ত্বিক ভাব ও ও ব্যভিচারি-ভাব হইতে পৃথক্।

মহর্ষির নাট্যশাস্ত্রে এই স্থলেই ভাব-প্রকরণের পরিসমাপ্তি দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধটিরও উপসংহার এই স্থলে করা যাইতেছে।*

যাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহে প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বে এই অতি বিস্তৃত ও পারিভাষিক 'রস-ভাব' প্রবন্ধাবলীর সূচনা করা হইয়াছিল, বসুমতীর সেই কর্ণধার স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের জীবদ্দশায় ইহার এই আংশিক পরিসমাপ্তিও সম্ভব হইল না—ইহা অপেক্ষা শোচনীয় আর কিছু নাই। শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, তিনি স্বধাম হইতে তাঁহার পরিকল্পিত এই প্রবন্ধটির অন্ততঃ মূলাংশেরও সমাপ্তি দেখিয়া শান্তিলাভ করুন।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(১০) অমর্ষ ও মদ স্থলে—হর্ষ ও উন্মাদ—কাশীর পাঠ।
স্বরভেদ স্থলে প্রতিবোধ (কাশীর পাঠ)
(কাশী সং ৭।১১১-১১২)

(১১) স্বেদ, বেপথু, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদ, ত্রাস, মরণ, বৈবর্ণ্য—
ভয়ানকে প্রযোজ্য (কাশীর পাঠ—৭।১১৪)

(১২) "ন হ্যেকরসজং কাব্যং কিঞ্চিদস্তি প্রয়োগতঃ।
ভাবো বাপি রসো বাপি প্রবৃত্তির্বৃত্তিরেব বা।
বহুনাং (সর্ব্বেষাং) সমবেতানাং রূপং যস্য ভবেদ্বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ।
নাঃ শাঃ, ৭।১৮০-১৮১, পৃঃ ৩৮৫

* যাঁহার আগ্রহে এ প্রবন্ধের প্রারম্ভ, তাঁহারই অভাবে এ প্রবন্ধকে আর দীর্ঘতর করিবার প্রবৃত্তি নাই। তাই মহর্ষির ভাব প্রকরণের ভাবানুবাদের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার পরিসমাপ্তি করিলাম।—লেখক

সমাপ্ত

আমাদের প্রতিবেশী

সহরের পাশে মাঠের ওধারে গ্রামের শ্যামল কোলে
বহু যুগ হতে ওদের বসতি—মাটীর কুটীর তোলে।
আকাশের নীচে, ঝোপের আড়ালে, রৌদ্র-বৃষ্টি-জলে,
মানুষ ইহারা; অতিশয় দীন, কোন মতে দিন চলে!
নূতন উষার সোনালি কিরণ পশেনি এদের গেহে,
পায়নিকো এরা আপন-প্রাপ্য জীবনের তরী বেয়ে।
বাহিরের ঝড় এদের কুটীরে দেয়নিকো আজো দোলা—
জগতের পথে এদের দুয়ার হয়নি আজিও খোলা!
বহু দিন হলো ভুলেছি এদের ঘৃণায় ফিরায়ে মুখ—
সম্মান কভু করিতে শিখিনি গর্বে ফুলায়ে বুক!
'ছোটলোক','হীন','ম্লেচ্ছ','অশুচি'—কত কি যে আরো সব,
ইহাদের নামে করেছি প্রচার করি ঘোর কলরব!
শত্রু ইহারা নহেকো মোদের, নহেকো ভিন্ন জন,
দেশের অন্নে-বস্ত্রে পালিত আমাদেরি সাধারণ!
একই মাটীতে মানুষ আমরা—বাস করি ঘেঁষাঘেঁষি,
আত্মীয় আর বন্ধু ইহারা আমাদের প্রতিবেশী!

শ্রীবিমলানন্দ ভট্টাচার্য্য

জ্যৈষ্ঠ

রৌদ্র-দগ্ধ দিগন্তের তটপ্রান্তে বসি
কে তুমি হে তপঃক্লিষ্ট রুক্ষকেশ ঋষি!
পিক-কল-কণ্ঠ-সুধা হয়েছে নিঃশেষ
কেকার কলাপী আজো ভরে নাই দিশি।

কেন তব দৃপ্ত রোষ অনল উগারি
ধরিত্রীর বক্ষ-সুধা আকর্ষিতে চায়,
লেলিহান জিহ্বা মেলি বিদ্যুৎ-বালিকা
আচম্বিতে শূন্যে কারে গ্রাসিবারে ধায়!

"এ কি তব মার-মূর্ত্তি হে জ্যৈষ্ঠ তাপস!
অথবা ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টির বিকাশ?
তপোবলে পিঙ্গলিত করিয়াছ ধরা,
তবু দাও আষাঢ়ের বৃষ্টির আভাস!

রূপে, রসে, সৌন্দর্য্যের স্বয়ম্ভু প্লাবনে,
ভরি দাও ধরণীর বঞ্চিত অঙ্গনে!

শ্রীরেণু গঙ্গোপাধ্যায় (কবিরত্ন)

ছোটদের আসর

অদৃশ্য-পর্ব্ব

ছিওকিতে বম্বে মেল দাঁড়াতেই সলিল বললে—"গগন, এসো, নেমে পড়া যাক্।" গগন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে—"এইখানে ? ছিওকিতে ?" সলিল হেসে উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস !"

ছোট সহর। তারই এক প্রান্তে ছোট একখানি বাড়ী ভাড়া করে সলিল সেন আর গগন গুপ্ত বাস করতে লাগল। খাওয়া-শোওয়া আর বেড়ানো ছাড়া কোন কাজ নেই। সেইখানকারই একটা চাকর তাদের কাজকর্ম্ম করে। স্রেফ্ বেকার উদ্দেশ্যহীন জীবন !

গগন রেগে বললে—"এ ভাবে কত দিন চলবে ?"

সলিল হেসে বললে,—"কি ভাবে ?"

"চুপচাপ বসে ?"

"চুপচাপ বসে নেই। ভাবছি।"

"কি ভাবছ ?"

"অতঃ কিম্ !"

ছিওকিতে "মদারী কা খেল" পথে-ঘাটে দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতাতেও আজ-কাল প্রায় নজরে পড়ে। ভানুমতীর খেলা। গরীব, অশিক্ষিত যাদুকর। খেলা দেখাবার প্রণালী বিশেষ মার্জ্জিত নয়। চার পয়সা দিয়েও লোকে দেখে না। কিন্তু একটু ঘষে মেজে নিলে দামী পোষাক পরে ভালো সেজে দেখালে ঐ খেলাই পাঁচ-দশ টাকা টিকিট দিয়ে লোকে দেখবে। যত বেশী দক্ষিণা—তত বেশী তারিফ !

এক দিন বেড়িয়ে ফেরবার সময় এক 'মদারী'কে সলিল সঙ্গে জোটালো। রাস্তায় সে খেলা দেখাচ্ছিল। সাধারণের চেয়ে একটু উঁচু দরের খেলা। গগন বিরক্ত হয়ে বললে—"ওটাকে আবার জোটালে কেন ?" সলিল উত্তর দিলে—"চট কেন ? লোকটা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।"

সেই দিন থেকে মদারী সলিলদের বাড়ীতে থাকতে লাগলো। মদারীর নাম হনুমান সিং।

এলাহাবাদ। চারিধারে বড় বড় প্ল্যাকার্ড !

অভাবনীয় ! অচিন্তনীয় !!

সুবর্ণ সুযোগ !!!

ভারতবর্ষে এই প্রথম !

তিব্বতের অপূর্ব্ব যাদুবিদ্যা !!

রোমাঞ্চকর প্রহেলিকা !!!

তুষারাবৃত রহস্যভরা তিব্বতের যাদুকর-সম্রাট

নয়নবালি ফেলাই লামা ভোজবিদ্যার্ণব

প্যালেস থিয়েটার

রঙ্গমঞ্চে জন-সাধারণের বিশেষ অনুরোধে

২০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার সাত ঘটিকার সময়

তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী বিদ্যার

পরিচয় দিবেন।

আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয় !

হয় ত' জীবনে এ সুযোগ আর আসবে না।

দক্ষিণা—২৫৲, ১০৲, ৫৲, ২৲ ও ১৲ টাকা।

মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র আসনের বন্দোবস্ত আছে।

এলাহাবাদ সহরে হৈ হৈ পড়ে গেল। দেখতেই হবে। থিয়েটার বায়োস্কোপ অনেক দেখা যায়। কিন্তু তিব্বতের ম্যাজিক—একেবারে রেয়ার। দেশীয় লোকেরা দেশের বিদ্যা দেখে গর্ব্ব আর বিদেশের লোকেরা এ দেশের বিদ্যাকে খর্ব্ব করবার জন্য প্যালেস থিয়েটারে যাওয়া ঠিক করলো। থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখলে স্কুলের ছেলেমেয়েরা খারাপ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ম্যাজিক—নির্ম্মল আনন্দ। ছাত্রেরা দলে-দলে টিকিট কিনতে লাগলো।

তিব্বতী যাদুকররা প্যালেস থিয়েটার ভাড়া নিয়েছে। এক রাত্রির জন্য পাঁচশো টাকা। দু'শো টাকা আগাম। বাকি তিনশো শো হয়ে যাবার পর দেয়।

নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্যালেস থিয়েটারে ভীড়ে ভীড়। তিল ধারণের জায়গা নেই। রেকর্ড সেল। ঠিক সাতটার সময় ঘন করতালির মধ্যে সীন উঠলো। যাদুকর-সম্রাটের প্রধান শিষ্য হনুমান সিং প্রথমে কয়েকটি তাসের খেলা দেখালেন। দর্শকদের ভালই লাগলো। তার পর হুডিনির খেলা। এক জন দর্শক এসে হনুমান সিংয়ের হাত-পা বেঁধে একটা সিন্দুকের মধ্যে তাঁকে পূরে তালা লাগিয়ে দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই অডিটোরিয়ামের মধ্যে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। সকলে বাহবা দিল। ঘন-ঘন করতালি।

নয়নবালি ফেলাই লামার এক জন কর্ম্মচারী সেদিনকার বুকিং-এর চার্জ্জে। হিসেব করে তিনি দেখলেন, প্রায় হাজার তিনেক টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে। টাকাগুলো পকেটে পূরে তিনি প্যালেস থিয়েটার ত্যাগ করলেন। নিঃশব্দে, সকলের অগোচরে। কিছুক্ষণ পরে কিছু মালপত্র নিয়ে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো প্যালেস থিয়েটারের পিছন দিকে অর্থাৎ অভিনেতৃবৃন্দের প্রবেশ-পথে। হনুমান সিং আরও দু'-চারটে খেলা দেখালেন। সবগুলিই বেশ জমাটে এবং রোমাঞ্চকর। থলির মধ্যে একটা ছেলেকে পূরে তাতে ছোরা বসিয়ে দিলেন। টকটকে তাজা লাল রক্তে ষ্টেজ ভেসে গেল। দর্শকরা আর্ত্তনাদ করে উঠলেন। এক জন দর্শককে ডেকে তিনি থলি দেখতে বললেন। তিনি দেখলেন থলি খালি। থলির মুখ বেঁধে ফিরে তিনি বলতে লাগলেন—"আ যাও বেটা, আ যাও।" সবিস্ময়ে দর্শকবৃন্দ শুনতে পেলেন, উত্তর এলো—"আতা হুঁ।" কখন ঘরের এধার থেকে, কখন ওধার থেকে, আবার কখন কড়ি-কাঠের কাছ থেকে। তার পর সকলে দেখলেন হনুমান সিং থলির মুখটি খুললেন, আর তার ভেতর থেকে অক্ষত শরীরে বালকটি বেরিয়ে এলো। ধন্য ধন্য রবে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হলো। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন পয়সা সার্থক হলো বটে।

ইণ্টারভ্যাল। চারি ধারের বিজলী-বাতি জ্বলে উঠলো। সকলেই খুশী। শিষ্য যখন এই, না জানি গুরু কি রকম ! সকলে উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন ইণ্টারভ্যাল শেষ হবে—নয়নবালি ফেলাই লামার আবির্ভাব হবে !

ইণ্টারভ্যাল শেষ হলো। ধীরে ধীরে ড্রপসীন উঠলো। প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত আলো নিবে গেল। ষ্টেজের ফুট-লাইট হেড-লাইট সব জ্বলে উঠলো। ধীর-পদবিক্ষেপে ষ্টেজে প্রবেশ করলেন নয়নবালি ফেলাই লামা। ইয়া বড় আলখাল্লা, প্রায় মাটিতে লুটোচ্ছে। পক্ক কেশ, আবক্ষ শুভ্র শ্মশ্রু, সৌম্যদর্শন। দর্শনবৃন্দের ঘন-ঘন করতালি।

যুক্তকরে সকলকে নমস্কার করে গম্ভীর স্বরে ফেলাই লামা বললেন—"আপনারা আমার শিষ্যের খেলা দেখলেন। এবার আমি আপনাদের একটি ভোজবিদ্যার নিদর্শন দেবো। তিব্বতের অতি গোপন বিদ্যা। পৃথিবীতে মাত্র চার জন লোক এ বিদ্যা অর্জ্জন করতে পেরেছেন। তিন জন তিব্বতের মঠেই থাকেন। আমি চতুর্থ। বাইরের কেউ এ বিদ্যা জানে না। তাই আমার মনে হয়, আপনাদের কাছে এ খেলা সম্পূর্ণ নূতন হবে। আমি আপনাদের কাছ থেকে ক'টি জিনিষ নেব—ঘড়ি, আংটী, হার ইত্যাদি। তার পর ষ্টেজের উপর আপনাদের সামনেই একটি বৃত্তাকার গণ্ডী আঁকবো। সাত মিনিটের মধ্যে সেই গণ্ডীর মধ্যে একটি গাছ গজিয়ে উঠবে। আর সেই গাছের শাখায় ঝুলে থাকবে আপনাদের জিনিষগুলি। আমি আপনাদের সামনেই ষ্টেজের ওপর একটি চেয়ারে বসে থাকবো। খেলাটি নিশ্চয় আপনারা পূর্ব্বে কখনও দেখেননি, এবং ভবিষ্যতেও দেখতে পাবেন বলে মনে হয় না।"

দর্শকগণ সকলেই স্বীকার করলেন খেলাটি নতুন এবং এ রকম খেলা তাঁরা পূর্ব্বে কখনও দেখেননি। অতঃপর ফেলাই লামা মহাশয় ক'জনের কাছ থেকে ঘড়ি, আংটী, হার ইত্যাদি নিলেন। তার পর ষ্টেজে বৃত্তাকার গণ্ডী টানলেন। ষ্টেজের আলোগুলি কমিয়ে দেওয়া হলো। যাদুকর-সম্রাট্ বললেন, "এবার আমি মন্ত্রপূত মালা নিয়ে এসে আপনাদের সামনে এই চেয়ারটিতে বসবো। সাত মিনিটের মধ্যে গাছ গজাবে। এই সাত মিনিট কিন্তু আপনাদের স্থির হয়ে বসে থাকতে হবে। গোলমাল অথবা নড়াচড়া করলে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যেতে পারি। তা হলে খেলাটি নষ্ট হয়ে যাবে। গভীর মনোযোগের প্রয়োজন।"

ফেলাই লামা ষ্টেজ থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই মালা-হাতে ফিরে এসে ষ্টেজের উপর একটি চেয়ারে চোখ বুজিয়ে বসলেন। প্রেক্ষাগৃহ নিশ্চল, নিস্তব্ধ। যেন সকলে যাদুমন্ত্রে পাষাণে পরিণত হয়েছেন। চক্ষু মুদ্রিত করে ফেলাই লামা এক-মনে মালা করছেন। এক একটা মিনিট যেন এক-একটা যুগ। সময় আর কাটতে চায় না!

এক মিনিট, দু'মিনিট···শেষ পর্য্যন্ত সাত মিনিট কেটে গেল। দর্শকরা চঞ্চল হয়ে উঠলো। গাছ কই? যাঁদের জিনিষ নেওয়া হয়েছিল তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এক জন উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেই ফেললেন—"সাত মিনিট তো কেটে গেল—গাছ কই? আমাদের জিনিষগুলিই বা কোথায়?" যাদুকর-সম্রাট্ ফেলাই লামা চঞ্চল হয়ে ক্রমাগত উইংসের দিকে চাইতে লাগলেন। কিন্তু গাছ গজাবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। ভীত এবং ব্যস্ত হয়ে লামা মহাশয় চেয়ার থেকে উঠে ষ্টেজের মধ্যে পালাবার চেষ্টা করতেই দু'-চার জন যুবক লাফিয়ে ষ্টেজে উঠে তাঁকে ধরে ফেললেন। দর্শকবৃন্দ চীৎকার করতে লাগলেন—"গাছ কই?" "জিনিষ ফেরৎ দাও।" "বুজরুকির জায়গা পাওনি!" ইত্যাদি। কিন্তু কোথায় বা গাছ, কোথায় বা তাঁদের ঘড়ি, আংটী, হার! যুবকরা ফেলাই লামাকে এই মারে তো এই মারে! কোনো মতে তাঁদের নিবৃত্ত করে লামা মহাশয় বললেন—"আমি তো যাদুকর-সম্রাট্ নয়নবালি ফেলাই লামা নই। আমার নাম হনুমান সিং। এই খেলাতে আমাদের দু'জনেরই এক রকম মেক-আপ ছিল। তিনি ষ্টেজের ভিতর গিয়ে আমায় বললেন, ষ্টেজে গিয়ে চেয়ারে বসে চোখ বুজিয়ে মালা ঘোরাতে। আমি তাঁর কথামত কাজ করছিলুম। এই দেখুন, এ চুল-দাড়ি সবই নকল।"

ছদ্মবেশ অন্তর্হিত হলো। লামা মহাশয় হনুমান সিং ব'নে গেলেন। তখন সকলে ষ্টেজের মধ্যে খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু আসল লামা মহাশয়ের সন্ধান মিললো না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল, একটি ছোট ড্রেসিং-রুমে তিনি বসে। দরজার দিকে পিঠ। সকলে সেই ঘরে ঢুকল এবং ঢুকে যা দেখলো, তাতে চক্ষুস্থির। একটা বালিসে দাড়ী আর চুল পরানো এবং সেটা আলখাল্লা দিয়ে এমন ভাবে ঢাকা যে বাইরে থেকে মনে হবে বুঝি ফেলাই লামাই বসে আছেন! আলখাল্লায় একটি চিরকুট পিন দিয়ে আটকানো। তাতে লেখা আছে—"এই খেলাটির নাম অদৃশ্য-পর্ব্ব। খেলাটি যে নতুন সে কথা আপনারা স্বীকার করতে বাধ্য এবং ভবিষ্যতে যে এ রকম খেলা আর কখনও দেখতে পাবেন না, এ-ও নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না। আপনাদের সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ। মনে বড় দুঃখ রয়ে গেল আপনাদের মুখ দর্শন করে বিদায় নিতে পারলুম না। নমস্কার!

বিনীত

যাদুকর-সম্রাট্ নয়নবালি ফেলাই লামা"

পুনশ্চ—নামটি আশা করি সার্থক হয়েছে।

সকলে থ! কি করা যায়? শেষ-পর্য্যন্ত ঠিক হলো হনুমান সিংকে পুলিশে দেওয়া যাক্। যদি লামা মহাশয়ের কোন পাত্তা মেলে।

হু-হু করে ট্রেণ চলেছে। একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে দু'টি বাঙ্গালী যুবক। এঁদের এক জন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যাদুকর-সম্রাট্ নয়নবালি ফেলাই লামা ছিলেন; আর এক জন ছিলেন বুকিং ক্লার্ক। নাম বোধ হয় বলে দিতে হবে না। লামা মহাশয়ের আসল পরিচয় সলিল সেন আর ক্লার্ক গগন গুপ্ত।

গগন বললে—"হাজার তিনেক টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছে।"

সলিল বললে—"পকেটে ঘড়ি-আংটী নেকলেস নিয়ে প্রায় হাজার পাঁচেক হবে।"

"মন্দ কি!" গগন বললে।

উভয়ে হাসলো। এলাহাবাদ তখন অনেক দূরে!

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ)

উদ্ভিদের কথা

গাছেরও প্রাণ আছে। গাছপালা ঠিক আমাদেরি মতই—বিরাট্ বট-অশ্বত্থ হইতে দেওয়ালের ফাটলের ছোট তৃণগুল্ম মাটির বুকের দূর্ব্বা ঘাসটি পর্য্যন্ত—সকলেই আমাদের মত শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলে। খাদ্য-পানীয়ে আমরা যেমন পুষ্টি-লাভ করি, বয়সে বাড়িয়া উঠি, তৃণ-লতার প্রাণশক্তিও তেমনি খাদ্য-পানীয়ের উপর নির্ভর করিতেছে।

গাছপালার প্রাণের পরিচয় খুব সহজে তোমরা লইতে পারো।

একটি জলের পাত্রে বা গ্লাসে জল রাখিয়া সেই গ্লাস বা পাত্রের উপর একখানি বড় পেষ্টবোর্ড চাপা দাও। তার পর একটি বড়-মুখ বোতলের মধ্যে গাছের সদ্য-ছেঁড়া একটি পাতা রাখো বোঁটা সমেত। ঐ যে আচ্ছাদনী-পেষ্টবোর্ড, সেই পেষ্ট-বোর্ডের মাঝামাঝি বড় ছিদ্র

করিয়া সেই ছিদ্র দিয়া বোঁটাটুকু ঢুকাইয়া দাও—দিয়া যে-বোতলে পাতা রাখিবে, সেই বোতলটি উপুড় করিয়া পেষ্টবোর্ডের উপর রাখো। ১নং ছবির ভঙ্গীতে রাখিতে হইবে। যে-বোতলে পাতা আছে, সে-বোতলে জল রাখিবে না। খানিকক্ষণ এই ভাবে রাখিলে দেখিবে, বোঁটা দিয়া পাতা জল টানিয়া পান করিতেছে। এই জল-পানের স্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইবে বোতলের গায়ে কুয়াশার মত আর্দ্র বাষ্প জমিয়া ওঠায়। এ বাষ্প কোথা হইতে আসিয়া বোতলে জমিল? নীচেকার জল-ভরা পাত্র বা গ্লাশ হইতে বোঁটা দিয়া পাতা জল টানিতেছে—তার ফলে বাষ্প জমিতেছে। ইহা হইতে বুঝিবে, পাতা জল পান করিতেছে প্রাণ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে।
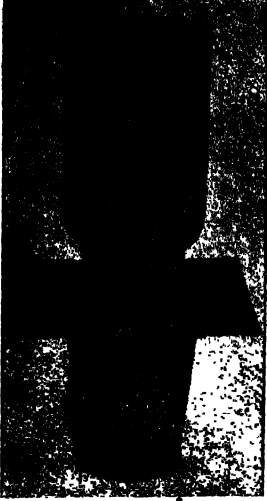
১। পাতা ও পেষ্টবোর্ড

গাছের মূলে জল দিলে সে-জল মূল হইতে শাখা-প্রশাখা বহিয়া গাছের সর্ব্বাঙ্গে কি করিয়া পরিচালিত হয়, তার পরিচয় যদি লইতে চাও তো এক কাজ করো। একটি বড় গোল আলু নাও। এই গোল আলুর বুক কুরিয়া বুকে রচিয়া তোলো খানিকটা গহ্বর বা খালি জায়গা। জল ঢালিয়া এই খালি জায়গা পূর্ণ করো—করিয়া ঐ-জলে চিনি গুলিয়া দাও। তার পর একটি কাচের গ্লাশে জল ভরিয়া বড় লোহার কাঠি বা খ্যাঙ্গরা কাঠি বিঁধিয়া আলুটিকে সে জলে ঝুলাইয়া রাখো ঠিক ২নং ছবির ভঙ্গীতে। খানিকক্ষণ পরে দেখিবে, গ্লাশের জল আলুর বুকে যে-জায়গায় চিনি-ভিজানো জল রহিয়াছে, সেই জায়গায় উঠিয়া জল উপছিয়া পড়িবার জো! এ-জল আলুর সর্ব্বাঙ্গ ফুঁড়িয়া বুকের ঐ খালি জায়গায় উঠিয়াছে। এ পরীক্ষায় বুঝিবে, 'নীচু বিনা উঁচুতে জল কভু যায় না' এ-কথা ঠিক নয়—জল উঁচুতেও ওঠে। আলুর গা ফুঁড়িয়া জল যেমন আলুর সর্ব্ব দেহ পরিপ্লাবিত করিতেছে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গেও ঠিক এমনি ভাবে জল চলে।

২। আলুর বুক কুরিয়া

৩। কাটা ডালে কাচের নল

আর একটি পরীক্ষার কথা বলিব। আমাদের দেহে যেমন রক্ত-চলাচল হয়, গাছের দেহেও তেমনি এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। গাছের রক্ত মানে জল-প্রবাহ। এই প্রবাহের ফলে যে চাপ পড়ে, তার পরিচয় চাও? যে কোনো গাছের ডাল কাটিয়া লও। পাতা ছাঁটিয়া দিবে। এবার ঐ কাটা ডালের ডগার দিকে একটি কাচের নল সংলগ্ন করো। এই কাচের নলে ভরো রঙ্গীন জল ৩নং ছবির ভঙ্গীতে। টবের মাটীতে জল দাও। দিলে মাটীতে জলের জন্য ঐ যে আর্দ্রতা—তাহারি বাষ্প মূল হইতে কাটা ডাল বহিয়া উপরে উঠিবে। তার ফলে কাচের নলে যে রঙ্গীন জল, দেখিবে নীচেকার আর্দ্র বাষ্পের ঠেলা পাইয়া নল বহিয়া সে জল উর্দ্ধে উঠিয়াছে। এ পরীক্ষায় বুঝা যায় গাছ যে-জল লইয়াছে, তার বেগ চাপ আছে। মানুষের দেহে রক্তের যেমন চাপ বা preasure এ-চাপও তেমনি!

৪। বীজের পুঁটলি

আর একটি পরীক্ষার কথা বলিয়া শেষ করি—যে-কোনো গাছের একরাশ বীজ এক-টুকরা ন্যাকড়ায় ভরিয়া পুঁটলি বাঁধো—তার পর একটি ছিপি-বন্ধ জারে জল ভরিয়া সেই জারের মধ্যে ঐ বীজের পুঁটলি ঝুলাইয়া দাও। জারের মধ্যে রাখিবে চূণের জল। পুঁটলি এমন ভাবে জারের মধ্যে ঝুলাইবে, যেন সেটি জলস্পর্শ না

করে। এমনি ভাবে জারটি ক'দিন মুখবন্ধ করিয়া রাখিয়া দাও—পাঁচ-সাত দিন। তার পর জারের ছিপি খুলিয়া যে কোনো পাত্রে ঐ জল ঢালিয়া জলে নিশ্বাস-বায়ু লাগাও—দেখিবে জলের রঙ হইবে ঘন-দুধের মত। এমন হইবার কারণ, এ ক'দিনে গাছের বীজগুলি যে-প্রশ্বাস ফেলিয়াছে, আমাদের প্রশ্বাসে যেমন থাকে কার্ব্বন ডায়ক্সাইড বাষ্প,—তার প্রশ্বাসেও তেমনি সেই কার্ব্বন ডায়ক্সাইড বাষ্প—সেই বাষ্পের স্পর্শে চূণের জলের রঙ হইয়াছে দুধের মত।

——

সহজ শিষ্টাচার

মানুষের আসল পরিচয়,—অর্থাৎ মানুষের যে-মনুষ্যত্ব, তার পরিচয় পাওয়া যায় মানুষের ঐশ্বর্য্যে নয়, মোটর-গাড়ী বা দাস-দাসীর বাহুল্যে নয়, ইউনিভার্সিটির উচ্চতম ডিগ্রীর চটকেও নয়! সে-পরিচয় মেলে মানুষের নিত্য-দিনের আচারে-ব্যবহারে—ঘরে-বাহিরে আর পাঁচ জনের সঙ্গে সে যেমন ব্যবহার করে, সেই ব্যবহারে!

ছেলেবেলায় পাঠ্যগ্রন্থে পড়েছিলুম—এক জন ধনাঢ্য বণিক এক দিন পথে বেড়াচ্ছিলেন,—ছুটীর দিন—পথে তাঁর কারখানার এক কারিগরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলো; কারিগর আনত হয়ে মনিবকে জানালো সশ্রদ্ধ অভিবাদন—ধনী বণিকটিও তার উত্তরে মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন করেছিলেন! বণিকের সঙ্গে ছিলেন তাঁর এক ধনী বন্ধু। বন্ধু বললেন—ও লোকটি কে? বণিক বললেন—আমার কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করে। এ কথা শুনে বন্ধুর দু'চোখ কপালে উঠলো! তাচ্ছল্যভরে বন্ধু বললেন—একটা সামান্য মিস্ত্রী—তাকে আপনি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন! ছি! এ কথায় বণিক জবাব দিলেন—ভদ্রতায় এবং শিষ্টাচারে আমার এক মিস্ত্রী আমাকে খাটো করে যাবে—তা আমি সহ্য করবো?

ধনী বন্ধুর গায়ে এ-জবাবটি পড়েছিল চাবুকের মত!

কথাটা খুব ঠিক! আমাদের চাকর-বাকর যদি সম্মান করে' নতি জানায় তো তার জবাবে আমাদের দেশে পুরা-কালে প্রচলিত ছিল তাদের শুভেচ্ছা জানানো বা আশীর্ব্বাদ করা। এ-কালে বিলাতী কায়দায় চাকর-বাকরদের অনেকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করেন না—এতে মনুষ্যত্বের বদলে তাঁদের অভদ্রতা বা বাঁদরামি প্রকাশ পায়।

শিষ্টাচারের দিকে আজ বিশেষ ভাবে তোমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাই—একটি বিশেষ কারণে।

যুদ্ধের জন্য আমাদের এই কলকাতা-সহর আজ লোকারণ্যে পরিণত হয়েছে। কাজের যেমন সমারোহ, মানুষের ছুটোছুটিও তেমনি বেড়ে উঠেছে প্রায় দশ গুণ। ভদ্রমহিলাদেরও আজ গাড়ীর আবরু ত্যাগ করে যাতায়াতের জন্য ট্রামে-বাসে উঠতে হচ্ছে। ট্রামে-বাসে সব সময়েই যাত্রীর ভিড় অসম্ভব রকম বেড়েছে; এত বেড়েছে যে যাত্রীদের মধ্যে শতকরা সত্তর জনকে ঝুলতে ঝুলতে যাত্রা-পর্ব্ব নির্ব্বাহ করতে হয়! এ-কারণে ট্রাম-কোম্পানির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে—মশায় গো, যাঁরা নামবেন তাঁদের আগে নামতে দিন, তার পর যাঁরা গাড়ীতে উঠতে চান, উঠবেন—সে অনুরোধ কেউ মানেন না। তার ফলে ওঠা-নামার সময় যে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে, তাতে প্রাণ বাঁচিয়ে ওঠা-নামা সারলেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং জামা-কাপড় অটুট অচ্ছিন্ন রাখা দায়! এই ছুটোপাটিতে কাজের উপরে আঠার পরিচয় তত মেলে না যতখানি মেলে অভদ্রতার পরিচয়! একটু ধীরে-সুস্থে যদি ওঠা নামা সারি, তাতে সকলেরই অসুবিধার মাত্রা কম হয় এবং গাড়ীও ফেল হবে না!

তার উপর সব চেয়ে অভদ্রতার পরিচয় পাই ধূমপায়ী যাত্রীদের ব্যবহারে। বাসে-ট্রামে ভিড়ের চোটে মানুষ-জনকে গায়ে-গায়ে সেঁটে দাঁড়াতে হয়, তার মধ্যে ফাতুষ সৌখীনের দল যখন মুখে-আগুন সিগারেটটুকুর মায়া ছাড়তে পারেন না, তখন মনে হয় তাঁদের এই বর্ব্বরতার একমাত্র শাস্তি যে-চপেটাঘাত—সেই চপেটাঘাতের আশ্রয় নি! তা নেওয়া হয় না—সহজ শিষ্টাচারে বাধে বলে'!

ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলিতে সিগারেট-মুখে দাঁড়ানোয় অপরের গায়ে ছ্যাঁকা লাগতে পারে, জামা-কাপড় আগুনে পুড়তে পারে—সিগারেটের ছাই উড়ে অস্বস্তির সৃষ্টি করতে পারে, এ আক্কেল যে বাবুবেশী-দের হয় না, তাদের গালে চপেটাঘাত করে' এ-শিক্ষা দিলে দোষ হবে বলে মনে হয় না!

ট্রাম-বাস-ট্রেনের শীটে পা তুলে বা গা খুলে বসা—ভদ্রতা নয়।

এর উপর যখন দেখি মেয়েদের শীটে বসে যাচ্ছেন পুরুষ-যাত্রী—মেয়েরা গাড়ীতে ওঠবামাত্র বিশ্রী মুখভঙ্গী করে তাঁরা যখন 'এই এলেন' বলে বিরক্ত-মুখে শীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, তখন তাঁদের এ বর্ব্বরতার সাজা-দেবার জন্য মনের মধ্যে যেন সুদর্শন-চক্র ঘুরতে থাকে! মেয়েরা যখন ট্রামে-বাসে ওঠেন-নামেন, তখন আপনা থেকে সরে দাঁড়িয়ে তাঁদের ওঠা-নামার পথটুকু অনেকে মুক্ত করেন না! এঁরা যত-বড় হোমরা অফিসার বা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হোন না কেন, রীতিমত অসভ্য! এই সব অসভ্যর কাণ ধরে' ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পথ মুক্ত করে নেওয়ায় দোষ হবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই সব বর্ব্বরতা যাতে প্রশ্রয় না পায়, সে-দিকে ছোট বয়স থেকে নজর রাখবে। এগজামিন পাশ করে' প্রেমচাঁদ স্কলার হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু ভদ্র হওয়া কারো পক্ষে কঠিন বা অসম্ভব নয়! ভদ্র-শিষ্ট ব্যবহার শেখো, তাহলে সত্যিকারের মানুষ হতে পারবে!

অশ্রু

কাঁদিতেই যদি গড়িয়া দিয়েছ নয়ন আমার বিধি,
কাঁদার ভিতরে খুঁজে যেন পাই তোমা হেন গুণনিধি!
আমার অশ্রু-সাগর-ধারায়,
মুক্তা-মাণিক যেন ভেসে যায়,
লভিতে তোমার চরণ-পদ্ম জিনিতে তোমার হিয়া
অশ্রু আমার পড়ুক ঝরিয়া তব প্রেম পরশিয়া!

হৃদয়-বেদনা নয়ন-সাগর-প্রবাহে যদি বা নামে,
তোমার অসীম জীবনে মিশিয়া সহসা যেন সে থামে!
তোমাতে মিশিয়া তোমাতে ডুবিয়া
উঠুক অশ্রু নিখিল হইয়া;
জীবনে জীবনে কাঁদিয়া ভাসিয়া ছুটি যেন তব পাশে,—
জীবন-ব্যথার বন্যা যেন তোমারেই ভালোবাসে!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল

মঞ্জুর
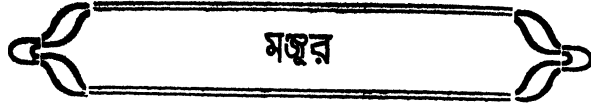
(গল্প)

হিমালয়ের নীচে বিস্তীর্ণ তরাই···সেই তরাইয়ের বুকে ছোট্ট রেলোয়ে-ষ্টেশন দলগাঁও।

দলগাঁওয়ে অনেক চা-বাগান। কান্তিচন্দ্র ক'খানা চা-বাগানের মালিক।

পূজার ছুটি আসন্ন। কান্তিচন্দ্রর গৃহে অতিথি হইয়া আসিয়াছে শঙ্কর। শঙ্কর বাল্য-বন্ধু।

শঙ্করের বয়স প্রায় চল্লিশ। একা মানুষ। বিবাহ করে নাই। বিবাহের কথা মনে জাগে নাই। জাগিবার মতো অবসরও ছিল না। চিরটা কাল গোঁয়ার-গোবিন্দর মতো কাটাইয়া আসিতেছে···

প্রথম-বয়সে ছিল ফুটবলের মাঠে বিখ্যাত সেণ্টার-ফরোয়ার্ড।···তার পর হঠাৎ এক দিন কলিকাতা হইতে সরিয়া রাইফেল ঘাড়ে শীকারী হইয়া উঠিল। বনে-বনে বাঘ-ভাল্লুক মারিয়া বেড়ায়···কোথাও থিতু হইয়া বসিতে পারে না! ঘুরিয়া বেড়ায়···মেলামেশা যা-কিছু পুরুষের দলে···সে মেলামেশায় স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ নাই! কাজেই···

ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ আসিয়াছে কান্তিচন্দ্রর গৃহে। কান্তি বলিল—ভালোই হয়েছে···সামনে পুজোর ছুটী ···ছুটীতে হারীত আসচে এখানে···শীকারের সখ···শীকার করতে যাবে। তুমি থাকলে শীকার জমবে ভালো!

হারীত আই-সি-এস্। শঙ্কর তাকে ভালো করিয়াই জানে···কলেজে ক'জনে এক-ক্লাশে পড়িয়াছিল।

ষষ্ঠীর দিন বৈকালে হারীত আসিয়া উপস্থিত···সঙ্গে তার বোন শৈল। শৈলর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর। বি-এ পাশ করিয়াছে···বিবাহ করে নাই। তার কারণ, মেয়ে-জন্ম লইলেও তার চাল-চলন কতকটা পুরুষের মতো। সে টেনিশ-খেলা ভালোবাসে; এ-যুগের যে-সিনেমা, সেই সিনেমায় তার বিরাগ! মেয়েরা পর-চর্চ্চা করে, শৈল নাক উঁচু করিয়া সরিয়া যায়! পড়াশুনা, পলিটিক্স··· এ-সব লইয়া তর্ক করে বেশ জোর-গলায়। মেয়েলি-ঢঙ লইয়া কোনো পুরুষ তার সামনে গিয়া প্রণয়াভিনয় করিবে···শৈলর গা রাগে নিসপিস্ করিয়া ওঠে! তার চোখের পানে তাকাইয়া প্রণয়াভিলাষী বিলাত ফেরতের দলও ভয়ে সরিয়া যায়।

শৈল বলিল শঙ্করকে—আপনার সঙ্গে আলাপ হলো ···ভারী আনন্দ হচ্ছে। দাদার কাছে আপনার শৌর্য্য-বীর্য্যের কত গল্পই যে শুনি! একটা দুর্দ্দান্ত গোরা-রেফারি নাকি মাঠে একবার ভয়ঙ্কর পার্শ্যালিটি করেছিল···পরে আপনি খেলতে-খেলতে তাকে এমন ল্যাঙ্ মেরেছিলেন যে তাতে একখানা পা ভেঙ্গে জন্মের মতো তার রেফারিগিরি ঘুচে যায়!

মৃদু হাস্যে শঙ্কর বলিল—সে সব ছেলেমানুষির কথা আর বলবেন না···শুনলে লজ্জা করে!

শৈল বলিল,—শীকারে আমার একটু সখ আছে। কলকাতায় থাকতে বাদায় গিয়ে মাঝে-মাঝে স্নাইপ্ মেরেছি।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

রাত্রে বসিয়া যাত্রার প্ল্যান হইতেছিল···কান্তি বলিল —শৈলও আমাদের সঙ্গে যেতে চায় শঙ্কর।

শঙ্কর বলিল—না, না···পথে নারী বিবর্জ্জিতা কথাটা এ-কালে অন্য সব পথের সম্বন্ধে অচল হলেও শীকারে অচল নয়!

শৈল বলিল—তার মানে? আমাকে তাহলে দলে নিতে চান না বুঝি! বা রে! আমাকে তেমন নার্ভস মনে করবেন না যে আরশুলা কিম্বা চামচিকে উড়তে দেখলে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠবো!

শঙ্কর বলিল—নার্ভসনেশের কথা বলছি না···অন্য কারণ আছে।

—কি কারণ, শুনি?

শঙ্কর বলিল—শীকারে ভয়ানক নিয়ম মেনে চলতে হয়। মেয়েরা কোনো-কিছুতে নিয়ম মেনে চলতে পারেন না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা···আপনারা এত বেশী খেয়ালী আর এমনি আপনাদের গোঁ যে কোনো মানা মান্‌তে পারেন না! তার ফলে শীকার সাংঘাতিক হতে পারে!

শৈল বলিল—আমি যদি কথা দি···আপনার ভয়ানক আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে থাকবো?

—কাজে তা হয়ে উঠবে না···আমার অভিজ্ঞতা আছে।

শৈল বলিল,—কিন্তু আমার সম্বন্ধে আপনার কোনো অভিজ্ঞতা নেই তো! আমি সত্যি বলছি, আপনার কথা আমি শিরোধার্য্য করে চলবো।

শঙ্কর কোনো জবাব দিল না।

শৈল বলিল,—কী আশা করে আমি এলুম! দাদাকে যে করে রাজী করিয়েছি···আমার অত আশা···

হারীত বলিল—না হে শঙ্কর, তুমি বুঝবে না···শৈলকে তুমি চেনো না···ও হলো জোয়ান অফ আর্ক। ও ঠিক আমাদের ঘরের মেয়ের টাইপ নয়! ওর মন একে-বারে যাকে বলে পালোয়ানী ছাঁচে গড়া!···সে-বারে সেই কলকাতায় রায়টের সময়ে ও···

করুণ স্বরে শৈল মিনতি জানাইল,—সত্যি বলছি··· আমাকে একবার পরীক্ষা করে দেখুন। যদি এতটুকু অন্যায় করি, তখনি সোজা আমাকে দলগাঁওয়ে পাঠিয়ে দেবেন। আমি আপনাদের শীকারে এতটুকু বিঘ্ন সৃষ্টি করবো না!

শঙ্করের মনে নিমেষের দ্বিধা···তার পর শঙ্কর বলিল —বেশ···আপনার প্রার্থনা তাহলে মঞ্জুর!

দলগাঁও হইতে খানিকটা দূরে ডুয়ার্স-লাইনের ট্রেণে চড়িয়া চেঙমুড়ী ষ্টেশনে নামিয়া দু' মাইল হাঁটিবার পর জঙ্গল। ভীষণ জঙ্গল। দিন-দুপুরে এ জঙ্গলের বহু স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে না···এমন নীরন্ধ্র ঘনারণ্য!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে জঙ্গলে পড়িল তিনটি ছোট ছাউনি। ছাউনি হইতে দেড়শো গজ দূরে তিস্তার জলহীন বুকে বালির রাশি···রূপার মতো ঝকঝক করিতেছে। তাহারি গা ফুঁড়িয়া মাঝে-মাঝে শীর্ণ জলরেখা। উত্তরে হিমগিরির তুঙ্গ প্রাচীর।

নদীর তীরে অনেকখানি জায়গা সমতল···ঠেশাঠেশি ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়াইয়া বড় বড় গাছগুলা যেন কত-কি গভীর রহস্য রচিয়া রাখিয়াছে!

চারি দিকে নিবিড় স্তব্ধতা। সভ্যতার মর্ম্মর-গুঞ্জনের বাহিরে এ স্তব্ধতায় মন যেন শিহরিয়া ওঠে! মনে হয়, কত প্রাণীই যেন এই স্তব্ধতার আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে দেখিতেছে সভ্য জগতের মানুষ-জন এখানে আসিয়া কিসের চক্রান্ত আঁটিতেছে!···

সঙ্গে বহু লোক-জন। বনের বুক তাদের কল-কলরবে স্পন্দিত হয়, পরক্ষণে স্তব্ধতা তাই আরো যেন নিবিড় হইয়া ভয়ঙ্কর লাগে!

শঙ্করের ছাউনি একটু দূরে। একসঙ্গে শীকার করিতে আসিয়াছে···তবু গল্প-গুজব করিয়া এ-মিলনকে সরস নিবিড় করিয়া তুলিবে, তেমন স্বভাবই তার নয়! সকলের কাছ হইতে দূরে-দূরে সে থাকে···যেন কিসের ধ্যানে তন্ময়! তার নাগাল পাওয়া দায়!

শৈল বলিল—আশ্চর্য্য মানুষ! আমাদের সঙ্গ এড়িয়ে থাকতে চান!

কান্তি বলিল—ও বলে, এসেছি শীকার করতে··· মজলিশ করতে আসিনি তো।

হারীত বলিল—মানুষের সঙ্গে কোনো দিন ভালো করে মিশতে পারলো না···ঐ ওর দোষ!

শৈল বলিল—আশ্চর্য্য!

শৈলদের ছাউনির পাশে শৈল বসিয়া গান গাহিতে-ছিল···হারীত আর কান্তি গান শুনিতেছে বিমুগ্ধ চিত্তে··· মাথার উপর অস্ত-রবির কিরণে আকাশ লালে লাল···শঙ্কর আসিয়া দেখা দিল। বলিল—ভালো কাজ করছো না··· গান এখানে মানায় না।

শৈল চুপ করিল।

কান্তি বলিল—তার মানে?

শঙ্কর বলিল—কোনো পাখীর ডাক শুনতে পাচ্ছো?

—না!

—এই থেকে বোঝো, এখানে হাসি-গল্প-গান করলে এখানকার এই ধ্যানমৌন স্তব্ধতা ভেঙ্গে যাবে।

হারীত বলিল—ষ্ট্রেঞ্জ ফিলজফি।

শঙ্কর বলিল—ফিলজফি নয়···সত্য কথা!

শঙ্করের এ-কথায় যেন কিসের আভাস!···শৈলর গায়ে কাঁটা দিল। শঙ্কর বলিল,—চেয়ে ছাখো সামনে ঐ জঙ্গলের দিকে···কিছু মনে হয়?

শৈলর বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। শৈল বলিল,— সত্যি, ভয় করে না, তবু যেন কি রকম! আমার মনে আছে···সাত-আট বছর আগে মার সঙ্গে একবার গিয়েছিলুম পুরীর মন্দিরের মধ্যে। খুবই অবিশ্বাসী আমাদের মন···নিজেদের শক্তির গর্ব্বে মত্ত থাকি··· তবু সে-দিন মন্দিরের মধ্যে কেবলি মনে হয়েছে, মানুষ কত ছোট! কত অসহায়! মানে, আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না···তবে এমনি ধরণের কথাই আমার তখন মনে হয়েছিল।

শঙ্কর বলিল—আমি বুঝেছি আপনি কি বলতে চান্··· এখানে এই ঘন বনের সামনে বসে আমারো মনে হয়, আমাদের শক্তি কত সামান্য! এ শক্তির গর্ব্ব করা চলে না। আমার মনে হয়, সকলের উচিত সহর ছেড়ে সভ্যতার কলরব ছেড়ে প্রকৃতির এই নিরালা বুকে মাঝে-মাঝে এসে বসা! তাহলে বুঝতে পারবো, পৃথিবীতে শক্তি কোথায়···বড়র বড়ত্ব কোথায়! সভ্য হয়েচি, বিজ্ঞান-চর্চ্চা করে আমাদের মাথা কেমন খারাপ হয়ে গেছে। নকল আর মিথ্যা নিয়ে পদে-পদে আমরা ভুল করে বসি। সভ্যতার আওতায় বসে অতি-ছোট তুচ্ছ জিনিষের উপর ঝোঁক দিয়ে আমাদের মনুষ্য-জন্মটাকে খুইয়ে ফেলি অথচ সেগুলো যে কিছুই নয়, তা বুঝি না! এখানে এসে চোখ মেলে চারি দিকে চেয়ে দেখলে এত শিক্ষা হয়···যে-শিক্ষা বড় বড় পণ্ডিতদের লেখা কেতাবে মেলে না! এই যে যাকে আমরা বলি animal instinct অর্থাৎ সহজাত বৃত্তি···নিরালা বনের জন্তু-জানোয়ার··· এমন কি ছোট একটা পাখীরও এই সহজাত বৃত্তি দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়!···একবারের কথা বলি··· মাগোদার জঙ্গলে গিয়েছিলুম বছর-খানেক আগে···

শঙ্কর কাহিনী সুরু করিল। শৈল শুনিতে লাগিল একাগ্র মনোযোগে···হারীত চাহিল দেশলাই···সিগার ধরাইবে। কান্তি বলিল—আমাকে দাও তো হে তোমার একটা চুরুট! সিগারেটে কেমন পাণাচ্ছে না যেন···

শঙ্কর চুপ করিল।

শৈল বলিল—থামলেন যে! বলুন…

শঙ্কর বলিল—এত ডিষ্টার্বান্সের মধ্যে সে-কথা বলা চলে না। ওঁরা গল্প করছেন, সিগারেট ধরাচ্ছেন…

শৈল বলিল—বাঃ, ওঁদের পাপে আমিও সাজা পাবো! আমি তো শুনছি…

শঙ্কর বলিল—আর এক সময়ে বলবো! গল্প বলুন, গান বলুন—শুনতে তন্ময়তা চাই। গল্প-গান শুনতে শুনতে যদি সিগারেটের জন্য আকুল হন্, তাহলে গল্প-গান শোনাবার চেষ্টা বিড়ম্বনায় দাঁড়ায়!…

রাত্রে বিছানায় শুইয়া শঙ্করের বারে-বারে মনে জাগিতেছিল শৈলর কথা। পুরুষ-মানুষের মতো মন এই শৈলর…নারীর মনে যে দ্বিধা-ভয়-সংশয়…যে উদ্দাম আবেগ…শৈলর মনে সে-সবের চিহ্নও নাই! পুরুষের মতো? তাও নয়…মেয়েদের সেই স্বাভাবিক কৌতূহল …বিনয়ে তেমনি আনত হইয়া আছে।

শৈলর সঙ্গে কথা কহিয়া সুখ আছে! এত বোঝে। তার পাশে হারীত, কান্তি? মন বলিয়া কোনো কিছুর উপসর্গ যেন তাদের নাই!

তন্দ্রায় দু'চোখ ভরিয়া আসিল—তন্দ্রাজড়িত চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল অস্পষ্ট আব্ছায়ায় শৈলর মাথার কুঞ্চিত ঘন কালো কেশের লহর…তার কালো দু'টি চোখের তারা…সে তারায় বুদ্ধির অসাধারণ দীপ্তি! মন বলিল…এমন মেয়ের দেখা জীবনে কখনো মেলে নাই যেন!

পরের দিন শীকারের সময়…

শৈল চলিয়াছে শঙ্করের পাশে-পাশে…নিস্তব্ধ…সতর্ক গতি…হারীত আর কান্তি লোকজন লইয়া তাদের অনেক পিছনে।

একটা ঘন ঝোপ। তারি পিছনে দু'জনে আসিয়া দাঁড়াইল। ও-দিকে অন্ধকার…কিছু দেখা যায় না!

সহসা শৈলর হাত চাপিয়া ধরিল শঙ্কর…সে-স্পর্শে শৈল চমকিয়া উঠিল।

আঙুল তুলিয়া শঙ্কর এক দিকে নির্দ্দেশ করিল। চাহিয়া শৈল দেখে, মস্ত বড় একটা হাতী…বিরাট দেহে দাঁড়াইয়া আছে। বড় বড় দাঁতে রৌদ্রকিরণ আসিয়া পড়িয়াছে। হাতীর কেমন যেন ভয়-চকিত ভাব! উৎকর্ণ দাঁড়াইয়া আছে…মনে হয় যেন কিসের প্রতীক্ষা করিতেছে! বাতাসে যেন কিসের আভাস, তাই শুঁড় তুলিয়া সন্ধান করিতেছে…কোথায়…কোথায়…কি?

এই দিকে তাদের পানেই চাহিয়া আছে না কি?

হয়তো রেঞ্জের বাহিরে নয়! শৈলর বুকের মধ্যে অস্ত্রের ঝঞ্জনা! পাশে শঙ্কর…ভয় কি? সে বন্দুক উঁচাইল।

—না…

সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কর চাপিয়া ধরিল শৈলর হাত। তার কাণের কাছে মুখ আনিয়া মৃদু ভাবে বলিল—চুপ!

মৃদু কণ্ঠের এ বাণী হাতী শুনিল…তখনি শুঁড় নামাইয়া ঝোপের দিকে তাকাইল।

সহসা এক ঝাঁক পাখী…ঠিক মাথার উপর…কলরব করিতে করিতে উড়িয়া গেল। হাতী চাহিল তাদের দিকে।

শঙ্কর বলিল…তেমনি অস্ফুট মৃদু ভাবে—পারবেন? ঠিক ওর মাথা তাগ্ করে…?

সঙ্গে সঙ্গে শৈলর বন্দুকে গুলী ছুটিল… ধুরুম্! শঙ্করের সমস্ত দৃষ্টি ঐ গুলীর সঙ্গে ছুটিয়া গিয়া পড়িল হাতীর উপর। না, গুলী লাগে নাই…গা ঘেঁষিয়া গিয়াছে! এক-চুল তফাৎ!

চকিতে হাতীর কণ্ঠে গর্জ্জন…যেন এক লক্ষ দামামা বাজিয়া উঠিল! শৈল আবার বন্দুক তুলিল…শঙ্কর সবলে বন্দুক চাপিয়া ধরিল।

শৈলর দু'চোখে যেন কে মায়ার ছড়ি বুলাইয়া দিয়াছে —সে স্তব্ধ স্তম্ভিত!

হাতী শুঁড় তুলিয়া সগর্জ্জনে ঝোপ ঠেলিয়া…ঐ…

শৈলর স্তম্ভিত ভাব ভাঙ্গিয়া গেল! শঙ্কর সজোরে তাকে ঠেলিয়া দিল। শৈল পড়িয়া গেল…ছোট একটা খানায়!

তখনি উঠিল। উঠিয়া দেখে, শঙ্কর তার বড় বন্দুক উঁচাইয়া সামনে ঐ ছুটন্ত হাতীকে লক্ষ্য করিয়া…

তার পর বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলা! হঠাৎ যেন ঝড় উঠিল …না, প্রবল ভূমিকম্পে সারা বন দুলিয়া উঠিয়াছে? ঝোপঝাড় মড়্মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ…কি যেন প্রলয়ের লীলা! তার পর শৈলর মাথা গেল ঘুরিয়া!… চোখের সামনে ঘন-ঘোর অন্ধকার।

এ অন্ধকারের পর আবার যখন আলো ফুটিল, শৈল চাহিয়া দেখে, ঝোপের ধারে পড়িয়া আছে শঙ্কর… নিস্পন্দ…পুতুলের মতো!

ছুটিয়া কাছে আসিল। হাতী চলিয়া গিয়াছে! শঙ্কর পড়িয়া আছে…যেন দলিত মথিত মাংসপিণ্ডের মতো! মুখ-চোখ-মাথা বহিয়া রক্তস্রোত বহিতেছে!

মন্ত্র-চালিতের মতো শৈল পাশে বসিল। শঙ্করের হাত নিজের হাতে চাপিয়া ধরিল…এই তো নাড়ীর স্পন্দন! তাহা হইলে আছেন! আঃ…ভগবান…ভগবান!

আর্ত্ত চোখে শৈল চাহিল চারি দিকে…দূরে ঐ না… এক দল লোক?

হাঁ…তাদেরই দলের লোক-জন।

চীৎকার করিয়া শৈল ডাকিল—দাদা…কান্তিবাবু…

তার চীৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়া উঠিল।

কান্তি-হারীত ছুটিয়া আসিল…সঙ্গে লোক-জন।

শৈল বলিল—বেঁচে আছেন! এখনি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।

বেশী কথা বলিবার সময় ছিল না। শুনিবার অবসর কাহারো নাই!

ধরাধরি করিয়া কোনো মতে সকলে শঙ্করকে তুলিল!

তিস্তার বুকের বালি খুঁড়িয়া যেটুকু পাওয়া যায়… আঁজলা ভরিয়া, আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া শৈল দিল শঙ্করের মুখে-চোখে। শঙ্করের সাড়া নাই—শব্দ নাই!

শৈল ডাকিতে লাগিল ভগবান…ভগবান…

তার দু'চোখে জল!

তার পর…

কাঁটায় গা ছড়িয়া কাপড় ছিঁড়িয়া শৈল চলিয়াছে লোক-জনের সঙ্গে শঙ্করকে লইয়া।

পথ আর ফুরায় না। এত দূরে আসিয়াছিল!

দিনের আলো নিবিয়া আসিতেছে…এখনো কত দূর? কত পথ এখনো বাকী?

কত ঝোপ ভাঙ্গিল…কত পথ হাঁটিল…সন্ধ্যার অন্ধকার চিরিয়া দূরে ঐ লাল আলোর রশ্মি…যেন দু'চোখ মেলিয়া তাদের পানে চাহিয়া আছে!

ষ্টেশনের আলো!…

অবশেষে চেঙমুড়ী ষ্টেশন।

ষ্টেশনের গায়েই রেলোয়ে-হাসপাতাল…

ডাক্তার বলিলেন, হাড়-পাঁজরা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। প্রাণটুকু কি করিয়া আছে, আশ্চর্য্য!

শৈল বলিল—বাঁচবেন তো?

ডাক্তার বলিলেন—আশা কম।

কিছু আশাও আছে? আঃ! ডাক্তার বলিলেন, —একেবারে নিরাশ হতে পারছি না…ভগবান যখন প্রাণটুকু এখনো রেখেছেন…

মনে মনে শৈল আবার ডাকিল ভগবান…ভগবান…

হারীত আর কান্তির সব অনুরোধ ব্যর্থ হইল… হাসপাতাল ছাড়িয়া শঙ্করের শয্যার পাশ ছাড়িয়া শৈল যাইবে না…কোথাও না! ষ্টেশনে আলাদা কোয়ার্টার্স… পাশে হাসপাতাল…সেখানেও না!

এক দিন দু'দিন তিন দিন কাটিল…শৈলকে কি করিয়া এ তিন দিন টানিয়া লইয়া গিয়া স্নান করানো হইয়াছে, তার মুখে দু'টি অন্ন দেওয়া হইয়াছে…যেন দুঃস্বপ্ন!

চতুর্থ দিনে শঙ্কর চোখ মেলিয়া চাহিল। আজ টেম্পারেচার নামিয়াছে ১০২।

শৈলর বুকের উপরকার পাথরখানা একটু সরিল। ডাক্তার বলিলেন,—ভারী আশ্চর্য্য আপনার নার্শিং… আন্‌টায়ারিং ডিভোশন্!

শৈলর দু'চোখ বাষ্পে ভরিয়া উঠিল।

সাত দিনের দিন শঙ্কর কথা কহিল…বলিল,—জল!

শৈল আনিয়া দিল শঙ্করের মুখে ফীডিং-কাপে করিয়া জল।

খাইয়া শঙ্কর আরাম পাইল…বলিল,—আঃ!

শৈল বলিল—খুব কষ্ট হচ্ছে?

শঙ্কর চাহিয়া রহিল শৈলর পানে…উদাস কাতর দৃষ্টি।

শৈল বলিল—বলুন…

শঙ্কর বলিল—গায়ে ভয়ঙ্কর বেদনা…

শৈল নিশ্বাস ফেলিল।

তার পর কখনো চেতনা হারায়…আবার চেতনা ফিরিয়া আসে…

এমনি ভাবে কাটিল আরো চল্লিশ দিন। এ ক'দিন শৈলর মনের মধ্যে সারা পৃথিবী যেন দুলিয়া ঘুরিয়া বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছে…

তার পর জ্বর থামিল। কিন্তু নড়িবার সামর্থ্য নাই…ডাক্তার বলিলেন—এবার কোনো মতে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সেখানকার হাসপাতালে দেখানো দরকার।

ষ্ট্রেচারে করিয়া ট্রেণে তুলিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

সেবা-শুশ্রূষার কিছু আর বাকী রহিল না! শৈল নিঃশব্দে বসিয়া রহিল শঙ্করের কেবিনে তার বিছানার পাশে।

আরো তিন মাস পরে মুক্তি।

ডাক্তাররা বলিলেন,—প্রাণটা বাঁচলো, তবে আজীবন এমনি পঙ্গুর মতো থাকবেন!

শৈল বলিল,—তা হোক্! বেঁচে থাকবেন তো!

হারীতদের কলিকাতার বাড়ী…

হারীত পাটনায় তার কর্ম্মস্থলে…বাড়ীতে শঙ্কর আর শৈল।

সে-দিন বৈকালে দোতলার বারান্দায় চাকা-চেয়ারে বসিয়া শঙ্কর…পাশে শৈল।

সামনের লনে মস্ত একটা ঝাউগাছ। ঝাউগাছের ডালে বসিয়া দু'টো পাখী…

শঙ্কর বলিল—আমাকে নিয়ে আর কষ্ট পান কেন? এবার আমায় ছেড়ে দিন।

শৈলর চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। শৈল বলিল— কোথায় যাবেন?

—দেশে আমার মতো আতুরদের জন্য আশ্রমের অভাব নেই তো।

—এখানকার চেয়ে সেখানে বেশী আরাম পাবেন মনে হয়?

শঙ্কর বলিল,—আরাম নয়!

—তবে?

—যত দিন বাঁচবো, এমনি ভাবেই আর এক জনের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে আমাকে, জানি! তা'বলে এ ভাবে আমার সঙ্গে বেঁধে আপনার জীবন নষ্ট হতে পারে না!

শৈল বলিল—আমার জীবন নষ্ট হচ্ছে, এ কথা আপনাকে আমি বলেছি ?

—তা নয়! মানে ··

—মানে কি, বলুন! আপনার বুঝি এখানে কষ্ট হচ্ছে?

—কষ্ট!···শঙ্কর চক্ষু মুদিল।

শৈল তার পানে চহিয়া ছিল···লক্ষ্য করিল, শঙ্করের মুদিত দুই চোখের কোণে মুক্তার মতো দু'টি জলের ফোঁটা।

নিশ্বাস ফেলিয়া শৈল বলিল—কষ্ট যদি না হবে, তাহলে চোখে জল এলো কেন?

শঙ্কর চোখ চাহিল। ম্লান মৃদু হাস্তে বলিল—কষ্ট নয় শৈল দেবী···চোখে জল এলো আমার উপর আপনার এত করুণা দেখে!

শৈল নিজেকে সম্বৃত রাখিতে পারিল না। বুকের অতল গহন হইতে জলের স্রোত ঠেলিয়া চোখে আসিল। কম্পিত কণ্ঠে শৈল বলিল—করুণা নয়···করুণা নয়···

—কি তবে?

—সে আমি বলতে পারবো না।

—আমাকে এমনি করে ধরে রেখে···

শৈল বলিল—আমার জন্যই আজ আপনার এ দুর্দশা ···আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারবো না। চিরদিন আপনার সঙ্গে থাকবো···

আর্ত্ত আহতের মতো শৈল সেইখানে বসিয়া পড়িল।

শঙ্কর বলিল—কিন্তু আজ আমি অন্ধকারের জীব··· একমুঠো অন্নের জন্যও আমাকে অপরের মুখ চাইতে হবে।

—না···না···না···কারো মুখ চাইতে হবে না আপনাকে। দাদাকে আমি চিঠি লিখেছি·· আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে স্ত্রীর অধিকার নিয়ে আমার এ-জীবনকে আমি আপনার সেবায়···

—কিন্তু···

—না, না, কিন্তু নয়···আপনি শুধু নিজের কথাই ভাবছেন! আমার কথা ভাববেন না? আমার সুখ? আমার দুঃখ?···আমি কোনো কথা শুনবো না। আমাকে আপনার সাথী করে সহায় করে নিতে হবে! আমার এই প্রার্থনাটুকু···

শৈলর হাত নিজের হাতে চাপিয়া শঙ্কর বলিল—এ প্রার্থনা যদি মঞ্জুর না করি, তাহলে আমি কিসের জোরে বাঁচবো শৈল? ···তোমারি দেওয়া প্রাণ···তুমি তার ভার নেবে, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর আমার কি আছে, বলো?

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র বসুর পত্র *

"আমাদিগের প্রিয় বন্ধু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন জানিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমি যে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার পরে ২ মাসও অতীত হয় নাই। তাঁহার প্রতিভাবান্ একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যু তাঁহার পক্ষে কিরূপ নির্ম্মম বেদনাদায়ক হইয়াছে, তখনই তাহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য হয় নাই বটে, কিন্তু সেই আঘাত যে এমন মারাত্মক হইবে, সে আশঙ্কা আমি করিতে পারি নাই। তাঁহার বৃদ্ধা শ্রদ্ধেয়া জননীর, পতিগতপ্রাণা নিষ্ঠাবতী পত্নীর ও তাঁহার যে বালিকা বিধবা পুত্রবধূর জীবন এখন অর্থহীন হইয়াছে—তাঁহাদিগের কথা মনে করিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যে দৈবদুর্ব্বিপাক তাঁহাদিগকে অভিভূত করিয়াছে, তাহা এত ভয়াবহ যে, তাহা প্রকাশের ভাষা নাই। মানুষের সমবেদনা যত অকৃত্রিম ও আন্তরিকই কেন হউক না, এ ক্ষেত্রে তাহা নিষ্ফল। আমার প্রার্থনা, জগজ্জননী তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

"আমি সতীশ বাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলাম ও বহু বিষয়ে তাঁহার আস্থাভাজন ছিলাম। বহু বার তিনি আমার সহিত চিন্তার ও ভাবের বিনিময় করিয়াছিলেন এবং তাহাতে আমি তাঁহার অন্তরের পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমার কাছে সতীশ বাবু উচ্চাঙ্গের সাংবাদিক হইলেও কেবল সাংবাদিক ছিলেন না। তিনি তাঁহার সহযোগীদিগের অনেকের তুলনায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। তিনি ব্যক্তি ছিলেন না—প্রতিষ্ঠান ছিলেন। অধুনা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচারে কেহই তাঁহার সমতুল্য নহেন। তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের ও সংস্কৃতির অন্যতম আন্তরিক ব্যাখ্যাকার ছিলেন। তাঁহার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব পরমহংসদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে যে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন—সতীশ বাবু তাহা পবিত্র উত্তরাধিকাররূপে রক্ষা করিয়া সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহা তিনি আবার তাঁহার প্রিয় পুত্রকে দিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু জগজ্জননীর নির্দ্দেশে যাঁহার পরবর্ত্তী হইবার কথা, তিনিই পূর্ব্বগামী হইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিবার সামর্থ্য আমাদিগের নাই।

"আমার বিশ্বাস, কৃতজ্ঞ পরপুরুষরা শ্রদ্ধা সহকারে সতীশ বাবুর নানা কার্য্য স্মরণ করিবেন। তিনি আজ আর নাই। কিন্তু তাঁহার 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির' এখনও বিদ্যমান। আমি আশা করি, তাহা চিরদিন বাণীর পবিত্র মন্দিররূপে বিরাজ করিবে।"

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু।

* শরৎ বাবু সতীশচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইয়া আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা ১৫ই মে লিখিত এবং পুলিশ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া ২৫শে মে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গনারী

বৈদিক যুগে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ও সমাজের যে পুষ্টি এবং পরিণতি সাধিত হইয়াছিল, বৌদ্ধ যুগে এবং মুসলমান রাজত্বকালে তাহাদের কতকটা পরিবর্ত্তন ও সাধারণ বিকাশ-ধারা হইতে স্খলিত হইয়াছিল। নানা প্রভাবে স্বাভাবিক বিকাশ-পথ হইতে কতকটা পরিভ্রষ্ট হইলেও একেবারে বিমার্গগামী হয় নাই। কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পশ্চিম আকাশের আলোক-সম্পাত হিন্দু সমাজের এক দিকে যেমন দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, অন্য দিকে তেমন ঘোর বিকারের কারণ হইতেছে। সেই জন্য ঐ সময় ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে একটা বিশিষ্ট সন্ধিক্ষণ। ঐ সময় হইতে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ যে তাহার সাধারণ বিকাশ-ধারা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অল্লাধিক অন্য আকার ধারণ করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকল দেশে এবং সকল মানব-সমাজেই নারীজাতিই সমাজের মেরুদণ্ড। বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ তাহার ব্যতিক্রম নহে। অতএব এই বিদেশী আবহাওয়ার প্রভাবে বঙ্গীয় নারী-সমাজ কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হইতেছে,—তাহা খতাইয়া দেখা কর্ত্তব্য এবং তাহা দেখিতে হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বঙ্গীয় সমাজে বঙ্গীয় নারীর মর্য্যাদা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাহাই করিব।

সে কালে হিন্দু সমাজে পারিবারিক ব্যবস্থা সমস্তই নারীদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। পুরুষ বাহির হইতে আবশ্যক দ্রব্য আহরণ করিয়া আনিতেন,—নারী গৃহে থাকিয়া গৃহস্থের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহার ব্যবস্থাপন এবং বিনিয়োগ করিতেন। গৃহদেবতার পূজা, অতিথিসেবা, আগন্তুকদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা, রোগীর চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষা, গৃহস্থের সামাজিক মর্য্যাদারক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই পরীক্ষা করিতেন। গৃহিণীরা অভাবে পড়িলেও সহজে পুরুষদিগকে উত্যক্ত করিতেন না। অভাব-অকুলান সমস্ত আপনারাই সামলাইয়া লইতেন। অভাবের সংসারে যে কর্ত্তৃত্ব করিয়া ভাল ভাবে সংসার চালাইতে পারিতেন, তাঁহার খ্যাতি সকলেই করিত; ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন :—

গৃহিণীর পাপ-পুণ্যে ঘর থাকে মজে।
সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে।

আর সেই সময় নারীদিগকে সকল লোকই বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিত। এই সময়ে মিষ্টার আলেকজাণ্ডার ডাউ (Dow) তাঁহার হিন্দুস্থান গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ভারতের নারীদিগকে লোক এতই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত যে, সাধারণ সৈনিকরা চারি দিকে হত্যার এবং ধ্বংসের কার্য্য করিতে থাকিলেও নারীদিগকে কোনরূপ পীড়ন করিত না। অন্তঃপুরকে তাহারা পবিত্র স্থান মনে করিত, উহাতে বিজয়-জনিত উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতে দিত না; গুণ্ডার দল স্বামীর রক্তে আপনাকে রঞ্জিত করিলেও স্ত্রীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে ভয় পাইত;" কিন্তু ঐ সময়ের কোন কোন বিদেশী পল্লবগ্রাহী লেখক সকল কথা না জানিয়া বা বিদেশী পরাজিত জাতির সামাজিক ব্যবস্থা না বুঝিয়া ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সিরাজউদ্দৌলার কতকগুলি নারীকে মিরজাফর ক্লাইভকে উপহার দিয়াছিল। ভেরেলষ্ট সেই জন্য বলিয়াছেন যে, প্রাচ্যখণ্ডে কোনরূপ আড়ম্বর না করিয়া নারীদিগকে,—তা তাহারা স্ত্রীই হউক বা বেশ্যাই হউক—অন্যের হস্তে সমর্পণ করা হইত। এ বিষয়ে নারীদিগের মতামত গ্রহণ করাও হইত না। যদি আমাদের ধর্ষণের আইন এবং সাক্ষ্য প্রমাণের আইন ভারতে প্রবর্ত্তিত থাকিত, তাহা হইলে অর্দ্ধেক পুরুষ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত। এ বিষয়ে তিনি প্রমাণস্বরূপ মীরজাফর কর্ত্তৃক ক্লাইভকে পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজউদ্দৌলার কতকগুলি নারী উপঢৌকন দিবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। মীরজাফর ছিল ক্লাইভের গর্দ্দভ। তাহার চরিত্র অত্যন্ত হীন ছিল। সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর প্রকৃত ক্ষমতা ক্লাইভের হস্তে পতিত হইয়াছিল। ক্লাইভের সহায়তা ব্যতীত মীরজাফর এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাঙ্গালার মসনদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিত না। এরূপ অবস্থায় সেই দুর্ব্বলচিত্ত এবং অযোগ্য নবাবের পক্ষে এইরূপ গর্হিত কার্য্য করা স্বাভাবিক হইয়াছে, মীরজাফরের কোনরূপ নীতিজ্ঞান ছিল না। তাহার নৈতিক চরিত্র কিরূপ ছিল তাহা সাধারণের অজ্ঞাত নাই। মহাবৎজঙ্গের শাসন-কালে মীরজাফরের মণি বেগম এবং বাবু বেগম নামে দুই জন রক্ষিতা নারী ছিল, তিনি ঐ নারীদ্বয়ের উপর অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, কিন্তু আলিবর্দ্দির ভয়ে ব্যাপারটা গোপন করিয়াছিলেন (১)। ঐ সময়ে হিন্দু নারীরা সংসারের লক্ষ্মী বলিয়া সম্মানিত হইত, তাহাদিগকে সাধারণ ভাবে বিলাইয়া দিবার কথা কেহই কল্পনাও করিতে পারিত না। যদি তখন অতি সহজে নারী হস্তান্তরিত করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে জগৎশেঠের পুত্রবধূর উপর আকৃষ্ট হওয়াতে সরফরাজ খাঁকে লাঞ্ছিত হইতে হইত না। সিরাজউদ্দৌলার পতনের অন্যতম কারণ রাণী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরীর উপর তাহার সলোভ দৃষ্টি (২)। সুতরাং ভেরেলষ্টের উক্তির কোন মূল্য নাই। ভেরেলষ্ট বঙ্গনারী-দিগের মর্য্যাদা অত্যন্ত হীন ছিল বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে জনৈক হিন্দু তাহার পত্নীকে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত দেখিয়া তাহার নাসাচ্ছেদও করিয়া দিয়া-ছিল। সে লোকটা ঐ কার্য্য করার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে অভিযুক্ত হইয়াছিল। আসামী আত্মরক্ষার্থ বলিয়াছিল যে, সে আইন এবং দেশাচার মতে কোন গর্হিত কার্য্য করে নাই। ঐ নারী তাহারই স্ত্রী, সুতরাং তাহারই সম্পত্তি। সেই জন্য তাহার সতীত্ব-হীনতার জন্য তাহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া দিবার অধিকার তাহার আছে। যে আইনের দ্বারা তাহার বিচার করা হইতেছে, সে আইনের কথা সে শুনে নাই। উহার জন্য যে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে সে তাহা জানিত না।

বাঙ্গালায় ভ্রষ্টচরিত্রা নারীদিগের উপর কখন কখন কঠোর ব্যবহার করা হইত, সে কথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ভ্রষ্টচরিত্রা নারীকে ঐরূপ কঠোর দণ্ড যে সাধারণতঃ প্রদত্ত হইত তাহা মনে হয় না। ইতর জাতির মধ্যে কেহ কেহ ব্যভিচারিণী পত্নীর নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়া দিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগেও পত্নীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনিলে তাহার স্বামী উন্মত্তপ্রায় হইয়া পত্নীকে কঠোর শাস্তি দেয়, এমন কি তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ করে, এরূপ দৃষ্টান্ত য়ুরোপের অনেক দেশে এবং মার্কিনেও বিরল নহে। কিন্তু ব্যভিচার যে কেবল নারীর পক্ষে দোষাবহ ছিল তাহা নহে।

---

(১) মুতাক্ষরীণ উট ভারিখ।

(২) অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রণীত সিরাজউদ্দৌলা দেখুন।

পুরুষের পক্ষেও ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে শান্তিপুরে এক ব্রাহ্মণ-তনয় এক চর্ম্মকার-কন্যার সহিত ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রাজা তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি নবাবের দরবারে এই আদেশ রহিত করিবার জন্য আবেদন করিয়াও কোন ফল পায় নাই। অবশ্য ভারতে নারী অতি প্রাচীন কাল হইতে পুরুষের অধীন আছে। মনুই বলিয়াছেন যে, নারীকে কৌমারে তাহার পিতা, যৌবনে তাহার স্বামী এবং বার্দ্ধক্যে তাহার পুত্র রক্ষা করিবে। নারী কখনই স্বতন্ত্রা হইতে পারিবে না। তবে য়ুরোপীয়েরা স্বতন্ত্র আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া ভারতীয় নারীদিগকে যেরূপ পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত অসুখী মনে করেন, বাস্তবিক তাহারা তেমন পরাধীনা এবং দুঃখিনী নহে; অন্তঃপুরে পুরুষকে নারীর অধীনেই থাকিতে হয়। কারণ নারীই অন্তঃপুরের কর্ত্রী। পল্লীগ্রামে তখনও নারী-দিগের সমিতি ছিল, ক্লাব ছিল, এখনও আছে। আহারাদির পর এক এক বাড়ীতে পাঁচ বাড়ীর মেয়েরা একত্র হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করে। স্নানের সময় জলের ঘাটেও মেয়ে-মজলিস বসে। সুতরাং ভেয়েনৃষ্ট প্রভৃতি অনভিজ্ঞ য়ুরোপীয়গণ ভারতীয় নারীদিগের জীবন যেরূপ বৈচিত্র্যবিহীন এবং নিরানন্দ মনে ভাবেন, উহা বাস্তবিক সেরূপ নহে। লেডী ডফরিণ অন্তঃপুরচারিণীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন যে, অবরোধে ভারতীয় মহিলারা অসুখী ত নহেনই, অধিকন্তু তাঁহারা সংসারের আর্থিক ঝড়-ঝাপ্‌টা হইতে অনেকটা দূরে থাকেন বলিয়া অপেক্ষাকৃত সুখী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত পাল্লা দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয় বলিয়া পাশ্চাত্যখণ্ডের নারীরা কত বিপদে পড়েন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

সে কালের ভারতীয় নারীরা পুরুষকে আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতেন না। সে জন্য অধিকার লইয়া নারী-পুরুষের কলহও হইত না। ভারতে উহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; ভারতীয় মুসলমান সমাজে তালাক দিবার প্রথা আছে। এক সম্প্রদায়ের বৈরাগীরাও (বৈষ্ণব) সহজে বিবাহ-বন্ধন নাকচ করিতে পারে। তাহা হইলেও ঐ সকল সমাজে কয়টি বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে? কিন্তু পাশ্চাত্য-খণ্ডে বিবাহের এক বৎসর যাইতে না যাইতে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়, ইহা সকলে জানেন। সেখানে নারী-পুরুষরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া মনে করার ফলে য়ুরোপে যে সামাজিক সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে তাহা ভাবিলে চমকিত হইতে হয়। এ দেশের নারীরা পুরুষের অধীন হইলে পতিগতপ্রাণা হইয়া থাকে। অল্প দিন পূর্ব্বে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় একটি সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছিল যে, একটি বাঙ্গালী নারী তাঁহার পতির মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার স্বামীর মুখের কাছে বসিয়াছিল। স্বামীর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ হইলে পর নারী ধীরে ধীরে শয্যা হইতে নামিয়া স্বামীর চরণ দুইখানি মস্তকে করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক আবার গিয়া স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বে শয়ন করিল। অতঃপর যখন সকলে স্বামীর দেহ সংকার করিবার জন্য আসিল, তখন দেখিল, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মৃত। উভয়কে একই চিতায় দগ্ধ করা হইয়াছিল। এরূপ ঘটনা আরও অনেক ঘটে। য়ুরোপে এরূপ দাম্পত্য প্রণয়ের কয়টা দৃষ্টান্ত দেখা যায়? য়ুরোপে নরনারীতে এইরূপ আড়া-আড়ির ভাব জন্মিবার পর যে অবস্থা হইয়াছে তাহা Bankruptcy of Marriage প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে বুঝা যাইবে। বাঙ্গালী নারীর মনোভাব য়ুরোপীয়েরা বুঝেন না। সুতরাং তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত পোষণ করা সঙ্গত নহে।

সে কালে পতি মরিলে কোন কোন নারী সহমৃতা হইতেন, অনেকে য়ুরোপীয়দিগের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া এখন বলিয়া থাকেন যে, নারীদিগকে জোর করিয়া স্বামীর চিতায় স্বামীর সহিত দগ্ধ করা হইত। ইহা অত্যন্ত মিথ্যা কথা। সহমৃতা না হইলে কোন দোষ হইত না। নলডাঙ্গা রাজবংশের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, রাজা রামশঙ্কর দেবরায়ের পত্নী রাণী রাধামণি দেবীই কেবল সহমৃতা হইয়াছিলেন। তিনি সতী হইবার সঙ্কল্প জানাইলে লোক তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তার প্রমাণ দিতে বলে। রাণী রাধামণি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটি প্রদীপে ধরিয়া উহা দগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সহমৃতা হইয়াছিলেন। আর কেহ হন নাই। তাই বলিয়া তাঁহাদিগকে কেহ জোর করিয়া পুড়াইয়া মারে নাই। এক একটি গ্রামে দুইটি কিম্বা তিনটি সতীর সংবাদ পাওয়া যায়। উঁহারা ইচ্ছা করিয়াই পতির জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন। ক্রফোর্ড তাঁহার Sketches of the Hindoos নামক সন্দর্ভ পুস্তকে ইহার অতি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। দুর্গ হইতে রাজার শব শ্মশানে নীত হইলে রাণীও আত্মীয় ও মহিলা পরিবেষ্টিত হইয়া শ্মশানে আসিলেন, রাজার দেহ চিতায় রক্ষা করা হইল। তাঁহার কোনরূপ মানসিক চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। তিনি হাসিতেছিলেন এবং সকলকে সান্ত্বনা দিতেছিলেন। পরে তিনি স্বামীর চরণ-ধূলা লইয়া চিতায় আরোহণ করিলে চিতায় আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাণীর দেহ একবারও কাঁপে নাই, উহা স্বামীর দেহের সহিত ভস্মীভূত হইয়াছিল। উইলিয়ম বোল্ট (Bolts) তাঁহার Consideration of Indian Affairs নামক পুস্তকে এই সতীদাহ ব্যাপার সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দু নারীরা এই ব্যাপারে স্বেচ্ছায় যেরূপ সহিষ্ণুতা প্রকাশ করে তাহা দেখিয়া য়ুরোপীয়রা বিস্মিত হইয়া পড়ে। তাঁহারা অতীব সাহসের সহিত পতির চিতাগ্নিতে স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জ্জন করে। ক্রাফটন বলিয়াছেন, অনেকে বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রী যাহাতে স্বামীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা না করে, সেই জন্য এই সহমরণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ কথা সত্য নহে। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাহারা সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা সিদ্ধান্তীকৃত আত্মসম্মানবোধ এবং প্রবল দাম্পত্য-প্রেমের ফলেই এইরূপ করিয়া থাকে। ইচ্ছা করিয়াই নারীরা সহমরণে যাইত। ক্রফোর্ড এইরূপ একটি সতীর কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৭৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে কাশিমবাজারে রামচাঁদ পণ্ডিত নামক এক জন মারহাট্টী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। পণ্ডিত-জীর বয়স ছিল ২৮ বৎসর, তাঁহার পত্নীর বয়স ১৭ হইতে ১৮ বৎসর। পত্নী পতির সহমৃতা হইবার সঙ্কল্প জানাইলেন। তাঁহাকে এই বিষয়টি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবার সময় দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে চাহিলেন না। পারিবারিক কারণে কাশিমবাজারে অনেকে তাঁহাকে ঐ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাঁহার বান্ধবীরা তাঁহাকে কঠোর সঙ্কল্পারূঢ় দেখিয়া তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। তখন মুর্শিদাবাদের ফৌজদারের সম্মতি লাভের জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা ইচ্ছা করিয়া সহমৃতা হইত।

তবে সকল ক্ষেত্রে স্ত্রীর পতির সহিত সহমরণে যাইবার ব্যবস্থা নাই। গর্ভবতী পত্নী, শিশু-সন্তানের জননী প্রভৃতি সহমরণে যাইতে পারিতেন না। সহমরণ সঙ্কল্পে সকল নারীই যে শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিতে পারিত তাহা নহে, জোর করিয়া অনেক স্ত্রীলোককে এইরূপ ক্ষেত্রে পতির চিতানলে দগ্ধ করা হইত। ইহাতে বিশেষ হৃদয়হীনতার পরিচয় দেওয়া হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়াতে মোটের উপর ভালই করা হইয়াছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এই বাঙ্গালা দেশে ৫৬ জন মাত্র নারী সহগমন করিয়াছিলেন।

অনেক ক্ষেত্রে এক পতির সহিত বহু নারী (সপত্নী) একই চিতায় জীবন বিসর্জ্জন দিতেন। কুলীনদিগের মধ্যে এই কাণ্ড প্রায় দেখা যাইত। 'সতীন হাসিতে হাসিতে পতির সহিত চিতায় দগ্ধ হইলেন আর আমি পারিলাম না' এইরূপ সপত্নীর ঈর্ষাবশে যাহারা সহমরণে যাইত, তাহারাই শেষকালে সূর্য্যার্ঘ্য দিবার সময় অথবা চিতা-রোহণে অগ্নির আঁচ গায়ে লাগিবার পর চিতা হইতে পলাইতে চেষ্টা করিতেন এবং তখন লোক তাহাকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করিত। ইহা নারীদিগের উৎকট ভীরুতার নিদর্শন নহে। ইহা ধর্ম্ম সম্বন্ধে উৎকট অন্ধবিশ্বাসের পরিচায়ক। কালবশে সকল ব্যবস্থারই এইরূপ অপব্যবহার হয়। সতীদাহ প্রথায়ও তাহা হইয়াছিল। তবে অধিকাংশ স্থলেই নারীরা স্বেচ্ছায় পতি-চিতানলে আত্মাহুতি দিত ইহা সত্য। ক্র্যাফটন যথার্থই বলিয়াছেন যে য়ুরোপীয়রা উহা ঠিক বুঝেন না।

অনেকে মনে করেন, তৎকালে নারীরা শিক্ষিতা ছিলেন না। স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে লোকের একটা উৎকট কুসংস্কার ছিল। ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। উচ্চবর্ণের নারীদিগের মধ্যে অনেকে আহা-রাদির পর রামায়ণ, মহাভারত, শিবায়ন, চণ্ডী প্রভৃতি পড়িতেন। ইঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। তবে যাঁহারা বিশেষ ভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন তাঁহাদের কথাই এই দীর্ঘকাল পরে শুনা যায়। ভারতচন্দ্র রায়ের ও রামপ্রসাদের বিদুষী বিদ্যার চরিত্র কতকটা তদানীন্তন শিক্ষিতা মহিলার আদর্শে অঙ্কিত। কবি জয়নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী হরিলীলা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই বারাণসীধামে হাতী বিদ্যালঙ্কার নাম্নী এক বাঙ্গালী মহিলা ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। ইনি ছিলেন বাঙ্গালার এক কুলীন-কুমারী। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিতা ছিলেন। তিনি বাল্যকালেই বিধবা হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতাও কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তখন ইনি অনন্যোপায় হইয়া কাশীতে যান এবং তথায় আরও কিয়ৎকাল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া টোল খুলিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যায় আকৃষ্ট হইয়া অনেকে তাঁহার টোলে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিতেন। ফরিদপুরে কোটালিপাড়ার গুনকবংশীয় এক জন সংস্কৃত কবি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম। ইঁহার স্ত্রী বৈজয়ন্তী দেবী অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। ইনি স্বামীর সহিত 'আনন্দলতিকা' কাব্য রচনা করেন। ঐ কাব্যখানি কালিদাসের কোন কাব্য অপেক্ষা হীন নহে। ঐ কোটালীপাড়ায় প্রিয়ম্বদা নাম্নী আর একটি বিদুষী মহিলা জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল শিবরাম সার্ব্বভৌম। স্বামীর নাম রঘুনাথ মিশ্র। মাজবাড়ী গ্রামের ইনি গৌতম-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। প্রিয়ম্বদা দেবী মদালসা উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা এবং মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ম বিষয়ে এক বিস্তৃত টীকা লিখিয়াছিলেন। রাজনগরের আনন্দময়ীর নাম অনেকেই জানেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-প্রধান গ্রামগুলিতে মধ্যে মধ্যে এক এক জন অসাধারণ বিদুষী মহিলা জন্মিতেন। ইঁহাদের সংখ্যা অবশ্য অল্প ছিল। কিন্তু সাধারণ ভাবে বাঙ্গালা শিক্ষিত নারীর সংখ্যা অল্প ছিল না।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোন কোন নারী এত দূর সুশিক্ষিতা হইতেন যে, তাঁহারা জমিদারী প্রভৃতি পরিচালনা করিতে পারিতেন। এই উপলক্ষে রাণী ভবানীর নাম উল্লেখযোগ্য। বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারী জমিদারী পরিচালনে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন।

দুর্দ্দান্ত জমিদার দেবীসিংহের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া অনেক জমিদার ও তালুকদার বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সেই বিদ্রোহীদিগের নেত্রীপদে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন জয়দুর্গা চৌধুরাণী নাম্নী এক জন মহিলা। ইনি স্বয়ং নিজের জমীদারী পরিচালিত করিতেন। কেহ কেহ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধা জয়দুর্গার চরিত্রের ছায়া অবলম্বনে রচিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গীয় মহিলাগণ যে সাধারণতঃ অশিক্ষিত ছিলেন, ইহা মনে করা বিষম ভুল। এ ধারণা দেশের প্রকৃত ইতিহাস না জানার ফল। তবে এরূপ নারীর কথা অধিক শুনা যায় না। যাঁহাদের প্রতিভা অনন্যসাধারণ ছিল এবং অবস্থার পাকচক্রে পড়িয়া যাঁহারা স্বীয় প্রতিভা প্রকটিত করিতে পারিতেন, তাঁহাদের নামই তখন প্রকাশ পাইত। এখন আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়া সে কথা ভুলিয়া যাইতেছি। বঙ্গীয় মুসলমান নারীদিগের মধ্যে তখন অনেকে লেখাপড়া জানিতেন এবং পতির সহিত যুদ্ধক্ষেত্রেও যাইতেন। আলিবর্দ্দী খাঁর মহিষী স্বামীর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন এবং অনেক দুরূহ রাজনীতিক বিষয়ে আলিবর্দ্দীকে পরামর্শ দিতেন।

ভারতীয়া মহিলারা কোন দিকেই পুরুষ অপেক্ষা ন্যূনতা প্রকাশ করেন নাই। তবে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র ছিল। পুরুষ ছিল বহির্বিষয়ের কর্ত্তা—বাহির হইতে অর্থ আনয়ন করিতেন এবং বাহিরের যাবতীয় কার্য্যের পরিচালক, আর নারী ছিল অন্তঃপুরের কর্ত্রী। ঘরের কাজ বাহিরের কাজ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। ঘরেই মানুষের জীবনের পত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। সে কালে নারী যতই বড়লোকের পত্নী হউন না কেন, তাঁহাকে রন্ধন করিতে হইত। রাজা-রাজড়ার বাড়ী ভিন্ন অন্য কোথাও পাচক বা পাচিকা রাখা হইত না, নারীরা অন্তঃপুরের কর্ত্রী ছিলেন. রন্ধনাদি ব্যাপার তাঁহাদেরই কর্ত্তব্যমধ্যে ছিল। উচ্চ-নীচভেদে সর্ব্বশ্রেণীর নারী-গণের রন্ধন ব্যাপার একটা অতি বড় শিক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। ন্যায়শাস্ত্রের কচকচি অনেক নারীই করিতে পারিতেন না, কিন্তু রন্ধন-কৌশল সকল নারীই শিখিতেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজে নারী যেমন নরের সর্ব্বকার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন তাহা ছিল না; নারী-পুরুষ পরস্পরে পরস্পরের ত্রুটিপূরক ছিলেন। রন্ধন, গৃহকার্য্যের সুবন্দোবস্ত এবং পারিবারিক চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষা নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। যাঁহারা সে কালের গৃহিণীদিগকে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা স্বীকার করিবেন।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

দ্বিতীয় রণাঙ্গন—

সমগ্র জগৎ ইউরোপের দ্বিতীয় রণাঙ্গনের জন্য উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিল—কবে ? কোথায় ? ও কখন্ ? বিশ্ববাসী সকলের মুখে এই একই প্রশ্ন স্বভাবত: শোনা যাইতেছিল। অবশ্য ইহার সঠিক উত্তর কাহারও জানা সম্ভবপর ছিল না। উচ্চ সামরিক মহল ইহার গোপন উত্তর তাঁহাদের অন্তরের নিভৃততম কোণে অতি সতর্কে রক্ষা করিতেছিল। বেফাঁস হইয়া পাছে কোনরূপে ইহার গোপন তথ্য বাহির হইয়া যায়, সে জন্য বৈদেশিক কুটনীতিবিদগণের (যুক্তরাষ্ট্র ও রুশ ব্যতীত) পত্রাবলীর সেন্সর করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ও অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া অপর সকলের বিলাত হইতে যাতায়াত বন্ধ করা হইয়াছিল। আগত দিন যে সমাসন্ন তাহার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল ইংলিশ প্রণালীতে মিত্রপক্ষীয় ও জার্ম্মাণ নৌবাহিনীর সংঘর্ষে। অপরিমিত রণসম্ভার ও অসংখ্য সৈন্য-বাহিনী বাহিত হইতেছিল নানা ধারায় ইংলণ্ডের সামরিক কেন্দ্র সমূহে—জেনারেল আইসেনহাওয়ার ও মণ্টগোমেরীর অধীনে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সংগ্রামে লিপ্ত হইবার জন্য।

মধ্যে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার দিন আসন্নপ্রায় হইয়া আসিয়াছে—এবং যে কোন মুহূর্ত্তে শোনা যাইবে ইহার "শুভ" ঘণ্টাধ্বনি। সমগ্র জগৎ সেই আসন্ন মুহূর্ত্তের ঘণ্টাধ্বনির প্রতীক্ষায় কাণ পাতিয়া বসিয়াছিল। মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে আমেরিকার বিখ্যাত সমরসংবাদদাতা হান্‌সন্ বলড্উইন লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক পত্রের নিকট এক বিশেষ তারে জানাইয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার দিন যতই আগাইয়া আসিতেছিল ইংলণ্ডে ততই একটা যেন শান্ত সমাহিত ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। ইহা ঝড়ের পূর্ব্বাভাস মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতেছিল যে, ইংলণ্ডে যেন এ জন্য আদৌ কোন উত্তেজনা বা চাঞ্চল্য ছিল না। ডানকার্কের পর আজ চারি বৎসর পরে বৃটেন পশ্চিম হইতে ইউরোপ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। তবে এবারে সে আর একা নহে। উভচর যুদ্ধে সুশিক্ষিত আমেরিকান সৈন্য ও নৌবাহিনী দ্বিতীয় রণাঙ্গনের যুদ্ধে বৃটেনের সহিত আজ লিপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় রণাঙ্গনে যে যুদ্ধ সুরু হইয়াছে, তাহার মত কঠিন যুদ্ধে আমেরিকাকে ইতিপূর্ব্বে কোন দিন অংশ গ্রহণ করিতে হয় নাই, এবং সে যুদ্ধে সহজেই যে বিজয়লাভ ঘটিবে তাহাও মনে হয় না। মনে রাখিতে হইবে যে, জার্ম্মাণীর পক্ষে ইহা মরণ-বাঁচনের শেষ যুদ্ধ—এবং ভীষণ হিংস্রতার সহিত দিবে সে মরণ-কামড়। অনেকের মতে মিত্রপক্ষকে জয়লাভের জন্য বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য যুদ্ধে কোন কিছুরই নিশ্চয়তা নাই। আবহাওয়া, সময়, জোয়ার-ভাটার ক্ষণ এবং বরাতের উপরই সমস্ত নির্ভর করিবে। একমাত্র পশ্চিম ইউরোপের উপরই যে আক্রমণ চালান হইবে তাহা মনে করাও ভুল। পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও অন্তরীক্ষ হইতে জার্ম্মাণদের উপরে আঘাত হানা হইবে। এই পরিকল্পনার প্রাথমিক অংশটা কার্য্যকরী করা হয় ইটালীতে। মিত্র-পক্ষীয় সামরিক মহল দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিবার জন্য রোম নগরী পতনের অপেক্ষা করিতেছিল। জার্ম্মাণদের মতে পূর্ব্ব রণাঙ্গনে রুশরাও সৈন্য সমাবেশ করিতেছিল। সে দিক হইতে যেমন সুনিশ্চিত প্রচণ্ড আক্রমণ করা হইবে, সেরূপ প্রচণ্ড আক্রমণ ইংলণ্ড হইতেও দ্বিতীয় রণাঙ্গনের [illegible] সমূহে করা হইবে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিভীষিকা জার্ম্মাণ জাতিকে অভিভূত করিয়াছিল। বিগত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে জার্ম্মাণ রণ-নীতিবিদগণ বরাবর একই সতর্ক বাণী শুনাইয়া আসিতেছিল, জার্ম্মাণী যেন কোন যুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের ঝুঁকি না লয়। এই সতর্ক বাণী অবহেলা করিয়া গত মহাযুদ্ধের সময় কাইজার ভীষণ ভুল করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে গত মহাযুদ্ধে বোধ হয় জার্ম্মাণীকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইত না! সে জন্য এই মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাহ্নে হিট্‌লার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যত দিন না তিনি রুশিয়ার সহিত মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নিজেকে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের ঝুঁকি হইতে মুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তত দিন তিনি ইউরোপের যুদ্ধে আবির্ভূত হইবার মাহেন্দ্র ক্ষণ খুঁজিয়া পান নাই। তার পর যত দিন না ফ্রান্সের পতনের পর ফরাসী দেশকে দখলে আনিয়া তিনি জার্ম্মাণীর অব্যবহিত পশ্চিমে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ম্মূল করিতে পারিয়াছিলেন, তত দিন রুশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহস করেন নাই।

জার্ম্মাণী ভাবিয়াছিল যে, ইংলণ্ডের উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করিয়া সে চিরকালের মত দ্বিতীয় রণাঙ্গনের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। কিন্তু বিমানযুদ্ধের সেই মহা পরীক্ষায় যখন ইংলণ্ড সদর্পে উত্তীর্ণ হইল, তখন জার্ম্মাণীর ইংলণ্ডকে পদানত করিবার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। মহাসমরের ঘটনাবলী প্রথম তিন বৎসর জার্ম্মাণীর পক্ষে অনুকূল ছিল বটে, কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সে অনু-কূলতার মূলে ছিল জার্ম্মাণীর পাশবিক শক্তি এবং কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট এবং স্ফীত নৈতিক বল। ফ্রান্সের পতন ঘটিয়াছিল স্বরাষ্ট্রীয় নানা কারণে—ইহা বর্ত্তমান মহাসমরের একটি বিষাদমূলক অধ্যায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ইউরোপের অন্যত্র জার্ম্মাণী যে প্রলয়াত্মক যুদ্ধ চালাইয়াছিল, সে যুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল মাৎস্যন্যায়ের উপর। শফরীবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সমূহকে বিরাট অভিযানের চাপে নিষ্পেষিত করিয়া জার্ম্মাণী রণকৌশলের বিশেষ পরিচয় দেয় নাই। ইহারই সাফল্যে গর্ব্বিত হইয়া জার্ম্মাণী যখন রুশিয়ার বিরুদ্ধে বজ্রাভিযান চালাইল, তখনও পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনীর নৈতিক বল অটুট ছিল। চরম শীর্ষে গিয়া পৌছিল সেই নৈতিক বল যখন জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী হানা দিল মস্কো নগরীর অদূরে। কিন্তু পাশবিক শক্তির সহায়তায় কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট নৈতিক বল কখনও চিরকাল অটুট অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকে না। সহস্র বিনিদ্র রজনী যাপনের পর রুশজাতি যখন স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য নূতন ভাবে মনের সাহস ও শক্তি অর্জ্জন করিয়া নূতন রণকৌশলের সহায়তায় হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প হইল, নাৎসী ফৌজের মনোবলে তখন পড়িল প্রথম কশাঘাত। যে রুশভূমি কবলস্থ করিতে জার্ম্মাণীর লাগিয়াছিল সহস্রাধিক দিবস, তাহা রুশিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইল। তার পর জার্ম্মাণীর আত্মপ্রত্যয় বিশেষ ভাবে ঘা খাইল, যখন আফ্রি-কার মহাযুদ্ধে পরাজিত, স্বরাষ্ট্র-নিধনের সম্ভাবনায় অভিভূত ইটালী মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিল। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের করাল প্রতিচ্ছায়া এই সময় স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল জার্ম্মাণীর মনোমুকুরে।

সেই মুহূর্ত্ত হইতে ইংলণ্ডও প্রস্তুত হইতে লাগিল দ্বিতীয়

রণাঙ্গনের জন্য। মহা উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হইল এই সম্পর্কে। উদ্যোগপর্ব্বের যে আশু অবসান ঘটিতেছে তাহা প্রকাশ পাইল তখনই—যখন দ্বিতীয় রণাঙ্গনের উপক্রমণিকা হিসাবে মিত্রশক্তি চালাইল বিমান হানা জার্ম্মাণীর রাজধানীর বুকে, সমর-শিল্পসমূহের কেন্দ্রস্থলে ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটা সমূহের উপরে।

একমাত্র এপ্রিল মাসেই বর্ষিত হইল জার্ম্মাণীর বুকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজকীয় বিমান বাহিনী হইতে লক্ষাধিক টন পরিমাণ অতি বিস্ফোরক ও আগ্নেয় বোমা। স্বপ্নাতীত ঘটনা বলিয়া মনে হইল—২৪৫০০ মিত্রপক্ষীয় বিমান নিযুক্ত হইল এই অভূতপূর্ব্ব অভিযানে একমাত্র এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে। বিমান-যুদ্ধ যে ক্রমশঃ চরমে পেঁছিতে-ছিল তাহা বুঝা গিয়াছিল বার্লিনের এক বেতার ঘোষণায়—"The invasion air force is now actually in the fight." জার্ম্মাণীস্থ নিরপেক্ষ সংবাদদাতাসমূহ বলিতেছিল—যদিও বিমান আক্রমণের কথাই আজ জার্ম্মাণীর পথে ঘাটে মাঠে বাটে সর্ব্বত্রই একমাত্র কথোপথনের বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি ইহা জার্ম্মাণ জাতির মনোবলকে বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ করিতে সক্ষম হয় নাই। তবে জার্ম্মাণীতে হিটলার আজি আর সেরূপ পূজার পাত্র নন্, যেরূপ মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বেও ছিলেন। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিভীষিকায় আক্রান্ত, বোমাবর্ষণে জর্জ্জরিত জার্ম্মাণ জাতি পূর্ব্ব-সীমান্তে রুশ-রণাঙ্গনে হিটলারের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াছে, হিটলার ধ্বংসক্ষেত্র-সমূহ পরিদর্শনে বিমুখ এবং নিজেকে বিমান-আক্রমণ হইতে নিরাপদ করিবার জন্য বেরখটেস গেডেনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ হয় সেই প্রতিকূল মনোভাবকে পুনরায় আশান্বিত করিবার চেষ্টায় হিট্‌লার আজ স্বয়ং পশ্চিম রণাঙ্গনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি, মধ্যে শুনা গিয়াছিল যে গোরিং, গোয়েবেলস্, হিটলার, রিবেনট্রপ, রোমেল ও রুনড্‌ষ্টেড্টের মত বিশ্বস্ত পার্শ্বচর সমূহও হিট্‌লারের সাম্প্রতিক ব্যবহার অনুমোদন করিতেছেন না। বার্লিনের নিরপেক্ষ সংবাদ-দাতারা মনে করেন যে, এইরূপ শুনা কথার মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। কিছু দিন পূর্বে জুরিখের (Zurich) সাপ্তাহিক পত্রিকা Sie und Er এ সম্বন্ধে যে জনরব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ—"হিট্‌লার বর্ত্তমানে বেশীর ভাগ সময়ই হেবরমাটের সভ্যদের দ্বারা বেষ্টিত থাকেন। তাঁর আবাস এখন বেরখটেস গেডেনের ওবারস্যালজবার্গ নামক স্থানে অবস্থিত। তিনি কদাচিৎ গোরিং, গোয়েবেল অথবা হিম্‌লারের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করেন। হিটলারের গৃহে কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করা নিষিদ্ধ; যথা মহাযুদ্ধ এবং হতাহতের সংবাদ। অল্পদিন পূর্ব্বে ক্রোটিয়ান প্রতিনিধিদের সম্মানার্থ ভোজসভায় এক জন অতিথি সেই নিষেধ অমান্য করিয়া যুদ্ধ এবং মিত্রপক্ষীয় বিমানহানার কাহিনীর কথা বলিতে আরম্ভ করেন। সভার সকলে ভীত, নিস্তব্ধ। হিট্‌লার হঠাৎ আহার বন্ধ করিয়া বলেন, তিনি ভোজ-টেবিল ত্যাগ করিতে চান। শেষ মুহূর্ত্তে কোনরূপে মনোমালিন্য এড়াইয়া যাওয়া হয় এবং যথারীতি ভোজনপর্ব্ব চলিতে থাকে।" কিন্তু সে যাহাই হউক, একটা জিনিষ পরিষ্কার প্রতীয়মান হইতেছিল। নিরপেক্ষ সংবাদদাতাগণ বলিতেছিলেন যে, "German industy and morale are far from being smashed. German civilians are not panicky; they are doggedly determined to carry on through this and worse to come. All Germans put their trust in their still well-armed, well disciplined Wehrmacht."

বস্তুতঃ, দ্বিতীয় রণাঙ্গনে আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধ চালাইবার জন্য জার্ম্মাণী প্রস্তুত হইতেছিল পূরা দমে। ৬ই জুন ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণের পর হইতে মিত্রপক্ষ যে যুদ্ধ সুরু করিয়াছে তাহা লইয়াই ইউরোপীয় মহাসমরের শেষ অধ্যায় রচিত হইবে। জার্ম্মাণী চালাইবে এই রণাঙ্গনে হিংস্রতম যুদ্ধ। যত দিন পর্য্যন্ত না মিত্রপক্ষীয় বাহিনী জার্ম্মাণীর উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানিতে পারে, তত দিন জার্ম্মাণী এই যুদ্ধের বিরতি জানাইবে না।

মিত্র বাহিনী-অধিকৃত তট-ঘাট ৩৬ মাইল প্রসারিত হইয়াছে, ও নরম্যাণ্ডির রণাঙ্গনে রুণষ্টেডের রিজার্ভ বাহিনীর সহিত মিত্রপক্ষের তুমুল লড়াই চলিতেছে।

নরম্যাণ্ডিতে উভয় পক্ষ নূতন সৈন্য আমদানী করায় যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাইতেছে। কায়েন-বেউ অঞ্চলে ট্যাঙ্কের প্রবল লড়াই হইতেছে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সম্মিলিত পক্ষ জার্ম্মাণ নিরাপত্তা-ব্যূহ হটাইয়া দিয়াছে। বৃটিশ ও সাম্রাজ্য বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল সার মণ্টগোমারী ফ্রান্সে তাঁহার প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার অধীনে দুই লক্ষ সৈন্য নরম্যাণ্ডিতে যুদ্ধ করিতেছে এবং সমসংখ্যক এক জার্ম্মাণ সৈন্যদল তাহাদিগকে বাধা দান করিতেছে। ওদিকে মার্কিন সৈন্যগণ ইসিগনির দক্ষিণে লাইসোঁ সহর দখল করিয়াছে এবং দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কয়েক মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

অন্যান্য রণাঙ্গন—

দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পূর্ব্বাহ্ণে জেনারেল আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে জেনারেল ক্লার্কের পঞ্চম বাহিনী রোম নগর অধিকার করিয়াছে। জার্ম্মাণরা আড্রিয়াতিক রণাঙ্গন হইতে অপসরণ আরম্ভ করিয়াছে ও মিত্রবাহিনী এখানে তোলো দখল করিয়াছে। টাইবারের পশ্চিমে মিত্রবাহিনীর প্রবল অগ্রগতির সম্মুখে বিরাট ধ্বংসস্তূপ ও রক্ষিবাহিনীর অন্তরালে জার্ম্মাণরা সরিয়া যাইতেছে। মিত্রবাহিনী অগষ্টা, প্যালেস্বোরা, সাবিনা, সুত্রিক প্রোরোলা দখল করিয়াছে। ওদিকে রুশ রণাঙ্গনের ক্ষণিক নীরবতাও শেষ হইয়াছে। বিরাট কর্দ্দম-অভিযান (mud offensive) চালাইয়া রুশ জাতি দখল করিয়া লইয়াছিল সাত সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত ভূভাগ—নীপার নদীর পার হইতে কারপাথিয়ান পর্ব্বতমালার পাদমূল পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সহিত তাল রাখিয়া প্রচণ্ড লড়াই চালাইবার জন্য সমবেত হইতেছিল লালফৌজের দল কৃষ্ণসাগরের তীর হইতে প্রিপেট জলাভূমি পর্য্যন্ত। ইহাতে আতঙ্কিত হইয়া জার্ম্মাণী নিযুক্ত করিয়াছিল তাহার রিজার্ভ বাহিনী সমূহকে বাল্টিকের উপকূলস্থ নার্ভায়, সাবেক পোলাণ্ডের অন্তর্গত লাউয়ে, ও কারপাথিয়ান পর্ব্বতমালার পাদদেশের ভূভাগ সমূহের অভিযানে। কিন্তু লালফৌজের দল দমিবার পাত্র নহে। সূচ্যগ্র জমি প্রত্যর্পণ না করিয়া লালফৌজ রক্ষা করিয়াছে তাহার পুনরুদ্ধৃত ভূখণ্ড। তার পর কিন্তু নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল রুশিয়ার রণাঙ্গন—ঠিক প্রলয়ের পূর্ব্বাহ্ণের নিস্তব্ধতার মত। রণদামামা আবার বাজিয়া উঠিল যখন জার্ম্মাণ ফৌজ আক্রমণ করিল জার্সিতে। সাত দিন ধরিয়া রুশ সৈন্যকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবার জন্য জার্ম্মাণরা চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড

আক্রমণ চালাইল। ট্যাঙ্ক ও কামানের লড়াইয়ের সহিত চলিল প্রচণ্ড বিমান-যুদ্ধ। প্রুথ অঞ্চলেও চলিল ভীষণতম যুদ্ধ। জার্ম্মাণ সৈন্য চেষ্টা করিল সাঁড়াশীর আকারে সোভিয়েট বাহিনীকে ঘিরিয়া ফেলিতে। কিন্তু জার্ম্মাণদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়া রুশ সে আক্রমণ প্রতিহত করিতেছে। মধ্যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গনের আঘাত হানা হইবে কোন্ দিক্ দিয়া—ইহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া জার্ম্মাণী আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিল বলকানে, ডেনমার্কে ও জুটল্যাণ্ডে।

রুশ সৈন্যগণ কারেলিয়ান যোজকে ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। একটি জার্ম্মাণ ব্যাটালিয়ন ট্যাঙ্কের সাহায্যে ষ্টানিস্লাভভের দক্ষিণ-পূর্ব্বে এক আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ রুশ সৈন্যগণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে এবং জার্ম্মাণদিগের যথেষ্ট লোকক্ষয় হইয়াছে।

জাসির উত্তরে রুশ সৈন্যগণ আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগের অবস্থার আরও উন্নতি করিয়াছে।

এদিকে প্রাচ্যের রণাঙ্গনে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে মণিপুরের গিরিপথে। চীন ও ব্রহ্মের রণাঙ্গনের সরবরাহ-পথ রোধ করিবার জন্য আবির্ভূত হইল জাপ মণিপুরের শান্তিপ্রিয় রাজ্যে। গিরিদেশের দুর্গমতার সুযোগ লইয়া জাপ নিজেদের অসংখ্য গিরিগহ্বরে ছড়াইয়া ফেলিল। এক এক করিয়া তড়িদ্‌গতিতে রোধ করিল ইম্ফল, কোহিমা ও মণিপুরের পথ সমূহ। কিন্তু অতি দ্রুত সে সাফল্যের অবসান ঘটিল। অচিরে মুক্ত হইল কোহিমা। ইম্ফল ও বিষেণপুরের অবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে।

মেঘদূতের ইসারায় মিত্রপক্ষীয় বাহিনী আরাকানের রণাঙ্গন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সীমান্তের আশ-পাশে জাপ-সৈন্য উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে।

উত্তর-ব্রহ্মে ষ্টিলওয়েলের বাহিনী লেডোর পথ ধরিয়া সরাসরি নামিয়া গিয়াছে মিচিনার বুক পর্য্যন্ত। চিণ্ডিট্ বাহিনী তাঁহার সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। ওদিকে চীনবাহিনীও ক্রমশঃ ব্রহ্মপথে অগ্রসর হইতেছে।

ইম্ফলের ১৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে জাপানীদের আক্রমণ ব্যর্থ করা হইয়াছে। তাহাদের হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশী। মিটকিনায় একটি আমেরিকান দল অর্দ্ধ মাইল অগ্রসর হইয়া মিটকিনা-মগং-সুম্প্রাবম সড়কের সংযোগস্থল অধিকার করিয়াছে। সালুইন রণাঙ্গনের দক্ষিণ অর্দ্ধাংশে চীনাদিগের প্রবল আক্রমণে জাপানীরা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্ম সড়কের যে সকল এলাকা এত কাল জাপানীদিগের যানবাহন চলাচলে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সকল সংযোগ-সূত্র এখন ছিন্ন করা হইতেছে।

জাপানীরা বিরাট ফৌজ লইয়া চীনদেশে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছিল। পিপিং-হ্যাংকাউ রেলপথ ধরিয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছিল দক্ষিণে লোয়াং সহরের দিকে। লক্ষ্য-বস্তু তাহাদের ছিল চীনের প্রাণকেন্দ্র চুংকিং। কিন্তু আক্রমণ-স্থল হইতে চুংকিং বহু দূর এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্যবধান ভূমিও দুর্গম এবং জঙ্গলাচ্ছন্ন। চুংকিংএর দিকে তাহাদের এই যে আক্রমণ ইহা প্রথম নহে। ইতিপূর্ব্বে তাহারা আরও দুই বার ব্যর্থ আক্রমণ চালাইয়াছিল। ব্রহ্ম পতনের পর, তাহারা ব্রহ্মের দিক্ দিয়া চুংকিংএর দিকে আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টাও তাহাদের সফল হয় নাই। বর্ত্তমানে সালুইন নদী পার হইয়া চীনারা আবার পাল্টা আক্রমণ করিয়াছে ব্রহ্মপথে লাসিওর দিকে। তাহাদের উদ্দেশ্য,—উত্তর-ব্রহ্মে ষ্টিলওয়েলের সৈন্যবাহিনীর সহিত মিলিত হওয়া। দুই বাহিনীর মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য যে, দুই বাহিনীর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইলে সমগ্র ব্রহ্ম-পথ মুক্ত হইয়া যাইবে, এবং ব্রহ্ম-চীন রণাঙ্গনে সরবরাহ প্রেরণ অতি সুগম হইবে।

হুনান প্রদেশে চ্যাংসার উপর জাপানীরা প্রবল ভাবে গোলাবর্ষণ করিলেও চীনারা তাহাদিগকে কোণঠাসা করিতেছে। চ্যাংসার পূর্ব্বে লিউয়াংএর উত্তর-পূর্ব্বে চীনারা কোচাং পুনরধিকার করিয়াছে।

ওদিকে জেনারেল ডগ্‌লাস্ ম্যাকারথার অষ্টাদশ মাস যাবৎ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অভিযান চালাইতেছেন। সম্প্রতি নিউ গিনির উপকূলস্থ হলাণ্ডিয়া, ঐটেপ্ ও টানাহামেরা উপসাগর দখল করিবার সময় তিনি বিশেষ রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। শত্রুকে প্রতারিত করিবার জন্য তিনি প্রথমে নকল আক্রমণ চালাইয়াছিলেন পালাউ অভিমুখে। কিন্তু রাতারাতি মোড় ফিরাইয়া তিনি আঘাত হানিলেন হলাণ্ডিয়ার উপর। ঠিক অনুরূপ নকল আক্রমণ চালাইয়াছিলেন তিনি মাডাং ও উইওয়াক অভিমুখে। সালামাউয়া ও বুনাগুনা-বিজয়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় ও অষ্ট্রেলীয় বীরেরা যখন হল্যাণ্ডিয়ায় অবতরণ করিলেন, তখন শত্রুর নিকট হইতে তাঁহারা পাল্টা জবাব পাইলেন অতি সামান্য।। দশ সহস্র জাপসৈন্য তাহাদের অভুক্ত প্রাতরাশ ছাড়িয়া দ্রুত পলায়ন করিল জঙ্গলের দিকে, আশ্রয়ের চেষ্টায়। গুরুত্বপূর্ণ পারঘাটাগুলি ক্ষণিকের মধ্যে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীর হস্তগত হইল। এক এক করিয়া অধিকৃত হইল তিন তিনটি জাপানী বিমান-ঘাঁটী। জেনারল ম্যাকারথারের সৈন্যবাহিনী নৌসেনাপতি চেষ্টার নিমিটজের নৌবহরের সহিত একত্র সম্মিলিত হইয়া এই প্রথম বড় রকমের যুদ্ধ করিল। ইষ্ট ইণ্ডিজ পতনের পর এই প্রথম অধিকারে আসিল ঐ অঞ্চলে পূর্ব্বতন ওলন্দাজ রাজ্যের ভূভাগখণ্ড। রুদ্ধ হইল দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত (নিউ গিনিতে ৬০০০০, নিউ বৃটেনে ৫০০০০, নিউ আয়ারল্যাণ্ডে ১০০০ ও বুগেনভীলে ২২০০০) এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার জাপ সৈন্যের সরবরাহ-পথ। সুগম হইয়া আসিল ফিলিপাইন পুনরুদ্ধারের প্রয়াস। জাপ-অধিকৃত অঞ্চল সমূহ ৫০০ মাইল নিকটতর হইয়া আসিল।

একটি ভারী জাপ ক্রুজার নিউ গিনির পশ্চিমাংশ রক্ষার জন্য আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে মিত্রপক্ষের বিমানবাহিনীর নিকট হার মানিতে হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরস্থ মিত্র সেনাদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, আমেরিকান সৈন্যেরা বিয়াক দ্বীপে মকমার বিমান-ঘাঁটী দখল করিয়াছে। আমেরিকানরা দুর্গম অঞ্চল দিয়া ঘুরিয়া যাইয়া পিছন হইতে জাপানীদের আক্রমণ করিয়া তাহাদের কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। মকমার বিমান-ঘাঁটার পূর্ব্বে অবস্থিত জাপানী ঘাঁটীগুলি ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে এবং জল ও স্থল হইতে তাহাদের উপর কামান দাগা হইয়াছে।

ওলন্দাজ নিউ গিনির নিকট বিয়াক দ্বীপে জাপানীরা দ্বিতীয় বার সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সম্মিলিত পক্ষের নৌবহর তাহাদিগের সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

শ্রীঅতুল সুর

স্রোত বহে যায়

[উপন্যাস]

১৩

কথায়-কথায় রাত্রি নটা বাজিল।

আলিস শিহরিয়া উঠিল·· কহিল—নটা!

বিন্দুমতী বলিলেন,—হুঁশ ছিল না মা···বড্ড রাত্তির হয়ে গেল···তাই তো!

আলিস বলিল—আমি তাহলে উঠি।

বারান্দা হইতে আলিস নামিল উঠানে। হঠাৎ বিদ্যুতের তীব্র ঝলক···সঙ্গে সঙ্গে কক্কড় শব্দে মেঘের গর্জ্জন!

বিন্দুমতী বলিলেন—ভয়ানক মেঘ করেছে যে···

আলিস বলিল—তা হোক, বৃষ্টি এখনো নামেনি! নামলে কতক্ষণে থামবে, ঠিক নেই! বৃষ্টির ভয়ে আর বসবো না! আমাদের খাওয়ার টাইম সাড়ে নটায়।

বিন্দুমতী বলিলেন—কিন্তু মাথার উপর এই দুর্য্যোগ নিয়ে···

আলিস বলিল—খুব জোরে হেঁটে গেলে বৃষ্টির আগে হয়তো পৌঁছুতে পারবো!

বিন্দুমতী বলিলেন—সুশীল বরং সঙ্গে যাক্ একটা লণ্ঠন নিয়ে! যে-পথ···ভয় করে! ও গেলে আমি তবু কতক নিশ্চিন্ত থাকবো!

বিন্দুমতী চাহিলেন সুশীলের পানে···

সুশীল বলিল—একটা হারিকেন জ্বেলে নি। আমিও আজ মামার বাড়ীতে ফিরবো···আপনাকে পৌঁছে দিতে ঐ তো পথ!

আলিস আপত্তি করিল না।

হারিকেন জ্বালা হইল। তার পর লণ্ঠন হাতে করিয়া সুশীল বলিল আলিসকে—আসুন···খুব জোরে হাঁটবেন বলছেন···দেখি আপনার পায়ের জোর!

মৃদু হাস্যে আলিস বলিল—আপনার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারি, আমার জন্য আপনাকে থেমে-থেমে চলতে হবে না!

—বেশ···

দু'জনে পথে বাহির হইল এবং বেশ জোর পায়েই চলিতে লাগিল।

আশে-পাশে গাছপালা সব নিথর দাঁড়াইয়া আছে··· যেন কি ভয়ানক উপদ্রব ঘটিবে, তাহারি আতঙ্কে এমন থমথমে ভাব! গাছের একটা কচি পাতাও নড়ে না!

দু'-তিনটা বাঁক ঘুরিয়া সুশীল একটা পায়ে-চলা গলি-পথ ধরিল, বলিল—এ পথে চট্ করে যাওয়া যাবে।

আলিস বলিল—এ-পথ আমি জানি। মাইনর স্কুল আছে, তার সামনে দিয়ে গিয়ে এ-গলি আমাদের স্কুলের বড় রাস্তায় মিশেছে।

—হ্যাঁ।

মাইনর স্কুল প্রায় পার হইয়াছে, একটা দমকা জলো হাওয়া···সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির দু'-চারিটা বেশ বড় ফোঁটা গায়ে পড়িল।

সুশীল বলিল—জল নামলো!

আলিস বলিল—আর কতটুকুন্ বা! বলেন যদি ছুটতে রাজী আছি।

সুশীল বলিল,—ছুটবেন?

—অভ্যাস নেই, এমন নয়। কলেজের সেকণ্ড-ইয়ারেও স্পোর্টসের কোয়ার্টার-মাইল রেশে ফার্ষ্ট হয়েছিলুম! এখনো সুবিধা পেলে ছুটোছুটি করি।

—বটে! তাহলে···

চট্ করিয়া আঁচলের প্রান্তটুকু মাথার উপর হইতে বুকের উপর ঘের দিয়া নামাইয়া আনিয়া আলিস গাছ-কোমর বাঁধিয়া ফেলিল; সুশীল কোঁচা গুটাইয়া মালকোঁচা আঁটিল। তার পর কৌতুক-ভরে বলিল,—ওয়ান··· টু···থ্রী···

দু'জনে ছুটিল!

চকিতে বাতাসের বেগ বাড়িল। যে-সব গাছ-পালা এতক্ষণ নিথর নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া ছিল, দুরন্ত ছেলে-দের মতো তারা যেন একেবারে রণ-রঙ্গে মাতিয়া উঠিল! ডালপালা নাড়িয়া প্রচণ্ড কলরব তুলিয়া কখনো নুইয়া, কখনো বাঁকিয়া এমন দৌরাত্ম্য সুরু করিল···যেন তারা সব-কিছু ঝাঁটাইয়া দুনিয়ার বুক খালি করিয়া দিবে! বাতাসও তাদের সঙ্গে প্রমত্ত খেলায় মাতিল। বাতাসের সে-বেগ ঠেলিয়া ছুটিয়া অগ্রসর হওয়া দায়—ঘাড় ধরিয়া যেন সাত হাত পিছনে ঠেলিয়া দেয়!

আকাশের ঘন কালো মেঘ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাষ্প-ভার ছিঁড়িয়া চূর্ণ করিয়া যেন পৃথিবী ভাসাইয়া দিবে, এমন তোড়ে সে বর্ষণ সুরু করিল।

দু'জনে এতক্ষণে সেই শিব-মন্দিরের সামনে আসিয়াছে—কাপড় ভিজিয়া গায়ে আঁটিয়া গিয়াছে···লণ্ঠনের প্রাণ বাঁচানো দায়! ক্লান্তি-অবসাদের ভারে আলিস একেবারে বিপর্য্যস্ত!

মন্দিরের ফটকের গায়ে ছোট একটু আশ্রয়। কবে বুঝি দরোয়ানের আস্তানা ছিল, দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—ভাঙ্গা দেওয়ালে ভর রাখিয়া ছাদটুকু কোনো মতে নিজেকে সামলাইয়া আঁটিয়া রাখিয়াছে।

সুশীল বলিল—এই আশ্রয়টুকুতে একটু দাঁড়ানো যাক্।

আলিস বলিল—কিন্তু এসে পড়েছি। জল কি এখনি ছাড়বে, ভাবেন?

সুশীল বলিল—তা নয়। তবে আপনি হাঁপিয়ে পড়েছেন। দাঁড়িয়ে একটু শুধু দম নেওয়া!

দম লইবার প্রয়োজন ছিল, আলিস তাহা বুঝিল। বলিল,—বেশ, কিন্তু পাঁচ মিনিট।

—তাই হবে।

দু'জনে দাঁড়াইল সেই ভগ্ন স্তূপের মধ্যে। মাথায় ছাদ থাকিলে কি হইবে? চারি দিক খোলা। বাতাসের বেগে জল লইয়া যেন দৈত্যদের পিচকারী-খেলা চলিয়াছে!

আলিস বলিল,—একেই বলে এ্যাডভেঞ্চার!

সুশীল বলিল—যা বলেছেন! আমাদের পক্ষে নর্থ-পোল সাউথ-পোল যাওয়া কল্পনাতীত! কাজেই এই বৃষ্টি আর জলের উপর দিয়ে আমাদের এ্যাডভেঞ্চারের সাধ পূর্ণ করতে হয়!

আলিস শুনিল…জবাব দিল না।

সুশীল চুপ করিয়া রহিল। বাতাসে আর মেঘেতে মিলিয়া কি যুদ্ধ না সুরু করিয়াছে! বাতাস যত বেগে বয়, তার সে-বেগের সহিত পাল্লা দিয়া মেঘ যেন বর্ষণকে আরো নিবিড় করিয়া তোলে! এ-ঝড় এ-বৃষ্টি যেন এ-জন্মে থামিবে না, মনে হয়!

আলিস বলিল,—আচ্ছা, আপনার জীবনে এ্যাডভেঞ্চার ঘটেছে কখনো?

সুশীল বলিল—এ্যাডভেঞ্চার বলতে আপনি কি বোঝেন?

আলিস বলিল—আমি বুঝি এমন ঘটনা…যাতে প্রাণটা রক্ষা পাবে কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

সুশীল বলিল—সে-রকম এ্যাডভেঞ্চার? না। আপনার জীবনে?

আলিস বলিল—একবার ঘটেছিল…

এইটুকু বলিয়া আলিস একটা নিশ্বাস ফেলিল। বাতাসের এত বেগেও আলিসের নিশ্বাসটুকু সুশীলের লক্ষ্য এড়াইল না!

সুশীল বলিল—কি রকম এ্যাডভেঞ্চার, শুনতে পারি?

আলিস বলিল—সে-ঘটনা শোনাবার মতো সময় এটা ঠিক নয়, সুশীল বাবু! আর কখনো যদি সুবিধা হয়, বলবো।

—বলবেন, শুনবো!

তার পর দু'জনে আবার চুপ। দু'জনকে ঘিরিয়া বাতাস আর মেঘের রুদ্র-ভৈরব লীলা!

প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট কাটিল। তার পর আলিস বলিল—এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বোধ হয় সারা রাতই এমনি ভাবে কাটবে! তার চেয়ে…

—পথে নামতে চান?

—উপায় কি! কোনো মতে ঘরে পৌঁছে নিরাপদ হতে পারলে যেন স্বস্তি মেলে! আমাকে পৌঁছে দিয়ে আপনাকেও আবার বাড়ী ফিরতে হবে তো!

—যা বলেছেন! তাহলে আর দেরী নয়। আসুন…

আলিস কোমরে-বাঁধা আঁচল খুলিয়া ভালো করিয়া নিঙড়াইয়া লইল। হারিকেনের আলো নিবিয়া না গেলেও জলের ঝাটে ঝাপ্‌সা…হাত দিয়া ঘষিয়া মাজিয়া সুশীল লণ্ঠনের গায়ের জল মুছিয়া লইল! আলোর রশ্মি প্রাণ পাইয়া জাগিল। সে-আলোয় ভিজা কাপড়ে আলিসের যে-মূর্ত্তি সুশীল চোখে দেখিল… অপরূপ!

শাড়ীর আঁচল নিঙড়াইয়া আলিস কোমরে আবার তাহা জড়াইয়া বাঁধিল।

সুশীল বলিল—একটু দাঁড়ান। মাথা বাঁচাবার উপায় পেয়েছি।

বলিয়া সুশীল স্তূপের অদূরে যে কচু-বন, সেখান হইতে টানিয়া দু'খানা বড় কচু পাতা আনিল; বলিল —মাথায় দিন। জলের চড়বড়ানির হাত থেকে খানিকটা তবু রেহাই মিলবে।

স্তূপের গা বহিয়া তীব্র জলস্রোত। ভাঙ্গা ইট-পাথর-মুড়িগুলা জলে ডুবিয়া গিয়াছে। নামিতে গিয়া আলিস হুঁচট খাইল। পড়িয়া যাইতেছিল, সুশীল তার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। বলিল,—আমার হাত ধরে আসুন। এখানে খানা-খোঁদলের অভাব নেই। পড়ে শেষে হাত-পা ভাঙ্গবেন!

সলজ্জ মৃদু হাস্যে আলিস বলিল—পুরুষ-মানুষে আর মেয়েমানুষে তফাৎ এইখানে! আমরা যতই শক্তি-সামর্থ্যের আস্ফালন করি না কেন, দুর্ব্বল হয়ে রইলুম চিরদিন।

হাসিয়া সুশীল বলিল—ঐ জন্যেই তো আপনাদের 'অবলা' বলি।

আলিসের হাত ধরিয়া সুশীল সতর্ক গতিতে ফটকের বাহিরে আসিল…আলিস আপত্তি করিল না। তার মনে এতটুকু দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই!

ফটকের বাহিরে আলোর মৃদু রশ্মি। সে-রশ্মি যার হাতের বাতি হইতে উৎসারিত, তাকেও দেখা গেল। সে শিবকৃষ্ণ!

দু'জনকে দেখিয়া শিবকৃষ্ণ থ! যেন ভূত দেখিয়াছে, এমনি তার চোখের ভাব!

শিবকৃষ্ণ বলিল,—সুশীল!

সুশীল বলিল,—হ্যাঁ।

—এমন সময় মন্দিরে?

সুশীল বলিল—মন্দিরে নয়। এঁকে পৌঁছে দিতে এসেছি। এতখানি পথ ছুটে এসে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাই ঐ গুমটির নীচে দু'জনে একটু দাঁড়িয়েছিলুম।

—ও!

সুশীল আলিসের হাত ছাড়িয়া দিল, বলিল,—রাস্তা পেয়ে গেছি। ঠোক্কর বা হুঁচোট খাবার ভয় নেই আর।

আলিসের গতি বেশ স্বচ্ছন্দ। সুশীলেরও তাই। দু'জনে চলিয়া গেল।

শিবকৃষ্ণ মন্দিরের ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া রহিল—স্তম্ভিতের মতো···দু'চোখের দৃষ্টিতে রাজ্যের বিস্ময় এবং আরো কত-কি ভরিয়া!

বাড়ী ফিরিয়াই শিবকৃষ্ণ ডাকিল নিস্তারকে।

নিস্তার শুইয়া ছিল; সে-ডাকে উঠিয়া আসিল। বলিল,—ব্যাপার কি? এত রাত্তির?

শিবকৃষ্ণ বলিল—গিয়েছিলুম সেই বিলাসপুরে··· পরেশের ছেলে অখিলের জন্য সেই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করতে। কাল যাতে তারা ছেলে দেখতে আসে, তার ব্যবস্থা করতে। কাকেও বলিস নে, পরেশ চায় ও-বাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিতে। বলে, যেমন করে পারো শিবুদা, ও-বাড়ীর মেয়ের বিয়ে যে-দিন, সেই দিনই যাতে অখিলের বিয়ে দিতে পারি, ব্যবস্থা করে দাও···তোমাকে আমি গুণে একশোখানি টাকা দেবো!

—তা কি হলো?

—কাল তারা ছেলে দেখতে আসবে।

—হুঁ! তা ভিজে কাপড় ছেড়ে ফ্যালো। সে-দিন অমন সর্দ্দি-জ্বর গেল, আর এই জলে ভিজে এলে! কেন, পরেশের বাড়ীতে না হয় আর একটু থাকতে! জল থামলে এলে চলতো না? এখানে কে বিরহিণী তোমার জন্যে কাঁদছে, শুনি?

হাসিয়া শিবকৃষ্ণ বলিল,—এখানে বিরহিণী কাঁদেনি—কিন্তু ভাগ্যে এসেছিলুম! নাহলে ছোকরা-ছুকরীর রাস-লীলা দেখতে পেতুম না রে!

—ছোকরা-ছুকরীর রাস-লীলা! ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নিস্তার বলিল,—আ মর্···নেশা করে এসেছো বুঝি?

—নেশা নয় রে নিস্তার, নেশা নয়। সাদা চোখে এই লণ্ঠনের আলোয় দেখা!

—কাদের কি রাস-লীলা দেখলে? কোথায়···শুনি?

—বলছি। কিন্তু খবর্দ্দার, এ-কথা যেন তিন কাণ না হয়!

—না···না···না!···আমার কি আর সে-বয়স আছে গা যে এ-কথা নিয়ে পাড়ায় বেরুবো ঘোঁট করতে!

ভিজা কাপড় নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে শিবকৃষ্ণ বলিল,—গামছাখানা দে, আর শুক্‌নো কাপড়!

নিস্তার গামছা এবং একখানা ন' হাত ডুরে শাড়ী আনিয়া দিল, বলিল—এই নাইবার শাড়ীখানা পরো··· আর এই নাও গামছা!

গামছা দিয়া গায়ের-মাথার জল মুছিতে মুছিতে শিবকৃষ্ণ বলিল—এই মাত্র যাহা দেখিয়া আসিয়াছে—আলিসের হাত ধরিয়া সুশীল··· বর্ণনায় যতখানি সম্ভব আদি-রস মিশাইয়াই বলিল।

শুনিয়া নিস্তার যেন আকাশ হইতে পড়িল! বলিল,—ও মা, সরোর ছেলে সুশীল! তার এই কীর্ত্তি! তা হবে না! কেন? সোমত্ত বয়স···মা এখনো বিয়ে দিচ্ছে না···ওর আর দোষ কি। তা ইস্কুলের মেয়ে-মাষ্টারণীর সঙ্গে ভাব হলো কি করে? ও থাকে কোথায় কত দূরে, মাষ্টারণী থাকে এখানে! সুশীল তো পাকা দেখায় এখানে এই ক'দিন এসেছে গো।

শিবকৃষ্ণ বলিল—এর জন্য কি আলাদা ব্যবস্থা আছে রে? তোর সঙ্গে আমার যখন প্রথম ভাব হয়, তুই সেই কেত্তনের দলে এসেছিলি চাঁপা-কেত্তনউলির সঙ্গে কর্ত্তাবাবুর শ্রাদ্ধের সময়···

—থামো থামো, তোমায় আর পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে হবে না। তা যাই বলো, এ সত্যি? চোখের ভুল হতে পারে তো?

শিবকৃষ্ণ বলিল—চোখের ভুল! বলিস কি নিস্তার! সাদা চোখে ভুল দেখবো আমি? তার ওপর আমার সঙ্গে সুশীলের কথা হলো। বললে, একে পৌঁছে দিতে এসেছি!

নিস্তার বলিল,—কোথায় গিয়েছিল শুনি যে পৌঁছে দিতে এসেছে!

শিবকৃষ্ণ বলিল,—বুঝিস্ না? অভিসার রে, অভিসার! সেই যে সে-বারে কথক-ঠাকুরের কথায় শুনিস্ নে···সেই বারোয়ারি-তলার কথায়··· কথক বলেছিল, যমুনা-কূলে অভিসার সেরে বর্ষার রাত্রিশেষে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সঙ্গে করে আয়ানের ঘরে পৌঁছে দিতে এলেন! পথে সেই

> বিজুরী-চমক লাগে শঙ্কা মনে জাগে,
> বিবশা রাধার হাত শ্রীকৃষ্ণের হাতে গো।

এখানেও অবিকল তাই। এর এক-বিন্দু যদি মিথ্যে বলে থাকি তো আমার জিভ্ খসে যাবে···এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি।

নিস্তার ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর বলিল,—সুশীল কিন্তু দুধের ছেলে যে গো!

শিবকৃষ্ণ বলিল,—তোর শ্রীকৃষ্ণও ছিল দুধের ছেলে! গোয়ালা-বাড়ীতে দুধ-ছানা ছাড়া আর কিছু খেতো না!

নিস্তার গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—হুঁ! তার পর দড়িতে গামছা খাটাইতে খাটাইতে বলিল,—তা'বলে ঐ খিষ্টানী-টার সঙ্গে! জাত-ধর্ম্ম আর কিছু রইলো-না দেখছি।

হতাশার নিশ্বাস ফেলিয়া শিবকৃষ্ণ বলিল,—নাঃ।

১৪

আলিসকে স্কুল-বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়াই সুশীলের ছুটি মিলিল না। আলিস ছাড়িল না; বলিল,—না, এই জলে এত ভিজেছেন, তার পর আবার ঐ ভিজে জামা-কাপড়ে জল মাখতে মাখতে যাবেন—এতখানি অত্যাচার শরীরে সইবে না, সত্যি!

সুশীল বলিল—আপনি ,তাহলে কি করতে বলেন শুনি?

আলিস বলিল—আমাদের এখানে না থাকলেও ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরুন। তার পর বসে আর কিছু না হয়, বেশ কড়া করে চা তৈরী করে দি, খান্। চা খেলে সর্দ্দি-কাশি উপসর্গগুলোর হাত থেকে নিস্তার পাবার আশা থাকবে!

সহাস্যে সুশীল বলিল—তার পর?

আলিস বলিল—বসে জিরুবেন। বৃষ্টি ধরলে তার পর বাড়ী যাবেন।

—বৃষ্টি যদি সারা রাত চলে…এমনি তোড়ে?

আলিস বলিল—তা যদি হয়, তাহলে ছাতা দিতে পারবো। সে ছাতায় মাথা রক্ষা করে বাড়ী ফিরতে পারবেন!

সুশীল বলিল,—না, ভিজেছি যখন, তখন এমনি ভিজে ভিজে বাড়ী পৌঁছুতে আমার কোনো কষ্ট হবে না! বাড়ীতে গিয়ে গা-মাথা মুছে কড়া চা'ও না হয় খাবো। মামা চা খান না—কিন্তু আমি খাই। কাজেই এখানে আসবার সময় চা আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

আলিস বলিল—কিন্তু এ ভাবে যদি চলে যান, আমার অস্বস্তির সীমা থাকবে না…এর পর আপনার সামনে দাঁড়াতেও আমার লজ্জা করবে।

——কিসের লজ্জা?

—অকৃতজ্ঞতা! কেবলি মনে হবে, আমার জন্যই আপনি এত কষ্ট পেলেন!

সুশীল বলিল—আপনাকে পৌঁছে দিতে না এলেও আমাকে বাড়ী আসতে হতো। আর আসতে গেলে বৃষ্টি আমাকে ছেড়ে সরে থাকতো না!

—তবু আমি যখন উপলক্ষ হয়েছি…

আলিসের কণ্ঠ করুণ। সুশীলের মন একটু টলিল। সুশীল বলিল—বেশ,…আপনার মান্য রাখতে বসছি।

আলিস খুশী হইল। ডাকিল,—বয়…

উর্দ্দি-পরা এক জন ছোকরা-চাকর আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। আলিস তাকে বলিল,—সাহেবকে বাথ-রুমে নিয়ে যাও। আর ধোপার বাড়ী থেকে আজ যে কাপড়-চোপড় কেচে এসেছে, সেগুলো আমার ঘরে ট্রাঙ্কের উপর আছে…তার মধ্যে সরু-পাড় ধুতি আছে…সেই ধুতি বাথ-রুমে দেবে…বুঝলে?

বয় বলিল,—জী…

সুশীলের মনে একটু কৌতূহল…সে-কৌতূহল সুশীল দমন করিতে পারিল না। বলিল,—সরু-পাড় ধুতি আপনি পেলেন কি করে?

আলিস বলিল—আমার ভাই এসেছিল…ছোট ভাই …তার একখানা ধুতি সে এখানে রেখে গেছে… কখনো যদি আসে, আমার শাড়ী তাকে পরতে হবে না, তাই। তার সেই ধুতি ধোপার বাড়ী থেকে কাচিয়ে এনেছি কি না…

—ও! ধুতিখানা তাহলে God-send…আমাকে এখানে এসে এ বৃষ্টিতে আশ্রয় নিতে হবে, তাই ভগবান্ যেন আগে থেকেই…

হাসিয়া আলিস বলিল,—আপনি তামাসা করছেন! কিন্তু আমার এক-এক সময় মনে হয়, আমাদের জীবনে যা ঘটে, তা সব যেন pre-destined! না হলে দেখুন না, এখানকার এ নির্জ্জন-বাস অসহ্য বোধ হচ্ছিল…আপনাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কি-সহজে হয়ে গেল!

—তা বটে! যাক, আপনার সঙ্গে থিওলজির আলো-চনা করতে চাই না। গামছায় গা মুছে ভদ্রলোক সাজি।

—হ্যাঁ। যান…আমি চা তৈরী করে ফেলি।

—আপনাকে অনর্থক এতখানি কষ্ট দিলুম। খুব ভাগ্য-বানকে পথের সহায় করেছিলেন বটে!

আলিস বলিল,—তা কেন? আপনি না এলেও এই জলে ভিজে বাড়ী ফিরে এসে আমি নিজের জন্য এক পেয়ালা চা নিশ্চয় তৈরী করতুম সব-আগে…এতে সুফল পেয়েছি অনেকবার। কিন্তু না, আপনাকে আর জবাব দিতে হবে না…আপনি বাথ-রুমে গিয়ে ঢুকুন।

গা মুছিয়া সুশীল শুষ্ক বসনে আসিয়া বসিল আলিসের ঘরের বারান্দায়। আলিস একখানা মোটা চাদর দিল; বলিল,—খোলা গায়ে থাকা ঠিক নয়, এখানা গায়ে জড়ান!

তার পর চা। বৃষ্টির বেগ একটু কমিয়াছে…বাহিরে 'দাদুরী ডাকিছে সঘনে'।

সুশীল বলিল—দশটা বেজে গেছে। বৃষ্টিও থেমে এলো …আমি উঠি। বয়কে বলুন তো আমার ভিজে জামা-কাপড়গুলো দেবে।

হাসিয়া আলিস বলিল—কেন? সেগুলো এখানে থাকলে খোয়া যাবার ভয় হয় বুঝি?

—না, না, তা কেন? খোয়া গেলেও লোকসান নেই। এখানকার একখানা ধুতি তো আমি নিয়ে যাচ্ছি।

সুশীল দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; আলিস বলিল—ছাতা এনে দি।

—আবার ছাতা!

—নিশ্চয়।…এর পর আপনার মামীমা যদি শোনেন

ভিজতে-ভিজতে আপনি এখান থেকে বাড়ী গেছেন, আমাকে কতখানি বেইমান ভাববেন, বলুন তো ?

—দিন ছাতা।

আলিস ছাতা আনিয়া দিল। সুশীল বলিল,—ধন্যবাদ এবং নমস্কার !

আলিস বলিল—নমস্কার। আজকের বৃষ্টি সত্যি খুব উপভোগ করেছি। ছেলেবেলায় বৃষ্টিতে ভিজে যেমন আনন্দ হতো, তেমনি।

সুশীল বলিল—হ্যাঁ, এবার আরো বেশী আনন্দ উপভোগ করুন···খাওয়া-দাওয়া সেরে শয়নে। পৃথিবী ঠাণ্ডা হলো, আজ ঘুম হবে চমৎকার !

হাসিয়া আলিস বলিল—নিশ্চয়।

ছেলের বেশ দেখিয়া সরস্বতী বলিলেন,—এ কি বেশ রে সুশীল! গায়ে জামা নেই···চাদর জড়িয়েছিস্···মাতৃহীনের মতো !

সমস্ত কাহিনী সুশীল খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া সরস্বতী বলিলেন—মেয়েটি খুব ভালো। আমার সঙ্গেও একটু জানাশুনা হয়েছে। আহা, একা থাকে! ওর মনের মতন সঙ্গী পায় না যে দু'টো কথা বলবে !

সুশীল বলিল—ওঁর বাবা ছিলেন এক জন নামজাদা টীচার। মারা গেছেন। তাঁর কাছেই এন্ট্রান্স এগজামিনেশনে আমার একটা পেপার পড়েছিল, মা। আর সে পেপারে আমাকে তিনি অসম্ভব-রকম বেশী নম্বর দিয়েছিলেন।···সে-কথাও হলো ওঁর সঙ্গে।

সরস্বতী বলিলেন—মাষ্টারণী বললে যা বোঝায়, তার কিছু নেই। মেয়েটিকে আমার এত ভালো লেগেছে ! তোর মামীমার কাছে হামেশা যায়।

—হ্যাঁ।

—অনেক রাত হয়ে গেছে। খেয়ে নে! তোর মামাবাবু তোর জন্য অনেকক্ষণ বসেছিল, বললে, সুশীল এলে তার সঙ্গে বসে খাবো। তার পর এই খানিক-আগে আমিই তাঁকে জোর করে খাওয়ালুম। বললুম, এ জলে তার মামীমা তাকে বোধ হয় ছাড়লো না !

আহারাদি সারিয়া শয়ন।

পরের দিন সকালে কিন্তু সকলের আগে ঘুম ভাঙ্গিল শিবকৃষ্ণর। ঘুম ভাঙ্গিবা মাত্র তামাক খাওয়া নয়, আহ্নিক-পূজা নয়—দাঁতন মুখে দিয়া সোজা সে আসিয়া উপস্থিত হইল পরেশ গাঙ্গুলির গৃহে।

খোলা দেউড়ি। চাকর-দাসীরা সকালের কাজ-কর্ম্মে লাগিয়াছে। শিবকৃষ্ণ বলিল—বাবু কখন উঠবেন রে ?

চাকর বলিল—বেলা আটটায়।

শিবকৃষ্ণর ধৈর্য্য সহে না !···সে বলিল,—আজো বেলা আটটায় ! ছেলে দেখতে আসবে মেয়ের বাপ···যা, যা, গিন্নীমাকে খপর দিগে যা !···গিন্নীমা উঠেছেন তো ?

—উঠেছেন।

—যা, কথাটা তাঁকে মনে করিয়ে দিগে যা। দু'পয়সা পাবি রে ব্যাটা।

পয়সার প্রত্যাশা আছে ! বটে ! চাকর গেল অন্দরে।

শিবকৃষ্ণ বসিয়া রহিল বহির্ব্বাটীর রোয়াকে। দাঁতনটাকে কষিয়া এমন করিয়া চিবাইতে লাগিল যে তার কোথাও উদ্ভিদত্বের কোনো চিহ্ন রহিল না !

বেলা আটটার পর পরেশ গাঙ্গুলি নীচে নামিলেন, শিবকৃষ্ণকে দেখিয়া বলিলেন—কি হে শিবকেষ্ট, কাল রাত্রে বাড়ী যাওনি না কি ?

—আজ্ঞে না, গিয়েছিলুম বৈ কি ! সকাল হতেই এলুম। তার মানে, যদি কিছু কাজ-কর্ম্ম থাকে ! ওঁরা আসছেন···

—আসছেন তো চার জন ! মেয়ের বাপ, মেয়ের মেশো, মেয়ের খুড়ো আর পুরুত !···তার উপর বিলাসপুরের চৌধুরীদের নিষ্ঠা এমন—যে যে-বাড়ীতে মেয়ে দেয়, সেখানকার একটি ছোলা অবধি দাঁতে কাটে না !

আরো দু'-চারিটা কথার পর যে-কথা বলিবার জন্য শিবকৃষ্ণর কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয় নাই···গলা খুশ্ খুশ্ করিতেছে···

হঠাৎ জিভ্ ফশকাইয়া শিবকৃষ্ণর কণ্ঠে সেই বাণী ফুটিল। শিবকৃষ্ণ বলিল,—একটা কথা ক'দিন বল্‌বো-বল্‌বো মনে করছি···

—কি কথা ?

—আজ্ঞে, মুখে উচ্চারণ করতে গায়ে কাঁটা দেয় ! ···আমরা এখনো বেঁচে আছি, আর এত-বড় অনাচার চোখের সামনে !

পরেশ গাঙ্গুলি ধমক দিলেন, বলিলেন,—কে অনাচার করেছে, কি অনাচার করেছে, দু'কথায় যদি বলতে পারো তো বলো, নাহলে থাক্।

ধমক খাইয়া শিবকৃষ্ণ নিমেষের জন্য এতটুকু ! তার পর চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল,—বড় বাড়ীর সুশীল পাদরী স্কুলের মাষ্টারণী আছে না···ঐ কেতা করে শাড়ী পরে··· রঙ্গীন ছাতা মাথায় দিয়ে গাঁখানাকে যেন চষে বেড়ায় ! ···তার সঙ্গে সুশীল-বাবাজীর যে খুব দহরম-মহরম চলেছে।

পরেশ গাঙ্গুলি কোনো কথা বলিলেন না···স্থির অবিচল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন শিবকৃষ্ণর পানে।

শিবকৃষ্ণ বলিল—আমি নিত্য দেখচি। আমার মন্দিরের পাশেই তো ইস্কুল ! দু'জনে হাত-ধরাধরি করে বেড়ায় ! হাসি-গল্পে ফোয়ারা ছোটে যেন ! এই কালই রাত্রে অত ঝড়-জল···তাতেও কামাই নেই ! আমি গিয়েছি এখান থেকে···মন্দিরের সামনে যেতেই দেখি, দু'জনকে !

ভিজে দু'জনে ঢোল! আমায় দেখে লজ্জা হবে···তা নয়! বেহারার মতো হা-হা করে হেসে দু'জনে গেল ইস্কুল-বাড়ীর দিকে!

পরেশ গাঙ্গুলি এবারও কোনো কথা বলিলেন না! কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বোধ হয় নিজের ছেলের কথা! কলিকাতায় গিয়া খানিকটা বাবু হইয়াছে! গায়ে গন্ধ না মাখিলে চলে না! দু'-চারিটা বার্ডশাইও যে না টানে, এমন নয়। তবে···

শিবকৃষ্ণ বলিল—এদের কাছে অখিল বাবাজী হীরের টুক্‌রো! বিয়ে দিচ্ছেন, খুব ভালো করছেন। যে বয়সের যা! সুশীল বাবাজীর বয়স···তা মন্দ হলো না! ও-বয়সে আপনাদের তিন-চারটে ছেলেমেয়ে হয়েছে।··· সে-দিন ওর মাকে বললুম, ছেলে-ডাগর হয়েছে, বিয়ে দিচ্ছ না কেন গো? বলো তো সম্বন্ধ করি—ভালো-ভালো কত পাত্রী হাতে আছে। তা নাক সিঁটকে সরো আমাকে বললে কি না, ছেলের বয়স হয়েছে—যে-দিন ও দরকার মনে করবে, বিয়ে করবে···নিজের পছন্দমতো; মা হয়েছি বলে যা-তা একটা মেয়ে ধরে তো ওর গলায় ঝুলিয়ে দিতে পারি না!

পরেশ গাঙ্গুলি মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন,—হুঁ! যেতে দাও ওদের কথা। ওরা লেখা-পড়া শিখে পাশ করেছে—ওরা আমাদের মানে? না, আমাদের কথা গ্রাহ্য করে? তাছাড়া ও-বাড়ীর ছেলে বিলেত যেতে পারে যদি তো কি না করবে, বলো?

শিবকৃষ্ণ বলিল—তা হোক! এ যে খৃষ্টান্‌নীর সঙ্গে মাখামাখি! সামনে এই বিয়ের ব্যাপার—এ নিয়ে যদি কথা ওঠে?

পরেশ গাঙ্গুলি বলিলেন—তুমি যদি কথা না তোলো তাহলে আর উঠবে কি করে?

—না, না···আমি কি এ-কথা বলতে পারি? আকাশে থুতু ফেললে সে-থুতু নিজের গায়ে পড়বে যে! আমি নই···তবে আমি যেমন দেখছি, তেমনি গাঁয়ের আর পাঁচ জনেও দেখছে তো! তাই না আমি ভয়ে সিঁটিয়ে আছি একেবারে।

পরেশ গাঙ্গুলি বলিলেন—ও কথা রাখো। আমি উঠি। গিন্নীর সঙ্গে কথা আছে। ছেলেকে বলে রাখবে বাড়ী থেকে যেন কোথাও না বেরিয়ে যায়।

সব কথা শুনিয়া গৃহিণী মানকুমারী মুখ বাঁকাইলেন; বলিলেন,—বিলাসপুরের মেয়ে! তবে যে শুনেছিলুম সে-মেয়ে কালো···মোটা···তার ওপর বাপ হাড়-কিপটে।

পরেশ গাঙ্গুলি বলিলেন,—কালো মোটা হয়েছে, তাতে কি! বাপের ঐ এক মেয়ে! বিলাসপুরের জয়রাম রায় কিপটে বলেই তো ও-মেয়ে আরো লুফে নেবার সামগ্রী! অনেক টাকা জমিয়েছে জয়রাম। মারা গেলে ওর সে-টাকা আসবে তোমার ঘরে ঐ মেয়ের দৌলতে, তা বোঝো?

মানকুমারী তবু বুঝিলেন না। মুখখানা ভারী করিয়া বলিলেন—তা হোক! টাকায় আমার লোভ নেই। বড়-বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কি রঙ, বলো দিকিনি। চেহারার কথা উঠলে দেশের লোক ও-বাড়ীর ছেলেমেয়ের কি ব্যাখ্যানাই না করে! আমার চিরদিনের সাধ, অখিলের বৌ করবো বেশ ফর্সা সুন্দরী দেখে! মেয়ের রঙ হবে, যাকে বলে, দুধে-আলতা মেশানো!

—দুধে-আলতা রঙ নিয়ে ধুয়ে খাবে! জমিদারী, নগদ টাকা—এ-সবের কাছে রঙ! না···না···না! ও-সব গেরস্থালী ঢঙ্ আমার ঘরে পোষাবে না। আমাদের বোনেদী বংশ! চিরদিন টাকা আর জমিজমা খুঁজে বেড়িয়েছি! বৌ এসেছে বিষয়-আশয় নিয়ে। রঙ আর চেহারা হলো গরীব-গেরস্থ ঘরের জন্যে। আমাদের ঘরে চেহারা চিপিচাপা কালোকিষ্টে হলেও দুঃখ নেই। টাকার গদি মোদ্দা চাই। ছেলেকে তুমি বলে রেখো, আজ যেন বাড়ীতে থাকে। তারা আসবে চারটে-পাঁচটার সময়। সে সময় কোথাও না বেরিয়ে যায়।

মনের দুঃখ মনে পূরিয়া মানকুমারী বলিলেন,—বলছো, বলবো!

মায়ের মুখের কথা শুনিয়া অখিল ক্ষেপিয়া উঠিল! কহিল—ও-বাড়ীর মেয়ে! তার মানে, রক্ষাকালীর বাচ্ছা! তার উপর গণ্ডমুখ্যু!

মা বলিলেন—বাপের ঐ এক মেয়ে রে! আর অগাধ সম্পত্তি।

—তা হোক! অত সম্পত্তির লোভ আমার নেই! আমি ও-মেয়ে বিয়ে করবো না।

মা বুঝাইলেন—জানিস্ তো ওঁর মেজাজ। কথা দেছেন, তারা দেখতে আসবে। তুই যদি বেঁকে বসিস্, তাহলে উনি হয়তো···

—ত্যেজ্য-পুত্তুর করবেন···ও-বাড়ীর বিজয়দা'র মতো! মস্ত বাহাদুরীর কাজ ত্যেজ্যপুত্তুর করা! আমি ভয় করি না। আমার পষ্ট কথা, যা-তা মেয়ে আমি বিয়ে করবো না।

মা বলিলেন,—অখিল···

অখিল বলিল,—এর আবার অখিল কি! যে-মেয়েকে আমি জানি না, চিনি না, তাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না!···

মানকুমারী প্রমাদ গণিলেন। এদিকে ছেলে, ওদিকে স্বামী! সারা জীবন ধরিয়া দু'জনকে কি ভাবে সাম-লাইয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছেন! মানকুমারী বলিলেন—দেখা দিলেই তো বিয়ে হচ্ছে না! আমার কথা শোন্

অখিল, তারা দেখতে আসছে, চুপ করে দেখা দে, বাবা। তার পর বিয়ের সম্বন্ধে পরে ভেবে দেখা যাবে। এখন থেকে যদি বেঁকে থাকিস্, তাহলে কি ঝড়-ঝাপটা না সইতে হবে, জানি না! মায়ের কথা শোন্ বাবা, লক্ষ্মীটি!

অখিল বলিল—শুনতে পারি যদি আমার একটা কথা তুমি শোনো!

—কি কথা?

অখিল বলিল—আমাকে শ'খানেক টাকা দিতে হবে। ভারী দরকার। ঐ টাকার জন্যই আরো আমি কলকাতায় যেতে পাচ্ছি না!

—অত টাকা কোথায় আমি এখনি পাই বল্ দিকিনি?

—খুব পাবে! তুমি এত-বড় ঘরের গিন্নী…তোমার আবার টাকার ভাবনা! টাকা যদি দাও…তাহলে লক্ষ্মী-ছেলের মতো দেখা দেবো…তাদের কথার জবাবে নাম বলবো, লেখাপড়ার কথা বলবো…কোনো রকম বেচাল আমার পাবে না। বাবাও খুব খুশী হবে!

মানকুমারী বলিলেন—একশো টাকা পারবো না! গোটা পঞ্চাশেক হলে যদি চলে, তাহলে বরং…

—একশো টাকার এক পয়সা কম হলে হবে না। টাকা পেলে আজ তোমাদের এগজিবিশনে পাত্র সেজে দেখা দেবো; তার পর কাল সকালের ট্রেণে কলকাতা-যাত্রা… ব্যস্! কি বলো…রাজী?

মানকুমারী বলিলেন,—আমার গলায় পা দিয়ে টাকা আদায় করতে তোর দুঃখ হয় না রে এতটুকু?

হাসিয়া অখিল বলিল—সন্তানের সুখেই মায়ের সুখ…তুমি নিজেই তো বলো! কিন্তু ও বাজে কথা নয়…আসল কথা, আমি টাকা চাই। দেবে একশো টাকা? হার্ড ক্যাশ্? এবং এখনি?

—আয়। তার আগে তুই ছাখ্ উনি কোথায়, কি করছেন!…তোর ভারী অন্যায়! এখনো স্নান করিনি… এই বাসি কাপড়…আমাকে দিয়ে তুই সিন্দুক খোলাবি!

—তুমি কেন খুলবে? আমি তো পুরুষ-মানুষ! ব্রাহ্মণ …বাসি কাপড়ে পুরুষ-মানুষ অশুদ্ধ হয় না! তুমি আমার হাতে চাবি দেবে, তোমার সামনে সিন্দুক খুলে টুক্ করে আমি বার করে নেবো একশো টাকা! বিশ্বাস করো একশোর বেশী আর একটি পয়সা আমি ছোঁবো না—এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি।

কথাটা বলিয়া অখিল মায়ের পায়ে হাত দিল।

মানকুমারী বলিলেন—তা হবে না। সিন্দুকের চাবি আমি তোমার হাতে দেবো না! তুমি এইখানে থাকবে, আমি পুজোর তসর পরে সিন্দুক খুলে তোমাকে টাকা এনে দেবো।…রাজী আছো?

—তাই করো মা গো, জননী আমার!

অপ্রসন্ন মুখে মানকুমারী ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। অখিল গিয়া খোলা জানলার ধারে দাঁড়াইল। মুখে বিজয়ের হাসি! পকেট হইতে টিন বাহির করিয়া খানিকটা বার্ডসাই হাতে লইল; তার পর পাৎলা কাগজে তাহা ভরিয়া পাকাইয়া মুখে দিয়া দেশলাই ধরাইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অশ্রু-অর্ঘ্য

ব্যারণ জয়তিলক

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ভারতস্থ সিংহল সরকারের প্রতিনিধি সার ব্যারণ জয়তিলক দিল্লী হইতে বিমানযোগে কলম্বো যাইবার পথে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল স্বয়ং এই বিমানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃতদেহ কলম্বোয় লইয়া যাওয়া হইয়াছে!

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

৮ই জ্যৈষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ৭১ বৎসর বয়সে বারাণসী-ধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁহাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-সমাজে সুবিদিত করিয়াছিল। বারাণসী হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে স্মৃতির অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বহু দিন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি, লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাঁহার অবদান স্মরণীয়। তিনি বহু দিন মাসিক বসুমতী পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষ এক জন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত হারাইল।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

১১শে জ্যৈষ্ঠ ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ কবি ও শিক্ষাব্রতী সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁহার লক্ষ্ণৌস্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।

অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন ছাড়া বাঙ্গালার সাহিত্য-জগতে কবি হিসাবেও তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা এক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী হারাইল।

মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ময়মনসিংহের মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী তাঁহার কলিকাতাস্থিত ভবনে ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। বিগত কয়েক সপ্তাহ কাল তিনি অসুখে ভুগিতেছিলেন। তিনি জমিদার-সভার সহিত সম্পর্কিত ছিলেন এবং হিন্দু মহাসভার উদ্যোগী সদস্য ও অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি তাঁহার বিধবা, তিন পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ঢাকায় পাইকারী জরিমানা

ঢাকার হাঙ্গামা যে সাম্প্রদায়িক, তাহা সরকারী সংবাদে বলা হয় নাই। শেষে এক দিন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া ফেলেন—হাঙ্গামা সাম্প্রদায়িক। খুলনার হাঙ্গামা আমরা কৃষি ব্যাপার ঘটিত বলিয়াই শুনিয়াছিলাম। শেষে সরকারের এক সংবাদে দেখা গেল, উহাও সাম্প্রদায়িক। ক্ষতি কিরূপ? শুনা গেল, মাত্র দশ হাজার টাকা। সুতরাং হাঙ্গামা নিশ্চয়ই প্রবল নহে। তবে এই অজুহাতে উদয়নগরে হিন্দু-সম্মিলন অধিবেশনের প্রাক্কালে নিষিদ্ধ হইল কেন? ইহাতে কি সাধারণের মনে হইতে পারে না যে, হাঙ্গামা নিশ্চয়ই প্রবল। ক্ষতির পরিমাণও নিশ্চয়ই অনেক বেশী! কোন্‌টা ঠিক?

ঢাকায় হাঙ্গামার নিদান নির্ণয়ের ক্ষমতা খাজা সার নাজিমুদ্দীনের নাই, হয় ত' তাহা তাঁহার অভিপ্রেতও নহে। কারণ, তিনি যে পথ ধরিয়াছেন তাহাতে যে সমস্যার সমাধান হইবে, এইরূপ বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। তিনি বলিয়াছেন, এখন তাঁহার সচিবসঙ্ঘ কঠোর ভাবে পাইকারী জরিমানা আদায়ে মনোযোগী হইবেন।

পাইকারী জরিমানার নানা দোষ। প্রথম—তাহা প্রতিহিংসা-দ্যোতক এবং সরকারের পক্ষে প্রতিহিংসা-পরবশ হওয়া প্রশংসার বিষয় নহে। দ্বিতীয়—তাহাতে অপরাধীর সঙ্গে যে নিরপরাধ শাস্তি ভোগ করে তাহারা চিরদিনের জন্য বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে। তাহার ফল ভয়াবহ। বিশেষ বর্ত্তমান অবস্থায় যখন লোক সকল রকম অভাবের কশাঘাতে জর্জ্জরিত।

ইহা সমস্যা-সমাধান বা শান্তি স্থাপনের পথ নহে। শান্তি স্থায়ী করিতে হইলে প্রথমে সাম্প্রদায়িকতা ও স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়। খাজা সার নাজিমুদ্দীন তাহা করিবেন কি?

—

লজ্জার বিষয়

নিখিলবঙ্গ মহিলা-আত্মরক্ষা-সমিতির সম্পাদকের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—"দুর্ভিক্ষের পর ব্যাপক রোগের ফলে জনগণের যে দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী জাতির সামাজিক জীবননাশের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। বিশেষ আমাদের যে সকল দুর্ভাগ্য ভগিনী সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থাভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশেষ ভাবে কষ্টে পড়িয়াছেন। দুর্গতির জন্য বাধ্য হইয়া কেহ কেহ পাপ-পথের পথিক হইয়াছেন এবং নানা স্থানে—বিশেষ সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সমূহে—যৌনব্যাধির ব্যাপ্তি ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে।"

সচিবরা স্বীকার করিয়াছেন—"লোক দুর্গত নারীর দুর্গতির সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে পাপে লিপ্ত করিতেছে—ব্যবসা করিতেছে।" দুর্গতদের জন্য আশ্রয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনও স্বীকার করিয়াছেন। ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহারা বলিয়াছেন,—"তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেটকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন—সেই নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ হইতেছে কি না বলিতে পারেন না।" তাহার পর কি হইয়াছে?

ফরিদপুরে অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন—"মুসলমানদিগের জন্য অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা হইতেছে—হিন্দুদিগের জন্য পরে তাহা হইবে।" সুবিচার বটে!

বিবৃতি ইংরেজীতে লিখিত। আমরা বাঙ্গালার গভর্ণর মিষ্টার কেসীকে—যদি তিনি এখনও ইহা না পড়িয়া থাকেন—তবে ইহা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

যে সচিবসঙ্ঘের অবসান সার জন হার্ব্বার্ট ঘটাইয়াছিলেন, সেই সচিবসঙ্ঘ সমুদ্রকূলস্থ স্থান সমূহে দুর্গতদিগকে সাহায্য দিয়া রক্ষা করিতেই ব্যস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুনর্গঠনের ব্যাপক পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ সেই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করেন নাই, অথচ তাঁহারা বর্ষাধিক কাল সময় পাইয়াছেন। ফলে সমুদ্রকূলস্থ স্থান সমূহের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে।

ইহার পরও কি মিষ্টার কেসী এই সচিবসঙ্ঘকে সমর্থনযোগ্য বলিবেন, যাহাদের কার্য্য সভ্যসমাজে উল্লেখ করিতে লজ্জাবোধ হয়। এই লজ্জাজনক অবস্থার দায়িত্ব তিনি কাহার বা কাহাদিগের উপর আরোপ করিবেন?

—

ক্ষতি হইবে কাহার?

মসলেম লীগ পঞ্জাবের প্রধান-সচিবের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। তিনি অশিষ্ট ভাবে সে তলব প্রত্যাখ্যান না করিলেও কৈফিয়ৎ দাখিল করেন নাই। মালিক খিজির হায়াৎ খাঁনের অপরাধ কিন্তু শৌকৎ হায়াৎ খানের পদচ্যুতির পূর্ব্বে কেহ শুনে নাই। সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে; শৌকৎ হায়াৎ খাঁনের অপরাধ কেবল মসলেম লীগের প্রতি প্রীতি নহে—অন্য অভিযোগ। সে অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত হইয়াছে এবং গভর্ণর তাঁহাকে সচিবসঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়াইতে পারে। অথচ মসলেম লীগ যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে শৌকৎ হায়াৎ খাঁনের প্রকৃত অপরাধ ঢাকিবার চেষ্টাই হইতেছে।

বাঙ্গালায় নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবার সময় মিষ্টার ফজলুল হক্ মসলেম লীগ হইতে বহিষ্কৃত হন। নির্ব্বাচনে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী খাজা সার নাজিমুদ্দীন ভোটে (মুসলমানদিগের) পরাজিত হন। মিষ্টার হক্ প্রধান-সচিব হন। তখন তাঁহার শরণাগত হইয়া সার নাজিমুদ্দীন অন্য কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত ও সচিবসঙ্ঘে গৃহীত হন। মিষ্টার হক নির্ব্বাচনের সময় লীগ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রধান-সচিব হইলে লীগের "উজ্জ্বল আলোক"রূপে গৃহীত ও প্রচারিত হন। ইহাতেই বুঝা যায়, লীগের সদস্যগিরি কোন সচিবের সম্ভ্রম বর্দ্ধিত করিতে পারে না; কিন্তু প্রধান-সচিবকে সদস্যরূপে পাইলে লীগের সম্ভ্রম বর্দ্ধিত হয়।

পঞ্জাবের প্রধান-সচিব মিষ্টার জিন্নাকে জানাইয়াছেন, তিনি পঞ্জাব সম্বন্ধে জিন্না-সিকান্দর সর্ত্তেরই অনুগমন করিতেছেন। কিন্তু মিষ্টার জিন্না তাহা চাহেন না। তিনি প্যাক্ট ছাড়িয়া একটি ফ্যাক্ট ধরিয়াছেন—পঞ্জাবে সচিবসঙ্ঘের নূতন নামকরণ করিতে হইবে, মসলেম লীগ সম্মিলিত সচিবসঙ্ঘ।

প্রধান-সচিব তাহাতে নারাজ। সার ছটুরাম জাঠ সম্প্রদায়ের এবং সর্দ্দার বলদেও সিং শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-রূপে সচিবসঙ্ঘে

যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন কেন? সার মনোহরলাল অর্থনীতিবিদ্‌রূপে যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা ক্ষুণ্ণ করা জিন্না কোম্পানীর ষড়যন্ত্রেরও সাধ্যাতীত।

মিষ্টার জিন্নার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত—মসলেম লীগ ত্যাগ করায় পঞ্জাবের প্রধান-সচিব ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন? না—তাঁহাকে ত্যাগ করায় মসলেম লীগ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে?

সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যোদ্দীপক বটে, কিন্তু ইহাতে দেশের প্রভূত পরিমাণ ক্ষতি হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে মসলেম লীগকে এইরূপ রসিকতা করিতে দেওয়া সরকারের পক্ষে সঙ্গত হইবে কি?

ভারতীয় অচল অবস্থা

'ইকনমিষ্ট' পত্রে বলা হইয়াছে, "কোন রাজনীতিক কারণের জন্য যে মিঃ গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই, তাহা এখন সুস্পষ্টরূপে জানা গিয়াছে। ভারতবর্ষে লর্ড ওয়াভেল পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও কেন্দ্রী পরিষদের কার্য্যকাল বর্দ্ধিত করিয়া রাজনীতিক অচল অবস্থা বজায় রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। মিষ্টার আমেরী এবং বড়লাট উভয়েই একটি লক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এবং সম্ভবতঃ ভারত-সচিবের যুক্তিতে পরস্পর-বিরোধী উক্তি আছে। কারণ, তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অচল অবস্থার অবসানের জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রথমে কিছু করা উচিত। অথচ তাঁহারা কারারুদ্ধ থাকার জন্য তাঁহাদিগের অনুচরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া নীতি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিতে বা অন্যান্য দলের মুখপাত্রগণের সহিত আলোচনা করিতে সমর্থ নহেন।"

মিঃ আমেরীর পক্ষে এইরূপ উক্তিই স্বাভাবিক। তাঁহার উক্তির মধ্যে যুক্তি খোঁজা পণ্ডশ্রম মাত্র।

৩রা মে ক্যাণ্টারবারীর আর্কবিশপের নেতৃত্বে 'বৃটিশ কাউন্সিল অব চার্চ্চেস'এর মনোনীত এক প্রতিনিধি দল ভারত-সচিব মিঃ আমেরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পেশ করেন। "ভারত ও বৃটেনের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ ও অবিশ্বাস বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়া এবং ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার দরুণ বৃটিশ কাউন্সিল অব চার্চ্চেস অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়াছে। ভারতের বড়লাট সম্প্রতি কেন্দ্রী আইন-সভায় বক্তৃতা উপলক্ষে ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিবার প্রতিশ্রুতির যে পুনরুল্লেখ করিয়াছেন, কাউন্সিল তাহা সাদরে অনুমোদন করিতেছে। ভারতীয় নেতাদের কেহ কেহ অদ্যাবধি আটক থাকার দরুণ এবং সমস্ত রকমের অসুবিধা সত্ত্বেও বিভিন্ন দলের ভারতীয় নেতাদিগের সহিত নূতন ভাবে আলোচনা করিবার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট যাহাতে করেন, তজ্জন্য কাউন্সিল দাবী জানাইতেছে; যেহেতু, কাউন্সিল বিশ্বাস করে যে, আপোষ রফার কার্য্যের উন্নতি সাধনকল্পে এইরূপ অবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়।"

উত্তরে মিষ্টার আমেরী তাঁহাকে মন খুলিয়া মতের আদান-প্রদানের সুযোগ দানের জন্য কাউন্সিলের প্রশংসা করেন। চমৎকার উত্তর!

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ কমন্স সভায় মিঃ শিনওয়েল মিঃ আমেরীকে জিজ্ঞাসা করেন—"তিনি কি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, মিঃ গান্ধীর মুক্তিতে ভারতে মনোভাবের পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে এবং মিঃ গান্ধী নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক। এই অবস্থায় ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য নূতন করিয়া চেষ্টা করা কি সম্ভব নহে?"

উত্তরে মিঃ আমেরী বলেন—"অবস্থা যদি ঐরূপই হয়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, বড়লাট উহার সুযোগ গ্রহণ করিবেন।"

কোথাও স্পষ্ট উত্তর নাই। সবই যেন ভাসা ভাসা, ঝাপ্‌সা। বোধ হয় বিলাতী ফগ!

৫ই জ্যৈষ্ঠ 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' লিখিতেছেন—"একটি সর্ব্বাত্মক যুদ্ধের চাপের মধ্যে সদয় ভাবের কোনও স্থান নাই; কিন্তু মিঃ গান্ধী মুক্তি পাইয়াছেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল, ইহা স্মরণ করিয়া আমরা ক্ষণেকের জন্যও আনন্দিত হইতে পারি। তাঁহার দেহে যদি শক্তি ফিরিয়া আসে, তবে পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে এই চরম বিপ্লবী, এই চরম শান্তিবাদী, পশুবলের এই মহা শত্রু কি করিবেন? এই মহাসমর পরিচালনা করা বৃথা হইবে, যদি এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র কোনও প্রকারের অখণ্ড বিশ্বশাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না করিতে পারি এবং আমাদিগের অধিকাংশের বিশ্বাস যে, তাহা করিতে হইলে অপরাজেয় পশুবলের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। এইরূপ ক্ষেত্রে আমাদিগের হয়ত মনে হইতে পারে যে, মিষ্টার গান্ধী আমাদিগের কোনও কাজে আসিবেন না, কিন্তু ইহা সত্য নহে। আমাদিগের পশুবল অখণ্ড বিশ্বশাসন-তন্ত্রের, আমাদিগের আন্তর্জ্জাতিক অভিজাতিক বিধিবিধানের উদ্দেশ্য শুধু শক্তি উৎপাদন করা নহে, কিন্তু মানব জাতির সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করা। স্বাধীনতা ব্যতীত যে সুখ-শান্তি সম্ভব হইতে পারে না, ইহা বৃটিশ ঐতিহ্যের মূল কথা। মিঃ গান্ধী আর যাহা হউন বা না হউন, তিনি যে মানব-স্বাধীনতার বীর যোদ্ধা ও বন্ধু, ইহা সুনিশ্চিত। তাহা হইলে এখনও আশা করা যাইতে পারে যে, তিনি আমাদিগের মিত্র হইতে পারেন এবং তাঁহার মিত্রতা লাভ বৃটেনের স্বার্থের অনুকূল। কারণ এই যে যুদ্ধ, ইহাতে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে; ভারতবর্ষে মিঃ গান্ধী এক অত্যধিক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রতীক।" মিঃ আমেরী মহাত্মা গান্ধীকে বৃটেনের মিত্ররূপে পাইবার জন্য একটি অঙ্গুলী পর্য্যন্ত নাড়েন নাই। তিনি নিশ্চল। (অচল?) তাঁহার অবস্থা "কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো, যত কিলোতে পারিস্ কিলো।"

এই কি মনুষ্যত্ব?

পূর্ব্ব পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ জাতীয় দৈনিক পত্র লিখিয়াছেন, "বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষে বহু লোক মারা গিয়াছে, এ কথা খুবই সত্য। বাঙ্গালায় এই দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয় গত হক-মন্ত্রিত্বের আমল হইতে। এবং যে সমস্ত কারণে হক-মন্ত্রিত্বের অবসান হয়, দেশের অন্নাভাব তাহার মধ্যে একটি। ফসলের পূরা মরশুমেও ধান-চালের দর ক্রম-বৃদ্ধির দিকে যাইতে থাকে? অসময়ে তাহার মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে বৈচিত্র কি আছে? তবে ব্যাপার এই যে, ফসলের মরশুমের পরে স্যর নাজেমকে এই দুরবস্থার মধ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হয়। মোটের উপর এই ইতিহাস-বিশ্রুত দুরবস্থার যে নায়ক প্রধানতই হক মন্ত্রিসভা নানা ভাবে তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।" সত্য অস্বীকার করেন নাই, কেবল প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের স্কন্ধে দোষভার ন্যস্ত করিয়া বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের ত্রুটি নিশ্চয়ই ছিল। যখন

গভর্ণর সার জন হার্বার্ট নৌকাপসরণ, ধান্যাপসরণ প্রভৃতি নানা ত্রুটি-পূর্ণ কার্য্যের দ্বারা এই মানব-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের জন্য প্রধানতঃ দায়ী হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহাদের পদত্যাগ করা উচিত ছিল। আজ তাঁহাদের দায়িত্ব বিচার করিয়া কোন ফল নাই।

কিন্তু বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ খাদ্যদ্রব্যের অভাব জানিয়াও তাঁহারা কি লোককে ও কেন্দ্রী সরকারকে মিথ্যার দ্বারা বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই?

৮ই মে (১৯৪৩ খৃঃ) মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলেন, "উদ্বৃত্ত নাই বটে এবং সঞ্চয় ও অতিলাভ চেষ্টায় কিছু কিছু অসুবিধাও আছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় বাঙ্গালার লোকের খাদ্যশস্য যথেষ্টই আছে।"

চার দিন পরে তিনিই পত্রে সাংবাদিকদিগকে লিখিয়াছিলেন, "অভাব আছে কিন্তু সে কথা বলিয়া কাজ নাই।" ব্যবস্থা পরিষদেও তিনি বলিয়াছেন, "অভাবের বিষয় তিনি মুখে বলিতে চাহেন না, পাছে লোক ভয় পায়।"

উল্লিখিত পত্রে তিনি লোককে কম খাইতে উপদেশ দিতে বলিয়াছিলেন। অথচ লর্ড ওয়াভেলও স্বীকার করিয়াছেন, "সাধারণ ভারতবাসী পর্য্যাপ্ত আহারে বঞ্চিত। বিশেষ প্রয়োজনেও তাহাদের আহার কমান সম্ভব নয়।" ইহাকেই বোধ হয় ডাইনীর হাতে পো সমর্পণ বলে।

১৭ই মে (১৯৪৩ খৃঃ) খাজা সার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছেন—"বাঙ্গালায় চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে তিনি আশা করেন, সচিবসঙ্ঘ সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন। কেবল কিছু সময়ের প্রয়োজন।"

ঐ ১৭ই মে শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী বলেন—"চাউলের বর্দ্ধিত মূল্য ২ বা ৩ সপ্তাহের অধিক কাল স্থায়ী হইবে না।"

এই মিথ্যা ভাঁওতায় ভুলিয়াই বোধ হয় স্যার রাদারফোর্ড সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"শীঘ্রই চাউলের মূল্য দশ টাকা মণ হইয়া যাইবে।"

এ মিথ্যার উদ্দেশ্য কি? এ যে সচিব-পদের মোহে মনুষ্যত্ব বর্জ্জন!

এই সচিবসঙ্ঘের সম্বন্ধেই লর্ড ওয়াভেল গত ২০শে ডিসেম্বর বলিয়াছেন—"বাঙ্গালাকেই বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আগামী ৬ মাসে তাহার পরীক্ষা হইবে।"

পাঁচ মাস তো কাটিয়া গেল। প্রভূত আমন ফসল ফলিলেও চাউলের মূল্য গত পূর্ব্ব-বৎসরের মূল্যের তুলনায় অধিক রহিয়াছে। অবশিষ্ট এক মাসে সমস্যার কি সমাধান হইবে, দেখা যাউক।

যখন খাজা সার নাজিমুদ্দীন ও তাঁহার সহসচিবগণ প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তখন যদি তাঁহারা মিথ্যার আশ্রয় না লইতেন, তবে যে কেন্দ্রী সরকার তখনই আবশ্যক ব্যবস্থা করিতেন এবং তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিত, তাহা অনায়াসে মনে করা যায়। তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করেন নাই, পরন্তু (১) বাহির হইতে যে খাদ্যদ্রব্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহাও তাঁহাদিগের কার্য্যকালে অতল গহ্বরে অন্তর্হিত হইয়াছে এবং (২) তাঁহারা পঞ্জাব হইতে নিরন্ন বাঙ্গালার জন্য ক্রীত গমে সরকারের তরফে লাভ করিতেও ঘৃণা বোধ করেন নাই। সেই লাভের টাকায় সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিত, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

আজ প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে যত চেষ্টাই কেন বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ করুন না, মানুষের এবং ভগবানের কাছে তাঁহারা কত অপরাধী, বিবেক কি তাহা বলিয়া দিতেছে না? অবশ্য যদি বিবেক থাকে। আছে কি না তাহা তাঁহারাই জানেন। সে পরিচয় লাভ আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই।

সচিবদলে ভাঙ্গন

বাঙ্গালা সচিবসঙ্ঘের অন্যতম পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র কুমার ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী উভয়েই প্রধান-সচিব খাজা সার নাজিমুদ্দীনের নিকট পদত্যাগ-পত্র পাঠাইয়াছেন। উভয়েই লিখিয়াছেন, মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের বিরুদ্ধে দেশের ভিতর—বিশেষ করিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ইঁহারা যে পত্রে হিন্দু দেববিগ্রহের জন্য ভোগ ও নৈবেদ্যের চাউল দানে আপত্তি ও বিলম্বের কথা উল্লেখ করেন নাই, তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

ব্যবস্থা পরিষদের তপশীলভুক্ত জাতির সদস্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস, ধনঞ্জয় রায় ও শ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মণ পূর্ব্বে সরকার পক্ষে ছিলেন। তাঁহারাও শিক্ষা-বিলে গভর্ণমেণ্ট নীতির প্রতিবাদে দল ত্যাগ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘে যদি সত্য সত্যই ভাঙ্গন ধরিয়া থাকে তবে তাহা যে সঙ্গত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। যে সচিবসঙ্ঘ শিক্ষাক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতার পাপ প্রবিষ্ট করাইতে ব্যাকুল, যে সচিবসঙ্ঘ বাঙ্গালায় অন্নাভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর সময়েও মিথ্যা কথা বলিতে দ্বিধা করেন নাই, খাদ্যদ্রব্যের অভাব নাই বলিয়া সকলকে প্রতারিত করিয়াছেন, যে সচিবসঙ্ঘ পঞ্জাবের প্রেরিত খাদ্যদ্রব্যের উপর সরকারী মুনাফা অর্জ্জন করাইয়াছেন সে সচিবসঙ্ঘ যে আপনার অপরাধে আপনি নষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা টলষ্টয়ের অমর বাণী 'গড সীজ দি ট্রুথ বাট ওয়েটস্' কখনও মিথ্যা হইবে না।

মংপুতে রবীন্দ্র স্মৃতিপূজা

মংপুতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কয়েক বার মৈত্রেয়ী দেবীর বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মংপু গমনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে সেই বাটীতে ২৮শে মে একটি তাম্রলিপি বসান হইয়াছে। উক্ত দিবসে স্থানীয় বাঙ্গালী এবং নেপালী অধিবাসীরা তাঁহার স্মৃতিপূজা করিয়াছিলেন।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল

বর্ত্তমান বৎসরের আই-এ এবং আই-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা প্রথম ১০টি স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আই এ—

(১) স্বদেশরঞ্জন দত্তগুপ্ত (রিপন কলেজ, কলিঃ), (২) প্রহলাদচন্দ্র জানা (বঙ্গবাসী কলেজ, কলিঃ), (৩) অমলচন্দ্র চ্যাটার্জি (বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিঃ) (৪) জগৎচন্দ্র শর্ম্মা (কটন কলেজ, গৌহাটী), (৫) অমিতাভ ঘোষ (কারমাইকেল কলেজ, রংপুর), (৬) রাজলক্ষ্মী দেবী

(আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ), (৭) অজিতকুমার বিশ্বাস (কৃষ্ণনগর কলেজ), (৮) রেবা দাসগুপ্তা (আশুতোষ কলেজ, কলিঃ), (৯) বিশ্বনাথ লাহিড়ী (কারমাইকেল কলেজ, রংপুর), (১০) মীরা দেব (মুরারিচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট)।

আই, এস-সি—

(১) শান্তিব্রত ঘোষ (কারমাইকেল কলেজ, রংপুর), (২) দীনেশচন্দ্র মিশ্র (বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিঃ), (৩) সুনীল রায় চৌধুরী (বঙ্গবাসী কলেজ, কলিঃ), (৪) অশেষপ্রসাদ মিত্র (বঙ্গবাসী কলেজ, কলিঃ), (৫) ধনঞ্জয় নসীপুরী (রিপন কলেজ, কলিঃ), (৬) শিবপ্রসাদ সমাদ্দার (কারমাইকেল কলেজ, রংপুর), (৭) অজিত-কুমার দাসগুপ্ত (প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিঃ), (৮) রণেশচন্দ্র চক্রবর্তী (প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিঃ), (৯) মনীষা বসু (স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, কলিঃ), (১০) রামদাস বৈরাগী (ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, বাঁকুড়া)।

সার উষানাথ সেন

আমরা জানিয়া প্রীত হইলাম, কেন্দ্রী সরকার মিষ্টার কার্চ্চনারের স্থানে এসোসিয়েটের প্রেস অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর ও ম্যানেজিং এডিটর সার উষানাথ সেনকে ভারত সরকারের চীফ প্রেস এডভাইসার নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি ১লা জুন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পঞ্জাবে নূতন সচিব

খান বাহাদুর নবাব সার মহম্মদ জামাল খান লোহারী. ও মেজর নবাব আসিক হোসেনকে পঞ্জাবে নূতন সচিব নিযুক্ত করা হইয়াছে। এইবার মোট মন্ত্রিসংখ্যা হইল ৭ জন—৪ জন মুসলমান, ২ জন হিন্দু ও এক জন শিখ। এই সচিবসঙ্ঘ স্থায়ী হইলেই ভাল।

অভাব

কলিকাতায় মৎস্যের অভাব। মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৈফিয়ৎ-স্বরূপ কৃষি বিভাগের মন্ত্রী বলিয়াছেন (১) বরফের অভাব (২) যানের অভাব। ডিরেক্টার অফ ইনডাষ্ট্রীজ অধিক বরফের উৎপন্ন কিসে হয় সে চেষ্টা করিতেছেন এবং রেলের কর্ত্তাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যান-বাহনের অভাব দূর করা হইবে। মৎস্য রক্ষা করিয়া তাহা বর্দ্ধিত করিবার যে সকল উপায় বহু দিন পূর্ব্বেই সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের রিপোর্টে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সে সকল আজও অবলম্বিত হয় নাই!

মৎস্যের অবস্থা ঐরূপ। আর দুগ্ধের? কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার বলিতেছেন—কলিকাতায় যে দুগ্ধের প্রয়োজন তাহার শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র পাওয়া যাইতেছে। শিশু ও রোগীদিগের অসুবিধার অন্ত নাই। কেন্দ্রী সরকার স্বীকার করিয়াছেন—গত ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মাংসের জন্য ২ লক্ষ ৭৬ হাজার গবাদি পশু হত্যা করা হইয়াছে।

কলিকাতায় তো সপ্তাহে ২ দিন মাংস ব্যবহার বন্ধ করিতে হইয়াছে। যখন অবাধে ঐ পশুহত্যা চলিয়াছিল তখন কি সরকার তাহাতে দুগ্ধ-সমস্যার সম্ভব যে অনিবার্য্য তাহা মনে করিতে পারেন নাই?

বাঙ্গালায় যখন মেদিনীপুর অঞ্চলে কৃষির ও দুগ্ধের জন্য গরুর অভাব অনুভূত হয়, তখন যে বাঙ্গালার বাহির হইতে গবাদি পশু আমদানী করিবার কথা শুনা গিয়াছিল, তাহার কি হইয়াছে?

আর চাউল? আমরা কলিকাতায় ভারত সরকারের কৃপায় যে চাউল পাইতেছি, তাহাও ভাল মন্দ বাছিয়া লইবার যোগ্যতা বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘের যে নাই, তাহার প্রমাণ আমরা প্রতিদিন পাইতেছি। কলিকাতার বাহিরে ঢাকায় চাউলের মূল্য যে নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষাও অধিক তাহা দিল্লীতে গভর্ণর মিষ্টার কেসীও বলিয়া আসিয়াছেন। অথচ এবার বাঙ্গালায় যেরূপ ধান ফলিয়াছে, সেরূপ বহু দিন ফলে নাই। সে ধান গেল কোথায়? তাহাতেও কি চাউলের মূল্য হ্রাস হইতে পারে না?

পদে পদে অভাব, পদে পদে বিশৃঙ্খলা!

যে সচিবসঙ্ঘ এইরূপ অযোগ্যতার পরিচয় পদে পদে দিতেছেন, তাঁহারা আর কত দিন বিধাতার অভিশাপরূপে বাঙ্গালায় বজায় থাকিবেন?

কাঁথি কলেজে সরকারী সাহায্য

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কাঁথি কলেজে সরকারী সাহায্য প্রদান প্রসঙ্গে শিক্ষাবিভাগের সচিব বলিয়াছেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের সুপারিশ ব্যতীত কলেজে সরকারী সাহায্য পুনরায় প্রদান করা হইবে না। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ কলেজে আবার সাহায্যদানের বিরোধী। জিজ্ঞাসা করা হয়—এ কথা কি সত্য যে, এই ম্যাজিষ্ট্রেটই তাঁহার মনোনীত ২ জন শিক্ষককে রাখিতে বলিলে কলেজের কার্য্যকরী সমিতি বহু মতে তাহাতে অসম্মত হন। সচিব বলেন, তিনি তাহা জানেন না।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করেন—বঙ্গীয় এডুকেশন কোডে কি এমন নির্দ্দেশ আছে যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের সুপারিশ ব্যতীত কোন বেসরকারী কলেজে সরকারী সাহায্য প্রদান করা হইবে না? উত্তরে সচিব বলেন, সেরূপ কোন নির্দ্দেশ থাকুক আর নাই থাকুক, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সুপারিশ ব্যতীত সরকার সাহায্য দিবেন না।

ইহার পর আর কি বলিবার থাকিতে পারে?

তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! যে ম্যাজি-ষ্ট্রেটের উপদেশ শিক্ষাসচিব গুরুবাক্য বলিয়া অবিচারিত চিত্তে পালন করিতেছেন—তিনি কে?

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি

কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষিত হইয়াছে যে, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১ই জুন হইতে এক বৎসরের জন্য বাঙ্গালার গভর্ণর হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদিগের হস্ত হইতে উহার পরি-চালনভার সহস্তে গ্রহণ করিলেন। শত্রুর আক্রমণের সময় যথোপযুক্ত ভাবে মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্ম পরিচালনা করাই ইহার কারণ। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী হামিদ হাসান নোমানী সরকারের পক্ষে যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিবেন। শত্রুর আক্রমণ যদি হাওড়াকে ভোগ করিতে হয়, তবে কি কলিকাতাই অক্ষত থাকিবে? হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষমতা হরণ না করিয়া কি শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা যাইত না?

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন্ধ্যা-দীপের শিখা

[শিল্পী—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোষ

স্মৃতি-পূজা

আমরা দু'জনে সহযাত্রী।

কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁচেছি। কর্ম্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।

আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন—কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে।

বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন, তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়!

উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জ্জনের ইচ্ছা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণ ভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখন সম্ভব হোত না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবীশক্তি। আচার্য্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ্। আচার্য্য নিজের জয়কীর্ত্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়—প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।

প্রথম বয়সে তাঁর প্রতিভা বিদ্যাবিতানে মুকুলিত হয়েছিল, আজ তাঁর সেই প্রতিভার প্রফুল্লতা নানা দল বিকাশ করে দেশের হৃদয়ের মধ্যে উদ্ঘারিত হোলো। সেই লোককান্ত প্রতিভা আজ অর্ঘ্যরূপে ভারতের বেদীমূলে নিবেদিত। ভারতবর্ষ তাকে গ্রহণ করেছেন, সে তাঁর কণ্ঠমালার ভূষণরূপে নিত্য হয়ে রইল। ভারতের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে আজ আমাদের সাধুবাদ মিলিত হয়ে তাঁর মাহাত্ম্য উদ্‌ঘোষণ করুক। *

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* ১৩৩১ সালে আচার্য্যদেবের ৭০ বৎসর বয়সে জয়ন্তী উৎসবে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

সংসারে সকল মানুষই চায় সুখে থাকতে এবং আরামে থাকতে; সবাই চায় ধন-জন, মান-যশ, ভোগ-বিলাস, আমোদ-প্রমোদ এবং পদ প্রতিপত্তি। এর মধ্যে আবার সকল দেশে ও সকল কালে এমন দু'-চার জন লোক জন্মান্, যাঁরা সবার পথের পথিক নন। এঁরা সুখ ছেড়ে দুঃখকে করেন বরণ, আরামের অলসতাকে উপেক্ষা ক'রে কর্ম্মের কঠোরতাকে করেন আবাহন, স্বার্থকে বর্জ্জন করে আপনাকে পরার্থে করেন উৎসর্জ্জন; আপন কর্ত্তব্য হ'তে এঁদের বিচলিত করতে পারে না খ্যাতি-প্রতিপত্তির মোহ এবং ভোগ-সম্ভোগের প্রলোভন। দুঃখ, দৈন্য, শোক-তাপ জরা-ব্যাধি ও অবিচার-অত্যাচার-নিপীড়িত মানবসমাজে এঁরা আনেন শান্তির ও সান্ত্বনার বাণী; অজ্ঞানের অন্ধকারে এঁরা জ্বালেন জ্ঞানের আলো; সকল দেশে ও সকল কালে ছড়িয়ে যান এঁরা কল্যাণের বীজ। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন এঁদেরই এক জন।

জ্ঞানে এবং কর্ম্মে প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন খুব বড়। বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল দেশ-বিদেশে। বহু মৌলিক গবেষণা এবং হিন্দুরসায়নের ইতিহাস রচনা হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ দান। প্রেসিডেন্সী কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে তিনি ছিলেন সর্ব্বোচ্চ পদে আসীন। অধ্যাপনায় তাঁর যশ ছিল অতুলনীয়। তিনি যে জ্ঞানী ও কর্ম্মী রাসায়নিক-দলের গঠন ও নিখিল ভারত রাসায়নিক সমিতির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তার ফলে আজ ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞান-সমাজে ভারতবাসীর সম্মান গেছে বেড়ে। বিজ্ঞানকে সাধারণতঃ বলা হয় প্রয়োগ-প্রধান শাস্ত্র; কারণ, শুধু জ্ঞানে নয়, ঐ জ্ঞানের ব্যবহার বা প্রয়োগেই হচ্ছে বিজ্ঞানের বিশেষত্ব। প্রয়োগমাত্রই সৎ এবং অসৎ উভয় আকার ধারণ করতে পারে। বিজ্ঞানের প্রয়োগ বা ব্যবহার ঘটনায় ঘটেছে উভয়তঃ; বরং বলা যেতে পারে, সৎপ্রয়োগ অপেক্ষা অধুনা বিজ্ঞানের অসৎপ্রয়োগই হচ্ছে বেশী রকমে। নতুবা আজ এই জগদ্ব্যাপী মহাসমরে বিপুল আয়োজনে, নির্ব্বিচারে, ভাল-মন্দ ও ছোট-বড় নির্ব্বিশেষে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অভিনয় এবং আসুরিক বর্ব্বরতার আস্ফালন আমাদের দেখতে হোত না। তথাপি মানতে হবে প্রয়োগ-বিহীন জ্ঞানের দ্বারা মানব-জাতির আত্মশক্তি কখনো প্রবুদ্ধ বা প্রস্ফুটিত হ'তে পারত না; মানুষ নানা দিকে তার উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে অক্ষম হোত। আমাদের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ ঘটেছে জ্ঞানের এ অসৎ প্রয়োগে। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে শুধু ধ্যান-ধারণায় আবদ্ধ করে রাখলে, মানুষের বহুবিধ কল্যাণের পথ যেত রুদ্ধ হয়ে। বিজ্ঞানীরা তাই জ্ঞানকে পরিণত করেন কর্ম্মে। এ না হ'লে বিজ্ঞানের অসাধারণ শক্তি বা প্রতিপত্তি যেত লোপ হয়ে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাই তাঁর জ্ঞানকে বিনিময় করেছিলেন ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন কর্ম্মে। তার ফলে গড়ে উঠেছে "বেঙ্গল কেমিকেল ও ফার্ম্মাসিউটিকেল" নামে তাঁর সুবিখ্যাত রাসায়নিক কারখানা। দেশের কল্যাণ ও গৌরবের তরফ হতে আচার্য্য রায়ের এ কর্ম্মানুষ্ঠানের তুলনা নাই। এ ছাড়া, বাঙ্গালার বহুবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন উদ্যোগী, নেতা বা উৎসাহদাতা।

জ্ঞানে ও কর্ম্মে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শুধু বড় ছিলেন না; বড় হতেও ছিলেন আরো কিছু বেশি। তিনি ছিলেন মহৎ। সে মহত্ত্ব ছিল তাঁর আত্মত্যাগে বা আত্মদানে। তিনি নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে ও অকৃপণ ভাবে দান করেছিলেন দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য। এতেই ছিল তাঁর মহত্ত্বের মহামন্ত্র।

গুরু-হিসাবে তিনি মহৎ ছিলেন; কারণ, আপন প্রাণ দিয়ে তিনি শিষ্যদের প্রাণে জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রেরণা সঞ্চার করেছেন। শিষ্যেরা ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ সচিব ও সখা। শিষ্যদের কৃতিত্বে তাঁর ছিল অপরিসীম আনন্দ। চিরকুমার, স্বল্পাহারী এ বিজ্ঞান-তপস্বীর বেশভূষাও ছিল নিতান্ত সহজ ও সরল। খদ্দরই ছিল তাঁর একমাত্র অঙ্গভূষণ। আচারে ব্যবহারে ও চালচলনে তিনি ছিলেন বেহদ্দ বাঙ্গালী, কিন্তু সময়নিষ্ঠা ও কাজের পদ্ধতিতে যে কোন শিক্ষিত ইংরেজকেও তিনি হার মানাতে পারতেন। এ কারণেই দুর্ব্বল শরীর এবং ভগ্ন-স্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি এত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপন কর্ম্ম-কুশলতার প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাঁর মধ্যে প্রাচ্য ঋষিগুরুর উচ্চাদর্শ ও পাশ্চাত্ত্যের ঊর্দ্ধগামী বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বিশেষত্ব গিয়েছিল গঙ্গাযমুনার ধারার মত মিলে।

দানেও তিনি আপন মহত্ত্ব গেছেন প্রকাশ করে। কত গরীব ছাত্র দীন দুঃখী যে তাঁর অর্থ-সাহায্যে জীবন লাভ করেছে, কত স্কুল-কলেজ কত শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে তাঁর দানে গড়ে উঠেছে, তার হিসাব নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দান করেছেন অকাতরে। খাদির প্রচার, চরকায় সুতোকাটা এবং দুঃস্থা বিধবা ও অসহায় শিশুদের জন্যও তিনি দান করে গেছেন প্রচুর। এ সব দানের জন্য তাঁর ঐশ্বর্য্য ছিল প্রাচুর্য্যে নয়, তা ছিল অভাবের অল্পতায়। তিনি অপরকে সুখী করেছেন আপনাকে বঞ্চিত করে। তাই বলেছি তাঁর দান শুধু বড় নয়, তাঁর দান মহৎ।

অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পর্দ্দা ও পণপ্রথা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি যে সব ব্যবস্থা ও কুসংস্কার আমাদের সমাজদেহকে বিকৃত ও জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করেছে, তার নিরাকরণ-কল্পে তিনি সারাজীবন অক্লান্ত ভাবে প্রবল আন্দোলন করে গেছেন। এ সব বিষয়ে তাঁর বহু বাণী ও লেখা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত
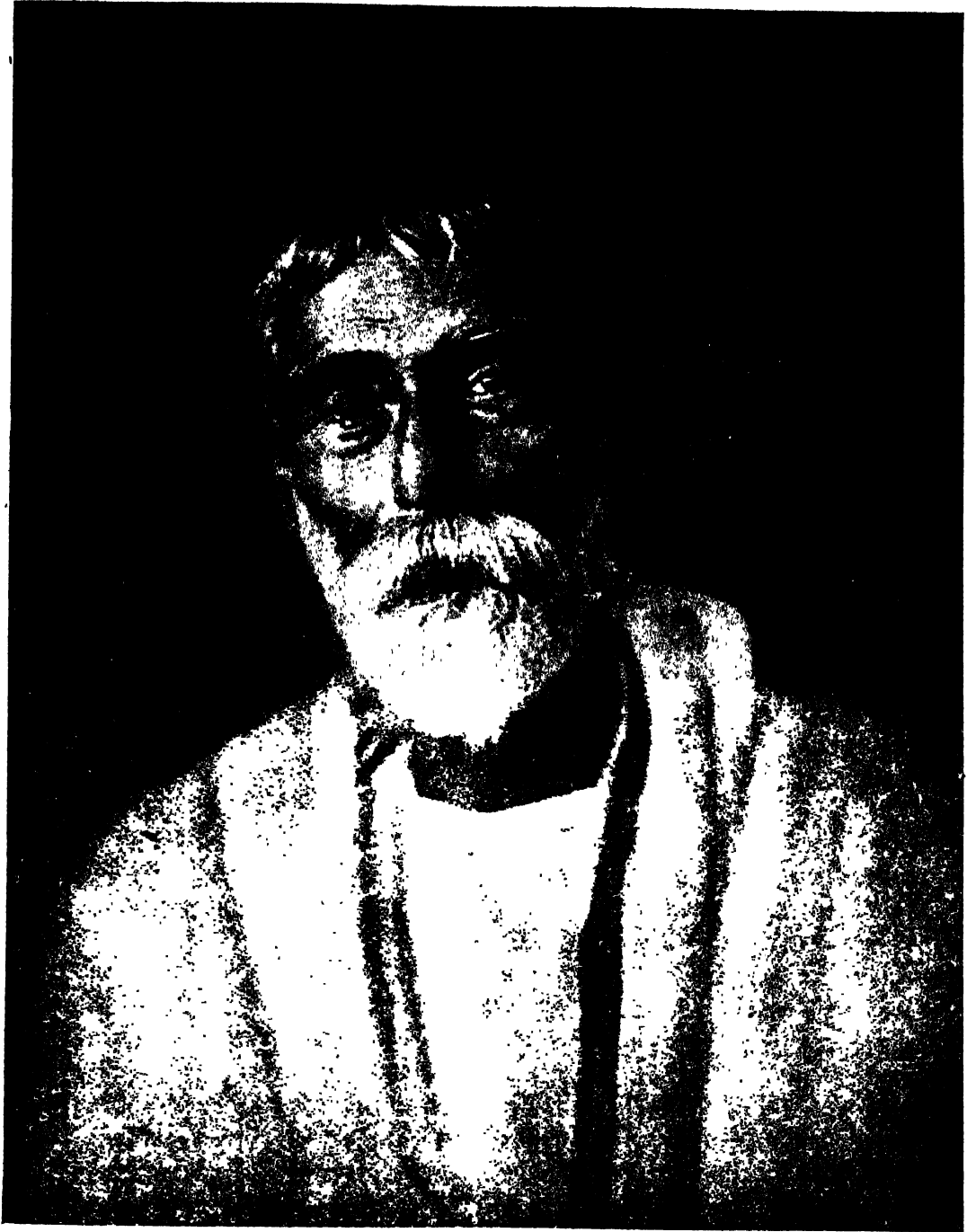
জন্ম—২রা আগষ্ট, ১৮৬১] **আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র** [মৃত্যু—১৬ই জুন, ১৯৪৪

শ্রীযুত চারু গুহের সৌজন্যে

ডক্টর পি, সি, রায়ের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ এক জন বিরাট বৈজ্ঞানিক এবং ততোধিক বিরাট দানী এবং ত্যাগীকে হারাইল। তিনি প্রকৃত দেশভক্ত এবং দরিদ্রবন্ধু ছিলেন। তাঁর সহজ অনাড়ম্বর জীবন সকলের—বিশেষ করিয়া ছাত্রদের আদর্শ। —মহাত্মা গান্ধী

হয়েছে। স্বদেশের কল্যাণ, উন্নতি ও মুক্তি ছিল তাঁর সকল কর্ম্মের ও সকল অনুষ্ঠানের প্রেরণা। তাঁর গভীর স্বদেশানুরাগ ছিল অনাড়ম্বর। রাজপথে শোভাযাত্রার পুরোভাগে নেতারূপে কিম্বা রাজনৈতিক জনসভার জয়-ধ্বনিতে তা কখনো প্রকাশ পায়নি; গঠনমূলক নীরবকর্ম্মে সে প্রসাদ লাভ করেছে! দেশসেবায় এতেই তাঁর মহত্ত্ব।

সাহিত্য ও ইতিহাসে ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ; ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় তাঁর লেখনী পরিচালিত হয়েছে অপ্রতিহত ভাবে। তাঁর "আত্মজীবনীতে" ও অন্যান্য প্রবন্ধাদিতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থায় ছিলেন তিনি বিশেষ উদ্যোগী। ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও বোধশক্তি জাগ্রত এবং প্রবুদ্ধ করতে হ'লে স্কুল-কলেজের অধ্যাপনায় ও পাঠ্যপুস্তকে মাতৃ-ভাষাকেই যে শিক্ষার বাহন করা আবশ্যক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিজাতীয় ভাষা আয়ত্ত করবার প্রয়াসে এবং বিনা বোধে জানবার চেষ্টায় এত শক্তি ও সময়ের অপব্যয় ঘটে যে, তাতে শিক্ষা হয় ছেলেদের নিকট নীরস, নির্জ্জীব ও একটি প্রকাণ্ড বিভীষিকার ব্যাপার। তাদের সকল উৎসাহ, সকল উদ্যম এবং সকল আনন্দ এতে যায় চলে। আমাদের মত বহু বয়োবৃদ্ধেরও ছাত্রজীবনের পরীক্ষার কথা মনে পড়লে এখনও আতঙ্ক হয়।

দরিদ্রের ও আর্ত্তের সেবা ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের প্রধান ধর্ম্ম। দুর্ভিক্ষে, বন্যায় বা অন্যবিধ সঙ্কটে যেখানেই দেশে কোন দুর্দ্দশা ঘটেছে, প্রফুল্লচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর করুণার দান নিয়ে। খুলনার দুর্ভিক্ষে ও উত্তরবঙ্গের বন্যার সময় তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ হ'তে সাহায্য সংগ্রহ করেছেন আর্ত্তদের জন্য। তাঁর উপর ছিল দেশবাসীর অগাধ বিশ্বাস। এরূপ মহত্ত্বের আদর্শ বিরল।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তাই সাধারণের সম্পত্তি। তিনি বড় হয়েও বড়লোকের মত আপনাকে বড়ত্বের বেড়া দিয়ে সাধারণের গণ্ডী হ'তে আড়াল করে রাখতে পারেননি। যখনি কোন ডাক্ এসেছে কোন শিক্ষা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান হ'তে, জনসাধারণের কোন সভাসমিতি বা অনুষ্ঠান হ'তে, অথবা কোন নিভৃত পল্লীর কোন সম্প্রদায় হ'তে, তিনি কদাচ তা অস্বীকার করতে পারেননি। বিজ্ঞান কলেজের পরীক্ষাগার ও তাঁর বাসকক্ষ ছিল ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সবার কাছেই অবারিত দ্বার। এতেও তাঁর বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব। তাঁর ক্ষীণ ও রুগ্ন দেহের মধ্যে যে মানুষটি বাসা নিয়েছিল, তা প্রকাণ্ড হলেও শিশুর মত ছিল সহজ, সরল ও উদার। কারো কাছে কিছুই না নিয়ে সারাজীবন তিনি শুধু দিয়েই গেছেন। দেহের ও মনের সকল সম্বল তিনি নিঃশেষে ব্যয় করেছেন স্বদেশের সেবার জন্য। এ সেবার পুণ্যস্মৃতি বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরকাল জাগ্রত থাকবে।

এই ক্ষুৎপীড়িত, ব্যাধিজর্জ্জরিত, বিরোধবহুল, পর-পদানত দেশে প্রফুল্লচন্দ্রের স্মৃতির উপাসনায় আমাদের কতটুকু অধিকার আছে, এ সম্বন্ধে গুরুতর প্রশ্ন উঠতে পারে। তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে যে নিদারুণ মর্ম্মান্তিক দৃশ্য বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ও কলিকাতা মহানগরীর পথে-ঘাটে দেখা দিয়েছিল, যখন লক্ষ লক্ষ অন্ন-বস্ত্রহীন নরনারী ও শিশুদের করুণ আর্ত্তনাদে বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস দূষিত হয়ে উঠেছিল, আমাদের ঘরের দুয়ারে যখন দু'মুঠো অন্নের জন্য বহু মানব-সন্তান দীর্ঘশ্বাসে দরিদ্রের ভগবানকে ডেকে দেহত্যাগ করেছিল, যার ফলে প্রায় ১৫ লক্ষেরও উপর বাঙ্গালার লোকক্ষয় ঘটেছে এবং এখনো ম্যালেরিয়া কলেরা বসন্ত ইত্যাদি নানাবিধ রোগ ও মহামারীতে বাঙ্গালার পল্লী শ্মশান হয়ে উঠছে, এর প্রতি-কারের জন্য প্রফুল্লচন্দ্রের দেশবাসী আমরা কি করেছি? রোগ-শয্যা হতে জরাজীর্ণ দেহে তিনি যদি আমাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করতেন আমরা কি তার উত্তর দিতে পারতাম? ঐ ঘোর দুর্দ্দিনেও আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেছি অবিচলিত ভাবে লঘু আমোদ-প্রমোদের সহিত; সিনেমা ও থিয়েটার-হলে, বিশ্রান্তিগৃহে ও ফুটবলের মাঠে চুরুটমুখে ভিড় জমিয়েছি যথানিয়মে; রেডিওতে গান শুনেছি; প্রীতি-সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করে ভোজ-উৎসবে যোগ দিয়েছি; কত নূতন কারখানা, শিল্প ও যৌথ-কারবারের প্রতিষ্ঠা করেছি; সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের কংগ্রেস কনফারেন্সে বক্তৃতা দিয়ে বা প্রবন্ধ পাঠ করে করতালি পেয়েছি; রাজদরবারে খেতাব লাভ করেছি; ব্যবস্থাপক সভায় তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা ও কোলাহল করেছি; হিন্দু-মুসলমানে মারামারি করেছি; ঘটা করে পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়েছি; এমন কি, হত-ভাগাদের জন্য লঙ্গরখানা খুলেছি; বুভুক্ষিতদের পাতে খিচুড়ীমণ্ডের পরিবেশন করে বাহবা পেয়েছি; যুদ্ধশিল্পের বহুগুণিত লভ্যাংশ হ'তে সাহায্য-ভাণ্ডারে দান করেছি; জমিজমাশূন্য কলিকাতাবাসীর সভায় বেশি করে ফসল জন্মাবার জন্য তার-স্বরে উপদেশ দিয়েছি; রাজপথে শোভাযাত্রা করে বন্দে মাতরম্ চীৎকারও করেছি; কমিউনিষ্টের দল বেঁধে সভাসমিতি করে বক্তৃতা দিয়েছি; এবং যুদ্ধের পর ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য খসড়া প্রস্তুতের বিবিধ কমিটী গঠন করেছি। আমাদের এ উত্তরে ও আমাদের এ কৃতিত্বে প্রফুল্লচন্দ্রের মহান্ আত্মা কি তৃপ্তিলাভ করবেন? আমাদের বিবেকবুদ্ধি যদি এর উত্তরে বলে 'না', তবে সসঙ্কোচে ও লজ্জায় মৌন হয়ে তাঁর নির্দ্ধারিত পথে চলাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে কি? তবেই তাঁর স্মৃতি-পূজায় আমাদের অধিকার জন্মিতে পারে।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে আপনারা যত জানতেন অন্য অল্প লোকেই তাঁকে ততটা জানত, এজন্য তাঁর সম্বন্ধে নূতন বেশি কিছু বলবার নেই। কোনও লোক যখন নানা কারণে বিখ্যাত হন তখন অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সব চেয়ে বড় গুণটি অন্যান্য গুণের আড়ালে পড়ে যায়। আমার মনে হয়, প্রফুল্লচন্দ্রের বেলায় তাই হয়েছে। তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী, বিখ্যাত শিল্পপ্রতিষ্ঠাতা—এই কথাই লোকে বেশি বলে। এ দেশে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী আর শিল্পকর্ত্তা আছেন, সুতরাং এই দুই দলে তাঁকে ফেললে তাঁর গৌরব বাড়ে না। তাঁর মহত্ত্বের সব চেয়ে বড় পরিচয়—তিনি নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষী। এই গুণে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর বৈজ্ঞানিক আর সাহিত্যিক বিদ্যা, শিল্পপ্রসারের জন্য তাঁর আগ্রহ—এ সব তিনি শিক্ষা বা চর্চ্চার দ্বারা পেয়েছিলেন। কিন্তু লোক-হিতের প্রবৃত্তি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তিনি বেশি রোজগার করেননি, সে জন্য তাঁর দানের পরিমাণ ধনকুবেরদের তুল্য নয়, তথাপি তিনি দাতাদের অগ্রগণ্য। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁকে দধীচির সঙ্গে সার্থক তুলনা করেছেন। সংসারচিন্তা এবং সব রকম বিলাসিতা ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজের সমস্ত ক্ষমতা ভাবনা আর অর্থ জনহিতে লাগিয়েছিলেন। দেশে দুর্ভিক্ষ বা বন্যা হয়েছে, আচার্য্য তৎক্ষণাৎ ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন! কোনও হাসপাতাল বা অনাথ-আশ্রম, স্কুল বা কলেজে টাকার অভাব, আচার্য্য তাঁর নিজের পুঁজি নিঃশেষ করে দান করলেন। কোনও ছোকরা এসে বললে—সার, আমার মাথায় একটা ভাল মতলব এসেছে, ময়রার দোকান খুলব, কিংবা ট্যানারি করব, কিংবা কাপড়ের ব্যবসা করব, কিন্তু হাতে টাকা নেই। আচার্য্য তখনই মুক্তহস্ত হলেন। নূতন শিল্প স্থাপনের জন্য তিনি অনেক লিমিটেড কোম্পানীতে টাকা দিয়েছিলেন, ডিরেক্টারও হয়েছিলেন। অনেক কোম্পানী ফেল হওয়ায় বিস্তর টাকা খুইয়েছেন, সময়ে সময়ে বদনামও পেয়েছেন, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেননি। কোনও কোম্পানী টাকা ধার করবে, অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে তিনি জামিন হয়ে দাঁড়ালেন। তার পর কোম্পানী ফেল হ'লে অম্লানবদনে দণ্ড দিলেন। অনেক ক্ষেত্রে আইন অনুসারে তিনি টাকা দিতে বাধ্য ছিলেন না, তাঁর হিতার্থীরাও তাঁকে বারণ করেছিলেন, তবু তিনি টাকা দিয়েছেন—পাছে তাঁর সাধুতায় কলঙ্ক হয়। মহাভারতে আছে—সকল শৌচের মধ্যে অর্থশৌচ শ্রেষ্ঠ। এ কথা তাঁর চেয়ে বেশি কেউ বুঝত না, টাকাকড়ির দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি শুচি-বায়ুগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে টাকা ধার নিয়ে গাপ করবার লোকের অভাব হয়নি।

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় আমাদের এই কোম্পানীর অনেক টাকা মারা যায়। শেয়ারহোলডার মিটিংএ এক জন বলেছিলেন—দেশী ব্যাঙ্কে বিশ্বাস নেই, সেখানে আর যেন টাকা না রাখা হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র উত্তর দিলেন—অবশ্যই রাখা হবে, দশ বার টাকা মারা গেলেও রাখা হবে; আমাদের এই দেশী কারবারকে লোকে বিশ্বাস করে, আমাদেরও অন্য দেশী কারবারকে বার বার বিশ্বাস করতে হবে।

তাঁর স্মৃতিরক্ষা বা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আমরা কি করতে পারি? এই কারখানায় তাঁর মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা বা চিতাভস্ম রক্ষার জন্য চৈত্যস্থাপন বেশি কিছু নয়। কিন্তু মৃতব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনেক ইচ্ছার মধ্যে একটি ছিল—এই কোম্পানী বড় থেকে আরও বড় হবে, এতে নানা রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী হবে, এতে বহু লোক শিক্ষিত উৎসাহিত পুরস্কৃত প্রতিপালিত হবে। এই ইচ্ছার পূরণ কেবল ডিরেক্টারদের চেষ্টায় হবে না, শেয়ারহোলডাররা লাখ লাখ টাকা মঞ্জুর করলেও হবে না, আপনাদের সকলের সমবেত চেষ্টাতেই তা হতে পারবে। *

শ্রীরাজশেখর বসু

বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়নের অধ্যাপকপদে ব্রতী হইয়া রাসায়নিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। নানারূপ প্রতিকূল আবেশের মধ্যে আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের অভাব উপেক্ষা করিয়া মনীষী প্রফুল্লচন্দ্র পরীক্ষাগারে প্রাণপ্রতিম ছাত্রগণের সহিত গবেষণা করিয়া অল্প দিন মধ্যেই বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহার উচ্চাঙ্গ গবেষণার পাশ্চাত্ত্য দেশে বিজ্ঞানিগণ ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। লণ্ডনে 'কেমিক্যাল সোসাইটী'তে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর স্বনামখ্যাত স্যর উইলিয়ম র‍্যামসে বলিয়াছিলেন, "আজ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিকের প্রবন্ধ শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। 'নাইট্রাইট্' সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তিনি আমাদিগের নিকট সুপরিচিত এবং তিনি প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির দেশে একাকী বহু বৎসর যাবৎ রসায়নের উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন।" প্রফুল্লচন্দ্রের 'নাইট্' উপাধি প্রাপ্তির পর লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটীর তদানীন্তন সভাপতি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া লিখিয়াছিলেন, "কেমিক্যাল সোসাইটীর সভ্যবৃন্দ একান্তচিত্তে কামনা করেন যে, ভারতে রসায়নের গবেষণার উন্নতিকল্পে আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন।"

রসায়নের গবেষণা ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের তপস্যা—তাঁহার কর্ম্মবহুল

---

* বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ম্মিবৃন্দ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় উক্ত।

প্রতিভাকে আঁকড়ে ধরে রাখি! উনি তো শুধু আমাদের নন। যুগে যুগে ওঁদের আবির্ভাব—নব নব উদয়াচলে তাঁদের পুনরভ্যুদয়! মৃত্যুতে তাঁদের পরিসমাপ্তি নয়। তাই বিশ্বনিয়ন্তা অন্তরালে হেসেছিলেন যখন বলেছিলাম "আপনাকে আরও দেড়শো বছর বাঁচতে হবে।"

১৭ই জুন প্রাতে আচার্য্যদেবের অন্তিম শোভাযাত্রার সঙ্গে গেলাম শ্মশানঘাটে। গঙ্গার তটের উপর এক খণ্ড জমিতে একটি বটবৃক্ষের তলে শেষ হল ভস্মে তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহ। ফিরে এলাম বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে—বিশাল পুরী তাঁর বিরহে একেবারে ম্লান, কোন শব্দ নেই—একেবারে নীরব! শুধু বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ—তাও যেন গুমরে কেঁদে উঠার মত। বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাতা—তাকে যে আজ চিরকালের মতন ছেড়ে চলে গেছেন, শোকে সে যেন মুহ্যমান—এ মর্ম্মন্তুদ বিষাদে তার হৃৎস্পন্দন যেন সহসা বন্ধ হয়ে গেছে।

শ্রীঅসীমা মুখার্জ্জী

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সান্নিধ্যে

মানুষের জীবন মহাকালের অনন্ত সমুদ্রে ক্ষীণ বুদ্‌বুদের ন্যায়ই ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়িত্বের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করেন তাঁহারাই—যাঁহাদের কার্য্যকলাপ ভবিষ্যৎ পুরুষের মধ্যেও প্রভাব রাখিয়া যায়। কালের কষ্টি-পাথরে তাঁহারাই প্রমাণিত হন খাঁটী সোনারূপে, তাই তাঁহারা জগতে হন চির-স্মরণীয়। দুঃখ-জর্জরিত, স্বার্থবুদ্ধি-পরিচালিত, পরস্পর বিবদমান মানব সমাজে তাঁহারাই শুনান আশার বাণী, সঞ্চারিত করেন জীবনের মন্ত্র এবং প্রদর্শন করেন শান্তির পথ। আজ যাঁহার মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন সেইরূপ এক জন মহাপুরুষ।

সাধারণ মানুষ আমরা। নিজের স্বার্থের মধ্যেই আমাদের গণ্ডী সীমাবদ্ধ; দেশের ও সমাজের জন্য কত অল্প পরিশ্রম করিয়া কত বেশি বাহাদুরী ও করতালি লাভ করা যায়, সেই বিষয়েই আমরা উৎসুক। তাই এই সঙ্কীর্ণতাপূর্ণ সমাজের মধ্যে যখন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় এক জন মনীষীকে দেখিতে পাই, তখন অধিকাংশ সময়েই আমরা তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারি না, অনেক সময়ে হয়তো আমাদের কার্য্যাবলীর দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যাহত করিয়া ফেলি; কেন না, আমাদের বুদ্ধি সাধারণতঃ স্বার্থ ও অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন। যাঁহারা এই সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারাও যে সকল সময়ে তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তাহাও বলা যায় না। পর্ব্বতের পাদদেশে যাইতে পারিলেই কি তাহার উচ্চতা সম্বন্ধে সঠিক অনুমান করা সম্ভব? কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে মহত্ত্বের প্রকৃত পরিমাণ না জানিলেও উহা যে কত বিরাট ও বিশাল, ইহা অন্ততঃ বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাই তাঁহার সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম তাহারই কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম কৈশোরেই আমরা দৈনিক কাগজে, সাপ্তাহিকে, মাসিক পত্রিকাতে দেখিয়া আসিতাম। তখন জানিতাম যে, তিনি আমাদের দেশের এক জন বড় বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠাতা। কলেজে অধ্যয়ন কালে কয়েক বার তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। বক্তৃতায় বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি এক জন দেশপ্রেমিক। কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে যখন বিজ্ঞান কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে আসিলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব বহুমুখী—শুধু বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্য অথবা দেশপ্রেমের মধ্যেই আবদ্ধ নয়।

বিজ্ঞান কলেজে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে যাহা আমার দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা হইতেছে তাঁহার সংগঠনমূলক কার্য্য করিবার অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহার স্থাপিত বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটীক্যাল ওয়ার্কস্ ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনা ব্যাপারেও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ। কিরূপ একটি বিরাট পরিকল্পনাকে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান কলেজের আকারে রূপদান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলে তাঁহার প্রতি মন শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ না হইয়া পারে না।

দ্বিতীয় বিষয় যাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহা তাঁহার সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার প্রণালী। তিনি থাকিতেন এই কলেজেরই রসায়ন বিভাগের ব্লকের একখানি ঘরে। এই ঘরের আসবাবপত্র (যাহা এখনও সেই ঘরেই রক্ষিত আছে) দেখিলে উহা একটি সাধারণ ছাত্রাবাসের ঘরের মত বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার নিজের বেশভূষাও ছিল অনুরূপ অনাড়ম্বর। অধিকাংশ সময়েই তিনি একটি গেঞ্জি ও লুঙ্গী পরিয়াই কাটাইয়া দিতেন এবং সেই বেশেই যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহাদের সকলেরই সহিত দেখা করিতেন। অনেকেই তাঁহার ন্যায় এক জন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে এইরূপ সাধারণ বেশে দেখিতে আশা করিতেন না; সেই জন্য কোনও কোনও সময়ে এইরূপ ঘটনাও ঘটিত যে, কোনও সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়তো কলেজের বারান্দায় তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতেন, "আচার্য্য রায়কে কোথায় পাওয়া যাইবে?" আমাদের ল্যাবরেটরীর অবস্থান নীচের তলায় সম্মুখের দিকে; সুতরাং আচার্য্য রায়ের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী অনেকেই প্রথমে আমাদের নিকট আসিয়া নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। এইরূপ এক জন ভদ্রলোক এক দিন আসিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য রায় কোন্ দিকে থাকেন?" ঠিক সেই সময়ে দৈবক্রমে তিনি বারান্দা দিয়া সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখাইয়া দিলাম; কিন্তু ঐ ভদ্রলোকের তাহাতে বিশ্বাস হইল না। আচার্য্য রায় যে দিকে ছিলেন সে দিকে না গিয়া ঐ ভদ্রলোক তাহার বিপরীত দিকে আর এক জনকে আচার্য্য রায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তিনিও যখন সেই একই ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিলেন তখন তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মিল।

ইংরেজীতে যাহাকে plain living and high thinking বলে, আচার্য্য রায়ের জীবন তাহারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁহার ন্যায় এক জন জ্ঞানী লোকের এইরূপ সহজ সরল জীবনযাত্রার প্রণালী দেখিয়া তাঁহাকে প্রাচীন কালের ঋষিদের মতই মনে হইত। তাঁহার জ্ঞানের গাম্ভীর্য্যে, ব্যবহারের মাধুর্য্যে ও জীবনযাত্রার সরলতায় [illegible] উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইত। জীবনের [illegible]ন

তাঁহার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ছাত্রদের প্রতি তাঁহার অমায়িক ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে। তিনি নিজেকে ছাত্রদের মধ্যে এক জন বলিয়া মনে করিতেন। এই দিক্ দিয়া তিনি প্রাচীন ভারতের আদর্শ-গুরুর ন্যায়ই ছিলেন। কত যে নিঃস্ব ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিত তাহার সংখ্যা-নির্ণয় করা কঠিন। অনেক দরিদ্র ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে আহার পাইত। মেধাবী ছাত্রদিগকে তিনি যে কিরূপ সাহায্য করিতেন তাহার নিদর্শন আধুনিক সময়ের প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-গণ। তাঁহার ছাত্রগণই আজ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-স্বরূপে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। তাঁহার প্রথম বয়সের ছাত্রগণ এক এক জন এক একটি দিক্‌পাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারই চেষ্টায় ও উৎসাহে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম সূত্রপাত। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ যে আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—তাহার মূলেও আছে তাঁহারই জীবনব্যাপী সাধনা।

বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রসারের জন্য ছাত্রদের উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত করাই তাঁহার একমাত্র কাজ ছিল না। স্বীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপরও ছিল তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ। এইরূপ গবেষণার দ্বারা তিনি রসায়নশাস্ত্রে যে সকল নব নব দ্রব্য ও তথ্যের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, রসায়নের ছাত্র মাত্রেই ঐগুলির সহিত পরিচিত। রাসায়নিক গবেষণা যে তাঁহার জীবনে কত বড় সাধনার বস্তু ছিল, বিজ্ঞান কলেজে আসার পর আমরা তাহার কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। এই প্রবীণ বয়সেও তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ৮টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের গবেষণাগারে আসিয়া গবেষণাকার্য্য আরম্ভ করিতেন এবং দৈনিক প্রায় ৭ ঘণ্টা কাল উহাতে অতিবাহিত করিতেন। কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইত। প্রায় ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে প্রত্যহ গবেষণাকার্য্য চালাইয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে নবীন ও অল্পবয়স্ক ছাত্রের মতই তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা দেখা যাইত। রসায়নের গবেষণা যেরূপ শ্রমসাধ্য ব্যাপার, তাহাতে বেশী বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্বহস্তে কাজ করিতে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইতেন।

শুধু যে রাসায়নিক গবেষণাই তাঁহার জীবনের প্রিয় বস্তু ছিল তাহাই নহে। সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর। চরক, সুশ্রুত, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের বিষয় গবেষণা করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমাদের এই ভারতবর্ষও এক কালে রসায়নবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ও উন্নত ছিল। আত্মবিস্মৃত জাতি আমরা—তাই আমরা সেই সকল বিদ্যা চর্চ্চার অভাবে হারাইয়া ফেলিয়াছি তাহাই নহে; পরন্তু, আমরা সন্ধানও রাখি নাই, পূর্ব্বে আমাদের কি ছিল। তিনি আমাদের সেই পুরাতন গৌরবময় দিনকে আমাদের নিকট পুনরুদ্ঘাটিত করিয়া শুধু যে আমাদের চেতনা দিয়াছেন তাহাই নহে, জগতের সমক্ষে আমাদের গৌরব দিয়াছেন বর্দ্ধিত করিয়া। শুধু এই কার্য্যের জন্যই দেশের প্রত্যেক অধিবাসীর উচিত তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকা। ইহা ভিন্ন সাহিত্যচর্চ্চাও ছিল তাঁহার অতি প্রিয়বস্তু। সাহিত্যানুরাগ ছিল তাঁহার এতই গভীর যে, তিনি বলিতেন যে, রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করা তাঁহার জীবনের একটা আকস্মিক ব্যাপার। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বেও তিনি সেক্সপীয়রের কাব্য অধ্যয়ন করিয়া ঐ বিষয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী এত ব্যাপক ও বহুমুখী যে, সকল দিক্ আলোচনা করা একেবারে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতি প্রত্যুষ হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাসায়নিক গবেষণা, সাহিত্যচর্চ্চা, ইতিহাস অধ্যয়ন

গবেষণারত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

এইগুলি ছিল তাঁহার দৈনিক কার্য্য। ইহা ছাড়া প্রত্যহ বহু লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, এবং প্রত্যেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি তাহাদের সহিত আলাপ ও আলোচনা করিতেন। ইহাতেও তাঁহার অনেকটা সময় যাইত। কিন্তু তাঁহার সমস্ত দিনের ব্যবস্থা এতই সুনিয়ন্ত্রিত ছিল যে, ইহার উপরেও তিনি সভাসমিতির কাজ, প্রত্যহ চরকা কাটা এবং নিয়মিত সান্ধ্যভ্রমণ করিতে সময় পাইতেন। চরকা ও খদ্দরে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। বড় বড় শিল্পের মধ্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কুটীর-শিল্পের উপর তাঁহার কত দৃঢ় আস্থা ছিল তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

এইরূপ কর্ম্মবহুল জীবনের মধ্যেও তিনি তাঁহার দরিদ্র দেশবাসীকে কখন বিস্মৃত হন নাই। বাঙ্গালার সমাজ, বাঙ্গালার শিল্প, বাঙ্গালার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কিরূপে উন্নত হইতে পারে, এ বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। বহু স্থানে, বহু বক্তৃতায় তিনি এ বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব মত বেশ সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অনেক বক্তৃতাতে তিনি বাঙ্গালীর দোষ উদ্ঘাটন করিয়া রূঢ় ভাবে তিরস্কার করিতেও ছাড়েন নাই—কিন্তু সেই তিরস্কারের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে বাঙ্গালার প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা। এ বিষয়ে একটি ঘটনা

আমার এখনও মনে পড়ে। এক দিন আমাদের ক্লাসে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বাঙ্গালী যুবক-সাধারণের শ্রমবিমুখতা, বিলাসিতা ও মিথ্যা আত্মাভিমানকে কটাক্ষ করিয়া কতকগুলি কথা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে জনৈক ছাত্র উঠিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি সকল সময়েই বাঙ্গালীর দোষ ও ত্রুটির কথাই আলোচনা করেন। বাঙ্গালীর ভিতর কি কোনও গুণ নাই? সর্ব্বদা দোষ দেখিলে নিজের প্রতি কি অবিচার করা হয় না?" তাহার উত্তরে আচার্য্য রায় বলিলেন, "বাঙ্গালীর চরিত্রে যে কোনও গুণ নাই, এ কথা তো আমি বলি না। কিন্তু দোষই বা থাকিবে কেন? আমি নিজে বাঙ্গালী, তাই দুঃখ হয় যখন দেখি যে, আমাদের মধ্যে এখনও অনেক দোষ ও ত্রুটি আছে; তিরস্কার করি এই জন্য যে, সর্ব্বদা দোষগুলি দেখাইয়া দিলে হয়তো তাহার সংশোধন হইতে পারে।" এই কয়েকটি কথা হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি বাঙ্গালীর কত দরদী বন্ধু ছিলেন।

কিন্তু শুধু বাঙ্গালী জাতিকে কিংবা সমগ্র দেশকে ভালবাসিয়াই তাঁহার দেশপ্রেম নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। সমষ্টিগত ভাবে দেশের উন্নতিশ্চিন্তা ছাড়াও তিনি দেশকে আর এক ভাবে ভালবাসিতেন। এই গুণই তাঁহাকে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা হইতে দেবত্ব প্রদান করিয়াছিল। ইহা তাঁহার প্রগাঢ় পরদুঃখকাতরতা। মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিলেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। তাই যেখানেই বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদিতে মানুষের চরম কষ্ট হইত, সেখানেই তাঁহার মুক্তহস্ত প্রসারিত হইত। তাঁহারই উদ্যোগে "বঙ্গীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতি" নামে একটি দানের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমাদের ছাত্র-জীবনে দেখিয়াছিলাম যে, তাঁহারই বসিবার ঘরে ছিল ঐ সমিতির অফিস এবং তিনিই ছিলেন তাহার প্রাণ। কত রাশি রাশি অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই সমিতির সাহায্যে তিনি যে কত সহস্র সহস্র লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত কর্ম্মবীর—একাধারে বহু গুণের সমষ্টি। তাঁহার চরিত্রের যতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল তাহার মধ্যে যে কোনও একটি থাকিলেই যে কোনও লোক দেশে পূজনীয় হইতে পারেন। একত্রে এতগুলি গুণ তাঁহাকে বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় সন্তানগণের মধ্যে অন্যতম করিয়াছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দপ্রমুখ বাঙ্গালায় যে সকল কৃতী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম্ম ও জীবন-যাত্রার প্রণালীর রূপ দিয়াছিলেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তাঁহাদেরই শেষ প্রদীপ। তাঁহার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের একটি গৌরবময় যুগের অবসান হইল। যে সময়ে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধন-প্রাণ ইত্যাদি সবই বিপন্ন, দেশ যখন আত্মকলহে বহুধা বিভক্ত, অবিশ্বাসের বিষে জর্জ্জরিত, দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে ক্লিষ্ট, যে সময়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত এক জন মহাপ্রাণ পরদুঃখকাতর, দেশ-প্রেমিকের বিশেষ প্রয়োজন, ঠিক সেই সময়েই তিনি চলিয়া গেলেন—ইহা অপেক্ষা দেশের দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?

আজ তাঁহার অভাব বাঙ্গালা দেশের বুকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি আঘাত হানিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি কি সত্যই আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন? আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র—কর্ম্মযোগী প্রফুল্লচন্দ্র—ত্যাগী, দেশপ্রেমিক, পরদুঃখকাতর প্রফুল্লচন্দ্র—শিল্প-প্রতিষ্ঠাতা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রবর্ত্তক, জ্ঞানযোগী প্রফুল্লচন্দ্র কখনও মরেন না—মরিতে পারেন না। সত্য বটে, তাঁহার নশ্বর দেহ আজ লয় পাইয়াছে—কিন্তু তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন আমাদের মনে, কেন না কীর্তিতে তিনি অমর। তাঁহার প্রত্যেকটি কার্য্য, প্রত্যেকটি উপদেশ বাঙ্গালীর জীবনের সহিত নিবিড় ভাবে জড়িত। বাঙ্গালার ইতিহাসে—তথা ভারতের ইতিহাসে তিনি থাকিবেন ভাস্বর সূর্য্যের মত দ্যুতিমান্। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মনে তিনি জাগিয়া থাকিবেন এক জন দরদী দেশপ্রেমিক—এক জন বন্ধু ও পথপ্রদর্শকরূপে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

—

আচার্য্য-স্মৃতি

বিগত মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে ছাত্র, অধ্যাপক, চাকুরিজীবী, প্রবাসী সকলের মধ্যেই বিলাত-যাত্রার ধূম পড়ে যায়। বোম্বাই-এর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী 'বালচাঁদ-হীরাচাঁদ-প্রতিষ্ঠিত' সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী ভারতীয় শিপিং কনসার্ণগুলির অগ্রণীদের মধ্যে অন্যতম। ঐ কোম্পানী যাত্রীদের য়ুরোপে নিয়ে যাবার জন্য 'লয়েলটি' নামক একটি জাহাজের বন্দোবস্ত করে। সার পি. সি. রায় সেই জাহাজেই চতুর্থ বার বিলাতযাত্রা করেন। যাত্রীরা অধিকাংশই ভারতবাসী। কয়েক জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিও সেই জাহাজের যাত্রী ছিলেন; যথা, বোম্বাইয়ের ডক্টর জীবরাজ মেহতা, লক্ষ্ণৌর অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত, নৃতত্ত্ববিদ্ বিরজাশঙ্কর গুহ। আমিও সেই জাহাজের যাত্রী ছিলুম। বেশির ভাগ যাত্রীই বাঙ্গালা, পঞ্জাব ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র, বিলাতে শিক্ষা লাভ করতে চলেছে। কয়েক জন বড় সিভিলিয়ানও ভাল জাহাজে স্থানলাভ না করতে পেরে এই জাহাজের যাত্রী হয়েছেন। আমরা প্রায় এডেনের কাছা-কাছি পৌচেছি, সেই সময় কথা উঠল—'এই স্বদেশী প্রচেষ্টাটি কোন কাজেরই হয়নি। খাবার খারাপ, ঘরগুলি নোংরা, যাত্রীদের তত্ত্বাবধানও তেমন হয় না।' রোজই এই ধরণের কথাবার্ত্তা হয়। এক দিন সার পি. সি. রায় জাহাজের ডেকে আমাদের কয়েক জনের সঙ্গে গল্প করছেন, এমন সময় কতিপয় পঞ্জাবী ও বাঙ্গালী ছাত্র তাঁর কাছে একটা দরখাস্ত নিয়ে হাজির—দস্তখত করে দিতে হবে। তিনি দরখাস্তটি একবার দু'বার তিন বার পড়লেন। তার পর ছেলেদের জিগ্যেস করলেন তারা পূর্ব্বে কখনও য়ুরোপ গেছে কি না। ছাত্রেরা উত্তর দিলে, "না"। তখন তিনি তাদের প্রশ্ন করলেন, "তবে তোমরা কি করে জানলে যে বিলাতী অথবা য়ুরোপীয় জাহাজের তুলনায় এই জাহাজের বন্দোবস্ত খারাপ?" তারা বললে, "ইংরেজ যাত্রীরা বলছিল।" তারা সহযাত্রী এক জন ইংরেজ সিভিলিয়ানের নামও করলে। সার পি, সি, রায় বললেন—"মাই ইয়ং ফ্রেণ্ডস্, এই নিয়ে আমি চতুর্থ বার য়ুরোপ চলেছি। এর আগে 'পি অ্যাণ্ড ও' এবং অন্যান্য য়ুরোপীয় জাহাজেও গেছি। আমি বলছি যে, এই জাহাজের খাবার এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত কোন বৃটিশ অথবা য়ুরোপীয় জাহাজের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়।" ছাত্রদের সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর অনেক আলোচনা হ'ল। অবশেষে তারা স্বীকার করলে, এক জন য়ুরোপীয় যাত্রীর প্ররোচনায় তারা এই দরখাস্ত করেছে। তখন সার পি, সি, রায় তাদের জিগ্যেস্ করলেন, "এই দরখাস্ত নিয়ে আমি কি করব? ছিঁড়ে সমুদ্রের জলে ভেলে দিই, কি

বল ?" এই প্রস্তাবে ছাত্রেরা সকলেই রাজী হল। তিনি তখন সেখানি ছিঁড়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন।

ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানের লোকের ধারণা, সার পি, সি, রায় কেবল বাঙ্গালা দেশকেই ভালবাসতেন। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, তাঁর দেশভক্তি শুধু বাঙ্গালা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যে কোন স্বদেশী প্রচেষ্টা—বাঙ্গালা অথবা বোম্বাই যেখানেই হোক না কেন, তাঁর কাছে সমান প্রিয় ছিল।

সার পি, সি, রায় একবার পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু রসায়ন সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আহরণ করে তিনি দুই খণ্ডে তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ 'হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস' রচনা করেছেন। এই গ্রন্থ তাঁর রসায়নশাস্ত্রে ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। বহু পরিশ্রমে তিনি 'বিজ্ঞানক্ষেত্রে ভারতের দান'—যা প্রায় লুপ্ত হয়ে গিছল, তাই পুনরুদ্ধার করে জগতের সামনে প্রকাশ করেন। লাহোরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেই বক্তৃতা-সভায় স্থানীয় কলেজের এক জন অল্পবয়স্ক ইংরেজ অধ্যাপকও ছিলেন। তিনি তখন সবে ভারতবর্ষে এসেছেন। এখানকার সভ্যতায় বা হালচালে বিশেষ আকৃষ্ট হননি। সার পি, সি, রায় প্রাচীন হিন্দুদের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও সেই যুগের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে ছবি এঁকে ব্যাখ্যা করছিলেন। কতকগুলি মাটির ভাণ্ডের ছবি, যাহার নীচে জ্বাল দিয়া উদ্ধপাতন প্রক্রিয়া দ্বারা (Sublimation) মকরধ্বজ ইত্যাদি তৈয়ারী করা হয়। ইংরেজ যুবকটি তাচ্ছিল্যভরে নাক সিঁটকাচ্ছিলেন এবং হাসি সম্বরণ করতে পারছিলেন না। আচার্য্যদেব তা লক্ষ্য করে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। যন্ত্রপাতির ব্যাখ্যা শেষ করে হাতে এক ডেলা মকরধ্বজ নিলেন। মকরধ্বজ হ'ল রিসাব্লাইম্‌ড্‌ মার্কিউরিক সালফাইড। কবিরাজরা এখনও সেই প্রাচীন নিয়মেই মকরধ্বজ প্রস্তুত করেন। অনেক য়ুরোপীয় চিকিৎসকেরাও তা ব্যবহার করে থাকেন। বাঙ্গালা সরকারের সার্জ্জেন জেনারল সার পার্দি লুকিস অনেক সময় তাঁর রোগীদের উত্তেজক ঔষধ হিসাবে মকরধ্বজ খেতে দিতেন। মকরধ্বজের ডেলা হাতে নিয়ে তিনি বললেন—"বন্ধুগণ, আজ হতে দু'হাজার বছর পূর্ব্বে সেকেলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারতবাসীরা এই অপূর্ব্ব ঔষধ প্রস্তুত করে মানবের কল্যাণার্থ ব্যবহার করেছেন, রোগে শান্তি দিয়েছেন,—এখনকার উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যেও এর চেয়ে বিশুদ্ধ Resublimed mercuric sulphide তৈয়ারী হয়নি। হিন্দুরা সামান্য মাটির ভাণ্ডে এরূপ বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারী করেছিলেন কোন্ সময়ে—প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে, যখন আমার ঐ বন্ধুটির (ইংরেজ যুবকটিকে দেখিয়ে) পূর্ব্বপুরুষেরা পশুচর্ম্মে লজ্জা নিবারণ করতেন এবং বন্য ফল খেয়ে জীবনধারণ করতেন।" এই কথা বলা মাত্র ভারতীয় শ্রোতারা করতালি দিয়ে উঠল; তরুণ ইংরেজ অধ্যাপক যুবকটি লজ্জায় লাল হয়ে সবেগে ঘর হ'তে ছুটে পালালেন। পরে তিনিই সার পি, সি, রায়ের বিশেষ গুণগ্রাহী হয়ে পড়েন।

সার পি, সি, রায়ের এই বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মহৎ জীবন অনেককেই আশ্চর্য্য করে দেয়। তাঁরা ভাবেন, কি করে এই জীবন সম্ভব হ'ল। তিনি তো চিরকালই রুগ্ন। বাল্যাবধি পেটের অসুখে ভুগতেন। আমি সার পি, সি, রায়ের মতন নিয়মানুবর্ত্তিতা খুব কম লোকেরই দেখেছি। তিনি চিরকুমার ছিলেন বলেই আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। প্রতিদিন তাঁর কাছে যাঁরা থাকতেন তাঁদের পূর্ব্বেই শয্যা-ত্যাগ করে সায়েন্স কলেজের বারান্দাতে পায়চারী করতেন। তার পর বেলা ৭টা হ'তে ৯টা পর্য্যন্ত পড়াশুনা। সে সময় তাঁকে বিরক্ত করবার সাহস কারও ছিল না। তার পর ল্যাবরেটরীতে গিয়ে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত কাজ। তার পর মধ্যাহ্ন ভোজন ও একটু বিশ্রাম। তার পরই আবার ল্যাবরেটরীতে এসে গবেষণা, চিঠি-পত্রের জবাব দেওয়া ইত্যাদি। চারটে নাগাদ বাইরের কাজের জন্য প্রস্তুত। সন্ধ্যার সময় একটু ময়দানে ভ্রমণ, বাছা বাছা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প। বন্ধুরা নানা শ্রেণীর, নানা বয়সের—কারো বয়স ১৫, আবার কারো বয়স ৮০। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর যে এই বিরাট দান—আমার মনে হয়, নিয়ম পালনের নিষ্ঠাই তার প্রধান কারণ। তিনি বোম্বাই অথবা বাঙ্গালোরের মত দূরদেশে যাবার আগে পথে কত বার খাবেন, কি কি খাবেন, সব হিসেব করে গুছিয়ে নিয়ে তবে যাত্রা করতেন। অনেক সময় ছাত্রদের সব চিঠি লিখতেন। ইঙ্গিত থাকত কিছু সঙ্গে করে এনো। তাঁরা সানন্দে তিনি যা খেতে ভালবাসতেন নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হতেন।

সার পি, সি, রায় আমাদের বলতেন যে, অধ্যাপক বার্থিলোর অনুরোধে তিনি 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনা করতে তাঁকে প্রায় ৮।৯ বছর টানা পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এক জন পণ্ডিতকে (হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন) দিয়ে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলির মানে করাতেন, তার পর প্রাচীন প্রস্তুত-প্রণালীর সঙ্গে আধুনিক প্রণালী মিলিয়ে দেখতেন। ন'বছর ধরে এই অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে যায়। তাঁর বন্ধু এবং চিকিৎসক সার নীলরতন সরকার তখন তাঁকে বাঁধা-ধরা নিয়মে থাকতে উপদেশ দেন এবং আরও বলেন যে, তাঁহার একটু Relaxation দরকার। অর্থাৎ, বিকালে দিনের কাজের পর বন্ধুবান্ধব নিয়ে লঘু আলোচনা—চলতি কথায় যাকে আড্ডা দেওয়া বলে তাই করা উচিত। এর পরে তিনি নিয়মমত সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে যেতেন এবং সেখানে দু'ঘণ্টা করে সময় কাটাতেন। রাত্রি ঠিক ন'টায় তিনি মাঠ থেকে ফিরতেন। আমরা এই সন্ধ্যাকালীন বৈঠককে 'বেতালের বৈঠক' বলতাম। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ২৫ বৎসর তিনি এই নিয়ম অব্যাহত রেখেছিলেন। কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক গিরীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু ইত্যাদি এই বৈঠকে যোগদান করতেন। আমার মনে হয়, স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন আধুনিক যুবকরা এই সব দৃষ্টান্ত থেকে ভোরে ওঠার ও নিয়মানুবর্ত্তিতার উপকারিতা বুঝতে পারবেন। তিনি প্রায়ই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বিখ্যাত উক্তি "Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise" উদ্ধৃত করতেন। এই উক্তিটি তিনি তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

শ্রীমেঘনাদ সাহা

আচার্য্যদেব

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শতমুখী প্রতিভার বিষয় কিছু লিখতে গেলে অনেক কিছুরই পুনরাবৃত্তি করা হবে। আজ তাঁর অবর্ত্তমানে

তাঁকে ঘিরে যে স্মৃতি আমার মনে সর্ব্বদা জেগে আছে, সে বিষয়ে দু'-একটি কথা লিখে তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাব।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে। আমি তখন গৌহাটী থেকে বি, এস-সি পাশ করে এসেছি সায়েন্স কলেজে পড়ব বলে—তাঁর সঙ্গে গিয়েছি দেখা করতে। সেই প্রথম সাক্ষাৎটি ভোলবার নয়! প্রথমেই আমাকে পিঠ চাপড়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"গায়ে জোর আছে তো? গায়ে জোর না থাক্‌লে কেমিষ্ট্রী পড়া হবে না।"

তাঁকে আরও অন্তরঙ্গ ভাবে জানবার সুযোগ হয় দু'বছর আগে। সে দিনটা বড় মর্ম্মান্তিক। সায়েন্স কলেজে অল্প কয়েক জনই আমরা আছি। সপ্তমী পূজার দু'দিন আগে। বেলা তখন বারোটা। হঠাৎ আচার্য্যদেবের চাকর এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। আচার্য্যদেবের ঘরে গিয়ে দেখি তিনি রক্তবমি করছেন। আমি তাড়াতাড়ি সবাইকে খবর দিলাম। আমরা সবাই যেতেই তিনি বল্লেন, "আমার তো শেষ হয়ে এসেছে। এবার তোদের কাছে এ রকম ভাবে মরতে পারলেই আমি খুসী।"

আচার্য্যকে যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝবেন, এ কথার মধ্যে কতটা দুঃখ লুকান ছিল। আচার্য্য ছিলেন কর্ম্মবীর। তাঁর জীবনে মানসিক রোগীর হতাশার স্থান ছিল না। আত্মনির্ভরতা ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। নিজের কোন কাজের জন্য অন্য কারুর উপর নির্ভর করতে তিনি চাইতেন না। তবু শেষ-জীবনের অক্ষমতার দরুণ অন্যের উপর অনেকখানি নির্ভর তাঁকে করতে হয়েছিল। সেটা তাঁর পক্ষে একেবারেই সুখের ছিল না! সে জন্যই বোধ হয় চলে যাবার কথা সে দিন তাঁর মুখে সর্ব্বাগ্রে এল। একটু সামলে উঠে তিনি বল্লেন, "গিরীনকে (ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু) ডাক।" গিরীন বাবু সে দিন কলকাতায় ছিলেন না। আমরা তার পর টেলিফোন ডাইরেক্টারী থেকে কলকাতার যত স্বনামধন্য ডাক্তার আছেন, সবাইকে ডাকা সুরু করলাম। আশ্চর্য্য এই—বহুক্ষণ ধরে কারুরই খোঁজ মিলল না। অবশেষে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের ডাক্তার শিবপ্রসাদ মুখার্জ্জিকে ধরা গেল। তিনি এলেন, তার কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত এসে হাজির হলেন। তাঁকে দেখেই আচার্য্যদেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "জানিস্, ইনি হচ্চেন প্রিন্স অব ফিজিসিয়ানস।" কোন অসুস্থতাই আচার্য্যকে অভিভূত করতে পারত না। এর পর থেকেই সুরু হলো তাঁর সান্নিধ্যে থেকে সেবা-যত্ন করা। সে দিন রাত ১টা অবধি তাঁর রক্তিবমি হয়েছিল। অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চললো। শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুর হাত থেকে যদিও তাঁর জীবনকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু এ আঘাত তাঁকে একেবারেই পঙ্গু করে দিয়ে গেল এবং একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল।

জীবনের শেষ বছরটা উনি নিতান্তই অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। ইন্‌ভেলিড চেয়ারে করেই ওঁকে সায়েন্স কলেজের বারান্দায় প্রত্যেক দিন সকাল বেলা বেড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। আমার ঘরের সামনে দিয়েই তাঁর যাওয়া-আসার পথ ছিল। যখনই দেখা হতো, দেখতাম ক্লান্ত বিষণ্নতা, বার্দ্ধক্যের জড়তা তাঁকে একেবারে ঘিরে রেখেছে। আমাদের দেখলে হয়তো একটু হাসতেন—একটু কিছু বলতে চাইতেন। কিন্তু তাঁর কথা একেবারেই অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিছুই বোঝা যেতো না। কখনও কখনও হাত বাড়িয়ে আমাদের গায়ে হাত দিতেন। সে স্পর্শের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠত তাঁর বার্দ্ধক্যের জরাজীর্ণ দেহের অব্যক্ত বেদনা এবং সে সঙ্গে আমরাও অনুভব করতাম, আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা কত গভীর!

পড়াশুনায় তাঁর একাগ্রতা ও অনুরাগ অসাধারণ ছিল। চোখ খারাপ হওয়ার পর থেকে আমাদের মাঝে মাঝে তাঁকে পড়ে শোনাতে হ'ত। কি পরিমাণ একাগ্রতা সহকারে তিনি শুনতেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। স্মৃতিশক্তিও ছিল প্রখর। কবে কখন্ কত পাতায় কি লিখে রেখেছেন, তাও মাঝে মাঝে বলে আমাদের আশ্চর্য্য করে দিতেন। পড়াশুনার কোন ব্যাঘাত ঘট্‌লে খুবই বিরক্ত হতেন। এক দিন তাঁকে পড়ে শুনান হচ্চে, এমন সময় কলকাতার কোন এক খ্যাতনামা অধ্যাপক ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। তিনি চমকে উঠে রাগতঃ ভাবে বল্লেন, "তুমি তো হে কলেজের মাষ্টার; জানো না পড়াশুনার সময় ব্যাঘাত করতে নেই!" অধ্যাপক মহোদয় অপ্রস্তুতের একশেষ!

আমাদের কাজকর্ম্মে আচার্য্যদেবের গভীর সহানুভূতি আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করতাম। যাঁরা আমাদের মধ্যে বাস্তবিক ভাল কাজ করতেন, তাঁদের খুবই পছন্দ করতেন—প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর ছিল। সায়েন্স কলেজে যে সব ছাত্ররা দিবারাত্র কাজ করতেন, কাজের সুবিধার জন্য তিনি তাঁদের খাওয়া-দাওয়ায় ব্যবস্থা করতেন। যাঁরা বাড়ী থেকে আসতেন, তাঁদেরও প্রায়ই বিকেল বেলা জলখাবারের ডাক পড়ত। রাত্রি ৯টার পর কলেজে কেউ কাজ করে তা তিনি চাইতেন না। তিনি রোজ ঠিক রাত্রি ৯টার সময় মাঠ থেকে বেড়িয়ে ফিরতেন। তাঁর বেড়িয়ে ফেরা দেখে ঘড়ি ঠিক করে নেওয়া যেত। আমাদের মধ্যে অনেকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করতেন। পাছে তিনি জানতে পারেন, তাঁর বকুনী খেতে হয়, এই ভয়ে তাঁর আসার শব্দ শুনেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হতো। এক দিন কেমন করে তিনি জানতে পারেন, সোজা এসে সে ঘরে হাজির। সে দিন সবাইকে যা বকুনী শুনতে হয়েছিল তা বলবার নয়। তবু সে বকুনী কারও গায়ে লাগছিল না। সে বকুনীতে হুল ছিল, মধুও কম ছিল না। উনি যে ব্যাপারটা একেবারে অপছন্দ করতে পারছেন না, এ কথা সবাই বুঝতে পেরেছিল।

আচার্য্যদেব আজ চলে গেছেন! জীবনের শেষ দুই বৎসর যে অসহনীয় কষ্ট তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল আজ তার অবসান হল। তিনি সে দিন চলে যেতেই চেয়েছিলেন তাই চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর চলে যাওয়ায় আমাদের যে ক্ষতি হ'ল, তা কোন দিনই পূরণ হবে না।

শ্রীফণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত

শ্রীভরতমুনি-প্রণীত

নাট্যশাস্ত্র

প্রথম অধ্যায়

দেব পিতামহ ও মহেশ্বরকে মস্তক-দ্বারা প্রণতি-পূর্ব্বক ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছিল (সেই) নাট্যশাস্ত্র বলিব ॥ ১ ॥

পুরাকালে কোন এক সময়ে অনধ্যায়কালে ব্রতী নাট্য-কোবিদ ভরত জপ সমাপন-পূর্ব্বক স্ব-পুত্রগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত (হইয়াছিলেন); এমন সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা জিতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত আত্রেয়-প্রমুখ মুনিগণ ইহাকে সম্যগ্‌রূপে উপাসনান্তে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥ ২-৩ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! ভগবৎস্বরূপ আপনা-কর্ত্তৃক এই যে বেদতুল্য নাট্য-বেদ গ্রথিত হইয়াছে, উহা কেন (কোন্ প্রয়োজনে) ও কাহার নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে ? ৪ ॥

নাট্যশাস্ত্রের উপর আচার্য্য অভিনবগুপ্তের (খ্রীঃ একাদশ শতাব্দী) 'অভিনব-ভারতী' নামে একখানি টীকা আছে। উক্ত টীকাটি 'বরোদা' হইতে প্রকাশিত নাট্যশাস্ত্রের সংস্করণে মুদ্রাপিত হইতেছে। এই টীকাটি সর্ব্বপ্রকারে অতুলনীয় ও ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে নাট্যশাস্ত্রের অর্থ উদ্ধার করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনামাত্র। এ কারণে, বরোদা-সংস্করণে মুদ্রিত মূলের পাঠই বর্ত্তমান ভাষান্তরের মূল-রূপে গৃহীত হইল। অবশ্য সেই সঙ্গে কাশী-সংস্করণের ও কাব্যমালা-সংস্করণের পাঠও তুলনার নিমিত্ত আলোচিত হইবে ও কোন স্থলে কাব্যমালা বা কাশীর পাঠ বরোদার পাঠ অপেক্ষা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইলে, যথাস্থানে সেই সকল পাঠের অনুযায়ী ভাষান্তর পাদটীকায় প্রদত্ত হইবে। অভিনবগুপ্তের এই টীকাটি অমূল্য হইলেও উহার সমগ্র অংশ পাওয়া যায় নাই। সপ্তম অধ্যায়ের কিয়দংশ ও অষ্টম অধ্যায়টি টীকাহীন অবস্থায় মুদ্রাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে সকল পুঁথি হইতে টীকাটি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদিগের পাঠ এতই বিকৃত যে, এই টীকার বহু স্থলের পাঠ লাগান একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। আমরা যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে মূলের গূঢ়ার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে টীকার সারাংশ প্রয়োজনমত উদ্ধৃত ও ভাষান্তরিত করিব। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা প্রতি পদেই বর্ত্তমান। সহৃদয় সুধীগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এ সকল ভ্রম সংশোধনের ভার লইলে তবেই এ প্রযত্ন সার্থক হইতে পারে।

১। মূলে আছে 'ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্'। উহার সরল বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছিল, অথবা ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন। সংস্কৃতে 'ব্রহ্মন্' শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ দুই-ই হয়। উভয় লিঙ্গেই তৃতীয়ার একবচনে 'ব্রহ্মণা' পদ হইয়া থাকে। পুংলিঙ্গ 'ব্রহ্মন্'-শব্দের অর্থ—(১) লোক-পিতামহ, (২) ব্রাহ্মণ বা বিপ্র। আর ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মন্-শব্দের অর্থ—(১) বেদ, (২) তত্ত্ব বা পরব্রহ্ম, (৩) তপস্যা। ভাষান্তরে পুংলিঙ্গের অর্থই প্রধান ভাবে গৃহীত হইয়াছে, ইহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে 'ব্রহ্মা কর্ত্তৃক'। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ইহা অশুদ্ধ (ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক হওয়া উচিত); তথাপি অর্থ পরিস্ফুট হয় বলিয়া ঐরূপ অশুদ্ধই লিখিত হইল। আচার্য্য অভিনব-গুপ্ত এই অংশটির নানারূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহার কিছু কিছু আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল :—(১) পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উক্ত (এরূপ অর্থের সমর্থন প্রথমাধ্যায়ের মূলেই পাওয়া যাইবে)। ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদের সার সংগ্রহপূর্ব্বক নাট্যশাস্ত্র সঙ্কলিত করেন—ইহাই ভরতোক্ত ইতিহাস। (২) নাট্যবেদ অনাদি—কারণ, উহা বেদান্তর্গত। এ কারণে উহা পিতামহ-কর্ত্তৃকও রচিত হইতে পারে না। ব্রহ্মা কেবল নাট্যবেদের তত্ত্বানুযায়ী উহার যে ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্তাদির সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রাচীন 'ব্রহ্মভরত' বা ব্রহ্মার দ্বারা কথিত আদি নাট্যশাস্ত্র। উহাই অন্যতম উপবেদ—'নাট্যবেদ' বা 'গন্ধর্ববেদ' —এই নামে প্রচলিত। এই সিদ্ধান্তানুসারে অর্থ দাঁড়ায়—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উদাহৃত, অর্থাৎ ব্রহ্মা যাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মা যাহার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন ("ব্রহ্মণোদাহৃতং প্রদর্শিতো-দাহরণং কৃতনির্দ্দেশনম্"—অভিনবভারতী, পৃঃ ৪)। (৩) 'নাট্য' অর্থে দশরূপক ; তাহার শাস্ত্র নাট্যশাস্ত্র। দশরূপকাদির লক্ষণ যাহাতে বর্ত্তমান, তাহাই নাট্যশাস্ত্র। ব্রহ্মা তাহার উদাহরণ অর্থাৎ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ইহাও একরূপ অর্থ। ব্রহ্মা দশরূপকাদির লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত যাহাতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত নাট্যশাস্ত্র। (৪) মতান্তরে, 'ব্রহ্মণা' অর্থে বেদ-কর্ত্তৃক। 'উদাহৃত' অর্থে নিরূপিত। বেদ-কর্ত্তৃক যাহার অংশবিশেষ ত্যাজ্য ও অংশ-বিশেষ অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে ("ব্রহ্মণা বেদাখ্যেন ভগবতা শব্দরাশিনোদাহৃতং নিরূপিতং ত্যাজ্যানুষ্ঠেয়রূপম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪)। (৫) ভট্টনায়কের মতে 'ব্রহ্মণা' পদের অর্থ পরব্রহ্ম-কর্ত্তৃক। উদাহৃত—উদাহরণরূপে প্রদত্ত। পরব্রহ্ম যে নাট্যকে অসার এই দ্বৈত প্রপঞ্চ-ভেদের উদাহরণ-(দৃষ্টান্ত)-স্থানীয় করিয়াছিলেন ("ভট্টনায়কস্তু ব্রহ্মণা পরমাত্মনা যদুদাহৃতমবিদ্যাবিরচিতং নিঃসারভেদগ্রহে যদুদাহরণী-কৃতং তন্নাট্যং বক্ষ্যামি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪-৫)।

২-৩। দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ শ্লোক পর্য্যন্ত পাঁচটি শ্লোক ভরত-মুনি-রচিত কি না—এ সম্বন্ধে বিচার অভিনব-ভারতীতে দৃষ্ট হয়। অভিনবের সিদ্ধান্ত ভরতমুনি স্বয়ং আপনাকে পর-রূপে কল্পনা করিয়া এই শ্লোকগুলি লিখিয়াছিলেন।

৪। 'ভগবতা' (মূল)—'ভগবৎ' শব্দটি পূজ্য অর্থের বাচক। ভরত-মুনিই এই পদটি দ্বারা লক্ষিত হইয়াছেন ("ভগবতা তত্রভবতা গুরুণেতি ভরতমুনিরেবৈবমুক্তঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৬)। বেদসম্মিতঃ (মূল)—'সম্মিত' অর্থে তুল্য।

নাট্যবেদ—ইহাই ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র। বর্ত্তমানে যে ভরত-প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র' পাওয়া যাইতেছে—উহার অন্যূন দুইটি মুখ্য সংস্করণ ও বহু অবান্তর পাঠভেদ সত্ত্বেও উহা মূলতঃ ছয় সহস্র গ্রন্থে সম্পূর্ণ। উহার প্রাচীনতর রূপ 'দ্বাদশসহস্রী আদিভরত'—শিব-পার্ব্বতী-সংবাদাত্মক। অভিনব উহাকেই 'সদাশিব-ভরত' বলিয়াছেন। উহারও মূল—ষট্‌ত্রিংশ সহস্র গ্রন্থে সম্পূর্ণ 'ব্রহ্মভরত'—যাহা পিতামহ-কর্ত্তৃক চতুর্ব্বেদের সার-রূপে সঙ্কলিত হইয়াছিল ; ইহারই নামান্তর গান্ধর্ব্ব উপবেদ। ইহাদিগের সকলেরই ভিত্তি চতুর্ব্বেদ। অবশ্য এস্থলে নাট্যবেদ বলিতে ব্রহ্মার রচিত গান্ধর্ব্ব উপবেদ বুঝাইতেছে না—ভরত-রচিত নাট্যশাস্ত্রকেই বুঝাইতেছে। এক্ষেত্রে 'বেদ'-শব্দটি

(উহার) কয়টি অঙ্গ ? কি প্রমাণ ? আর উহার প্রয়োগ কীদৃশ ? হে ভগবন্ ! এই সকল যথাযথ তত্ত্বানুসারে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বলুন ।৫।

সেই মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়াই ভরতমুনি নাট্যবেদ-কথা শুনাইবার উদ্দেশ্যে তখন প্রতিবাক্য বলিয়াছিলেন ।৬।

গৌণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। উপদেশ-হেতু বলিয়া ইহাকে 'বেদ' নাম দেওয়া হইয়াছে ("প্রসিদ্ধা চাস্য নাট্যবেদসংজ্ঞা বিদিতা। অত এবোপদেশহেতুত্বাদ্বেদঃ। এবঞ্চ জিজ্ঞাস্যতত্ত্বমেবায়ম্"—অঃ ভাঃ পৃঃ ৬)।

কথম্ (মূল)—কেন ? 'কথম্'এর অর্থ কিরূপে কি প্রকারে—ইহাও হয়। এস্থলে সে অর্থ সঙ্গত হয় না ! কথম্—কেন, কোন্ প্রয়োজনে ? প্রশ্নের গূঢ় অভিপ্রায় এই যে—নাট্যবেদ যখন বেদান্তর্ভূত উপবেদ, তখন তাহার পৃথক্ প্রয়োজন কি থাকিতে পারে ? উহার যাহা প্রয়োজন, তাহা ত বেদ হইতেই সিদ্ধ হইতে পারিত ; তবে পৃথগ্‌ভাবে নাট্যবেদ-গ্রহণের প্রয়োজন কি? ন্যায়-শাস্ত্রের পরিভাষায়—এই নাট্যবেদ-গ্রথন-রূপ কার্য্যটি সিদ্ধ-সাধন-দোষদুষ্ট।

কস্য বা কৃতে (মূল)—যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে—না, পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে পারে না, কারণ, সকল ব্যক্তির ত সাক্ষাৎ বেদ হইতে উপদেশ লাভের অধিকার বা যোগ্যতা নাই—তাহা হইলে এই দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিতে পারে—বেদ হইতে উপদেশ যাহার পক্ষে লাভ করা সম্ভব নহে, কে সে—কীদৃশ ব্যক্তি ? কাহার নিমিত্ত—অর্থে—কোন্ জাতীয় অধিকারীর উদ্দেশ্যে ? ফলিতার্থ—কেবল বেদাধিকারীই কি নাট্যবেদেও অধিকারী ?—অথবা, তদ্ব্যতীত অন্য ব্যক্তিরও ইহাতে অধিকার আছে ? ("কথমুৎপন্নঃ কেন প্রয়োজনপ্রকারেণোৎপন্নঃ, তৎপ্রয়োজনস্য বেদেভ্য এব সিদ্ধেঃ।...অথ যস্য বেদেভ্যো নোপদেশঃ সিদ্ধঃ, স কস্তাদৃগিত্যাহ কস্যাধিকারিণঃ কৃতে—কিং বেদাধিকৃত এবাত্রাধিকারী উত তদন্যোঽপীত্যধিকারিবিষয়োঽয়ং প্রশ্নঃ। পূর্ব্বস্তু সিদ্ধসাধ্যতয়া নিষ্প্রয়োজনত্বেনাক্ষেপায় প্রশ্নঃ :"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৬)।

অতএব, দেখা গেল যে—চতুর্থ শ্লোকে মোট দুইটি প্রশ্ন।

৫। পঞ্চম শ্লোকে তিনটি প্রশ্ন। (৩) নাট্যবেদের কয়টি অঙ্গ ? (৪) নাট্যবেদের কি প্রমাণ ?—এ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, এ প্রশ্নটি নিরর্থক। কারণ, নাট্য ত প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ। ইহার উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন—এ কথা সত্য বটে, তথাপি নাট্যবেদের বহুবিধ অঙ্গের কোন্‌টি কোন্ প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়—ইহাই এ প্রশ্নের মর্ম্ম। তাহা ছাড়া, কোন্ প্রমাণের বলে—কোন্‌টি অঙ্গী আর কোন্‌গুলি অঙ্গ তাহা নির্ণীত হইতে পারে ?—ইহাও এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য। মতান্তরে—নাট্যগত রূপকাদির পাঠ্য-অভিনয়-রস-গীত ইত্যাদির কি প্রমাণ অর্থাৎ কি সংখ্যা—এরূপ অর্থও ধরা হইয়াছে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৭ দ্রষ্টব্য)। (৫) অস্য—ইহার, নাট্যের। কীদৃশঃ প্রয়োগঃ—কিরূপে প্রয়োগ হইবে—ইহাই পঞ্চম প্রশ্ন। নাট্যের অঙ্গগুলি যুগপৎ প্রযুক্ত হইবে, কিংবা ক্রমানুসারে উহাদিগের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব নিয়ত থাকিবে কিংবা থাকিবে না ?—ইত্যাদি নাটকাদি রূপকের অভিনয়-বৈচিত্র্য-সম্বন্ধীয় এই পঞ্চম প্রশ্ন (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৭)। যথাতত্ত্বং—মুনিগণের বক্তব্য এই যে—তাঁহারা নাট্য-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অতএব, যে সকল প্রশ্ন তাঁহারা করিয়াছেন, সেগুলি হয়ত যথাযথ ক্রমানুসারে করা হয় নাই। অথবা, হয়ত প্রশ্ন করিবার বিষয় আরও কিছু থাকিতে পারে। সে সকল দুরুক্ত ও অনুক্ত বিষয়ের দোষানুসন্ধান না করিয়া যাহা যথার্থ তত্ত্ব তাহাই যেন মুনিবর স্বয়ং নিরূপণ করিয়া বলেন—ইহাই অভিপ্রায় (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৭)। সর্ব্বম্ এতৎ (মূল) লক্ষণ-পরীক্ষা পর্য্যন্ত।

৬। তেষাং তু (মূল)—'তু' অর্থে—অবধারণ। শ্রবণ করিয়াই—শ্রবণ করিবামাত্র বিলম্ব না করিয়া (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৮)। নাট্যবেদ-কথাং—'কথা' শব্দটির প্রয়োগ-দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ভরত যথাযথ তত্ত্বানুসারে নাট্যশাস্ত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ বলেন—প্রয়োগ-সম্বন্ধে যখন পঞ্চম প্রশ্ন, তখন প্রত্যক্ষতঃ প্রয়োগ প্রদর্শন ব্যতীত যথাযথ উত্তর দেওয়া হইল না এইরূপ কোন আশঙ্কা বা আপত্তি পাছে উঠে, তাহার নিরাকরণার্থ 'কথা'-শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে নাট্যপ্রয়োগ না করিয়া কেবল কথার সাহায্যে পরোক্ষভাবে উত্তর দিয়াছিলেন—ইহা বুঝাইতেই কথা-শব্দটির প্রয়োগ। অভিনব এরূপ সমাধানের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে মুনিগণ যে নাট্যপ্রয়োগ প্রত্যক্ষ দেখিতে চাহেন নাই, পরোক্ষে কথায় মাত্র শুনিতে চাহিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের পঞ্চম শ্লোক-স্থিত উক্তি ('বক্তুমর্হসি'—বলিতে আজ্ঞা হয়) হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। অতএব, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রয়োগ প্রদর্শনের উপায় কোথায় ? (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৮) এ হেতু মুনিবর নিজেকে অপরের ন্যায় কল্পনা করিয়া এই ষষ্ঠ শ্লোক পর্য্যন্ত বলিয়াছেন—ইহাই সিদ্ধান্ত। অপরে কেহ কেহ বলেন—প্রথম ছয়টি শ্লোক ভরত-মুনির কোন শিষ্য-কর্তৃক রচিত। ব্রহ্মণা উদাহৃতম্—প্রথম শ্লোকের এই ব্রহ্ম-পদ ভরত-মুনিকেই লক্ষ্য করিতেছে। ব্রহ্মণা—ব্রাহ্মণ-কর্তৃক, ব্রাহ্মণ-মুনি-ভরত-কর্তৃক। এইরূপ অর্থ করিলে চতুর্থ শ্লোকে 'ব্রহ্মন্' (ভরতের প্রতি মুনিগণ-কর্তৃক প্রযুক্ত সম্বোধন-পদ—হে ব্রাহ্মণ) পদের একবাক্যতাও হইয়া থাকে। সপ্তম শ্লোক হইতে ভরতের উক্তির প্রারম্ভ। আর সমগ্র নাট্যশাস্ত্র-মধ্যে যে যে স্থলে প্রশ্ন ও তাহার উত্তরের সূচক শ্লোক দেখা যায়, সেগুলি এই ভরত-শিষ্যের উক্তি। অভিনবগুপ্ত এ মতের পোষকতা করেন না। তাঁহার মতে একই গ্রন্থের মধ্যে একাধিক বক্তার উক্তি থাকার পক্ষে প্রমাণ নাই ; পক্ষান্তরে, একই ব্যক্তির লিখিত গ্রন্থে কাল্পনিক নিজ-পর-ব্যবহার-দ্বারা পূর্ব্বোত্তর-পক্ষ-স্থাপন-পদ্ধতি অন্যান্য ঋষি-প্রণীত স্মৃতি-ব্যাকরণ-তর্কাদি শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয়। প্রাচীন ঋষিগণের শৈলীই এইরূপ যে, তাঁহারা নিজ উক্তিকেও পরোক্তির আকারে প্রকাশ করিতেন। (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৮)।

এই প্রসঙ্গে কেহ বলেন—পাঁচটি প্রশ্নেরই উত্তর সংক্ষেপে প্রথমাধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। অপর অধ্যায়গুলি উহারই সবিস্তর ব্যাখ্যা-মাত্র। মতান্তরে, প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে প্রথম দুইটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আর সামান্যাভিনয়াধ্যায় হইতে চিত্রাভিনয়াধ্যায় পর্য্যন্ত অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে অবশিষ্ট প্রশ্নত্রয়ের উত্তর পাওয়া যাইবে। অভিনব-মতে এরূপ কোন ক্রম নাট্যশাস্ত্রে নাই। সমগ্র ষট্‌সহস্রী নাট্যশাস্ত্র একখানি অখণ্ড গ্রন্থ—একটি মহাবাক্য-স্বরূপ। উহার মধ্যে যথাযোগ্য অবসরে (যথায় যেরূপ প্রয়োজন সেইভাবে) এই মোট পাঁচটি প্রশ্নেরই সমাধান করা হইয়াছে। ক্রমানুসারে করা হয় নাই (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৮)।

—আপনারা শুচি ও অবহিত-চিত্ত হইয়া নাট্যবেদের ব্রহ্মা কর্তৃক সম্পাদিত উৎপত্তির (বিষয়) শ্রবণ করুন। ৭

হে বিপ্রগণ! পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব (মন্বন্তরের) অন্তর্গত কৃতযুগ অতীত হইলে পর, বৈবস্বত মনুর (সময়ান্তর্ব্বর্ত্তী ত্রেতাযুগ পর্য্যন্ত যাবতীয় মন্বন্তরান্তর্গত প্রত্যেক) ত্রেতাযুগ সমাগত হইলে—॥৮॥

৭। সম্ভবো ব্রহ্মনির্ম্মিতঃ (মূল)—'সম্ভব' শব্দের অর্থ উৎপত্তি। উৎপত্তি দুই প্রকারে হইয়া থাকে। এক প্রকার উৎপত্তির কথা আমাদিগের অতি পরিচিত; ধরুন, যেমন ঘটের উৎপত্তি। ঘট পদার্থটি পূর্ব্ব হইতে আমাদিগের জানাই আছে। এমন নহে যে, কোন এক কুম্ভকার সর্ব্বপ্রথমে এই অজ্ঞাত ঘট পদার্থটির আবিষ্কার করিল। তথাপি যে কুম্ভকার যখন যে ঘটটি নির্ম্মাণ করে, তখনই বলা হয় যে—সেই কুম্ভকার-কর্তৃক সেই ঘটটি উৎপাদিত হইল। এ ক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত ঘট-নামক পদার্থের সাধারণ রূপের অনুসরণ-পূর্ব্বক উপাদান মৃত্তিকাকে যথাযথভাবে রূপদান করার নামই ঘটের উৎপত্তি। পক্ষান্তরে, নাট্যের উৎপত্তি এরূপ নহে। 'নাট্য'-নামক কোন পদার্থ জনগণের নিকট অতি প্রাচীন কালে অজ্ঞাতই ছিল। পরে ব্রহ্মা উহার প্রথম সংগ্রহ করেন। অতএব, বলা চলে ব্রহ্মা উহার আদি প্রবক্তা বা আদি প্রবর্ত্তক। এই কারণে বলা হইয়াছে, 'সম্ভবো ব্রহ্মনির্ম্মিতঃ' ("তস্য তূৎপত্তিরেব বিরিঞ্চোপজ্ঞতয়া স্থিতেতি সম্ভবো ব্রহ্মনির্ম্মিত ইত্যুক্তম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৯)। কেহ কেহ বলেন যে, নাট্য বেদের ন্যায় অনাদি; অতএব, এ ক্ষেত্রে 'উৎপত্তি' শব্দের অর্থ গৌণ—স্মরণ, অভিব্যক্তি ইত্যাদি। অভিনবের মতে সেরূপ অর্থ করিলেও 'সম্ভব' পদটি হইতে যে কারণ-ভাবের আভাস পাওয়া যায় একথা অস্বীকার করা চলে না। প্রশ্ন উঠিতে পারে, নাট্যের কারণ কি হইতে পারে? উত্তরে বলা হয় যে, কাল সর্ব্বক্ষেত্রেই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এই কারণেই অষ্টম শ্লোকে 'পূর্ব্বম্' (পুরাকালে) এই পদটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। অষ্টম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে নাট্যোৎপত্তির যথোচিত কালের উল্লেখ-পূর্ব্বক যথাযোগ্য অধিকারি-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (অঃ ভাঃ পৃঃ ৯)।

৮। পূর্ব্বম্ (মূল) পুরাকালে অর্থাৎ কেবল এই প্রচলিত শ্বেত বরাহ-কল্পে নহে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পগুলিতেও এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল—ইহাই নিগূঢ়ার্থ। এক কল্প—ব্রহ্মার এক দিন (বা রাত্রি)—১৪ মন্বন্তর (অর্থাৎ মনুর অধিকার-কাল)—১০০০ চতুর্যুগ—মানব-মানের ৪৩২ কোটি বৎসর। চতুর্যুগ—৪৩২০,০০০ বৎসর। প্রত্যেক দিবা-কল্পে ব্রহ্মার দিন অর্থাৎ সৃষ্টি, আর প্রত্যেক রাত্রি-কল্পে ব্রহ্মার রাত্রি অর্থাৎ প্রলয়। এই ভাবে পর পর এক দিবা-কল্প ও এক রাত্রি-কল্প চলিতেছে। প্রত্যেক কল্পে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর; অতএব, এক মন্বন্তর—কিঞ্চিদধিক ৭১ চতুর্যুগ। উহাদিগের মধ্যে প্রথম—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর; আর বৈবস্বত মনন্তর হইতেছে সপ্তম। আমরা অধুনা শ্বেতবরাহ-কল্পের সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগে বর্ত্তমান রহিয়াছি।

অভিনব বলিয়াছেন—এই সকল মন্বন্তরেরই কেবল ত্রেতাযুগ-গুলিতে নাট্যবেদ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—কোন মন্বন্তরের কোন সত্যযুগেই কখনও উহার প্রবৃত্তি (প্রচার) দেখা যায় নাই। আদ্য স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের যে প্রথম সত্যযুগ তাহার সন্ধি-কাল পর্য্যন্ত সম্যগরূপে অতিক্রান্ত হইয়া যাইবার পর যে ত্রেতাযুগ দেখা দিল, তাহাতেই প্রথম নাট্যের উৎপত্তি। কেবল স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর কেন,—স্বায়ম্ভুব হইতে আরম্ভ করিয়া স্বারোচিষ, উত্তমৌজাঃ, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত পর্য্যন্ত সকল মন্বন্তরেরই সত্যযুগগুলি অতীত হইয়া ত্রেতাযুগগুলির আরম্ভ হইলেই নাট্য-প্রবৃত্তি দেখা যায়। অতএব মুখ্য সিদ্ধান্ত এই যে—ত্রেতাযুগমাত্রেই নাট্যপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে ("তত্র সর্ব্বেষ্বেব মন্বন্তরেষু ত্রেতাবসরে ব্রহ্মণা নাট্যবেদঃ প্রবর্ত্তিতঃ কৃতযুগে তু নেতি তাৎপর্য্যম্। যোজনা তু স্বায়ম্ভুবে আদ্যে মন্বন্তরে যৎ কৃতযুগং তস্মিন্ সম্যক্ সন্ধ্যতিক্রমেণ স্ফুটতরং প্রবৃত্তে। ন কেবলং তত্রৈব মন্বন্তরে। তুশব্দো যাবচ্ছব্দার্থে। যাবদ্বৈবস্বতস্য মনোরন্তরে সময়ে যৎ ত্রেতাযুগং, তস্মিন্ প্রবৃত্তেঽপি। তেনাদ্যন্তনিরূপণেন সর্ব্বেষাং মধ্যমন্বন্তরাণাং সংগ্রহঃ। তেন সর্ব্বেষু ত্রেতাযুগেষু নাট্য-প্রবৃত্তিরিত্যুক্তং ভবতি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৯—১০)।

লোক (গণ) গ্রাম্য-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত, কাম ও লোভের বশতাপন্ন ঈর্ষ্যা-ক্রোধাদি-দ্বারা সম্মূঢ় হইয়া সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হইলে—॥৯॥

দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-মহোরগগণ-কর্তৃক সমাক্রান্ত জম্বুদ্বীপ লোকপাল(গণ)-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়—॥১০॥

৯। গ্রাম্য-ধর্ম্ম—যাহারা শাস্ত্রার্থ কখনও শ্রবণ করে নাই, এ জাতীয় লোক যে দেশে বাস করে, সেই দেশে প্রচলিত ধর্ম্ম—স্বধর্ম্মের অপালনরূপ ধর্ম্ম; ইহা অধর্ম্মই—ধর্ম্ম নহে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১০)। গ্রাম্য-ধর্ম্মের আর একটি অশ্লীল অর্থ আছে—স্ত্রী-পুরুষ-মিলন।

কামলোভবশং গতে (মূল)—কাম-বশগত হইলে ঈর্ষ্যাদি ও রাজ্যলোভাদি হইতে ক্রোধাদি জন্মে। অতএব কাম-লোভ যথাক্রমে ঈর্ষ্যা-ক্রোধাদির কারণ। ঈর্ষ্যা ক্রোধাদি—আদি-পদ-দ্বারা অনুরাগ তৃষ্ণা ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। সুখিতদুঃখিতে (মূল)—সুখিত ও দুঃখিত—সুখ ও দুঃখ উভয়ভাবগ্রস্ত। যাঁহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে ঐকান্তিক সুখ ভোগ করেন (যথা সত্যযুগের বা ইলাবৃত-বর্ষের অধিবাসী জনগণ), অথবা যাঁহারা ঐকান্তিক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন (যথা কলির অন্তভাগবর্ত্তী বা নরকবাসী জনগণ), তাঁহাদিগের পক্ষে আর চিত্তবিক্ষেপ-রূপ ক্রীড়া সম্ভব নহে বলিয়াই যে দেশে বা যে কালে জনগণের পক্ষে সুখ-দুঃখ-মিশ্র ভোগের সম্ভাবনা সেই দেশ-কালে জনগণের চিত্তবিক্ষেপ করাইবার উপযোগী ক্রীড়নীয়ক সৃষ্টি করিবার অনুরোধ দেবগণ পিতামহকে করিয়াছিলেন (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১০)।

১০। জম্বুদ্বীপ—কর্ম্মভূমি।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, বর্ণিত কালে অধর্ম্মই প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব, প্রশ্ন হইতে পারে অধর্ম্ম-নিবন্ধন দুঃখই হওয়া উচিত, সুখ আসিবে কোথা হইতে যে—'সুখিত-দুঃখিত' বলা হইল? তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, জম্বুদ্বীপকে স্ববশে আনিতে শ্রীমদ্‌বিজয় অবিমুক্তাদি রুদ্রাবতার দেবগণও সচেষ্ট ছিলেন, আবার রাজস-তামস-প্রকৃতির জনগণের উপাস্য দানবাদিও জম্বুদ্বীপের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে তৎপর ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও সমাধান হয় না। দেব-দানবাদি-দ্বারা একযোগে জম্বুদ্বীপ আক্রান্ত হইলে ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মিশ্রণ ঘটা উচিত—আর এ অবস্থায় কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ না হওয়ায় লোকের অপ্রবৃত্তি (নিশ্চেষ্টতা) আসিবে।

মহেন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ-কর্ত্তৃক পিতামহ নিম্নোক্তভাবে উক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে—"আমরা (এমন একটি) ক্রীড়নীয়ক চাই, যাহা দৃশ্য ও শ্রব্য হইতে পারে। ১১।

এই বেদ-ব্যবহার শূদ্রজাতিগণের পক্ষে সম্যগ্‌রূপে শ্রবণ করাইবার যোগ্য নহে। অতএব, সার্ব্ববর্ণিক পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করুন"। ১২।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

তাহার উত্তর এই যে—লোকপালগণের অংশ-সমূহ হইতে উৎপন্ন নৃপতিগণ-কর্ত্তৃক জনগণ স্বধর্ম্ম-সাধনের অনুকূলরূপ নিয়োজিত হইয়াছিলেন; সেহেতু স্বধর্ম্মে লোকপ্রবৃত্তির অভাব ঘটে নাই।

সত্যযুগ সত্ত্বপ্রধান বলিয়া তৎকালে লোক কেবল স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন, তখন সুখ বা দুঃখের প্রতি গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য বুদ্ধি থাকে না। ত্রেতাযুগে রজোগুণ কিছু প্রবল হওয়ায় লোক দুঃখ-ত্যাগে ও সুখ-লাভে ইচ্ছুক হয়। অতএব, দুঃখকর শাস্ত্রীয় কার্য্যে লোককে প্রবৃত্ত করাইতে রাজকীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ঘটে। কিন্তু রাজকীয় বিধি-দ্বারা ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তন বড়ই অশোভন ব্যাপার। অতএব, এমন কোন উপায় আবিষ্কার করা প্রয়োজন, যাহার আকর্ষণে লোক স্বয়ং দুঃখকর হইলেও শাস্ত্রমার্গে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এইরূপ উপায়ই নাট্য—ইহাই তাৎপর্য্য (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১০-১১)।

১১। ক্রীড়নীয়ক—যাহা-দ্বারা চিত্ত ক্রীড়িত অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয়। চিত্ত স্বভাবতঃ ইতস্ততঃ বিক্ষেপ-প্রবণ। যাহা-দ্বারা উহা স্বধর্ম্মমার্গে নিয়োজিত হইতে পারে, তাহাকেই ক্রীড়নীয়ক বলা হইয়াছে। অথবা,—যাহা ক্রীড়ার পক্ষে হিতকর। অর্থাৎ—আপাতদৃষ্টিতে ক্রীড়ার দ্রব্য মনে হইলেও ইহা (চিনির আবরণ দেওয়া কটু ঔষধের মত) ফলতঃ চিত্তকে স্বধর্ম্মাভিমুখে প্রবর্ত্তিত করে। আর যাঁহারা যুগপৎ সুখ-দুঃখ-ভাগী, তাঁহারাই এরূপ ক্রীড়নীয়ক লাভের যোগ্য অধিকারী। (অবশ্য এ ক্রীড়নীয়কটি কীদৃশ পদার্থ হইবে—তৎসম্বন্ধে দেবগণের তখনও কোন ধারণা জন্মে নাই)। যাঁহারা অবিচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখে নিমগ্ন, তাঁহাদিগের পক্ষে এরূপ ক্রীড়নীয়কের প্রয়োজন নাই। কারণ, নিরবচ্ছিন্ন সুখী যাঁহারা, তাঁহারা ত ধর্ম্মেই নিবিষ্ট (যেহেতু ধর্ম্মের ফলই সুখ); আর যাঁহারা ঐকান্তিক দুঃখী, তাঁহারা অধর্ম্মে সম্পূর্ণ মগ্ন (—অধর্ম্মই দুঃখ-কারণ)। এ কারণ তাঁহাদিগের চিত্তকেও টানিয়া স্বধর্ম্মমার্গে স্থাপন করা অসম্ভব (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১০)। দৃশ্য—হৃদ্য। শ্রব্য—ব্যুৎপত্তি-জনক। একাধারে যাহা দৃশ্য ও শ্রব্য, তাহা যুগপৎ প্রীতি ও ব্যুৎপত্তির (জ্ঞানের) কারণ (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১১)।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—ইন্দ্রাদির এ ব্যাপারে কি স্বার্থ? উত্তর, জম্বুদ্বীপের অধিবাসিগণ যে লোক-পালাংশ-সম্ভূত নরপতিগণ-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এই সকল নরপতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ থাকিয়া যাগাদি-দ্বারা স্বর্গবাসী দেবগণের তৃপ্তি সাধন করেন। তাহার প্রতিদানে এই সকল স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাজগণ-দ্বারা শাসিত অধর্ম্ম-প্রবণ প্রজাপুঞ্জের প্রতি দেবগণের অহেতুকী করুণার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। পরস্পরের প্রতি দান-প্রতিদান-রূপ উপকার-প্রত্যুপকার-দ্বারা দৈব-মানুষ-সৃষ্টি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত—ইহা বিন্ধ্যবাসী প্রভৃতির মত। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—"পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ" (৩।১১)।

মতান্তরে—মহেন্দ্রাদির ইহা ক্রীড়া-রূপ নিজ প্রয়োজন। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে দেবগণেরও এইরূপ মনোভাবের উদয় স্বাভাবিক। ত্রেতা মানবের মনে রজোবৃদ্ধি করে। সেই উদ্ভূত-রজোগুণ-সম্বন্ধ-যুক্ত যাগাদি-দ্বারা দেবগণেরও অন্তরে রজোগুণের সম্পর্ক। দেবগণ রজোগুণ-মলিন-হৃদয় হওয়ায় তাঁহাদিগের ক্রীড়নীয়ক লাভের এই অভিলাষ (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১১)।

১২। সত্যযুগে সকলেই সত্ত্ব-প্রকর্ষবশতঃ স্বধর্ম্মপরায়ণ। ত্রেতায় রজোবৃদ্ধি বশতঃ শূদ্রাদি জাতি ত্রৈবর্ণিকের অনুবৃত্তি করিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন। 'শাস্ত্র তোমাদিগকে এইরূপ নির্দেশ দিয়া থাকেন'—দ্বিজাতিগণের এইরূপ মুখের বচনে তাঁহাদিগের সন্তুষ্টি হয় না। অথচ তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ বেদাধ্যয়নেও অধিকার নাই। তাই দেবগণের এই প্রার্থনা।

সার্ব্ববর্ণিক—যেহেতু নাট্য সরস সুকুমার পদ্ধতিতে প্রত্যেক বর্ণের স্ব-স্ব-কর্ত্তব্য-নিরূপণের উপায় স্থির করিয়া দেয়, অতএব সর্ব্ব-বর্ণের ইহাতে সমান অধিকার। যে সকল শূদ্রাদি বর্ণ বেদে অনধিকারী, তাঁহাদিগের ত ইহাতে অধিকার আছেই; যাঁহারা (যথা ত্রৈবর্ণিক) বেদে অধিকারী, অধীতশাস্ত্র, সুপণ্ডিত, তাঁহারাও ইহার সাহায্যে অবিচলিতভাবে কার্য্যাকার্য্য-বিবেকে সমর্থ হন—এই কারণেই ইহাকে সার্ব্ববর্ণিক বলা হইয়াছে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১১-১২)।

বংশ-গৌরব

(শেখ সাদী হইতে)

ফুলের সেরা গোলাপ যে, সে
কাঁটার মাঝে লয় জনম,
তাই বলে' এ জগতে তার
আদর কোথাও নয়কো কম।
গুণ যদি রয় দেখাও সে-গুণ,
দেখায়ো না বংশকে,
গুণী -জনের আদর হেথায়,
বংশ নাহি চায় লোকে।

শেখ হবিবর রহমান

কামনা

কাজের ফাঁকে সলাজ চোখে একটুখানি চাওয়া,
নিশুত রাতে খাটো সুরে একটুখানি গাওয়া,
গোলাপ-রাঙা মধুর মুখের একটুখানি হাসি,
সেই তো আমার সাধের স্বপন, সেই তো ভালোবাসি।

আঁধার নামে এ-জীবনে না থাকে কোনো আলো,
সে দিন রাণী হৃদয় দিয়ে কেবলি বেসো ভালো।
জগৎ যবে ফেরাবে মুখ, বলবে চিনি না যে!
সে দিন যেন যুগল প্রাণে প্রেমের বাঁশী বাজে!

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

উনিশ

ঝিম্‌লিকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল রাজবাড়ীর এক কোণে বাঁশের বেড়া-দেওয়া ছোট একটা ঘরে। ঘরের আগড় বাঁশের তৈরী হলেও এমন মজবুত এবং বাইরের দিকে শক্ত দড়ি দিয়ে এমন ভাবে বাঁধা যে, ভিতর থেকে সে দড়ি কেটে বেরিয়ে আসা ঝিম্‌লির পক্ষে একেবারে অসম্ভব। ক'দিন ঝিম্‌লি ঐ ঘরেই বন্দী আছে। দিনে একবার সামান্য কিছু আহার জোটে,—তাই খেয়ে সে কোনো রকমে প্রাণ ধারণ করে আছে।

রাত তখন দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাইরে থেকে বিরাট উৎসবের তুমুল কোলাহল—দামামা-মাদলের সঘন ধ্বনি ঝিম্‌লির ক্ষুদ্র কারা-কক্ষে প্রবেশ করে তাকে অস্থির করে তুলেছে। প্রতাপের প্রাণদণ্ডের আদেশের কথা সে শুনেছিল সে-দিন দরবারে, কিন্তু কি ভাবে কখন্ সে আদেশ প্রতিপালিত হবে, তা সে জানতে পারেনি। প্রতাপকে রাজ-বেশে পাহাড়ের উপর বেঁধে রাখার খবরও সে জানে না। তার ভয়, এই রাত্রির উৎসব সম্ভবতঃ প্রতাপের দণ্ডপালন-সম্পর্কেই হচ্ছে! প্রতাপকে কিছুতেই আর বাঁচানো গেল না! তার রক্ষার কোনো উপায় নেই ভেবে ঝিম্‌লি এ ক'দিন অঝোরে অশ্রু-বর্ষণ করেছে। তারই দোষে সম্পূর্ণ নিরপরাধ রাণী জুমেলো-কেও আজ থাকতে হয়েছে কারা-গৃহে বন্দী! হয়তো তাকেও ভোগ করতে হবে মৃত্যু-দণ্ড কিংবা অতি কঠোর নির্য্যাতন! কি তার দুর্ভাগ্য! রাণীর স্নেহে এবং আদরেই সে বড় হয়েছে এবং তারই দয়ায় সে স্বচ্ছন্দে বেড়াবার স্বাধীনতা পেয়ে জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতে পেরেছে। মায়ের মতো সেই রাণী আজ তারই জন্য শুধু লাঞ্ছিতা ও নির্য্যাতিতা নয়, তাকে প্রাণ দিতে হবে! এ দুঃখ রাখবার স্থান নেই।

কিন্তু এ সবের কোনো প্রতিকার হ'তে পারে না? সে এমনই শক্তিহীন যে, কিছুই করতে পারবে না? তীর-ছোড়া শিখে কি তবে তার লাভ হলো—যদি তা কাজে লাগানো না গেল? সে সংকল্প করলো, এই কারা-গৃহ থেকে একটি বার বেরুতে পারলে প্রতাপ এবং রাণী-মার উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে এবং প্রয়োজন হলে তার ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না! এদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য অপরের প্রাণ নেওয়া যতই তাতে পাপ হোক, সেই মহাপাতক সে শিরোধার্য্য করবে এবং প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বিসর্জ্জন দেবে তার নিজের প্রাণ।

কিন্তু এ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করা তার পক্ষে কখনো সম্ভব হবে? রুদ্ধ ঘরে বেদনায় সে ছটফট্ করতে লাগলো।

মজবুত একটা লম্বা দড়ি দিয়ে তার কোমর বাঁধা এবং ঐ দড়ির দু'দিক এমন ভাবে শক্ত একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা যে, তার গাট রয়েছে বাইরের দিকে:—যেন হাত দিয়ে সে তা খুলতে না পারে। ঘরের দোরও তেমনি বাইরের দিকে বাঁধা। এ অবস্থায় এমন সুবিধা ছিল না যে, দোর পর্য্যন্ত সে পৌঁছুতে পারে—মুখ ঘুরিয়ে কি মাথা নীচু করে দাঁত দিয়ে বন্ধন-রজ্জু কাটবার চেষ্টা করবে! সুতরাং নিজের চেষ্টায় এ ঘর থেকে বেরুনো একেবারেই অসম্ভব। অথচ প্রতাপ এবং রাণীকে বাঁচাতে হ'লে তাকে বেরুতেই হবে! দুশ্চিন্তায় সে অস্থির, এমন সময় অকস্মাৎ তার উকুক্ টিয়ারা ঘরের চালের নীচের ফাঁক দিয়ে গলে এসে একেবারে ঝিম্‌লির কাঁধের ওপর চেপে বস্‌লো।

ঝিম্‌লির মনের উপর থেকে দুশ্চিন্তার ভারী পাথর-খানা গেল চকিতে সরে। ঝিম্‌লি তখন টিয়ারার মুখে বাঁধনের দড়িটা তুলে দিয়ে সেটা কেটে ফেল্‌বার ইঙ্গিত জানালো। সুবোধ ছেলের মতো টিয়ারা তখনি ঐ কাজে লেগে গেল। তার ঘন কালো মুখের শাদা ধব্‌ধবে দাঁতগুলোর কর্ম্মতৎপরতা দেখে ঝিম্‌লির মন আশায়-আনন্দে স্পন্দিত হতে লাগলো। ক'মিনিটের মধ্যেই টিয়ারা দড়িটাকে দাঁতে কেটে দু'টুক্‌রো করে ফেললে। ঝিম্‌লি তাকে আবার দেখিয়ে দিল দোর-বাঁধা দড়িটা। টিয়ারা সে দড়িও কাটলো। তার পর কোমরের দড়ি। ঝিম্‌লির ইঙ্গিতে সে বাঁধনও কাটলো! ঝিম্‌লি মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে কারাকক্ষের বাইরে এসে নিশ্বাস ফেল্‌লো!

মাদলের ভৈরব রবের সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে আস্‌ছিল প্রচুর উন্মাদনার সংবাদ; কিন্তু সে সংবাদ রাজ-বাড়ীর

প্রাঙ্গণ থেকে আসছিল না, গ্রামের দক্ষিণ দিক্‌কার বড় মাঠ থেকে আসছিল—যেখানে বছরে এক বার করে মেলা বসে। গুরুতর না কিছু ঘট্‌লে ও-মাঠে উৎসবের কোনো আয়োজন হয় না। ঝিম্‌লি আসল ব্যাপার বুঝতে না পেরে ভীত হলো, উদ্বিগ্ন হলো। তার মনে হলো, ব্যাপার যাই হোক, এখনি তাকে সে ব্যাপার দেখতে হবে। তাড়াতাড়ি ছুটে যেতে সাহস হয় না। যদি কেউ দেখে ফেলে! তাই সে খুব সন্তর্পণে সে-শব্দ লক্ষ্য করে ঐ দিকে রওনা হলো। কিন্তু দু'-চার পা গিয়েই বুঝতে পারলো, রাজ বাড়ীতে একটি প্রাণীও নেই,—সকলেই সম্ভবতঃ উৎসবের মাঠে এসে জড়ো হয়েছে।

অন্য কোনো দিকে মন না দিয়ে সে তখন ছুটলো সেই মাঠের দিকে। গা-ঢাকা দিয়ে চুপি চুপি সে জায়গার কাছাকাছি এসে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়ালো। সেখান থেকে যা দেখ্‌লো, তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেল! রাজা থেকে আরম্ভ করে নাগাদের প্রধান প্রধান সব লোক সেখানে উপস্থিত—তাছাড়া সাধারণ লোকের সংখ্যাও অগণিত। চারটে প্রকাণ্ড কড়ায় তেল, না জল, কি ফুটোনো হচ্ছে ঠিক বোঝা গেল না,—ওগুলোর চার দিক্ ঘিরে বিস্তর লোক যুদ্ধের সাজ পরে নাচছে মাদলের তালে-তালে। তা ছাড়া বিরাট একটা কাঠের ঢাক রাখা হয়েছে এক পাশে। সে ঢাক দেখে ঝিম্‌লির বুক কেঁপে উঠ্‌লো। সে জান্‌তো, বড় রকম শত্রু-নিপাত হলে কিংবা ঐ রকমের কিছু ঘট্‌লে সেই সংবাদ এই কাঠের ঢাক বাজিয়ে দিকে দিকে ঘোষণা করা হয়। নৌকার মতো দেখতে এই ঢাকের উপর কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করলে যে-শব্দ ওঠে, তা বহু দূর থেকে শোনা যায়।

চারটে কড়ার ব্যবস্থা দেখে ঝিম্‌লি বুঝ্‌তে পারলো, চার জন অপরাধীকে এই সব কড়ার ফুটন্ত তেলে বা জলে ফেলে মারবার উদ্যোগ চলেছে। এক জন অপরাধী তো জংলী-পুলিশ, দ্বিতীয় অপরাধী ঝিম্‌লি নিজে এবং তৃতীয় রাণী জুমেলা! কিন্তু চতুর্থ অপরাধী কে? ঝিম্‌লি কিছু ঠিক করতে পারলো না। অথচ আর বিলম্ব করা চলে না,—হয়তো এখনি আসামীদের নিয়ে আসা হবে তপ্ত কড়ায় ফেল্‌বার জন্য। প্রতাপকে বা রাণীকে সেখানে তখন দেখতে পেলো না, হয়তো অবিলম্বে তাদের আনা হবে। সে আবার চল্‌লো ফিরে বাড়ীর দিকে এবং সোজাসুজি নিজের ঘরে ঢুকে সংগ্রহ করলো তার তীর-ধনুক আর একখানা ছোরা। মনে তার সুদৃঢ় সংকল্প, যারা প্রতাপ বা রাণীমার অনিষ্ট করতে চাইবে, তাদের কাকেও সে রেহাই দেবে না,—রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজ্য—সব যদি ধ্বংস হয়ে যায় তো যাক্!

কিন্তু ইচ্ছা করলেই কি ধ্বংস হয়? কি করে ঝিম্‌লি এ অসাধ্য সাধন করবে? সে একা, আর ওদিকে এই বিপুল জনতরঙ্গ! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার নজরে পড়লো ক'জন লোক রাণীকে ধরে টেনে নিয়ে আসছে মাঠের দিকে,—একটু পরে হয়তো এখনই তাকে আনবার জন্য লোক যাবে কারা-কক্ষে। তাকে না পেলে কি যে হবে, তার ঠিক নেই। অতএব যা করতে হয়, এখনি! সতর্ক গতিতে সে একটু অগ্রসর হলো। অগ্রসর হতেই চোখে পড়লো ছোট একটা জলন্ত উনুন। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে সে সেই উনুনের শুকনো একখণ্ড বাঁশ টেনে নিয়ে তৈরী করলো মশাল। সেই মশালের আগুনে প্রথমে ছোট কারা-গৃহে, শেষে রাজ-বাড়ীর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। দিয়ে সে ছুটলো আবার সেই উৎসবের মাঠের দিকে।

বিধাতার বিচিত্র বিধানে পথে মিললো একটা কলা-বাগান। সে বাগানে তার সেই প্রিয় হাতী রয়েছে। ইঙ্গিত-মাত্র হাতী তার কাছে এসে তাকে পিঠে তুলে নিল। ঝিম্‌লি তখন দ্রুত অথচ খুব সতর্ক ভাবে হাতীতে চড়ে এগিয়ে চল্‌লো!

আবার সেই গাছের আড়ালে এসে সে দাঁড়ালো। হাতীর কাঁধে বসে সে এখন অনেক কিছু দেখতে পেল। উৎসব-ক্ষেত্র তখন অনেকগুলো বড় বড় মশালের আলোয় প্রদীপ্ত। ঝিম্‌লি দেখ্‌লো, কড়া চারটের নীচে তখনও দাউ-দাউ করে আগুন জ্বল্‌ছে। অকস্মাৎ তার দৃষ্টি একেবারে স্থির হয়ে গেল—ঠোঁট কাঁপতে লাগলো—হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো—যেন ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছে!

উৎসব-প্রাঙ্গণের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় সে দেখ্‌লো, খাড়া ভাবে মাটীতে পোঁতা মোটা কাঠের খুঁটির সঙ্গে প্রতাপকে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে এবং সেনাপতি নান্দু একটা বেত-হাতে তাকে মারবার জন্য উদ্যত! আর কোনো দিকে না চেয়ে ঝিম্‌লি তখনই তার ধনুকে তীর যোজনা করে স্থির-লক্ষ্য করলো! পর-মুহূর্ত্তে নান্দুর ডান হাতের কব্জিতে গিয়ে বিদ্ধ হলো সেই তীর,—সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে খসে পড়লো বেত এবং নান্দু চীৎকার করে মাটীতে বসে পড়লো। কি করে কি হলো, কেউ বুঝতে পারলো না! কিন্তু নান্দু সহজে ক্ষান্ত হবার লোক নয়। বেত্রাঘাত করতে না পেরে সে বাঁ হাতে একটা বর্শা নিয়ে প্রতাপকে সেই মুহূর্ত্তে শেষ করবার জন্য বর্শা তুললো প্রতাপের পিঠ লক্ষ্য করে। এ ভাবে প্রতাপকে হত্যা করার আদেশ রাজার ছিল না অবশ্য, কিন্তু রিষের বিষে অন্ধ নান্দু রাজার আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করার চেয়ে শত্রু-নিপাতের জন্য ক্ষেপে উঠলো! তার বাঁ হাতের উদ্যত বর্শা সজোরে নিক্ষিপ্ত

হবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে আর একটা তীর এসে তার পিঠ ফুঁড়ে বুক পর্য্যন্ত বিঁধলো। এবার তার চীৎকার করারও সময় হলো না,—মাটীতে একেবারে লুটিয়ে প'ড়ে বার কয়েক হাত-পা ছুড়ে সে জড়ের মতো নিস্পন্দ হলো।

সেনাপতি নান্দুর এই আকস্মিক দুর্দ্দশায় চারি দিকে ভয়ানক আতঙ্ক আর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো, কাছেই কোনো প্রবল শত্রুর আবির্ভাব হয়েছে নিশ্চয়! মুহূর্ত্তে আনন্দ-উৎসব ভয়ার্ত্ত লোকের ছুটোছুটি এবং চেঁচামেচির হট্টগোলে বিশৃঙ্খল হলো,—মাদলের দুম্-দাম্, কাঁসরের ঝন্ঝনা, নর্ত্তক ও গায়কদের লম্ফ-ঝম্ফ-উন্মাদনা সব এক-সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। তাদের ভয়ের মাত্রা আরো বাড়লো, যখন সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত আকাশ আলোকিত করে আগুনের লেলিহান শিখা তাদের বস্তির বুকে দেখা দিল। সে আলোয় উৎসব-ক্ষেত্র একেবারে লাল হয়ে উঠলো! ঘর-বাড়ী বিরাট আগুনে পুড়ে ছাই হচ্ছে—বুঝতে পেরে সকলে ব্যস্ত হয়ে ছুটলো ঘর-বাড়ীর দিকে।

ক'মিনিটের মধ্যেই মাঠ হলো সম্পূর্ণ জন-হীন। মাটীতে পড়ে রইলো শুধু নান্দুর প্রাণহীন দেহ এবং খুঁটিতে বাঁধা প্রতাপ। ঝিমলি অবিলম্বে হাতী নিয়ে চ'লে এলো প্রাঙ্গণের মাঝখানে সেই খুঁটির কাছে এবং তখনি হাতীর পিঠ থেকে নেমে ছোরা দিয়ে প্রতাপের বাঁধন কেটে তাকে মুক্ত করলো। ঠিক সেই সময়েই অনতিদূরে হাত-পা-বাঁধা দু'টি স্ত্রীলোকের উপর তার নজর পড়লো। কাছে গিয়ে ঝিমলি দেখে তাদের এক জন রাণী-মা, আর এক জন মনুয়া।

মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে তখনই সে তাদেরও মুক্ত করলো। মনুয়াও যে রাজার কোপানলে প্রাণ দিতে বসেছিল তা বুঝতে পেরে ঝিমলির মন থেকে আগেকার সে বিদ্বেষ ভাব দূর হয়ে গেল এবং তার উপর মমতায় ঝিমলির মন ভরে উঠলো।

প্রতাপের মুখে কথা নেই—সে শুধু তাকিয়ে রইলো ঝিমলির দিকে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে। তখনকার উত্তেজনায় রাণী এবং মনুয়ারও যেন কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছিল! প্রতাপ, রাণী এবং মনুয়া তিন জনকে সম্বোধন করে ঝিমলিই প্রথম কথা বললো—এখানে আর একটুও দেরী করা নয়,—এখনি রাজা লোক-জন এনে আবার কি বিভ্রাট সৃষ্টি করবে! যা কোনো দিন করিনি, যা কখনো করবো বলে ভাবিনি, আজ বাধ্য হয়ে তাই করতে হয়েছে, সেনাপতি নান্দুকে তীর বিঁধে হত্যা। আমার এ অপরাধ রাজা কখনো ক্ষমা করবে না। রাজার লোক আগুন নিবিয়ে এখনি আবার আসবে—কাজেই এখনি সকলের পালানো দরকার। চলো, সবাই এই হাতীর পিঠে চেপে বসি। আমার পোষা হাতী—সে পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাতারাতি অনেক দূর আমাদের নিয়ে যেতে পারবে। রাণীমা, তুমিও এসো আমাদের সঙ্গে।"

রাণী জুমেলা মাথা নেড়ে বললো :—"তা হয় না, রাজাকে ফেলে আমি কোথাও যাবো না।"

—"কিন্তু রাজা যে তোমায় ক্ষমা করবে না রাণী-মা, প্রাণে মেরে ফেলবে।"

—"মারুক! মরি তো রাজার হাতেই মরবো।"

—"আমার জন্যই তোমার এই বিপদ রাণী-মা। আমায় ক্ষমা করো, আমি পালাবো না—এদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে আবার আমি তোমার কাছে আসবো। রাজা যে শাস্তি দেন তোমার সঙ্গে তা গ্রহণ করবো।"

—"না ঝিমলি, তুই এদের নিয়ে এ দেশ থেকে চলে যা। আমার যা হবার হবে। তোর মরণ আমি দেখতে পারবো না। তুই পালা, শীগ্‌গির পালা এখান থেকে।"

—"আমার ওপর রাগ করবেন না রাণী-মা?"

—"না, না, রাগ করবো না। আর কথা ক'য়ে দেরী করিস্‌নে, পালা।

ঝিমলি তখন প্রতাপকে বললো,—"হাতীর পিঠে তোমরা হয়তো বসে থাকতে পারবে না। ঐ খুঁটিতে আর রাজার ঐ বসবার জায়গার চার দিকে যে দড়ি আছে সেগুলো তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।" বলেই সে তার হাতের ছোরা প্রতাপকে দিল। প্রতাপ নিঃশব্দে ঝিমলির নির্দ্দেশমতো দড়িগুলো নিয়ে এলো। তখন ঝিমলির ইঙ্গিতে হাতী হাঁটু গেড়ে বসলো। প্রতাপ হাতীর পিঠে অনেকবার চলা-ফেরা করেছে ব'লে তার জানা ছিল, কি ভাবে দড়ি বাঁধতে হয়। ঝিমলির সাহায্যে প্রতাপ প্রথমে একটা দড়ি হাতীর গলা ঘিরে বাঁধলো, তার পর আর একটা লম্বা দড়ি গলা থেকে সুরু করে লেজ ঘুরিয়ে আবার গলার কাছে নিয়ে এলো। বুক-পিঠ জড়িয়ে বাঁধবার মতো দড়ি ছিল না, কাজেই তাদের ঐ ভাবেই যেতে হলো। ঝিমলির কথানুযায়ী প্রতাপ বসলো হাতীর ঠিক কাঁধের ওপর মাহুতের জায়গায় এবং তার পিছনে ঝিমলি এবং মনুয়া পাশাপাশি হাতীর পিঠের দড়ি শক্ত করে ধরে। রাণী-মার কাছে সজল চোখে বিদায় নিয়ে ঝিমলি হাতীকে ইঙ্গিত করলো চলবার জন্য। সে ইঙ্গিতে বিরাট-দেহ হাতী তখনি ছুটলো জঙ্গলের পথে—পিঠে তিন জন সওয়ার নিয়ে।

বিশ

দেহ প্রকাণ্ড হলেও হাতী চলতে পারে বেশ দ্রুত এবং একেবারে নিঃশব্দে—পথ যদি মুক্ত হয়। ঘন জঙ্গলে নিজেই সে পথ করে নেয় সামনের গাছ-পালা পায়ের চাপে ভেঙ্গে, উপরের এবং দু'পাশের লতাপাতার জাল শুঁড় দিয়ে ছিঁড়ে। সুতরাং জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে চলা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রতাপ মাহুতের

জায়গায় বসলেও হাতীকে চালাচ্ছিল ঝিম্‌লি। কারণ, ঝিম্‌লির ভাষাই সে বুঝতো এবং তাকেই সে মানতো। পাহাড়ের অনেক জায়গাই ঝিম্‌লির জানা! নাগা-কুকিদের বস্তিগুলো যথাসম্ভব দূরে রেখে, সাধারণের চলাচলের পথ এড়িয়ে বনের ভিতর দিয়ে হাতীকে সে চালিয়ে নিয়ে চল্‌লো।

পাহাড়-অঞ্চলে হিংস্র জানোয়ারের অভাব নেই—বিশেষ রাত্রে। কিন্তু জংলি হাতী রাত্রে পথ চলে এবং সে কারো তোয়াক্কা রাখে না। সারা রাত অবিশ্রাম সে চললো কোনো ওজর না করে। এই দীর্ঘ দুর্গম পথের বহু স্থানেই তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে ছোট-বড় অনেক খাদ, অনেক ঝরণা-স্রোত। এ ভাবে যতটা পথ অতিক্রম করা হলো, পায়ে চলে ততটা যেতে চার দিনেরও বেশী সময় লাগতো।

সকালে দু'টো উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গায় এসে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য তারা হাতীর পিঠ থেকে নামলো। তখন তিন জনেই খুব ক্ষুধার্ত্ত এবং হাতীরও কিছু আহারের প্রয়োজন। ঝিম্‌লি হাতীকে ছেড়ে দিল জঙ্গলে ঢুকে গাছের পাতা খাবার জন্য। নিজেদের আহারের উপকরণ সঙ্গে কিছু ছিল না, সুতরাং বন থেকে কিছু সংগ্রহ করা যায় কি না, দেখবার জন্য তিন জনেই বনের দিকে গেল। একটা গাছে পাকা বেল পাওয়া গেল। প্রতাপ বহু কষ্টে বেল ক'টা পেড়ে আনলো এবং তাই দিয়ে তিন জনে কোন রকমে ক্ষুধা নিবৃত্তি করলো।

প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হতে হলো। ঝিম্‌লি তার তীর রাখার চোঙার ভিতর থেকে বাঁশীটা বার ক'রে তাতে একটা সুর তুললো,—সেই সুরের ঝঙ্কার প্রভাত-বাতাসে নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো পাহাড়ের কন্দরে-কন্দরে। প্রতাপ আর কুসমিয়া মুগ্ধ হলো সে সুরে। কিছুক্ষণ পরে সুরের মোহে হাতী নিজে থেকে এসে হাজির হলো ঝিম্‌লির কাছে।

তার পর আবার যাত্রা সুরু। আর মাইল দশেক গেলেই একটা পার্ব্বত্য নদী—তার অপর পারে পৌছুতে পারলেই অনেকখানি নিরাপদ। কারণ, নাগারা সাধারণতঃ সে নদী অতিক্রম করে না।

বেলা প্রায় দুপুরের সময় তারা সেই নদীর তীরে এসে পৌছুলো। এই দীর্ঘ পথে ঝিম্‌লি আর কুসমিয়ার মধ্যে কথা বড় বেশী হলো না। ঝিম্‌লি কুসমিয়াকে জানে মনুয়া বলে এবং মনুয়াও কখনো সন্দেহ করেনি ঝিম্‌লির 'ঝিম্‌লি' ছাড়া আর কোন নাম আছে বা থাকতে পারে বলে! প্রতাপের খোঁজে বেরিয়ে কেমন করে তাকে নাগা-রাজার বেশে পাহাড়ের উপর দেখতে পায় এবং কেমন করে সে তাকে উদ্ধার ক'রে দু'জনেই নাগাদের হাতে ধরা পড়েছিল, মনুয়া শুধু এই কথাগুলোই ঝিম্‌লিকে বলেছিল। এ ছাড়া ঝিম্‌লিকে সে একবার শুধু জিজ্ঞেস্ ক'রেছিল :—"জংলি দারোগার সঙ্গে তুমি তো ভাঙা হিন্দুস্থানীতে কথা বললে, এ ভাষা তুমি কোথায় শিখ্‌লে?"

উত্তরে ঝিম্‌লি বলেছিল,—"কোথায় শিখেছিলাম মনে নেই, তবে ভালো ক'রে সব কথা বলতে পারি না। দারোগা বাবু নাগা ভাষা বোঝে না, কাজেই তার সঙ্গে ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্থানীতে কথা বল্‌তে হয়েছে।"

ঝিম্‌লি স্পষ্ট বললো, ঐ হিন্দুস্থানীই তার শিশু-কালের মাতৃ-ভাষা। আসল কথা, সে মনুয়াকে তখনও নাগা-মেয়ে বলে ধরে নিয়েছিল এবং হয়তো তার কাছে শিশু-বয়সের কোন কথা-বলার আবশ্যকতা বোধ করেনি। মোটের উপর দু'জনের কাছেই দু'জনের প্রকৃত পরিচয় অপ্রকাশ রয়ে গেল।

নদী-তীর পর্য্যন্ত এতটা পথ যে সম্পূর্ণ নিরাপদে আসতে পারবে, এ-ভরসা তাদের ছিল না। ভগবানের কৃপায় বিপদ কেটে গেছে বলেই তাদের মনে হলো এবং তাই ভেবে আনন্দে উৎসাহে নদী অতিক্রম করতে লাগলো। পাহাড়ি নদী,—জল তেমন গভীর নয়—হাতী অনায়াসে হেঁটে পার হতে লাগলো।

অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করা হয়েছে, এমন সময় এক দল কুকি ভীষণ চীৎকার করে তীরের প্রায় কাছাকাছি হাজির হলো এবং সেখান থেকে বর্ষার বারি-ধারার মতো তারা তীর বর্ষণ করতে লাগলো হাতী এবং তার আরোহীদের লক্ষ্য করে। হাতী ভয় পেয়ে এদিক্-ওদিক্ ছোটবার জন্য অস্থির। কিন্তু ঝিম্‌লির কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হয়ে তারই নির্দ্দেশ-মতো এগিয়ে চললো।

কুকিরা ততক্ষণ আরো এগিয়ে এসেছে। তীর-বর্ষণে এক-তিল বিরাম নেই। হাতীর পিছনে ক'টা তীর এসে লাগলো এবং শেষে একটা তীরের ফলক এসে বিঁধলো ঝিম্‌লির বাঁ হাতে। ঝিম্‌লি চীৎকার করে হাতীকে ইঙ্গিত করলো আরো দ্রুত চলবার জন্য! ইঙ্গিতের কোন প্রয়োজন ছিল না,—হাতী আহত হয়ে নিজেই পাগলের মতো ছুটতে আরম্ভ করেছিল সামনের দিকে।

ঝিম্‌লির চীৎকারে চমকিত হ'য়ে প্রতাপ পিছন ফিরে তার দিকে চেয়ে দেখলো, ঝিম্‌লির হাতে একটা তীর বিধে আছে এবং সে যেন স্থির ভাবে বসে থাক্‌তে পারছে না। প্রতাপ কোনো রকমে এক-হাতে তাকে ধরে রাখলো।

কুকিরা তখন তীরের সংলগ্ন একটা উঁচু জায়গার কাছে এসেছে। প্রচণ্ড চীৎকারের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ তারা একেবারে দাঁড়িয়ে গেল

এবং পর-মুহূর্ত্তে আবার ছুটলো উল্টো দিকে—যে দিক্ থেকে আসছিল, সেই দিকে। অদূরে ঝোপের আড়ালে পৌঁছুবার আগেই একসঙ্গে ক'টা বন্দুকের শব্দ হলো নদীর অপর পার থেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ক'জন কুকি ভমড়ি খেয়ে মাটীতে পড়লো। কুকিরা আক্রান্ত হয়ে তখুনতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলো।

বন্দুক ছুড়েছিল এক দল বৃটিশ-সৈন্য। কুকিদের সন্ধানে তারা ঐ সময় এই পথেই আসছিল। কুকিদের দেখতে পেয়ে এবং এরা যে খুব সাধু উদ্দেশ্যে নদীর দিকে আসেনি, তাই বুঝে সৈন্যদল তাদের লক্ষ্য করে গুলী ছোড়ে।

ইত্যবসরে হাতী আর কোনো রকম বাধা না পেয়ে নদীর অপর পারে পৌছুলো। ঝিমলির ইঙ্গিতে হাতী বসলে প্রতাপ ঝিম্‌লিকে ধরে নামালো। কুসুমিয়া বিনা সাহায্যেই নামতে পারলো।

প্রতাপ খুব সাবধানে আস্তে আস্তে ঝিম্‌লির হাতের তীর টেনে বার করলো। তখন ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো ক্ষত স্থান থেকে। আর কিছু না পেয়ে প্রতাপ তার পরনের কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে তাই দিয়ে ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ্ বেঁধে দিল। কিন্তু ঝিমলি বসে থাকতে পারলো না, তার মাথা ঝিম-ঝিম করতে লাগলো। কাজেই তাকে সেইখানে ঘাসের উপর শুইয়ে রাখা হ'লো। ঝিম্‌লি তখন করুণ নেত্রে প্রতাপের দিকে চেয়ে বললো :—"বিষ-তীর মেরেছে—আমি বাঁচবো না—আর কথা কইতে পারচি না।"

তার পর ঝিম্‌লি প্রতাপের একখানা হাত ধরে সে হাতে একবার চুমো খেয়ে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো প্রতাপের মুখের দিকে—যেন যুগ-যুগান্তের বাসনা এবং পুঞ্জীভূত প্রেম নিয়ে!

ঝিম্‌লির দু'খানা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে চেপে ধরে ছল-ছল চোখে আকুল কণ্ঠে প্রতাপ বলে উঠ্‌লো :—"তোমার পরিচয় আজও জানতে পারিনি ঝিম্‌লি, জানবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তুমি আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করে রয়েছ। তুমি এ ভাবে চ'লে যেতে পারবে না—কিছুতেই না। এ কি, তুমি অমন করছো কেন? কি হলো? কিছুই যে করতে পাচ্ছি না তোমার জন্য। ঠাকুর, ঠাকুর, কোথায় তুমি! ঝিম্‌লিকে বাঁচিয়ে দাও—বাঁচিয়ে দাও!"

একান্ত অসহায় প্রতাপ! কিন্তু দারুণ বিষের ক্রিয়া রোধ করবার কোনো উপায় সে করতে পারলো না। কুসুমিয়াও এই অপ্রত্যাশিত বিপদে অধীর হয়ে ঝিম্‌লির বুকের কাছে পড়ে গভীর মর্ম্ম-ব্যথা জানাতে লাগলো!

ঝিম্‌লির মুখে আর কথা নেই। কিছুক্ষণ যাতনায় ছট্‌ফট্ করে সে চিরদিনের মতো দু'চক্ষু মুদ্রিত করলো।

ঠিক এই সময়ে সেখানে এসে উপস্থিত হ'লো এক দল বৃটিশ-সৈন্য এবং তাদের সঙ্গে গিরিধারী।

সৈন্যদল হঠাৎ এই দৃশ্যের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তখনই প্রকৃত অবস্থা বুঝে উঠতে পারলো না। গিরিধারী এ দলের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন কুসুমিয়ার খোঁজে। কুসুমিয়ার প্রেরিত চিঠি থেকে তিনি ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন, প্রতাপের খোঁজেই সে বেরিয়েছে। নাগা-কুকিদের নিষ্ঠুরতা এবং বর্ব্বরতার পরিচয় তাঁর অজ্ঞাত ছিল না,—তাই কুসুমিয়া এবং প্রতাপের জন্য তাঁর উদ্বেগের সীমা ছিল না। নাগা মেয়ের বেশে কুসুমিয়াকে তিনি প্রথমে চিনতে পারেনি, কিন্তু, কুসুমিয়া তাঁকে দেখেই তাঁর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললো :—"বাবা, আমার এই বেশে তুমি আমায় চিনতে পারোনি—আমি কুসুমিয়া। তোমার অনুমতি না নিয়ে বেরিয়ে এসে যে অপরাধ করেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করো।"

—"কুসুমিয়া! আয় মা, কাছে আয়। তোরে হারিয়ে আমি পাগল হয়েছিলাম। এই যে প্রতাপ, তুমিও আছো! আঃ! কিন্তু এখানে ও শুয়ে কে?"

বৃদ্ধকে প্রণাম করে প্রতাপ চুপ করে রইলো। গিরিধারী কিছু বুঝতে না পেরে ভূশায়িত ঝিম্‌লির দিকে আবার তাকালেন। হঠাৎ তাঁর চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল,—পরক্ষণেই তিনি বলে উঠলেন :—"এ কি, এ যে আমার মীরা! ভালো করে দেখি—একটু সরে দাঁড়াও তোমরা।"

প্রবল উত্তেজনা-বশে গিরিধারী একেবারে ঝুঁকে পড়লেন ঝিম্‌লির দেহের উপর,—তার পর তার চিবুকের নীচের দিকে কি যেন খুঁজতে লাগলেন! অমনি বলে উঠলেন, "হাঁ, এই যে চিহ্ন,—সেই আঁচিল! আমার মীরা! এত বছর পরে আমার মীরাকে পেলাম! কিন্তু মা আমার, ওঠ্, ওঠ্ মা, আমাকে বাবা বলে একবার ডাক্।"

সস্নেহে ঝিম্‌লির গায়ে হাত দিলেন—নিস্পন্দ দেহ। বুঝলেন, এ তো মীরাকে পাওয়া নয়—পেয়ে হারানো! জন্মের মতো হারানো! "মা'—ব'লে ডেকে তিনি ঝিম্‌লির দেহের উপর প'ড়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন। কুসুমিয়ারও দু'চোখে জল—পিতার উপর ঝুঁকে পড়তে যাচ্ছিল—প্রতাপ তাকে ধরে ফেল্‌লো। মুহূর্ত্তে বিপর্য্যয় ব্যাপার।

গিরিধারী আর উঠলেন না। চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই হার্টফেল্ করে তিনি তাঁর হারানো মেয়ের সহযাত্রী হলেন!

প্রতাপের উদ্ধারের জন্য বৃটিশ সৈন্যদলের আর অগ্রসর হবার প্রয়োজন হলো না। নাগাদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান এইখানেই শেষ হলো।

শেষ

শ্রীরেবতীমোহন সেন

শিব ও শক্তি

শিব কখনই শক্তিশূন্য নহেন। যখন তিনি শক্তি-সমন্বিত—তাঁহাতে শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত, তখন তিনি বাক্য-মনের অগোচর, কেবল সনাতন পুরুষ মাত্র। তখন শিব একা বসিয়া আছেন; তানপুরা লইয়া, শব্দব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া, নিজের ভাবে নিজে বিভোর হইয়া আছেন। তখন বিশ্বসৃষ্টি তাঁহাতে সংহৃত—তাঁহার মধ্যে যেন সম্পুটিত। তখন তাঁহাতে কোন ক্রিয়া নাই, কোন চেষ্টা নাই, শুধু তিনি বিরাজ করিতেছেন! এ অবস্থা মনুষ্যের চিন্তার অতীত—কল্পনার অতীত। কিন্তু যখন তানপূরা বাজিয়া ওঠে, শব্দব্রহ্মে ঝঙ্কার হয়, তখনই মহাবাক্য উত্থিত হয়। সেই ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে "এক আমি বহু হইব," এই ইচ্ছাশক্তি যেন জাগরিতা হন! এই ইচ্ছা বেশ জমাট বাঁধিলেই সৃষ্টিশক্তি জাগিয়া কিশোরী গৌরীরূপে তাঁহার বাম উরুর উপর বসেন। তখন এক হইতে দুইয়ের উৎপত্তি হয়। এই দুই অর্থাৎ এই শিব-গৌরী হইতেই জগতের সৃষ্টি—বিশ্বের বিকাশ। বিশ্বের স্তরে স্তরে যেমন বিকাশ ঘটিতে থাকে, তেমনি স্তরে স্তরে আদ্যাশক্তির দশ-মহাবিদ্যারূপ ফুটিয়া ওঠে। যেই ক্ষণ হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ, সেই ক্ষণ হইতে নাশেরও উদ্ভব। অপচয় ও উপচয় একসঙ্গেই ঘটিয়া থাকে। মা যে-মুহূর্ত্তে উমা, সেই মুহূর্ত্তেই কালী। কারণ, ক্রিয়ার অর্থই উপচয় এবং অপচয়। এক দিকে উপচয়, অন্য দিকে অপচয়—এক দিকে ক্ষরণ, অন্য দিকে বিকাশ। ক্রিয়া না হইলে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি একটা ক্রিয়া মাত্র। শক্তি সঞ্চালিত—আন্দোলিত ও স্পন্দিত হইলেই ক্রিয়ার উৎপত্তি। শক্তির স্পন্দন—আন্দোলন—সঞ্চালন তখনই হয়, যখন এক দিকে অপচয় অন্য দিকে উপচয় ঘটে। সুতরাং সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নাশ দেখা দিবে—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মরণ আসিবেই। তাই সদাশিবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র—তিনই বর্ত্তমান! তাই উমা দেখা দিলেই কালী এবং ছিন্নমস্তা ধূমাবতী ও বগলা দেখা দিয়া থাকেন। এক বিদ্যার বিকাশ হইলে, অন্য নয় বিদ্যা নয় দিক্ হইতে ফুটিয়া উঠেন।

যখন সৃষ্টির খেলা পূরাদমে চলিতে থাকে, তখন শক্তি কালীরূপে বিকশিতা। শিব শবাকারে চরণতলে পড়িয়া আছেন, মা শিবের বুকের উপর দাঁড়াইয়া অসংখ্য প্রেতিনী সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নাশ, নাশের সঙ্গে নূতন সৃষ্টির বিকাশ হইতেছে। আদ্যাশক্তি এক খাইতেছেন, আর গড়িতেছেন, আবার খাইতেছেন আবার গড়িতেছেন। জীবন-মরণের এই পরম্পরা—ইহার যেন আদি নাই, অন্ত নাই, কেবলই চলিয়াছে নদী-প্রবাহের মত! ইহাই সৃষ্টিশক্তির পূর্ণ বিকাশ। এই সময়ে শিবের শিবত্ব যেন ঢাকা পড়ে, শিব শবের ন্যায় হন। শক্তি এখন উন্মাদিনী—কোটি রূপে কোটি ভাবে অসংখ্য দিক্ দিয়া বিকশিতা। তখন শক্তি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ও সর্ব্বস্বে প্রকটিতা। শক্তি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না; আর কাহারও খোঁজ পাওয়া যায় না। তখনকার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভক্ত গান করিয়াছেন :—

"বাজবে গো মহেশের বুকে
নেমে নাচ গো ক্ষেপা মাগী।"

কিন্তু তাহা ত হইবার যো নাই! শিবের বুক ছাড়া তাঁহার নাচিবার অন্য স্থানও নাই। কারণ, শিব সর্ব্বব্যাপী, অখণ্ড সত্তা—সর্ব্বস্বে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। মা সর্ব্বব্যাপিনী, শিবও সর্ব্বাধারভূত। সুতরাং নাচিতে হইলে মাকে শিবের বুকের উপরেই নাচিতে হয়। কল্পলতিকা তিনি, কল্পদ্রুম শিবের চারি দিকে—সর্ব্বাবয়বে জড়াইয়া, লতাইয়া আছেন। শিব ছাড়া শক্তি থাকিতে পারে না। শিবদেহ-সমাশ্রিত বলিয়াই শক্তি গতি-রূপিণী ও লীলাময়ী। পক্ষান্তরে, তেমনই শক্তি ছাড়া শিবও থাকিতে পারে না। শক্তি প্রকট হউক, অথবা সম্পুটিতাই হউক, সদাই শিবদেহ-সমাশ্রিতা। যখন শক্তি সংহৃতা, তখন শিব আত্মারাম—মহাযোগে নিমগ্ন। যখন শক্তি প্রকট, তখনও শিব যোগ-বিভোর বটে, পরন্তু ইচ্ছাময়। তাঁহা হইতে সিসৃক্ষা বা সৃজন-ইচ্ছা ফুটিয়া উঠিয়াছে আর ক্ষণে ক্ষণে এক এক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইতেছে—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব ও বিলয় তাঁহাতেই হইতেছে।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অহরহঃ যে লীলা হইতেছে, প্রত্যেক জীবের দেহভাণ্ডেও সেই শিব-শক্তির লীলা অহরহঃ চলিতেছে। দেহভাণ্ডে শক্তি কুণ্ডলিনী-রূপে বিরাজিত, আর আমি আছি, এই শিব-জ্ঞান অখণ্ড ভাবে তাহার মধ্যে বিরাজ করিতেছে। জীবন শক্তির একটা খেলা বটে! শক্তি নানা ভাবে লীলা করিয়া জীবনকে ফুটাইয়া তুলিতেছে বটে, পরন্তু আমি আছি, এই শিব-জ্ঞান অব্যাহত ভাবে শক্তির খেলার মধ্যগত হইয়া না থাকিলে, শক্তির নানা বিকাশকে কেন্দ্রগত না করিলে জীবের জীবনই সম্ভবপর হয় না। স্থাবর, জঙ্গম, সকল প্রকার জীবেই আমি আছি, এই জ্ঞান থাকিবেই। দেহাবচ্ছিন্ন আমি দেহেই বিরাজ করিতেছি, অন্য পদার্থ সকল হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজ করিতেছি, এই জ্ঞান যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ দেহ সজীব থাকিবে। নহিলে শক্তি জড়শক্তি মাত্র, প্রাণহীন, জ্ঞানহীন।

কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জড় ও অজড় বুঝি না! সকল পদার্থেই, সকল শক্তির খেলাতেই, যেখানে স্বাতন্ত্র্য আছে, সেইখানেই—যেখানে পদার্থের বিশিষ্টতা আছে, সেই পদার্থেই শিব ও শক্তি

বিদ্যমান। বিশ্ব-সৃষ্টিতে শিব-শক্তি-বর্জ্জিত কিছু হইতে পারে না, কিছু থাকিতে পারে না। এই অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেখানে যাহা কিছু আছে, হইতেছে, হইয়াছে এবং হইবে, সে সকলেই শিব-শক্তি আছে। শক্তির এক প্রকারের বিকাশকে আমরা জীব বলি, অন্য প্রকারের প্রকাশকে বলি জড়। প্রকৃতপক্ষে জড় ও অজড়, জীব ও জড় দুই এক, অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র জড় পদার্থেও জীব-ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছেন। জড়েরও এক প্রকারের অনুভূতি আছে—উপচয় অপচয় আছে। যখন জড়ে ও জীবে শক্তি-ক্রিয়ার একই রকম পরিণতি ঘটিতেছে, তখন জড় ও জীব এক, কেবল অবস্থার বিকাশ-ভঙ্গী স্বতন্ত্র। এই হিসাবে তন্ত্রশাস্ত্র বলেন যে, সৃষ্ট-পদার্থ মাত্রেরই প্রাণ আছে, অনুভূতি-শক্তি আছে, সুখ-দুঃখ বোধ আছে। এই মেদিনীমণ্ডল একটা সজীব পদার্থ, সৌরমণ্ডল একটা প্রাণযুক্ত যন্ত্র মাত্র—দেহী পুরুষ-স্বরূপ। তাহার উপর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট জীব, বিরাট পুরুষ। যেমন মনুষ্য বা পশু-দেহ জীব-সমবায়ে স্বতন্ত্র সত্তারূপে বিদ্যমান, তেমনি পৃথিবীও জীব-সমবায়ের সত্তারূপে জীবরূপে বিরাজমান। তাহার উপর সৌরমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড স্বতন্ত্র পুরুষ বিরাট জীব। এমনই অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড জীবে এই অনন্ত আকাশ পরিপূর্ণ। অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডে—জীবপূর্ণ আকাশ, আবার এক অনন্ত আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিত। আত্মাশূন্য স্থান নাই—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন এক বিশ্বাত্মার সাগর। সেই সাগরের একটি বুদ্‌বুদ্ এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। সৃষ্টিতত্ত্বের এমন grand idea এমন বিরাট ভাব আর কোন জাতির কোন শাস্ত্রে আছে কি না জানি না!

জীবের কলেবরে যে ক্রিয়া যেমন ভাবে হইতেছে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেও সেই ক্রিয়া তেমনই ভাবে হইতেছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যে ক্রিয়া যেমন ভাবে হইতেছে, মনুষ্যদেহেও সেই ক্রিয়া তেমন ভাবে হইতেছে। তাই পৃথিবী একটা জীব। মেদিনীর শ্বাস-প্রশ্বাস আছে, সুখ-দুঃখ-বোধ আছে, কুণ্ডলী-শক্তির ক্রিয়া আছে, এক অপূর্ব্ব ভাষার সাহায্যে ভাবের ব্যঞ্জনা আছে। জীব ছাড়া জীবের উৎপত্তি সম্ভব নহে। পৃথিবী হইতে যখন নানা জীব সমুৎপন্ন হইতেছে, তখন পৃথিবী সজীব পদার্থ। যতক্ষণ সৃষ্টিলীলা চলিতে থাকে, ততক্ষণ কোন জীবের কোন পদার্থের নাশ নাই, শুধু অবস্থান্তর-প্রাপ্তি ঘটে মাত্র। যতক্ষণ শিব-শক্তির লীলা চলিতে থাকিবে, ততক্ষণ কিছুরই নাশ হইবে না। তাই তান্ত্রিক ভক্ত বলিয়া থাকেন, মা থাকিতে ছেলে মরে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যতক্ষণ মায়ের লীলা থাকিবে, ততক্ষণ মায়ের ছেলে মরিবে না। এক দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটিতে পারে, পরন্তু শিবশক্তি-সমুৎপন্ন জীব—আমি আছি এই জ্ঞান—আমার আছে এই বোধ—আমিত্ব-বিস্তারের এই শক্তি কখনই নষ্ট হইবার নহে। কারণ, উহার নাশ ঘটিলে সৃষ্টির নাশ ঘটিবে। অতএব তন্ত্রের কথা মা-বাপ থাকিতে ছেলে মরে না, ইহা অসঙ্গত অলীক হইতে পারে না।

এইবার তন্ত্র বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম সিদ্ধান্তের সহিত বিবাদ বাধাইয়াছেন। শাক্ততন্ত্র মাত্রেই লেখা আছে যে, 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এমন কথা হইতেই পারে না। ইহা অস্বাভাবিক কথা। জীবনই হিংসা, হিংসা না হইলে জীবন থাকে না। মায়ের বাহন হিংসার অবতার—সিংহ! তুমি খাইবে কি? যাহা খাইবে, তাহাই জীব। জীব-হত্যা না করিলে তোমার ভোজ্য প্রস্তুত হইবে না। পশু মারিয়া মাংস খাইতে হইলে মুমূর্ষু পশুর কাতর ক্রন্দন শুনিতে পাও,—তোমার দুর্ব্বল স্নায়ু বিচলিত হয়। তুমি দয়াপরবশ হইয়া মাংস ভোজন বর্জ্জন কর। কিন্তু গাছের ফল ছিঁড়িলে বৃক্ষ রোদন করে না? বেদনার অশ্রুধারায় তাহারও সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যায়! সে রোদনের ভাষা শুনিতে পাও না, বুঝিতে পারো না, তোমার দয়া হয় না! গো-বৎসকে বঞ্চিত করিয়া তাহার মাতৃদুগ্ধ পান কর কোন্ হিসাবে? তোমার জননীর স্তনযুগ হইতে যে ক্ষীরধারা প্রবাহিত হয়, বিধাতার বিধানে তাহা তোমার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তুমি তাহা পরকে খাইতে দিলে বাঁচিতে পারো না। তেমনি ছাগ ও গাভী-শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য আদ্যাশক্তি মাতৃদুগ্ধরূপে তাহাদের জননীর স্তনে বিরাজ করেন। তুমি তাহা পান করো কোন্ লজ্জায়? ছাগ বা মৃগমাংস ভোজন করা যদি পাপ হয়, তাহা হইলে দুগ্ধ-পান, ক্ষীর-ভোজনও মহাপাপ। তাহা হইলে কোটি কোটি জীব নষ্ট করিয়া, গোধূম-ধান্য-ব্রীহি প্রভৃতি শস্য, আম-কাঁটাল প্রভৃতি ফল, কন্দ-মূল, পত্র-পুষ্প ভোজন করাও মহাপাতক। আত্মরক্ষায় দয়া নাই, হিংসা আছে। কোনটা প্রকট হিংসা মনুষ্যের অনুভূতিগম্য, কোনটা বা অপ্রকট হিংসা—মনুষ্যের অনুভূতির বাহিরে। তুমি উঠিতে বসিতে শুইতে খাইতে জীবহত্যা করিতেছ, সঙ্গে সঙ্গে কত জীব সৃষ্টিও করিতেছ। হিংসা ছাড়া তুমি থাকিতে পারো না, তোমার দেহে কত জীব অন্য কত জীবকে সদা-সর্ব্বদা খাইতেছে। তাহা রোধ করিতে পারো? জীবের দ্বারাই জীবের পুষ্টি ও বিস্তৃতি ঘটিতেছে। একটা বড় জীবের অবস্থিতির জন্য কোটি ক্ষুদ্র জীবকে ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ দিতে হইতেছে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো যায় না, ব্যত্যয় কখনও হয় না। হীনযানী বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের এই প্রতিবাদের উত্তর দিতে পারেন নাই। উত্তরে তাঁহারা নীতির কথা, সমাজের কথা তুলিয়াছেন। তবে তন্ত্র বলেন যে, যাহার যাহা সহ্য হয় সে তাহা খাইবে।

ঘাস খাইলে সিংহ ব্যাঘ্র বাঁচিতে পারে না,—ঘাস সিংহ-ব্যাঘ্রের খাদ্য নহে। মাংস খাইলে গো, ছাগ, মেষ, মৃগাদি বাঁচে না,—মাংস উহাদের খাদ্য নহে। তেমনি মানুষের ধাতু-অনুসারে, দেশ ও কাল-অনুসারে যখন যাহা খাদ্য, তখন মানুষ তাহাই খাইবে। আহারের বিচারে মানুষের উচ্চনীচ বিচার করিতে নাই, এবং মানুষের যাহা খাদ্য তাহা সবই পবিত্র—হেয় নহে, বর্জ্জনীয় নহে। মানুষ যাহা খায়, তাহাই মায়ের বলি, যাহা খায় না, তাহা মাকে নিবেদন করিতে নাই। যত জীব, তত শিব। প্রত্যেক দেহাবচ্ছিন্ন শিবের চারি পার্শ্বে কুণ্ডলিনীর ক্রিয়া হইতেছে। সেই কুণ্ডলিনীকে তুষ্ট রাখিবার জন্যই মাকে ভোগ দিতে হয়, জীবের ভোজ্য স্থির করিতে হয়। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মায়ের জন্য সংগৃহীত উপচারগুলি মাকে নিবেদন করিয়া দিবার পূর্ব্বে চাখিয়া দেখিতেন! সুস্বাদু না হইলে তাহা মায়ের ভোগের জন্য দিতেন না। কথিত আছে, একদা তিনি কোন গৃহস্থের বাটীতে শ্যামাপূজার পৌরোহিত্য করিতে যান। পূজায় বসিয়া ভোগ নিবেদন করিয়া দিবার ঠিক পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে মায়ের ভোগের উপকরণগুলি একটি একটি করিয়া চাখিয়া দেখিতে লাগিলেন। যেটি খাইতে ভালো লাগে সেটি রাখিয়া দেন, আর যেটি খাইতে ভালো নয়, সেটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে থাকেন। গৃহস্থ প্রমাদ গণিলেন! পূজামণ্ডপে সমবেত যাবতীয় লোক এই বিধি-বহির্ভূত অনাচার দেখিয়া কুপিত হইয়া তাঁহাকে পূজায় নিরস্ত হইতে বলিল। আগমবাগীশ বলিলেন, "আমি অদ্য এই পূজায় পুরোহিতের পদে বৃত হইয়া আসিয়াছি, মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি, মা এই প্রতিমায় আবির্ভূতা হইয়াছেন, আমাকেই পূজা শেষ করিতে হইবে। যদি পূজায় কোন বিধি-বহির্ভূত ক্রিয়া আমার দ্বারা হইতেছে আপনারা এমন অনুমান করেন, তাহার বিচার পূজান্তে হইবে, এখন নয়। এখন যদি কেহ এই সাক্ষাৎ মায়ের সম্মুখে এই শুদ্ধীকৃত বীরাসন হইতে আমায় উঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার ফল ভাল হইবে না।" এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় পূজায় মনোনিবেশ করিবেন, এমন সময়ে তিনি শুনিলেন, অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছে। এক জন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বুজরুকটার কাণ ধরে পূজামণ্ডপ থেকে বাহির করিয়া দাও। এই রাত্রে আমরা নূতন পুরোহিত আনিয়া নূতন করিয়া মায়ের পূজা করাইব। প্রাণ থাকিতে এই উচ্ছিষ্ট ভোগ-রাগে মায়ের পূজা হইতে দিব না" ইত্যাদি।

বাড়ীর কর্ত্তাকে ডাকিয়া আগমবাগীশ বলিলেন, "তুমি আমাকে এই পূজায় পৌরোহিত্য করিতে বরণ করিয়াছ—তোমারও ঐ মত?"

তিনি বলিলেন, "এই পাঁচ জনকে লইয়াই আমাকে থাকিতে হইবে, আমি ত সমাজের বাহিরে নই বাবা!"

"তবে তাই হোক, আমি এই পূজা অর্দ্ধ-সমাপ্ত রাখিয়া চলিলাম। তবে যাইবার আগে তান্ত্রিক সাধকের বুজরুকীটা একটু দেখিয়ে দিয়ে যাই।" এই কথা বলিয়া তিনি মায়ের চরণে কোশার খোঁচা মারিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। মায়ের চরণ হইতে রক্তের ফোয়ারা ছুটিল। আগমবাগীশ চাহিয়া দেখেন, সেই রক্ত-ধারা মায়ের পদতলে পতিত শবরূপী মহাদেবের শ্বেতাঙ্গ আপ্লুত করিয়া মায়ের লোল রসনা স্পর্শ করিতেছে,—মা ছিন্নমস্তা-মূর্ত্তিতে সেই রক্তধারা পান করিতে-ছেন,—যাহা হইতে উদ্ভব, তাহাতেই লয়! মায়ের এই রূপোন্মত্ততায় আগমবাগীশের চোখে ভাবের অশ্রু, মুখে আনন্দের অট্টহাসি ফুটিল। চারি দিকে চাহিয়া তিনি দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই—শুধু অন্ধকার—অমা-নিশার রাশি রাশি অন্ধকার—অন্ধকার যেন প্রলয়-মূর্ত্তিতে সমস্ত বিশ্বকে গ্রাস করিবার জন্য উপস্থিত! এক মুহূর্ত্তে বাটীর সমস্ত দীপগুলি নিবিয়া গিয়াছে—একটি মাত্র প্রদীপ মায়ের পূজামণ্ডপে জ্বলিতেছে—'বোধ হয় প্রদীপও এখনি নিবিয়া যাইবে! এই মাত্র পূজা-বাড়ী লোকে গিস্‌গিস্ করিতেছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলে ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে; শুধু বাটীর কর্ত্তা মূর্চ্ছিত হইয়া একধারে পড়িয়া আছেন!

আগমবাগীশ যেন মুহূর্ত্তের জন্য সম্বিৎহারা হইয়া-ছিলেন—প্রকৃতিস্থ হইয়া তাড়াতাড়ি তিনি পুনরায় সেই বীরাসনে বসিয়া ধ্যানস্থ হইবামাত্র মায়ের সংহারিণী মূর্ত্তি সংবরিত হইল। তিনি পূর্ণাহুতি দ্বারা মায়ের পূজা শেষ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার পর লোকে এই তান্ত্রিক সাধক আগম-বাগীশের অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানিতে পারিল। তান্ত্রিকের ভক্তিকুম্ভ হইতে মা-নামের অমৃতধারা পান করিবার জন্য বহু লোক আসিয়া তাঁহার আশ্রমে ভিড় করিতে লাগিল—অদ্বিতীয় তান্ত্রিক পণ্ডিত-জ্ঞানে বাঙ্গালার আপামর সাধারণ তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল।

এই সময়ে তিনি বৃহৎ তন্ত্রসার নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা তান্ত্রিক মাত্রেরই অমূল্য সম্পত্তি—তন্ত্রতত্ত্বের রচনা-মণি-মঞ্জুষা। এই গ্রন্থে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মানুষ যাহা খাইবে তাহাই মায়ের প্রসাদ—তাহাই মাকে নিবেদন করিয়া দিতে হয়। আর মা সেই জন্যই সৃষ্টিতত্ত্বে এবং সংহারতত্ত্বে সর্ব্বব্যাপারেই ছিন্ন-মস্তা। নিজের শোণিত নিজেই পান করিতেছেন,—সে শোণিতে নিজে পুষ্ট হইতেছেন। ইহাই সৃষ্টির গুপ্ত অব্যক্ত লীলা।

শিব ও শক্তির সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্ব বুঝাইয়া তন্ত্র তাঁহাদের রূপের কথা কহিয়াছেন। নাম ও রূপ বুঝিলে রূপতত্ত্ব বুঝা যায় না। রূপের দুইটা স্তর আছে; এক অনুভূতিগম্য রূপ, আর বোধাতীত রূপ। বোধাতীত যাহা, তাহা বুঝানো যায় না; সুতরাং সে কথা চাপা থাকাই ভালো। অনুভূতিগম্য রূপও দুই শ্রেণীর। এক —জ্ঞানাভাস বা Concept, দ্বিতীয়—বোধাভাস বা Precept। বোধের আভাস যাহা—অনুভূতিগম্য যাহা—তাহারই আলোচনা করিতে হয়। সে কথা পারি তো পরে বলিব। শিবের concept এবং precept দুইয়ের সুন্দর বিশ্লেষণ তন্ত্রে আছে। এই জ্ঞানাভাস ও বোধাভাস লইয়াই মায়ের দশমহাবিদ্যার রূপ নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু এই রূপতত্ত্বের বিষয় গুরুমুখ ভিন্ন ঠিক বুঝা যায় না, বুঝানোও যায় না। পুঁথিগত বিদ্যা লইয়া রূপতত্ত্বের আলোচনা করিতে নাই। উহা সাধনার ধন—করিয়া, কর্ম্মিয়া সম্মুখে দেখাইয়া দিতে হইবে। গুরু দেখাইয়া দেন, শিষ্য সেই experiment দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ক্রিয়া করে। তাই তন্ত্রে গুরুর এত আদর! গুরুর পদবী ঈশ্বরের সমান।

শ্রীপিনাকীলাল রায়।

কাগজ

কাগজের বড়ই অভাব। অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার মত ইহাও একটি সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কর্ম্মস্থানে, বিদ্যাস্থানে কাগজের ব্যবহার যথাসাধ্য সংক্ষেপ করা হইতেছে, তথাপি অকুলান! সরকারী লেফাফার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে দীর্ঘ দিন কার্য্যক্ষম রাখা হইয়াছে, শিরোনামা লিখিতে তাহার গায়ের উপর চিরকুটের সংক্ষিপ্ত আবরণ পড়িয়াছে, তথাপি অনটনের অভাব নাই! পথের ধারের কুটিটা পর্য্যন্ত বৃষ্টির শেষ-বিন্দুর ন্যায় সমুদ্রের সহিত যুক্ত হইতেছে, তবুও অভাব! তবুও দিন দিন সুসভ্য বিংশ শতাব্দী ধীরে ধীরে প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে ফিরিয়া চলিয়াছে। তালপত্র, কাষ্ঠফলক, শ্লেট নামক মিশ্র প্রস্তর-ফলক বর্ত্তমানে ছাত্র প্রভৃতির লেখ্য উপাদান হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

যুদ্ধই কারণ। যুদ্ধই বিজ্ঞানানুশীলনকে কখনও অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেয়, কখনও তাহাকে পশ্চাতে টানিয়া লইয়া আসে। যুদ্ধের জন্যই অধুনা দীপ-শলাকার পরিবর্ত্তে চকমকির ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে। যুদ্ধের জন্যই হয়তো এক দিন পৌরাণিক নালিকা, বজ্র প্রভৃতি ঘোররবা ব্রহ্মাস্ত্র সকল আবার তীক্ষ্ণ-ফলক বাণ-বর্শায় পরিণত হইয়াছিল। তবে ভীত হইবার কারণ নাই! কাগজের সে ভাবে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা কম। এখন যুদ্ধ-হেতু বহির্ব্বাণিজ্য একরূপ বন্ধ থাকায় ইহার আমদানী ব্যাহত হইতেছে। এবং কর্ম্ম-প্রসার হেতু ইহার ব্যবহার অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়াছে, তাই এই অভাব! এ অভাব চিরস্থায়ী নয়, ইহাতে কাগজ-শিল্পের ধ্বংস সম্ভব নয়!

আজ সহসা কাগজের বিলোপ সাধন হইলে সভ্যতার অগ্রগমন প্রতিহত হইবে। কয়েক শতাব্দীর অন্ধকার আসিয়া জগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। গুহার মানুষকে আবার হয়তো গুহাতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে! এত বড় যে নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থ, একবার তাহার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখা যাক্—কবে, কোন্‌খানে, কি ভাবে জন্মলাভ করিয়া কাগজ কাহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া কত দূর অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে! এই ক্রমোন্নতিশীল প্রাচীন শিল্প জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে, ব্যবহারে প্রত্যেক কর্ম্মস্থানেই মানুষের নিত্য-সাথী; অতি শৈশব-কাল হইতেই ইহার সহিত মানব-সন্তানকে পরিচিত হইতে হয়।

দেশভেদে ইহার নামের বিভেদ :—

আর্য্যাবর্ত্ত	...	...	কাগজ
পারস্য	...	...	কাগজ
জাপান	...	...	কাদজ
আরব	...	...	কর্ত্তাগ
ইটালী ও প্রাচীন লাটিন			কার্টা বা চার্টা
তামিল	...	...	বরক
ডেনমার্ক	...	...	পেপির
ফ্রান্স	...	...	পেপিয়ার
পর্ত্তুগাল	...	...	পেপেল
জার্ম্মাণী	...	...	পেপিয়ার
ইংলণ্ড	...	...	পেপার
স্পেন	...	...	পেপেল
রাশিয়া	...	...	বুমাঙ্গনা

কাগজ আবিষ্কারের সঠিক ইতিহাস নাই; আছে অপ্রতিহত গৌরব, তাহা পূর্ব্বদেশের। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যসম্পদ-সঞ্চয়ের অভিপ্রায়েই কাগজের অভাব অনুভব এবং প্রাচ্যদেশই জ্ঞান-চর্চ্চার পথ-প্রদর্শক। প্রাচ্যখণ্ডের মহর্ষিগণই এক দিন মানুষের স্মৃতিভ্রংশতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের জ্ঞান-সম্ভার লিপিবদ্ধ করিতে লেখ্য উপাদানের অভাব প্রথম বোধ করিলেন। তার পর কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়া কাগজ ধীরে ধীরে ক্রমাবর্ত্তের মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইতে হইতে অদ্যাবধি সভ্যতার সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। একমাত্র কাগজকে আশ্রয় করিয়াই জগতের কত সৃষ্টি কত সম্পদ্ গড়িয়া উঠিয়াছে! সকল পদার্থ, সকল প্রচেষ্টার সঙ্গেই কাগজের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কাগজকে বর্জ্জন করিলে জগতে কিছুই নাই।

কাগজের অভাব যেমন দিন দিন বাড়িতেছে, তেমনই ইহার রচনা-প্রণালীর চাতুর্য্য এবং বিভিন্ন উপকরণের সাহচর্য্যও ক্রমশঃ

ইহাকে উন্নততর করিয়া উত্তরোত্তর শ্রীমণ্ডিত করিতেছে। পাশ্চাত্য জগৎ কাগজের আদিরূপের উপর আধুনিক সৌষ্ঠব দান ও নির্ম্মাণে ক্ষিপ্রকারিতার জন্য অগ্রণী। তাই বলিয়া প্রাচীন প্রণালীর হস্তনির্ম্মিত কাগজ ও তার সৃষ্টি-প্রণালী একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। আজও ভারতে, পূর্ব্ব উপদ্বীপে, চীনে, জাপানে, পারস্যে প্রাচীন পদ্ধতির হস্তনির্ম্মিত কাগজের যথেষ্ট সম্মান আছে।

ভারতের মধ্যে বঙ্গ, বিহার, নেপাল, ভুটান, আমেদাবাদ, সুরাট, ধারবার, কোলাপুর, ঔরঙ্গাবাদ ও দৌলতাবাদের কাগজ-শিল্প এক কালে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ঔরঙ্গাবাদ, দৌলতাবাদ ও গৌড়ের কাগজের ইতিহাস ঢাকাই মস্‌লিনের মতই গৌরবময়। তার পর য়ুরোপের নিকট রাজনৈতিক পরাজয়ের ফলে এদেশীয় বস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পের ন্যায় কাগজ-শিল্পও এক দিন ভীষণ ভাবে আহত হইয়া পড়িল।

ভারতে যে এক দিন উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানী হইত, এ কথা আজ রূপকথার মতই অবিশ্বাস্য। পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানোন্নতি এদেশীয় জন-সমাজের মূর্খতায় বিশ্বাস-স্থাপক। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানচর্চ্চায় প্রাচ্য-চিন্তার বিন্দুমাত্র সাহচর্য্যও বিলুপ্ত-প্রায়। সৌভাগ্যের বিষয়, বর্ত্তমানে জমিদার ও দেশীয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং দেশের যুবকবৃন্দের উৎসাহে ভারতের কাগজ-শিল্প আবার গড়িয়া উঠিতেছে। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং কংগ্রেস-নেতাগণ অবধি দেশীয় হস্তনির্ম্মিত কাগজের ব্যবহারে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। নিখিল-ভারত শিল্প-সঙ্ঘ (All India Industries Association) এই উদ্দেশ্যে রীতিমত প্রচার-কার্য্য চালাইতেছেন। অবশ্য এখনকার অভাবের তুলনায় এ প্রচেষ্টা সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্যের তুল্য!

য়ুরোপের পণ্ডিত-সমাজের মতে চীনদেশই কাগজ-শিল্পের জন্মস্থান। কিন্তু ভারতে তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে কাগজ প্রচলনের প্রমাণ আছে। আনুমানিক খৃষ্টীয় অব্দের প্রথম যুগ হইতেই চীন-দেশে কাগজ প্রস্তুত সুরু হয়। চীন-সম্রাট্ কন-ফুচির আমলেও দেখা যায়, চীনারা বাঁশের ভিতরকার পর্দা বাহির করিয়া তাহার উপর তীক্ষ্ণাগ্র লেখনী আঁচড়াইয়া লিখিত। কথিত আছে, সম্রাট্ হো-তাই (Ho-ti)য়ের শাসন-কালে তাঁহার এক বিশিষ্ট কারিগর শাইলান (Tsi-Lun) একবার ন্যাক্‌ড়া, মাছ ধরিবার জাল, গাছের ছাল ও বাতিল-দেওয়া রশির চটিজুতা (Hemp Sandals) হইতে কাগজের ন্যায় এক প্রকার লেখ্য উপকরণ প্রস্তুত করে। তাহাই ঐ দেশের আদি কাগজ বলিয়া পরিচিত। ১০৫ খৃষ্টাব্দে শাইলান তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার-বার্ত্তা জন-সমাজে প্রচার করেন। দেখিতে দেখিতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহা সমগ্র চীনদেশে ছড়াইয়া পড়িল। ৬০০ শত বৎসর পরে চৈনিক কাগজ বৈদেশিক সংস্পর্শ লাভ করে।

কিন্তু ভারতের ইতিবৃত্তে ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর যুগে কাগজ ব্যবহারের উল্লেখ আছে। পঞ্জাব-বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি নিয়ারকাস্ তাঁহার ভারত-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, তৎকালে এ দেশে উত্তম মসৃণ, চিক্কণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী এক প্রকার তুলা-চাপড়ানো পদার্থের উপর বাণিজ্যাদির হিসাব-নিকাশ লিখিবার বহুল ব্যবস্থা ছিল। এই তুলা-চাপড়ানো অর্থে তুলট কিংবা সেই জাতীয় অপর কোন পদার্থকে ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না। গ্রীক্ সম্রাটের ভারত-আক্রমণ ঘটে ৩১৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে। সুতরাং তাহারও পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কাগজজাতীয় পদার্থ ব্যবহারের প্রমাণ মেলে।

সংস্কৃত ভাষায় কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থে কাগজ শব্দের অর্থবাহী কাগদ-শব্দের ব্যবহার আছে। সে কালে চীনদেশীয় এক প্রকার উৎকৃষ্ট কাগজকে ইংরেজরা "India-proof paper" নাম দিয়াছিল। ইহা দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, তৎকালে সেই জাতীয় কাগজ চীনদেশে সেই প্রথম প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহা ভারতীয় কাগজেরই অনুকরণে। নচেৎ চীনা কাগজের ঐরূপ আখ্যা হওয়ার কারণ কি? তাহা হইলে ভারত হইতেও উৎকৃষ্টতর কাগজ চীনদেশে রপ্তানী হইত।

পূর্ব্বে মালদহ অঞ্চলে এক প্রকার উৎকৃষ্ট তুলট কাগজ প্রস্তুত হইত এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাহার বিলক্ষণ চাহিদা ছিল। সম্ভবতঃ ঐ কাগজের অনুরূপ কাগজকে "India-proof paper" বলা হইত। আজও বহু প্রাচীন জমিদার-ঘরে সাটিনের মত এক প্রকার উজ্জ্বল ও মসৃণ কাগজের উপর লিখিত সনন্দ, ছাড় প্রভৃতি দেখা যায়।

ভারতের মত উৎকৃষ্ট, মূল্যবান কাগজ শুধু তৎকালে কেন, একালেও কোথাও দেখা যায় না। মুসলমান তন্তুবায়কে যেমন জোলা, মৎস্যজীবীকে নিকারী বলে, তেমনই মুসলমান কাগজ-প্রস্তুতকারীকে কাগজী বলা হইত। এখনও ঢাকা-মালদহ অঞ্চলের কাগজীদিগের বংশধরেরা কেবলমাত্র কাগজ তৈয়ারী করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

পূর্ব্বে এদেশে সাধারণতঃ তিন প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত—

১। সাধারণের ব্যবহারের জন্য

২। আমীর-ওমরাহদিগের জন্য

৩। ঘোঁটা কাগজ।

ঘোঁটা কাগজ আবার তিন প্রকারের—

(ক) সাদা: (কেবল কড়ি বা নুড়ি ঘষিয়া মসৃণ করা)

(খ) জরফসান্ (সোনালী ও রূপালী ছিটা দেওয়া)

(গ) টিক্‌লিদার। (ছোট ছোট পাটালি আকারের রূপালী ও সোনালী পাত বসানো)।

ঔরঙ্গাবাদের আফসানি, দৌলতাবাদের বাহাদুরখানি ও মাধগরি কাগজ সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। প্রস্তুতের সময় ইহার মণ্ডের সহিত স্বর্ণের সূক্ষ্ম পাত মিশাইয়া দেওয়া হইত। কখন-কখন ইহার চারি ধারে স্বর্ণ-রৌপ্যের লতা-পাতা, পদ্ম প্রভৃতি নানাবিধ নক্সা খচিত থাকিত। এই সকল কাগজ অতিশয় মূল্যবান; সাধারণের পক্ষে ব্যবহার একরূপ অসম্ভব ছিল। নবাব-বাদশাহেরা ইহাতে সনন্দ, ছাড়, দলিল প্রভৃতি লিখিতেন। রাজ-পরিবারের যুবক-যুবতীদের পত্র-ব্যবহারও অনেক সময় ইহাতেই হইত। গৌড়ের সাটিনের ন্যায় কাগজের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশীয় রাজন্যবর্গ এই সকল কাগজের বিলক্ষণ আদর করেন। কাশ্মীরে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়, দেখিতে তেমন সাদা নয়; কিন্তু তেমন চিক্কণ ও দৃঢ় কাগজ এদেশে অতি অল্পই আছে। শুনা যায়, অতি প্রাচীন কাল হইতেই না কি সেখানে এ-কাগজ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে।

নেপালে মহাদেওকা-ফুল (Daphne cannabia) নামক

গাছ হইতে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়; তাহা বিলাতী কাগজ হইতেও উৎকৃষ্ট। একবার তাহার কিছু নমুনা পরীক্ষার জন্য বিলাতে পাঠানো হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, কাগজ তৈয়ারীর যাবতীয় উপকরণই ইহার মধ্যে বর্ত্তমান। ইহা অতিশয় মসৃণ এবং ক্ষুদ্রাদপি অক্ষরও ইহাতে এত সুন্দর ছাপা হইতে পারে, যাহা কোন বিলাতি কাগজেই সম্ভব নয়। এই কাগজ চামড়ার মত দৃঢ় ও দীর্ঘকাল-স্থায়ী।

চীনদেশীয় এক-প্রকার চিত্রিত হাত-পাখা বাজারে পাওয়া যায়। বিশেষ শক্ত, টানিলে সহজে ছিঁড়ে না। তাহা ঐ জাতীয় বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত। ঐ বৃক্ষ ভোটরাজ্যে ও হিমালয়ের নিম্নদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ফুলগুলি সাদা বেগুনী রঙের, চোঙের মত লম্বা, মুখের দিক সামান্য ছড়ানো। গুল্মজাতীয় গাছ। ফল বিষাক্ত ও কণ্টকযুক্ত। এতদ্দেশে ঐ জাতীয় গাছকে ধুস্তুর বা ধুতুরা বলে। গাছের ত্বক্ পিষিয়া মণ্ড করিয়া কাগজ তৈয়ারী হয়।

কলিকাতার বিগত আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে (১৮৮৩-৮৪) কয়েক প্রকার দেশীয় কাগজ প্রদর্শিত হয়। তন্মধ্যে কয়েক প্রকার পাটের কাগজ, ঢাকা মুন্সিগঞ্জের মেঘু-কাগজীর প্রস্তুত এক প্রকার কাগজ, সাসেরাম হইতে এক প্রকার কাগজ, বহরমপুর কনহৌলি হইতে দুই প্রকার কাগজ এবং ভুটান হইতে এক প্রকার বৃক্ষের ছালের কাগজ আসিয়াছিল। ভুটিয়া কাগজে প্রায়ই পোকা লাগে না, দেখিতে খুব সুন্দর ও মসৃণ।

চীনদেশের কাগজ-প্রস্তুত-প্রণালী তাহাদের প্রাচীন পদ্ধতিরই ক্রমবিকাশ মাত্র। বৈদেশিক বাণিজ্য-প্রভাবে চৈনিক কাগজ কোন দিনই জখম হয় নাই। অভিজ্ঞতার ফলে চীনারা বর্ত্তমানে এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, খড়, কুটা, কাঠ, পাতা, করাতের গুঁড়া অর্থাৎ যা পায় তাই দিয়াই কাগজ প্রস্তুত করিয়া লয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ হইতে কাগজ প্রস্তুত করে। যে প্রদেশে যে-উপকরণ সুপ্রাপ্য, সেই প্রদেশ সেই উপকরণ হইতেই কাগজ তৈয়ারী করে। বিভিন্ন উপাদানের কাগজ আবার বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

ভারত-কাগজ বা 'India paper'এ ক্ষোদিত কারু-শিল্পের সূক্ষ্ম বিষয় অতি উৎকৃষ্ট ভাবে ছাপা হয়!

হো-সি নামক খড়ের কাগজ দোকানদারেরা মোড়ক বাঁধিবার জন্য ব্যবহার করে। এ কাগজ এত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয় যে, ইহার দ্বারা ঐ দেশের বহু স্থানে শব-দাহ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়া থাকে! য়ুরোপে আধুনিক কাগজ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে এই খড়ের কাগজ যথেষ্ট ব্যবহার হইত। আজও পাশ্চাত্ত্য জগতে খড়ের কাগজের আদর বড় কম নয়। যথাস্থানে সে-বিষয় আলোচিত হইবে।

কিয়াং-সি প্রদেশে হোয়াং-পিয়ান নামক কাগজেও শব-দাহ সংসাধিত হয়।

পিং-সজে নামক কাগজ তুঁত-গাছের বাকল হইতে প্রস্তুত। চিকিৎসালয়ে ও ঔষধালয়ে ক্ষতের পটি বা Lint বাঁধিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কাগজে চীনারা অনেক সময় ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা বা ন্যাকড়ার কাজ করিয়া থাকে।

তা-সে ও চসে নামক কাগজ লিখিবার খাতা-পত্রের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মাপিয়েন ও লিয়েন-সি কাগজ দেখিতে অতি সুন্দর ও পাতলা। ইহাতে পুস্তক ও চিত্রাদির মুদ্রণ-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

কৈ-লিয়েন-সি কাগজ হরিদ্রা বর্ণের। ঔষধালয়ের চূর্ণ ঔষধাদি মুড়িবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত নৌকা বা ঘরের ছাদ ফুটা হইলে তাহারা এক প্রকার কাগজ দিয়া দাগরাজী করে। আর এক প্রকার কাগজ দিয়া তাহারা জাহাজের মাস্তুলে তালি দেয়। এ কাগজ খুব শক্ত। দোকানদাররা ইহা হইতে মোড়ক বাঁধিবার সুতলি প্রস্তুত করে। চীনারা কাগজের উপর মোম ও শিরীষ জাতীয় এক প্রকার পদার্থ লাগাইয়া তাহাকে জল-সহনীয় করে। ইহাতে লিখিলে কালি চুপ্‌সায় না।

চীনের রেশমী কাগজ অতি প্রাচীন ও বিশ্ববিশ্রুত। চীনের নিকট হইতে ভারত, ভারতের নিকট হইতে পারস্য এবং ক্রমে য়ুরোপ এ কাগজ তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছে। ভারতে এক দিন এ কাগজের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ইহার জৌলস প্রশংসনীয়!

চীনারা যে কেবল কাগজই প্রস্তুত করে, তাহা নয়। তাহারা কাগজ হইতে নানাবিধ সুরুচিসম্পন্ন শিল্প-সামগ্রী গড়িয়া থাকে। এক কাগজ প্রস্তুত করিয়া অথবা কাগজ হইতে কোনরূপ শিল্প বানাইয়া চীনদেশে বহু লোক স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করে। কলিকাতার চীনাবাজার অঞ্চলে অনেক চীনা স্ত্রী-পুরুষ পাতলা রঙীন কাগজের নানাবিধ ফুল প্রভৃতি লোভনীয় বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবসা করে। আমাদের দেশের অনেক হিন্দুস্থানী সেই সমস্ত বস্তু খরিদ করিয়া পাড়ায় পাড়ায় বাঁশী বাজাইয়া বিক্রয় করে।

জাপানে দৈনন্দিন ব্যবহারের বহু সামগ্রী কাগজ-নির্ম্মিত। তাহারা অনেক সময় কাঠের কাজ, লোহার কাজ, কাপড়ের কাজ শুধু কাগজ দিয়াই সারিয়া লয়। পরদা, মশারী, টুপী, রুমাল, এক জাতীয় পোষাক, গৃহসজ্জা, আসবাব, ঘরের দেওয়াল, চাকা, দড়ি, কাঁচি প্রভৃতি তাহাদের বহুবিধ দ্রব্য কাগজ-নির্ম্মিত। তাহারাও চীনাদের মত নানাবিধ উপাদান হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কাদজ গাছ ও কাদজি বা কাদজিরা গাছের বাকল উল্লেখযোগ্য।

চীনাদের নিকট হইতে কাগজ-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আরবীরা ৭০৬ খৃষ্টাব্দে সমরখন্দ সহরে প্রথম কারখানা স্থাপন করে। ইহার প্রায় ৩০০ শত বৎসর পরে মিশর ও মরক্কোদেশীয় বণিকের সংস্পর্শে সে-কাগজ য়ুরোপে প্রচারিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্পেনদেশে তুলা হইতে কাগজ প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাই পশ্চিম মহাদেশে কাগজ-প্রস্তুতের প্রথম কারখানা। ইহার পরে ভেলেন্সিয়া (Valencia) প্রদেশের কজেটিভা সহরে আর একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারখানার কাগজ তৎকালে য়ুরোপে বিশেষ খ্যাতি-লাভ করিয়াছিল। এই সময় ইতালীয়গণ সিসিলিবাসী আরবদিগের কাছে পূর্ব্বদেশীয় পদ্ধতির কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করে এবং পরে তাহাদের দ্বারা নূতন পদ্ধতির কাগজের কারখানা স্থাপিত হয়। এই স্থলে দেখা যায়, আরবরাই অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায় কাগজ-প্রস্তুত-বিদ্যাও প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্ত্যে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তখনকার দিনের কাগজে লিখিত কয়েকখানি দলিল উত্তর-সিরিয়ার গস্ নগরের মঠে ও ভিয়েনার যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে একখানি রোম সম্রাট্ দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের

আদেশ-পত্র। ইহাতে ১২৪১ অব্দের তারিখ দেওয়া আছে। আর একখানি সিসিলির রাজা রোগারের লিখিত। ইহার তারিখ—১১০২ অব্দ। পশ্চিম পৃথিবীর ইহাই প্রাচীনতম কাগজ। ইহা ছাড়া দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাগজে লিখিত আরও কয়েকখানি আইনবহি য়ুরোপীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগৎ ১৪শ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাগজের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়া ওঠে।

১৩৯০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কাগজ প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডের কাগজ-ইতিহাসে ইহাই প্রথম কারখানা। ইহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা তৃতীয় জর্জ্জ বিখ্যাত কাগজ-ব্যবসায়ী Mattihias Koopsকে অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর কাগজ-প্রস্তুতের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি খড়ের কাগজে মুদ্রিত একখানি পুস্তক রাজা তৃতীয় জর্জ্জকে উৎসর্গ করেন এবং ঐরূপ অনুমতি দেওয়ার জন্য ভূমিকায় রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। পুস্তকখানির নাম—**Historical account of the substances which have been used to describe events and to convey ideas from the Earliest date to the Invention of paper.** এই পুস্তকখানির এক সংখ্যা কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডের কাগজ খড় ছাড়াইয়া দোসরা উপাদানের সন্ধান করে। কিন্তু শণ ও রেশম হইতে কাগজ তৈয়ারী য়ুরোপে ১৪শ শতাব্দীতেই আরম্ভ হয়। য়ুরোপের রেশমী কাগজ বিশেষ শক্ত ও যথেষ্ট প্রসিদ্ধ।

বিলাতী কাগজের জল-ছাপ কাগজ-প্রস্তুতের প্রথম অবস্থা হইতেই প্রচলিত। ভিন্ন ভিন্ন জল-ছাপ ভিন্ন ভিন্ন কারখানার বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন জল-ছাপের মধ্যে—পাঞ্জা, মদের গ্লাস, সিঙ্গা, ঢালের উপর রাজ-মুকুট, পুষ্প, অশ্বারোহীর টুপী প্রভৃতি প্রধান। অশ্বারোহীর টুপী মার্কা কাগজে সেক্সপীয়ারের পুস্তকাবলী প্রথম ছাপা হইয়াছিল। তৎকালে আদালতের কার্য্যে অনেক সময় এই সকল জল-ছাপই একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইত।

ফুলস্কেপ কাগজের একটা ইতিহাস আছে। একবার ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্ কয়েক জন ব্যবসাদারকে বিশেষ বিশেষ বস্তুর একচেটিয়া ব্যবসায়ের আদেশ দেন। তাহাদের মধ্যে কয়েক জন সরকারী দপ্তরখানায় কাগজ সরবরাহ করিবার অনুমতি পায়। ইহারাই সর্ব্বপ্রথম ফুলস্কেপ কাগজের আকারে কাগজ তৈয়ারী করে। সেই সময় ঐ কাগজের জল-ছাপে রাজ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত। পরে অলিভার ক্রমওয়েল শাসনভার গ্রহণ করিলে তিনি ইহাতে রাজ-চিহ্নের পরিবর্ত্তে গাধার টুপী (fool's cap) ও ঘণ্টাচিহ্ন অঙ্কিত করিবার আদেশ দেন। শেষে পার্লামেন্টের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত হইলে উক্ত গাধার টুপী ও ঘণ্টাচিহ্ন উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অদ্যাবধি সেই আকারের কাগজ ও পার্লামেন্টের জাবদা খাতা-পত্রের নাম ফুলস্কেপই আছে।

লিখন-পঠন ব্যতিরেকেও কাগজের যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। কিন্তু কাগজের এক দিন জন্ম হইয়াছিল লেখ্য উপকরণেরই অভাব-চিন্তা হইতে। কাগজসৃষ্টির পূর্ব্বে কোন্ কোন্ বস্তু মানুষের উদ্দেশ্য সাধন করিত, একবার তাহার অনুসন্ধান করা যাক্।

প্রস্তর—প্রস্তরই মানুষের প্রাচীনতম লেখ্য উপকরণ। মানুষ যেখানে যায়, সেখানকারই পর্ব্বতগাত্রে অথবা বৃক্ষগাত্রে কোন-কিছু অঙ্কিত করিয়া আসা তাহার চিরন্তন স্বভাব। আজও নিম্নভূমির লোক পার্ব্বত্য দেশে গেলে সেখানে পর্ব্বতপৃষ্ঠে নাম লিখিতে লুব্ধ হয়। মানুষের এই প্রবৃত্তি হইতেই লিখন-প্রথার উৎপত্তি। পূর্ব্বে প্রায় সকল দেশেই প্রস্তরের উপর লিখন-কার্য্য সম্পন্ন করিত। আজও মিশরের পিরামিড-গাত্রে, অনেক পর্ব্বতগুহায় প্রাচীন অক্ষরের লিখিত পদার্থের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। অজন্তা প্রভৃতি অনেক স্থানে অজ্ঞাতনামা শিল্পীর বহু সুনিপুণ চিত্রাদিও দেখা যায়। বর্ত্তমানে সমাধি-শিলায় স্মৃতি-লিপি ও ফটকের পার্শ্বে প্রস্তরখণ্ডে নাম ও উপাধি-লিপি—সেই প্রাচীন পদ্ধতিরই অবতারণা করিতেছে।

কাষ্ঠ—বৃক্ষগাত্রে লিখিবার প্রথা পর্ব্বতগাত্রেরই সমসাময়িক। ইহা হইতেই কাষ্ঠপাতে লিখন-প্রথার উদ্ভব। ইহার প্রচলন প্রায় সকল দেশেই ছিল। সোলনের বিখ্যাত জাতি-সংগঠক আইনগুলি প্রস্তর ও কাষ্ঠফলকে খোদিত হইয়াছিল। লুবুগাছের কাঠ এই কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সেকালে রোমের আইন-কানুন ওকগাছের কাঠে লিখিত হইয়া সাধারণের পাঠের জন্য বাজারে (Forum) প্রদর্শিত হইত।

মহারাজ অশোক গৌতম বুদ্ধের বাণী সকল বৃক্ষ ও প্রস্তর-ফলকে লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। আজও এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া স্কুল-কলেজে কাষ্ঠফলকে (Black Board) লিখন-কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। বিংশ শতাব্দীর বহু দোকানদার কাষ্ঠখণ্ডের উপর হিসাব লিখিয়া প্রাচীন যুগের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানে কাগজের অভাবে বহু স্থানে হিসাব-নিকাশে সাহায্য করিতে আবার কাষ্ঠ-ফলক আসিয়া দেখা দিয়াছে।

বৃক্ষত্বক্—বৃক্ষত্বক্ আধুনিক কাগজের পিতামহ। মানুষের বিজ্ঞান-চিন্তা কাষ্ঠফলক অপেক্ষা সুন্দর ও চিক্কণ পদার্থ অনুসন্ধান করিতে গিয়া এক দিন বৃক্ষ-বল্কলকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। সেই সঙ্গে কাঠের গুরুভার ও যন্ত্র-সাহায্যে খোদিত করার গুরু পরিশ্রমেরও অবসান ঘটিল। সেই সময়ে লেখনীর সাহায্যে কালি-জাতীয় তরল পদার্থের জন্য বৃক্ষের রস বা কষ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বৃক্ষ-বল্কল চাঁছিয়া ছুলিয়া ভব্য-সভ্য করিয়া উপর্য্যুপরি রাখিয়া গ্রন্থ রচনা হইতে লাগিল। ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বৎ, শ্যাম, আনাম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশের অনেক মঠে, টোলে, পাঠাগারে এবং এতদ্দেশীয় বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাড়ীতেও বৃক্ষত্বকে লিখিত বহু প্রাচীন গ্রন্থ ও পুঁথি আছে। মালাবার-উপকূলবাসী ও সুমাত্রা-দ্বীপের দুই-একটি জাতি এখনও পূর্ব্ব প্রথানুসারে বৃক্ষ-ছালেই লেখাপড়া করে। মিশর দেশের প্যেপিরাস বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ ছাল এক দিন সমস্ত পশ্চিম-এশিয়ায় ও য়ুরোপে লেখনী-রূপে ব্যবহৃত হইত। নীল-নদের তটভূমি ছিল প্যেপিরাসের আবাদক্ষেত্র। গাছগুলি গুল্ম আকারের, শাখা-বর্জ্জিত, সরল ; মস্তকে বহুশীর্ষযুক্ত একটি পুষ্প ফুটিত। সরু সরু কাণ্ডগুলি কেবলমাত্র বাকলে গঠিত। বাকলগুলি কাগজের মত পাতলা। লেখাপড়ার জন্য কয়েকখানি ছাল পাশাপাশি জুড়িয়া কোষ্ঠিপত্রের মত পাকাইয়া রাখা হইত।

বংশ—পুরাকালে চীনদেশে বংশের অভ্যন্তরে লিখিবার কথা জানা যায়। পরবর্ত্তী কালে এই প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি হয়। চীনারা

বাঁশের ছালকে এক পংক্তির উপযুক্ত প্রস্থ ও ৯।১০ ইঞ্চি দীর্ঘ করিয়া কাটিয়া লিখিবার মত করিয়া লইত! তার পর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সজ্জিত করিয়া মধ্যস্থলে একটি ছিদ্রের মধ্যে সূত্র প্রবেশ করাইয়া বন্ধন করিত। চীনদেশে তৎকালে ঐরূপ পুঁথির প্রচুর চলন ছিল। ইহা অনেকটা আমাদের দেশের তালপাতার পুঁথির মত।

বৃক্ষপত্র—বৃক্ষত্বকের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষপত্রও ক্রমশঃ লিখিবার উপাদান হইয়া উঠিল। প্রাচীন যুগে সাইরাকিউসের বিচারপতিরা জলপাই-পত্রে আসামীদের নির্ব্বাসন-দণ্ডের আদেশ লিখিতেন। পূর্ব্বদেশে তালপত্রে গ্রন্থ-মুদ্রণ ও ভূর্জ্জপত্রে কবচ, যন্ত্রাদি লিখিবার রীতি আজিও বর্ত্তমান। পল্লীগ্রামের পাঠশালায় কলাপাতা, তালপাতায় লিখিবার নিয়ম বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই আবার নূতন করিয়া তাহার সূত্রপাত হইতেছে। বৃক্ষপত্রের ব্যবহার হইতেই বইয়ের পাতা, পত্র বা Leaf শব্দের প্রচলন।

ইষ্টক—ইষ্টক বা মৃৎফলকের উপর লিখিবার পদ্ধতিও অতি প্রাচীন। আদিকালে কলিয়াদগণ ইষ্টকের উপর তাহাদের জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তের ফলাফল লিখিয়া রাখিত। কাঁচা ইষ্টকে লিখিয়া তাহা পুড়াইলেই তাহা স্থায়ী করা যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য যাদুঘরে অদ্যাপি তাহা কিছু সংগৃহীত আছে। এসিরিয়ায় ও ব্যাবিলনে মাটির রোলার করিয়া (cylinder) তাহার গায়ে সাহিত্য, জ্যোতিষ, ইতিহাস, জীবনী, জন্মপত্রিকা প্রভৃতি লিখিবার ব্যবস্থা ছিল। ঐ সকল রোলারের মধ্যে নেবুকাড্‌নিজারের সপ্তগ্রহকে মন্দির উৎসর্গ করার কাহিনী-সম্বলিত দুইটি রোলার পাওয়া গিয়াছে। তৎকালে গ্রীস ও মিশরীয়গণও মৃৎপাত্র ও টালির উপর বহু বিষয় লিখিয়া রাখিত। লণ্ডনের যাদুঘরে ঐরূপ প্রচুর টালি ও মৃত্তিকা-পাত্রে সংগৃহ আছে। চীনদেশেও মাটির বাসনের (Porcelain) গায়ে কবিতাদি লিখিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা হইত।

ধাতুপাত—অতঃপর ধাতুযুগ, প্রস্তর, মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ-সভ্যতার অবসান ঘটাইয়া লিখন-কার্য্যে সীসক, পিত্তল ও তাম্রপাত ব্যবহৃত হইতে লাগিল। রোমে পিত্তল ও সীসকপাতে আইন, দলিলপত্র প্রভৃতি লেখা হইত। রোম-সম্রাট্ ভেস্পেসিয়ানের আমলে রাজধানী অগ্নিদগ্ধ হইলে ৩০০ পিত্তলপাত নষ্ট হয়। ভারত সিংহল ব্রহ্মদেশের তাম্রলিপিও ইহার অপর নিদর্শন।

হস্তিদন্ত—ব্রহ্মদেশে মূল্যবান গ্রন্থাদি হস্তিদন্তের পাতে সোনা-রূপার অক্ষরে লিখা হইত। রোমীয়গণ ঐরূপ পাতের উপর মোমের আস্তরণ দিয়া সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিত।

চর্ম্ম—কোন কোন দেশে ছাগল ভেড়া প্রভৃতি পশুচর্ম্মে লিখিবার প্রথা ছিল। প্রাচীন ইহুদীদিগের আইন সূক্ষ্ম চর্ম্মের উপর লিখিত হয়। কনষ্টান্তিনোপলের অগ্নিকাণ্ডে হোমারের ইলিয়াড অডিসির এক কপি পুড়িয়া যায়। উহা একজাতীয় সর্পের উদরের চর্ম্মে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল। পূর্ব্বে পারস্যে তুজ নামক বৃক্ষের ত্বকের সহিত চামড়া মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত; সেই সময় পশ্চিম-এশিয়া ও পূর্ব্ব-য়ুরোপের বহু স্থানে এবং ভারতের পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। বর্ত্তমান যুগের পার্চমেণ্ট কাগজ সেই জাতীয় কাগজের পরিণতি।

অস্থি—লিখনকার্য্যে এই সকল পদার্থের ব্যবহারের সহিত অস্থির ব্যবহারও দেখা যায়। শুনা যায়, মুসলমান-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের কতকগুলি গ্রন্থ মেষের স্কন্ধের অস্থিতে লিখা হইয়াছিল।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বস্তুগুলি কাগজ-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।—তুলা, পাট, শণ, রেশম, পশম, খড়, তৃণ, কাঁটাগাছ, কাষ্ঠ, বাকল, বৃক্ষমূল, শৈবাল, জলজ উদ্ভিদ, ছোবড়া, নারিকেলের মালা, বৃক্ষপত্র, তুঁষ, চুল, চামড়া, কাপড়, বাদামের খোলা প্রভৃতি। বৃক্ষের মধ্যে বাবলা, তুঁত, ইক্ষু, বংশ প্রভৃতি প্রধান। পত্রের মধ্যে ঘৃতকুমারী, আনারস, ভূর্জ্জ, তাল প্রভৃতি। এইরূপ তৃণের মধ্যে শর, কুশ ও ঘাসই প্রশস্ত। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, ভারতের যাবতীয় তৃণ হইতেই কাগজ প্রস্তুত সম্ভব।

এইবার কাগজ তৈয়ারীর কথা আলোচনা করা যাক্। প্রথমে ছেঁড়া কাগজ, ন্যাকড়া, কচি বাঁশ, তৃণ প্রভৃতি উপকরণগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হয়। পরে ৫।৭ দিন চূণ বা অন্য কোন ক্ষারের জলে ভিজাইয়া অগ্নি-তাপ দিলেই মণ্ড প্রস্তুত হইবে। তখন তাহার সহিত ভাতের মাড় জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত করিয়া ছাঁচে ঢালিলেই কাগজ প্রস্তুত হইবে। ইহার জলীয় অংশ বাহির করিবার জন্য উপর হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত লোহার পাতের সাহায্যে চাপ দিতে হয়। মণ্ডের সহিত কিছু তুঁতে মিশাইলে কাগজে উই ধরে না।

চীনদেশীয় বাঁশের কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—কচি বাঁশগুলিকে টুকরা করিয়া টুকরাগুলিকে দুই-এক দিন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তার পর পুনরায় ৫।৭ দিন চূণ বা ক্ষারের জলে ভিজাইয়া নরম করিয়া লইতে হইবে। তখন উত্তমরূপে জলে সিদ্ধ করিলেই মণ্ড প্রস্তুত হইবে। এবার ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালিলেই কাগজ তৈয়ারী হইবে। কোন কোন স্থানে কাগজকে জল-সহনীয় করিবার জন্য মণ্ডের সহিত হীরাকষ বা ডিমের শ্বেতসার মিশানো হয়।

বঙ্গদেশীয় তুলট কাগজ তুলা চাপড়াইয়া অথবা তুঁতগাছের ছাল চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত গঁদ ও তেঁতুলবীচির আঠা মাখাইয়া প্রস্তুত হইত। কেহ কেহ ভাতের ফেনও মাখাইত। এই কাগজ বিশেষ শক্ত—টানিলে সহজে ছিঁড়ে না।

এক্ষণে কাগজ প্রস্তুতের অভিনব যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে কাগজ প্রস্তুতের যাবতীয় কাজই অতি সহজে ও সুচারু ভাবে সম্পন্ন হইতেছে। উপরিলিখিত নিয়মগুলি হস্ত দ্বারা অল্পের মধ্যে সারিবার জন্য দেওয়া হইল। উহাই কাগজ প্রস্তুতের আদি প্রণালী।

পেপার-মেশি—ছেঁড়া বাতিল কাগজে এক প্রকার শিল্প প্রস্তুত হয়। ইহা চীনদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া সমগ্র য়ুরোপ ও আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বহু বেকারের অন্নসংস্থান হইতেছে।

প্রস্তুত-প্রণালীও সহজ। প্রথমে কাগজগুলিকে সামান্য কুটিয়া উত্তমরূপে অগ্নিতে কিছু ক্ষারযোগে ফুটাইয়া মণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। তার পর Embossing processএ ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালিয়া তাহা হইতে সিগারকেস, নস্যের ডিবা, টি-ট্রে, ব্র্যাকেট, খেলনা, পুতুল প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু প্রস্তুত করা যায়। জিনিষগুলি খুব হাল্কা, সহজে ভাঙ্গে না। ইহার সহিত হীরাকষ বা ডিমের শ্বেতসার মিশাইয়া শক্ত ও জল-সহনীয় করা যায়। শুকাইয়া গেলে ইহার উপর ২।৩ কোট বার্ণিস বা রং মাখাইয়া লইলে রীতিমত ব্যবসায় করা চলে।

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

স্বামী

(গল্প)

এঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেই দু'বছর মাত্র বাবার কাছে শিক্ষানবিশী,—তার পর বাবা রিটায়ার করলেন আর আমি পাকা হয়ে বাহাল হলাম তাঁর পোষ্টে। প্রথম যৌবনেই এতখানি সাফল্য বাঙ্গালীর ভাগ্যে সহজ কথা নয়! কিন্তু আমার পত্নী-সৌভাগ্য এর চেয়েও অসাধারণ! লতিকার হৃদয় জয় করে তাকে আমি বিয়ে করেছি। ব্যারিষ্টার এ, কে, চৌধুরীর কন্যা লতিকা।

ঘটক-পুরোহিত বা হারু খুড়োর মধ্যস্থতায় বিয়ে নয়! ক্রেসেন্ট-ভিলার লতিকার হৃদয় জয় করে মিলন! ডক্টর বোস এম্ বি, এফ আর সি এস্ (এডিন) যার হৃদয়ের দ্বারে মাথা গলাবার জন্য পাঁচ বার নিজেদের কটেজে পার্টি দিয়েছিল; ব্যারিষ্টার চন্দ দেরাদুন শৈল-নিবাস থেকে ওয়ালটেয়ারের জ্যোৎস্না-প্লাবিত সৈকতে দীর্ঘ কাল বন্ধুভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছিল; কার এণ্ড বজেরিয়া কোম্পানির অমলেন্দু কর,—লতিকার দু'টো জন্ম-তারিখে খাঁটী সাহেবদের হোটেলে বাঙ্গালীদের প্রীতি-সম্মিলনীর ব্যবস্থা করেছিল! অপেক্ষাকৃত অবিখ্যাতদের হিসাব নাই বা দিলাম!

আমি নিজেও যে বাবার ব্যাঙ্কের হিসাব কিছু খাটো করিনি, তা' নয়! কিন্তু তার জন্য কোন দিনই ক্ষুব্ধ হইনি। রমণীর মন—সহস্র বৎসরের সাধনার ধন! এ তো সামান্য একটি বছর! লতিকা যে কোর্টশিপ-কোম্পানির কাকেও কোন দিন ভালোবাসেনি, শুধু মজা দেখেছে, এ-কথা বিয়ের পর সরল ভাবেই আমার কাছে স্বীকার করেছে। ওরা না কি সব 'ক্যাড'! আমার রুচি মার্জ্জিত, প্রকৃতি ভদ্র, পাণ্ডিত্য গভীর—এ সবের কাছে ওরা কেউ দাঁড়াতে পারে না!

এই অসামান্য চাঞ্চল্য একান্ত ভাবে উপভোগ করার সুযোগ দিয়ে বাড়ীর সবাইকে নিয়ে বাবা আর মা মধুপুরে হাওয়া বদলাতে গেছেন। গাড়ী-বাড়ী, চাকর-খানসামা নিয়ে আমি একবেলা অফিস, অন্য বেলা 'মধুচন্দ্র' যাপন করছি।

বিকেলে অফিস থেকে ফিরে অফিসের পোষাক বদলাচ্ছি, চাকর এসে খবর দিল, মেম-সাহেব ব্যারিষ্টার সাবকা কোঠিমে গেছেন···পাঁচ বাজে জরুর লওটেগা! এ বাড়ীতে মেম-সাহেব বলতে লতিকাকে আর ব্যারিষ্টার সাহেব বলতে তাঁর বাবাকে বোঝায়।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। কিছুক্ষণ আগেই পাঁচটা বেজেছে। লতিকার জন্য বেশীক্ষণ দেরী করতে হলো না। নীচে মোটরের হর্ণ শোনা গেল এবং একটু পরেই সিঁড়িতে তিন-চার জোড়া চরণধ্বনি! সঙ্গে সঙ্গে শ্যালিকা, শ্যালক এবং পত্নীর প্রবেশ। একটু যেন ব্যস্ত ভাবেই প্রবেশ!

"কখন তুমি অফিস থেকে বেরিয়েছ? অফিসে ফোন্ করে তোমাকে পাওয়া গেল না।" জিজ্ঞাসা করলো লতিকা।

শ্বশুর-বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা ঘটলো না কি? ভয় পেয়ে গেলাম।

"মেট্রোয় ছ'টার শোতে বক্স রিজার্ভ করা হয়েছে। জলদি তৈরী হয়ে নিন।" ভয়টা ভেঙ্গে দিল শ্যালিকা।

"তৈরী হতে পনেরো মিনিটের বেশী লাগলে 'শো' আরম্ভ হয়ে যাবে কিন্তু!" কব্জি-ঘড়ি উল্টিয়ে শ্যালক রায় দিল।

পনেরো মিনিটে তৈরী হওয়া দূরের কথা, পনেরো মিনিট নষ্ট করারও উপায় ছিল না আমার। মাসখানেক ধরে পার্টির অরণ্যে মধুচন্দ্রটা একটু বেশী করেই উপভোগ করেছি। ফলে অফিসের ফাইলগুলিতে অমা-বস্যা দেখা দেছে! বড়সাহেব অফিসে শ্লিপ্ দিয়েছেন সেগুলির সুব্যবস্থা না করতে পারলে বাবার পদে বহাল থাকার পক্ষে আমার যোগ্যতা নেই, প্রমাণ হবে। বাধ্য হয়েই অবস্থাটা তাদের বুঝিয়ে বলতে হলো। পত্নী ও শ্যালিকারা ব্যারিষ্টার-কন্যা—বড় সাহেবের চিরকুটের মর্ম্ম বুঝলো।

"এমন সুন্দর শো!" শ্যালিকার অর্দ্ধস্বগত আক্ষেপ-উক্তি।

"তাতে কি হয়েছে! আজ তোমরাই গিয়ে দেখে এসো।" শ্যালিকাকে ভরসা দিলাম।

"কিন্তু দিদি তা হলে যাচ্ছে না বোধ হয়?" শ্যালক মন্তব্য করলো।

"কেন যাবে না? বাঃ, এমন সুন্দর শো।" ভদ্রতায় ত্রুটি হতে দিলাম না।

"কিন্তু তুমি একা থাকবে?" পত্নীর কণ্ঠে সহানুভূতি।

"একা কেন! চার-পাঁচটা ফাইল নিয়ে এসেছি যে। তোমরা কিন্তু আর দেরী করো না! ছ'টা বাজে—বয়কে আমার জন্য চা-জলখাবার দিতে বলে যাও। আমার আসার পর তার টিকিও দেখিনি!"

"ও, সে তো তার ভাইকে দেখতে আমার কাছে ছুটী নিয়ে চলে গেছে। সন্ধ্যার পর ফিরবে। তোমার চা তাহলে—" পত্নী মুস্কিলে পড়লেন!

"আচ্ছা, আমিই ব্যবস্থা করছি। তোমরা বেরিয়ে পড়ো।"

তিন-জোড়া সপাদুকা-চরণের দ্রুত অন্তর্দ্ধান।

ব্যবস্থা অবশ্য কিছুই করতে পারলাম না। কোন দিন নিজে চা করার অভ্যাসও ছিল না। বাড়ীতে খানসামা-বাবুর্চ্চির অপ্রতুল কোন দিনই হয়নি, কিন্তু সব ক'জনই এখন মধুপুরে। এক জন চাকর, এক জন খানসামা, বাবুর্চ্চি কম্‌বাইণ্ড ড্রাইভার, আমি আর লতিকা—এই নিয়ে এখন আমার সংসার।

এর চেয়ে বেশী লোক বাড়ীতে থাকলে নববিবাহিতদের অসুবিধা হবার কথা। অফিসে বড় সাহেবের স্লিপ স্নিগ্ধ দেহ-মনের উপর বেশ ভালো রকম ভার চাপিয়েছিল; এখন আহার এবং পানীয়—দু'-ই চাই। হতাশ ভাবে ডেকচেয়ারে পড়ে দেহ এলিয়ে দিলাম।

পাশের বাড়ীর দরজায় সাইক্‌লের বেল এবং টেলি-গ্রাফ-পিয়নের গলা শোনা গেল, "বাবু তার।" উৎসুক ভাবে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম।

বালীগঞ্জ সার্কেলের লোক হলেও আমাদের বাড়ীটি নিতান্ত অখ্যাত পল্লীতে—বাড়ীটি অবশ্য অখ্যাত নয়।

পাশের বাড়ীতে এক-একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে তিন-চার ঘর কেরাণী-পরিবার দিন-গত পাপক্ষয় করে। তাদের সকলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই বটে—কিন্তু আমাদের গায়ে লাগানো যে ফ্ল্যাট, সে ফ্ল্যাটে এক ছোকরা কেরাণী তার বুড়ো মাকে নিয়ে বাস করে—তার সঙ্গে আমাদের পরিচয়—এমন কি, একটু ঘনিষ্ঠতাও আছে। তার কারণও ছিল। গত বৎসর আমার ছোট ভাই-বোন দু'টির স্কারলেট-ফিভার হয়। অত্যধিক সংক্রামকতার ভয়ে তাদের শুশ্রূষার ব্যাপার নিয়ে আমরা বেশ একটু অসুবিধায় পড়ি। আমাদের বাড়ী আর তাদের ফ্ল্যাট গায়ে-গায়ে লাগানো। একটু মনোযোগ দিলেই পরস্পরের সাধারণ আলাপ শুনতে অসুবিধা হয় না। রাত্রে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তার কথা হয়তো ছোকরার কাণে গিয়েছিল! পরদিন সে নিজে এসে শুশ্রূষার প্রার্থনা জানালো এবং পনেরোটি বিনিদ্র রজনী যুদ্ধ করে এক রকম যমের মুখ থেকে সে তাদের ফিরিয়ে আনলো। ছোকরার নাম অনিল। পাড়াগাঁয়ে বাড়ী। মা ছাড়া আপন-জন কেউ নেই! সামান্য কি বিষয়-সম্পত্তি আছে, এক দূর-সম্পর্কীয় খুড়ো সে সব দেখা-শোনা করে, খুড়ো খুব ভালো—ওদের ঠকায় না।

অনিল একটা মার্চেন্ট-অফিসে সামান্য মাহিনায় চাকরি করতো। বাবা খুশী হয়ে তাকে আমাদের অফিসে অপেক্ষাকৃত ভালো কাজ দিয়েছেন এবং সেই থেকেই তাকে স্নেহ করে আসছেন। স্নেহ করার মত ছেলেটিও বটে—যেমন নম্র, তেমনি অমায়িক।

রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম, অনিলই টেলিগ্রাম নিয়ে ভিতরে গেল। আমরা অবশ্য খবরের আদান-প্রদান টেলিগ্রামেই করে থাকি—নাহলে মান থাকে না! কিন্তু অনিলদের সমাজের খবর তো জানি—হঠাৎ কারো মৃত্যু, বা জীবনে আশা নেই এমনি অসুখ না হলে টেলিগ্রাম পাঠাবার প্রয়োজন প্রায় হয় না। তাকে স্নেহ করতাম। ব্যাপারটা জানবার জন্য চাকর পাঠিয়ে তাকে ডাকতে হলো।

অনিল এলে যে সংবাদ পেলাম, তাতে নিশ্চিন্ত হলাম। তার বিয়ের দিনস্থির করে খুড়ো টেলিগ্রাম করেছেন—শীঘ্র রওনা হতে।

"আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবে না?"

কংগ্রাচুলেট্ করলাম।

"আজ্ঞে, যে-রকম জায়গা, সেখানে আপনাদের——"

মানায় না? অনিল অবশ্য অত দূর বললে না, কুণ্ঠিত হয়ে পড়লো।

"বেশ, বেশ। তোমরা এখানে ফিরে এলেই নিমন্ত্রণ খাওয়া যাবে—কেমন? তখন যেন ঠকিয়ো না।" আলাপ সংক্ষিপ্ত করে তাকে রেহাই দিলাম।

"মেয়ে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?" অধস্তন কেরাণীকে এর বেশী প্রশ্ন করা চলে না।

"আমি তো দেখিনি স্যার! কোথায় বিয়ে তাও জানি না। খুড়োই ঠিক করেছেন।" অনিল আরো কুণ্ঠিত হলো। আরো দু'-একটা কথা বলে তাকে বিদায় দিলাম, কিন্তু মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো। আমি লতিকার স্বামী—অনার্স-গ্রাজুয়েট-লতিকা! দীর্ঘ এক বৎসর ব্যারিষ্টার চৌধুরীর গৃহে গতায়াত করে—দু'বার দার্জ্জিলিংএ লতিকাকে গতায়াত করিয়ে তবে তার মন বুঝতে পেরেছিলাম। আমি তবু বুঝতে পেরেছি কিন্তু ব্যারিষ্টার চন্দ দু'বৎসর দেরাদুন-ওয়ালটেয়ার পর্য্যন্ত একত্র ঘুরেও বুঝতে পারেনি,—এহেন দুর্জ্ঞেয় নারী জাতিকে—তা হলোই বা পাড়াগাঁয়ের—একবারও না দেখে সে বুঝে নিল তার ভালোবাসা পাবে? ব্যাপারটা কিছুতেই যেন মনে থিতুতে পারছিল না।

ডেক-চেয়ারে বসে দেখলাম, অনিল বাসা থেকে বেরিয়ে গেল। বোধ হয় বিয়ের বাজার করতে! ইডিয়ট!

দীর্ঘ সাত ঘণ্টার মধ্যে পেটে খাদ্য বা পানীয় কিছুই পড়েনি—একটু চা-ও নয়! মাথা গরম হয়ে উঠেছে। ইচ্ছা হচ্ছিল অনিলের ঝুঁটি ধরে দু'টো ঝাঁকি দিয়ে বলি, ওরে হতভাগা, ওদের জাত্‌কে তো এখনও চিনিস্‌নি! একটু আড়াল-আবডাল থেকে ওয়াকিব-হাল হয়ে নে—তার পর তোর হারু খুড়োর ঘটকালিতে হাজির হোস্। অনিল কিন্তু কখন্ রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে!

সে দিন বড় সাহেবের স্লিপ দেখিয়ে শ্বশুর-কন্যাদের হাতে রেহাই পেয়েছিলাম কিন্তু খোদ শ্বশুর-মহাশয়ের

নিমন্ত্রণে রেহাই মিললো না। তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা মাধবীর জন্মদিনের পার্টীতে অনেক মান্যগণ্য ভাগ্য-পরীক্ষক উদীয়মান ব্যারিষ্টার-ডাক্তার নিমন্ত্রিত হয়েছেন। মাধবীর মন বোঝাবুঝির পালা এবার। আমাদের পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে ডাক্তার বোসও উপস্থিত ছিলেন। তিনি এখন মাধবীর মন বুঝতে চান? অনেকগুলি 'তারকা'ও উপস্থিত ছিলেন—সিনেমার নয়, লেকের। সম্ভবতঃ প্রাথমিক বাছাইটা পরের খরচে হওয়াই ভালো। লতিকা সগৌরবে তাদের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দিল। তার স্বামি-গৌরবে না কি অনেক তারকারই ঈর্ষা হয়েছে!

তারকার দল সিনেমেটিক কায়দায় নমস্কার গ্রহণ করলেন। বন্ধুরা বন্ধুর মতই হাতাহাতি করলে। ডাক্তার বোসের ঝাঁকিটা কিন্তু শক্ত! গাত্রদাহ, না, আনন্দাতিশয্য—ঠিক বুঝলাম না।

ইনার টেম্পল, গয়ার ষ্ট্রীটের অতি-আধুনিক খবর কিছু-কিছু সংগ্রহ করে পার্টীর শেষে বাড়ী ফিরে এলাম। তবে সস্ত্রীক নয়—একা।

অনিল বিয়ে করে ফিরে এসেছে। সাত দিন মাত্র সে ছুটী পেয়েছিল। কেরাণীর বিয়ের ব্যাপারে এর বেশী সময় যে লাগে না, এ-কথা সাহেব বেশ জানে।

অনিল এসে সসঙ্কোচে বৌ-দেখার নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিল! বাবা অনিলের স্ত্রীকে একজোড়া ব্রেসলেট দিয়ে আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছেন। আমিই বাবার প্রতিনিধি হয়ে বৌয়ের হাতে বালা পরিয়ে দিয়ে এলাম। লতিকারও নিমন্ত্রণ ছিল। যেতে পারেনি—আগেই কোথায় তার নিমন্ত্রণ বুক্ করা ছিল।

যেতে পারেনি, ভালোই হয়েছে! কারণ, বৌটি যখন অলঙ্কার এবং আশীর্ব্বাদ পেয়ে আমার পায়ের কাছে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলে, লতিকা তা দেখলে নিশ্চয় হেসে ফেলতো! রামায়ণে আছে, রামচন্দ্র না কি বলেছিলেন আমরা রাজপুত্র, কোন দিন প্রণাম করিনি। কেমন করে করতে হয় জানি না। যুক্তিটা অকাট্য—এরিষ্টোক্রাট-সার্কেলে এখন রাম-রাজত্ব চলেছে!

অনিলের বৌটি কিন্তু দেখতে বেশ। বুড়ো হারু খুড়োর টেষ্ট আছে! অবশ্য লতিকার সঙ্গে তুলনা হয় না, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

ওদের শয়ন-ঘরের জন্য আমার পাশের ঘরটিকেই সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে। ঠিক যেন আমার মধুচন্দ্র-রজনীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ভাব! নয়তো গলির এই মুখটাতে পুষ্পধনুর দু'-একটা ফুল ছিটকে পড়ে থাকবে!

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ওদের মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়, কিন্তু কোন কথা স্পষ্ট ধরতে পারি না। পাশের ঘরেই এঞ্জিনীয়ার সাহেব থাকেন এ-কথা তারা কোন সময়েই ভুলে যায় না। অথচ এই ঐতিহাসিক যুগের বিয়ের ফল বর্ত্তমান যুগে কেমন হয়, জানবার জন্য আমার আগ্রহ বড় কম ছিল না।

এক-তলার যে স্থানটা তাদের রান্নার জন্য ঘেরা, তারই সম্মুখে অনিলের মা তুলসী-মঞ্চ স্থাপনা করেছিলেন। আগে প্রতি-সন্ধ্যায় বৃদ্ধা নিজেই প্রদীপ দিতেন, এখন দেখি, অনিলের স্ত্রী একখানা গেরুয়া-রংএর শাড়ী পরে সেখানে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়ে প্রণাম-নিবেদন করে যায়। বৃদ্ধা বোধ হয় প্রকৃত মালিকের উপর গৃহ-দেবতার ভার দিয়ে এখন নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

সে দিন বৌটি প্রণাম করছিল—অনিল সওদা-হাতে তার পিছনে এসে দাঁড়ালো। আমার জানলার পর্দ্দা ফেলা। ওরা আমার উপস্থিতি ধরতে পারেনি, কাজেই সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। এবার প্রথম ওদের প্রেমালাপ শুনলাম।

"আসল ঠাকুর তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে, সেটা ভুলো না বীণা।"

বীণা স্বামীর হাত থেকে পুঁটলি নিয়ে বললে, "আমাকে ঠাকুর চেনাতে হবে না! তুমি এইবার প্রণাম করো গিয়ে তো। দাঁড়াও, দাঁড়াও, সাত বাজার ঘুরে এসেছো অমনি তুলসীতলায় যায় না, একটু দেরী করো।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ—তার পর ঘটি থেকে জল ঢালার শব্দ পাওয়া গেল।

"নাঃ, তোমার জন্য আমাকে নুলো জগন্নাথ হ'তে হবে দেখছি। কিছু যদি আমাকে করতে দেবে! কেন, পা-দু'টো কি আমি নিজে ধুতে জানি না?"

"খুব জানো! অফিসে গিয়ে সাতটা সাহেবের পা ধোয়াচ্ছো রোজ।"

"ধোয়াই তো! এঞ্জিনীয়ার সাহেবের পা তুমি গিয়ে ধুয়ে দিয়ে এসো, এক জন তবু আমার ভাগে কম পড়বে।"

গুরুজনদের নিয়ে ঠাট্টা করো না! বার-বার এই তিন বার হলো! তুমিই না সে দিন বললে ছোট ভাইয়ের মত ভালোবাসেন।"

"বাসেনই তো—সেই জন্যই তো বলছি।" অনিল কৃত অপরাধটা শুধরে নিল ভয়ে ভয়ে।

"যে দিন ধোয়াতে ডাকবেন তোমার অফিস থেকে ফেরার সময়টুকুও দেরী করবো না।" বীণা ভারডিক্ট দিল বিজয়িনীর মত। "ভালো কথা, দিদি বোধ হয় বাপের বাড়ী চলে গেছেন—না?"

অনিল হো-হো করে হেসে উঠলো। হাসির দমকে বীণা অপ্রতিভ।

"হাসলে যে! আজ তিন-চার দিন দেখছি, উনি যখন

আপিস থেকে ফেরেন, একা···দিদিকে দেখি না। চাকরে খাবার নিয়ে আসে।”

“হাসি তোমার বুদ্ধির দৌড় দেখে। বাপের বাড়ী গেছেন! তুমি যেমন যাও রামচন্দ্রপুর—তিন-চার মাসের জন্যে! কিন্তু যাই করো বীণা, মনের আবেগে দিদি বলে ডাকতে যেয়ো না যেন, আমার চাকরিতে গয়া-গঙ্গা হয়ে যাবে তাহলে!”

সিঁড়িতে অনিলের মায়ের স্বর শোনা গেল, “তুলসী-তলায় পিদিম দেখালে না বৌমা?” বৃদ্ধা গৃহ-দেবতার পরিচর্য্যায় খবরদারি করতে নীচে নেমে আসছেন। বীণা ছুটু করে রান্নাঘরে ঢুকে গেল, আর অনিলও এক-লাফে নেমে গেল কলতলায়—এক দিকে মুখ-প্রক্ষালনের উচ্চ শব্দ, অন্য দিকে হাঁড়িকুঁড়ির ঢুক্‌ঢাক্।

এটুকু বোঝা গেল, বীণা মনে-মনে লতিকাকে দিদির আসনে বসিয়েছে—অনিল যেমন আমাকে দাদার আসন দেছে। তবে সে শুধু মনে-মনে, প্রকাশ করে বলার সাহস এখনও পায়নি বীণা!

•

তিন-চার দিন পরের কথা। রাত এগারোটা বেজে গেছে। বড় সাহেবের স্লিপের পর মধু-চন্দ্রিকার ক্লাট প্রায় সংশোধন করে এনেছি। এইমাত্র শেষ ফাইল দু'টি শেষ করলাম। খাটে শুয়ে লতিকা টলষ্টয়ের নভেল পড়ছে—অ্যানা কারেনিনা। অ্যানা, ভ্রন্‌স্কি, অ্যালেকসী—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টোচ্ছে আর কাহিনীটা গোগ্রাসে গিলছে। পরকীয়া প্রেমে মত্ত ভ্রন্‌স্কি, আর হতভাগ্য স্বামী অ্যালেক্‌সী আলেকজেন্‌-ড্রিনোভিচ আর দু'জনের ভাগ্যের দাঁড়িপাল্লা হাতে সুন্দরী আনা কারেনিনা!

সামনের ঘরে বীণা আর অনিলের বিশ্রম্ভালাপ চলছে। ক্রমেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একাগ্র তন্ময়তায় তারা ভুলে গেছে যে এঞ্জিনীয়ার সাহেব পর্দ্দার আড়ালে বসে ফাইল সাফ করছেন! অফিসের এঞ্জিনীয়ার সাহেব—তাদের কল্পিত স্নেহ-প্রবণ বড় ভাই!

সারা দিনের পরিশ্রম—আঙুলগুলো টন্‌টন্ করছে—একভাবে বসে থাকতে থাকতে মেরুদণ্ডে ব্যথা ধরে গেছে, একটু ঘুমোনো দরকার! কিন্তু লতিকার নভেল শেষের দিকে এসেছে প্রায়! সে কি এখন ছাড়বে? ঘরে অত্যুজ্জ্বল আলো—আমি আবার আলো জ্বললে ঘুমোতে পারি না। বদ অভ্যাস! পাশের ঘরে নব-বিবাহিত দম্পতি প্রেমালাপ করছে, আমার নববিবাহিতা পত্নী প্রেমের কাহিনী পড়ছে। আবহাওয়াটা নিশ্চয় ঘুমোবার মত নয়!

“আজকের মত বইটা রাখবে লতিকা? বড্ড ঘুম পাচ্ছে।” এক মাস আগে হলে হয়তো বলতাম, বাইরে ফিকি চাঁদের আলো উঠেছে! চলো একটু বেড়িয়ে আসি!

“এই যে আর দু'টো চাপ্‌টার—লক্ষ্মীটি, ফাইল ক'টা শেষ করে রাখো। কাল তা হ'লে——”

বাকী কথা টলষ্টয়-চাপা পড়ে গেল। কাল তাহলে ব্যারিষ্টার চন্দের বাগান-বাড়ীতে পিকনিকে নিয়ে যাবে বলতে চেয়েছিল, বোধ হয়!

ফাইল আগেই শেষ হয়েছিল। বীণা-অনিলও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল—তাদের কথা কাণে এলো।

“আচ্ছা, সব সময়ে তুমি আমার সেবা করতে এত উৎসুক কেন? কোনো কাজ আমাকে করতে দেবে না—আমি যেন মানুষ নই—দেবতা!”

“বেশ, বেশ! তোমাকে আর পণ্ডিতি ফলাতে হবে না। এখন একটু থামো! কত রাত হলো, আমাকে আজ আর ঘুমুতে দেবে না?”

বীণা ঝাঁজিয়ে উত্তর দিল; এবং এক মুহূর্ত্ত পরেই কণ্ঠ সপ্তম থেকে খাদে নামিয়ে বললো, “একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দাও না, লক্ষ্মীটি। শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাতে ঘুমিয়ে পড়ি।”

মিনিট পাঁচেক চুপ্‌চাপ্—বোধ হয় স্ত্রীর মাথায় হতভাগা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

“তোমার দিদি ফিরেছেন তো?” অনিলের স্বরে মৃদু বিদ্রূপ!

“রোজ রোজ একই ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না! আমি কেমন করে জানবো? উনি যখন অফিস থেকে ফেরেন, দিদি তখন বেড়াতে যান! অফিস থেকে ফিরলে ওঁর কাছে দিদিকে দেখি না, তাই সে দিন মনে করেছিলাম—”

একটু নিস্তব্ধতার পর;—“দিদির কিন্তু এ অন্যায়—তা তুমি যাই বলো! ওঁকে দেখেন না। বাবা-মা কাছে নেই—শুধু চাকরদের উপর ছেড়ে দিলে চলে কখনো? আমি হলে পারতাম না! দিদিকে আমি এক দিন বলবো।”

অনিল জানালো, তুমি ক্ষেপেছ! লেখাপড়া-জানা মেয়ে। নিজে মোটর চালাতে পারেন! তুমি নিজেই বল্লে সে-দিন—যেন অন্য জগতের! তুমি যাবে তাঁকে উপদেশ দিতে! তোমাকে কুকুর লেলিয়ে দেবেন! তাতেও ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার চাকরি! মনে রেখো।”

দুই জনই নিস্তব্ধ। বোধ হয় বীণা স্বামীর কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করেছে। অনেকখানি সময় কেটে গেল, বোধ হয় ওরা ঘুমিয়েছে।

কিন্তু না, আমারই ভুল—ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করার সময় ওদের নয়।

“বীণা!”

“উঁ! ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল বীণা।

“তুমি যে সে-দিন বলছিলে—”

"কিছু দিন পুরোনো হলে ভক্তি কমে যায়। সেবার ঘটা একটু কম করবে। মানুষ এ সব দেখলে হাসে না? বলো! তুমি বরং তোমার দিদিকে একবার জিজ্ঞাসা করে এসো। আজ-কালের দিনে—"

মনে করলাম, বীণা আর একদফা রুখে উঠবে! কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

"কথা বলছো না যে?"

"কি বলবো বলো? দিদিকেই বা কি জিজ্ঞাসা করতে যাবো? তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি আছে—টাকা-পয়সা, বাপ-মা, গাড়ী-বাড়ী, চাকর, খানসামা! সংসারে কিছুরই অভাব নেই, তিনি আমার কথা কি বুঝবেন! আমার তো সে-সব কিছু নেই। বিদ্যাও নেই যে বই নিয়ে দিন কাটাবো! আমার শুধু স্বামী—অযত্ন করে তাকেও নষ্ট করবো! অবহেলা করে সরিয়ে দেবো! তাহলে আমার উপায়?"

বীণার স্বর গাঢ়, উচ্ছ্বসিত। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ক'টি মুহূর্ত! শুধু ক'টি অতি-পরিচিত অস্পষ্ট শব্দ বাতাসে ভেসে এলো।

"কি প্যাথেটীক!" অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম—চমকে উঠলাম।

লতিকা ওদের কথা শুনে ফেলেছে? সর্ব্বনাশ! উদ্বিগ্ন ভাবে লতিকার মুখের দিকে তাকালাম।

"এ্যানার জীবনের শেষ পরিণতির কথা বলছি। শেষ পর্য্যন্ত তাকে রেলগাড়ীর নীচে পড়ে আত্মহত্যা করতে হলো! অথচ তার কিছুরই অভাব ছিল না! সংসারে বিদ্যা-বুদ্ধি, সমাজে প্রতিপত্তিশালী চরিত্রবান্ ধনী স্বামী, ছেলে-মেয়ে—কি না ছিল!"

আশ্বস্ত হলাম। লতিকা নভেলের কথা বলছে! দরিদ্রের যে সম্পদ্, তারই ছোঁয়াচ লেগেছিল মনে! বললাম, "অত কিছু না থাকলেই হয়তো এ্যানার মঙ্গল হতো! খুব বেশী থাকাটা অপরাধ! আর পরিণতি যাই হোক, সে তো তার স্বকৃত ব্যাধির ক্রিয়া! তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। কিন্তু তার হতভাগ্য স্বামী! আহা, কি তার অপরাধ? তবু তার জীবনে চরম সর্ব্বনাশ হয়ে গেল! মাথা নীচু হয়ে রইলো সমাজের কাছে।"

লতিকার মন এই বিশ্ববিখ্যাত কাহিনীর বিশালতায় আচ্ছন্ন হয়েছিল! সে পুনরায় সেই চিন্তাতেই ডুবে গেল।

নাঃ, অনিলকে ডেকে কাল সতর্ক করে দিতে হবে! অতখানি পরচর্চ্চা ভালো নয়!

"আচ্ছা, আমি যদি এই বইটার বাংলা তর্জ্জমা করি—আদর হবে না?" সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো লতিকা আমার দিকে।

চেয়ারে বসেই ঘুমে ঢুলছিলাম—উত্তর দিতে একটু দেরী হলো।

"বাঃ, তুমি দিব্বি ঘুমোচ্ছ—বসে বসেই! বলো না, আমি যা জিজ্ঞাসা করছি।"

"হবে না কেন?—তোমার বন্ধুরা লুফে নেবে নিশ্চয়। প্রত্যেকে এক-এক কপি নিলেই তো একটা এডিসন্ কেটে যাবে।"

বইখানা লতিকা আষ্টে-পৃষ্ঠে উল্টে-পাল্টে দেখছে আর প্রয়োজন-মত প্রশ্ন করছে। তর্জ্জমা করতে হলে ওর প্রকাশকদের সম্মতি আনাতে হবে, বোধ হয়। মস্কো থেকে? না, লণ্ডন থেকে? টলষ্টয়ের উত্তরাধিকারীদের ঠিকানা পাওয়ার উপায় কি ইত্যাদি।

টলষ্টয়ের উত্তরাধিকারীদের হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় নেই; চোখ রগড়ে ঘুমের হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করলাম।

বীণা আমাদের সাড়া পেয়ে থেমে গেছে। ঘুমোয়নি নিশ্চয়ই! এক মাস আগে সে ছিল অজ্ঞাত অখ্যাত বীণা! সে এখন স্বামী পেয়েছে—একান্ত নিজস্ব সংসার—সে কি ঘুমোতে পারে? সহিষ্ণু মমতাময়ী—ঘটক হারু খুড়োর বীণা!

অনুবাদ-সাহিত্যে যুগান্তর আনবার কল্পনায় বিভোর লতিকা—সেও কি ঘুমোতে পারে? নারী-প্রগতির জীবন্ত প্রতীক লতিকা!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিংহ

অঙ্গনে

বন্ধু আমার গৃহ-অঙ্গনে দাঁড়ালো হাসিয়া যবে,
হেরিনু তখন প্রভাত অরুণ স্বর্ণ ঢালিছে নভে।
হেরিনু তখন কুসুম-মুকুল
বনের বক্ষ করিছে আকুল,
হেরিনু তরুণ এ হৃদ্-কুঞ্জে গোলাপ মাধুরী-ভরা।
হেরিনু নবীন ভুবনে ভুবনে রসের প্রবাহ ঝরা!

বন্ধু যখন নয়নের এক পরম চাহনি দিয়া
জিনিল হৃদয় করিল অভয় আমার সকল হিয়া,—
চিত্তসীমায় লভিনু তখন
প্রেমের ফাগুনে পুলকিত ক্ষণ;
নয়নে তখন নামিল আমার নব আলোকের ধারা,
বন্দী জীবনে ঘুচিল আমার সকল অন্ধ-কারা!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল

রাজা-বাদ্‌শাহদের ম্যাজিক-প্রীতি

ম্যাজিককে অনেকে বলেন, "King of hobbies, and hobby of Kings" অর্থাৎ ইন্দ্রজাল-বিদ্যা "সব সখের রাজা এবং রাজা-রাজড়ার যোগ্য সখ।" কথাটা খুবই সত্য! যাদুকরদের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া-কলাপ সময়-বিশেষে উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর মনে হয়। সেই জন্যই যুগে যুগে পৃথিবীর সকল দেশে যাদুকররা রাজা-বাদ্‌শাহদের প্রসাদ লাভ করিয়াছেন।

যাদুবিদ্যার প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিব, পৌরাণিক যুগে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় যাদুবিদ্যা প্রদর্শিত হইত—তাহা হইতেই না কি এ-খেলার নাম হইয়াছে 'ইন্দ্রজাল'! অনেকে বলেন, ভোজরাজের নাম হইতে নাম হইয়াছে ভোজবাজী বা ভোজ-বিদ্যা। রাজা ভোজ ছিলেন মালবের অধীশ্বর। তাঁহার রাজধানী ছিল সুপ্রসিদ্ধ ধারা নগরী। প্রমারবংশীয় রাজাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রখ্যাত-নামা। রাজা ভোজ যাদুবিদ্যা-প্রমুখ নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনিই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন উদ্ধার করেন এবং পরে ১০৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

যাদু ও সম্মোহন-বিদ্যার ব্যাপারে আবিষ্কর্ত্তার নাম হইতে এ বিদ্যার নামকরণ বিচিত্র নয়। 'মেসমেরিজ্‌ম্' এই বিদ্যারই আর একটি বিভাগ। 'এ্যানিমাল-ম্যাগ্নেটিজম্' বা জৈব আকর্ষণ-বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা ভিয়েনা নগরীর ডাক্তার মেসমার। তাঁহার নাম হইতে এই বিদ্যা 'মেসমার-ইজম্' অর্থাৎ মেসমেরিজম্-এ পরিণত হইয়াছে। তেমনি [illegible] বিদ্যা ভোজবিদ্যা বা ভোজবাজী হওয়া বিচিত্র নয়।

এই ভোজরাজের কন্যার নাম ছিল ভানুমতী। রাণী [illegible] সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের মহিষী এবং পিতার ন্যায় অশেষ বিদ্যার অধিকারিণী ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, যাদুবিদ্যায় তিনি তাঁহার পিতার চেয়েও অধিকতর পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই যাদুবিদ্যা ভানুমতীর খেলা বা ভানুমতীর খেল নামে সুপরিচিত। রাজা বিক্রমাদিত্য নিজেও এ বিদ্যার বিশেষ সমাদর করিতেন। কালিদাস-রচিত অমর গ্রন্থ 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা'য় রাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে প্রদর্শিত এক অত্যদ্ভুত যাদুবিদ্যার উল্লেখ আছে। ইহা অনেকাংশে অধুনা-প্রসিদ্ধ 'ভারতীয় দড়ির খেলার' অনুরূপ বলিয়া নিম্নে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার বর্ণিত যাদুক্রিয়ার অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ (বসুমতী সংস্করণ) দেওয়া হইল।

সোদপুর রাজ-দরবারে দেশীয় নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন

"একদা রাজা বিক্রমাদিত্য সামন্ত-রাজকুমারগণ-কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে এক ঐন্দ্রজালিক উপস্থিত হইয়া কহিল, 'দেব, আপনি সকল কলাবিদ্যায় পারদর্শী, অনেক বড় বড় ঐন্দ্রজালিক আসিয়া আপনার নিকট নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন; অত্র প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্রজাল বিদ্যায় আমার নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করুন।' রাজা কহিলেন, 'এখন আমাদিগের অবসর নাই; স্নানাহারের সময় উপস্থিত, প্রভাতে দেখিব।' অনন্তর (পরদিন) প্রভাতে মহাকায়, দীর্ঘশ্মশ্রু, দেদীপ্যমান দেহ এক পুরুষ বিশাল স্কন্ধদেশে একখানি সমুজ্জ্বল খড়্গ স্থাপন পূর্ব্বক একটি সুন্দরী নারী সমভিব্যাহারে (সভাতলে) উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রণাম করিল। সভাস্থিত

রাজপুরুষেরা এই ঘটনা-দর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নায়ক, তুমি কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছ ?' সেই পুরুষ কহিল, 'আমি দেবেন্দ্রের পরিচারক। কোন সময়ে প্রভু আমাকে অভিসম্পাত করাতে আমি ধরাতলে অবস্থান করিতেছি। এইটি আমার পত্নী। সম্প্রতি দানবগণের সহিত দেবতাদিগের মহা সংগ্রাম বাধিয়াছে, সেই জন্য আমি তথায় যাইতেছি। এই বিক্রমাদিত্য রাজা পরস্ত্রীদিগের সহোদরস্বরূপ, এই বিবেচনায় ইঁহার নিকট পত্নীকে ন্যাসস্বরূপ রাখিয়া যুদ্ধযাত্রা করিব।' এই কথা শুনিয়া রাজা অতীব বিস্ময়-প্রাপ্ত হইলেন। সেই ব্যক্তিও রাজার নিকট আপনার স্ত্রীকে রাখিয়া রাজাকে নিবেদন পূর্ব্বক খড়্গে নির্ভর করিয়া গগনমার্গে উত্থিত হইল। যেমন সে শূন্যমার্গে উঠিয়াছে, অমনি নভোমার্গে 'মার্ মার্, ধর্ ধর্' এই প্রকার ভীষণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সভাস্থ সকলে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কৌতুকের সহিত দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণমাত্র পরেই নভোমণ্ডল হইতে রাজসভাতলে রুধিরাপ্লুত একটি বাহু নিপতিত হইল; সেই বাহুতে খড়্গ সংযুক্ত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সকলেই কহিল, 'হায়, এই রমণীর বীরপতি সংগ্রামে প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারই একটি বাহু ও খড়্গ পতিত হইল।' সভাস্থ সকলে এই কথা বলিতেছে, অমনি সেই বীরের ছিন্ন মস্তক ও কিয়ৎক্ষণ পরেই কবন্ধদেহ নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে সেই বীরের রমণী কহিল, 'দেব, আমার পতি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। তাঁহার মস্তক, বাহু, কবন্ধ ও খড়্গ নিপতিত হইয়াছে; অতএব দিব্যবালারা আমার প্রিয় পতিকে বরণ করিবে। আমার এই দেহ পতির জন্যই বিদ্যমান, আমার পতি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং কাহার জন্য আর আমি এই দেহ ধারণ করিব?'—এই বলিয়া সেই রমণী অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইবার জন্য রাজার পাদমূলে পতিত হইল। রাজা তখন চন্দন-কাষ্ঠাদি দ্বারা চিতাসজ্জা করাইয়া রমণীকে সহমরণে যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। সেই সতী নারীও রাজার আদেশ পাইয়া পতির শবদেহের সহিত অগ্নিগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

"অনন্তর সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা সন্ধ্যাবন্দনাদি-সমাপনান্তে সিংহাসনে উপবেশন করিলে সামন্ত ও মন্ত্রিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে সেই বিশালকায় নায়ক পূর্ব্ববৎ অসি-হস্তে দেদীপ্যমান কলেবরে উপস্থিত হইয়া রাজার গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংগ্রাম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া সমগ্র সভা বিস্ময়ে স্তম্ভিত! নায়ক পুনরায় কহিল, 'রাজন্! আমি এই স্থান হইতে সুরপুরে উপস্থিত হইলে দানবদিগের সহিত ইন্দ্রের ভীষণ যুদ্ধ বাধে। অনেক রাক্ষস তাহাতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অনেকে পলায়ন করে। সংগ্রাম শেষ হইলে দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া আমাকে বলিলেন, 'নায়ক, অদ্য হইতে তুমি আর ধরাতলে গমন করিও না। তুমি অভিশাপ-মুক্ত হইলে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম। এই বলয় গ্রহণ কর।' এই বলিয়া আপনার হস্ত হইতে রত্নখচিত মুক্তাবলয় খুলিয়া আমাকে প্রদান করিলেন। আমি পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলাম—'প্রভো, আমার পত্নীকে রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট ন্যাসস্বরূপ রাখিয়া আসিয়াছি। তাহাকে লইয়া ত্বরায় আসিতেছি।' দেবরাজকে এই বলিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম। আপনি আমার পত্নীকে প্রত্যর্পণ করুন, তাহাকে লইয়া পুনরায় সুরপুরে যাইব।'

"এই কথা শ্রবণ মাত্র রাজা ও সভাস্থ সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। রাজার সমীপবর্ত্তী লোকেরা কহিল, 'তোমার পত্নী অগ্নি-প্রবেশ করিয়াছে।' নায়ক বলিল, 'কেন?' সভাস্থ সকলে নিরুত্তর হইয়া রহিল। তখন নায়ক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'হে রাজশিরোমণে! হে পরদারাসহোদর! হে লোককল্পমহাদ্রুম, আপনি ব্রহ্মার ন্যায় আয়ুষ্মান্ হউন! আমি জনৈক যাদুকর, আপনার সম্মুখে যাদুবিদ্যার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলাম।' এই কথা শুনিয়া রাজা প্রথমে বিস্ময়াপন্ন ও পরে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তৎপর অষ্টকোটি স্বর্ণ, ত্রিনবতিকোটি মুক্তাভার, মদগন্ধলুব্ধ মধুকরবেষ্টিত পঞ্চাশটি হস্তী, তিন শত ঘোটক ও চারি শত পণ্যনারী ইত্যাদি যাহা তিনি সে দিন পাণ্ড্যরাজ্যের করস্বরূপ পাইয়াছিলেন, সমস্তই পুরস্কার-স্বরূপ সেই ঐন্দ্রজালিককে দিলেন।"

মোগল আমলে কয়েক জন বাঙ্গালী যাদুকর নানা যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া সমগ্র দেশে হুলস্থুল বাধাইয়া তুলিয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় লিখিত আত্মজীবনী 'জাহাঙ্গীর-নামা' বা Tarkish-i-Jahangirnama-Salimi (or Dwazda-saha-Jahangiri) গ্রন্থে বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই বাঙ্গালী যাদুকরদের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

"আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বাংলা দেশে ক'জন যাদুকর ম্যাজিক ও ভোজবাজীতে এমন নিপুণ ছিল যে, তাহাদের কাহিনী আমার এই আত্মজীবনীতে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি।" তিনি লিখিয়াছেন—"এক সময়ে আমার দরবারে সাত জন বাঙ্গালী যাদুকরের আবির্ভাব হয়। তাহারা তাহাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিল। আমাকে তাহারা সগর্ব্বে বলে যে, তাহারা এমন খেলা দেখাইতে পারে, যে খেলা দেখিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরও তাক্ লাগিবে। বস্তুতঃ, তাহারা বাজী দেখাইতে আরম্ভ করিয়া এমনই সব অত্যদ্ভুত খেলা দেখাইল যে, স্বচক্ষে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। কৌশলগুলি এমনই আশ্চয্যজনক ছিল যে, আমরা যে যুগে বাস করিতেছি, সে যুগে এমন বিস্ময়কর ঘটনা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য।"

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখি, খৃষ্ট-জন্মের ৩৭৬৬ বৎসর পূর্ব্বে Tchatcha-em-ankh নামক যাদুকর মিশরের রাজা খুফু (King Khufu)র সম্মুখে নানাবিধ অত্যদ্ভুত যাদুক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মিশরের ধর্ম্মযাজকগণ যাদুবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া নানা ভাবে তৎকালীন রাজাদের বিমোহিত করিতেন। অতি প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক শত দেড় শত বৎসর পূর্ব্বেকার এমন বহু যাদুকরের বিবরণ পাওয়া যায়—যাহারা অত্যদ্ভুত বহু যাদু-কৌশল দেখাইয়া তৎকালীন রাজাদের সখ্য সহানুভূতি ও উপঢৌকন লাভ করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজারা স্বয়ং যাদুকরের সহকারিরূপে কাজ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ স্পেনের রাজা আলফন্সো (King Alphonso XII)র কথা বলা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার প্রাসাদে আলেক-জান্দার হারম্যান নামক এক জন যাদুকরের তাসের ও অঙ্কের খেলা দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হন এবং উক্ত যাদুকরের সহকারিরূপে খেলায়

সাহায্য-করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। তার পরে বস্তুতঃ কতকগুলি খেলায় রাজা স্বয়ং সহকারীর কাজ করিয়াছিলেন। আমেরিকার 'নর্থ আমেরিকান রিভিউ' পত্রিকায় ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

যাদুবিদ্যার ইতিহাসে 'পিনেটি' (Pinnetti) খ্যাতনামা সুপ্রসিদ্ধ। তিনি বহু বার রাজার সম্মুখে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। রুশ সম্রাট্ পিনেটির যাদুক্রীড়ায় খুসী হইয়া তাঁহাকে বিশেষ পদক (Medallion), আংটি এবং মণিমুক্তা উপহার দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, পিনেটি আশা করিয়াছিলেন, রুশ-সম্রাট্ তাঁহার পুত্র-কন্যাদের খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষাভিষেক-স্থলে উপস্থিত থাকায় তাঁহাদের ধর্ম্মপিতা (God-father) হন এবং সম্রাট্ তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ যাদুকরকে রুশ-সম্রাট্ কতখানি ভালবাসিতেন, ইহাতে তাহার প্রমাণ মিলে।

যাদুবিদ্যায় লোকের মনোরঞ্জন করা খুবই সহজ। সেই জন্যই যাদুকররা সহজেই রাজা-বাদ্‌শাহের প্রসাদ ও প্রীতি লাভ করেন। "The old and the new Magic" গ্রন্থে ৩০০ পৃষ্ঠায় যাদুকর-প্রীতির এক বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ আছে। বিখ্যাত যাদুকর 'কার্ল হার্জ' (Carl Hertz) স্বদেশে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করাইয়া খুবই সুনাম অর্জ্জন করেন। মালয়ের সুলতান ও রাজকুমারী-প্রমুখ সকলেই যাদুকরের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হন। রাজকন্যা উক্ত যাদুকরকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেন। যাদুকর তাহাতে জানান যে, তিনি বিবাহিত এবং তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান, কাজেই তাঁহার পক্ষে এ বিবাহ অসম্ভব। একথায় উক্ত রাজকুমারী জানান যে, পূর্ব্ব-স্ত্রী বা স্ত্রীগণ বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহার এ বিবাহে আপত্তি নাই। যাদুকর শেষে বহু কৌশলে ও বৃটিশ ভাইস-কনসালের সাহায্যে সেখান হইতে চলিয়া আসেন। এ ক্ষেত্রেও উক্ত রাজা ও রাজকন্যা অপূর্ব্ব যাদুবিদ্যা-দর্শনেই যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহারই প্রমাণ পাই। সেণ্ট পিটার্সবার্গের রাজপ্রাসাদে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দি গ্রেট জনৈক যাদুকরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহার সঙ্গে দাবা খেলিয়াছিলেন। যাদুকরের খেলায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেন। বেলজিয়ামের সম্রাজ্ঞী হেনরীয়েটা যাদুবিদ্যার খুব আদর করিতেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ যাদুকর কার্ল হারম্যানের নিকট তিনি যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যাদুকর কার্ল হারম্যান বেলজিয়ামে যাইলে সম্রাজ্ঞী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান এবং জানান যে, তিনি যাদুবিদ্যা শিখিতে চান। পরে উক্ত যাদুকর ব্রসেলস্ সহরে রাজপ্রাসাদে ষ্টেট-গেষ্টরূপে ছয় মাস বাস করিয়াছিলেন এবং রাণী প্রত্যহ তাঁর কাছে চার ঘণ্টা করিয়া যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। আমেরিকায় যাদুকর-সম্মিলনীর মুখপত্রে প্রকাশ যে, রাণী যাদুবিদ্যায় আশ্চর্য্য দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রাসাদে স্বতন্ত্র ষ্টেজ তৈয়ারী করিয়া তিনি সে ষ্টেজে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতেন। এইরূপ আরও অসংখ্য যাদুকরের কাছে রাজপুরুষগণ যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন।

অনেকে হয়তো শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ অষ্টম এডোয়ার্ড ছিলেন চতুর যাদুকর। তিনি যখন প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্, তখন হইতেই এই বিশিষ্ট বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হন। ইংলণ্ডের যাদুকর-সম্মিলনীর সহকারী সভাপতি তাঁহার একটি পুস্তকে এই সম্রাট্ যাদুকরের অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইংলণ্ডের কোন এক বিশিষ্ট যাদুকরের নিকট হইতে হাতে-কলমে এ বিদ্যা শিক্ষা করেন। বহু নূতন খেলার কৌশল আয়ত্ত করেন এবং নিয়মিত অভ্যাসে দর্শকদের সম্মুখে সে সব খেলা দেখাইয়া তিনি আনন্দ পাইতেন। উক্ত সহকারী সভাপতি আরও লিখিয়াছেন, ডিউক অব উইণ্ডসর খুব অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলেন। একই খেলা বারংবার অভ্যাস করিতে তিনি কখনও বিরক্তি বোধ করেন না। তাঁহার মনের ক্ষিপ্রতা এবং ততোধিক ক্ষিপ্র হস্তচালনায় তিনি যাদুবিদ্যায় উত্তরোত্তর উন্নতি দেখাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার গুরু ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরও তাহাতে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। প্রিন্স অফ্ ওয়েলস সর্ব্বপ্রথম খেলা শিখেন—একটি সিল্কের রুমালকে মুহূর্ত্তে ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন-জ্যাকে পরিণত করা। পরে তিনি আরও বহু কঠিন খেলা আয়ত্ত করেন। এ সময়ে তিনি হস্ত-কৌশল-জাত তাসের খেলাগুলি বিশেষ পছন্দ করিতেন এবং অদম্য উৎসাহে যাদুবিদ্যা-সংক্রান্ত পুস্তকের একটি লাইব্রেরীও গড়িয়া তোলেন।

প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ যখন পঞ্চাশটি খেলার কৌশল ভালো করিয়া আয়ত্ত করেন, তখন আরও নূতন খেলা শিখিবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠেন। তাঁহার পিতা সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ যাদুক্রীড়া খুবই পছন্দ করিতেন এবং পুত্রের হাতে বিচিত্র মায়া-কৌশল দেখিয়া তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'মে-ফেয়ারে'র এক প্রাইভেট পার্টিতে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ নিমন্ত্রিত হন। সন্ধ্যাবেলায় আত্মীয়বর্গের মধ্যে এক জন ভদ্রলোক কয়েকটি ছোট ছোট খেলা দেখান। তার পর সভায় সকলে প্রিন্স অফ ওয়েলসকে ধরিয়া বসেন কয়েকটি খেলা দেখাইতে। তাঁহারা জানিতেন না যে, প্রিন্স তৎকালে যাদুবিদ্যা বিষয়ে বহু আলোচনা করিতেছেন। সেই রাত্রে তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া একটির পর একটি বহু খেলা এরূপ দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত দেখাইলেন যে, দর্শকমণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে তাঁহার জয়ধ্বনি করেন। এখনও ব্যবসায়ী যাদুকরদের রঙ্গমঞ্চে ডিউক অফ উইণ্ডসর ম্যাজিক দেখিতে ভালোবাসেন। ম্যাজিকের নাম শুনিলে তিনি সেখানে উপস্থিত হন।

একটি ম্যাজিক-বুলেটিনে প্রকাশ যে,—"ডিউক অফ উইণ্ডসর এক জন প্রতিভাবান্ যাদুকর। একটা সিগারেট হাতের মধ্যে এমন কৌশলে তিনি লুকাইয়া ফেলিতে পারেন ও অনুরূপ এমন কয়েকটি ক্রিয়া সাধন করিতে পারেন—যাহা প্রথম শ্রেণীর বহু যাদুকরের পক্ষে বিশেষ দুঃসাধ্য। ডিউক অফ উইণ্ডসর যাদুবিদ্যাকে মনে-প্রাণে ভালবাসেন।"

আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব আমীর আমানুল্লাহও এক জন চতুর যাদুকর। একবার বিলাতের এক প্রসিদ্ধ যাদুকরকে তিনি যাদুবিদ্যায় হারাইয়া দিয়াছিলেন। ইংলণ্ড-ভ্রমণ-কালে লিভারপুলে সম্রাট্ আমানুল্লাহকে এক পার্টি দেওয়া হয়। সেখানে বিলাতের এক প্রসিদ্ধ যাদুকর তাঁহাকে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করান। একটি খেলার বিষয় ছিল, সম্রাট্ আমানুল্লাহ্ একটি তাস টানিয়া লইয়া দেখিয়া পুনরায় ম্যাজিসিয়ানের হাতের তাসে সেটি ভরিয়া দিবেন

এবং পরে ম্যাজিসিয়ান্ তাঁহার নিজের পকেট হইতে সেই তাস বাহির করিয়া দিবে। সবই ঠিক-মত হইল। বাদশাহ্, একটি তাস টানিয়া লইয়া দেখিয়া পুনরায় ফিরাইয়া দিলেন। ম্যাজিসিয়ানও মায়ামন্ত্র প্রভাবে তাঁহার নিজের পকেট হইতে তাসটি টানিয়া বাহির করিয়া দিলেন। দর্শকদের হর্ষোৎফুল্ল করতালি পড়িল। কিন্তু অকস্মাৎ বজ্রাঘাত! আমানুল্লাহ্ বলিলেন, ঐটি তাঁহার তাস নহে—কারণ তাঁহার তাসটি তিনি হস্তকৌশল (Palming) সাহায্যে প্যাকেটে ফিরাইয়া না দিয়া নিজের পকেটে রাখিয়াছিলেন। এই কথা বলিয়া তিনি আসল তাস বাহির করিয়া দিলেন। সম্রাট্ হস্তকৌশলে কত দক্ষ, ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়।

ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড যাদুবিদ্যা খুবই ভালোবাসিতেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যাদুকর হবেস গোল্ডিন লণ্ডনে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করাইয়া তখন খুব সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড তখন সবেমাত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তখনই চৌদ্দ দিনের মধ্যে পাঁচ দিন হবেস গোল্ডিনের যাদুবিদ্যাভিনয় দেখেন। এক দিন রাত্রে খেলা-শেষে তিনি সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের সঙ্গে ষ্টেজের গ্রীণরুমের দ্বারে গিয়া গোল্ডিনের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে গিয়া গোল্ডিনকে তাঁহার বাকিংহাম প্যালেসে আসিয়া বিশেষ ভাবে খেলা দেখাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তদনুযায়ী বাকিংহাম প্যালেসে এক বিশেষ ষ্টেজ তৈয়ারী করা হয়। এবং হবেস গোল্ডিন সেখানে সদলবলে আসিয়া যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন।

ইংলণ্ডের যাদুকর-সম্মিলনীর সহকারী সভাপতির পুস্তক-পাঠে আরও জানা যায় যে, প্রিন্স জর্জ্জ ও (সম্ভবতঃ আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ) এক জন প্রতিভাবান্ যাদুকর। তিনি যাদুবিদ্যার অনেক কৌশল অবগত আছেন; তবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অফ উইণ্ডসরের ন্যায় তিনি অতখানি শক্তিশালী ও কুশলী নন।

আমি নিজে যাদু-খেলা দেখাই। সুতরাং যাদুকরদের উপর রাজা-বাদশাহদের এতখানি সম্প্রীতির কথায় কতখানি গৌরব বোধ করি, ভাষায় তাহা বুঝাইতে পারিব না।

সম্প্রতি যোধপুর রাজ-দরবারে ২০।২৫ জন দেশীয় রাজন্যের সম্মুখে ক্রীড়া-প্রদর্শনের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। খেলার জন্য বিশেষ ভাবে সেখানে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করানো হয়; এবং প্যালেসের এঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের জনৈক বিশিষ্ট এঞ্জিনীয়ারের তত্ত্বাবধানে বহু বিশিষ্ট যন্ত্রপাতিও তৈয়ারী হয়। রাও রাজা নরপতি সিং আমাকে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নিজস্ব কতকগুলি যন্ত্রপাতি দিয়া তিনি এ খেলায় সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজা নরপতি সিং এবং বড় মহারাজকুমার দু'জনেই যাদুবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ। যোধপুরে 'ষ্টেট-গেষ্ট'রূপে সপ্তাহাধিক কাল আমি ছিলাম। রাজন্যবর্গের এতখানি সমাদর যে বিদ্যার জন্য আমি লাভ করিয়াছি, সে-বিদ্যার সামান্য প্রচার ও প্রসার যদি আমার দ্বারা সম্ভব হয়, তবেই আমার সব অধ্যবসায়, সব সাধনা সার্থক হইবে। *

পি, সি, সরকার (যাদুকর)

---

* যাদুকর সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ম্যাজিক দেখাইয়া বহু সম্মান ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি সুশিক্ষিত এবং দেশের উপর তাঁহার অনুরাগের কথা আমাদের অবিদিত নয়। এ বিদ্যা শিখাইবার জন্য তিনি যদি এই বাঙ্‌লা দেশে একটি শিক্ষালয় স্থাপন করেন, তাহা হইলে বহু তরুণ-তরুণী তাঁহার কাছে এ বিদ্যা শিখিয়া শুধু অন্নসমস্যা সমাধানে সমর্থ হইবে না, সরকারের সাধনা তাহাতে সফল হইবে এবং দেশের গৌরব বাড়িবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।—মাঃ-বঃ-সম্পাদক

কিশোর-কিশোরী

আমরা কিশোর, আমরা কিশোরী,
মর্ত্তেতে রই স্বরগ বিসরি!
শোভার তুলি ধরায় বুলাবো,
তমাল-শাখে ঝুলন ঝুলাবো।
পরবো কুসুম আমরা অলকে,
শুক্তি দেবে মুক্তা নোলকে।
যমুনা-জলেতে ভরবো গাগরী
যুগের যুগের নাগর-নাগরী।
আমরা নাচি ময়ুর-ময়ূরী।
রূপের মালিক, বুকের জহুরী।
লাবণ্যময় দেহ ও অন্তর,
যা করি তাহাই লাগে সুন্দর।
আমরা গরল, আমরা যে মধু,
আমরা যুগল হ'তে চাই বহু।
দেবদেবতী আমরা রতিস্মর,
আমরা অমর—আমরা বধূ-বর।

যৌতুক বল্ মোদের কি দিবি?
রচবো মোরা নূতন পৃথিবী।
রঙিন বাসর করবো ধরাকে
কদম-রেণু, পিয়াল-পরাগে।
সোণার তরী আমরা সাজাবো,
নূপুর এবং কাঁকণ বাজাবো।
আমরা সুভগ, আমরা সুমতী
আমরা যুবক আমরা যুবতী।
ক্ষণে মানুষ ক্ষণেই হই অমর,
মধুকরী আমরা মধুকর।
ক্ষুধা প্রচুর সুধার সন্ধানী,
আমরা ইন্দ্র, আমরা ইন্দ্রানী।
আমরা চপল, চটুল, গরবী
টগর গোলাপ, কমল করবী।
আমরা ভালে ধরি জয়টীকা
প্রজাপতি ষোড়শ-মাতৃকা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিজয়া

(গল্প)

সহরের বড় বড় ডাক্তাররা এইমাত্র বিদায় নিয়া গেলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সুমিতা সোমনাথের কাছে আসিয়া বসিল। সোমনাথ সুমিতার দিকে ছল-ছল নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "এবার আমি জগতের সব আনন্দের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কঠিন দুঃখ কি—মানুষের মুখেই শুনেছি, ভগবান্ আমাকে এবার হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়ে সে-দুঃখকে চিরসাথী করে দিলেন।" বলিয়া সোমনাথ নিশ্বাস ফেলিল।

সুমিতা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "এমন অধীর হচ্ছো কেন? ডাক্তাররা তো বললে, এ রোগ যে কখনো সারে না এমন নয়, ভগবান্ সারালে সারতে পারে। তবে?"

সোমনাথ হতাশ কণ্ঠে বলিল, "ভগবান্ সারাবেন! তিনি যদি সারাবেন, তাহলে এ রোগ দিলেন কেন? আমি আর লোক-সমাজে মুখ দেখাতে পারবো না, সু! লোকে আমায় ঘৃণা করবে। শত্রুকে লোকে গাল দেয়—তোর কুষ্ঠ হোক্! সেই রোগ আমার হলো! আচ্ছা মিতা, বলতে পারো, এ রোগ আমার হলো কেন? এমন কোনো অপরাধ আমি করিনি, যার জন্য এমন তপ্ত অভিসম্পাত কুড়ুবো! এর চেয়ে ভগবান্ আমাকে মৃত্যু দিলেন না কেন? কিম্বা এমন রোগ, যাতে সহজেই মানুষের মৃত্যু হয়!"

সুমিতা সস্নেহে স্বামীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, "পাগল! কি সব বলছো অলুক্ষণে কথা! মানুষের কত রোগ হয়। কত সারে। তোমারও এ রোগ নিশ্চয় সারবে।"

সুমিতার মুখখানিকে নিজের দুই অক্ষম হাত দিয়া আলগা ভাবে ধরিয়া সোমনাথ সুমিতার দিকে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কান্নায় সুমিতার দু'চোখ জল-ভরে টলটল করিয়া উঠিল। সোমনাথ কাতর কণ্ঠে বলিল, "সকলের মত তুমিও আমায় ঘৃণা করবে? ছোঁবে না? কাছে আসবে না?"

সুমিতা কোন কথা না বলিয়া দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ জড়াইয়া তাহার বুকে নিজের মাথা গুঁজিয়া রাখিল। ঘরে নীল আলো। বাহিরে বর্ষার মেঘে-ঘেরা ম্লান জ্যোৎস্না—নিস্তব্ধ রজনী—ঝিল্লীর একটানা একঘেয়ে সুর—সবই যেন কি অব্যক্ত ব্যথায় গুমরাইয়া কাঁদিতেছে!

সংসারের কাজ-কর্ম্ম আজ-কাল সুমিতা একেবারে প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছে। সুস্থ অবস্থায় সোমনাথ ভালোই রোজগার করিত। এখন সে চির-অক্ষম হইয়া রহিল। সে দিন সোমনাথকে সুমিতা স্নান করাইয়া তার গা মুছাইয়া গায়ে পাউডার মাখাইতেছিল, সোমনাথ যেন তার কাছে অসহায় শিশু! কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সুমিতার দিকে চাহিয়া সোমনাথ বলিল, "তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই সুমিতা। আমার এই দুঃসময়ে তুমি যেন আমায় দূরে ফেলে রেখো না।"

সুমিতা তার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটুকু সোমনাথের প্রাণে ঢালিয়া দিয়া বলিল, "তোমার জন্যই আমার এ-বাড়ীতে আসা। তোমাকে যদি দূরে রাখবো, তবে এ-বাড়ীতে বাস করবো কার জন্যে? তুমি যখন সংসারের এক জন ছিলে, তখন আমিও এ-সংসারের এক জন ছিলাম। ভগবান্ এখন তোমাকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন, আমিও সংসারের কেউ নই!"

সোমনাথকে খাওয়াইয়া মুখ-হাত-পা সযত্নে ধোয়াইয়া বিছানায় বসাইয়া হাত-পা তোয়ালে দিয়া পরিষ্কার করিয়া মুছাইতে লাগিল। সোমনাথ করুণ কণ্ঠে বলিল, "লক্ষ্মী মিতু, শীগ্‌গির করে তুমি চারটি মুখে দিয়ে এসো! তুমি যতক্ষণ কাব্য পড়ো, ততক্ষণ আমি আমার রোগের কথা ভুলে যাই। এসো কিন্তু!"

সুমিতা ঘরের দরজা টানিয়া বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল, "নিশ্চয় আসবো।"

বাহিরে আসিয়া দেখিল, মেজ জা কুন্তলা তার ছেলেকে ধরিয়া খুব ঠ্যাঙাইতেছে। সুমিতা ছেলেটিকে কাছে টানিয়া কুন্তলাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "কি তুই কুন্তলা!"

কুন্তলা ছেলে ছাড়িয়া মুখ ভারী করিয়া দাঁড়াইল। দেবর লোকনাথ গম্ভীর মুখে বলিল, "কুন্তলার আর দোষ কি? একা মানুষ, ক'দিক্ দেখবে বলো দিকি? এত বড় সংসারের সব ভার কুন্তলার ঘাড়ে! একটা মানুষকে যেন বাড়ীশুদ্ধ লোক কুকুর-ছেঁড়া করে টানছে!"

সুমিতা অন্যমনস্ক ভাবে রান্নাঘরে গিয়া বলিল, "বামুন-দিদি, চট্ করে দু'টো ভাত দাও না!"

মুখ ভার করিয়া ভাত বাড়িতে বাড়িতে বামুন-দিদি বলিলেন, "দিচ্ছি,—তা মেজবৌকে ফেলে খেতে বসবে?"

সুমিতা এ পর্য্যন্ত কুন্তলাকে ছাড়া কখনো খায় নাই। আজ দু'দিন ধরিয়া এ নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে। বামুন-দিদি বলিল, "একটু বসে বসে খাও বৌদি, ভাঁড়ার বন্ধ। চাবি নিয়ে আসি। দই বার করতে হবে।"

সুমিতা শুনিল, বামুন-দিদি গৃহিণীর কাছে বলিতেছে, "সুমিতা বৌদির দই বার করতে হবে।"

গৃহিণী বিরক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "এই সাত-সকালে বুঝি বড়-বৌমা খেতে বসলো!" ননদ রতনমণি টিপ্পনি কাটিল, "তাঁর অফিস আছে না কি? বড়-বৌদির সবই অলুক্ষণে কাণ্ড! সারা দিন ঘরে দোর দিয়ে বসে থাকবে, আর খাওয়ার সময় সাত-তাড়াতাড়ি সকলের আগে খেতে বসবে।"

লোকনাথের গলা শুনা গেল, "দেখ মা, কুন্তলার হার্টের অসুখটা ভয়ানক বেড়েছে—তার বিশ্রাম দরকার! তোমার সংসারের জন্যে তো তাকে মেরে ফেলতে পারিনে। আর আমি যখন এখনও দু'টো পয়সা রোজগার করছি, তাকে আরামে রাখবার চেষ্টা, স্বামী হয়ে আমি যদি না করি, তাহলে আমার মত রোজগারী স্বামী পেয়ে ওর কি লাভ হলো?"

মা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "সে তো বটেই বাবা! কুন্তলা আমার পয়মন্ত বৌ!" সুমিতার কণ্ঠে যেন ভাত আট্‌কাইয়া গেল! সে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

আজ কাব্য পড়িতে পড়িতে সুমিতা কেবলই অন্যমনস্ক হইতেছিল। মাঝখানে পড়া বন্ধ করিয়া জানলা দিয়া উন্মুক্ত আকাশের দিকে উদাস ভাবে তাকাইয়া রহিল। বৃষ্টির ছাঁট

আসাতে সোমনাথ বলিল, "জানলাটা বন্ধ করে দাও।" সুমিতা জানলা বন্ধ করিয়া বলিল, "তিনটে বেজে গেছে। উঠি।" সোমনাথ অনুনয়ের সুরে বলিল, "বোসো না, সবে তো তিনটে।" "না, না, উঠি, জলখাবার তৈরী করতে হবে। তোমার খাবার নিয়ে আসি।"

সন্ধ্যাবেলা গৃহিণী রতনমণিকে দিয়া সুমিতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুমিতা আসিলে গৃহিণী শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন, "বোসো। লোকনাথকে ডাক্তার কি বলেছে, শোনো।"

সুমিতা একটু আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া ভীত নয়নে লোকনাথের দিকে চাহিল। লোকনাথ গলা ঝাড়িয়া লইয়া বলিল, "দেখ বৌদি, তুমি নেহাৎ বোকা নও, কুঁড়েও নও। ডাক্তার বলেছে, সংসারে দাদা একেবারেই জঞ্জাল হয়ে গেলেন,—তোমার পেটের সন্তানটিকেও সেই দিকে পাঠাবে। এই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কুষ্ঠ-রুগীর কাছে কিছুতেই যাওয়া উচিত নয়। যদি সন্তান চাও তো ও-ঘরে একেবারেই যাবে না।"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তুই তো বেশ, ও-ঘরে একেবারে না গেলে সোমের ভাত-জল দেওয়া, তাকে স্নান করানো—এ-সব কে করবে?"

লোকনাথ বলিল, "কেন, তুমি!"

মা জ্বলিয়া উঠিলেন। তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "আমার তো পূজো-আচ্ছা, সংসার-দেখা কিছু নেই, তাই! আমি যাবো ওই সব নোংরা ঘাঁটতে!" তার পর গৃহিণী চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "আমার যেমন কপাল! নইলে অমন ছেলে—তার কি না হলো কুষ্ঠো! তা আমার বরাতে যত দিন ছিল, তত দিন এ-সব কিছু ছিল না, পরের মেয়ে ঘরে এনে তার বরাতে বরাত মিলিয়ে এখন আমার কপালে এই দশা!" গৃহিণী কপাল চাপড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রতনমণি বলিল, "দাদার কাজগুলো বৌদি করবে বৈ কি! সে আবার কে করবে? তবে অকারণ ও-ঘরে যেয়ো না। আর—বলিয়া একটা ঢোক্ গিলিয়া বলিল, "রাত্রে মায়ের ঘরে এসে শুয়ো কিন্তু।"

লোকনাথ বলিল, "হ্যাঁ দেখো বৌদি, কিছু মনে করো না, ও-সব রোগ সারবার নয়, এদিকে আবার ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে। সাংঘাতিকও বটে। দাদাকে তো তাড়াতে পারিনে বাড়ী থেকে। তুমি বাড়ীর বড়-বৌ! এ সংসারের ভালো-মন্দ সব তোমায় চিন্তা করতে হবে। তবে এ-ও ঠিক কথা, তোমার মন অত্যন্ত খারাপ হবে। স্বামী! তোমার সারা জীবনের সঙ্গী। তার এই রকম হলো. তা মন ভালো করবার একমাত্র উপায়, সারাক্ষণ সংসারের কাজে-কম্মে ডুবে থাকা। আর আমাদের এত-বড় সংসারকে যদি ভালো করে না দেখো, তাহলে দু'দিনে সব নষ্ট হয়ে যাবে যে। জানি, কুন্তলা খুবই কাজের মেয়ে। আর বড়-ঘরের মেয়ে কি না, সে জন্যে ওর মনটাও খুব উঁচু। বুক দিয়ে সে সংসারের সকলের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করে, তাও আমি মানি। কিন্তু সে ছেলে-মানুষ, তার উপর হার্টের রুগী! তাকে পরিশ্রম করতে ডাক্তার একেবারে বারণ করেছে। কাজেই তার উপর এত-বড় সংসারের ভার দেওয়া ঠিক নয়! তোমার স্বাস্থ্য ভালো, এবং তোমার এ-অবস্থায় পরিশ্রম করাও দরকার। দেখো, আমাদের সংসার যত বড়, আয় তেমন বড় নয়! তার উপর দাদা আমাদের গলায় পড়লেন, কি করে যে আমি এত-বড় সংসারকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বো, এই হয়েছে সবচেয়ে দুশ্চিন্তা।" তার পর মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "জানো মা, রাত্রে আমার ঘুম হয় না দুশ্চিন্তায়।"

সমবেদনা-ভরা কণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন, "হবেই তো বাছা, সবই আমার কপাল! এখন তুমি বেঁচে থাকো, তবেই।"

"দুশ্চিন্তা হয় টাকার অভাবে! এই মাস থেকে ভাবচি রাঁধুনী, চাকর, ঝি—এ সব ছাড়াতে হবে। না হলে দুশ্চিন্তায় আমি বাঁচবো না, কুন্তলার শরীরও খুব খারাপ, তাকে তার বাপের বাড়ী পাঠাব। তা বৌদি তো চিরদিনই কাজের লোক, নিশ্চয়ই এ ক'টা কাজ করে উঠতে পারবেন, আমারও দুশ্চিন্তার কিছু লাঘব হবে। কি বলো বৌদি?"

সুমিতা কোন জবাব দিতে পারিল না! সে শুধু নীরবে সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। তার মনে হইল, এতগুলি ছোট-বড় সম্পর্কের লোকের সম্মুখে এ সব কথা না বলিলে তার পক্ষে ভালো হইত। তার স্বামীর এই কঠিন অসুখের সঙ্গে সঙ্গে যেন বাড়ীসুদ্ধ লোক সুমিতার লজ্জা-সম্মান সব ভুলিয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সোমনাথ মাঝে-মাঝে অভিমান করে, অনুযোগ করে, "সুমিতা, সারা-রাত তোমার জন্য প্রতীক্ষা করে কাটাই!" সুমিতার দু'-চোখ জলে টলমল করে। সুমিতা নতমুখে ঘরের কাজ করিতে করিতে বলে, "বড্ড খাটুনী বেড়েছে। ঠাকুরঝির আজ-কালই হবে. মেজ-বৌ বাপের বাড়ী গেছে, বড় খুড়িমার বাত, আমার শরীরটাও বিশেষ—"

সোমনাথ তাহার চোখের জল মুছিয়া, আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার শরীর কেমন আছে, সুমিতা? থাক্ থাক্, শরীর বুঝে তুমি চলো। নাই বা এলে!"

পূজা আসিয়াছে। সুমিতার এক-মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই। সোমনাথ দেখে, তার ঘরের কাজ-কম্ম কলের মত হইয়া যায় বটে, তবে সুমিতাকে সে বড় আর দেখিতে পায় না! সোমনাথ নিশ্বাস ফেলিয়া জানলার ধারে বসিয়া থাকে! তার দীর্ঘ অবসর, রাতে দিনে। বই পড়িতে পারে;—কিন্তু বই ধরিতে পারে না! লিখিতে পারে, অঙ্গুলিহীন-হস্তে লেখনী ধরা দেয় না। বাড়ীর কেহ তাহার ত্রি-সীমানায় আসে না। তার ঘরের পাশেই রায়েদের বাগান,—খানিকটা ঝোপ-জঙ্গল। অফুরন্ত সময় তার, রায়েদের নারিকেলকুঞ্জ, ঝাউগাছের দোলা দেখিয়া কাটে। মনে মনে ভাবে, আমাকে যেমন ভগবান্ দীর্ঘ অবসর দিয়াছেন, সুমিতাকে তেমনি দিয়াছেন অবসর-হীন কাজ। বেচারী সুমিতা!

বাহির-বাড়ীতে সানাই বাজিতেছে। আজ দুর্গা-ষষ্ঠী। বোধন বসিয়াছে। পূজামণ্ডপ হইতে চণ্ডীপাঠের গুরুগম্ভীর শব্দ কাণে আসিতেছে। ছোট বোন লীলাকে ডাকিয়া সোমনাথ চুপি-চুপি বলিল, "তোর বড়-বৌদি কোথা রে?" লীলা আলুগোছে চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া ব্যস্ত ভাবে বলিল, "পূজো-মণ্ডপে,—তার কত কাজ!" সোমনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে খেয়েছে কি না জানিস্?" মেয়েটি বলিল, "কে জানে বাপু অত খবর! বড়বৌদি এমন কি মানুষ যে তার খাওয়া-নাওয়ার খবর আমায় রাখতে হবে! আর কিছু বলবে কি? আমি দাঁড়াতে পারছিনে—"

ঝী বামার মা সেখান দিয়া যাইতেছিল, সে সোমনাথকে বলিল,

"কি ! বড়বৌদিকে ডাক্‌বো দাদা-বাবু ?" "না না, তাকে ডাক্‌তে হবে না। সে কিছু খেয়েছে কি না;—" বামার মা গালে হাত দিয়া বলিল, "ও মা ! তিনি খাবে কি গো ? আজ ষষ্ঠী ! পেটের পেটে একটা না এসেছে, খোঁড়া-নুলোর ছেলেই হোক্, আর যাই হোক্, তার মঙ্গল কামনা করা চাইতো। তার উপর পুরুতরা এখনও খায়নি ভোগ খেতে-টেতে, সেই রাত যার নাম বারোটা। তা ভালমন্দ কি খাবেনি। যা খায়, পূজোর নৈবিদ্যির পেসাদ।"

বাড়ীর কর্ত্তা সুমিতাকে বলিলেন, "দেখ বড়-বৌমা, পূজোর ক'টা দিন তুমি যেন সোমের নোংরা পরিষ্কার করতে যেয়ো না। কার কি অনাচারে বাড়ীতে এমন রোগ হলো, আবার ওই নোংরা ছুঁয়ে তুমি আসবে ঠাকুর-দেবতার কাজ করতে, শেষে আবার কি অমঙ্গল হবে ! ঘরের পাশেই বাথ-রুম—ও যেন এ ক'দিন জমা দিয়ে রাখা যায়। তোমার স্নান করার আগে তুমি শুধু ওর কাপড়গুলো কেচে দিয়ে এসো। স্নান করে আর ও-ঘরে যেয়ো না, দরজার বাইরে থেকে আলগোছে ভাতের থালা ঠেলে দিয়ো।" সোমের মা আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "আমার ছেলে আমার কাছে যত দিন ছিল, তত দিন ভালই ছিল। যে দিন থেকে তোমার হলো, সেই দিন থেকেই বাছার কপালে কি শনি যে লাগ্‌লো। এখন মা জগদম্বাই জানেন, আমার পোড়া অদৃষ্টে কি আছে।"

রাত্রি বারোটা-একটায় বাড়ীর সকল কাজ মিটাইয়া স্নান করিয়া সুমিতা ঠাকুর-দালানের লোহার গেটে চাবি দিয়া জবকারী কেটে ফল ছাড়ায়, জবা-বিল্বপত্রের মালা, শিউলি ফুলের মালা গাঁথে। দোতলার বারান্দায় টাঙ্গানো বড় ঘড়িটাতে ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা বাজে। সুমিতা তাড়াতাড়ি ওঠে পুষ্পপাত্র গুছাইবার জন্য। আর এক বার স্নান সারিয়া বসে পূজামণ্ডপে। মণ্ডপের কাজ সারিয়া যত শীঘ্র পারা যায়, ভোগ রাঁধিতে যাইতে হইবে। ভিজা চুলে পিঠের কাপড় ভিজিয়া যাইতেছে, খেয়াল নাই !

একটি ছোট ছেলে আসিয়া বলিল, "বড়দা বল্লেন,তোমার চুলগুলো ভাল করে মুছতে।" সুমিতার চকিতে মনে পড়ে, দোতলার সেই ছোট্ট ঘরটি। মুহূর্ত্তে সেই দিকে তাকায়। জানলার ধারে সোমনাথ বসিয়া, চারি দিকে তাকাইয়া আছে। বুক ফাটিয়া যেন আর্ত্তনাদ বাহির হইতে চায়। "মা গো !" বলিয়া সে শ্রীশ্রীমায়ের দিকে উদভ্রান্ত কাতর নয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে। পুনরায় মনের দ্বিগুণ জোরে কাজ লইয়া পড়ে।···

বিজয়া ! হিন্দুর পবিত্র মিলন-দিন। যাদের সঙ্গে বারো মাস মুখ-দেখা-দেখি হয় না, তারাও আসে এই দিনে বিচ্ছেদকে অবিচ্ছেদের সূত্রে বাঁধিতে। সন্ধ্যা হইতেই বাড়ীতে লোকসমাগমের শেষ নাই। মিষ্টি সাজাইতে সাজাইতে সুমিতা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় বামার মা আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি কেমন ইস্তিরি গো ? হলোই বা স্বামীর কুটোরোগ। তা'বলে অমন অচ্ছেদ্দা করে সোয়ামীকে খেতে দেবে ? আহা হা, দেখগে দেখি, গরম দুধের বাটিতে হাত দিয়ে হাত পুড়িয়েছে।"

সুমিতার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তাই তো ! সুমিতা তার আসল কাজে একেবারেই ফাঁকি দিতেছে ! হাতের কাজ ফেলিয়া ত্রস্তে সে ছুটিয়া চলিল সোমনাথের কাছে। রতনমণি, কুন্তলা মুখ টিপিয়া হাসিল। রতনমণি বলিল, "নাও মেজবৌদি, এখন এগুলো সারো, বড়বৌদি ছিষ্টি ছড়িয়ে-মড়িয়ে রেখে পালালো, এখন আজকের মত নিশ্চিন্তি। নাঃ, যেমন ভালবাসা বড়বৌদিকে বরণ করেছে বড়দার কাছে যেতে, বড়বৌদি তেমনি কোনো ছুতোয় যেতে পারলে হয়।" মেজ ননদ লীলা বলিল "তা যাই বলো, বড়বৌদি বড়দাকে ভালোবাসে !" কুন্তলা শ্লেষ করিয়া বলিল, "হাঁ, ভালো ত বাসেন ! কোন ছুতোয় উনি সংসারের কাজে ফাঁকি দিতে পারলে ছাড়েন না।"

সোমনাথকে খাওয়াইয়া সুমিতা সযত্নে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিতে সোমনাথ মিনতি করিয়া বলিল, "আজ রাতে আমায় ফাঁকি দিয়ো না সু,—আজ বিজয়া।" সুমিতা নতমুখে বলিল, "না, আজ ঠিক আস্‌বো।" "কে সু, আজকের দিনে তুমি একখানা ভালো কাপড় পরলে না, চুল বাঁধলে না। আলতা পরোনি ! এখনও আমি বেঁচে আছি যে। আমার কি তোমার লক্ষ্মী-মূর্ত্তি দেখতে সাধ হয় না মিতা ?"

সুমিতা অনেক কষ্টে নিজের বক্ষের উদ্বেলিত ব্যথার অশ্রু দমন করিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "সময় পাইনি। পরবো বৈ কি, নিশ্চয় পরবো।"

সুমিতা সত্যই আলমারি খুলিয়া ভালো কাপড় পরিল। সযত্নে পরিপাটি করিয়া খোঁপা বাঁধিল। আলতা, সিন্দুর পরিয়া প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া সোমনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "দেখ তো আমায় কেমন দেখাচ্ছে।" সোমনাথ আগ্রহভরে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। "আরও দু'টো আলো জ্বালো মিতা, তোমাকে চোখ ভরে দেখি।"

সুমিতা আরও দু'টি আলো জ্বালিল।

বাহির হইতে গৃহিণী কঠিন স্বরে ডাকিলেন, "বড়-বৌমা !"

ঘরের আলোগুলি নিবাইয়া দিয়া সুমিতা বলিল, "যাই মা।"

বাহিরে আসিয়া বুঝিল, বাড়ীর সমস্ত চোখ যেন তাহাকে গ্রাস করিতেছে ! সে নিঃশব্দে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। গৃহিণী বিরক্তিভরে বলিলেন, "ছি ! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি দিন্‌কের দিন যেন কেমন হচ্ছে। স্বামী যার অমন, তার আবার সাজ-পোষাক কি ? তোমার সাজ দেখে লোকে হাসে, কত কথা বলে,—যাও, ও সব খুলে এসো।"

একে একে বিজয়া-মিলন শেষ হইল। গভীর রাত্রে সকল কাজ সারিয়া সুমিতা সোমনাথের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে রতনমণি উচ্চ কণ্ঠে বলিল, "কত রাত করলে বড়বৌদি ? শীগগির এসো বাপু, মা ঘরের দরজা বন্ধ করবেন।" পাশের ঘরে লোকনাথ তিক্ত কণ্ঠে বলিল, "এই দুপুর রাতে আবার সাঁজ কোথায় যাওয়া হলো ! নাঃ, এ-বৌকে নিয়ে মায়ের বরাতে অনেক দুঃখ আছে।"

লক্ষ্মী-পূর্ণিমার নিশি। সুমিতা সারা দিন উপবাস করিয়া পূজার সকল কাজ করিয়াছে। উপবাস-ক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া এক জন নিমন্ত্রিতা গৃহিণীকে বলিলেন, "হ্যাঁ দিদি, তোমার বৌয়ের তো আট মাস চলছে, এখনও একে দিয়ে পূজো-আচ্চার কাজ করাও ?" গৃহিণী বিরস-মুখে জবাব দেন, "কে করবে বলো ? বড়-বৌমা ঝাড়া-হাত-পা লোক। আর যারা আছে, তাদের কারো হার্টের রোগ, কারো কোলে-কাঁখে ছেলে, তাদের দিয়ে তো পারিনে। আমি তো না থাকার মধ্যে। শরীর, মন—কিছুতেই আর কিছু নেই ; তা এটুকু কাজও যদি না কর্‌বে তো আমার বৌ হয়ে কেন এলো ?"

সুমিতার শরীর পূজার ক'দিন অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রমের দরুণ

মোটেই ভালো ছিল না, তদুপরি আজিকার এই পরিশ্রম তাকে যেন আরও দুর্ব্বল করিল। শেষ-রাত্রে সে শিশুর জননী হইল।

লোকনাথ দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "দেখলে মা! আমি যখন বারণ করি, তখন তোমরা বোঝো না। এখন দেখো, এই অকালে ছেলে হওয়া। যা হোক্, আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি, ওঁর আর যেন ছেলে-পুলে না হয়। এত ল্যাঠা কে ভুগবে!"

রাস-পূর্ণিমার দিন শিশুটিকে আর ধরিয়া রাখা গেল না। সকাল হইতে বাড়াবাড়ি। দু'দিন পূর্ব্বেই ডাক্তার শিশুর সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ করিয়া গিয়াছেন। সুমিতা এ ক'দিন শিশুটিকে বুকে করিয়া রাখিয়াছে। গৃহিণী আসিয়া প্রথমে শিশুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি, তোমার ভব-লীলা সাঙ্গ হলো না কি? তা মেয়ে-সন্তান যাওয়াই ভালো। তুমি কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি করছো বড়-বৌমা। ভারী তো এক মাসের মেয়ে, তার জন্যে আবার এত মায়া! দেখ দেখি আমাকে—ছেলের কঠিন রোগ, তবু আমি ধৈর্য্য ধরে সংসারে সব দেখাশুনা করছি। যাও, ওকে রেখে সংসারের কাজে মন দাও।···মেজ-বৌমা একা খেটে খুন হয়ে গেল। ধৈর্য্য ধরো। ধৈর্য্য ধরো।"

শিশুর মৃতদেহটিকে কাঁথায় জড়াইয়া অতি সন্তর্পণে বাড়ীর পাচক-ব্রাহ্মণের হাতে সুমিতা তুলিয়া দিল। প্রাঙ্গণে তখন রাস-পূর্ণিমার মুক্ত জ্যোৎস্না। সুমিতা সস্নেহে একবার শিশুর দিকে চাহিয়া ঊর্দ্ধ নয়নে নীলাকাশের দিকে কাহার সন্ধানে যেন নয়ন মেলিল! বুক ঠেলিয়া আকুল ক্রন্দন তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ইচ্ছা হইতে লাগিল, কোনো স্নেহময় বক্ষে মাথা রাখিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া আসে। গৃহিণী বলিলেন, "আর দাঁড়িয়ে থেকো না বড়-বৌমা। গাড়ী এসেছে, বামার মার সঙ্গে গিয়ে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে এসো।"

বাড়ীর সকলের কড়া হুকুম, সুতীক্ষ্ণ নজর, সুমিতার সঙ্গে যেন সোমনাথের দেখা না হয়। লোকনাথ স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে, "এক কুষ্ঠের জ্বালায় অস্থির, আর কুষ্ঠের বংশ বাড়িয়ো না বড়বৌদি। অন্ন-বস্ত্র ওষুধ-পথ্য জোগাতে এখনি হিমসিম্ হতে হচ্ছে, আবার যদি মানুষ বাড়ে তাহলে বিপদ।"

কিন্তু লোকনাথের প্রচণ্ড ধমক, শাশুড়ী-ননদের শাসন, স্বজনবর্গের সতর্কতা সত্ত্বেও সুমিতা এবার একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিল। এবং বাড়ীর সকলের অযত্ন, অবহেলা তুচ্ছ করিয়া সে দিনে-দিনে বেশ বাড়িতে লাগিল। গৃহিণী সুমিতার দিকে তাকাইয়া বুক চাপড়াইয়া বলিলেন, "বেহায়া বৌ!" লোকনাথ অকথ্য ভাষায় কুৎসিত ভাবে সুমিতাকে আক্রমণ করিল। সুমিতার দুই কাণ আগুনের মত ঝাঁ-ঝাঁ করিয়া উঠিল। বধূর সন্তান-প্রসবে গৃহিণী বিলাপ করিলেও শিশুকে পাইয়া তিনি যেন সংসার ভুলিলেন। লোকনাথকে শেষে বুঝাইলেন, যা হবার হয়ে গেছে। এখন অভাগীর যা বরাত, ছেলেটা বেঁচে থাকে ওর কপালে, তবেই···। লোকনাথ গজরাইতে লাগিল।

ফাগুনের জ্যোৎস্না-ভরা মদির নিশা! বসন্তের উতল হাওয়া আমের বোলের পাগল-করা গন্ধ বহিয়া আনে। ছেলেটিকে শাশুড়ীর কাছে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া সুমিতা বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। নির্ম্মল রাত্রি! বাহিরে মত্ত কোকিল কোথায় একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে। কি আবেগ-ভরে সুমিতা জ্যোৎস্নাভরা নিশার দিকে মুগ্ধ-নয়নে চাহিয়া রহিল! সুমিষ্ট ফুলের গন্ধ, মিষ্ট ঝির-ঝিরে হাওয়া কার স্পর্শ যেন স্মরণ করায়! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিতে সে চমকাইয়া উঠিল। পাশে বসিয়া সোমনাথ। কখন সে হামা দিয়া আসিয়াছে, সুমিতা টের পায় নাই। তীব্র গতিতে উঠিয়া সুমিতা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সোমনাথের দিকে চাহিয়া ঘরে গিয়া সজোরে দরজায় খিল দিয়া, বিছানায় বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, সে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া স্পষ্ট দেখিতেছে, কে যেন হামা টানিয়া টানিয়া তার মাথার কাছের জানলার ধারে বসিয়া ব্যাকুল করুণ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে! আর তার তপ্ত নিশ্বাস সুমিতার গায়ে ফেলিয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে!

কালের বিচিত্র গতি। পরিবর্ত্তনশীল জগতে রূপ কত না বদলায়। কর্ত্তা-কর্ত্রী এ-বাড়ী হইতে চির-বিদায় নিয়াছেন। বড়-ছেলে অক্ষম বলিয়া,—লোকনাথের অপেক্ষা তার ভাগে টাকা, বিষয়-সম্পত্তি কিছু বেশী করিয়া লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। লোকনাথ সোমনাথকে ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। গৃহিণী মরিবার পূর্ব্বে এক দিন চুপি চুপি সুমিতাকে ডাকিয়া কয়েকখানা ভারি ভারি গহনা তার হাতে তুলিয়া দিয়া বলেন, "আমার সুজিতের বৌ এলে দিয়ো। অভাবে পড়ে যেন বেচে খেয়ো না। কিন্তু সুমিতা শাশুড়ীর কথা ভালো করিয়া রাখিতে পারে নাই। সুজিত যখন ব্যবসায় নামে, তখন সুমিতার কাছে ক'খানা গহনা ছাড়া আর কিছু ছিল না। গহনা ক'খানা বাঁধা পড়ে। ব্যবসা একটু দাঁড়াইতে সুজিতকে সুমিতা বলে, "দেখো, আর যা কিছু করো, আমার এই ক'খানা গহনা—এ ছাড়াতেই হবে।"

সুজিত ব্যবসায় নামিয়া ক'বার ঘা খাইয়া পরে যুদ্ধের বাজারে ধনকুবের বলিয়া নাম কিনিল। ব্যাঙ্কে মোটা টাকার হিসাব; সহরে বড় বড় ক'খানা বাড়ী। প্রকাণ্ড লন-ঘেরা বাড়ীটি কিনিয়া আসিয়া বলিল, "মা, বাবার বেড়াবার বেশ সুবিধে হবে। চলো নতুন বাড়ীতে যাই।" সুমিতা পুরানো বাড়ী ছাড়িতে চাহে না। সুমিতা তার শাশুড়ীর ঘরেই থাকে। সোমনাথের ঘরে আজ ত্রিশ বৎসর সে প্রবেশ করে নাই। সুজিতের বধূ আসিলে সস্নেহে তাকে বুকে টানিয়া বলে, "মা, আমার সব আছে। তুমি তোমার শ্বশুরকে দেখা-শোনা করো!" তার পর আপন-মনে বলে, "আহা মা, মানুষটা বড়ই অসহায়!"

বধূ অনুভা রাত্রে সুজিতকে জিজ্ঞাসা করে, "মা তো বাড়ীর সকলকে খুব ভালোবাসেন, বাবাকে দেখা-শোনা করেন না কেন? ঝি, চাকর, মেজ-মা—সকলেই বলে, বাবার উপর তিনি কেমন—" সুজিত অন্যমনস্ক ভাবে বলে, "মা আমার বড় দুঃখী, তুমি আমার মাকে দেখো।"

অনুভা বুদ্ধিমতী। শাশুড়ী কিসে সুখী হন বুঝিল। সুজিতকে দিয়া সাহেব-বাড়ীতে ফরমায়েস দিয়া সোমনাথের জন্য জুতা তৈয়ারী করাইয়া আনিল। সোমনাথ লাঠিতে ভর দিয়া সেই জুতা পরিয়া হাঁটিতে লাগিল। অনুভা যেন এখন সোমনাথের জীবন-দায়িনী। সোমনাথকে কাব্য পড়িয়া শোনায়, তার পছন্দমত রান্না করিয়া

খাওয়ায়, তাহাকে ধরিয়া বাগানে বেড়ায়। ক্যাম্প-চেয়ারে বসাইয়া সিনেমায় লইয়া গিয়া, আয়না ফেলিয়া সোমনাথকে বায়োস্কোপের ছবি দেখায়। এই আদর-যত্নে সোমনাথের আনন্দ রাখার জায়গা নাই; সংসারের আর কোন খবর তার কাছে পৌঁছায় না। সুজিত বোধ হয় শুনিয়া বলিতে পারে এতখানি বয়সে, তার বাবার সঙ্গে সে কটা কথা বলিয়াছে। সে চেনে সুমিতাকে! তার নির্ভর মায়ের উপর।

এবার দুর্ভিক্ষের বাজারে পাড়ার সব পূজা বন্ধ! শুধু সুমিতা পূজা করিবে। এবার পূজায় অন্য বারের অপেক্ষা অনেক বেশী খরচ হইবে। বিদেশ হইতে বন্যাপীড়িতগণকে আনাইয়া দু'-বেলা খাওয়ানো, তাদের কাপড় দিতে হইবে, সুমিতার হুকুম। উদ্যোগ চলিতেছে। লোকনাথ পেনসন নিয়াছেন। একটি মেয়ে—সুজিতের দৌলতে ভালো ঘরে বিবাহ হইয়াছে। সে বলে "বৌদি, আর দু'-জন সুজিত থাকলে বেশ হতো, তার আরও দু'টি কন্যা আছে। সুমিতা বাড়ীর পার্টিসান তুলিয়া দিয়াছে, লোকনাথের বড়ই অর্থকষ্ট।

পূজার সম্মুখেই সুমিতা অসুখে পড়িল। সুজিত একেবারে সহরের বড় বড় ডাক্তারদের বাড়ীতে বাঁধিয়া রাখিল। কিন্তু সুমিতা বুঝিল, পরপারের ডাক আসিয়াছে।

পূজা-উপলক্ষে ননদরা আসিয়াছে। রত্নমণি বিধবা হইয়াছে, সে আর ফিরিয়া যাইবে না। সুমিতার জন্য সুজিত ভালো নার্স নিযুক্ত করিয়াছে। রত্নমণিকে বলে, "পিসিমা, মায়ের সকল ইচ্ছে যেন পূরণ হয়। কিন্তু সাবধান, মাকে কোন রকমে উত্তেজিত বা চিন্তান্বিত করবেন না।"

পাড়ার রায়েদের বড়-গিন্নী সেখানে কি কাজ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন "দেখ্‌ রতন, তোর বড়-বৌদি সত্যিই সতীলক্ষ্মী বটে। অত রূপ! আর ঐ স্বামী! কিন্তু কেউ একটি কথা বলতে পারেনি। এই পাড়ার মেসের ছেলে-বুড়ার সঙ্গে পাড়ার ঝি-বৌ নিয়ে কত কাণ্ড-কারখানাই বাধে। কিন্তু এ-বাড়ীর বড়-বৌমাকে কেউ একটা কথা বলতে পারেনি।" সোমনাথ এখন আর সেই জানলার ধারে বসিয়া দিন কাটায় না। পূজা-প্রাঙ্গণে চেয়ার পাতিয়া অনুভা তাহাকে সে-চেয়ারে বসাইয়া দেয়। সোমনাথ সেখানে বসিয়া রায়গিন্নীর কথা শুনিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল। তার দুর্ভাগ্যে সে এখন অভ্যস্ত। ধিক্কার, খেদ, দুঃখ, লজ্জা—সব তার চলিয়া গিয়াছে। দুর্ব্বল, অক্ষমরা যেমন স্বার্থপর হয়, বড় বড় চিন্তাগুলিকে তাহারা যেমন আকর্ষণ করিতে পারে না, সে-ও তেমনি হইয়াছে। সুমিতা আজ ত্রিশ বৎসর তাহার ঘরে আসে না। কেন আসে না? ইহার জন্য সে কাঁদিয়াছে, রাগিয়াছে, কোনো ফল হয় নাই। সে বুঝিয়াছে, সুমিতা তাহাকে ঘৃণা করে। প্রথম প্রথম ইহার জন্য সুমিতাকে নিকৃষ্ট ভাবে দেখিয়াছে। বহু ঘৃণিত আলোচনা সুমিতার সম্বন্ধে মনে মনে করিয়াছে। কিন্তু সুমিতা তার কাছে স্ত্রী-ভাবে না আসিলেও স্ত্রী-হিসাবে সে তাহকে ঘিরিয়া আছে। দূরে থাকিয়াও সুমিতা তার সকল যত্ন পরিপাটি ভাবে চালায়। সোমনাথ বুঝিতে পারে, সে সুমিতার হাতের পুতুল।

এখন সুমিতাকে দেখিলে সোমনাথ মুখ ফিরাইয়া লয়। ছেলের উপর সুমিতার কি প্রভাব, সোমনাথ দূর হইতে দেখে। বহু দিন পরে সে যেন অনুভার যত্নে আবার নিজেকে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছে। সে জন্য মাঝে-মাঝে সোমনাথকে দেখিবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়। অনুভা তাহাকে নূতন মানুষ পাইয়াছে। যে জগৎ-সংসার তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিল, অনুভা পার তার ছোট ছেলেটি পুনরায় যেন এই জগতের মাটির কোমল স্পর্শ তার অন্তরে স্পর্শ করাইতেছে। সংসার যেন আবার তাহাকে সস্নেহে টানিতেছে। কিন্তু সে বুঝিল না, এর মূল আকর্ষণকারী কে?

আজ আবার বিজয়া দশমী।

সংসার হইতে সুমিতার এখন অবসর। সংসার তাহাকে বিদায় দিতেছে। নহিলে, আজ বিজয়ার সন্ধ্যা, সুমিতা আছে কি না নিরুদ্বেগে, নিশ্চিন্তে বিছানায় শুইয়া? বাড়ীর কোন গোলমাল মায়ের ঘরে যাহাতে না আসে, সুজিত সে জন্য খুব সতর্ক। দু'জন নার্স সর্ব্বক্ষণ সুমিতার কাছে। এ ঘরের বাহিরে বিজয়া! উৎসব ঘরে-বাহিরে। রাস্তায় প্রতিমা-বিসর্জনের বাজনা, ছেলেদের সিদ্ধি খাইয়া পাগলামী, মেয়েদের সাজসজ্জার ধূম—তার ছোট একটু তরঙ্গও এ ঘরে আসিয়া পৌঁছায় নাই। এমন ভাবে সুমিতা নিজেকে কোন দিন পায় নাই। সোমনাথের চেয়ে সুমিতাকে দেখায় বয়সে যেন অনেক বড়। তাহার কারণ, নানা দুঃখ, দারিদ্র্য, অনশন, অনিদ্রা—সুমিতার শরীরে আর কিছু নাই। দুর্ব্বল দেহকে বিছানায় এলাইয়া দিয়া সুমিতা নিজেকে ভালো করিয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছে।

নার্সরা বারান্দায় চাঁদের আবছা আলোয় বসিয়া মৃদু স্বরে গল্প করিতেছে। ঘরে জানালার গরাদের ফাঁক দিয়া বিছানার স্থানে স্থানে জ্যোৎস্না আসিয়া যেন সোনা-কালি সতরঞ্চ বিছাইয়া দিয়াছে। সুমিতার মনে পড়িল, কত জ্যোৎস্না রাত্রি, কত বসন্ত পূর্ণিমা, কত শ্রাবণী শর্ব্বরী তার জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে তাহাদের বিদায় দিয়াছে। তার মনের নিভৃত কোণের গূঢ় বেদনার কথা কে জানে? কেহ কোন দিন সে কথা ভাবে নাই! কেহ সে কথা জানিতে চাহে নাই! মনে পড়িল সোমনাথকে। এখন সে সুমিতাকে দেখিলে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লয়।

কে বুঝিবে, বন্যার মত যৌবনের গতিকে সে যে কঠোর শাসনে চারি দিক্‌ দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া সংসারের মঙ্গল-যজ্ঞে জীবন আহুতি দিয়াছে! ভগবানের অভিশাপকে সে সহ্য করিবার চেষ্টা করিতে-ছিল, কিন্তু অবুঝ সংসারের লোক-জন তাহাকে সহ্য করিতে দেয় নাই। দুঃখের ভারে সে চোখের পাতা মুদ্রিত করিল। মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। সে কি অপরাধী? আজ ওপারে যাওয়ার আগে এ-জায়গায় কাজ তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে হইবে যে! এমন সময় নার্সদের অনুমতি নিয়া রত্নমণি, কুন্তলা, লীলা ঘরে প্রবেশ করিল। "কেমন আছো বড়-বৌদি!" রত্নমণি ডাকিল।

সুমিতা চক্ষু চাহিয়া ম্লান হাসি হাসিল। রত্নমণি সুমিতার দিকে করুণ নেত্রে চাহিয়া বলিল, "বৌদি, একটু উঠে বসতে পারবে? পায়ের ধূলো নেবো, আজকে বিজয়া।"

"আজ বিজয়া!" মুহূর্ত্তে সুমিতার মানস-চক্ষে পূর্ব্বের এক বিজয়া-সন্ধ্যার কথা মনে পড়িল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আজ বিজয়া, না ঠাকুরঝি? ও কি করো বলো তো! বয়সে তো আমরা ভাই সমান, প্রণাম কোর না!" রত্নমণি, অশ্রুসজল কণ্ঠে

বলিল, "বৌদি, তোমার মত ভাগ্যবতীর পায়ের ধূলো ক'জন পায় বলো তো?" কুন্তলাও প্রণাম করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হ্যাঁ দিদি, তোমার মত যেন ভাগ্যবতী হতে পারি এই আশীর্ব্বাদ করো!" লীলা চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিয়া বলিল, "বড়-বৌদি, আমি যে বড় আশা করেছিলাম, আমার মেয়ের বিয়েতে তুমি গিয়ে এয়োর কাজ করবে!"

"এয়োর কাজ আমি করবো?" তার পর একটু থামিয়া আপন-মনে মৃদু স্বরে বলিল, "ভাগ্যবতী কি না।"

এয়ো করার কথায় উপস্থিত চারি জনের মনেই পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করাইয়া দিল। চারি জনেই চক্ষু নত করিল। লীলার বিয়েতে সুমিতা বরণডালা ছুঁইয়াছিল, সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া আসিয়া সে বরণডালা ফেলিয়া নূতন করিয়া সাজায়। তখন তাহারা সুমিতাকে বলিত, অলক্ষণা! ওর স্পর্শে অলক্ষণ হয়!

সুমিতা উদাস নয়নে বাহিরে জ্যোৎস্নায় স্নাত নারিকেল পাতাগুলির ঝির-ঝিরে কাঁপুনির দিকে চাহিয়া রহিল। তার ঘরের নীচেই সোমনাথের ঘর! মনে মনে বলিল, ভাগ্যবতী! মনে পড়ে সেই বহু বৎসর পূর্ব্বে নিস্তব্ধ ফাল্গুনী রাতে জ্বলন্ত দীর্ঘনিশ্বাস। মনে পড়ে বহু বৎসর পূর্ব্বের বিজয়ার সন্ধ্যা। ভাগ্যবতী! সহসা সে রতনমণির হাত দু'-খানি ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "ঠাকুরঝি, আমি তো ভাই তোদের সংসার থেকে বিদায় নিচ্ছি, এখন তোরা যে হাত দিয়ে আমাকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলি, সেই হাত দিয়েই তাঁর পায়ে আবার আমায় পৌঁছে দিয়ে আয়। যত দিন আমি তোদের ছিলাম, তোদের ইচ্ছার অন্যথা করিনি। আজ তোরা আমায় সেই জায়গায় ফিরিয়ে দিয়ে আয়। তিনি বড় দুর্জ্জয় অভিমানী। আমি তাঁর পায়ের নীচে দাঁড়িয়ে বলবো, সংসারের সকল ত্রুটি সমাধান করে, সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে আমি এসেছি তোমার পায়ের তলে। আমার মাথার বোঝা নামিয়ে এসেছি, তাই মন আজ আমার পরিপূর্ণ,—অন্তরের মিলনই আমাদের সত্যকার মিলন।"

শ্রীউৎপলাসনা দেবী

শ্রীশঙ্করাচার্য্য

অধর্ম্ম যখন প্রবল হইয়া সমাজে এবং রাষ্ট্রে অস্বস্তিকর বিশৃঙ্খলা রচনা করে, সবলের হাতে যখন দুর্ব্বলের পেষণ ও পীড়ন চলে, তখন সকল দেশেই এমন সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে, যাঁহার প্রেরণায় খণ্ড-বিবর্ত্তন দেখা যায়। সে বিবর্ত্তনের ফলে রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। সে-অবস্থায় জাতির শিক্ষায়, সাধনায়, সাহিত্যে এবং সর্ব্বপ্রকার অধিকারক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব স্পন্দন পরিলক্ষিত হয়। তখন স্থিতিশীলতা থাকে না।

বিশ্বের এবং জীবের কল্যাণের জন্য যাঁহাদের এমন আবির্ভাব ঘটে, তাঁহাদিগকে আমরা ভগবানের অংশসম্ভূত বা 'অবতার' বলিয়া শ্রদ্ধা-নিবেদন করি এবং সে হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, যীশুকে অবতার বলিলে যেমন অত্যুক্তি হয় না, তেমনি শ্রীগুরু শঙ্করাচার্য্যকেও আমরা অবতার বলিয়া মানিতে পারি।

মহাপুরুষের অবতারত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ—শাস্ত্রীয় বাক্য, তাঁহার অলৌকিক শক্তি, কর্ম্ম এবং জীবনধারা। শঙ্করাচার্য্যের সম্বন্ধে বায়ুপুরাণে উল্লিখিত আছে,—"চতুর্ভিঃ সহ শিষ্যৈস্তু শঙ্করোঽবতরিষ্যতি।" সত্যযুগে ব্রহ্মা ছিলেন জগদ্গুরু, ত্রেতাযুগে ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, এবং দ্বাপরে ব্যাসদেব।

যে বৈদিক জ্ঞান-ধারা ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, যে অনাবিল জ্ঞানধারার উদ্দেশ্যে আর্য্যসন্তান চিরযুগ-প্রবাহী গুরুপরম্পরাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া আসিতেছে:—

"নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎপুত্রপরাশরঞ্চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্॥
শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্মপাদঞ্চ হস্তামলকঞ্চ শিষ্যম্।
তন্ত্রোটকং বার্ত্তিককারমন্যান্ অস্মদ্গুরূন্ সন্ততমানতোঽস্মি॥

সেই জ্ঞান-ধারা অবৈদিক মতের উত্থানে সাময়িক বাধা পাইয়াছিল। আচার্য্যদেব সেই জ্ঞান-ধারাকে বাধামুক্ত করিয়া আবার পূর্ণ গৌরবের পথে পরিচালিত করেন। সনাতন ধর্ম্মের এক দারুণ সঙ্কটময় কালে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। সেই সময়ে ভারত ছিল বৌদ্ধমত-প্রধান। ভগবান্ তথাগতের প্রচারিত অবৈদিক মতবাদ তৎকালীন বিশাল রাজশক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া এবং দিঙ্নাগ, ধর্ম্মকীর্ত্তি, ধর্ম্মপাল, বসুবন্ধু প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন বৌদ্ধাচার্য্যগণের সহায়তায় ভারতে এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল যে, বৈদিক ধর্ম্ম অতি-কষ্টে নিজের সত্তা রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। এমন কি, বিক্রমাদিত্য ও পুষ্যমিত্রের ন্যায় স্বনামধন্য নৃপতিগণ এবং বাৎস্যায়ন উদ্যোতকর প্রভৃতি মনীষিগণের চেষ্টাতেও বৈদিকধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। এমনি দারুণ সময়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া স্বীয় অপূর্ব্ব প্রতিভায়, পাণ্ডিত্যে ও জ্বলন্ত বিচার-শক্তি ও যুক্তিমত্তায় বৈদিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা বৌদ্ধ-মতবাদ বিধ্বস্ত করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা পুনরুত্তোলন করেন। জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের দশোপনিষদ-ভাষ্য, শারীরকভাষ্য, গীতাভাষ্য প্রভৃতি ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক বিরাট গ্রন্থরাজির উল্লেখ না করিয়াও তাঁহার নির্ব্বাণশতকম্, আত্মপঞ্চকম্, বিজ্ঞাননৌকা, অদ্বৈতানুভূতি, আত্মবোধ, বিজ্ঞানকেশরী ও সিদ্ধান্তবিন্দু প্রভৃতি স্তোত্র ও মন্ত্রমধ্যে ছন্দ, শব্দ ও ভাবের দ্যোতনায় অদ্বৈতজ্ঞানের যে রূপ মূর্ত্ত হইয়াছে, জগতে তাহা অতুলনীয়।

৬০৮ শকাব্দে বা ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে বৈশাখী শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে দাক্ষিণাত্যে কেরল প্রদেশের কলাদিগ্রামে আচার্য্য এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শিবগুরু ও

কোটি কোটি ধর্ম্মগ্রন্থ যে সিদ্ধান্ত করিতে পারে নাই, আচার্য্যদেব সেই সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত ভাবে বজ্রদৃঢ় বাক্যে ঘোষণা করিলেন—

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইহ দেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্ত-ডিণ্ডিমঃ॥

আর্য্যধর্ম্মে চারটি আশ্রমের নির্দ্দেশ আছে। শেষ আশ্রমটির নাম সন্ন্যাস। বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মচারীর জন্য সংহিতা, গৃহস্থের জন্য ব্রাহ্মণ, বানপ্রস্থের জন্য আরণ্যক ও সন্ন্যাসীর জন্য উপনিষদ্। উপনিষদই চরম বেদ বা বেদান্ত। মোক্ষপথের পথিক এই বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে ব্রহ্ম-জ্ঞান আহরণ করিয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে। ভগবান্ শঙ্কর এই বেদান্তদর্শনকে ঔপনিষদ দর্শন বলেন। বেদান্তদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণ। বেদান্ত-দর্শনে কয়েক জন বেদাচার্য্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কাশকৃৎস্নের মত সমর্থন করিয়া ভাগবতপাদ নিজ অসাধারণ শক্তিমত্তায় এক নব রূপ প্রদান করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ও উপাদেয় বেদান্তের শারীরক ভাষ্য অদ্বৈতবাদিগণের নিকট বহুলরূপে আদরণীয়। মনীষী আনন্দগিরি ও বাচস্পতি মিশ্র শারীরক ভাষ্যের টীকা রচনা করিয়াছেন। ভাগবতপাদের পদাঙ্ক অনুসরণে পঞ্চদশী, অদ্বৈতসিদ্ধি, বেদান্তসার প্রভৃতি বহুবিধ প্রকরণ-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

ভগবান্ শঙ্কর সংসারকে রাগদ্বেষাদিসঙ্কুল বলিয়া আবর্ত্তবহুল নক্রকুম্ভীরপূর্ণ ভীষণ সাগরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সংসার চিরদুঃখময়। এই দুঃখবাদে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় দর্শন প্রতিষ্ঠিত। দুঃখবাদে ইহার আরম্ভ, দুঃখনাশে ইহার সমাপ্তি। দুঃখনাশের উপায় ব্রহ্মজ্ঞান। যাহাকে বেদান্তের ভাষায় বলে বিদ্যা। বিদ্যা দ্বারা অমৃত লাভ হয়! ব্রহ্মই অমৃত। সেই বিরাট ভূমানন্দ। সেই অমৃত-সাগরে যাহাতে জীববিন্দু নিমজ্জিত হইতে পারে, সেই পথের সন্ধান বেদান্ত বা উপনিষদ্-দর্শন দিয়াছেন। বেদান্তমতে সমস্তই ব্রহ্ম। সেই সদ্বস্তু নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সত্যস্বভাব পরমানন্দ, পরিপূর্ণ সনাতন স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদরহিত অদ্বয় ব্রহ্ম। কত না বিরাট ছন্দে, কত না সুন্দর সঙ্গীতে, কত না সুন্দর মন্ত্রে, কত না আবেগময়ী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় উপনিষদের ঋষিগণ সেই বহু আদরণীয় ও বরেণ্য মহাবস্তুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—তুমি নির্বিশেষ আবার তুমি সবিশেষ। কখন তোমার কোন গুণের পরিচয় পাই না, আবার তোমাকে সর্ব্বগুণাধার বলিয়া জানিতে পারি। কখন তোমায় অবাঙ্‌মনসগোচর কখনও আবার মনসৈবানুদ্রষ্টব্য বলিয়া ভাবি। শব্দের মধ্যে, স্পর্শের মধ্যে, রূপের মধ্যে ও রসের মধ্যে তোমায় না পাইয়া আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে থাকি; তখন তুমি অনন্ত সৌন্দর্য্য লইয়া অনন্তরূপে রূপময় হইয়া আমার স্তুতির মধ্যে আমার স্পর্শের মধ্যে ধরা দাও। দেখি, কত অমৃতের রস তোমার প্রেমময় আনন্দ-বিস্ফুরিত মূর্ত্তি হইতে ক্ষরিয়া পড়িয়া চির-পতিতপাবনী সুরধুনীর মত আনন্দস্রোত বহাইয়া দিতেছ। আবার দেখি, কখন বা অঘটনঘটন-পটীয়সী বিশ্বাবর্গাত্মিকা মহাশক্তিরূপিণী মহামায়া-প্রভাবে শুক্তিতে রজতভ্রমতুল্য রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া, জগৎ ও জীবকে দ্বৈতরূপে, ভিন্নরূপে দর্শন করাইতেছ। আবার কখন বজ্রনির্ঘোষে বেদের সেই মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'অহং' 'ব্রহ্মাস্মি' 'সোঽহম্' দ্বারা প্রতিপন্ন করাইতেছ জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নতা। জগদ্‌গুরু সেই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি তুলিয়া বিঘোষিত করিলেন, "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্"। আমি দেহ বা দেহের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার, প্রাণবর্গ বা বুদ্ধি নহি, আমি সাক্ষিস্বরূপ নিত্য প্রত্যগাত্মা-শিবস্বরূপ। যেমন রজ্জুর অজ্ঞানতাবশতঃ রজ্জুতে সর্প প্রকাশ পায়, সেইরূপ আত্মার অজ্ঞানতা বশতঃ আত্মার জীবভাব হয়। যথার্থ বেত্তার বাক্য দ্বারা সর্পভ্রান্তি নাশ হইলে রজ্জু রজ্জু বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ "জ্ঞানরূপ তপস্যাতে জীব হয় শিব"!

কথিত আছে, এক দিন জগদ্‌গুরু বারাণসীধামে নিজ আশ্রমে শিষ্যগণের নিকট বেদান্ত ও ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা করিতেছিলেন। এই শিষ্যগণের নাম জগদ্‌বিদিত। পদ্মপাদ (সনন্দন), হস্তামলক, ত্রোটকাচার্য্য (আনন্দগিরি) বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য (মণ্ডনমিশ্র) সকলেই আলোচনায় নিযুক্ত। বারাণসীধামে এই অপূর্ব্ব বিদ্বৎ-সম্মিলনে বহু পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মতত্ত্ব, অদ্বৈততত্ত্ব, বিবর্ত্তবাদ প্রভৃতি তত্ত্ব আচার্য্যদেব জলন্ত ভাষায় অভিব্যক্ত করিতেছিলেন। এমন সময় এক তেজঃপুঞ্জ-কলেবর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া সেই আলোচনায় যোগদান করিলেন। ব্রাহ্মণের অপূর্ব্ব মেধা ও বিচার-শক্তি দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের অসাধারণ ব্যাখ্যা সকলকে চমৎকৃত করিল। অজ্ঞাতনামা অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন কুশাগ্রবুদ্ধি এই ব্রাহ্মণের নিকট আচার্য্যদেবের পরাভব আশঙ্কায় শিষ্যগণ আশঙ্কিত হইলেন। কখনও আচার্য্যদেবের যুক্তি ও জ্ঞান অপূর্ব্ব ভাবে প্রকাশিত হইতেছিল, কখন বা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অসামান্য শক্তি ও বিদ্যার প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। দিনের পর দিন তর্কযুদ্ধ চলিল। কাহারও গৌরব ম্লান হইবে, এমন লক্ষণ দেখা যায় না। আচার্য্য-শিষ্য পদ্মপাদ ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, এই তেজো-দীপ্তকায় অপূর্ব্ব মেধাবী ব্রাহ্মণ শ্রীমন্নারায়ণাবতার ব্যাসদেব! আচার্য্য-দেবের জ্ঞান-পরীক্ষায় সমাগত হইয়াছেন! শিষ্য গুরুদেবকে নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্রাহ্মণের পরিচয়ের ইঙ্গিত করিলেন :—

শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসঃ সাক্ষাৎ নারায়ণঃ।
নমস্তাভ্যাং নমস্তাভ্যাং নমস্তাভ্যাং নমো নমঃ॥

ভগবান্ শঙ্কর বাদরায়ণের চরণতলে পতিত হইলেন। ব্যাসদেব আচার্য্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার পরমায়ু ষোড়শবর্ষ হইতে দ্বাত্রিংশ বর্ষ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

গগনে উদিলে যথা দেব অংশুমালী,
লুপ্ত হয় ক্ষীণ-জ্যোতি তারকার দল।

সেইরূপ বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের নিরীশ্বরবাদ ও অন্যান্য সঙ্কীর্ণমতবাদ জগদ্‌গুরুর জ্ঞানবাদের নিকট পরাজয় মানিয়া চিরতরে ভারতভূমি হইতে বিলুপ্ত হইল। আচার্য্যদেবের প্রচারিত অদ্বৈতবাদ এক নব মিলন-ভূমিতে ভারতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিল। পরিব্রাজকরূপে ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বমতবাদের ইষ্টদেবগণের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়া আচার্য্যদেব সরল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় যে স্তোত্র ও মন্ত্রগুলি রচনা করিয়াছেন, সেগুলির শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ আবৃত্তিতে মন ভরিয়া উঠে। অন্নপূর্ণাস্তোত্র, আনন্দলহরী, গঙ্গাস্তোত্র ভবান্যষ্টক প্রভৃতি যেমন শক্তি-উপাসকগণের নিকট প্রিয়, সেইরূপ শিবানন্দলহরী, শিবাপরাধভঞ্জনস্তোত্র শৈবগণের নিকট পরম আদরণীয়।

আজও ভারতের পশ্চিম প্রান্তে দ্বারকাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত শারদামঠ (যাহার পীঠদেবতা সিদ্ধেশ্বর ও দেবী ভদ্রকালী, আচার্য্য সুরেশ্বর এবং যাহার মহাবাক্য তত্ত্বমসি) পূর্ব্ব প্রান্তে জগন্নাথক্ষেত্রে সংস্থাপিত গোবর্দ্ধনমঠ (যাহার দেবতা জগন্নাথ ও দেবী বিমলা) আচার্য্য পদ্মপাদ, মহাবাক্য "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", উত্তর প্রান্তে বদরিকাশ্রমের পবিত্র জ্যোতির্মঠ (যাহার দেবতা নারায়ণ, দেবী পূর্ণাগিরি, আচার্য্য ত্রোটক, মহাবাক্য "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম।") ও দক্ষিণ প্রান্তে রামেশ্বরক্ষেত্রের শৃঙ্গেরী মঠ (যাহার দেবতা আদি বরাহ ও দেবী সর্ব্বকামফলপ্রদায়িনী কামাক্ষী, আচার্য্য পৃথ্বীধর ও মহাবাক্য "অহং ব্রহ্মাস্মি") বিশ্ববন্দিত আচার্য্যের বিজয়-নিশানস্বরূপ বর্ত্তমান। আজও তাঁহার চারি প্রধান শিষ্যের দশ-শিষ্যের নামে প্রবর্ত্তিত দশনামী সম্প্রদায় তাঁহার জ্ঞান, ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পবিত্র হোমাগ্নি রক্ষা করিয়া ভারতকে ধন্য করিতেছে।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, এরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন ও হৃদয়বান্ বিরাটের সর্ব্ববিষয়িণী শক্তির সম্যক্ পরিচয় না পাইয়া কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায় তাঁহাকে "ভক্তিহীন" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। 'প্রবোধসুধাকরে' আচার্য্য জলদগম্ভীর স্বরে ভক্তির মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন :—

শুদ্ধ্যতি হি নান্তরাত্মা কৃষ্ণপদাম্ভোজভক্তিমৃতে।
বসনমিব ক্ষারোদৈর্ভক্ত্যা প্রক্ষাল্যতে চেতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণপদকমলে ভক্তির উদয় না হইলে অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ হয় না, ক্ষারজল সংযোগ দ্বারা যেমন বসনের মলিনতা ঘুচিয়া যায়, সেইরূপ ভক্তির উদয়ে চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়, যে মহাপুরুষের কুলদেবতা যদুপতি যাঁহার অনন্তরূপ ও সৌন্দর্য্য বিরাট স্তবমন্ত্রে 'প্রবোধসুধাকরে' আচার্য্যদেব তেজোময়ী ভাষায় বিঘোষিত করিয়াছেন, সেই অবতারশ্রেষ্ঠ কি ভক্তিহীন হইতে পারেন ?

যমুনাতটনিকটস্থিতবৃন্দাবনকাননে মহারম্যে।
কল্পদ্রুমতলভূমৌ চরণং চরণোপরি স্থাপ্য।
তিষ্ঠন্তং ঘননীলং স্বতেজসা ভাসয়ন্তমিহ বিশ্বং
পীতাম্বরপরিধানং চন্দনকর্পূরলিপ্তসর্ব্বাঙ্গম্॥
আকর্ণপূর্ণনেত্রং কুণ্ডলযুগমণ্ডিতশ্রবণং
মন্দস্মিতমুখকমলং সুকৌস্তুভোদারমণিহারম্।
বলয়াঙ্গুলীয়কাদ্যানুজ্জ্বলয়ন্তং স্বলঙ্কারান্
গলবিলুলিতবনমালং স্বতেজসাপাস্তকলিকালম্॥

শোভায় অতুলনীয় শ্রীবৃন্দাবনধামে যমুনাপুলিনে কল্পদ্রুমতলে শ্যামসুন্দর চরণোপরি চরণ রাখিয়া বিরাজমান। প্রভুর পরিধানে পীতবাস, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কর্পূরচন্দনলিপ্ত। ঘননীলবর্ণাভা রাশি ও দেহের প্রভায় বিশ্ব উদ্ভাসিত। আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল, শ্রবণদ্বয় কুণ্ডলশোভিত, মধুরহাস্য-বিকসিত মুখকমল। উরঃদেশে কৌস্তুভমণি ও রত্নহার বিলম্বমান। গলে বনমালা বিলম্বিত, বলয় ও অঙ্গুরীয়কাদি অলঙ্কারে ভূষিত শ্যামরায় স্বতেজঃপ্রভাবে কলিকালকে পরাহত করিয়াছেন।

কন্দর্পকোটিসুভগং বাঞ্ছিতফলদং দয়ার্ণবং কৃষ্ণম্।
ত্যক্ত্বা কমন্যবিষয়ং নেত্রযুগং দ্রষ্টুমুৎসহতে।
পুণ্যতমামতিসুরসাং মনোহভিরামাং হরেঃ কথাং ত্যক্ত্বা।
শ্রোতুং শ্রবণদ্বন্দ্বং গ্রাম্যং কথমাদরং ভবতি॥

কোটি কন্দর্প অপেক্ষা মনোহর বাঞ্ছিত ফলদাতা করুণাসাগর শ্যামসুন্দরকে পরিত্যাগ করিয়া নয়নদ্বয় কি অন্য কোন বিষয় সন্দর্শনে ব্যাকুল হইতে পারে ? চিত্তহারিণী পবিত্র সুরসপূর্ণ হরি-কথা পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণযুগল কি গ্রাম্যকথা-শ্রবণে আগ্রহযুক্ত হইতে পারে ?

* * *

একো ভগবান্ রেমে যুগপদ্ গোপীষ্বনেকাসু।
অথবা বিদেহজনক-শ্রুতদেবভূদেবয়োর্হরির্যুগপৎ॥

একই ভগবান্ যুগপৎ বহুগোপীগণসহ রমণ করিয়াছিলেন। বিদেহ প্রদেশে জনক ও শ্রুতদেব-আলয়ে হরি যুগপৎ একসঙ্গে গিয়াছিলেন।

* * *

রাক্ষসী পূতনা তীব্র গরলযুক্ত স্তনদ্বয় পান করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আলয়ে আসিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেহসংস্পর্শে সেই রাক্ষসী অতি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিয়াছিল। এমনি তাঁহার করুণা।

* * *

সর্পবেশধারী অঘাসুর ও বিপুলকায় সর্পরাজ কালিয় গো, গোপী ও গোপগণকে অত্যন্ত পীড়ন করিলেও করুণাময় ভগবান্ তাহাদিগকে অনঘপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

* *

ত্রিবক্রশরীর অতিশয় লম্বোষ্ঠী বিগতযৌবনা লোলচক্ষু কুব্জা শ্রীভগবানকে স্তবচন ও মাল্যচন্দনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া সুবদনী সুঠাম সুন্দরীতে পরিণত হইয়াছিল।

* * *

কৃপাপাত্রং যস্য ত্রিপুররিপুরম্ভোজবসতিঃ
সুতা জহ্নোঃ পূতা চরণনখনির্ণেজনজলম্।
প্রদানং বা যস্য ত্রিভুবনপতিত্বং বিভুরপি
নিদানং সোঽস্মাকং জয়তি কুলদেবো যদুপতিঃ॥

শিবসুন্দর ও কমলযোনি ব্রহ্মা যাঁহার কৃপাপাত্র, পূতা জাহ্নবী যাঁহার চরণনখনিঃসৃত সলিলধারা, ত্রিলোকাধিপত্য যাঁহার দান, বিভু হইয়াও যিনি বিশ্বের নিদানস্বরূপ, সেই আমাদের কুলদেবতা যদুপতি জয়যুক্ত হউন।

এই স্তুতির তুলনা কোথায় ? এই বিরাটের উপমা জগতে বিরল। তাই সেই 'গূঢ়ার্থ-দীপিকা'র টীকা-কার বঙ্গের সুসন্তান মনীষী মধুসূদন সরস্বতী আচার্য্যের "দশশ্লোকী"র টীকা সিদ্ধান্তবিন্দুতে আচার্য্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন :—

ন স্তৌমি তং ব্যাসমশেষমর্থং সমগ্রসূত্রৈরপি যো ববন্ধ।
বিনাপি সূত্রৈঃ সংগ্রথিতাখিলার্থং তং শঙ্করং নৌমি জগদ্‌গুরুং চ॥

যে বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেব সমগ্র সূত্রের দ্বারাও উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য সেই বরণীয় বস্তুর অর্থসংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, সেই নারায়ণাবতার মহর্ষি বাদরায়ণকে স্তুতি করি। আর যিনি সূত্রসমূহ ব্যতীতও সেই পরম আদরণীয় মহদ্বস্তুর সকল বিষয় সম্যক্‌রূপে গ্রথিত করিয়াছেন, সেই জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যকে প্রণাম করি।

শ্রীভুবনমোহন মিত্র

মরু-মায়া

না:, এ একঘেয়েমি কণিকার আর ভালো লাগে না।

সকাল বেলা উঠিতে প্রায়ই বেলা হইয়া যায়। দু'টা উনানে আগুন দিয়া সে স্নান সারিয়া আবার রান্নাঘরে আসে। স্নানের পূর্ব্বে বড় দু'টি ছেলে-মেয়ে দীপক ও পূরবী দু'জনকে পড়িতে বসাইয়া দেয়। একটা উনানে ডাল বসাইয়া দিয়া কোলের ছেলে কল্যাণকে দুধ খাওয়ায়। অন্য উনানে চা জল-খাবার তৈয়ারী করিয়া নিখিল ও ছেলেদের দেয়। এই তৈয়ারী করা ও দেওয়ার পালা তাহার চলে বেলা দশটা পর্য্যন্ত। প্রত্যহ একই রুটিন।

নিখিল আদালতে বাহির হইয়া যায়; দীপক আর পূরবী যায় স্কুলে। তার পর সমস্ত দিন বেলা চারিটা পর্য্যন্ত বাড়ীতে থাকে সে, কল্যাণ আর চাকর ভজুয়া। আর থাকে, সংসারের খুঁটিনাটি কাজ,—কাপড়গুলি গুছাইয়া রাখা, বিছানা পরিষ্কার করা, কোনও কিছু রৌদ্রে দেওয়া ইত্যাদি।

কিন্তু তবুও তাহার দুপুরটি যেন ফুরাইতে চায় না। অনেক বলাবলির পর নিখিল একটা লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বই আনিবার অভাবে তাহার একই অবস্থা! ভজুয়া চাকরটিকে সন্ধ্যা হইতেই নিখিল দখল করিয়া বসে: তখন আর তাহাকে পাইবার উপায় নাই। এক সেই শনিবার, সে দিন নিখিলের কাজ থাকে কম—কাজ তো কতই। কণিকা দেখিয়াছে, ভজুয়া বাহিরের রোয়াকে বসিয়া বসিয়া খৈনী টিপিতেছে আদেশের প্রতীক্ষায়। না হয় যখন কেহ ঘরে না রহিল, সে নিখিলের পা টিপিয়া দেয়। যতক্ষণ ভজুয়া বসিয়া থাকে, কণিকার চার বার বই আনা হয়। কিন্তু পাঠাইলে নিখিলের ডাক পড়িবে আর কণিকার বরাতে তিরস্কার। পুরস্কারের আশা নাই। তাই কণিকা শনিবারের প্রতীক্ষা করে। দুই-তিন দিন পাশের বাড়ীর মণিকে দিয়া বই আনাইয়াছিল। কিন্তু পরকে কি প্রত্যহ বলা যায়? ছেলেটি বৌদি' বলে—বড়ই ভালবাসে তাই বলিতে পারিয়াছিল।

বিকালটা উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সে রান্না শেষ করে। সন্ধ্যায় পূরবী ও দীপককে পড়াইতে হইবে। আর বিকালটা তাহার ভালো লাগে। সে ধীরে ধীরে ভিজা কাপড়খানি হাতে লইয়া আসে ছাদে। কাপড় প্রাচীরে মেলিয়া দেয়। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; আকাশের গায়ে রঙের ছোপটুকু তখনও অন্ধকারে ঢাকা পড়ে নাই—আকাশের পানে চাহিয়া কণিকার মনে পড়ে সেই গান—'যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যাও'।

কখনও হয়তো এক ঝাঁক পাখী ব্যস্ত ভাবে বাসায় ফিরিতেছে দেখিয়া সে আপন মনে গুন্-গুন্ করিয়া গাহিয়া ওঠে, "যখন বেলা-শেষের ছায়ায় পাখীরা যায় আপন কুলায়।" নীচে শুনা যায় নিখিলের কণ্ঠ, ওগো কোথায়? কণিকা পুলকে চঞ্চল হইয়া ওঠে। তাহার এই অবসর-ক্ষণটুকু নিখিলের সঙ্গে যাপন করিবে। সে সাড়া দিতে ভুলিয়া গাহিয়া যায়,—"দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে ভেবে রাখি মনে মনে, কর্ম্ম-অন্তে সন্ধ্যাবেলা বসিব তোমার সনে"। নিখিল তাহাকে ডাকিতেছে। তাহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা কি অন্তর্যামী জানিয়াছেন? কি বলিবে নিখিল? হয়তো বলিবে, এখানে বসে একটা গান করো না! অনেক দিন শুনিনি। কণিকা গাহিবে,—"কেন পরাণ হলো বাঁধন-হারা!"

এবার সিঁড়ির নীচেই নিখিলের কণ্ঠ শুনা যায়—"কণা!"

কণিকা নামিয়া আসিল।

নিখিল বলিল, "আমায় একটা রুমাল দাও তো, বড় ময়লা হয়েছে এটা।" ময়লা রুমালখানি সে বাহির করিয়া দিল। বলিল,—"আমি একটা কাজে যাচ্ছি। বিনয় বাবু আসবেন আটটার সময়, ভজুয়া যেন বসতে বলে। আমি আটটার মধ্যেই ফিরবো।"

কণিকা যন্ত্র-চালিতের মত নিখিলকে রুমাল বাহির করিয়া দিল ও কথা শুনিল।

বাহিরে যাইতে যাইতে নিখিল তাহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বুঝেছ?"

কণিকা ঘাড় হেলাইয়া জানাইল, বুঝিয়াছে।

কাজ, কাজ, কাজ! নিখিলের কাজ কি শুধু বাহিরেই আছে, অন্তরের কোন প্রয়োজন নাই? কণিকার বাহিরের সমস্ত প্রয়োজনই সে মিটাইয়া যায়; কিন্তু অন্তরের দাবী মিটানো ত দূরের কথা, দু'টি কথা শুনিবারও তাহার অবসর নাই। বাহিরে সকলেই জানে, কর্ত্তব্য-পরায়ণ উপার্জ্জনশীল স্বামী তাহার। অনেকে ঈর্ষাও করে, যেমন তাহার ননদ নীতি!

সত্যই সুখে আছে? না, না, ওগো তোমরা জানো না, কণিকা দীন, বড় দীন!

এই সময় দীপক ও পূরবী মা-মা করিয়া ছুটিয়া আসে। পূরবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, "মা, দাদা আমার চুল ধ'রে টেনেছে। এত চুল ছিঁড়ে গেছে।"

দীপক বলে, "ও আমার পা মাড়িয়ে দিলে কেন?"

বাতাস পাইলে যেমন পাতায়-লাগা শিশির ঝর্-ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়ে, তেমনি কণিকার চোখ দিয়া এক-রাশ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল, "তোমাদের নালিশ আর আমি শুনতে পারি না বাবা, আমার মরণ হলেই বাঁচি।"

উভয়ে মার মুখের পানে স্তম্ভিত কুণ্ঠিত ভাবে চাহিয়া থাকে।

কিন্তু নিখিল সত্যই এমন? কেন সে তো বাহিরে কাহারও প্রতি উদাসীন থাকে না। কেবল কণিকার বেলাতেই তাহার কাজের ব্যস্ততা বাড়িয়া যায়!

এই তো সে দিন আসিয়াছিল কণিকার ছোট বোন মণিকা, কথায় কথায় সে বলিল, "আচ্ছা নিখিলদা, দিদি কত দিন যায়নি বলুন তো। ও গম্ভীর ভাবে ছেলে-মেয়ের অজুহাত দেয়, আপনি পাঠিয়ে দিতে পারেন?"

"উঁহুঁ।"

"কেন?"

"তুমি বড় স্বার্থপর মণি—তোমার কলেজের এত সব সঙ্গী থাকতে আমার একটি কণাকেও টেনে নিতে চাও!"

মণিকা উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। "আপনি খুব ত্যাগী পুরুষ তো? ঐ এক কণা নিয়ে আর সবাইকে বর্জ্জন করেছেন।"

বিদ্রূপ ভরা সুরে কণিকা বলিল, "বর্জ্জন সকলকেই করেছেন; শুধু ওঁর মক্কেলমহল আর তাদের দিন-রাত্রির কাজ ছাড়া।"

কুণ্ঠিত স্বরে নিখিল বলিল, "দেখছো মণি, এটুকুও তোমার দিদি চায় না—কি করি বলো তো ?"

মণিকা আরও হাসিতে থাকে।

কণিকা সেখান হইতে চলিয়া আসে। তাহার বড় দুঃখ হয়, ভারী রাগ হয়।

সে-দিন—

একটা পাতলা মেঘের স্তর সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে ; বৃষ্টি হইবে না, বোধ হয়। এ-রকম দিনে বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে ভালো লাগে না। কণিকার মনে হয়, কোন সবুজের বাঁক দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া বেড়ায়। মনে পড়ে স্কুলের সেই ঘাস-ঢাকা মাঠটিকে। এমনই দিনে সুবিধা পাইলেই সে, গ না ও চিত্রা সেখানে বসিয়া গল্প করিত, গান করিত। উঠিতে ইচ্ছা হইত না। সেই নিরাড়ম্বর দিনগুলি কি মাধুর্য্যময়ই না ছিল !

সামনের একটা বাড়ীর ফটকের উপর একটা ফুলন্ত লতা—মৃদু বাতাসে তাহার পাতাগুলি নড়িতেছিল—ফুলগুলি দুলিতেছিল। সেই দিক পানে চাহিয়া কতকটা আত্মগত ভাবেই মৃদু স্বরে কণিকা গাহিয়া উঠিল,

"পথ দিয়ে কে যায় গো চলে ডাক দিয়ে সে যায়,
আমার ঘরে থাকাই দায়।"

"না গো তুমি কারও ডাকে সাড়া দিয়ো না।" নিখিল ঘরে আসিল—হাসিমাখা মুখ।

জানলা হইতে সরিয়া কণিকা এদিকে আসিল—মুখে ম্লান হাসি। মনে মনে বলিল, "আমি তো তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে উন্মুখ, কিন্তু কৈ তুমি তো ডাক দাও না।"

মণিব্যাগ হইতে কয়েকখানা নোট বাহির করিয়া নিখিল বলিল, "এই টাকাগুলো তুলে রেখে দাও তো। আজ সুপ্রসন্ন দিনে ! এ মামলাটাও জিতলুম।" নিখিলের মুখে তৃপ্তির হাসি। কণিকা আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা হইতে একটা চাবি বাছিয়া লইয়া আলমারী খুলিয়া টাকাগুলি রাখিয়া দিল। বুঝিল, নিখিলের আজিকার প্রসন্নতার কারণ অর্থাগম, আপনার সাফল্য।

নিখিল কত কথা বলিয়া যায়। বিমল বোস উকীলের জেরা, সৈয়দ আলি ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়, রমেশ পালিতের সওয়াল প্রভৃতি। এই ভাবে উপার্জ্জন করিতে পারিলে চার বৎসরের মধ্যে সে একখানা বাড়ী কিনিতে পারিবে ; তার পর তাহারা আরও ভালো ভাবে থাকিতে পারিবে। হঠাৎ সে এক সময় আপনার বক্তব্য থামাইয়া ফেলিল। কণিকা যে তাহার কথা শুনিতেছে না, অন্য কিছু ভাবিতেছে, তাহা সে বুঝিল।

"কণা—"

কণিকা নিখিলের পানে চাহিল। তাহার চোখ দেখিয়া মনে হইল, যেন কতকটা অশ্রুর প্রবাহ সে বহু আয়াসে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। কণিকা সুন্দরী নয়, কিন্তু তাহার মুখের সে লাবণ্যময় ভাবটুকু কোথায় গেল ? তাহার সে রহস্যময়ী প্রকৃতি অন্তর্হিত হইয়া মুখে পড়িয়াছে ম্লান ছায়া। ছাত্রী-জীবনে কণিকা কবিতা লিখিত। আজও লিখে কি না নিখিল জানে না, কিন্তু কল্যাণের জন্মের পূর্ব্বে অর্থাৎ দু' বৎসর পূর্ব্বে নিখিল তাহাকে লিখিতে দেখিয়াছে। কিন্তু কণিকার পূর্ব্বের সেই ভাব-প্রবণ প্রকৃতি আজও আছে। কণিকাকে দু' বৎসর পরে নিখিল যেন আজ প্রথম দেখিল।

তাহার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া নিখিল মমতাপূর্ণ স্বরে বলিল, "তুমি দিন-দিন এমন হ'য়ে যাচ্ছ কেন ?"

কত দিন পরে স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের স্পর্শ ! কণিকার অশ্রু আর বাধা মানিতে চায় না। তবুও সে মলিন-হাসি হাসিল। বলিল, "কি হয়ে যাচ্ছি ?"

"যেন বুড়ী হয়ে যাচ্ছ। দিন-রাত যেন ভগবানের ধ্যান করছ।"

কণিকার ইচ্ছা হইল বলে সে, তাহার এই অকাল-বার্দ্ধক্যের জন্য দায়ী কে ? কিন্তু সে নীরবে রহিল !

নিখিল বলিল, "আজ আমি ফ্রি আছি। বেড়াতে যাবে কণা ?"

কণিকা সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহার মন আজ ইহাই চাহিতেছে।

নিখিল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তুমি তৈরী থাকো, আমি একটু কমলের ওখান থেকে ঘুরে আসছি।"

কণিকা প্রস্তুত।

কল্যাণকে ভজুয়ার কাছে দিয়া তাহাকে রাখিতে বলিয়াছে। পূরবীকে বলিয়াছে, চুল যেন না নষ্ট হয়, রিবন যেন না খোলে। দীপককে বলিয়াছে, জামা-কাপড়ে ধুলা লাগাইলে তাহাকে লইয়া যাইবে না। নিজে একখানি ধূসর রঙের ঢাকাই পরিয়া নিখিলের প্রতীক্ষা করিতেছে।

নিখিল ভুলিয়া গেল না কি ? কণিকার দেরী সহে না। অথচ নিখিল আসিয়া যদি দেখে কণিকার দেরী আছে, সে বিরক্ত হইবে। কাজেই—

ঐ যে গলির মোড়ে নিখিলকে দেখা যাইতেছে।

বাহিরের রোয়াকে কল্যাণকে লইয়া ভজুয়া বসিয়া আছে, নিখিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেউ আমাকে খুঁজেছিল রে ?

ভজুয়া কি সব বলিল। কাগজের এক টুকরা হাতে দিল। কাগজটার উপর চোখ রাখিয়া নিখিল উপরে আসিল !

সামনে সজ্জিতা কণিকাকে দেখিয়া কিছুক্ষণ হতভম্বের মত তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

পাঞ্জাবীটা গায়ে পরিতে পরিতে অনুযোগের সুরে বলিল, Sorry কণা ! আজ আর যাওয়া হলো না। এই দেখ না, বিনয় বাবু এসে ইতিমধ্যে খবর দিয়ে গেছেন, একটা কন্‌শাল্‌টেসনে যেতে হবে।"

নিখিল চলিয়া গেল। দীপক ও পূরবী আসিয়া বলিল, "মা, বাবা চলে গেল কেন ? আমরা কি যাবো না ?"

"না।"

মা'র গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহারা দু'জনে দু'দিকে সরিয়া গেল।

কণিকা স্তব্ধ কঠিন ভাবে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে আয়নায় আপনার ছায়া দেখিয়া উঠিল। কাপড় ছাড়িতে হইবে। মরীচিকা মিলাইয়া গিয়াছে। আর কেন ? বহুক্ষণের সঞ্চিত একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া আসে।

শ্রীইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়

কাচের জান

ভবিষ্যতে ইট-কাঠ-লোহা-ইস্পাতের বদলে ঘর-বাড়ী নির্ম্মিত হইবে শুধু কাচ দিয়া—বৈজ্ঞানিকের এ বাণী অলীক বা রূপ-কথা নয়!

কাচের টেবিলে লম্ফ-ঝম্প

বিজ্ঞানের বলে মানুষ কাচকে আজ কতখানি কঠিন কঠোর অভঙ্গুর করিয়া তুলিয়াছে, তার পরিচয় পাইবেন উপরের ঐ ছবিতে! টেবিলের মাথায় কাচ বসাইয়া তার উপর ভদ্রলোক কি জোরে পা ঠুকিয়া না লাফ দিতেছেন! এত লাফেও কাচের বুক অটুট—
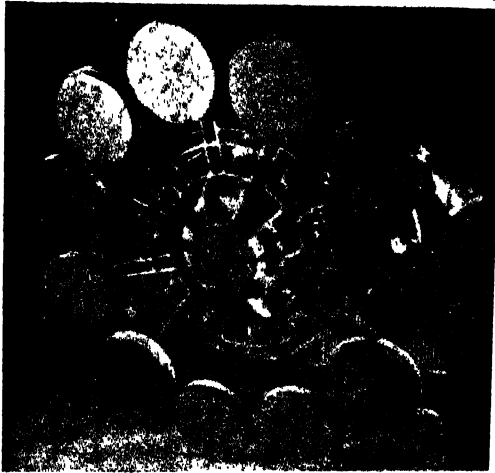
পালিশ-যন্ত্র

অকম্পিত! এ-কাচ এখন লাগানো হইতেছে মোটর গাড়ীর উইণ্ড-স্ক্রীণে। বিশেষ যন্ত্র-সাহায্যে পালিশ করিয়া কাচের জানকে এমন অভঙ্গুর করিয়া তোলা হইতেছে। ফোর্ডের কারখানায় পালিশের যে-যন্ত্র ব্যবহার করা হইতেছে, তার ছবি উপরে দেখুন।

মানুষের বদলে যন্ত্র

আমেরিকার মানুষ-জন—কেহ আজ লড়াইয়ে বাহির হইয়াছে, কেহ বা লড়াইয়ের কাজে ব্যস্ত,—অথচ চাষ-বাসের কাজে ঢিলা দেওয়া চলে না! উপায়? বিজ্ঞানবিদের বিদ্যাবুদ্ধিতে ফশল-কাটা যন্ত্র-সমেত অতিকায় ট্রাক্টর তৈয়ারী হইতেছে। এ ট্রাক্টরে কাজ করিতে আট-জন মাত্র লোকের প্রয়োজন! ট্রাক্টরের আগে-আগে এক জন লোক মাটির বুকের ফশল কাটিয়া যায়—তার পর বাকী লোকের মধ্যে

যন্ত্র-মানব

দু'জন ট্রাক্টর চালায়; এবং দু'জন ট্রাক্টরে বসিয়া কাটা-ফশল গাড়ীতে বোঝাই করে—বোঝাই হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর দু'জন লোক ট্রাক্টরের ভিতরকার ভাণ্ডারে ফেলিয়া তাহা জমা করে। এক-হাজার একর-পরিমিত ভূমির ফশল এ ট্রাক্টরের সাহায্যে ছ'ঘণ্টায় কাটা ও তোলা যায়; এবং পাঁচ জন লোক যে-ফশল ভাণ্ডার-জাত করে, বিনা-ট্রাক্টরে সে-কাজ করিতে পূর্ব্বে পঞ্চাশ জন লোকের প্রয়োজন হইত এবং তাহাতে সময় লাগিত তিন-চার দিন।

টানেলের বন্ধু

আমেরিকার বহু স্থানে পাহাড় কাটিয়া টানেল-পথ তৈয়ারী হইয়াছে—এক-একটি টানেল বেশ দীর্ঘ। এই টানেল-পথে দু'-সারে মোটর-কার
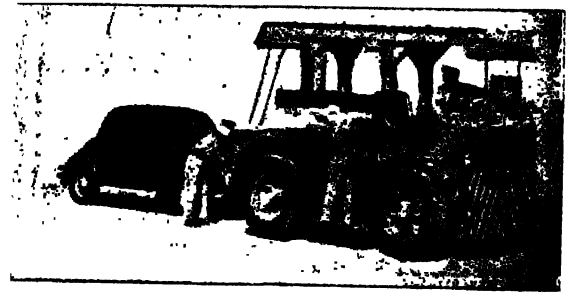
টানেল-ট্রাক্

ও লরি নিত্য যাতায়াত করিতেছে। সুদীর্ঘ টানেলের মধ্যে দৈবাৎ কল-কব্জা বিগড়াইয়া বা অন্য কারণে যদি কোনো গাড়ী অচল হয়,

তাহা হইলে সে-গাড়ীকে উদ্ধার করিয়া আনা এত কাল ছিল খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুইজার্ল্যাণ্ডের যন্ত্র-শিল্পীরা এ অসুবিধা-মোচনের জন্য অচল গাড়ীকে সচল করার উদ্দেশ্যে বিপত্তি-মধুসূদন-রূপী ট্রাক্টর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। টানেলের সম্মুখে-পিছনে দু'-চারিখানি করিয়া ট্রাক্টর রাখা হয়—টেলিফোনযোগে গাড়ীর বিপত্তির সংবাদ পাইবামাত্র এ-ট্রাক্টর নিমেষে ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত হয় এবং টানেলের মধ্যে গাড়ীর যত বড় দুর্গতিই ঘটুক না কেন, সে-গাড়ীকে টানিয়া পাঁচ-সাত মিনিটে বাহিরে আনিতে পারে। ট্রাক্টরে অগ্নি-নিবারক সরঞ্জাম-পত্রের অভাব নাই—কাজেই টানেলের মধ্যে সকল বিপদেই এখন পরিত্রাণ-লাভের আশা ঘটিয়াছে।
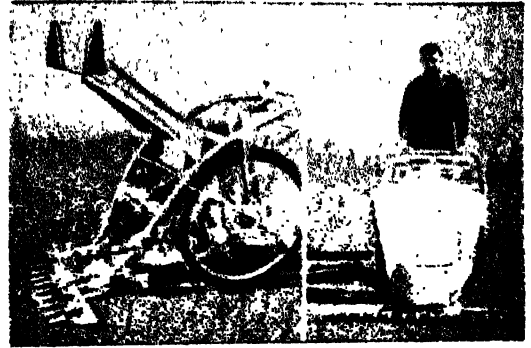
কাস্তে যন্ত্র

পক্ষাঘাতে প্রতিকার

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, পক্ষাঘাত-গ্রস্তকে দিয়া যদি খানিকটা ব্যায়াম করানো যায়, তাহা হইলে তার জড়ত্ব ঘুচিবার আশা আছে। এ উদ্দেশ্যে নানা আকারের পাইপ জুড়িয়া—তার সঙ্গে বাইকের চেন, স্প্রকেট, হাতল এবং পায়ের প্যাডল্ সংলগ্ন করিয়া বিশেষ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। আসনে বসাইয়া রোগীকে দিয়া হাতল দু'টি ধরানো চাই; আর চাই তার পা দু'টিকে প্যাডেলে রাখা। পা দিয়া শুধু প্যাড্‌ল্ চালাইবে। বাস্! এ ব্যবস্থায় আমেরিকার কয়েক জন আবাল্য পক্ষাঘাতগ্রস্তের পেশী সচল হইয়াছে এবং রোগও অনেকখানি আরোগ্যের পথে।
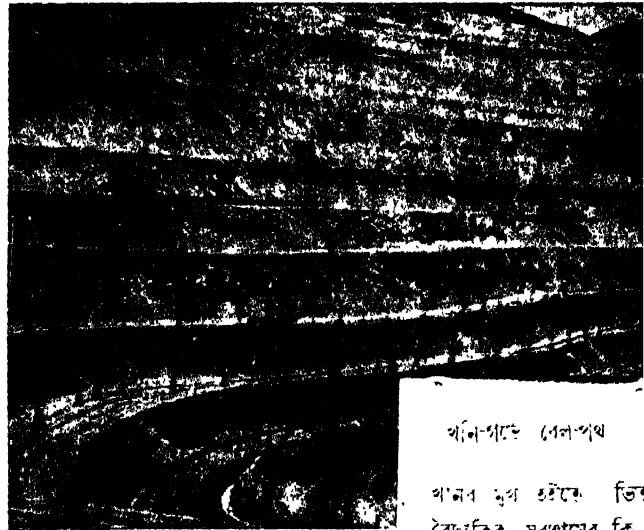
পক্ষাঘাতের প্রতিকার যন্ত্র

রসাতলে রেল

আমেরিকার সবচেয়ে বড় এবং সমৃদ্ধ তামার খনি আছে সল্ট লেক সিটির দক্ষিণে বিংহাম ক্যানিয়ন অঞ্চলে। খনিটি ১৭০০ ফুট গভীর। খনিগর্ভ হইতে দিনে তামা তোলা হইতেছে দেড়-লক্ষ টন!

খনি-গর্ভে রেল-পথ

খনির মুখ হইতে ভিতর পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের কি সমারোহ! যন্ত্রে সব কাজ হয়; মানুষ শুধু যন্ত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে! খনির মুখ হইতে অভ্যন্তর-প্রদেশ পর্য্যন্ত সরীসৃপের ভঙ্গীতে তৈয়ারী আছে রেল-পথ; সে-পথ সর্ব্বক্ষণ বিজলী-আলোক-মালায় আলোকিত। উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত এই ঘোরানো রেল-পথের দৈর্ঘ্য

খনির মধ্যে পুল

ফশল কাটি

ধান্যাদি ফশল কাটিবার জন্য আমেরিকার রকভেলনিবাসী যন্ত্র-শিল্পী টমাশ লীন বেশ হাল্‌কা ও স্বচ্ছন্দগামী ফশল-কাটা যন্ত্র বা মোয়ার তৈয়ারী করিয়াছেন। যন্ত্রটি চলে পেট্রোল-এঞ্জিনে। এঞ্জিনের শক্তি দেড়টি ঘোড়ার শক্তির সমান। যন্ত্রটির সামনে আছে ফশল-কাটা কাস্তে—দু'টি ক্লাচ্। কাস্তের মাপ ৩৬ ইঞ্চি। মোয়ারের সঙ্গে লাগানো আছে তিন-অ মাপের পাইপে একখানি মাত্র বাইকের চাকা।

একশো মাইলের উপর। পথে আসা-যাওয়া করার জন্য দু'প্রস্থ লাইন আছে। সে-লাইনে তামার গাড়ী গতায়াত করিতেছে প্রায় সারাক্ষণ। পূর্ত্ত-শিল্পের দিক্ দিয়া এ-খনির কার্য্য-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য তুলনাহীন।

শয্যা-বাতি

রাত্রে শয়ন-কক্ষে ব্যবহারের জন্য এক রকম বাতি তৈয়ারী হইয়াছে—এ বাতি আপনা হইতে জ্বলে। এটি বিজলী বাতি। এ বাতির সুইচ থাকে খাটের স্প্রিং এবং গদির মধ্যে যে-জায়গা, সেইখানে। শয্যায় শয়ন করিলে শায়িত ব্যক্তির দেহের চাপে সুইচ বন্ধ হয় আর সঙ্গে

শয্যা-বাতি

সঙ্গে বাতি নিবিয়া যায়। শয্যায় চড়িয়া বসিবামাত্র সুইচের সংযোগ হয় এবং তার ফলে আপনা হইতে বাতি জ্বলিয়া ওঠে! দিনের বেলায় সুইচের সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখিতে হয়, বাতিও তখন নিবিয়া থাকে।

গাছ চালা

এমন অনেক গাছ আছে—বীজ হইতে চারা জন্মিয়া সে-চারা একটু মাথা চাড়া দিলে—সে-গাছকে টব হইতে তুলিয়া মাটিতে লাগাইতে হয়। একটি ব্যবস্থায় এ-কাজ সহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে। বড় টিনের কানা-উঁচু বড় একটি পাত্র নিন—পাত্রটিতে ভরুন ভালো সার মাটী দু'-ইঞ্চিটাক উঁচু করিয়া। তার পর নিন কটা সিগারেটের খালি টিন। ঐ টিনগুলির ডালা ও তলা খুলিয়া লইতে হইবে। এ-টিনগুলিতে সারালো মাটী ভরুন। এবার ঐ বড় টিনের উপরে রাখুন এই টিন-গুলি। সিগারেট-টিনগুলির মধ্যে ফেলুন গাছের বীজ। নিয়মিত জল দিতে হইবে। জল দিবেন ঐ বড় টিনের মাটিতে। যে-সব টিনে বীজ দিয়াছেন, সে টিনগুলির মধ্যে কখনো জল ঢালিবেন না। তার পর চারা বাহির হইয়া সে-চারা খানিকটা বাড়িলে সেখান হইতে তুলিয়া যদি বিস্তীর্ণ জমিতে পুঁতিতে চান তো পূর্ব্বে দু'-এক দিন ঐ টিনসমেত চারাগুলিকে বাহিরের আলো-বাতাসে রাখুন। চড়া রৌদ্র না লাগে—সাবধান! দু'-এক দিন এমনি রাখিলে চারাগুলির আলো-বাতাস সহিবার সামর্থ্য হইবে। এবার টিনগুলির মধ্যকার মাটীকে একটু আর্দ্র করুন—তার পর বড় টিন হইতে

টিনে গাছ

এক-একটি টিন তুলিয়া নির্ব্বাচিত জমি খুঁড়িয়া সেইখানে টিন হইতে খশাইয়া চারা বসাইয়া মাটী দিন। ইহাতে শিকড়ের অনিষ্ট ঘটিবে না—গাছগুলি হইবে সতেজ প্রাণবন্ত।

মোটর-বাইকে দৌড়-প্রতিযোগিতা

কালিফোর্ণিয়ার চেকার্সফীল্ড সহরের বিখ্যাত বাইক-চালক আলফ্রেড লাটুর্ণার রেশার-মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাইক চালাইয়াছিলেন—ঘণ্টায় ১০১ মাইল রেটে। এমন কীর্ত্তি পূর্ব্বে কেহ আর বাইক
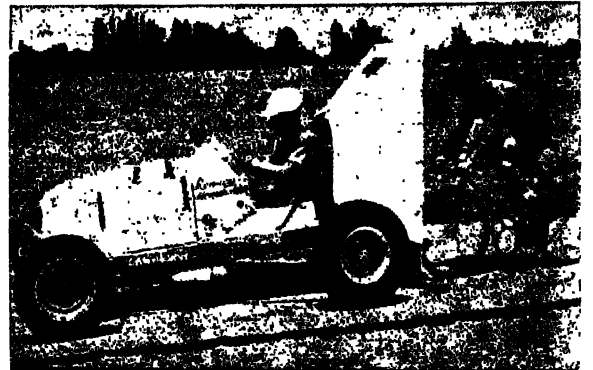
বাইক-দৌড়

চালাইয়া দেখাইতে পারেন নাই! রেশার-কারের পিছু-পিছু ভদ্রলোক বাইক চালাইয়া গিয়াছিলেন। বাতাসের বেগ বাঁচাইতে রেশার-কারের পিছনে প্রকাণ্ড আবরণ খাড়া করা হইয়াছিল। সে জন্য আলফ্রেড সাহেবকে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে হয় নাই। বাইকটির গড়নে বৈশিষ্ট্য শুধু এই যে, তার স্প্রকেটটি আকারে ন'গুণ বড়।

বিনা-খুঁটীতে তাঁবু

মোটা এবং বড় বড় বহু খুঁটা নহিলে বড় তাঁবু খাটানোর বাসনা চির-কাল কল্পনাতেই থাকিয়া যাইত! কিন্তু বিজ্ঞান-শিল্পীদের

বিনা-খুঁটীর তাঁবু

অধ্যবসায়ের ফলে আজ এমন ব্যবস্থা হইয়াছে যে, বিনা-খুঁটিতে সার্কাশের বড় বড় তাঁবুও অনায়াসে খাড়া করা চলে। সে ব্যবস্থা কি, জানেন? কচি কচি ছেলে-মেয়েদের মশা-মাছির পীড়ন হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য আমরা যেমন শিক-বাঁধানো ছোট মশারির 'ঢাকার' মধ্যে শিশুদের শোয়াই, তেমনি রীতিতে বাঁকানো-সাইজের অতিকায় শিকে গাঁথিয়া তাঁবু খাড়া করা হইতেছে! এ তাঁবুর শিকগুলি ভাঁজে-ভাঁজে পাট করিয়া গুটাইয়া রাখিতে বল বেশী মেহনৎ বা সময় যেমন লাগে না, তেমনি শিক-সমেত গুটানো তাঁবু সহজে বাঁধা ও বহা চলে।

—

বিপক্ষের পক্ষ-পোত

বৃটিশ এবং আমেরিকান সমর-বিভাগের প্রচেষ্টার ফলে বিপক্ষ-পক্ষ যে চট্ করিয়া পক্ষপোত চালাইয়া আসিয়া হানা দিবে, সে সম্ভাবনা আজ অনেকখানি তিরোহিত হইয়াছে। বৃটেন এবং আমেরিকার সমুদ্রোপকূলে বহু রেডিয়ো-মঞ্চ গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এ-সব মঞ্চ হইতে অহর্নিশ আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বহু দূর আকাশকে অবিচ্ছিন্ন আলোর ধারায় প্রদীপ্ত রাখা হয়। মঞ্চগুলি ২৪০ ফুট দীর্ঘ—উপকূল প্রদেশে সার-সার এ মঞ্চ বসানো আছে। বাতি ছাড়া এ মঞ্চে বিবিধ সূক্ষ্ম-যন্ত্রাদি সংলগ্ন আছে। পাঁচশো মাইল দূরে আকাশের গায়ে বিমানপোত উড়িলে বাতির আলোয় তাহা দেখা যাইবে : তার উপর সে বিমানপোতের চলন-ধ্বনি নিমেষে উপকূল প্রদেশের বেতার ষ্টেশনে ঝঙ্কার তুলিবে। যন্ত্রাদির পাহারা-পদ্ধতি মহ-অফিসার ভিন্ন আর কাহারো জানিবার উপায় নাই—সে কৌশলের বিবরণ-প্রকাশ নিষিদ্ধ। এ সকল কারণে বিপক্ষ-পক্ষের পক্ষ-পোতের গতি আর তেমন নিরঙ্কুশ নয়।

রেডিয়ো-মঞ্চ

জামার বোতাম কাটা

জামার আঁটা বোতাম যদি কাটিয়া তুলিয়া ফেলিতে চান, তবে এক কাজ করুন! বোতামটির নীচে বড় চিরুণীর বড় দাড়া চালাইয়া দিন—জামার গায়ে বড় চিরুণী লাগিয়া থাকিবে তো—এবার একখানি ক্ষুরের ব্লেড চালাইয়া বোতামের সূতা কাটিয়া ফেলুন। বড় চিরুণীর আড়াল থাকার জন্য জামার গায়ে ব্লেডের ঘা লাগিবে না; জামা অক্ষত থাকিবে।

বোতাম কাটা

—

অহিংস
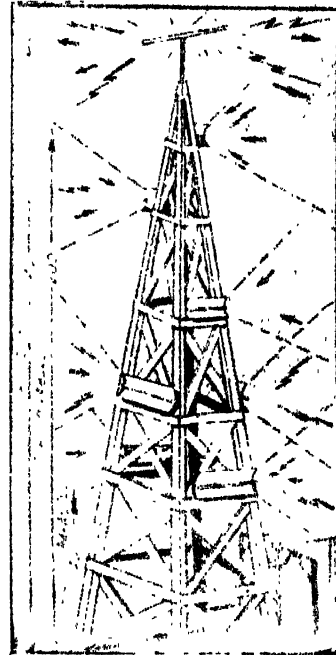
অহিংসা পরম ধর্ম—এই মহাবাণীর প্রচার
যে করিল বিশ্বমাঝে, তারি শিষ্য হাজার হাজার;
জলে-স্থলে-ব্যোমে আজি যন্ত্র-দানবের তীক্ষ্ণ নখে
বিদারিছে মানবের হৃৎপিণ্ড জঘন্য পুলকে—
নর-নারী সবাকার শিশু-যুবা-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে;
রক্তের প্রবাহ বহে অথৈ অতল শত দেশে।
শরাঘাতে জর্জ্জরিত ক্ষুদ্র এক রাজহংস হেরি'
যে প্রাণ কাঁদিয়াছিল, আজিকার সারা বিশ্ব ঘেরি'
হত্যার তাণ্ডবলীলা প্রবিরাট হেরি' সেই প্রাণ
কি করিবে, জানে তাহা আর জানে ঊর্দ্ধে ভগবান!
বিস্ময়ের কথা আরো, শুনিয়াছি তাহারা সকলে
বুদ্ধের মন্দিরে গিয়া প্রার্থনা জানায় দলে দলে—
'হে প্রভু মঙ্গল করো আমাদের দিগ্বিজয় রণে'
সে প্রার্থনা শুনি বুদ্ধ কি করেন,—তাই ভাবি মনে!

মোহম্মদ নওলকিশোর বোগরাবী

১৩৫০-১৩৫১ ঃ অর্থনৈতিক সঙ্কট ও সমস্যা

বাঙ্গালা ১৩৫০ সাল মহাকালের তিমির-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এরূপ নিদারুণ দুর্বৎসর ভারতের—বিশেষতঃ বাঙ্গালার ভাগ্যে ঘটে নাই। দেশব্যাপী অন্নাভাব, হাহাকার, মহামারী, দস্যুভয়, বন্যা, ঝটিকা, ভূমিকম্প প্রভৃতি আধি-ব্যাধিতে দেশ বিপর্যস্ত হইয়াছে। বহু লোক কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারা অনশনে অর্দ্ধাহারে কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট—গৃহহীন আত্মীয়-স্বজন-বিহীন এবং জীবনযাত্রা, নির্ব্বাহের সর্ব্বপ্রকার উপায়-উপকরণ-বিচ্যুত। দ্রব্যাদির মহার্ঘতা চরমে পৌঁছিয়াছে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণে দেশের কিয়দংশ রাহুগ্রস্ত। অভাব-অনটনের নিত্য পীড়নে সুখ নাই, শান্তি নাই, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নাই। ইহাই ১৩৫০ সালের মাত্র মসীলিপ্ত নহে—রক্তরঞ্জিত ইতিহাস! বস্তুতঃ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আলোচ্য দ্বাদশ মাস প্রচণ্ড বিপ্লবের যুগ।

বহিঃশত্রুর দ্রুত আক্রমণ এবং অগ্রগতি ভারতবাসীর মনে বিষম আতঙ্কের ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। শত্রুর প্রতিরোধকল্পে দ্রুত এবং দৃঢ় ভাবে সংরক্ষণ-উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এই সকল উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগ হেতু অপরিসীম অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় এবং জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিকে সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতে হয়। প্রবল বাত্যা, বন্যা এবং পুঞ্জ পুঞ্জ পঙ্গপাল বিপুল ধ্বংসের সৃষ্টি করে। ফলে, ভবিষ্যৎ ভয় ও ভাবনার তাগিদে মাল বাঁধাই (Hoarding), দৈবাবাণিজ্য (Speculation) এবং অতিরিক্ত মুনাফা-গৃধ্নুতা (Profiteering) এরূপ প্রচণ্ড ও ব্যাপক ভাবে প্রবর্ত্তিত হয় যে, এই সকল অনাচার ও অত্যাচার দমন করিবার শক্তি প্রচলিত শাসনযন্ত্রের সামর্থ্যের বহির্ভূত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ, এমন একটি সমস্যা-সঙ্কুল পরিস্থিতির উৎপত্তি ঘটে যে, কোন প্রকারে ইহাদের কুফল প্রতিরোধ করা যাইবে সে আশাও প্রায় নির্মূল হইয়াছিল। তখন তৎকালীন অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের জটিলতা ও কুটিলতা বহিঃশত্রুর আক্রমণ-সঙ্কট হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না! যদিও ইহাদিগকে কিয়দংশে দমন করা হইয়াছে, তথাপি তাহাদের পীড়নের দুঃখ-কষ্ট যুদ্ধের ধ্বংসের তুলনায় কোন প্রকারে লঘু নহে। দরিদ্রের পক্ষে দুর্ব্বিষহ।

কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও এই সকল অনাচার ও অত্যাচার বিদূরিত হয় নাই এবং ইহাদের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক শ্যেনদৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। ইহাদের উচ্ছেদ সাধনার্থ সরকার দুইটি নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথম খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ এবং বণ্টন ব্যবস্থা (Procurement and distrivution) ও দ্রব্য-মূল্য শাসন (Price control); এবং দ্বিতীয় যুদ্ধ-শিল্পে ও যুদ্ধোপকরণ-সরবরাহে অর্জ্জিত প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত অর্থকে নিষ্ক্রিয় করিয়া স্বল্প-পরিমিত দ্রব্য-সামগ্রীর অযথা মূল্য-বৃদ্ধি নিবারণ (Immobilisation of surplus war profits)। এই উভয় বিধিই মুদ্রা ও মূল্যস্ফীতি নিবারণ (Anti-inflationary measures) প্রচেষ্টার অন্তর্ভূত। এই মুদ্রা ও মূল্যস্ফীতি এবং তৎসহচর নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ১৩৫০ সালের দুঃখ-দুর্দ্দশার এবং অনশন-মৃত্যুর প্রবল ও প্রচণ্ড "নিমিত্ত।"

দরিদ্রের দেশ হইলেও ভারত রত্নপ্রসূ। ভারতের বনজ, খনিজ, কৃষিজ এবং শিল্পজ সম্পদ্ প্রচুর। সেই সম্পদের সদ্ব্যবহার করিয়া বহু জাতি ভারতে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছে ও করিতেছে; কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতবাসী নিঃস্ব, দুঃস্থ ও দরিদ্র। যুদ্ধ-ঘোষণার প্রারম্ভ হইতে বৃটিশ শাসনশক্তি ও মিত্রশক্তিগুলি ভারত হইতে বহুবিধ যুদ্ধোপকরণ দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করিতেছেন। ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য বৃটিশ-মুদ্রা ষ্টার্লিংএ প্রদত্ত হইয়া আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডে সঞ্চিত হইতেছে। ভারত সরকার ঐ ষ্টার্লিং-সংস্থিতির বিনিময়ে ভারতে অজস্র কাগজের নোট ছাপিয়া যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারীদের প্রাপ্য মূল্য যোগাইতেছে। ফলে, আমাদের দেশে নোটের প্রচলন দ্রুত এবং অসঙ্গতরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। পক্ষান্তরে, যুদ্ধ-শিল্পের প্রসার এবং ক্রমান্বয়ে অধিকতর পরিমাণে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য ও আহার্য্য দ্রব্যের সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজনের ফলে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন ও যোগান হ্রাস পাইয়াছে। ফলে, স্বল্প-পরিমিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর পরিমাণ হ্রাস এবং যুদ্ধসংক্রান্ত শিল্পকারবারে লাভবান ব্যক্তিবর্গের আয়-বৃদ্ধি হেতু হাটে-বাজারে অল্প-স্বল্প জিনিষের নিমিত্ত বহু পরিমিত অর্থের আমদানী হওয়াতে দ্রব্য-মূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।' যুদ্ধসম্পর্কীয় কারবারে অর্জ্জিত বহুল পরিমাণ অর্থের সামান্য সংখ্যক অধিকারী অতিরিক্ত মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করাতে দরিদ্রের মুখের গ্রাস ধনীর কবলিত হইতেছিল। অর্দ্ধাহারে, অনাহারে জীর্ণ-শীর্ণ লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গৃহস্থ হাল-গরু, জমি-জমা, তৈজসপত্র, গৃহাদি বিক্রয় করিয়া সর্ব্বহারা হইয়া পল্লীগ্রামের পথে-ঘাটে এবং সহরের ও নগরের রাজপথে নীরবে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিল। দুই শত বৎসর পূর্ব্বের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে এরূপ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বাঙ্গালায় কিংবা ভারতের অন্য কোন প্রদেশে দেখা যায় নাই।

যুদ্ধের ব্যয়-বৃদ্ধি হেতু অর্থ-বৃদ্ধি প্রয়োজন। অন্যান্য দেশে যুদ্ধজনিত লাভের উপর কর ধার্য্য করিয়া, জনসাধারণের উপর নিদ্ধারিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করিয়া এবং বহুল পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ-ব্যয় নির্ব্বাহ করা হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের যাহাতে অভাব-অনটন না ঘটে এবং অর্থ-বৃদ্ধির ফলে অযথা মুদ্রা এবং মূল্যস্ফীতি (Inflation of money and prices) না ঘটে, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। অন্যান্য দেশে যে অর্থ বৃদ্ধি করা হয় তাহার পশ্চাতে স্বর্ণ-রৌপ্যের নির্ভরযোগ্য সংস্থিতি রক্ষিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে অর্থবৃদ্ধি করা হইতেছে কাগজের নোট ছাপিয়া; ইহার পৃষ্ঠপোষক সংস্থিতি ষ্টার্লিং মাত্র। এই ষ্টার্লিং আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রামণ্ডলে মূল্য-মানে স্থিতিশীল নহে। স্বর্ণ-রৌপ্যের একটি আন্তর্জ্জাতিক মূল্য-মান আছে; কিন্তু ষ্টার্লিং অন্যান্য দেশের প্রচলিত মুদ্রার ন্যায় স্বর্ণ অথবা রৌপ্য-মানে দৃঢ়-নিবদ্ধ নহে। গ্রেট বৃটেন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে স্বর্ণ-মান পরিত্যাগ করিয়াছে। ফলে, আমাদের রৌপ্য-মুদ্রাও এখন স্বর্ণ-মানে নিবদ্ধ নহে; ষ্টার্লিংএর সহিত সংযুক্ত। ষ্টার্লিংএর উত্থান-পতনের সহিত আমাদের প্রচলিত মুদ্রাপ্রকরণের উত্থান-পতন অনিবার্য্য। সুতরাং আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতির দৃঢ়তা অনিশ্চিত।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে আগষ্ট মাসে, আমাদের কারেন্সি (প্রচলিত)-নোটের পরিমাণ ছিল ২১৬·৭৮ কোটি টাকা এবং ষ্টার্লিং-সংস্থিতির পরিমাণ ছিল ৫৯·৫০ কোটি টাকা। যুদ্ধের কয়েক বৎসরে এই একুন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গত মার্চ্চ মাসের শেষে দাঁড়াইয়াছিল, যথাক্রমে ৮৯৪·০১ কোটি এবং ৭৭৯·৮৩ কোটি টাকায়। যুদ্ধের কয়েক বৎসরে কারেন্সি নোট ও ষ্টার্লিং দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত দুই বৎসরের বৃদ্ধি এইরূপ,—

১৯৪২	একুন নোট	বাজার চলতি	ষ্টার্লিং সম্বল	টাকার সম্বল
	(ক্রোর)	(ক্রোর)	(ক্রোর)	(ক্রোর)
জানুঃ ২	৩৩৫·০৪	৩২১·৩৯	২৩৭·৬৩	৪১·[illegible]
ডিসেঃ ২৫	৫৮৫·৪০	৫৭০·৩৬	৪০৪·৮৩	১২২·৫৪
	+২৫০·৭৬	+২৪৯·২৭	+১৬৭·২	+৮০·৮০
১৯৪৩				
জানুঃ ২	৫৮৯·৭৭	৫৭৮·২৭	৪১২·৮০	১২২·০৬
ডিসেঃ ৩১	৮৬০·৪০	৮৫১·৮০	৭৩৪·৮৪	৫৮·২০
	+২৭০·৬৩	+২৭৩·৫৫	+৩২২·[illegible]	—৬৪·[illegible]

উপরে উদ্‌ধৃত অঙ্ক হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত নোটের বৃদ্ধি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের বৃদ্ধি অপেক্ষা অধিকতর হইয়াছিল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের বৃদ্ধি ছিল কিছু সাময়িক খৎ (Ad hoc securities) এবং কিছু ষ্টার্লিং সঞ্চয়ের (Sterling securities) অবলম্বনে ; কিন্তু ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের বৃদ্ধি ছিল সম্পূর্ণরূপে ষ্টার্লিং সঞ্চয়ের নির্ভরতায়। ১৯৪২ এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু (Issue) এবং ব্যাঙ্কিং (Banking) উভয় বিভাগের মোট ষ্টার্লিং প্রাপ্তি (Receipts) ছিল এইরূপ :—

১৯৪২	ষ্টার্লিং প্রাপ্তি	১৯৪৩	ষ্টার্লিং প্রাপ্তি
	(ক্রোর)		(ক্রোর)
জানুঃ ২	২৮৮·২২	জানুঃ ২	৪৭৯·৪৪
ডিসেঃ ২৫	৪৭৫·৮১	ডিসেঃ ৩১	৮৫৫·৪৪
	+১৮৭·৫৯		+৩৭৬·০০

এই দুই বৎসরের ষ্টার্লিং ঋণ প্রভূত পরিমাণে পরিশোধিত হইয়াছিল, সুতরাং আমাদের ষ্টার্লিং প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল ৬৫০ হইতে ৭০০ কোটি টাকা পরিমিত। গত মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে, অর্থাৎ সরকারী আর্থিক বৎসর ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের শেষে প্রচলিত নোট, ষ্টার্লিং সঞ্চয় এবং টাকার খৎ (Rupee securities) দাঁড়াইয়াছিল এইরূপ :—

১৯৪৪	একুন নোট	বাজার চলতি	ষ্টার্লিং সম্বল	টাকার সম্বল
	(ক্রোর)	(ক্রোর)	(ক্রোর)	(ক্রোর)
মার্চ্চ ৩১	৮৯৪·৮৪	৮৮২·৪৮	৭৭৯·৮৪	৫৮·৫২

অতএব দেখা যাইতেছে, যুদ্ধের কয়েক বৎসরে সহজ ক্লেশে অর্জিত আমাদের আর্থিক সংস্থানের ভিত্তি ষ্টার্লিং। স্বর্ণ-রৌপ্যের তুলনায় সর্ব্বদেশের প্রচলিত মুদ্রার মূল্য স্বর্ণ অথবা রৌপ্য-মানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না হইলে সতত পরিবর্ত্তনশীল হয়। ডলার বিনিময়-হারের উপর ষ্টার্লিং এখন নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্তরাজ্যের মৈত্রী ইহার ভিত্তি। কোন কারণে এই মৈত্রী শিথিল হইলে ষ্টার্লিং-এর মূল্য অধোমুখী হওয়া অনিবার্য্য। সুতরাং আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থ-সংস্থান সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে।

যুদ্ধান্তে যুদ্ধোত্তর সংগঠন-সমুন্নয়নের নিমিত্ত আমাদের বহু যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, সাজ-সরঞ্জাম এবং উপাদান উপকরণ কিনিতে হইবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির নিমিত্ত আমরা যে ঐ সকল দ্রব্য কেবল যুক্তরাজ্য হইতে কিনিব, তাহা সম্ভব নহে। কারণ, যুদ্ধান্তে যুদ্ধের ক্ষয় ও ক্ষতির ফলে যুক্তরাজ্যের পক্ষে আমাদের প্রয়োজনীয় সর্ব্বাবিধ দ্রব্য-সামগ্রী সরবরাহ করা কখনও সম্ভব নহে। সকলেই দ্রব্য মাত্রেরই উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে যে দেশে যে-যে দ্রব্য সুলভ, সেই-সেই দেশ হইতে সেই-সেই দ্রব্য কিনিতে উৎসুক। এই নিমিত্ত আমাদের দেশ-বহির্ভূত অর্থ-সংস্থান (External finance) কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দেশ-বিশেষে নিবদ্ধ থাকা সমীচীন নহে। বর্ত্তমানে নানা কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আমাদের আদান-প্রদান ও কাজ-কারবার বৃদ্ধি পাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন শক্তি এখন যেমন অক্ষুণ্ণ আছে, যুদ্ধান্তেও তদ্রূপ থাকিবে, আশা করা যায়। সুতরাং যুদ্ধান্তে যুদ্ধোত্তর সংগঠনের নিমিত্ত আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যুক্তরাজ্য অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রেই অধিকতর পরিমাণে এবং অনায়াসে প্রাপ্তব্য হইবে। এই হেতু আমরা বহু দিন হইতে ষ্টার্লিং-সংস্থিতির ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রে একটি ডলার-সংস্থিতি গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত সরকারের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন নিবেদন জানাইয়াছি। সরকার কিন্তু এ বিষয়ে এত দিন কর্ণপাত করেন নাই। অধিকন্তু, যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে আমাদের প্রাপ্য ডলার ষ্টার্লিং-এ রূপান্তরিত হইয়া ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডে জমা হইতেছে ; অর্থাৎ আমরা আমাদের ডলার সংস্থানের সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছি এবং যুক্তরাজ্য সে সুবিধা উপভোগ করিতেছে। ভারতের প্রবল জনমতের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বৃটিশ সরকার ভারত সরকারের তরফ হইতে একটি ডলার-ভাণ্ডার গঠন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বটে। কিন্তু এ ডলার-ভাণ্ডারও থাকিবে লণ্ডনে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের হেপাজতে। সুতরাং আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতি যেমন আমাদের আয়ত্তের বহির্ভূত, এই ডলার-সংস্থিতিও তদ্রূপ। ষ্টার্লিং-সংস্থিতি এবং ডলার-ভাণ্ডারের যুদ্ধোত্তর সদ্ব্যবহারের উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি-অবনতি নির্ভর করিতেছে।

গত ১৩৫০ সালে আমরা আমাদের এই ভবিষ্যৎ সম্বলের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য আশ্বাস পাই নাই। পক্ষান্তরে, ভারতের নিকট বিলাতের এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রভূত ঋণ পরিশোধের নিরাপত্তা সম্পর্কে সম্প্রতি ভারতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান আষাঢ় মাসের ১৭ই (ইংরেজী ১লা জুলাই) তারিখ হইতে আমেরিকায় যে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠক বসিয়াছে, তাহাতে এই ঋণ পরিশোধের উপায় উপকরণ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিবে। সে আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নহে। আমরা এই ষ্টার্লিং-সংস্থিতির বিনিময়ে আমাদের দেশে যে সকল বৃটিশ সম্পদ্‌-সম্পত্তি আছে, তাহা আমাদের হস্তে তুলিয়া দিবার প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ জানাইয়াও কোন সুফল লাভ করি নাই। আমাদের এই ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা অনুযায়ী কার্য্য হইলে যুদ্ধের কয়েক বৎসরে অযথা অতিমাত্রায় মুদ্রাস্ফীতির যে অবশ্যম্ভাবী কুফল,—অযথা দ্রব্য-মূল্য-বৃদ্ধি, তাহা সহজেই নিবারিত হইতে পারিত। স্বর্ণ-রৌপ্যের দৃঢ় পৃষ্ঠপোষকতাহীন (without adequate metallic backing) কাগজের নোটের অতি-প্রাচুর্য্য এবং নিত্য-প্রয়োজনীয়

আহার্য্য ব্যবহার্য্যের অতি-অপ্রাচুর্য্য-হেতু, দ্রব্য-মূল্যকে গগনস্পর্শী করিয়া দীন-দরিদ্র বুভুক্ষু এবং মুমূর্ষু ভারতবাসীর মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করিয়াছে। ১৩৫০ সালের নিদারুণ দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের অনশন-মৃত্যুতে আমরা ইহার শোচনীয় পরিণতি সজল নয়নে লক্ষ্য করিয়াছি! যুদ্ধের এই কয়েক বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৫ অংশ মাত্র, যুক্তরাজ্যে এই বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ২৫ হইতে বড় জোর ৩০ অংশ; কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতে ইহার বৃদ্ধি শতকরা ২০০ হইতে ৩০০ অংশ বেশী! অথচ, ভারত অতি দরিদ্রের দেশ, এখানে শতকরা ৮৫ জন লোক দুই বেলা পেট ভরিয়া আহার পায় না। শতছিন্ন বস্ত্র এবং জরাজীর্ণ পর্ণ-কুটীর ইহাদের একমাত্র সম্বল। ১৩৫০ সাল তাহাদিগকে এই অতি অকিঞ্চিৎকর সম্বল হইতেও বঞ্চিত করিয়া গৃহহীন, নিরাশ্রয় ও নিরন্ন করিয়া শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের জীবন মৃত্যু হইতেও ভীষণ ও শোচনীয়। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, গৃহ নাই, কাহারও কাহারও আত্মীয়-স্বজনের চিহ্ন মাত্র নাই! সরকারী ও বেসরকারী দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নিতান্ত নিরুপায় ভাবে নির্ভরশীল!

এই দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক কারণে ঘটে নাই। বহিঃশত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণের আশঙ্কায় তৎপ্রতিরোধকল্পে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার কয়েকটি এই নিদারুণ খাদ্যাভাবের প্রত্যক্ষ কারণ! অযথা মুদ্রাস্ফীতির ফলে যেরূপে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দ্রব্যমূল্যের এই মহার্ঘতা এত অধিক লোককে পীড়া দিত না, যদি বহিঃশত্রুর অতর্কিত আক্রমণ-আশঙ্কায় "অস্বীকার নীতি" (Denial policy) অবলম্বন করিতে না হইত। জার্ম্মাণী যখন প্রচণ্ড ভাবে রুশরাজ্যে অগ্রসর হইতেছিল, রুশ কর্ত্তৃপক্ষ তখন নিরুপায় হইয়া "Scorched Earth" নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। যে-যে স্থান রুশ বাহিনীকে বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইতেছিল, তাহা তাহারা জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল; যাহাতে শত্রুপক্ষ সেই সেই স্থানের খাদ্য-পেয় এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে না পারে। এই নীতির অনুসরণ করিয়া ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে আসাম ও বঙ্গদেশে শত্রু যাহাতে কোন প্রকার আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের সুবিধা না পায়, তজ্জন্য যান-বাহনের চলাচল বন্ধ এবং খাদ্যদ্রব্যাদির ত্বরিত অপসারণের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই দরিদ্রের আয়ত্তের বহির্ভূত এই সকল দ্রব্য ক্রমে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিবর্গের পক্ষেও দুর্লভ হইয়া উঠিতেছিল। ফলে, ছয় টাকা মণের চাউল পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে এক শত টাকাতেও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। এই সকল খাদ্যদ্রব্য তাড়াতাড়ি স্থানান্তরিত করিয়া এরূপ স্থানে রাখা হইয়াছিল যে, প্রয়োজনানুযায়ী তাহা শীঘ্র পাইবার উপায় ছিল না এবং তাহা এরূপ ভাবে রাখা হইয়াছিল যে, অচিরে তাহার অধিকাংশই মনুষ্য-ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছিল। শুধু খাদ্য-পেয় দ্রব্যের অভাব নহে; এই অস্বীকার নীতির ফলে বহু সংখ্যক লোকের বৃত্তি-ব্যবসায় বন্ধ হইয়া তাহাদিগকে প্রচণ্ড অর্থাভাবের ও নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

ভারত-সচিব সে দিন পার্লিয়ামেণ্ট সভায় বলিয়াছেন যে, আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কয়েকটি কারণ কোন শাসনতন্ত্রই প্রতিরোধ করিতে পারিত না। তিনি বলিয়াছেন, বর্ম্মা শ্যাম প্রভৃতির বিচ্যুতির ফলে ভারতে চাউলের আমদানী রুদ্ধ হইয়াছিল। শাসন-যন্ত্রের এমন কোন ব্যবস্থা ছিল না, যাহাতে খাদ্যদ্রব্যের প্রাথমিক উৎপাদকদিগের হস্তস্থিত উদ্বৃত্ত দ্রব্য-সামগ্রীকে আয়ত্তে ও শাসনে আনিতে পারা যায়; অধিকন্তু, মৌশুমী বৃষ্টির অনিশ্চয়তা অর্থাৎ স্বল্পতা অথবা আধিক্য; লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সমুদ্রপথে মালবাহী জাহাজ চলাচলের সঙ্কোচ ছিল প্রচণ্ড। আংশিক ভাবে ইহার প্রত্যেকটিই সত্য। কিন্তু এই সকলের মূলে ছিল শাসনশক্তির দূরদৃষ্টির অভাব এবং স্থলবিশেষে শাসনযন্ত্রের রাজনৈতিক বৈকল্য। যাহা হউক, এই সকল দুর্নিমিত্ত দূরীকরণার্থে খাদ্যদ্রব্যের যথোচিত সংগ্রহ, সংস্থান ও সরবরাহের এবং নিয়মিত বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; বিভিন্ন স্থান হইতে খাদ্যদ্রব্যের আমদানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এ দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানী রুদ্ধ করা হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল স্থান হইতে অভাবগ্রস্ত স্থানে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ, সংক্রামক পীড়ার ব্যাপ্তি প্রশমন এবং পীড়িতের ত্বরিত চিকিৎসা ব্যাপারে সামরিক বিভাগ শাসন-বিভাগকে প্রচুর সাহায্য করিতেছেন। খাদ্য-শস্য উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে গত বৎসরের ফসলের পরিমাণও আশাপ্রদ হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসরের ধন-জন ও সম্পদ্-সম্পত্তির প্রভূত ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণ দুই-এক বৎসরের কর্ম্ম নহে। কৃষির উন্নতি ও প্রসার যেরূপ জনসংখ্যা ও পশুসম্পদের উপর একান্ত নির্ভরশীল তাহার প্রচুর অভাব-অনটন ঘটিয়াছে, সুতরাং আমরা যে বর্ত্তমান বর্ষে অভাব-অনটনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? ভারত-সচিব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতে উৎপন্ন খাদ্যশস্য ভারতের প্রয়োজনের পক্ষে প্রচুর নহে এবং শস্যোৎপাদনের সময়ে সুবৃষ্টির অভাব ঘটিলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হ্রাস হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং পূর্ব্বেও যেমন, এখনও তেমনি, আমরা দৈবের অর্থাৎ বারিপাতের উপর নির্ভরশীল। এই নিমিত্ত এক জন ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব বলিয়াছেন যে, Indian budget is a gamble in rain, অর্থাৎ ভারতের অগ্রিম আয়-ব্যয়ের খসড়া বৃষ্টিপাতের জুয়া-খেলা মাত্র! বস্তুতঃ, ১৩৫১ সালের সূচনাও আশাপ্রদ নহে।

নববর্ষের হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী "কুজো রাজা ভৃগুর্মন্ত্রী জলানামধিপঃ শশী। গুরুঃ শস্যাধিপো জ্ঞেয়ঃ আবর্ত্তো মেঘনায়কঃ॥" অর্থাৎ মঙ্গল রাজা, শুক্র মন্ত্রী, শশী জলাধিপ, বৃহস্পতি শস্যাধিপ এবং আবর্ত্ত মেঘনায়ক। মঙ্গল-রাজত্বের ফল,—"মন্দা বৃষ্টিঃ কুজে রাজ্ঞি রোগ-শস্ত্রানলৈর্ভয়ং। পৃথ্বী ধূলিসুসম্পূর্ণা বিরোধো ভূভুজাং সদা॥" মন্ত্রী, জলাধিপ এবং শস্যাধিপের ফল মন্দ না হইলেও, মেঘনায়কের ফল সুবিধাজনক নহে, "বর্ষণং নৈব সর্ব্বত্র শস্যং কীটসমাবৃতং। জগদ্ ভবেৎ সুদুঃখার্ত্তমাবর্ত্তে জলদাধিপে॥" ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের পক্ষে গ্রহসমাবেশ শুভসূচক নহে। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক উৎপাত, আতঙ্ক, শত্রুভয়, খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ, শস্যহানি, রোগভয়, বন্যা প্রভৃতি গত বৎসরের ন্যায় প্রবল না হইলেও প্রশমিত হইবে না। কৃষির অবস্থা তেমন অনুকূল নহে। কৃষির উপযোগী বৃষ্টি প্রচুর হইবে না এবং সময়োপযোগী বর্ষণেরও অভাব ঘটিবে। দুর্য্যোগকারক ঘটনারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। সুতরাং, বর্ত্তমান বর্ষের আসন্ন ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ নহে; তবে ভরসা এই যে, সরকার খাদ্য-দ্রব্যের

সংগ্রহ, সংস্থান ও সরবরাহ নিয়মিত ও পরিমিত করিয়া গত বৎসরের ন্যায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ও দুর্মূল্যতা নিবারণ করিবার নিমিত্ত যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এবং দুর্ভিক্ষ ও দুর্মূল্যতার মূলে যে অজস্র অপরিমিত মুদ্রাস্ফীতি তাহার কুফল প্রশমন করিবার নিমিত্ত যুদ্ধসৃষ্ট অর্জিত প্রচুর অর্থ বা নিট্ মুনাফাকে সংরক্ষণ ঋণ প্রভৃতিতে নিবদ্ধ রাখিয়া মুদ্রাস্ফীতি এবং জনসাধারণের ভোজ্য ভোগ্য দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করিয়া, দ্রব্য-মূল্যকে দরিদ্রের ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের আয়ত্তাধীনে রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রচেষ্টা যে সর্ব্বত্র কার্য্যকরী হইয়া সুফল প্রদান করিতেছে, তাহা নহে; তথাপি প্রশংসার্হ।

যুদ্ধ-সংস্রবে অর্জ্জিত প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থই বাজারে বিপর্য্যয়, অর্থাৎ অযথা অপরিসীম দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির হেতু। ইহাকে আয়ত্ত করিবার দুইটি প্রশস্ত ও প্রকৃষ্ট উপায় যুদ্ধজনিত লাভের (War profits) উপর উচ্চ হারে কর-নির্দ্ধারণ, অথবা কর-বৃদ্ধি, এবং ক্রম-বর্দ্ধমান সংরক্ষণ-ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রচুর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ। করগ্রহণ মাত্রাতিরিক্ত হইলে, কিংবা কোন কারণে একদেশদর্শী হইলে বিভিন্ন কৃষি, শিল্প অথবা বৃত্তি ব্যবসায় বিশেষের বিষম হানিকর হইতে পারে। এরূপ অন্তরায় বহু ক্ষেত্রে যুদ্ধোত্তর সংগঠন ও সংস্কার-সংবর্দ্ধনের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে, সরকারী সংরক্ষণ-ঋণে নিবদ্ধ অর্থ যুদ্ধান্তে নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ কৃষি, শিল্প ও বৃত্তি ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন ও প্রবর্দ্ধনের সাহায্যকারী। এই নিমিত্ত দেশের ও দেশবাসীর আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া পরিমিত পরিমাণে ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে করগ্রহণ করিয়া বিত্তশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে ঋণ গ্রহণ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এ নীতি যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত হওয়া দুষ্কর, সুতরাং হয় নাই। বর্ত্তমান সরকারী আর্থিক বৎসর ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের অগ্রিম আয়ব্যয় হিসাবের ঘাটতি ৭৮·২১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে অতিরিক্ত কর নির্দ্ধারণ দ্বারা ২৩·৫ কোটি টাকা পূরণ করিয়াছেন। ক্রমবর্দ্ধমান যুদ্ধ-ব্যয় অবশ্য এই বিরাট ঘাটতির প্রধান হেতু। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের মোট ব্যয় ৩৬৩·১৮ কোটি টাকা, তন্মধ্যে সামরিক ব্যয় ২৭৬·৬১ কোটি টাকা এবং অ-সামরিক (Civil) ব্যয় ৮৬·৫৭ কোটি টাকা মাত্র! যুদ্ধের গত চারি বৎসরে যুদ্ধ-ব্যয় ৪৯ কোটি হইতে ২৭৬ কোটিতে উন্নীত হইয়াছে। গত ১৯৪৩-৪৪ এবং বর্ত্তমান ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে—এই দুই বৎসরের একুন যুদ্ধ-ব্যয় ৬০০ কোটি টাকা।

ভারতের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের সামরিক ও বে-সামরিক উভয়বিধ বর্ত্তমান ব্যয়-সমষ্টি সমগ্র ভারতের যুদ্ধ-পূর্ব্ব জাতীয় আয়ের শতকরা বিশ অংশের সমতুল। আর একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী দেশের পক্ষে যেখানে কর দ্বারা সংগৃহীত রাজস্ব (Tax revenue) সমগ্র ব্যয়ের (Total expenditure) শতকরা ২৬ অংশ মাত্র এবং যুক্তরাজ্যের ন্যায় প্রতাপ ও প্রভাবশালী দেশে উক্ত রাজস্ব সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ৫০ অংশ মাত্র, সেখানে অর্থ-সামর্থ্যে অতি দরিদ্র ভারতবর্ষে কর-নির্দ্ধারিত রাজস্ব সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ৮০ অংশ। সুতরাং ভারতে যুদ্ধ-ব্যয়ের বোঝা বর্ত্তমান পুরুষের লোকের (Present genration) উপর অত্যন্ত অধিক। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল জনসাধারণের দারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশা।

বর্ত্তমান বর্ষের বাজেটে আয়-করের নিম্নতম ধার্য্যোপযোগী আয়-সমষ্টিকে ১৫০০ হইতে ২০০০ টাকায় উন্নীত করিয়া বহু নিঃস্ব স্বল্পবিত্ত ব্যক্তিকে দায় হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু ১০ হইতে ১৫ হাজার টাকা আয়ের উপর যুক্ত কেন্দ্রীয় অতিরিক্ত করের (Central sercharge) মৌলিক হার (Basic rate) ২৫ পাইয়ের উপর দুই পাই বৃদ্ধি করিয়া ১৬ হইতে ১৮ পাই করা হইয়াছে এবং ১৫ হাজার টাকার বেশী আয়ের উপর যুক্ত উক্ত করের মৌলিক ৩০ পাইয়ের উপর ৪ পাই বৃদ্ধি করিয়া ২০ হইতে ২৪ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। সমিতি করকে (Corporation tax) এক আনা হইতে তিন আনায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তবে কোন কোম্পানীর যে আয়-সমষ্টির উপর লভ্যাংশ বিতরিত হইবে না, তাহাতে টাকা-প্রতি এক আনা রেহাই দেওয়া হইবে। কৃষি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির উপর বিলাতের ন্যায় মৃত্যু-কর (Death duties) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পাউণ্ড প্রতি চা, কফি ও সুপারীর উপর দুই আনা উৎপাদন-কর ধার্য্য হইয়াছে। তামাকের উৎপাদন-কর দ্বিগুণ করা হইয়াছে। মূলধন অধিকতর পরিমাণে নিবদ্ধ ও নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিবার নিমিত্ত অতিরিক্ত লাভ-করকে (Excess Profit tax) শতকরা শত অংশ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই সকল নূতন ও বর্দ্ধিত কর হইতে ২৩·৫ কোটি টাকা পরিমাণ ঘাটতি পূরণ হইবে। আয়কর ও সমিতি-করের বৃদ্ধি এবং সমগ্র অতিরিক্ত লাভ-করকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ফলে ভারতের শিল্প-সমুন্নয়ন ব্যাহত হইবে। এই সকল প্রস্তাবের অসঙ্গতি ও অসমীচীনতা কত ভাবে আত্মপ্রকাশ করে—যখন আমরা বিবেচনা করি যে, সরকার অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত রেলওয়েগুলিকে যুদ্ধোত্তর সমুন্নয়নের জন্য প্রচুর সংস্থান (Reserves) সঞ্চয় করিবার অধিকার দিয়াছেন; অথচ শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট হইতে তাহাদের সমস্ত উদ্বৃত্ত মুনাফা শুষিয়া লইয়া তাহাদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইতে বাধ্য করিতেছেন। এই জন্য মনে হয় যে, সরকারের এই কর-নির্দ্ধারণ নীতি বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি ও অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবে, যেহেতু ইহার কোন সুপরিপুষ্ট যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সম্বন্ধ বা সামঞ্জস্য নাই! বিভিন্ন শিল্পের যুদ্ধোত্তর সমুন্নয়নের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন এই যে, যুদ্ধান্তে প্রত্যেক শিল্পের হস্তে এরূপ অর্থ-সামর্থ্য থাকিবে, যাহাতে তাহা অনায়াসে যুদ্ধোত্তর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইতে পারে। অর্থ-সামর্থ্যের অভাবে উপযুক্ত কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এবং উপাদান-উপকরণ থাকিলেও কোন শিল্পের পক্ষে অর্থ-সামর্থ্যে সুসম্পন্ন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। ভারত সরকারের বর্ত্তমান কর-নির্দ্ধারণ নীতি শিল্প-মাত্রেরই যুদ্ধোত্তর সংগঠন সম্ভাবনার্থ সংস্থান সঞ্চয়ের পরিপন্থী। অথচ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, শিল্পে নিযুক্ত কলকারখানার যন্ত্রপাতি অপরিমিত পরিচালন, এবং যুদ্ধোত্তর সংগঠনের নিমিত্ত সঞ্চয়ের প্রয়োজন এখন যত অধিক, এমন আর পূর্ব্বে কোন দিন অনুভূত হয় নাই। যুদ্ধান্তে যুদ্ধ-শিল্পগুলিকে শান্তিকালে প্রয়োজনীয় শিল্পে পরিণত এবং অন্যান্য শিল্পগুলিকে যুদ্ধান্তে প্রভূত পরিমাণে প্রবল চাহিদার অনুরূপ যোগান দিবার উপযুক্ত উৎপাদন-মাত্রা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এখন হইতেই

প্রভৃত সংস্থান-সঞ্চয়ের আবশ্যক। এই সকল শিল্প যুদ্ধান্তে প্রতিযোগিতায় সমর্থ না হইলে, সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় ভোগ্য ভোজ্য দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে আমাদের ষ্টার্লিং ও ডলার-সংস্থিতি কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যাইবে এবং আমাদের যুদ্ধোত্তর মূল ও স্থুল শিল্প প্রবর্ত্তন ও প্রবর্দ্ধনের দুরাশা মরুভূর মরীচিকায় পরিণত হইবে। মোটের উপর আমাদের যুদ্ধোত্তর আশা-ভরসা অতি ক্ষীণ ও দীন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার ব্যতীত তাহা সম্ভবপর নহে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা নূতন বড়-লাটের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ উন্নতি-প্রচেষ্টার আশ্বাস পাইয়াছি বটে, কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা যে কোন্ পর্য্যায়ে, তাহা একমাত্র বিধাতা পুরুষই বলিতে পারেন।

ভারত-সচিব, বড়লাট এবং বাঙ্গালার নূতন লাট সকলেই আশ্বাস দিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ১৩৫১ সালে গত ১৩৫০ সালের অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ-দুর্ম্মূল্যতা এবং অনশন-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না। কিন্তু আমরা যেমন সহায়হীন তেমনি সামর্থ্যহীন। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগোর অতি দীর্ঘস্থায়ী শ্লথ ও শিথিল শাসন বিশৃঙ্খলার অবসানে লর্ড ওয়াভেল নবোদ্যমে অভাব-অভিযোগের বহু প্রশমন সম্পাদন করিয়াছেন বটে, দুর্ভিক্ষ ও দুর্ম্মূল্যতার নিদারুণ প্রকোপ প্রশমিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অভাব-অনটন এখনও প্রচণ্ড; পূরণের পর্য্যায়ে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য না হইলেও খাদ্য পেয় ও ইন্ধনাদি এখনও বহু দরিদ্র মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত দরিদ্রের আয়ত্তের বহির্ভূত। কোন দিন চাউল নাই, কোন দিন ডাইল নাই, কোন দিন তৈল নাই, কোন দিন লবণ নাই; কোন দিন আটা নাই, কোন দিন চিনি নাই, কোন দিন কাঠ নাই, কোন দিন কয়লা নাই—ইত্যাকার অভাব-অভিযোগের অন্ত নাই। রণদুর্ম্মদদের শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, অবসন্নতা নাই; শান্তি দেবতার প্রসাদ নাই, প্রসন্নতা নাই। সুসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে বারিপাত, অধিকতর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন, কুটীর শিল্পের উন্নতি ও প্রসার এবং যন্ত্রশিল্পের প্রবর্ত্তন ও প্রবর্দ্ধন,—ফলতঃ মূল ও স্থূল, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার কৃষি-শিল্প, বৃত্তি-ব্যবসা, ব্যাপার-বাণিজ্য ও কাজ-কারবার প্রবর্ত্তিত, প্রচলিত, প্রবর্দ্ধিত ও সুপরিচালিত না হইলে আমাদের দুঃখের অবধি থাকিবে না। অর্থ-সামর্থ্য ও সহায়-সম্পদ্ আমাদের অতি কম এবং সম্পত্তির সহিত বিপত্তি অনিবার্য্য। অতএব আশু আত্মকলহের অবসান এবং আত্ম-শক্তি সাহায্যে আত্মসংযম, আত্মশাসন ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। মুক্তি সেই পথে।

১৩৫০ সাল অতীতে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসে অক্ষয় স্থান লাভ করিয়াছে। তাহার কুকীর্ত্তি-স্মৃতি চিরদিন আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে। মৃত্যু-মলিন ১৩৫০ ছিল অতি শোচনীয়, শোকাবহ, সঙ্কট-সঙ্কুল ও সর্ব্বনাশকর। ১৩৫১ যে তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন হইবে, সেরূপ কোন সুলক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈষ্ণবমত-বিবেক

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এইবার শ্রীবৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলাচার্য্য গোস্বামিগণ একে একে আগমন করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ একবার পুরীধামে আসিয়া তথায় কিছু দিনের জন্য অবস্থান করিয়া আবার স্থায়িভাবে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন। ইহার পরই শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া আবার পুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট গমন করিয়া কিছু দিন অবস্থান করিবার পর পুনরায় স্থায়িভাবে শ্রীবৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিবার জন্য তথায় প্রেরিত হইলেন। এইরূপে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন দুই ভাই আসিলে লোকনাথ ও ভূগর্ভ যেন তাঁহাদিগকে পাইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্ত্তিমান্ কৃপারাশি লাভ করিলেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বয়সে জ্যেষ্ঠ—বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ শ্রীল সনাতন লোকনাথকে ও ভূগর্ভকে নিজের সহোদর ভ্রাতার ন্যায় পরমাদরে ও পরম স্নেহে গ্রহণ করিলেন। মথুরায় সুবুদ্ধি রায় এবং বৃন্দাবনে শ্রীরূপ, সনাতন, লোকনাথ ও ভূগর্ভ নূতন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনকে ভাবসম্পদ ও তীর্থসম্পদে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। লোকনাথ ও ভূগর্ভ যে সকল তীর্থস্থান আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপের নিকট জানাইলেন,—শ্রীরূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রজমণ্ডলের যাবতীয় শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থল একে একে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। এ-দিকে পুরীধাম হইতে ও গৌড়দেশ হইতে বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রী—শ্রীবৃন্দাবনে এখন আর মুসলমানের উপদ্রব নাই জানিতে পারিয়া দলে দলে তীর্থদর্শনাশায় শ্রীমথুরামণ্ডলে সমাগত হইতে লাগিলেন। যে সকল ব্রজবাসী শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া ম্লেচ্ছভয়ে অন্যত্র অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তীর্থগুরুরূপে বসতি করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীপুরীধাম হইতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আশীর্ব্বাদ লইয়া কাশীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দাস-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ আসিলেন।

অন্য দিকে শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য তাঁহার শিষ্যাদিসমেত আসিয়া গোকুলে ও গোবর্দ্ধননাথ গোপালের নিকটে আবাস-স্থান নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের হরিদাস স্বামি-প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দও শ্রীবৃন্দাবনের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। অলৌকিক ত্যাগের ও নৈষ্ঠিক ভজনের আদর্শ স্থাপনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোস্বামিগণের তুলনা নাই। আবার পাণ্ডিত্যেও সিদ্ধান্তশাস্ত্রের পারগামী হইয়া তাঁহারা—মধুর বিনয়-পূর্ণ ব্যবহারে শ্রীবৃন্দাবন-বাসী সর্ব্বসাধারণের—জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে চিত্তজয় করিয়াছিলেন।

লোকনাথ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া ব্রজমণ্ডলের সকল স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের বনগুলির স্থান-নির্ণয় করিয়াছিলেন, ইহা নারায়ণভট্টের 'ব্রজভাব-বিলাস' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাহার পর শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন আসিয়া যখন এ বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন লোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ গোস্বামী ভজনেই অধিকাংশ সময় নিয়োগ করিতে লাগিলেন। যদিও শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহাদের স্থায়িভাবে কোনও আশ্রয়স্থল ছিল না, তথাপি ছত্রবনের পার্শ্বে পুরাতন উমরাও গ্রামে শ্রীকিশোরীকুণ্ডের সন্নিকটে কিছু দিন নির্জনে ভজন করিবার সময় শ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীরাধাবিনোদ নামক একটি শ্রীবিগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। বৃক্ষমূলে বাস করিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা করা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য, আমাদের তাহা ধারণা করিবারও সামর্থ্য নাই। নির্জন-ভজননিষ্ঠ নিষ্কিঞ্চন ভক্তের আদর্শ লোকনাথ কোনওরূপে বন্যফুলে ও তুলসীদলে শ্রীবিগ্রহের পূজা করিতেন এবং বন্য ফলমূল ও ভিক্ষালব্ধ শাকান্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগ দিবার ব্যবস্থা করিতেন। কিশোরীকুণ্ডের সন্নিকটবর্ত্তী এক কোটরেই এই বিগ্রহকে পাইয়াছিলেন, সেই স্থানেই বিগ্রহকে রাখিয়া তিনি অনেক সময়ে সেবা করিতেন। আবার যখন অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন হইত তখন একটি ঝোলার মধ্যে করিয়া শ্রীবিগ্রহকে লইয়া তিনি পথ পর্য্যটন করিতেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আসিবার কিছু পরে 'বৃহদ্-ভাগবতামৃত' রচনা করেন এবং তাহার কিয়ৎকাল পরেই শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের সভায় ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ভক্তিরস-প্রবাহে পরিসিক্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ইহার কিছু পরে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃব্য ও গুরুদেব শ্রী প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। ক্রমশঃ শ্রীবজ্রনাভের স্থাপিত শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীরূপকে স্বপ্নাদেশ দিয়া প্রকাশিত হইলেন; শ্রীল মদনমোহন দেবও শ্রীল সনাতনের প্রতি কৃপা করিয়া মথুরায় চৌবের গৃহ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন। আদিত্যটিলায় ১৪৫৪ শকে শ্রীল মদনমোহন প্রতিষ্ঠিত হইলেন। গৌড়দেশ হইতে সদাচারী ব্রাহ্মণগণ আসিয়া শ্রীল মদনমোহনের সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। শ্রীল মদনমোহন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই শ্রীল চৈতন্যদেব লীলা সম্বরণ করেন। শ্রীল গোবিন্দদেবকে পাইয়া তাঁহার জন্য পুরীধামে মহাপ্রভুর আদেশ ভিক্ষা করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রোত্তর যখন আসিল এবং তাহার পর যখন শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইল, তখন শ্রীচৈতন্যদেব আত্মগোপন করিয়াছেন। পুরীধামে মহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার পরই তাঁহার অন্তরঙ্গ শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামী ও কাঞ্চনগড়িয়ার বড় হরিদাস ঠাকুর-প্রমুখ ভক্তগণ পুরীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া আসিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সমাগম হইল। লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামী ইহাদের সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাজন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর অপূর্ব্ব ভজন-নিষ্ঠায় সকলেই বিস্মিত হইতেন। এই সময়ে শ্রীল সনাতনের ও শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র তরুণ-বয়স্ক শ্রীজীব আসিলেন ও অল্প দিনেয় মধ্যেই স্বকীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় ও পিতৃব্যগণের সেবায় তিনি শ্রীলোকনাথ-গোস্বামি-প্রমুখ ভক্তগণের পরম স্নেহভাজন হইয়া উঠিলেন। এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনে যে বৈষ্ণবমহাবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল তাহা সকলেই জানেন। শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রগ্রন্থন, তীর্থপ্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহসেবা ও কীর্ত্তন সমন্বয়ে শ্রীবৃন্দাবন চলিতে লাগিল। শ্রীরূপ-সনাতন-প্রমুখ যখন এইভাবে শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণবতার যে উচ্চতম আদর্শ স্থাপন করিলেন—লোকনাথ গোস্বামী তাহার সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী, এই জন্যই লোকনাথ গোস্বামী সকলের আদর্শ-স্থানীয় হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। নিজ ভজনের অনুকূল দীনতা ও নির্জ্জনে ভজনপ্রিয়তার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠাকে যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। উপযুক্ত শিষ্য পাইবার জন্য গোস্বামিগণ তাঁহার অধ্যয়নের ও গুরুনির্ব্বাচনের সাহায্য করিতেন, কিন্তু পাছে তাহাতে ভজনের বাধা হয়, এই জন্য কোনও দিন শিষ্য করিবেন এরূপ অভিপ্রায় লোকনাথের ছিল না। কিন্তু অতিশয় সুযোগ্য শিষ্য প্রাপ্তিতে তিনি সে সঙ্কল্প অটুট রাখিতে পারিলেন না। কিরূপে এই ব্যাপার ঘটিল, আমরা এখন তাহা বর্ণনা করিয়া এই পবিত্র জীবনের বক্তব্য শেষ করিব।

কালক্রমে প্রথমে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, পরে শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন অন্ধকার করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন লোকনাথ গোস্বামীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ। এদিকে উৎসাহ ও উদ্যমে পিতৃব্যদ্বয়ের মুখোজ্জ্বল করিয়া অনুপম প্রতিভাশালী পরম বিনীত যুবক শ্রীজীব গোস্বামী তখন শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বকার্য্যের অগ্রণী। ঐ সময়ে গৌড়, বঙ্গ ও উৎকল হইতে তিনটি ভক্ত শ্রীবৃন্দাবনের মহা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিরূপে সমাগত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীনিবাস সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ, নরোত্তম তদপেক্ষা অল্পবয়স্ক এবং শ্যামানন্দ সর্ব্বকনিষ্ঠ। শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ-সন্তান, নরোত্তম কায়স্থ ও শ্যামানন্দ সদ্‌গোপ। কিন্তু ইঁহাদের তিন জনের মূর্ত্তি নয়ন মনোহর এবং তিন জনই বিদ্যা, বিনয় ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। ইঁহাদের মধ্যে নরোত্তম ও শ্রীনিবাস, এই দুই জনের দীক্ষা হয় নাই, কিন্তু শ্যামানন্দ—যাঁহার নাম পূর্ব্বে দুঃখী কৃষ্ণদাস ছিল তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়পার্ষদ শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয়শিষ্য শ্রীমৎ হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের শিষ্য। যে মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত সে মন্ত্রের চৈতন্যসম্পাদনের জন্যই তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনে আগমন। যাহা হউক, তাঁহার কথা আমরা পরে যথাসময়ে তাঁহার জীবনলীলা প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কথাও যথাক্রমে তাঁহার জীবনলীলা প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। বর্ত্তমানে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের কথাই আমাদের আলোচ্য।

নরোত্তমের পরিচয়

বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পদ্মাতীরে গরাণহাটী পরগণায় খেতরী গ্রামে সুবিখ্যাত জমিদার কৃষ্ণানন্দ দত্ত বাস করিতেন। তৎকালে পরগণার অধিবাসী শ্রেষ্ঠ জমিদারগণের উপাধি জমিদার ছিল; তদুপরি জমিদারির বিশালতার জন্য তিনি 'রাজা' উপাধিতেও ভূষিত হইয়াছিলেন। ইনি উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ। ইঁহার বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল এবং তজ্জন্য নবাব-সরকারে প্রচুর রাজস্বও দিতে হইত। রাজা কৃষ্ণানন্দ মজুমদারের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

শ্রীললিতমাধব নাটকের * প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, "পদ্মাবতী-তীরবর্ত্তী গোপালপুরনিবাসী গৌড়াধিরাজ মহামাত্য শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত সত্তম-ই নরোত্তম দাস ঠাকুরের পিতৃব্য।" অতএব এই পুরুষোত্তমই রাজা কৃষ্ণানন্দ মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি গৌড়াধিরাজের মহামাত্য ছিলেন বলিয়া রাজধানীতেই ইঁহাকে বাস করিতে হইত। রাজা কৃষ্ণানন্দই জমিদারি-শাসনাদি যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। নরোত্তমের জন্মের সময় রাজা কৃষ্ণানন্দের বৃদ্ধ পিতাও জীবিত ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

রাজা কৃষ্ণানন্দ মজুমদার তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য রাজার ন্যায়ই বার মাসের তের পার্ব্বণে ব্যয় করিতেন। দীন-দুঃখীর দুঃখমোচনেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ যেমন ধার্ম্মিক ছিলেন তাঁহার পত্নী রাণী নারায়ণীও সেইরূপ ভক্তিমতী ও সাধ্বী পতিব্রতা ছিলেন! সংসারে এই ধার্ম্মিক দম্পতির সন্তানের অভাব ছিল। ভগবৎকৃপায় অবশেষে তাঁহারা নরোত্তমের ন্যায় সর্ব্বগুণবান্ সুশীল সর্ব্বজনমনোহর পুত্ররত্ন লাভ করিয়া ধন্য হইলেন।

আনুমানিক ১৪৭২ শকের মাঘী-পূর্ণিমা তিথিতে প্রাতে ছয় দণ্ডের সময় শ্রীল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন। সন্ন্যাস লইয়া পুরীধামে যাইবার পরে দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া যখন শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে আগমন করেন, সেই বার কানাইর নাটশালা হইতে শান্তিপুরে আসিবার সময়ে তিনি কুতবপুরে পদ্মা পার হন। ঐ সময়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়া খেতরির দিকে "নরোত্তম" "নরোত্তম" বলিয়া কয়েক বার আহ্বান করেন। এই ব্যাপারের প্রায় ৩৬ বৎসর পরে খেতরি গ্রামের রাজা কৃষ্ণানন্দের এই পরমসুন্দর পুত্রটি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের ছয় মাস পরে অন্নপ্রাশনের সময়ে দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক ইঁহার 'নরোত্তম' নামকরণ হয়। এই অন্নপ্রাশনের সময়েই আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, অনিবেদিত অন্নাদি বা মিষ্টান্নাদি মুখে দিতে আসিলে শিশু মুখ ফিরাইয়া লয়, কিছুতেই তাহা মুখে লয় না। অবশেষে দৈবজ্ঞের পরামর্শে বিষ্ণু-নৈবেদ্য মুখে দিলে শিশু পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাহা গ্রহণ করিল। তদবধি পিতা নিয়ম করিয়া দিলেন যে, শিশুকে কেহ কোনও অনিবেদিত দ্রব্য খাইতে দিবে না এবং শিশুর পিতামাতাও তদবধি বিষ্ণু-নৈবেদ্য ব্যতীত অন্য কোনও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতেন না। এইরূপে পুত্রের জন্যও তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা নিয়মপরায়ণ, সদাচারী ও সংযত হইলেন। ক্রমে যথাকালে চূড়াকরণের পর বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইল। অক্ষর-পরিচয়ের কাল হইতে নরোত্তমের অপূর্ব্ব কৃতিত্বের বিকাশ দেখিয়া তাঁহার শিক্ষকেরা বিস্মিত হইতে লাগিলেন। পরে ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কারাদি লৌকিক বিদ্যায় তিনি অল্পসময়েই যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিলেন। জমিদার পিতা তখন তাঁহাকে বৈষয়িক শিক্ষা দান করিতে যাইয়াই তাহার ঔদাসীন্য দেখিয়া ভীত হইলেন। ভাবিলেন, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বুদ্ধিমান পুত্র কি গৃহে থাকিয়া বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে?

কিশোর বয়স হইতেই নরোত্তমের শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিয়া তাঁহার সমগ্র চরিত-কথা জানিতে উৎকণ্ঠা জন্মিল। খেতরিতে কৃষ্ণদাস নামক এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি জিতেন্দ্রিয় ও তেজস্বী ভক্ত। তিনি নরোত্তমের নিকট আসিলে রক্ষিগণ কেহই তাঁহাকে নিষেধ করিতে সাহস করিত না। সকলেই সভয়ে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত। এই শ্রীচৈতন্যগত ব্রাহ্মণ নরোত্তমকে দেখিয়া তাঁহার স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। তিনি যেমন নরোত্তমকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, নরোত্তমও তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। এইরূপে নরোত্তম ইঁহার নিকট হইতে শ্রীচৈতন্য-দেবের ও তাঁহার পরিবারগণের সমগ্র জীবন-কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারিলেন। ইহার ফল হইল এই যে, নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য—শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদগণের সঙ্গ প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

রাজা কৃষ্ণানন্দ পুত্রের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া শীঘ্র তাঁহাকে বিবাহ দিবার জন্য সমশ্রেণীর কায়স্থ সমাজে উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নরোত্তমকে একরূপ চোখে চোখে রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়া গেল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চিহ্নিত দাসকে দৈবই সাহায্য করেন। বিশেষ কোনও বিষয়কার্য্য উপলক্ষে রাজা কৃষ্ণানন্দ মজুমদারকে কিছু কালের জন্য রাজধানীতে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইল। নরোত্তমও সেই অবসরে গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া দীনবেশে শ্রীবৃন্দাবনের পথে ধাবিত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবনের রক্ষাকর্ত্তা শ্রীজীব তখন তাঁহাকে সাদরে আশ্রয় দান করিলেন এবং শ্রীল লোকনাথ ভূগর্ভ গোপাল ভট্ট-প্রমুখ বৃদ্ধ গোস্বামিগণের সহিত তাঁহার মিলন করাইয়া দিলেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর অলৌকিক চরিত্র এবং অপূর্ব্ব ভক্তিভাব দর্শন করিয়া নরোত্তম মনে মনে তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু লোকনাথের সঙ্কল্প—তিনি কখনও শিষ্য করিবেন না। নরোত্তমও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি লোকনাথ গোস্বামীর নিকট হইতেই দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীল লোকনাথ-প্রমুখ গোস্বামিগণের অনুমোদন অনুসারেই শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণব সদাচারের সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতি "শ্রীহরিভক্তিবিলাস" রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে বিধান আছে যে, সদ্গুরু শিষ্যকে অন্ততঃ এক বৎসর কাল উপযুক্ত পরীক্ষা না করিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করিবেন না এবং উপযুক্ত শিষ্যও গুরুদেবকে ঐরূপ এক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা না করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবেন না। তাহাতে সদ্গুরুর ও উপযুক্ত শিষ্যের যে লক্ষণ বর্ণিত আছে—তেমন গুরু ও তেমন শিষ্য বর্ত্তমান কালে একান্ত দুর্ল্লভ। নিতান্ত যাঁহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাঁহাদেরই এরূপ গুরু ও এরূপ শিষ্য লাভ হইতে পারে। অন্ততঃ লোকনাথ গোস্বামীর মত দৃঢ়চিত্ত ভক্ত নিজ সংকল্প ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রের মর্য্যাদা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে পারেন না—যে ধর্ম্মরক্ষার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত, যে আদর্শ রক্ষার ভার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা প্রাণ দিয়াও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। এই সকল ভাবিয়া নরোত্তমকে তিনি শ্রীজীবের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়নের অনুমতি করিলেন। নরোত্তম প্রকাশ্য ভাবে লোকনাথের সেবার অধিকার পাইলেন না।

আমরা বিষয়াসক্ত জীব—যাহারা স্বতঃ বা পরতঃ আমাদের ভোগ

---

* সুবিখ্যাত বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা শ্রীল গোবিন্দদাস শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের খুড়তুতো ভ্রাতা সন্তোষ রায়ের অনুরোধেই এই নাটকখানি রচনা করেন। এই নাটকখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই—বোধ হয় উপযুক্ত অনুসন্ধান হইলে এখনও ইহার সমগ্র প্রতিলিপি মিলিতে পারে।

সুখের ইন্ধন যোগায়, তাহারাই আমাদের প্রিয় হইয়া থাকে। কিন্তু উপনিষদাদি শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ চোখে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, পুত্র-বিত্ত ইত্যাদি আত্মার কামনা পরিতৃপ্ত করে বলিয়াই তাহারা আমাদের প্রিয় হয়; কিন্তু সেই স্বরূপানন্দ আত্মানন্দের আধাররূপ সাধনাবর্ত্মে যাঁহারা নামিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, গুরুদেবের সহিত শিষ্যের সম্বন্ধ যেরূপ প্রাণারাম, পৃথিবীর আর কোনও বস্তুর আকর্ষণ তত তীব্র নহে। লোকনাথের চরণদ্বয়ের ঐকান্তিক আকর্ষণ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন।

এ দিকে লোকনাথের ভজন-কুটীরের অতি দূরে নরোত্তম কোনওরূপে একটু ঝুপড়ী বাঁধিয়া বাস করিয়া কেবল মধ্যাহ্নে শ্রীজীবের নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া প্রাণপণে শ্রীভগবানের নিকট স্বীয় মনোভাব পরিপূরণের জন্য তীব্র ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণে সুদৃঢ় শক্তির আবির্ভাব হইল। তিনি প্রত্যাখ্যাত হইয়াও প্রফুল্ল মনে লোকনাথ গোস্বামীর অলক্ষ্যে সর্ব্বদা তাঁহার নানা প্রকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

লোকনাথ গোস্বামী প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে বনের এক প্রান্তে নির্জ্জন স্থানে বহির্দ্দেশে গমন করিতেন, নরোত্তম তাঁহার বহু পূর্ব্বে তাঁহার নিকট শৌচের মৃত্তিকা ও জল সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, এবং সেই পথ ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। এই ব্যাপার এক দিন দুই দিন চলিতে পারে—কিন্তু পরম সাবধানী লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমের যে এই কার্য্য, তাহা মনে মনে বুঝিতে পারিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনিও শাস্ত্র-বিধান অনুসারে নরোত্তমকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। যখন দেখিলেন যে, দীর্ঘকাল নিষ্ঠাভরে এইরূপ সেবা করিয়াও রাজার ছেলে নরোত্তমের তাহাতে বিরক্তি জন্মিল না, সাক্ষাৎ হইলে প্রকাশ্যে লোকনাথ উদাসীন ভাব দেখাইয়াও বুঝিতে পারিলেন যে, নরোত্তম তাঁহার প্রতি অতি দীন ভাবে আকুল আগ্রহে চাহিয়া কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন, তখন তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি এক দিন শৌচে যাইবার সময়ের অনেক পূর্ব্বে যাইয়াও দেখেন যে, নরোত্তম স্থান মার্জ্জনা করিতেছেন—তখন নরোত্তম প্রত্যহ এই কার্য্য করেন কি না, এবং কি উদ্দেশ্যে করেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন নরোত্তম তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া অতি কাতর ভাবে আত্মনিবেদন করিলেন, এবং এই গুরুসেবাই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা—তাহা হইতে যেন বঞ্চিত না হইতে হয়, ইহা অতি করুণ ভাবে জানাইলেন। অশ্রুধারায় তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অতঃপর দয়ার সাগর করুণ-হৃদয় লোকনাথও আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না—তাঁহার হৃদয় ত' আর সত্যই পাষাণে নির্ম্মিত নহে। তিনি নরোত্তমকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং সন্তুষ্ট মনে তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সহিত অবসর সময়ে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। এবার হইতে লোকনাথ সন্তুষ্ট মনেই নরোত্তমের সেবা গ্রহণ করিলেন এবং এক এক করিয়া তাঁহার গৃহের, সংসারের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া লইলেন। কিছু দিন পরে তিনি তাঁহাকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করিলেন এবং যথাসময়ে 'শ্রাবণী পূর্ণিমা'তে তাঁহাকে দীক্ষা দিবেন, এ কথা বলিয়া দিলেন। দীক্ষার পূর্ব্বে তিনি নরোত্তমকে বলিয়া দিলেন যে, দীক্ষাগ্রহণের পর শাস্ত্রাধ্যয়ন শেষ করিয়া নরোত্তমকে দেশে ফিরিয়া যত দিন পিতামাতা জীবিত থাকিবেন, তত দিন তাঁহাদের সেবা করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে এবং তাহার পরে কুমার ব্রহ্মচারী থাকিয়া শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন করিয়া জাতিবর্ণনির্বিশেষে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। আর যখন যাহা যাহা করিতে হইবে—শ্রীচৈতন্যদেব অন্তর্য্যামিরূপে তাঁহার অন্তরে থাকিয়াই করাইবেন, তাঁহাকে মাত্র সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া তাঁহার হস্তে যন্ত্রের ন্যায় আপনাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

অনন্তর সমস্ত বৃন্দাবনে নরোত্তমের এই সৌভাগ্যের বার্ত্তা বিঘোষিত হইল, নরোত্তমের প্রিয় সুহৃৎ শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাস আচার্য্য পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। শ্রীজীব প্রীতিভরে নরোত্তমকে আলিঙ্গন করিয়া নরোত্তমের দীক্ষার যাবতীয় বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিলেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম্-এ, বি-এল)

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

সৌন্দর্য্যের আসন

সুন্দরী বলিয়া যদি সমাজে খ্যাতি চান, তাহা হইলে শরীরকে শক্ত-সমর্থ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। দুর্ব্বল দেহে সৌন্দর্য্য থিতাইতে পারে না। অর্থাৎ দেহে বল না থাকিলে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীকে কায়েমি ভাবে অঙ্গে ধরিয়া রাখা যাইবে না; 'ন হি সৌন্দর্য্যং বলহীনেন লভ্যম্।'

আমাদের দেশে পনেরো-কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, মেয়েরা ছোট বয়সে কতখানি দৌড়-ঝাঁপ করিত! তাছাড়া বাড়ীর পাঁচটা ফাই-ফরমাশ খাটা, সংসারের পাঁচটা শ্রমসাধ্য কাজ—এ সবে তাদের এতটুকু ঔদাস্য ছিল না। কিন্তু এখন ছোট বেলা হইতেই ছেলেদের মত মেয়েদের হাতে আমরা একরাশ স্কুলের বই তুলিয়া দিয়েছি,—বাড়ীর খাটাখাটুনি হইতে যথাসম্ভব তাদের নিবৃত্ত রাখিতেছি। মেয়েরা ছোট বয়সে এখন শুধু বই পড়ে, স্কুলে যায়; তার উপর গান শেখা, বাজনা ও সেলাই শেখাই। ইহাতে আমরা তাদের মানুষ করিয়া তুলিতে চাই! তার ফলে কিশোর বয়সে পদার্পণ করিলেও একালের মেয়েদের গায়ে মাস লাগে না—দু'-চার বার সিঁড়ি ওঠানামা করিতে গেলে [illegible], হাঁফাইয়া শুইয়া পড়ে! নানা রোগের উপসর্গ লাগিয়াই আছে। সে-দিন একটি মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী বলিতেছিলেন—একালের মেয়েরা পাশ করিয়া ডিগ্রী লইলে কি হইবে, তাদের দেহ যেন পাৎ! সে দেহে না আছে শ্রী, না সৌন্দর্য্য! মেয়ে-স্কুলের গাড়ী হইতে যে-সব মেয়ে স্কুলে আসিয়া নামে, তাদের মধ্যে কাহাকেও দেখিলে মনে হয় না, কালে এ মেয়ে সুন্দরী হইবে বা সুস্থ দেহে দীর্ঘকাল বাঁচিবে! দেহে যেন কারো প্রাণ নাই! শিক্ষয়িত্রী-বান্ধবীর কথাগুলি অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। মাথাধরা উপসর্গ কোন্ মেয়ের নাই? তার উপর ডিস্পেপসিয়া? এ সব মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিলে দিশাহারা হইতে হয়।

এ ব্যাপার ঘটিবার অনেক কারণ আছে। সে সব কারণের

আলোচনা আর এক সময়ে করিব। আজ শুধু বলিতে চাই—অঙ্গে সৌন্দর্য্য-শ্রীর কামনা করিবার আগে দেহকে সবল করিতে হইবে!

১। জোড়-বাঁধা দুই পা

কুঁজা হইতে জল গড়াইতে গেলে যদি বুক ধড়ফড় করে, তাহা হইলে সৌন্দর্য্য-সুষমার আশা দুরাশায় পরিণত হইবে!

বিখ্যাত পাশ্চাত্য চিত্র-শিল্পী আর্ণল্ড জেনি বলেন—There is no beauty without strength. এ-কথা কতখানি সত্য, তাহা আমাদের অন্তঃপুরের দিকে চাহিলে বুঝিতে পারি। বহু গৃহেই দেখি, মেয়েদের চেয়ে মেয়েদের মা-মাসি খুড়ী-জেঠিরা প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় আসিলেও অনেক বেশী সৌন্দর্য্য-সুষমার অধিকারিণী। রোগীর সেবায় এক দিনেই তাঁরা ক্লান্ত অবসন্ন হন্ না! সারিডান্ বা স্মেলিং সল্টের শিশির প্রয়োজন তাঁরা হয়তো জীবনে অনুভব করেন নাই!

এই জন্যই আমরা চাই আমাদের অন্তঃপুরিকারা হোন রূপে লক্ষ্মী, শক্তিতে শক্তিময়ী। নারীকে আমাদের দেশে 'শক্তি' বলিয়া ঋষিরা অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। সেকালে বড়-বড় "যজ্ঞি"র কাজে মেয়েরা কি শক্তি না দেখাইতেন! একালের মেয়েরা একাসনে বসিয়া একশো পাণ সাজিতে মূর্চ্ছা যান! একালে বাঙলার নারী শক্তির সাধনা ছাড়িয়া রূপশ্রীকে যত মলিন ম্লান করিতেছেন, ততই রূপের লোভে রুজ-ব্লুম-পাউডার মাখিয়া কৌতুকের উৎস হইতেছেন! রূপশ্রীর মূলে যে শক্তি, সে শক্তির সাধনায় তাঁদের লক্ষ্য নাই! শক্তির সঙ্গে দেহে সহজেই সৌন্দর্য্যশ্রী ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন, এমন কয়েকটি ব্যায়াম-বিধি কথা বলিতেছি।

১। মেঝেয় বসুন—দু'পা সামনের দিকে প্রসারিত করিয়া দিন। বসিয়া দু'হাত রাখুন পিছন দিকে—মেঝেয় রাখিবেন দুই কর-তল। তার পর একসঙ্গে জোড়-বাঁধা অবস্থায় দুই পা তুলুন উর্দ্ধে; সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিকে একটু হেলিবেন ঠিক ঐ ১নং ছবির ভঙ্গীতে। তার পর দু' পা একসঙ্গে জোড়-বাঁধা অবস্থাতেই আবার সামনে প্রসারিত করিয়া দিন; সঙ্গে সঙ্গে সিধা হইয়া বসিবেন। এ ব্যায়াম করিবেন অন্ততঃ তিন মিনিট। বেশ দ্রুত তালে এ ব্যায়াম করিতে হইবে।
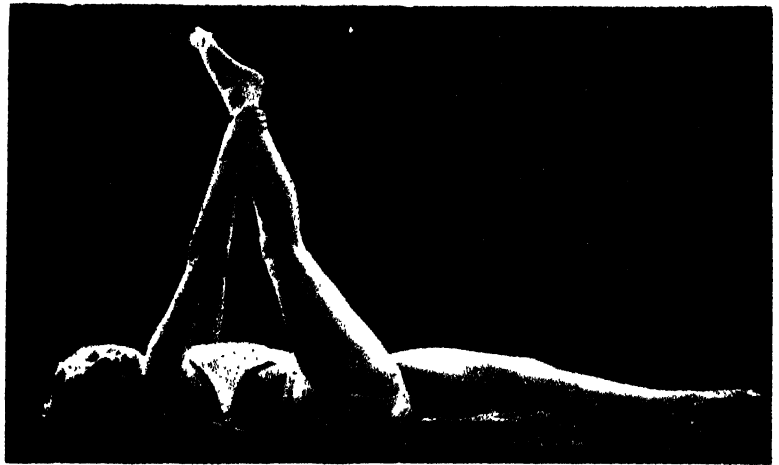
২। কোমর হইতে মাথা

৩। দু'হাতে ডান পা ধরিয়া

২। এবার দু'পা ফাঁক করিয়া দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া ২নং ছবির ভঙ্গীতে বেশ দ্রুত তালে একবার ডান দিকে পরক্ষণে বাঁ দিকে কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত ডাহিনে-বাঁয়ে ঝাঁকানি দিয়া দুলাইবেন। এ ব্যায়ামও করিবেন তিন-চার মিনিট।

৩। এবার চিৎ হইয়া শুইবেন—দু'পা প্রসারিত করিয়া। তার পর দুই হাত দিয়া ডান পা ধরিয়া ৩নং ছবির ভঙ্গীতে উর্দ্ধে তুলুন; বাঁ পা প্রসারিত এবং গোড়ালিটুকু মাত্র মেঝে স্পর্শ করিয়া

থাকিবে। তার পর ডান পা প্রসারিত করিয়া ঠিক এমনি ভাবে বাঁ পা তুলিতে হইবে। এ ব্যায়াম করিবেন অন্ততঃ চার মিনিট!

৪। এবার দু' পা ফাঁক করিয়া আবার দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া ৪নং ছবির ভঙ্গীতে ডান দিকে মাথা ফিরাইয়া ডান হাত প্রসারিত

৪। ডান দিকে মাথা ফিরাইয়া

৫। ডান হাত মুড়িয়া

৬। বাঁ হাত ঊর্দ্ধে
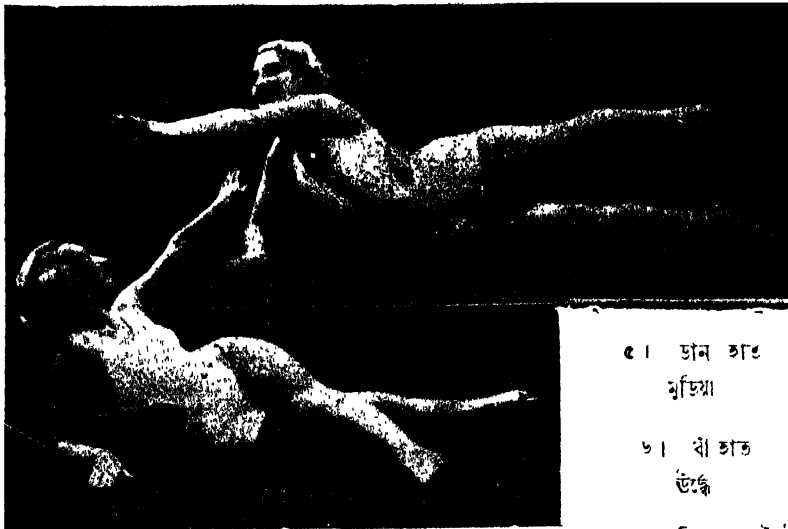
করিয়া কনুইয়ের কাছ হইতে বাঁ হাত বাঁকাইয়া ডান হাতের গুলি স্পর্শ করিবেন—দুই পায়ের ভঙ্গী থাকিবে ৪নং ছবির মত। পরক্ষণেই আবার বাঁ দিকে মাথা ফিরাইয়া বাঁ হাত প্রসারিত করিয়া ডান হাত বাঁকাইয়া বাঁ হাতের গুলি স্পর্শ করা! এ ব্যায়ামও বেশ দ্রুত তালে চার মিনিট করা চাই।

৫। এবার ৫নং ছবির ভঙ্গীতে কাৎ হইয়া ডান পা না নাড়িয়া সোজা রাখিয়া বাঁ পা তুলুন। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত মুড়িয়া তার উপর দেহের ভর রাখিয়া বাঁ হাত প্রসারিত করিয়া দিন। পরক্ষণেই ৬নং ছবির ভঙ্গীতে বাঁ হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ডান পায়ের উপর বাঁ পা রাখিয়া অবস্থান। ৫নং ও ৬নং ছবির দু'টি ব্যায়াম পর-পর করিতে হইবে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট।

এ কয়টি ব্যায়াম নিত্য নিয়মিত করিলে অঙ্গ যেমন সৌন্দর্য্য-সৌষ্ঠবে ভরিয়া উঠিবে, তেমনি দেহে শক্তি মিলিবে প্রচুর!

ঠাঁই-ঠাঁই

একালে একান্নবর্ত্তিতা কেন টিকছে না—সে কথা নিয়ে মাঝে-মাঝে কাগজে আলোচনা দেখি। খরচের মাত্রা এখন খুব বেড়েছে; নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও লক্ষ্য বেড়েছে তেমনি। তার জন্য টাকা-পয়সা সম্বন্ধে আমাদের স্বার্থের মাত্রাও অনেকখানি বেড়েছে। সেকালে নানা দিকে খরচ ছিল এবং সে-খরচের ব্যাপারে মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সুখের দিকে একালের মত এতখানি মনোযোগী ছিলেন না। দোল-দুর্গোৎসবে এবং পারিবারিক সকল অনুষ্ঠানে খরচ করতে বাধতো না। জিনিষপত্রের দাম ছিল অল্প, অবস্থা ছিল সাধারণতঃ স্বচ্ছল; এবং আয়োজনের চেয়ে প্রয়োজনেই মানুষ পয়সা খরচ করতো। এখন যে-ভাই রোজগার করেন মাসে এক-হাজার টাকা, তাঁর গৃহিণী সে-টাকা নিজের ছেলে-মেয়ে স্বামীর জন্য খরচ করে' তা থেকে সঞ্চয়ের প্রয়াসী। সে-টাকা থেকে ত্রিশ-টাকা মাহিনার দাওর-ভাসুরের আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য ঘুচুক—এতে এ-কালের গিন্নীরা নারাজ!

এই নারাজী নিয়ে কথা উঠলে এর সপক্ষে এবং বিপক্ষে যে-যুক্তি তোলা হবে, অর্থনীতির দিক দিয়ে সে-যুক্তি হয়তো অকাট্য। যাঁরা সমাজনীতির কথা তুলবেন, তাঁরা বলবেন—নিজের বিলাস-সুখই সব? মায়া-মমতা স্নেহ-প্রীতির কি কোনো দাম নেই? আর এ-যুগে স্নেহ-মায়া-মমতার দাবী যে কমে আসছে, এ-কথা মর্ম্মান্তিক হলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই!

কিন্তু এ সব অর্থ-বা-সমাজ-তত্ত্বের কথা নিয়ে আলোচনা করছি না। আমার মনে হয়, অনেকে যে বলেন একান্নবর্ত্তী পরিবারে আজ এই যে-ফাট বেড়ে চলেছে, সে জন্য একালের মেয়েরাই বেশী দায়ী। একালে আমরা না কি এত বেশী স্বার্থপর আর অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি যে, নিজের স্বামী আর ছেলে-মেয়েকেই শুধু মানি আপন-জন বলে'। তাই স্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারের গণ্ডী রচে তার পর অপরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতি বা সম্পর্ক মেনে চলি। এই সম্পর্ক পাতা এবং মানা—এও নির্ভর করে আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপর। যারা আমাকে মানবে, শুধু তাদের নিয়েই বাস করবো। যারা আমার ব্যক্তিগত আচরণাদির বিরুদ্ধে এতটুকু

ইঙ্গিত করবে, তাদের সহ্য করতে পারি না। এই জন্যই একালে আমাদের গণ্ডী খুব সঙ্কীর্ণ হচ্ছে। তাতে খাওয়া-পরা ও বিলাসিতা রক্ষা করতে পারছি, সে কথা ঠিক,—কিন্তু রোগে-শোকে-বিপদে খাঁটা স্নেহ বা দরদ সাহায্য কি পাই? আগে একান্নবর্ত্তী পরিবারে এক জনের রোগ হলে রোগীর সেবার জন্য বাড়ীতেই লোক মিলতো—এখন সেবায় লোকের অভাব হচ্ছে—মাহিনা-করা নার্শ ডাকতে হয় তাই। এতে সমাজে পোজিশনের পাব্‌লিশিটি হলেও রোগের সময় নিজেকে অসহায় বলে' মনে হয় না কি?

কিন্তু এ শিবের গীত গেয়ে লাভ নেই! আমাদের মনে হয়—কাল-ধর্ম্মে যা যাচ্ছে, তাকে জোর করে টেনে রাখবার চেষ্টা মিথ্যা হবে। কারণ, কাল-ধর্ম্মে আমাদের মনের গড়ন, সংস্কার—সব ভেঙ্গে বদলে যাচ্ছে। মনকে সংযত করে সুনিয়ন্ত্রিত করবো, স্বার্থ একটু বিসর্জ্জন দেবো, সে শক্তিও আজ আমাদের নেই—সে-শক্তির সাধনাতেও আমরা বিমুখ।

এ কথা ঠিক যে, সংসারে শান্তি চাই সর্ব্বাগ্রে; এবং এ শান্তি পেতে ও রক্ষা করতে হলে আলাদা থাকাই ভালো। কাটাকাটি-মারামারি করে সংসারকে কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে পরিণত করবার আগেই যদি ভাই-ভাই মানে-মানে ঠাঁই-ঠাঁই হয়, তাতে আর যে দুঃখই ভোগ করি না কেন, ভায়ে-ভায়ে জায়ে-জায়ে অপ্রীতি হয়তো নিবিড় হবে না! এ সম্বন্ধে একালের মেয়েদের অসহিষ্ণুতা এবং আত্মসুখপরায়ণতার মাত্রা দিন-দিন কি ভাবে বেড়ে চলেছে এবং তার ফলে অসহায়তার বোঝা ভারী হয়ে এক দিন কি অনর্থ সৃষ্টি করবে, ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়! দাসী-চাকর-বামুনকে যত মাহিনাই দিই, ভাই বা জায়ের চেয়ে তারা দরদ করতে পারবে না! তাছাড়া হৃদয়কে ছোট করে' ফেলার জন্য ছেলেমেয়েরা যদি পরে আমাদের অগ্রাহ্য করে, আমাদের সুখ-দুঃখের কথা না ভাবে, তাহলে সে আঘাত সহ্য হবে তো? কাকা-জ্যাঠাকে মা-বাপ গ্রাহ্য করেন না দেখে ছেলে-মেয়েরা ছোট বয়স থেকেই যদি বোঝে, ভাই-বোন পর,—তাহলে তাদের দোষ দেওয়া যাবে না!

ছোটদের আসর

সোনার বালুর চর

মধুপুরে গাড়ী দাঁড়াতেই সলিল বললে—"এসো গগন, এইখানেই নেমে পড়া যাক্।"

শ্লেষের সহিত গগন বললে—"মধুপুরে! কেন? স্বাস্থ্য-অন্বেষণ?"

হেসে সলিল উত্তর দিলে—"শুধু স্বাস্থ্য নয়, শান্তিও। কিছু দিন চুপচাপ বসে চিন্তা না করলে নতুন প্ল্যান মাথায় আসবে না। এটাকে তুমি শান্তিপর্ব্বও বলতে পারো, আবার উদ্যোগপর্ব্বও বলতে পারো।"

"মধুপুরে কোথায় থাকবে?" বিরক্ত হয়ে গগন প্রশ্ন করলে।

ততক্ষণে তারা প্ল্যাটফর্ম্মে নেমে পড়েছে। সলিল হেসে উঠল; গগন সলিলের হাসি বরদাস্ত করতে পারলো না।

রাগত স্বরে গগন বললে—"কথার উত্তরে স্রেফ দাঁত বার করে হাসলে আমার পিত্ত জ্বলে ওঠে।" সলিল কিন্তু এতে মোটেই দমল না। তেমনি নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে বললে—"আরে বন্ধু, তোমার পিত্তাধিক্য হয়েছে। সেই জন্য বায়ু-পরিবর্ত্তন আবশ্যক। মধুপুর থেকে একটু দূরে মহেশমুণ্ডা বলে একটা ষ্টেশন আছে। সেখানকার জল খুব ভালো। বিশ্রাম, শান্তি এবং শরীর সারাবার জন্য একেবারে আদর্শ স্থান। কিছু দিন সেইখানেই ডেরা করতে হবে।"

অতঃপর মধুপুর-গিরিডি লাইনের গাড়ী চড়ে উভয়ে মহেশমুণ্ডায় উপস্থিত হলো। স্থানটি সত্যই অপূর্ব্ব। মধুপুরের মত ভীড় নেই। অথচ মধুপুর এবং গিরিডি দু-ই কাছে। যখন ইচ্ছা বেড়িয়ে এলেই হলো। একটি বাড়ীর সামনে গিয়ে সলিল দারোয়ানকে ডেকে বললে—"ওরে, আমরা ক'লকাতার কলেজের ডাক্তার প্রিয়নাথ বসুর বাড়ী থেকে আতা হ্যায়। তোর নামটা কি ভুলে গেছি বাপু।"

দরোয়ান প্রকাণ্ড সেলাম ঠুকে বললে—"হুজুর হামারা নাম রামটহল পাঁড়ে।"

এক গাল হেসে সলিল বললে—"ঠিক, ঠিক, রামটহল পাঁড়ে। তা পাঁড়েজী আচ্ছা আছ তো? আমি হলুম গিয়ে ডাক্তার বাবুর নাত-জামাই আর এটি আমার দোস্ত, বুঝা?"

"জী হুজুর!"

পকেট থেকে এক টাকার একখানি নোট রামটহলের হাতে গুঁজে দিয়ে সলিল বললে—"এটা তুম রাখো। আমরা দো-চার দিন থাকে গা। একটু খাবার-দাবার কা বন্দোবস্ত করেগা, পারেগা তো?"

আবার এক দফা সেলাম বাজিয়ে রামটহল বললে—"জরুর। ঘাব্‌ড়াইয়ে মৎ, হাম সব ঠিক কর দেগা। হুজুর কা কোই তরহ কা তকলীফ নেহি হোগা।"

রামটহল বাড়ীর ঘর খুলে দিলে। সলিল ও গগন সেইখানে বসল! ডাক্তার বসুর বাড়ীতে ফার্ণিচারের অভাব ছিল না। সুতরাং অসুবিধার কোন কারণই ঘটল না। রামটহল ষ্টেশন থেকে দু'জনের জন্য দু'পেয়ালা চা আনতে গেল। বাড়ীটা ষ্টেশন থেকে খুবই নিকটে।

বিস্মিত হয়ে গগন প্রশ্ন করলে—"ভায়া, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। তুমি তো বিয়েই করনি, ডাক্তার বসুর নাত-জামাই কি করে হলে? আর তাঁর সম্বন্ধে এত খবরই বা রাখলে কি করে?"

সলিল হেসে উত্তর দিলে—"শক্ত কি। একটু চোখ-কান খুলে রাখলে সবই ঠিক হয়ে যায়। আমার এক আত্মীয় ব্যারাকপুরে থাকে। তার সঙ্গে ডাক্তার বাবুর নাত-জামাইয়ের আলাপ আছে। সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও আলাপ হয়। কথায় কথায় জানতে পারি, মহেশমুণ্ডায় ডাক্তার বাবুর বাড়ী আছে, তার পর দুই আর দুইয়ে চার। অতি সহজ সরল।"

গগন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সলিলের দিকে চেয়ে থেকে বললে—"ধন্য বন্ধু, ধন্য।"

দিন কাটে—দিব্য আরামে। আহার, নিদ্রা আর ভ্রমণ! আজ

মধুপুর, কাল গিরিডি। ষ্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে খুবই আলাপ জমে গেছে। মাছ মাংস রামপাখী তোফা চলেছে। স্বাস্থ্য-শান্তি সবই মিলছে, কিন্তু উদ্যোগ কই? মধ্যে মধ্যে গগন বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে—"এ রকম কুড়ে আর নিষ্কর্ম্মার মত কত দিন বসে থাকতে হবে?"

মুচ্‌কি হেসে সলিল উত্তর দেয়—"ধীরে বন্ধু, ধীরে! ব্যস্ত হয়ো না। যথাসময়ে যথাকর্ত্তব্য সব ঠিকই করা হবে। এখন স্রেফ বিশ্রাম।" গগন চুপ করে যায়, কিন্তু মনটা খুঁত খুঁত করতে থাকে।

এক দিন মধুপুর থেকে সলিল বেড়িয়ে ফিরল, হাতে একটা এয়ার-গান আর একটা উকো। বিস্মিত হয়ে গগন প্রশ্ন করলে—"এ আবার কি পাগলামি?"

সলিল হেসে উত্তর দিলে—"নব উদ্যোগের অস্ত্র।"

তার পর উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হলো। সোনার অলঙ্কার উকো দিয়ে ঘষা আর বাগানের এক-তাল মাটী এনে এয়ার-গানের সাহায্যে সেই ঘষা সোনা মাটীর মধ্যে মেশানো। চার-পাঁচটা বড় বড় মাটীর চাপড়া সুবর্ণমিশ্রিত করতে প্রায় দিন পনেরো কেটে গেল। হঠাৎ এক দিন সলিল বললে—"এখানকার ডেরা এইবার তুলতে হবে। ব্রজের খেলা সাঙ্গ হল যাব এবার মথুরায়।" সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে গগন বললে—"মথুরাটা কোথায়?" সলিল গম্ভীর-ভাবে উত্তর দিলে—"সুদূর দাক্ষিণাত্যে—মাদ্রাজে।"

"এত দেশ থাকতে মাদ্রাজে কেন?" গগন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে। হাতের খবরের কাগজটা গগনের দিকে এগিয়ে দিয়ে সলিল উত্তর দিলে—"এই ব্যাপারটা পড়ে দেখ।"

গগন পড়লে—"মাদ্রাজের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও ধনকুবের সার সম্মুখম্ বৈদ্যনাথন্ ১৮ই জুন পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র রামেশ্বরম্ কৃষ্ণস্বামী বৈদ্যনাথন্ এই বৎসর বি-এ পাশ করিয়াছেন।...আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

সলিলের হাতে কাগজখানি ফেরত দিয়ে গগন বললে—"পড়লুম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমাদের সঙ্গে মাদ্রাজের বৈদ্যনাথনের সম্বন্ধটা কি?"

ঈষৎ হেসে সলিল উত্তর দিলে—"শীঘ্রই খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এখন মাদ্রাজ যাত্রা করতে হবে।"

মাদ্রাজ! মাউণ্ট রোডস্থিত বিরাট অট্টালিকার দ্বিতলে খান তিনেক ঘর নিয়ে এক নতুন আপিস "পিটারসন জেফারসন এণ্ড কোম্পানী, মাইনিং এঞ্জিনীয়ার্স।" কার্পেটমণ্ডিত সুসজ্জিত ঘরগুলি। হাল-ফ্যাশনের ফার্ণিচার। মিষ্টার পিটারসনের খাস-কামরায় তিনি এবং সার সম্মুখম্ বৈদ্যনাথনের একমাত্র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মিষ্টার রামেশ্বরম্ কৃষ্ণস্বামী বৈদ্যনাথন্ নিম্ন স্বরে কথোপকথনে নিমগ্ন।

মিষ্টার পিটারসন বললেন—"দেখুন মিষ্টার বৈদ্যনাথন্, আমি আপনাকে পাকাপাকি ভাবে কিছুই বলতে পারব না। আমার বন্ধু এবং অংশীদার মিষ্টার জেফারসন কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত মধ্য-আফ্রিকার জঙ্গলে ছিলেন। দিন দুই হ'ল তাঁর একটা কেব্‌ল পেয়েছি, স্পেশাল বিমান ভাড়া করে তিনি মাদ্রাজে আসছেন। আমাদের আবিষ্কৃত ধোপাগাধাও নদীর সন্ধান পৃথিবীতে এখনো পর্য্যন্ত কেউ জানে না। আমরা এক দিন দেখলুম, রৌদ্রালোকে সেই নদীর চরভূমি চিক্‌চিক্ করছে। মনে সন্দেহ হল, বিস্ময় হল। এক চাপড়া মাটী ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলুম, বালি আর কাদার সঙ্গে মিশে রয়েছে সোনার গুঁড়ো। আনন্দের আতিশয্যে কিছুক্ষণ আমাদের মুখ দিয়ে কথা পর্য্যন্ত বার হ'ল না। পরে জেফারসন পাগলের মত দু'হাত তুলে চীৎকার করে উঠল—'সোনা'! আমিও সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলুম 'সোনা'! তারপর দু'জনের সে কি তাণ্ডব নৃত্য! নিগ্রো কুলীরা হয়তো আমাদের উন্মাদ মনে করল।"

মিষ্টার বৈদ্যনাথনের চক্ষু তো ছানাবড়া! পিটারসন বলে কি? এ যে সোনার বালুর চর। কনসার্ণটা হাতাতে পারলে মন্দ হয় না। বৈদ্যনাথন্ ভাবলে, কথা শুনেই আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছি আর পিটারসন তো নিজে চোখে দেখেছে। ভাগ্যিস্ পাগল হয়ে যায়নি। অধীর আগ্রহে সে প্রশ্ন করলো, "তার পর?"

পিটারসন বললেন—"তার পর কি! সেখানকার জমিটা আমরা দখল করে ফেললুম। সোনার স্তূপের উপর আমাদের করায়ত্ত হ'ল। কিন্তু সেই সোনা বাজারে এনে না বেচতে পারলে তো কোন লাভই হবে না। অনেক টাকার ধাক্কা। সেখানে যন্ত্রপাতি বসাতে হবে। সেই সোনা পরিষ্কার করে বাজারে ছাড়তে হবে। অবশ্য টাকা আমাদের হাতে আছে, কিন্তু তা পর্য্যাপ্ত নয়। তাই মনে করছি, লিমিটেড কনসার্ণ করে শেয়ার বেচে প্রয়োজনীয় অর্থ তুলবো। আমার অংশীদার জেফারসনের তাতে বিলক্ষণ আপত্তি আছে। সে বলে, যত বেশী লোককে টানা হবে ততই আমাদের ভাগ কমে যাবে। কথাটা অবশ্য সত্য। কিন্তু এ ছাড়া তো অন্য কোন উপায়ও দেখছি না।"

মিষ্টার বৈদ্যনাথন্ জিজ্ঞেস করলেন—"সঙ্গে কিছু স্যাম্পল এনেছেন কি?" পিটারসন উত্তর দিলেন—"নিশ্চয়! নমুনা না দেখাতে পারলে লোকে আমার কথা বিশ্বাস করবে কেন? এখান থেকে ওখান থেকে অ্যাট র‍্যাণ্ডাম কয়েকটা মাটীর চাপড়া নিয়ে এসেছি।"

"আমাকে দেখাতে কোন আপত্তি আছে?"

"কিছু না। এখনই দেখাচ্ছি।" এই বলে পিটারসন উঠে গিয়ে লোহার সিন্দুকের চাবী খুলে তার ভিতর থেকে একটি মাটীর চাপড়া বার করলেন। বৈদ্যনাথন্ মাটীর চাপড়ার মধ্যে সোনার কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে পিটারসনের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে পিটারসন বললেন—"বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই। পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

মিষ্টার বৈদ্যনাথন্ বললেন—"দেখুন, আমি আপনাদের কিছু টাকা দিতে পারি, যদি আপনারা আমাকেও এক জন পার্টনার করে নেন। কিন্তু তার আগে আমি একবার কোন এক্সপার্টকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে চাই। অবশ্য যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে!"

পিটারসন বললেন—"আপত্তি কিসের? আপনি এক চাপড়া স্যাম্পল নিয়ে যান। কোন এক্সপার্টকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখবেন। তবে আপনাকে পার্টনার করতে পারব কি না, সে কথা

এখন সঠিক বলতে পারছি না। জেফারসনের মত না নিয়ে—বুঝতে পারছেন তো?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়"—মিষ্টার বৈদ্যনাথন্ বললেন। "তবে আমার কথাটা ভেবে দেখবেন। লিমিটেড কোম্পানী করলে অনেক লোককে অংশ দিতে হবে। আপনারা দু'জন আর আমি—মাত্র তিন ভাগ। লাভের বখরাটা বেশ মোটা-রকম হবে। মিছামিছি পাঁচ ভূতের পেট ভরিয়ে কি লাভ?"

"বটেই তো! আপনি খুব উচিত কথাই বলেছেন। তবুও আমার অংশীদার মিষ্টার জেফারসনের মতটা একবার নেওয়া দরকার। আর সে তো কেবল অংশীদারই নয়, সে আমার বন্ধু।"

"মত নেবেন বই কি! আচ্ছা, আজ উঠি। মিষ্টার জেফারসন কবে এসে পৌঁছবেন?"

"বোধ হয় কালই এসে পড়বে।"

"তবে আমি পরশু আসব। এর মধ্যে মাটিটা পরীক্ষাও করিয়ে নেবো।"

"নিশ্চয়ই! কাজে নামতে গেলে—বিশেষ যেখানে টাকার ব্যাপার, এতটুকু সন্দেহ থাকলে চলে না।"

"আমি তবে আজ চলি। নমস্কার!"

"নমস্কার।"

মিষ্টার বৈদ্যনাথন্ চলে গেলেন। মিনিট খানেক পরেই পাশের ঘর থেকে মিষ্টার জেফারসন বেরিয়ে এলেন।

পিটারসন হেসে বললেন—"সব শুনলে?"

জেফারসন উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ! আশাপ্রদ। এখন গেঁথে তুলতে পারলে হয়।"

পিটারসন তাঁর অংশীদারের পিঠ চাপড়ে বললেন—"কিছু ভেবো না ব্রাদার! পুরুষের ভাগ্য স্বয়ং দেবতারও অগোচর। যদি ভাগ্যে থাকে তবে কেউ রদ করতে পারে না!"

নির্দ্দিষ্ট দিনে মিষ্টার বৈদ্যনাথন্ এসে হাজির। অফিসে মিষ্টার পিটারসন ও জেফারসন দু'জনেই ছিলেন। পিটারসন পরিচয় করিয়ে দিলেন—"ইনি মিষ্টার বৈদ্যনাথন্, স্যর সম্মুখম্ বৈদ্যনাথনের একমাত্র পুত্র এবং অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, আর ইনি আমার বন্ধু এবং অংশীদার মিষ্টার জেফারসন। আজই এরোপ্লেনে মাদ্রাজ এসে পৌঁচেছেন।"

নমস্কার এবং কুশল-প্রশ্নাদি সাঙ্গ হবার পর মিষ্টার পিটারসন প্রশ্ন করলেন—"তার পর মিষ্টার বৈদ্যনাথন্, আমাদের স্যাম্পলটা পরীক্ষা করিয়েছেন?"

মিষ্টার বৈদ্যনাথন্ উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ। রেজাল্ট খুবই ভাল। শতকরা প্রায় পনেরো ভাগ সোনা আছে।"

মিষ্টার পিটারসন বিস্মিত হয়ে চোখ কপালে তুলে বললেন—"বলেন কি? আমরা অতটা ভাল রেজাল্ট আশা করিনি। ভেবেছিলুম হয়তো শতকরা ৫।৬ ভাগ হবে।"

মিষ্টার বৈদ্যনাথন্ বললেন—"আজ তো মিষ্টার জেফারসনও রয়েছেন। এইবার কাজের কথা পাড়া যাক। আমাকে আপনারা এক জন পার্টনার করবেন কি?"

মিষ্টার জেফারসন একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"পার্টনার? কিসের? পিটারসন, তুমি তো আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলোনি!"

মিষ্টার পিটারসন বললেন—"বলবার আর সময় পেলুম কই? আমি ভাবছিলুম, অনেকটা ক্যাপিটেল হাতে পেলে কাজটা তাড়াতাড়ি হবে। তাই আমাদের কনসার্ণটাকে লিমিটেড করব।"

মিষ্টার জেফারসন রেগে বললেন—"আমরা এত কষ্ট করে প্রাণের মায়া ছেড়ে আবিষ্কার করলুম আর পাঁচ ভূতে তা থেকে পয়সা লুটবে? অসম্ভব। এ হতেই পারে না।"

মিষ্টার বৈদ্যনাথন্ বললেন—"সেই কথাই তো আমি বলছি। অত লোককে লাভের অংশ না দিয়ে যদি আপনারা দু'জন আর আমি এই তিন জনে মিলে টাকাটা দিই, তবে প্রত্যেকের ভাগেই অনেকটা করে পড়ে।"

মিষ্টার পিটারসন সায় দিয়ে বললেন—"আমার মতে মিষ্টার বৈদ্যনাথনের যুক্তি খুবই সমীচীন।"

মিষ্টার জেফারসন প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু ভাগটা কি রকম হবে?"

মিষ্টার পিটারসন বললেন—"আমি হিসেব করে দেখেছি, যন্ত্রপাতি সব ফিট করে ভাল ভাবে কাজ করতে গেলে আমাদের প্রায় চার লাখ টাকা ক্যাপিটালের প্রয়োজন। আমরা দু'জনে মিলে যদি দু'লাখ টাকা দিই আর মিষ্টার বৈদ্যনাথন দু'লাখ দেন, তাহলে তিন জনের সমান ভাগ হতে পারে! আমাদের আবিষ্কারের একটা দাম আছে তো।"

মিষ্টার বৈদ্যনাথন্ বললেন—"নিশ্চয়ই! আপনি খুব ন্যায্য কথাই বলেছেন। আমার এতে কোন আপত্তি নেই।"

মিষ্টার জেফারসন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—"বেশ তাই হোক। অবশ্য আমার ইচ্ছা ছিল কাউকে কিছু না জানিয়ে আমরা অল্প পরিমাণে কাজ করে ধীরে ধীরে ক্যাপিটেল বাড়িয়ে ফেলব। তবে আমার বন্ধু পিটারসনের যখন এই মত, তখন আর আমি আপত্তি করবো না।"

মিষ্টার পিটারসন বললেন—"আমার এই অনুরোধ বন্ধু। এতে কাজ তাড়াতাড়ি হবে এবং লাভও বেশী হবে। তুমি তাহলে কিছু নগদ টাকা হাতে নিয়ে আফ্রিকা চলে যাও। আমি আর মিষ্টার বৈদ্যনাথন্ এখানে থেকে মার্কেটের ব্যবস্থা করি।"

মিষ্টার জেফারসন বললেন—"বেশ। তবে টাকার বন্দোবস্ত কর।"

মিষ্টার বৈদ্যনাথন্ প্রশ্ন করলেন—"সমস্ত টাকাটাই কি এখন দিতে হবে?"

মিষ্টার পিটারসন্ বললেন—"দিলে ভাল হয়। তবে এখনই সবটার দরকার কি? আপনি এখন হাজার পঞ্চাশেক দিন। কাজটা চালু হোক। তার পর যখন যেমন প্রয়োজন হবে, দেখা যাবে।"

মিষ্টার বৈদ্যনাথন্ বললেন—"আমিও এই কথা বলছিলুম। কিন্তু এই পার্টনারশিপ ব্যাপারের একটা লেখাপড়া থাকা উচিত নয় কি?"

পিটারসন বললেন—"নিশ্চয় থাকবে। কাল এগারোটা নাগাদ আসবেন। আমি এক জন উকিলের বন্দোবস্ত করে রাখব। সেই সময় নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকাও সঙ্গে আনবেন। কালই তাহলে একটা প্লেন ভাড়া করে জেফারসন চলে যাক। আমার ইচ্ছা—পরে আমরা দু'জনেও একবার যাব। যে কাজের জন্য আপনি অর্থ ব্যয় করছেন, নিজের চোখে একবার সেটা দেখা দরকার।"

"সে তো বটেই। তাহলে এই কথাই রইল। আমি কাল সকালেই আসছি। নমস্কার।"

মিষ্টার বৈদ্যনাথন্ চলে গেলেন। জেফারসন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—'দু' লাখ থেকে একেবারে হঠাৎ পঞ্চাশ হাজারে নেমে গেলে কেন?"

পিটারসন হেসে বললেন—"যতখানি হজম হয় ঠিক ততখানি খাওয়াই ভাল। একেবারে দু' লাখ চাইলে বৈদ্যনাথনের মনে সন্দেহ জাগত। হয়তো সবই ফস্কে যেতো। এতে ওর মনে বিশ্বাস জেগেছে। জানই তো, বিশ্বাসে মিলায় অর্থ সন্দেহে বহু দূর।"

পরদিন ঠিক সময়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে মিষ্টার বৈদ্যনাথন্ এসে উপস্থিত পিটারসন জেফারসনের অফিসে। পিটারসন তাঁকে কি ভাবে লেখাপড়া হবে তার একটা খসড়া দেখালেন। বৈদ্যনাথন্ খুবই খুশী হলেন। তার পর পিটারসন বললেন—"জেফারসন গেল টিফিন করতে গেছে। এখনই এসে পড়বে। উকিলেরও আসবার সময় হয়েছে। আপনার টাকাটা দিন। আমি এখন একটা রসিদ লিখে দিচ্ছি। কোন আপত্তি নেই তো?"

"না, না, আপত্তি কিসের?" এই বলে বৈদ্যনাথন্ পকেট থেকে এক-তাড়া নোট বার করে পিটারসনের হাতে দিলেন। বললেন—"গুণে দেখে নিন, ঠিক আছে কি না!"

পিটারসন নোটগুলি গুণছেন এমন সময় দ্বারপ্রান্তে এক জন পুলিশ অফিসারের মূর্ত্তি দেখা দিল। গম্ভীর কণ্ঠে অফিসার বললেন —"পিটারসন, তোমার চালাকী ধরা পড়ে গেছে। এই ভাবে বোগাস কোম্পানির কথায় ভুলিয়ে তুমি অনেকের সর্ব্বনাশ করেছ। এখন তুমি সোজাসুজি ভাবে কোন গণ্ডগোল না করে থানায় যাবে, না হাতে হাতকড়া দিতে হবে? মনে রেখো, গোলমাল করে কোন ফল হবে না।"

পিটারসন অবনত মস্তকে বললেন—"না, গোলমাল করব না।"

বৈদ্যনাথন্ যেন একেবারে পাথরের পুতুল বনে গেলেন। এ রকম কাণ্ড হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নোটগুলির দিকে হাত বাড়ালেন। পুলিশ অফিসার তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—"ওগুলি এখন নেবেন না। আপনার নাম?"

"আমার নাম রামেশ্বরম্ কৃষ্ণস্বামী বৈদ্যনাথন্।"

"আই সী। আপনি স্যর সন্মুখম্ বৈদ্যনাথনের পুত্র! এবার বুঝি পিটারসন আপনাকে ঘায়েল করবার মতলবে ছিল। খুব বেঁচে গেছেন। আপনি এক কাজ করুন। আপনার উকিলকে নিয়ে একবার ষ্ট্রাণ্ড রোডের থানায় আসুন। আমি একে সেইখানেই নিয়ে যাচ্ছি। আপনার টাকা এখন আমার জিম্মাতেই রইল। সেখানে এর জবাববন্দী নিয়ে আপনাকে টাকা ফেরৎ দেব। কত আছে?"

"পঞ্চাশ হাজার।"

একটা রসিদ লিখে বৈদ্যনাথনের হাতে দিয়ে পুলিশ অফিসার বললেন—'এই নিন রসিদ। আপনি যত শীঘ্র পারেন থানায় আসুন। একে আমি নিয়ে চললুম। আমার নাম সার্জ্জেণ্ট লেসলী। গেট-কীপারকে বলে রাখবো—গেটে খোঁজ করলেই আপনাকে ভেতরে নিয়ে যাবে।'

আধ ঘণ্টা পরে বৈদ্যনাথন যখন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়ে সার্জ্জেণ্ট লেসলির খোঁজ করলেন, তখন যা শুনলেন তাতে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগলো। সার্জ্জেণ্ট লেসলি! নাঃ, ও নামের তো কেউ নেই। তখনই তিনি পুলিশ-কমিশনারকে গিয়ে সব কথা বললেন। খোঁজ-খোঁজ! কোথায় সার্জ্জেণ্ট লেসলি আর কোথায় পিটারসন! সব যেন কর্পূর হয়ে উড়ে গেছে! সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকাও হাওয়া!

হু-হু করে মাদ্রাজ মেল চলেছে। একটি সাষ্ট ক্লাস কামরায় দু'জন মাত্র যাত্রী। দৌহিন গোলার পলা নাচানো। এক জন বললে— "তোমার বুদ্ধিকে তারিফ করতে হয়। অদ্ভুত প্ল্যান। সোনার বালুর-চর সত্যই সোনা ফলিয়েছে। পঞ্চাশ হাজার—এক কোপে! আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।"

আর এক জন মৃদু হেসে বললে—"সবই তাঁর ইচ্ছা। তারা লক্ষ্মী! আমার মাথাটাই সোনার বালুর চর। এই মাথাটিকে অবজ্ঞা করো না!"

এরা? বলিলে যেন আর বলা হয়। পিটারসন আর জেফারসন কোম্পানির পার্টনার্স। একটি পিটারসন আর সার্জ্জেণ্ট লেসলি।

মাদ্রাজ মেল হু-হু করে ছুটে চলেছে—যেন হাওয়া!

শ্রীযামিনীমোহন কর

অন্ধের যষ্ঠি

ক'বছর আগে কাশীতে দেখিয়াছিলাম এক অন্ধ ভিখারীকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে একটি কুকুর! ভিড় ধাক্কা বাঁচাইয়া, পথের চলন্ত গাড়ী-ঘোড়ার আঘাত বাঁচাইয়া অন্ধের পথ পরিক্রমণকে সে শুধু নিরাপদ করিত না—যোগ্য ব্যক্তি দেখিলে তাঁর সামনে সে অন্ধকে দাঁড় করাইত—সঙ্কেত বুঝিয়া অন্ধ তখন পথিকের কাছে ভিক্ষা চাহিত!

অন্ধের যষ্ঠি হইয়া কুকুরের এই নিপুণ সাহায্য এ দেশে আর প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আমেরিকার নিউ জার্শিতে মরিশ টাউনে একটি শিক্ষা-সদন আছে। সে-সদনে জার্মান শেপার্ড জাতের বড় কুকুরকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া অন্ধের বন্ধু করিয়া তুলিবার সুব্যবস্থা আছে। শিক্ষা-সদনের নাম—'দেখিবার চক্ষু' অর্থাৎ The Seeing Eye.

ছাত্র-কুকুরদের প্রথমে এখানে শিখানো হয় সহরের পথ-ঘাট অলি-গলির অবস্থান, লোক-জন এবং গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় বাঁচাইয়া কি করিয়া পথ চলিতে হয়, সে-বিদ্যাও কুকুরকে সযত্নে শিখানো হয়—কুকুর এ বিদ্যায় বেশ পারদর্শী হইয়া ওঠে! এ শিক্ষার সঙ্গে সিঁড়ি ওঠা-নামা, বাসে ওঠা-নামা এবং পথে নিরাপদে চলার সমস্ত কৌশল শিখাইয়া কুকুরকে এমন প্রবীণ করিয়া তোলা হয় যে, এ বিদ্যা শিখিয়া এ সব কুকুর অন্ধের 'যষ্ঠি' হইয়া ওঠে। কুকুরের গলার দড়ি ধরিয়া বিনা-লাঠিতে অন্ধেরা অনায়াসে এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ ভাবে পথ চলিতে পারে—এতটুকু বিপদ ঘটে না! দড়ি-বাঁধা কুকুর অন্ধকে লইয়া অতি-দীর্ঘ সর্পিত মন্থর গতিতে পথ চলে না—পথে তাদের গতি যেমন সাবলীল তেমনি দ্রুত এবং অন্ধও কুকুরের দড়ি ধরিয়া কুকুরের গতির সঙ্গে তাল রাখিয়া পথ চলিতে এতটুকু অসুবিধা বোধ করে না!

চৌদ্দ মাস বয়স হইলে তবে এ-জাতের কুকুরকে মরিশ টাউনের শিক্ষা-সদনে লওয়া হয় শিক্ষা-দানের জন্য। প্রথম শিখানো হয় কথার বাধ্য হইতে। সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত পাইবামাত্র জিনিষ বহিয়া আনা, ওঠা, বসা, শোওয়া, দৌড়ানো—এ-সব শিখানো হয় নিখুঁত ভাবে। অন্য কুকুর বা বিড়াল বা পাখী দেখিলে তাদের তাড়া করা কুকুরের স্বভাব; এ স্বভাবটুকু তাদের ত্যাগ করানো হয়। তার পর শিখানো

শেপার্ড-কুকুর ও অন্ধ

হয় গাইডের কাজ। ফুটপাথের কিনারা হয় পথের চেয়ে উঁচু—এ-কিনারা হইতে পথে নামিবার সময় থামিয়া তার পর সতর্ক ভাবে পথে নামা—এটুকু শিখিয়া কুকুর অন্ধকে পথে নামাইতে পারে। সামনে-পিছনে, ডাহিনে-বাঁয়ে চলো—কথা বলিয়া-বলিয়া তাকে এমন শিখানো হয় যে, তার ফলে অন্ধও তাকে পথে ঠিক ভাবে পরিচালনা করিতে পারে। তার পর পথের গ্যাসপোষ্ট, অন্য পোষ্ট বা বাধা—এ-সবের আঘাত বাঁচাইয়া, কাহারও সহিত না ধাক্কা লাগে—সব দিক সামলাইয়া তাকে চলিতে শিখানো হয়। এ শিক্ষায় সে নিজে যেমন আঘাত বা বাধা প্রভৃতি সামলাইয়া চলিতে সমর্থ হয়, অন্ধকে লইয়াও তেমনি নিরুপদ্রবে পথ চলিতে পারে।

শিক্ষা-দান শেষ হইলে শিক্ষক চোখে কাপড় বাঁধিয়া অন্ধ সাজিয়া কুকুরকে গাইড করিয়া পথে বাহির হন। ভিড়-ভরা পথে—গাড়ী-চলা পথে। এই সব পথে চলিয়া তিনি যখন দেখেন, কুকুরের চলায় এতটুকু ত্রুটি নাই, তখন কুকুরকে 'গ্রাজুয়েট' বলিয়া পাশ করিয়া দেন। 'গ্রাজুয়েট' মানে গাইডের কাজে উপযুক্ত কুকুর।

তার পর অন্ধের শিক্ষা। যে-অন্ধ এ কুকুরকে গাইড-স্বরূপ চাহিবে, তাকেও শিক্ষাসদনে আসিয়া কুকুর লইয়া চলাফেরার কৌশল শিখিতে হয়। শিক্ষায় কুকুরের উপর যখন তার বিশ্বাস অচল হয় এবং কুকুরের উপর সে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে, তখন কুকুরকে তার গাইড-স্বরূপ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তার পূর্ব্বে নয়। কুকুর এবং অন্ধ দু'জনে হয় তখন হইতে অবিচ্ছেদ-বন্ধু!

বসানো-দাঁড়ানো শিক্ষা

অন্ধকে ভিড় বাঁচাইয়া কুকুর এমন ভাবে চালায় যে, অন্ধের গায়ে কাহারো ঘেঁষ লাগে না। সিঁড়ি ওঠা-নামা করিবার সময় সঙ্কেত দিয়া অন্ধকে কুকুর সতর্ক করে; তার ফলে ওঠা-নামা করিতে অন্ধের বাধে না। কুকুরের সতর্ক দৃষ্টি এবং বুদ্ধির গুণে অন্ধের গতিবিধি এতখানি স্বচ্ছন্দ হইয়াছে।

এই সব গাইড-কুকুরের শিক্ষায় তিনটি বিভাগ আছে। প্রথম, যিনি কুকুরকে এ-সব শিক্ষা দেন, তাঁর শিক্ষা চাই সর্ব্বাগ্রে। সে জন্য শিক্ষকের শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা আছে। কুকুরের মাষ্টারি-বিদ্যা শিখিতে সময় লাগে চার বৎসর। এ বিদ্যা শিখিতে শিক্ষকের চাই ধৈর্য্য, অধ্যবসায় এবং কাজে অকৃত্রিম অনুরাগ। কুকুরকে যিনি এ-বিদ্যা শিখাইবেন, তাঁর মনে রাখা দরকার তিনি সার্কাশের খেলোয়াড় নন—শিক্ষক। কুকুরকে "জানোয়ার" বলিয়া না দেখিয়া 'মানুষ' বলিয়া দেখিতে হইবে। কুকুরের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর চাই গভীর অভিনিবেশ। প্রতিপদে কুকুরের চিন্তাবৃত্তি লইয়া তাঁকে চিন্তা করিতে হইবে অর্থাৎ (he must think like a dog). এই ভাবে যিনি কুকুরের শিক্ষাদান-কার্য্যে নিজেকে নিয়োগ করিতে

পারেন, তিনিই শুধু কুকুরকে শিক্ষা দিয়া অন্ধের গাইড গড়িয়া তুলিবার যোগ্য।

সব জাতের কুকুর এ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে না। যে সব কুকুর শীকারী বা পুলিশ-প্রহরীর কাজে নিপুণ, তারা এ-কাজে পটু হইতে পারে না। এ কাজের জন্য সব-চেয়ে উপযোগী জার্মান শেপার্ড জাতের কুকুর। এ-জাতের কুকুরের বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি আশ্চর্য্য দায়িত্ব-জ্ঞান!

ঘ্রাণ লইয়া যে-সব কুকুর পথ চলে, সে-জাতের কুকুর এ কাজে নিপুণ হয় না। জার্মান শেপার্ড কুকুরের ঘ্রাণ এবং দৃষ্টি-শক্তি খুব প্রখর। কোথায় গাড়ী আসিতেছে—চোখে দেখা যায় না—শুধু শব্দটুকু শুনা যায় হয়তো মোড় ঘুরিলে গাড়ী দেখা যাইবে—এ-জাতের কুকুর সে-গাড়ীর শব্দ শুনিতে পায়; সে গাড়ীর গতিবেগ, কোন্ দিক হইতে গাড়ী আসিতেছে—সব বুঝিতে পারে। এবং তাহা পারে বলিয়াই অন্ধকে নিরাপদে পথে চালাইতে সমর্থ।

বাসে ওঠা

গাইড-কুকুর লইয়া আজ পর্য্যন্ত কোনো অন্ধ পথে-ঘাটে এতটুকু বিপন্ন হয় নাই। তার কারণ, চলন্ত গাড়ী দেখিয়া মানুষ যদি-বা কখনো ভাবে, ছুটিয়া টুক্ করিয়া রাস্তা পার হইবে এবং ইহা ভাবিয়া রাস্তা পার হইতে চলন্ত গাড়ীর ধাক্কা খায়—গাইড-কুকুর চলন্ত গাড়ীর সামনে এমন 'চান্স' কখনো লয় না! গাড়ী যতক্ষণ না চলিয়া যায়, ততক্ষণ সে ধৈর্য্য ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে!

গাইডের কাজে কুকুরের নৈপুণ্য অটুট থাকে দশ বছর। কুকুরের লালন-পালনে ও শিক্ষা-দানে শিক্ষা-সদনের ব্যয় হয় এক হাজার ডলার। এ কুকুরকে 'গাইড'-স্বরূপ লইতে হইলে অন্ধকে দিতে হয় শিক্ষা-সদনের ফণ্ডে দেড়শো ডলার। এই দেড়শো ডলার লওয়া হয় কুকুরের মূল্য এবং অন্ধের শিক্ষা-দানের ব্যয়-বাবদ।

শিক্ষা-সদনে শিক্ষার্থী কুকুরের সংখ্যা বাড়িতেছে। মার্কিণ যুক্ত-রাজ্যে অন্ধের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। সকল অন্ধ যাহাতে এ কুকুরকে গাইড-স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে, সে জন্য শিক্ষা-সদনের আশ্রয়ে জার্মান শেপার্ড জাতের কুকুরের লালনাদির ব্যবস্থাও খুব সুনিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে।

মনের জোর

জীবনে আমাদের সুখ বলো, দুঃখ বলো—অপরের জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তা জড়িয়ে আছে। অপরের সুখ-দুঃখ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিছক সুখ-দুঃখ ভোগ করা এক-রকম অসম্ভব বললেই চলে। তবে মনের জোর—যাকে ইংরেজীতে বলে will-power—এই মনের জোর বা দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের আয়ত্তাধীন।

মনের জোর কারো শিক্ষায় বা উপদেশে বাড়িয়ে তুলবে, সে উপায় নেই; নিজে থেকে মনকে জোরালো করতে হবে।

দু'-একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা ঠিক বুঝতে পারবে। ছুটির দিনে সকালে বন্ধুবান্ধব এসে জটলা করে। তাদের সঙ্গে গল্প-গুজবে সকাল-বেলাটুকু কেটে যায়; লেখাপড়া হয় না। মনে-মনে ঠিক করলে কাল সকালে বন্ধুরা এলে বলবো, বাড়ী যাও ভাই—এখন আমি পড়াশুনা করবো। এমনি মন নিয়ে পরের দিন সকালে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলে। তাদের হয়তো বললে, বাড়ী যাও—লেখাপড়া করবো। তারা বললে এসেছি—খানিকটা গল্প হোক। তার পর যাবো, পড়াশুনা করবে। এ-কথায় সায় দিয়ে লেখাপড়া ছেড়ে গল্প করতে বসলে! এ থেকে প্রমাণ হলো, তোমার মন দুর্ব্বল! গল্পের লোভ ত্যাগ করতে পারলে না! হয়তো ভাবলে, যাক্, বন্ধুরা বলছে,—আজ না হয় গল্প চলুক, কাল থেকে পড়া!

এই যে মনে-মনে সঙ্কল্প করে সে-সঙ্কল্প রাখতে পারলে না—এমন হলে চলবে না। সঙ্কল্প যখন করবে, তখন সে-সঙ্কল্প রাখতেই হবে।

খুব বড় এক জন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বলে গেছেন—কখনো যদি এমন সঙ্কল্প করি যে কাল সকালে ঠিক ছটায় আমি উঠবো—তার পর ছটায় না উঠে সাড়ে ছটায় উঠি, তাহলে আমার মনস্তাপের সীমা থাকে না। এমনি ভাবে এই সামান্য সঙ্কল্পটুকু যদি না রাখতে পারি,—আধ ঘণ্টার তফাৎ ঘটে, তাহলে বিশ বৎসরে আমার মনের দুর্ব্বলতার সীমা থাকবে না যে! বিশ বৎসর পরে হয়তো একটা দারুণ খুন-খারাপী করে বসবো!

এ-কথার অর্থ, এই রকম সামান্য ত্রুটি করতে-করতে অভ্যাস এমন হবে যে, কোনো দিন কোনো সঙ্কল্প রক্ষা করতে পারবে না—তার জন্য জীবন হবে লক্ষ্যহারা এবং ব্যর্থ।

ছোট-খাট অবহেলা, আমোদ-স্পৃহা, আলস্য—এ-সবের মোহ আজ যদি না কাটাতে পারো, তাহলে ঔদাস্যবশে মন এমন হবে যে, পদে-পদে ত্রুটি-বিচ্যুতির অন্ত থাকবে না। সঙ্কল্প করে যদি তা রাখতে পারো, তাতে যে আনন্দ পাবে—বড়-বড় যুদ্ধজয়ের আনন্দের চেয়ে সে-আনন্দ এতটুকু কম নয়!

মনের এই জোরকে গোঁয়ার্ত্তুমি বা জিদ মনে করো না। মনকে যদি সমস্ত প্রলোভনের উর্দ্ধে তুলতে পারো—তাহলে দুঃখ পাবে না—জীবনকেও সার্থক করতে পারবে!

কূল-রক্ষী

যখন যুদ্ধ-বিগ্রহের উৎপাত থাকে না, তখন সমুদ্র-কূলস্থিত প্রদেশগুলিতে কোষ্ট-গার্ডস্ নামে এক-জাতের পাহারাদার নিযুক্ত থাকে। তাদের কাজ—ডিউটি বাঁচাইয়া ভিন্ন সাম্রাজ্য হইতে কোনো মালপত্র গোপনে না আমদানি হয় তাহারি পাহারাদারী করা। এখন এ যুদ্ধে এই কোষ্ট-গার্ড বিভাগ প্রায় দশ গুণ বাড়ানো হইয়াছে; এবং বিপক্ষের দিক হইতে কোনো রকম রসদ বা চিঠিপত্র বা লোকজন অনায়াসে না পুরী প্রবেশে সমর্থ হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখা আজ তাদের কাজ। বৃটেন ও আমেরিকার কোষ্ট-গার্ডদের কাজের সীমা ও নির্ঘণ্ট অনেকখানি বাড়িয়াছে এবং সে জন্য আয়োজনাদি যা হইয়াছে, তা একেবারে চূড়ান্ত-রকম। শুধু জলপথে নয়, শূন্যপথেও গ্রীণলাণ্ড হইতে সুরু করিয়া সারা আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের বুক বহিয়া মার্কিণ কোষ্ট-গার্ড চরম নৈপুণ্যে আজ জল-পথকে অনেকখানি নিরুপদ্রব রাখিয়াছে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে গ্রীণলাণ্ডের কাছে একটি জার্ম্মাণ বেতার-ষ্টেশন চূর্ণ করিয়া মার্কিণ কোষ্ট-গার্ড এবারকার এ অভিযানে কীর্ত্তি রাখিয়াছে।

এ বিভাগের প্রত্যেকেই 'নিষ্ঠুর ক্রুর ছল' জলকে এমন ভাবে বশ করিতে শিখিয়াছে যে, আঁধারে দুর্য্যোগে কাহারো এতটুকু ভয় নাই, ডর নাই! জল-পথের সকল বিঘ্ন বিপত্তিকে যেন মন্ত্রবলে চূর্ণ করিয়া দিতেছে।

যখন যুদ্ধের উৎপাত ছিল না, তখন কূল-রক্ষীর দল দিনে প্রায় পনেরো জন লোককে সলিল-সমাধি হইতে রক্ষা করিত। এ বিভাগে ছয় বছর পূর্ব্বে রক্ষীর সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। জলপথে শান্তিরক্ষা, সর্ব্ববিধ বে-আইনী কার্য্য নিবারণ, বিপত্তিমোচন ছাড়া তাদের কাজ ছিল সাগরবক্ষে প্রায় পাঁচশো বাতিঘর, বয়া, লাইটশীপ, রেডিয়ো-ষ্টেশন এবং ছ'শো সিগন্যাল নিয়ন্ত্রিত করা। এখন যুদ্ধের সময় এ বিভাগে কাজ বাড়িয়াছে এবং দিনে দিনে বাড়িতেছে। এক মার্কিণ সাম্রাজ্যেরই পাঁচটি প্রধান বন্দর আজ এই কূল-রক্ষীদের পাহারায় উপদ্রবহীন রহিয়াছে। যে সব জায়গা হইতে ফৌজ, গুলী-গোলা-বারুদ, বন্দুক-কামান প্রভৃতি পাঠানো হয়—শুধু সে জায়গাটুকু নয়—সে জায়গায়

টর্পেডোয়-চূর্ণ জাহাজের যাত্রীদল- কোষ্ট-গার্ডদল কর্ত্তৃক উদ্ধারের পরে

মত্ত সাগর-বক্ষে "কাটার"

শত্রুপক্ষ হইতে একটা মক্ষিকা আসিয়া না পুরী প্রবেশ করে, সেদিকে কোষ্ট-গার্ড-বিভাগ সতর্ক লক্ষ্য রাখিতেছে। তাছাড়া টর্পেডোর আক্রমণে কোথায় কোন্ জাহাজ ভাঙ্গিয়া মানুষ-জন বিপন্ন হইল, সে সব মানুষ-জন, মালপত্র এবং বিদীর্ণ জলমগ্ন জাহাজের উদ্ধার-সাধনও হইল কোষ্ট-গার্ড বিভাগের প্রধান কর্ত্তব্য।

উত্তর-আফ্রিকার গোয়াডালায় মিত্র-বাহিনীর জীবন যখন দারুণ বিপন্ন হইয়াছিল, তখন তাদের রক্ষা করিয়াছিল এই কোষ্ট-গার্ড-বাহিনী। 'ওয়েকফীল্ড' জাহাজে পাহারাদারী করিবার সময় এক দল মার্কিণ কোষ্ট-গার্ড সিঙ্গাপুরে বীরের মত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছে।

চারি দিকে বহু মাইল বিস্তৃত অঞ্চল আজ কূল-রক্ষীদের কার্য্যকুশলতার গুণে সুরক্ষিত।

কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এ বিভাগের এক জন অধ্যক্ষ লিখিয়াছেন—সব দিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হয়। শত্রু কোথায় জলে বোমা ভাসাইয়া দিল,—সে বোমা আসিয়া কোথাও পাছে জাহাজ নষ্ট

বাঁশীর সঙ্কেত-শিক্ষা

করে—সেদিকে সতর্ক পাহারাদারী করিতে হয়। সমুদ্রতীরে নিরালা কোনো জায়গায় রাত্রে যদি হঠাৎ দেখি বাতি বা মশালের আলো, কিম্বা নিরালা নির্জ্জন জায়গায় লোক জমিতেছে, অথবা নোঙর-করা জাহাজ হইতে হঠাৎ সঙ্কেত-আলোর ছটা স্ফুরিত হইতেছে, তখনি

ডিউটির পর বিশ্রাম

গিয়া সে সবের তদারক করি। বন্দর-গামী সমস্ত জাহাজ ও বোট আমাদের পরিচিত। অজানা বোট বা জাহাজ দেখিবামাত্র আমরা গিয়া তাদের পরিচয় ও অনুমতিপত্র পরীক্ষা করি। শুধু তাই নয়, যে-কোনো জাহাজে উঠিয়া যাত্রী ও মালপত্র পরীক্ষা করার অধিকার আমাদের আছে। বোম্বেটে, স্মাগলার প্রভৃতি আমাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া এখন আর শয়তানীর বড় সুযোগ পাইতেছে না। দিনেও চৌকিদারীর বিরাম নাই। চৌকিদারীর সীমা ভাগ করিয়া প্রতি ভাগের জন্য স্বতন্ত্র রক্ষী নিয়োগ করা হইয়াছে। সন্ধ্যা হইবামাত্র আমাদের রক্ষী-জাহাজগুলি জল তোলপাড় করিয়া বেড়ায়—সার্চ্চ-লাইটের আলোয় সমুদ্রের বুকে এবং চারি দিকে তীব্র সন্ধান রাখে।

সমুদ্রকূলে ক'মাইল অন্তর করিয়া আমাদের বহু ঘাঁটী আছে। ঘাঁটীর শৃঙ্খল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এ সব ঘাঁটীর রক্ষীরা সব সময়ে লক্ষ্য রাখিতেছে সাবমেরিণের দিকে। কোথাও একটি পেরিস্কোপ, দেখিবামাত্র ঘাঁটীতে-ঘাঁটীতে টেলিফোন-মারফৎ সে-সংবাদ নিমেষে প্রচারিত হয়।

যুদ্ধের সাপ্লাই আসিয়া পৌছিবে—কূলে তাই সশস্ত্র রক্ষীরা

সাধারণতঃ যে-সব ছোট জাহাজ বা বোট লইয়া আমরা চৌকিদারী করিয়া বেড়াই, সেগুলির নাম 'কাটার'। কাটার ছাড়া আছে পাল-তোলা বোট, ছোট বিজলী-বোট, ষ্টীমার, ডিঙ্গি—অর্থাৎ ভেলা পাইলে তাহা লইতেও আমাদের দ্বিধা নাই!

কূল-রক্ষী এ-ছেলেটিকে জল হইতে তুলিয়াছে

কাজে সকলের উৎসাহ অপরিসীম। প্রাণের মায়া রাখিয়া কেহ এ-কাজে নামে না! বিপত্তি ঘটিলে মরিয়া হইয়া ওঠে। জীবনের জন্য কেহ এতটুকু অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার অবকাশ পায় না এবং কেহ কাজে গাফিলি বা বিলম্ব জানে না।

এ-বিভাগে যোগ দিতে চাহিলে প্রথমেই দেখা হয় সে-লোকের স্বাস্থ্য কেমন—সে কতখানি মজবুত—কতখানি শ্রম ও কষ্ট সে সহ্য করিতে পারে—ভয়-ডরের কিছুও তার মনে আছে কি না! দলে যোগ দিবামাত্র সকলকে প্যারেড করিতে হয়; তার পর শিখিতে হয় কি করিয়া পরের হাত পা মাথা ভাঙ্গিতে হয়; লাঠি, ছুরি, ছোরা, বন্দুকের ব্যবহার শিখানো হয়; শিখানো হয় মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তিগিরি এবং

জিউজিৎসু-রীতিতে আত্মরক্ষার কৌশল। সাঁতারে সকলকে এমন দক্ষ করিয়া তোলা হয় যে, ডাঙ্গার মত জলকেও তারা দু'দিনে একেবারে 'ঘর' করিয়া তোলে। আলোয়-অন্ধকারে জলের বুকে শত্রুকে আক্রমণ করিতে সকলে অচিরে যেমন পটু হইয়া ওঠে, তেমনি পটু হয় সে-অন্ধকারে জলের বুকে শত্রুর হাতে আত্ম-রক্ষা

দড়ি ধরিয়া কূলে আসা

করিতে। বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাক ডেম্পশী এখন মার্কিণ কোষ্ট-গার্ড বিভাগের অন্যতম কমাণ্ডার।

বহু লোক এ বিভাগে যোগ দিয়াছে—এ সব কাজে তাদের নৈপুণ্যও অসাধারণ! প্যারেড বা ডিউটি শেষ হইলে কেহ চুপচাপ

শিক্ষার্থী ও ধোলাই যন্ত্র

বসিয়া থাকে না—খেলাধূলা করে। এবং সবচেয়ে সখের খেলা—সমুদ্র-বক্ষে তরী-চালনা।

রক্ষীদের অধীনে আছে অসংখ্য কুকুর। শিক্ষায় তাদের এমন পটু করিয়া তোলা হইয়াছে যে, ইঙ্গিতে যদি কুকুরকে বলা হয়—ওকে আনো (Get him), তখনি সে সে-আদেশ পালন করিবে। রাত্রির গভীর অন্ধকারে এ-সব কুকুর ঘ্রাণে শত্রুর সন্ধান পায়। সন্ধান পাইলে সে চীৎকার করে না—নীরবে গিয়া মনিব-রক্ষীকে টানিয়া শত্রুর সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করায়। আত্মগোপনের তেমন প্রয়োজন ঘটিলে কুকুর মাটীতে পেট ঘসিয়া চলে, পায়ে চলে না।

কুকুরের পরীক্ষা-গ্রহণ সম্বন্ধে এক জন অফিসার লিখিয়াছেন—এক দিন অন্ধকার রাত্রে আমি গিয়া দাঁড়াইলাম বালির একটা উঁচু প্রাচীরের পিছনে। সেখানকার রক্ষীর ডিউটিতে আসিতে একটু

তরি চালান শিক্ষা

বিলম্ব হইতেছিল—রাত্রির আহার্য্য ঠিক সময়ে ছাউনিতে পৌঁছায় নাই বলিয়া। জোর বাতাস বহিতেছিল আমার দিক হইতে—রক্ষীর কুকুর ছিল বিপরীত দিকে। বাতাস বোধ হয় একটু বাঁকা ভাবে বহিতেছিল—কুকুর তাই ঘ্রাণে আমার সন্ধান পায় নাই। আমি

দারুণ শীতে মুখশ-আঁটা

ভাবিলাম, কুকুর-সমেত রক্ষী হয়তো কাজে ঔদাস্য করিতেছে! আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম—চকিতে অমনি বিদ্যুৎ গতিতে কুকুর আসিয়া উপস্থিত আমার সামনে—সঙ্গে তার মনিব-রক্ষী।

রক্ষীকে আমি বলিলাম, কুকুর যদি এখন না আসিত, তাহা হইলে তোমাকে সাজা দিতাম।

সলিল-সমাধি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোষ্ট-গার্ড বিভাগে যে-সব বোট ব্যবহৃত হয়, সে-বোটগুলির গায়ে অসংখ্য ফুটা। সে ফুটা

দিয়া ভিতরে জল ঢুকিলেও বোট ডোবে না, এমন আশ্চর্য্য এ-সব বোটের নির্ম্মাণ-কৌশল! বোট যদি দৈবাৎ কখনো উল্টাইয়া যায়, চালকের পটুতায় সে বোটকে খাড়া করিতে বিশ সেকণ্ডের বেশী সময় লাগে না! বোটগুলি খুব হালকা বল্‌শা-কাঠের তৈয়ারী। দাঁড় টানিয়া বোট চালানো হইলেও বহু বোটে এঞ্জিন সংলগ্ন করা হইয়াছে। বোট ডুবিয়া গেলেও এঞ্জিন বন্ধ হয় না—চলিতে থাকে; তার ফলে ডুবিলেও এ বোট তলাইয়া যায় না। কাজেই ডোবা-বোটের উদ্ধার-সাধন সহজ! বোটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শক্ত দড়ি লাগানো থাকে—বোট উল্টাইলে আরোহীর দল বোটের পিঠে চড়িয়া সেই দড়ি টানিয়া আবার তাকে খাড়া করিয়া তোলে।

ডেম্পসী ও ছাত্রের দল

কাটার বোট

সার্ফ-বোটগুলিতে রবারের টায়ার আছে, সে জন্য এ-সব বোটকে ডাঙ্গায় তুলিয়া ট্রাক্টর বা ট্রাকের সঙ্গে বাঁধিয়া যে-কোনো জায়গায় খুশীমত এবং দ্রুত টানিয়া লইয়া যাইতে বাধে না। সেবার মিশিসিপি এবং ওহিয়ো নদীতে প্রবল বন্যা বহিলে বহু সার্ফ-বোট লইয়া গিয়া কূল-রক্ষীর দল বহু লোকের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিল।

টর্পেডোর ঘা খাইয়া কত বড় বড় জাহাজ চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে—সে-সব চূর্ণবিচূর্ণ জাহাজের যাত্রী ও মালপত্রের নিশ্চিত উদ্ধার-সাধন সম্ভব হইয়াছে কোষ্ট-গার্ডদের দৌলতে। লাইফ-বোটের সাহায্যে কোষ্ট-গার্ডদের কাজ অনায়াস হইয়াছে। এক-একটি লাইফ-বোটে রশদ থাকে প্রায় ৭০ মণ পানীয় জল, ঔষধ-পথ্য, বিস্কুট, চকোলেট ও দুধের বড়ি। এ-সব এত বেশী পরিমাণে থাকে যে এক-একটি লাইফ-বোটের যাত্রীর তাহাতে দশ দিন চলে। ইহার উপর পাম্প, কম্বল, প্লাগ, তুলা, আয়না, ঘুম-ভাঙানো সাঙ্কেতিক-যন্ত্র থাকে।
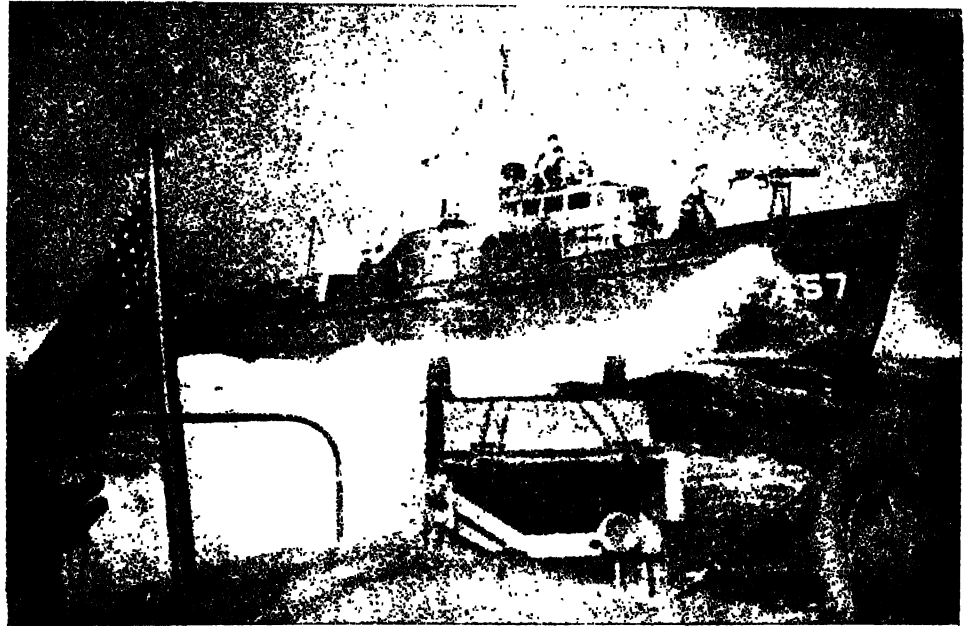
রক্ষীরা মাছ ধরিতে পটু হইয়া ওঠে। মাছ ধরায় তাদের আনন্দের

সীমা থাকে না। জ্বলন্ত তৈল-বক্ষে পড়িলে কি করিয়া সাঁতার কাটিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, সে কৌশলও সকলকে শিখিতে হয়। হাঙ্গর আসিয়া যদি সহসা আক্রমণ করে, তাহা হইলে হাঙ্গরের নাসিকায় সামান্য আঘাত দিলে উদ্ধার মিলিবে, এ বিদ্যা-কৌশলও সকলে ভালো করিয়া শিখে। শিক্ষায় এবং অভ্যাসে সকলকে এমন করিয়া তোলা হইতেছে যে, প্রয়োজন ঘটিলে আহার্য্যের অভাবে সাপ, বাদুড় ও ফড়িং খাইয়া তারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে পারে এবং এ-সব সামগ্রী খাইয়া কেহ অসুস্থ হয় না।

জলপথে যেমন কূল-রক্ষীরা পাহারা দিতেছে, তেমনি তাদের পাহারাদারী করিতে আবার শূন্যপথে স্বতন্ত্র বিমান-পাহারাদারীর ব্যবস্থা আছে।

কোষ্ট-গার্ডের সতর্ক দৃষ্টির কল্যাণে সাবমেরিণ আসিয়া সহসা আজ দারুণ উপদ্রব করিবে, সে উপায় নাই। কোষ্ট-গার্ড বিভাগের জন্য যে-সব বিমান-পোত আছে, সেগুলি জলে-স্থলে সমান যেমন চলিতে পারে, তেমনি পারে জল-বক্ষ ও স্থল-বক্ষ হইতে চকিতে শূন্যপথে উঠিতে। লক্ষণ বুঝিলে এ সব বিমানপোত মাছধরা যত ডিঙ্গিওয়ালাদের সংবাদ জানাইয়া পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিয়া দেয়।

এ্যাকাডেমি—শিক্ষাক্ষেত্র

যুদ্ধের ঘনঘটায় সাগর-বুকে যে সব বাতিঘর আছে, সে-বাতির আলো আজ মলিন ম্লান করিয়া রাখা হইয়াছে—বহু স্থানে বাতির আলো একেবারে নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে য়ুরোপ আমেরিকার পথে সাগর-বক্ষে জ্বলিত বিশ মাইল অন্তর বাতিঘরের বাতি! প্রত্যেকটি বিজলী-বাতি। সে বাতির আলো ছিল নব্বই লক্ষ মোম-বাতির আলোর শক্তিতে শক্তিমান্। সাগরের বুক আগাগোড়া আলোয় আলো হইয়া থাকিত। এখন সে জায়গায় সামান্য কটা মাত্র বাতি জ্বলে! সে আলোয় সাগরের বুকে অন্ধকার
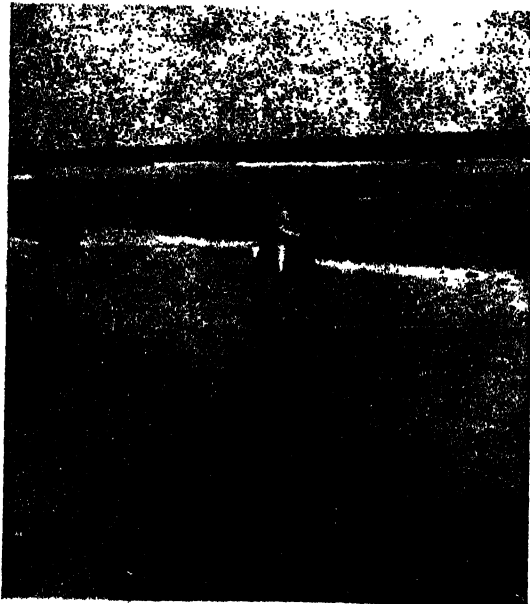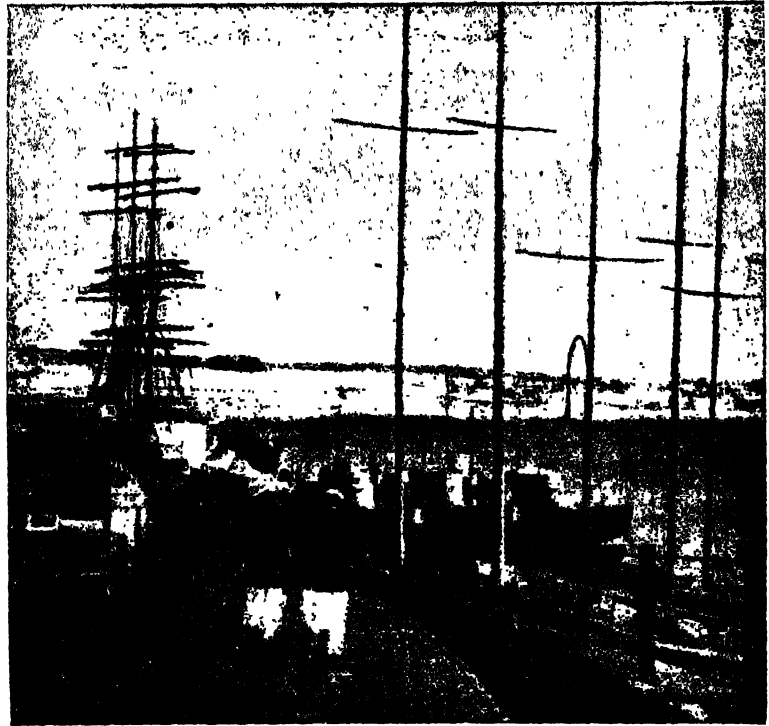
প্লেন-পাহারায় সওয়ার রক্ষী

কূলে পাহারাদারী

হয় আরো বেশী জমাট, ভয়াকুল। বাতিঘরের বাতির এ সব লেন্সে দিনের বেলায় সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়। লেন্সে প্রতিফলিত সে রশ্মির এমন তেজ যে, বাতিঘরের রক্ষীরা আচ্ছাদনে সে-লেন্স ঢাকিয়া রৌদ্রের ঝাঁজ হইতে আত্মরক্ষা করিত। এ-সব বাতিঘরের আলোগুলিতে এখন জ্বলে তেলের আলো! শীতকালে এখন বাতি-ঘরে বাস করা দায়। আলো নাই—হিম্-কুয়াশার রাতে

—জাহাজ, জাহাজের বয়লার, রেডিয়ো, এরোপ্লেন, মোটর এবং গ্যাসোলিন-এঞ্জিন, সার্চলাইট, নেভিগেশন, বয়া চালানোর কায়দা-কানুন; তার পর গণিত, সামুদ্রিক আইন-কানুন এবং আরো কত কি। এ-সবে রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবেই অফিসারের কাজ শিখিবার অধিকার মিলিবে। এক কথায় এ বিভাগের অফিসারের সব দিকে ওস্তাদ হওয়া চাই। সে হইবে

উল্টানো বোটে

আহতের শুশ্রূষা

জাহাজে ভোজ-কক্ষ

রক্ষী ও শেপার্ড-কুকুর

শীতের দাপট বাড়ে অসম্ভব রকম। গত শীতের সময় এক দারুণ কুয়াশা-ভরা রাত্রে একটি বাতি-ঘরের দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া প্রায় দেড়শো উড়ন্ত পাখী মরিয়া গিয়াছিল।

কনেক্টিকাটে নদীর তীরে কোষ্ট-গার্ড বিভাগের এ্যাকাডেমি। এখানে অফিসারদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এ্যাকাডেমির কাজ আজ দ্বিগুণ হইয়াছে। এখানে চার মাসে শিক্ষা লাভ। তার পর রক্ষীরা যায় সমরক্ষেত্রে লড়াই করিতে। শিক্ষার প্রকরণের মধ্যে আছে

একাধারে নাভিগেটর, মেরিন-এঞ্জিনীয়ার, মেকানিক, পুলিস, জীবন-রক্ষক, লড়ায়ে সিপাহী; এবং আন্তর্জাতিক আইন-কানুনে পাকা। শিক্ষাকালে কাহারো এক নিমেষ চুপচাপ বসিয়া থাকা চলে না। শরীর ঘন-ঘন অসুস্থ হইলে এখানে থাকা চলিবে না। কোনো কারণে ক্লাশের নিয়মিত শিক্ষায় একটু পিছাইয়া পড়িলেই সর্ব্বনাশ! সকালে সাড়ে ছ'টায় ঘুম ভাঙ্গিয়া শয্যাত্যাগ করিয়াই চাই আট মাইল দৌড়ানো—তার পর প্রাতরাশ; প্রাতরাশ সারিয়া ক্লাশে হাজির হওয়া!

সেখানে হাড়ভাঙ্গা ড্রিল, দাঁড় টানা, জাল বহা, এবং শ্রমসাধ্য আরো কত কাজ! ছুটী নাই! শরীর আর মনকে শিক্ষার মুগুর মারিয়া রীতিমত কঠিন করা হয়। বিশ্রাম মিলিবে সেই রাত্রি সাড়ে দশটায়।

যে-কাজে এত পরিশ্রম, এমন প্রাণ-সংশয়ের ভাব—সে কাজে হাজার হাজার লোক কেন যায়? অনেককে প্রশ্ন করিয়া উত্তর মিলিয়াছে—ডাঙ্গার চেয়ে জলকে ভালো লাগে, তাই। তাছাড়া মরণ কোথায় নাই? রোগে ভুগিয়া বিছানায় পড়িয়া মরার চেয়ে এ-কাজে মরায় আরাম আছে। অর্থাৎ ইহাদের শিক্ষা এবং ক্রিয়া-পদ্ধতিতে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতা—

'জলে বাসা বেঁধে ছিলুম
ডাঙ্গায় বড় কিচিমিচি—
সবাই গলা জাহির করে,
চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।'

এ বিভাগের শৌর্য্য এবং সাহস, নিষ্ঠা এবং কর্ম্মতৎপরতা দেখিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

স্রোত বহে যায়

[উপন্যাস]

১৫

বিলাসপুরের জয়রাম রায় আসিয়া অখিলকে পাত্র দেখিয়া গেলেন। পাত্র পছন্দ হইল। অপছন্দর কারণ ছিল না। বাপের আছে বিষয়-সম্পত্তি…মোটা থাম, পূজার দালান এবং উঠানওয়ালা মস্ত বাড়ী…বাগান…পুকুর। সেই বাপের ছেলে…তার উপর কলিকাতার কলেজে পড়িতেছে। ইহার বেশী দেখিবার প্রয়োজন নাই! ছেলে কি পড়িতেছে, কেমন পড়িতেছে, সে সব খবর জয়রাম রায় বোঝেন না, চাহেন না! বাড়ী-বাগান-পয়সা এবং বাপের নাম-ডাক! ছেলে কলেজে পড়িতেছে,…অগাধ জলের মাছ…বাড়িয়া কত বড় হইবে, তার ঠিক নাই! অতএব…

রাত্রে মানকুমারীর সঙ্গে অখিলের কথা হইতেছিল। অখিল বলিল,—কাল সকালে আমি কলকাতায় যাচ্ছি।

মানকুমারী বলিলেন—ফিরবে কবে?

—পাঁচ-সাত দিন পরে।

মানকুমারীর মনের কোণে কেমন যেন একটু ভয়! তিনি বলিলেন—ঠিক তো?

হাসিয়া অখিল বলিল—সন্দেহ হচ্ছে না কি তোমার?

—কি জানি বাপু…তোমাদের মতি-গতি কিছু বুঝতে পারি না! এখন ডাগর হয়েছো…পাখা গজিয়েছে…কখন কি-তালে থাকো! পাকা দেখার দিন ঠিক হলে শেষে যদি তুমি কলকাতায় থেকে যাও, এখানে অনর্থ ঘটবে!

—না, না…জয়রামের সামনে গিয়ে পাত্র সেজে যখন বসেছি…তখন নিশ্চিন্ত থাকো! টোপর মাথায় সঙ সেজে তোমাকে বৌ এনে দেবো!

ছেলের কথার ভঙ্গী মানকুমারীর ভালো লাগিল না! তিনি বলিলেন—বুঝেচি, তোর ইচ্ছে নেই ওখানে বিয়ে করতে! তবে এও বলি, বিয়ের ব্যাপারে নিজের ইচ্ছা কি চলে? মাথার উপর যখন আমরা বেঁচে রয়েছি!

অখিল বলিল—তোমারো তো বৌ পছন্দ নয় বলেচো!

মানকুমারী বলিলেন,—দেখা-শুনা হবার আগে সে কথা বলেছিলুম। বিয়ের কথা যখন পাকা হয়ে গেল, তখন ও-কথা আর বলতে পারবো না! এখন অপছন্দ হলে যেমন খারাপ বলতে পারবো না, তেমনি ফেরাতেও পারবো না!

অখিল হাসিল; বলিল,—কিন্তু এ ভারী অদ্ভুত কথা মা যে বাইরে থেকে পছন্দ করে বৌ আনবে, তাতেও নিজের বিচার-বুদ্ধি খাটাবে না!

—মানুষের ইচ্ছায় কি বিয়ে হয় রে? জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে হলো বিধাতার লিখন…ওতে মানুষের হাত নেই!

অখিল বলিল—আর হাসিয়ো না মা, মৃত্যুতেই মানুষের কোনো হাত নেই! জন্ম বা বিয়ে…এ দু'টি জিনিস মানুষের নিজের হাতে! তার জন্য বিধাতাকে দায়ী করো না!

মানকুমারী বলিলেন—থাক্ থাক্, তোকে আর ডেঁপোমি করতে হবে না…কলকাতায় যাচ্ছিস্, যা… কিন্তু আমাকে কথা দিয়ে যা যে এক হপ্তার মধ্যেই ফিরবি। না হলে আমি মাথা-মুড় খুঁড়ে মরবো অখিল… তা বলে রাখছি!

হাসিয়া অখিল বলিল—তোমাকে মাথা-মুড় খুঁড়ে মরতে হবে না, মা। বৌ আমি তোমাকে এনে দেবো… এবং ঐ বৌ…জয়রাম রায়ের ঐ মুটকি টাকার থলি!

—ষাট—ষাট… ঘরের লক্ষ্মী…তাকে অমন কথা বলতে আছে!

অখিল বলিল—আমি না বলি, পাড়ার পাঁচ জনে তো বলবে। কথাটা কাণে সইয়ে রাখো এখন থেকে!

পরের দিন সকালে অখিল গেল কলিকাতায়।

পরেশ গাঙ্গুলি বলিলেন—ছেলে হঠাৎ কলকাতায় গেল যে?

—ওর কি কাজ আছে, বললে।

—হুঁ...ফিরবে কবে?

—এই হপ্তাতেই ফিরবে বলে গেছে।

পরেশ গাঙ্গুলি বলিলেন—দেখো, বিয়ে যেন ছরকোট না হয়! এর পর যদি বলে, বিয়ে করবো না... তাহলে আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। জয়রাম রায়কে কথা দিয়েছি যখন...

মানকুমারী বিরক্ত হইলেন...ঝাঁজালো কণ্ঠে বলিলেন —কি যে তুমি বলো! আমার ছেলে অমন নয়। তাড়াতাড়ি পালাবে কি দুঃখে? আর কি এমন নশো পঞ্চাশ টাকা ওর হাতে আছে যে তাই নিয়ে পালাবে, শুনি!...

তিন দিন পরে মা-বাপের দুশ্চিন্তা মোচন করিয়া অখিল ফিরিয়া আসিল।

বেলা তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে...সাজগোজ করিয়া অখিল আসিয়া দাঁড়াইল কেশব ভট্টাচার্য্যের গৃহের দ্বারে।

পুকুরে গা ধুইয়া ভিজা কাপড়ে গা ঢাকিয়া কদম বাড়ী ফিরিল...কাঁখে জলভরা ঘড়া।

দ্বারে অখিলকে দেখিয়া মৃদু হাস্যে কদম বলিল—বর মশাই যে! কি খবর?

সকৌতুকে অখিল বলিল—কার বর?

কদমের ভ্রূযুগ ঈষৎ কুঞ্চিত...কদম বলিল—কার আবার? নতুন কনে বৌয়ের বর।...তা এখানে হঠাৎ কি মনে করে?

অখিল বলিল—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

দু'চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ ভরিয়া কদম কহিল—আমার সঙ্গে কথা?

অখিল বলিল—হ্যাঁ। তা এখানে দাঁড়িয়েই সে-কথা শুনবে?

কদম বলিল—শুনলে ক্ষতি হবে?

অখিল বলিল—কিন্তু...

কদম বলিল—আমার কিন্তু সময় হবে না। কাপড় ছেড়ে এখনি জ্যাঠাইমার ওখানে যাবো! তাঁর ওখানে সত্যনারাণ হবে...আমাকে যেতে বলেছেন।

—ও...তা পনেরো মিনিট সময় হবে না...আমার কথা শুনতে?

—বেশ...এসো।

অখিলকে সঙ্গে লইয়া কদম গৃহ-প্রবেশ করিল। উঠানের কোণে রোয়াকে বসিয়া কেশবের কনিষ্ঠ পুত্র নবীন ছোট কাটারি দিয়া একান্ত মনে বাখারি চাঁছিতেছিল ..

অখিল কহিল—কি রে নবীন, কি হচ্ছে?

নবীন বলিল—ছিপ তৈরী করছি। জানো অখিলদা, গয়লাপাড়ার বড় পুকুরটায় কি মাছ হয়েছে...ওঃ! পাঁচ-সাতটা ছেলে বসে মাছ ধরছে। তাই আমিও...

অখিল বলিল—ছিপের সুতো আছে?

নবীন বলিল—না...বাধুর দোকানে খোঁজ করেছি... ছিপের সুতো ওর কাছে নেই! একটা কাটিম দেছে। সুতো শক্ত আছে, তাই দিয়েই...

হাসিয়া অখিল বলিল—দূর পাগল! কাটিমের সুতো পল্‌কা...ছিঁড়ে মাছ পালিয়ে যাবে যে!

• নবীন বলিল—পুঁটিমাছ তো পালাতে পারবে না!

অখিল বলিল—এত মেহনৎ করছিস শেষে পুঁটিমাছ ধরবার জন্য! তাহলে গামছা দিয়ে ছেঁকে ধরলেই তো পারিস্!

নবীন বলিল—না, ছিপে মাছ ধরবো। একটা বঁড়শী জোগাড় করেছি...আর কেঁচো আছে অঢেল...কত টোপ করবে, করো!

নবীন যে ভাবে ছিপের কাজে মত্ত...ও-কাজ চুকিতে কতখানি সময় লাগিবে, কে জানে! অথচ কদমকে যে-কথা বলিতে আসিয়াছে, নবীন থাকিলে...

বুদ্ধি করিয়া অখিল ডাকিল,—নবীন...

নবীন তার পানে চাহিল।

অখিল বলিল,—আমাদের বাড়ী যেতে পারিস্? আমার আছে ছিপের সুতো। গিয়ে নিখিলকে বলবি, আমার ঘরে টেবিলের টানায় আছে ছোট একটা কাটিমে জড়ানো এক-রীল ছিপের সুতো...তার কাছ থেকে আমার নাম করে চেয়ে নিয়ে আয়। এনে ছিপ তৈরী কর্। সে-ছিপে মিরগেল, চারাপোনা পর্য্যন্ত ধরতে পারবি।

—সত্যি? উৎসাহে আনন্দে নবীন একেবারে নাচিয়া উঠিল! তখনি ছুটিল অখিলের গৃহে!

ভিজা কাপড় ছাড়িয়া তসরের শাড়ী পরিয়া কদম আসিল ঘরের বাহিরে। তার পর উঠানে নামিয়া ভিজা শাড়ী-গামছা দড়িতে মেলিয়া দিয়া কদম চাহিল অখিলের পানে...বলিল—নবীনকে ফন্দী করে বাড়ী পাঠানো হলো যে?

অখিল যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে, তেমনি আশ্চর্য্য কণ্ঠে কহিল—ফন্দী!

—ফন্দী নয়তো কি! ঘর থেকে আমি কথা-বার্ত্তা শুনেছি মশাই!

—তার মধ্যে ফন্দীর কি পেলে? ও-বেচারী ছিপ তৈরী করছে কাটিমের পচা সুতো দিয়ে, তাই...

মৃদু হাস্যে কদম বলিল,—বুঝেছি। এখন কি তোমার কথা, শীগ্‌গির বলো অখিলদা। বললুম তো, আমাকে জ্যাঠাইমার কাছে যেতে হবে এখনি। আমি কাপড় পরে তৈরী।

অখিলের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। যে-কথা বলিবে বলিয়া আসিয়াছে, গলার মধ্যে সে-কথা কেমন কুণ্ডলী

পাকাইয়া বাধিয়া গেল। কাশিয়া গলা সাফ করিয়া সে বলিল—সব কথা শুনেছো নিশ্চয়···আমার বিয়ে?

কদম বলিল—শুনেছি বৈ কি! এর পরে শ্বশুরের বিষয়-আশয় সব পাবে। বিলাসপুরের মেয়ে! মস্ত বড় জমিদারের মেয়ে···আর এক মেয়ে! এত-বড় খবর কি চাপা থাকে?

অখিল বলিল—বিষয়ের জন্য আমি যেন তপস্যা করছি! শুনেছো বোধ হয় মেয়ে দেখতে বিশ্রী!

কদম বলিল,—না, সে-কথা তো শুনিনি। তা তুমি আমাকে এই কথা বলতে এসেছো?

—না। আমি বলতে এসেছি···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অখিল পকেট হইতে বাহির করিল কেসে-ভরা একটা চুণীর আংটি। ডালা খুলিয়া আংটির কেস কদমের সামনে ধরিয়া বলিল,—এটি তোমাকে দিতে এসেছি···উপহার।

কদম অবাক্! কহিল,—হঠাৎ উপহার? তোমার বিয়ে হচ্ছে·· সেই আনন্দে?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অখিল বলিল—না। আমার ভালোবাসার স্মৃতি! বিয়েই করি আর যাই করি কদম, তোমাকে আমি ভুলতে পারবো না! আমার মনের রাজ্যে তুমিই একমাত্র রাজ্যেশ্বরী!

বলিতে বলিতে অখিল আবেগ-ভরে কদমের দুই হাত নিজের হাতে চাপিয়া ধরিল!

সবলে নিজেকে মুক্ত করিয়া কদম দু' পা পিছনে সরিয়া আসিল, বলিল—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে অখিলদা! কাকে কি বলছো? আমি না এক জনের বৌ?

—না···না···না। তুমি আমার··

কদম বলিল—বাড়ী যাও অখিলদা। আর কেউ তোমার এ-কথা যদি শুনতো?

অখিল বলিল,—শুনুক! কাকেও আমি ভয় করি না।

কদম বলিল—তুমি ভয় না করতে পারো, আমি করি। তুমি যাও। এ-সব কথা আমি শুনবো না।

কদম ফিরিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিল। তার পর দ্বারের শিকল টানিয়া তালা লাগাইয়া তালায় চাবি আঁটিল। সে-চাবি আঁচলে বাঁধিয়া অখিলের পানে চাহিয়া বলিল,—আমি যাচ্ছি···বুঝলে?

অখিল যেন তন্দ্রা-মগ্ন! কদমের কথায় চেতনা জাগিল। বলিল,—কথা না শোনো, আমার এ উপহার···

—তুমি পাগল হয়েছো! গরীব ভট্চায্যির বৌ আমি! ঐ দামী আংটি আঙুলে দিয়ে মানুষের সামনে আমি বেরুবো কোন্ মুখে, বলতে পারো?

—কিন্তু···

অখিল পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল।

—আঃ,—কি করো অখিলদা! সরো,···যেতে দাও আমাকে! আমার নামে একটা কলঙ্ক না রটিয়ে তুমি ছাড়বে না?

—কিসের কলঙ্ক! আমি তোমায় ভালোবাসি কদম। তোমাকে আমি···

অখিল কদমের হাত ধরিল।

দ্বারের দিক হইতে সরস্বতীর আহ্বান—তোর হয়েছে রে কদম?

কণ্ঠ শুনিয়া কদমের হাত ছাড়িয়া অখিল সরিয়া গেল। সরস্বতী আসিলেন উঠানে···পিছনে সুশীল।

সরস্বতী কহিলেন—অখিল না?

অখিল বলিল—হ্যাঁ।

কদম বলিল—আংটি কিনেছে পিসিমা, বৌয়ের জন্য··· আমাকে তাই দেখাতে এসেছে।

অখিল নির্ব্বাক্···মাথা নীচু করিয়া রহিল।

হাসিয়া সরস্বতী বলিলেন—তা এতে লজ্জা কি! বৌকে জিনিষ দিবি, ভালো কথা! সত্যি, বৌয়ের সঙ্গে লজ্জার সম্পর্ক নয় তো যে তাকে কোনো জিনিস দিতে লজ্জা হবে! দেখি আংটি।

১৬

কেশব ভট্চায্যি পূজা করিল। দক্ষিণা লইয়া গমনোদ্যত হইলে সরস্বতী বলিলেন—কদমকে আমরা পৌঁছে দিয়ে যাবো কেশব, বুঝলে?

—বেশ।

কেশব ঠাকুর চলিয়া গেল।

আলিস আসিয়াছিল পূজা দেখিতে। মায়ের কথায়, মামীমার কথায় সুশীল তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে।

শির্ণী লইয়া সরস্বতী বলিলেন,—আলিস খাবে তো মা?

—কেন খাবো না? এ-কথা আপনি জিজ্ঞাসা করলেন যে?

—ভাবলুম, কি জানি···আমাদের দেবতার প্রসাদ খেতে তোমাদের ধর্ম্মে যদি মানা থাকে!

হাসিয়া আলিস বলিল—দেবতাদের মধ্যে জাতের তফাৎ আছে না কি?

সরস্বতী অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন—দেবতাদের জাতের তফাৎ নেই মা, আমরাই নিজেদের অহঙ্কারে মেতে তফাৎ করি।

মায়ের কথার খেই ধরিয়া সুশীল বলিল—আপনাকে ব্যঙ্গ করছি না···তবে আমরা যে-ভোগ দি ঠাকুরের উদ্দেশে···সেই ভোগ দেওয়াকে খৃষ্টান-মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা গোঁড়া তাঁরা বলেন idolatory. তাই মানে···

আলিস বলিল—ও-সব কথা শুনে হাসি পায়। পাদ্রীরা এদিকে বলেন God made love to the world.

হাসিয়া সুশীল বলিল—বাংলা ভাষায় যার তর্জ্জমা দেখি—ঈশ্বর পৃথিবীকে প্রেম করিলেন!

আলিস হাসিল; হাসিয়া বলিল—মানুষকে ভগবান্ ভালোবাসলেও ওঁরা অবজ্ঞা করেন কি হিসেবে, এর মানে আমি খুঁজে পাই না।

—এর মানে ওঁরাই জানেন…যাঁরা ধর্ম্মের সেবা করেন না—করেন ধর্ম্মের নামে চাকরির সেবা…পয়সার সেবা!

বিন্দুমতী ধমক দিলেন। বলিলেন—তোদের তত্ত্বকথা রাখ্ দিকিনি বাপু! চুপ করে পেসাদ খা।

শির্ণী মুখে দিয়া সুশীল বলিল—এ কি একরত্তি দেছেন মামীমা! একটি বাটি ভরে আমাকে শির্ণী দিন! কি চমৎকার খেতে! আঃ! এর কাছে কোথায় লাগে আমাদের পায়েস আর এঁদের পুডিং!

শেষের কথাটা বলিল আলিসকে উদ্দেশ করিয়া।

হাসিয়া আলিস চাহিল সুশীলের পানে। সুশীল বলিল—নয়? বলুন,—সত্যি করে! নো প্রেজুডিস প্লীজ!

আলিস বলিল—এত দোহাই দিচ্ছেন কেন? জানি, শির্ণী খেতে খুব ভালো! কখনো আমি এ জিনিষ খাইনি না কি?

—আর একটু খান তবে। মামীমা, ওঁকেও একটু বেশী করে দিন।

বিন্দুমতী বলিলেন,—দেবো?

—দিন।

কদম বসিয়াছিল এক ধারে…নির্ব্বাক! তার মনে কাঁটা বিঁধিতেছিল! আলিসের দিকে সুশীল কি আগ্রহ লইয়া ঝুঁকিয়া আছে!…কেন থাকিবে না? আলিস বিদুষী …কথা বলিতে জানে! তার কাছে কদম…

বুকের মধ্যে নিশ্বাস জমিয়া উঠিতেছিল।

বিন্দুমতী বলিলেন—বসে আছিস কেন.কদম? নে না মা, নিজে ঐ পাথরের বাটিতে কোরে শির্ণী নে। একখানা রেকাবিতে পেসাদ তুলে নে!…ফল, সন্দেশ… নে মা। তার পর রাত্রে আমার এখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ী যাবি।

নিশ্বাস ফেলিয়া কদম কহিল—খাবো'খন জ্যাঠাইমা। আপনাদের হোক্, আপনাদের সঙ্গে আমি খাবো!

সুশীল চাহিল কদমের দিকে। সহাস্যে কহিল—সত্যি, …বুড়ো-মানুষকে এখনি খাবার জন্য বিরত করছেন কেন মামীমা? আমরা ছেলেমানুষরা আগে খাই। উনি এর মধ্যে খাবেন কেন?

মুখে সলজ্জ হাসি…কদম বলিল,—আমি তো তা বলিনি!

—তবে খান। মামীমা দিচ্ছেন।

বিন্দুমতী শির্ণী দিলেন কদমের হাতে।

আলিস বলিল,—ইনি…

সরস্বতী বলিলেন—যিনি পূজো করে গেলেন…কেশব ঠাকুর…তাঁর বৌ।

দু'চোখে বিস্ময়…আলিস চাহিয়া রহিল কদমের পানে।

কদম লক্ষ্য করিল। সে-দৃষ্টি কাঁটার মতো বিঁধিয়া তার দেহে-মনে অস্বস্তি জাগাইয়া তুলিল।

সুশীল বুঝিল। তাই হাসিয়া কদমকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—আরো শির্ণী নাও কদম। তোমার বয়সে আমি বাটি-বাটি শির্ণী খেয়ে সাফ করেছি। বিশ্বাস না হয়, মাকে জিজ্ঞাসা করো বরং! বেশী বেশী করে নাও…লজ্জা করো না…বুঝলে!

কদম বলিল—কাকে লজ্জা করবো, শুনি? আপনাকে?

—কি জানি! পুরুষ-মানুষের সামনে মেয়েদের লজ্জা করে খেতে! যেন পুরুষ-মানুষ আশ্চর্য্য হয়ে যাবে যে, ওমা, মেয়েরাও খায় তাহলে!

এ-কথায় সকলে উচ্চ হাস্য করিল। সরস্বতী বলিলেন, —নে, তোকে আর রঙ্গ করতে হবে না। তুই মুখ বুজে খা দিকিনি।

—যা বলেছো মা! কথা কইতে গেলে সময় নষ্ট হয়। না, আর কথা নয়, চুপ করে খেয়ে যাই শুধু!

শির্ণীর পর লুচি-তরকারীর পালা। কাহারো মুক্তি মিলিল না। বিন্দুমতী আয়োজন করিয়াছেন একেবারে ষোড়শোপচারে! মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যখন নাই,—তখন এই মৌন মূক দেবতাদের লইয়াই তাঁর সান্ত্বনা সংগ্রহ করা!

আহারাদি চুকিতে রাত প্রায় দশটা বাজিয়া গেল। সরস্বতী বলিলেন—আসি তাহলে বৌ-ঠাকরুণ! কদম ওঠো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবো।

কদমকে তার গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া মোড়ের মাথায় সরস্বতী বিদায় লইলেন। সুশীলকে বলিলেন—আলিসকে তুই পৌঁছে দিয়ে আসবি।

পূর্ণিমার রাত্রি। মাথার উপর আকাশ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া আছে…কোথাও মেঘের বিন্দুবাষ্প জমিয়া নাই!

আলিস বলিল—কি চমৎকার রাত্রি!

সুশীল বলিল—যা বলেছেন!

আলিস বলিল—এমন রাত্রে আমার মনে হয়, আমি সারা পৃথিবী ঘুরতে পারি…এতটুকু ক্লান্তি হয় না!

হাসিয়া সুশীল বলিল—মেয়ে-জাত এমনি ভাবুক বটে!…ভাবের উচ্ছ্বাসে কঠিন বাস্তবের কথা আপনারা এত সহজে ভুলে যান!

—তার মানে?

—মানে, ভাবে আপনারা মশ্গুল হয়ে থাকেন! যখন যেমন খেয়াল হয়, তখন সেই খেয়ালের ভাবে আর সব-কিছু ভুলে যান। এতখানি ভাবাবেগে ভবিষ্যতের চিন্তা মনে জাগে না।

—যেমন ?···দৃষ্টান্ত দিয়ে বলুন, যাতে বুঝতে পারি !

সুশীল বলিল—যেমন···স্বামীকে স্ত্রী এমন ভালোবাসে ···যে সে-ভালোবাসার ঘোরে স্বামীর দোষ-ত্রুটিগুলোকে পর্য্যন্ত শিরোধার্য্য করে। তাতে স্বামীদের আস্পর্দ্ধা বাড়ে ···স্ত্রীর উপর তাদের পীড়ন চলে নানা ভাবে।···ঐ যে মেয়েটিকে দেখলেন, ওর নাম কদম। ওর মন আছে! জীবন্ত মন। ওকে দেখে দুঃখ হয় ! ঐ কেশব ঠাকুরকে দেখলেন তো ! কেশব-ঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। দু'জনে বয়সে কত তফাৎ ! কিন্তু সেইটেই কদমের জীবনে ট্রাজেডি নয়। স্ত্রীর কি দাম, কেশব ঠাকুর তা জানে না, বোঝেও না ! সে জানে, স্ত্রী মানে একটা স্ত্রীলোক ··সে-স্ত্রীলোক সকল দিক দিয়ে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবে ! সে-স্ত্রী যে মানুষ ···তারি মতো মানুষ, কেশব ঠাকুর তা জানে না, মানেও না।

আলিস শুনিল, কোনো কথা বলিল না।

সুশীল বলিতে লাগিল,—সে-মনে সাধ-আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, সুখ-দুঃখবোধ আছে, সে সম্বন্ধে স্বামী কেশব ঠাকুর সম্পূর্ণ উদাসীন! শুধু কেশব ঠাকুর বলি কেন, শতকরা নিরেনব্বই জন স্বামী এমনি। এরা স্ত্রীকে জানে, আরাম-সুখ-বিলাস জোগাবার জীব !···অথচ এই কদমের মতো স্ত্রীরা স্বামীর উপর ভালোবাসার আবেগে এমন বিভোর যে নিজেদের থেঁৎলে-ছেঁচে-পিষে স্বামীকে অমৃত পান করাচ্ছে ! প্র্যাক্‌টিকাল্ না হয়ে এমনি ভাবোচ্ছ্বাসে মশগুল থাকে বলেই আমাদের দেশের মেয়েদের জীবন কমেডি না হয়ে ট্রাজেডিতে পরিণত হচ্ছে !

কথাগুলা আলিসের বুকে যেন খোঁচার মতো লাগিল ! নিশ্বাস ফেলিয়া আলিস বলিল—হয়তো আপনার কথা সত্যি ! কিন্তু···

—কিন্তু কি, বলুন···

আলিস বলিল—মেয়েরা পারে প্র্যাক্‌টিকাল্ হতে ?

—তার মানে ?

—আমার মনে হয়, মেয়ে-মানুষের মনের ছাঁচটাই ভগবান অন্য রকম করে গড়েছেন !

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দেবালয়

উৎসব আর জীবনের সৌরভ
লুপ্ত যেথায় বহু শতাব্দী পরে,
সুপ্ত যেথায় বাঙ্গালীর গৌরব
বটের ছায়ায় জনহীন প্রান্তরে—
সেথায় প্রাচীন মন্দিরে বসি' একা
প্রাচীরের গায়ে পাষাণ-ফলকে লেখা
মধ্যযুগের হেরিনু কাহিনী সুন্দর অক্ষরে।

তারি বুকে পড়ে রৌদ্রের ঝিলিমিলি,
সম্মুখে দীঘি—পাল-বংশের স্মৃতি,
কূজন করিছে বিহগেরা নিরিবিলি
বাতাসে ধ্বনিছে তরু-মর্ম্মর-গীতি।
এই দেবালয় দিগ্বিজয়ীর দান,
উত্তরাপথে ছিল যার অভিযান
জয়-দুন্দুভি চৌদিকে বেজে সার্থক হতো নিতি।

এর কথা কিছু লেখে নাই ইতিহাস—
প্রাক্-পলাশীর-যুগ-অধ্যায়-মাঝে,
ধর্ম্মপালের কীর্ত্তির অধিবাস
এই প্রান্তরে তন্দ্রার মত রাজে।
ভাঙ্গা বিগ্রহ বেদিকার পটভূমে
পড়ে আছে দুখে পাষাণের বুক চুমে—
মিনতি-প্রদীপ জ্বলে নাকো আর ভাব-বিহ্বল সাঁঝে

গেছে কত দিন ভাবনা-বিহীন পথে
কণ্ঠে দুলায়ে বাঙলার চাঁদমালা,
ভারত-বিজয়ী গর্ব্ব-উজল রথে
এনেছে কত না মণি-মুক্তার ডালা।
দুর্ভিক্ষের দেখে নাই মুখ যারা,
আজিকার মত হয়নি লক্ষ্মী-ছাড়া—
এই মন্দির সেই বাঙালীর হৃদয়-রক্তঢালা।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

জার্ম্মাণী এত দিন মহাবিক্রমে দিগ্‌বিজয় করিতেছিল। পশ্চিমে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও উত্তরে তাহার প্রতাপে অতি-প্রতাপশীল রাজ্যগুলি কোনটি আর্ত্তনাদ করিয়া আটলান্টিক দরিয়ার অপর পারস্থিত স্বগোত্রীয়গণের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছে, কোনটি পদানত হইয়াছে, অধিকাংশ রাষ্ট্র আপন বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন করিয়াছে, কোনটি বা আহত সিংহের মত সুদিনের ও সুযোগের অপেক্ষা করিয়াছে।

রুশিয়ার পশ্চিম অভিযান—

এ সকল প্রস্তুত জাতির মধ্যে তাতার-তেজোদীপ্ত-রুশিয়া প্রতি-প্রহারের যে ব্যবস্থা করিয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিবে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণরা স্মোলেনস্ক জয় করিয়া তাহাদের প্রধান লক্ষ্য লেনিনগ্রাড, মস্কো ও কিভের দিকে বিদ্যুৎ বেগে ধাবিত হয়। জুলাইয়ের শেষে জার্ম্মাণ-সীমান্ত হইতে তাহারা প্রায় ৩ শত মাইল অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। আর ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে জুলাইয়ে রুশ বীরেরা এই একই অঞ্চলে একই প্রকার বেগে অগ্রসর হইয়া প্রায় একই সময় আপনার বাহুবলে তুল্য পুনরধিকার করিয়াছে। এক বৎসরে তাহারা অন্যূন ৩ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য ধ্বংস করিয়াছে। এই যুদ্ধের নাম দেওয়া হইয়াছে—"Mud offensive." ৭ সপ্তাহ প্রচণ্ড আক্রমণের পর নাপার তট হইতে কার্পেথিয়ান গিরি-অঞ্চলের যুদ্ধ প্রায় থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণরা আশঙ্কা করিতেছে, ইহা নূতন আক্রমণের পূর্ব্বের বিরতি মাত্র। রুশরা কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চল হইতে সৈন্য লইয়া প্রিপেট জলাভূমির দিকে যাইতেছে। উদ্দেশ্য—পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিণ আক্রমণের বাস্তব চাপ বৃদ্ধি পাইলে, জার্ম্মাণ রক্ষা-ব্যূহের এই মধ্যস্থল রুশ-সৈন্যগণ প্রচণ্ড বেগে বিদ্ধ করিয়া লাও (Lwow) ও উত্তর পোল্যাণ্ডকে অতিক্রম করিয়া বার্লিনাভিমুখে ছুটিবে।

আমেরিকার য়ুরোপ আক্রমণ—

জার্ম্মাণ-বোমায় ক্ষত-বিক্ষত বৃটেন আমেরিকাকে ডাকিয়া লইয়া আসিয়া জার্ম্মাণীকে মজা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথমে মার্কিণ বোমারু বিমানগুলি জার্ম্মাণীর শিল্প-সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির উপর বিস্ফোরণ বর্ষণ করিয়া সেগুলির কর্ম্মশক্তি ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করে। এইবার তাহারা য়ুরোপ আক্রমণ করিয়াছে। য়ুরোপ অর্থাৎ "চলি-চলি পা-পা"র প্রথম ধাপে ইংলিশ চ্যানেলের পূর্ব্বতটবর্ত্তী ফরাসী উপকূল-ভূমি। এই ভূমির একটু ভৌগোলিক পরিচয় থাকা দরকার। ইংলণ্ডের ঠিক দক্ষিণেই ব্রেষ্ট হইতে অষ্টেণ্ড পর্য্যন্ত ফ্রান্সের উপকূল। ব্রেষ্ট হইতে শেরবুর্গ পর্য্যন্ত স্থানের উপকূল অত্যন্ত উচ্চ খাড়াই পাহাড়ের, সুতরাং তথায় সৈন্য অবতরণের অসুবিধা। শেরবুর্গ হইতে উত্তরে সীন নদীর মোহানা পর্য্যন্ত সমুদ্রের বেলাভূমি অতি নিম্ন। সীনের মোহনাতেই লা হেভার অবস্থিত। লা হেভার হইতে পূর্ব্বে ডীপে পর্য্যন্ত তটভূমিতে খাড়াই পাহাড়। অষ্টেণ্ড হইতে ডীপে পর্য্যন্ত স্থানে সৈন্য অবতরণের সুবিধা। অষ্টেণ্ডের পূর্ব্বদিকেই রাইন নদীর মোহনা, এই অঞ্চলে সমুদ্র-জল লইয়া গিয়া প্লাবিত করিয়া দেওয়া যায়।

জার্ম্মাণী পূর্ব্ব হইতেই ইঙ্গ-মার্কিণ অভিযান আয়োজনের আভাস পাইয়া তথায় মার্শাল রোমেল, ও মার্শাল রানষ্টেটকে সমরায়োজনের ভার দেয়। ঘেণ্ট, আরাগ, বোঁভয়, আজেন্‌টান, বেণে, ডানকার্ক, ক্যালে, শেরবর্গ, ব্রেষ্ট প্রভৃতি [illegible] ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং সুবিস্তীর্ণ সামরিক [illegible]।

ইঙ্গ-মার্কিণ আক্রমণ [illegible] মোহনাস্থিত নিম্ন বেলাভূমি অঞ্চলে। [illegible] হইতে দক্ষিণে প্রায় ৩০ মাইল [illegible] প্রায় ১৫ মাইল স্থান ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্য [illegible]।

জার্ম্মাণদের পাল্টা আক্রমণ

জার্ম্মাণেরা এ আক্রমণে [illegible] করিতেছে তাহার বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। [illegible] ইঙ্গ-মার্কিণ [illegible] ইংলিশ প্রণালীর পূর্ব্ব উপকূলে [illegible] হইলে জার্ম্মাণ ইউবোটগুলি বাধা দিবার বিশেষ কোন [illegible] করিতে পারে নাই এইরূপ সংবাদই আসিয়াছে। [illegible] মিঃ চার্চ্চিল স্বীকার করিয়াছেন যে, মার্শাল রোমেল [illegible] আক্রমণ করিতে [illegible] হন নাই। ইঙ্গ-মার্কিণ অভিযানের [illegible] বোমার এমন [illegible] আক্রমণ [illegible] যে, [illegible] স্ত্রীলোক ও শিশুকে অজ্ঞাত স্থানে [illegible]। মিঃ চার্চ্চিল এ আক্রমণ [illegible] বলিয়া [illegible] নাই। আক্রমণ অবিশ্রান্ত চলিতে থাকায় মিত্রপক্ষকে [illegible] ঘাঁটিগুলির সন্ধান করিয়া সেগুলি [illegible]। সম্ভবতঃ এই কারণ [illegible] ডাঃ গোয়েবেলস বলিয়াছেন—'The nation now finds itself in an emergency which releases its supremest and final strength." জার্ম্মাণীর এই উড়ন্ত বোমার [illegible] করিবার জন্য ইঙ্গ-আমেরিকা না কি এমন এক [illegible] আবিষ্কার করিয়াছে, যাহার প্রভাব জার্ম্মাণ উড়ন্ত বোমা অপেক্ষা চতুর্গুণ বেশী।

অপর পক্ষও পাল্টা প্রচার করিয়া [illegible], নাৎসীরা এমন একটি নূতন অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে, যাহার প্রয়োগে ৫ শত গজের মধ্যে সকল পদার্থের তাপ শূন্য ডিগ্রী ফারেনহিটের অপেক্ষা ৩৩২ ডিগ্রী কমিয়া যাইবে। ফলে মরণ! এই অস্ত্র প্রয়োগের পাল্লার মধ্যে প্রত্যেকটি জীব গতাসু হইবে, লোহা মোটা ইস্পাত আর কংক্রিটের বাড়ীঘর রাস্তা কাচের মত চূর্ণ হইয়া যাইবে। জার্ম্মাণ রেডিওর এই প্রচার-গল্প শুনিয়া না কি ইংরেজ বর্ষুগণ [illegible] চাপিয়াছিলেন।

অতঃপর যুদ্ধ কেমন চলিবে, তৎসম্বন্ধে মার্কিণ সেনাপতি আইসেন-হাওয়ার না কি বলিয়াছেন যে—আভ্যন্তরীণ গোলযোগে জার্ম্মাণীর কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এ আশা করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত! মিত্রপক্ষকে দীর্ঘকাল ও তীব্রতর উদ্যমে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যুদ্ধ কঠোর হইবে ও তাহাতে বহু জনক্ষয় হইবে।

পরাজিত জার্ম্মাণী সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা—

জার্ম্মাণীর পরাজয় হইলে, উহাকে লইয়া কি করা হইবে, এ সম্বন্ধে এখন হইতেই না কি গোপন আলোচনা চলিতেছে। রুজভেল্ট-চার্চ্চিল না কি দাবী করিতেছেন, বিনা সর্ত্তে জার্ম্মাণীর আত্মসমর্পণ। কিন্তু কোন কোন বিশিষ্ট রাজনীতিকের মত এই যে, ইহাতে নাৎসী গোয়েবেল্‌সদেরই জয় হইবে। জার্ম্মাণীর প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েবেল্‌স (৭ই জুলাই) তাঁহার সাপ্তাহিক পত্র—"Das Reich"এ জানাইয়া

দিয়াছেন—Nations become most dangerous when it has burnt its boats and has nothing to lose··· জার্ম্মাণ জাতিকে উত্তেজিত করিয়া এই নাৎসী প্রচারকরা বলিতেছে—আত্ম-সমর্পণ করিলেই জার্ম্মাণ জাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

অধিকৃত জার্ম্মাণী সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ ইচ্ছা কতকটা যেন এইরূপ—

১। দীর্ঘকাল জার্ম্মাণীতে কোন বে-সামরিক শাসন-ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে না। ২। ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্য যে সকল স্থান অধিকার করিবে তাহাতে ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। ৩। রুশ সৈন্য যে সকল স্থান অধিকার করিবে, তাহাতে রুশ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

যুদ্ধান্তে ইঙ্গ-মার্কিণ সম্পর্ক—

যুদ্ধ মিটিলে ইংরেজের সহিত আমেরিকার সম্পর্ক কি দাঁড়াইবে, ইহার গবেষণাও যে না হইয়াছে তাহা নহে। অনেকে এমন আশঙ্কা করিয়াছেন যে, উভয়ের মধ্যে যে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সম্পর্ক দাঁড়াইবে তাহাতে হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতারই সৃষ্টি হইবে। 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রের নিম্ন মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

"There have been hints that the Russian advance is being played up and represented as a threat to civilisation and a bid for unrivalled authority at a peace conference laying upon Anglo-Americans the duty to get to Berlin first by coming to terms with their resolute opponents."

কিন্তু এ সকল নিছক প্রচার-কার্য্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

জার্ম্মাণীকে রসদ যোগায় কে?—

য়ুরোপ অভিযানের উদ্যোগপর্ব্বে এবং আক্রমণ চলিবার কালে অগ্নি ও বিস্ফোরক বর্ষণ করিয়া জার্ম্মাণীর অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ও বিদগ্ধ করা হইতেছে, এ সংবাদ নিত্য আমরা পাইয়াছি। তথাপি জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান রসরক্তের যোগান কেমন করিয়া হইতেছে, তাহার পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যে না যাইতেছে তাহা নহে। নিরপেক্ষ দেশগুলি যুযুধান দেশগুলির সহিত ব্যবসা চালাইয়া এই অবসরে স্ফীত হইবার চেষ্টা বেশ করিতেছে। তুরস্কের ক্রোম টনে টনে জার্ম্মাণীর বলবিয়ারিং কারখানাগুলিতে চালান যাইতেছিল, সম্প্রতি মিত্রপক্ষের আপত্তিতে এ চালান বন্ধ হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিবাদ তুচ্ছ করিয়া স্পেন (সামরিক যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের পক্ষে অপরিহার্য্য) টাংষ্টেন ধাতু যথারীতি জার্ম্মাণীকে দিতেছে। সুইডেন বলবিয়ারিং তৈয়ারী করিয়া প্রভূত পরিমাণে জার্ম্মাণীতে পাঠাইতেছিল। ইঙ্গ-ইয়াংকি ধমক খাইয়া এবং মার্কিণ গ্যাসোলিন না পাইবার আশঙ্কায় জার্ম্মাণীকে বলবিয়ারিং প্রদান না কি সুইডেন সম্প্রতি বন্ধ করিয়াছে।

ইটালী অভিযানে বৃটেনের মূল্যদান—

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের পথ অর্থাৎ কাঁচামাল বৃটেনে প্রেরণের নিরাপদ করিবার জন্য আফ্রিকায় জার্ম্মাণ-প্রতাপ খর্ব্ব করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি ইটালীতে যে অভিযান চালায় তাহা যে ফলপ্রসূ হয় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইংরেজ ও তাহার মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের ইটালীতে অবতরণ হইতে রোম জয় পর্য্যন্ত মাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যেরই ৭৩,১২২ সৈন্য হতাহত বা নিরুদ্দেশ হইয়াছে। মার্কিণ সৈন্যের হতাহতের হিসাব পাওয়া যায় নাই।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষা—

ব্রহ্ম পুনরধিকারের তোড়জোড় ইঙ্গ-মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ অনেক দিন হইতেই করিতেছেন, ফল কিছুই হয় নাই, বরং উল্টা বিপত্তি হইয়াছে। জাপান ভারত আক্রমণ করিয়াছে। আজ প্রায় ৪ মাস যাবৎ জাপ-সৈন্যদল আসাম-সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, অগ্রসর হইয়াছে এবং যুদ্ধ করিতেছে। চারি মাস পর আসামের গভর্ণর সার এণ্ড্রু ক্লো এক বেতার-ঘোষণায় বলিয়াছেন, ইঙ্গ-মার্কিণ ফৌজ কোহিমা রক্ষা করিয়া সমগ্র আসাম উপত্যকা রক্ষা করিয়াছে। আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তস্থিত মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল যে জাপ সৈন্যদিগের অপেক্ষা অশেষ শক্তিশালী ইহা একাধিক বার ঘোষণা করা হইলেও জাপ সৈন্যদিগকে কি জানি কেন, আজিও ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে দেখা যায় নাই। গত ২৮শে ও ২৯শে আষাঢ় মাত্র ৬ শত জাপানী সৈন্য উখরুলের দক্ষিণ-পশ্চিমে চেপু নামক স্থানে ইংরেজের ব্যূহ ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া পরাজিত হইয়াছে। শিলচরের পশ্চিমে মণিপুর-শিলচর রোড; ২৬ নং মাইলষ্টোন পর্য্যন্ত পথের উত্তর দিক হইতে জাপসৈন্যকে দূর করা হইয়াছে। কিন্তু বিষেণপুর হইতে জাপানী ঘাঁটী তাঁহারা আজিও সরাইতে পারেন নাই। আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের উত্তর ভাগেও জেনারল ষ্টিলওয়েলের সৈন্যদল প্রত্যহই সাফল্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। কামাইং-মোগং রোড হইতে শত্রু-প্রতিরোধ একেবারে নষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

চীনের অবস্থা ভাল নহে—

চীনের অবস্থা সুবিধা নহে। রয়টারের বণ্টিত বিচ্ছিন্ন সংবাদে অবশ্য সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহাদিগের বিজয়ের সুখবর পাই, কিন্তু ২৬শে আষাঢ় মার্কিণ ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ ওয়ালেস প্রকাশ করিয়াছেন—চীনের অবস্থা খুব সঙ্গীন! সঙ্গীনত্বের বিস্তৃত সংবাদ কি, তাহা বুঝা না গেলে চীন-ব্রহ্ম তথা উত্তর আসাম-সীমান্তে চীনা-মার্কিণ ও জাপ-প্রচেষ্টার কোন সংবাদেরই সঠিক মর্ম্ম আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না।

প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ প্রতাপ—

এ কথা বলিলে আজ কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে, গত তিন মাসে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নৌ-প্রভুত্ব করিতেছে। আজ এক দিকে যেমন মার্শাল ও গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ ও অন্য দিকে তেমনি সোলেমন দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে মার্কিণ শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। মার্কিণ নৌবহরগুলি আজ জাপ রক্ষা-প্রাচীরের বহির্ভাগে সদা প্রস্তুত রহিয়া আশা করিতেছে, জাপান প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ঠেলা বুঝুক। এ কথা সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, জাপ রক্ষা-প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ দ্বীপগুলিতে জাপান একান্ত শক্তিশালী। মার্কিণ নৌবীররা বড় বড় নৌযুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন এবং হতাশ হইয়া বলিতেছেন—"We are willing but the Japs do not seem to want to gamble."

কিন্তু ২৩শে আষাঢ় কলম্বো হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ভারত মহাসাগরে শত্রুর টর্পেডো মিত্রপক্ষের একখানি বাণিজ্য-জাহাজ ডুবাইয়াছে, ফলে তিন শতাধিক আরোহীর মৃত্যু হইয়াছে। এ অঞ্চলেও মিত্রপক্ষের নৌ-প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়াই আমাদের ধারণা ছিল। তবে মার্কিণ বোমারু বিমানদলও চীনা ঘাঁটী হইতে গিয়া খাস জাপ দ্বীপপুঞ্জের নাগাসাকি, সাসেবো ও ইয়াবাতোর উপর বোমাবর্ষণ করিয়া আসিয়াছে।

শ্রীতারানাথ রায়

সাময়িক প্রসঙ্গ

কাগজ-নিয়ন্ত্রণের নূতন আদেশ

সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারত সরকার সম্প্রতি যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহার ফলে বাঙ্গালার মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর পত্রিকাই যে কিরূপ বিপদের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা প্রত্যেকেই বুঝেন। দুই সপ্তাহ পরে সরকার আবার এই আদেশের একটি টীকা প্রকাশ করিয়া নিজেদের কার্য্যের সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—"কাগজ-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য—বাজে কাজে কাগজ অপব্যয় না করা হয়। যেমন ধরুন, পঞ্জাবের কোন জমীদার তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের সনদগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইতে চাহেন। অথবা কোন নেতা নিজের বক্তব্য অথবা বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।"

যদি সরকার সত্যই এই ধরণের প্রকাশ-কার্য্য বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই রকম আদেশ জারী করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই তাহা করা উচিত ছিল। কিন্তু তখন তাহা করা হয় নাই। কত নূতন পত্রিকার, কত নূতন প্রকাশকের অভ্যুদয় হইয়াছে। এখন হঠাৎ বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের মত এই রকম আদেশ সকলের টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার আয়োজন করিয়াছে। ভাল, মন্দ, দরকারী, অদরকারী, কোন বাছ-বিচারই নাই।

আমাদের মনে হয় এবং বোধ হয়, অনুমান ঠিকই যে, এই আদেশ জারী করিবার পূর্ব্বে সরকার কোন মুদ্রাকর, প্রকাশক অথবা ব্যবসায়ীর মতামত গ্রহণ করেন নাই।

এই আদেশে যে কোন কার্য্যই চলিতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। "কাগজ-নিয়ন্ত্রণ" করা হয়ত' উচিত, কিন্তু তাহা এইরূপ ক্ষতিকর ভাবে নহে। ইহাতে কেবল প্রকাশকেরাই নহে, ষ্টেশনার্স এবং প্রিণ্টিং-হাউসগুলিরও ক্ষতি হইবে। অনেককে হয় বছরে মাত্র তিন মাস কাজ করিতে হইবে, না হয় শতকরা পঁচাত্তর জন লোকের চাকুরী যাইবে! সংক্ষেপে এই আদেশের ফলে বোধ হয় ভারতবর্ষে মুদ্রণ-কার্য্য একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার সংখ্যা কমিয়া যাইবে। বিজ্ঞাপন পত্রিকার একটি বড় আয়। সুতরাং সেই আয়ও কমিবে। পত্রিকার আকার কমিলে গ্রাহকগণ পূর্ব্ব-মূল্যে হয়ত' পত্রিকা কিনিবেন না। সে জন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। সাময়িক পত্রিকাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়াই কি তবে সরকারের উদ্দেশ্য? কাগজ উৎপাদন সম্বন্ধে প্রেসনোটে দেখিতে পাই—"কাগজ উৎপাদন স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ কম। তাই আদেশ জারী করা হইয়াছে—কাগজের ব্যয় কমাইয়া শতকরা ৩০ ভাগ করিতে হইবে।"

এই আদেশ কি করিয়া ন্যায্য বলা যায়? কাগজ শতকরা ৩০ ভাগ কমাইতে না বলিয়া ৭০ ভাগ কমাইতে বলা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বেকার সময়ের তুলনায় অনেক পত্রিকারই আকার বেশ কিছু কমিয়াছে। 'কমার্শ' পত্রিকা বলেন—"যা কাগজ পাওয়া যায় তার প্রায় সবটাই সরকার নিজেরা নেন। জনসাধারণ যুদ্ধের পূর্ব্বে শতকরা আশী ভাগ কাগজ পাইত। যুদ্ধের জন্য মাত্র ১৮ ভাগ পাইতেছে! আরও শতকরা ৩০ ভাগ কমাইলে মাত্র ৬ ভাগ থাকে। 'টোটাল ওয়ারে'র সময়ও ইহা যেন বেশী বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয়।"

স্বীকার করি, আমদানী এবং উৎপাদন কম। কিন্তু এ দায়িত্ব সরকারের, জনসাধারণের নহে। আমদানী সম্বন্ধে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা অতিশয় নিন্দনীয়। কেবল যে জাহাজে কাগজের জন্য স্থানের বন্দোবস্তের ভাল ভাবে চেষ্টা করা হয় নাই তাহাই নয়; 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' বলিয়াছেন যে, বৃটেন হইতে ভারতে যে পূরা মাল যাইতে পারিতেছে না তাহার কারণ জাহাজে স্থানাভাব নহে, লাইসেন্সের অভাব। অতএব দেখা যাইতেছে, চেষ্টা করিলে আরও কাগজ ভারতে আসিতে পারিত। এই অভাবের কারণ সরকারের চেষ্টার অভাব। তাহা ছাড়া হাতে-প্রস্তুত কাগজ সরকারী সাহায্যলাভে বঞ্চিত। সাহায্য পাইলে এই সময়ে অনেক সুবিধা হইত, কিন্তু সাহায্য তো দূরে থাকুক, এই আদেশে শিল্পটির মৃত্যু সুনিশ্চিত।

এই আদেশের ফল বেকার-সমস্যা বাড়িবে। প্রায় সকল পত্রিকাই বন্ধ হইয়া যাইবে। শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি সবই বিসর্জন দিতে হইবে। এই অতি ক্ষতিকর আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য 'পিরিওডিক্যাল প্রেস এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া' গঠিত হইয়াছে। প্রতিনিধিরা বোম্বাই কনফারেন্সে তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ জানাইবার জন্য গিয়াছেন। আশা করি, সরকার তাঁহাদের আদেশ যে কি পরিমাণ ক্ষতিকর এবং গ্লানিকর, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

দুর্ভাগা চট্টগ্রাম

আধুনিক বাঙ্গালার ইতিহাসে চট্টগ্রাম একটি মর্ম্মন্তুদ পরিচ্ছেদ। রাজরোষ, প্রকৃতির বিপর্য্যয় ও যুদ্ধ ইহাকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে যখন চট্টগ্রামে খাদ্যদ্রব্যের অভাব সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা ব্যবস্থা পরিষদে হয়, তখন তাহাতে আপত্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে সে বিষয়ে মুলতুবী প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন সদস্য চট্টগ্রামের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা ভয়াবহ। খান বাহাদুর হাজী বোদী আহম্মদ চৌধুরী বলেন—চট্টগ্রামে খাদ্যদ্রব্যের অভাবে অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে যে, পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকেরাও জীবন-রক্ষার জন্য বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে। সেখানে ১০ ছটাক চাউল এক টাকায় বিক্রয় হইতেছে এবং এই প্রকার মূল্য দিয়াও অনেক স্থানে চাউল পাওয়া যায় না! তিনি প্রাপ্ত একখানি পত্রে জানিয়াছেন, একটি ইউনিয়ন বোর্ডকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যেন ১লা জুন হইতে জন্ম-মৃত্যুর কোন হিসাব রাখা না হয়। এই সম্পর্কে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা বলেন—দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া চট্টগ্রামের নারী-জীবনের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় সেখানে ব্যাপক বেশ্যা-বৃত্তি সুরু হইয়াছে। 'কলিকাতা গেজেটে' দেখা যায়, গত মে মাস হইতেই চট্টগ্রামে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসর মে মাসে—যে বৎসর বাঙ্গালায় অনাহারে ২৫।৩০ লক্ষ লোক মরিয়াছে, তখন চট্টগ্রামে চাউলের মূল্য ২৫ টাকা মণ ছিল! আর আজ—যখন বাঙ্গালায় সুজন্মা হইয়াছে এবং প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের আহার্য্য

যোগাইবার ভার ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন উহা দ্বিগুণ হইয়াছে। এখন মূল্য ৫০ টাকা মণ!

খাদ্য-সচিব সুরাবর্দ্দী নিতান্ত দয়া করিয়া বলিয়াছেন—"না, চট্টগ্রামকে আমরা ভুলি নাই। তবে, যানবাহনের বড়ই অভাব! কেমন করিয়া বাড়তি অঞ্চল হইতে খাদ্যদ্রব্য চালান দেই! হ্যাঁ, তবে শীঘ্রই একটা সুরাহা হইবে আশা করি।"

এই ধরণের উত্তর অন্য কোন দেশে দিলে সচিবের পক্ষে পরিষদ-গৃহ ত্যাগ করা নিশ্চয়ই দুষ্কর হইত। এইরূপ অযোগ্যতার জন্য হয়ত' সচিবত্বের অবসান ঘটিত। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছেন, খাদ্য-সমস্যা প্রাদেশিক সমস্যা নহে। আমরা আশা করি, তিনি চট্টগ্রামে চাউলের দামের বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু মিষ্টার কেসী কি কিছুই লক্ষ্য করেন নাই? বাঙ্গালার গভর্ণররূপে কি তাঁহার কোন দায়িত্বই নাই? যে সচিবসঙ্ঘের অযোগ্যতায় বাঙ্গালা দেশের এই দুরবস্থা, তিনি কি সেই সচিবসঙ্ঘকে এখনও সমর্থনযোগ্য মনে করিবেন?

—

ভারতের অচল অবস্থা

গান্ধী-ওয়াভেল পত্র-বিনিময় সম্পর্কিত পুস্তিকা ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। বিলাতের লোকেরাও শীঘ্রই তাহা পড়িবার সুযোগ পাইবেন। গান্ধীজী অতি স্পষ্ট ভাষায় কংগ্রেসের পোজিশন পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন। "ভারত ত্যাগ কর" প্রস্তাবটির যে রাজনৈতিক মনোমালিন্যের দরুণ বিকৃত করিয়া ভুল ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল তাহাও তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রস্তাবটির অর্থ এবং উদ্দেশ্য—"ভাল অথবা মন্দ যে ভাবেই হউক না কেন, আমরা নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই চালাইতে চাহি।" এই প্রস্তাবের মধ্যে কাহারও প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ নাই। স্বাধীনতা চাহিবার অর্থবে পরের ক্ষতি করিবার চেষ্টা বলা নিশ্চয়ই ভুল।

মুক্তির পর হইতে দুর্ব্বল শরীর সত্ত্বেও গান্ধীজী এই অচল অবস্থা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, হয় তাঁহাকে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সভ্যদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সুযোগ দেওয়া হউক, নচেৎ বড়লাটের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে কংগ্রেসের এবং তাঁহার নিজের মতামত বুঝাইয়া বলিবার অনুমতি দেওয়া হউক। বড়লাট তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন নাই। তবে অচল অবস্থার জন্য কে দায়ী? কংগ্রেস না ভারত সরকার?

—

তরী ডুবিল

ফুটা নৌকা ভাঙ্গা হাল লইয়া পার্লাকিমেদীর মহারাজা তথাকথিত স্বায়ত্ত-শাসন চালাইতেছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি তরী ডুবিল। মহারাজা ও পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্রের মধ্যে যে ধরণের বাদ-প্রতিবাদ এবং অভিযোগ ও পাল্টা-অভিযোগ হইয়াছে তাহাতে উভয়ের মিলনের আশা নাই। তাই মহারাজা প্রধান-সচিবত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। উড়িষ্যার গভর্ণর সচিবত্রয়কে একত্র করিতে পারেন নাই। সুতরাং শেষ অবধি যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছে—৯৩ ধারা জারী। ব্যবস্থা পরিষদে যথেষ্ট সমর্থক না থাকিলে কোন সচিবসঙ্ঘই স্থায়ী হইতে পারে না। অতএব সচিব-সঙ্ঘের সচিবগণ সাবধান!

হাতী পোষা

শুনা যাইতেছে, বাঙ্গালা সরকারের খাদ্যবিভাগের শক্তিবৃদ্ধির জন্য মধ্য-প্রাচী এবং বিলাত হইতে কয়েক জন কর্ম্মচারী আমদানী করা হইবে। বাঙ্গালার সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কিরূপে সেই সমস্যা সমাধান করিবেন তাহা বুঝা শক্ত। বাঙ্গালা দেশে কি যোগ্য ব্যক্তি ছিল না? এই প্রস্তাবটি যদি সত্য হয়, তবে বাঙ্গালার পক্ষে অপমান-সূচক! বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা আজ পর্য্যন্ত আমাদের উল্লেখযোগ্য কোন উপকার হইয়াছে কি? এ যে পেটে এবং পিঠে মারা! একে এই অভাব-অনটন, তাহার উপর শ্বেতহস্তী পুষিবার ব্যয়-ভার! হে ভগবান্, এই শ্রেণীর সবজান্তাদের হাত হইতে আমাদের রক্ষা কর!

—

নির্জ্জলা অতএব খাঁটি

কমন্স সভায় ভারতীয় সংবাদ-সেন্সর সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে মিষ্টার আমেরী বলেন—"এমন ভাবে সেন্সর করা হয় না, যাহা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা গঠনের অন্তরায়।" ইহার উত্তরে বিলাতের 'রেনল্ড নিউজের' সম্পাদকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন —"সেন্সরের জন্য ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব নয়। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের মনোভাব ব্রিটেনবাসীকে জানিতে দেওয়া হয় না।" লর্ড ওয়াভেল স্বয়ং এ বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতেছেন! দেখা যাক, কত দূর কি হয়। তবে আমেরীর নির্জ্জলা মিথ্যা কথা বলিবার ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

—

রতনে রতন চেনে

বৃটিশ সরকার প্রকৃত গুণগ্রাহী বটে। ভারতে অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া সার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল বিলাত গিয়াছেন। রতনে রতন চেনে। ভারতীয় আফিসের সংবাদে প্রকাশ, তিনি মিষ্টার আমেরীর মন্ত্রণাদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন। মাণিক-জোড়! সত্যই মিষ্টার আমেরীর পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্যতা তাঁহার অধিক আর কাহার আছে? ভারতে তিনি সে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এইবার লর্ড লিনলিথগোকে সঙ্গে টানিলেই আদর্শ ত্র্যহস্পর্শ হয়!

—

বুঝা ভার

সরকারের বুদ্ধি এবং কার্য্যপ্রণালী বুঝা অসম্ভব। এক সময় জনসাধারণের মতের অপেক্ষা না করিয়াই যুক্তরাজ্যকে সস্তায় ভারতীয় রৌপ্য বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইল। জনসাধারণ ইহা জানিতে পারিয়া তীব্র আপত্তি জানাইল, কিন্তু সরকারের কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল না। বোধ হয় সেই সময় সরকার কাণে তুলা গুঁজিয়া ছিলেন! এখন আবার ইজারা ও ঋণ ব্যবস্থার দরুণ সেই রৌপ্য ভারতে ফিরিয়া আসিতেছে। রৌপ্যের পরিমাণ দশ কোটি আউন্স এবং মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য এই পরিমাণ প্রয়োজন। মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিষ্টার খেমকা এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যদি জনমতের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যকে রৌপ্য বিক্রয় না করা হইত, তবে আজ তাঁহাদের নিকট রৌপ্য ভিক্ষা করিতে হইত না। এই ব্যবস্থার সব চেয়ে গোলযোগের বিষয় এই যে, যুদ্ধের পর এই রৌপ্য যুক্তরাজ্যকে আবার ফেরত দিতে হইবে। তাই বলি, সরকারের বুদ্ধি ও মনোভাব দুর্জ্জেয়।

আর্ম্মস্ বনাম আদর্শ

মিষ্টার চার্চ্চিলের মনোভাব যেন ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে——যুদ্ধট্যাঙ্ক ও কামানের ; আদর্শের নহে। কিন্তু তাঁহার আমেরিকান পার্টনারদের মত একটু ভিন্ন ধরণের। তাঁহারা বলেন—যুদ্ধ বৃটেনের ভাল আহারের অথবা আমেরিকার মাল বিক্রয় করিবার সুবিধার জন্য নহে। পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসানের প্রচেষ্টাই ইহার উদ্দেশ্য। চার্চ্চিল চান, পৃথিবীর জন্য "ফোর ফ্রীডম্স" আর আমেরিকার কর্ত্তারা চান, সত্যকারের স্বাধীনতা—"ফ্রীডম ফর অল।" মিষ্টার হাল এবং মিষ্টার ওয়ালেস প্রচ্ছন্ন ভাবে সেই কথাবই ইঙ্গিত করিয়াছেন! মিষ্টার উইলকি কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন, "আমরা যে আদর্শের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি, মিষ্টার চার্চ্চিলের মত তা যেন হারিয়ে না ফেলি। যুদ্ধ যতই অগ্রসর হবে, সে আদর্শ যেন ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে শুধু যুক্তরাজ্যেই নয়, পৃথিবীর সকল দেশের লোকদের মধ্যে স্বাধীনতার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা।" তিনি উচিত কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু অনেকেরই তাহা কটু লাগিবে।

যুদ্ধ-পরিচালনায় মিষ্টার চার্চ্চিলের নৈপুণ্য থাকিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। সকল জাতিকে সমান করিয়া তোলাই যদি এই যুদ্ধের আদর্শ হয়, তবে সেই আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার শিথিলতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাই ভয় হয়, গত মহাযুদ্ধের মত এই যুদ্ধের পরও পৃথিবীর সমস্যাগুলি যথা পূর্ব্বং তথা পরং অবস্থায় থাকিয়া না যায়!

নোটের হার বৃদ্ধি

যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশেই চলতি নোটের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র	...	১০৫
যুক্তরাজ্য	...	১৮৮
কানাডা	...	২২১
অষ্ট্রেলিয়া	...	২৩১
সাউথ আফ্রিকা	...	৮৩
নিউজিল্যাণ্ড	...	১২০
ভারতবর্ষ	...	৪০০

দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষেই বৃদ্ধি সকলের চেয়ে বেশী। শুধু তাহাই নয়, এই হার উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভবিষ্যতে আমাদের ভাগ্যে যে কি আছে তাহা বলা শক্ত।

ভূস্বর্গ দোজক

"আপনার রচনা এত উচ্চদরের যে আমাদের পত্রিকায় ছাপা উচিত হবে না" এই বলিয়া এক জন অতি বিনয়ী সম্পাদক বাজে লেখা ফেরত দিতেন। কাশ্মীরে মিষ্টার জিন্নার অবস্থা হইয়াছে তদ্রূপ। শ্রীনগরে কাশ্মীর মুসলিম-সভায় মিষ্টার জিন্না উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি সভায় পাকিস্থানের ঝাণ্ডা উড়াইতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন যে, কাশ্মীরের মুসলিমগণ হিন্দু শিখ ভাইদের সহিত একত্রে দেশের কাজ করিতে চায়। কাশ্মীরের লোকেরা কি মাননীয় অতিথির মান্য দিতে জানে না? শেষে ভূস্বর্গ দোজক হইয়া গেল। তাঁর সময়টা বড়ই খারাপ যাইতেছে। পঞ্জাবে সুবিধা হইল না, তাই কাশ্মীরে গেলেন, কিন্তু সেখানেও এই অবস্থা! তবে তিনি কোথায় যাইবেন?

বাঙ্গালী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি

বাঙ্গালীদের মধ্যে হিন্দী ভাষার যাহাতে আদর হয়, সেই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় হিন্দীমণ্ডল দুইটি পঞ্চাশ টাকার মাসিক বৃত্তি দিবেন বলিয়া প্রকাশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কোন বাঙ্গালী ছাত্র হিন্দী সাহিত্যে এম-এ পড়েন, তবে এই বৃত্তি লাভ করিতে পারিবেন।

ধাঁধা

১লা আষাঢ় কমন্স সভায় মিষ্টার প্রাইস (শ্রমিক) জিজ্ঞাসা করেন——ভারতে প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকায় এবং দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা লইয়া শস্যোৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকায় ভারত সরকার কি ভূমি সংস্কারের জন্য এবং খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা স্থির করিতে কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন? মিষ্টার আমেরী উত্তর দেন—ইহা প্রাদেশিক সরকার সমূহের বিবেচ্য বিষয়। মিষ্টার প্রাইস প্রশ্ন করেন, আমাকে কি বুঝিতে হইবে, এইরূপ একটা ব্যাপারের দায়িত্ব প্রধানত প্রাদেশিক সরকারগুলিরই বহনের বিষয়? ভারতে কৃষিজাত শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার এবং ঐ কার্য্যে অগ্রণী হইবার দায়িত্ব লইবার মত একটা বিষয়ের গুরুত্ব কি ভারত সরকার উপলব্ধি করেন না? উত্তরে মিষ্টার আমেরী বলেন—হাঁ, আপনার সমস্ত প্রশ্নের জবাবই একটু আগে প্রদত্ত আমার উত্তরের মধ্যেই পাইবেন।

আমরা খুঁজিয়া উত্তর বাহির করিতে পারিলাম না। মিষ্টার প্রাইসও বোধ হয় পারেন নাই। এ এমন ধাঁধা যে, একমাত্র মিষ্টার আমেরী ছাড়া আর কেহ সমাধান করিতে পারিবেন না।

মিষ্টার আমেরী কি বলেন?

নাটাল ভারতীয় বিচার বিভাগীয় কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানকালে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমিশনের য়ুরোপীয় চেয়ারম্যান মিষ্টার ওয়াডলি বলেন—"আমার সভ্যতা যদি আপন গুণে ভারতীয় বা অন্য কাহাকেও সহ্য করিতে না পারে, তাহা হইলে উহা লোপ পাওয়াই শ্রেয়ঃ। ইহা আমার ব্যক্তিগত অভিমত।" তিনি আরও বলেন যে, "ভারতীয়দিগকে জাতীয় ও স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব প্রদানের সময় আসিতেছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, তাহার প্রতিষ্ঠান এসিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রতিনিধির অভাবে নানা বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিয়াছে।" এ বিষয়ে মিষ্টার আমেরী কি বলেন?

খেল খতম!

রেফারী মিষ্টার কেসী হঠাৎ বাঁশী বাজাইয়া বঙ্গীয় পরিষদের অসমাপ্ত খেল খতম করিয়া দিলেন। বিরোধী দল যখন সরকারী তরফের ব্যাকদের কাটাইয়া গোলে শট মারিতে যাইতেছেন, ঠিক সেই সময় বাঁশী বাজিল। খেল খতম হইল বটে, কিন্তু বিরোধী দলের এবং দর্শকদের মনে একটা সন্দেহ জাগিয়া রহিল যে, এই ভাবে হঠাৎ মাঝপথে খেলা বন্ধ না করিলে সরকারী দল নিশ্চয়ই হারিয়া যাইত। ইহাই

কি 'ময়াল ডিকাট' নহে ? মাত্র সে দিন য়ুরোপীয়ানদের সমর্থনে ১৩টি ভোটাধিক্যে শ্রীযুত বরদাপ্রসন্ন পাইন (সচিবমণ্ডলী ?) আত্মরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আত্মসম্মান? মনে রাখিতে হইবে, বিরোধী দলের ১০ জন সদস্য অন্তরীণ আছেন। সরকার তাঁহাদের ভোট দিবার অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছেন। যদি সেই সকল ভোট পাওয়া যাইত এবং য়ুরোপীয়ানদের ভোট সচিবমণ্ডলীরা না পাইতেন, তবে ফলাফল যে কি হইত তাহা বলা বাহুল্য। সচিব-পদের মোহ ইঁহাদের আত্মসম্মানকে—যদি এখনও কিছু অবশিষ্ট থাকে—এইবার একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। নহিলে শ্বেতাঙ্গদলের নেতা তাঁহার বক্তৃতায় গভর্ণরের ৯৩ ধারা প্রয়োগের হুমকি দিয়া ভয় দেখাইবার সাহস পান কিরূপে ? এই অবস্থায় বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলীকে টিকাইয়া রাখার কোন অর্থই হয় না। ২৯শে জুন সচিব সাহাবুদ্দীনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা উঠিয়াছিল এবং অন্যতম সচিব শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা মঞ্জুর হইয়াছিল। এ দিকে সচিবদলের বহু সদস্য ক্রমশঃ বিরোধী দলে যোগদান করিতেছিলেন। এই সময়ে অতি অকস্মাৎ ক্ষয়িষ্ণু সচিব-সঙ্ঘকে বাঙ্গালার গভর্ণর মিষ্টার কেসী রক্ষা করিলেন একেবারে পরিষদের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া। তাঁহার এই ভাবে পরিষদের অধিবেশনে হস্তক্ষেপ করায় বিরোধী দল যে রুষ্ট এবং ক্ষুব্ধ হইবে তাহা স্বাভাবিক। লাট সাহেবের সাহায্যে পরিষদের দরজা বন্ধ করা যায়, কিন্তু লোকের মুখ তো বন্ধ করা যায় না! মিষ্টার কেসী কি এখনও বুঝেন নাই যে, এই সচিবমণ্ডলী পরিষদের আস্থা হারাইয়াছে ? তিনি কি স্বীকার করিবেন না যে, তাঁহার এই কার্য্য পক্ষপাতদুষ্ট ?

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

বাঙ্গালার শেষ সুবর্ণ-দেউটি আজ নির্ব্বাপিত। জাতীয়তার মূর্ত্ত প্রতীক ত্যাগ ও কর্ম্মে সমুজ্জ্বল জীবনের অবসান ঘটিল। বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক, আর্ত্তবন্ধু, দেশহিতব্রতী মহাপুরুষ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৬ই জুন অপরাহ্ণ ৬টা ২৭ মিনিটে বিজ্ঞান-কলেজ-ভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৩ বৎসর ৫ মাস বয়স হইয়াছিল। তিনি কেবল অধ্যাপকই ছিলেন না, ছাত্রদের বন্ধু ছিলেন। তাহাদের সুখ-দুঃখ তিনি নিজের সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করিতেন। নিজেকে বঞ্চিত করিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থ গরীব ছাত্রদের বিলাইয়া দিতেন। নিজের খাবারের ভাগ ছাত্রদের না দিয়া খাইতেন না। তাই তিনি এতগুলি উজ্জ্বল রত্ন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। সরকারের সার উপাধি দানের পরও দেশের লোক তাঁহাকে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াই জানিত। আচার্য্যদেবের মন দেশের জন্য, দরিদ্রের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত।

কোথাও বন্যা হইল, দুর্ভিক্ষ হইল, আচার্য্য বাহির হইয়া পড়িলেন ভিক্ষার ঝুলি-হাতে! রোগশীর্ণ জীর্ণ শরীরে সে কি উদ্যম! যে কোন স্বদেশী প্রচেষ্টার জন্য তিনি অকাতরে দান করিয়াছেন। কত বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তবুও সাহায্য-দানে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন, বিজ্ঞানকে নিত্য-ব্যবহার্য্য কার্য্যে না লাগাইতে পারিলে তাহার কোন সার্থকতা নাই। সৃষ্টি হইল বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। ভারতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ইহাই এখন বৃহত্তম।

তাঁহার স্বদেশপ্রেম ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; বিজ্ঞান-প্রেমকেও ছাপাইয়া গিয়াছে। "বিজ্ঞান অপেক্ষা করিতে পারে কিন্তু স্বরাজ পারে না" তাঁহার বিখ্যাত উক্তি। তিনি নিজেকে অকৃপণ ভাবে দান করিয়াছেন পরার্থে। দরিদ্রের কষ্টের লাঘব, ছাত্রদের সুখ-সুবিধা, দেশবাসীর উন্নতি, ইহা লইয়াই ছিল তাঁহার জীবন। এমন সহজ সরল অথচ শক্তিমান্ পুরুষ সত্যই দুর্লভ। বাঙ্গালা দেশের মাটীতে তিনি উপযুক্ত সার দিয়াছেন, উপযুক্ত বীজ ছড়াইয়াছেন। তিনি চাহিয়াছিলেন বাঙ্গালী নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখুক। ব্যবসা করুক। কল-কারখানা করুক। স্বাধীন হইতে হইলে পরমুখাপেক্ষী থাকা চলিবে না। বাঙ্গালা দেশ তাঁহার কাছে চিরঋণী থাকিবে। তাঁহার আত্মাকে তৃপ্তিদান করিতে হইলে তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্যসমূহ করিতে হইবে। তিনি যে দীপশিখা জ্বালিয়া গিয়াছেন, সে শিখা যেন নির্ব্বাপিত না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবেই আমরা তাঁর অবিনশ্বর আত্মার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদানের অধিকারী হইব।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৪ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে বঙ্গীয় খৃষ্টীয় সমাজের নেতা ও বঙ্গীয় খৃষ্টীয় সংসদের সভাপতি, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে অল্প কয়েক দিন মাত্র রোগভোগের পর অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি পর-পর তিন বার পুরাতন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। খৃষ্টীয় সমাজের পৃথক্ নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও "ইম্মর্যাল ট্রাফিক্" বিল-এর প্রবর্ত্তন—এই দুইটি তাঁহার বিশেষ কাজ। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে অধিবেশিত সভায় খৃষ্টীয় সমাজের পক্ষ হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া গিয়াছেন। ৭৩ বৎসর বয়স হইলেও তিনি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবান্ ও অক্লান্তকর্ম্মী ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দান করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী

শ্রদ্ধেয় ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রীর মৃত্যুতে বাঙ্গালা এক জন স্মরণীয় সন্তান হারাইল। ব্রজ বাবু বিশেষ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ব্যবহারাজীবরূপে হিন্দু আইনে বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম ছিলেন এবং তাহার জন্য প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ওকালতী ত্যাগ করেন। তিনি মোহান্ত সন্তদাস বাবাজীর (তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের) বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। চৌধুরী মহাশয় যে দিন ওকালতী ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেন, সেই দিন ব্রজলালকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিত্য-ব্যবহৃত ডেস্ক্‌টি তাঁহাকে উপহার দিয়া গিয়াছিলেন। ব্রজলাল বাবুর মৃত্যুতে আমরা এক জন বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত বন্ধু হারাইলাম।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গ্রাম্য বালিকা

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

সে অনেক দিনের কথা। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আমি দেওঘর স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত রচয়িতা ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি অনুরোধ-পত্র লইয়া প্রেসিডেন্সী-কলেজে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়েব সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে পরম আত্মীয়ের ন্যায় সাদর ব্যবহারে মুগ্ধ করেন। আমার বেশ স্মরণ আছে যে, যদিও আমি কোন্ বিষয় বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিব তাহা স্থির করি নাই, তথাপি রসায়ন যে পড়িব না, এ বিষয়ে আমি তখন কৃতনিশ্চয় ছিলাম। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া আমার পূর্ব্বসংকল্প দূর হইয়া গেল। তখন হইতে এই দীর্ঘ ৪৫ বৎসর কাল তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত থাকিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে সেই সময় প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াইবার ভার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা বিচক্ষণ অধ্যাপকদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। ইঁহাদের উভয়েরই বক্তৃতা বহু পরীক্ষা (experiment) সমন্বিত থাকিত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রসায়নের মূল তথ্যগুলি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে নানা প্রকার কৌতূহলপ্রদ ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করিতেন। বলা বাহুল্য যে, রসায়নের ইতিহাস আচার্য্যদেবের বিশেষ প্রিয় বিষয় ছিল এবং এই বিষয়ে তিনি অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য তরুণ ছাত্র-দিগের আগ্রহ এত অধিক ছিল যে, বক্তৃতা-মন্দিরে যথাসম্ভব সম্মুখের আসনে বসিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রতিযোগিতা হইত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র নিতান্ত সাধারণ ভাবে বেশ-ভূষা করিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার সময় ছিটের গলাবন্ধ কোট ও পেণ্টলুন তিনি সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন। মাথায় চেরা সীঁথি থাকিত। পেণ্টলুনে ছোট ছোট তালি অনেক সময় লক্ষ্য করিতাম। যে ব্যক্তি বক্তৃতাগারে পরীক্ষা-প্রদর্শনে তাঁহাব সহায়তা করিত, তাহার গায়েও আচার্য্যদেবের পূর্ব্ব-ব্যবহৃত কোট শোভা পাইত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সহজেই ছাত্রদের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায়, বেশভূষায় ছাত্রেরা, এমন কি কলিকাতায় নবাগত মফঃস্বলের ছাত্রেরাও তাঁহার নিকট যাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিত না। তাঁহার দ্বার ছাত্রদিগের নিকট সর্ব্বদা অবারিত ছিল। তিনি নিজে চিরকুমার ছিলেন, ছাত্রদিগকেই তিনি পুত্রবৎ জ্ঞান করিতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবার সময় এক দিনের ঘটনা আমার বিশেষ স্মরণ আছে। সে দিন রবিবার। আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে আচার্য্যদেবের ৯১নং অপার সার্কুলার রোডস্থ বাটীতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি, বহু দরিদ্র ছাত্র সেখানে সমবেত হইয়াছে এবং তিনি এক জনের পর এক জনকে ছোট ছোট কাগজের মোড়কে জড়ান টাকা দিতেছেন। পরে শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার মাসিক বেতনের মাত্র ১০০৲ টাকা বাদে আর সমস্ত টাকা এই ভাবে দান করিতেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আমি এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, এখন প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরেও উহা আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

আমি তাঁহাকে যত দিন দেখিয়াছি, তিনি সর্ব্বদাই ছাত্রমণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। কোন মেধাবী ছাত্র দেখিলেই চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, সেই ভাবে তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইতেন। ৯১নং অপার সার্কুলার রোডে (তদানীন্তন বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওরার্কসের আফিস) থাকিবার কালে তাঁহার ঐ ছোট বাসাতেই দুই-এক জন ছাত্র সর্ব্বদা থাকিত এবং পরে বিজ্ঞান কলেজে থাকিবার কালেও এই প্রথার কোন দিন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে মধুর সম্পর্কের উচ্চ আদর্শ আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যমান। সরল অনাড়ম্বর ভাবে জীবন যাপন, ছাত্রগণকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন করিয়া আমাদের দেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ শিক্ষাদান করিতেন। উচ্চ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাংলার ছাত্র-সমাজের সম্মুখে এই মহৎ আদর্শ নূতন করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই জন্য গভর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত উচ্চ "নাইট" উপাধি পাইবার পরেও জন-সাধারণ তাঁহাকে সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই ; আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াই তৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রবৎসলতা একমুখে বর্ণনা করা অসম্ভব! তিনি কেবল তাহাদের মানসিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাহাদের শারীরিক উন্নতির দিকে তাঁহার সর্ব্বদা লক্ষ্য ছিল। কাহারও শীর্ণ দেহ বিশেষতঃ চোখে চশমা দেখিলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইতেন। বিশালবক্ষা সুদৃঢ় মাংসপেশী-বহুল কোন বলবান যুবককে দেখিলে আহ্লাদিত হইতেন। বুকে ঘুসী মারিয়া বা পিঠে কিল মারিয়া তাহাদের শক্তি পরীক্ষা করিয়া তিনি বড়ই আনন্দ লাভ করিতেন।

ছাত্রদিগকে প্রশংসা-পত্র দান সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন। কেহ কোন প্রশংসা বা অনুমোদন-পত্র চাহিতে আসিলে সাধারণতঃ আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। প্রথম প্রথম আমি কি ভাবে প্রশংসা-পত্র দিতে হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিতাম। তাঁহার একটা বাঁধা সূত্র ছিল—"এমন ছেলে হয় নাই—হইবে না। জন্মায় নাই—জন্মিবে না।" বহু বৎসর ধরিয়া আর আমি তাঁহাকে প্রশংসা-পত্র-দান সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করি নাই। তবে প্রশংসা-পত্র লিখিত হইলে তাঁহাকে একবার পড়িয়া শুনাইতাম। কদাচিৎ সামান্য পরিবর্ত্তন করিতেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার ছাত্রদের সচরাচর দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতেন। যে সকল ছাত্র প্রথম হইতে তাঁহার নিকট রসায়ন অধ্যয়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার নিজের ছেলে বলিতেন ; আর যাহারা অন্য স্থানে পাঠ সমাপনের পর শেষের দুই এক বৎসর তাঁহার ছাত্র থাকিত তাহাদিগকে তিনি গ্রাম্যভাষায় তাঁহার "হাটাল" ছেলে বলিতেন। *

ছাত্রদের কিসে উন্নতি হইবে সে বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিতেন। কেহ কোন উচ্চাঙ্গের গবেষণা করিলে তাহা শতমুখে প্রচার করিতেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্যতম প্রিয় শিষ্য স্যর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ—"ঘোষের নিয়ম" আবিষ্কার করিলে তিনি আনন্দে অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যদের গৌরব বর্দ্ধিত হউক ইহা তাঁহার সর্ব্বদাই কাম্য ছিল। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে বহু বার "সর্ব্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ং" এই মহাবাক্য বলিতে শুনিয়াছি।

রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার প্রবর্ত্তন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজের পরীক্ষাগারে তিনি পারদ ধাতুর কয়েকটি নূতন যৌগিক আবিষ্কার করেন এবং সেই সময় হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করা পর্য্যন্ত তিনি শিষ্যদিগের সহিত বহু মৌলিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নাগারে মৌলিক গবেষণার উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম এক রকম ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অবস্থায় শত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এ দেশে রসায়ন বিষয়ে মৌলিক গবেষণার প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অদম্য উৎসাহ এবং বিরাট অধ্যবসায়ের ফলে।

মৌলিক গবেষণায় আবিষ্কৃত তথ্যগুলি পূর্ব্বে তিনি লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত করিতেন। একটি নিজস্ব রসায়ন বিষয়ক পত্রিকার অভাব তিনি অনেক দিন হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষীয় রাসায়নিক সভা স্থাপিত হয়, তখন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইহার অন্যতম উদ্যোক্তা এবং প্রথম সভাপতি ছিলেন। * পরে রাসায়নিক সভার গৃহনির্ম্মাণ-কল্পে তিনি দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা কেবল বিশুদ্ধ রসায়নের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই। এ দেশে ব্যবহারিক রসায়নের প্রথম প্রবর্ত্তন তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। স্বোপার্জ্জিত সামান্য মূলধন লইয়া তিনি ৯১নং অপার সার্কুলার রোডস্থ বাটীতে প্রথম বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের সূচনা করেন। এখন ইহা সমগ্র এশিয়ার জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে পশ্চাৎপদ হইতেছে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের এই ক্ষোভ চিরজীবন ছিল। বাঙ্গালী যুবকের চাকরীর মোহ দূর করিতে, তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত করিতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। কেহ কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে চাহিলে তাহাকে অর্থ দিয়া পরামর্শ দিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা দেশে যতগুলি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তিনি যে জড়িত ছিলেন, তাহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে পরস্পর-বিরোধী বহু গুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। এক দিকে সর্ব্বত্যাগী তপস্বী, অপর দিকে তীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধি-সম্পন্ন কর্ম্মী পুরুষ। কিন্তু অধ্যয়ন-অধ্যাপনাই হউক আর ব্যবসা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানই হউক, সকল বিষয়েই তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মের মূলে ছিল দেশপ্রেম। সমস্ত শক্তি তিনি দেশসেবার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কিসে দেশের কল্যাণ হইবে, ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। দেশে চিকিৎসাবিদ্যার প্রচার-প্রচেষ্টা—যাহার অন্যতম ফল কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, তাহাতেও তিনি এক জন অগ্রণী ছিলেন। যাদবপুর যক্ষ্মা আরোগ্যালয়ের তিনি অন্যতম ট্রাষ্টি ছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে জড়িত ছিলেন।

---

* বিধবা মাতার পুনর্ব্বিবাহের পর তাঁহার যে সন্তান তাঁহার সহিত নূতন পিতার গৃহে আসে, তাহাদিগকে "হাটাল" ছেলে বলা হয়।

* তখন হইতে রসায়ন বিষয়ক সমস্ত প্রবন্ধ এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত করিতেন এবং তাঁহার ছাত্রদের তাহা করিতে উৎসাহ দিতেন।

আবার সাহিত্যক্ষেত্রেও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ হিন্দু রসায়নের ইতিহাস প্রাচীন ভারতীয়দিগের রসায়ন জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যে পরিপূর্ণ। ইহা রচনা করিবার জন্য আচার্য্যদেব চরক, সুশ্রুত, রসেন্দ্র-চিন্তামণি, রসরত্নসমুচ্চয়, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ প্রভৃতি বহু প্রাচীন পুঁথি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা ও নিরপেক্ষ বিচারের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তখন হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি বিজ্ঞান কলেজেই অতিবাহিত করিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কাজের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। যত দিন শরীরে বল ছিল, প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি কিছু কাল ভ্রমণ করিতেন। সার্কুলার রোডস্থ গ্রীয়ার পার্ক যে সময়ে সাধারণের জন্য খোলা ছিল, তখন অনেক সময় সকালে খালি পায়ে সেখানে বেড়াইতেন, কখনও বা বিজ্ঞান কলেজের ছাদে বেড়াইতেন। তাহার পর পাঠে বসিতেন। পাঠের সময় তিনি কোন প্রকার ব্যাঘাত সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ সেই সময় দেখা করিতে আসিলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, কোন অর্ব্বাচীন একবার তাঁহাকে সেখানে প্রশ্ন করিয়াছিল, "আপনি কি পড়া-শুনা করিতেছেন?" উত্তরে আচার্য্যদেব (গ্রাম্য ভাষায়) বলেন, "না, আমি শৌচে বসিয়াছি!" প্রত্যহ বেলা ৯টার সময় তিনি পরীক্ষাগারে আসিতেন এবং বেলা সাড়ে ১১টা পর্য্যন্ত থাকিতেন। চিঠি-পত্রের উত্তর তিনি কখনও ফেলিয়া রাখিতেন না। তাহার পর ঘরে আসিয়া স্নানাহার সারিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার ২টার সময় পরীক্ষাগারে গিয়া সাড়ে ৪টা পর্য্যন্ত থাকিতেন।

প্রত্যহ বৈকাল ৬টা সাড়ে ৬টার সময় গড়ের মাঠে গিয়া প্রথমে কিছুকাল ভ্রমণ করিতেন, পরে লর্ড রবার্টসের প্রস্তর-মূর্ত্তির নীচে তথা-কথিত 'ময়দান ক্লাবের' অধিবেশন হইত। ৺প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ৺উপেন্দ্রনাথ সেন, ৺গিরীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি অনেকেই আমরণ—"ময়দান ক্লাবের" সভ্য ছিলেন। আমি মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইতাম। ক্লাবের একটি বিশেষত্ব এই যে, সেখানে কোন প্রকার গুরুতর বিষয়ের আলোচনা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) বলিতে গেলে যুদ্ধ বিষয়ে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনাই ক্লাবের একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল। রঙ্গপুর কলেজের বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় যুদ্ধের দৈনন্দিন পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাবে বর্ণনা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন।

আনুমানিক ৯টা পর্য্যন্ত ময়দানে কাটাইয়া আচার্য্যদেব গৃহে ফিরিয়া আসিতেন এবং পরে সামান্য আহার করিয়া শয়ন করিতেন। আচার্য্যদেবের দেহ শীর্ণ থাকা সত্ত্বেও তিনি যে দীর্ঘ এবং কর্ম্মবহুল জীবন লাভ করিয়াছিলেন তাহার একটি প্রধান কারণ তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তিতা।

কোন প্রকার নিয়ম-বহির্ভূত কাজ দেখিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। বৈদ্যুতিক পাখা খুলিয়া রাখিয়া ঘরের বাহিরে কেহ চলিয়া গেলে, গ্যাস বা জল অপচয় করিলে তিনি দোষী ব্যক্তিকে—সে যে কেহ হউক না কেন, তীব্র ভর্ৎসনা করিতেন। গবেষণায় নিযুক্ত অধ্যাপক বা ছাত্রদের যেমন তিনি উৎসাহিত করিতেন তেমনি তাহাদের কেহ সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত পরীক্ষাগারে থাকিলে বিরক্ত হইতেন। যদি কেহ থাকিতেন তবে আচার্য্যদেব ময়দান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন জানিতে পারিলেই পরীক্ষাগারের গ্যাস, বৈদ্যুতিক আলোক ইত্যাদি নির্ব্বাপিত করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন এবং পরে আচার্য্যদেব আপন কক্ষে চলিয়া গেলে আবার আলো জ্বালিতেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অসাধারণ কর্ম্মকুশলতার ও সুপ্রণালীবদ্ধ ভাবে কার্য্য করাইবার প্রথম পরিচয় পাই উত্তরবঙ্গ জল-প্লাবনের সময়। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিজ্ঞান কলেজ একটি বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। অর্থ, নূতন ও পুরাতন বস্ত্রাদি, কম্বল, ঔষধ-পথ্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ এবং সংবাদ-সংগ্রহ ও প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আচার্য্যদেব সমস্তই নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। সেই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে বন্যাপীড়িতদের প্রতি সহানুভূতি কত দূর জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা

কঠিন। আমি প্রথম দুই মাস কাল কোষাধ্যক্ষ ছিলাম। এমন দিন গিয়াছে, যে দিন কেবল দুই শতাধিক টাকার অর্দ্ধপয়সা ও পয়সাই সংগৃহীত হইয়াছে এবং এক-কালীন সর্ব্বসাকুল্যে কুড়ি হাজার টাকা আসিয়াছে। যাহার যেমন সাধ্য দান করিয়াছে—এমন কি রেলের কুলীরা রিলিফ কমিটীর জিনিষ-পত্র গাড়ীতে উঠানো বা গাড়ী হইতে নামানোর জন্ম ন্যায্য পারিশ্রমিক লইতে অস্বীকার করিয়াছে। জিনিষ-পত্র বাদে ৬ লক্ষ টাকা দুই মাসে রিলিফ কমিটীর হাতে আসিয়াছিল।

উত্তরবঙ্গ জল-প্লাবনের পরেও যখনই কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ বা জলপ্লাবন বা অন্য কোন দৈবদুর্ব্বিপাক হইয়াছে তখনি দূর-দূরান্তর হইতে—ইরাণ, ইরাক, মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রহ্মদেশ, মালয় হইতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট লোকে টাকা পাঠাইয়াছে। কারণ, সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, আর্ত্ত দেশবাসীর ক্রন্দনের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলে আচার্য্যদেব কখনও নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারিবেন না। লোকের ইহাও বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইলে তাহার অসদ্ব্যয় কদাচ হইবে না।

গত দুই বৎসর হইতে আচার্য্যদেব এক প্রকার চলৎশক্তি-রহিত এবং শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। এ জন্য গত বৎসরের ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা আমরা তাঁহাকে জানিতে দিই নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত লোকচক্ষুর গোচর হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে নূতন কিছু সংবাদ দেওয়া কঠিন। তিনি নিতান্ত সাদাসিধা ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। পোষাক-পরিচ্ছদ যেমন অনাড়ম্বর ছিল তেমনই আহারও ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত। সুক্তো, মোচার ঘণ্ট, ঝালের ঝোল ইত্যাদি খাইতে ভালবাসিতেন। আমার স্ত্রী বহু বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে তাঁহার জন্য কিছু কিছু তরকারী রন্ধন করিয়া পাঠাইতেন। কচু, ওল এবং "মৌ ঝোলা" গুড় আচার্য্যদেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। গায়ের খদ্দরের জামা অনেক সময় ছেঁড়া থাকিত। আচার্য্যদেবের বিশেষ প্রিয় ছাত্র ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেনের মুখে শুনিয়াছি, এক দিন তিনি ডাঃ সেনকে কথা-প্রসঙ্গে নিজের ছেঁড়া জামা দেখাইয়াছিলেন। ডাঃ সেন বলেন—"Some people cannot be happy unless they are miserable." ইহার উত্তরে আচার্য্য বলেন—"দেখ হেমেন্দ্র, Miser এবং Miserable একই ধাতু হইতে উৎপন্ন শব্দ।"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বভাবতঃ পরিহাস-রসিক ছিলেন। তাঁহার দেশহিতৈষণা ও স্বদেশপ্রেমের জন্য তাঁহার কার্য্যকলাপের উপর গুপ্ত পুলিসের তীব্র দৃষ্টি ছিল। তাঁহাকে C. I. E. উপাধিতে ভূষিত করা হইবার পর একবার তিনি কোন পুলিসের কর্ম্মচারীকে কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—তোমরা আমার আর কিছু করিতে পারিবে না—আমি তোমাদের চেয়ে উঁচু; তোমরা C. I. D. আর আমি C. I. E.

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অত্যন্ত নিয়মপরতন্ত্র ছিলেন। কিন্তু যে নিয়ম তাঁহার গবেষণা-কার্য্যের পক্ষে হানিকর সে নিয়ম তিনি মানিতেন না। প্রেসিডেন্সী কলেজে শেষ কয়েক বৎসর আচার্য্যদেবের প্রথম সময়ের ছাত্র শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়ের সহিত এই প্রকারের নিয়ম লঙ্ঘন লইয়া কখনও কখনও বাক্‌বিতণ্ডা হইত। ভাদুড়ী মহাশয়ের প্রসঙ্গ উঠিলে অনেক সময় আচার্য্যদেব তাঁহাকে "ইন্‌পেক্‌টর জাবার্ট" নামে অভিহিত করিতেন।

পর্ব্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া তাহার উচ্চতা উপলব্ধি করা যায় না। দূর হইতেই ইহা সম্ভব হয়। আমাদের যদিও তাঁহার সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল তথাপি তাঁহার বিরাটত্ব সম্পূর্ণ ভাবে কোন দিনই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যত দিন যাইতেছে তাঁহার অভাব আমরা তত তীব্র ভাবে অনুভব করিতেছি; এবং তিনি দুর্ব্বল, রোগ-জীর্ণ শরীর লইয়া এত দেশহিত-কর কার্য্য কি করিয়া সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া চমৎকৃত হইতেছি!

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

আচার্য্য-স্মরণে

উনিশ বছর আগে যে দিনটিতে দেশবন্ধুকে আমরা হারিয়েছি, সেই শোকতপ্ত দিনে আচার্য্য রায়েরও কর্ম্মমুখর জীবনের অবসান হয়ে গেল। বাংলার এই দুই মহাপ্রাণ কর্মীর অন্তরে যে আদর্শগত মিল ছিল, তাই যেন আজ সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,—

"...হয়তো আমার প্রিয় বিদ্যা (রসায়ন) চর্চায় আজীবন লিপ্ত থাকার ফলে আমার দৃষ্টি অস্বচ্ছ ও চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ সাধনার মূলে আমার একটি মাত্র অভিলাষ ছিল, ইহা দ্বারা আমি দেশের সেবা করিব। তাঁহার (দেশবন্ধুর) ও আমার একই আকাঙ্ক্ষা। ভগবান জানেন, ইহা ব্যতীত আমার জীবনে দ্বিতীয় কাম্য নাই।"*

আচার্য্যের জীবন-সায়াহ্নে (১৯৩২) অল্পদিন হলেও ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁর সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে কখনও এখানে-সেখানে গেছি, থেকেছি। তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবনের কথা কে না জানে? সেই পুণ্য জীবনচরিত রামায়ণের মত সকলেই খুলে দেখার অধিকারী ছিল। কত অল্পে তাঁর প্রয়োজন মিটে যেত দেখেছি, মনে হয়েছে তাঁর সামান্য প্রয়োজনটাই আসলে তাঁর অসামান্য ঐশ্বর্য্য। যত দিন অশক্ত হয়ে পড়েননি, কিছুতে পরের সাহায্য নিতে চাইতেন না, জুতোটি পর্য্যন্ত নিজে ঝেড়ে নিতে দেখেছি। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-সভায় একবার বলেছিলেন,—"আমি আরও অগ্রগামী। আমার ক্ষমতা থাকিলে আমি এদেশে সেই প্রাচীন শিক্ষাধারায় ব্রহ্মচর্য্য সংস্কারের পুনরুজ্জীবন করিতাম, যাহা শিক্ষার মূলে থাকিয়া বীর্য্যবান্ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ শিক্ষিত মানবকে উত্তর-জীবনের সকল প্রতিকূল বায়ুর মধ্যে স্থির থাকিতে সক্ষম করিত। আমি চাহিয়াছি যে শিক্ষার্থী, সে সকল প্রকার বিলাস বর্জ্জন করিবে, দৃঢ় রুক্ষ খদ্দর পরিয়া থাকিবে, আপনার ঘর ঝাড়িবে, কাপড় কাচিবে, বাসন মাজিবে এবং সর্বতোভাবে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিবে।" আপনার জীবনে এই বাণী তিনি কত দূর সার্থক করেছিলেন, অনেকেই তা নিজের চোখে দেখেছেন।

চিন্তায়, কথায় ও কাজে ঐক্য রেখে তিনি যে স্বাধীন বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন, বর্ত্তমান যুগের অগণিত দেশবাসী তাঁর দ্বারা নানা ভাবে প্রভাবান্বিত। তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য সম্পর্কে

---

* দেশবন্ধুর কারাবরণে শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে লিখিত পত্র, ডিসেম্বর ১৯২১।

অপ্রভাবিত প্রত্যক্ষদর্শীর মত তাই এদেশে পাওয়া কঠিন। দু'-এক জন বিদেশীর উক্তি পাওয়া যায়।

উত্তর-বঙ্গের বন্যার সময় (১৯২২) 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা বিধ্বস্ত অঞ্চলে আর্ত্তত্রাণকার্য্য দেখতে এসেছিলেন। তখন সরকারী চেষ্টা অনুপযুক্ত দেখে বেসরকারী সমিতি খুলে আচার্য্য রায় সেবাকার্য্য পরিচালনার ভার নিয়েছেন। সায়ান্স কলেজে সমিতির আপিস খোলা হয়েছে। সংবাদদাতা লিখছেন,—

"...সায়ান্স কলেজে সার পি, সি, রায়কে দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমার মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি, কেন তাঁর দেশবাসী তাঁর উপর এতটা বিশ্বাস রাখে। এক দিন দেখলাম, আর্ত্তের জন্য স্বেচ্ছা-সেবকদের সংগ্রহ করা পর্ব্বতপ্রমাণ নতুন ও পুরানো কাপড়ের স্তূপ তিনি পরম আগ্রহে দেখে ফিরছেন। পরের দিন দেখি, তাঁর গবেষণাগারে দুটি তরুণ ছাত্রকে কোনও রাসায়নিক পরীক্ষায় সাহায্য করছেন। দেখে বোধ হ'ল সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে স্নেহের সম্পর্ক আছে। তাঁর কাছ থেকে নিন্দে শোনার আগে আমি এঁর আজ্ঞা পালন করতাম। তাঁর মত দৃপ্ততেজা উদ্যোগী পুরুষ কখনও নিখুঁত সমালোচক হন না। কিন্তু তাঁর নিন্দার কশাঘাতের মধ্যেও তৃপ্তি আছে যে, এই ব্যক্তি কাজ এগিয়ে দিলে কাজ ঘাড়ে নিতে ভয় পান না, এবং কাজ নিলে যে কোনও সমর্থ ব্যক্তিরই মত, হয়তো তার চেয়ে আরও একটু ভাল ভাবেই সে কাজ সুসম্পন্ন করতে পারেন।"

সেই দীর্ঘ উজ্জ্বল কর্ম্ম-জীবনের পরিচয় এখানে দেওয়া অনাবশ্যক। রসায়নে তাঁর ব্যাপক গবেষণা, দেশে অগ্রগণ্য রসায়নীর দল সৃষ্টি করা, তাঁর হিন্দু রসায়নী-বিদ্যার ইতিহাস, তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল, দেশীয় শিল্পের উদ্বোধন, দেশের বড় বড় বিপদে সেবাকার্য্য। তাঁর সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মধারার পরিচয় দিয়ে খ্যাতনামা রাসায়নিক সার এডোয়ার্ড থর্প মন্তব্য করেছিলেন, "...সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে প্রফুল্লচন্দ্র ক্রমশঃ দেখিবেন তিনি সর্ব্বসাধারণেরই সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতেছেন।...এই ক্ষুদ্র শীর্ণ মানুষটি তাঁহার দুর্ব্বল স্বাস্থ্য ও জীবন-ব্যাপী অজীর্ণ রোগ লইয়া দেশের সেবায় নিঃশেষিত হইয়া যাইবেন। তাঁহার জীবদ্দশায় দেশে উন্নতির দিন আসিবে না; কিন্তু সেই সেবার স্মৃতি অক্ষয় হইয়া রহিবে।"

হাসিমুখ কর্ম্মঠ যুবক, চিরকাল তাঁর নয়নের আনন্দ ছিল। সে আনন্দ তিনি ভাষায় ব্যক্ত করতেন না। কীল-চাপড়ে অনেকেই তা অনুভব করে ধন্য হয়েছে। অগ্রগামী বলিষ্ঠ চিন্তাধারায়, সংস্কারমুক্ত বিচারে, সাহসে ও উৎসাহে বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে দেশের শক্তির অগ্রদূত মনে হ'ত। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের কথা বলছি, তখন ছিয়াত্তর বৎসর তাঁর বয়স, বৈকালিক পাঠ সেরে নিয়ে বেরোবার আগে আমার সঙ্গে গল্প হচ্ছিল, "...এখনও তোদের মত হয়েই বাঁচতে চাই। পাছে বুড়ো হয়েছি মনে হয়, আরসিতে মুখ দেখিনে। কখনো পার্কে যাইনে সেখানে বুড়োদের সভা; সেখানে সেই 'ছিল বটে আমাদের কালে, অমুক সায়েব, বাবু বলতে প্রাণ যেত...সি, আর, দাসই তো দেশটার সর্ব্বনাশ করলে,' শুনিসনি?" বলে হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন।

জীবনের শেষ পঞ্চাশ বছর ধরে' বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা তাঁর জাগরণের চিন্তা, নিদ্রার স্বপ্ন হয়েছিল। এক এক সময় অধীর হয়ে বলতে শুনেছি, এ জাতি লুপ্ত হয়ে যাবে। তার প্রতিবাদ করেছি, বলেছি, এত দিন বীরের সংগ্রাম করে শেষে পরাজিতের বাণী আমাদের জন্যে রেখে যান, তবে তেমন অভিজ্ঞতার কথা আমাদের না-ই জানিয়ে গেলেন। তিনি বলেছেন, "ষাট বছর হয়ে গেল সমস্ত চোখ দিয়ে মন দিয়ে দেশকে দেখছি। কি সম্পদ ছিল তোরা তা দেখিসনি, কি আছে আমি তা দেখতে পাচ্ছি...

• "বাঙ্গালী হয়ে জন্মেছি বলে আমি গর্ব করি। বাঙ্গালীর চরিত্রে অনেক উন্নত গুণের সমাবেশ দেখেছি। কিন্তু এক অত্যন্ত দরকারী কাজে সে সাংঘাতিক অপারগ, তার নিজের অন্নের সংস্থানে। দেখেছি, তার আপন জন্মভূমিতেই সে প্রতিযোগিতা রোধ করে দাঁড়াতে সবচেয়ে অসমর্থ। দেশের গ্রামে ঘুরে ঘুরে আমাদের ছেলেদের যুবকদের লক্ষ্য করি। তাদের শরীরে বাড় নেই, দেহে রক্ত নেই, চোখে দীপ্তি নেই। কত দিন ভাল খেতে পায়নি। তাদের অসহায় মুখে নিরাশা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, দিন দিন তারা ডুবে গেল। যে জাতির যৌবন অবশ অবসন্ন, তার ভবিষ্যতের আশা নেই। তবু জীবনের এই সন্ধ্যাবেলায় আমি আশা ছেড়ে দিতে পারব না..."

"বাঙ্গালী রসায়নীর জীবন ও অভিজ্ঞতা" বইয়ে তিনি আপনার জীবনের অনেক ঘটনা, চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করে গেছেন। শেষ জীবনেও যে আশা তিনি ছাড়তে পারেননি, আমরা যেন তাকে জলাঞ্জলি না দিই। আমাদের যোগ্যতা যে কত তুচ্ছ, গত দুর্ভিক্ষে তা দেখা হয়ে গেছে। তবু ভাবি, তাঁর মত যোগ্যতার রাজমুকুট নিয়ে যে কোন দেশে কম মানুষই জন্মগ্রহণ করেন, বেশির ভাগ মানুষকেই আপন দুঃখ-বিপদের জ্বালা সহ্য করে করে অল্পে অল্পে যোগ্য হয়ে উঠতে হয়। বর্তমান যুগে আমরা সেই ভাগ্যহীনদের জাতি!

শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

ছেলেবেলা থেকেই 'পি সি রায়' এই নাম উচ্চারণে যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনন্দ ও গৌরব মিশিয়ে আছে, তা কি প্রকাশ করতে পারব? যদিও ঐ নামের অন্তরালে যে দেবতুল্য চরিত্র, জীবনব্যাপী আত্মত্যাগ, পরদুঃখকাতরতা, পরদুঃখ দূরীকরণের চেষ্টা, সত্যের সন্ধান ও অপূর্ব্ব কর্ম্মতৎপরতার বিপুল প্রকাশ রয়েছে, তা আজ দেশবাসীর অবিদিত নেই। আমার যখন তাঁর অতি নিকটে আসবার সৌভাগ্য হল, তখন মন ভক্তিতে অবনত, চিত্ত সঙ্কোচে পূর্ণ। সকলেরই দেখেছি, তাঁর নিকটে এলে তাঁর প্রতি ভক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়েছে। কারণ তাঁর জীবনে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না, মুখোস ছিল না, সহজ সরল স্বচ্ছতা তাঁর প্রত্যেক ব্যবহারে প্রত্যেক কাজে, এবং তা গভীর আন্তরিকতায় পূর্ণ। তাই আত্মীয়তায় মন অধিকতর আকৃষ্ট হ'ত, মুগ্ধ হ'ত।

Plain living and high thinking যা এ যুগে সাধারণতঃ স্কুলপাঠ্য প্রবন্ধ-রচনার বিষয় মাত্র হয়ে আছে, সেই উপদেশ-মূলক সত্য তাঁর জীবনে এমন পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছিল—যা না দেখলে ধারণা করা শক্ত! দীর্ঘ ৮৩ বৎসরে তিনি দেখিয়ে গেলেন **plain living** ও **high thinking**এর যোগাযোগ জীবনে কত দূর সহজসাধ্য; এবং শুধু চিন্তা নয়, জ্ঞান নয়, এ দু'য়ের সঙ্গে তিনি যোগ করলেন

অক্লান্ত কর্ম্ম। আমার যখন অভিজ্ঞতা সুরু হয় তখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর নিয়ে পালিত প্রফেসর হয়ে ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিয়েছেন। বিজ্ঞান কলেজেই একটা ঘর নিয়ে ছিলেন। ঘরেই একটু আড়াল করে রান্নার ব্যবস্থা এবং সামনের বারান্দাটা ঘিরে তাঁর আশ্রিত ছাত্রদের আস্তানা। আসবাব-পত্রের মধ্যে থাকত একটি দড়ির খাটিয়া (যা দ্বারওয়ানেরা ব্যবহার করে), একটি চেয়ার ও টেবিল আর কয়েকটি বইয়ের আলমারী। খাটিয়াটিই ছিল সব চেয়ে প্রিয়। গবেষণা ও নানাবিধ কার্য্যের অবসরে সেই খাটিয়াটিতে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় পড়াশুনা করতেন। আজকাল সামান্য অবস্থার লোকদেরও চাল বজায় রাখবার জন্য অর্দ্ধভুক্ত থেকে গৃহ ও দেহের সাজসজ্জা ও অনাবশ্যক আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থা দেখার পর এই রিক্ত ঘরটিকে একটি পবিত্র আরাধনার জায়গা বলেই মনে হত। দেহের সজ্জা আবার ঘরের সজ্জার কাছেও লজ্জা পেত। খাদির মন্ত্র তিনি গ্রহণ করেছিলেন অন্তরের সঙ্গে, এবং খাদি ছাড়া কিছু পরতেন না। যত দিন শক্তি ছিল নিজের কাপড় নিজেই কেচে নিজেই শুকোতে দিতেন। কখনো নিজেকে পরমুখাপেক্ষী হতে দেননি। বালতি হাতে স্নানাগারে যাওয়া ও আসা নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য ছিল। লুঙ্গী পরে একটা উচ্চ টুলে বসে গবেষণাগারে নিজে কাজ করতেন এবং ছাত্রদের কাজ দেখাতেন। যাঁরা ওঁকে পূর্ব্বে দেখেননি এমন অনেকে এসে ওঁর নিতান্ত সাদাসিধা বেশভূষার জন্য চিনতে না পেরে খুঁজে পেতেন না। একবার একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক ঘুরে ঘুরে বিপন্ন হয়ে আমাদের শরণাপন্ন হলেন। ওঁর ঘরটা নির্দ্দেশ করাতে বললেন, সেখানে তো কাউকে দেখলুম না। "সে কি, উনি একটা টুলে বসে কাজ করছেন যে!" তিনি তো মহা অপ্রস্তুত! কারণ টুলে উপবিষ্ট ব্যক্তিটিকে তিনি গ্রাহ্যই করেননি। বাহিরের অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরের প্রতি এই অবহেলার মূল কারণ ছিল তাঁর একাভিমুখী সাধনা, একাগ্র বিজ্ঞানচর্চ্চা, যার ফল য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলিতে স্থান পেয়েছে এবং য়ুরোপের সুধীমণ্ডলে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর প্রধান কীর্ত্তি বহু শতাব্দীর পর তিনি (ও সার জগদীশ) ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার পুনরায় সূত্রপাত করলেন। সে জন্য অনেক বাধা-বিঘ্ন, অনেক অসুবিধা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর আরো বড় কৃতিত্ব, তিনি শুধু নিজেই গবেষণা করে ক্ষান্ত হননি, অন্যের ভিতরও এই সত্যান্বেষণের পিপাসা জাগিয়েছেন। স্বহস্তে কতগুলি বিশিষ্ট ছাত্র তৈরী করেছেন—যাঁরা আজ বিজ্ঞান-জগতে উচ্চস্থান অধিকার করেছেন। কত ছাত্র যে ওঁর কাছে দীক্ষা পেয়েছে, উৎসাহ পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আজ যে ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে গবেষণার সাড়া পড়ে গিয়েছে, আজ যে আমরা বিজ্ঞান-জগতে সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে ও চলতে পারছি তার মূলে তিনি ও তাঁর একাগ্র চেষ্টা। গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত হবার আগে তিনি তাঁর ছাত্রদের বেশ ভাল করে যাচাই করে নিতেন। চাইতেন একনিষ্ঠতা। বলতেন, "এ খোন্তা কোদালের কাজ নয়।" যে বিবাহ করেছে, বিশেষ বাল্যকালে—তার একাগ্রতার প্রতি সন্দিহান হতেন। যে সব ছাত্র অনেক পরে এসেছিলেন তাঁদের আদর করে বলতেন, এরা আমার রাসায়নিক নাতির দল। কত ছাত্র যে নিয়মিত সাহায্য পেত, প্রত্যহ কত ছাত্র যে ওঁর কাছে অন্নগ্রহণ করত, তার শেষ নেই। নিজেকে বঞ্চিত করে সর্ব্বস্ব দান করতেন। মাঝে মাঝে ওঁর ভক্তদের কাছ থেকে ফলমিষ্টি প্রভৃতি আসত (ওঁর উপযুক্ত পরিমাণে)। গুরুকে নিবেদন করে আহারের চিরন্তন প্রথার বিপরীত উনি ছাত্রদের বণ্টন করে নিজের জন্য যৎসামান্য রাখতেন। আহার্য্য পরিমাণে অল্প, ছাত্রদের ক্ষুধা প্রচণ্ড। বলতেন "দাঁড়া, আগে গর্ত্ত ভর্ত্তি করি।" বেরুত প্রথমে মুড়ি,—যা ওঁর খুব প্রিয় ছিল, স্বদেশী বলে, গরীবের খাদ্য বলে,—তাতে মিশত বেঙ্গল কেমিকেল থেকে আনান সিরাপ। 'গর্ত্ত' যখন কিছু ভরেছে, ব্যাঘ্রেরা যখন কিঞ্চিৎ শান্ত, তখন বেরুত সন্দেশ আম। খাদ্যদ্রব্যগুলি অচিরে ছাত্রদের পেটে অন্তর্দ্ধান হ'ত। ভক্তরা নিশ্চয় এই পরিণাম জানতে পারলে দুঃখিত হতেন; কিন্তু যাঁকে নিবেদন, তিনি ছাত্রদের তৃপ্তিতেই বেশী আনন্দ পেতেন।

তাঁর একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল ছাত্রদের কৃতিত্বে তিনি যে রকম আনন্দ ও গৌরব অনুভব করতেন, নিজের কৃতকার্য্যতাতেও বোধ করি ততটা নয়। এতেই বোঝা যায়, ছাত্রদের প্রতি স্নেহ তাঁর কত আন্তরিক এবং গবেষণা-কার্য্যের প্রতি তাঁর কত প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কাজকে বড় করে নিজেকে আড়ালে রাখতেন। যদিও জীবনব্যাপী রসায়নশাস্ত্রের সেবা করে এসেছেন এবং এই তাঁর অতিপ্রিয় শাস্ত্র, তবু অন্যান্য বিষয়—বিশেষতঃ ইতিহাস রাজনীতি ও অর্থনীতি—তাঁর অবসরের সঙ্গী ছিল। তাঁর পুস্তকাগার দেখলেই বোঝা যেত তাঁর অনুসন্ধিৎসা কত সর্ব্বতোমুখী ছিল। নিজেকে কেবল গবেষণাগারে আবদ্ধ রাখেননি; দেশের সকল অবস্থার সঙ্গেই তাঁর গভীর সংযোগ ছিল। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাঙ্গালীকে বাঁচতে হলে চাকরীর গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে ব্যবসা অবলম্বন করতে হবে। আজ যে ব্যবসার প্রতি বাঙ্গালীর ঘৃণা অনেক পরিমাণে দূর হয়েছে তার পিছনে রয়েছে তাঁর পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী চেষ্টা। চাকরীর উমেদারদের উনি সর্ব্বদাই ব্যবসায়ে উৎসাহিত করতেন। শুধু ব্যবসা করার পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, নিজে পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন। বাঙ্গালীর প্রথম বড় ব্যবসা বাঙ্গালীর গৌরব, Bengal Chemical—তাঁরই স্বহস্তে সযত্নে তিলে তিলে গঠিত। আজ Bengal Chemical-এর অনুকরণে অনেক অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু তখন এর সম্ভাবনা কল্পনাতীত ছিল। কোথাও কোনো বাঙ্গালীকে নিজের চেষ্টায় ব্যবসায় উন্নতি করতে দেখলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হতেন। শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের কৃতিত্বে বিশেষ গৌরব বোধ করতেন। তিনি যে কেবলমাত্র বড় বড় প্রতিষ্ঠানেরই অনুকূল ছিলেন তা নয়, কুটীরশিল্পও তাঁর সহায়তায় বঞ্চিত হয়নি। গান্ধীজীর সঙ্গে উনিও পরম উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন ঘরে ঘরে সুতো কাটার সম্বন্ধে। তারই ফলে খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। তিনি নিজে প্রত্যহ সকালে নিয়মিত চরকায় সুতো কাটতেন। কোনো বিষয়ে উপদেশ মাত্র দিয়ে ক্ষান্ত হতেন না নিজে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হতেন। ওঁর বহির্জ্জগতের কর্ম্মতৎপরতা শুধু ব্যবসার উন্নতি সাধনেই আবদ্ধ ছিল না। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল লোকের দুঃখ দূর করা। এই পরদুঃখকাতরতাই তাঁর জীবনকে ব্যাপ্ত করেছিল। এর জন্য তিনি সন্ন্যাসীর জীবন অবলম্বন করেছিলেন, এর জন্য তিনি সারাজীবন ধরে সর্ব্বস্ব দান করতেন। যখনই দেশে দুর্ভিক্ষ, প্লাবন বা অন্য কোনো দৈব দুর্বিপাক ঘটেছে উনি এগিয়ে এসেছেন দেশকে রক্ষা করতে। কেবলমাত্র ওঁর নামের মহিমায় অর্থ অযাচিত ভাবে স্রোতের মত এসে পড়েছে। আজ সেই বিশার্ত্ত-হৃদয় নিস্পন্দ

পরের দুঃখে কাঁদবেন না. পরের দুঃখ দূর করবার জন্য প্রাণপাত করতে আর তিনি ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে আসবেন না! আজ সেই ঋষিতুল্য মানব সাধনোচিত ধামে চলে গিয়েছেন, রেখে গিয়েছেন আমাদের জন্য এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত আর আনন্দপূর্ণ সান্ত্বনা যে, তাঁর মত দেবতুল্য চরিত্র ও কর্মনিষ্ঠ জীবন দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল! ভারতে সন্ন্যাসীর অভাব কোনো কালে ছিল না। মনুষ্য জগৎ থেকে দূরে সন্ন্যাস-জীবনে সিদ্ধি থাকতে পারে; কিন্তু তাতে জগতের বাস্তব কল্যাণ নেই। তাঁর আদর্শ-জীবনের কাছে সকলেই নতমস্তক। এই আদর্শই যেন হয় আমাদের লক্ষ্য—সেই হবে তাঁর পরম তৃপ্তি, সেই হবে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য-অঞ্জলি।

শ্রীমনোমোহন সেন

আচার্য্যদেব

আচার্য্যদেবের গুণাবলী এবং সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁর ছাত্রদের কৃতিত্বের মূলে আছে তাঁরই বহুমুখী প্রতিভার ছায়া। যারা তাঁর সেই প্রতিভার সংস্পর্শে এসে তাঁর সুনাম বজায় রাখতে পেরেছে তার জন্য তারা নিজেদের ধন্য মনে করে।

কিঞ্চিদধিক পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে, যখন শুধু রসায়নশাস্ত্রের আকর্ষণে নয়, তাঁর দেবপ্রতিম আদর্শ চরিত্রের সংস্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞান কলেজের সদা উন্মুক্ত দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছিলুম। যদিও প্রথম সাক্ষাতে তাঁর সাদর সম্ভাষণ আমার ভাগ্যে ঘটেনি তবু যা পেয়েছিলুম তাতে ছিল তাঁর দেবোপম চরিত্রের, অপরিসীম দেশাত্মবোধের এবং অকৃত্রিম দেশপ্রেমের পরিচয়। সে পরিচয় আমাকে বিমুগ্ধ করেছিল। ভাল ছেলে বললে স্বাস্থ্য হিসাবে যা বোঝায় সেই ছিল আমার তখনকার স্বাস্থ্য-সম্পদ! একহারা চেহারা, চোখে চশমা এবং দীপ্তিহীন অবসন্ন চাহনি, বয়স-অনুপাতে অসম্ভব গাম্ভীর্য্য। তাই দেখে আচার্য্যদেব বল্লেন যে, এ দেশে যদি Spartan রীতি প্রচলিত থাকতো তা হলে এই মুহূর্ত্তে গোপাল * তোমায় কলেজের তিন তলা থেকে ফেলে দিত এবং তা দিলে ভালোই হতো। তার পর বল্লেন, "যেখানে কঠিন সাধনা এবং চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, কি হবে সেখানে এই সব নষ্টস্বাস্থ্য নামে-মাত্র-যুবক বৃদ্ধের রসায়নশাস্ত্রের চর্চ্চা করে? শরীরে ক্ষমতা চাই, মনে বল চাই তবেই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দ্বারা সাধনা ও সিদ্ধি লাভ হবে।" তাঁর সেই অপ্রিয় সত্য কথা সে দিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল আর এক বিরাট পুরুষের কথা। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। দেশের ভগ্নস্বাস্থ্য, নিস্তেজ, বলহীন যুবকদের দেখে গর্জ্জন করে যিনি বলেছিলেন, "Health is more precious than religion." পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, সুদূর হাওড়া থেকে প্রতিদিন কলকাতায় পড়তে যাওয়ার পরিশ্রমই দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের খানিকটা হেতু, তখন স্নেহ এবং করুণামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, "তবে তুমি আমার এখানেই খেয়ো আর থেকো।" *

সে দিনের কথা আজও মনে হলে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। মনে হয়, তিনি যে শুধু এক জন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন তাঁর ছাত্রদের দরদী বন্ধু। তাঁর সেই প্রথম দিনের পরিচয় আমাকে এমন মুগ্ধ করেছিল যে, তার পর যখনই তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েছি তখনই মনে হয়েছে সত্যই এক ঋষিকল্প মহাপুরুষের আশ্রম সমীপে এসে উপস্থিত হয়েছি।

এই সময় বিজ্ঞান কলেজে উদীয়মান রাসায়নিক "জ্ঞানদ্বয়ের" (এক্ষণে Sir J. C. Ghose এবং Dr. J. N. Mukherjee) রাসায়নিক প্রতিভার উন্মেষে প্রভাবান্বিত। তৃতীয় জ্ঞান (Dr. J. N. Roy., Director of Drugs & Dressing, Dept. of Supply, New Delhi) গবেষণাগারের হেড়পড়ুয়া। এঁদেরই সাকরেদ হয়ে বিজ্ঞান কলেজে আমার শুভপ্রবেশ হলো। এঁরা সকলেই আচার্য্যদেবের প্রিয় শিষ্য ও ছাত্র। অসংখ্য রাজসম্মান প্রাপ্তি বা অসহযোগ আন্দোলনের আবর্ত্ত এই ঋষিকল্প বৈজ্ঞানিক এবং অতিমানুষের বিজ্ঞান-সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। Knighthood প্রাপ্তিতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়েছিল তার এক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করে বিজ্ঞান-সাধনার মধ্যে তাঁর দেশ-প্রীতি ছিল কতখানি তার নিদর্শন দেওয়া সমীচীন মনে করি। "You have shown, Sir, that the achievements of our forefathers are no more museum curios of primitive intellectuality, no more mumied specimens of thought bound in the trappings of erudition but they are living and potent forces making for the far-off event of scientific millenium." এতে ইঙ্গিত ছিল, তাঁর বিশ্ববিশ্রুত History of Hindu Chemistry" রচনার প্রতি। এই পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের সময় সংশোধন বা সংযোজন করা উপলক্ষে আমার কাজ ছিল রিডিং পড়ে তাঁকে শোনানো এবং কি সংশোধন বা সংযোজন করতে হবে তা সন্নিবেশিত করা। দেবনাগরী অক্ষরে অসংখ্য সংস্কৃত শ্লোক এবং পদাবলীতে ভরা! ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত আমার সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি থাকায় সঠিক উচ্চারণ বা পাঠ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হতো। আচার্য্যদেব বড় আক্ষেপের সহিত বলতেন, "কি শিখলি তোরা? ইংরেজী জানিস্ না, বাংলাও জানিস না, সংস্কৃত ত আদপেই নয়।" রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বা সেক্সপীয়রের বই থেকে উদ্ধৃত করা তাঁর রসায়নশাস্ত্রের মতই সহজসাধ্য ছিল।

তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভার কথা আজ কারও অবিদিত নাই। সাধারণ চিঠি-পত্রে তাঁর উক্তি ও মত অনেক সময়ে বাংলা ও ইংরাজীতে আমি লিপিবদ্ধ করেছি। সেগুলির ভাব ও ভাষা অতুলনীয়। তাঁর সাধনা ছিল অপরূপ। আমরা তাঁর সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছি।

দীর্ঘ চার মাসের ছুটীতে ঘুরতে ঘুরতে দেশের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আচার্য্যদেবের অসুস্থতার সংবাদ

---

* আমার সহপাঠী ডাক্তার গোপাল চক্রবর্ত্তী অসীম স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ছিলেন। পরে সেই অতুলনীয় স্বাস্থ্যের ভাঙ্গন ধরে অকালে মারা যান।

* শিষ্য হওয়ার এ সুযোগ এত সহজে লাভ করা অভাবনীয় এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত বলেই মনে করি।

পাই। বাংলার সেই দুর্দ্দিনে সকাল থেকেই তাঁর রোগশয্যার পাশে থেকে তাঁর শীর্ণ অথচ প্রশান্ত মুখশ্রী দেখেছি। তাঁর মৃত্যু যেন একটা শান্ত transmission—যেমন মহান্ তেমনি সুন্দর!

শ্রীগণেশচন্দ্র মিত্র

আধুনিক রাসায়নিক মৌলিক গবেষণায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্থান

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতে আধুনিক রাসায়নিক মৌলিক গবেষণার প্রধান হোতা ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রত্যাগত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে মৌলিক রাসায়নিক গবেষণার দীপে যে প্রাণ-শিখার সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা সহস্র ধারায় প্রজ্বলিত হইয়া ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ দীপের সমুজ্জ্বল শিখা বিশ্ববিজ্ঞান-জগতে ভারতের নাম গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ বিজ্ঞান-জগতে শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল। তাহার পর পাশ্চাত্ত্যে বিজ্ঞান-চর্চ্চার দ্রুত উন্নতির সহিত ভারত ধাপে ধাপে নামিয়া আসিয়াছে। Swedish রাসায়নিক Savante Arrheneus-এর মতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হইতে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্রম-অবনতি আরম্ভ হয় এবং কয়েক শত বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞান-আলোচনা ভারতে লোপ পায়।

মহামতি Jonesএর কলিকাতা-সমাগমনের সহিত ও তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৭৭৪ খৃঃ Asiatik Societyর জন্ম ও ভারতে পুনরায় বিজ্ঞান-চর্চ্চার সূত্রপাত হয়। রসায়ন-শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম সূত্রপাত হয় ১৮৮০ খৃঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক Sir Alexander Pedlerএর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে। পেডলারের পূর্ব্বে ভারতের বিভিন্ন শিক্ষায়তনে বিজ্ঞান-আলোচনার তেমন ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই হয়। প্রথমে পেডলার ও পরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঐকান্তিক উদ্যমে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রাসায়নিক মৌলিক গবেষণার ব্যবস্থা অল্প-স্বল্প হয়। কথিত আছে যে, তদানীন্তন সরকার বাহাদুর বিজ্ঞান-চর্চ্চার সুযোগ ও সুবিধাদানের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন উদ্যোক্তার অভাবে ইহার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সরকার বাহাদুরের এইরূপ যুক্তির প্রথম সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন পেডলার ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর এক বৎসর যাবৎ—তদ্বিরের ফলে মাত্র আড়াইশ টাকা মাহিনায় প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পেডলারের অস্থায়ী সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পেডলার প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও তিনি মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। কেউটে সাপের বিষের রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণার ফল পেডলার ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে Royal Societyর পত্রিকায় প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করেন। পরে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে Chemical Societyর পত্রিকায় পেডলারের রাসায়নিক গবেষণা-মূলক তিনটি প্রবন্ধ বাহির হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্রকে সহকারিরূপে পাইয়া পেডলার দ্বিগুণ উৎসাহে প্রেসিডেন্সি কলেজে রাসায়নিক গবেষণার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য গভর্ণমেণ্টকে তাগিদ দিতে থাকেন এবং উভয়ের সমবেত চেষ্টার ফলে গভর্ণমেণ্ট মেধাবী ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক মৌলিক গবেষণার জন্য কয়েকটি বৃত্তির ব্যবস্থা করেন ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। এই ব্যবস্থার ফলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যোগ্য ছাত্রদের রাসায়নিক মৌলিক গবেষণায় প্রবুদ্ধ করিবার সুযোগ পান। ইহার পূর্ব্বে পেডলার এবং প্রফুল্লচন্দ্রকে রাসায়নিক পরীক্ষামূলক সকল প্রকার কার্য্যই নিজহস্তে অপরের সাহায্য-ব্যতিরেকে করিতে হইত।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রসায়নশাস্ত্র-সঙ্গত যে সকল মৌলিক গবেষণা হইত তাহা অত্যন্ত প্রাথমিক ধরণের, স্বল্পপরিসর এবং তাহাদের ব্যাপকতা ও ধারাবাহিকতার সমধিক অভাব ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-দশকে মৌলিক রাসায়নিক গবেষণার সুযোগ ও সুবিধা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র Science Convention of the Indian Association for the cultivation of Science-এর রসায়ন-শাখার সভাপতিরূপে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ যে উক্তি করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।—"When I first joined the Presidency College in 1889, Mr. Peddler, now Sir Alexander Peddler was the solitary worker on the subject. It was he who prepared the way. He had to clear the jungles and prepare the soils for the abad (আবাদ). The pursuit of Chemistry has since been very active and highly encouraging. It was about the year 1901 that the Govt. of Bengal for the first time instituted a few research scholarship tenable at the various colleges, open to graduates who want to continue their studies and research···"

এই সূত্রে স্যর উইলিয়ম র‍্যাম্শে ১৭৭৪ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণার পরিসর ও পরিস্থিতির সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। "···That (chemistry) is a subject which can be prosecuted only in the laboratories. In India until recently, there have been but a few laboratories worth the names, and we have had but few competent men with leisure to devote to lengthened chemical research"—[Centenery review of Researches of the Asiatic Society of Bengal Part iii P 101]

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করিবার পর কয়েক বৎসর প্রফুল্লচন্দ্র খাদ্য-বস্তুর ভেজাল নিবারণ-মানসে ঘী, সরিষার তৈল প্রভৃতি খাদ্য-বস্তুর রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহার তিন বৎসরের গবেষণার ফল Asiatic Societyর পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধের আকারে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ পায়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে mercurous nitrite আবিষ্কার করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। Ruscoe Berthelot, Victor Meyer, Vollard প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য রাসায়নিকেরা আচার্য্য রায়ের তদানীন্তন প্রেসিডেন্সি কলেজের পরিমিত যৎসামান্য সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে এই অদ্ভুত আবিষ্কারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৮৯৭ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধাতব nitrite ও hyponitrite সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা করেন ; এই গবেষণার ফল ১৩টি প্রবন্ধে Chemical Societyর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে গভর্ণমেণ্ট-বৃত্তিভোগী একটি ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে গবেষণার জন্ত নিযুক্ত হয়। প্রত্যেক ছাত্রটির বৃত্তিভোগ তিন বৎসরের জন্ত নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ সেন সর্ব্বপ্রথম বৃত্তিভোগী ছাত্র হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসেন। এতাবৎ কাল প্রফুল্লচন্দ্রকে গবেষণার জন্য সকল পরীক্ষা একাকী করিতে হইত।

বৃত্তিভোগী ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আচার্য্য রায় তাঁহার জীবনীতে যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য।

"......From 1900 on, one scholar was always attached to my department, who in the early probationary stage, co-operated with me in my line of research but later on was allowed to develop in his own ways and strike out a line of his own. In this manner some of these scholars were not only to secure Doctorate on presentation of a thesis but also won the blue ribbon of the Calcutta University—the Premchand Roychand scholarship."

সুতরাং বৃত্তিভোগী ছাত্ররা যে কেবল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁহার গবেষণায় সাহায্য করিত তাহা নহে ; পরন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশে ও নির্দ্দেশে স্বাধীন ভাবে নিজেদের স্থিরীকৃত বিষয়ে গবেষণা করিবার সুযোগ পাইত। এই ভাবে বৎসরের পর বৎসর বহু ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভার সন্নিকটে থাকিয়া ও তাঁহার সহযোগিতায় রাসায়নিক গবেষণায় প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং পরে অন্য শিক্ষা-আয়তনে নিযুক্ত থাকিয়া রাসায়নিক গবেষণার প্রসার বৃদ্ধি করেন।

আজ যে ভারতের সর্ব্বপ্রদেশে রাসায়নিক মৌলিক গবেষণার বহুল প্রসার দেখা যায়, তাহার মূল উৎস ছিলেন আচার্য্য রায়। যে সকল ভারতীয় ছাত্র আজ বিজ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়া বরেণ্য হইয়াছেন, ছাত্রজীবনে আচার্য্য রায়ের প্রগাঢ় উৎসাহ ও প্রবল উদ্দীপনা না থাকিলে হয়ত তাঁহাদের জীবনের ধারা ও কর্ম্মক্ষেত্র ভিন্ন দিকে চালিত হইত।

১৯০৩ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার ছাত্রদের সহযোগিতায় বিভিন্ন ধাতুর সহিত নাইট্রিক এ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন। ১৪টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ London Chemical Society ও American Chemical Societyর পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

আচার্য্য রায়ের সহিত রাসায়নিক গবেষণায় সহযোগিতা করেন প্রথম ১৯০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সেন। পরে যতীন্দ্রনাথ সেন স্বাধীন ভাবে রাসায়নিক গবেষণার জন্ত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং প্রথমে Pusa Agricultural Institute-এ নিযুক্ত হন, তৎপরে Imperial Forest Research Institute-এ Bio-chemistএর পদ অলঙ্কৃত করেন।

যতীন্দ্রনাথের পরে শ্রীযুত পঞ্চানন নিয়োগী বৃত্তিভোগী ছাত্র হিসাবে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্রের সহযোগিতা করেন। পরে স্বাধীন ভাবে রাসায়নিক গবেষণা করিয়া Ph. D উপাধিতে ভূষিত হন। ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী বিভিন্ন সরকারী কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন ; শেষে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিয়া তিন বৎসর পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করেন। ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী আচার্য্য রায়ের নিকট রাসায়নিক গবেষণার যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের অবকাশে রাসায়নিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার গবেষণার ফল বহু বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯০০ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে কয়েক জন ছাত্র আচার্য্য রায়ের গবেষণায় সহযোগিতা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জনের নাম উল্লেখযোগ্য।

১। ডাঃ যতীন্দ্রনাথ সেন।
২। ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী।
৩। শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী।
৪। " অতুলচন্দ্র ঘোষ।
৫। " সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৬। ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন।
৭। ডাঃ রসিকলাল দত্ত।
৮। ডাঃ নীলরতন ধর।
৯। রায় সাহেব জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

উপরি উক্ত নয় জনের মধ্যে সকলেই প্রায় স্বাধীন ভাবে রাসায়নিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হন ও নিজ নিজ ছাত্রদের রাসায়নিক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেন। আচার্য্য রায়ের উপরি-উক্ত নবরত্নের মধ্যে ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন, ডাঃ রসিকলাল দত্ত ও নীলরতন ধরের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রসিকলাল রাসায়নিক গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রী লাভ করেন এবং কয়েক বৎসর কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করিয়া Bengal Govt.এর Industrial Chemist-এর পদে নিযুক্ত হন।

হেমেন্দ্রকুমার রসায়নশাস্ত্রে এম এ ডিগ্রী লাভ করিয়া কিছু দিন সিটি কলেজে অধ্যাপনা করার পর বিলাত যাত্রা করেন। তথায় রাসায়নিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস্ সি উপাধি লাভ করিবার পর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান কলেজে ফলিত রসায়ন বিভাগে সার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার অধীনে বহু ছাত্র নানা বিষয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত হয় ও কয়েক জন ছাত্র রাসায়নিক গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি এস্ সি উপাধি লাভ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক রাঁচি India Lac Research Institute-এ Directorএর পদে নিযুক্ত হন, ও ঐ স্থানে লাক্ষা, প্লাষ্টিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করেন। অধুনা ডাঃ সেন বিহার গভর্ণমেণ্টের Director of Industriesএর পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন।

১৯০৩ হইতে ১৯১২ খৃঃ পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্রকে আচার্য্য রায় সহকর্ম্মিরূপে পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ নীলরতন ধরের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ে আচার্য্য রায়ের গবেষণা অজৈব রসায়ন বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নীলরতন ধর ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রথম Physical Chemistry (প্রাকৃতিক

রসায়ন) বিভাগে সর্ব্বপ্রথম গবেষণা সুরু করেন এবং আচার্য্য রায়ের সহযোগিতায় ১৯১২-১৩ খৃঃ তাঁহাদের গবেষণার ফল ৫টি প্রবন্ধে Chemical Societyর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ খৃঃ নীলরতন স্বাধীন ভাবে গবেষণা সুরু করেন ও এক বৎসরে তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ বিলাত, আমেরিকা ও জার্ম্মাণীর রাসায়নিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকাদিতে স্থান লাভ করে। ১৯১২ খৃঃ হইতে ১৯৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ডাঃ নীলরতন ধর তিন শতাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার অধীনে বহু ছাত্র গবেষণা করিয়া ডি এস্ সি ডিগ্রী লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৯১২-১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত গবেষণায় প্রবৃত্ত থাকিবার পর নীলরতন State Scholarship লাভ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন এবং London ও Paris বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি এস্ সি উপাধি লাভ করেন। ১৯১৮ খৃঃ এলাহাবাদে Muir Central Collegeএ রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও পরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। ডাঃ নীলরতন ধরের প্রাকৃতিক রসায়ন বিভাগের মৌলিক গবেষণার উৎসাহ ১৯১৪-১৫ খৃঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (অধুনা স্যর) ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ে সংক্রামিত হয়। ইঁহারা প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে ও পরে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে গবেষণায় আবিষ্ট হন। ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রথমে বৈদ্যুতিক রসায়ন-বিজ্ঞানে গবেষণা সুরু করেন। ১৯১৪ খৃঃ তাঁহার গবেষণার ফল American Chemical Societyর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলাদলীয় (Colloidal) রসায়ন বিভাগে গবেষণা আরম্ভ করেন ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে American Chemical Societyর পত্রিকায় তিনটি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। জ্ঞানদ্বয় ১৯১৯ খৃঃ বিলাত যাত্রা করেন ও ১৯২১ খৃঃ ভারতে প্রত্যাগমন করিলে ডাঃ মুখার্জ্জি কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কিন্তু সেই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অধুনা স্যর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ Bangalore Indian Institute of Scienceএর ডিরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই জ্ঞানদ্বয়ের রাসায়নিক গবেষণায় বাঙ্গালী ও ভারতের মুখ বিজ্ঞান-জগতে উজ্জ্বল হইয়াছে।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আচার্য্য রায় University College of Science-এ Palit Professor পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে যত দিন পালিত অধ্যাপকের পদে স্থায়ী ছিলেন, তিনি বেতন হিসাবে একটি কপর্দ্দক গ্রহণ করেন নাই; তাঁহার সঞ্চিত সমুদয় বিত্ত বিজ্ঞান-চর্চ্চায় দান করিয়া গিয়াছেন। যে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই স্বার্থত্যাগী ঋষিকল্প বৈজ্ঞানিক সারা জীবন রসায়ন-বিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহার আর কোন অনুরূপ দৃষ্টান্ত ভূ-ভারতে পাওয়া যায় কি না, তাহা গবেষণা-সাপেক্ষ।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে আচার্য্য রায়ের নেতৃত্বে যে সকল ছাত্র গবেষণায় লিপ্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, প্রফুল্লচন্দ্র গুহ, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্লচন্দ্র বসু ও সুশীল-কুমার মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই জৈব রসায়ন শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ্ সায়েন্স উপাধিতে বিভূষিত হন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রসায়ন শাস্ত্রের মৌলিক গবেষণার কেন্দ্র মাত্র চারি স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। কলিকাতায় আচার্য্য রায়ের নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সি কলেজে, বাঙ্গালোরে ডাঃ ট্রাভার্সের অধ্যক্ষতায় Indian Institute of Scienceএ, Dr. E. R. Watsonএর পরিচালনায় ঢাকা কলেজে এবং Prof. Mouat Jonesএর পরিচালনায় লাহোরে।

আচার্য্য রায় ও তাঁহার কৃতী ছাত্রদের সাধনায় ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে রাসায়নিক গবেষণার চর্চ্চা সম্প্রসারণের সহিত আচার্য্য রায় বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁহাদের গবেষণার বহুল প্রচারের নানা বাধা অনুভব করেন। প্রথম হইতেই আচার্য্য রায় ও তাঁহার সহকর্ম্মিবৃন্দকে তাঁহাদের গবেষণার ফল বৈজ্ঞানিক-জগতে প্রচারের জন্য বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকার দ্বারস্থ হইতে হয়। সময় সময় তাঁহাদের গুরুত্বপূর্ণ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ স্থানাভাবের অজুহাতে ফেরত আসিত। অধিকন্তু ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে অযথা বিলম্ব হইত। যে ক্ষেত্রে একই ধরণের গবেষণার কাজ ভারতে ও বিলাতে অনুসৃত হইত, সে ক্ষেত্রে বিলাতী বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফল বিলাতী পত্রিকায় শীঘ্র প্রকাশিত হওয়ার দরুণ এ দেশের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান হইতে অযথা বঞ্চিত হইতেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এ দেশের রাসায়নিকগণের গবেষণার ফল সুষ্ঠুভাবে বৈজ্ঞানিক মহলে বহুল প্রচার মানসে রাসায়নিকগণের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হন এবং বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইয়া তাঁহার কৃতী ছাত্র ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ নীলরতন ধর ও ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের এবং তাঁহার ছাত্র-স্থানীয় ডাঃ (অধুনা স্যর) শান্তিস্বরূপ ভাট্‌নাগরের সমবেত আপ্রাণ চেষ্টায় ১৯২৪ খৃঃ মে মাসে ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির (Indian Chemical Society) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে ঢাকা কলেজের ডাঃ E. R. Watson তাঁহাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই সময়ে Dr. Watson 'Cawnpore Harcourt Butler Technological Institute'এর অধ্যক্ষ ছিলেন।

এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টির অনেক পূর্ব্বে Asiatic Society বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার চর্চ্চা প্রচার মানসে স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার গবেষণা প্রচারে এই সমিতি নানা কারণে বিশেষ সহায়তা করিতে সমর্থ হয় নাই।

আচার্য্য রায়ের অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায় ও ডাঃ Watsonএর অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে এই প্রতিষ্ঠান রেজিষ্টীকৃত হয় এবং ইহার কার্য্যালয় ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথের গৃহে স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রথম কার্য্যকরী সমিতির বৈঠক বসে ও ২৪শে নভেম্বর আচার্য্য রায়ের সভাপতিত্বে সভার প্রথম সাধারণ সম্মেলনের উদ্বোধন হয়।

ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির প্রথম সভাপতির পদে আচার্য্য রায়কে বরণ করা হয় ও ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রথম কর্ম্মসচিব এবং ডাঃ Watson ও ডাঃ নীলরতন ধর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

যে মহান্ আদর্শ লইয়া আচার্য্য রায় এই সমিতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যনির্ব্বাহকগণ

গত ২১ বৎসর ধরিয়া ভারতের রাসায়নিক গবেষণার ফল পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের বৈজ্ঞানিক মহলে পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন। আচার্য্য রায় এই সমিতির কোষে সর্ব্বসমেত ১৩ হাজার টাকা দান করেন।

আচার্য্য রায় সপ্ততি বর্ষে পদার্পণ করিলে এই সমিতির সভ্যগণ তাঁহার সপ্ততি জন্মতিথি স্মরণার্থে "Sir P. C. Roy 70th Birthday commemoration volume" শীর্ষক একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া আচার্য্য রায়ের সপ্ততি জন্মতিথির অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। তাঁহার কৃতী ছাত্র ও ভারতের সকল প্রসিদ্ধ রসায়নবেত্তাগণ এবং England, Germany, France, Austria, Switzerland ও আমেরিকার বিশ্বশ্রুত রাসায়নিকগণ আচার্য্য রায়কে যথোচিত মর্য্যাদা প্রদান করিতে তাঁহাদের মৌলিক গবেষণা এই বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

ভারতীয় রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া আচার্য্য রায় এ দেশের রাসায়নিকগণের যে দারুণ অভাব পূরণ করিয়াছেন, তাহা রসায়ন বিদ্যাচর্চ্চায় তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

বিনীত লেখক আচার্য্য রায়ের সহিত বিগত ২৫ বৎসর ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে যখন এই প্রতিষ্ঠানে সহকারী সম্পাদকরূপে আমি যোগদান করি, প্রথম দিনেই তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "পারবি ত? যদি না পারিস্ ত' এখনি সরে পড়্!" ইহার পর প্রায় প্রতিদিন এই প্রতিষ্ঠানের শুভাশুভ সম্বন্ধে নানা প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন এবং যে দিনই কোন বিশেষ সুসংবাদ দিতে পারিতাম, সে-দিন তাঁহার ঘরে ডাকিয়া নানাপ্রকার মুখরোচক মিষ্টান্নে রসনা পরিতৃপ্ত করাইতেন।

ভারতের এই জ্ঞানগুরু রসায়নের একনিষ্ঠ সাধকের সরল, উদার, অনাড়ম্বর, নিরহঙ্কার জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই এমন কেহ নাই! তাঁহাকে অনেক ভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি! তাঁহাকে দেখিয়াছি চরকার সূতা কাটিতে, তাঁহাকে দেখিয়াছি স্বহস্তে ভোজ্যবস্তু পরিবেশন করিতে, তাঁহাকে দেখিয়াছি পরিধেয় বস্ত্র নিজ হস্তে ধৌত করিয়া নিজ হস্তে রৌদ্রে মেলিয়া দিতে, তাঁহাকে দেখিয়াছি অশ্বযান ও মোটরে বেড়াইতে, কাছে বসিয়া গল্প করিতে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন দিনই কোন কথা বা ব্যবহার ও আচরণে কোনরূপ অহমিকার বা উষ্মার ভাব প্রকাশ করিতে দেখি নাই। এবং তাঁর অতিবড় বিরুদ্ধ-মতবাদীর প্রতি তিনি কোন দিন কোন প্রকার দ্বেষ পোষণ করিতেন না ও রাগত হইতেন না। তিনি ছিলেন বাস্তবিক শিশুর মত সরল, কিন্তু কর্ত্তব্যপালনে ছিলেন ইস্পাতের মত কঠিন; কাহারও কর্ত্তব্যচ্যুতি অথবা সময়ানুবর্ত্তিতার অভাব দেখিলে তিনি বিরক্ত হইতেন, ক্ষুব্ধ হইতেন কিন্তু ক্রুদ্ধ হইতেন না, এইখানেই তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য। শ্রীগণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

——

মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে দেশের কতখানি ক্ষতি হয়েছে, তার পরিমাপ করবার চেষ্টা না করেও অনায়াসে বলা যায়, বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান আজ আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন। আর্ত্তবন্ধু, ঋষিকল্প আচার্য্যদেবের বিস্তারিত জীবন-কাহিনী বলবার মত মানসিক অবস্থা আমাদের এখন নয়। সুতরাং সে চেষ্টা না করে আমি মানুষ প্রফুল্লচন্দ্রের সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলব। আচার্য্যদেবের শেষ জীবনের প্রায় ১৪ বৎসর আমি তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি—এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সংসারী প্রফুল্লচন্দ্র ও স্নেহার্ত্ত প্রফুল্লচন্দ্রের যে অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়েছে, তারই দু'-একটা উদাহরণ উল্লেখ করে আমি আজ তাঁর স্মৃতিতর্পণ করি।

আজন্ম-ব্রহ্মচারী, চিরকুমার প্রফুল্লচন্দ্রকে যদি সংসারী প্রফুল্লচন্দ্র বলা হয় তবে অনেকেই অবাক হবেন জেনেও আমি বলব, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ঘোরতর সংসারী ছিলেন। আমার মনে পড়ে, আমি যখন প্রথম আচার্য্যদেবের সংসারে আসি, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, "দেখ বাপু, আমার বয়স হয়েছে—যদি দেখি সব সময় ধোপ-দুরস্ত কাপড়-জামা পরে আছ তা হলে আমার হাতে কিল চড় খাবে—আমি বলব জামাইবাবুটি সেজে আছেন! আবার যদি দেখি ময়লা কাপড়-জামা তা হলে ধাঙড়-মেথর বলে গালাগাল দেব, এ আমার বুড়া বয়সের privilege. আমার সংসারে থাকতে হলে হিসাব করে চলবে।" বাস্তবিক আচার্য্যদেব কোন কিছুরই চরম করাটা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর নিজের জামা-কাপড় চিরদিন তাঁকে সাবান দিয়ে কাচতে দেখেছি। যত দিন সামর্থ্য ছিল তিনি নিজের হাতে কাপড় কেচেছেন, নিজে মেলে দিয়েছেন এবং শুকিয়ে গেলে নিজেই ভাঁজ করে তুলে রেখেছেন। এ সব কাজের ভার চাকরের হাতে ছেড়ে দেননি।

"আমার সংসার" কথাটা আচার্য্যদেবের বেশ প্রিয় ছিল। মাসের প্রথমে তাঁর কাছে আমাদের মাসের খরচের একটা বাজেট পেশ করতে হত, যদি দু'-এক দিন দেরী হত আচার্য্যদেব ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন,—কি, তোমরা যে সংসার-খরচের টাকা নিচ্ছ না? বাজেট নিয়ে আমাদের বলতে হত মাসে মোট কত টাকা দরকার হতে পারে, ব্যস্, আচার্য্যদেব একখানা চেক লিখে দিতেন। খরচপত্র সব আমাদের হাতে কিন্তু কি আমরা করছি, ব্যয় কেন কত হল এ তিনি কোন দিন দেখেন নাই। তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল আমাদের সংসারী করে গড়তে। পালাক্রমে আমাদের প্রত্যেককে নিয়মিত বাজার করতে হত। পালাক্রমে আমাদের তিনি ঘর ঝাঁট দিতে দিয়েছেন এবং মধ্যে মধ্যে পাচককে অযাচিত ভাবে ছুটি দিয়ে আমাদের তিনি পাক করতে বাধ্য করেছেন! এ কথা তাঁর মুখে হাজার বার শুনেছি—বাবা সংসারে গণ্ডা গণ্ডা চাকর-চাকরাণী, বাবার ক্ষমতা যদি শেষ পর্য্যন্ত না জোটে তখন বুঝবে আমি কেন এত অত্যাচার করছি।

এমনি ভাবে আমাদের প্রত্যেককে সংসারের কাজ আচার্য্যদেব করিয়েছেন। অনভ্যস্ত হাতে আমরা যা রেঁধেছি তাই তিনি হাসিমুখে খেয়েছেন। কোন দিন তিনি পাক ভাল হয়নি বলে অন্য কিছু নিজে খাননি—বরঞ্চ কোন দিন একটু ভাল পাক হলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। স্নেহাতুরা জননী যেমন করে নিজের মেয়েকে সংসারের কাজ শেখান ভারতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-শিক্ষকও ঠিক তেমনি করে তাঁর ছাত্রদের সংসারের কাজ শিখিয়েছেন—পাছে দৈব-দুর্ব্বিপাকে কোন দিন আমাদের এ-সব করার দরকার হয়!

অপচয় দেখলে আচার্য্যদেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হতেন। লেবরেটারীতে কাজ করতে যেয়ে যদি কোন দিন অনবধানতা বশতঃ আমরা কোন কিছু নষ্ট করেছি দেখেছেন, তবে গালাগাল ও কিল-চড় দিয়ে আমাদের তিনি অস্থির করে তুলতেন। আমাদের এই ত্রুটির কথা তিনি বড়

সহজে ভুলতেন না। অনেক সময় দেখেছি, দু'-এক মাস পরেও তিনি এ ত্রুটির কথা স্বচ্ছন্দে উল্লেখ করতে ছাড়তেন না। এক কথায় একবার একটা অপরাধ করে ফেললে কয়েক মাস আমাদের সশঙ্ক থাকতে হত, কখন তিনি তার উল্লেখ করে আমাদের লজ্জায় ফেলেন। এর ফলে আমরা সব সময় লক্ষ্য রাখতাম কোন অপচয় আমাদের হাতে না হয়। অন্যান্য ভাই-বোনদের চেয়ে আচার্য্যদেব বাল্যকালে মায়ের একটু বেশী প্রিয় ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় মায়ের আঁচল ধরেই থাকতেন। তাই সংসার কি করে করতে হয়, কি ভাবে ছোটদের খুঁটিনাটি ঘরের কাজ শেখাতে হয় এ তত্ত্ব তিনি ভাল ভাবেই শিখেছিলেন। আচার্য্যদেবকে দেখেছি, চিরকাল তিনি দু'বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর একটা করে পাণ খেতেন। আচার্য্যদেব বলতেন, এ অভ্যাসও তিনি মায়ের কাছেই পেয়েছিলেন।

যে কেউ একবার আচার্য্যদেবের সঙ্গ লাভ করেছে সেই আচার্য্যদেবের স্নেহকোমল হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। স্নেহভাজন যারা তাদের কোন বিপদের সংবাদ শুনলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন, এ কথাও অনেকে জানেন। কিন্তু অতি সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে তিনি এমন সব কাণ্ড করে বসতেন যে, শুনলে অবাক হতে হয়। আমি এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। একবার আচার্য্যদেবের সঙ্গে আমি বাঙ্গালোরে যাচ্ছিলাম—আচার্য্যদেব চলেছেন সায়েন্স ইনষ্টিটিউটের একটা সভায় যোগ দিতে এবং আমি চলেছি তাঁর সঙ্গে তাঁর সেবক হিসাবে! বিকেল ৬টায় মান্দ্রাজ মেলে আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল। কলকাতা থেকে ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জিও চলেছেন বাঙ্গালোরের সভায় যোগ দিতে। তিনি ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে আর আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে। আমাদের সঙ্গে আচার্য্যদেবের বাক্সে বই-খাতা—ট্রেণে এবং বাঙ্গালোরে পড়তে হবে। আর একটা বেতের বাস্কেটের মধ্যে রয়েছে পথের খাবার। রাত্রের খাবার আমরা তৈরী করেই নিয়েছি, শুধু রাত্রের কেন স্বল্পাহারী আচার্য্যদেবের পথের খাবার সবই ছিল। তবে আমার খাবার পথে কিনতে হবে। রাত্রে আমরা যথাসময়ে খাবার খেলাম। পরদিন সকালে উঠেই আচার্য্যদেব বললেন, "তোমার দুপুরের খাবার যোগাড় করতে হবে। গার্ডকে বলে দিলে যে কোন বড় ষ্টেশনের হোটেল থেকে ট্রেণের মধ্যেই খাবার দিয়ে যাবে।" যা হোক তখনকার মত খাবার প্রশ্ন চাপা পড়ল। পথে আমি তাঁর কাছে সেক্সপিয়ার পড়ে যেতে লাগলাম আর তিনি শুনতে লাগলেন। পড়া শেষ হল বেলা প্রায় আটটায়। তখন কোন একটা বড় ষ্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়িয়েছে। আচার্য্যদেব প্লাটফরমে নেমে পায়চারী করছেন, ডাক্তার মুখার্জ্জিও প্লাটফরমে নেমে এলেন এবং আচার্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে লাগলেন। প্লাটফরমে নেমেই আচার্য্যদেব ডাক্তার মুখার্জ্জিকে বললেন আমার খাবার ব্যবস্থা করতে। গার্ডকে দেখে আমার সামনেই খাবার কথা বলে দেওয়া হল এবং যথাসময়ে যথাস্থানে খাবার পেলাম।

বেলা প্রায় দেড়টায় আমরা ওয়ালটেয়ার ছাড়তেই আচার্য্যদেব বললেন, "তোমার রাত্রের খাবার ব্যবস্থা করবার জন্য গার্ডকে বলে দাও।" গাড়ী তখন চলছে, বললাম, "আচ্ছা।" কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আচার্য্যদেব বললেন, খাবার দেওয়ার কথা ডাঃ মুখার্জ্জিকে বলে এস—তিনি সব ব্যবস্থা করবেন। ইতিমধ্যে কিন্তু গার্ডকে আমি বলে দিয়েছি রাত্রের খাবারের কথা। সে কথা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, দেখ বাপু, আমার কি, আমার খাবার ত দরকার হবে না, খাবার না পেলে তোমাকেই উপোসী থাকতে হবে। যথারীতি সেক্সপিয়ার পড়ে তাঁকে শোনাচ্ছি, হঠাৎ আচার্য্যদেব বললেন, "গার্ডকে ত খাবার কথা বলেছই, একবার ডাক্তার মুখার্জ্জিকেও না হয় বলে এস। কি জানি কিছু গোলমাল হলে তিনি যা হোক একটা ব্যবস্থা করবেনই, নইলে তোমাকে উপোস করতে হবে—জান ত আমাদের দেশে একটা কথা আছে 'রাত উপোসে হাতীও শুকিয়ে মশা হয়ে যায়।" এবারে আমি একটু রাগ করেই বললাম, "ডাক্তার মুখার্জ্জিকে বলে কি হবে? গার্ডকে ত বলেই দিয়েছি।" আচার্য্যদেব বললেন, "দেখ অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য কখনও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে নেই। সব সময় মনে রাখবে ভুল-ভ্রান্তি হলে তোমাকেই অসুবিধায় পড়তে হবে। নিজে যখন সংসার করবে তখন চেষ্টা করো যাতে আবশ্যক জিনিষ সব দুই প্রস্থ রাখতে পার! একটা যদি নষ্ট হয় তবে অন্ততঃ অন্যটা দিয়ে কাজ চালাতে পারো। এই জন্যই আমি বলি গার্ডকে খাবার কথা বলেছ—বলেছ, শ্যামাপ্রসাদকেও বলে এসো। তাহলে আর যাই হোক রাতে উপোস দিতে হবে না।"

হয়তো আচার্য্যদেব আমার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝেছিলেন যে, এই সামান্য কথার জন্যে আমি ডাঃ মুখার্জ্জির কাছে যেতে নারাজ। তিনি হেসে বললেন, "তুমি আবার যে লাজুক!"

সাড়ে তিনটে কি চারটের সময় গাড়ী এসে দাঁড়াল পিঠাপুরম্ ষ্টেশনে। আচার্য্যদেব প্লাটফরমে নেমে গুটি-গুটি ডাঃ মুখার্জ্জির কামরার দিকে রওনা হলেন। আমি আমার খাবার কথা ডাঃ মুখার্জ্জিকে বললাম না দেখে তিনি নিজেই ডাঃ মুখার্জ্জিকে বলতে চললেন—আমি বুঝলাম। আচার্য্যদেব গাড়ী থেকে নেমে দু'-চার পা যেতেই হঠাৎ হুইসিল দিয়ে গাড়ী দিল ছেড়ে। ট্রেণের ভিতর আমি একা, আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশমত সেক্সপিয়ার থেকে কি একটা যেন নোট লিখছি। গাড়ী ছাড়তেই ব্যাকুল হয়ে প্লাটফরমের দিকে তাকালাম —যা দেখলাম, তাতে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। দেখি, আচার্য্যদেব দৌড়ে এসে গাড়ীর দরজার হাতল ধরে ঝুলছেন। গাড়ী আস্তে আস্তে চলছে। আমি দৌড়ে এসে দরজা খুলে দু'হাতে আচার্য্যদেবকে টেনে ধরলাম। প্লাটফরমে লোকজন একটা হল্লার সৃষ্টি করেছে। গাড়ী অবশ্য থেমে গেল এবং গাড়ী থামতেই ডাঃ মুখার্জ্জি হন্তদন্ত হয়ে আমাদের কামরায় এসে উঠলেন।

আচার্য্যদেব গাড়ীতে উঠে বসলেন। ডাঃ মুখার্জ্জি এসে অনুযোগের সুরে বললেন, "এ আপনি কি করছিলেন! এমন কখনো করে?" উত্তরে আচার্য্যদেব বললেন, "জান, হাতল ধরে রেলে যাওয়া—ও আমি খুব পারি। প্রায় ২৫ বছর আগে একবার পণ্ডিত মালব্যের সঙ্গে যেতে আমি প্রায় এক ষ্টেশন পথ গাড়ীর হাতল ধরে গিয়েছিলাম।" এই সব বলে তিনি আমাদের বোঝাতে চাইলেন যে ব্যাপারটা মোটেই গুরুতর কিছু নয়।

এমনি স্নেহান্ধ ছিলেন আচার্য্যদেব। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের তিরোধানে বঙ্গভূমি যে অমূল্য রত্ন হারাল তার জন্য সমস্ত দেশ আজ শোকাহত, কিন্তু আমরা হারিয়েছি—আরও কিছু বেশী! আচার্য্যদেবের প্রশান্ত নয়নের স্নেহার্দ্র দৃষ্টি আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত্তের প্রতিটি কার্য্যকে এক দিন সার্থক করে রেখেছিল. আজ আমরা তা থেকে বঞ্চিত হলাম! শ্রীভবেশচন্দ্র রায়

শেষ আশ্রয়

[উপন্যাস]

১

নিজের শয়ন-কক্ষে বসিয়া নিবারণ চা খাইতেছিল। নিবারণের অবশ্য শয়ন-কক্ষ, উপবেশন-কক্ষ বলিয়া আলাদা কিছু নাই; তার প্রয়োজনও হয় না। বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা অল্প; দু'-চার জন যা আছে, নিবারণের দর্শন-লাভের জন্য কেহ তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসে না। দৈবাৎ কেহ আসিলেও নিবারণ তাহাকে শয়ন-কক্ষে আনিয়া বসায়। কক্ষটি স্বল্প-পরিসর, স্বল্পালোকিত। বায়ু, আলো এবং নিবারণের নিজের আগমন ও নির্গমনের জন্য বাহিরের দিকে দুইটি জানালা ও একটি দরজার ব্যবস্থা আছে। জানালা দু'টি সকাল সাতটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। কারণ, বায়ু ও আলোর প্রতি নিবারণের নিরাসক্তি নহে, পাশের বাড়ীর প্রতিবেশি-প্রবরের প্রবল আপত্তি। নিবারণের ঘরের জানালা দুইটির সামনা-সামনি প্রতিবেশীর রান্নাঘরের জানালা। সেখানে প্রতিবেশি-পত্নী রন্ধন-কার্য্যে সারাদিন ও অর্দ্ধেক রাত্রি অতিবাহিত করেন। প্রতিবেশি-পত্নীর বয়স চল্লিশের কোঠায় পড়িয়াছে, দেহে মেদের এমনই প্রাচুর্য্য যে সেই পুরু মেদাস্তরণ ভেদ করিয়া হৃদয় বিঁধিবার মত তীক্ষ্ণ শর স্বয়ং মদনদেবের তূণেও বোধ হয় নাই, তবু জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ নিবারণের ঘোলাটে চোখের নিরীহ অহিংস দৃষ্টিকেও তাঁর স্বামীর ভয়! নিবারণের অসুবিধা হয়, কষ্ট হয়, অন্ধকার ঘরের বদ্ধ বাতাসে হাঁপ ধরে, কাজেই সুযোগ পাইলেই সে টো-টো করিয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

অবশ্য কষ্ট হইবার কথা নহে নিবারণের। পল্লীগ্রামের নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে। সারা জীবনটা কলিকাতায় দেশী সওদাগরী আফিসের একতলার অন্ধকার ঘরে, দিনের বেলায় আলো জ্বালাইয়া বেলা দশটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত কলম পিষিয়াছে! এঁদো গলির মধ্যে কোম্পানির আমলে তৈয়ারী চুণ-বালি-খসা ভাঙ্গা বাড়ীর একতলার ঘরে ভ্যাপসা অন্ধকারে নড়বড়ে খাটে, চটচটে ময়লা বিছানায় শুইয়া জানালার পাশে আবর্জ্জনা-স্তূপের পূতি গন্ধ-ভরা বিষাক্ত হাওয়ায় নিশ্বাস টানিয়া টানিয়া সারা রাত্রি ঘুমাইয়াছে। সেই নিবারণের এ বাড়ীতে কষ্ট!

মাঝারি আয়তনের দোতলা বাড়ী—সদ্য-নির্ম্মিত, ঝকঝকে তকতকে। প্রত্যেক তলায় পাঁচখানা করিয়া কুঠরী—মাঝখানে বড় হল—দুই পার্শ্বে দুইটা করিয়া কুঠরী। একতলার হল-ঘরটি ড্রয়িং-রুম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দামী-দামী হাল-ফ্যাসানী কৌচ-কেদারায় সোফা-সেটী, তেপায়া ও আলমারীতে, নামজাদা দেশী ও বিলাতী শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং গৃহস্বামীর (নিবারণের পুত্র) নিজের ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ফটোতে, দেশী-বিলাতী কারিগরদের তৈয়ারী সুন্দর-সুন্দর নানা রকমের শিল্পকার্য্যে, কত কি সৌখীন টুকি-টাকি জিনিষে—ঘরটি সুসজ্জিত। সে ঘরে নিবারণের প্রবেশ নিষেধ। দৃষ্টি-হীন মানুষ, চলিতে বসিতে কোথায় কি অঘটন ঘটাইয়া বসিবে!

নিবারণ নিজেও সাহস করে না। জীবনে এ সব জিনিষের সংস্পর্শে সে কোন দিন আসে নাই, অনেক জিনিষের নাম পর্য্যন্ত জানে না, দূর হইতে বিস্ময়-বিমূঢ় চোখে চাহিয়া-চাহিয়া দেখে। এক-তলার বাকী চারটি ঘর আয়তনে ছোট, তবে বাসের অযোগ্য নহে, অন্ততঃ নিবারণের মত লোকের পক্ষে। ঘরগুলির একটিতে আফিস—নিবারণ-পুত্র সেখানে বসিয়া কাজ করে; একটিতে থাকে ঝি, একটি সংসারের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়; বাকীটিতে থাকে নিবারণ। অবশ্য নেহাৎ একলা থাকিতে হয় না তাহাকে, আর এক জন 'রুম-মেট' আছে—পাড়ার বেওয়ারিশ কুকুর জিমি—নিবারণের মতই নিষ্কর্ম্মা, নিষ্প্রয়োজনীয়; নিবারণের মতই শৃঙ্খল-মুক্ত। সারাদিন টো-টো করিয়া, কখনও একলা, কখনও নিবারণের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়, যা' জোটে খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, রাত্রে নিবারণের খাটের নীচে শুইয়া থাকে। নিবারণ আপত্তি তো করেই না, বরং আপ্যায়ন করে। রাত্রে নিজের বরাদ্দ আটখানা রুটীর দু'খানা খাইতে দেয় তাহাকে—বরাদ্দ পোয়া-খানেক দুধেরও খানিকটা দেয়। এ বাড়ীতে একমাত্র জিমির সঙ্গেই নিবারণের যেন একটি যোগসূত্র আছে—রক্তের নয়, রিক্ততার। সে যোগসূত্র বাহিরের লোকের দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। কাজেই—নাসিকা তাহাদের কুঞ্চিত হইয়া ওঠে। নিবারণের আচার-হীন আচরণে ঝি-চাকর-মহলেও বিরুদ্ধ সমালোচনা গুঞ্জিত হয়। গৃহকর্ত্রীর খাস দাসী ক্ষান্তমণি—বাপের বাড়ী হইতে আমদানী, আদরিণী—সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলে—"তোমরা দ্যাখো ভালো করে! দিদিমণির দোষ দাও যে সব! নিজের শ্বশুরকে নীচের তলায় নির্ব্বাসন দেয় কি লোকে সাধে! ঐ রীতের জন্যে! কেমন বংশ! কেমন শিক্ষা-দীক্ষা! দিদিমণির কি এদের ঘরে পড়বার কথা! নেহাৎ জামাইবাবুর মতন ছেলেকে দেখে দেওয়া! না হলে যে-বাড়ীর মেয়ে দিদিমণি—এদের ঘরে পা ধুলেও ওদের মাথা হেঁট হয়!"

সত্য কথা! অজ পাড়া-গাঁয়ের অখ্যাত-বংশ-জাত দেশী-সওদাগরী আফিসের স্বল্প-বেতনভোগী কেরাণী নিবারণ মিত্রের ঘরে খাস কলিকাতা-নিবাসী হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র-কিশোর ঘোষ মহাশয়ের প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যা পুত্রবধূ হইয়া আসিবে—এ ভাগ্যলিপি এক বিধাতা পুরুষ ছাড়া আর কেহ কোন দিন কল্পনা করিয়াছিল কি? ইহার একমাত্র উত্তর—না-না-না; যদি কেহ করিয়া থাকে সে বাতুল উন্মাদ; উন্মাদাশ্রমের বাহিরে তাহাকে রাখা জনসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক।

তবে এ অঘটন ঘটিল কি করিয়া? ক্ষান্তমণি বলে—অবশ্য ঝি-চাকর-মহলে—"মুখপোড়া বিধাতার এক-চোখোমী! না হ'লে রাজার ঝিয়ারী ভিখারীর ঘরে দাসী হয়!" বীরেন্দ্র-কন্যা বিভাবতী বলে—অবশ্য স্বামীর উপর রাগ বা অভিমান হইলে—"বাবার একচোখোমী। বড় মেয়েকে, মেজ মেয়েকে রাজা-রাজড়ার ঘরে দিয়ে ছোট মেয়েকে দিলেন কি না এক অমানুষের হাতে!" বীরেন্দ্রকিশোর, ক্ষীণ-দৃষ্টি চোখে মোটা চসমা পরিয়া বলেন—"আমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি!"

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কনভোকেশন সভায় যে লম্বা কাহিল শ্যাম-বর্ণের ছেলেটি বি-এ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে সসম্মানে কৃতকার্য্য ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্বর্ণ-পদকটি পুরস্কার লইয়া চলিয়া গেল, বীরেন্দ্রকিশোর তাহার পাছু লইলেন। অনেক রাস্তা ঘুরিয়া যে গলির সামনে হাজির হইলেন সেখানে তাঁহার গাড়ী আর চলিল না।

কাজেই ড্রাইভারকে পাঠাইয়া ছেলেটির অভিভাবকের সম্বন্ধে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। পরের দিনই বীরেন্দ্র ছেলেটির বাবা নিবারণকে তাহার আফিসে পাকড়াও করিলেন। আফিসের বড়-বাবু বীরেন্দ্রের অনুগত ব্যক্তি—তাহারই মধ্যস্থতায় বিবাহের কথা-বার্ত্তা পাকা হইল; বিবাহও হইয়া গেল। নিবারণের ছেলের বিবাহে পণের টাকায় দেশে পৈতৃক মাটির কোঠা ভাঙ্গিয়া পাকা এক-তলা বাড়ী তুলিবার স্বপ্ন শূন্যে মিলাইয়া গেল! কিন্তু নিবারণ-পুত্র নীরদ গোলোক-ধাম-খেলার ঘুঁটীর মত খেলোয়াড়ের এক চালেই উত্তীর্ণ হইল নরক হতে স্বর্গে—নিবারণের মেশের অন্ধকার স্যাঁৎসেতে অপরিচ্ছন্ন ঘর হইতে বীরেন্দ্রের বিরাট রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকার আলোকোজ্জ্বল বায়ু-বীজিত সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে—পার্শ্বে দেবকন্যা তুল্য বিভাময়ী বিভাবতী! নিবারণের জন্য বিরহ-বেদনা নীরদের মন হইতে দিন কয়েকের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল।

বৎসর দুই পরে নীরদ এম, এ পাশ করিল; তার পর প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পাশ করিয়া হাকিম হইল। বীরেন্দ্রকিশোর টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বন্ধু-বান্ধবদের ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছে নিজের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির তারিফ করিলেন।

২

বৎসর কয়েক পরে নিবারণের কর্ম্ম-শৃঙ্খল মুক্ত হইল। যে শৃঙ্খল চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নিবারণের সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বক্ষণ জড়াইয়া ছিল, চলিতে ফিরিতে যে শৃঙ্খল ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিত, একদা কর্ত্তৃপক্ষের এক কথায় তাহা খসিয়া পড়িল। কর্ত্তৃপক্ষ বলিল, 'নিবারণ, তুমি বুড়া হইয়াছ—তোমাকে বিদায় লইতে হইবে অর্থাৎ পিষিয়া-পিষিয়া তোমার জীবনের সমস্ত রস নিষ্কাশন করিয়া লইয়াছি, হে ছিবড়া নিবারণ, তোমাতে আর আমার প্রয়োজন নাই।' মালিকের মাংসল, মসৃণ মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া ছিল নিবারণ; তার পর টলিতে টলিতে বাহিরে আসিল।

পরদিন হইতে নিবারণের দিন আর কাটিতে চাহে নাই। পিঞ্জর-মুক্ত পাখীর মত সারাদিন আফিস-পাড়াতেই ঘুরিয়া ফিরিয়াছিল—আফিসের পাশ দিয়া বারংবার হাঁটাহাঁটি করিয়াছিল, জানালার ভিতর দিয়া তাহার বহুদিন-ব্যবহৃত জীর্ণ-মলিন চেয়ার; টেবিল ও টেবিলের উপরস্থিত কাগজ-পত্রগুলির দিকে মমতার সহিত তাকাইয়াছিল; তার পর রাত্রে মেশে ফিরিয়া যা' হোক কিছু মুখে গুঁজিয়া নিজের মলিন বিছানাটিতে শুইয়া পড়িয়া আগামী কর্ম্মহীন, ক্লান্তিহীন, সঙ্গিহীন জীবনের বাকী দিনগুলি কেমন করিয়া কাটাইবে ভাবিয়া সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছিল।

কর্ম্মভার-মুক্ত জীবনের নূতন ভার-কেন্দ্র আয়ত্ত করিতে নিবারণের দিন কয়েক লাগিল। আফিসের বিরহ ফিকা হইয়া আসিল। বড়-বাবুর পাহারা-বিহীন অবসর-বহুল আলস্যময় দিনগুলি ভালোই লাগিতে লাগিল। তবে সে দিন মালিকের মুখের সেই কথাটি সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না—নিবারণ তুমি বুড়া হইয়াছ। সতেজ সবুজ যৌবন, পুরন্ত পক্ব প্রৌঢ়ত্ব একে একে পার হইয়া গিয়া জীবনে পচ, ধরিতে সুরু করিয়াছে; এর পর বৃন্ত হইতে ঝরিয়া পড়িবার সময় আগত-প্রায়। কিন্তু কবে, কত দূরে সেই দিন—নিশ্চিত করিয়া জানিবার উপায় নাই! অফিস হইতে আজীবন একনিষ্ঠ প্রভুভক্তির পারিতোষিক-স্বরূপ হাজার খানেক টাকা সে পাইয়াছে—তাহাতে খুব হিসাব করিয়া চলিলেও চার-পাঁচ বৎসরের বেশী চলিবে না। তার পরও যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে কি করিবে সে? তা'ছাড়া অসুখ-বিসুখ আছে, বিপদ-আপদ আছে, সর্ব্বোপরি পৃথিবী হইতে বিদায়-কালীন সেই অনিবার্য্য অসহায় অবস্থা আছে! কে সেবা করিবে? মুখে কে এক ফোঁটা জল দিবে? কে তাহার মৃতদেহের সদ্গতি করিবে? কাজেই ছেলের কাছে আশ্রয় লওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকিবে না তাহার! বিবাহের পর হইতে ছেলে কোন সম্পর্ক রাখে নাই—তবু তাহার কাছে যাইতে লজ্জা নাই, দ্বিধা নাই নিবারণের। কিন্তু ছেলে ত একা নহে—সঙ্গে পুত্রবধূ আছে! বড় লোকের মেয়ে—বড় ঘরের মেয়ে। বিবাহের পর একবার মাত্র তাহাকে দেখিয়াছে। পুত্রবধূর কথায়-বার্ত্তায়, ভাবে-ভঙ্গীতে নিবারণের উপর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ফুটিয়া ওঠে নাই। নিবারণও মেয়েটিকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারে নাই। যে-মেয়ে তাহার একমাত্র পুত্রকে জন্মের মত কাড়িয়া লইয়াছে, তাহার কথা মনে হইলেই ঈর্ষার কাঁটা মনে বিঁধিয়াছে নিবারণের। কাজেই সেই পুত্রবধূর দ্বারপ্রান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে আশ্রয়-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে তাহার মন কিছুতেই রাজী হইতেছিল না। অবশেষে সকলের পরামর্শে নিবারণ নিজ গ্রামে যাওয়া স্থির করিল। শস্তা-গণ্ডার জায়গা, আত্মীয়-স্বজনও আছে—দু'-চার পয়সা পাইলে সেবা-শুশ্রূষা করিবে! তা' ছাড়া গ্রামের চাষা-ভুষোদের মধ্যে ঐ টাকাটা তেজারতীতে খাটাইতে পারিলে সুদের টাকাতেই নিজের খরচা চলিয়া যাইবে।

নিবারণ দেশে গেল। তাহার নিজের ঘর-বাড়ী কবে ভূমিশায়ী হইয়াছিল; কাজেই খুড়তুতো ভাইয়ের বাড়ীতে উঠিল। নিবারণ আজীবন কলিকাতা-বাসী, তার উপর এক জন জল-জীয়ন্ত হাকিমের জন্মদাতা! কাজেই ভাই আদর-আপ্যায়নের বান ডাকাইয়া দিল যেন স্বয়ং লাট সাহেব খেয়াল-বশে গরীবের কুঁড়েতে পা দিয়াছেন, এমনি ভাব! নিবারণ হকচকিয়া গেল! সঙ্কোচে, সন্দেহে, শঙ্কায় শুকাইয়া উঠিল। মতলব কি ইহার? তাহার ভাঙ্গা তোরঙ্গের মধ্যে খামের মধ্যে বন্ধকরা হাজার টাকার নোটটির সন্ধান পাইয়াছে না কি! আটাত্তর বৎসরের বুড়ী খুড়িমা যাট বৎসরের বুড়া নিবারণকে কোলের কাছে বসাইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণে তাহার মাথার চুল স্যাঁতসেঁতে করিয়া তুলিল! বর্ষণটা অবশ্য নিবারণের জন্য নহে—নিবারণের পরলোকগতা স্ত্রীর উদ্দেশে। আহা, হতভাগী যদি বাঁচিয়া থাকিত! স্ত্রীর কথাটা নিবারণ একদম ভুলিয়া গিয়াছিল—ঢ্যাঙ্গা কাহিল কালো মুখরা মেয়ে; মুখের চোটে হৃৎকম্প হইত! পাণ হইতে চুণ খসিলে নাকানি-চোবানি খাওয়াইত তাহাকে। তাহার কথা সহজে নিবারণের মনে পড়ে না। একবার মনে পড়িয়াছিল নীরদের বিবাহের সময়—নিজের থেকে নয়! সবাই খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া মনে পড়াইয়া দিয়াছিল। আর আজ মনে পড়িল খুড়িমায়ের অশ্রুজলে। স্ত্রীর স্মৃতির উপর এত দিন ধরিয়া যে বিস্মৃতির বালু জমিয়াছিল, খুড়িমায়ের অশ্রুজল তাহা কোথায় ভাসাইয়া দিল। অস্বস্তি বোধ করিল নিবারণ।

বৈঠক-খানায় একা থাকিতে হয় তাহাকে। পাড়াগাঁয়ে সারা রাত্রি আলো জ্বালিয়া রাখার রেওয়াজ নাই, একটা লম্প কাছে থাকে, আবশ্যক হইলে জ্বালিতে হয়। অন্ধকার ঘরে পরলোকগতা পত্নী যদি

স্বামী সন্দর্শনে আসিয়া হাজির হয়, তাহা হইলে ? কথাটা চাপা দিবার জন্ত নিবারণ কহিল—"সে সতীলক্ষ্মীর কথা থাক্ খুড়িমা ! স্বর্গে আছে, ভালই আছে ! মিছিমিছি দুখের সংসারে তাকে টেনে এনে কি লাভ, বলো !"

খুড়িমা বুঝিল ; কহিল—"ঠিক বলেছিস্, বাছা ! দুখের সংসারই বটে ! বাঁচতে ইচ্ছে হয় না এক ফোঁটাও। সে সতী ভাগ্যিমানী —সাত-সকালে চলে গিয়ে বেঁচেছে ! কবে যে যেতে পাববো !" বলিয়া দীর্ঘজীবনের দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিবারণের অলক্ষ্যে নাক ও কাণ মুচড়াইয়া মরণের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের দেহকে সুরক্ষিত করিয়া তুলিল।

কথাটার মোড় ঘুরাইয়া খুড়ী জিজ্ঞাসা করিল—"বৌমা কেমন হয়েছে ? একবার দেখালিনে, বাছা ! বড় মানুষের মেয়ে শুনেছি, ভক্তি-ছেদ্দা করে তো ?"

নিবারণ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, খুব ! তাহাদের কাছেই এত দিন ছিল সে ! আসিতে দিতে রাজী হয় নাই কিছুতেই ! তবু— আপনার লোকদের না দেখিয়া থাকিতে পারে নাই সে ! সকলের কথা ঠেলিয়া জোর করিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

যে এ-কথা শুনিল, সেই নিবারণকে ধন্য-ধন্য করিল। সাধু নিবারণ ! ম্যালেরিয়া-জীর্ণ, ঝোপ-ঝাপ-খানা-ডোবাকীর্ণ পল্লীর জন্য প্রাণ কাঁদিয়াছে তাহার ! দেশ-প্রেমিক নিবারণ ! হাকিম ছেলের ঘরের পোলাও-কালিয়া ফেলিয়া গরীবের ঘরে খুদ্-কুঁড়া খাইতে আসিয়াছে সে ! মহাপ্রাণ নিবারণ ! পাড়ায়-পাড়ায়, ঘরে-ঘরে নিমন্ত্রণের ধূম পড়িয়া গেল নিবারণের। নিবারণ যদি গ্রামেই ফিরিয়াছে, তবে একটিবার করিয়া প্রত্যেক গৃহে পায়ের ধূলা তাহাকে দিতেই হইবে।

নিবারণ কিন্তু ভিতরে-ভিতরে অস্থির হইয়া উঠিল। এত আদর-আপ্যায়ন জীবনে অবশ্য কখনও পায় নাই সে ! তবু পার্ব্বত্য নদীর বন্যার মত ইহা যে ক্ষণস্থায়ী, তাহাও সে বুঝিতে পারে। কারণ, যাহারাই নিমন্ত্রণ করিতেছে—তাহারাই খাওয়া-দাওয়ার পর তাহার দুই হাত জাপটাইয়া ধরিয়া এক একটি করিয়া আরজি পেশ করিতেছে বেকার ছেলে বা ভাইয়ের চাকরীর, কন্যাদায়ে সাহায্যের অথবা স্বল্প সুদে ঋণের জন্য ! আর যে-রাখাল তাহাকে গুরুর আদরে রাখিয়াছে, সে মাটিতে হাঁটিলে তাহার বুকে বাজে—এমনি দরদ—তাহার আরজিটা গুরুতর ধরণের—নিবারণের পৈতৃক ভিটাটি তাহাকে লেখা-পড়া করিয়া দিতে হইবে ! রাখালের ছেলে-মেয়ে অনেকগুলি—ছোট বাড়ীটিতে তাহার কুলাইতেছে না—নিবারণের পোড়ো পৈতৃক ভিটাতে খান-দুই ঘর তুলিতে পারিলে তাহার খুব সুরাহা হইবে। নিবারণ ছেলের দোহাই দিয়া আপত্তি তুলিয়াছিল কিন্তু রাখাল তাহা কাণে না তুলিয়া বলিয়াছে—"হাকিম ছেলে তোমার—সে কি আর পাড়াগাঁয়ে পা দেবে ! বৌমাও তো খাস কলকাতার মেয়ে—বালীগঞ্জ ছাড়া আর কোথাও বাড়ী করবে না তারা।"

নিবারণ জানে—কিছুই করিবার সাধ্য নাই তাহার, ইচ্ছাও নাই ; ঠিক ভারতের বড় লাটের অবস্থা ! তবু যত দিন স্তোকবাক্যে ইহাদের ভুলাইয়া রাখিতে পারা যায়, তত দিনই সুবিধা।

কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোক আর যাহাই হোক ফাঁকা কথায় ভুলিবার পাত্র নয়। তাহারা নিবারণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল—চিঠি লেখা হইয়াছে কি ? জবাব কই ? সকলে এক একটি পোষ্টকার্ড আনিয়া কহিল—আমাদের সামনে বসিয়া লেখো—"আমরা নিজেরা চিঠি ডাক-বাক্সে ফেলিব।"

নিবারণ তাহাদের এই বলিয়া নিরস্ত করিল যে—এত ব্যস্ত হইলে চলিবে না। একটা জেলার হাকিম—লাট সাহেবের সঙ্গে হরদম্ চিঠি লেখা-লেখি—সাধারণ চিঠি লেখার সময় করা শক্ত। তবে ছেলে তাহার পিতৃগতপ্রাণ—স্বয়ং দশরথ পর্য্যন্ত অমন ছেলে পাইলে বর্ত্তিয়া যাইতেন। অতএব মাভৈঃ ! চিঠির জবাব যথাসময়ে আসিবেই।

কিন্তু রাখাল কোন কথায় কাণ দিল না। তাহার সেই এক কথা—"কবে জেলায় যাবে বলো ?"

দিনের পর দিন ফেলিয়া রাখালকে নিবারণ কোন না কোন অছিলায় এড়াইতে লাগিল। শেষে এক দিন রাখাল গরুর গাড়ী বায়না-পত্র করিয়া আসিয়া জানাইয়া দিল—"কাল ভোর ভোর বেরোতে হবে। কালই কোন প্রকারে কাজ সারা চাই—না হলে সামনে পূজোর ছুটী—এক মাস পরে কোর্ট খুলবে, যা' ম্যালেরিয়ার ঘটা, তত দিনে কে বাঁচবে, কে মরবে বলা যায় না !"

নিবারণ বলিল—"ভালোই তো ! যদি চোখ বুজি—তোমার এত হাঙ্গামার দরকার হবে না।"

রাখাল ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"তোমার ছেলে যদি না দিতে চায়—তবে ?"

নিবারণ কহিল—"তুমিই তো বলছিলে—সে দেশে আসবে না !"

রাখাল কহিল—"তা তো বলেছি আর এখনও বলছি—তবু এক জন গরীব আত্মীয়ের একটা সামান্য উপকার কি কেউ সহজে করতে চায় আজকাল ?" বলিয়া নিবারণের দিকে চাহিয়া মুখের ও চোখের একটি বিশেষ ইঙ্গিতসূচক ভঙ্গী করিল।

কিন্তু ভগবান্ নিবারণকে রক্ষা করিলেন ! সে দিন সন্ধ্যার পর হইতে নিবারণের গা-হাত-পা মাথা ভার-ভার ঠেকিতে লাগিল। রাখাল অপ্রসন্নের সহিত কহিল—"ও কিছু নয়—দিন কয়েক খাওয়ার অত্যাচার হচ্ছে। রাতটা লঙ্ঘন দাও।"

কিন্তু মাঝ-রাত্রি হইতে স্পষ্ট জ্বর আসিল ও শেষ রাত্রে গাড়োয়ান আসিয়া যখন হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল, তখন নিবারণ প্রবল জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন। যাওয়া অগত্যা বন্ধ করিতে হইল। রাখালের অবশ্য ইচ্ছা ছিল না কিন্তু গ্রামের লোক বাধা দিল। জ্বর ছাড়িল না নিবারণের। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার আসিয়া ফিভার মিক্সচার ও কুইনিন গিলাইল, কিন্তু জ্বর বেপরোয়া বাড়িয়া চলিল। শেষে ডাক্তার বলিল—কেশ গুরুতর টাইফয়েড্ ! অনেক টাকার মামলা !

নিবারণের চেতনা তখনও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল। রাখাল কাণের কাছে মুখ আনিয়া হাঁকিয়া কহিল—দাদা, শুনছ ? ভারী শক্ত রোগ তোমার। অনেক টাকা খরচ ; আমার অবস্থা জানো তো ! খেতে-পরতেই কুলোয় না ; তা' টাকা-কড়ি কিছু আছে সঙ্গে ?"

গ্রামের লোক চারি দিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ডাক্তার পাশে বসিয়াছিলেন ; নিবারণ বিহ্বল-নয়নে ডাক্তার ও লোকগুলার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল —কিছুই নাই।

৩

নিবারণকে জেলা সহরের সদর হাসপাতালে পাঠানো হইল। প্রায় এক মাস ভুগিয়া নিবারণ সারিয়া উঠিল। অস্থি-চর্ম্ম-সার দেহ,

চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, মাথার চুলগুলা সব পাকিয়া গিয়াছে। সারাক্ষণ বিছানায় শুইয়া থাকে, এক একবার টলিতে টলিতে লাঠি ধরিয়া বারান্দায় আসিয়া বসে। ডাক্তার বাবুটি ভারী ভালো লোক—মাঝে মাঝে আসিয়া কাছে বসেন, জিজ্ঞাসা-বাদ করেন। এক দিন বলিলেন—"যাঁরা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা কি আপনার আত্মীয় ?"

নিবারণ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হঁ।"

ডাক্তার বাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"তাঁরা তো আর কেউ খবর নিলেন না!"

নিবারণ ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল—"কি জানি!"

ডাক্তার বাবু প্রশ্ন করিলেন—"আপনার নিকট-আত্মীয় কেউ নাই ?"

নিবারণ চুপ করিয়া থাকিল। রাখাল নিশ্চয়ই নীরদকে তাহার অসুখের খবর দিয়াছে; তবু সে একবারও খবর লয় নাই! নিজের ছেলে যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, দূর-আত্মীয়েরা যদি তাহার খোঁজ-খবর না লয় তো বলিবার কি আছে!

ডাক্তার বাবু আবার প্রশ্ন করিলেন—ছেলে-মেয়ে কেউ নেই আপনার ?

নিবারণ ঘাড় নাড়িয়া কহিল আছে—ছেলে!

পরিচয় সুরু হইল। ছেলের নাম-ধাম-কাম শুনিয়া ডাক্তার বাবু সবিস্ময়ে কহিলেন—"নীরদ আপনার ছেলে! আমার যে বিশেষ বন্ধু। একসঙ্গে এক জায়গায় অনেক দিন ছিলাম।"

আরও মাস খানেক পরে নিবারণ অনেকটা সবল হইয়া উঠিল; ডাক্তার বাবু তাহাকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন, এবং নীরদকে সমস্ত খবর সবিশেষ জানাইয়া ও নিবারণকে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দিলেন। জবাব আসিতে দেরী হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে নিবারণ তাহার বাক্স-বিছানা আনিবার জন্য গ্রামে গেল। তাহাকে দেখিয়াই রাখাল ও রাখাল-পত্নীর মুখ ভারী হইয়া উঠিল—যেন বাঁচিয়া উঠিয়া নিবারণ অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছে! খুড়িমা একটু উচ্ছ্বসিত হইবার চেষ্টা করিয়াই ছেলে-বৌয়ের থমথমে মুখ দেখিয়া সামলাইয়া লইল। নিবারণ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করছিলেন—আপনার ভাই তো আর খবর নিলেন না!"

রাখাল খ্যাঁক করিয়া উঠিল—"ডাক্তারের জিজ্ঞেসা করবার ভাবনা কি! ঘরশুদ্ধ যে কি ভোগান্তি যাচ্ছে দু'মাস—খবর তো কেউ রাখে না! বাড়ীর বেরালটার পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া। উল্টে-পাল্টে জ্বর। এই ক'দিন তো সব খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছি! না হলে জ্বরের ঘোরে তোমার নাম ধরে ভুল বকেছি কি না, জিজ্ঞেস্ করো গে গাঁয়ের সবাইকে।"

নিবারণ চাপিয়া গেল। এক দিন পরে কহিল—"তা আমি তো আর থাকতে পারবো না, ভাই। ছেলে যেতে লিখেছে। অসুখের সময়ই এসে নিয়ে যাবার খুব চেষ্টা করেছিল। তা ডাক্তার বাবু নীরদের বন্ধু কি না, ছাড়লেন না। বললেন—"আমি কি আর ওঁর ছেলে নই ? থাকলেই বা আমার এখানে—কোন ভাবনা নেই তোমার। অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে ডাক্তার বাবু তাকে ফেরত দেন—"

রাখাল বিশেষ উৎসাহ দেখাইল না। নীরদের উপর চটিয়াছিল সে। নিবারণের চিকিৎসার খরচ-হিসাবে কিছু টাকা চাহিয়া চিঠি লিখিয়াছিল—চিঠির জবাব পর্য্যন্ত নীরদ দেয় নাই। কহিল—"তা তোমার জিনিষ-পত্তর যেখানে রেখে গিয়েছিলে সেখানেই আছে, তোমার যাবার পর থেকেই তালা দেওয়া। নড়তেই পারিনি—খোঁজ-খবর রাখবো কি! তা' কিছুই খোয়া যায়নি বোধ হয়! গাঁয়ের চোর-গুলোর পর্য্যন্ত জ্বরে নড়বার ক্ষমতা নেই, চুরি করবে কে?"

বিকালবেলায় রাখাল গ্রামের কয়েক জন মাতব্বরকে ডাকিয়া আনিল। নিবারণ বিস্ময় প্রকাশ করিলে রাখাল কহিল—"না, দাদা! গাঁয়ের সকলের সামনেই দেখে শুনে নেওয়া ভালো। তখন যে বলবে, আমার এই ছিল, সেই ছিল, খোয়া গেছে, তা' চলবে না।"

সর্ব্ব-সমক্ষে তালা খোলা হইল। কোমরের ঘুন্সী হইতে চাবির রিং খুলিয়া নিবারণ তোরঙ্গ খুলিল; অল্প কয়েকখানা কাপড় জামা আলোয়ান মাটিতে নামাইল, তার পর তোরঙ্গের নীচে বিছানো খবরের কাগজের পাটের মধ্যে হাত চালাইয়াই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। অতিকষ্টে সামলাইয়া লইয়া সে কম্পিত হস্তে খবরের কাগজটা তুলিয়া ভাঁজ খুলিয়া, মেলিয়া ধরিল, ঝাড়িল; দুই চক্ষু যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়া দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া সমস্ত বাক্সের তলাটা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল; শেষে দুই হাতে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল।

সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করিল—"কিছু হারিয়েছে না কি ?"

নিবারণ জবাব দিল না। রাখাল কাছে আসিয়া ধাক্কা দিয়া কহিল—"কি হলো ? মাথা ঘুরছে না কি ?" সকলের দিকে চাহিয়া কহিল—"শরীর দুর্ব্বল তো! এখনও সারেনি বেশ। কেন যে কষ্ট করে আসা ? একটা চিঠি লিখলেই পাঠিয়ে দিতাম।" নিবারণের উদ্দেশে কহিল—"তা সব ঠিকঠাক মিলেছে তো ? আর মিলবে না-ই বা কেন! যেমনটি রেখে গিয়েছিলে, ঠিক তেমনিটি আছে—মশা-মাছি পর্য্যন্ত ঢোকেনি এ-ঘরে।"

এবার নিবারণ শুষ্ক কণ্ঠে কহিল—"খবরের কাগজের পাটের মধ্যে টাকা ছিল, পাচ্ছি না।"

সমস্বরে প্রশ্ন হইল—"টাকা ? কত টাকা ?"

নিবারণ ঢোক গিলিয়া কহিল, "হাজার টাকার এক-কিতে নোট।"

সকলে বিস্ময়াহত কণ্ঠে কহিল—"সত্যি!"

রাখাল ক্ষোভের সহিত কহিল—"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, দাদা! কোথায় ছিল তোমার টাকা ? সকলের সামনে নিজে মুখে বলে গেলে—এক-পয়সা নেই তোমার কাছে।" সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া রাখাল কহিল—"কি! বলেননি এ কথা। বাঁড়ুয্যে দাদা, আপনিও তো ছিলেন—বলুন এখন ?"

মনোহর বাঁড়ুয্যে গ্রামের মাতব্বরদের অগ্রগণ্য—পাড়ার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। সামনে আগাইয়া আসিয়া নিবারণকে কহিল—"সত্যি! আমাদের সকলের সামনে ও-রকম কথা বলেছিলে বটে।"

নিবারণ কহিল—"আমি মিথ্যে বলেছিলাম—"

রাখাল বাঁকা হাসি হাসিয়া শ্লেষের স্বরে কহিল—"তা' এখনও যে মিথ্যে বলছো না, তার প্রমাণ ?"

নিবারণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

রাখাল কহিল—"মরণের সামনে দাঁড়িয়ে যে মিথ্যে বলতে

পারে, তার কোন্ কথাটা লোকে বিশ্বাস করবে, বলো ?" সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল—"তোমার কাছে হাজার টাকা কেন—যদি হাজারটা পয়সাও থাকতো তা'হলে কি মেথর-চাঁড়ালের জল হাসপাতালে খেতে ?"

সকলে ঘাড় নাড়িয়া রাখালকে সমর্থন করিল। রাখাল উৎসাহিত হইয়া কহিল—"তোমার যে কত করেছি আমি, তা দেখেছে গাঁয়ের লোক। তার বদলে খুব কলঙ্ক চাপালে মাথায়। যেমন আপনার লোক বলে উপকার করতে গিয়েছিলাম, তার ফল হাতে হাতে পেয়ে গেলাম !"

গ্রামের লোকগুলি নির্ব্বাক্ নির্বিকার দাঁড়াইয়া রহিল। রাখাল উষ্মার সহিত কহিল—"কিন্তু এই হয়ে গেল— আর কারও জন্য কড়ে আঙুলটি পর্য্যন্ত নাড়বে না রাখাল মিত্তির।"

একে একে সকলে চলিয়া গেল। নিবারণ দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। তার পর জামা-কাপড়গুলি একে একে তোরঙ্গে তুলিয়া, খাটিয়াটার উপরে চিৎ হইয়া পড়িয়া দু'চোখের দৃষ্টি মেলিয়া বোধ করি সহায়-সম্বলহীন, নিঃসঙ্গ ধূসর ভবিষ্যৎকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল !

নিবারণ জেলা সহরে ফিরিয়া আসিল। নীরদের চিঠি আসিয়াছে। লিখিয়াছে—ডাক্তার-বাবু যেন একটি লোক সঙ্গে দিয়া নিবারণকে তাহার কাছে পৌঁছাইয়া দেন। সমস্ত খরচ নীরদ বহন করিবে। নীরদের আন্তরিকতাহীন আগ্রহ-লেশ-হীন নীরস মামুলি চিঠি পড়িয়া নিবারণ মরিতে না পারার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল।

ডাক্তার বাবু হাসপাতালের এক জন কম্পাউণ্ডারকে সঙ্গে দিয়া নিবারণকে পাঠাইয়া দিলেন। নিবারণ যথাসময়ে বাক্স-বিছানা সমেত নীরদের বাসায় পৌঁছিল। নীরদ মৌলিক আপ্যায়নের সহিত তাহাকে ঘরেও তুলিল, কিন্তু কি করিয়া যে তাহাকে লইয়া হাকিম-সমাজে নিজের মর্য্যাদা বজায় রাখিবে, ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সিল্কের পাঞ্জাবীর নীচে ফুটা গেঞ্জির মত যে অতীত জীবনকে সে অন্তরালে রাখিতে চায়, নিবারণ যেন তার জীবন্ত প্রতীক। নিম্ন-মধ্যবিত্ত-সুলভ তার চেহারা, পোষাক, আচার ও ব্যবহার। বিশেষ করিয়া নিবারণের কতকগুলি কদভ্যাস আছে! দাড়ি-গোঁফ কামানো ও চুল ছাঁটা সে অপছন্দ করে ; শীতের আমেজ দেখা দিতে না দিতে স্নান পরিত্যাগ করে এবং সারা শীতকাল সর্ব্বদা একটি ধূলি-ধূসর মোটা-মজবুত গরম কোট গায়ে চাপাইয়া ও গলায় কম্ফার্টার জড়াইয়া রাখে, যখন-তখন টানিয়া-টানিয়া সশব্দে কাশে, যেখানে-সেখানে থুথু ফেলে ; পাঁচ মিনিট অন্তর বিড়ি খায় এবং যেখানে বসে ও শোয়, তাহার চারি পাশ পোড়া বিড়িতে আচ্ছন্ন করিয়া তোলে। কোন অপরিচিত ভদ্র লোককে দেখিলেই গা ঘেঁষিয়া গিয়া আলাপ করে, ছেলের পদমর্য্যাদার পরিচয় দেয়। ভদ্রলোক যদি সিগারেট খান তো—আলাপ একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই সিগারেট চাহিয়া বসে! তার পর সিগারেট টানিতে টানিতে কেমন করিয়া যে সামান্য বেতনের কেরাণী হইয়াও সে তাহার একমাত্র ছেলেকে হাকিম করিতে পারিয়াছে—তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিতে থাকে।

নিবারণকে দোতলার একটা ঘরে স্থান দেওয়া হইল ; অনস্বীকার্য্য সম্পর্কের খাতিরে, এবং কতকটা লোকলজ্জার খাতিরেও বটে। বিভাবতী মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু প্রথম দিন কর্ত্তব্য-সারা হিসাবে শুষ্ক একটি প্রণাম করিয়াই আর শ্বশুরের কাছে ঘেঁষিল না। ঝি ক্ষান্তমণি কিন্তু চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী নয়, শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল—"কি চেহারা দিদিমণি, তোমার শ্বশুরের ! দেখে ভদ্র লোক বলে মনে হয় না ! ওর চেয়ে যে আমাদের বিশু সরকারও ঢের দেখতে ভালো !"

•

এক দিন নীরদের ছেলে-মেয়ে দু'টিকে কাছে পাইয়া নিবারণ তাহাদের আদর করিতে যাইবামাত্র ক্ষান্তমণি হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া ছোঁ মারিয়া—ছেলে-মেয়েদের তুলিয়া লইল এবং ঝঙ্কার দিয়া কহিল—"ও রকম করবেন না। ভালো লাগে না ওদের।"

নিবারণ অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জিত মুখে কহিল—"না—না—কিছু করিনি তো !"

তবু নিবারণের মনে নিশ্চিন্ততার সীমা রহিল না। অকূল সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে সে যেন তরীতে ঠাঁই পাইয়াছে! আর ভয় নাই, ভাবনা নাই! সক্ষম, শক্তিমান্ চালকের স্কন্ধে তাহার সমস্ত ভার চাপাইয়া জীবনের বাকী দিনগুলি নিরুদ্বেগে কাটাইয়া দিতে পারিবে।

কাটিলও দিন কয়েক। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ঘর, পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ও শয্যা। নিবারণের তোরঙ্গ ও বিছানার বাণ্ডিলটি নীচের তলার একটা ঘরে অন্তরিত হইয়াছিল। সুস্বাদু, স্বাস্থ্যকর আহার। নিবারণের হাড়ে মাংস গজাইতে সুরু করিল, চেহারায় চিক্কণতার আভাস দেখা দিল, অপরিচিত-সুলভ সঙ্কোচ ও জড়তা কাটিয়া মনটাও অনেকখানি হাল্‌কা হইয়া উঠিল।

ফলে এক দিন একটা কাণ্ড করিয়া বসিল নিবারণ।

অসুখের পর তাহার দুর্ব্বল দেহে বাতের আশ্রয় ঘটিয়াছিল—বিশেষ করিয়া ডান হাঁটুতে ও বাম বাহুমূলে। দিন দিন সন্ধিস্থল দুইটা পাথরের মত জমাট হইয়া উঠিতেছিল। হাত ও হাঁটু দুই-ই নাড়িতে পারিত না ; অসাবধানে কোন প্রকারে নাড়া লাগিলে আপাদ-মস্তক তীব্র বেদনায় ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিত। রাত্রে ঘুমাইতে পারিত না, সারারাত্রি ছটফট করিত। সে দিন সন্ধ্যার পরে ক্ষান্তমণি তাহার ঘরের সাম্‌নে দিয়া যাইতেছিল, নিবারণ তাহাকে ডাকিয়া সানুনয়ে কহিল—"ক্ষান্ত, আমার হাতটায় একটু সেঁক দিয়ে দেবে ?"

ক্ষান্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া কথাটা শুনিয়া চলিয়া গেল। ক্ষান্তমণি আগুন আনিতে গেল ভাবিয়া নিবারণ তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

ক্ষান্ত এ দিকে আগুন আনিবে কি, নিজেই রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। বড়লোকের বাড়ীর ঝি সে, অঙ্গসেবা যদি করিতেই হয় তো বড়লোকেরই করিবে। তাই বলিয়া নিবারণের! তা ছাড়া এই ভর সন্ধ্যায় এক জন মেয়েমানুষকে সেঁক দিতে ডাকা! নিবারণ কি ভাবে, তাহার এত বয়স হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে যখন-তখন ডাকায় দোষ নাই? বুড়া-বয়সে চোখের মাথা একেবারেই খাইয়াছে না কি নিবারণ? না, তাহার ভীমরতি ধরিয়াছে?

রাগে গসগস্ করিতে করিতে ক্ষান্তমণি বিভাবতীর কাছে গিয়া মুখে কাপড় চাপিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিভাবতী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"কি হলো তোর? ভর সন্ধ্যেবেলায় কাঁদতে বসলি কেন ?"

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসটা সামলাইয়া লইয়া ক্ষান্তমণি অশ্রুরুদ্ধ

কণ্ঠে কহিল—"আর এক দণ্ড এখানে থাকবো না দিদিমণি, আমাকে কলকাতা পাঠিয়ে দাও।"

বিভাবতী হতভম্ব হইয়া কহিল—"কেন বল্ দিকি?"

ক্ষান্তমণি অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিল—"আমাকে যে গিন্নিমা এখানে পাঠিয়েছেন, তা কি কাউকে সেবা করবার জন্য? না, তোমার ছেলে-মেয়েদের মানুষ করবার জন্য?"

বিভাবতী জবাব দিল না।

কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া ক্ষান্তমণি কহিল—"জবাব দাও। চুপ করে রৈলে কেন?"

বিভাবতী গম্ভীর কণ্ঠে কহিল—"কে বললে তোকে সেবা করতে?"

ক্ষান্তমণি ঝঙ্কার দিয়া কহিল—"কেন! তোমার শ্বশুর! মাসে মাসে মাইনে দিচ্ছে, খেতে-পরতে দিচ্ছে—আর কে বলতে যাবে, বলো?" মাথার ঝাঁকানি দিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল—"এই সন্ধ্যেবেলায় আগুন নিয়ে গিয়ে ওর বুকে সেঁক দিতে হবে! মেয়ে-মানষের হাতের সেঁক ছাড়া চলবে না। নবাব! বাড়ীতে দশটা বাঁদী আছে যে!" মাথাটা প্রবল ভাবে নাড়িয়া কহিল—"না দিদিমণি, আজই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। ও থাকলে থাকবো না আমি।"

বিভাবতী প্রবোধ দিয়া কহিল—"কি করবি বল্? উপায় কি?"

ক্ষান্তমণি কহিল—"তা'হলেও তোমাদের যে আবার বাড়াবাড়ি! দোতলায় ওকে রাখবার দরকার কি! একতলায় বিদেয় করে দাও। সারা রাত খক্‌র খক্‌র করে কাসি আর গোঙ্গানি—ছেলে-মেয়ে দু'টো চমকে চমকে ওঠে, আমি চোখে-পাতায় করতে পারিনে। তা'ছাড়া, ঘরের সামনে দিয়ে যাবার যো নেই! এমন করে তাকায় যেন গিলে খাবে! না বাপু, ও লোক ভালো নয়। পাড়াগাঁয়ের লোকের ধাত্‌, আমার খুব জানা আছে।"

পরদিনই নিবারণের অধোগতি ঘটল। সকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, ফিরিতেই চাপরাশী কহিল—"নীচের ঘরে আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে হুজুর! আপনি বেতো রুগী কি না, উপর-নীচে করতে কষ্ট হয়, তাই সাহেব বললেন, নীচের ঘরেই সুবিধে হবে আপনার।" বলিয়া ঘরটি দেখাইয়া দিল।

ঘরে ঢুকিতেই নিবারণের পুরাতন সঙ্গী দু'টির দেখা মিলিল—সেই বিছানার বাণ্ডিল ও তোরঙ্গ—এক জন একটা চৌকির উপরে চাপিয়া, আর এক জন চৌকীর নীচে বসিয়া যেন নিবারণের দিকে তাকাইয়া কৌতুকের হাসি হাসিতেছে! [ক্রমশঃ

শ্রীঅমলা দেবী

দুর্গেশনন্দিনী

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস। প্রথম চেষ্টায় ভাষা, ভঙ্গী, আখ্যানবস্তুর বিন্যাস, সংযম, পারিপাট্য ইত্যাদিতে যে সকল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, তাহা ইহাতে আছে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস ইহা হয় নাই। ইহার কতক অংশ ইতিহাস, কতক অংশ উপন্যাস, কতক অংশ কাব্য, কতক অংশ নাটক। ইহাকে উপন্যাস না বলিয়া রোমান্সের বই বলিতে হয়। চরিত্র-সৃষ্টির দিক্ হইতেও ইহা সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নাই।

তবু এই পুস্তকের মূল্য অনেক বেশি। কেবল বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনার দিক্ হইতে নয়—বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস ও তাহার ক্রমোন্নয়ের দিক্ হইতে বিচার করিলে এই গ্রন্থের মূল্যের অবধি নাই।

তাজমহলের ভিত্তির যে মূল্য, বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যের পক্ষে ইহার মূল্য তদ্রূপ। যে দেশে কথা-সাহিত্য বলিয়া বিশেষ কিছু ছিল না—সে দেশের কথা-সাহিত্যের প্রথম পুস্তক এত উচ্চ শ্রেণীর কি করিয়া হইল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সত্য কথা বলিতে গেলে, বঙ্কিম কথা-সাহিত্যের কোন আদর্শ এ দেশে প্রাপ্ত হ'ন নাই—বঙ্কিমকে এক প্রকার শূন্য হইতেই এই রস-বস্তুর সৃষ্টি করিতে হইয়াছে—এবং এই সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ না হউক—অপকৃষ্টও হয় নাই। এই কথা ভাবিলে বঙ্কিমের প্রতিভার অসাধারণতা লক্ষ্য করিয়া শ্রদ্ধায় শির অবনত হইয়া পড়ে।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্ব্বে বিজয়বসন্ত, কামিনীকুমার প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদম্বরী ধরণের উপন্যাস, গার্হস্থ্য পুস্তক প্রচার-সভার প্রকাশিত হংসরূপী রাজপুত্র, চকমকির বাক্স প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প, আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। এ সকল গ্রন্থ হইতে বঙ্কিম কোন আদর্শই লাভ করেন নাই।

আচার্য্য অক্ষয় সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ, হাতেমতাই, চাহার দরবেশ প্রভৃতি বটতলার প্রকাশিত গ্রন্থ হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর পুরুষেরা কিনিত। মেয়েরাও জীবনতারা, কামিনীকুমার ইত্যাদি গ্রন্থ ক্রয় করিত।"

বঙ্কিম এই সকল গ্রন্থ হইতে কোন সাহায্যই পান নাই। সরকার মহাশয় রামকমল ভট্টাচার্য্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ' নামে একখানি পুস্তকের নাম করিয়াছেন। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'—অল্প দিন আগে প্রকাশিত হইয়াছিল। সরকার মহাশয়ের মতে এই পুস্তক দুইখানির ভাষা বঙ্কিমের ভাষার জননী। যদি এ কথা সত্য হয়—তাহা হইলে বঙ্কিম এই পুস্তক দুইখানি হইতে আদর্শ বাংলা ভাষার সন্ধান পাইয়াছিলেন—এই কথা মাত্র স্বীকার করিতে হয়। উপন্যাস রচনার অন্য কোন অঙ্গের দিক্ হইতে বঙ্কিম ঐ পুস্তক দুইখানি হইতে কোন সহায়তা লাভ করেন নাই। আর ভাষার কথাতেও বলিতে হয়—দুর্গেশনন্দিনীর ভাষার সঙ্গে ঐ পুস্তক দুইখানির ভাষার কোন মিলই নাই। বঙ্কিম পরবর্ত্তী জীবনে যে ভাষাভঙ্গীর পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ঐ পুস্তক দুইখানির ভাষার যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে।

মোটের উপর মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্যরাজ্যে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল—বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী কথাসাহিত্যের রাজ্যে সেই শ্রেণীরই যুগান্তর ঘটাইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের প্রবর্ত্তক—দুর্গেশনন্দিনীতে সেই যুগের সূত্রপাত

হইয়াছে—রবীন্দ্র শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি তাহারই অনিবায্য স্বাভাবিক সুপরিণতি। বর্ত্তমান যুগের কথা-সাহিত্যের পুষ্পপল্লব-সমারোহের মূল ঐ দুর্গেশনন্দিনী।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায় "যে পথ দিয়া দুর্গেশ-নন্দিনীর অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্বচালন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।"

বৈষ্ণবধর্ম্মের ক্রম-পরিণতির ইতিহাসলেখক ও বৈষ্ণবতত্বের ব্যাখ্যাতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় যে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেমধর্ম্ম জগতের রসসাধনার উল্লেখ করিয়াছেন—সেই শ্রদ্ধা ভক্তির সহিতই আজ আমরা বর্ত্তমান সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গেশ-নন্দিনীর নামোল্লেখ করিতে পারি।

বঙ্কিম এ দেশের কোন পূর্ব্ব সূরির নিকট ঋণী নহেন সত্য, কিন্তু ইউরোপের কথা-সাহিত্যিকদের কাছে তিনি ঋণী। দুর্গেশনন্দিনীর আখ্যানবস্তুর সহিত Scottএর Ivanhoe আখ্যানবস্তুর মিল আছে। অনেকে মনে করেন—বঙ্কিম Scott Ivanhoeর অনুসরণেই দুর্গেশনন্দিনী লিখিয়াছেন। সে কালের প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিম Scottএর প্রধান গ্রন্থ Ivanhoe পড়েন নাই, এ কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। যাহাই হউক—বঙ্কিম নিজে যখন এ কথা অস্বীকার করিয়াছেন, তখন এ কথার উল্লেখ করাই ধৃষ্টতা। অশীতিপর বৃদ্ধ রায় বাহাদুর অঘোরনাথ অধিকারী মহাশয় বলেন—Ivanhoe সে কালে খুব আদরের পুস্তক ছিল—শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই তাহা পাঠ করিতেন। বঙ্কিম Ivanhoe নিজে না পড়িলেও বন্ধু-বান্ধবের মুখে Ivanhoe উপাখ্যানটি শুনিয়া থাকিবেন। তিনি যৌবনকালে এইরূপ একটা কথা শুনিয়াছিলেন। বঙ্কিম যদি Ivanhoeর গল্প শুনিয়াই দুর্গেশনন্দিনী লিখিয়া থাকেন, তাহাতেও দুর্গেশনন্দিনীর মৌলিকতার গৌরব বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় নাই। আখ্যানবস্তুর কিয়দংশ Ivanhoeর সঙ্গে মিলিলেও অন্য কোন অংশে Ivanhoeর সহিত দুর্গেশনন্দিনীর মিল নাই।

এই গ্রন্থে বঙ্কিমের সৃষ্টির সমারোহময় নিজস্ব ঐশ্বর্য্য ও অপূর্ব্ব মৌলিক ক্রম-পরিণতির চাতুয্যের মধ্যে আখ্যানবস্তুর কিয়দংশের ঐ সাদৃশ্য কোথায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

বঙ্কিম Ivanhoe না পড়িতে পারেন, কিন্তু Scottএর কোন কোন গ্রন্থ নিশ্চয়ই তিনি পড়িয়াছিলেন—Dickens, Charlotte Bronte ইত্যাদি ঔপন্যাসিকদের গ্রন্থও সম্ভবতঃ তাঁহার অপরিচিত ছিল না এবং Chivalric যুগের বীর-ধর্ম্ম প্রথা পদ্ধতি ও শৌর্য্যের আদর্শের সঙ্গে তিনি ইংরেজী কাব্য, নাট্য ইত্যাদির মারফতে নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন। এই পরিচয় তাঁহাকে সাহিত্যরচনায় যে আদর্শ দান করিয়াছিল, দুর্গেশনন্দিনী সেই আদর্শেই গড়া। বঙ্কিমের রোমান্স ও উপন্যাস-রচনার দীক্ষা ইউরোপীয় সাহিত্য-গুরুদের রচনা হইতে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র কঠোর তপস্যার দ্বারা যে ভাবমন্দাকিনীর ধারা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আনয়ন করিয়া-ছেন—তাহার সহিত এ দেশের সংকীর্ণ খাতে প্রবাহিত কোন ভাব-ধারার সংযোগ নাই। এ দেশের কাব্য-সাহিত্য প্রবাহের সম্বন্ধে যাহা সত্য, কথা-সাহিত্য প্রবাহের সম্বন্ধে তাহা সত্য নয়।

দুর্গেশনন্দিনী হইতে বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্যের সূত্রপাত ত বটেই, ঐতিহাসিক উপাদানকে সাহিত্যে পরিণত করিবার বঙ্গসাহিত্যে ইহাই প্রথম। দিল্লীর সম্পর্কে বাঙ্গালা দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপাদান বঙ্কিমের কিছু কিছু অধিগম্য ছিল। সে উপাদান এত সামান্য যে, তাহাতে বহুল পরিমাণে কল্পনার উপাদান সংযোগ করিয়া বঙ্কিমকে এই উপন্যাস রচনা করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীর সহিত কল্পনার নর-নারীর মিলন ঘটাইতে যে মনীষা ও ঐতিহাসিক মানসিকতার প্রয়োজন, বঙ্কিমের তাহা ছিল। সামান্য ও অস্পষ্ট উপাদান উপকরণ হইতে বঙ্কিম প্রাচীন দেশ ও কালকে অনুমান ও কল্পনার সাহায্যে মনের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অঙ্গ-বিশেষ হইতে অঙ্গীকে গড়িয়া তুলিবার শক্তি ছিল বঙ্কিমের অসাধারণ। বঙ্কিমের এই শক্তি ছিল বলিয়া—তিনি কল্পনার নরনারীর সহিত ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রীর অপূর্ব্ব মিলন ঘটাইতে পারিয়াছিলেন—দেশ-কালোপযোগী পরিবেষ্টনী ও পটভূমিকা রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, রাজপুত, বাঙ্গালী হিন্দু ও পাঠান জাতিকে একটি বিরাট সংসারের পরিজনরূপে দেখাইতে পারিয়াছিলেন এবং বিগত যুগের স্মৃতি ও স্বপ্নে জীবন সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন। দেশের ইতিহাসের অধিকাংশ যখন মাটির তলে, তখনই বঙ্কিম দেশের প্রাচীন যুগবিশেষকে ধ্যানরূপ দিয়া গড়িয়াছিলেন—আজিকার দিনেও তাঁহার সৃষ্টিকে সমুদ্‌ঘৃত ইতিহাসের পরীক্ষায় ভ্রান্ত বলিবার উপায় নাই। বঙ্কিমের মনীষা ও সৃজন-প্রতিভা কত বড় ছিল, ইহা হইতেই অনুমেয়।

দুর্গেশনন্দিনীতে অনেক ত্রুটি আছে সত্য, কিন্তু উপন্যাস, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস গড়িয়া তুলিবার জন্য যে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন—তাঁহার সে শক্তির পরিচয় ইহাতে প্রচুর পরিমাণেই আছে—কোথাও তাহা অবসন্ন বা নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই।

দুর্গেশনন্দিনীতে আর যে বস্তুরই অভাব থাকুক—কল্পনার লীলা-বৈচিত্র্যের অভাব নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্লট গড়িবার অদ্ভুত ক্ষমতা দুর্গেশনন্দিনী হইতেই আমরা লক্ষ্য করি। দুর্গেশনন্দিনীর প্লটে যে কোথাও অঙ্গহানি নাই—ফাঁক নাই—অসম্ভব ও অস্বাভাবিকতার সন্নিবেশ নাই, তাহা নহে। বঙ্কিমচন্দ্র যত দূর সম্ভব স্বাভাবিকতা রক্ষা করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। স্মরণ রাখিতে হইবে—বঙ্কিমের কথার ধারা এই গ্রন্থে কি দুরূহ, জটিল, উচ্চাবচ দুর্গম পথ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। প্রহরিবেষ্টিত হিন্দু-দুর্গাধিপতির অন্তঃপুর ও পাঠান নবাবের অন্তঃপুরের মধ্য দিয়া রক্তপিচ্ছিল পথে তাঁহার কল্পনাকে কত সন্তর্পণে চলিতে হইয়াছে। বঙ্কিম সাধ করিয়া যে দুর্গমতার ও জটিলতার জাল সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা ভেদ করিয়া তাঁহার আখ্যান-যাত্রীকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। তাঁহার কথাবস্তুর যাত্রাপথের দুর্গমতার কথা ভাবিলে তাঁহার স্খলনাদির কথা আর মনে থাকে না।

পাঠকের কল্পনাকে বঙ্কিম অতীত যুগের শূন্যপথে লইয়া গিয়াছেন—কল্পনা যাহাতে যাত্রাপথে আশ্রয় পায়, সে জন্য তিনি কেবল ঘটনার শৈল-শিখরের উপরই নির্ভর করেন নাই—তিনি অজস্র চিত্রের সৃষ্টি করিয়া ঘটনার শিলাপুঞ্জকে মোহনশ্রীতে সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন। ঘটনাপরম্পরার দ্বারা যে কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি—তাহাতে যথাযোগ্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনী ও চিত্রবাহুল্য না থাকিলে যে তাহা ইতিহাসের ফিরিস্তি হইয়া পড়িবে, এ সত্য বঙ্কিম গোড়া হইতেই বুঝিতেন।

পাঠকের কৌতূহলকে সদাপ্রবুদ্ধ রাখার জন্য আখ্যানভাগের

কোথায় কোথায় ফাঁক দিতে হইবে—কোথায় কতটা অংশ অকথিত রাখিতে হইবে—বিবিধ অংশের কোনটা আগে কোনটা পিছে বসাইতে হইবে—আগে ইঙ্গিতে আভাসে বলিয়া কোথায় পূর্ণ বিবৃতি দিতে হইবে—বঙ্কিম তাহা গোড়া হইতেই বুঝিতেন।

দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় উপন্যাস দ্রুতসঞ্চারী ঘটনা-পরম্পরার দ্বারাই সংগঠিত। এই উপন্যাসে ঘটনাই যেন প্রধান—চরিত্রগুলি আনুষঙ্গিক। চরিত্রগুলি যেন ঘটনার বশবর্ত্তী—ঘটনারই ক্রীড়নক। তিলোত্তমার কোন ব্যক্তিত্ব নাই—তাহার জীবন সম্পূর্ণ ঘটনানুগামী—দৈবাধীন। বিমলার পক্ষচ্ছায়ায় সে আচ্ছন্ন। আয়েষা একটা ভাবাদর্শ মাত্র—একটি ভাবাদর্শকে বঙ্কিম বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি দিয়াছেন মাত্র। ঠিক রক্ত-মাংসের দেহধারণ সে করে নাই। নারীচরিত্রের মধ্যে বিমলাই পুস্তকের প্রাণস্বরূপ। বিমলা হাস্যে পরিহাসে, ধূর্ত্ততায়, ভুলভ্রান্তিতে, নৃত্যগীতে, বেশভূষায়, রূপে, যৌবনে, তেজস্বিতায়, পাতিব্রত্যে, স্থৈর্য্যে, ধৈর্য্যে ও প্রতিহিংসায় জীবন্ত। বিমলার জীবনকে সূত্রস্বরূপ অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থের প্লট দানা বাঁধিয়াছে।

পুরুষচরিত্রগুলির মধ্যে বীরেন্দ্রসিংহ, জগৎসিংহ ও ওস্‌মানই উল্লেখযোগ্য। জগৎসিংহ-চরিত্রে ইউরোপীয় শৌর্য্যযুগের নাইট-(Knight)গণের চরিত্রদৃঢ়তা দৃষ্ট হয়। আদর্শ রাজপুতবীর বলিতে আমরা যাহা বুঝি, জগৎসিংহ তাহাই। রাজপুতনার ইতিহাসে এইরূপ চরিত্রের আমরা পরিচয় পাই বলিয়া এ চরিত্র আমাদের কাছে অসত্য হইয়া উঠে নাই। জগৎসিংহের তুলনায় বীরেন্দ্রসিংহের চরিত্র-দৃঢ়তা আরো বেশী, অথচ জগৎসিংহের চরিত্রে যে অবাস্তবতার স্বপ্নচ্ছায়া আছে বীরেন্দ্র-চরিত্রে তাহা নাই। ওসমান-চরিত্র আরও জীবন্ত। শৌর্য্যে ওসমান জগৎসিংহের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী—বঙ্কিম শেষ পর্য্যন্ত ওস্‌মান-চরিত্রের বীর-মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। জগৎসিংহকে পদাঘাত করিয়া ওসমান্ শৌর্য্যের আদর্শে হীন হইয়া পড়িয়াছে, ওসমান্ সাধারণ মানুষ—দেবতা নহে—তাহার প্রেমের গভীরতা ও উদ্দীপনা সাধারণ মানুষেরই মত। ওস্‌মান বীরধর্ম্মের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে—কিন্তু রক্ত-মাংসে জীবন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিম হাস্য-রসিকতাকে কথা-সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া জানিতেন। এই রঙ্গরসিকতা তাঁহার অনেক গ্রন্থে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে। বঙ্কিমের পূর্ব্বে ও সময়ে যাঁহারা নাটক লিখিতেন—তাঁহারা রঙ্গরসিকতার জন্য পৃথক্ একটি চরিত্রেরই সৃষ্টি করিতেন। দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিম সেই ধারারই অনুসরণে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের দ্বারা দুর্গেশনন্দিনীর ঐশ্বর্য্য কিছুই বাড়ে নাই।

যে শ্রেণীর রসিকতার ধারা বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল—বঙ্কিমবন্ধু দীনবন্ধুর নাটকে যে ধারার পরিসমাপ্তি হইয়াছে—বঙ্কিমের দুর্গেশ-নন্দিনীকেও তাহা স্পর্শ করিয়াছে। রসিকতার যে সুরুচিসঙ্গত আদর্শ বঙ্কিম বঙ্গ-সাহিত্যে পরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সে সৌরুচ্য আশ্‌মানী-দিগ্‌গজের প্রেমচিত্রে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে যে 'নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য'রসের প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন—দুর্গেশ-নন্দিনীতে তাহার প্রবর্ত্তন হয় নাই।

আজকাল অনেকে বঙ্কিমকে অতিরিক্ত শুচিবাগীশ ও বর্ণা-শ্রমের পাণ্ডা-পূজারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা তাঁহার প্রথম উপন্যাসেই দেখি—তিনি মনে-প্রাণে তাহা ছিলেন না, বরং তিনি সর্ব্ববিষয়ে অসঙ্কোচ উদারতায় আধুনিক সাহিত্যের যুগধর্ম্মেরই প্রবর্ত্তক—বর্ত্তমান যুগের নৈতিক জীবনাদর্শের তিনিই গুরুগোঁসাই।

বঙ্কিম দেখাইয়াছেন—প্রেমের পথ বর্ণাশ্রমী শাসননিষ্ঠ সমাজের বাঁধা রাজপথ নয়। প্রেম সর্ব্বত্রই বিদ্রোহী—সে কুটিল, বন্ধুর, দুর্গম ও পিচ্ছিল পথ ধরিয়াই চলে। সামাজিক বিধি-নিষেধ মানিয়া চলে নাই বলিয়া প্রেম কোথাও বঙ্কিমের কাছে অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে নাই। প্রেমের স্থান যে জাতিধর্ম্মবর্ণগত সংস্কারের উপরে, বঙ্কিমই এ কথা আমাদের দেশে প্রথম শুনাইয়াছেন।

বীরেন্দ্রসিংহ পিতার অমতে দুইটি বিভিন্ন জাতীয় নব-নারীর মিলনে উৎপন্না জারজা কন্যাকে গোপনে বিবাহ করিলেন। তাঁহাদের মিলনে উৎপন্না তিলোত্তমাকেই বঙ্কিম এই গ্রন্থে প্রধান নায়িকার গৌরব দান করিলেন।

বীরেন্দ্রসিংহও সামাজিক অপরাধের জন্য বঙ্কিমের লেখনীতে অবজ্ঞাত হ'ন নাই। যে ভাবে তিনি মৃত্যু বরণ করিলেন—তাহাতে দেখা যায়, বঙ্কিম তাঁহাকে বীরেন্দ্রের মর্য্যাদাই দান করিলেন।

বিমলাও ঐরূপ জারজা এবং শূদ্রী-গর্ভজাতা। তাহাকে বীরেন্দ্রসিংহের অঙ্কলক্ষ্মীর মর্য্যাদা দিতে বঙ্কিম কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই—শুধু তাহাই নয়, বিমলাকেই বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীতে প্রধান চরিত্র করিয়া তুলিয়াছেন এবং তাঁহার পরিকল্পিত বীরাঙ্গনাদের মধ্যে বিমলাই প্রথমা। যে শশিশেখর বার বার অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইতেছে—সেই শশিশেখরকে মহামহোপাধ্যায় অভিরাম স্বামী করিয়া তুলিয়া বঙ্কিম তাহার চরণে রাজরাজন্যগণের মস্তক লুণ্ঠিত করাইয়াছেন। রাজ-পুতবীরের সহিত কেবল বাঙ্গালী কন্যার নয়—পাঠান-যুবতীর প্রণয়ের কাহিনী লিখিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। জগৎসিংহ পিতার অনুমতি না লইয়া জানিয়া শুনিয়া জারজা-গর্ভজাতা তিলোত্তমাকে বিবাহ করিলেন। বঙ্কিম এখানে সামাজিক সংস্কারের উপর প্রেমকেই বিজয়ী করিয়া তুলিয়াছেন। সর্ব্বোপরি,—তিনি কামান্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখে শূদ্রী প্রণয়িণীর উচ্ছিষ্ট অন্নগ্রাস তুলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও চরিত্রবল না থাকিলে সে যে একটা দাসীর চরণতলে পতিত হইতে পারে—প্রাণ বাঁচাইতে মুসলমান হইতে স্বীকৃত হইতে পারে—এ কথা স্বীকার করিতে তাঁহার বাধে নাই। চরিত্রহীন মূর্খ ব্রাহ্মণকে লইয়া অবজ্ঞাময় নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করিতে তিনি উল্লাস বোধই করিয়াছেন।

দেবতার মন্দিরের মধ্যে যুবক-যুবতীর রূপজ মোহাত্মক প্রণয় সঞ্চার ঘটাইতে বঙ্কিমের আতঙ্কে গা শিহরিয়া উঠে নাই। প্রেম যতই পবিত্র হউক—প্রথম দর্শনে ত তাহা রূপমোহের উপরকার স্তরে আরোহণ করে নাই, তাহার শুচিতাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা বঙ্কিমের উদার সংস্কারমুক্ত শিল্পিজনো-চিত বিরাট মনের পরিচয় পাই। মানবতার বা মানবহৃদয়ের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা শিল্পীর ধর্ম্মের অঙ্গীভূত অন্য পুস্তকে তাহার যতই অভাব থাকুক, দুর্গেশনন্দিনীতে তাহার অভাব নাই।

ভারতীয় সাহিত্যে নায়িকার রূপবর্ণনার একটা প্রথা ছিল। তাহাতে রূপ ঠিক ফুটিত না—রূপবর্ণনাচ্ছলে কবিগণ নিজেদের মামুলি অলঙ্কার প্রয়োগের কৃতিত্ব দেখাইতেন মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ শ্রেণীর বাক্যালঙ্কার সাহায্যে রূপবর্ণনার প্রথাকে আশমানীর রূপ

বর্ণনা-প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ব্যঙ্গ-রসিকতার নিদর্শন হিসাবে ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যই হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম নিজে রূপবর্ণনার এই প্রথাটি ত্যাগ করিতে পারেন নাই—অবশ্য বর্ণনাভঙ্গী পূর্ব্বসূরিদের অন্ধ অনুকরণ মাত্র নয়। কিন্তু তাহাতেও রূপ ঠিক ফুটে নাই। ইহাতে বঙ্কিমের ভাষার মুন্সিয়ানা প্রকাশিত হইয়াছে। আর একটি জিনিষ ফুটিয়াছে—তাহা বঙ্কিমের নিজের রূপমুগ্ধতা। পূর্ব্বগামী কবিদের মত বঙ্কিমের রূপবর্ণনা নিরাবেগ বা উদাসীন বর্ণনামাত্র নয় —রীতিমত আবেগময়। রমণীরূপবর্ণনার উৎসাহ ও উল্লাসের মধ্যে বঙ্কিমের কবি-মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পী বঙ্কিম ছিলেন রূপেরই উপাসক। রমণীরূপ তাঁহার চিত্ত কিরূপ রসাবিষ্ট করিত, আয়েষা, তিলোত্তমা ও বিমলার রূপবর্ণনাচ্ছলে তিনি তাহারই আভাস দান করিয়াছেন। পরোক্ষে ও অপরোক্ষে তিনি স্বীকার করিয়াছেন—প্রেম শুচিই হউক আর অশুচিই হউক, সকল প্রেমেরই জন্ম রূপমোহে।

দুর্গেশনন্দিনীতে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের বালাই নাই। কেবল 'অঙ্গুরীয় প্রদর্শন' শীর্ষক অধ্যায়ে একটু চেষ্টা দেখা যায়—তাহাতে মনে হয়, বঙ্কিম প্রথম উপন্যাসেই বুঝিয়াছিলেন—কথাসাহিত্যে ইহারও প্রয়োজন আছে। *

স্বীকার করি, দুর্গেশনন্দিনীর অনেক স্থল কলাশ্রী-সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু কতকগুলি চিত্রে বঙ্কিম প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পরিচয় দিয়াছেন—যেমন পাঠানগণের দুর্গ-প্রবেশ, বীরেন্দ্রসিংহের বিচারদৃশ্য, কতলুখাঁর বিলাস লীলা, বিমলার রহিম-সম্মোহন, ওসমান-জগৎসিংহের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও আয়েষার তিলোত্তমা-সম্ভাষণ ইত্যাদি চিত্রে বঙ্কিম যথেষ্ট কলা-কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বঙ্কিম এই পুস্তকে ঐতিহাসিক আবেষ্টনী সৃষ্টিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু প্রাকৃতিক আবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন নাই।

বঙ্কিম যে ভাষায় দুর্গেশনন্দিনী লিখিয়াছেন—তাহা তাঁহার নিজস্ব ভাষা নয়। তখনও বঙ্কিম নিজের ভাষা খুঁজিয়া পান নাই। এ ভাষার ভঙ্গী কতকটা অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের রচনা, কতকটা সে কালের উপকথার পুস্তকগুলি, কতকটা বিবিধ সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত। তখন বাঙ্গালায় নব নব ভাবের অভাব হয় নাই—কিন্তু সেগুলির প্রকাশের উপযোগী ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। ভাব প্রকাশ করিতে তখনকার লেখকদের কি দারুণ ক্লেশই না স্বীকার করিতে হইত। দুর্গেশনন্দিনীতেও সে কৃচ্ছ্র-চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্ত—১। এক জন প্রাচীন মোগল সৈনিক কহিলেন, মহারাজ যথায় তাবৎ সেনা পাঠাইতেও আশঙ্কা, তথায় অল্প সংখ্যক সেনার দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধন হইবেক? মানসিংহ কহিলেন—অল্প সেনা সম্মুখ রণে অগ্রসর হইতে পাঠাইতে চাহিতেছি না। ক্ষুদ্রবল অস্পষ্টে থাকিয়া গ্রামপীড়নাসক্ত পাঠানদিগের সামান্য দল সকল কতক পরিমাণে দখলে রাখিতে পারিবেক।

২। ইতিপূর্ব্বে যুবরাজ যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদনে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাইয়া ত্বরিত এক শত অশ্বারোহী সেনা লইয়া পিতৃসমক্ষে যাইতেছিলেন, অপরাহ্নে সমভিব্যাহারিগণের অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন।

৩। অভিরাম স্বামী মহাসমারোহের সহিত দৌহিত্রীকে জগৎসিংহের পাণিগ্রহিত্রী করিলেন। তিলোত্তমার পিতৃবন্ধুও অনেক আহ্বান প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-কার্য্যে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

৪। সে দৃষ্টি কোমল, কেবল স্নেহব্যঞ্জক তিরস্করণাভিলাষের চিহ্নমাত্রে বর্জ্জিত।

৫। জগৎসিংহ অর্থব্যয় ও শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যত্ন কেবল পূর্ব্ব সম্বন্ধের স্মৃতিজনিত কি যে যে অপরাপর কারণে মানসিংহ প্রভৃতি সেইরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই সেই কারণ-সম্ভূত, কি পুনঃ সঞ্চারিত প্রেমানুরোধে উৎপন্ন, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই।

এইরূপ অনেক স্থলে ভাবপ্রকাশের কৃচ্ছ্র চেষ্টা দেখা যায়।

অনেক সময় বঙ্কিম এক একটি পূর্ণ বাক্যকেই 'সমস্ত'পদে পরিণত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যেমন—অনিবার্য্যতৃষ্ণাকাতরলোচনে। যোদ্ধৃবৃত্তি-অবলম্বনকরণাশয়ে। পীবরাংসসংসক্তাবিদ্যুদগ্নিগর্ভমেঘবৎচঞ্চল। সন্ধ্যাসমীরণকম্পিত-নীলোৎপলতুল্য। কর্ণাভরণস্পর্শপ্রার্থী পীবরাংস। শিল্পকার্য্যোৎপন্নদ্রব্যজাত-বিক্রেতা। প্রস্ফুটশারদসরসীরুহের মন্দান্দোলনস্বরূপ। বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরণ-চকিত কটাক্ষ-নিক্ষেপ।

বঙ্কিম মুহুর্মুহু তদ্-শব্দের সহিত সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করিতেন—

মুসলমানেরা অবাধে তদ্রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। সুলতান বাবর···তৎসিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবৎসর উৎকল-বিজিগীষু হইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। মানসিংহ তৎপরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া ···প্রতীক্ষায় রহিলেন!

বঙ্কিমের নিজের স্বচ্ছ সরল ভাষাভঙ্গীর মুকুলিত রূপ এই গ্রন্থের অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। যেমন—

১। বিমলা নিজ কক্ষে বসিয়া বেশভূষা করিতেছিলেন। পঞ্চত্রিংশ-বর্ষীয়ার বেশভূষা? কেনই বা না করিবে? বয়সে কি যৌবন যায়? যৌবন যায় রূপে আর মনে। যাহার রূপ নাই সে বিংশতি বর্ষ বয়সেও বৃদ্ধা। যাহার রূপ আছে সে সকল বয়সেই যুবতী। যাহার মনে রস নাই সে চিরকাল প্রবীণ। যার রস আছে, সে চিরকাল নবীন। বিমলার আজ রূপে শরীর চলচল করিতেছে, রসে মন টলটল করিতেছে। বয়সে আরও রসের পরিপাক।

২। দিন যাবে। তুমি যাহা ইচ্ছা কর, দিন যাবে, রবে না। পথিক! বড় দারুণ ঝটিকা-বৃষ্টিতে পতিত হইয়াছ? বৃষ্টিতে প্লাবিত হইতেছ? অনাবৃত শরীরে করকাঘাত হইতেছে? আশ্রয় পাইতেছ না? ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর, এ দিন যাবে, রবে না। দুর্দ্দিন ঘুচিবে, সুদিন আসিবে—ভানূদয় হইতে কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

কাহার না দিন যায়? কাহার দুঃখ স্থায়ী করিবার জন্য দিন বসিয়া থাকে? তবে কেন রোদন কর? কার দিন গেল না? তিলোত্তমা ধূলায় পড়িয়া আছে—তবু দিন গেল। বিমলার হৃৎপদ্মে প্রতিহিংসা-কালফণী বসতি করিয়া সর্ব্বশরীর বিষে জর্জ্জর করিতেছে। এক মুহূর্ত্ত তাহার দংশন অসহ্য। এক দিনে কত মুহূর্ত্ত। তথাপি দিন কি গেল না?

---

* "বঙ্কিম তাঁহার এই প্রথম উপন্যাসে কতকটা ঐতিহাসিক ঘটনাবাহুল্যের জন্য ও কতকটা রোমান্স-সুলভ অপ্রত্যাশিত পরিণতির অবতারণার জন্য গল্পাংশের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার জন্য এরূপ মনস্তত্ত্ব-মূলক বিশ্লেষণে হস্তক্ষেপ করেন নাই।"—বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা।

কতলুখাঁ মসনদে, শত্রুজয়ী। সুখে দিন যাইতেছে, দিন রহে না। জগৎসিংহ রুগ্নশয্যায়, রোগীর দিন কত দীর্ঘ কে না জানে? তথাপি দিন গেল।"

স্থলে স্থলে বঙ্কিম এমন ভঙ্গীতে লিখিয়াছেন, পড়িতে মনে হয় সংস্কৃত কাব্যের বুঝি অনুবাদ পড়িতেছি—

তিলোত্তমা একাকিনী কক্ষবাতায়নে বসিয়া কি করিতেছেন? সায়াহ্নগগনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন? তবে ভূতলে চক্ষু কেন? নদীতীরজ কুসুম-সুবাসিত বায়ু সেবন করিতেছেন? তবে ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইবে কেন? মুখের এক পার্শ্ব ব্যতীত ত বায়ু লাগিতেছে না। গোচারণ দেখিতেছেন? তাহাও নয়, গাভীগণ ত একে একে গৃহে আসিল। কোকিলরব শুনিতেছেন? তবে মুখ এত ম্লান কেন? তিলোত্তমা কিছুই দেখিতেছেন না, শুনিতেছেন না, চিন্তা করিতেছেন।

পূর্ব্বরাগের লক্ষণাদি বর্ণনাতেও বঙ্কিম ভারতীয় পূর্ব্ব কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিজস্ব মৌলিকতাও কিছু আছে। (১ম খণ্ড। ৭ম পরিচ্ছেদ দেখ)

বঙ্কিমের ভাষা অনেক স্থলে অলঙ্কৃত। অলঙ্কার প্রয়োগে বঙ্কিমের মৌলিকতা আছে, কোথাও কোথাও অবশ্য সংস্কৃত কবিদের অনুসরণ করিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত—

১। সে যেন তাপশুষ্ক ঘৃত। মদন-আগুন যত শীতল হইতেছে—দেহখানি ততই জমাট বাঁধিতেছে।

২। যেমন শীতার্ত্ত ব্যক্তির অঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বেলাধিক্যে রৌদ্র সরিয়া যায়। আয়েষা সেইরূপ ক্রমে ক্রমে জগৎসিংহ হইতে আরোগ্য কালে একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইতে লাগিলেন।

৩। আমি বন্দী হই। আমাকে কারাগারে স্থান দিন। এ দয়ার শৃঙ্খল হইতে আমাকে মুক্ত করুন। আর যদি বন্দী না হই, তবে আমাকে হেমপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখার প্রয়োজন কি?

তিলোত্তমার স্বপ্নকাহিনীটি আগাগোড়া রূপক। *

এইরূপ বহু স্থল হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দেখানো যাইতে পারে—প্রথম শ্রেণীর রসশিল্পীর উপযুক্ত ভাষার সূত্রপাত হইয়াছে বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসেই।

দুর্গেশনন্দিনী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের প্রথম রচনা। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় ডেপুটি, তখন দুর্গেশনন্দিনী রচিত হয়। ২।৩ বৎসর পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্কিম অগ্রজদের দেখিতে দেন—তাঁহারা ইহাকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মনে না করিলেও প্রকাশযোগ্য মনে করেন।

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইলে দেশীয় পণ্ডিতসমাজ ইহার তেমন আদর করেন নাই। কেহ বলিলেন—ভাষায় ব্যাকরণ ভুল অজস্র, কেহ বলিলেন—ইহা বিলাতী ভাবে পরিপূর্ণ। ইংরেজীনবীশরা এই পুস্তক পড়িয়া খুবই খুশী হইলেন। যে দেশের সাহিত্যে দেবতার মহিমা কীর্ত্তন ছাড়া আর কিছু ছিল না—সে দেশের সাহিত্যে মানুষের অন্তর্নিহিত মহিমার ঘোষণা দেখিয়া—তাহার জীবনরহস্য ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা খুশীই হইলেন।

যে দেশে মানব-জীবনটাকে অসার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল—সে দেশের সাহিত্যে মানব-হৃদয়কে এত গৌরব পূর্ব্বে কেহ দেয় নাই। মানব-জীবনের ভিতরে যে কত রহস্য, কত বৈচিত্র্য, কত গভীরতা, কত জটিলতা—তাহার প্রথম আভাস দিলেন বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীতে। পুরাণ ও তদনুগত সাহিত্যে দেবাধীন মানুষের অদৃষ্টের কথাই থাকিত—মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও পুরুষকারের কথা থাকিত না—দুর্গেশনন্দিনীতে তাঁহারা এই কথা প্রথম পাইলেন। প্রণয়ের স্বাধীনতা, উচ্চাদর্শ ও গৌরব প্রচারে বঙ্কিমের অসাধারণ সাহস দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন। ধর্ম্ম সমাজ ও সাহিত্যের বহুবিধ জীর্ণ সংস্কারকে জয় করিয়া—রক্ষণশীলতার সকল শাসন অনুশাসনকে অবহেলা করিয়া বঙ্কিমের লেখনীকে সসাহসে বসোত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া তাঁহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

যে দেশে কথা-সাহিত্যের পুঁজি ছিল—পার্শী হইতে অনূদিত, তোতার ইতিহাস, হাতেম তাই, চাহার দরবেশ, আর সংস্কৃত হইতে অনূদিত কাদম্বরী, শকুন্তলা, বৃহৎকথা; ইহা ছাড়া দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ, অঙ্গুরীয়-বিনিময় ইত্যাদি দুই একখানি তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তক—সে দেশে দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাব যে একটা মহামহোৎসবের ব্যাপার সে বিষয়ে সন্দেহ কি? সাত বৎসর আগে আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থগুলির তুলনায় শ্রেষ্ঠ হইলেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কথা-সাহিত্যের পুস্তক বলিয়া গণ্য হয় নাই। বঙ্কিম নিজে এই গ্রন্থের সমাদর করিয়াছিলেন—কলাসৌষ্ঠবের জন্য নয়—ভাষার সরলতা, স্বচ্ছ ও স্বাভাবিকতার জন্য।

দুর্গেশনন্দিনীকেই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম রসগর্ভ কথাসাহিত্যের পুস্তক বলিতে হয়। বিশ্বাস্যতা সৃষ্টি কথাসাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। সামাজিক উপন্যাসে যথাযথ বিবরণী দেওয়ার ভঙ্গীতে, অস্বাভাবিক, অসংগত, অসম্ভব, অপ্রাসঙ্গিক, অতিপ্রাকৃত ব্যাপার ও ঘটনাদি বর্জ্জন করিয়া কল্পিত জিনিষের বিবৃতি দেওয়া হয়। বহু মিথ্যা (?) কথা চালাইবার জন্য বহু সত্য কথাও বলা হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঐতিহাসিক অংশই সত্য বলিয়া স্বভাবতঃ বিশ্বাস্যতা উৎপাদন করে। ঐ সঙ্গে কাল্পনিক ব্যাপারগুলিকেও ঐতিহাসিক সত্যের সহিত চালানো যায়—যথাযথ বর্ণনা দেওয়ার ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। বিশেষতঃ Romance শ্রেণীর এই সকল কথা-সাহিত্যের পুস্তকে বিশ্বাস্যতা উৎপাদনের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। পাঠক এই শ্রেণীর পুস্তকে কাব্যরসই আস্বাদ করে—কাঁটায় কাঁটায় সঙ্গতি অসঙ্গতির বিচার করে না। যাহাই হউক—দুর্গেশনন্দিনীর আখ্যানবস্তুকে ঐতিহাসিক আবেষ্টনীর মধ্যে রক্ষা করিয়া এবং কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের সাহায্য লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে একটা ইতিবৃত্তলভ্য বিশ্বাস্যতা দান করিয়াছেন।

ইহার ঐতিহাসিক সূত্র এই—

আকবরের সময়ে বঙ্গদেশ বিজিত হইলেও উড়িষ্যার পাঠানরা কতলু খাঁর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে উপদ্রব ও লুণ্ঠন করিয়াছিল। মানসিংহ পাঠান দমনের জন্য তখন বঙ্গদেশে ছিলেন। মানসিংহ তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে পাঠানদের দমনের জন্য বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রেরণ করেন। জগৎসিংহ পাঠানদের বিতাড়িত করেন। পাঠানরা একটি দুর্গে আশ্রয়

* এইরূপ রূপক-স্বপ্ন সাধারণ উপন্যাসের পক্ষে অনুপযোগী হইলেও রোমান্সের রসপুষ্টির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহা দুর্গেশনন্দিনীর কাব্যাঙ্গের পরিপোষক। ইহাতে বঙ্কিমের কবিমানসের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রহণ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠায়। কিন্তু উড়িষ্যা হইতে বহু সৈন্য আসিয়া পড়ায় তাহাদের সাহায্যে পাঠানরা জগৎসিংহকে বন্দী করিয়া বিষ্ণুপুরে লইয়া যায়। জগৎসিংহ যখন বিষ্ণুপুরে বন্দী—তখন কতলু খাঁর রোগে (অস্ত্রাঘাতে নয়) মৃত্যু হয়। পাঠানরা তখন নেতৃহীন হইয়া জগৎসিংহের সহায়তায় মানসিংহের সঙ্গে সন্ধি করে।

এইটুকু ইতিহাস বঙ্কিমের সম্বল। ইহা ছাড়া একটু কিংবদন্তী আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পিতামহের ভ্রাতার মুখে শুনিয়াছিলেন—বিষ্ণুপুর ও জাহানাবাদের মধ্যে মান্দারণ গ্রামে একটি গড় ছিল। সেই গড়ে এক জন প্রবল-প্রতাপ জমিদার বাস করিতেন। ঐ অঞ্চলে তিনি শুনিয়াছিলেন উড়িষ্যার পাঠানরা মান্দারণ গড় দখল করিয়া জমিদার ও তাঁহার পরিবারবর্গকে উড়িষ্যায় বন্দী করিয়া লইয়া যায় কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য মানসিংহ কর্তৃক প্রেরিত হ'ন।

এই দুইটি সূত্র হইতে আমরা কতলু খাঁ, জগৎসিংহ ও গড় মান্দারণ পাইতেছি। বাকী সমস্তই বঙ্কিমের কল্পনা-প্রসূত। ওসমান বঙ্কিমের সৃষ্টি। বিমলা, আয়েষা, তিলোত্তমা ইত্যাদি নারীচরিত্রগুলি সবই বঙ্কিমের কল্পনা-প্রসূত।

•এ ক্ষেত্রে দুর্গেশনন্দিনীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। Romance সৃষ্টির জন্য বঙ্কিম দেশকালগত ঐতিহাসিক আবেষ্টনী মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা ছাড়া কিছুই বলা যায় না। জগৎসিংহের অভিযান ও বন্দিদশা একটি সূত্র মাত্র যোগাইয়াছে।

শ্রীকালিদাস রায়

প্রকৃত ম্যাজিক

'ম্যাজিক' কথাটি ইংরেজী হইয়াও বাংলা ভাষারই এক সাধারণ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। ইহার বাংলা প্রতিশব্দ স্থির হইয়াছে—যাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, ভোজবাজী প্রভৃতি। কিন্তু প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিলে ইহার একটিও সঙ্গত হইবে না। 'ম্যাজিক' শব্দটি গঠিত হইয়াছে 'ম্যাজি' বা 'ম্যাগি' (বা পারসিক magi…বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) হইতে।* বাইবেলেও 'ম্যাজি' বা 'ম্যাগি'দের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে তাঁহারা 'প্রাচ্যের বুদ্ধিমান্ লোক' বলিয়া খ্যাত। খৃষ্টের জন্মের সময় 'ম্যাজিদের' (বা wise men of the East) আগমন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ম্যাজিসিয়ান' কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসাবে wizard কথাটির ব্যবহার পাওয়া যায়। এই wizard কথার অর্থও 'বুদ্ধিমান্ লোক' (wise man) অর্থাৎ wise কথাটির সহিত—ard বা art প্রত্যয় যোগ করিয়া wizard শব্দ গ্রথিত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত ম্যাজিক বুঝিতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের ক্রিয়া বুঝায় এবং ম্যাজিকের খেলা বুদ্ধিরই খেলা। প্রাচীন মিশর, বেবিলন, গ্রীস, চীন ও ভারতবর্ষের যাদুবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিলে এই উক্তির তাৎপর্য্য আরও সহজে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ম্যাজিক কথাটির অর্থ ব্যাপক হইতে হইতে উহা সাধারণ খেলার নামে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে। 'প্রকৃত ম্যাজিক' বলিতে যখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের ক্রিয়াকেই বুঝায়, আলোচ্য প্রবন্ধে যাদু-রঙ্গমঞ্চের বাহিরে ম্যাজিসিয়ানরা কিরূপ ভাবে আপন বুদ্ধির পরিচয় দেন, তাহার আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সংক্ষেপে যাদুবিদ্যা দ্বারাই তাঁহারা কত বার বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন তাহাই বলিব।

অতি প্রাচীন কালে যাদুকরদিগকে ভূত বা ডাইনীদের অংশ-সম্ভূত বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে এক জন প্রসিদ্ধ যাদুকর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল 'কম্‌টে' (Louis Apollinaire Comte). তিনি শব্দানুকরণ, ভেণ্ট্রিলোকুইজম্, ম্যাজিক প্রভৃতিতে খুবই দক্ষ ছিলেন। তাঁহাকে ডাইনীর লোক বিবেচনা করিয়া সুইজারল্যাণ্ডের কৃষকগণ একবার খুব প্রহার করে এবং প্রকাণ্ড একটি কয়লার অগ্নিকুণ্ডে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়। আসন্ন-মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়া যাদুকর কম্‌টে বাধ্য হইয়া তাঁহার শব্দানুকরণ ও ভেণ্ট্রিলোকুইজম্ বিদ্যার সাহায্য লইলেন। অগ্নিকুণ্ডের মধ্য হইতে কোন এক অদৃশ্য দেবতা যেন বলিয়া উঠিলেন—'সাবধান! তোমরা কম্‌টের কোন অনিষ্টের চেষ্টা করিও না'। এই ভৌতিক আদেশ পাইয়া কৃষকগণ তখনি তাঁহাকে সেখানে ফেলিয়া পলায়ন করে।

যাদুকর বোস্কোর কাহিনীও কম রোমাঞ্চকর নয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বোস্কো (Bartolomes Bosco) ইতালীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং অতি শৈশব হইতে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাতে বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করেন। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে তিনি নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক রুশ-অভিযানে সৈন্যদলভুক্ত হন। কশাক সৈন্যদের সহিত যুদ্ধকালে এক জন অশ্বারোহী কশাক সৈন্য তাঁহাকে বর্শাবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করে। তৎপরে উক্ত সৈন্য অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বোস্কোর পকেট তল্লাসী করিতে উদ্যত হয়। অপরাপর সৈন্যের ন্যায় বোস্কো সাহেবও তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব নিজের পকেটে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। যদিও তাহা খুব বেশী ছিল না সামান্য কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা, একটি ঘড়ি, ধূমপানের যন্ত্র ইত্যাদি মাত্র, তথাপি উহা হারাইলে তাঁহাকে এই পৃথিবীতে নিঃস্ব এবং বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইয়া অনাহারে কাটাইতে হইত। বোস্কো তখন তাঁহার যাদুকরের বুদ্ধি খাটাইলেন,—তিনি মৃতের ন্যায় ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। পূর্ব্বোক্ত সৈন্যটি তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া পকেট তল্লাসী করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গেল; এ দিকে বোস্কোও আপন যাদুকরের প্রখর বুদ্ধি ও কুশলী হাত খাটাইয়া উক্ত সৈন্যের পকেট মারিলেন। সৈন্যের পকেটে বহু স্বর্ণমুদ্রা ছিল। বোস্কো সুকৌশলে সমস্তই হস্তগত করিয়া মৃতের

* "Magic is the art of the Persian magi, a class of wizard priests. Wizard is properly a 'wiseman': it is 'wise—' with suffix '—ard or '—art' witch (originally of common gender) also meant 'a wise man' and is connected with the root seen in 'wit' (knowledge). 'Words & their ways in English Speech' by Greenough & Kittredge.

ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিলেন এবং সৈন্যটিও সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেল। এই অর্থে বোস্কো পরে হাসপাতালে বেশ আনন্দেই দিন কাটাইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ যাদুকর ডেভিড ডেভাণ্ট (David Devant) সাহেবের কাহিনীও চমৎকার। আমাদের দেশে 'ভৌতিক বাক্সের খেলা' অনেকে দেখিয়াছেন। হাত-পা বাঁধিয়া যাদুকরকে তালাবদ্ধ একটি প্রকাণ্ড বাক্সে বদ্ধ করিয়া দিলেও তিনি অনায়াসে বাহির হইতে পারেন বলিয়া এই বাক্সের নাম 'ভৌতিক বাক্স।' বিলাতের প্রখ্যাতনামা যাদুকর ডেভাণ্ট সাহেব এই 'ভৌকিত বাক্স' খেলাটি প্রদর্শন করিয়া তৎকালে সমগ্র ইউরোপখণ্ডে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। একবার তিনি তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে এই বাক্সের খেলা দেখাইতে গিয়াছিলেন। রাত্রে খেলা শেষ করিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়েন এবং স্বপ্নে ঐ ভৌতিক বাক্সের খেলাই দেখেন। তার পর যাহা ঘটিয়াছিল, ডেভাণ্ট লিখিয়াছেন,—

"আমার স্বপ্ন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখি, এক ডাকাত রিভলবার হস্তে আমার সামনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি শরীরে একবার চিমটি কাটিয়া নিজে নিজেই দেখিলাম যে এই ডাকাতটি স্বপ্ন কি না এবং তার পর উঠিয়া বসিলাম। ডাকাত তাহার রিভলবার আমার দিকে বরাবরই উদ্যত রাখিয়াছিল। সে বলিল, 'একবার যদি কথা বলিবে, তবে সে-কথা জীবনের মত কথা বলা জানিবে।' আমি কথা বলিলাম না। তার পর সে বলিল, 'আমি যদি দরজা অথবা জানালা দিয়া পালাবার চেষ্টা করি তাহা হইলে সে আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িবে।' ডাকাত আমার পকেট হইতে স্বর্ণমুদ্রাগুলি লইল। আমি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। আমার বিছানার পাশেই ছিল ভৌতিক বাক্সটি। উদ্যত রিভলভার দেখাইয়া সে আমাকে তাহার মধ্যে ঢুকিবার ইঙ্গিত করিল। আমাকে বাক্সে ঢুকিতে হইল। সে বাক্সের চাবি হাতে তুলিয়া লইল। তার পর বলিল, 'মাথা নীচু কর।' আমি মাথা নীচু করিলাম। সে তার পর বাক্সের ডালা বন্ধ করিয়া বাক্সে তালা আঁটিল এবং চাবিটি লইয়া গেল। পরে দেখিলাম, আমাকে বাক্সসহ উঁচু করা হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমাকে দিয়া এ নূতন আবার কি খেলা আরম্ভ হইল! বুঝিলাম, আমাকে বাক্সসহ বিছানার উপর রাখিয়া দিল। যাঁহারা আমার বাক্সের খেলা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, আমাকে বাক্সের মধ্যে ঢুকাইবার পর-মুহূর্ত্তে আমি বাহির হই। ডাকাত দরজা পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতেই আমি উক্ত বাক্স হইতে বাহির হইলাম। এবং নিজের রিভলবারটি হাতে লইয়া ডাকাতের পশ্চাদনুসরণ করিলাম। সে আমাকে দেখিয়া অবাক্!

"আমি তাহাকে বলিলাম, 'হাত উঁচু কর'—'Hands up!' সে নিজের রিভলবার বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া বা কোনরূপ ওজর-আপত্তি না করিয়া তাহার হাত উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে পিছন দিকে হাঁটিয়া হাঁটিয়া সেই বাক্সের নিকট আসিতে আদেশ করিলাম। বলিলাম, 'বাক্সের মধ্যে ঢোক।' ডাকাত বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি তাহাকে তাড়াতাড়ি ডালাবদ্ধ ও তালাবদ্ধ করিয়া বাক্সটিকে বিছানার চাদর দিয়া জড়াইয়া দিলাম, যাহাতে তাহার চীৎকারে বাড়ীর লোক চকিত না হয়। এর পর আমি পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া আস্তে আস্তে আমার বন্ধু গৃহস্বামীর নিকটে গেলাম। ভৌতিক বাক্সের সাহায্যে তিনি আমার ডাকাত ধরার সংবাদে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ডাকিতে চলিলেন।"

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর হুডিনি (Harry Houdini)র কাহিনীও কম রোমাঞ্চকর নয়। হুডিনি হাতকড়ির রাজা,—'King of Handcuffs' নামে প্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে এমন কোন হাতকড়ি বা তালা আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা তিনি খুলিতে সমর্থ নহেন! যে কোন দেশের যে কোন প্রকার বাক্সে, জেলখানায় তাঁহাকে আবদ্ধ করা হউক না কেন—যাদুকর হুডিনি সেখান হইতে বাহির হইবেনই! প্রথম-জীবনে হুডিনি যখন এক সার্কাস কোম্পানিতে এই সব খেলা দেখাইতেন, তখন এই সার্কাস কোম্পানি রোডস্ দ্বীপে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। তৎকালে রোডস্ দ্বীপে রবিবারে অভিনয় করার আইন ছিল না। কোম্পানি যখন দেখিল, জনসাধারণ অভিনয় চায় এবং জরিমানার সামান্য অর্থদণ্ড অপেক্ষা আয় অনেক বেশী, তখন তাঁহারা রবিবারেও অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন। ফলে যাদুকর হুডিনিপ্রমুখ প্রত্যেক অভিনেতারই জরিমানা হইল। কোম্পানির ম্যানেজার জরিমানার টাকা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাদের প্রত্যেকের জেল হইল। জেলের সেল্ খুব ছোট ছিল এবং সার্কাসের লোকজন ছিল বেয়াড়া চেহারার—(যথা স্থূলদেহী মহিলা, জীবন্ত কঙ্কাল, জার্ম্মানীর দৈত্য প্রভৃতি)। কাজেই কাহারও পক্ষে 'সেল' নীচু মনে হইতে লাগিল, আবার কাহারও দেহ চারি দিকে ঠেকিতে লাগিল। কষ্টের যখন সকলের সীমা রহিল না তখন অশ্রু-পূর্ণ নয়নে সকলে হুডিনির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। 'ওয়ান—টু-থ্রি' ব্যস! যাদুকর হুডিনি জেলের তালা খুলিয়া দিলেন এবং সকলে পলায়ন করিলেন।

যাদুকরের বুদ্ধি অনেক সময়েই অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করে। আমার নিজের জীবনের ছোট একটি কাহিনী এখানে বলি। বিগত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলায় সর্ব্বপ্রথম হক-মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রথম প্রীতিভোজে যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের জন্য আমাকে নিযুক্ত করা হয়। 'ইউনাইটেড প্রেস অফ্ ইণ্ডিয়া' ও 'এসোসিয়েটেড প্রেসে'র তৎকালীন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাগণ উপস্থিত হইয়া আমাকে নিযুক্ত করিয়া 'কণ্ট্রাক্ট' করিয়া গেলেন। তৎকালে কি কারণে জানি না, মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরোধীদলের জনৈক ভদ্রলোক—ইনি তৎকালে কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের সম্পাদক, আমাকে জানান আমি যেন ঐ প্রীতিভোজে কিছুতেই যাদুবিদ্যা প্রদর্শন না করি এবং এমন ভয়ও দেখাইলেন যে, আমি উক্ত প্রীতিভোজে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিলে তাঁহাদের সংবাদপত্রে তাঁহারা আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিবেন। মহা সমস্যায় পড়িয়া গেলাম। এক দিকে দুই জন বিশিষ্ট সাংবাদিক আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন—অপর দিকে এক জন বিশিষ্ট সাংবাদিক নিষেধ করিতেছেন! যাহা হউক, আমি যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতে গেলাম এবং কয়েকটি খেলা দেখাইবার পর মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবের নিকট হইতে সার্টিফিকেট চাহিলাম। মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবের স্বাক্ষরিত ও লিখিত সে-সার্টিফিকেট আমি কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার মিষ্টার এল, এইচ, কলসন সাহেবকে পড়িবার জন্য তাঁর হাতে দিলাম! তদনুযায়ী তিনি পড়িলেন যে—"আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সকলে এই মুহূর্ত্তে

মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলাম এবং আজ হইতে যাদুকর পি, সি, সরকার বাংলার মন্ত্রী হইলেন।" এর পর বিরাট হাস্য-সহকারে প্রধান-মন্ত্রী এবং অপরাপর মন্ত্রিগণ বলেন যে—তাঁহারা ঐরূপ কথা লিখেন নাই বা ঐরূপ স্বাক্ষর করেন নাই! কিন্তু সকলেই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন—তাঁহাদের হাতে এমন লেখা হইল কি করিয়া এবং স্বাক্ষরই বা গেল কিরূপে! এই হাস্যকর খেলার বিবরণ পরদিন কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্রে "বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগ!" "প্রীতিভোজে হাস্যকর ব্যাপার" প্রভৃতি বড় বড় শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। যে-সম্পাদক আমাকে প্রথমে ভয় দেখাইয়াছিলেন, তিনিও উক্ত শিরোনামাসহ প্রকাণ্ড এক বিস্তারিত রিপোর্ট পরদিন তাঁহার সংবাদপত্রে প্রকাশিত করেন। ভারতবর্ষের বাহিরেও বহু সংবাদপত্রে এ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কয়েক জন খ্যাতনামা কার্টুনিষ্ট এই ঘটনা লইয়া চমৎকার কার্টুন-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কাজেই আমি ঐ একটি খেলাতেই রাতারাতি খুব প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিলাম। এই গেল এক ধরণের যাদুবিদ্যার কথা।

প্রকৃত ম্যাজিক বলিতে কি এই বুদ্ধির খেলাই শুধু বুঝায়? আমি আমার মায়া-মুকুরের দিকে তাকাইয়া আর এক ধরণের প্রকৃত যাদুবিদ্যা দেখিতেছি। যেখানে ম্যাজিককে রাজনৈতিক কারণে প্রয়োগ করা হয়। অবশ্য ম্যাজিক-বিদ্যার আবিষ্কার ও প্রচার হইয়াছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সেকালে মন্দিরে অথবা রাজার সম্মুখে যাদুবিদ্যা প্রদর্শিত হইত শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, তাহার যথেষ্ট প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যাদুকর হোডিন কর্ত্তৃক প্রদর্শিত বিবরণী সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি আফ্রিকার আলজিরিয়া প্রদেশে বিশেষ কার্য্যে প্রেরিত হন। আলজিরিয়া ফরাসী সরকারের অধীন হইলেও ফকির-জাতীয় একদল লোক (Marabouts) নানা রকম ভেল্কী দেখাইয়া সেখানকার কুসংস্কারাপন্ন অশিক্ষিত এবং সরল আরবদের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। আরবরা ভাবিল, ইহারা নিশ্চয় ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন, নতুবা এমন অদ্ভুত ক্রিয়া দেখায় কিরূপে? এই সব ফকিরের উপর আরবদের শ্রদ্ধার ভাব যত বাড়িতে লাগিল, সাদা চামড়ার লোকদের উপর ভয় এবং শ্রদ্ধাও তত কমিতে লাগিল। সুতরাং ফরাসী গভর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, এমন এক জন ফরাসী লোককে আলজিরিয়ায় পাঠাইতে হইবে, যিনি ঐ সব ফকিরের অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক খেলা দেখাইয়া তাহাদের প্রভাব নষ্ট করিতে পারেন। তখন যাদুকর বর্বা হোডিনকে আলজিরিয়ায় পাঠানো হইল এবং তিনিও আরবদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদন করিবার ক্ষমতা ফরাসীদের ন্যায় অন্য কাহারও নাই। আরবদের উপর যাদুকর হোডিন এত বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিদায়-কালে বড় বড় সর্দ্দার ফকিরের স্বাক্ষরিত অভিনন্দন-পত্র তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

ভারতীয় রাজনৈতিক গগনেও যাদুকরী বুদ্ধির অভাব নাই। এ দেশ যাদুকরের দেশ। যাদুবিদ্যায় এ দেশের লোকের বুদ্ধি জন্মগত এবং অস্থিমজ্জাগত। কে সেই সন্ন্যাসী ভারতের রাজনীতি-গগনের একচ্ছত্র সম্রাট্, যিনি রাজার কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন? রাজার কঠোর শাসনকে যাদুকরী বুদ্ধিতে ফাঁকি দিয়াছেন? সুভাষচন্দ্র বসুর কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি ছত্রপতি শিবাজীর কথা। ইতিহাস তাঁহাকে তস্কর বলিতে পারে—কিন্তু এক ধর্ম্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে বাঁধিয়া দিবার কি আকুল আগ্রহ তাঁহার ছিল! রাজরোষ এবং কারা-প্রাচীরকে তাঁহার তীক্ষ্ণ যাদুকরী বুদ্ধি অনায়াসে ফাঁকি দিয়াছিল।

রাণী পদ্মিনীর কথা কে না জানেন? শিবিকায় পরিচারিকা লইবার ছলে তিনি চিতোরের সমস্ত বড় বড় যোদ্ধাদের লইয়া গিয়াছিলেন। বাদশাহ তাঁহার যাদুকরী বুদ্ধি ধরিতে পারেন নাই। এইরূপ বহু প্রমাণ আছে। ম্যাজিক বলিতে আমি তাস আর রুমালের খেলা মাত্র বুঝি না। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের জন্য বুদ্ধির যে খেলা, তাহাকেই আমি বলি 'প্রকৃত ম্যাজিক'।

পি, সি, সরকার (যাদুকর)

শ্রাবণে

শ্রাবণের মেঘ-শিখা
আবরিয়া আছে এই দিক্-দিগন্তর—
কোন্ প্রিয়া-স্মৃতি-ব্যথা
সুদূর আকাশ-তীরে জমে নিরন্তর!
সজল কোমল নভোতল
কালো রূপে করে টলমল!

কি যেন করুণা আজি
কার অশ্রু হয়ে হায়, সিক্ত করে ধরা,—
অতীত দিনের কথা
বেদনার বাষ্প হয়ে ওড়ে দিশাহারা!

কূলহারা প্রাণ মোর
অকূল সমুদ্র-বক্ষে ডোবে আর ভাসে!
সে দিনের প্রেম-ঘোর
পুঞ্জিত মেঘের রূপে হৃদয়েতে আসে!
গভীর গহন হৃদিমাঝে
ঘন ঘোর কে যেন বিরাজে!

ভাসি কালো রূপ-স্রোতে
না পাই খুঁজিয়া এই প্রবাহের তীর!
শ্রাবণ কাঁদিছে নভে,
ব্যথায় হৃদয় মোর যেন অস্থির!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল

কৌমুদী

(গল্প)

শরতের বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারী বাড়ী থেকে আর বেরোয়নি। নিজের ঘরের জানলার পাশে চুপ করে বসেছিল।···মনটা একটু বিষণ্ণ। সে বিষণ্ণতার কারণ ওর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো মামার ওপরে।

ও যখন জন্মায়, মামা সুবোধগোবিন্দ ছিল ঠিক পাশে—দিদিকে ডেকে বললে,—"দিদি, এর নাম রাখো ব্রহ্মচারী।"

দিদি বললেন,—"সে কি? এটুকু ছেলের নাম···"

"কি যে বলো দিদি, তার ঠিক নেই। ঐ নামের জন্যেই তোমার ছেলে পৃথিবীর সমস্ত মোহ কাটাতে পারবে···তা জানো? তুমি যদি না ওকে মানুষ করতে পারো, আমাকে দিয়ো!"

দিদি হেসে বললেন,—"আচ্ছা, তাই নিস্।"

সে আজ চব্বিশ বছর আগেকার কথা। এই চব্বিশ বছরে পৃথিবীর কোনো রোমান্সের হাওয়া ওর গায়ে লাগেনি···রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করেছে মাথা নীচু করে, তার জন্যে পথচারীদের কাছ থেকে কত ভর্ৎসনা, কত তিরস্কারই না তাকে সহ্য করতে হয়েছে···। মামাতো বোন মঞ্জু যখন ওর কাছে এসে সিনেমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ তুলতো, তখন সে সবেগে মাথা নেড়ে বলে উঠতো—"দূর্, তোদের নিয়ে কি রাস্তায় বেরোবার আছে! 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা' এ কথা তোরা ভুললেও আমি ভুলিনি।"

মামীমা শুনে হাসতেন···তিরস্কারের সুরে বলতেন,—"পাগল ছেলে! বোন আবার 'নারী' কি রে!"

ব্রহ্মচারী তর্কে পেরে উঠতো না—শেষে বাড়ী ছেড়ে পালাত। ···তার ওপরে মামা যে আশা করতেন···ব্রহ্মচারীকে ঘিরে মামার যে-স্বপ্ন···শুধু নামের জোরে ব্রহ্মচারী তার ওপরেও টেক্কা দিয়েছে এই চব্বিশটা বছর ধরে।···সেই নাম···সেই ব্রত আজ নিষ্ফল হতে চলেছে। গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে রমেশ বাবুর বাড়ীতে তার সমাধি, কৌমুদী তার কফিন্!

কৌমুদী রমেশ বাবুর তৃতীয়া কন্যা। বাড়ীতে পোষ্য অনেকগুলি। বড় মেয়ে দু'টির বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়ে গেছে। তার পর কৌমুদী। কৌমুদীর পরে চারটি ছেলে···দু'টি মেয়ে। বড় মেয়েদের বিয়ে হয়েছে সৎপাত্রে। বয়সে তারা রমেশ বাবুকে ছাড়িয়ে গেলেও ঐশ্বর্য্য তাদের প্রচুর···সুতরাং কৌমুদীর দিদিরা আর্থিক জগতে সুখী। কিন্তু কৌমুদী চায় না এমন সুখ, এত ঐশ্বর্য্য···সে চায় রোমান্স! ওকে দোষ দেওয়া যায় না। দেখতে সুন্দরী না হলেও কৌমুদী নেহাৎ কুৎসিত নয়। সবার ওপরে যুগের হাওয়া! ভালো লাগে ওর হাসিটুকু, কথা বলার ভঙ্গীও চমৎকার···ঈষৎ-ফাঁক-হয়ে-যাওয়া ঠোঁট দু'টির মধ্য থেকে উঁকি দেয় সুন্দর সেট্-করা কুন্দ-শুভ্র দাঁতগুলি। রঙের জৌলুশ না থাকাতে অনেক পাত্রপক্ষের অভিভাবকদের কাছে পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি···সুতরাং বাধ্য হয়েই তাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। স্বয়ং রমেশ বাবুও সকলের মতে মত দিয়েছেন কতকটা নিরুপায় হয়ে। বৃদ্ধা পিসিমা তার উপর কৌমুদীর সহায়।

···ব্রহ্মচারীর সঙ্গে ওদের আলাপ হয়ে গেল নেহাৎ বিধাতার ইচ্ছায়! তাতে ব্রহ্মচারীর নিজের কোন হাত ছিল না।

এম, বি পাশ করে সে গিয়েছিল কন্‌ভোকেশনে ডিগ্রী আনতে—ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এলো যখন···তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দু'বছরের সাধনার ধন আজ তার হাতের মুঠোয়! সারা শরীরে রোমাঞ্চ! অন্তরের অন্তস্তলে কে যেন গুন্‌গুন্ করে বলে চলেছে···

"এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাব
কে মোরে রাখিবে ধরে?"

এর শেষাংশটুকু যে পর-মুহূর্ত্তেই ওর জন্য প্রতীক্ষা করছিল, সেটুকু ওর জানা ছিল না···জানলো পরে।

মামাতো বোনের শ্বশুরবাড়ী গ্রে ষ্ট্রীটে। কন্‌ভোকেশন-গাউন পরে ডিগ্রী হাতে নিয়ে দ্রুতপদে সে পথ অতিক্রম করে চলেছে··· হঠাৎ মুস্কিল বাধালো রাস্তার একটা কুকুর। ঘন অন্ধকারের রহস্যভরা রাস্তায় গাউন-পরা ব্রহ্মচারীকে কুকুরটার বোধ হয় মনঃপূত হলো না। হয়তো মনে করলে অদ্ভুত একটা-কিছু···করলে তাড়া···ঘেউ···ঘেউ ঘেউ! ব্রহ্মচারী প্রাণপণে ছুটে চললো···কুকুরও ছুটেছে। রাস্তা প্রায় জনবিরল বললেই হয়···বাড়ীগুলিরও সব দরজা প্রায় বন্ধ। মোড়ের ওপরেই একটা বাড়ীতে আলো জ্বলছে···নীচের ঘরে। দ্বিধা না করে সজোরে দরজা ঠেলে ব্রহ্মচারী ভিতরে ঢুকে পড়লো। তার পর এলেন রমেশ বাবু···এলেন পিসিমা···এলো কৌমুদী। আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হলো না বরং কিছুই বেশী বলা যেতে পারে। ধীরে ধীরে ব্রহ্মচারীর মনের কোণে কিসের একটা যেন ভাঙ্গা-গড়া হয়ে গেল। সে বুঝতে পারলো, ভাঙ্গলো ওর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত···ভাঙ্গলো ওর কৌমার্য্য!

ব্রহ্মচারী আর কৌমুদী অগ্রসর হয়ে গেলো অনেক দূর···সিনেমা, রেস্তোরা···কার্জ্জন পার্ক···প্রতিদিনের সন্ধ্যার নীরব অবসরে হয়ে উঠতো মুখর ওদের দু'জনের কল-কাকলীতে! হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে শত বীণা-বেণুর ঝঙ্কার! স্নায়ুতে স্নায়ুতে রোমাঞ্চের সুমধুর আবেশ!

লেকের কালো জলে সন্ধ্যার ম্লান আভায় কৌমুদীর কাণে কাণে যখন ব্রহ্মচারী অস্ফুটে আবৃত্তি করলে—

"এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাব
কে মোরে রাখিবে ধরে
কে আমারে পারে আঁকড়ি ধরিতে
দু'খানি বাহুর ডোরে···"

তখন ওর হাত দু'খানি ধরে কৌমুদী যে কি উত্তর দিয়েছিল তা শুধু ব্রহ্মচারীই জানে। বর্ষণমুখর নীরব সন্ধ্যায় নির্জ্জন গৃহে আজ সেই কথাটি মনে হতেই ব্রহ্মচারীর সারা দেহের উপর দিয়ে পুলকের শিহরণ বয়ে গেল।···

২

বসন্তের বাতাস সবেমাত্র বইতে সুরু করেছে···কৌমুদীর মুখে গানের গুঞ্জরণ···

মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখি জাগো···সখি জাগো···

স্নান সেরে এসে কৌমুদী প্রসাধন-পর্ব্বের উদ্যোগ করছিল··· নীচে থেকে পিসিমা ডাক্ দিলেন—"কুমু···ও মা, একবার নীচে আয়।"

কুমু সাড়া দিলে—"কেন পিসিমা ?"

"ক্ষীরকমলা কববো···লেবু কটা ছাড়িয়ে দিবি !"

সে দিন ওর পাকা দেখা···আশীর্ব্বাদ করতে আসবে ব্রহ্মচারীর বন্ধু-বান্ধবরা···মামা দূব বিদেশে···সুতরাং আশা-ভরসা যা কিছু বন্ধুদেব ওপরেই ! আয়োজন যে বেশী হবে, সে কথা বলা বাহুল্য। পিসিমা কোমর বেঁধে কাজে লেগেছেন। দ্রুতপদে কৌমুদী নীচে নেমে এলো সাহায্য করতে।

"তুই খাবি ? খা না দুটো কোয়া।"

"দেখো···কম পড়বে না তো ?"

"ও মা, কম হবে কি রে ! এতগুলো লেবু রয়েছে···খা না···"

"তবে দাও। দাঁড়াও, আগে এটা খুলে রাখি।"

সুন্দর সেট্-করা ব্রীজ-শুদ্ধ বাঁধানো চারটি দাঁত খুলে রেখে কৌমুদীর কমলালেবু ছাড়ানো আর খাওয়া দুই-ই চলতে লাগলো। ছোটবেলায় কবে কোন্ অশুভ গ্রহের প্রকোপে পড়ে কৌমুদীর চারটি দাঁত যায় ভেঙ্গে—তার পর থেকেই এই ব্যবস্থা।

কাজ যখন পুরো দমে চলেছে···কৌমুদীর ছোট ভাই এসে ডাক্ দিলে,—"দিদি জল্দি···পিসিমা তুমিও এসো···মা আলমারি খুলে বসে আছে, শাড়ী-টাড়ী কি সব পছন্দ করতে হবে···বাবা কিনতে যাবেন···এসো শীগগির।"

হাতের কাজ ফেলে রেখে লাফাতে লাফাতে কৌমুদী চলে গেল। পিছন পিছন গেলেন পিসিমা।

একটু পরেই দোতলার বারান্দা থেকে কৌমুদীর সজল কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"পিসিমা—ও পিসিমা···"

পিসিমা সাড়া দিয়েও বিশেষ উপকার করতে পারলেন না···ব্রিজ-শুদ্ধ দাঁত চারটি বামী ঝি কমলালেবুর খোসার সঙ্গে কখন যে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছে কেউ জানে না। শাড়ীর প্রাচুর্য্যের মধ্যে সকলে ছিলেন ডুব দিয়ে···সকলের অলক্ষিতে এত বড় সর্ব্বনাশ হয়ে গেল কার নির্দ্দেশে···কে জানে !

রমেশ বাবু বাড়ী ফিরে এসে সব শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কৌমুদী শয্যা নিয়েছে···পিসিমা বামীকে গালাগাল দিয়ে সারা বাড়ী তোলপাড় করছেন। সকলের অবস্থাই অবর্ণনীয়। ছোট ছোট ভাই-বোনগুলি ভয়ে কাঁটা···বিকেল পাঁচটার মধ্যে বরপক্ষের সকলে এসে পড়বে। মাস-ছয়েকের উপর্য্যুপরি চেষ্টার ফলে যদি বা এক জনকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া গেল···এই দুর্ঘটনার জন্য তাকেও কি আজ হারাতে হবে ?

কৌমুদীর চোখে অশ্রুর বন্যা বয়ে চলেছে হু-হু করে।

মা পরামর্শ দিলেন—"ওখানে চিঠি লিখে দাও···মেয়ের অসুখ করেছে হঠাৎ···আশীর্ব্বাদ আজ বন্ধ থাকুক।"

"তা হলেও ব্রহ্ম ঠিক-ই আসবে···তখন ?···

"তখন যা হয় কিছু বলা যাবে। এখন উপস্থিত তো সামলাও আগে।"

মায়ের পরামর্শ-মত কাজ করা হলো। সারা বাড়ী নিঝুম হয়ে পড়েছে···অমঙ্গলের ছায়া বাড়ীর আনাচে-কানাচে। সকলের আহার-নিদ্রা বন্ধ···সকলেরই দারুণ উৎকণ্ঠিত ভাব।

৩

বাঙালীর পাঁচটা···সাজতে-গুজতেই ব্রহ্মচারীর বন্ধুদের সাতটা বেজে গেল—বাড়ী থেকে বেরোতে যাবে···একটা ছোট ছেলে একখানি চিঠি দিয়ে দ্রুতপদে চলে গেল। চিঠি পড়ে সকলে অবাক···কৌমুদীর অসুখ।

ব্রহ্মচারীর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো···যদি না বাঁচে ? যদি কিছু হয় ? বন্ধুদের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললে—ভাই ! ···কথাটা শোনালো অনেকটা আর্ত্তনাদের মত।

বন্ধুরা আশ্বাস দিলে,—"ভয় কি ? আমরা আছি···পালা করে রাত জাগবো।"

সকলের মধ্যে বিমল বয়োজ্যেষ্ঠ···ব্রহ্মচারীকে উপদেশ দিয়ে বললে,—"তুই একবার ঘুরে আয়···তার পর দেখিস যদি শক্ত অসুখ ···তাহলে আমাদেরও যেতে হবে।"

কোন রকমে পায়ে জুতো জোড়া গলাতে গলাতে ব্রহ্মচারী বাড়ী থেকে বার হয়ে গেল।

রাত্রি আটটা। কৌমুদীদের বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠলো। বাড়ীর মধ্যে তখন কৌমুদী কাতর কণ্ঠে ছোট ভাইদের অনুরোধ করছে, "একবার যা ভাই তোরা···রাস্তার ডাষ্টবিনটা খুঁজে আয়।"

ভায়েরা আপত্তি জানালে,—"বা রে, রাস্তায় কি ঘুরঘুট্টি অন্ধকার···তা জানো না বুঝি। তার উপর ব্ল্যাক্-আউট্···"

"হারিকেনটা নিয়ে যা···লক্ষ্মী ভাইটি !"

অনুরোধের মাঝখানেই কড়া নড়ে উঠলো সজোরে···মন্টু ছুটে গেল। একটু পরে ফিরে এলো হাঁপাতে হাঁপাতে।

"দিদি···ব্রহ্ম দাদা !"

"এ্যাঁ !" কৌমুদী ছুটলো শয়ন-ঘরের উদ্দেশে।

ব্রহ্মচারীকে মাঝ-পথে আটকালেন পিসিমা।

"এই যে বাবা ব্রহ্ম, কুমুর বড় অসুখ···আজ সকাল থেকে কি যে হয়েছে জানি না বাবা···ডাক্তার ওর ঘরে যেতে বারণ করেছে।"

"সে কি ! আমিও যেতে পারি না ? অসম্ভব !" ব্রহ্মচারীর স্বরে উৎকণ্ঠা ! সকলের বাধা আপত্তি অগ্রাহ্য করে ব্রহ্মচারী কৌমুদীর ঘরে এলো। বিছানার উপর শায়িত···কৌমুদীর মুদ্রিত দু'টি চোখের কোণ দিয়ে বয়ে চলেছে জলের স্রোত···সারা দেহ মাঝে মাঝে শিউরে শিউরে উঠছে···খানিকটা ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে···খানিকটা হয়তো বা ভয়ে !

"কুমু···কুমু···কৌমুদী···" আকুল স্বরে ব্রহ্মচারী ডাকতে লাগলো। তবু কৌমুদীর ফুল্লকুসুম তুল্য অধরের প্রান্তভাগ একটুও ফাঁক হলো না।

মা এসে বললেন—"কথা বলতে পারছে না বাবা। দেখছো না, কত কষ্ট হচ্ছে !'

"ডাক্তার কি বলেছে ?"

"তিন জন ডাক্তার তিন রকম বলে গেছে বাবা ! কেউ বললে— গলায় কি হয়েছে ! কেউ বললে—চোয়াল আটকে গেছে···কেউ বা বললে—মাথার ব্যামো। কেউই ধরতে পারলে না।"

"তাইতো···ওষুধ কিছু দিয়ে গেছে ?"

ব্রহ্মচারীর প্রশ্নে মা-পিসিমা ব্যস্ত হয়ে দূরের একটা টেবিল দেখিয়ে দিলেন। ব্রহ্মচারী উঠে গিয়ে দেখলে—কুইনিন, এক্স নম্বর ওয়ান,

মকরধ্বজ, ভাইব্রোনা, ক্যাম্ফার-কম্পাউণ্ড, ওয়াটার বেরী কম্পাউণ্ড, ভিনোমণ্ট, ইউক্যালিপটাস্, টিংচার আয়োডিন, বেন্‌জিন ইত্যাদি।··· ডজন-খানেক শিশি-বোতল।

আশ্চর্য্য হয়ে ব্রহ্মচারী বললে—"কি আশ্চর্য্য···কোন্ ডাক্তার দেখছে? এত সব ওষুধের শিশি···অথচ অসুখ বলছেন···আচ্ছা, আমি আজ-ই ডাক্তার নিয়ে আসৃছি···মনটুকে একবার ডেকে দিন তো।"

মা, পিসিমা চোখে অন্ধকার দেখলেন! কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃ ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি সত্ত্বেও মনটুকে কোথাও পাওয়া গেল না।

ব্রহ্মচারী অগত্যা রাস্তায় বেরিয়ে এলো। দেখলে, কিছু দূরে লণ্ঠনের আলো। দু'টি তিনটি ছেলে রাস্তার এক কোণে উপুড় হয়ে কি করছে। এগিয়ে গিয়ে ব্রহ্মচারী অবাক্ হয়ে গেল···"এ কি··· তোমরা? বাড়ীতে এত অসুখ···আর এখানে কি করছো? এসো আমার সঙ্গে। কি হারিয়েছে···টাকা-পয়সা?"

ভালো করে কোন উত্তরই পাওয়া গেল না। ব্রহ্মচারীর অনর্গল কথার উত্তরে লণ্ঠনটি রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে সনটু মনটু যে যে-দিকে পারলো, দৌড়ে পালিয়ে গেল।

৪

পরের দিন ডাক্তার-বন্ধুকে নিয়ে ব্রহ্মচারী যখন কৌমুদীদের বাড়ী এলো, তখন রোদে রোদে সারা কলকাতা সহর গেছে ভরে। উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য সমস্ত বাড়ীটিকে ঘিরে রেখেছে···ব্রহ্মচারীর সঙ্গে এলো সুবোধ, পরেশ, বিকাশ আর অজিত।

প্রথমেই কলতলায় দেখা হয়ে গেল রমেশ বাবুর সঙ্গে। রমেশ বাবু হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন—"বাবা ব্রহ্ম···মেয়ে আমার একেবারে অসাড় হয়ে পড়ে আছে।"

"সে কি?"

কাউকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ব্রহ্মচারী আর্ত্তনাদ করে ওপরে ছুটলো বন্ধুদের পিছনে ফেলে রেখে। বন্ধুদের মধ্যে অজিত সকলের চেয়ে মাথায় ছোট—তবু উপস্থিত বুদ্ধি তার সকলের চেয়ে বেশী। বিমূঢ় পরেশ, বিকাশ আর সুবোধকে নিয়ে অজিত তড়্‌তড়্ করে ওপরে উঠে গেল।

চাদর মুড়ি দিয়ে পড়েছিলো কৌমুদী।···পিসিমা ছুটে এলেন ···মা ঠাকুরঘরে ছুটলেন···তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে মানত্ করতে।···আর রমেশ বাবু ঢুকলেন বৈঠকখানায়···তিন হাঁটু এক করে মাথাটা তার মধ্যে গুঁজে বসে রইলেন। অন্তরে আকুল প্রার্থনা—"ভগবান, এ যাত্রা রক্ষা করো···তার পর একশো দু'শো তিনশো টাকা দিয়ে দাঁত কিনে আনবো। উঃ, কেন যে কাল আনিনি!"

···ও-দিকে ওপরে তখন দারুণ সঙ্কট।

অনেক পরীক্ষার পরে ডাক্তার বল্লেন—"ল্যারিংজাইটিস্···ওষুধ খাওয়াতে হবে—গলার মধ্যে পেণ্ট্ও করতে হবে।"

কিন্তু কৌমুদীর মুখ একেবারে বন্ধ···এতটুকু ফাঁক চোখে পড়ে না। ডাক্তার আর বন্ধুদের চেষ্টা চলতে লাগলো···পিসিমা আর্ত্তকণ্ঠে বললেন—"বাবা ব্রহ্ম, কেন বাছাকে আমার এত কষ্ট দিচ্ছ? ভাখো, ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছে···কত কষ্ট হচ্ছে।"

ব্রহ্মচারী চেয়ে দেখলে কৌমুদীর নিমীলিত আঁখির কোণে অশ্রুর প্রস্রবণ।

চব্বিশ বছরের ব্রহ্মচর্য্য ভাঙ্গা···ছ'মাসে গড়ে-ওঠা অন্তরের অন্তস্তলে প্রেমের কমল-কলি! করুণায় ব্রহ্মচারীর মন হয়ে উঠলো আর্দ্র···তবু পারলো না ডাক্তারকে বাধা দিতে।

···ঘণ্টা দুয়েক ধরে সকলের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে কৌমুদীর ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে কৌমুদীর শয্যার ওপরে ঝুঁকে পড়লো। ব্রহ্মচারীর হাতে ওষুধ···ডাক্তারের হাতে থোট্ পেণ্টের তুলি···আর অজিতের হাতে টর্চ্চ···সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কৌমুদীর মুখের ওপর।

একটি পরিষ্কার চামচ্ নিয়ে কৌমুদীর মুখের মধ্য দিয়ে ডাক্তার ঈষৎ চাপ দিলেন···অজিতের টর্চ্চের উজ্জ্বল আলোয় কৌমুদীর সমস্ত মুখ হয়ে উঠলো উদ্ভাসিত।

"ও মা···এ যে বিরাট গহ্বর!"

"ব্রহ্মচারী কি আমাদের বিশ্ব-রূপ দেখাতে নিয়ে এলি?"

অজিতের শ্লেষের হাসিতে বিস্ময়াভিভূত ব্রহ্মচারী বললে—"তার মানে?"

"মানে আর কি! সারা জীবনের ব্রহ্মচর্য্য তোর ভাঙ্গলো শেষে কি এই দন্তরুচি-কৌমুদী?"

পিসিমা দরজা দিয়ে ছুটে পালালেন।

মূর্চ্ছিত কৌমুদীর পাল্‌স্ দেখতে দেখতে ডাক্তার বল্লেন,—"চুপ চুপ···গোল করো না···ওষুধটা ঢেলে দাও···"

"ওষুধ আর কোথায় ঢালবো শুর? সবটাই যে···"

পলায়নোদ্যত বিস্ময়াভিভূত ব্রহ্মচারীর জামা চেপে ধরলো ওরা—"এই, পালাচ্ছিস কোথা?"

খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে রমেশ বাবু এলেন ছুটে···আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলে গেলেন।

সমস্ত শুনে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারী চেয়ে রইলো কৌমুদীর দিকে! মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো,—"ইমপার্টিনেণ্ট! অসহ্য!"

তার পর দুম্‌দুম্ করে ঘর থেকে সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

৫

···তার পরের কথা খুবই সামান্য। উপসংহারে এইটুকু বলা যেতে পারে···সে দিনের পর থেকে ব্রহ্মচারীর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। অনেক বিজ্ঞাপন, অনেক পুরস্কার-ঘোষণা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

পাঁচটি বছর অতীতের অতল গহ্বরে ডুবে গেছে—ব্রহ্মচারীর কথা সকলে প্রায় ভুলতে সুরু করেছে···

হঠাৎ সে দিন সন্ধ্যাবেলা সকলে রেডিয়োতে শুনতে পেলে—ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টের ভারতীয় সৈন্যদের নামের তালিকায় ব্রহ্মচারীর নাম।

সকলের বিস্ময়-ভরা দৃষ্টির ওপর ভেসে উঠলো পাঁচ বছর আগেকার একটি ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী!

শ্রীপ্রতিমা ঘোষ

বৈষ্ণবমত-বিবেক

লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামী

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

লীলাশেষ

শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগামী বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও ভজনে আদর্শস্থানীয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এত নিরভিমান ও দৈন্যের খনি ছিলেন যে, তাঁহাদিগের নিজ নিজ চরিত-কথা তাঁহারা সযত্নে গোপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ যখন রচিত হয়, তখন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, কাঞ্চনগড়িয়ার দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর-প্রমুখ বৈষ্ণবেরা অবস্থান করিতেন, কিন্তু চরিতামৃতকার শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরিত্র স্বীয় গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীজীবের সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই পাওয়া যায়। তদানীন্তন অন্যান্য ভক্তগণ সম্বন্ধে আর কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে যে, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী তাঁহাদিগের কোনও কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, পরবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস এ প্রেমবিলাসে লোকনাথের কথা কিছু কিছু পাওয়া গেলেও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী যে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর অভিন্ন-হৃদয় অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ছিলেন, ইহা প্রথম হইতেই শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর জীবনী আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। শ্রীভূগর্ভ শ্রীলোকনাথের সমীপেই অবস্থান করিতেন। তিনি শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ভজন-সহচর ছিলেন এবং লোকনাথের মধ্যেই একরূপ নিজের সত্তাকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। লোকনাথ গোস্বামীও যেমন শিষ্য করিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, ভূগর্ভ গোস্বামীরও বোধ হয় অনুরূপ সংকল্প ছিল। শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর কোনও শিষ্যের কথা কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না। মাত্র বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থাবলীতে ভূগর্ভ গোস্বামীর উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। ভক্তিরত্নাকরে চতুর্দ্দশ বিলাসে শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীবৃন্দাবন হইতে যে লিখিত পত্র কয়েকখানি পরিদৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে প্রথম পত্রে শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর সম্বন্ধে পাওয়া যায় যে—"শ্রীভূগর্ভ গোস্বামিচরণে দেহং সমর্পিতবন্ত আত্মানন্ত শ্রীবৃন্দাবননাথায় জ্ঞানপূর্ব্বকমিতি বিশেষঃ।" শ্রীজীব শ্রীনিবাস আচার্য্যকে লিখিয়াছেন যে, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী—দেহ ও আত্মাকে শ্রীবৃন্দাবননাথের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক, ইহাই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জীবনে চিরদিন একত্র থাকিলেও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর সমাধি শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর-মন্দিরের প্রাঙ্গণের একটি গৃহে অবস্থিত, ঐ গৃহেই ঐ সমাধির অপর পার্শ্বে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি অবস্থিত। পরন্তু শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সমাধি গোকুলানন্দে অবস্থিত।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমকে দীক্ষাদান করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবশাস্ত্র বিশেষতঃ গোস্বামিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার জন্য শ্রীজীবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। নরোত্তমও শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি প্রমুখ বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়নে তন্ময় হইলেন। অধ্যয়নের সময়েও নরোত্তম নিয়মপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের সেবায় সর্ব্বদা অবহিত হইতেন। বলা বাহুল্য, শ্রীগুরু-দেবের স্নেহে তাঁহার শাস্ত্রে পঠিত বিষয় সমস্তই উপলব্ধি হইতে লাগিল। তিনি সিদ্ধদেহে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাপরায়ণা সখীবৃন্দের অনুগামী হইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মানস সেবায় তন্ময় হইয়া গেলেন। নরোত্তমের এই সিদ্ধদেহের সেবা সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে একটি উপাখ্যান পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

> শ্রীনরোত্তমের বৈছে মানসে সেবন।
> তাহা একমুখে বা বর্ণিব কোন্ জন॥
> একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে।
> বিলসয়ে নিকুঞ্জেতে পরম প্রেমরঙ্গে॥
> শ্রীরাধিকা কৌতুকে কহয়ে সখীপ্রতি।
> এথা ভক্ষ্যদ্রব্য শীঘ্র কর সুসঙ্গতি॥
> ললিতাদি সখী মহা উল্লসিত হৈয়া।
> তক্ষণ সামগ্রী সবে করে যত্ন পাইয়া॥
> নরোত্তম দাসীরূপে অতি যত্নমতে।
> দুগ্ধ আবর্ত্তন করে সখীর ইঙ্গিতে॥
> উথলে পড়য়ে দুগ্ধ দেখি ব্যস্ত হৈলা।
> চুল্লী হইতে দুগ্ধপাত্র হস্তে নামাইলা॥
> হস্ত দগ্ধ হৈল তাহা কিছু স্মৃতি নাই।
> দুগ্ধ আবর্ত্তন করি দিলা সখী ঠাঁই॥
> মনের আনন্দে রাধাকৃষ্ণে ভুঞ্জাইল।
> অবশেষ লভ্যমাত্রে বাহ্যজ্ঞান হৈল॥
> দগ্ধ হস্ত দৃষ্টিমাত্রে কৈলা সঙ্গোপন।
> জানিলেন মর্ম্ম অন্তরঙ্গ কোন জন॥
>
> —ষষ্ঠ তরঙ্গ।

বলা বাহুল্য, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমের এই সেবা-সৌকর্য্য দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনস্থ ভক্তচূড়ামণিগণের অভিমত গ্রহণ করিয়া নরোত্তমকে "ঠাকুর মহাশয়" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। এইরূপে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের সময় শ্রীল গৌরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের একটি উপযুক্ত শিষ্য শ্রীবৃন্দাবনে সমাগত হইয়াছিলেন। ইনিও শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তমের সহিত একসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইঁহার পূর্ব্বনাম দুঃখী কৃষ্ণদাস; শাস্ত্রাধ্যয়নজনিত অনুভবানন্দের সহিত ইনি শ্রীরাধিকার যে অলৌকিক কৃপা প্রাপ্ত হন, তাহার ফলে ইনি শ্যামানন্দ নামে অভিহিত হন। যাহা হউক, একমাত্র শিষ্য নরোত্তমকে লোকনাথ গোস্বামী সর্ব্বপ্রকারে আদর্শ বৈষ্ণবে পরিণত করিলেন।

শ্রীজীব এই তিনটি শিষ্যকে অধ্যাপনা করাইয়া ইঁহাদের দ্বারা গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলে ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত; এই জন্য তিনি তাঁহাকেই এ বিষয়ে নেতৃত্বে বরণ করিয়া নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ ঠাকুরকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীও বৈষ্ণব সমাজের এই কালে শ্রীজীবের সর্ব্বপ্রকারে অনুমোদন করিয়া তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের পুত্রাধিক একমাত্র শিষ্যকে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আচারের ও প্রচারের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনি অনেক পরীক্ষা করিয়া নরোত্তমকে শিষ্য করিয়াছিলেন—এই জন্য নরোত্তমের শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার কোনও সন্দেহ ছিল না। তিনিই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে তিনি উপযুক্ত শিষ্য পাইলে তাহাকে দীক্ষা দিতে আদেশ করিলেন। নরোত্তম জানিলেন যে, গুরু লোকনাথ গোস্বামী এবার তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশের বহু জনকে কৃপা করিবেন। নরোত্তম বুঝিলেন এবং অনুভব করিলেন যে, তাঁহার দেহ, মন ও বুদ্ধি তাঁহারই গুরুদেবের লীলাক্ষেত্র—গুরুদেব তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন।

শ্রীজীব সম্পুট সাজাইয়া গ্রন্থাবলী সিন্দুকের মধ্যে পূর্ণ করিয়া শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে সমাগত হইলেন। শ্রীলোকনাথ, ভূগর্ভ গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ গোস্বামিগণ যথারীতি আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ইঁহাদিগের সহিত গো-শকটে পূরিয়া গ্রন্থরাজি পাঠাইবার ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী অতিকষ্টে নরোত্তমকে বিদায় দিলেন এবং তাঁহাকে পরম স্নেহভরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন। নরোত্তমের সহিত ইহজীবনে যে আর তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে না—এ কথা বলিলে নরোত্তম দুঃখে জ্ঞানহারা হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। লোকনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া স্বীয় ভজন-কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। লোকনাথ যেমন ধীর ভাবে ভজনে দিবারাত্রির মধ্যে সাড়ে সাত প্রহর কাল অতিবাহিত করিতেন, নরোত্তমকে বিদায় দিয়া সেই বৃদ্ধকালেও নিষ্ঠাভরে সেইরূপ ভজন ও শ্রীরাধাবিনোদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

লোকনাথ গোস্বামীর পূর্ব্বনিবাস যশোহর জেলায় তালখড়ি গ্রামে ছিল। যাঁহারা যশোহর রাজ্যের স্থাপয়িতা সেই বিক্রমাদিত্যের পিতৃব্য ও বসন্ত রায়ের পিতা গুণানন্দ গুহ এ সময়ে সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীগোবিন্দভজনের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। যত দূর জানা যায়, তাহাতে গুণানন্দও শ্রীজীব গোস্বামীর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদেশেই গুণানন্দ শ্রীল মদনমোহনের সুবৃহৎ মন্দির নিম্মাণে প্রবৃত্ত হন।

১৪৯৮ শকাব্দে, ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আকবরের যুদ্ধে গৌড়ের স্বাধীন পাঠান নৃপতি দায়ুদ খাঁ মোগলের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। যুদ্ধের পূর্ব্বে দায়ুদ ও তাঁহার অনুচরগণ বিক্রমাদিত্যের ও বসন্ত রায়ের হস্তে তাঁহাদের যাবতীয় সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া যান। এই বিপুল সম্পত্তির একাংশের দ্বারা যশোহরে গৌড়ের যশ হরণপূর্ব্বক বিক্রমাদিত্যের ও বসন্ত রায়ের রাজধানী নির্ম্মিত হইল এবং অপরাংশ শ্রীবৃন্দাবনে বসন্ত রায়ের পিতা গুণানন্দের নিকট প্রেরিত হইলে তদ্দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের আদিত্যটীলায় শ্রীল মদনমোহনদেবের সুবৃহৎ অভ্রভেদী মন্দির নির্ম্মিত হয়। আমাদের মনে হয়, আনুমানিক ১৫০০ শকাব্দে (১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে) এই সুবৃহৎ মন্দিরের নিম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং তাহার ২।৩ বৎসরের মধ্যেই মন্দিরের নিম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ ও শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী উভয়েই এই মন্দিরে শ্রীল মদনমোহনকে বিরাজিত দেখিয়া পরমা তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।*

পরবর্ত্তী, এই সময়ে উৎকল দেশ হইতে শ্রীল মদনমোহন দেবের জন্য শ্রীরাধিকা ও ললিতা এবং শ্রীগোবিন্দ দেবের জন্য শ্রীরাধিকা আনীত এবং প্রতিষ্ঠিত হন, শ্রীল গোপালভট্ট ও শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।† উৎসবমুখর শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যেও শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী স্বীয় ভজননিষ্ঠায় কঠোরতার হ্রাস করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর শ্রীরাধাবিনোদের বাম পার্শ্বে শ্রীরাধিকা প্রতিষ্ঠিত হন।‡

শ্রীবৃন্দাবনের এই পরমানন্দের যুগের অবসান না হইতেই শ্রীল সনাতন, শ্রীরূপ, ও শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব হইল। ইহার পর বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থ লুণ্ঠনের সংবাদ আসিল—কিন্তু অত্যল্প-কাল মধ্যেই সে নিরানন্দ সংবাদ আনন্দের সংবাদে পরিণত হইল। সকলেই জানিতে পারিলেন যে, গ্রন্থ লুণ্ঠনকর্ত্তা বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের পদে আত্মসমর্পণ করিয়া গৌড় ও বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সহায়ক হইয়াছেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রথম বয়সে শ্রীভাগবতের টীকা লিখিয়া-ছিলেন। কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী যখন শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে বৃন্দাবনে থাকিয়া গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন হইতে তিনি আর লেখনী ধারণ করেন নাই।¶

---

* এই মন্দিরের গাত্রে যে লিপি খোদিত আছে, তাহাতে বাঙ্গালা ও দেবনাগরী উভয় জাতীয় অক্ষরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে :—

"ইহ হীর গুহবংশ্যো যৎপিতা রামচন্দ্রো
গুণিমণিরিব পুত্রো যস্য রাজা বসন্তঃ।
সকলগুরুতরাশিঃ শ্রীগুণানন্দনামা
ব্যধিত বিবিধদেবস্মন্দিরং নন্দসূনোঃ॥"

† পরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীরাধিকা কি প্রকারে উৎকলে বৃহদ্ভানু বিপ্রের বাৎসল্য বশে গিয়াছিলেন, সাধনদীপিকা হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধার করিয়া ভক্তিরত্নাকরের ষষ্ঠ তরঙ্গে তদ্বিষয় বর্ণিত আছে। উৎকল হইতে পুরুষোত্তম রাজা শ্রীরাধিকার বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথের মন্দির হইতে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। এই সকল বিষয় ভক্তি-রত্নাকরের ষষ্ঠ তরঙ্গে বর্ণিত আছে। (বহরমপুরের দ্বিতীয় সংস্করণ ভক্তিরত্নাকর ৪৫৮ পৃঃ হইতে ৪৬১ পৃষ্ঠা)

‡ এই রাধিকা যে কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। পরবর্ত্তী কালে আওরঙ্গজেবের অত্যাচারের সময়ে শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীল রাধামদনমোহন, শ্রীল রাধাগোপীনাথ ইত্যাদি মূর্ত্তিবিগ্রহ জয়পুর, করৌলী ইত্যাদি স্থানে নীত হইয়া এখনও তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। এখন শ্রীবৃন্দাবনে ইঁহাদের প্রতিনিধি-বিগ্রহ বিরাজমান।

¶ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, লোকনাথ গোস্বামীই "সীতাচরিত্র" নামক একখানি গ্রন্থের লেখক। গ্রন্থখানি আলাটীর 'ভক্তিপ্রভা' কার্য্যালয় হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আর যাহাই হউক, গ্রন্থখানি যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরে লিখিত এবং উহা যে আদৌ লোকনাথ গোস্বামি লিখিত নহে—গ্রন্থমধ্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী যত দিন শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট দেহে বর্ত্তমান ছিলেন, তত দিন শ্রীজীব তাঁহাকে শ্রীরূপ সনাতনের স্থলাভিষিক্ত মনে করিয়া গুরুর ন্যায় তাঁহার আদেশ পালন করিতেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া ও তাঁহার আদেশ না লইয়া কোনও কার্য্য করিতেন না। ফলতঃ, শ্রীল সনাতন গোস্বামী যাঁহার বৈষ্ণবতোষণী টীকায় যাঁহাকে "শ্রীবৃন্দাবনপ্রিয়" ও "শ্রীগোবিন্দপ্রেষ্ঠ" বলিয়া বন্দনা করা হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীজীবের এইরূপ সম্মানপূর্ণ ব্যবহার যে নিতান্ত সুসঙ্গত হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য।

কালক্রমে আকৌমার ব্রহ্মচারীর চিরজীবনের সাধনধন সিদ্ধদেহের সঙ্গোপনের প্রয়োজন হইল। সম্ভবতঃ ১৫১০ শকে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও সময়ে শতাধিক বর্ষ বয়সে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রকটদেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যলীলায় সমাবিষ্ট হন। শ্রীজীব যথা-সময়ে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত বরবপু শ্রীরাধাবিনোদের সন্নিকটে গোকুলানন্দ মঠে সমাহিত করেন এবং যথাবিধি মহোৎসবের বন্দোবস্ত করেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও যথাসময়ে এই শোক সংবাদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের সহিত নিত্য-সম্বন্ধে যুক্ত থাকায় শোকে তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শ্রীগুরুদেবের উদ্দিষ্ট কার্য্যে অধিকতর উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হইলেন। শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীল রামকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীল শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী ও মহামহোপাধ্যায় প্রতিভার বরপুত্র শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ শিষ্য-প্রশিষ্যগণের দ্বারাই শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর বরেণ্য নাম উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতর হইয়া বৈষ্ণবগণের স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া বিরাজ করিতেছে।

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভক্ত

শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছিলেন, তখন দক্ষিণ দেশের শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের মধ্যে ভক্তি ধর্ম্মের যে আদর্শ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব যে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের সহিত কখনও তাঁহার কোনও বিরোধ হয় নাই, কিন্তু তত্ত্ববাদী বা মধ্ব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ চলিয়াছিল এবং অবশেষে তত্ত্ববাদী আচার্য্য তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া একরূপ তাঁহার প্রতিপাদিত যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন, এ কথা আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলায় বর্ণিত দেখিতে পাই। কিন্তু মধ্বপ্রতিষ্ঠিত মঠসমূহের মধ্যে উত্তরাদি মঠই আদি মঠ এবং এখনও ঐ মঠের আচার্য্যই সমস্ত মধ্বসম্প্রদায়ের অধিনেতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। এই মঠের যে গুরুপ্রণালী পাওয়া যায়, তাহাতে ১৪২৮ শকাব্দ হইতে ১৪৭১ শকাব্দ পর্য্যন্ত রঘুবর্য্যতীর্থই যে ঐ মঠের আচার্য্য ছিলেন তাহা উত্তরাদি মঠের গুরুপ্রণালীর তালিকাতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ ১৪৩১ শকে এবং তাহার পরবর্ত্তী দুই বৎসরই স্থূলতঃ তাঁহার দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের সময় বলিয়া ধরিয়া লওয়া গেলে উত্তরাদি মঠের আচার্য্য রঘুবর্য্যতীর্থের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও বাদানুবাদ হইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত হয়, মধ্বসম্প্রদায়ের মধ্যে চিরদিন কর্ম্মমিশ্র ভক্তির ও চতুর্ব্বিধ মুক্তির প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেব তত্ত্ববাদীদিগের "কর্ম্ম ও মুক্তির" আদর্শ খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধা ভক্তির কথা শুনাইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রবোধানন্দ

কিন্তু শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিধর্ম্মের এই ভিত্তিগত আদর্শ সম্বন্ধে কোনও বাদানুবাদ হয় নাই। শ্রীরঙ্গমে বেঙ্কটভট্টের বাটীতে তিনি চাতুর্ম্মাস্যের চারি মাস কাল যাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তিনি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদকে আকর্ষণ করেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য গোপালভট্ট গোস্বামীকে নিজের অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে পরিণত করেন। আমরা শ্রীল গোপালভট্টের জীবনী আলোচনা করিবার সময় শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। শ্রীল প্রবোধানন্দ কি প্রকারে যতিবেশে শ্রীচৈতন্যকে প্রথমে স্বগৃহে দর্শন করেন তাহারও আমরা ঐ জীবনী প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীল প্রবোধানন্দ পরবর্ত্তী কালে শ্রীপুরীধামে আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করেন এবং সম্ভবতঃ সেখান হইতে তাঁহার আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকেই একমাত্র উপাস্য বলিয়া স্থির করেন, ইহা তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" গ্রন্থ পাঠ করিলেই নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা যায়। অনন্তর তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনশতক গ্রন্থেও শ্রীবৃন্দাবনের অপূর্ব্ব মহিমা এবং শ্রীরাধাগোবিন্দলীলার মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহাকে গৌরপারম্যবাদী (অর্থাৎ পরতত্ত্বরূপে শ্রীগৌরাঙ্গই একমাত্র উপাস্য এই মতাবলম্বী) বলিয়া স্থির করেন, তাঁহারা কিন্তু তাঁহার 'সঙ্গীতমাধব' গ্রন্থ পড়িলে তাহাতে শ্রীরাধাগোবিন্দলীলার প্রতি তাঁহার সুদৃঢ় নিষ্ঠার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের কোনও শ্লোক উদ্ধার করেন নাই। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গৌরপারম্যবাদ প্রচার করিয়াছেন বলিয়াই কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ হইতে কোনও

রহিয়াছে। আমরা এখানে উহার বিস্তৃত আলোচনায় বিরত থাকিয়া মাত্র ২।১টি কথার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। সীতাচরিত্র ও অদ্বৈতপ্রকাশে শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিত্র কাব্য প্রমুখ প্রামাণিক গ্রন্থের বিরোধী বহু কথা বর্ণিত হইয়াছে। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" নামক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থে "অদ্বৈতপ্রকাশ" "সীতাচরিত" "সীতাগুণ-কদম্ব" ও "অদ্বৈতমঙ্গলের" সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এই জাল গ্রন্থের বিচার ব্যাপারে অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার সহিত একমত। মূল পুঁথি না পাইলে ঐতিহাসিকের নিকট বহুস্থানেই সাক্ষ্য প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এই জন্য বিমান বাবু এই গ্রন্থগুলিকে যতটা প্রাচীন বলিয়া মনে করিয়াছেন, আমরা তাহাও মনে করিতে প্রস্তুত নহি। যদি সম্ভব হয়, তবে স্থানান্তরে ও সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। সীতাচরিত্রের মতে শ্রীচৈতন্যদেব না কি জন্মমাত্রই শ্রীরাধা বলিয়া সীতা ঠাকুরাণীকে আলিঙ্গন করিতে শ্রীভুজ বাড়াইয়াছিলেন।

শ্লোক উদ্ধার করেন নাই। কিন্তু সঙ্গীতমাধব গ্রন্থ ত' কবিরাজ গোস্বামীর অজ্ঞাত ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনশতকও কি তাঁহার অজ্ঞাত ছিল? শ্রীবৃন্দাবনের প্রাচীন বৈষ্ণবগণের নিকট এ বিষয়ে যে প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, আমরা তাহা বিবৃত করিয়াই কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর উল্লেখ মাত্র কেন করেন নাই তাহার একটি কারণ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

হরিবংশ গোস্বামী নামে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর এক জন শিষ্য ছিলেন। ভট্ট গোস্বামীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও একাদশীর উপবাসের দিনেও শ্রীরাধারাণীর তাম্বুল প্রসাদ গ্রহণ করায় গোপালভট্ট গোস্বামী হরিবংশকে ত্যাগ করেন। বৈষ্ণবসদাচারস্মৃতি হরিভক্তিবিলাসের গ্রন্থকার শ্রীল ভট্ট গোস্বামীর এইরূপ মর্য্যাদা হানি করায় শ্রীবৃন্দাবনস্থ তাৎকালিক বৈষ্ণবগণ সকলেই হরিবংশকে ত্যাগ করেন। কোথাও আশ্রয় না পাইয়া হরিবংশ গোপালভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য ও গুরু শ্রীল প্রবোধানন্দ গোস্বামীর চরণে একান্ত ভাবে শরণাগত হন। প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর মনে করেন যে, তিনি গোপালকে বলিয়া তাঁহার ক্রোধশান্তি করিয়া দিবেন এবং গোপাল তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। পরম করুণাময় শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী যদি পুনর্ব্বার প্রসাদ জ্ঞানেও তাম্বুল গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেন, তবে হয়ত হরিবংশকে ক্ষমা করিতে পারিতেন। কিন্তু হরিবংশ একাদশীর দিনেও প্রসাদী তাম্বুল গ্রহণ না করিয়া পারিবেন না। অতএব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সদাচার রক্ষার জন্য গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর আদেশেও হরিবংশের একাদশীর উপবাসের দিনে প্রসাদী তাম্বুল ভক্ষণের অনুমোদন করিতে পারিলেন না। এ দিকে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীও একবার আশ্রয় দিয়া হরিবংশকে আর ত্যাগ করিতে পারিলেন না। হরিবংশ নিজে প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরকে গুরু করিয়া শ্রীরাধাবল্লভী সম্প্রদায় নামে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে এখনও এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ একাদশীর দিনে—মাত্র তাম্বুল নহে—শ্রীভগবৎপ্রসাদজ্ঞানে অন্নাদিও গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার ও পাঞ্চরাত্র বিধির অধীন না হইলে আত্যন্তিকী হরিভক্তিও উৎপাতের কারণ হইয়া থাকে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই ঘটনাতে সেই উৎপাতেরই পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া শ্রীল প্রবোধানন্দ গোস্বামীকে পূজনীয় বলিয়া প্রণাম করিলেও হরিবংশ গোস্বামীর প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া প্রসাদে "ঐকান্তিকী" ভক্তিরূপ উৎপাতের সমর্থন করিতে পারিলেন না এবং হরিবংশ বা তাহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর রচিত গ্রন্থাবলীর কোনও শ্লোক ছয় গোস্বামীর বা কবিরাজ গোস্বামীর কোনও গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই।

ভক্তিরত্নাকরের নবম তরঙ্গে * বর্ণিত আছে যে, শিখর ভূমির রাজা হরিনারায়ণ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা লইবার জন্য ব্যগ্র হন, কিন্তু তিনি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট, এই জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্য নিজে তাঁহাকে দীক্ষা না দিয়া শ্রীরঙ্গম্ হইতে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য পুত্র শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভ্রাতা ত্রিমল্লভট্টের পুত্রকে লোক পাঠাইয়া পত্র দ্বারা শিখর ভূমির রাজধানী পঞ্চকোটে আনয়ন করেন এবং তাঁহার দ্বারা রাজা হরিনারায়ণকে দীক্ষাদান করান।

* বহরমপুর তৃতীয় সংস্করণ পৃঃ ৫৮৩

শ্রীরাঘব গোস্বামী

ভক্তিরত্নাকরে রাঘব গোস্বামী নামক এক জন দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি "ভক্তিরত্নপ্রকাশ" * নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার। ইনি গোবর্দ্ধনের সন্নিকটে বাস করিতেন বলিয়া গোবর্দ্ধনবাসী রাঘব পণ্ডিত নামে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থে দেখা যায়—

"শ্রীরাধাপ্রাণরূপা যা শ্রীচম্পকলতা ব্রজে।
সাদ্য রাঘবগোস্বামী গোবর্দ্ধন-কৃতস্থিতিঃ।"

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনে যিনি শ্রীচম্পকলতা নামে শ্রীরাধিকার প্রিয়সখীরূপে বিরাজ করিতেন, তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের সময় গোবর্দ্ধনবাসী রাঘব গোস্বামিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই রাঘব গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামীর বিশেষ অনুগত ছিলেন। ইনি মধ্যে মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বৃন্দারণ্যস্থ গোস্বামিগণের ও ভক্তগণের সঙ্গসুখ লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। ইনি সর্ব্ববিধ শাস্ত্রে বিশেষতঃ সঙ্গীতশাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যখন শ্রীব্রজমণ্ডলের তীর্থদর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন, তখন দৈবক্রমে শ্রীল রাঘব গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবের নিকট উপনীত হন। ইনি শ্রীব্রজমণ্ডলের যাবতীয় তীর্থ ও তৎসংক্রান্ত পৌরাণিক ও আধুনিক সকল প্রকার ঐতিহ্য সম্বন্ধে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি শ্রীজীবের নিকট যাইয়া শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার কথার উল্লেখ করিলে শ্রীজীব উপযুক্ত পাত্রের হস্তে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে শ্রীব্রজমণ্ডলের যাবতীয় তীর্থদর্শনের জন্য সমর্পণ করিলেন। শ্রীল রাঘব গোস্বামীও এই দুই যুবককে পাইয়া পরমানন্দে তাঁহাদের সহিত শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় বহির্গত হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের যাবতীয় তীর্থবাসী ও তাঁহাদের ইতিহাস, শ্রীরূপসনাতন-প্রমুখ ভক্তবর্গ যে তীর্থে—যে ভাবে যাপন করিয়াছেন এবং শ্রীরাধাগোবিন্দ ও ও তাঁহাদিগের পরিকরবর্গের সাক্ষাৎ ইত্যাদি পাইয়াছেন—তাহা সুবিস্তৃত ভাবে ইঁহাদের দুই জনের নিকট বিবৃতরূপে বর্ণনা করেন। ভক্তিরত্নাকরের সুবৃহৎ ৩০৬ পৃষ্ঠাব্যাপী পঞ্চম তরঙ্গ এই তীর্থকথায় ও নানাবিধ লীলারসমূলক সঙ্গীতে ও উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। শ্রীল রাঘব গোস্বামী যেরূপ প্রেমভরে এই নবানুরাগযুক্ত ভক্তদ্বয়কে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা ও প্রেমসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)

* 'ভক্তিরত্নপ্রকাশ' গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই বা ইহার কোনও সন্ধান মিলে নাই।

বাক্য-বল

ছেলেবেলায় যাত্রার-দলে যুদ্ধ দেখিতাম, "তুরাচার পামর" প্রভৃতি জোরালো বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে গদায়-গদায় ও ভোঁতা তলোয়ারে-তলোয়ারে দারুণ হানাহানি! সে-বয়সে ভাবিতাম, গদা-তলোয়ারের মত বাক্যও বুঝি যুদ্ধের অন্যতম অস্ত্র! আজ এ যুদ্ধে রেডিয়োর কল্যাণে বাক্য দেখিতেছি, সত্যই অস্ত্রের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। গোলাগুলী-বোমার মত বাক্যেরও আজ অসীম শক্তি! এ-কালের যুদ্ধে গতি-বেগ বাড়িয়াছে অসম্ভব রকম। আলোর গতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল; রেডিয়ো-মারফৎ বাক্যের গতিও আলোর গতির সমান!

আজিকার যুদ্ধে বাক্যের বল অসামান্য। যুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে হয় পরস্পরে আলোচনা; তার পর সেই আলোচনায় নির্ভর রাখিয়া

"হ্যালো চায়না,—আমেরিকার বোষ্টন হইতে কথা বলিতেছে আন্‌লিন্-ওয়াঙ্,—এখানকার ওয়েলেশলি কলেজ হইতে চীনকে এবং মাদাম চিয়াঙ্-কাই-শেককে অভিনন্দন জানাইতেছে।"

"এস্-এস্-এস্,—সাবমেরিণ আমাদের উপর গোলা-বর্ষণ করিতেছে!"

• সুদূর তিব্বত হইতে কোনো মিশনারী করিতেছেন শর্ট-ওয়েভ-যোগে সানফ্রানসিশকোর বেতার-ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণ, "প্রতি সন্ধ্যায় তোমাদের কথা আমরা স্পষ্ট শুনিতেছি। আমরা আছি উত্তর-গোল-কার্দ্ধের ঠিক বিপরীত ভূ-ভাগে" ইত্যাদি।

মানিলায় যখন বোমা-বর্ষণ হয়, ১০০০ মাইল দূরে বসিয়া
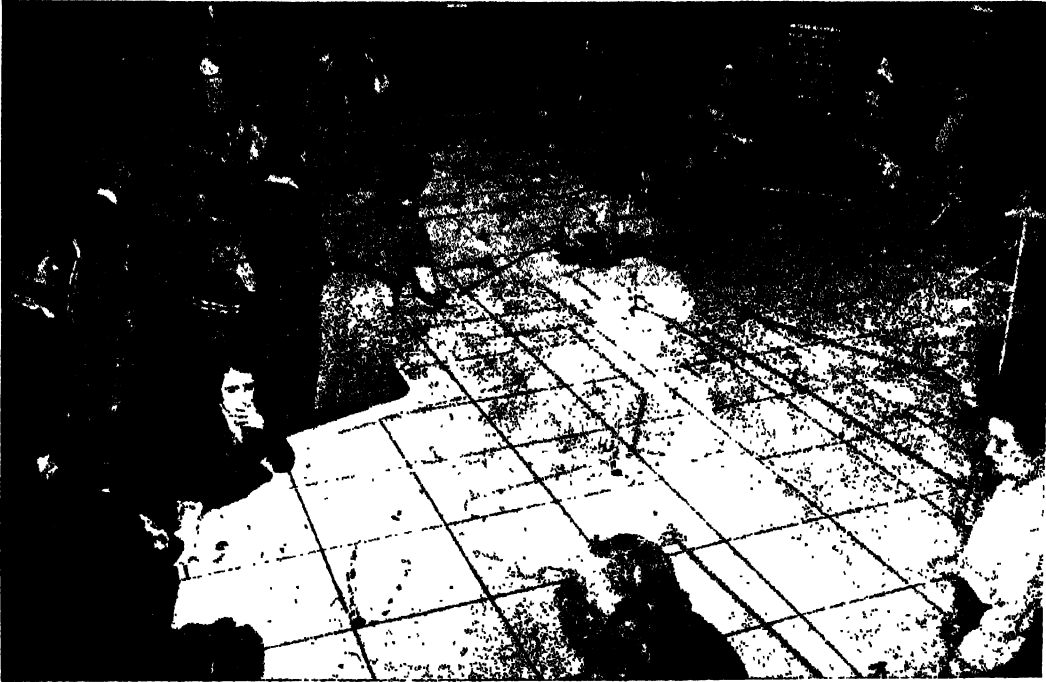
খবর পাওয়ার পর বিপক্ষ-প্লেনের ঠিকানার সন্ধান

যুদ্ধের আদেশ-নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। এই আদেশ-নির্দ্দেশের দ্রুত-পরিচালনার উপর যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ভর করে।

যুদ্ধক্ষেত্রে কামান-বন্দুকের পালা মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে; ফৌজের দলও বিশ্রাম করে, ঘুমায়! কিন্তু রেডিয়ো-তরঙ্গে বাক্যের গতি নিমেষের জন্য বন্ধ থাকে না! পৃথিবী ব্যাপিয়া বাক্য ধ্বনিত-রণিত হইতেছে সারাক্ষণ। শুধু রাশিয়া, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের সমরাঙ্গনই নয়—তিব্বতের উপর দিয়া আকাশ বহিয়া দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর মেরু পর্য্যন্ত চলিয়াছে বাক্যের স্রোত!

রেডিয়ো-যন্ত্রে বোতাম টিপুন—তখনি নানা ভাষায় মিশ্র কথার ঝঙ্কার শুনিবেন। নানা দেশের লোকের কলগুঞ্জন। তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ তীব্র সঙ্কেত-রব—'ডিট-ডিট ডা-ডা ডিট্'। এমনি নানা সঙ্কেত-শব্দ! এ সঙ্কেতে চলিয়াছে যুদ্ধের খবরাখবর এবং আদেশ-নির্দ্দেশ!

—"মেশিন-গান্ লইয়া এক হাজার মাইল উত্তরে আক্রমণ করো!"

মার্কিণ যুক্ত-রাজ্যের লোক তখনি সে সংবাদ শুনিয়াছিল বেতারের বার্ত্যাযোগে।

এই সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য পৃথিবীর গা ফুঁড়িয়া মাথার উপর দিয়া তারের জাল বিছানো আছে—ঠিক মাকড়শার জালের মত! বেতার-যন্ত্রে কাণ পাতিলে শব্দ-তরঙ্গের অনিমেষ অবিরাম ধ্বনি কাণে বাজিবে।

শীটল্ হইতে ওয়াশিংটনে সংবাদ চলিয়াছে—ফ্লাইং ফোর্ট্রেশ নির্ম্মাণের জন্য আমাদের চাই আরো বেশী এলুমিনিয়ামের জোগান্! মার্কিণ রিপোর্টার সংবাদ পাঠাইতেছে লণ্ডনে—এক হাজার ব্রিটিশ বমার আসিয়া বোমা-বর্ষণে ব্রিমেনের শিল্পকেন্দ্রকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে! দশ মিনিটের মধ্যে এ সংবাদ আজ পৃথিবীময় প্রচারিত হইতেছে। কোথায় নিরালা গিরি-শিরে প্রহরী বসিয়া আছে কাণে বেতারের রিসিভার আঁটিয়া, চকিতে তার কাণে ধ্বনিয়া উঠিল

সংবাদ—ফৌজ চলিয়াছে ঐ পথে ; হুঁশিয়ার ! এ সংবাদ পাইবা মাত্র প্রহরী তাহা বেতার-যোগে দিক-দিগন্তে প্রচার করিয়া দিল—শত্রুকে রোধ করিতে চকিতে অমনি সকলে তৎপর হইয়া উঠিল !

বোমার গতিবিধি দেখিয়া সময় থাকিতে এই যে সঙ্কেত-দান চলিতেছে, এ সঙ্কেতের নিঃসংশয়তার জন্য বেতার-তারের জাল নিখুঁত-ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে ! বেতার না থাকিলে বিপক্ষের বোমার অতর্কিত আক্রমণে পৃথিবী বোধ হয় জনহীন হইয়া যাইত ! বেতারের কল্যাণে শত্রুপক্ষের আক্রমণ আজ দারুণ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া আমাদের অনেকখানি নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত করিয়াছে।

চার বৎসর পূর্ব্বে আন্তর্জ্জাতিক সন্ধিসূত্রে বেতারের শর্ট-ওয়েভের পথ-সীমা নানা জাতির মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ যে লাইনে বৃটেনের শব্দ-তরঙ্গ বহিবে, সে লাইনে জার্ম্মানির শব্দ-তরঙ্গ ভাষায়। বিদেশী ভাষায় সংবাদ রেকর্ড করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুবাদ হয়। বাক্যের স্রোত হইতে অধ্যক্ষ বা মনিটর প্রয়োজনীয় সংবাদ-গুলি বাছিয়া লন—বিপক্ষের চাল-চলনের ইঙ্গিত এবং সংবাদ সত্য কি না, বেতার-যোগে যাচাই করিয়া সঠিক বিবরণটুকু দু'ঘণ্টার মধ্যে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা আছে।

বেতারের দৌলতে যুদ্ধের বিধিতে কতখানি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, বুঝাইয়া বলি !

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দূর-হইতে-ভাসিয়া-আসা ব্যাগ-পাইপের শব্দে লক্ষ্ণৌয়ে বৃটিশ বন্দীর দল জয়ের আভাস পাইয়াছিল। কিন্তু এ যুদ্ধে বেতারের শর্ট-ওয়েভযোগে ইংলণ্ডে বসিয়া সকলে শুনিতেছে কোথায় ৩০০০ মাইল দূরে মাশাচুশেট্সের কারখানায় কি বিপুল ভাবে অস্ত্রশস্ত্রাদির নির্ম্মাণ চলিতেছে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নিউ-অর্লিন্সের

সংগৃহীত সংবাদের বাছাই-বিশ্লেষণ

বহিবে না ! একই লাইনে উভয় জাতির শব্দ-তরঙ্গ বহিলে শব্দ বা ধ্বনি 'জাম্' হইবে ! রেডিও-কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, লাইন ধরিয়া 'জাম্' করার প্রয়াস বিপক্ষের এখনো দেখা যায় না ! তবে কখনো 'জাম্' হয় নাই এমন নয়। হইলেও সে কাজ কাহারো ইচ্ছাকৃত নয় ; দৈবাৎ তাহা ঘটে !

যুদ্ধে যাঁরা বেতার ষ্টেশনে অধ্যক্ষতা করিতেছেন, শব্দ-নিবারক ঘরে তাঁরা পালা করিয়া বসিয়া আছেন—বেতার-যন্ত্রের কাঁটা ঘুরাইতেছেন এবং শব্দ গ্রহণ করিতেছেন অবিরাম অবিচ্ছিন্ন ভাবে ! শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ ভাবে তার মর্ম্ম তাঁহারা টাইপ-রাইটারে লিখিয়া লইতেছেন। আন্তর্জ্জাতিক বার্ত্তা-বিভাগের পাঁচটি প্রধান ষ্টেশনে প্রত্যহ প্রায় এক কোটি সংবাদের বিশ্লেষণ চলিতেছে।

বেতারে গৃহীত সংবাদের শতকরা ১০টি সংবাদ আসে ইংরেজী সংবাদ ইংলণ্ডে আসিয়া পৌছিয়াছিল এক মাস পরে ! কিন্তু এখন যেখানে যাহা ঘটিতেছে—ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে সে-সংবাদ দিক্-দিগন্তে প্রচারিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জিয়া অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় জার্ম্মান বাহিনী লোকালয় হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এখন যেখানে যে বাহিনী অবস্থান করুক, ইচ্ছা মাত্র সকলে দেশের সংবাদ, বাড়ীর সংবাদ পাইতে পারে। দূরে থাকিয়াও দূরকে মানুষ যে আজ নিকট করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, সে শুধু এই বেতারের দৌলতে !

সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের সঙ্গে বেতার আজ আশ্চর্য্য যোগসূত্র রচিয়া রাখিয়াছে। যুদ্ধ-রত পুত্রের সংবাদ-প্রয়াসী পিতা বেতার-ষ্টেশনে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার পুত্র টেলিগ্রামে জানাইয়াছে সাব্দ অরিজিলে .আছে। কোথায় সে জায়গা ?

বেতার-ষ্টেশন তখনি বেতারের মারফৎ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পিতাকে কৃতার্থ করিয়া দিতেছে !

যুদ্ধের জন্য 'ওয়াকি-টকি' নামে দ্বি-মুখী রেডিয়ো-টেলিফোন যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এ যন্ত্র এত হালকা যে এক জন লোক অনায়াসে তাহা বহিতে পারে। যন্ত্রের সঙ্গে collapsible (সঙ্কচনশীল) 'এরিয়াল'-সংযোগ আছে ; তার ফলে যখন খুশী এ-যন্ত্র খাটাইয়া খবর দেওয়া-নেওয়া চলে। প্যারাশুট-বাহিনীর সঙ্গে একটি করিয়া 'ওয়াকি-টকি' থাকে। এ যন্ত্রের ওজন আড়াই সের মাত্র। এই যন্ত্রবাহী ফৌজের নাম 'ইলেকট্রন-শাস্ত্রী'।

আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে স্বদলে সংবাদ পাঠানো

রেডিয়ো-মারফৎ বহু দূরস্থ বিপক্ষ-বমারের আভাস-গ্রহণ

রেডিয়ো-যন্ত্রকে সর্ব্বদিকে কুশলী করিয়া তুলিতে বিশেষজ্ঞদের অধ্যবসায়ের বিরাম আজো নাই। তাঁরা সাধনা করিতেছেন দুর্গের মত সুরক্ষিত ল্যাবরেটরিতে। এতখানি গোপনতার কারণ—তাঁরা বলেন, যদি এতটুকু উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন, শত্রুপক্ষ যেন তার আভাস না পায় ! তাহারা যদি জানিতে পারে এখানে কি উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহা হইলে মাথা ঘামাইয়া তখনি তথ্য আবিষ্কারে প্রয়াসী হইবে ! সে-প্রয়াস যাহাতে তারা না করে, ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য। ঘরের লোকও যেন জানিতে না পারে তাঁরা কি করিতেছেন, তাই এতখানি সতর্কতা।

কালিফোর্ণিয়ার চীনা বেতার-ষ্টেশন

রেডিয়ো-মারফৎ আজ শুধু সংবাদ যাইতেছে না—যুদ্ধের ছবিও যাইতেছে ! মশ্‌কো হইতে নিউ-ইয়র্ক ৪৬১৫ মাইল দূরে। মশ্‌কো হইতে যুদ্ধের ছবি যদি প্লেনে করিয়া পাঠানো হয়, তাহা হইলে শূন্য-পথে প্লেনকে যাইতে হইবে ঘণ্টায় ২১৩০ মাইল বেগে। কিন্তু প্লেনের পক্ষে অতখানি বেগে চলা আজো সম্ভব হয় নাই। এ ছবি কিন্তু মিনিট কয়েকের মধ্যেই রেডিয়ো-যোগে মশকো হইতে নিউ-ইয়র্কে গিয়া পৌছিতেছে ! রেডিয়ো-বাক্যের গতি

বড়-বমারের বার্ত্তাবাহী

কোথাও মন্থর হয় না। বাক্য চলে সীমান্ত দুর্গ পরিখা প্রাচীর সমস্ত লঙ্ঘন করিয়া—বাক্যের মার কোথাও নাই।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যে সামরিক শর্ট-ওয়েভ ষ্টেশন আছে চৌদ্দটি—

প্যারাশুট-বাহিনীর কথা শোনা

তাছাড়া মিত্রপক্ষেরও এমনি বহু ষ্টেশন আছে। এই সব ষ্টেশন হইতে আকাশ ব্যাপিয়া অহরহ অবিরাম বার্ত্তা বহিয়া চলিয়াছে—নদীর স্রোতের মত!

রেডিয়ো-রশ্মির পথ বদলানো

বর্ত্তমান যুদ্ধে রেডিয়ো-যন্ত্রকে এতখানি উন্নত করা হইয়াছে যে, দশ হাজার মাইল দূর হইতে মানুষের কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট নিখুঁত শুনা যায়। এ উৎকর্ষ সাধন করিতে যে বৈদ্যুতিক তাপ সঞ্চার করিতে হয়, সে তাপে লোহা-সীসা নিমেষে গলিয়া যায়। এ জন্য যন্ত্রটিকে শীতল রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতে যন্ত্রের এতটুকু অনিষ্ট ঘটে না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বা চার্চ্চিল কিম্বা হিটলার—ইঁহারা যখন নিজেদের বাণী প্রচার করেন, তখন মাইক্রোফোনের

সেনাদের চিঠি-পত্রের ফটো তুলিয়া ক্ষুদ্র আকারে পাঠানো হয়

শক্তিকে বাড়ানো হয় বহু কোটি কোটি কোটি গুণ—(400 million b.l n b llion billion billion billion times)। তবেই সে-বাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট শুনা যায়। বিশেষজ্ঞের সাধনায়
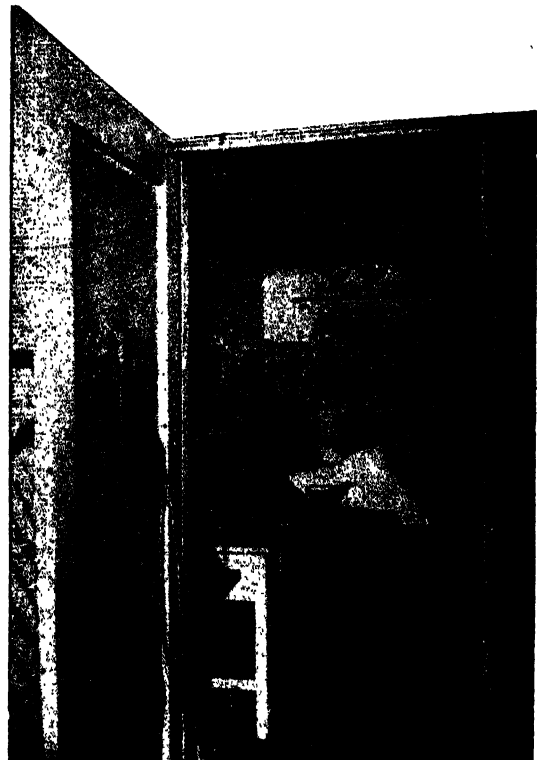
বিপক্ষ রেডিয়োর গুপ্ত-সংবাদ-গ্রাহী

বেতারের ব্যবস্থা আজ এমন হইয়াছে যে, যেখানে খুশী, যখন খুশী, আকাশে কাণ পাতিলেই সংবাদ মিলিতে এতটুকু অসুবিধা ঘটিবে না!

আলো জ্বালিলে তার রশ্মি যেমন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে, নিস্তরঙ্গ দীঘির জলে ঢিল ছুড়িলে যেমন ঢেউ উঠিয়া চক্রাকারে সারা

দীপ্তির বুকে ব্যাপ্ত হয়, তেমনি সাধারণ রেডিয়ো-ষ্টেশন হইতে বাক্য বা শব্দ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। রেডিয়ো-রশ্মি কিন্তু এমন ভাবে চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হয় না। রেডিয়ো-রশ্মি (Radio beam)

জাহাজ হইতে আলোক-সঙ্কেতে শত্রুর আগমন-সংবাদ-জ্ঞাপন

সার্চ্চ-লাইটের মত; একই নির্দ্দিষ্ট দিকে এ রশ্মি নিয়ন্ত্রিত হয়। এ রশ্মিকে মেরুপ্রদেশ ভিন্ন সর্ব্বত্র প্রতিফলিত করা যায়। মেরুতে ম্যাগনেটিক-পোলের অবস্থান হেতু রশ্মিকে সেখানে পরিচালিত

রণ-পোতের বার্ত্তাবহ—গ্যাস-মুখোশ ও টেলিফোন-যন্ত্র আঁটা

করা যায় না। রেডিয়োর শর্ট-ওয়েভ রশ্মি চলে পৃথিবীর বুক বহিয়া সরল রেখায় মাত্র; কাজেই মেরুবাসীরা পোলাণ্ড-মারফৎ সংবাদ আদান-প্রদান করে। কানাডায় যে সব ফরাসীর বাস, তারা বেতারে সংবাদ আদান-প্রদান করে ফ্রান্সের মারফৎ। বহু দূরের সংবাদ পাইতে হইলে যন্ত্রকে নিখুঁত ভাবে 'টিউন' করিয়া লইতে হয়। ঋতু ও সময়-ভেদের পর্য্যায় বুঝিয়া তাহার বিধি আছে। সেই বিধি আয়ত্ত

রণাঙ্গনে বসিয়া দেশের গীতবাদ্য-শ্রবণ

করিলে আমরা এখানে ঘরে বসিয়া অল্-ওয়েভ শেটে সর্ব্বদেশের বাক্য বা বাণী অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারি।

ট্যাঙ্কের রোডয়ো-সেট সারাইবার মেকানিক

রেডিয়োর জন্য যুদ্ধের রীতিও এখন বদলাইয়া গিয়াছে—গতি তো বাড়িয়াছেই। এখন ট্যাঙ্ক এবং ট্রাকবাহী ফৌজ চলে ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে—বমার চলিয়াছে শূন্যপথে ৩০০ মাইল বেগে। রেডিয়োর মারফৎ আদেশ-নিদেশের চলার গতি আরো ক্ষিপ্র। পূর্ব্বকালে সৈন্য-সামন্ত চলিয়াছে তো চলিয়াছেই—লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে তাদের যেখানে এক মাস সময় লাগিত, এখন সেখানে সময় লাগে দু'দিন বা

তিন দিন! সেনাদলের সঙ্গে থাকে সিগনাল-কোর। তাদের কাজ টেলিগ্রাফ-লাইন পাতিয়া তাহাকে নিরঙ্কুশ করিয়া তোলা, বেতারের ব্যবস্থা করা এবং পারাবত বা লোকের মুখে সংবাদ প্রেরণ; অথবা আগুন জ্বালাইয়া, পতাকা-পারাবত উড়াইয়া এবং বাঁশী বাজাইয়া সেনাদের সঙ্কেত জানানো।

রণাঙ্গনে দ্রুত তার খাটানো

সমরাঙ্গনে সেনারা আজ নির্দ্দেশ পায় আকাশে-বাতাসে। এ নির্দ্দেশ দিবার জন্য ব্যবস্থার সীমা নাই! সে ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই ওয়াকি-টকি রেডিয়ো-যন্ত্র। লড়ায়ে-বমার ট্রাক
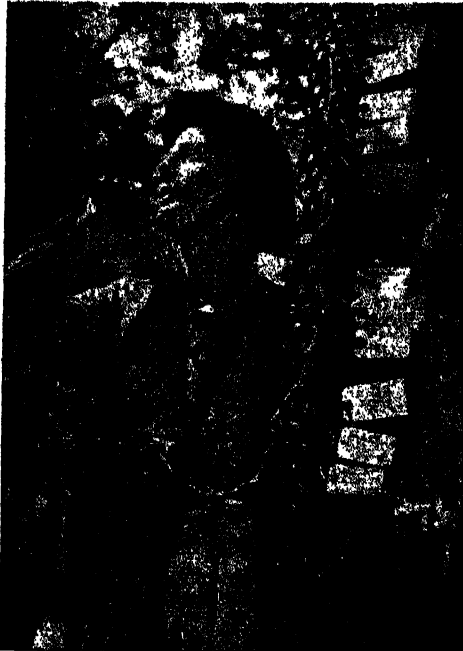
রেডিয়ো-টেলফোনে শত্রুপক্ষের সন্ধান পাওয়া

ট্যাঙ্ক বড় বমার—সকলের সঙ্গে রেডিয়ো-যন্ত্র আছে। আক্রমণে এ যন্ত্র যেমন সহায়, বিপদে পরিত্রাণ করিতেও তেমনি। পদাতিক-দলেও কোর-সূত্রে সংযোগ থাকে নিবিড় ভাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেখানে থাকুক, মূল কেন্দ্রের সহিত সকলের সংযোগ আছে; পারস্পরিক সংযোগ-সূত্র যেমন অটুট থাকে, তেমনি নিখুঁত।

কণ্ঠে-আঁটা মাইক্-মারফৎ কথা কওয়া

তার ফলে যুদ্ধে মালমশলা ফুরাইলে আশঙ্কার কারণ নাই। রেডিয়োর লাইন কখনো যে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে না, তা নয়! লাইনে বাধা ঘটে: শত্রু সাঙ্কেতিক কোড নষ্ট করিয়া দেয়; কিম্বা রেডিয়ো
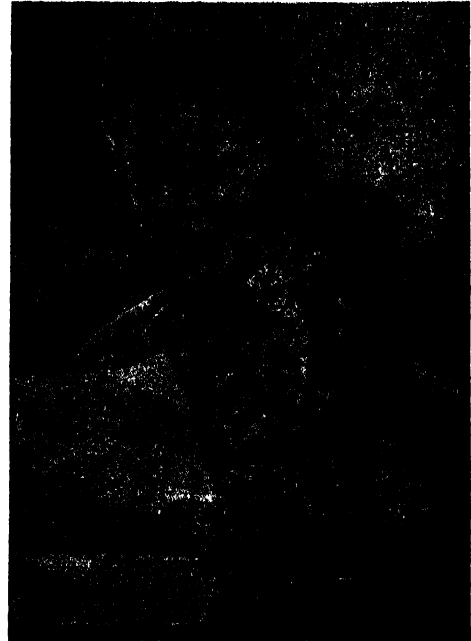
রেডিয়ো-যোগে চীনা-ভাষা শিখানো

চালাইলে শত্রু সন্ধান জানিয়া ফেলে। তাই আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে রেডিয়ো বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ফৌজের সঙ্গে রেডিয়ো এঞ্জিনীয়ার বিভাগ থাকে। রেডিয়োর সম্বন্ধে এ বিভাগের কাজ এমন নি^ুত যে বাধা বা অনিষ্ট ঘটিবামাত্র লাইন সরাইতে বা সারাইতে ইঁহাদের তৎপরতার সীমা নাই। কামানের গোলা বা শেলের লক্ষ্যও এখন রেডিয়োর মারফৎ নির্দ্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কামান লইয়া ফৌজ প্রস্তুত—কোরে আদেশ আসিল ৫০০ গজ বাঁয়ে ১০০ সর্ট-শট! অমনি কামান গর্জ্জন তুলিল। বেতারে নির্দ্দেশ-বাণী—বাঁয়ে এক বাঁয়ে শূন্য···শোল্ মার্ক ওয়ান্···ফিজি দ্বীপ···ঊর্দ্ধে চার তিন পাঁচ···ব্যাটারি ওয়ান বাউণ্ড—ফায়ার! সঙ্গে সঙ্গে শূন্যপথের প্লেনে জাগিল নির্দ্দেশ—ব্যাটারি রেডি! প্লেন উদ্যত রহিল পাহারার কাজে; রেডিয়োর মারফৎ আবার বাণী জাগিল—ফায়ার! সঙ্গে সঙ্গে প্লেন হইতে পড়িল বোমা—নীচে কামান দাগিল—দুরুম!

মাটীর বুকে তার খাটাইয়া চলিয়াছে

ট্যাঙ্কে যে-সব রেডিয়ো-অপারেটর থাকে, তারা আঁটে ইয়ার-ফোন। মাথায় প্যাড-করা হেলমেটের মধ্য দিয়া ইয়ার-ফোন আঁটে। এঞ্জিনের বিকট শব্দ, কামান ও শেলের ভীষণ ধ্বনি হইতে কাণ নিরাপদে থাকিবে—তাই! বাণী-প্রেরণের জন্য ইহাদের গলায় থাকে ষ্টেথেশকোপের মত মাইক্রোফোন—ইহা এমন কৌশলে রচিত যে বাহিরের কোন বাণী-গ্রহণে বা প্রেরণে এতটুকু অসুবিধা ঘটে না।

মার্কিনের সামরিক বেতার-বিভাগে এঞ্জিনীয়ার ও বাহিনী হিসাবে এখন ৭৫০০০ জন লোক কাজ করিতেছে! তাছাড়া বেসামরিক এ্যামেচার কর্ম্মচারীর সংখ্যাও প্রায় ৭৫০০০!

বৃটেনে সামরিক বেতার বিশেষজ্ঞের সংখ্যা লক্ষাধিক। জার্ম্মানিতে বেতার বিশেষজ্ঞের সংখ্যা দশ-পনেরো হাজার। জাপানে দু'-তিন হাজার। ইতালীতে বেতার বিশেষজ্ঞ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বেতার-লাইনকে আরো পরিবর্দ্ধিত করা হইতেছে। এ জন্য যেখানে যত পুরানো তার বা কেব্‌ল্ আছে, সংগৃহীত ও সুসংস্কৃত হইতেছে।

বেতার-তরঙ্গে যুদ্ধের সংবাদ বহিয়া চলিয়াছে সারাক্ষণ। সুদূর চীনের চুঙকিঙে—চুঙকিং হইতে নিউ ইয়র্কে সর্ব্ববিধ সংবাদ আসিয়া পৌছিতেছে দু'ঘণ্টার মধ্যে—কাঁচির স্পর্শে সে-সবের ছাঁট-কাট হইয়া! রাশিয়া হইতে সংবাদ আসে নানা ভাষায়—ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিয়া তবে সে সংবাদ প্রচারিত হয়!

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ হইতে পৃথিবীর ৪৬টি মাত্র জায়গায় রেডিয়ো-টেলিগ্রাম যাইত—এখন সর্ব্বত্র যায়।
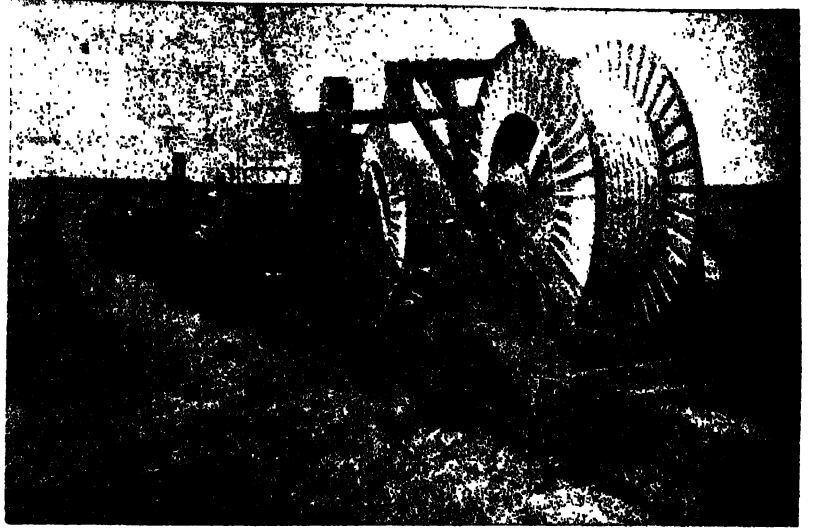
রেডিয়োর বাক্য আজ সত্যই কামান বোমা সাবমেরিণের মত শক্তিমান। রেডিয়োর বাক্য মিত্রপক্ষকে কতখানি শক্তি-সামর্থ্য

সংবাদের ফটো চলে রেডিয়ো মারফৎ

দিয়াছে, সমরাঙ্গনে এবং আমাদের নিরাপত্তায় তার প্রচুর পরিচয় মিলিতেছে।

ইতিহাসের অনুসরণ

বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে বহু বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। বার বার বহিঃশত্রুর আক্রমণে বরেন্দ্রীর পাল-রাজশক্তি তখন দুর্ব্বল; ধর্ম্মপাল ও দেবপালের ভুজবলে অর্জ্জিত বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ। এই সুযোগে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গে এক নূতন রাজ-বংশের অভ্যুদয় ঘটে। তাহা চন্দ্রবংশ বলিয়া পরিচিত।

চন্দ্র উপাধিধারী কয়েক জন রাজার নাম পাওয়া যায়। আরাকান অঞ্চলে এক চন্দ্রবংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিল। ত্রিপুরা জেলার ভারেল্লা গ্রামের নর্ত্তেশ্বর-মূর্ত্তির পাদলিপিতে শ্রীমল্লয়হচন্দ্র দেবের নাম আছে। ময়নামতী ও গোপীচাঁদের গীত উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে সুপ্রচলিত। 'শব্দ-প্রদীপ' গ্রন্থে এবং 'তিরুমলে' লিপিতে বাঙ্গাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ আছে। সম্প্রতি তাঁহার নামাঙ্কিত দু'খানি মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। সুকবি উমাপতিধর চন্দ্রচূড়-চরিত রচনা করেন জনৈক চাণক্যচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় বিক্রমপুরাধিপতি শ্রীচন্দ্রদেবের সম্বন্ধে। একমাত্র তাঁহারই তাম্র-শাসন পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন 'রোহিতাগিরিভুজাং বংশে'। এই রোহিতাগিরির অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, রোহিতাগিরি বিহার প্রদেশে সাহাবাদ জেলার রোহতাসগড়। কিন্তু এখানকার কোন চন্দ্রবংশের উল্লেখ কোথাও নাই। পক্ষান্তরে শ্রীচন্দ্রের তাম্র-শাসনে উল্লেখ আছে যে হরিকেল রাজের সামন্তরূপেই তাঁহারা প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সুতরাং তাঁহাদের আদি নিবাস হরিকেল বা বর্ত্তমান চট্টগ্রামের কাছে হওয়া সম্ভব। 'রাঙ্গামাটী' এবং 'লালমাই' এই দুই স্থানই সে-গৌরব দাবী করে। ময়নামতীর নাম সংশ্লিষ্ট বলিয়া লালমাইয়ের দাবী অধিকতর সমীচীন মনে হয়।

চন্দ্র-উপাধিধারী অন্যান্য রাজাদের সহিত ইঁহাদের কি সম্বন্ধ তাহা সঠিক জানা যায় না। অনেকে মনে করেন আরাকানের চন্দ্রবংশীয়দের সহিত জ্ঞাতিত্ব ছিল। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। ডাঃ ভট্টশালী ভারেল্লা নর্ত্তেশ্বর-মূর্ত্তির পাদপীঠে উল্লিখিত লয়হচন্দ্র একই বংশের বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু প্রমাণাভাবে এ মত গ্রহণ করা যায় না। পক্ষান্তরে বিরুদ্ধ প্রমাণ আছে। ভারেল্লা-লিপি-অনুযায়ী বংশের প্রথম রাজার নাম 'লয়হচন্দ্র'; কিন্তু শ্রীচন্দ্রের তাম্র-শাসনে তাঁহার নাম ত্রৈলোক্যচন্দ্র। ময়নামতীর গানের গোবিন্দচন্দ্র বিক্রমপুরের রাজা মাণিকচন্দ্রের পুত্র এবং মেহারকুল অঞ্চলের রাজা তিলকচন্দ্রের দৌহিত্র। ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও তিলকচন্দ্রকে অভিন্ন মনে করিলে গোবিন্দচন্দ্র হন শ্রীচন্দ্রের ভাগিনেয়। শ্রীচন্দ্র পাল-রাজ মহীপাল দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকাল আনুমানিক খৃষ্টাব্দ ৯৮০-১০৩০ বলিয়া স্থির হইয়াছে। পাইকপাড়া বাসুদেব মূর্ত্তির পাদ-লিপি কোনক্রমেই একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না, ইহা ডাঃ সরকারের মত। সুতরাং গোবিন্দচন্দ্র শ্রীচন্দ্রের বহু পরবর্ত্তী কালে বিক্রমপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ডাঃ সরকারের মতে তিনি ছিলেন শ্রীচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই মতের পরিপোষক প্রমাণ কিছু নাই। দুই ভ্রাতার রাজত্ব-কালের মধ্যে এরূপ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের পার্থক্যও সম্ভব নয়। ইহা অপেক্ষা ময়নামতীর গানের তথ্য অধিকতর যুক্তিযুক্ত। উমাপতিধরের পৃষ্ঠপোষক চাণক্যচন্দ্র সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। হয়ত তিনি এ বংশের এক নগণ্য সামন্ত রাজা ছিলেন। ময়নামতীর গানের মধ্যে যে কিছু ঐতিহাসিক সত্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তদনুযায়ী ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও তিলকচন্দ্রের অভিন্নতা স্বীকার করিলে চন্দ্রবংশের বংশ-লতা এইরূপ দাঁড়ায়:
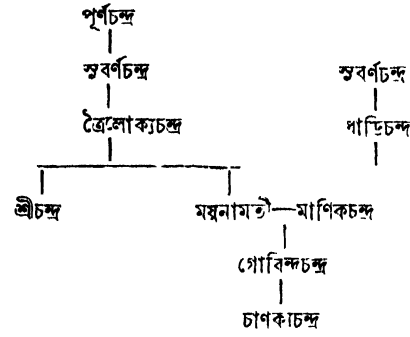
রোহিতাগিরি অঞ্চলে চন্দ্রগণ বিশেষ কিছু প্রতিপত্তি অর্জন করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী কালে যেমন অসংখ্য নগণ্য ভুঞা রাজার কথা জানা যায়, ইঁহারাও সেইরূপ ছিলেন। বিক্রমপুরের ধাড়িচন্দ্রও সমাবস্থাপন্ন ছিলেন সন্দেহ নাই। পূর্ণচন্দ্রের কুল-গৌরব কিছু ছিল না। "নাগ্নৌ বিশুদ্ধো ন তুলাধিকঢ়ঃ"। ইহাতে মনে হয় এই বংশ ও আরাকানের চন্দ্রবংশ বিভিন্ন। সুবর্ণচন্দ্রও সামান্য ভূম্যধিকারী মাত্র—"পুণ্যাবলোকঃ পরলোকভীরোপলোকা সমাশাসিতজ্ঞাবলোকঃ"। তাঁহার পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র হইতেই প্রথম সৌভাগ্যোদয়! তিনিই সর্ব্বপ্রথম 'বভূব নৃপতির্দ্বীপে দিলীপোপম"। কিন্তু তাহাও সামন্তরাজ-রূপে। 'আধারো হরিকেলরাজ ককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়াম্'।

এই হরিকেল রাজ্য কোথায় ছিল? 'অভিধান-চিন্তামণি'কারের মতে বঙ্গ ও হরিকেল অভিন্ন। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর লোক এবং গুর্জ্জরবাসী। মঞ্জুশ্রী মূল কল্পের প্রমাণ অধিকতর নির্ভরযোগ্য, সন্দেহ নাই! তাহাতে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেলের পৃথক্ উল্লেখ আছে। চৈনিক পরিব্রাজক ই চিং বলেন, হরিকেল পূর্ব্বভারতের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত দুইখানি পুঁথিতে দেখা যায়, হরিকেল শ্রীহট্টের সমীপবর্ত্তী। মহারাজ ভূতিবর্মা'র বড়গাঁ শিলালিপি সম্পাদন-কালে ডাঃ ভট্টশালী দেখাইয়াছেন যে, সমতটের পূর্ব্বসীমা কাছাড় ও ত্রিপুরার পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং হরিকেল ইহার দক্ষিণে হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কান্তিদেবের এক তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা হরিকেলের সামন্ত-রাজাদের উদ্দেশে প্রদত্ত। এই সমস্ত তথ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, বর্ত্তমান চট্টগ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল সেকালে হরিকেল বলিয়া পরিচিত ছিল।

ত্রৈলোক্যচন্দ্র ছিলেন হরিকেলপতির সামন্ত। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং ডাঃ সরকারের মতে এই হরিকেল-পতি পাল-বংশীয় ছিলেন। বরেন্দ্রীর পাল-সাম্রাজ্য অত দূর বিস্তৃত ছিল

বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। কান্তিদেবের তাম্র-শাসন খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রদত্ত। তাহাতে পাল-বংশের উল্লেখ নাই। পরবর্তী কালে পাল-রাজগণের গৌরব বিনষ্ট হইয়াছে। কান্তিদেব স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তাঁহার তাম্র-শাসন ককুদচিহ্ন-লাঞ্ছিত। পাল-রাজগণের লাঞ্ছন অন্য প্রকার। ত্রৈলোক্যচন্দ্র 'আধারো হরিকেল রাজ ককুদছত্র স্মিতানাং শ্রিয়াম্'। সুতরাং তিনি পাল-রাজগণের সামন্ত ছিলেন না। ডাঃ ভট্টশালী তাঁহাকে কান্তিদেবের সামন্ত বলিয়াছেন। কিন্তু কান্তিদেব ৮৫০ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী হইতে পাবেন না। শ্রীচন্দ্রদেব মহীপালদেবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী! তাঁহার পিতাও নবম শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় পাদে বর্ত্তমান ছিলেন না। সুতরাং ডাঃ শ্রীযুত ভট্টশালীর সিদ্ধান্ত একটু পরিবর্ত্তিতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ত্রৈলোকাচন্দ্র কান্তিদেবের বংশীয় পরবর্ত্তী কোন হরিকেলপতির সামন্ত ছিলেন।

এই ত্রৈলোক্যচন্দ্র 'বভুব নৃপতির্দ্বীপে দিলীপোপমঃ'। বাখরগঞ্জ জিলার প্রাচীন নাম 'চন্দ্রদ্বীপ'। গোবিন্দচন্দ্রকে 'বাঙ্গাল-রাজ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেকের মতে বাখরগঞ্জ জিলাই প্রাচীন বাঙ্গাল দেশ। গৌরনদী থানায় "বাঙ্গাল বড়াভূ' গ্রামের অবস্থিতি এই মতের পরিপোষক। চট্টগ্রামের রাজার সামন্তরূপে জলপথে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের বাখরগঞ্জ অধিকার অসম্ভব ঘটনা নয়। সুতরাং চন্দ্রগণ সর্ব্বপ্রথম বাখরগঞ্জ জিলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, ইহা অনুমান করিলে ভুল হইবে না।

সামন্তরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্রের এক 'সূচিত রাজচিহ্ন' পুত্র জন্মে। ইনিই খ্যাতনামা শ্রীচন্দ্রদেব। তাঁহার চারিখানা তাম্র-শাসনই বিক্রম-পুর হইতে প্রদত্ত। সুতরাং দেখা যায়, তিনি বিক্রমপুর অধিকার করেন। 'ময়নামতীর গান' ও 'গোপীচাঁদের গীত' অনুযায়ী এ-সময়ে বিক্রমপুরের রাজা ছিলেন ধাড়িচন্দ্রের পুত্র মাণিকচন্দ্র। তাঁহার সহিত শ্রীচন্দ্রের ভগ্নী ময়নামতীর বিবাহ হয়। কিছু বিকৃত হইলেও এই সব সুপ্রচলিত কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না। ময়নামতীর গানে মাণিকচন্দ্রের রাজ্যে গোলযোগের উল্লেখ আছে। এই আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগে এবং ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ লইতে শ্রীচন্দ্র বোধ হয় বিক্রমপুর অধিকার করেন।

শ্রীচন্দ্রদেব এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। এ সময় চন্দ্ররাজ্য উত্তরে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া হইতে দক্ষিণে সমুদ্র-উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশের অধিকারী হন। প্রথমে তাঁহার রাজ্য ছিল 'বাঙ্গাল' দেশ। এই সকল স্থান তাঁহার সহিত সংযোজিত হওয়ায় সবটাই ক্রমশঃ বাঙ্গাল দেশ নামে পরিচিত হয়!

এই বিশাল রাজ্যের কি ভাবে পতন ঘটে, তাহা জানা যায় না। তবে পাল-বংশের ক্ষমতা-বৃদ্ধিই বোধ হয় তাহার কারণ। সেই সুযোগে গোবিন্দচন্দ্র অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু রাজেন্দ্র চোল দেবের নিকট পরাজিত হওয়ায় সে গৌরব আর পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। তাঁহার বংশধরগণ খুব সম্ভবতঃ সামান্য ভূস্বামিরূপে দিনপাত করিতেন। তাঁহাদের এক জনের পৃষ্ঠপোষকতায় উমাপতি ধর চন্দ্রচূড়-চরিত রচনা করেন। তখন তাঁহাদের বিশাল-শ্রী দূরে থাকুক, সামান্য নরপতিত্বের গর্ব্বও প্রায় মিথ্যার বাগাড়ম্বরে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

চন্দ্ররাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। রাজলাঞ্ছন ছিল ধর্ম্মচক্র। তাম্র-শাসনসমূহে সর্ব্ব প্রথমে বুদ্ধের স্তুতিবাচক শ্লোক এবং নামের সহিত পরম সৌগত প্রভৃতি বিশেষণ তাহার পরিচায়ক, কিন্তু সে জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের কোন বৈরতা ছিল না। সেন-রাজগণের মত তাঁহাদের পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ ছিল না।

কেদারপুর তাম্র-শাসনে শ্রীচন্দ্রদেব নিজ বংশের পরিচয় দিতেছেন —'নাগ্নৌ বিশুদ্ধো ন তুলাধিরূঢ়ঃ।' দুর্লভ মাণিক্যের গোবিন্দচন্দ্রের গীতে পরিচয় আছে—'বণিক্ জাতি ক্ষত্রিয়কুল'। চন্দ্রগণ বোধ হয় তথাকথিত নীচ জাতীয় ছিলেন; ক্রমশঃ সমাজে স্থান করিয়া লন। স্বর্গত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বসু মহাশয়ের মতে ভরদ্বাজ গোত্রীয় কায়স্থ চন্দ্র উপাধিধারিগণ এই রাজগণের বর্ত্তমান বংশধর।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

রিক্তা

কোথা তব হাস্যময়ী চঞ্চল চপল দিঠিখানি?
চলিতে কলস কাঁখে বাজে না তো কঙ্কণ-কিঙ্কিণি!
সীঁথিতে সিন্দুরবিন্দু কুঙ্কুম-রঞ্জিত টীপ ভালে,
কদম-কেশর কৈ সযত্ন-রক্ষিত কেশজালে?
কোথা সেই জলকেলি, সখী সাথে সলিল-সিঞ্চন?
অলক্ত-রঙীন পায়ে নূপুরের ঝুমুর-গুঞ্জন?
কোথা গেল সে চাহনি, সপ্রেম বিলোল আঁখি দু'টি?
অধরে তাম্বূল-রাগে ওঠে না তো সে মাধুরী ফুটি!
কোথা সেই প্রিয়-আশে বারে-বারে পথপানে চাওয়া?
বিরহে কাতর হৃদি—ক্ষোভে, অভিমানে গান গাওয়া!
কীটদগ্ধ পুষ্পসম হৃদয়ের শতধা বাসনা
পরজন্ম লাগি বৃথা প্রিয় লাগি জানায় কামনা!
উছল যৌবন তব হেরি আজ পুষ্পসম ম্লান!
হেলায় দলিয়া গেছে কেহ যেন লইয়া আঘ্রাণ!
নিঙাড়িয়া হৃদয়ের সর্ব্ব রস করেছে হরণ।
কেহ নাহি শুনিবার—বৃথা আজ বিলাপ-রোদন!
গৃহ শূন্যময় তব তারি সাথে সর্ব্বস্ব দিয়াছ।
যা কিছু অস্তিত্ব তার একে একে সব মুছিয়াছ!
অতীত দিনের কথা আজ শুধু স্বপনের ঘোর!
বিগত কাহিনী স্মরি বহে তাই দু'নয়নে লোর।
মুক্তকেশ, শুভ্রবেশ, হাসি তাও বিশুষ্ক মলিন।
আভরণ-হীন বাহু, সীঁথিটুকু সিন্দুর-বিহীন।
দৃষ্টিতে আবেশ নাই, শূন্য দু'টি উদাস নয়ন,
অতীত স্মৃতির মাঝে খুঁজে মন নিবিড় বন্ধন।
ফুরায়েছে প্রয়োজন, প্রতীক্ষার উদ্বেগ, পিপাসা।
আজি মন স্তব্ধ শান্ত অধরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাষা—
শুকায়ে গিয়াছে হায়, সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কার!
রিক্তা তুমি! মানো তাই নারী-জন্মে শতেক ধিক্কার।

রাণু গঙ্গোপাধ্যায়

মহামুনি-ভরত-কৃত

নাট্যশাস্ত্র

প্রথম অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'এইরূপ হউক'—ইহা তাহাদিগকে বলিয়া ও দেবরাজকে বিদায় দিয়া তত্ত্ববিৎ (ব্রহ্মা) যোগ অবলম্বন-পূর্ব্বক চতুর্ব্বেদ স্মরণ করিলেন ৷১৩৷

('যেহেতু এই সকল বেদ স্ত্রী-শূদ্রাদি জাতিগণের নিকট শ্রবণের যোগ্য ছিল না, সেই হেতু সকলের শ্রবণ-যোগ্য অন্য পঞ্চম বেদ আমি সৃষ্টি করিব')।

ধর্ম্ম ও অর্থের অনুকূল, যশস্কর, উপদেশ-যুক্ত, সসংগ্রহ, ভবিষ্যৎ লোকের সর্ব্বকর্ম্মানুদর্শক—৷১৪৷

সর্ব্বশাস্ত্রার্থ সম্পন্ন, সর্ব্বশিল্পের প্রবর্ত্তক, নাট্যাখ্য পঞ্চম বেদ ইতিহাস সহ আমি (রচনা) করিব। ১৫।

১৩। দেবরাজং বিসৃজ্য (মূল)—দেবরাজকে বিদায় দিয়া। কেবল দেবরাজ নহে, সকল দেবতাকেই বিদায় দিয়াছিলেন। দেবরাজ সকল দেবতার প্রধান বলিয়া তাঁহার নাম বিশিষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যোগ—যোগ-বলেই সর্ব্ববেদের যুগপৎ অবভাস (প্রকাশ) সম্ভব। তত্ত্ববিৎ—সকল-লোক-বেদ-তত্ত্বজ্ঞ (অভিনব-ভারতী, পৃঃ ১২)।

১৩ ও ১৪ শ্লোকের মধ্যবর্ত্তী সংখ্যা-বিহীন শ্লোকটির পাঠ কাশী-সংস্করণে ধৃত হয় নাই—কেবল বরোদা-সংস্করণে ব্র্যাকেটের মধ্যে মুদ্রাপিত হইয়াছে। উহার উপর অভিনবভারতী না থাকায় উহা প্রক্ষিপ্ত বোধ হয়।

১৪। ধর্ম্ম্য (মূল)—ধর্ম্ম-পথ হইতে অবিচ্যুত, ধর্ম্মের অনুকূল, ধর্ম্মবিষয়ে সম্যগ্‌ভাবে উপদেশের নিমিত্তভূত। অর্থ্য—অর্থানুকূল। অর্থ—প্রয়োজন। যশস্য—যশোলাভ যাহার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য। সোপদেশং (মূল)—উপদেশ-যুক্ত। অভিনব পাঠ ধরিয়াছেন—'সোপদেশ্যং'—উপদিশ্যমান-উপায়-যুক্ত। অতএব, অভিনব-মতে তাৎপর্য্য এইরূপ—ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ। ধর্ম্ম্য—চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থেরই সাধক; সাক্ষাৎ সাধক না হইলেও উপদিশ্যমান বিবিধ উপায়-দ্বারা চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের সাধক—চতুর্ব্বর্গের উপায়-প্রবর্ত্তক। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—বেদাদিও ত চতুর্ব্বর্গের উপায় প্রবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহা হইলে বেদ ও নাট্যে প্রভেদ কোথায়? উত্তর—মূলে যে 'সসংগ্রহ' পদটি দেওয়া হইয়াছে—তাহাতেই ইহার সমাধানের সূচনা রহিয়াছে। সংগ্রহ—সমগ্ররূপে গ্রহণ; যদনন্তর সুস্পষ্ট প্রতীতির নিমিত্ত অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা নাই, সেইরূপ প্রমাণ-দ্বারাই সম্যগ্‌রূপে গ্রহণ সম্ভব হয়। এই প্রমাণ—প্রত্যক্ষ—সাক্ষাৎকার-স্বরূপ। প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার সহ যাহা বর্ত্তমান, তাহাই 'সসংগ্রহ'। আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রত্যক্ষ-দ্বারা বৈদিক যজ্ঞ, সদাচার ইত্যাদিও ত দেখা যায়, তবে বেদ-সদাচারাদি হইতে নাট্যের ভেদ কোথায়? উত্তর মূলে প্রদত্ত হইয়াছে—'সর্ব্বকর্ম্মানুদর্শকম্'—ক্রিয়মাণ সকল কর্ম্মের অনন্তর অচিরকাল মধ্যে (পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে) শুভাশুভ কর্ম্ম ও তৎফলের সম্বন্ধ সাক্ষাৎকার যথায় হইয়া থাকে ("সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ক্রিয়মাণানামনু পশ্চাদচিরেণৈব কালেন দর্শকং পক্ষবাদিভিরেব দিবসৈঃ শুভাশুভকর্ম্মতৎফলসম্বন্ধসাক্ষাৎকারো যত্র"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৩)। কাহার? এই প্রশ্নের উত্তর—'ভবিষ্যতশ্চ লোকস্য'—যে কোনও লোক উক্ত ক্ষণের (করিবার সময়ের) পরে হইবে, তাহার। অভিনব 'লোক'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—উপদেশ ("কস্যোত্যাহ যো যঃ কশ্চিদস্মাৎ ক্ষণাদূর্দ্ধং ভবিষ্যতি লোকস্তস্যোপদেশস্যেত্যর্থঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৩)।

'উপদেশ' অর্থ—উপদেশ্য—যাহাকে উপদেশ দেওয়া যায়—এরূপ লোক, উপদেশ-প্রদান-দ্বারা যাহার ব্যুৎপত্তি জন্মান যায়—এরূপ ব্যক্তি। অভিনব পরে ইহার শব্দান্তর দিয়াছেন—"ব্যুৎপাদ্য" (লোক)। ভবিষ্যৎ—অনুকার্য্য—অনুকরণের যোগ্য। তাহা হইলে, 'ভবিষ্যতঃ লোকস্য'—ভবিষ্যৎ লোকের—এই বাক্যাংশের অর্থ দাঁড়াইতেছে—অনুকরণ-যোগ্য উপদেশ-দ্বারা যাহার ব্যুৎপত্তি জন্মান যাইবে—এরূপ লোকের।

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে—নাট্য-রচনার অন্তর্গত শব্দ-সমূহ হইতে ত অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়েরও প্রতীতি হয়; অতএব, কেবল 'ভবিষ্যৎ' পদটির প্রয়োগের সার্থকতা কোথায়? ইহার উত্তরেও বলা চলিতে পারে—অতীত রাজবংশাদির কীর্ত্তন ত মুখ্যভাবে কণ্ঠোক্তি-দ্বারাই করা যুক্তিযুক্ত; পক্ষান্তরে, ভবিষ্যৎ বিষয়ের কণ্ঠোক্তি-দ্বারা বিবৃতি অসম্ভব। একারণে 'ভবিষ্যৎ' এই পদটির প্রয়োগ-দ্বারা বিশেষ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—ভবিষ্যৎ বিষয়েরও বিবরণ (নাট্যে) সম্ভব। কিন্তু অভিনব এ দৃষ্টিতে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—এরূপ উক্তি-প্রত্যুক্তি এক্ষেত্রে তোলা থাকুক।

'ভবিষ্যৎ' পদের অর্থ—ভবিষ্যৎ বিষয় নহে। ভবিষ্যতে যে বিষয় অনুকরণের যোগ্য তাহাই ভবিষ্যৎ ("অনুকার্য্যাভিপ্রায়েণাত্র ভবিষ্যত ইতি ব্যাখ্যাতম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৩)। সে বিষয়টি হয়ত অতীতে ঘটিয়া থাকিতে পারে, অথবা বর্ত্তমান বিষয়ও উহা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না—উহা ভবিষ্যতের আদর্শ—ভবিষ্যতের অনুকরণ-যোগ্য হইলেই হইল—ইহাই অভিনবের অভিপ্রায়। তাহা হইলে সমগ্র বাক্যাংশটির তাৎপর্য্য দাঁড়াইতেছে এইরূপ—নাট্যবেদে যে উপদেশ থাকিবে, তাহা ভবিষ্যতে অনুকরণ-যোগ্য; উহার অনুকরণ-দ্বারা লোকের ব্যুৎপত্তি (জ্ঞান, অভিজ্ঞতা) অদূর ভবিষ্যতে জন্মিতে বাধ্য। নাট্যাভিনয়-কালে যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার অনুষ্ঠান-দ্বারা অচিরকাল-মধ্যেই উক্ত কর্ম্ম ও তৎফলের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এক কথায়—নাট্যোক্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্মোপদেশের অনুসরণ-দ্বারা লোক অতি অল্পদিনের মধ্যেই অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।

এখন পুনশ্চ প্রশ্ন উঠিবে—নাট্যোক্ত উপদেশের অনুষ্ঠানে লোক প্রথমে প্রবৃত্ত হইবে কেন? উহা অদূর ভবিষ্যতে ফলপ্রদ হইতে পারে সত্য—কিন্তু বর্ত্তমানে উহাতে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে প্রয়োজক কি? তাহারই উত্তর মূলে দেওয়া আছে—'অর্থ্যম্'—অর্থাৎ হৃদ্য বলিয়া নানা বিষয়ে অধিকারী বিভিন্ন ব্যক্তির অভিলাষের যোগ্য। পুনশ্চ প্রশ্ন হইতে পারে—প্রবৃত্ত হইবার কালে ত ভাবী ফল অজ্ঞাত; অতএব, পূর্ব্বে অভিলাষ জন্মিবেই বা কেন? তাহার উত্তর 'যশস্যং'—হৃদ্য বলিয়া সর্ব্বত্র প্রথিত।

১৫। সর্ব্বশাস্ত্রার্থসম্পন্নং—ইহা যে কেবল ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গ বা চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের উপায় তাহা নহে, পরন্তু সকল

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ভগবান্ সকল বেদের অনুস্মরণ-পূর্ব্বক তাহা হইতে চতুর্ব্বেদাঙ্গ-সম্ভব নাট্যবেদ (রচনা) করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্য, আর সাম-সমূহ হইতে গীত, যজুর্ব্বেদ হইতে (বিভিন্ন) অভিনয়-(পদ্ধতি)-সমূহ ও আথর্ব্বণ হইতে রস-সমূহ (তিনি) গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১৭॥

শাস্ত্রের বিশেষতঃ কলা-প্রধান শাস্ত্রগুলির যে অর্থ (প্রয়োজন)—নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি—তদ্‌যুক্ত। সর্ব্বশিল্পপ্রবর্ত্তকং—চিত্র-পুস্ত ইত্যাদি সর্ব্ববিধ শিল্পের প্রবর্ত্তক। পুস্ত—রঙ্গমঞ্চে যে সকল কৃত্রিম বৃক্ষ-পর্ব্বত-যান-বিমানাদি প্রদর্শিত হয় (নাঃ শাঃ, কাশী সং, ২৩।১। পুস্ত ত্রিবিধ—ব্যাজিম (যন্ত্রময়), সন্ধিম ও চেষ্টিম।

সেতিহাসং—ইতিহাস সহ, ইতিহাসের উপদেশ-কর। ইতিহাস—ইতি—এইরূপ ; হ—আগম (আগমোক্ত বিষয়) ; আসঃ—স্থিতি। ইতিহাস—যাহাতে এইরূপ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান আগমোক্ত বিষয়-সমূহ (কর্ম্ম ও তৎফলের সম্বন্ধ) বিদ্যমান। অথবা, ইতি—জ্ঞান; হাস—হর্ষপূর্ব্বক বিকাশ। যাহাতে জ্ঞানের হর্ষপূর্ব্বক বিকাশ দৃষ্ট হয়, তাহাই ইতিহাস—এরূপ অর্থও কেহ কেহ করিয়া থাকেন (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৩)। পঞ্চম বেদ—ইহা এক হইলেও চতুর্ব্বেদকে অতিক্রম করিতে সমর্থ ("য একোঽপি চতুরো বেদানতিশেতে"—অঃ ভাঃ; পৃঃ ১৩)। নাট্যবেদ সৃষ্টিতে ব্রহ্মার আগ্রহ জন্মিল কেন?—ইহার উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন—সকল লোক-কৃত্যের উদ্বহন তাঁহার পরম কর্ত্তব্য। সকল লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ ব্রহ্মা—অতএব তাহাদিগকে আচরণীয় কৃত্য বা কর্ম্ম-পথ নির্দেশ করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য (অঃ ভাঃ, পৃ ১৪)।

১৬। সঙ্কল্প—বুদ্ধি-দ্বারা চতুর্ব্বেদাঙ্গের একীকরণই সঙ্কল্পের ব্যাপার—ইহাই নাট্যবেদের উৎপাদন (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৪)। সর্ব্ব বেদাননুস্মরন্—অনু-স্মৃ-শতৃ—অনুস্মরন্। এস্থলে শতৃ-প্রত্যয়ের অর্থ হেতু। যেহেতু পিতামহ চতুর্ব্বেদ স্মরণ করিয়াছিলেন, অতএব চতুর্ব্বেদাঙ্গসম্ভব নাট্যবেদ রচনা করিয়াছিলেন। মূলে আছে 'ততঃ'। ততঃ—তাহার পর, সঙ্কল্পানন্তর ; কিন্তু অভিনব অর্থ করিয়াছেন—তাহা হইতে। তাহা—চতুর্ব্বেদ ("তত ইতি চতুর্ভ্যো নাট্যবেদং চক্রে"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ১২)। চতুর্ব্বেদাঙ্গসম্ভবম্—ইহার সরল অর্থ এরূপ হইতে পারে—চতুর্ব্বেদের অঙ্গ হইতে সম্ভব (অর্থাৎ উৎপত্তি) যে নাট্যবেদের—অর্থাৎ এক কথায় চতুর্ব্বেদের অঙ্গ-সম্ভূত। কিন্তু তাহা হইলে অর্থ দাঁড়ায়—নাট্যবেদ সাক্ষাৎ চতুর্ব্বেদ-সম্ভূত নহে কিন্তু চতুর্ব্বেদের অঙ্গভূত উপবেদাদি হইতে উৎপন্ন। কিন্তু এরূপ অর্থ বাঞ্ছনীয় নহে। এ কারণে অভিনব অর্থ করিয়াছেন—চারিটি বেদ হইতে যাহার (যে নাট্যবেদের) অঙ্গসমূহের সম্ভব (উৎপত্তি)। অর্থাৎ—সাক্ষাৎ বেদ-চতুষ্টয়ই নাট্যবেদের বিভিন্ন অঙ্গের উপকরণ বা উপাদান যোগাইয়াছিলেন। নাট্যের অঙ্গ বলিতে বুঝাইতেছে—পাঠ্য, গীত, অভিনয় ও রস। কোন্ বেদ হইতে কোন্ অঙ্গটি গৃহীত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় ১৭ সংখ্যক শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে।

১৭। পাঠ্য—সকল নাট্যাঙ্গের মধ্যে ইহাই প্রধান। তাই অন্যত্র বলা হইয়াছে—বাক্যাভিনয়ে বিশেষ যত্ন কর্ত্তব্য, যেহেতু, ইহা নাট্যের দেহ-স্বরূপ। অঙ্গাভিনয়, নেপথ্য (আহার্য্যাভিনয়) ও সত্ত্বাভিনয় বাক্যার্থেরই অভিব্যঞ্জক—

"বাচি যত্নস্তু কর্ত্তব্যো নাট্যস্যৈষা তনুঃ স্মৃতা।
অঙ্গনৈপথ্যসত্ত্বানি বাক্যার্থং ব্যঞ্জয়ন্তি হি ॥"
—নাঃ শাঃ, বরোদা সং, ১৪।২

কাশী সংস্করণে উহা ১৫শ অধ্যায়ের শ্লোক। তথায় পাঠ—"অঙ্গনেপথ্য-তত্ত্বানি"—সম্ভবতঃ ইহা লেখক-প্রমাদ।

ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্য গৃহীত—ঋগ্বেদ ত্রিস্বর (উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত) যুক্ত। পাঠ্যেও ত্রিস্বরেরই প্রয়োগ হয়। একস্বর হইলে কাকু ও অন্যান্য বচোভঙ্গী সুস্পষ্টভাবে বুঝান যায় না—একস্বর গীতের অন্তর্গত। অতএব, ত্রিস্বর-প্রধান ঋগ্বেদ হইতেই পাঠ্য-গ্রহণ যুক্তিযুক্ত।

সামবেদ হইতে গীত—বেদ-মন্ত্র ত্রিবিধ—(১) ঋক্ (ছন্দোবদ্ধ পাদবদ্ধ—কবিতা, যাহা পাঠ-যোগ্য), (২) সাম (গীতি-রূপ) ও (৩) যজুঃ (কবিতা ও গীত ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ গদ্যরূপ)। সাম যখন গীতিরূপ, তখন সামবেদ হইতে গীত-গ্রহণ খুবই যুক্তিযুক্ত। গীতই পাঠ্যের উপরঞ্জক—নাট্য-প্রয়োগের প্রাণ-স্বরূপ—এ কারণে পাঠ্যের পরই গীতের উল্লেখ করা হইয়াছে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৪)।

'অভিনয়-সমূহ' (অভিনয়ান্—মূল) বলিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে অভিনয় নানা প্রকার। বস্তুতঃ অভিনয় চতুর্ব্বিধ—(১) বাচিক, (২) আঙ্গিক, (৩) আহার্য্য ও (৪) সাত্ত্বিক (নাঃ শাঃ, বরোদা সং ৬।২৪)।

আহার্য্যাভিনয় বলিতে বুঝায়—আহার্য্য-শোভাময় অভিনয়। আহার্য্য-শোভা আহরণীয় শোভা—যাহা শরীরের স্বাভাবিক শোভা নহে, পরন্তু বেশ-ভূষাদি কৃত্রিম উপায়ে যে শোভা আহরণীয়, তাহাই আহার্য্য-শোভা। মহর্ষি ভরতের মতে আহার্য্যাভিনয় ও নেপথ্য-বিধান একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। নেপথ্য—বেশ। ভরত-মতে নেপথ্যের চারিটি বিভাগ—(১) পুস্ত, (২) অলঙ্কার, (৩) অঙ্গরচনা ও (৪) সঞ্জীব। পুস্ত—রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শনীয় কৃত্রিম বৃক্ষ-পর্ব্বত-যান-বিমানাদি। ইহার আবার তিনটি বিভাগ—(ক) সন্ধিম—বস্ত্র-চর্ম্মাদি-দ্বারা কৃত রূপ ; (খ) ব্যাজিম—যন্ত্রময় ; (গ) চেষ্টিম—অঙ্গচেষ্টা-দ্বারা যাহার অনুকরণ করা হয়। অলঙ্কার—মাল্য-আভরণ-বস্ত্র ইত্যাদি। অঙ্গরচনা—দেশ-জাতি-বয়স-অনুসারে বর্ণবিধান (পেণ্ট করা)। সঞ্জীব—রঙ্গমঞ্চে অপদ, দ্বিপদ, চতুষ্পদ ইত্যাদি প্রাণিগণের প্রবেশ প্রদর্শন। (আহার্য্যাভিনয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ কাশী সং নাট্যশাস্ত্রের ২৩শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

সাত্ত্বিকাভিনয়—সত্ত্ব মনঃপ্রভব—ইহাই মহর্ষি ভরতের মত। সমাহিত মনই সত্ত্ব, তাই সমাধি অবস্থায় সত্ত্ব-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। অভিনবগুপ্ত-মতে সত্ত্ব আর চিত্তৈকাগ্র্য সমার্থক। বিশ্বনাথমতে মনোমধ্যে যখন রজোগুণ ও তমোগুণ প্রকাশ পায় না—কেবল সত্ত্ব-গুণেরই উদ্রেক হইতে থাকে, তখন তাদৃশ মনকেই সত্ত্ব-নামে অভিহিত করা হয়। এই সত্ত্ব বাহ্য মেয় (জ্ঞেয়) বস্তু হইতে বিমুখতা উৎপাদন করে অর্থাৎ ইহা চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সত্ত্ব রসাদির উদ্বোধক আন্তর-ধর্ম্ম-বিশেষ। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু (কম্প), বিবর্ণতা, অশ্রু ও প্রলয় (অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদিকৃত চেষ্টা ও জ্ঞানের লোপ)—এই আটটি সাত্ত্বিক-ভাব-দ্বারা সাত্ত্বিকাভিনয় প্রদর্শনীয় (মৎসম্পাদিত অভিনয়দর্পণ, পৃঃ ২০-২১ দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে মহাত্মা সর্ব্ববেদী ভগবান্ ব্রহ্মা কর্তৃক বেদ ও উপবেদ-সমূহ-দ্বারা সম্বদ্ধ নাট্যবেদ সৃষ্ট হইয়াছিল ।১৮।

নাট্যবেদ উৎপাদন-পূর্ব্বক ব্রহ্মা সুরেশ্বরকে বলিয়াছিলেন—'আমি ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছি, উহা সুরগণের মধ্যে নিয়োজিত কর' । ১১ ।

যাঁহারা কুশল, বিদগ্ধ, প্রগলভ ও জিতশ্রম—তাঁহাদিগের মধ্যে এই নাট্যসংজ্ঞক বেদ তুমি সংক্রামিত কর ।২০।

ব্রহ্মা যাহা বলিলেন, ভগবান্ ইন্দ্র তাহা শ্রবণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হইয়া পিতামহকে প্রতিবাক্য বলিয়াছিলেন ।২১।

হে ভগবন্ ! হে সত্তম ! দেবগণ ইহার (নাট্যের) গ্রহণে, ধারণে, জ্ঞানে ও প্রয়োগ ইত্যাদিতে অশক্ত—নাট্যকর্ম্মে অযোগ্য ।২২।

এই যে সকল ঋষি বেদের গুহ্য-তত্ত্বজ্ঞ ও সংশিতব্রত, ইঁহারা ইহার গ্রহণ, ধারণ ও প্রয়োগে সমর্থ । ২৩ ।

যজুর্ব্বেদ হইতে অভিনয়—যজুর্ব্বেদের ঋত্বিক্ অধ্বর্য্যু প্রদক্ষিণ-গমন-আহুতি-প্রদানাদি ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান প্রধানভাবে করিয়া থাকেন।

এ কারণে বলা হইল, যজুর্ব্বেদ হইতে অভিনয়-সমূহ গৃহীত হইয়াছিল। অবশ্য এস্থলে অভিনয় বলিতে মুখ্যতঃ আঙ্গিকাভিনয়ই বুঝিতে হইবে। কারণ, বাচিকাভিনয় ত পাঠ্য-স্বরূপ—উহা ত ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। আর সাত্ত্বিকাভিয় রসপুষ্টির সাক্ষাৎ অনুকূল বলিয়া উহা অথর্ব্ববেদ হইতে গৃহীত। আহার্য্যাভিনয়ও অনেক সময় রসপুষ্টির সহায়তা করে। শান্তিকর্ম্মে যেরূপ বেশের প্রয়োজন, মারণে সেরূপ বেশ অচল। এ কারণে আহার্য্যাভিনয়কেও অথর্ব্ববেদের অঙ্গভূত বলিয়া অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু 'অভিনয়' বলিতে মুখ্যভাবে বুঝায় আঙ্গিকাভিনয়। উহা একমাত্র যজুর্ব্বেদের অধীন। তবে আনুষঙ্গিকরূপে বাচিক ও আহার্য্য অভিনয়ও যজুর্ব্বেদে বিদ্যমান থাকিতে পারে।

অথর্ব্ববেদ হইতে রস-সমূহ—অথর্ব্ববেদে শান্তি-পুষ্টি-মারণাদি নানারূপ ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান-কালে ঋত্বিক্‌কে নটেরই ন্যায় লোহিত উষ্ণীষ ইত্যাদি নানারূপ বেশ ধারণ করিতে হয়। তবে ঐ প্রকার বেশ-পবিবর্ত্তনই অথর্ব্ববেদের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। বেশান্তর-ধারণ গৌণ ব্যাপার! মুখ্যতঃ ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কালে ঋত্বিকের মনে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ও হইয়া থাকে। এই কারণে অথর্ব্ববেদকে সত্ত্ব-সূচিত রসের উৎস-স্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

অভিনব বলিয়াছেন—যে হেতু অথর্ব্ববেদোক্ত শান্তি-মারণাদি কর্ম্মে কেবল বেশান্তরের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় না, পক্ষান্তরে, সেই সেই কর্ম্মের অনুকূল মানস ভাব (সত্ত্ব) ও তৎসম্ভূত রসের উদ্রেক ঋত্বিকের চিত্তে হইয়া থাকে, সেই হেতু অথর্ব্ববেদ হইতে অভিনয় গ্রহণ না করিয়া রসের সংগ্রহ করা হইল। (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৫)।

নাট্য—রূপক-সমূহে সম্বদ্ধ, গীত-বাদ্য-অঙ্গাভিনয়-সমূহ-দ্বারা ক্রমশঃ পরিপোষ-প্রাপ্ত রসাস্বাদনাত্মক পর-প্রীতি-জনক নাট্য—ইহাই অভিনবের মত ("তদেবং নাটকাদিরূপকোপক্রমং গীতাতোদ্যপ্রাণাভিনয়বর্গ-পরিপুষ্যদ্রসচর্ব্বণাত্মকং পরপ্রীতিময়মেব নাট্যম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৫)।

১৮। উপবেদ—বেদার্থের উপকারক ; যথা—ঋগ্বেদের উপবেদ—আয়ুর্ব্বেদ—প্রজা-রক্ষণার্থ প্রযুক্ত।

মহাত্মা সর্ব্ববেদী—যেহেতু তিনি মহাত্মা (অর্থাৎ সমষ্টি-সূক্ষ্ম-শরীরাত্মক—হিরণ্যগর্ভ-স্বরূপ), অতএব তিনি সমষ্টি বুদ্ধির (মহত্তত্ত্বের) আশ্রয়—সর্ব্ববিৎ। সর্ব্ববেদী—সর্ব্বজ্ঞ। আর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই সকল বেদের ও উপবেদের সার সংগ্রহ-পূর্ব্বক নাট্যবেদ-রচনায় সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপে ঋষিগণ-কৃত তিনটি প্রশ্নের সমাধান করা হইল—নাট্যের কি প্রয়োজন, কে যথার্থ অধিকারী, কি কি উহার অঙ্গ, অঙ্গগুলির মধ্যে কোন্‌টি প্রধান, কোন্‌গুলি বা অপ্রধান—ইহা নির্ণীত হইল। অভিনব বলিয়াছেন—নাট্য-রচয়িতা কবি (নাট্যে অধিকারী) হইবেন পিতামহ-সদৃশ। দেবরাজের ন্যায় বিভববান্ ও আজ্ঞানুবর্ত্তী নট-যুক্ত রাজা হইবেন উহার প্রয়োজয়িতা (producer)। ভরতমুনির ন্যায় সম্পন্ন-পরিবার ও সর্ব্ববিৎ নাট্যাচার্য্য হইবেন উহার প্রযোক্তা (director)। প্রয়োজয়িতার কোন উৎসব হইবে নাট্য-প্রয়োগের কাল। ক্রীড়াদির ছলে উহাতে উপদেশ প্রদত্ত হইবে। আর নির্ম্মলহৃদয় বিগত-রাগ-দ্বেষ মধ্যস্থ-বৃত্তি-যুক্ত রসাস্বাদাভিজ্ঞ সামাজিকগণ হইবেন উহার দর্শক। পুরাকল্প (প্রাচীন ঘটনার বিবরণ)-প্রসঙ্গে উক্ত তত্ত্বগুলি প্রথমাধ্যায়ে ধীরে ধীরে প্রদর্শিত হইয়াছে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৫-১৬)।

১১। উৎপাদ্য নাট্যবেদং তু—'তু' শব্দটি হইতে বুঝা যায় যে, একমাত্র রাজাই নাট্য-প্রয়োগের উপযুক্ত কর্ত্তা। ইতিহাস—দশরূপক (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৬)।

২০। কুশল—গ্রহণে (পাঠ্যাদির শিক্ষায়) ও ধারণে (শিক্ষিত বিষয় মনে রাখায়) যোগ্য। বিদগ্ধ—পণ্ডিত, রসিক, connoisseur উহাপোহ-সমর্থ। উহ-অপোহ—অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি। প্রগলভ—সভাতে যে ভয় পায় না—forward, stage-free, জিতশ্রম—যাহার দেহ অল্পে খেদযুক্ত হয় না, hardy.

২২। গ্রহণ—গুরুমুখ হইতে শিক্ষণ। ধারণ—শিক্ষিত বিষয়ের অবিস্মরণ। জ্ঞান—উহাপোহ-বিচার। প্রয়োগ—পরিষদে উহার প্রকটীকরণ। ইত্যাদি (চ—মূল)—ব্যায়াম, অভ্যাস ইত্যাদি। দেবগণ চিরদিন অত্যন্ত সুখাভ্যস্ত। তাঁহারা দুঃখ-বহুল নাট্য-প্রয়োগের উপযুক্ত অধিকারী নহেন। তবে পিতামহ যদি আদেশ দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই নাট্য-প্রয়োগের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে নাট্য-প্রয়োগের পূর্ণ ফললাভ কখনও সম্ভব হইবে না—ইহাই দেবরাজের বক্তব্যাভিপ্রায় (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৬)।

২৩। বেদগুহ্যজ্ঞাঃ—বেদাধ্যয়ন দেবতাদিগকে করিতে হইত না—ঋষিগণই উহা করিতেন। তৎকালে এই বেদাধ্যয়ন ছিল অতি কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার। আধুনিক কালেব ন্যায় লিখিত পুস্তক দেখিয়া পাঠ করার রীতি সে যুগে ছিল না। গুরুর মুখ হইতে শ্রুতির উচ্চারণ শুনিয়া অনুরূপ উচ্চারণ-পূর্ব্বক উহা কণ্ঠস্থ করিতে হইত—এই প্রক্রিয়ার নাম ছিল অক্ষর-গ্রহণ। আর এই কারণেই বেদের নাম ছিল 'শ্রুতি' (যাহা কর্ণে শুনিয়া আয়ত্ত করিতে হইত)। বেদ-গুহ্য—(১) বেদের গুহ্য অর্থাৎ রহস্য অংশ—উপনিষৎ—অধ্যাত্ম-তত্ত্বপূর্ণ জ্ঞানকাণ্ড ; অথবা (২) বেদ (বেদের কর্ম্মকাণ্ড)—ও গুহ্য (রহস্যাংশ উপনিষৎ)। বেদের মূল বিভাগ দুইটি—(১) মন্ত্র ও (২) ব্রাহ্মণ। মন্ত্র-সমষ্টি—সংহিতা। ব্রাহ্মণ—তিন অংশ—(ক) ব্রাহ্মণ (মুখ্য)—কর্ম্ম-কাণ্ড, (খ) আরণ্যক—উপাসনা-কাণ্ড ও (গ) উপনিষৎ—জ্ঞান-কাণ্ড—(গুহ্য)। বেদগুহ্যজ্ঞাঃ বলিতে বুঝাইতেছে—বেদজ্ঞ

ইন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া পদ্মযোনি (ব্রহ্মা) আমাকেই বলিলেন—হে অনঘ! তুমি পুত্র-শত সহ ইহার প্রযোক্তা হও। ২৪।

(এইরূপে) আজ্ঞাপিত হইয়া আমি পিতামহের নিকট হইতে নাট্যবেদের জ্ঞানলাভ করিয়া পুত্রগণকে (উহার) অধ্যাপনা করিয়াছিলাম ও তত্ত্বানুসারে প্রয়োগেরও (শিক্ষা দিয়াছিলাম)। ২৫।

(১) শাণ্ডিল্য, (২) বাৎস্য, (৩) কোহল, (৪) দত্তিল, (৫) জটিল, (৬) অম্বষ্টক, (৭) তণ্ডু ও (৮) অগ্নিশিখ—। ২৬।

(৯) সৈন্ধব, (১০) পুলোমা, (১১) শাড্বলি, (১২) বিপুল, (১৩) কপিঞ্জলি, (১৪) বাদির, (১৫) যম ও (১৬) ধূম্রায়ণ—। ২৭।

(১৭) জম্বুধ্বজ, (১৮) কাকজঙ্ঘ, (১৯) স্বর্ণক, (২০) তাপস, (২১) কৈদারি, (২২) শালিকর্ণ, (২৩) দীর্ঘগাত্র, ও (২৪) শালিক—। ২৮।

(২৫) কৌৎস, (২৬) তাণ্ডায়নি, (২৭) পিঙ্গল, (২৮) চিত্রক, (২৯) বন্ধুল, (৩০) ভল্লক, (৩১) মুষ্টিক ও (৩২) সৈন্ধবায়ন—। ২৯।

(৩৩) তৈত্তিল, (৩৪) ভার্গব, (৩৫) শুচি, (৩৬) বহুল, (৩৭) অবুধ, (৩৮) বুধসেন, (৩৯) পাণ্ডুকর্ণ ও (৪০) সুকেরল—। ৩০।

(৪১) ঋজুক, (৪২) মণ্ডক, (৪৩) শম্বর, (৪৪) বঞ্জুল, (৪৫) মাগধ, (৪৬) সবল, (৪৭) কর্ত্তা ও (৪৮) উগ্র—। ৩১।

(৪৯) তুষার, (৫০) পার্ষদ, (৫১) গৌতম, (৫২) বাদরায়ণ, (৫৩) বিশাল, (৫৪) শবল, (৫৫) সুনাভ, ও (৫৬) মেষ—। ৩২।

'হে সত্তম! অপর কেহ ইহার (নাট্যবেদের) ধারণে অথবা প্রয়োগে যোগ্য (সমর্থ) নহে। উহার প্রয়োগে অতন্দ্রিত (অনলস) হইয়া যত্ন কর'—ইহা (আমি) উক্ত হইয়াছিলাম।

বিভুর আজ্ঞা (পাইয়া) পিতামহের নিকট হইতে নাট্যবেদ শিক্ষা-পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞানুসারে প্রয়োগার্থী আমি পুত্রগণকে অধ্যাপনা করিয়াছিলাম।

(অর্থাৎ বেদের মন্ত্র-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-তত্ত্বজ্ঞ) ও গুহ্যজ্ঞ (উপনিষদে অভিজ্ঞ)।

বেদজ্ঞ—বেদের গ্রহণ (কণ্ঠস্থীকরণ) ও ধারণের সামর্থ্য সূচিত হইতেছে। গুহ্যজ্ঞ—অধ্যাত্ম উপনিষদের অর্থজ্ঞান ও ধারণের কৌশল আয়ত্ত করিয়া রসাদির উপযোগী সাত্ত্বিকভাব-সম্পাদিত সামর্থ্য সূচিত হইতেছে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৬)। এই সত্ত্বই নাট্যের প্রাণ—সাত্ত্বিক ভাবগুলির কোন্‌টির কোথায় কেন্দ্র, তাহা অভিনবভারতীতে উদ্ধৃত হইয়াছে—প্রাণ (শ্বাস) ভ্রূমধ্যে, স্তম্ভ ও বাষ্প চক্ষুতে, স্বেদ হৃদয়ে, গুহ্যদেশে বেপথু, পুলক মস্তকে, বৈবর্ণ্য মুখে, গদ্‌গদ কণ্ঠে, প্রলয় নাসাভ্যন্তরে ইত্যাদি। এই সকল স্থানের উপর একাগ্র চিত্ত স্থাপিত না হইলে সাত্ত্বিক ভাবের যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয় না। সাত্ত্বিক-ভাবের বিকাশ না করিতে পারিলে রসস্ফূর্ত্তি অসম্ভব।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, নাট্যবেদের গ্রহণ-ধারণাদিহেতু আনুষঙ্গিক ভাবে নটেরও পরম-পুরুষার্থ লাভের যোগ্যতা বর্ত্তমান (অঃ ভা, পৃঃ ১৭)।

ঋষয়ঃ—'ঋষ' ধাতুর অর্থ দর্শন। ঋষি—ক্রান্তদর্শী, সত্যদ্রষ্টা—উহাপোহযোগ্য। সংশিতব্রতাঃ—সুতীব্র ব্রতাচরণে সমর্থ—ইহা হইতে বুঝায়—তাঁহারা কঠোর অভ্যাসে সমর্থ।

২৪। শ্রুত্বা তু শক্রবচনং মামাহাম্বুজসম্ভবঃ—'মাং তু'—এইরূপ অন্বয় হইবে। 'মাং তু'—এস্থলে 'তু' পদ-দ্বারা অন্য ঋষি হইতে ভরতের বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে। ব্রহ্মা স্বয়ং ভরতকে বলিয়াছিলেন—ইহাতেও আদরের আতিশয্য সূচিত হইতেছে। পুত্র শত—ইহাতে বুঝাইতেছে—ভরতের পরিবার (দলবল) খুব বেশী। অনঘ—পাপ-হীন। ইহা দ্বারা ভরতের সম্মান করা হইয়াছে।

—ইহা হইতে বুঝায়—উৎসাহযুক্ত পরিষৎ-কর্তৃক নটগুরুর সম্মান প্রদর্শিত হইলে প্রয়োগ সুষ্ঠু, নিষ্পাদিত হইয়া থাকে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৭)।

২৫। আজ্ঞাপিতঃ—পিতামহের বচন যে অলঙ্ঘ্য ইহাই সূচিত হইল। প্রয়োগ—ইহার তিন প্রকার অর্থ—(১) যাহার প্রয়োগ করা যায়—দশবিধ রূপক, (২) যাহা-দ্বারা প্রয়োগ করা যায়—নাট্য-লক্ষণ-শাস্ত্র ও (৩) রঙ্গে প্রয়োগ-রূপ যে ব্যাপার। চাপি—এই দুইটি অব্যয়-পদের প্রয়োগ-দ্বারা প্রয়োগ-শব্দটির দ্বিরাবৃত্তি বুঝাইতেছে—নাট্য-লক্ষণ-শাস্ত্র ও উহার প্রয়োগ-তত্ত্ব আমি পুত্রগণকে পড়াইয়াছিলাম, আর আমি নিজেও এরূপভাবে অভ্যাস করিয়াছিলাম, যাহাতে পুত্রগণ প্রয়োগ-প্রক্রিয়া সম্যগ্‌রূপে শিখিতে পারে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৭)।

কাশীর পাঠান্তর' পুত্রানধ্যাপয়ং যোগ্যান্' যোগ্য পুত্রগণের অধ্যাপনা করিয়াছিলাম।

বরোদা সংস্করণে ফুটনোট ২৫ শ্লোকের পাঠান্তর-রূপে দুইটি শ্লোক প্রদত্ত হইয়াছে। উহাদিগের ভাষান্তর নিম্নরূপ—

২৬। ২৬ হইতে ৩৯ পর্য্যন্ত শ্লোকে ভরতের শত পুত্রের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। নামগুলির বহু পাঠান্তর আছে। যে পাঠান্তর-গুলি সঙ্গত মনে হইল এ স্থলে সেইগুলিই কেবল প্রদত্ত হইল।

(৪) ধূর্ত্তিল; দন্তিল (কাশী)। ৫ জটুল (কাশী); ষড়িল। ৭ তাণ্ডু (কাশী); তাণ্ড্য, দণ্ড। ৮ অগ্নিমুখ।

২৭। (১০) পুংসলোমা। ১১ শাড্বলী (কাশী); শাম্বলি, বালিক, পাড়লি। ১২ বিবুধ। ১৩ কপিঞ্জল। ১৪ বাদরি। ১৫ বম (কাশী)।

কাশী-সংস্করণে ২৯ নং শ্লোকের শেষার্দ্ধ ২৭ শ্লোকের শেষার্দ্ধরূপে পঠিত হইয়াছে। আবার ৩০ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধরূপেও পুনরুক্ত হইয়াছে।

২৮। ১৭ জম্বুধ্বজ; জম্বুক; বাম্বল। ১৮ কাকজঙ্ঘ; কোকমুস্ত। ১৯। স্বর্ণকূৎ; পূর্ণক। ২১ কেদার (কাশী); কেদারি।

২৯। ২৫ কোৎস। ২৬ তান্ড্যাসী; তাণ্ড্যায়নি। ২৭ পিণ্ড। ২৮ ছত্রক (কাশী); ছত্র। ২৯ বন্ধল (কাশী) ২৭ শ্লোক। ৩০ ভক্তক (কাশী ২৭ শ্লোক); বল্লক; ভালুক; বাস্কল।

৩০। (৩৩) ত্রিত্তিল। (৩৭) অমুধ। (৩৯) পারকর্ণ; পাণ্ডুকর্ণ (৪০) কেরল (কাশী); সুরেক্ষল।

৩১। (৪১) মিশ্রক; ঋজু। (৪২) কমণ্ডলু (৪৩) শাম্বক; (৪১) বঞ্জুল। (৪৬) সুরল, সুকল, সারণ।

কর্ত্তা ও উগ্র—এই দুইটি নাম কাশী-সংস্করণে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

৩২। (৪৯) তুষাদ (কাশী)। (৫০) পাংশল। (৫২) বাদরায়ণি। (৫৫) সুনালী (কাশী)। ৫৩ ৫৪ ৫৫ ও ৫৬ স্থলে পাঠান্তর যথাক্রমে—উদারি, বরুণ, বরণি, হংস।

ইহার পরেই কাশী-সংস্করণে ৩৫ শ্লোকটি পঠিত হইয়াছে।

(৫৭) কাল্পিয়, (৫৮) ভ্রমর, (৫৯) পীঠমুখ মুনি, (৬০) নখকুট, (৬১) অশ্মকুট, (৬২) ষট্পদ ও (৬৩) উত্তম—॥ ৩৩ ॥

(৬৪) পাদুকা, (৬৫) উপানৎ, (৬৬) শ্রুতি, (৬৭) অযস্বর, (৬৮) অগ্নিকুণ্ড, (৬৯) আজ্যকুণ্ড, (৭০) বিতণ্ড্য, ও (৭১) তাণ্ড্য—॥৩৪॥

(৭২) কর্ত্তরাক্ষ, ৭৩ হিরণ্যাক্ষ, ৭৪ কুশল ৭৫, দুঃষহ, ৭৬ লাজ ৭৭ ভয়ানক, ৭৮ বীভৎস ও ৭৯ বিচক্ষণ—॥৩৫ ॥

(৮০) পুণ্ড্রাক্ষ, (৮১) পুণ্ড্রনাস, (৮২) অসিত, (৮৩) সিত, (৮৪) বিদ্যুজ্জিহ্ব, (৮৫) মহাজিহ্ব, ও (৮৬) শালঙ্কায়ন—॥৩৬॥

(৮৭) শ্যামায়ন, (৮৮) মাঠর, (৮৯) লোহিতাঙ্গ, (৯০) সংবর্ত্তক, (৯১) পঞ্চশিখ. (৯২) ত্রিশিখ ও (৯৩) শিখ—॥৩৭॥

(৯৪) শঙ্খবর্ণমুখ, (৯৫) ষণ্ড, (৯৬) শঙ্কুকর্ণ, (৯৭) শক্রনেমি, (৯৮) গভস্তি, (৯৯) অংশুমালি ও (১০০) শঠ—॥৩৮॥

(১০১) বিদ্যুৎ, (১০২) শাতজঙ্ঘ, (১০৩) রৌদ্র, ও (১০৪) বীর—পিতামহের আদেশে ও লোকের গুণপ্রাপ্তির ইচ্ছায় মৎকর্ত্তৃক—॥৩৯॥

৩৩। (৫৭) কালেয়। (৬০) তরুকুট্ট (কাশী)।

৩৪। (৬৬) শ্রুতিক (কাশী); শ্রুত; শৃতি। (৬৭) ষট্ স্বর (কাশী); স্বর। (৭০) বিতাণ্ড্য (কাশী)। (৭১) তণ্ড্য।

৩৫। (৭২) কেকরাক্ষ। (৭৪) নকুল। (৭৫) দুঃসহ (কাশী)। (৭৬) জাল (কাশী); জল। (৭৯) সুবিচক্ষণ।

৩৬। (৮০) পুণ্ডাক্ষ (কাশী)। (৮২) পূর্ণনাস। (৮৬) সালঙ্কায়ন।

৩৭। (৮৭) শ্যামায়স; ত্যামায়ন (কাশী); ত্যামায়স। (৯১) পঞ্চসখ। (৯৩) শিখি; শিখর।

৩৮। (৯৫) খণ্ড।

৩৯। (১০১) বিদ্যুত (কাশী)। (১০৩) ও (১০৪) একত্রে রৌদ্রবীর (কাশী)—একটি নাম—দুইটি নহে। ইহার পরেও বরোদা-সংস্করণে পাদটীকায় নিম্নলিখিত অতিরিক্ত নামগুলি প্রদত্ত হইয়াছে—'কিরীটী, পাশ, ধন্বী, শিলাপট্ট, স্বর্ণগ, সিলাগিলক অগ্নিবেশ্য, শিব, ধ্যান, জপ্য, সুমঙ্গল, জৈগীষব্য, কুটিল ও কলশ—এইরূপে ভূমিকা-বিভাগানুযায়ী সমগ্র শত (সংখ্যা) পূর্ণ হইয়াছে'।—এই শ্লোকগুলি মূলে মুদ্রিত হয় নাই। কাশী-সংস্করণেও দৃষ্ট হয় না।

পুত্রশত—শত-শব্দটি এস্থলে কিঞ্চিদধিক শত বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, নটগণের নাম-গ্রহণের মুখ্য প্রয়োজন তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধিহেতু আদর-প্রদর্শনার্থ। অবান্তর হেতুও নানারূপ আছে—যথা বিদূষক তাপস ইত্যাদি ভূমিকায় যাঁহারা অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগের নামগুলির ব্যুৎপত্তি-লব্ধ অর্থ ভূমিকা-বিশেষের পক্ষে উপযোগী হইয়া থাকে। যথা, 'জটিল'-নামক ভরতপুত্র যদি তপস্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে তাঁহার নামের ব্যুৎপত্তি-লব্ধ অর্থ (জটাবিশিষ্ট) তাপস-ভূমিকার পক্ষে যে সবিশেষ উপযোগী হইবে—তাহাতে সন্দেহ নাই। এ মতে—এক শতের দুই চারিটি অধিক নাম এ স্থলে যদি পঠিত হইয়া থাকে, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

পক্ষান্তরে, অপর কোন টীকাকার মত প্রকাশ করিয়াছেন—ঠিক এক শত নামই এ স্থলে পঠিত হইয়াছে—একটিও কম বা বেশী নহে। কারণ, নয়টি স্থায়িভাব হইতে উৎপন্ন নয়টি রস (রতি—শৃঙ্গার; হাস—হাস্য; শোক—করুণ; ক্রোধ—রৌদ্র; উৎসাহ—বীর; ভয়—ভয়ানক; জুগুপ্সা—বীভৎস; বিস্ময়—অদ্ভুত; শম (নির্ব্বেদ)—শান্ত), ও তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব, ও আটটি সাত্ত্বিক ভাব মিলিয়া পঞ্চাশটি পদার্থ। উহাদিগের প্রত্যেকটি ন্যায্য ও অন্যায্য-ভেদে দ্বিবিধ। ন্যায্য—নায়ক-গত। অন্যায্য—প্রতিনায়কগত। অতএব, মোট পদার্থ একশতটি। এই গণনা অনুসারে ভরত-পুত্রও একশতটি মাত্র বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক ভরতপুত্র এই মতে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক পদার্থটির মূর্ত্ত প্রতীক।

কিন্তু অভিনব এ মত গ্রহণ করেন নাই। কারণ, এ মত স্বীকার করিলে শৃঙ্গার-রসও ভরতপুত্র-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইবার যোগ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। পক্ষান্তরে, পরে মূলে বলা হইয়াছে যে, ভরত-পুত্রগণ শৃঙ্গার-প্রয়োগের যোগ্য অধিকারী বলিয়া গণ্য না হওয়ায় অপ্সরোগণের সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল (শ্লোক ৪২—৪৬)। অতএব, এ মতের কোনই মূল্য নাই (অঃ ভাঃ, পৃঃ ১৯)।

৪০। যে কর্ম্মে—উত্তম-মধ্যম-অধম প্রকৃতির উপযুক্ত চেষ্টা-দিতে। যেরূপ যোগ্য—কেহ হৃদগত হর্ষ-ভাব প্রকাশনের যোগ্য, কেহ বা শোক-ভাব, কেহ বা হাস্য প্রদর্শনের যোগ্য। এই যোগ্যতানুসারে ভূমিকা বণ্টন করা হইয়াছিল (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২০)।

ভূমিকা-বিভাগানুসারে পুত্রশত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যিনি যে কর্ম্মে যেরূপ যোগ্য, তিনি তাহাতেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন ॥৪০॥

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

সাধুবাদ

পণ্ডিত এক দেখিতে এলেন অত্যাচারী দেশ,
মানুষ হয়েছে পশুর অধম, দেখি হলো বড় ক্লেশ।
তীব্র নহে সে লাঞ্ছনা আর—হইয়াছে সহনীয়,
নূতন নূতন উৎপীড়নটা হতেছে জনপ্রিয়।
পণ্ডিতে ডাকিয়া বলে সগর্ব্বে শাসক অত্যাচারী—
হয়তো এ দেশ দেখিয়া আপনি রুষ্ট হলেন ভারী!
ভালো লাগে নাই হয়তো কঠোর মোর শাসনের ঢঙ,
শিখিয়া যাউন তাতার শাসিতে চাই তৈমুর লঙ্।
সভ্য সমাজে, বিদগ্ধ মাঝে বহু দিন ধরে বুঝি,
প্রচারের লাগি দোষ-ত্রুটি সব দেখিলেন হেথা খুঁজি?

এই আনন্দ ফলাও করিয়া অপরাধ আমাদের
বস্তু হইবে, সেথা সুধীদের তর্ক-বিতর্কের!
পণ্ডিত কন্, সেথা তর্কের বহুৎ বিষয় আছে,
নিন্দার চেয়ে ভালো কিছু চান শুনিতে আমার কাছে?
সর্প ও শ্যেন সিংহ ব্যাঘ্র হিংস্রক কম নয়,
কোবিদ-সমাজ কখনো মিলি কি তাহাদের কথা কয়?
বিষ লয়ে শুধু থাকুক ধরায় যাহার যেমন সাধ—
সাধু-সংসদ শুনিতে ব্যগ্র অমৃতের সংবাদ।
দুষ্কৃত জনে পিষিবে আপনি কালের চক্রনেমি—
চক্রধারীর সন্ধান করে আমাদের একাডেমী।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নূতন লড়ায়ে প্লেন

বৃটিশ সমর-বিভাগ এক নূতন জাতের প্লেন তৈয়ারী করিয়াছে যুদ্ধের জন্য। এ প্লেন চলে মিনিটে ছ'মাইল রেটে—অর্থাৎ ঘণ্টায় ৩৬০ মাইল। প্লেনখানির দু'দিকে দু'খানি পাখার প্রত্যেকটিতে
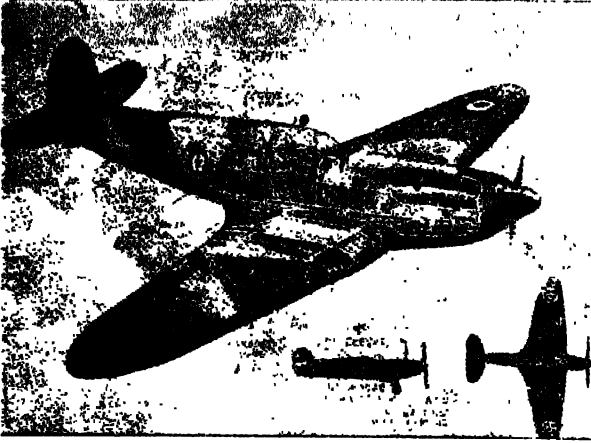
আধুনিকতম লড়ায়ে প্লেন

ব্রাউনিং-টাইপের সাতটি করিয়া মেশিন-গান সংলগ্ন আছে। উড়িতে উড়িতে চৌদ্দটি মেশিন-গানে যখন গুলী ছুটিতে থাকে, তখন বিপক্ষ-দলে প্রলয়ের সৃষ্টি হয়।

মানুষ-পক্ষী

শূন্যপথের প্লেন হইতে ঝাঁপ দিয়া প্যারাশুট-যোগে নামিয়া পড়া ভিন্ন আর একটি উপায়ে প্লেন পরিত্যাগ করা হয়। সে-উপায়ের নাম

মানুষের পিঠে বাদুড়ের ডানা

গ্লাইডিং অর্থাৎ বাতাসে গা ভাসাইয়া নামা! গ্লাইড করিয়া শূন্য হইতে নামার জন্য আছে স্বতন্ত্র পোষাক। তার নাম ফ্লোটেশন ভেষ্ট। এই পোষাক গায়ে আঁটিয়া প্লেন হইতে ঝাঁপ খাইবামাত্র পোষাকটি ফাঁপিয়া ফুলিয়া ওঠে—তার জোরে বাতাসে ভর রাখিয়া ভাসিয়া যাত্রী মর্ত্ত্যভূমে নিরাপদে নামিতে পারে! পোষাকের নীচের দিকে অর্থাৎ পায়ের কানাতের সঙ্গে এমন কৌশলে সিক আঁটা আছে যে গ্লাইডার তার দৌলতে বায়ু-তরঙ্গ কাটিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিতে সমর্থ হয়। জলে পড়িলে ফাঁপা ও ফোলা পোষাকের জন্য গ্লাইডার ভাসিতে থাকে; ডুবিবার এতটুকু আশঙ্কা নাই। সিক দিয়া এ পোষাকের সঙ্গে যে পাখনা আঁটা আছে, সে পাখনা দেখিতে ঠিক বাদুড়ের ডানার মত। এই পোষাকের দৌলতে নির্ভীক সাহসী মানুষের পক্ষে আজ পক্ষিরূপে ওড়ায় বিপত্তির ভয় ঘুচিয়াছে!

বন কাটিয়া গ্রাম-নগর

এ যুদ্ধে এক দিকে যেমন ভাঙ্গনের অন্ত নাই, অন্য দিকে তেমনি গড়নের কাজও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। গড়নের কাজে আমেরিকার কার্য্যতৎপরতা সবচেয়ে বেশী। ফৌজের খাদ্য-জোগানোর জন্য কত জলা, কত পতিত জমির যে সংস্কার সাধন হইতেছে, তার সীমা

আলাস্কার জলায়

নাই। এ কাজের জন্য বন কাটিয়া কত গ্রাম-নগরের সৃষ্টি হইতেছে! আলাস্কার বিস্তীর্ণ ভূভাগ এত কাল ছিল জলা-জঙ্গলে সমাকীর্ণ। সে জলা-জঙ্গলে মানুষের পদচিহ্ন পড়িবে, এ কল্পনাও কাহারো মনে জাগে নাই। সম্প্রতি বড় বড় ট্রাক্টর চালাইয়া জলা বুজাইয়া, জঙ্গল কাটিয়া সাফ, করিয়া মাটির বুকে ফশল ফলানো হইতেছে দারুণ অধ্যবসায়ে; সেই সঙ্গে বড় বড় মোটর-ট্রাকে ভরিয়া খাদ্যসম্ভার, গ্রাম-নগর-গঠনের সর্ব্বপ্রকার উপাদান-সরঞ্জাম পাঠানো হইতেছে; এবং জাহাজে চড়িয়া মোটরে চড়িয়া লোকজন চলিয়াছে গ্রাম-নগর গড়িবার উদ্দেশ্যে। সেতুর অভাবে তার ঝুলাইয়া সেই তারের সাহায্যে সকলে নদী-পার হইতেছে। গৃহ ও পথ-ঘাট নির্ম্মাণের সঙ্গে চাষ-আবাদের কাজ এমন অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে যে দেখিলে মনে হয়, মন্ত্রবলে যেন মায়া-পুরীর সৃষ্টি!

নূতন মাল-জাহাজ

যুদ্ধের হাঙ্গামায় যে মালপত্র জাহাজে পাঠানো হয়, তার জন্য বিপত্তির ভয় প্রতিপদে। এই বিপত্তি-মোচনের জন্য মার্কিণ শিল্পীরা নূতন ধরণের মাল-বাহী জাহাজ তৈয়ারী করিতেছে। এ জাহাজের আকার সাবমেরিণের মত। এ জাহাজ চলে ডিয়েশ্‌ল্‌-পাওয়ারের এঞ্জিনে।
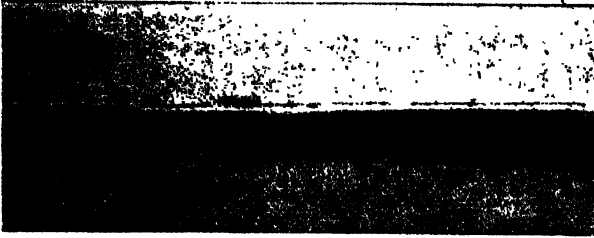
মালের জাহাজ

জাহাজের দেহখানি আগাগোড়া ওয়েল্ড-করা—ইস্পাতকে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় ওয়েল্ড করিয়া সামনের দিকটা বিনির্ম্মিত; মাল রাখিবার ট্যাঙ্কগুলি নিকেল-পাতের ফ্রেমে আঁটা। নিকেল করার দরুণ লবণ প্রভৃতি ক্ষার দ্রব্য রাখিলে জাহাজের দেহে যেমন এতটুকু অনিষ্ট ঘটে না, তেমনি এ জায়গায় আটা গম চিনির বদলে তৈলাদি তরল সামগ্রীও অনায়াসে রাখা চলে। এই সব নূতন মডেলের জাহাজে এখন কেরোসিন, নানা জাতের তৈল, লাই, গুড় প্রভৃতি চালান যাইতেছে। এ জাহাজের দেহ গোলা-বারুদে সহজে টোটে না, ফাটে না। জাহাজের খোলে ধরে বারো লক্ষ গ্যালন কেরোসিন তৈল।

ঘর-বাড়ী চালা

সমর-ঘাঁটী স্থাপনার জন্য বহু প্রদেশে বেসামরিক অধিবাসীদিগকে দেশভুঁই ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে। সভ্য-স্বাধীন দেশে এই সব অপসারিত লোকজনের সুবিধা-কল্পে যত দূর সম্ভব তাদের ঘর-বাড়ীগুলিকেও তাদের সঙ্গে যথাস্থানে চালান করিবার ব্যবস্থা

বোটের বুকে বাড়ী-ঘর

হইয়াছে। সে ব্যবস্থার ফলে বহু ক্ষেত্রে বাড়ী-ঘরগুলিকে উপড়াইয়া বড় বড় ফ্ল্যাট-নৌকার বুকে তুলিয়া স্থানান্তরিত করা হইতেছে।

নির্বিঘ্ন টেলিফোন্

অফিস প্রভৃতিতে কলকোলাহলের অন্ত নাই—সে জন্য টেলিফোনে কথাবার্ত্তা বলায় বহু বাধা ঘটে। এই বাধার প্রতিকার-কল্পে য়ুরোপে ও আমেরিকায় অফিস-টেলিফোন রাখার ব্যবস্থা হইতেছে টেব্‌ল্‌

ডেস্ক-ফোন্

অথবা ডেস্কের উপর একটু ছাউনি রচিয়া সেই ছাউনির মধ্যে। ছাউনিটি কাঠের তৈয়ারী—২৬ ইঞ্চি চওড়া, ২৪ ইঞ্চি উঁচু এবং ১১ ইঞ্চি গভীর। ছাউনিটি টেব্‌ল্‌ বা ডেস্কের উপর এমন ভাবে সংলগ্ন করা চলে যে তার মধ্যে মাথা গুঁজিয়া চিঠি-পত্রাদি লিখিতেও এতটুকু অসুবিধা ঘটে না।

পেন্সিল তৈয়ারী

এক জন বিদেশী বৈজ্ঞানিক বন্ধু বলেন—ঘরে বসিয়া আমরা পেন্সিল তৈয়ারী করিতে পারি। কি করিয়া? বৈজ্ঞানিক বন্ধু বলেন—সরবৎ বা কোল্ড-ড্রিঙ্ক পান করিতে অনেকে ব্যবহার করেন খড়ের তৈয়ারী নল। এ নল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। দাম বেশী নয়। এক-ডজন খড়ের নল কিনিয়া সেগুলিকে একসঙ্গে টাইট্ করিয়া বাঁধিয়া একটা কাঠের ব্লকে গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তে সুদৃঢ় ভাবে খাড়া রাখুন। তার পর নিন গ্রাফাইট এক টিন এবং এক শিশি প্যারাফিন। গ্রাফাইট ও প্যারাফিন বাজারে কিনিতে পাইবেন। একটি হাতায় বা কাঁশিতে খানিকটা প্যারাফিন ঢালিয়া

খড়ের পেন্সিল্

আগুনের আঁচে তাতাইয়া গলান্—প্যারাফিন যখন গলিতে থাকিবে তখন তাহাতে খানিকটা গ্র্যাফাইট মিশান। দু'টি জিনিষ মিশাইয়া নাড়িতে থাকুন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেই মিকশ্চারটি হয় ঘন

থক্‌থকে সিরাপের মত হয়। এবার এই মিক্শ্চার ঢালিয়া দিন ঐ খড়ের নলের মধ্যে—একেবারে নলের গলায় গলায় পূর্ণ করিয়া। তার পর ঘণ্টা দুই-তিন রাখিয়া ঠাণ্ডা হইলে ঐ খড়ের মধ্যে মিক্শ্চার জমিয়া যাইবে। তখন খড়ের গা ছিঁড়িয়া-ছিঁড়িয়া পেন্সিলের মত এই ছোট ছড়ি ব্যবহার করুন। আমরা অবশ্য এ পেন্সিল তৈয়ারী করিয়া পরখ করি নাই—আপনারা একবার পরখ করিয়া দেখুন না!

বিমান-পোতের পাশপোর্ট

ফৌজ ও লোকজন বহিবার জন্য অধুনা যে সব অতিকায় প্লেন তৈয়ারী হইতেছে, বিবিধ সরকারী পরীক্ষায় 'পাশ' হইলে তবে সেগুলিকে ব্যবহার-যোগ্য বলিয়া ছাড়পত্র দেওয়া হয়। শেষ-পরীক্ষায় পাশ করিবার সময় তার অঙ্গ-সজ্জার প্রয়োজন। গ্রাজুয়েটদিগকে যেমন
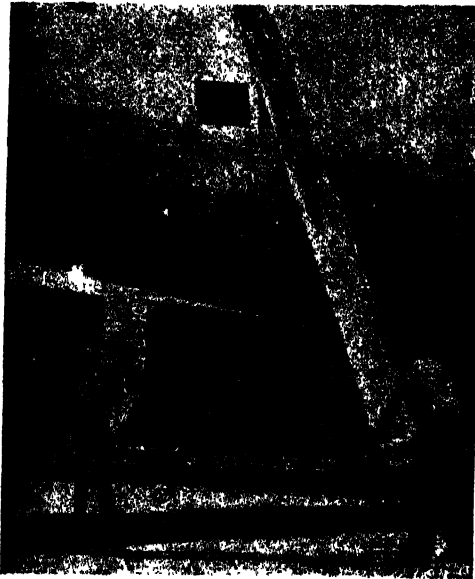
প্লেনের গা পালিশ,

কনভোকেশনের জন্য গাউন ও হুডের ভূষণ আঁটিতে হয়, এই সব প্লেনকেও তেমনি তার শেষ-পরীক্ষায় পাশ করিতে হইলে পালিশ-করা চিকণ বেশ ধারণ করিতে হয়। অতিকায় প্লেনকে পালিশ করা হয় জুতা-পালিশের রীতিতে; তবে সে রীতিতে একটু রকমফের আছে! প্লেনের ঘাড়ের উপর পালিশ-কাপড় ফেলিয়া দু'দিক দিয়া ঐ ছবির ভঙ্গীতে দু'জন লোকে তার আপাদ-মস্তক ঘষা-মাজা করে।

প্লেনের স্নান

যুদ্ধে আজ এই যে লক্ষ লক্ষ এরোপ্লেন ব্যবহৃত হইতেছে, এই সব প্লেনের ধুলা-ময়লা ধুইয়া সাফ করিতে কত লোক এবং কত পরিমাণ জলের প্রয়োজন, ভাবিলে দিশাহারা হইতে হয়! কিন্তু সমর-বিভাগ কর্তৃক প্লেন সাফ করিবার জন্য যে স্নানপ্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর! সজল বাষ্প বর্ষণে প্লেনের ধোয়া-মোছার কাজ পনেরো মিনিটে সম্পন্ন হইতেছে! প্রত্যেকটি প্লেনে এ জন্য বাষ্প

আর্দ্র বাষ্পে স্নান

সৃষ্টি করা হয়। সেই বাষ্পের সঙ্গে সাবানের কুচি মিশাইয়া হোজ-পাইপ যোগে প্লেনের গায়ে বর্ষণ করিলে প্লেনের সর্বাঙ্গ ধূলি-আবর্জ্জনাদি হইতে নিমেষে মুক্ত হয়।

অতিকায় টায়ার

যুদ্ধের রণদপত্রাদি বহিবার জন্য কিরূপ অতিকায় ট্রাক তৈয়ারী হইতেছে, তার কতক পরিচয় এ দেশে বসিয়াও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি! এই সব ট্রাকের জন্য অনুরূপ অতিকায় টায়ার চাই!
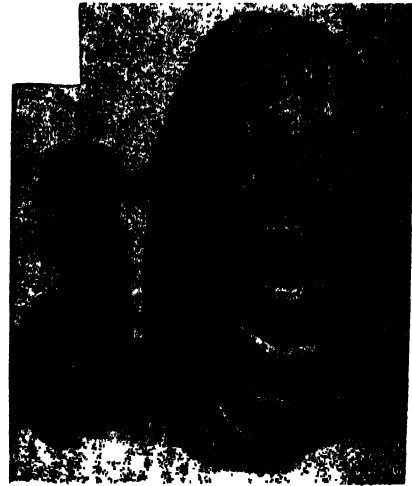
৫০ মণ ওজনের টায়ার

কালিফোর্ণিয়ায় সানফ্রানসিশকোর কাছে হানসেনডাম সহর। সেই সহরের এক রবার কোম্পানি অতিকায় টায়ার তৈয়ারী করিতেছে অজস্র পরিমাণে। টায়ারগুলি নিউমাটিক; আকারে সাত ফুট। গাড়ীতে এ টায়ার আঁটিতে তিন জন লোকের প্রয়োজন। প্রত্যেকটি টায়ারের ওজন ৪৮ মণ ১০ সের। টায়ারের রবার তিন ইঞ্চি পুরু। এ টায়ারে যে-টিউব পরানো হয়, সে-টিউবের প্রত্যেকটির ওজন এক মণ দশ সের করিয়া। এক-একখানি টায়ার প্রায় সাড়ে বারো টন ভার সহিতে ও বহিতে পারে।

[ছোট গল্প]

মনের মাঝে বিস্ময় ও আনন্দের যে তরঙ্গ উঠিল, তাহাতে যেন স্তব্ধ হইয়া পড়িলাম। সেই নীহারেন্দু! তাহার লেখা কাহিনী লইয়া ফিল্ম হইয়াছে এবং তাহার পরিচালনা করিয়াছে নীহারেন্দু নিজে।

বহু দিন হইয়া গেল তাহাদের কোন খবর পাই নাই, অথচ এমন দিন ছিল, যখন দু'বেলা তাহাদের বাড়ীতে না গেলে আমার দিন কাটিত না। তাহার বাহিরের ঘরে মাদুর বিছাইয়া দুই জনে বসিতাম, সে তাহার নূতন লেখা গল্প পড়িয়া আমাকে শুনাইত, এবং আমি প্রশংসা করিলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিত,—তোমার উদার মনের ক্ষেত্রটি ছাড়া আমার সাহিত্য বিকোবার আর জায়গা হলো না।

মাঝে-মাঝে তার লেখা দু'-একখানা মাসিকে ছাপা হইত, দু-চার জন তার প্রশংসা করিয়া তাহাকে যেন কৃতার্থ করিয়া দিত। তার পর সে লেখা মাসিকের পৃষ্ঠাতেই চিরদিনের জন্ম চাপা পড়িয়া যাইত, শুধু স্মৃতিটুকু জ্বলিতে থাকিত লেখকের নিজের মনে।

নীহারের স্ত্রী বিভাকে আজ মনে পড়িতেছে। প্রায় সে আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিত.—আচ্ছা, খালি লেখা নিয়ে থেকে কারও পেট ভরেচে আমায় দেখিয়ে দিতে পারো ঠাকুরপো?

নীহার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিত,—পেট ভরাটাই তো সংসারে একমাত্র কথা নয়!

তার স্ত্রী বোধ হয় ও-কথাটা শুনিয়া-শুনিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তাহার প্রতিবাদ না করিয়া ধীরে-ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া যাইত।

হাসিয়া নীহার বলিত,—বিভা মনে করে, পয়সা-পয়সা করে পথে-পথে ছুটে বেড়ালেই বুঝি পয়সা পাওয়া যায়। যে কটা টাকা মাইনে পাই, তাতে কোনো দিন মন উঠ্‌লো না ওর।

প্রতিবাদ করিয়া বলিতাম,—ওর মন ওঠার কথা বল্‌ছো কেন ভাই! যাকে সংসারের এই ভারী রোলারটাকে নিছক্ নিজের শক্তি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তার কষ্টের কথা সে-ই জানে! তুমি তো শুধু মাইনে ফেলে দিয়েই খালাস।

নীহার হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিত,—তা'ছাড়া আমি কি করতে পারি, বলো! আমি লিখি, না-লিখে আমার আর উপায় নেই বলেই। তোমরা হয়তো বলবে, আমার এ-লেখার জন্ম কারু এতটুকু মাথা-ব্যথা পড়েনি। কিন্তু, তবু না লিখে পারিনে। কেন, তার কোনো জবাবদিহি আমি করতে পারবো না। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখকেও আমি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েচি! সুতরাং আমার আশ্রয়ে এসে পড়ায় যাদের দুর্ভাগ্য হয়েচে, তাদের তা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

সেই নীহার হইয়াছে আজ সিনেমা-পরিচালক! ভাবিতে-ভাবিতে আমার শিরায়-শিরায় আনন্দের শিহরণ বহিয়া যাইতে লাগিল। এত দিনে সত্যই বুঝি তার নীরব সাধনার পুরস্কার মিলিল!

মনের আনন্দ চাপিয়া রাখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতেছিল, এখনি ছুটিয়া গিয়া নীহারের সঙ্গে দেখা করিয়া আসি! কিন্তু তাহার কোন উপায় ছিল না। সে হয়তো এখন তার দিনাজপুরের বাড়ীতে নাই। দিনাজপুর ছাড়িয়া আসার পর হইতে কিছু দিন তাহার সহিত পত্রের আদান-প্রদান ছিল; তার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহাও বন্ধ হইয়া গেছে। সুতরাং এখন তার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর।

তবু ঠিক করিলাম, দিনাজপুরের ঠিকানাতেই একখানা চিঠি লেখা যাক্। লিখিলাম। কিন্তু জবাব পাইলাম না। চিঠিখানা যে তার কাছে পৌঁছায় নাই, সে কথা নিশ্চয়, কিন্তু কোথায় পৌঁছিল, তাহাও জানিতে পারিলাম না!

এখানকার সিনেমা-হাউসে 'দেওয়া-নেওয়া' বইখানি আসিতেছে। প্রাচীরপত্রে বড় বড় অক্ষরে লেখা কাহিনী ও পরিচালনা—নীহারেন্দু মজুমদার।

আমার বুকখানা ন'-দশ হাত হইয়া উঠিল। বন্ধুমহলে সগর্ব্বে ঘোষণা করিলাম, এই নীহার হচ্চে আমার অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

বন্ধুরা বলিল,—তাই না কি? ওঁর দু'-চারটে লেখাও পড়েচি! বেশ প্রমিসিং রাইটার। কিন্তু লেখা ছেড়ে সিনেমা-লাইন নিয়ে কি ভাল করলেন? পয়সা অবিশ্যি পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু লেখার মর্য্যাদা ব্যাহত হবে না কি? তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেননি?

একটু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া মিথ্যা বলিতে হইল,—না, ঠিক পরামর্শ নয়, তবে আমি ওকে এ-সম্বন্ধে বরং উৎসাহই দিয়েছিলাম।

নিশীথ হাসিয়া বলিল,—পয়সার মোটা অঙ্ক দেখে নিশ্চয়? আমরা ভয়ঙ্কর রিয়ালিষ্টিক্ হয়ে পড়েচি কি না! তার বাইরে আর কোনো কিছু দেখ্‌তে পারিনে। রবীন্দ্রনাথ যদি ফিল্ম্-ডিরেক্টার হয়ে বসতেন, হয়তো অনেক কিছুই করতে পারতেন, কিন্তু হলফ্ করে' বলা যায়, তাঁর ফাউন্টেন-পেন্ দিয়ে কোনো দিন 'বলাকা' বেরুতো না।

সকলে হাসিয়া উঠিলাম। ওদিক হইতে উকীল শিশির মিত্তির বলিয়া উঠিল,—খুব তো লম্বা-লম্বা বচন আওড়াচ্ছো হে নিশীথ! সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ মাসে ক'খানা করে' বই বাড়ীতে কেনা হয়, জান্‌তে পারি কি? সাহিত্য-প্রীতির ধারাটা তো বড়-জোর ঐ রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরী-ঘরে চরম সার্থকতা লাভ করেচে! সুতরাং সাহিত্যিকদের পেট চলে কি করে, সেটা কি ভেবে দেখা হয়েচে কোনো দিন?

শিশিরের কথায় মনে মনে বেশ খুশী হইলাম। সত্য সত্যই, নিশীথের মত এই-সব বচন-সর্ব্বস্ব লোকগুলোকে একটু অপ্রস্তুত হইতে দেখিলে বেশ আনন্দ হয়।

কি-যে নিদারুণ অভাব-অনটনের ভিতর দিয়া নীহারের সংসার চলিত, তাহা আমার নিজের অজানা ছিল না। সেই নিদারুণ দুর্দ্দশার দুর্য্যোগের মধ্যেও আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা যে কত

শক্ত, সে কথা নিশীথের মত এই ধনীর দুলালরা বুঝিবে কেমন করিয়া! তখনই দেখিয়াছিলাম, তার তিনটি ছেলে-মেয়ে! তার পর সংসার নিশ্চয় বাড়িয়াছে। তখনই দেখিতাম, তাহার স্ত্রী সারা দিনে-রাতে এতটুকু নিশ্বাস ফেলিবার সময় পাইত না, ইদানীং না জানি তাহাদের কি অবস্থা হইয়াছিল! সকলে বাঁচিয়াই আছে কি না তাই বা কে জানে! তবু যদি নীহারের আজ সত্য সত্যই সুদিন আসিয়া থাকে, তার চেয়ে সুখের কথা আর কি থাকিতে পারে? বিভা সুখী হইয়াছে; অর্থকষ্টের মধ্যে তাহাদের স্বামি-স্ত্রীর মনের মাঝখানে যে অশান্তির কালো মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছিল, আজ তাহা কাটিয়া গিয়া আবার দাম্পত্য-প্রেমের জ্যোৎস্না-ধারা ফুটিয়াছে। কি সার্থকতা ছিল ফাঁকা একটা আদর্শকে জড়াইয়া থাকায়?

খুব ধুমধামে 'চিত্রাঙ্গদা' সিনেমা-হাউসে 'দেওয়া-নেওয়ার' শো আরম্ভ হইয়াছে। আমি ও উকীল বন্ধু শিশির মিত্তির,—দুই জনে দেখিতে গিয়াছিলাম। আমার আনন্দ ও উৎসাহের সীমা-পরিসীমা নাই। শিশির ঠাট্টা করিয়া বলিল,—তোমার উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছে, তোমারই লেখা গল্পের অভিনয় দেখতে বসেছ!

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া জবাব দিলাম,—আশ্চর্য্য হবার এতে কিছুই নেই। নীহারের আগেকার লেখা যদি হয়, তাহলে তার সঙ্গে আমার যে কতখানি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তোমরা ধারণা করতে পারবে না। আমি ছিলাম তার লেখার সবচেয়ে বড় সমঝদার, তা জানো?

নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রূপালী পর্দ্দার দিকে চাহিলাম। কাহিনীর খানিকটা সুরু হইতেই আমি সোল্লাসে বলিয়া উঠিলাম,—আরে, এ গল্প তো নীহার আমাকে নিজে পড়ে শুনিয়েচে! ঐ তো সেই পাগলা ব্যারিষ্টার মিঃ বাগচী!...উঃ, অত্যন্ত করুণ—অত্যন্ত করুণ এ-গল্পটা! ট্র্যাজেডিতে নীহারের হাত অদ্বিতীয় বললে চলে।

শিশির বলিল,—আঃ, তুমি চুপ করবে একটু?

ঠিক আমার এ-পাশেই একটি অচেনা লোক বসিয়াছিল। সে আমার কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া বলিল,—আপনি স্যার, নীহারদাকে চেনেন্ না কি?

হাসিয়া বলিলাম,—চিনি কি না তাই জিজ্ঞাসা করচেন? নীহারের সঙ্গে দেখা হলে তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন, আমাকে চেনে কি না?—অর্থাৎ, অমল সেন বলে তার কোনো বন্ধু ছিল কি না?

—ও, আপনার বন্ধু! নমস্কার—নমস্কার! নীহারদা আজকাল নামজাদা লোক স্যার! সমস্ত টলিউডের তিনি নীহারদা বললে হয়! বড় বড় ষ্টাররা, বিশেষ এ্যাক্‌ট্রেস্-মহল নীহারদাকে কি খাতিরই করে! নীহারদার ডিরেক্‌শনে প্লে করতে পেলে ওদের খুশী দেখে কে!

শিশির বলিল,—ও! আপনি তো ওদিক্‌কার অনেক খবরই রাখেন দেখছি!

লোকটি অতি-বিনয়ের ঝোঁকে গলার স্বরকে অনেকখানি মোলায়েম করিয়া বলিল,—তা স্যার, আপনাদের আশীর্ব্বাদে খবর একটু-আধটু রাখি বৈ কি! এই যে ডায়মণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং এজেন্সি—ওটা তো আমাদেরই কন্‌সার্ণ! প্রত্যেক সিনেমায় আমাদের বই দেখানো হলে আমাকে ঘুরে-ঘুরে দেখতে হয় কি না!

শিশির বলিল,—ও! আপনি হলেন তাহলে সিনেমা-ইন্‌স্পেক্টর!

আচ্ছা স্যার, বলুন তো, এই যে মেয়েটি নায়িকার ভূমিকা নিয়েছে, এরই নাম না প্রতিভা চ্যাটার্জী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এম-এ পাশ। একখানা বই প্লে করেই উনি 'ষ্টার' হয়েচেন। সব ডুবিয়ে দিলে স্যার, কানন-টানন সকলকে ডুবিয়ে দিলে!

তার পর একটু নীচু-গলায় আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—ইনিই তো হচ্চেন নীহারদার কেপ্‌ট—ওর নাম কি, যাকে বলে সুইটহার্ট!

বিস্মিত হইয়া লোকটার মুখের উপর সমস্ত দৃষ্টিটুকু তুলিয়া ধরিলাম। কিন্তু কোন-কিছু বলিতে পারার আগেই ও-পাশ হইতে শিশির বলিয়া উঠিল,—আরে, ভদ্রলোক বলেন কি অমল? তোমার বন্ধুর রক্ষিতা? তোমার বন্ধুর রুচি আছে বলতে হবে।

পাশের লোকটি পরম-উৎসাহে বলিতে লাগিল,—কি বলেন, স্যার! ওকে পাবার জন্ম কতগুলো প্রডিউসার যে ঘুঁকেছিল, তা বলবার কথা নয়! এমন কি, অমন যে কোটিপতি গণেশজী বিকানীর-ওয়ালা—তিনি পর্য্যন্ত—হাঃ হাঃ হাঃ! নীহারদা কি কম মা কি স্যার!

লোকটা অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিল,—বেগ্ ইওর পার্ডন্! দেখুন, দেখুন, আমি ততক্ষণ আফিস-ঘর থেকে ঘুরে আসি।

সে উঠিয়া গেল। আমি হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কিন্তু চুপচাপ থাকিলেও পর্দ্দার কাহিনীটা যেন আর আমার মনের কিনারায় পৌঁছিতে পারিল না। তার চেয়েও অনেক বেশী অবাস্তব অলৌকিক একটা কাহিনী আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল।

লোকটা যাহা বলিয়া গেল, তার ভিতরে সত্য কিছু আছে না কি? নীহারের এতখানি অধঃপতন হইয়াছে? তাছাড়া যার নিজের স্ত্রী-পুত্রকে খাইতে দিবার সংস্থান ছিল না কোন দিন, সে কি না—

অসম্ভব! অসম্ভব! কিন্তু তখনই মন বলিয়া উঠিল,—অসম্ভব কেন? হয়তো এত দিনে দুঃখ-অভাবের নিষ্পেষণে তাহার স্ত্রীপুত্র-কন্যা সকলেই গত হইয়াছে। অন্ততঃ বিভা হয়তো বাঁচিয়া নাই। কিম্বা বাঁচিয়া থাকিলেও নীহারের ভাগ্য-বিবর্ত্তনের সহিত তাহাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্ত্তনই হয় নাই। দুঃখের দিনে যে সর্ব্বংসহা নারী তাহার ও তাহার সন্তানদের জন্য জীবনপাত করিয়া দুর্ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, আজ সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে হয়তো চিরদিনের জন্য বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বরে নির্ব্বাসিত পড়িয়া আছে! হয়তো তাহাদের মুখে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই, ছোট ছেলে-মেয়েগুলো হয়তো হাঘরেদের মত অর্দ্ধাশনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর তাহাদের বাপ নবোদিতা সিনেমা-তারকার রশ্মিপ্রভায় তন্ময় হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে! বাস্তবের রঙ্গমঞ্চে এ শোচনীয় কাহিনী তো নিত্য-নিয়ত অভিনীত হইতেছে!

ইণ্টারভালের সময় শিশিরকে বলিলাম—কেমন লাগছে?

—মন্দ কি!

—আমার কিন্তু মাথাটা হঠাৎ কেমন ধরে উঠেচে। তুমি বরং থাকো, আমি উঠি।

শিশির আমার মুখের পানে নাটকীয় ভঙ্গীতে তার দৃষ্টি তুলিয়া হঠাৎ হাসিয়া বলিল,—এঃ, তুমি দেখচি এখনো নিতান্ত ছেলেমানুষ হে! তোমার অন্তরঙ্গ সুহৃদটি অমন এক জন সুইটহার্ট লাভ করেচেন

দেখে তোমার অমনি মাথা ঘুরে গেল? এই জন্তই মনস্তাত্ত্বিকদের মতে যেখানে অন্তরঙ্গতা যত গভীর, বিরোধিতাও তত তীক্ষ্ণ। কিন্তু, সেটা খুবই প্রচ্ছন্ন এই যা! এত প্রচ্ছন্ন যে তোমার নিজেরই ধরবার ক্ষমতা নেই। না হলে—

—রাবিশ! কি যে বলো! ওকালতির মুখে তোমার কিছুই আটকায় না দেখচি!

—আটকাবে কেন বাবা! তুমি বরং এই ভেবে উৎফুল্ল হতে পারো, পুরোনো বন্ধুত্বের পাসপোর্ট নিয়ে এক দিন প্রতিভা চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করে আসতে পারবে!

রাগ করিয়া বলিলাম,—তুমি হলে তাই করতে বটে!

শিশির হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—সে কথা আবার কষ্ট করে' তুমি বলচো! তাই তো, তোমার ফিউচার প্রস্পেক্ট দেখে রীতিমত ঈর্ষা জাগচে আমার!—বলিতে বলিতে সে আমার হাত ধরিয়া আবার আমাকে চেয়ারে বসাইয়া দিল।

সেই অপরিচিত প্রগল্‌ভ লোকটার সহিত তাহার পর আর দেখা হয় নাই। তার জন্ত অস্বস্তিও আমার কম হয় নাই। এতক্ষণ ধরিয়া লোকটা আবোল-তাবোল বকিয়া গেল, আর সেই সুযোগে আসল কথা জানিবার চেষ্টা করিলাম না, অর্থাৎ নীহারের বর্ত্তমান ঠিকানাটা! সে যখন এত খবর জানে, নিশ্চয় এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারিত।

এক এক সময় ও-প্রসঙ্গটাকে মন হইতে নির্ব্বাসিত করিবার কত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। জীবনের প্রভাতে কত জনের সহিত তো বন্ধুত্ব হইয়াছিল, এখন তারা কোথায়? মধ্যাহ্নের প্রখরতায় কোথায় এবং কবে যে তাদের অধিকাংশ হারাইয়া গিয়াছে, মনের অতলে কোথাও তাদের নামগুলি পর্যন্ত জাগিয়া নাই। নীহারের কথাও তো বহু দিন মনে পড়ে নাই, আজ হঠাৎ তাহার তত্ত্ব লইবার এতখানি আগ্রহ জাগিল কেন?

কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মন গ্লানিতে ভরিয়া ওঠে। এত দিন তাহাদের কতই না দুর্দ্দশায় দিন কাটিয়াছে, অথচ এক দিনের জন্ত খোঁজ লইবার কথা মনের কোণে উঁকি মারে নাই। আজ মা কি সে বড় হইয়াছে, তাই তাহার সহিত নূতন করিয়া পরিচয়ের জন্ত এতখানি উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছি! ইহার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি আছে!

সুতরাং কিছু দিন ধরিয়া নীহারের প্রসঙ্গ বাহিরে তো নহে, নির্জ্জনে নিজের মনের কাছেও উত্থাপন করি নাই। বন্ধুদলের অনেকেই "দেওয়া-নেওয়ার" নিন্দা বা স্তুতি করিয়াছে আমার কাছে, আমি তাহাতে যোগ দিই নাই। প্রতিভা চ্যাটার্জ্জীর প্রসঙ্গ উকীল শিশির মিত্র বেশ ব্যাপক ভাবে বন্ধুমহলে প্রচার করিয়াছে, আমি শুধু একটু মুচকি হাসিয়া সে কথা চাপা দিয়াছি। কেন না, উকীল বন্ধুটিকে ঘাঁটাইয়া কেবল নিজকে বিপর্য্যস্ত করা ছাড়া আর কোনো লাভ নাই।

শিশিরের অসংযত রসনার মারফতে কথাটা সম্পূর্ণ না হোক্ ইঙ্গিতে আমার অন্তঃপুরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্ত শোভনার আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইবার উপক্রম। শেষে আমার কাছে শুনিয়া এক-মুখ হাসিয়া বলিয়াছিল,—ও মা, তাই বুঝি বলা হচ্ছিল না? নিজেদের কুকীর্ত্তির কথা কোন্ মুখে আর বলবে!

আপত্তির সুরে আমি বলিয়াছিলাম—বেশ বিচার তো! কে অপরাধ করলে, আর শাস্তি পড়লো কার ঘাড়ে!

শোভনার হাসি ততক্ষণে অতি-গাম্ভীর্য্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বলিল,—সব পুরুষেরই এক রা। তুমি হলেও ঠিক এই করতে।

রসিকতা করিয়া বলিলাম,—আর তুমি তাহলে কি করতে শুনি?

—আমি আত্মহত্যা করতুম। আমাদের করবার আর কি আছে?

—তাহলে বুঝতে হবে যে, কথাটা যদি সত্যি হয় এবং নীহারের স্ত্রীর কাণে পৌঁছে থাকে, তাহলে সেও আত্মহত্যা করেচে?

—নিশ্চয়। অন্ততঃ তাই তার করা উচিত।

মুখে কিছু বলিলাম না। কি চমৎকার এই জাত! কেমন এক-কথায় এত-বড় একটা সমস্যার সুমীমাংসা করিয়া দিল! তর্ক করিয়া লাভ নাই। আত্মহত্যা করাটা আসলে এত সহজ নয়, এ আপত্তি তুলিতে গেলে এখনি হয়তো জহর-ব্রত হইতে শুরু করিয়া কেরোসিনের সদ্ব্যবহারের নজির হাজির করিয়া দিবে! সুতরাং চুপ-চাপ থাকাই শ্রেয়ঃ। আত্মহত্যা করার ব্যাপারে আমরা যে উহাদের পিছনে পড়িয়া আছি, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নীহারের 'দেওয়া-নেওয়া' ছবিখানি আবার এক দিন দেখিতে যাইতে হইল। কেন না, শোভনা এত দিন বাপের বাড়ীতে ছিল, মাত্র কয় দিন হইল এখানে ফিরিয়াছে এবং প্রতিভা চ্যাটার্জীকে না দেখা পর্য্যন্ত তাহার ঘুম হইতেছিল না।

দেখিয়া আসার পর সে দিন সারা রাত সে কি এক-তরফা বক্তৃতা! অভ্যস্ত থাকায় আমার বিশ্রামের বিশেষ অসুবিধা হয় নাই, কিন্তু সেই উদ্গীর্ণ বিষের প্রক্রিয়া বেচারা প্রতিভা চ্যাটার্জীকেও যে জর্জ্জরিত করে নাই, সে-কথা হয়তো জোর করিয়া বলা চলে না।

ইহার প্রায় মাস কয়েক পরে হঠাৎ একখানা খামে-মোড়া চিঠি আসিল, নীহারের বড় ছেলে সুধীরের লেখা। সে লিখিয়াছে,—

"কাকাবাবু! দিনাজপুরের ঠিকানায় লেখা আপনার চিঠিখানা সে দিন অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে আমাদের হাতে এসে পড়্‌লো। আপনি যে এত দিন পরে আমাদের মনে করেছেন, তাই ভেবে কি আনন্দ যে হোলো! আমরা এখন কলকাতায় রয়েচি। বাবা বোম্বাই গেছেন। হয়তো ফিরতে মাস দুই দেরী হবে। কাকীমা এবং আপনি আমাদের প্রণাম নেবেন। ভাই-বোনদের আশীর্ব্বাদ দেবেন। আপনি একবার আসবেন আমাদের এখানে। নিশ্চয় আসবেন।"

নীহারের বড় ছেলে সেই সুধীর! সে তাহা হইলে এত দিনে বেশ বড়-সড় হইয়াছে। ভালোই আছে তাহা হইলে। আমাকে যাইতে লিখিয়াছে। নিশ্চয় তার বাবার কথামত চিঠিখানা লেখা। সে তো আজ আর সামান্ত লোক নয়! সময় তাহার এতখানি মূল্যবান যে, নিজের হাতে দু'কলম চিঠি লেখারও অবসর হয় না। তাই প্রাইভেট সেক্রেটারী ছেলেকে দিয়া—

মনে-মনে ঠিক করিলাম, কলিকাতায় গিয়া দেখা করা তো দূরের কথা, এ-চিঠির জবাবও দিব না। দেশ-বিখ্যাত সিনেমা-ডিরেক্টরের সহিত বন্ধুত্ব করিবার স্পর্দ্ধায় লাভ নাই।

চিঠির জবাব দিলাম না। কিন্তু কিছু দিন পরে হঠাৎ এক দিন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় যাইবার প্রয়োজন হইল। সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম মনে হইল, এক বার নীহারদের ওখানে গিয়া দেখা করিয়া আসিলে বিশেষ কিছু দোষ হইবে না, বোধ হয়?

কলিকাতার কাজ সারিয়া ফিরিতে আট-দশ দিন বিলম্ব হইবে দেখা গেল। বোর্ডিংএ উঠিয়াছিলাম। পরদিন নীহারদের বাড়ীটা খুঁজিয়া বাহির করিলাম। প্রকাণ্ড ঝক্‌ঝকে বাড়ী। তাহারই তিন-তলার দু'খানি ঘর লইয়া একটা ফ্ল্যাট। সুধীর বাড়ী ছিল না। তাহার পরিবর্ত্তে একেবারে মুখোমুখি একটি মহিলায় সহিত দেখা হইয়া গেল! এই মহিলাই যে নীহারের স্ত্রী বিভা, সে-কথা সে নিজে জানাইয়া না দিলে আমি চিনিতে পারিতাম না।

সে বলিল,—ও মা, ঠাকুরপো যে! এসো, এসো। সুধীরের চিঠি পেয়েছিলে তাহলে? বলিতে বলিতে সে আমাকে ভিতরে লইয়া গিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিতে দিল।

সে আজ কত বৎসরের কথা! আজ বিভার পানে চাহিয়া মনে হইতেছে, বয়স তো তাহার এতটুকু বাড়ে নাই, বরং খানিকটা কমিয়াছে বলিয়া ভুল হয়। দিনাজপুরে নীহারের বাড়ীতে যে-বিভাকে নিত্য চোখের সামনে দেখিতাম, তাহার সহিত ইহার কোনো দিক্ দিয়াই মিল নাই—ঠোঁটের পাশের ঐ টোল-খাওয়া হাসিটুকু ছাড়া। এ-ভাবের ধোপদোস্ত কাপড় পরিতে তাহাকে কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সাজিমাটিতে-কাচা লালচে ছোপ-ধরা কাপড় তাহার গায়ের তামাটে-রঙের অনিবার্য্য সঙ্গিরূপে আমার মনের চোখে গাঁথা ছিল। কিন্তু আজ গায়ের সে তামাটে রঙ্ আর নাই। আজ এত দিনের পর যেন প্রথম দেখিলাম, নীহারের বৌ সত্যই সুন্দরী।

একমুখ হাসিয়া বিভা বলিল,—কি দেখ্‌চো বলো দেখি অবাক্ হয়ে? ভাব্‌চো, আমাদের উন্নতি হয়েচে!

হাসিয়া জবাব দিলাম,—হবার কথা! নীহার তো আজ একটা নামজাদা মানুষ! শুধু লেখা থেকে মানুষের পেট ভরে কি না আজ তো বুঝ্‌তে পারচো!

—তা পারচি। বলিয়া ওদিকে ফিরিয়া জানালার পর্দ্দাটা একটু টানিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তার পর? হঠাৎ আজ সাত বছর পরে আমাদের মনে পড়লো?

বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিলাম,—কারণ অত্যন্ত মামুলি এবং স্পষ্ট। আজ আমার বন্ধুর সুসময় যে! সুতরাং পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নেওয়া দরকার হয়ে পড়্‌লো।

বিভা গম্ভীর হইয়া বলিল,—তুমি চিরদিনই এক ভাবে রইলে। নিজেকে খেলো করে কথা বলতে বিশেষ আনন্দ পাও তুমি। ওটা কিন্তু গুণ নয়।

হাসিয়া জবাব দিলাম,—তা, মানুষ তো দোষ-ত্রুটির অতীত নয়!

—তা নয়। কিন্তু তর্ক করা আমার অভ্যাস নয়, সুতরাং তর্কে আমার হার। তর্ককে চিরদিন আমি এড়িয়ে চলেচি জীবনে।

—আচ্ছা, তার পর সুধীর কোথায়? আর সব ছেলে-মেয়েরা?

—সুধীর কি জন্য এক বার কলেজে গেছে। বেণুকে তোমার নিশ্চয় মনে পড়ে? আজ তার ইস্কুলে গানের ক্লাশ। ছোট দুটি ছাদের ওপর খেলা করচে। সুধীর হয়তো এখনি এসে পড়্‌বে। তুমি বসো ভাই! আমি এলুম বলে।

বলিয়া সে তাড়াতাড়ি পাশের বারান্দা দিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। একটু পরেই ঘুরিয়া আসিয়া বলিল,—একাই বা বসে' থাকবে কতক্ষণ! তার চেয়ে রান্নাঘরেই এসো। গল্প করা যাবে।

ছোট পরিপাটী রান্নাঘরটি। প্রত্যেকটি জিনিষ কেমন নিপুণ করিয়া গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। ও-দিকের উনানে হাঁড়িতে কি-একটা ফুটিতেছে, এ-পাশের উনানে কড়াইয়ে সবে তেল ঢালা হইয়াছে।

বলিলাম,—দিনাজপুরের বাড়ীর কথা মনে পড়চে। রান্নাঘরে ঢুকে কত জ্বালাতনই না করেচি!

সে বলিল,—কিন্তু কোনো দিন এক-কাপ চায়ের বেশী সামনে এগিয়ে দেবার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি আমার। তখন মনে-মনে কত যে বলেচি, এক দিন যেন সাধ মিটিয়ে খেতে দিতে পারি তোমায়। আমার মনের সেই ইচ্ছা পূরণ করতে আজ তাই তোমাকে আস্‌তে হয়েচে নিজে থেকে ছুটে!

—কি ভয়ঙ্কর লোক তুমি বৌদি! আমি না কি তোমার কাছে খাবার জন্যে ছুটে এলুম?

—কেন, তাতে অপমান আছে বুঝি? দু'জনে তোমরা একসঙ্গে বসে' খেতে! কিন্তু সে বরাত আমার নয়! তুমিই তো বলেচ, সে আজ একটা নামজাদা মানুষ।

—সুধীর লিখেছিল, সে বম্বে গেছে। ফিরবে কবে?

—কোথায়?

—কেন, এখানে?

—তা আমি কেমন করে' বলবো বলো! কল্‌কাতায় হয়তো ফিরবে দিন দশের মধ্যেই। কিন্তু এখানকার এই ফ্ল্যাটে তার দেখা পাবার আশা করে' বসে থাক্‌লে কোনো দিনই তার দেখা পাবে না ঠাকুরপো!

—তবে?

—বালিগঞ্জে কোথায় একটা অদ্ভুত রকমের রাস্তায় নাম। সুধীর জানে।

অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—সে সেখানে থাকে? নীহার একা?

এক-মুখ হাসিয়া সে জবাব দিল,—একা কি না, সে কথা বলা শক্ত। হয়তো একা না'ও হতে পারে। অন্ততঃ আমি ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাইনি কোনো দিন। গরীবের ঘরের মেয়ে, বাপের বাড়ীতে কখনো টাকা-পয়সার মুখ দেখিনি। বিয়ের পরেও কি-করে' দিন কেটেচে, তা তোমার অজানা নেই ঠাকুরপো! ছেলে-মেয়েদের পেট পূরে খেতে দিতে পারিনি কোনো দিন, আজ তারা খেতে পাচ্ছে, মনের মত করে' লেখাপড়া শিখ্‌চে গান শিখ্‌চে। এর বেশী কিছু আমি চাইনি কোনো দিন, তাই আজ আর আমার কোনো দিকে চোখ-কাণ দেবার সময়ও নেই।

যে-হাসি লইয়া সে কথা বলিতে সুরু করিয়াছিল, মাঝখানে কখন্ যে তাহা ঘন মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছিল, লক্ষ্য করিবার অবকাশ ছিল না। অবাক্ হইয়া তার মুখের পানে চাহিয়া-চাহিয়া

ভাবিতেছিলাম···ঠিক কি যে কথা তখন আমার মনে হইতেছিল, তা আমি নিজেই গুছাইয়া বলিতে পারিব না!

সহসা মেঘমুক্ত অনেকখানি আলো তাহার মুখে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল,—বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো না বলে' কিন্তু তোমার চলে' গেলে চলবে না, তা বলে রাখ্‌চি। আমার হাতে না-খেয়ে আজ তুমি যেতে পাবে না।

হাসির উত্তরে না-হাসিয়া উপায় ছিল না। হাসি-মুখে বলিলাম, —তোমার হাতে খাওয়া তো আজ আমার নতুন নয় বৌদি! আজ তুমি আমাকে যত আড়ম্বর করেই খাওয়াও, তোমার সেই দিনাজপুরের বাড়ীতে গরম চায়ের আস্বাদটিকে কোনো-কিছুতেই ঢেকে দিতে পারবে না। সুতরাং ওটা আজকের মত থাক্ বৌদি! আমি কল্‌কাতায় আছি এখন ক'দিন। নীহারের সঙ্গে দেখা না-হলেও যদি বা চলে, তোমার হাতে না-খেয়ে যাওয়া আমার চলবে না।

কিন্তু কথায় তাহাকে নিরস্ত করা গেল না! সে দিনের মত রান্নাঘরে বসিয়াই টাট্‌কা নিম্‌কির সঙ্গে গরম চায়ের সদ্ব্যবহার না-করিয়া উপায় রহিল না। আবার এক দিন আসিবার প্রতিশ্রুতি-টাকে সে যেন ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না। না-পারিবার কথা! কেন না, সেখান হইতে বাহিরে আসিয়া মন আমার কি-যে বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল! মনে হইল, ইহাদের সহিত এই যে সুদীর্ঘ সাত-আট বৎসর দেখা হয় নাই, সে ভালো ছিল সব দিক্ দিয়া। কেনই বা আবার ইহাদের সংশ্রবে আসিবার খেয়াল জাগিল মনে? নীহার নিশ্চয় আমার চিঠি দেখিয়াছিল, দেখিয়াও নিজে একটা জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই। এ-অবস্থায় আবার এখানে আসা শুধু নিরর্থক নয়, অন্যায়।

তবু কেন যে বুকের নীচে কোন্ একটা অনির্দ্দেশ্য স্থানে একটা ব্যথার মত বিঁধিয়া ওঠে, বুঝিতে পারি না। নীহারের স্ত্রীর কথাগুলি থাকিয়া-থাকিয়া কাণে বাজে।···এর চেয়ে বেশী-কিছু কোন দিনই আমি চাইনি। তাই আজ আর আমার কোন দিকে চোখ-কাণ দেবার সময়ও নেই।···এতটুকু আশা নাই, ঈর্ষা নাই, উষ্মা নাই, অত্যন্ত সহজ শান্ত সুরে কথাগুলি সে বলিয়া গেল। অদ্ভুত—সত্যই অদ্ভুত! জীবনের এই নির্ম্মম কঠোর বাস্তব চেহারাটাকে এরাই চিনিয়াছে। এবং চিনিয়া বিনা অভিযোগ-অনুযোগে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

প্রতিভা চ্যাটার্জ্জী মেয়েটি কে, নীহারের সহিত সত্যকার তার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, কে জানে! বিভা হয়তো জানে! হয়তো বা জানেও না! জানিবার জন্য এতটুকু কৌতূহলও জাগে নাই তার মনে! নিজের সংসারকে পাশ কাটাইয়া নীহারের বালিগঞ্জে থাকার সঙ্গে হয়তো প্রতিভা চ্যাটার্জ্জীর কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। কিন্তু বিভা সে-সম্ভাবনাকে অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে অগ্রাহ্য করিয়াছে।

কলিকাতার কাজ নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বেই সারা হইয়া গেল। সুতরাং ঘরে ফিরিবার আয়োজন করিতেছিলাম। মনের ভিতর এক-একবার একটা দুর্দ্দমনীয় বাসনা জাগিতেছিল, যাইবার আগে একবার নীহারের বাড়ীতে দেখা করিয়া আসি। অনেক কষ্টে মনকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না। যাইতে হইল। জিনিষপত্র গুছাইয়া ঠিক করিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। নিজের মনে-মনে একটা যুক্তিকে বারম্বার খাড়া করিয়া ধরিতেছিলাম, কে জানে সেখানে আজ নীহারের সহিত দেখা হইতে পারে হয়তো! কিন্তু নীহারের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা, অথবা বিভাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছি, তাহা রক্ষা করার ইচ্ছা, কোন্‌টা আমাকে বেশী আকর্ষণ করিতেছিল, সেটা নিজের মনেও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল না।

বরাবর উপরে উঠিয়া আসিলাম। ফ্ল্যাটখানার সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ। ঘরে কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না। সে-দিন যে ঘরে ঢুকিয়াছিলাম, আজ তার দরজার কাছে আসিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। হঠাৎ ভিতর হইতে গলা শোনা গেল,—এসো ঠাকুরপো।

ভিতরে ঢুকিতেই এক-মুখ হাসিয়া বিভা বলিল,—আজ সত্যিই আমায় তুমি আশ্চর্য্য করে দিয়েচ ঠাকুরপো!

—কেন বৌদি?

—মনে-মনে জানতুম, কখনো আর এ-মুখো হবে না।

—কিন্তু আমি যে সে-দিন কথা দিয়েছিলুম!

সশব্দে হাসিয়া সে জবাব দিল,—সংসারে কথা-দেওয়ার যে সত্যকার কোনো দাম আছে, তা ক'জনই বা মনে করে তোমার মতো!

—তাহলে না-এলেই ভালো করতুম বল্‌চো!

—অন্ততঃ আমাকে তুমি ঠকাতে পারতে না, ঠাকুরপো! এ-সংসারে বেশী আশা করে' ঠকার চেয়ে না-আশা-করাই দেখেচি সব-চেয়ে ভালো।···কিন্তু আজ এসে তুমি কি উপকারই যে করলে আমার! সুধীরের সঙ্গে এরা সব সিনেমায় গেছে। আমি এই মেয়েটাকে নিয়ে একা। কাজকর্ম্ম সব সারা হয়ে গেছে। বসে-বসে আপনার মনে কখন্ একটু তন্দ্রা এসেছিল। মনে হচ্ছিল, দিনাজপুরে সেই ছোট্ট চালাঘরখানার দাওয়ায় আমি একা বসে' আছি, বাড়ীর পিছনের মুচকুন্দ চাঁপার গাছটার পাতা ছুঁয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েচে দরাজ উঠোনের ওপর, আর বাইরের ঘরে তোমাদের দু'জনের মজলিস্ বসেচে। কি যে আরাম লাগছিল, কি বলবো!

মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল,—দিনাজপুরে তাহলে খুব সুখে ছিলে বলতে চাও?

এক-মুখ হাসিয়া সে জবাব দিল,—বা রে, তবে আর স্বপ্ন বলবে কেন! স্বপ্নে সব-জিনিষটাই উল্টো করে মনে হয়! সত্যিকার অবস্থায় যাকে নিয়ে অশান্তির সীমা থাকে না, স্বপ্নে তারই ছবি কি শান্তি এনে দেয় মনে, তা তুমি হয়তো বুঝতে পারবে না, আমি কিন্তু বুঝি।

কি-যে জবাব দিব, সহসা ভাবিয়া পাইলাম না। কথাগুলো তার অপূর্ব্ব হেঁয়ালিতে ভরা বলিয়া ঠেকিল। ছোট মেয়েটি একপাশে একটা ডলি-পুতুল লইয়া খেলা করিতেছিল, আমি সেই দিকে মনোযোগ দিবার ভাণ করিলাম।

সে বলিল,—না, তুমি নিশ্চয় বিরক্ত হচ্চো, বোকার মত যা-তা বক্‌চি দেখে। তার পর তোমার কি খবর বলো?

—আমি আজই বাড়ী ফিরচি। তাই একবার ভাবলুম—

—বন্ধুর সঙ্গে যদি দেখা হয়? বলেচি তো, এখানে তার দেখা পাওয়া সম্ভব হবে না। তার চেয়ে বালিগঞ্জে গেলে—

—বালিগঞ্জে যাওয়ার সময় আমার কোনো দিন হয়নি—হবেও না।

বিভা মুখ টিপিয়া হাসিল। পরে কথা ঘুরাইয়া বলিল,—ট্রেনের তোমার নিশ্চয় দেরী আছে এখনো?

—উঁহু, দেরী কোথায় বৌদি? আর বড় জোর ঘণ্টা দুই!

—তার পরেও তো গাড়ী আছে! আমার রান্না সেরে উঠ্‌তে কতক্ষণই বা যাবে!

জবাব দিবার আগেই সিঁড়ি দিয়া কার যেন উপরে ওঠার শব্দ শুনা গেল। এবং একটু পরেই যে-লোকটি একেবারে দরজার সামনে আসিয়া পৌঁছিল, সে নীহার।

—হ্যালো! অমল যে! এই কিছু দিন আগে, সুধীর বলছিল বটে তোমার কথা! ওঃ! কত দিন তোমায় দেখিনি। কেমন আছো, বলো।

উত্তরে বলিলাম,—নিশ্চয় ভালো আছি। আমি তো কলকাতায় এসেই তোমার বাড়ী খুঁজে-খুঁজে বার করে' এখানে এসেছিলুম। তা শুনলুম, তুমি বম্বে গেছ।

রুমালে মুখ মুছিতে-মুছিতে সে বলিল,—হ্যাঁ ভাই, বম্বেতে ক'দিন স্যুটিং হলো কি না! তুমি এখানে এসেছিলে বুঝি? তা, বিভা তো তোমায় যথেষ্ট চেনে! আর আমার কথা বলো না ভাই! এম্‌নি কাজ নিয়েচি, যাকে বলে মরবার ফুরসৎ নেই। তা তুমি এক দিন বালিগঞ্জে যেতে পারো তো অনায়াসেই!

—ওঃ বালিগঞ্জে না-গেলে বুঝি আজকাল তোমার দেখা মেলে না? কার্ড দিয়ে ঢুক্‌তে হবে নিশ্চয়?

মুখে খানিকটা ক্লান্ত হাসি টানিয়া বলিল,—ঠাট্টা সুরু করলে? তা, করো ঠাট্টা! মানে ওই যে বললুম, কোথায় যে কখন্ আমি থাকি—

আরও গোটাকয়েক এটা-সেটা কথার পর সে বিভাকে বলিল,—তার পর তোমাদের খবর সব ভালো তো? এরা সব কোথায়?

বিভা হাসি-মুখে জবাব দিল—সুধীরের সঙ্গে সিনেমায় গেছে।

—তাই না কি? তা বেশ।—তা ভাই অমল, তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে বলো?

—আমি আজই শিউড়ী ফিরচি।

—আজই? বলো কি! তাহলে আর কি হবে!

পরে বিভাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—আচ্ছা, আমি কিন্তু উঠ্‌লুম এখন। নীচে মোটর দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিভা সঙ্গে আছে গাড়ীতে।

বেশ সহজ সুরেই বিভা বলিল,—ওপরে নিয়ে এলে না কেন?

—না—বড্ড তাড়াতাড়ি, এখনি স্যুটিংএ যেতে হবে। পাছে দেরী করি, এই ভয়ে ও আজ ওপরে আস্‌তে চাইলে না। আচ্ছা তাহলে ভাই অমল, তুমি বসে' গল্প করো। আমি বেরিয়ে পড়লুম। গুড্‌বাই।

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিভাকে বলিল,—হ্যাঁ, কাল-পরশু একবার সুধীরকে দেখা করতে বোলো।

দরজার কাছে গিয়া আবার ফিরিয়া বলিল,—আর তোমার হাতে টাকা আছে তো? না থাকে, এখন এগুলো রাখো। বলিয়া কয়েকখানা নোট বিভার দিকে আগাইয়া দিল। বিভা সেগুলি লইয়া আঁচলে বাঁধিল।

নীহার চলিয়া গেল।

আমি স্তম্ভিত—নির্ব্বাক্। হঠাৎ বিভা খিল্-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরে আপনা-আপনি হাসি থামাইয়া বলিল,—বসো ঠাকুরপো। তুমি ততক্ষণ খুকির সঙ্গে পুতুল-খেলা করো বরং। আমি চট্ করে' ষ্টোভটা জ্বেলে ফেলি।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকে ভারতের ব্যর্থতা

আন্তর্জ্জাতিক জল্পনা-কল্পনা ও সন্ধি-সঙ্কল্প বৈঠকের রীতি-নীতি ও কূট মন্ত্রণা-কৌশলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই নিশ্চিত ছিলেন যে, গত মাসের আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকে ভারতের ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীন দেশের স্বার্থ চিরদিনই পরাধীন দেশের স্বার্থ হইতে বিভিন্ন। স্বাধীন দেশের, বিশেষতঃ বিজেতার যাহা স্বার্থ, পরাধীন বিজিত জাতির তাহা পরার্থ। পাশ্চাত্ত্যের শ্বেত জাতিগুলি প্রাচ্যের পীত ও কৃষ্ণ জাতিগুলিকে কখনই সমপর্য্যায়ে অবস্থিত দেখিতে ইচ্ছা করে না। ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ ও অধিকারে আমরা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রে, তেমনি অর্থনীতি ক্ষেত্রে। প্রাচ্যের পীত ও কৃষ্ণ জাতিগুলি প্রতীচ্যের শ্বেত জাতিগুলির বশীভূত হইয়া তাহাদের সুখ-সম্পদ্ যোগাইবে, ইহাই প্রবলের "ন্যায়" নীতিতে দুর্ব্বলের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতি ক্লেশকর শ্রম-সাধ্য কার্য্যে কাঁচা মাল উৎপাদন করিয়া, অতি সুলভ মূল্যে পাশ্চাত্ত্য শ্রমশিল্পকে পরিপুষ্ট করিয়া, তদুৎপন্ন পাকা মাল অতি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিয়া পাশ্চাত্ত্যের ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ এবং নিজের ভাণ্ডার নিঃশেষ করাই প্রাচ্যের সহজ সরল জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত নিরীহ জাতিগুলির বিধাতৃ-বিহিত বিধান। এই বিধানের ব্যতিক্রম সম্ভবপর নহে!

ব্রেটন্ উডসের আর্থিক আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকেও এই চিরন্তন নীতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ভারতের সমস্ত সমীচীন প্রস্তাব-গুলি অতি কোমল অথচ কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাহার ভাগ্যে ব্যর্থতা, বিফলতা ও বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে প্রচুর। আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকের সাহায্যে আপনার ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করিয়া শিল্প-বাণিজ্য, বৃত্তি-ব্যবসায় ও ধন-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার যে কল্পনা ভারত সত্যে পরিণত করিবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকের প্রধান পাণ্ডাদ্বয় আশ্রিত ও অনুগত মিত্রশক্তিগণের সহযোগে ও সমর্থনে তাঁহাদের সু-পরি-কল্পিত আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের কর্ম্ম-পরিধি হইতে সেই সকল বিধি-বিধান বিদূরিত করিয়াছেন, যাহার ফলে শিল্পে-অনুন্নত জাতি-গুলির শিল্পে-সমুন্নত জাতিগুলির স্বার্থের বিঘ্ন ঘটাইবার সম্ভাবনা। কিরূপে তাহাই বলিব।

বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে আন্তর্জ্জাতিক কার-কারবারে ও

বাণিজ্য পরিচালনের সৌকর্য্য হেতু আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-সমন্বয়ের প্রয়োজন। সর্ব্বদেশের প্রচলিত-মুদ্রা-প্রকরণের মধ্যে একটি দৃঢ় বিনিময় যোগসূত্র অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বিভিন্ন মুদ্রা-প্রকরণের একটি নির্দ্দিষ্ট বিনিময়-হার নির্দ্ধারিত না থাকিলে, পণ্য (Goods) ও পরিচর্য্যা (Services) আদান-প্রদানের বিষম ব্যাঘাত ঘটে। বিনিময়-হার সতত পরিবর্ত্তনশীল হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ-লোকসানের অনিশ্চয়তা হেতু দৈব-বাণিজ্যের (Speculation) উৎপত্তি ঘটে। দৈব-বাণিজ্য সর্ব্বদেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির উপযোগী অর্থ-বিনিয়োগ (Investment) নীতির প্রচণ্ড অন্তরায়। দৈব-বাণিজ্যে ধনী নির্ধন হয় এবং নির্ধন ধনী হয়। বিভিন্ন দেশের প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের বিনিময়-হারের অনিশ্চয়তা সর্ব্বদেশের কল্যাণকর বাণিজ্য-সুযোগ ও বাণিজ্য-বিস্তারের পরিপন্থী।

আদান-প্রদান ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্য অচল। সর্ব্বদেশে সর্ব্বপ্রকার পণ্য উৎপন্ন হয় না এবং সর্ব্বদেশে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী মিলে না। সুতরাং যে দেশে যাহা নাই, অন্য দেশ হইতে সে দেশে তাহা আনিতে হয় এবং স্বদেশের উদ্বৃত্ত পণ্য ও কর্ম্মীর বিনিময়ে বিভিন্ন দেশ হইতে স্বদেশের প্রয়োজনীয়, অথচ স্বদেশে প্রাপ্তব্য নহে, এমন বহু দ্রব্য-সামগ্রী ও কুশলী কর্ম্মি-কারিকর আমদানী করিতে হয়। বিনিময়-হারের দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তাই এই আদান-প্রদানের মূল ভিত্তি। স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায় সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির কাম্য মূল্যবান ধাতুর ভিত্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না হইলে, কোন দেশের ধাতব অথবা কাগজের ভাক্ত (Token) মুদ্রা-প্রকরণ আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক জগতে তাহার মূল্য-মান দৃঢ় রাখিতে সমর্থ হয় না।

বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মুদ্রা-মান প্রচলিত। কোথাও স্বর্ণমান, কোথাও রৌপ্যমান, কোথাও বা স্বর্ণ-রৌপ্যমান (Bi-metallic), কোথাও স্বর্ণবাট (Gold bullion), কোথাও স্বর্ণ-বিনিময় (Gold exchange) এবং কোথাও সুবর্ণ-নির্ম্মিত ডলার অথবা ষ্টার্লিং বিনিময় মান। ভারতে এখন এই শেষোক্ত ষ্টার্লিং বিনিময় মান প্রচলিত। বিভিন্ন দেশের এই বিভিন্ন মানে পরিচালিত প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণকে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থিতিশীল মুদ্রা-মূল্যমানসূচক এককের (Unit) সহিত যোগ-সূত্রে যুক্ত রাখিতে না পারিলে, পরস্পরের সহিত আদান-প্রদানে বিনিময়-হার দৃঢ় রাখিতে পারা যায় না। বিনিময়-হার স্থিতিশীল না হইয়া, সতত পরিবর্ত্তনশীল হইলে কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং এমন কি চাকুরী-নকরী ও মজুরীতেও অর্থের আদান-প্রদান অর্থাৎ আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের নিরিখ নির্দ্ধারিত থাকে না; সুতরাং একটি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি ঘটে। এই অসুবিধা বিদূরিত করিয়া, ভবিষ্যতে যাহাতে সর্ব্বপ্রকার ব্যাপার-বাণিজ্যে অর্থের আগম-নির্গমের নিশ্চয়তা দ্বারা সর্ব্ব জাতির সর্ব্ববিধ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, তদুদ্দেশ্যে কিছু দিন পূর্ব্বে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র দুইটি বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-সমন্বয় পরিকল্পনা রচনা করেন। যুক্তরাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কীনেস্ একটি আন্তর্জ্জাতিক খালাস-নিষ্পত্তি বিধায়ক সম্মিলনী (International Clearing Union) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে তিনি সর্ব্ব জাতির সার্ব্বভৌম শীর্ষ-মুদ্রার নাম দিয়াছিলেন, "ব্যাঙ্কর" (Bancor)। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্রের খাজাঞ্চীখানার অধ্যক্ষ মিঃ মর্গেনথো প্রস্তাব করিয়াছিলেন, একটি আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক স্থৈর্য্য-সম্পাদক ভাণ্ডার (International Stabilisation Fund) প্রতিষ্ঠার। তাঁহার সার্ব্বভৌম শীর্ষ-মুদ্রার নাম দিয়াছিলেন, "ইউনিটাস্" (Unitus)। লর্ড কীনেসের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার প্রতিষ্ঠান আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক হিসাব-নিষ্পত্তির যোগসূত্র সংস্থাপন করিবে; আর মিঃ মর্গেনথোর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার ভাণ্ডার বিভিন্ন দেশের মুদ্রা-প্রকরণের ক্রয়-বিক্রয়-মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবে। উভয়েরই উদ্দেশ্য, বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ বিনিময়-হারের অযথা হ্রাস-বৃদ্ধি নিবারণ। এই পরিকল্পনা দুইটির মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, "ইউনিটাস্" স্বর্ণ কিংবা যে-কোন প্রচলিত-মুদ্রা-প্রকরণে পরিবর্ত্তনীয়; কিন্তু "ব্যাঙ্কর" খালাস-নিষ্পত্তি প্রতিষ্ঠানের সম্মতি ব্যতীত স্বর্ণে পরিবর্ত্তনীয় নহে। উভয়েরই ভিত্তিভূমি স্বর্ণ; তবে যুক্তরাজ্যের স্বর্ণ-সম্পদ্ এখন অত্যন্ত কম; সুতরাং স্বর্ণের সহিত "ব্যাঙ্করের" সংস্রব শিথিল। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণ-সম্পদ্ এখন অতি প্রচুর, সুতরাং স্বর্ণের সহিত "ইউনিটাসের" দৃঢ় সম্পর্ক! এই পার্থক্যে বিরোধের বীজ নিহিত ছিল।

এই পার্থক্য বিদূরিত করিয়া উভয় দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান সুদৃঢ় মৈত্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উভয় দেশের পরিকল্পনা দুইটির মধ্যে যথাসম্ভব ঐক্য ও সামঞ্জস্য সংস্থাপনার্থ সম্প্রতি একটি যৌথ পরিকল্পনা সঙ্কলিত হইয়াছে। উভয় দেশের বিশেষজ্ঞেরা এখন একটি আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় স্থৈর্য্য সম্পাদক অর্থভাণ্ডার (International Exchange Stabilisation Fund) স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহার অর্থ-সংস্থান হইয়াছে ৮,৮০০ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ আড়াই হাজার মিলিয়ন ষ্টার্লিং; প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সহযোগিতা দ্বারা বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা-বিঘ্ন বিদূরীকরণ। এই পরিকল্পনায় পূর্ব্ব-সঙ্কল্পিত "ব্যাঙ্কর," অথবা "ইউনিটাস্"-রূপ আন্তর্জ্জাতিক একক বর্জ্জন করা হইয়াছে। সর্ব্ব দেশের প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের নিরিখ স্বর্ণে নির্দ্ধারিত করা হইবে। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় ভাণ্ডারের সদস্য-দেশ (Member countries)-গুলির নিজ নিজ হিস্যার (quota) অধিকাংশ স্বর্ণে দিতে হইবে না। এখন দিতে হইবে প্রত্যেকের হিস্যার শতকরা ২৫ অংশ স্বর্ণে, অথবা তাহার স্বর্ণ-সংস্থানের (Holdings of gold and gold exchange) শতকরা ১০ অংশে,—ইহার মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম হয়। সুতরাং কোন দেশের স্বর্ণ-সংস্থান যতই স্বল্প হউক না কেন, তাহার পক্ষে হিস্যা পূরণ ক্লেশকর হইবে না। যে-কোন সদস্য-দেশ কয়েকটি নির্দ্ধারিত সর্ত্তে তাহার প্রচলিত মুদ্রার বিনিময়ে ভাণ্ডার হইতে অন্য যে-কোন সদস্য-দেশের প্রচলিত মুদ্রা ক্রয় করিতে পারিবে। কোন প্রকার প্রচলিত মুদ্রার স্বল্পতা ঘটিলে ভাণ্ডার কোন সদস্য-দেশের নিকট হইতে ঋণ লইতে অথবা স্বর্ণের বিনিময়ে প্রচলিত মুদ্রা ক্রয় করিতে পারিবে। যে-কোন দেশ আভ্যন্তরীণ গার্হস্থ্য, সামাজিক, অথবা রাজনৈতিক কারণ-প্রসূত বিপর্য্যয় নিবারণকল্পে, অত্যাবশ্যক হইলে, তাহার প্রচলিত মুদ্রার নির্দ্ধারিত মূল্যমান (Parity) পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে; কিন্তু এই পরিবর্ত্তন তাহার আদ্য (Initial) মূল্যের শতকরা ১০ অংশের অধিক হইতে পারিবে না। সার্ব্বজনীন ভাবে সমপরিমাণে একটি

সর্ব্বসম্মত পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারা যাইবে,—যদি ভাণ্ডারের মোট হিস্যার শতকরা দশ কিংবা ততোধিক অংশের অধিকারী সদস্য-দেশগুলি এইরূপ পরিবর্ত্তন অনুমোদন করে। এই নব যৌথ-পরিকল্পনার সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ সাধারণ পাঠকের রুচিকর হইবে না। এই নিমিত্ত আমরা সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আপাতদৃষ্টিতে এই পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার অনুরূপ হইলেও বাস্তবপক্ষে ইহা যুক্তরাজ্যের পরিকল্পনার বিশিষ্ট বিধানগুলিকে ইহার সামিল করিয়া লইয়াছে। রাশিয়াও এই পরিকল্পনাকে স্থূল ভাবে অনুমোদন করিয়াছেন। এখন মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য দেশগুলির সমর্থন ও সম্মতি-ক্রমে ইহা কার্য্যকরী হইতে পারিবে। আমরা ভারতের স্বার্থের দিক্ হইতে ইহার বিচার করিব।

গত আষাঢ় মাসের শেষভাগে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার নামক স্থানের ব্রেটন উড্স্ সহরে এই যৌথ পরিকল্পনার বিচার-বিবেচনার্থ মিত্রপক্ষীয় একচল্লিশটি দেশের সহযোগে একটি আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল। এই বৈঠক যুদ্ধোত্তর সমস্যা সমাধানার্থ বহু বৈঠকের প্রথম অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট সর্ব্বাগ্রে আর্থিক বৈঠকের আহ্বান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত যে যুদ্ধ-সম্ভূত আর্থিক সমস্যাগুলি এরূপ প্রবল ও প্রচণ্ড যে, যুদ্ধের অবসান হইবার পূর্ব্বেই ইহাদের সমাধান প্রয়োজন। প্রতিনিধি-বর্গের মুখ্যতম কার্য্য হইতেছে, এমন একটি আন্তর্জ্জাতিক কার্য্যালয়ের প্রতিষ্ঠা—যাহা যুদ্ধান্তে সম্ভাব্য আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা ও মূল্যস্ফীতি (Inflation) নিবারণকল্পে নিখিল জগতের যাবতীয় প্রচলিত-মুদ্রার বিনিময়-হার শাসনে রাখিতে পারিবে। এই বৈঠকের আর একটি বিচার্য্য বিষয় ছিল, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের নিমিত্ত এমন একটি আন্তর্জ্জাতিক ধনাগারের (International Bank for Reconstruction) প্রতিষ্ঠা, যাহা যুদ্ধে-বিধ্বস্ত এবং অর্থনৈতিক-হিসাবে অনুন্নত দেশ সমূহকে ঋণ সরবরাহ করিয়া তাহাদিগের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে। বর্ত্তমান সঙ্কল্প অনুযায়ী ফরাসী, মিশর, ভারতবর্ষ, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ সমূহ সমভাবে এই ঋণলাভের সুযোগ-সুবিধা পাইবে।

আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-সমন্বয় সমস্যার সহিত পরাধীন ভারতের সংস্রব প্রত্যক্ষ নহে—পরোক্ষ। ভারতের প্রচলিত মুদ্রা বিলাতের প্রচলিত মুদ্রা ষ্টার্লিংএর সহিত দৃঢ় সংবদ্ধ। আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক মাত্রেই ভারতের স্বাতন্ত্র্য নামে মাত্র। ভারত সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত ও প্রেরিত প্রতিনিধিবর্গ যথার্থ পক্ষে, ভারতের নহে,—আমলাতান্ত্রিক শাসন-প্রণালীর প্রতিনিধি। ভারতের তরফ হইতে ভারতের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার অথবা সৎসাহস তাঁহাদের নাই। আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের কঠোর শাসনাধীনে তাঁহারা যে মতামত প্রকাশ করেন, তাহা প্রায়শঃই ভারতের যথার্থ জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় স্বার্থ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বহির্ব্বাণিজ্য-জমাখরচের উদ্বৃত্ত অঙ্ক (Trade balance) ভারতের অনুকূলে, অর্থাৎ ভারত কাহারও নিকট ঋণী নহে; যুক্তরাজ্যের অবস্থা ইহার বিপরীত। পক্ষান্তরে, ভারতের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্য অঙ্কের ন্যায় এত বিশাল নহে যে, তাহার নিকাশ-নিষ্পত্তি কোন জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিবে। ভারতের সমস্যা হইতেছে, কিরূপে তাহার বৈদেশিক প্রাপ্য অর্থকে সুশৃঙ্খল ভাবে তাহার পরিকল্পিত সমুন্নয়ন কার্য্যে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। অধমর্ণের নিত্য-নৈমিত্তিক হিসাব-নিকাশের দায়-দায়িত্ব হইতে ভারত অধুনা মুক্ত। ভারতের আশঙ্কা এখন এই যে, সাগরপারের প্রবল রাষ্ট্রশক্তিগুলি আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক বিরোধ-বিপ্লবের অবসানে নিখিল জগতের অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে হয়ত প্রচণ্ড বিরোধ-বিপ্লবের সৃষ্টি করিবেন। আমাদের আতঙ্ক এই যে, এই সকল যুধ্যমান্ প্রবল রাষ্ট্রশক্তি অর্থ-নৈতিক হিসাবে অনুন্নত দেশ সমূহকে অর্থ-সামর্থ্যে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবেন না; বরং এই সকল শক্তি-সামর্থ্যহীন অনুন্নত দেশ সমূহের প্রচুর কাঁচামাল-সম্পদ্ অধিকার করিয়া, তদুৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীকে সেই সেই দেশে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত কঠোর কুটিল বাণিজ্য-নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন।

যুদ্ধের অভিঘাতে যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক ঋণ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং যুক্তরাজ্যের স্বার্থ এই যে, তাহার আভ্যন্তরীণ আর্থিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বিপর্য্যস্ত না করিয়া ধীরে ধীরে তাহার সুযোগ-সুবিধা ও সামর্থ্যানুযায়ী ঋণ পরিশোধ। পক্ষান্তরে, জগতের প্রধানতম উত্তমর্ণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ যত শীঘ্র সম্ভব, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য মিত্র ও অনুগত রাষ্ট্র সমূহ হইতে নির্ব্বিবাদে তাহার প্রাপ্য সংগ্রহ। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ এরূপ বিপুল হইয়াছিল যে, তাহার এই আগ্রহাতিশয্যকে কোন প্রকারে নিন্দা করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে কয়েকটি মাত্র স্থূল বিষয়ে, আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সহযোগিতা ঘটিতে পারে। চলতি লেনা-দেনাই (Current transactions) বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতের প্রথম ও প্রধান স্বার্থ, যুদ্ধোত্তর সংগঠন সমুন্নয়নকল্পে আমাদের বিলাতে অবস্থিত ষ্টার্লিং-সংস্থিতির ত্বরিত আদায়। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র-সঙ্কলিত যৌথ-পরিকল্পনা হইতে সুকৌশলে এই প্রশ্নের সমাধান-সমস্যা অন্তর্হিত করা হইয়াছে। ভারতের মুস্কিল এইখানে। এই প্রশ্নই ভারতের মুখ্য প্রশ্ন—জীবন-মরণের সমস্যা। অথচ স্থূল দৃষ্টিতে এই সংস্থিতি-পরিশোধ প্রশ্ন চলতি লেনাদেনার মধ্যে আসে না। সম্প্রতি ভারতের অস্থায়ী অর্থ-সচিব স্যার সিরিল জোন্স একটি ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন যে, এই সংস্থিতি পরিশোধার্থ যুক্তরাজ্যের ভারতকে প্রদেয় বাৎসরিক কিস্তিও আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইবে। বিলাতের "নিউজ ক্রনিকল্" পত্রিকার অর্থনীতিবিদ্ নাগরিক সম্পাদক (City Editor) এই ব্যাখ্যার এই টীকা করিয়াছিলেন যে, অস্থায়ী অর্থ-সচিবের উদ্দেশ্য এই যে, ভারত তাহার ষ্টার্লিং-সংস্থিতি পরিশোধার্থ যুক্তরাজ্যকে আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারে। এই ব্যাখ্যা যদি যথার্থ হইত, তাহা হইলে, ব্রেটন উডসের আর্থিক বৈঠকে ভারতের যোগদান করিবার বিশিষ্ট সার্থকতা থাকিত। দেশ-দেশান্তরে মূলধনের গতিবিধি (Capital movements) এবং বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে অর্থবিনিয়োগ প্রচেষ্টা (Large scale foreign investments) প্রভৃতি প্রশ্ন ভারতের পক্ষে গৌণ। মুখ্য প্রশ্নে বৈঠকের নির্দ্দেশ ভারতের বিপক্ষে। অর্থাৎ ষ্টার্লিং-সংস্থিতির উদ্ধার-সাধন বৃটেন ও ভারতের ঘরোয়া ব্যাপার; আন্তর্জ্জাতিক প্রশ্ন নহে।

ব্রেটন্ উড্‌সে আর্থিক বৈঠক বসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিলাতের কয়েকটি আর্থিক ও অর্থনৈতিক পত্রিকা ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান বিপুল ষ্টার্লিং-সংস্থিতি সম্পর্কে যেরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছিলেন, তাহা যথার্থই আশঙ্কাপ্রদ। কোন প্রকারে এই গচ্ছিত ধনের দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাভই তাঁহাদের অভিপ্রেত। এই উদ্দেশ্যেই ইঙ্গ-মার্কিণ যৌথ পরিকল্পনা আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকের কার্য্যসূচী হইতে দুঃস্থ ও নিঃস্ব জাতির সাহায্য (Relief) পুনর্গঠন, (Reconstruction) এবং যুদ্ধ-ঘটিত আন্তর্জ্জাতিক ঋণ (War indebtedness) প্রভৃতি প্রশ্ন তিরোহিত করা হইয়াছিল। ফলে ব্রেটন উড্‌সের আর্থিক বৈঠক আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতির ত্বরিত উদ্ধার সম্পর্কে তথাকথিত ভারতের প্রতিনিধি-মণ্ডলীর প্রস্তাব প্রতিকূলাচারীদের সংখ্যাধিক্যে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভারতের এই কঠিন সমস্যায় প্রচুর মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, প্রবল পরাক্রান্ত প্রতাপশালী প্রতিনিধিবর্গ ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধ-ঘটিত পরিশোধনীয় ঋণের পরিমাণ এরূপ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে যে, এই বিপুল এবং এখনও ক্রম-বর্দ্ধমান অর্থসমষ্টির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইলে, প্রস্তাবিত সমগ্র অর্থ-ভাণ্ডারের সংস্থান সমূলে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। ভাণ্ডারের প্রতি এইরূপ গুরুভার অর্পিত হইলে ভাণ্ডার স্থাপনের উদ্দেশ্য ভাণ্ডারের সূচনাতেই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাঁহারা আশ্বাস দিয়াছেন যে, ভারতের প্রধান প্রতিনিধি স্যার জেরেমি রেইস্‌ম্যানের নেতৃত্বাধীনে এই ষ্টার্লিং-সংস্থিতির সমস্যা সংশ্লিষ্ট-দেশের সহিত দ্বি-পক্ষীয় (Bi-lateral) বন্দোবস্তের দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে। সুতরাং ভারতের আশঙ্কা অমূলক নহে। ভারতের এই দারুণ কষ্টার্জ্জিত অর্থের উদ্ধার ভারতের ঈপ্সিত অনুকূল উপায়ে হওয়া সম্ভবপর নহে। ভারতের পক্ষে যাহা অনুকূল—বৃটেনের পক্ষে তাহা প্রতিকূল।

আমাদের বর্ত্তমান অস্থায়ী অর্থ-সচিবের যে ব্যাখ্যার সূত্র ধরিয়া ভারতের তথাকথিত প্রতিনিধিগণ ব্রেটন্ উড্‌সের বৈঠকে এই সমীচীন প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া মিঃ মর্গেনথোর বিশেষজ্ঞ সহযোগী মিঃ হোয়াইট বলিয়াছেন যে, যে-কোন দেশ তাহার ভাণ্ডারে প্রদত্ত মূলধনের শতকরা ২৫ অংশ পরিমাণে ভিন্ন-দেশীয় প্রচলিত-মুদ্রা পাইতে পারিবে বটে; কিন্তু ইহা তাহার ন্যায্য অধিকার-সূত্রে নহে,—ভাণ্ডারের মূল উদ্দেশ্যের অনুকূল সমীচীন প্রয়োজনে! প্রচলিত মুদ্রার দ্বৈধ-বাণিজ্যের (Speculation in Currency) উদ্দেশ্যে কখনই কোন সদস্য-দেশকে ভিন্ন-দেশীয় প্রচলিত-মুদ্রার সুবিধা দেওয়া হইবে না। কোন দেশের প্রচলিত-মুদ্রার মূল্যহ্রাস (Depreciation) ঘটিলে, এবং বৈধ রপ্তানী-বাণিজ্যের সাহায্যে অভীপ্সিত কোন দেশের প্রচলিত-মুদ্রার সহিত বিনিময়-সুবিধা বিনষ্ট হইলে, অবশ্য তাহাকে নির্দ্ধারিত সীমায় ঋণ-গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হইবে। ফশলের হানি কিংবা অন্য কোন আকস্মিক অর্থ-নৈতিক বিপত্তি ঘটিলে যে-কোন দেশকে নির্দ্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণেও বৈদেশিক প্রচলিত মুদ্রার সহিত বিনিময়ের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে। আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতি আমাদের শেষ সম্বল। এই সম্বলের সমীচীন ত্বরিত উদ্ধারের সুযোগ হইতে বিচ্যুত, অথবা বঞ্চিত হইলে আমাদের যে নিদারুণ অর্থনৈতিক বিপত্তি ঘটিবে, তাহার তুলনা বিরল। কিন্তু ব্রেটন উড্‌সের বৈঠকে প্রধান পাণ্ডাদিগকে এ কথা বুঝাইবার উপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য ও সাহস-সম্পন্ন প্রতিনিধিত্রয় এই ষ্টার্লিং-সংস্থিতি যে আমাদের ভবিষ্যৎ সংগঠন-সমুন্নয়নের একমাত্র অবলম্বন, ইহা বিশদ-রূপে বিবৃত করিয়াও বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রাপ্রকরণে ইহার আংশিক পরিবর্ত্তনও সমর্থিত করিতে পারেন নাই। ভাণ্ডারের পক্ষে সে দায়িত্ব গ্রহণ অসম্ভব। এখন এই অর্থই আমাদের অনর্থের মূল।

যুদ্ধের কয়েক বৎসর যুদ্ধোপকরণ যোগাইয়া ভারতবর্ষ যে প্রভূত ষ্টার্লিং-সংস্থিতির অধিকারী হইয়াছে, তাহা লইয়াই এই বিষম অনর্থের সূত্রপাত ঘটিয়াছে। এই ক্রম-বর্দ্ধমান ষ্টার্লিং-সংস্থিতির যুদ্ধোত্তর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা বহু প্রবন্ধে আমাদের আন্তরিক আশঙ্কার কথা নিবেদন করিয়াছি। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে ভারতবর্ষ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি মিত্রশক্তিকে প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করিতেছে। ভারত সরকার ভারতবর্ষ হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া মিত্রশক্তির যুদ্ধ-প্রয়োজন মিটাইতেছে। বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য ভারত সরকার কাগজের নোট ছাপাইয়া চুকাইয়া দিতেছে। মিত্র-শক্তি যুক্তরাজ্যের মারফতে এই সকল দ্রব্যের যে মূল্য দিতেছে, তাহা ষ্টার্লিং নামক বৃটিশ মুদ্রায় লণ্ডনে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা পড়িতেছে। ভারতের রৌপ্যমুদ্রা বৃটিশ ষ্টার্লিং-এর সহিত বিনিময়-সূত্রে দৃঢ়বদ্ধ। সুতরাং আমাদের দেশে প্রচলিত কাগজের মুদ্রার পশ্চাতে পৃষ্ঠশক্তি বহুল পরিমাণে এই ষ্টার্লিং-সংস্থিতি। যুদ্ধ-পূর্ব্বে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ এই সংস্থিতির সমষ্টি ছিল সাড়ে ৫৫ মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় দেড় শত কোটি টাকা। বর্ত্তমান ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসের শেষে এই সংস্থিতির পরিমাণ হইয়াছিল, ৭৪৫ মিলিয়ন পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। ইতি-মধ্যে এই সংস্থিতি হইতে ৩৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড (৪৬৬ কোটি টাকা) পরিমিত ভারতের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধিত হইয়াছে। গত মে মাসের শেষে ভারতের বৈদেশিক ঋণের অবশিষ্ট ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটি টাকা।

ভারতের নিজস্ব সংরক্ষণ প্রয়োজনে এবং মিত্রশক্তিকে প্রদত্ত যুদ্ধোপকরণের মূল্য প্রদান করিবার নিমিত্ত আমাদের প্রচলিত-মুদ্রা-সমষ্টিকে বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে হইয়াছে। ধাতুর অপ্রাচুর্য্যে কাগজই আমাদের একমাত্র সম্বল। সুতরাং ধাতব মুদ্রার পরিবর্ত্তে কাগজের নোট-রূপ ভাক্ত মুদ্রা (Token coin) এখন আমাদের প্রধান অবলম্বন। যুদ্ধ-পূর্ব্বে কারেন্সি নোটের সমষ্টি ছিল ২১৬ কোটি টাকা; গত জুন মাসের শেষে এই সমষ্টির পরিমাণ হইয়াছিল ৯৪৩ কোটি টাকা! প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে, জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় আহার্য্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর পরিমাণ তেমনি দ্রুত হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধ-প্রয়োজনে যুদ্ধোপকরণ-প্রস্তুত-শিল্পের দ্রুত প্রসারণ হেতু সাধারণ জন-মণ্ডলীর প্রয়োজনীয় অসামরিক দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন ক্রমে হ্রাস পাইয়াছে। ফলে ক্ষীয়মাণ স্বল্প-পরিমিত অসামরিক অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর উপর অপরিমিত ক্রম-বর্দ্ধমান প্রচলিত-মুদ্রার চাপে দ্রব্য-মূল্য অসম্ভব ও অসঙ্গত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অযথা মুদ্রা-বৃদ্ধির ফলে অবশ্যম্ভাব্য দ্রব্য-মূল্য-বৃদ্ধি হেতু দীন-দরিদ্রের মুখের গ্রাস উচ্চ মূল্যে ধনীর কবলিত হইয়াছে। বিবিধ যুদ্ধ-কারবারে লিপ্ত কতিপয় ধনীর ধন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সহিত অসংখ্য দীন-দরিদ্র ও বাঁধা-বেতন-ভোগী ব্যক্তিবর্গ অর্দ্ধাহারে—অনাহারে বিত্তহীন, অন্নহীন ও গৃহহীন

হইয়া পরিশেষে অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অযথা মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতির ইহাই অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য পরিণাম।

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই যুদ্ধের প্রারম্ভে সরকারের অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী অনর্থের আশঙ্কা করিয়া নির্ব্বন্ধাতিশয়-সহকারে সরকারকে এই সাংঘাতিক বিধি-বিরুদ্ধ অযথা মুদ্রাস্ফীতি-নীতি বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু সরকার কোন গূঢ়-অভিসন্ধি-সম্পন্ন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। মিত্র-শক্তি যদি স্বর্ণের বিনিময়ে সরাসরি ভারতীয় যুদ্ধোপকরণের মূল্য প্রদান করিতেন, কিংবা বৃটিশ সরকার যদি এ দেশে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ বৈদেশিক কাজ-কারবার এবং সম্পদ-সম্পত্তির বিনিময়ে যুদ্ধোপকরণের ঋণ পরিশোধ করিতেন, তাহা হইলে অযথা মুদ্রাস্ফীতির প্রয়োজন হইত না, এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী কুফল, দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি হেতু নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমিকে শ্মশানে পরিণত করিত না!

যাহা হউক, ভারতের এই ক্রম-বর্দ্ধমান ষ্টার্লিং-সংস্থিতি সম্বন্ধে সচকিত হইয়া বিলাতের অসূয়া-পরবশ ও কূটনীতিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ্ ব্যক্তিবর্গ এবং অর্থনীতি-সম্পর্কীয় সংবাদপত্রগুলি বৃটিশ সরকারকে কূটকৌশলে এই ন্যায্য ঋণকে অন্ততঃ আংশিক ভাবে পরিহার করিবার কুপরামর্শ দিতেছেন। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে আমরা আমাদের এইরূপ সংস্থিতি, দেড় শত কোটি টাকা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বিগত মহাযুদ্ধে ভারতের দুঃখ-কষ্ট এরূপ চরমে পৌছে নাই এবং সংস্থিতির সমষ্টিও ছিল বহুল পরিমাণে কম! বর্ত্তমান যুদ্ধে কানাডা ইতিমধ্যে এইরূপ দাক্ষিণ্য দেখাইয়াছে। কিন্তু কানাডার তুলনায় ভারত অতি দরিদ্রের দেশ। পরন্তু স্বায়ত্ত-শাসনশীল কানাডা ক্ষুদ্র-বৃহৎ ও গুরু-লঘু বহু যুদ্ধ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার দ্বারা দেশকে ধন-সম্পদে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমরা যে সামান্য শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সাধন করিয়াছি, তাহা কানাডার তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর এবং তাহাতে কতিপয় ধনীর ধন বৃদ্ধি পূর্ব্বক অগণিত দীন-দরিদ্রের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে নিত্য-ক্ষয়িষ্ণু করিয়াছে। সম্প্রতি বিলাতের "ফাইন্যান্সিয়াল নিউজ", "ইকনমিষ্ট", "টাইমস্" প্রভৃতি পত্রিকা ভারতের অতি দীন-দরিদ্রের প্রতি রক্ত-বিন্দুর বিনিময়ে অর্জ্জিত এই ষ্টার্লিং-সংস্থিতির উৎপত্তির যে অপব্যাখ্যা করিতেছে তাহাতে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহাদের মতে অত্যাবশ্যক যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের মূল্য-সমষ্টি এই সংস্থিতি বৃটিশ সরকারের উদারনীতি-প্রসূত দান। কূট-অপব্যাখ্যার ইহা চরম নিদর্শন।

সকলেই জানেন, ভারতের সহিত যুদ্ধব্যয় সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের একটি বাটোয়ারা বন্দোবস্ত আছে! গত বৈশাখ মাসের "যুদ্ধ-বাজেট" প্রবন্ধে আমরা ইহার বিশ্লেষণ করিয়াছিলাম। এই আর্থিক বাটোয়ারার বিধান এই যে, ভারতের ভৌগোলিক সীমার অভ্যন্তরে ভারতের নিজস্ব সংরক্ষণ হেতু যে ব্যয় ঘটিবে, তাহা ভারতকে বহন করিতে হইবে। মোট ব্যয়ের অবশ্য একটি সর্ব্বোচ্চ সমষ্টি নির্দ্ধারিত আছে। এই শীর্ষ-সীমা নির্দ্ধারণের ভার ভারতের জঙ্গী-লাটের উপর। তিনি অবশ্য সামরিক প্রয়োজনের প্রতি দৃঢ়দৃষ্টি-সম্পন্ন। সুতরাং দুঃখ-দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ভারতের অর্থ-সামর্থ্যের প্রতি ন্যায়-সঙ্গত দৃষ্টি রাখা সম্ভবপর নহে। যুদ্ধ-জয়ই মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যয়, যেমন করিয়া হউক নির্ব্বাহ করিতে হইবে,—হইতেছেও তাহাই। আজ দুঃস্থ ভারতের দৈনিক সামরিক ব্যয় এক কোটি টাকা! বিলাতের কূট অর্থনীতিনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদ-পত্রের অভিপ্রায় এই যে, বৃটিশ সরকারের সহিত ভারত সরকারের যে আর্থিক বাটোয়ারা বন্দোবস্ত আছে, আশু তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন এবং ভারতের অংশে যুদ্ধ-ব্যয়ের পরিমাণ আরও অধিক হওয়া প্রয়োজন; কারণ, যুদ্ধ কেবলমাত্র বৃটেনের স্বার্থ-সংরক্ষণার্থ নহে, ভারতের স্বার্থ-সংরক্ষণার্থও বটে, সুতরাং দায়-দায়িত্ব তুল্য। কিন্তু বৃটেন আত্ম-স্বাধীনতা রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতেছে, আর ভারত ভারবাহী গর্দ্দভ মাত্র। পরাধীন ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার নাই; স্বৈর-শাসনাধীন দুর্ভাগ্য ভারতের আয়ত্তে মাত্র অজস্র অশ্রু ও অনশন! অর্থ ভারতের কিন্তু সে অর্থের অধিকার অন্যের আয়ত্তে এবং সে "অন্য" হইতে অধমর্ণ অভিন্ন! ইহা অপেক্ষা কৌতুককর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? বিলাতের অর্থ-সচিব বলিয়াছেন, ভারতের ষ্টার্লিং-সংস্থিতির খালাস নিষ্পত্তি সম্পর্কে অন্যান্য রাষ্ট্রের ও মধ্য-প্রাচ্যের স্বার্থ বিবেচনা করিতে হইবে। কেন? কি উদ্দেশ্যে?

আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডারে ভারতের প্রদেয় হিস্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে চারি শত মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৩৩ কোটি টাকা, তথাপি কার্য্যকরী সমিতিতে ভারতের স্থান নাই। ঐ সমিতির পাঁচ জন সদস্য যোগাইবেন—যুক্তরাষ্ট্র (২৭৫০ মিলিয়ন ডলার), যুক্তরাজ্য (১৩০০ মিলিয়ম ডলার), সোভিয়েট রাশিয়া (১৩০০ মিলিয়ন ডলার), মহাচীন (৫৫০ মিলিয়ন ডলার) এবং ফরাসী (৪৫০ মিলিয়ন ডলার)। হিস্যার পরিমাণে ফরাসীর পরেই ভারত (৪০০ মিলিয়ন ডলার) এবং তাহার পরে কানাডা (৩০০ মিলিয়ন ডলার)। সুতরাং হিস্যার গুরুত্বে ও প্রতিনিধিত্বের মর্য্যাদাতেও ভারতের ভাগ্যে ব্যর্থতা বিহিত হইয়াছে। অর্থের পরিমাণ যেমন গুরু, মর্য্যাদার পরিমাণ তেমনি লঘু। ভারত পরাধীন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝড়

মৃত্যুর বিবর্ণতা লেগেছে শীর্ণ দিনে
　　জীবনের পাতায় পাতায়—
কে এনেছো বজ্র-বাণী জাগাতে ধরিত্রীরে
　　আলোকিত অপূর্ব্ব উষায়?

পৃথিবীর যত কিছু ক্লিন্ন ব্যর্থ কোলাহল
　　মুহূর্ত্তের তরে করো লীন।
তব নব ইন্দ্রজাল প্রকাশিত করো আজ
　　করো ধরা মালিন্য-বিহীন।

শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস

কর ও করাঙ্গুলি

সুগঠিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহ জগতে দুর্লভ। সে জন্য সকল দেশের কবি-শিল্পীরা নানা জনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অতিসূক্ষ্ম পার্থক্য দেখিয়া তাহারি মধ্য হইতে বাছিয়া সুন্দর সুঠাম দেহের একটি আদর্শ আঁকিয়া শিল্পে ও কাব্য-কলায় সেই আদর্শ মূর্ত্তির ব্যঞ্জনা করিয়াছেন। আদর্শ মূর্ত্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ডৌল তাঁরা লতা-পাতা-ফুল প্রভৃতির অনুরূপ বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সে বর্ণনার অর্থ সংগ্রহ করিলে দেখিব, সে আদর্শে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়িয়া তোলা অসম্ভব নয়! সুন্দর ভ্রূযুগকে তাঁরা বলিয়াছেন ধনুকাকৃতি; অধরম্ বিম্বফলম্; চিবুকম্ আম্রবীজম্; কণ্ঠ শঙ্খ-সমায়ুতম্; বাহু করিকরাকৃতি; প্রকোষ্ঠ অর্থাৎ কনুই হইতে করতলের গোড়া পর্য্যন্ত "বালকদলীকাণ্ডং" অর্থাৎ তেমনি নিটোল, সুগঠিত ও সুদৃঢ়; এবং অঙ্গুলি চাঁপার কলি!

মেয়েরা অনায়াসে শিল্পাচার্য্যদের আদর্শ-অনুযায়ী প্রকোষ্ঠ ও করাঙ্গুলি গড়িয়া তুলিতে পারেন। সে জন্য চাই বিশেষ ব্যায়াম-বিধি। আজ আমরা সেই ব্যায়াম-বিধির কথা বলিব।

১। প্রথমে দুই করতল মুক্ত এবং করাঙ্গুলিগুলিকে বেশ সবলে এবং যতখানি সম্ভব প্রসারিত করুন—১নং ছবির ভঙ্গীতে। তার পর দুই করতল করুন মুষ্টিবদ্ধ। এমনি ভাবে অঙ্গুলি-প্রসারণ ও পরক্ষণে করতল মুষ্টিগত করিবেন প্রায় তিন মিনিট ধরিয়া।

২। এবার দুই করতল প্রসারিত রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির ডগা দিয়া প্রত্যেকটি অঙ্গুলির ডগা বেশ ক্ষিপ্র ভাবে ২নং ছবির বা জপের ভঙ্গীতে স্পর্শ করুন। এ ব্যায়াম করিতে হইবে তিন মিনিট।

৩। এবার দুই হাতের প্রত্যেকটি অঙ্গুলি ৩নং ছবির ভঙ্গীতে মুড়িবেন—একটি অঙ্গুলি মুড়িবার সময় অপর অঙ্গুলিগুলিকে যথাসম্ভব সুদৃঢ় রাখিতে হইবে। এ ব্যায়ামও করা চাই তিন মিনিট।

৪। এবার ৪ং ছবির ভঙ্গীতে কব্জীর কাছে মুড়িয়া দুই করতল সাপের ফণার আকারে সামনে-পিছনে ঘন-ঘন দুলাইবেন প্রায় তিন মিনিট।; তার পর কব্জীকে সুদৃঢ় রাখিয়া দুই করতল বক্রাকারে দু'-তিন মিনিট ঘুরাইবেন।

৫। দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিন; দিয়া দুই করতল মুষ্টিবদ্ধ করুন ৫নং ছবির ভঙ্গীতে। তার পর কনুই হইতে দুই হাত মুড়িয়া দুই করাঙ্গুলি ঠিক ৬নং ছবির ভঙ্গীতে দুই কাঁধের উপর রাখুন। তার পর দুই করতল আবার মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ৫নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত প্রসারিত করুন! পর্য্যায়ক্রমে মুষ্টিবদ্ধ হস্ত-প্রসারণ এবং পরক্ষণে ৬নং ছবির ভঙ্গীতে মুঠা করিয়া দুই হাত আবার স্কন্ধে স্থাপন করা চাই প্রায় পাঁচ মিনিট-কাল।

৬। এবারে সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিন ৭নং ছবির ভঙ্গীতে। তার পর কনুই হইতে করতল একবার সামনে পরক্ষণে পিছন দিকে ফিরান বেশ দ্রুত তালে। কনুই হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত বাহু থাকিবে সুদৃঢ়। এ ব্যায়াম তিন-চার মিনিট করিবেন।

৭। এবার সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া দুই হাত ৮নং ছবির ভঙ্গীতে অর্থাৎ সাঁতার কাটিবার প্রণালীতে নাড়িতে হইবে প্রায় পাঁচ মিনিট। ডান হাত যখন উর্দ্ধে তুলিবেন, বাঁ হাত থাকিবে নীচের দিকে; বাঁ হা· উর্দ্ধে তুলিবার সময় ডান হাত নীচু করিতে হইবে—দেহ টলিবে না, নড়িবে না। দুই হাত জোরে জোরে চালাইবেন যেন জল কাটিয়া সাঁতার দিতেছেন, এমনি ধরণে। এ ব্যায়াম পাঁচ মিনিট করা চাই।

১। দুই করতল মুক্ত

২। জপের ভঙ্গীতে

নিত্য নিয়মিত ভাবে এ ব্যায়াম করিলে হাত ও আঙুলের গড়ন হইবে শিল্পাচার্য্যদের আদর্শ-মাফিক অর্থাৎ প্রকোষ্ঠ বালকদলী-কাণ্ডবৎ এবং আঙুল চম্পক-কলি!

এ সব ব্যায়াম খুবই সহজ এবং সরল; অনায়াসে করা চলে। আমাদের ঘরের মেয়েরা জপ-তপ করিয়া আসিতেছিলেন; এখন বহু পরিবারে সে "কুসংস্কার" বিদূরিত হইয়াছে—জপের আধ্যাত্মিকতা না

৬। দুই হাত কাঁধে

৫। দুই বাহু প্রসারিত

৭। করতল সামনে-পিছনে

৮। সাঁতার কাটার প্রণালীতে

৩। একটি আঙুল মুড়িবেন

৪। কব্জীর কাছে মুড়িয়া

মানুন, ব্যায়ামের খাতিরে জপ মানিলে ক্ষতি কি!

মায়ের মন

সে দিন এক জন বান্ধবী দুঃখ করছিলেন। তাঁর দু'টি ছেলে, একটি মেয়ে। মেয়ে আর বড় ছেলের বিবাহ হয়ে গেছে; ছোট ছেলেটির বিবাহ আসন্ন অর্থাৎ এই শ্রাবণ মাসে হবে। ছোট ছেলে তার নিজের পাত্রী নিজেই পছন্দ করেছে, মা তাতে সায় দেছেন।

বান্ধবী বলছিলেন, বড় ছেলেটি বিদেশে বাস করছে বৌ নিয়ে চাকরি-উপলক্ষে। কালে-ভদ্রে মায়ের কাছে আসে। বিয়ের পরে মেয়ে পর হয়ে পরের ঘরে বাস করছে—তার নিজের সত্তা মিশিয়ে দেছে শ্বশুর-ঘরের সত্তায়! ছোট ছেলের বিয়ে হচ্ছে—এতে মায়ের মনে আনন্দ নয়, দুঃখ জাগছে। মনে হয়—কষ্ট সয়ে মানুষ করে বড় ছেলেটিকে এবং মেয়েকে তিনি হারিয়েছেন; এবার ছোট-ছেলের বিয়ে। তার বিয়ের পরে তাকে হারিয়ে কি করে বাঁচবেন!

ছেলে-মেয়ের বিবাহ মায়ের খুব কাম্য—তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিবাহের উপর মায়ের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে অনেকখানি। কি-স্নেহে নিজেকে কি-ভাবে বঞ্চিত করে, নিজের সত্তা কি-ভাবে বিসর্জ্জন দিয়ে মা ছেলে-মেয়েদের মানুষ করেন, সে কাহিনী কারো অবিদিত নয়! তার পর বিবাহ হলে দেখা যায়, ছেলে হয় স্ত্রীর বশ বা মুখাপেক্ষী, মেয়ে হয় সম্পূর্ণ পরাধীন। মেয়ে মাকে দেখতে আসবে, তাতেও তাকে পরের অনুমতি নিতে হয়! কাজেই মায়ের মনে ব্যথা-বেদনার মাত্রা ভারী হয়ে ওঠে!

এ ব্যবস্থা বা বিধি অমোঘ বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মায়ের এ ব্যথা-বেদনা প্রশমিত হতে পারে শুধু একটি উপায়ে! যে-মন নিয়ে যে-ভাবে নিজেকে ছেঁটে ফেলে তিনি ছেলে-মেয়েদের মানুষ করেন, সেই মনোভাব ছেলেমেয়ের বিবাহের পরে তাঁর ত্যাগ করা চলবে না। ছেলেমেয়েকে বড় করবার সময় তাদের সুখের উপর যেমন মায়ের লক্ষ্য থাকে—ছেলেমেয়ের সুখে তাঁর সুখ,—বিবাহের পরেও

ছেলে-মেয়ের সুখে তাঁকে সুখী হতে হবে! তাদের বিবাহের আগে যেমন তাদের কাছে তিনি কোনো-কিছুর প্রত্যাশা রাখতেন না, বিবাহের পরেও তেমনি তাদের কাছ থেকে কোনো-কিছুর প্রত্যাশা যেন না রাখেন।

মায়ের ভালোবাসার মত নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পৃথিবীতে আর নেই! ছেলেমেয়ের অসুখে মা যেমন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে শত কষ্ট সয়ে ছেলেমেয়ের সেবা করেন, এমন সেবা মানুষ আর কাকেও করতে পারে না। ছেলেমেয়েকে নিয়েই মায়ের সব সুখ, সব আনন্দ। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাতেই মা তাঁর নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিশিয়ে দেন। তাদের বিবাহের পরেও যদি মায়ের মনে এমনি ভাব বজায় থাকে, মা যদি ছেলে-বৌয়ের বা মেয়ে-জামাইয়ের সুখকে বড় করে দেখেন, তাহলে তাদের কোনো আচরণে মায়ের মনে ব্যথা অশান্তি জাগবে না! ছেলেমেয়ের বিবাহ হলে তাদের উপর মায়ের স্নেহ কমে না বা চলে যায় না। মাকে তারাও আগে যেমন ভালোবাসতো, তেমনি ভালবাসবে—যদি তারা দেখে, মায়ের স্নেহ তাদের সুখে এতটুকু বিঘ্ন সৃষ্টি করছে না—মায়ের স্নেহে অত্যাচারের বিন্দু-বাষ্প প্রকাশ পাচ্ছে না! মায়ের মনে রাখা উচিত, ডাগর হলে ছেলেমেয়েকে আঁচল চাপা দিয়ে রাখা চলে না! তাদের নিজেদের চিন্তা-শক্তি আছে, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অরুচি আছে—মায়ের রুচি মেনে চিরদিন চলতে পারে না। এ কথা মনে রেখে যে-মা সন্তানের সুখ-দুঃখে চিরকাল নিজের সুখ-দুঃখ মেশাতে পারেন, তাঁর আসন কোনো বৌ এসে টলাতে পারে না। বৌকে মা দেখবেন ছেলের অংশ! ছেলে এখন তাঁর কাছে ছেলে-বৌয়ের যুগল-মূর্ত্তিতে দেখা দেছে! মা যদি ছেলে-বৌয়ের স্বার্থে নিজের স্বার্থ না মিশিয়ে রাখতে পারেন তো সে মায়ের দোষ! তিনিও স্বামীকে যে ভাবে পেতে চেয়েছিলেন, যে ভাবে পেয়েছিলেন, তাঁর পুত্রবধূও যদি সেই ভাবে তাঁর ছেলেকে পেতে চায়, তাহলে বধূর দোষ হবে কেন? এই সহজ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে মায়ের মনে ক্ষোভ-সঞ্চারের কোনো কারণ থাকতে পারে না।

ছোটদের আসর

বর্ষায়

বড্ড বর্ষা নেমেছে। ও দিকে ফুটবলের ম্যাচ। মাঠে যেমন জল, তেমনি কাদা! তোমাদের ভারী রাগ হচ্ছে—না? আমরাও রেগে খুন—অফিস আছে, কাছারি আছে, এই বর্ষায় যাতায়াতে কম কষ্ট!

অথচ দু'মাস আগে এই বর্ষার জন্যই আমাদের মিনতি-প্রার্থনার অন্ত ছিল না! গ্রীষ্মের তপ্ত রোদে ঘেমে সারা হতুম,—পথ চলতে নাক-মুখ বুঁজে উঠতো আগুনের হল্কায়—কলকাতার পীচ-ঢালা পথ যেন আগুনের খাপরা—দারুণ রাগ ধরতো। আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টিধারাকে কাতর হয়ে ডাকতুম—নামো, বৃষ্টি নামো!

আর এখন সে বৃষ্টি যেমন নামলো, অমনি তার উপরে আমরা খাপ্পা!

এ-রাগ বা এ-অসন্তোষ কি মিথ্যা নয়? রাগ করে বা অসন্তোষ প্রকাশ করে আমরা ঋতু-চক্রটিকে নিজেদের খেয়াল-খুশীমত ঘুরোতে পারবো না তো! রাত্রে যখন শুতে যাবো—বাইরে বেরুবার প্রয়োজন থাকবে না, তখন চাইবো বৃষ্টি—আর মাঠে যে দিন ম্যাচ সে দিন চাইবো খট্‌খটে রোদ—তা কখনো হয়!

অর্ডার দিয়ে যখন রৌদ্র-বৃষ্টি আনা বা বন্ধ করা সম্ভব নয়—গ্রীষ্মবর্ষা-শীতের রূপ বদলানো যখন আমাদের সাধ্যাতীত, তখন তা নিয়ে মেজাজ খারাপ করা—অর্থাৎ রাগ করা বা অপ্রসন্ন ভাবে গুম্ হয়ে থাকা—নির্বুদ্ধিতা বৈ আর কিছু নয়! মন এতে তিক্ত-বিরক্ত হলে না পারবো কাজ করতে, না পাবো আমোদ! অতএব—

মনকে এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যে রোদ-বৃষ্টি যাই হোক, তাতে বিচলিত হবো না। আমাদের দেহ মাখনের তৈরী নয় যে রোদ লাগলে গলে যাবে—চিনির তৈরী নয় যে বৃষ্টিতে ধুয়ে মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন হবে! আসুক বৃষ্টি, হোক রোদ—আমরা আমাদের সঙ্কল্পিত কাজ বা আমোদ করে যাবো।

আজ বৃষ্টির প্রাচুর্য্যে একবার ভাবো দিকিনি—দু'মাস আগেকার সেই তপ্ত রৌদ্রের কথা! পথ চলতে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত জ্বালা করতো—কাজ করতে ঘেমে নেয়ে উঠতে হতো!

বৃষ্টি যখন পড়ে, পথ চলতে কষ্ট হয়, সত্যি! কিন্তু তার পরই বৃষ্টির জলে ধূলা ধুয়ে গাছপালায় কি সবুজ শ্রী ফোটে, চোখ তাতে জুড়িয়ে যায়! বৃষ্টির পর যে ঠাণ্ডা বাতাস—সে-বাতাসে কতখানি আরাম পাই! পথে জল দাঁড়িয়েছে—বেরুতে পারছো না? বেশ, ঘরে বসে দু'খানা ভালো বই পড়ো—কিছু লেখো! আনন্দ পাবে! কাজের জন্য বেরুতেই যদি হয়, বেরোও। একটু ভিজলে অসুখ হয় যদি তো স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তোমার ঔদাসীন্য কতখানি, বোঝো—বুঝে স্বাস্থ্যকে গড়ে তোলো। পৃথিবীতে থাকতে হবে যখন, তখন পৃথিবীর এই রৌদ্রে-মেঘে বাঁচবার যোগ্য করে' দেহকে গড়ে তোলো—বৃষ্টি বা রোদ এড়িয়ে বাঁচা সম্ভব হবে না তো!

সে দিন গিয়েছিলুম সুদূর এক গ্রামে। ফেরবার মুখে নামলো আকাশ কাঁপিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি। পথে এক গাছতলায় দাঁড়ালুম—আশ্রয়ের জন্য। একটু পরে গ্রামের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে সেই গাছতলায় আশ্রয় নিলেন। বৃষ্টি চললো ঝাড়া প্রায় একটি ঘণ্টা—প্রচণ্ড বেগে। বৃদ্ধ গল্প সুরু করলেন—তাঁর দীর্ঘ জীবনে যা-কিছু দেখেছেন—সেই সব কাহিনী! একটি ঘণ্টা কোথা দিয়ে যে কাটলো! বৃদ্ধের মুখে বাঙ্‌লা দেশের কত বছরের ইতিহাসের যে আদরা পেলুম,—ভাঙ্গা-গড়ার ছোট-বড় কত কাহিনী—খুবই উপভোগ্য লেগেছিল।

ভিজে, কাদা মেখে বাড়ী ফিরতে রাত হয়েছিল বেশ—তবু বৃষ্টির সময় পথে গাছতলায় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের মুখে গল্প শুনে যে-আনন্দ পেয়েছিলুম, সে-আনন্দের তুলনায় কষ্টকে কষ্ট বলে মনে হয়নি। তাই তোমাদের বলতে চাই, বৃষ্টি হোক, রোদ হোক—তাতে ভড়কে যেয়ো না। চড়া রোদ বা অঝোর বৃষ্টি যেন তোমাদের মনকে গোলাম বানিয়ে না ফেলে, সে দিকে লক্ষ্য রেখো! তাহলে তোমাদের আনন্দ কোনো দিন ম্লান বা খাটো হবে না!

মানুষ শক্তিধর

কবিরা যে বলেন, মানুষের শক্তি দুর্জ্জয়,—মনে করিলে মানুষ সকল অসাধ্য সাধন করিতে পারে, সে কথা এতটুকু অত্যুক্তি নয়! দেহ-

লোহার কড়িতে রঙ দেওয়া

মনের অদম্য শক্তিতে মানুষ বিজ্ঞান-জগতে কি অসাধ্য না সাধন করিতেছে! জ্ঞান ও বুদ্ধির সঙ্গে দেহ-মনের শক্তির অপূর্ব্ব সংযোগে ইহা সম্ভব হইয়াছে।

রূপকথা গল্পে পড়ি, মানুষ দেহ-মনের শক্তিতে দৈত্য-দানব-রাক্ষসকে মারিয়া বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করিয়াছিল, মানুষের শক্তি-সাহসের আলোচনা করিলে রূপকথার সে সব গল্পকে নিছক গল্প-কথা বলিয়া মনে হইবে না!

কুমীরের মুখে

উদরান্নের জন্য কত লোকে কত দুঃসাহসের কাজ না করিতেছে! যে-লোক সার্কাসে ট্রাপেজে খেলা করে, সিংহ-ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই করে, যে-লোক চিড়িয়াখানায় সাপকে লালন করে, সুন্দর-বনে যে-সব লোক কাঠ কাটিতে যায়, মধু আনিতে যায়, তাদের বিপদের সীমা নাই। ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর—মৃত্যুরূপী এই দুই প্রবল শত্রুর সম্মুখে পড়িবার আশঙ্কা প্রতি পদে—তবু তারা যায়! দেহ-মনের শক্তির উপর নির্ভর আছে বলিয়াই তারা যায়! ফায়ার-ব্রিগেডে যারা কাজ করে, যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের মুখে যারা ছোটে, যে-সব বৈমানিক প্যারাশুট-যোগে ভূতলাবতীর্ণ হয়, তাদের সাহসের কথা মনে হইলে আমরা শিহরিয়া উঠি!

আমাদের মধ্যে এমন লোক আছে বাজি পুড়িতে দেখিলে যাদের মাথা ঘোরে। আবার এমন লোকেরও অভাব নাই, কাহারো ঘরে আগুন লাগিলে জলের কলসী লইয়া সে আগুন নিবাইতে ছুটিয়া জলন্ত চালার মাথায় গিয়া ওঠেন! এ-সব লোকের মনের বল অভাবনীয়!

দাঁড়ানো ঘোড়ার পিঠে মানুষ

মনের এই শক্তির নাম সাহস! সাহস মানুষকে লাভ করিতে হয়—স্বাধ-নায়। যার সাহস আছে, পৃথিবীতে তার বিজয় লাভ সম্বন্ধে সংশয় থাকিতে পারে না।

মানুষের বিচিত্র এবং অপরূপ সাহসের ক'টি সত্য কাহিনী আজ তোমাদের বলি।

সার্কাসের অঙ্গনে মোটর-বাইক চালাইয়া আর-একখানা মোটর-বাইককে টপকাইয়া যাওয়া—লুপিং দি লুপের খেলা, ঘোড়ার পিঠে সওয়ারের নানা রকম
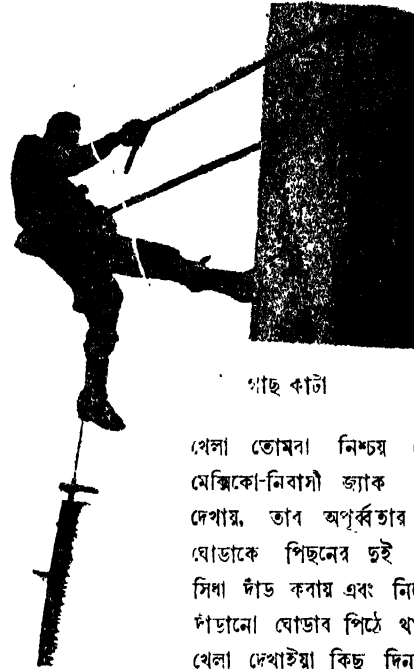
গাছ কাটা

খেলা তোমরা নিশ্চয় দেখিয়াছ। কিন্তু মেক্সিকো-নিবাসী জ্যাক যে ঘোড়ার খেলা দেখায়, তার অপূর্ব্বতার সীমা নাই। ঘোড়াকে পিছনের দুই পায়ে সে খাড়া সিধা দাঁড় করায় এবং নিজে সেই খাড়া-দাঁড়ানো ঘোড়ার পিঠে থাকে লম্বমান—এ খেলা দেখাইয়া কিছু দিন পূর্ব্বে সে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল।

পাঁচ-সাত তলা উঁচু বাড়ীর লোহার বীমে রঙ দিবার জন্য প্রথম ছবিতে ছাখো—এক জন জাপানী রঙ-মিস্ত্রীর কশরতি। কাঠ-বিড়ালীর মত বীমখানিকে জড়াইয়া ধরিয়া বীমের গায়ে রঙ দিতেছে—হাত-পায়ের বাঁধন একটু আলগা হইলেই কোথায় গিয়া পড়িবে—দেহের হাড়-পাঁজরা গুঁড়াইয়া ধূলা হইয়া যাইবে! তার পর

ভাখো আমেরিকায় দু'শো ফুট উঁচু এক গাছের মাথা কাটিবার জন্য সাহসী বীর পায়ে কাস্তে বাঁধিয়া দড়ির সাহায্যে কি-ভাবে গাছে উঠিতেছে! কাটা হইলে গাছের মাথা যখন নীচে পড়িবে, তখন? সে-কথা মনে হইলে গায়ে কাঁটা দেয়।

সার্কাশে বাঘের মুখের মধ্যে অনেক খেলোয়াড় মাথা ঢুকাইয়া দেন—কিন্তু কুমীরের মুখের মধ্যে মাথা প্রবেশ করানোর কথা শুনিয়াছ?

ছাদের কার্ণিসে সাইকল্ চালানো

এল্ গোয়ানি নামে এক জন মার্কিণ খেলোয়াড় এ খেলা দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। লশ-এঞ্জেলশে এক ভদ্রলোক বাস করেন—তাঁর নাম বাডি মেশন। ইনি বাইসিকল্ চালনায় এমন ওস্তাদ যে, উঁচু বাড়ীর কার্ণিসে অকুতোভয়ে সাইকল্ চালান।

অভ্যাসে সব কাজ রপ্ত হয়, জানি। কিন্তু এ-সব অভ্যাস রপ্ত করিতে কতখানি সাহসের প্রয়োজন, বলো তো!

তোমাদের মধ্যে যারা ভূতের ভয়ে, জুজুর ভয়ে, গাড়ীঘোড়ার ভয়ে ঘরের কোণে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকো, এ-সাহসের কথা শুনিয়া তাদের লজ্জা হয় না? জ্ঞানীরা বলিয়া গিয়াছেন—এক জন মানুষ যে কাজ করিয়াছে, সে-কাজ সকলেই করিতে পারে। তুমি-আমিও পারি। তবে সে জন্ম চাই চেষ্টা, চাই সাহস।

বিবাহ-পর্ব্ব

কলকাতায় এসে সলিল সেন আর গগন গুপ্ত থিয়েটার রোডে এক বিরাট বাড়ী ভাড়া করে বাস করছে। আজ পার্টি, কাল ডিনার, পরশু লাঞ্চ। দেখতে দেখতে সলিল সেন আধুনিকতম সোসাইটার এক জন কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে পড়লো। কেনই বা হবে না? সলিল দেখতে স্মার্ট, পয়সা আছে, আদব-কায়দা জানে। গগনের গুণাবলী চিরকালই গুপ্ত। হৈ-চৈ তার ধাতে বড় সয় না। সলিলের এই রকম মেলামেশা আর দু'হাতে পয়সা খরচ করা সে ভয়ানক অপছন্দ করে। এক দিন কথায় কথায় বলে ফেললে—"কলসীর জল গড়াতে গড়াতে ফুরিয়ে যায়।" খোঁচাটা বুঝতে পেরে সলিল হেসে বললে—"তা যায়, যদি আবার জল ভরবার ব্যবস্থা না থাকে। কিন্তু জানো তো বন্ধু, জলে জল বাঁধে। লোকে তেলা-মাথাতেই তেল দেয়।" গগন গম্ভীর প্রকৃতির লোক। সলিলের হাসি কোন দিনই বরদাস্ত করতে পারে না, চটে গিয়ে বললে—"শুধু মুখে বললেই তো হয় না, চেষ্টা দেখতে হয়।" সলিল হেসে উত্তর দিলে—"শুকনো মাটীতে ফসল হয় না, সেচের প্রয়োজন হয়। এখন সেচ-পর্ব্ব চলছে। তার পর যেই বীজ বুনবো—" কথাটা সে শেষ করলে না। হো-হো করে হেসে উঠলো। গগন রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্যামাক ষ্ট্রীটে কাঞ্চনপুরের মহারাজার প্রাসাদোপম অট্টালিকা। মহারাজ শিবসুন্দর বিপত্নীক। সবিতা তাঁর একমাত্র কন্যা। অন্য সন্তানাদি আর হয়নি। সবিতা সুন্দরী, বিদুষী, পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী। মহারাজার ইচ্ছা, রজতগড়ের রাজপুত্র পদ্মনাভের সঙ্গে সবিতার বিবাহ হয়। বছর দু'য়েক আগে তিনি কথাবার্ত্তাও কইতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সবিতার আপত্তির জন্য হয়ে ওঠেনি। বাপেতে-মেয়েতে এই নিয়ে একটু মন-কষাকষিও হয়েছিল। মেয়ে বলে—"থাক্ পয়সা, পদ্মনাভ দেখতে কালো।" বাপ বলেন—"হোক্ কালো, অগাধ পয়সা।" দু'জনেই নিজ নিজ পয়েন্ট ধরে বসে রইলেন! অগত্যা কথা আর অগ্রসর হলো না।

সলিলের সঙ্গে মহারাজার আলাপ বেশ জমে উঠলো। সলিলকে মহারাজার খুব পছন্দ হলো। মহারাজার ম্যানিয়া, তাঁর শরীর খারাপ। নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা বলতে তিনি ব্যাকুল, কিন্তু শ্রোতার অভাব। অনেক দিন পরে তিনি মনের মত শ্রোতা পেলেন—সলিল সেন! সুতরাং মহারাজার বাড়ীতে সলিলের নিমন্ত্রণ হতে লাগলো প্রায়ই। কথায় কথায় পদ্মনাভের সঙ্গে সবিতার বিবাহের খবরও তার কর্ণগোচর হলো। সলিল মহারাজের কথায় সায় দিয়ে বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বললে—"হোক কালো, অগাধ পয়সা।"

সে দিন সকালে মহারাজা চা-পান করছিলেন, সেই সময় বেয়ারা একটা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিখানি পড়ে ক্রোধে তাঁর হাত-পা কাঁপতে লাগলো। সবিতার দিকে চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন—"ভাখো"। রাগে অপমানে মুখ দিয়ে কথা বার হলো না। সবিতা পড়ে দেখলে—"কাঞ্চনপুরের মহারাজা শিবসুন্দর চৌধুরীর একমাত্র কন্যা সবিতা দেবীর সহিত মডার্ণ মুভিটোনের প্রসিদ্ধ ফিল্ম-ডিরেক্টর রজত রায়ের বিবাহের কথা শুনা যাইতেছে। খবরটা সত্য কি?"

সবিতা আধুনিক মেয়ে। একটু হেসে সে বললে—"এতে রাগের কি আছে? এ এক রকম আধুনিক ষ্টান্ট।" মহারাজা রেগে বললেন, "ষ্টান্ট! কিন্তু তোমার নাম জড়ানো কেন? আমি রজত রায়ের বিরুদ্ধে কেস্ করব। মানহানির কেস্।"

সবিতা উত্তর দিলে, "তাতে কেলেঙ্কারী আরও গড়াবে। লোক-জানাজানি হবে। খবরের কাগজে কার্টুন বেরুবে। যে পাবলিসিটি ওরা চায়, সেইটেই হয়ে যাবে। সুতরাং ওদেরই জিত হবে। আমার মতে চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলাই বেষ্ট।"

চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেললেও ব্যাপার সেইখানেই থামলো না। মহারাজা যেখানেই যান, ঐ এক কথা! "মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন!" "শেষে ফিল্ম-ডিরেক্টর।" "রজত রায় লোকটি কিন্তু ভালো নয়।" প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। ক্রমাগত 'না' 'না' বলতে বলতে গলা শুকিয়ে গেল। মেজাজ একেবারে আগুন। চাকর-বাকর তটস্থ। মেয়েকে বললেন—"তোমার জন্যই এই অপমান। পদ্মনাভকে বিয়ে করলে এ সব কিছুই হোত না। এখন বুড়ো বয়সে, ছি ছি, ভদ্রসমাজে মুখ দেখাবার উপায় নেই।" সবিতা কোন উত্তর দিল না।

ডাক পড়লো সলিল সেনের। সব শুনে সে বললে—"এক কাজ করুন। কলকাতার বাহিরে কোন ছোটখাটো সহরে গিয়ে পদ্মনাভের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিয়ে ফেলুন। বেশী হৈ-চৈ করবেন না। কিছু দিনের মধ্যে সব গোলমাল থেমে যাবে, দেখবেন।" মহারাজ প্রসন্ন হয়ে সলিল সেনের পিঠ চাপড়ে বললেন—"ঠিক বলেছো! তোমার মত বুদ্ধিমান্ ছেলে আজ-কাল দেখা যায় না।" ঠিক সেই সময় টেলিফোন্ বেজে উঠল; মহারাজ রিসিভার তুলে নিলেন। "হালো।" একটু পরেই 'ড্যাম্ ইট্' বলে দড়াম্ করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। সলিল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মহারাজের দিকে চাইল। মহারাজ বললেন—"ব্যাটার এত বড় আস্পর্দ্ধা।" সলিল জিগ্যেস্ করলে—"কার?" মহারাজ গর্জ্জে উঠলেন—"কার আবার? রজত রায়ের। বলে, আপনার কন্যাকে একবার ফোনে ডেকে দিন। তাঁর কাছ থেকে তাঁর পছন্দমত একটা লিষ্ট করিয়ে নিয়ে বিবাহের বাজার করবো। ষ্টুপিড! তাকে খুন করলেও মনের ঝাল যায় না।"

বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে সলিল বললে—"তাই তো, ব্যাপারটা দেখছি ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে। আপনি আর দেরী করবেন না। আজই এখান থেকে চলে যান! রজত রায় সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছি, তাতে মনে হয় লোকটা সুবিধের নয়। গুণ্ডা দিয়ে আপনাদের ক্ষতি করতে পারে।" মহারাজ বললেন—"সবই তো বুঝলুম, কিন্তু সবিতাকে নিয়েই হয়েছে মুস্কিল। সে পদ্মনাভকে বিয়ে করতে চায় না।" সলিল বললে—"ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝিয়ে বললে হয়তো রাজী হতে পারেন। বলবেন, এখানে থাকলে প্রাণের ভয় আছে। রেগে গেলে রজত রায় খুন করতে পারে।" মহারাজ ভীত কণ্ঠে বললেন—"তাই না কি? তবে তো ভয়ানক চিন্তার কথা! আমি সবিতাকে রাজী করাবার চেষ্টা করি। তুমি কিন্তু বাবা একবার সন্ধ্যার সময় এসো। তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ করতে চাই না।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সলিল সেন মহারাজার বাড়ীতে এলো। মহারাজ হেসে বললেন—"সবিতা রাজী হয়েছে। আজ রাত্রের ট্রেনেই রাঁচি যাচ্ছি। এদিকের তো সব ঠিক। কিন্তু পদ্মনাভকে খবর দেবার কি হবে? বছর খানেক হলো তার বাপ মারা গেছেন। মা আগেই গত হয়েছিলেন। সে এখন রাজা হয়েছে। তাকে রাঁচি নিয়ে যাবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

সলিল প্রশ্ন করলে—"মেয়ে তাঁর পছন্দ তো?"

মহারাজ উত্তর দিলেন—"খুব পছন্দ। সবিতা অমত না করলে এত দিন কবে বিয়ে হয়ে যেত। আমার বিশ্বাস, পদ্মনাভকে বললেই সে রাজী হবে। কিন্তু আমার তো এখন যাওয়া হতে পারে না। সবিতাকে একলা রেখে কোথাও যাওয়া নিরাপদ হবে না, কি বলো?"

সলিল ব্যস্ত হয়ে বললে—"না, না। তাঁকে একলা রেখে কোথাও যাওয়া উচিত হবে না। তাঁকে একলা বাড়ীর বার হতে দেবেন না। বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?"

মহারাজা বললেন—"তাতো বটেই। তাহলে পদ্মনাভকে খবর দেবার কি করা যায় বলো তো?"

একটু ভেবে সলিল বললে—"এক কাজ করলে মন্দ হয় না।"

আগ্রহভরা কণ্ঠে মহারাজা বললেন—কি কাজ বলো তো?"

সলিল জবাব দিলে—"ধরুন যদি কোন বিশ্বস্ত লোককে দিয়ে পদ্মনাভ বাবুকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দেন?"

আনন্দভরে টেবিল চাপড়ে মহারাজা বললেন—"ঠিক বলেছো তো বাবা! আমি বলি কি, তোমার যদি কোন অসুবিধা না হয়।"

"না, না, অসুবিধা কি! আমায় আপনি যা বলবেন, আমি তাই করতে প্রস্তুত।"

"আমি বলছিলুম, তুমি যদি চিঠিখানা নিয়ে যাও!"

"নিশ্চয় নিয়ে যাব।"

মহারাজ খুশী হয়ে বললেন—"তুমি বসো! আমি এখনই চিঠি লিখে এনে দিচ্ছি। আর তোমার যাতায়াতের খরচের জন্য দু'শো টাকার একটা চেক দিয়ে দিচ্ছি। তুমি কাল সকালেই ষ্টার্ট কোরো।"

রাঁচি। ডুরাণ্ডায় ছোট একটি বাংলো ভাড়া করে মহারাজ শিবসুন্দর কন্যাসহ রয়েছেন। দু'দিন পরে মহারাজা এক টেলিগ্রাম পেলেন। সলিল সেন পাঠিয়েছে! "পদ্মনাভ কাল রাঁচি পৌঁছুবেন। একলাই যাবেন। সঙ্গে এক জন পুরোনো নায়েব যাবে। আমি বিশেষ কাজে কলকাতা যাচ্ছি। যদি বিবাহের দিন উপস্থিত না থাকতে পারি, অপরাধ ক্ষমা করবেন। পরে এক দিন গিয়ে দেখা করবো।"

যাক্, পদ্মনাভ আসছে! মহারাজের বুকের উপর থেকে যেন দশ মণের একটা বোঝা নেমে গেল।

যথাসময়ে বিবাহ হয়ে গেল। সমারোহ বিশেষ কিছু হলো না। পদ্মনাভের চেহারা একটু বদলে গেছে। যেন একটু রোগা আর লম্বা মনে হচ্ছে। তা তো হবেই। বাপ মারা গেছে। ষ্টেটের সমস্ত ভার ঘাড়ে পড়েছে। বিবাহ-সভায় সলিল আসতে পারেনি।

পরদিন বিদায় নেবার সময় বর-বধূ যখন মহারাজকে প্রণাম করতে এলেন, তখন বরের দিকে চেয়ে মহারাজ চমকে উঠলেন। এ কি! এতো পদ্মনাভ নয়। এ যে সলিল সেন। সলিল প্রণাম করে বললে—"আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না। পদ্মনাভের চেহারাটা সত্যিই এত খারাপ যে তার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়া চলে না। তাই আমিই—অবশ্য, আপনার কন্যারও এতে অমত ছিল না। ইনি আমার পুরাতন নায়েব এবং বন্ধু গগন গুপ্ত। কিছু দিন রজত রায় সেজে ছিলেন মাত্র। আসল রজত রায় দার্জ্জিলিংএ আছেন। তিনি এ-সবের বিন্দু-বিসর্গ জানেন না। আর রজতগড়ের পদ্মনাভের সঙ্গে আমি দেখা করতে যেতে পারিনি। আপনাদের অ্যালবামেই তাঁর ছবি দেখেছি! অপরাধ ক্ষমা করবেন।"

রাগে মহারাজের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো। তার পর কি ভেবে হেসে বলে উঠলেন—"তা সত্যি, পদ্মনাভের চেহারাটা সত্যই খারাপ!"

সলিল সেন এখন রাজার জামাতা আর গগন গুপ্ত রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী।

শ্রীযামিনীমোহন কর

ভাইটামিন্

[গল্প]

সন্ধ্যার একটু আগে অফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া অক্ষয় ঢুকিল অন্দরে।

সামনে টানা দালান। দালানে মোড়ায় বসিয়া সাবিত্রী··· সামনে তোলা-উনুনে চাপানো মাটির হাঁড়িতে জল। সাবিত্রী জল ফুটাইতেছে। কোলের উপর একখানা বই খোলা আর মেঝের আছে টাইম-পীশ ঘড়ি এবং পাঁচ-সাতটা টিন। কোনো টিনে শটি, কোনটায় বার্লি, কোনটায় ওট্‌স্, বাকিগুলায় রকমারি ভাইটামিন-ট্যাবলেট।

অক্ষয় বলিল,—হচ্ছে কি?

সাবিত্রী বলিল—ছোট খোকা, বলতে নেই, দেড়-বছরে পড়েছে, এখনো হাঁটবার নাম করে না—বুক ঘষে-ঘষে চলে! এ তো ভালো কথা নয়। তাই শচীনদা বলছিল—ভাইটামিন বুঝে ওকে খেতে দিতে হবে···না হলে ছেলেটা জন্মরোগা হয়ে থাকবে!

শচীনদা ডাক্তার। পাশ করিয়া পাঁচ বছর ঘবড়াইয়া পশার করিতে পারে নাই; ক'মাস পূর্ব্বে চৌরঙ্গীতে চেম্বার লইয়া বসিয়াছে—নূতন কি প্রণালীতে তার চিকিৎসা···পশার জমিতেছে মন্দ নয়!

অক্ষয় বলিল—ছোট খোকার অসুখটা কি?

সাবিত্রী বলিল—অসুখ বিশেষ কিছু নয়···কিন্তু তেমন বাড়ছে কৈ? শচীনদা বলছিল, কি না কি ক্রোমিয়াম-রে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা হয়েছে···তাই করতে পারলে ওর দেহ খুব মজবুত হয়ে উঠবে!··· বললে, ছোট বয়সে ঠিক খাবার ওকে দেওয়া হয়নি···মানে, একালে যে-সব ভাইটামিন ছোটদের দেওয়া উচিত, তাই!

অক্ষয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল—পাগল! গোরুর দুধ খাচ্ছে··· খাঁটি দুধ···গোয়ালা এসে চোখের সামনে দুয়ে দিয়ে যাচ্ছে! গোরুর দুধের চেয়ে পুষ্টিকর খাবার আর আছে না কি? আমরা ঐ গোরুর দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছি। তোমার আর সব ছেলেমেয়েও তাই··· তাদের স্বাস্থ্য খারাপ কোথায়, বলতে পারো?

তীব্র প্রতিবাদের সুরে সাবিত্রী বলিল—থাক্···শনিবার সন্ধ্যা-বেলায় আমার ছেলেমেয়েদের আর নাই বা খুঁড়লে! তাও যদি না বাছাদের জ্বর, সর্দ্দি, কাশি, পেট-খারাপ না লেগে থাক্‌তো!

উচ্চ হাস্য করিয়া অক্ষয় বলিল—মানুষের একটু জ্বর-জাড়ি বা পেটের অসুখ হয়েই থাকে···হুঁঃ! যাক···ভারী খিদে পেয়েছে···তুমি তো ব্যস্ত! ঠাকুরকে খাবার দিতে বলো। জল খেয়ে আমাকে আবার বেরুতে হবে এখনি···দরকার আছে।

সাবিত্রী বলিল—বলছি ঠাকুরকে, সে খাবার দেবে। লক্ষ্মীটি, কিছু মনে করো না···আমি উঠতে পারছি না। বই দেখে এই ভাইটামিন এক্স-এর বড়ি বার্লির সঙ্গে মিশিয়ে ছোট খোকার খাবার তৈরী করতে হবে। জলটা উনুনে থাকবে, শচীনদা বলেছে, ঠিক আধ ঘণ্টা। তাই আমি ঘড়ি ধরে জলের হাঁড়ি চাপিয়ে বসে আছি।

হাসিয়া অক্ষয় বলিল—তোমার শচীনদা এত-বড় ডাক্তার হয়েছে, তাকে আগে বলো দিকিনি তোমার মাথার চিকিৎসা করতে···দু'দিন বাদে তোমাকে নিয়ে না রাঁচি যেতে হয়!

অগ্নি-ভরা দৃষ্টিতে সাবিত্রী চাহিল স্বামীর পানে···রাগে মুখে কথা বাহির হইল না। এমন কথা তাকে প্রায় এখন শুনিতে হয়··· যেদিন হইতে ডাক্তারি-পাশ-করা শচীনদার সঙ্গে আলোচনা করিয়া স্বাস্থ্য-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া সংসারে সে তার পরীক্ষা সুরু করিয়াছে, সেদিন হইতে!

অক্ষয় সে-দৃষ্টি দেখিল···দেখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

আধ ঘণ্টা পরে অক্ষয় সজ্জিত বেশে নামিয়া আসিল···আবার অন্দরের একতলার সেই দালানে। সাবিত্রী তখন পূর্ণ চাকরকে লইয়া সযত্নে কেটলির জল ছাঁকিয়া চীনামাটীর পেয়ালায় ঢালিতেছে।

অক্ষয়ের পানে না চাহিয়াই সাবিত্রী বলিল—খাবার খেয়েছো?

অক্ষয় বলিল—খেয়েছি···তবে আমার জন্য যে বীট-গাজর-বীনসিদ্ধ চটকে রেখেছিলে···সেই সঙ্গে জলবৎ-তরল এক পেয়ালা সুপ আর দু'পীশ টোষ্ট-রুটি, তা খাইনি। আমি খেয়েছি চাকরদের জল-খাবারের যে আটখানা রুটি ছিল আর ওবেলার ঝাল-চচ্চড়ি, তাই!

—ওতে পোষ্টাইয়ের কি আছে আমার মাথা, শুনি?

—খেয়ে পেট ভরলো! আর··· ভয় নেই, ঠাকুরকে বলেছি আমার জলখাবারটা তারা যেন খায়। বিনিময়-প্রথা···বুঝলে!

দু'চোখ কপালে তুলিয়া সাবিত্রী বলিল—তুমি অবাক করলে! অমন ভাইটামিন···তা ফেলে দিয়ে ওবেলার মোটা রুটি আর ঝাল-চচ্চড়ি! তোমার শরীর ভালো থাকবে বলেই শচীনদার সঙ্গে পরামর্শ করে ঐ জল-খাবারের ব্যবস্থা করেছি আমি। তা মুখে রুচলো না! রুচলো ঐ অখাদ্যি!

অক্ষয় বলিল—অখাদ্যি খেয়ে আজ বিয়াল্লিশ বছর বয়সেও যদি আমার শরীর না টস্‌কে থাকে···তাহলে ও-অখাদ্যি আমি ছাড়বো কেন, তুমি আর তোমার শচীনদা আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারো?

সাবিত্রী বলিল—বিয়াল্লিশ বছর বয়স বলেই খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে এখন তোমার ধরাকাট্‌ করা উচিত আরো! এত দিন যা-খুশী খেয়ে এসেছো, কিছু যে হয়নি, তার কারণ জোয়ান বয়সে মানুষের হজমের ক্ষমতা থাকে। শচীনদা বলে, চল্লিশ বছর বয়সের পর আমাদের খাওয়া হবে শুধু ঐ নামে···মানে, খুব কম। আর যেটুকু খাবে, তা শুধু ভাইটামিন্! নাহলে আগেকার মতো খাওয়ায় শরীরে শুধু বিষ জমবে।···তুমি চাও, আমি বই দেবো'খন পড়তে···শচীনদার লেখা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

দু'পা সরিয়া অক্ষয় সাবিত্রীর কাছে আসিল, বলিল—থামো, থামো···অমন করে' আর ভয় দেখিয়ো না। আমি আমার কথা বলছি না। আমি বলছি তোমার ছোট খোকার কথা···এখন থেকে ওকে যদি এমনি ওজন করে আর বাছাই করে খেতে দাও, তাহলে সারাজীবন ওকে তোমার শচীনদার কেয়ারেই রাখতে হবে! সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে! এই যে সেদিন পার্কের দোলায় দুলতে-দুলতে নন্তু পড়ে গিয়ে পা কেটে ফেলেছিল···ওষুধ-পত্তর লিণ্ট-আয়োডিন গজ্-ব্যাণ্ডেজ নিয়ে কত কাণ্ড করলে···বেচারী পনেরো দিন শয্যাশায়ী হয়ে রইলো! আমাদের আমোলে আমরা দৌড়-ঝাঁপ করতে গিয়ে কত ছড়া ছড়েছি, কত কাটা কেটেছি···আমার এই ঠোঁটের কাছটা কেটে গিয়েছিল একবার—ওষুধ কি দিয়েছিলুম,

জানো ? শ্রেফ একমুঠো গাঁদা পাতা চটকে রস-শুদ্ধ সেই গাঁদা-পাতা টিপে রেখেছিলুম কাটার ওপর···ছ'দিনে আরাম !

সাবিত্রী বলিল—তোমাদের সেকালে ওষুধ-বিষুদ মানুষ কটা জানতো ? কাজেই ওতে সারতো। একালে মানুষ কত-কি জেনেছে···

হাসিয়া অক্ষয় বলিল—তাই কথায়-কথায় এক্স-রে, আলট্রা-ভায়োলেট-রের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে ! এর-পর আকাশের রামধনু ধরে এনে তার সাত-সাতটা রঙ নিংড়ে চিকিৎসা করতে হবে ! যত সব ননসেন্স !

নিরুপায় হতাশ কণ্ঠে সাবিত্রী বলিল—তুমি যখন বুঝবে না, কি করে তোমায় বোঝাবো, বলো ? জমাদার এসে উঠোন ঝাঁট দিয়ে গেলে চাকরদের দিয়ে ফেনাইল-জল ঢেলে আমি সব ধোয়াই, তুমি তাতে কত রাগ করো···কিন্তু এ-কথা একবার ভাবো না যে জমাদার কত বাড়ীর নোংরা নালা-নর্দ্দামা সাফ করে বেড়াচ্ছে···কার বাড়ীতে কি রোগ···

অক্ষয় বলিল—ও-কথায় আর কাজ নেই ! ও আমি বুঝবো না কোনো দিন। আমার মত হচ্ছে, যত বাঁধাবাঁধি করবে, ততই হবে ফস্কা গেরো ! জানো, যে যত নিষ্ঠাভরে স্বাস্থ্য-বিধি মেনে চলে, একটু এদিক-ওদিকে তাকেই ধরে রোগে···আর তাকে যে-রোগই ধরুক, ফল হয় সাংঘাতিক। তাই বলি, সব জিনিষকে গ্রহণ করো, সইয়ে নাও···তাহলে power of resistance আশ্চর্য্য-রকম বেড়ে উঠবে !

সংসারে একটু অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে ! পাঁচটি ছেলেমেয়ে··· একটা-না-একটা অসুখ কাহারো লাগিয়া আছে। সাবিত্রী পাগল হইয়া ওঠে ! অসুখে তার কী ভয় ! অক্ষয় অনেক বুঝাইয়াছে—মাঝে মাঝে অসুখ হলে শরীরের কল-কবজাগুলো একটু নাড়া পায়. মরচে ধরতে পারে না !

সাবিত্রী বলে,—পাগল ! মানুষ সুস্থ থাকলে কিসের ভয় ? অসুখ হলেই না···

শচীনদাকে কাছে পাইলে কত কথা সে জিজ্ঞাসা করে ! কি খাইলে লিভারে গোলযোগ ঘটে, কিসে মানুষের লাংস্ ভালো থাকে··· বাঙালীর ঘরে এই যে আজ ব্লাডপ্রেসার আর ডায়েবেটিসের ধুম···এ কেন ? শচীন বুঝাইয়া দেয়, ব্যঙালী খাটে, চিন্তা করে—কিন্তু ব্যায়াম করে না ! কাজের ভিড়ে বিশ্রামের কথা তার মনে জাগে না। তার উপর বাঙালী খায় এত ! ভাত, সেই সঙ্গে ডাল-ঝোল-অম্বল-ভাজা···রাশীকৃত তরকারী ! তাতে ফুলে ঢিপ্‌সী হয়···ও-সবে তো সাবষ্টান্স নেই ! তার পর মাংস যদি খাবে তো একেবারে কবজী ডুবিয়ে···যেন গোরুর জাব্‌না ! এত বেশী খাওয়া···তার যোগ্য ব্যায়াম নেই। সকালে-সন্ধ্যায় একটু মাঠে গিয়ে বেড়াবে, তাতেও তার গভীর ঔদাস্য ! কাজেই···

শুনিতে শুনিতে সাবিত্রীর বুকখানার মধ্যে যেন কামান দাগিতে থাকে ! স্বামী অক্ষয় কারবারী মানুষ···শারীরিক শ্রমের তার সীমা নাই ! তেমনি মাথার খাটুনি ! সারাক্ষণ চিন্তা করিতেছে। দু'-মিনিট বসিয়া থাকিতে জানে না। অক্ষয়ের জন্ত তার দুশ্চিন্তার কি সীমা-পরিসীমা আছে ! সাবিত্রী কতবার বলিয়াছে—ভোরে উঠে যাও না গা—গাড়ী করে মাঠে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়ে একটু ঘুরে এসো। গাড়ী থেকে নেমে মাঠে না হয় একটু হেঁটে বেড়ালে !

হাসিয়া অক্ষয় জবাব দেয়—পাগল ! বেড়াবার সময় কোথায় ? সাতটা থেকে লোক আসতে শুরু হয়···তার পর রাজকুমার আসে দোকানের খাতা নিয়ে। হুঁঃ !

শচীনদার কাছে সাবিত্রী শুনিয়াছে, চটা মেজাজ ব্লাডপ্রেসারের একটা লক্ষণ। কারবারে আমানতীর অঙ্ক একটু কম হইলে অক্ষয়ের চেঁচামেচি এবং বকাবকির সীমা থাকে না। সে সময় মেজাজ যা হয়··· সাবিত্রী কাঁপিতে থাকে ! আগে এমন মেজাজ ছিল না ! শচীন বলে, ব্লাডপ্রেসার হয় একটু বেশী বয়সে। অক্ষয়কে কত দিন বলিয়াছে, তোমার ব্লাড-প্রেসারটা একবার দেখাও না গা ! অক্ষয় তাচ্ছিল্য-ভরে চলিয়া যায়···এ-কথায় কাণ দেয় না !

শচীনদার 'স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান' বইখানা সাবিত্রী এক-রকম মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। একটা পরিচ্ছেদে লেখা আছে, কোন্ খাদ্য পরিপাক করিতে কত সময় লাগে ! সেই বই দেখিয়া সাবিত্রী বাড়ীর খাদ্য পরিবেষণ করে। ছেলেমেয়েরা যদি শসা খায় তো তার পর প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা কাল তাদের মাছ-মাংস খাইতে দেয় না। বলে,—শসা হজম করতে পৌণে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে !···বাঁধা-কপি আর ফুলকপি তার সংসারে একসঙ্গে কাহারো পাতে পড়ে না ! তার কারণ, বইয়ে লেখা আছে, বাঁধাকপি হজম করিতে সময় লাগে সাড়ে তিন ঘণ্টা আর ফুলকপি লাগে আড়াই ঘণ্টা ! শুধু তাই নয়···

বাড়ীতে জল ফুটানো হয়···নিত্য। ফুটানো জল ছাড়া অন্য জল খাওয়া নিষেধ। ছেলে-মেয়েদের উপর আদেশ আছে, যত নিকট-আত্মীয় বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর গৃহে যাও না কেন, খবর্দ্দার, সেখানে জল খাইবে না ! বাজারের তরী-তরকারী···লাইশল-জলে ধুইয়া তবে ভাঁড়ারে তোলা হয়। খাদ্য-সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইয়াছে, মশলাদার কোন-কিছু খাওয়া এ-বাড়ীতে চলিবে না। সিদ্ধর উপর দিয়া যতখানি হয় ! ছেলে-মেয়েয়া বিদ্রোহ করে। সাবিত্রী বলে—যত দিন আমার অধীনে আছো, আমার নিয়ম মেনে চলতে হবে। নিজেরা স্বাধীন হলে যা খুশী করো···তখন আমি কিছু বলতে যাবো না।

ছেলেমেয়েরা বলে—আমাদের বেলাতেই যত-কিছু নিয়ম ! আর বাবা···

সাবিত্রী বলে,—ওঁর উপর জোর নেই। তোমরা আমার পেটে জন্মেছো···তোমাদের উপর জোর আছে !

সেদিন অঙ্ক কষিতে কষিতে মেজো ছেলে শঙ্কু আসিয়া হুম্ করিয়া আসনে বসিয়া ভাতে ডাল ঢালিয়া মাখিল। ডলি বলিল,—এঁ্যা··· মেজদা···হাত ধুয়ে এলে না !

শঙ্কু বলিল—আমার নোংরা হাত নয় যে ধুতে হবে !

সাবিত্রী বলিল—অঙ্ক কষছিলে তো ?

শঙ্কু বলিল—হ্যাঁ।

সাবিত্রী বলিল—ইস্কুলে ঐ খাতা নিয়ে যাও···সেখানে ও-খাতায় কে না হাত দিচ্ছে, শুনি ? যাও, হাত ধুয়ে এসো···সাবান দিয়ে !

শঙ্কু গজগজ করিতে করিতে হাত ধুইতে গেল···সাবিত্রী ডাকিল,—ঠাকুর···

ঠাকুর আসিল। সাবিত্রী বলিল—এ-থালা নিয়ে যাও। অন্য থালায় করে মেজদার ভাত বেড়ে নিয়ে এসো।

সংসারে বিধি-নিয়মের এমনি কড়াকড়! কোথাও শৈথিল্য ঘটিবার জো নাই।

চাকর-বামুনদেরও বিধি-নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। বাহিরে গেলে বাড়ী ফিরিয়া সর্ব্বাগ্রে জল ঢালিয়া পা ধোয়া···রাস্তা-মাড়ানো পায়ে চলাফেরা করিতে পারে না।···

দু'-তিন দিন পরের কথা। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া অক্ষয় বলিল,—যতীশ আসছে কাল।

সাবিত্রী বলিল—একা?

—হ্যাঁ।

যতীশ অক্ষয়ের ভগ্নীপতি···ছোট বোন মৃণালের স্বামী। বর্দ্ধমানে ওকালতি করে।

মানুষটি ভালো। অমায়িক···মিশুক···হাসি-গল্প করিতে জানে। ওকালতি ব্যবসা করিলেও মক্কেলের কাজে আত্মোৎসর্গ করে নাই···দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক রাখিয়া চলে। সাবিত্রী তাকে পছন্দ করে।

রাত্রে দু'জনে খাইতে বসিয়াছে···অক্ষয় এবং যতীশ। যতীশ আসিয়াই বলিয়া দিয়াছে—খাওয়া সম্বন্ধে আমার ভারী বাঁধা-বাঁধি নিয়ম, বৌদি।

অর্থাৎ সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া যতীশ খায় ক'খানা মাত্র আদার-কুচি এবং কতকগুলা ছোলা···লবণ দিয়া! তার পর দশটা-বেলায় মাপিয়া দু'চামচ ভাত···সেই সঙ্গে একটু গাওয়া-ঘী···একটু সুক্তো···আধখানা সিদ্ধ পেঁপে···একটা সিদ্ধ কাঁচকলা বা মুলা বা শাকসব্জী এবং আধ পেয়ালা দই···ব্যস! টিফিনে কিছু টাটকা মুড়ি, আধ-মালা নারিকেল, এক-গ্লাস বার্লি-ওয়াটার। রাত্রে জাঁতাভাঙ্গা আটার রুটি গুণিয়া দু'খানি···পালঙ-শাক, বরবটী আর দু'টি পেঁয়াজ সিদ্ধ এবং এক-বাটি ঘন দুধ।

সেই ব্যবস্থাই হইয়াছে। অক্ষয়ের সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা নয়। অক্ষয় তাহা হইলে চ্যাচাইয়া বাড়ী মাথায় করিবে!

খাওয়ার সঙ্গে গল্প চলিতেছিল···

সাবিত্রী বলিল—আচ্ছা ঠাকুর-জামাই, এঁর চেয়ে আপনি বয়সে কত ছোট?

দু'চোখ কপালে তুলিয়া যতীশ বলিল—স্বামী বলে ওকে সব-বিষয়ে বড় দেখতে হয় বুঝি, বৌদি? ওর ছোট বোনকে বিয়ে করে আমি এত ছোট হয়ে গেছি, ভাবেন?

সাবিত্রী বলিল—না, না···সে-ছোট বলছি না তো! বয়সের কথা হচ্ছে।

যতীশ বলিল,—অক্ষয়ের চেয়ে আমি চার বছরের বড়, জানেন? অক্ষয়ের হলো কত? বিয়াল্লিশ?

অক্ষয় বলিল—হ্যাঁ।

যতীশ বলিল—আমার ছেচল্লিশ চলছে।

সাবিত্রী বলিল—দেখলে কিন্তু এঁর চেয়ে আপনাকে বয়সে অনেক ছোট দেখায়!

হাসিয়া যতীশ বলিল—আমার বয়স কত মনে হয়, বলুন তো বৌদি?

সাবিত্রী এক-মিনিট ধরিয়া ঠাহর করিল, তার পর বলিল—চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর!

বিজয়ের উল্লসিত কণ্ঠে যতীশ কহিল,—বৈজ্ঞানিক বিধি মেনে চলার ফলে, বৌদি! অতিভোজন আমি ছেড়ে দিয়েছি ঠিক চল্লিশ বছর বয়সে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে। খাবার যা খাই, স্রেফ ভাইটামিন্ দেখে! ভাত খাই খুব কম···খাই বটে মুসুর-ডালের জুস, আলু-পটল বা কুমড়ো সিদ্ধ দু'-এক পীশ···বীট-গাজর-কপি-কলাইশুঁটি সিদ্ধ। সব সিদ্ধ! তেলের সম্পর্ক একদম নেই। অক্ষয় চিরদিনই দারুণ পেটুক···অতি-ভোজনের দোষে এই বয়সে এমন বুড়ুটে চেহারা করে ফেলেছে!

গম্ভীর কণ্ঠে অক্ষয় বলিল—উদর-যন্ত্রটির পরিচর্য্যায় যদি কৃপণতা করতুম, তাহলে আজ আর আমাকে বাঁচতে হতো না! তুমি তো রাত্রে খাও শুধু দু'মুঠো মুড়ি···তাতে এক-ছিটে গাওয়া-ঘী আর ঐ সঙ্গে দু'টি আলু-সিদ্ধ!

বাধা দিয়া যতীশ বলিল—এবং এক-বাটি ঘন দুধ···অবশ্য! দুধটুকু আমার চাই-ই। দুধে কি কম ভাইটামিন আছে হে?

সাবিত্রী নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—আপনি দু'-চার দিন আছেন, আপনার সম্বন্ধীকে দয়া করে বুঝিয়ে দিন তো এ-বয়সে লঘু আহার কতখানি দরকার আর ভাইটামিনের কত গুণ! আমাকে বিয়ে করে এনেছেন···পরের মেয়ে···আমি কি দরদ জানি! আমার সঙ্গে খালি ঝগড়া করেন। বেশী বলতে আমার লজ্জা হয়। ভাববেন, উনি আনছেন রোজগার করে পয়সা, আর ওঁকে উপোসী রেখে আমি স্ত্রী দশভুজা হয়ে সর্ব্বস্ব খেয়ে বেড়াচ্ছি!

যতীশ বলিল—নিশ্চয় ওকে বুঝিয়ে দেবো। এখনো হোটেলে খাওয়ার নামে ওর মুখে নাল্ পড়ে। বোঝে না যে সে খাবার নয়, বিষ।

হুঙ্কার দিয়া অক্ষয় বলিল—থামো! বিষ হলে সে-বিষে অক্ষয় আজ জর-জর হয়ে ক্ষয় পেতো! তার চিহ্ন থাকতো না!

যতীশ বলিল—হোটেলের স্তুতি করো না ভাই! নোংরা বিশ্রী প্লেট-ডিশ—তার উপর নোংরা হাতে নোংরা ভূতগুলো করে রান্না আর পরিবেষণ!

অক্ষয় বলিল—তা উপায় কি? ভালো মুখরোচক জিনিষ খেতে আমার সাধ হয়। বাড়ীতে তা পাবো না তো! ওঁর আপত্তি! বলেন, rich food এ-বয়সে খাওয়া হবে না। বলেন, স্ত্রী হয়ে স্বামীকে বিষ দিতে পারি না!

যতীশ কহিল—যথেষ্ট খেয়েছো! এখনো লোভ!

অক্ষয় বলিল—খাবার জন্যই সংসারে আসা। তাছাড়া শরীর আমার খারাপ কোন্‌খানটায়, বলতে পারো?

যতীশ বলিল—ভিতরে কি হচ্ছে, কে বলতে পারে! বট্-অশথের গাছ দেখেছো, বাইরে দিব্যি আছে—তার পর হঠাৎ ঝড় নেই, জল নেই, সে-গাছ মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়ে!

প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় সাবিত্রী বলিল—বলুন তো ঠাকুর-জামাই···ওঁকে সাধে বলি! ওঁর উপর আমাদের সকলের নির্ভর! উনি যদি বিছানা জান্···

কথা শেষ হইল না—বাষ্পভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

অক্ষয় বলিল,—জানো যতীশ, বাড়ীতে যদি মাল আসে তো

সে-মাংস রান্না হয় যেন রুগীর পথ্যি! ষ্টু'তে আর সুপে কি স্বাদ আছে, ছাই! আমি চাই দিব্যি···

তার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া যতীশ বলিল—ঘীয়ে জবজবে কালিয়া ইয়া বড় জাম্-বাটি ভরা! বাব্বাঃ! মনে করলে আমার পেট কনকন্ করে। না, এমন করে তুমি আত্মহত্যা করতে পাবে না। আমার মতে চলো। বৌদিও ততখানি সাবধানী নন। আমি বলি বৌদি, রান্নার পাট্ তুলে দিন্—স্রেফ্ সিদ্ধ! শাকসব্জী বলুন, তরী-তরকারী বলুন—তাতে মশলা মিশিয়েছেন কি সে হয়ে উঠবে বিষ! আমাদের যা কিছু অসুখ-বিসুখ, সব ঐ মশলা থেকে।

সাবিত্রী বলিল—বলুন তো ঠাকুর-জামাই, আমি ঐ কথাই বলি, মানুষের শরীর ভাইটামিনে। তা কে শোনে কার কথা! আমার শচীনদা বলে···

অক্ষয় খ্যাঁক্ করিয়া উঠিল, বলিল—আবার শচীনদা! তোমার শচীনদা যে এত উপদেশ দেয়, সে নিজে কি খায়? ভাইটামিন-ট্যাবলেট্?

সাবিত্রী বলিল—শচীনদা তোমার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট।

অক্ষয় বলিল—কিন্তু আমি চাই খাবারে ভ্যারাইটি।

যতীশ বলিল—ভ্যারাইটির ব্যবস্থা আছে না কি?

অক্ষয় বলিল,—শুনি, কি পেতে হবে?

যতীশ চাহিল সাবিত্রীর পানে, বলিল—বলুন না বৌদি···

সাবিত্রী বলিল—কেন,—ফল খান···যত চান্! তাছাড়া বীট, গাজর, পালঙ-শাক···জাঁতায়-ভাঙ্গা আটার রুটি। তাই কি উনি একটু-আধটু খাবেন! ওঁর চাই রাশীকৃত!

অক্ষয় বলিল—কম খেলে হাতীও নিপাত যায়!

সাবিত্রী বলিল—ভাইটামিন খাও।

যতীশ বলিল—কাল থেকে আমাকে ভার দিন আপনার বাড়ীর খাবারের 'মেনু' তৈরীর।

সাবিত্রী বলিল—দেখুন, যদি ওঁকে বোঝাতে পারেন!

পরের দিন সকালে গৃহিণীপনার চার্জ্জ লইল যতীশ···

সকালে একটা শাস্-প্যানের মধ্যে ক'টা গাজর এবং আলু ভরিয়া প্যানের মুখ ঢাকনি-বন্ধ করিয়া উনানের উপর বসাইয়া দিল; বলিল—একটি ফোঁটা জল নয়···বুঝলেন বৌদি···জল দিলে এর যা কিছু ভাইটামিন, সব যাবে জলে ধুয়ে সাফ হয়ে! সিদ্ধ করে খেলে তবেই পাবেন ফল! আপনি বলে দিন ঠাকুরকে—সকালে এই আলু আর গাজর সিদ্ধ, এক পেয়ালা দুধ আর একটা করে ভুট্টা···এতে পাবেন ভাইটামিন এ, বি, সি···সেই সঙ্গে লাউ-সিদ্ধ-করা জল, আর পাবেন চাটি ছোলা! আর অক্ষয়কেও বলি, এক বোতল কড-লিভার অয়েল আনাও,—তাতে যেমন 'ডী'-ভাইটামিন এমন আর কিছুতে নয়! একমাত্র কডলিভার অয়েল খেলে আল্ট্রা-ভায়োলেট-রের ফল পাবেন।

অক্ষয় বলিল—এ হলো সকালের পালা! তার পর অফিসে যাবো কি খেয়ে?

যতীশ বলিল,—সব্জী, পাকা কলা, কমলা লেবু, দু'টো টোমাটো খাও, চীনের বাদাম খাও!···দু'পীশ রুটি খাও···

অক্ষয় বলিল—ভাত ত্যাগ করবো?

—নিশ্চয়। ভাতে ভুঁড়ি···দেহের শক্তি নাশ করতে ভাতের মতো বিষ আর নেই!

ঝাঁজালো সুরে অক্ষয় বলিল—লাষ্ট ফেমিনের সময় এসে এ-কথা বলে যেতে পারোনি মিনিষ্টারদের কাছে? বেচারীরা বাজরা-আমদানির দায় থেকে নিস্কৃতি পেতো—সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের টিপ্পনী সইতে হতো না।

হাসিয়া যতীশ বলিল—এ সম্বন্ধে রীতিমত ষ্টাডি করেছি হে··· শরীরটি দেখছো তো! সারা দিন কাছারিতে মামলা আর্গু, ক্রশ-এগজামিন করে দু'ঘণ্টা মাটী কোপাতে পারি এখনো।

অক্ষয় বলিল—কোপাওগে তুমি মাটী। আমি ও-কাজ পারবো না! কক্ষনো না।

সে-কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যতীশ বলিল—দু'দিন কষ্ট হবে, মানি। তার পর একবার রপ্ত হলে ভাত-ডালের নামে গা কেমন করবে, দেখে নিয়ো! শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে, তাই সয়! মহাজনরা এ-কথা বলে গেছেন।

অক্ষয় বলিল—বামুন-চাকররা কি খাবে?

—সকলের এক ব্যবস্থা। তোমার বাড়ীতে চাকরি করতে এসেছে ওরা···দেহ পাত করতে আসেনি!

অক্ষয় বলিল—কিন্তু ঐ ভাত-ডাল খেয়ে এদেশের লোক চিরদিন বেঁচে আসছে।

হাসিয়া যতীশ বলিল—কোথায় আর বাঁচছে! ভাইটামিন্ বুঝে খেলে লাষ্ট ফেমিনে কি আর মানুষ এমন ধড়াধ্বড় মরতো!··· কালের হাওয়া বদলে গেছে। সেকালে ভাইটামিনের সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতো না—তাই সেকালের লোকরা সব মারা গেছে। একালে ভাই-টামিন্ হলো প্রাণ-শক্তি! জানো, সায়েন্টিষ্টরা বলছেন, বিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁরা ভাইটামিনের এমন ছোট-ছোট বড়ি বানিয়ে তুলবেন যে রান্না, বাসনকোশন—এ-সবের পাট উঠে যাবে। একটি করে বড়ি খেলে মানুষের জঠর-জ্বালা ঘুচবে, সঙ্গে সঙ্গে দেহে-মনে শক্তি যা হবে, একেবারে অসুরের মতো!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অক্ষয় বলিল—সে শুভদিন আসবার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়!

কথাটা বলিয়া অক্ষয় চাহিল সাবিত্রীর পানে···সাবিত্রী নির্ব্বাক্ ···যেন কাঠের পুতুল! বুঝি, একাগ্র-মনে সে যতীশের ভাইটামিন্-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল!

পরের দিন পূর্ণ চাকর আসিয়া সাবিত্রীকে বলিল—দেশে আমার মায়ের খুব অসুখ···চিঠি এসেছে। আমার হিসেব চুকিয়ে দেবেন মা···আজই আমি বাড়ী যাবো।

সাবিত্রী বলিল,—আজ যাবি! তা কখনো হয়? আমায় একটা লোক দে।

পূর্ণ বলিল—লোক কোথায় পাবো মা?

সাবিত্রী বলিল—বাবুকে বলো গে যাও···আমি ছুটী দিতে পারবো না!

ঘণ্টাখানেক পরে ঠাকুর বলিল—আমার ভাইয়ের বিয়ে···বাবা লিখেছে, আজই বাড়ী যেতে।

সাবিত্রীর দু'চোখ কপালে উঠিবার জো! বলিল—ব্যাপার কি ঠাকুর? ভাইয়ের বিয়ে! কিন্তু তোমার মুখেই শুনেছি, তোমার একটি মাত্র ভাই···আর তার বয়স পাঁচ বছর! পাচ বছর বয়সে মানুষের বিয়ে হয়, বলতে চাও?

ঠাকুর মুখ ফিরাইল···জবাব দিল না।

সাবিত্রী বলিল—বলো···জবাব দাও।

ঠাকুর বলিল—আজ্ঞে, এখানে চাকরি আর করবো না। পেট ভরে কাঁশি ভরে ভাত খাবো বলেই চাকরি করতে এসেছি। দু'খানি আলু-গাজর সিদ্ধ আর তার সঙ্গে একটা ভুট্টা আর চীনা বাদাম খেয়ে কি দেহ নষ্ট করবো!

সাবিত্রী বলিল—কিন্তু বুঝছো না ঠাকুর, বড়-বড় ডাক্তারবা বলছেন, মানুষের শরীর সুস্থ থাকে শরীরে শক্তি থাকে শুধু ঐ ভাইটামিনে। ভাত-ডাল একরাশ খেলে পেট ভরতে পারে, কিন্তু তাতে শরীর থাকে না।

তাচ্ছল্যভরে ঠাকুর বলিল—আমরা গরীব-মানুষ মা, পেট যদি না ভরলো তো কাজ করবো কিসের জোরে! আপনারা বড় মানুষ··· আপনাদের একটু-কিছু মুখে দিলেই চলে!

সাবিত্রী যেন অকূলে পড়িল! একসঙ্গে ভৃত্য ও পাচকের নোটিশ!

ঠাকুর বলিল—আপনার সঙ্গে তর্ক করতে পারি না মা···এত দিন আপনার নুণ খাচ্ছি···কিন্তু খাওয়া-দাওয়া এমন হলে আমি থাকতে পারবো না···এ আমার পষ্ট কথা। এর পরে চলে গেলে যেন বেইমান বলবেন না।

ঠাকুর আর কথা না বাড়াইয়া চলিয়া গেল।···

সাবিত্রী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল···মাথার মধ্যে যেন একরাশ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইতে লাগিল।···হঠাৎ বাহিরে কি যেন একটা ভারী জিনিষ পড়িল···বিকট শব্দ!

সাবিত্রীর চমক ভাঙ্গিল। দ্রুত পায়ে শব্দ লক্ষ্য করিয়া গিয়া দেখে, দালানের চৌকাঠের কাছে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে···স্বামী অক্ষয়।

ছুটিয়া গিয়া হাত ধরিয়া তুলিল···বলিল,—পড়ে গেছ?

অক্ষয় বলিল,—ও কিছু নয়···

—কিছু নয় কি! ইঃ, কপালটা ঠুকে গেছে···ফুলে উঠলো যে। ···হোঁচট খেলে? এত বলি, বয়স হয়েছে, এখন কি আর অমন তড়-তড় করে সিঁড়ি-নামা সাজে!

অক্ষয় বলিল—তড়-তড় করে নামিনি গো! বেশ আস্তে-আস্তে নামছিলুম। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।

সাবিত্রীর বুকে কে যেন জাঁতা ঘুরাইল!

অক্ষয় বলিল—যাই···ও কিছু নয়। ভাইটামিন-বী একটু বাড়িয়ে দিয়ো!

পাচক-ভৃত্যকে ভয়ে-ভয়ে ব্যবস্থা দিতে হইল—নহিলে তাদের ধরিয়া রাখা যায় না! ব্যবস্থার কথা কিন্তু গোপন রাখিল···যতীশ বা অক্ষয় বিন্দু বিসর্গ না জানে!···

কিন্তু নিজেও আর পারে না! খাঁশারির ডাল সিদ্ধ···যতীশ বলে, সব ডালের চেয়ে খাঁশারিতে ভাইটামিন আছে বেশী! তার উপর ঐ লাউ সিদ্ধ করিয়া তার উপ্‌শুনি-জল···এক-পেয়ালা ঐ জল···বলে, পাঁচ পোয়া ছানার সমান! তরকারী ভুট্টা শাকসব্জী সব সিদ্ধ···তাহাতে ভাইটামিন যতই থাকুক, গলা দিয়া নামিতে চায় না!

ভাবিল, ঠাকুর-জামাই বাড়াবাড়ি করিতেছেন! মানুষ একেবারে কি এত দিনের অভ্যাস বদলাইতে পারে! তাছাড়া অক্ষয় যে সেদিন মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল···কি জানি, হয়তো খাদ্যের অভাবে! শচীনদাকে পাইলে চুপি-চুপি একবার জিজ্ঞাসা করিত! শচীনদা হাজার হোক ডাক্তার···ঠাকুর-জামাই উকিল!

শচীনদাকে পাওয়া গেল না···সে বাহিরে কোথায় 'কলে' গিয়াছে!···

ছেলেমেয়েদের শুষ্ক মুখ···আহা, বেচারী!

কিন্তু কি করিবে? ঠাকুর-জামাই যদি দুঃখ করেন!

বৈকালে পূর্ণ ধরিয়া আনিল সেজ ছেলে বঙ্কুকে···তার হাতে ঠোঙা···ঠোঙায় উড়ের দোকানের ফুলুরী! বঙ্কু ষাঁড়ের মতো চেঁচাইতেছে!

সাবিত্রী বলিল—ব্যাপার কি রে?

পূর্ণ বলিল,—এই দেখুন মা, সেজদাবাবু কি খাচ্ছিলেন···পথে ঐ ইন্দ্রমণির দোকানে।

দেখিয়া সাবিত্রীর চোখে জল আসিল···চারি দিকে কি এ বিপর্য্যয় ব্যাপার!···ছেলে শাসনের বাহিরে গিয়াছে!

পাঁচ দিনের দিন অক্ষয়কে একান্তে পাইয়া সাবিত্রী বলিল,— তোমার খাওয়ার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

অক্ষয় বলিল—তা হোক! ভাইটামিন যাচ্ছে শরীরে!

সাবিত্রী বলিল—ছেলেমেয়েরা সহ্য পারছে না, তারা লুকিয়ে যা-তা খাচ্ছে···শাসন মানছে না। আগে মানতো। কুপথ্যি করতো না। তাদের আমি আলাদা খাবার দিচ্ছি। শম্ভু দু'দিন বমি করেছে। বলে, বিশ্রী খেতে!

অক্ষয় বলিল—কিন্তু ভাইটামিন···

সাবিত্রী বলিল—ঠাকুর-জামাই মনে দুঃখ করবেন···নাহলে আমি ভাবছিলুম, যেমন-ধারা তোমরা চিরদিন খাও, তাই করো। উনি বড় বাড়াবাড়ি করছেন! ঠাকুর আর পূর্ণ তো চলে যাচ্ছিল এই খাবারের দৌরাত্ম্যে! তাদের আর এ-ব্যবস্থায় রাখিনি···

অক্ষয় বলিল—তাই না কি? যতীশকে একবার বলি···

—না···না···না, খবর্দ্দার···আমার মাথা খাবে! ওঁকে বলো না। মনে আঘাত পাবেন!

—বেশ!

সেদিন সন্ধ্যার ট্রেণে যতীশ বর্দ্ধমানে ফিরিবে···অক্ষয় বলিল— তোমাকে ষ্টেশনে পৌছে দিয়ে আসি, চলো।

ষ্টেশনের পথে দু'জনে আসিয়া ঢুকিল একটা হোটেলে। অর্ডার দিল···সুপ, ড্রাই, কারি, ভাত, পুডিং···বেশ সব মুখরোচক খাদ্য।

খাইতে খাইতে যতীশ বলিল—আমরা অত্যন্ত পাষণ্ড! ওঁদের যা-তা খাইয়ে নিজেরা ক'দিন লুকিয়ে চর্ব্বচোষ্য গ্রহণ করেছি!

হাসিয়া অক্ষয় বলিল—ভালোই করেছো! বাড়ীতে খাদ্যাদি সম্বন্ধে সে কঠোর বিধি-নিয়মও উল্টে গেছে।

—তার মানে?

—গৃহিণীর বাতিক সেরেছে। বলেন, ভাইটামিনে শরীরে যত উপকারই হোক, মানুষ যখন রাঁধতে শিখেছে, মশলা-টশলায় ব্যবহার জানে, তখন জানোয়ারের মতো তারা খাবে ঐ কাঁচা ঘাস-পাতা! ভাইটামিন্ খেলে চলবে না! তাছাড়া কালিয়া-পোলাও খেয়ে মানুষ যখন বেঁচে আসছে চিরকাল···

যতীশ বলিল—আমার দাওয়াই তাহলে সার্থক হয়েছে, বলো?

—নিশ্চয়।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ প্রমথনাথ তর্কভূষণ

সন ১২৭১ সালের পৌষ মাসে ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ বংশে ভট্টপল্লী-গ্রামে প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেব তারাচরণ তর্করত্ন মহাশর এক জন অসাধারণ প্রতিভাবান্ পণ্ডিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় তারাচরণ তর্করত্নের অগ্রজ। তারাচরণ তর্করত্ন অল্পবয়সে তদানীন্তন কাশীনরেশ মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহের সভাপণ্ডিতরূপে কাশীতেই বসবাস করিয়াছিলেন। তখন কাশীধামে মহামহোপাধ্যায় বালশাস্ত্রী খুব প্রসিদ্ধ, হিন্দুস্থানী পণ্ডিত সমাজে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু তারাচরণ তর্করত্নের সম্মুখে শাস্ত্র বিচারে বালশাস্ত্রী ভীতি-কম্পিত হইতেন। আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কাশীধামে উপস্থিত হইলে এই তারাচরণ তর্করত্নের সহিত বিচারে সম্পূর্ণ পরাজিত হ'ন। তৎপরে স্বামী দয়ানন্দ—বাঙ্গালায় আসিলে সনাতন 'ধর্ম্মের সংরক্ষক পুণ্যশ্লোক ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহিত চুঁচুড়ায় এক বিচারের আয়োজন করেন। এই বিচারে সাহায্য করিবার জন্য তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয় আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হ'ন, স্বামী দয়ানন্দ তারাচরণ তর্করত্নের' উপস্থিতির কথা জানিতে পারিয়া আর বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। এইরূপ প্রতিভাবান্ পিতার পুত্ররূপে প্রমথনাথ জন্মগ্রহণ করিলেও বাল্যে তাঁহার বিদ্যাভ্যাসের দিকে তেমন লক্ষ্য রাখা হয় নাই, এ জন্য বাল্যকালে খেলাধূলায়—ব্যায়ামে তাঁহার আকর্ষণ অধিক হওয়ায় তিনি ব্যাকরণ কাব্যপাঠে তেমন মনোযোগী হইতে পারেন নাই। অল্প বয়স হইতেই তিনি এমন গল্প করিতে পারিতেন যে, লোককে মুগ্ধ হইতে হইত।

১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃদেবের কাশীলাভ ঘটে, পিতার কাশীলাভের কয়েক দিন পূর্ব্বে ভট্টপল্লী হইতে গৌতম-গোত্রীয় পঞ্চানন (পরে তর্করত্ন ও মহামহোপাধ্যায়) তারাচরণ তর্করত্নের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করেন। এই সময়ে পঞ্চানন ও প্রমথনাথ প্রগাঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হ'ন। পিতৃহীন প্রমথনাথ কাশীধামে অধ্যয়নের সুবিধা না দেখিয়া ভট্টপল্লীতে আগমন করেন। এখানে পঞ্চানন তর্করত্নের সহিত একসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের নিকট কাব্য ও পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সাংখ্য পাঠে মনোযোগী হন। অধ্যয়নের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে পঞ্চাননের গৃহেই তাঁহার সহিত শাস্ত্রের আলোচনা ও অনুশীলন হইত। এই সময়ে এক দিন সন্ধ্যায় পঞ্চানন ও প্রমথনাথ একটি গৃহে বসিয়া আছেন, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, পঞ্চাননের ভগিনী নৃত্যকালী দেবী একটি প্রদীপ লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রমথনাথ—প্রদীপালোকে সেই দিন সেই কিশোরীকে বড়ই সুন্দরী দেখিলেন এবং বলিলেন—যেন একখানি প্রতিমা; তৎপরে এই নৃত্যকালী দেবীর সহিত প্রমথনাথের বিবাহ সম্পন্ন হইল। নৃত্যকালী দেবীকে পাইয়া প্রমথনাথ সংসার জীবনে বড়ই শান্তি পাইয়াছিলেন। নৃত্যকালী এরূপ সতী-সাবিত্রী ছিলেন যে, প্রমথনাথের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে পীড়িত বৃদ্ধ স্বামীর চরণদ্বয় মাথায় রাখিয়া কাশীতে জাহ্নবীর—অন্তিম গতি লাভ করেন।

ভট্টপল্লীতে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ প্রায় সমাপ্ত করিয়া তিনি পুনরায় কাশীধামে প্রত্যাগত হন। সেখানে মহামহোপাধ্যায় কৈলাস-চন্দ্র শিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং তদানীন্তন অসাধারণ বৈদান্তিক স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট মীমাংসা ও বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দের কথা-প্রসঙ্গে প্রমথনাথ প্রায়ই বলিতেন···"দুনিয়াকা কাঁটা সে তুম নহী উঠ সকতা হৈ—আপনা পৈদমে জুতা পিন্হো" এই ছিল স্বামীজীর উপদেশ। আপনি সাবধানে চল—দুনিয়াকে সুধরাইতে পারিবে না।" প্রমথনাথ কিছু দিন দ্বারভাঙ্গা পাঠশালায় অধ্যাপনা করেন এবং এই সময়ে

পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ

তাঁহার বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা-শৈলী বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্রেরও চিত্তাকর্ষণ করে।

ইতিমধ্যে 'বঙ্গবাসী'র শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্য আরম্ভ হয়, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন—পণ্ডিত প্রমথনাথ কিছু দিন এই শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যেও লিপ্ত ছিলেন। অল্প দিন মধ্যেই মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুরোধে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রমথনাথকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি ও অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করান (১৮৯৮ খৃঃ)। যদিও তিনি তখন স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হ'ন নাই, তথাপি এই পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বুঝিয়া ভট্টপল্লীর বিশিষ্ট অধ্যাপক বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং অল্প দিনে স্মৃতিশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেন। স্মৃতি, বেদান্ত, মীমাংসা ও ন্যায়শাস্ত্রে

তাঁহার বহু ছাত্র কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। একবার 'বিজয়া দশমী' সম্বন্ধে কোন বিচার-সভায় মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের সহিত বিচারে প্রমথনাথের মীমাংসাশক্তি দেখিয়া স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। গুরুদাস বাবু ঐ সভায় মধ্যস্থ ছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হ'ন।

প্রায় ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তর্কভূষণ মহাশয় শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবার পর তাঁহার জ্ঞান গবেষণা বক্তৃতা দ্বারা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে বাঙ্গালা, হিন্দী ও সংস্কৃতে তিনি অসাধারণ বক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইংরেজীতেও তিনি বক্তৃতা করিয়া বহু লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। গৃহে বসিয়া তিনি কিছু কিছু ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছিল। এই বক্তৃতার জন্য তিনি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত 'ডন-সোসাইটি'তে—স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'গীতা সোসাইটিতে', 'মহাবোধি সোসাইটি' এবং বৈষ্ণব সম্মিলনীতে সাদরে আমন্ত্রিত হইতেন এবং তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সহস্র সহস্র লোক সাগ্রহে অপেক্ষা করিত। তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও আংশিক ভাবে অধ্যাপনা করিতেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাল্য-জীবনের স্মৃতিপূত পিতৃসেবিত কাশীধামে চলিয়া আসেন।

এই সময়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক অধ্যক্ষরূপে প্রাচ্য-বিদ্যা বিভাগে স্থাপিত করেন। ১৯৩৭ খৃঃ অব্দে প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হ'ন এবং ১৯৪৯ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে (Honorary) বিশিষ্ট মানচিহ্নরূপে 'ডি, লিট্' উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়। ইহার প্রযোজক ছিলেন—বর্ত্তমান ভাইসচ্যান্সলার স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ হিন্দুসভা ও হিন্দু মিশনের আন্দোলনে যোগ দেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্ম্ম-মহাসভাতেও তিনি যোগদান করেন। তাঁহার পরিণত বয়সে তিনি হিন্দুসংগঠনের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অনেক সময়েই বলিতে শুনিয়াছি—হিন্দু বাঁচিবে কেমন করিয়া? হিন্দু-রক্ষার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইত। তাঁহার এই ব্যাকুলতার ফলে প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রমত হইতে তিনি কিঞ্চিৎ মতান্তর পোষণ করিয়াছিলেন। এই মতান্তর হেতু বাল্যের প্রগাঢ় বন্ধু পঞ্চানন তর্করত্ন অসন্তুষ্ট হইলেও তিনি নিজের নবীন মতবাদ পরিত্যাগ করেন নাই। আত্মীয়-স্বজনের বিরাগের দিকেও তিনি লক্ষ্য করেন নাই। তর্করত্ন ও তর্কভূষণের মতবাদ বিচার-আকারে 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

তর্কভূষণ মহাশয় এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ও আসামের বহু স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নিজ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন।

তিনি সংস্কৃতে 'বিশুদ্ধানন্দচরিতম্'—'রাসরসোদয়ম্' 'কোকিল-দূতম্' প্রভৃতি সুললিত কবিত্বপূর্ণ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অমলা নামে অর্থসংগ্রহের একটি টীকা ও সাংখ্য-সূত্রের টীকা তাঁহার প্রণীত। গীতার শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ, ও ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রীয় শাঙ্কর ভাষ্য ও ভামতী টীকার অনুবাদ তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। মনুসংহিতায় মেধাতিথি ভাষ্যের অনুবাদ, বিবরণপ্রমেয় সংগ্রহ, (বসুমতী সংস্করণ) চণ্ডী ও সিদ্ধান্তলেশের অনুবাদ তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ করিতেছে।

মায়াবাদ, মণিভদ্র, দুকূল ও পরিকা, শাক্যসিংহ, সনাতন হিন্দু, রত্নমালা, ভক্তি ও মুক্তি প্রভৃতি বঙ্গভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এতদ্ব্যতীত বহু মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার বিয়োগে সমগ্র ভারতের বিদ্বৎসমাজে যে বজ্রপাত হইল, তাহা অপূরণীয়। তাঁহার চরিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, একত্র বেদান্ত ও ভক্তির মিশ্রণ, পাণ্ডিত্যের সহিত বিনয়-সৌজন্যের সমাবেশ, শাস্ত্রবিচারের সহিত মধুরভাষিতার মিলন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের কাশীপ্রাপ্তির পূর্ব্বদিনে—উভয়ের প্রীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সে দিনের সে দৃশ্য চিরদিন স্মৃতিপথে অঙ্কিত থাকিবে।

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার মধ্যাহ্ন ১টায় সময়ে মণিকর্ণিকাতীর্থে শ্রীবিষ্ণুপদে ব্রহ্মনালে তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত কাশীলাভ করিয়াছেন। পাঁচ দিন মুমূর্ষু অবস্থায় যখন তিনি মণিকর্ণিকায় শয়ান ছিলেন, তখন বহু মনীষী তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

সমগ্র ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত—বঙ্গজননীর এই বরপুত্র জীবনে ধর্ম্ম-অর্থ-কামের সুসমঞ্জস ভাবে সেবা করিয়া অন্তে পরম পুরুষার্থ মুক্তিলাভ করিলেন, হিন্দুর যাহা কাম্য—তাহাই তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হইল।

লোকান্তরিতা

লুকিয়ে আছে—হারায়নিকো—আছে চোখের অড়ালে!
জানি আমি আস্‌বে ছুটে—দু'খানি হাত বাড়ালে!
ধ্বংস নাহি—অমর যাহা— মরণে শেষ হয় কি তাহা?
অঙ্গারেরি অনল কি যায় চরণ-তলে মাড়ালে!
মাঝখানে বয় মৃত্যু-নদী—দাঁড়িয়ে আমি এ-পারে—
ও-পার আঁধার—বারতা তা'র আনতে হেথা কে পারে?
হয়তো একা আমার মত অশ্রু তাহার অবিরত
ঝরছে চোখে কতই শোকে অচিন্ লোকে সেথা রে!

খুঁজে বেড়াই—পাই না দেখা—কাঁদি গো তাই হতাশে,—
বহ্নি-তাপে দগ্ধ হলো পেলব স্বর্ণলতা সে!
মরণ এ নয়—লুকোচুরি! প্রণয়-লীলার ছল-চাতুরী!
তাইতো এসে দেয় না দেখা, কয় না হেসে কথা সে!
হয়তো আছে—হয়তো নাহি—কি কাজ বলো বিচারে?
হৃদয়ে যার আসন তারে বাইরে খোঁজা মিছা রে!
ঐ মূরতি বুকের মধ্যে থাকবে—ছিল—আজো আছে!
মৃত্যু-জরা-দুঃখভরা মাটীর কায়া কি ছার এ!

শ্রীআশুতোষ সান্যাল (এম্, এ)

স্রোত বহে যায়

[উপন্যাস]

১৭

দু'-তিন দিন পরের কথা।

জয়রাম রায়ের মেয়েকে পাকা-দেখিতে যাওয়ার দিন। শিবকৃষ্ণ এ বিবাহে ঘটক···পরেশ গাঙ্গুলির বাড়ীর মাটী কামড়াইয়া থাকিয়া সকালে একখানি ধোয়া সাদা ধুতি এবং গরদের একটা চাদর আদায় করিয়াছে। এই বেশে সে যাইবে বিলাসপুরের জমিদার-বাড়ী।

বেলা তখন ন'টা···নিস্তারকে বলিল—তুই চট্ করে ভাতে ভাত করে দে। বেলা বারোটায় আমাদের বেরুতে হবে। আমি ধাঁ করে মন্দিরের পূজোটা সেরে আসি, বুঝলি?

নিস্তার বলিল—তা যাচ্ছি···কিন্তু একটা কথা ছিল।

—কি আবার কথা?

নিস্তার বলিল—সেদিন গাঙ্গুলি-বাড়ীর পাকা দেখায় বরপক্ষের কাছ থেকে পনেরোটা টাকা পেয়েছো···আমাকে তার কিছু জানতে দাওনি যে?

শিবকৃষ্ণ ফোঁশ্ করিয়া উঠিল, বলিল—কে বলেছে তোকে টাকার কথা, শুনি?

নিস্তার বলিল—যেই বলুক, পেয়েছো তো?

শিবকৃষ্ণর মনে ক্ষণেকের দ্বিধা! সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কথাটা নিস্তার নিশ্চয় জানিয়া ফেলিয়াছে! গোপন করিলে কি জানি, এখনি যদি রণচণ্ডী-মূর্ত্তি ধরে! তাই বলিল—পেয়েছি।

—আমাকে সে-কথা বলা হয়নি যে?

—ভুলে গিয়েছিলুম রে···সত্যি বলছি। যে-ঘোরানটা পরেশ ঘোরাচ্ছে, খেতে-নাইতে ভুলে যাই, তা টাকা!

নিস্তার গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—এখন মনে পড়েছে যখন, তখন ও থেকে দশটা টাকা আমার চাই!

শিবকৃষ্ণ মনে মনে জ্বলিয়া উঠিল! বলিল,—অমনি তোমার চাই ও টাকার ভাগ!

নিস্তার বলিল—আমি একটা নৎ গড়াতে দিয়েছি···দশটা টাকা কম পড়ছে। টাকা না পেলে নৎ সে দেবে না। বলেছে, এ দশ টাকা আদায় করতে ক'বছর সময় লাগবে, তার ঠিক নেই! সেখানে তাগাদায় গেলে শিবু ঠাকুর গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে তো! ছি ছি, কি-নামই কিনেছো বাজারে!

শিবকৃষ্ণ বলিল—কে এ-কথা বলেছে, বল্‌তো? কার ধার ধারি যে···

বাধা দিয়া নিস্তার বলিল—রুক্মিণী স্যাকরা বলেছে। আর মিথ্যা কথাও বলেনি। মনে আছে, দু'বছর আগে দু'টো মাকড়ি গড়িয়েছিলুম, তাও সোনা দিয়েছিলুম নিজের পুঁজি থেকে···আমার নিজের সোনা···বাণীর তিনটে টাকা তোমাকে দিতে বলেছিলুম। সে-টাকা আদায় করতে সত্যিই তো রুক্মিণীর পা টাটিয়ে গিয়েছিল। ক' বছরে সে তিনটে টাকা শোধ করেছো বলো তো?

—হ্যাঁ···হ্যাঁ···ব্যাটাকে তো চিনিস্ না! বাণী চাইতে এসেছে! আর ওর ছেলের অসুখে ঠাকুরের কাছে পূজো মানত করেছিল··· ছেলে সারতে পূজো দিয়ে গেল পাঁচ টাকার···নৈবিদ্যির একখানা বাতাসা আমাকে দ্যায়নি! পূজো করিয়ে আমায় দক্ষিণে দিয়েছিল কত, জানিস? দু'আনা! ব্যাটা এমনি ছোট লোক!

নিস্তার কিন্তু এ কথায় টলিবার পাত্রী নয়! বলিল—তোমার পুরাণ শুনতে আমি চাইনি। আমাকে দাও দিকিনি দশটা টাকা!

শিবকৃষ্ণ বলিল—দেবো'খন।

—না, অখন নয়···এখনি আমার চাই! তোমাকে আমি খুব চিনি। টাকা দাও।

শিবকৃষ্ণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল নিস্তারের পানে। কি যেন বলিতে যাইতেছিল···বলিতে পারিল না। নিস্তারের যে-রকম নিথর গম্ভীর ভাব!

জানে, আকাশ যখন এমনি স্তব্ধ গম্ভীর থাকে, তার অব্যবহিত পরক্ষণে ওঠে দারুণ ঝড়, নয় ঝরে প্রচণ্ড বৃষ্টি! নিস্তারের এমন গাম্ভীর্য্য চিরদিন দারুণ ঝড়ে ফাটিয়া পড়িয়াছে!

শিবকৃষ্ণ বলিল—দেবো রে, দেবো! দরকার বলছিস যখন, দেবো! পূজোটা সেরে আসতে দে।

নিস্তার বলিল—সে টাকা তো ব্যাঙ্কে পাঠাওনি যে দিতে তোমার ভয়ঙ্কর খানিকটা সময় লাগবে! পূজোর কথা বলছো···পূজো যা করো—যে-মন্ত্র বলো···আর সকলে না জানলেও আমার তা অজানা নয়!

তীব্র রোষে মনখানা বুঝি ফাঁশিয়া যাইবে! কোনো মতে রাগ সামলাইয়া শিবকৃষ্ণ বলিল—একটু গোলমাল আছে, তাই···মানে···

—এর আবার গোলমাল কি?

শিবকৃষ্ণ বলিল—আজ দু'মাস হলো বড্ড দায় পড়েছিল বলে দিনু ময়রার কাছ থেকে বারোটা টাকা ধার করেছিলুম। তাগাদার চোটে প্রাণটা সে বার করে দিচ্ছিল! সেদিন দিনু ছিল গাঙ্গুলি-বাড়ীতে। ও দেখেছিল, আমি পনেরো টাকা পেয়েছি। কুটুম-বাড়ীর লোকজন চলে যেতেই সে একেবারে আমাকে জাপ্‌টে ধরলে। মান রাখতে বারোটা টাকা তাকে না দিয়ে ছাড়ান পেলুম না রে!

কথা শুনিয়া নিস্তারের চোখের দৃষ্টিতে যেন আগুন ফুটিল! নিস্তার বলিল—আমার কাছে গাল-গল্প শুনিয়ো না। তোমাকে আমি যেমন চিনি, এমন আর কেউ নয়। মিথ্যা কথা ছাড়া মুখে কখনো সত্যি কথা বেরুতে জানে না! হতভাগা বামুন! আমাকে বিয়ে-করা স্ত্রী পাওনি যে তোমার খিদ্‌মত্ খেটে পোষা বেরালের মতো পড়ে থাকবো তোমার পায়ের কাছে! আমার পষ্ট কথা, টাকা আমার চাই···আর আজ···এখনি! না দাও, তুমি তো নাচতে নাচতে বিলাসপুরে চলেছো আরো কিছু দাঁও বাগাবার মতলবে··· ফিরে এসে দেখো, এখানে আমি কি করি!···আমি পরাণ কৈবর্ত্তর মেয়ে···বামুনের রক্তে জন্ম নয় যে ছেঁদো কথায় ভুলে যাবো!

কথাটা বলিয়া নিস্তার দুম্-দুম্ শব্দে চলিয়া গেল। গেল রান্না-ঘরের দাওয়ায়। সেখানে তাকে ছিল নারিকেল তেলের ভাঁড়। ভাঁড় লইয়া দাওয়ায় বসিয়া মাথার চুল এলাইয়া তেলের ভাঁড়ে হাত ডুবাইল। শিবকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিল ওদিককার রোয়াকে···নিস্পন্দ ···নিশ্চল···যেন পাথরের মূর্ত্তি!

দু'মিনিট চার মিনিট দশ মিনিট কাটিয়া গেল, কাহারো মুখে কথা নাই! ঘষিয়া ঘষিয়া নিস্তার মাথায় তেল মাখিতে লাগিল; শিবকৃষ্ণর দিকে ভুলিয়াও চাহিল না···একটা মানুষ দাঁড়াইয়া আছে, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

শিবকৃষ্ণ নিশ্বাস ফেলিল। ইতিমধ্যে সংশয়ের যে-ছবি মনে অস্পষ্ট আবছায়ায় ভাসিয়া উঠিতেছিল, বুঝি তাহারি কথা ভাবিয়া নিশ্বাস ফেলিল। তার পর ডাকিল—নিস্তার···

নিস্তার জবাব দিল না···দুই পা ছড়াইয়া সরিষার তেলের বাটীতে হাত ডুবাইল।

বাহিরে আহ্বান জাগিল—শিবুঠাকুর বাড়ী আছেন?

শিবকৃষ্ণ সাড়া দিল,—কে?

—আমি রামরতন।

রামরতন মাখন গাঙ্গুলির সরকার।

শিবকৃষ্ণ বলিল—খপর কি রামরতন?

রামরতন বলিল—এইখানে দাঁড়িয়েই বলবো?

—না···না···আমি যাচ্ছি।

বলিয়া উঠানে নামিয়া নিস্তারকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—বড় বাড়ী থেকে রামরতন এসেছে···তাকে ভেতরে আনতে হবে তো। তুই কি আর তেল মাখবার জায়গা পেলিনে? এই সামনে বসে··· পা ছড়িয়ে! ওকে সদর থেকেই বিদায় করতে পারি না তো!

নিস্তার বলিল—আনো ডেকে, কাকে আনবে! আমি কুলের কুলবধূ নই! বয়সে গাছ-পাথর নেই···আমাকে এখনো উনি পর্দ্দা ঢেকে রাখবেন! এমন না হলে চাল-কলা চটকে দিন কাটাবে কেন?

কথা নয় তো, বন্দুকের ছররা! বুঝিল, নিস্তার ভয়ানক রাগিয়াছে। দশটা টাকা আদায় সে করিবেই! না দিলে কি করিবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা করিতে পারিল না।···চিন্তিত মনে শিবকৃষ্ণ আসিল বাহিরে। বলিল—কি খপর রামরতন?

রামরতন বলিল—বড় বাবু একবার ডাকছেন। এখনি যেতে হবে। খুব জরুরী দরকার, বলে দিলেন।

সর্ব্বনাশ! কোনো মতে পূজা সারিয়া তৈরী হইতে হইবে। বিলাসপুরের পাওনা আদায় করিতে যাইবে। এমন সময় বড় বাবুর আহ্বান!

শিবকৃষ্ণ বলিল,—মন্দিরে যাচ্ছিলুম। বড় বাবু ডাকছেন যখন, তখন পূজো আর আজ হবে না। বাবার মাথায় দু'টো ফুল বেলপাতা চাপিয়ে নিত্য-কাজ সেরেনি। নিয়েই আমি যাচ্ছি রামরতন। তুমি বড় বাবুকে বলো গিয়ে···

রামরতন বলিল,—দেরী করো না ঠাকুর, দেরী করলে আবার আমাকে আসতে হবে।

—না, না। আমি দু'-মিনিটের মধ্যে পূজো সেরে নেবো।

—বেশ!

রামরতন চলিয়া যাইতেছিল, শিবকৃষ্ণ ডাকিল—রামরতন···

রামরতন ফিরিল, বলিল—কেন?

—কেন ডাকছেন···কিছু জানো?

—না। আমি খাতা লিখছিলুম···আমাকে ডাকলেন। গেলুম। বড় বাবু বললেন, কাজ সেরে শীগগির গিয়ে শিবকেষ্টকে ডেকে আনো রামরতন!

—হুঁ! বাবুর কাছে আর কোনো লোকজন আছে, দেখলে?

রামরতন বলিল—এক জন বাইরের কে ভদ্রলোক আছেন···আর বাড়ীর ছেলেরা আছে।

—তাইতো! আচ্ছা, তুমি এগোও, আমি এই এলুম বলে।

রামরতন চলিয়া গেল। মনে এক-রাশ উদ্বেগ লইয়া শিবকৃষ্ণ চলিল মন্দিরে।

বড় বাবু কেন ডাকিলেন? ক'দিন ওদিক মাড়ায় নাই··· পরেশকে লইয়া মাতিয়া আছে···বলিতে গেলে, এ বিবাহের ঘটক সে···তাই! কিন্তু···

১৮

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—এই যে শিবকেষ্ট!

শিবকৃষ্ণ বলিল—আজ্ঞে, আমাকে ডেকেছেন?

—হ্যাঁ।···পরেশের ছেলের না কি বিয়ে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমিই এ-বিয়ের ঘটক?

—আজ্ঞে···বলিয়া শিবকৃষ্ণ মুখখানা কাঁচুমাচু করিল।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—মেনির পাকা-দেখায় পরেশকে আমি নিজে গিয়ে বলে এসেছিলুম···সে আসেনি। তার ছেলের পাকা-দেখায় আমাকে বলাও সে দরকার মনে করেনি।···উত্তম!··· নেমন্তন্ন না করার জন্য আমার অসুবিধা হয়নি অবশ্য···মানেরও হানি হয়নি!···তোমাকে ডেকে এ-কথা বলার মানে, তুমি এ বিয়ের ঘটক ···এ-কথাটা তোমার মনে হলো না! অথচ মন্দিরে কাজ করছো ···সে কতক আমার অনুগ্রহেই!

কথাগুলায় অন্তরালে বেশ খানিকটা ঝাঁজ! শিবকৃষ্ণ একটু ভড়কাইয়া গেল। করুণ নেত্রে সে চাহিয়া রহিল মাখন গাঙ্গুলির পানে।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—তুমি এখন পরেশের মন্ত্রী হয়েছো! ভালো!

শিবকৃষ্ণর মুখ বিবর্ণ···মুখে কথা ফুটিল না।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—তার পর হ্যাঁ. ভালো কথা, সুশীলের নামে কি সব নোংরা কথা না কি রটনা করে বেড়াচ্ছো!

শিবকৃষ্ণর বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এই রে! কোনো মতে আমতা-আমতা করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমি?

—হ্যাঁ, তুমি। পাদরী-সাহেবদের ইস্কুলে ঐ যে-মেয়েটি করে হেড-মাষ্টারী, তার সঙ্গে সুশীল না কি হাত-ধরাধরি করে বেড়ায়···

শিবকৃষ্ণ যেন পাথর বনিয়া গেছে···তেমনি নিস্পন্দ!

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—সুশীল হলো একালের ছেলে···বয়সে বড় হলেই মানুষকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে, সে ধারাই ওদের নয়! ওরা মানুষকে দেয়···যে যেমন লোক, ঠিক ততখানি তার দাম! এ-কথা তার কাণে গেছে। আমার কাছে এসে বলেছে। বলেছে, এর বিহিত যদি আমি না করি তো এ-নোংরামির জন্য তোমাকে সে ছেড়ে দেবে না!

শিবকৃষ্ণ প্রমাদ গণিল। একেবারে বিগলিত ভাবে আনত হইয়া মাখন গাঙ্গুলির পায়ে হাত দিয়া বলিল—আজ্ঞে বড় বাবু, আমার নামে কেউ মিথ্যা করে এ-কথা লাগিয়েছে! আমি বলে, আপনার দাসানুদাস···আমার এত-বড় আস্পর্দ্ধা হবে···আমি বলবো আপনার

ভাগনের নামে নোংরা কথা! তাও এক জন অপর মেয়েছেলের সম্বন্ধে!

মাখন গাঙ্গুলি হাসিলেন, বলিলেন—মেয়েছেলের সম্বন্ধে নোংরা কথা বলতে তোমার জিভে আটকায় না শিবকেষ্ট, ও কথা কেন বলছো! আমি তো তোমাকে জানি। তা বেশ, তুমি যদি এমন কথা না বলে থাকো, তাহলে সুশীলকে আমি ডাকি, তার সঙ্গে এর মোকাবেলা করো তুমি।

শিবকৃষ্ণর বুকের ভিতরটা গলিয়া অশ্রুর পাথার হইয়া উঠিল! ভাবিল, সর্ব্বনাশ! আবার সুশীলকে ডাকিবে, বলেন।

কিন্তু উপায় কি? জিভ তার শুকাইয়া কাঠ! মুখে কোনো কথা বলিতে পারিল না।

মাখন গাঙ্গুলি ডাকিলেন—সুশীল…

সুশীল আসিল। বলিল—ডাকছেন মামা বাবু?

—হ্যাঁ। এই তোমার সেই শিবকেষ্ট! ও বলে, ও এমন কথা বলেনি!

—বলেনি! সুশীলের দুই চোখ যেন ভাঁটার মতো গোল হইয়া উঠিল। সুশীল ডাকিল—বরদা বাবু…

ওদিক হইতে এক জন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁকে উদ্দেশ করিয়া সুশীল প্রশ্ন করিল—এ মানুষটিকে চেনেন কি না, দেখুন তো! কখনো একে দেখেছেন?

বরদা বাবু-ভদ্রলোকটি বলিলেন—আজ্ঞে, ইনিই! কাল স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছি—হেড মিসট্রেস্ আমার সঙ্গে ফটক অবধি এসেছিলেন …স্পোর্টস্ হবে, সেই সম্বন্ধে আমাদের কথা হচ্ছিল। আমি পথে এলুম —হেড মিসট্রেস্ চলে গেলেন তাঁর কোয়ার্টার্সে। পথে এই লোকটি তখন মশাই-মশাই করে আমাকে ডাকলেন…ডেকে কতকগুলো নোংরা কথা বললেন।

সুশীল বলিল—কি কথা বললেন. আপনার মনে আছে?

—আজ্ঞে, তা আছে বৈ কি। খুব কদর্য্য কথা।

সুশীল বলিল—দয়া করে সে কথা বলুন তো। উনি বলছেন কোনো কথা উনি বলেননি!

বরদা বাবু বললেন—উনি বললেন, আপনাদের ইস্কুলটা বৃন্দাবন-ধাম হয়ে উঠলো মশাই! গ্রামের ভালো ভালো জোয়ান বয়সের ছেলেগুলোকে নিয়ে রাস-লীলার ব্যবস্থা চলেছে!… কথাটা শুনে আমি চমকে উঠলুম। গলায় এক-গোছা সাদা পৈতে ধপ্-ধপ্ করছে…অচেনা লোক…বয়স হয়েছে…আমাকে ডেকে এত বড় কথা বলেন! আশ্চর্য্য হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এ কথার মানে? তাতে উনি বললেন—বড়-বাড়ীর ভাগনে সুশীল…অগাধ পয়সা…দেখতে রাজপুত্তুর…আপনাদের মিশিবাবা মিসট্রেসটি তাকে বেশ পাকড়াও করেছেন! আমি চোখ রাঙিয়ে ওঁকে ধমক দিলুম। বললুম, ফের যদি এমন নোংরা কথা বলেন, আপনাকে আদালত দেখিয়ে তবে ছাড়বো…আমাদের হেড-মিসট্রেস চমৎকার মেয়ে! ওঁর উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে…তাতেও নিজেকে কি ভাবে উনি অটল রেখেছেন! কি মায়া-মমতা স্নেহ-দয়া…অমন মেয়ে একটা জন্মায় না! তাঁর নামে এত-বড় কথা বলেন! পরে ভাবলুম, ভালো কথা নয়তো! ওঁর কাণে এ কথা গেলে উনি কতখানি ব্যথা পাবেন! তাই আমি সুশীল বাবুকে এ কথা বলেছিলুম কাল সন্ধ্যার সময়। ওঁর কথাতেই আপনার কাছে এসেছি আজ নালিশ জানাতে।

কথাটা বরদা বাবু শেষ করিলেন মাখন গাঙ্গুলির পানে চাহিয়া। মাখন গাঙ্গুলি চাহিলেন শিবকৃষ্ণর পানে। বলিলেন,—শিবকেষ্ট কি বলতে চাও? ভদ্রলোকের শত্রুতা আছে তোমার সঙ্গে? তোমার নামে মিথ্যা কথা বলতে এসেছেন?

এ-কথায় শিবকৃষ্ণ একেবারে এতটুকু!

সুশীল হাঁকিল—বলুন…জবাব দিন…সত্যজীব মশাই।

শিবকৃষ্ণ মাথা নত করিল…নির্ব্বাক্।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—কি মুস্কিল করেছো শিবকেষ্ট, জানো? মন্দির ছুঁয়ে আছো…তাও গাঙ্গুলিদের দৌলতে। ঐ মন্দির আর গাঙ্গুলিদের জোরে যার-নামে যা-খুশী চিরকাল বলে বেড়িয়েছ।… কারো সম্বন্ধে ভালো কথা কোনো দিন বলতে শুনিনি…যত সব ইতর নোংরা কথা। আজ শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছো। ওঁরা তোমার গাঙ্গুলিদের প্রজা নন্…গাঙ্গুলিদের বা মন্দিরের দোর ধরেও বাস করেন না। ওঁরা তোমার প্রতাপ সহ্য করবেন কেন? বলো…

অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে শিবকৃষ্ণ চাহিল প্রথমে মাখন গাঙ্গুলির পানে…তার পর দৃষ্টিতে অনেকখানি কাকুতি মিশাইয়া সুশীলের পানে! সুশীল তার পানেই চাহিয়াছিল…দু'চোখে অজস্র কৌতুক ভরিয়া।

শিবকৃষ্ণর পানে চাহিয়া সুশীল কহিল—ওঁরা তোমার নামে নালিশ করবেন। মানহানির মকদ্দমা। কি তুমি বলতে চাও?

শিবকৃষ্ণের দু'চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। এমন বিপদে জীবনে পড়ে নাই। গাঙ্গুলি-বাড়ীর জোরে জোর ফলাইয়া এ-গ্রামে চিরদিন আপন প্রতাপ বিঘোষিত করিয়া আসিয়াছে! আজ এ কি গ্রহ! তার মুখে কথা নাই।

সুশীল বলিল—জুলজুল করে চাইলে চলবে না তো! বলো, কি করতে চাও?

যে-বিধাতা শিবকৃষ্ণকে এমন ধাতুতে গড়িয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন এবং পাঠাইয়া পর্য্যন্ত কৌতুক-ভরে তাকে চালাইয়া আসিতেছেন, তিনিই বুঝি অলক্ষ্যে ইঙ্গিত দিলেন! তাঁর সে-ইঙ্গিতে নিঃশব্দে নিজের দুই কাণ মলিয়া শিবকৃষ্ণ দুই করপুট অঞ্জলিবদ্ধ করিল!

সুশীল মনে মনে হাসিল। তার পর বাহিরে এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—ওতেই হবে না ঠাকুর! কাণ-মলা নাক-মলা তো তোমার নিত্যকার ব্যাপার! নাকে-কাণে কড়া পড়ে গেছে। ওর চেয়ে বড় ব্যবস্থা করা চাই।

কোনো মতে শিবকৃষ্ণর মুখে কথা নিঃসারিত হইল। শিবকৃষ্ণ বলিল—কি ওঁরা চান, বলুন।

সুশীল চাহিল বরদা বাবুর পানে।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন, বরদা বাবুকে উদ্দেশ করিয়া,— আপনাদের আসামীকে তো পেয়েছেন! যা হয় ব্যবস্থা আপনারা করুন এখন! আমার বিশেষ কাজ আছে, আমাকে তাহলে ক্ষমা করবেন।

বরদা বাবু শশব্যস্তে বলিলেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি যাবেন বৈ কি! মামলা যখন সুশীল বাবুকে নিয়ে…

মাখন গাঙ্গুলি বিদায় লইলেন।

শিবকৃষ্ণ নির্ব্বাক্…মিনতি-ভরা নেত্রে চাহিয়া আছে…তেমনি কৃতাঞ্জলি-পুটে…ভিক্ষার্থীর মতো।

সুশীল বলিল—কি হলে ওকে ছেড়ে দেবেন, বলুন বরদা বাবু।

বরদা বাবু বলিলেন গম্ভীর কণ্ঠে—আমাকে যেমন এ-কথা উনি বলেছেন, তেমনি আরো অনেককে হয়তো বলেছেন। আর এ-কথা শুনে তাদের মনে যদি আলিস মেম-সাহেবের সম্বন্ধে এমনি ধারণা জন্মে থাকে—মানে, ইস্কুলের কতখানি অনিষ্ট হবে বলুন দিকিনি! তার উপর পাদরী-সাহেবদের কাণে যদি এ-কথা যায়? আলিসকে তাঁরা মেয়ের মতো দেখেন!

চিন্তান্বিতের মতো সুশীল বলিল—তা বটে! তাহলে…?

সুশীল আবার চাহিল শিবকৃষ্ণর পানে।

কোনো মতে শিবকৃষ্ণর অধরপুট খুলিয়া অস্ফুটে বাক্য বাহির হইল—বলুন্ কি করতে হবে আমায়! যা বলবেন, আমি তাই করতে রাজী আছি!

—রাজী আছো! সুশীল বলিল—তোমার অনুগ্রহ! তা আমি বলি, বরদা বাবু…

বরদা বাবু বলিলেন—বলুন…

সুশীল বলিল—মন্দিরে যাই, চলুন। মন্দির ঘুরে মন্দিরের দোরে নাকে খত দিয়ে যদি বলে, এমন সব নোংরা কথা জীবনে আর কখনো বলবে না…কারো নামে নয়…

—বেশ। আপনার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়েছে…আপনি যদি তাতেই ওঁকে ক্ষমা করেন…

সুশীল বলিল—এর পর কখনো যদি আর কারো নামে ওর মুখে কোনো রকম নোংরা কথা শুনি, তাহলে যোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করা যাবে।

দায়ে পড়িয়া এ-শাস্তি বহিয়া শিবকৃষ্ণ যখন মুখ গোঁজ করিয়া বাড়ী ফিরিল, বেলা তখন প্রায় এগারোটা। ফিরিয়া দেখে, নিস্তার বসিয়া ডাল বাটিতেছে। রান্নাঘরের দিকে চাহিল—ধোঁয়ার নাম-গন্ধ নাই! বলিল—রান্না হয়েছে?

গম্ভীর কণ্ঠে নিস্তার বলিল—না!

—না! তার মানে?

নিস্তার বলিল—মানে আবার কি! আমার ইচ্ছা হয়নি, রাঁধিনি। তোমার মাইনে-করা রাঁধুনি তো আমি নই।

শিবকৃষ্ণ বুঝিল, সেই দশটা টাকা!

ক্ষোভে-অপমানে বুকের ভিতরটা তখনো পুড়িয়া যাইতেছে—এখানকার হাওয়া পর্য্যন্ত সে ঝাঁজে তাতিয়া আছে। ভাবিয়াছিল, কোনো মতে বাহির হইয়া পড়িলে বাঁচিয়া যায়! না,ঘরে এই বিভ্রাট!

রাগ হইল। ও-বাড়ীর সমস্ত অপমান রাগের আগুনে ছাই হইয়া গেল! তাতিয়া চড়া গলায় শিবকৃষ্ণ বলিল—বদমায়েসীর আর সময় পাসুনি, না? বেইমানী করিস্ কার সঙ্গে? দশটা টাকার জন্য এত বড় অনিষ্ট করতে চাস্! ভাবিস্ তোর হাতের দু'টি ভাত না পেলে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে! দেবো না আমি টাকা! দশটা কি, এক টাকাও দেবো না! হঁ:—আমার আবার ভাতের ভাবনা! পরেশের গোয়ালে গিয়ে বললে দু'টি ভাত আমার খুব জুটবে'খন!

এই কথা বলিয়া চটিতে চট্‌চট্ আওয়াজ তুলিয়া শিবকৃষ্ণ গিয়া ঘরে ঢুকিল। নিস্তার টুঁ শব্দটি করিল না…যেমন বসিয়া ডাল বাটিতেছিল, তেমনি বাটিতে লাগিল।

গাঙ্গুলি-বাড়ীর দেওয়া সাদা ধুতি পরিয়া গায়ে গরদের চাদর ফেলিয়া শিবকৃষ্ণ বাহিরে আসিল, বলিল—রইলো তোর ঘর-দোর। আমি চললুম!

শিবকৃষ্ণ ভাবিয়াছিল, নিস্তার কিছু বলিবে! হয়তো এখনি এক পর্ব্ব বাধিয়া যাইবে! কিন্তু নিস্তার কথা কহিল না। হাঙ্গামা-পর্ব্বে নিস্তার পাইয়া শিবকৃষ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরেশ গাঙ্গুলির গৃহে যাচিয়া দু'টি অন্ন মিলিল। তার পর বিলাসপুর যাত্রা।

মনের মধ্যে জমাট অন্ধকার…সে-অন্ধকার ভেদ করিয়া কথা বাহির হইতে পারে না।

পরেশ গাঙ্গুলি বলিলেন—এমন গুম্ হয়ে আছো কেন হে শিবকেষ্ট? বাড়ীতে ঝগড়া হয়েছে, বুঝি?

এ-ইঙ্গিতে শিবকৃষ্ণ বর্ত্তাইয়া গেল! কোনো মতে বলিল,—দেখুন না, অনাসৃষ্টি বায়না! সে-বায়না রাখিনি বলে' উনুনে আগুন পর্য্যন্ত তায়নি। আমি একটু বেরিয়েছিলুম। এসে দেখি, দিব্যি নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার! ধুত্তোর বলে' চলে এলুম। ছোটলোক কি না…নাই পেয়ে মাথায় উঠে বসেছে। আমি যদি ওকে না পুষতুম, কোথায় কার উঠোন ঝাঁট দিয়ে দিন কাটাতো, বলুন তো!

পরেশ গাঙ্গুলি কৌতুক বোধ করিলেন…কিন্তু শুভকার্য্যে বাহির হইয়াছেন।…কৌতুক এখন ভালো লাগিল না। বলিলেন,—ও-সব কথা যেতে দাও এখন। ঘর করতে গেলে স্ত্রীর সঙ্গেই ঝগড়া-ঝাঁটি হয়…নিস্তার তো তোমার স্ত্রী নয়।

পাঁচটা কথায় শিবকৃষ্ণর মনের জমাট অন্ধকার কাটিতেছিল…তারি মধ্যে এক-সময়ে দুম্ করিয়া সে বলিয়া বসিল,—জানেন…বড় বাবুর মান হয়েছে…তাঁকে এ কাজে বলা হয়নি বলে। আমাকে ডেকে দু'শো কথা শুনিয়ে দেছেন আজ।

পরেশ গাঙ্গুলি বলিলেন,—কি বলেছেন?

—সে অনেক কথা…এখন আর বলবো না…মন খারাপ হবে। …ফেরবার সময় বলবো। সে তো আমাকে কথা শোনানো নয়…শোনানো আপনাকে। মানে, আমাকে রীতিমত অপমান করেছেন—শুধু বড় বাবু বললে গায়ে লাগতো না…ঐ ভাগনেটা! গুণধরের রাগ আছে কি না আমার ওপর! আমি চোখে দেখেছি ওঁর লীলাখেলা ঐ মাষ্টারণীর সঙ্গে! এ তারি জন্য…বুঝলেন কি না!

পরেশ গাঙ্গুলি বাধা দিলেন, বলিলেন,—আবার ঐ সব কথা!

অপ্রতিভ হইয়া শিবকৃষ্ণ বলিল,—আজ্ঞে না', সে কথা কি মুখে আনতে পারি! আপনারা হলেন অন্নদাতা! ঠাই-ঠাই হলেও রক্ত তো এক! তাছাড়া আকাশে থুতু ফেললে সে-থুতু এসে পড়ে নিজের গায়ে, এ-জ্ঞান আমার বিলক্ষণ আছে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যে বাজার-দর

অর্থনীতির বাজারে দাম কমে গেলে জিনিষ কাটে ভালো; আর সাহিত্যের বাজারে সাহিত্যের দাম কমে গেলে বাজারে যত না কাটুক পোকায় তার চেয়ে অনেক বেশী কাটে। মাছের বাজারে যেমন দেখি—মাছের দাম টাকা থেকে সিকিতে নামলেই বাজারে আর লোক ধরে না—সকলেই মাছ কিনতে ব্যস্ত। সাহিত্যের বাজারে কিন্তু এমন কখনও দেখি না। অনেকে হয়তো মনে করবেন সাধারণ বাজারে যেমন দুর্ভিক্ষ লেগেছে, আমার অভিপ্রায় সাহিত্যের বাজারেও তেমনি দুর্ভিক্ষ লাগুক। বেশ শস্তায় এত দিন পর্য্যন্ত বহু চোর-ডাকাতের কাহিনী, রূপ-কথা, ভূতের গল্প প্রভৃতি পড়ে আসছিলাম, এবার বুঝি তাও বন্ধ হয়ে যায়। সব বাজারেই বইয়ের দাম চড়ছে।

দেশের ইতিহাসে, দশের জীবনে সাহিত্যের মূল্য কত বেশী তা লেখনীর সাহায্যে বুঝিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। সাহিত্য সমগ্র জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। যখন কোন দেশে, কোন সমাজে নব চেতনার উদ্রেক হয়, সাহিত্যের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম তার সাড়া পাওয়া যায়। এর প্রমাণ ইতিহাসের পাতাতে দেখি। ফ্রান্সে যখন দরিদ্র কৃষকের প্রতি অত্যাচার অবিচার, তার উপর দুরন্ত কর-ভারের বোঝা তাদের মাথায় তুলে দেওয়া হয়, তখন সর্ব্বপ্রথম কে তাদের জাগিয়েছিল? কে তাদের বিপ্লবের নেশায় মাতিয়েছিল? এর সমস্ত দাবী একমাত্র সে যুগের ফরাসী সাহিত্যের প্রাপ্য। একটা জাতকে ভেঙ্গে নূতন ভাবে গড়ে, নূতন পথে চালাতে হলে চাই সবার আগে নবীন উদ্দীপনা, নূতন প্রাণের সাড়া।

দেশপ্রেমিক সাহিত্যিকদের লিখিত বহু তত্ত্বপূর্ণ সাহিত্যের মধ্যে এরূপ উদ্দীপনা, এরূপ নূতন প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়:

সাহিত্য কেবল লেখকের জন্য নয়, তাহা সার্ব্বজনীন, সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের।

অতীতের সাহিত্য অতীতেই শেষ নয়। তা যদি হতো তা হলে জগতে কোন সাহিত্যই থাকতো না, কোন ইতিহাসও লেখা হতো না। অতীতের সেই সাহিত্য বর্ত্তমানে নিয়ে আসে এক নূতন যুগের প্রেরণা; ভবিষ্যতেও তার রেশ গিয়ে পৌছয়। সাহিত্যের গতি অনেকটা নদীর গতির মত; তবে পার্থক্য এই যে, এ গতি দৃশ্য নয়। কিন্তু দৃশ্য না হলেই কি কোন জিনিষ নির্জ্জীব হয়? ঝড়ের তো কোন রূপ নেই, তা বলে ঝড়ের গতি নেই? সাহিত্যও তেমনি প্রাণহীন নিশ্চল নয়, এরও প্রাণ আছে, স্পন্দন আছে।

"যে জাতি নিশ্চল প্রাণহীন, সে জাতির সাহিত্যও সেইরূপ। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই জাতির প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। আজ ইউরোপে সমস্ত জাত প্রাণের সাড়া পেয়েছে, তাদের মধ্যে কর্ম্মের আহ্বান এসেছে, তাই তাদের সাহিত্য আজ উন্নত, তারাও উন্নত। আর যে জাতি মৃত তার সাহিত্যের প্রয়োজনই বা কি? যারা নিজের দেশকে জানে না, এমন কি নিজেদেরও চিনে না, সে জাতির মরাই ভাল। তাদের জন্য সাহিত্য লেখা কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র।"

বাংলার জাতীয় সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, তার প্রতিষ্ঠা বঙ্কিমী যুগের 'বঙ্গদর্শন' থেকেই শুরু হয়। মাত্র এই এক শতাব্দীর চেষ্টাতেই বাংলা ভাষা আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বলে পরিগণিত হয়েছে। যে-সাহিত্যের পরিচয় হয়েছিল এক দিন এক জন বৈদেশিকের হাতে, সেই সাহিত্য নিয়েই আজ বাঙ্গালী গর্ব্ব করে। অবশ্য তাদের এই গর্ব্ব করার যথেষ্ট কারণও আছে। এক দিন এই বাংলা সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছিল। সেই Nobel Prize-প্রাপ্ত বাংলা সাহিত্যের কি অধোগতি, আর সেই বাংলারই বা কি অবস্থা! যে দেশের লোক শতকরা এক জনও জ্ঞানের আলো পায়নি, সে দেশের সাহিত্যের আর কত উন্নতি হবে? কতকগুলি মুষ্টিমেয় লোকের চেষ্টায় কখনও কোন কালে সাহিত্যের উন্নতি হয়নি। সাহিত্য যখন সর্ব্বকালের, সর্ব্বজনের, তখন তাকে সার্ব্বজনীন করে তোলাতেই তার একমাত্র সার্থকতা।

সাহিত্যের বাজার যেন চিরকাল চড়াই থাকে। সাহিত্যের দর চড়া বলতে পুস্তকের দাম বাড়া বোঝায় না। তা যদি বোঝাতো, তা হলে বর্ত্তমানে কাগজের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের দামও বেড়েছে, বলতে হবে! কিন্তু সাহিত্যের দাম যদি সত্যই বাড়তো, তাহলে আসতো দেশের প্রাণে এক নবীন উদ্দীপনা, নূতন সাড়া। কিন্তু সে উদ্দীপনা, সে তেজস্বিতা আজ কোথায়? সাধারণ কথায় যাকে পুস্তক বলি, তার সঙ্গে সাহিত্যের অনেক পার্থক্য। তর্কশাস্ত্রে যেমন বলে, A term is a word, but a word is not a term. পুস্তক ও সাহিত্যের মধ্যে সম্বন্ধটাও সেই রকম। সাহিত্য বলতে পুস্তক বোঝায়, কিন্তু পুস্তক বলতে সাহিত্য বোঝায় না। সাহিত্যের ভাবই সাহিত্য। 'সাহিত্য' বলতে বোঝায় কোন-কিছুর সামঞ্জস্য রক্ষা। যে পুস্তক দেশের ও দশের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে, তা গল্প, উপন্যাস, কাব্য যাই হোক না কেন, তাহাই সাহিত্য। পুস্তক সাহিত্যের species মাত্র। Genus ও species-এ যে সম্বন্ধ, সাহিত্য ও পুস্তকেও ঠিক সেই সম্বন্ধ। Species ছাড়া genus যেমন ভাবা যায় না, তেমনি পুস্তক ছাড়া সাহিত্য ভাবা যায় না।

পুস্তকের দাম টাকায় মাপা যায়! কিন্তু সাহিত্যের দাম টাকায় মাপা যায় না। তার দাম বুঝতে গেলে বুঝতে হবে তার কাজ থেকে; তার বস্তু থেকে নয়। যে সাহিত্য জাতীয় জীবনের উপর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে' বটগাছের মত দাঁড়িয়ে আছে, একমাত্র সেই সাহিত্যেরই মূল্য আছে। আর কোন সাহিত্যের মূল্য থাকলেও সে মূল্য অতি অল্প। আবার সেই অল্পটুকুও ভালোর দিকে নয়, সমস্তই মন্দের দিকে। এর পরিচয় পেতে হলে অন্য কোথাও যেতে হবে না, এ দেশের সাহিত্যেই সে পরিচয় পাওয়া যাবে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বাংলা সাহিত্যের দর কমে যাচ্ছে। বাংলার সাধারণ লোক শস্তা সাহিত্য শস্তা দামে পেয়ে প্রচুর পরিমাণে উদরস্থ করছে। তার ফলে তাদের মানসিক অবস্থা দূরে থাকুক শারীরিক উন্নতিও হচ্ছে না। বাংলার সাহিত্যে অন্নের বন্দোবস্ত নেই, ভোজের ব্যবস্থা আছে।

প্রত্যেক দেশ-প্রেমিক মনীষীর কর্ত্তব্য, নূতন উপায় উদ্ভাবন করে নূতন পথে দেশের লোককে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, আর সেই

সঙ্গে চোরা-বালিতে ডুবে-যাওয়া জাতীয় সাহিত্যকে তুলে উদ্ধা'র করা। বিশ্বকবি গেয়েছেন :—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপুট। এ দৈন্য মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

বড় বই লেখার প্রয়োজন নেই, ছোট বইয়েই কাজ হবে। ছোট ছেলেদের মানুষ করতে হলে তাদের উপযোগী ছোট জামা ছোট কাপড় চাই। হাল্কা গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতিরও প্রয়োজন আছে—যেমন পেট ভরে শুধু লুচি-মোণ্ডা খেলেই চলবে না, সেই সঙ্গে জলও খেতে হবে। গল্প, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি সেই জলের সামিল। তবে এ জল বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। যত দিন পর্য্যন্ত না এই জলের বিশুদ্ধতা হয়, তত দিন পর্য্যন্ত জাতীয় জীবনে কোন উন্নতি নেই; বরং মড়ক লাগার আশঙ্কা বেশী। সেই সঙ্গে সাহিত্যেরও কোন উন্নতি নেই; দিনের পর দিন এর বাজার নেমে যাবে।'

শ্রীপৃথ্বিরাজ দাস

আন্তর্জাতিক-পরিস্থিতি

মিত্রপক্ষের "এসিয়েটিক ষ্ট্রাটেজি"

গত বৎসর অক্টোবর জেনারল জোশেফ ষ্টিলওয়েলের মার্কিণ প্রথায় শিক্ষিত দুই ডিভিসন চীনা সৈন্য ধীরে ধীরে উত্তর-ব্রহ্মের হুকং নদীর তট বহিয়া জাপ সৈন্যদিগকে খেদাইয়া লইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে মার্কিণ এঞ্জিনীয়ারগণ—চীনা শ্রমিকদের সাহায্যে লেডো রোড ধরিয়া কুনমিং হইয়া চুংকিংগামী নূতন পথ নির্ম্মাণ করিয়া চলিতে থাকে। আমেরিকার প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হইল চীনকে যুদ্ধরত রাখা। ("The Americans consider that their primary objective is to keep China in the war. British have yet to be convinced that the opening of Burma and maintenance of a flow of supply into China is the corner stone of Asiatic Strategy.") চীনকে যুদ্ধে রত রাখিতে হইলে জাপানীদের রসদ আদান-প্রদানের পথ রুদ্ধ করিয়া চীনকে রসদ পাঠাইবার পথ খোলা রাখা দরকার। জাপ জাহাজগুলি রেঙ্গুনে অস্ত্র ও রসদাদি নামাইয়া রেলওয়ে বা অন্যবিধ পথে এক দিকে মিয়িটকিয়িনা এবং অন্য দিকে লাশিও পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে। লেডো রোডের সহিত রেঙ্গুন মিয়িট্‌কিয়িনা রেলপথের যোগ আছে। চীনা-মার্কিণ সৈন্যদল যেমন মিয়িটকিয়িনায় জাপ-রেলওয়ে লাইন বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে, তেমনই জাপ সৈন্যগণ এক দিকে চিন-পাহাড়ের ভিতর দিয়া এবং চিন্দুইন নদী অতিক্রম করিয়া চীন-রসদ-পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করে, অন্য দিকে চীনে পিপিং-হ্যাংকো রেলপথে পূর্বকর্তৃত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে জাপানীরা হোনান প্রদেশে উত্তর হইতে যে ভাবে প্রবল আক্রমণ চালায় তাহাতে চুংকিং সরকার যেমন শঙ্কিত হয়, তেমনই ইঙ্গ-মার্কিণ—Asiatic Strategyও বিপন্ন হইতে থাকে। অনুপযুক্ত আহার, অনুপযুক্ত পোষাক এবং অনুপযুক্ত অস্ত্রসজ্জা—চীনাসৈন্যের এই দৈন্য অবস্থা দূর করিবার জন্য ভারত হইতে যে সাহায্য যাইতেছিল, তাহাও জাপ আক্রমণে বিপন্ন হয়। পিপিং-হ্যাংকো রেললাইন যদি জাপানী ব্যবহারযোগ্য করিতে পারে, তাহা হইলে হ্যাংকো হইতে ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত স্থান তাহারা অনায়াসে দখল করিতে পারিবে এবং এশিয়ায় প্রত্যেক জাপঘাঁটিতে জাপান অনায়াসে অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করিতে সক্ষম হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিণ নৌবাহিনী চীনের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে অবতরণ করিবার আয়োজন করিতেছে। এই অবতরণের প্রতিষেধক ব্যবস্থার জন্যই হানান প্রদেশে জাপানের এই প্রবল আক্রমণের আয়োজন। জুলাই মাসের প্রথম হইতেই জাপানীরা ক্যাণ্টন-পিপিং রেলপথের হেঙ্গিয়াং নামক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী অবরোধ করে। প্রায় ২০ হাজার চীনা সৈন্য দেড় মাস অবরুদ্ধ থাকিবার পর আত্মসমর্পণ করে।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে—

চীনে কতকটা সাফল্য লাভ করিলেও জাপান ভারত-চীন রসদ-পথ রোধ করিতে পারে নাই। আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে জাপান দুই স্থানে এই রসদ-পথ রোধ করিবার চেষ্টা করে—(১) উত্তরে লেডো রোড এবং (২) মণিপুরের পশ্চিমে পুরাতন আসাম-বেঙ্গল রেলপথ। এই অঞ্চলে মিত্রপক্ষের ভারপ্রাপ্ত মার্কিণ জেনারল মেজর ষ্টিলওয়েল স্বীকার করিয়াছেন যে, জাপানীরা যখন যেশামিতে পৌঁছে তখন তিনি শঙ্কিত হন, কিন্তু কোহিমায় পৌঁছিতে তাহাদের যখন ১ মাস লাগে, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হন। ১১শে শ্রাবণ মিয়িটকিয়িনার পতন হইলেও এখানে ১লা শ্রাবণ হইতে মিত্র সৈন্যদিগকে প্রতিগজ স্থান দখল করিতে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে হয়। মিয়িটকিয়িনার গ্রাম ঘিরিয়া পূর্ব্ব দিকে চীনা, দক্ষিণে চিন্দিৎ এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ষ্টিলওয়েল ও ভারতীয় সৈন্যদল প্রায় ৪ মাস চেষ্টা করিতেছিল। চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে লেফটনাণ্ট জেনারল জোশেফ ষ্টিলওয়েল ২ ডিভিশন চীনা ও মার্কিণ সৈন্য লইয়া এই পথে প্রথমে অভিযান করেন। এই অভিযানেই 'বর্ম্মার লরেন্স' মেজর জেনারল উইঙ্গেটকে প্রাণ দিতে হয়। জাপানী পক্ষে মিয়িটকিয়িনা রক্ষার ভার ছিল সিঙ্গাপুরবিজয়ী লেঃ জেনারেল রেণ্যা মাতাগুচির উপর। জেনারেল ষ্টিলওয়েল যখন পিপিংএ ছিলেন তখন মাতাগুচি তথায় জাপ লিগেশন গার্ডের কম্যাণ্ডার ছিলেন। উভয়ের পরিচয় ও প্রতিযোগিতার সূত্রপাত সেইখানেই, মিয়িটকিয়িনা জয়ের পর মিত্রপক্ষ ভারত হইতে চীনে রসদ প্রেরণের জন্য লেডো রোড সর্ব্ব ঋতুর উপযুক্ত করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিবে।

২২শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত সংবাদ পাওয়া যায় যে, মণিপুর হইতে আসাম-বেঙ্গল রেলপথের উপর জাপ আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত

হইলেও, মণিপুরের দক্ষিণ অঞ্চল হইতে জাপানীদিগকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করা যায় নাই। তবে টামুর উত্তরে এবং চিন্দুইন নদীর পশ্চিমে আর জাপসৈন্য নাই। টিড্ডিম রোড চিনগিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়া ১৬৩ মাইল সর্পিল গতিতে চলিয়াছে। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের সহিত এই পথ টিড্ডিমের যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। এই পথ গত বৎসরের প্রথম ভাগে জাপ-হস্তে পতিত হয়। জাপানীরা পথের ধারে স্থানে স্থানে বড় বড় মোটর চলাচল ঘাঁটী নির্ম্মাণ করে। মিত্রপক্ষ এই পথের উপর দিনের পর দিন বোমা বর্ষণ করিয়া বহু সেতু নষ্ট করিয়াছে এবং বোমার আঘাতে পাহাড় হইতে পথের উপর ধ্বস নামাইয়াছে। জাপানীরা আশা করিয়াছিল যে, বর্ষা নামিলে ব্যোমাবর্ষণ ক্ষান্ত হইবে। কিন্তু সে আশা ফলবতী হয় নাই। জাপরা ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সুরক্ষিত করিয়াছে, একটি সেতু নষ্ট হইবামাত্র নূতন নূতন সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে। পথের উপর ধ্বস নামিবামাত্র তাহা পরিষ্কার করিয়াছে। ইম্ফল-টিড্ডিম পথ দক্ষিণ হইতে ভারত আক্রমণের একমাত্র পথ। পথটি যেখানে মণিপুর নদী অতিক্রম করিয়াছে (অর্থাৎ মণিপুর হইতে ১২৬ মাইল দূরে) বৃটিশ সৈন্য ব্রহ্মদেশ হইতে পলায়নের সময় তথাকার ঝুলন সেতু নষ্ট করিয়া° দিয়া আসে। জাপানীরা সেখানে পাশাপাশি পায়ে চলিবার একাধিক সেতু নির্ম্মাণ করিয়া অগণিত কুলির সাহায্যে সমরোপকরণ আমদানী করিতে থাকে। গত কয় মাস মিত্রপক্ষের বিমানগুলি অবিরাম এই সকল সেতুর উপর আক্রমণ চালায়। ফলে মইরং ও চূড়াচান্দপুর অঞ্চলে জাপ রসদবাহী যানগুলি অচল হয় এবং মিত্রপক্ষের বিমানগুলি ইহাদের উপর আক্রমণ করে।

মণিপুর-ব্রহ্ম সীমান্তে জাপ-সৈন্যের অপর রসদ-পথ পালেল-টামু রোড। টামু গ্রাম জাপানীদের হাসপাতাল-কেন্দ্র ছিল। ঠিক যে দিন মিয়িটকিয়িনার পতন হয়, সেই দিনই মিত্রসৈন্য টামু গ্রাম দখল করিয়া এই পথ জাপ-সৈন্যমুক্ত করে।

শ্রাবণের শেষ ভাগে মণিপুর-ব্রহ্ম সীমান্তের অবস্থা এইরূপ—ইম্ফলের সমতল ভূমি হইতে জাপগণ সম্পূর্ণ বিতাড়িত। শিলচর পথ জাপ-কবল মুক্ত। টিড্ডিম রোডে মিত্র-সৈন্যগণ কুকি পাহাড় পর্য্যন্ত অগ্রসর। পালেল-টামু রোড সম্পূর্ণ দখল হয় নাই, ইহা দখল করিতে পারিলেই ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে জাপ-রসদ আমদানীর পথ সম্পূর্ণ ভাবে মিত্রপক্ষের করায়ত্ত হইবে।

শ্রাবণের মধ্য ভাগে জানান হয় যে, ৩ মাসে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের যুদ্ধে জাপানীদের ৫ ডিভিসন (অর্থাৎ প্রায় ৮০ হাজার) সৈন্য নষ্ট হয়। জাপানের নূতন সমর-সচিব এ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন—'The prosecution of the war with much stronger unity among the Japanese is needed to save the situation"—অন্য দিকে মিয়িটকিয়িনা দখলে উল্লসিত হইয়া বিলাতী সংবাদপত্রগুলি আশান্বিত হইয়া বলিয়াছে—"It is preliminary to recover Malaya and eventually Singapore, though the later can perhaps, hardly be attempted until Sumatra and possibly Java have been relieved."

জাপানের আশঙ্কা—

জাপানের এই আশঙ্কা এবং জাপশত্রুর এই উল্লাসের কারণ আছে। ভারত সীমান্তে পরাজয়, ভারত-চীন রসদ-পথ রোধের ব্যর্থ চেষ্টা, খোদ জাপদ্বীপপুঞ্জের উপর একাধিক বার বোমা-বর্ষণ, নিউগিনি, ফিলিপাইন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের একাধিক দ্বীপে মিত্রসৈন্যের প্রায় অবাধ অবতরণ—এ সকল জাপানের পক্ষে অশুভসূচক। জাপান বুঝিয়াছে যে, বৃটেন ও য়ুরোপীয় দেশগুলির দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জাপনেতারা প্রাচ্যখণ্ডে অতি দ্রুত সাফল্যলাভ করে; বর্ত্তমানে মার্কিণ সাহায্যে যে সকল য়ুরোপীয় দুর্ব্বল জাতিগুলি পুষ্ট হইয়া যখন সাফল্যলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। হয়ত শীঘ্রই এংলো-স্যাক্সন সর্ব্বশক্তি জাপানের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে। সম্প্রতি মিঃ চার্চ্চিল আশা করিয়াছেন যে, হিটলারকে পরাজিত করিয়া জাপানকে পরাজিত করা হইবে। এ সময় রণ-শক্তি বর্দ্ধিত এবং রণনীতি সবল করিবার জন্যই জাপানে তোজো সরকারের পতন হইয়া জেনারল কুনাই কি কৈসো সরকার গঠিত হইয়াছে। নূতন সরকার শক্তি সংরক্ষণের দিকে নজর দিয়াছেন, জাপানে সার্ব্বজনীন সৈনিক-বৃত্তি বাধ্যতামূলক হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, জাপান দ্বীপপুঞ্জের রক্ষাগণ্ডীর বাহিরে জাপ রণতরী যুদ্ধে নামিবে না।

হিটলার কি হতবীর্য্য ?

ইঙ্গ-মার্কিণ বোমার আক্রমণে জার্ম্মাণ জাতি হতবীর্য্য হইয়াছে, এরূপ কথাই শুনা যাইতেছে। এক দিকে জার্ম্মাণ শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বেপরোয়া বোমা-বর্ষণ, অন্য দিকে পূর্ব্বে অভাবনীয় রুশ-সাফল্য ও পশ্চিমে এংলো-স্যাক্সন আক্রমণ—ইহাতে জার্ম্মাণ জাতি অভিভূত হইয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছে। হিটলারের উপর না কি জাতির আস্থা শিথিল হইয়াছে। পূর্ব্ব রণাঙ্গনের বিপন্ন নগরগুলি পরিদর্শন করিতে না গিয়া না কি হিটলার বার্চ্চেসগাদেনে মুসোলিনী বা বাছা বাছা দেহরক্ষীদল লইয়া বোমা-বিস্ফোরণ-ভয়শূন্য কক্ষে দিনযাপন করিতেছেন। মে মাসের প্রারম্ভেই মার্কিণ সাংবাদিকগণ সংবাদ পান যে—কর্ত্তৃদলে (গোরিং, গোয়েবেলস্, হিমলার, রিবেনট্রপ, রোমেল, ও রানষ্টেট) ভেদ বাধিয়াছে, কিন্তু সুইডিস্ সাংবাদিকগণ বলেন—য়ুরোপ অভিযান আরম্ভ হইবার পর যখন মিত্র-সৈন্যদল জার্ম্মাণীর সীমান্তের অভিমুখে অগ্রসর হইবে, তখনই ভেদ আত্মপ্রকাশ করিবে, পূর্ব্বে নহে।

কিন্তু য়ুরোপে এংলো-স্যাক্সন আক্রমণ অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকে সংবাদ প্রচারিত হয় যে, জার্ম্মাণীতে রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। হিটলার এবং মুসোলিনীকে হত্যা করিবার জন্য এক বিরাট ষড়যন্ত্র হইয়াছে, হিটলারকে হত্যা করিবার জন্য যে বোমা-বিস্ফোরণ হয়, তাহাতে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রপতির দক্ষিণ-হস্ত হিমলার নিহত এবং গোরিং আহত হইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ বৃটিশ লেখক মিঃ এইচ, জি ওয়েল্‌স্ (৭৭) (হার্ব্বার্ট জর্জ্জ ওয়েলস্) অবশ্য তাঁহার নূতন গ্রন্থ ফর্টিটু—ফর্টিফোর" গ্রন্থে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন—'এ যুদ্ধের ফলাফল যাহাই হউক না কেন, তোমরা হিটলারকে হত্যা করিও না। এ যুগে প্রতিষেধক ও উদাহরণমূলক হত্যার প্রয়োজন সম্বন্ধে বিশেষ কোন আপত্তি

থাকিতে পারে না। জনপীড়ক, অপযৌনবৃত্তি, নরঘাতকের তালিকা তৈয়ারী করিলে তাহা কম বড় হইবে না। ইহারা শিরশ্ছেদের উপযুক্ত। এদের কোথাও ঠাই দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু এই হতভাগ্য উন্মাদ অষ্ট্রীয়ান ক্লীবকে যেন তোমরা কেহ মারিও না।' যাহা হউক, রয়টারের বণ্টিত সংবাদ হইতে এরূপ বুঝান হইয়াছে যে, জার্ম্মাণীর একদল বিশিষ্ট সমরনায়ক মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। এ সংবাদও প্রচারিত হয় যে, ইটালী ও ফ্রান্সে ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল এরউইন ফন উইজলেবেন, জার্ম্মাণ রিজার্ভ সৈন্যদলের সেনাপতি কর্ণেল জেনারল ফ্রম, অপর দুই জন সেনাপতি এবং রুশিয়ার বন্দী দুই জন সেনাপতি রুশিয়ার সহিত মিত্রতা করিবার ষড়যন্ত্র করেন। এ জন্যই হিটলারকে হত্যা করিয়া জার্ম্মাণ সেনাদলের হস্তে শাসনভার লইবার চেষ্টা হয়। কিন্তু নাৎসীদল যে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমরনায়কদিগের এই বিদ্রোহের (?) কোন প্রতিক্রিয়া রুশ, নরম্যাণ্ডী বা ইটালীর রণাঙ্গনে দেখা যায় নাই। এই তিন রণাঙ্গনের কোথাও জার্ম্মাণ প্রতিরোধ জার্ম্মাণ আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে শিথিল হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

য়ুরোপে এংলো-স্যাক্সন আক্রমণ—

য়ুরোপের ২ হাজার মাইল উত্তর-পশ্চিম উপকূল এংলো-স্যাক্সন আক্রমণ-স্থল বলিয়া বিবেচিত হয়। ব্রিটানী উপদ্বীপ হইতে জুডার-জি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ৭০০ মাইল স্থানের ৯টি বন্দর আক্রমণ-কেন্দ্র হইবার উপযুক্ত—(১) শেরবুর্গ—বৃটিশ উপকূল হইতে ৮০ মাইল দক্ষিণে বৃটেনের প্রতি যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া আছে। জার্ম্মাণরা এ স্থান খুব সুরক্ষিত করে। কনটেনটিন বা নরম্যান উপদ্বীপের পূর্ব্বস্থিত নিম্ন উপকূলে প্রথমে সৈন্য অবতরণ করিয়া এংলো-স্যাক্সনগণ এই স্থান দখল করিয়াছে। (২) সেন্ট নাজায়ার—লয়ার নদীর মোহনায় আক্রমণের সর্ব্বোত্তম কেন্দ্র বলিয়া বিবেচিত হইলেও উহা এখনও আক্রান্ত হয় নাই; (৩) জার্ম্মাণ সাবমেরিণ-ঘাঁটী লোরে—এখানে স্থল ও সমুদ্রপথে আক্রমণ-চেষ্টা চলিতেছে। জার্ম্মাণরা এখানে প্রবল বাধা দিতেছে; (৪) ব্রেষ্ট—স্থায়ী কেল্লা আছে, উপকূলে খাড়া পাহাড়, এখানেও জার্ম্মাণী প্রবল বাধা দিতেছে। (৫) লা-হেভার—সীন নদীর মোহনায়; (৬) ডীপে—১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মিত্র-সৈন্যগণ একবার এখানে সৈন্য নামাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু অতি প্রবল জার্ম্মাণ রক্ষা-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিবার মত উপযুক্ত সৈন্য ও ট্যাঙ্ক তাহারা তখন সংগ্রহ করিতে পারে নাই। (৭) বুলোঁ—ক্ষুদ্র বন্দর, অবাধ যানবাহন পরিচালনের অসুবিধা; (৮) ক্যালে—ইংলণ্ডের উপকূল হইতে মাত্র ২১ মাইল দূরে এবং (৯) ডানকার্ক—অবতরণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ইংরেজদিগকে এখান হইতে পশ্চাদপসরণ করিতে হয়।

গত ১ মাসের চেষ্টায় ইঙ্গ-মার্কিণ ফৌজ শেরবুর্গ হইতে প্রায় ১৬৫ মাইল দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া লয়ার নদী অতিক্রম করিয়াছে, অবশ্য নরম্যাণ্ডিতে সেণ্টমালো, মার্লে, ব্রেষ্ট এবং লোরে রণাঙ্গনে জার্ম্মাণী প্রবল বাধা দিতেছে। এংলো-স্যাক্সন ফৌজ বর্ত্তমান ফ্রান্সের ১৬৫×২০০ মাইল স্থানে পুরুভুজের ন্যায় বিস্তারলাভ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে। জার্ম্মাণরা না কি প্রায় বিনা যুদ্ধেই ব্রিটানী উপদ্বীপ ত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। ২০শে শ্রাবণ রয়টার এ সংবাদ বণ্টন করিয়া মন্তব্য করেন, একবার ব্রিটানীর বন্দরগুলি মিত্রপক্ষের হাতে পড়িলেই সৈন্য ও রসদ সরবরাহ বৃদ্ধি করা হইবে। কিন্তু নরম্যাণ্ডিতে মিত্রপক্ষের এই সাফল্য হইতে এরূপ ধারণা করা ঠিক হইবে না যে, তাহারা অবাধে ও অনায়াসে স্থানের পর স্থান অধিকার করিতেছে। এমন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, ক্রমেই জার্ম্মাণ-প্রতিরোধ প্রবল হইতেছে। অনেকে এরূপও অনুমান করিতেছেন যে, নরম্যাণ্ডিতে মিত্রপক্ষের সৈন্যগণ জার্ম্মাণ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া জার্ম্মাণীর সীমান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই হয়ত রুশগণ বার্লিনে গিয়া পৌছিবে।

বৃটেনে বোম্বার্ডমেণ্ট—

নরম্যাণ্ডিতে এংলো-স্যাক্সন আক্রমণের পাণ্টা জবাব যে জার্ম্মাণী না দিতেছে তাহা নহে। গত ২রা আগষ্ট মিঃ চার্চ্চিল যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, ৭ সপ্তাহ জার্ম্মাণ উড়ন্ত বোমা অবিরাম দক্ষিণ ইংলণ্ডের উপর যে আক্রমণ করে তাহাতে—

নিহত	—	৪৭৩৫
গুরু আহত	—	১৪০০০
গৃহ সম্পূর্ণ নষ্ট	—	১৭০০০
" আংশিক নষ্ট	—	৮০০০০০
" বাসের অযোগ্য	—	৬০০০০০

শুনা যাইতেছে, এই আক্রমণের ফলে ঘণ্টায় ৭ শত গৃহ নষ্ট হইতেছে। মিঃ চার্চ্চিল এই বেপরোয়া আক্রমণের গুরুত্ব অগ্রাহ্য করেন নাই। ইহার তুলনায়, নরম্যাণ্ডির যুদ্ধে জার্ম্মাণীর কত জনক্ষয় হইয়াছে তাহার হিসাব মিঃ চার্চ্চিল দেন নাই। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী ১৫ই জুন হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত যেখানে বৃটেনের উপর ৪৫ হাজার টন উড়ন্ত বোমা বর্ষণ করে, তেমনই মিত্রপক্ষও জার্ম্মাণীর উপর একই সময়ে ৪৮ হাজার টন বোমা ফেলিয়া প্রতিশোধ লইয়াছে।

রুশ প্রহার—

যে দিবসে ষ্টালিন বলিয়াছিলেন—"লক্ষ লক্ষ সোভিয়েট-প্রজা ফাসিষ্ট-দাসত্ব হইতে রক্ষা পাইয়াছে। আমাদের স্বদেশ এবং আমাদের মিত্র-দেশগুলিকে দাসত্বের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে আহত জার্ম্মাণ-পশুকে তাহার গুহাবাস পর্য্যন্ত খেদাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে পূর্ব্ব দিকে আমাদের সৈন্যদলের এবং পশ্চিমে আমাদের মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদিগের যুগপৎ আঘাত আক্রমণের প্রয়োজন।"

শ্রাবণের শেষ সপ্তাহে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, এক বা দুই সপ্তাহে খোদ জার্ম্মাণীতে লড়াই চলিবে। রুশরা ইতিমধ্যে পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে, এ অঞ্চলে জার্ম্মাণরা যে রুশ সৈন্যের সহিত মরণ-পণ যুদ্ধ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ যুদ্ধে পরাজিত হইলে জার্ম্মাণদিগের "পিতৃভূমি" বিপন্ন হইবে। রুশরা বিভিন্ন মর্ম্মকেন্দ্রে জার্ম্মাণদিগকে যুগপৎ প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে। রুশরা পোল রাজধানী ওয়ারসতে পৌছিয়াছে। পোলরা রুশদিগকে সাহায্য করিতেছে। দক্ষিণে রুশরা ক্রাকো আক্রমণ করিতেছে। জার্ম্মাণীর ১০ ডিভিসন সৈন্য ফিনল্যাণ্ড এবং ২০ হইতে ৩০ ডিভিসন সৈন্য অন্যান্য বাণ্টিক রাজ্যগুলিতে আছে। রুশরা

ইগাদিগের প্রত্যাগমন-পথ ছিন্ন করিয়াছে, মিঃ চার্চ্চিল মার্শাল ষ্টালিনকে নমস্কার করিয়া বলিয়াছে—আকাশ ও নৌপথে আমরা আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারি, কিন্তু রুশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্ত কোন ব্যক্তি জার্ম্মাণ সৈন্ত-বাহিনীর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

পোল-রুশ মৈত্রী—

রুশসৈন্য পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারসর দ্বারদেশে উপনীত হইতেই দেশভক্ত পোলগণ বিদ্রোহী হইয়া নগরস্থ জার্ম্মাণদিগকে আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে (২৩শে শ্রাবণ)। কিন্তু রুশিয়া সম্বন্ধে পোল্যাণ্ড কি মনোভাব অবলম্বন করিবে, তাহা এখনও ঠিক বুঝা যাইতেছে না। মে মাসে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পোল অধ্যাপক অস্কার ল্যাঙ্গেকে মার্শাল ষ্টালিন বলেন—"পোল্যাণ্ড য়ুরোপীয় রাজনীতিতে এক বিশেষ কর্ম্মভার গ্রহণ করিবে। সোভিয়েট য়ুনিয়নের স্বার্থে পোল্যাণ্ডকে শক্তিশালী করিতে হইবে।" পোল প্রধান সেনাপতি জেনারল সোসঙ্কোস্কীকে রুশরা আপনাদের স্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে করে। তাহারা মডারেট প্রধানমন্ত্রী ষ্টানিস্লস মিকোলাঝিকের পক্ষপাতী। বৃটিশ চাপে এই মডারেট দলের সহিত বৃটিশ ও রুশ কর্ত্তৃপক্ষের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

জেনাঃ সোসঙ্কোস্কীরই রাষ্ট্রপতি পদ পাইবার কথা ছিল. পোল্যাণ্ডস্থিত গুপ্ত সমিতিগুলি বৃটেনকে জানায়, যে, জেনাঃ সোসঙ্কোস্কীকে সেনাপতি পদে রাখিয়া প্রেসিডেণ্ট পদে এক জন বে-সামরিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। গুপ্তদলের প্রস্তাব অনুসারে টোমাজ আর্কিস্কেউস্কিকে-পোল-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সর্ব্বগ্রাসী রুশ-প্রভাব—

সম্প্রতি না কি পোলাণ্ডের ন্যায় ফিন্ল্যাণ্ড রুশ সন্ধি-সর্ত্ত মানিতে সম্মত হইয়াছে। অবিলম্বে রুশিয়ার সহিত সন্ধি করিবার জন্য ম্যানারহিম প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

গ্রীসেও রুশিয়া অনেক আশা করিতেছে। গ্রীসে এখন কম্যুনিষ্ট, গেরিলা দল ও মধ্যপন্থীরা দলাদলি লইয়া ব্যস্ত। গেরিলা দল কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার রুশপন্থী টিটোর সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতেছে। কিন্তু মস্কো সরকার যুগোশ্লাভিয়াকে আত্মমতাবলম্বী করিতে সমর্থ হইলেও বৃটিশ-আওতা হইতে গ্রীসকে সরাইতে পারিবে না।

যুগোশ্লাভিয়ার রাজা দ্বিতীয় পিটার নূতন সরকার গঠন করিয়াছেন। কিন্তু রুশিয়া গঠনে সম্মতি প্রদান না করিলে এই নূতন সরকার টিকিবে না। বুলগেরিয়ায় নিত্য অশান্তি বিরাজমান। অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে, রুশরা আসিয়া পড়িলে অধিবাসীরা সানন্দে তাহাদিগকে বরণ করিবে। স্পেনেও না কি ফ্রাঙ্কোর শাসনতন্ত্রের অবসানের জন্য বিপ্লব আসন্ন। বিপ্লবী দলের মধ্যে কম্যুনিষ্টরাই প্রবল ও সুসংগঠিত!

তুরস্কের কি মনোভাব?—

প্রচার, বৃটেনের অনুরোধে তুরস্ক জার্ম্মাণীর সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছে। ইংরেজরা অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তুরস্ক জার্ম্মাণীর সহিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। ইহার ফলে ২০শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত তুরস্ক-প্রবাসী ৫ হাজার জার্ম্মাণ তুরস্ক ত্যাগ করিয়াছে।

মিঃ চার্চ্চিল তুরস্ককে আশ্বাস দিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী বা বুলগেরিয়া তুরস্ককে আক্রমণ করিলে মিত্রপক্ষ তুরস্কের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিবে।

তুরস্কের উপরেও রুশ-প্রভাব কম নহে। কিন্তু জার্ম্মাণী তাহাকে উত্তেজিত না করিলে সে বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না। নিরপেক্ষ তুরস্কের মারফতে জার্ম্মাণী অনেক মাল-মসলা পাইত, এ জন্যই বোধ হয় প্রাচ্যখণ্ডের তোরণস্বরূপ এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বপ্রান্তীয় ঘাঁটীস্বরূপ তুরস্ককে প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা মিষ্টার চার্চ্চিল করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ পরাজয়ের পর য়ুরোপ—

মুখ্যতঃ আমেরিকা, বৃটেন ও সোভিয়েট রুশিয়াকে লইয়া নূতন একটি জাতিসঙ্ঘ গঠন করিবার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। ধনতান্ত্রিক আমেরিকা, সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন এবং জাতীয় সমাজ-তন্ত্রী রুশিয়ার সহিত এ সম্বন্ধে বে-সরকারী রফাও না কি হইয়া গিয়াছে।

মিত্রপক্ষের য়ুরোপ পরিত্রাণ করিবার পর কি করা যাইবে, না যাইবে, তৎসম্বন্ধে মস্কো বৈঠকে মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব কর্ডেল হাল, বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব এণ্টনি ইডেন এবং সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব মোলোটভকে লইয়া য়ুরোপীয়ান এডভিসরি কমিশন গঠিত হইয়াছে। কমিশনের গুপ্ত বৈঠকে না কি য়ুরোপ পুনর্গঠন সম্বন্ধে রুশিয়া মাত্র সামরিক পরিকল্পনা প্রদান করে। বৃটেন বে-সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক পরিকল্পনা দাখিল করে। আমেরিকা মাত্র সাধারণ ভাবে মন্তব্য করে। রুশিয়া না কি সমগ্র জার্ম্মাণ সৈন্যদলের পুনর্গঠন প্রস্তাব করিলে আমেরিকা ও বৃটেন তাহাতে সম্মত না হইয়া বলে, হেগ কনভেন্শনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে এ প্রস্তাবে রাজি হওয়া চলে না। বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস মনে করিয়াছে, তাহাদিগকে মোটেই আমল দেওয়া হয় নাই, ডি'-গলপন্থী ফরাসীরা না কি "ছোট-জাতদের" (Small nations) সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিতে অসম্মত। ডি'-গলপন্থী ফরাসীদেরও না কি কথা শোনা হয় নাই। টিউনিসে জেনারল চার্লস ডি'-গল আমেরিকা ও বৃটেনকে স্পষ্ট শুনাইয়া দিয়াছিলেন—ফ্রান্সের আর একটি পরম বন্ধু আছে (First in relation, dear and powerful Russia)। সে যাহাই হউক, ৫ মাস মস্তক ঘর্ম্মাক্ত করিয়া য়ুরোপীয়ান এডভিসরি কমিটী আর কিছু না করুন, অধিকৃত জার্ম্মাণীকে ভাগ-বাটোয়ারা করিবার পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। মোটামুটি পরিকল্পনা এইরূপ—(১) এলব নদীর পূর্ব্ব দিক সমস্তই সোভিয়েট সৈন্যদিগের আয়ত্তে থাকিবে; (২) এলব নদীর তটদেশ হইতে নেদারল্যাণ্ডস্ পর্য্যন্ত স্থান বৃটেনের শাসনাধীন হইবে; (৩) জার্ম্মাণীর দক্ষিণ দেশগুলি শাসন করিবে আমেরিকা এবং (৪) বার্লিন ও সম্ভবতঃ সমগ্র অষ্ট্রীয়া ইঙ্গ-মার্কিণ-সোভিয়েট এজমালি নিয়ন্ত্রণাধীন রহিবে। অধিকৃত ফ্রান্স ও ইটালীকে লইয়া কি করা হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

লক্ষণ যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী এংলো-স্যাক্সন রাষ্ট্রগুলির সহিত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতিযোগিতা আসন্ন। মার্কিণ সমর-সম্ভারের সহিত রুশ সমর-সম্ভার প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কি না বুঝা যাইতেছে না। তবে এখনও রুশিয়াকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নিকট হইতে সাহায্য সংগ্রহ করিতে দেখিয়া মনে হইতেছে, রুশিয়া আপাততঃ ইঙ্গ-মার্কিণ মিতালী পরিহার না করিয়া য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া যাইবে।

শ্রীতারানাথ রায়

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাকিস্থানের জের

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে রাজাজী যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদ্দ্বারা লীগের দাবী মানিয়া লওয়া হইয়াছে। গান্ধীজী তাহা সমর্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহাই নির্ভুল এবং একমাত্র পন্থা না-ও হইতে পারে। যদি তিনি সঠিক ভাবে বুঝিতে পারেন যে, ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে অকল্যাণকর, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমর্থন নাকচ করিতে প্রস্তুত আছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করা সত্য, ন্যায় এবং ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার সমান। ভারতবর্ষকে ব্যবচ্ছেদ করিবার পূর্ব্বে যেন তাঁহাকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়! ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার মত এখনও তাহাই আছে, কেবল পলিসি হিসাবে তিনি রাজাজীর পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি নিজের মত কাহারও উপর চাপাইতে চাহেন না। এই স্কীম সম্বন্ধে সকল দলের মতামত জানিতে ব্যগ্র। কারণ, তাহা না জানিলে দেশবাসীর প্রকৃত মনোভাব জানা সম্ভবপর নহে।

প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের ইচ্ছা অচল অবস্থার সমাধান হউক। বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর হস্তে শাসন-ভার ন্যস্ত করিতে প্রস্তুত নহেন। এই অচল অবস্থার জন্য দায়ী সরকার, দেশবাসী নয়। হিন্দু-মুসলিম মতভেদের দোহাই দিয়া তাঁহারা আমাদের চক্ষুতে ধূলিনিক্ষেপের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু প্রত্যেকেই জানেন এবং বুঝেন যে, এই মতভেদের সৃষ্টি এবং পুষ্টি বৃটিশ সরকারের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে। তাঁহাদের কারসাজির জন্যই ইহার কোন সমাধান সম্ভবপর হইতেছে না। কিন্তু এই মতভেদ সত্ত্বেও তাঁহাদের শাসনকার্য্যে যখন কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে না, তখন শাসনযন্ত্র ভারতবাসীদের হাতে আসিলেই বিকল হইয়া যাইবে, ইহা কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়? তাঁহাদের এই আপত্তি একটি অজুহাত মাত্র। ঘরোয়া বিবাদ আমাদের, আমরাই তাহার সমাধান করিব। এক ভাইকে আর এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে উস্কাইয়া বিবাদ বাড়ান যায়, মেটান যায় না। যাঁহারা এই প্ররোচনায় সাহায্য করেন তাঁহারা উভয় ভ্রাতারই সর্ব্বনাশ করিবার উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকেন, উপকারের জন্য নহে।

আমরা হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে একটি আপোষ রফা 'ন্যাশনাল বেসিসে' করিতে চাহি। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা প্রত্যেকেই এই সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার পর হইতে ধূয়া উঠিয়াছে, ভারত-ব্যবচ্ছেদ করিয়া মুসলিমদের জন্য পাকিস্থানের সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে, কারণ, এই ব্যবস্থা প্রকারান্তরে জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাতের সমান। ইহার দ্বারা ভেদ সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু মূল সমস্যার কোন সমাধানই হয় না। বাঙ্গালা, পঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলিম-সংখ্যা অধিক। এই সকল স্থানে মুসলিমদিগের উপর কেহ যে কোন অত্যাচার করিয়াছে এ কথা মুসলিম লীগ কোন দিন বলেন নাই, কিন্তু যে সকল প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যা অধিক, যেখানে কংগ্রেসের আধিপত্য বেশী, সেইখানেই না কি মুসলিমদিগের উপর অত্যাচার হইয়াছে, এ অভিযোগ করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলিম মতভেদের যথার্থ সমাধান করিতে হইলে উভয় পক্ষের নেতাদের একত্র করিয়া ঠিক করিতে হইবে, কি ভাবে কার্য্য করিলে সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থে আঘাত লাগিবে না। মিষ্টার জিন্না মুখে বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানবাসী সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়ে তিনি প্রচেষ্টা করিবেন। আমরা জানিতে চাহি, সেই প্রচেষ্টাটি কি এবং তিনি তাহা কি ভাবে কার্য্যকরী করিবেন। যাহা তিনি সাফল্যের সহিত পাকিস্থানে চালাইতে পারিবেন, হিন্দুরাও নিশ্চয়ই ঠিক সেই ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অবশিষ্ট স্থানে করিতে পারিবেন। সংখ্যালঘিষ্ঠদের নেতারা কি চাহেন, জানাইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাহা পূর্ণতঃ অথবা অংশতঃ দেওয়া সম্ভব কি না বিবেচনা করিতে পারেন। ইহা ছাড়া সত্যিকারের মিটমাটের অন্য কোন উপায় নাই। দুই পক্ষকেই কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে।

মিষ্টার জিন্না বহুরূপীর মত ক্রমাগত রং বদলাইতেছেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পাকিস্থান স্কীম কেহ 'ইনটেরিম' সময়ে স্বীকার করেন তাহা তিনি চাহেন না। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের প্রস্তাবের পর তিনি বলিলেন যে, প্রথমে পাকিস্থান স্কীম স্বীকার করিয়া তবে 'ইনটেরিম' মিটমাটের কথা আলোচনা করা চলিবে। পাকিস্থান যে কি তাহা তিনি কাহাকেও জানান নাই। হয় তাঁহার জানাইবার ইচ্ছা নাই অথবা তিনি নিজেই এখনও সঠিক জানেন না। এই না-জানানর ফলে তাঁহার সুবিধা হইয়াছে অনেক। তাই তিনি নাক সিঁটকাইয়া বলিতে পারিতেছেন "The offer made by Mr Rajagopalachari is nothing but a maimed and mutilated Pakisthan which can hardly meet my demand"

মিষ্টার জিন্নার ৫ই আগষ্টের বিবৃতি এবং লাহোরে মুসলিম লীগ সভার বক্তৃতা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি দোকানদারী দর-দস্তুর করিতেছেন। এমনই অদৃষ্টের পরিহাস যে, যখন মুসলিমগণ বুঝিতে পারিল যে, পাকিস্থান একটি বিরাট রকম ফাঁকি এবং মুসলিম লীগে ভাঙ্গন ধরিল, ঠিক সেই সময় গান্ধীজী মিষ্টার জিন্নাকে তুলিয়া ধরিলেন। একমাত্র তিনি ছাড়া জিন্নাকে অপর কেহ এই পোজিশনে তুলিতে পারিতেন না। কিন্তু ইহাতে মিটমাটের কোন সুবিধাই হইল না! মিষ্টার জিন্না নিজেদের বক্তব্য অতি বিশদ ভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম, গান্ধীজীর কথা-মত বৃটিশ সরকারের বদলে যদি 'ইনটেরিম' জাতীয় সরকার স্থাপিত হয়, তাহা হইলে পাকিস্থানের কি হইবে? নূতন শাসনপ্রণালী গঠিত হইলে পাকিস্থানকে কে রক্ষা করিবে? দ্বিতীয়, রাজাজীর স্কীম গান্ধীজীর স্কীমের সহিত মেলে না। ক্রিপস্ অফারের সহিত মেলে। কিন্তু গান্ধীজী এখনও ক্রিপস্ অফারের বিরোধী। তৃতীয়, কোন স্কীম সম্পর্কিত আলোচনার পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলিম মতভেদের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন এবং সেই জন্য তিনি শীঘ্রই গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। গান্ধীজী যে ভারত ব্যবচ্ছেদে মত দিয়াছেন, সে জন্য তিনি (জিন্না) আনন্দিত। চতুর্থ, তিনি চাহেন যে, প্রেস অথবা কোন দল

লীগের বহির্ভূত মুসলিমদের যেন আমল না দেন। তাঁহার ইচ্ছা, প্রত্যেক মুসলিম লীগের পতাকা-তলে আশ্রয় লউক।

গান্ধীজীর সহিত মিষ্টার জিন্না যে কি ভাবে আলোচনা চালাইতে চাহেন, তাহা বুঝা বিশেষ শক্ত নয়। তিনি পাকিস্থান যে কি বস্তু তাহা কাহাকেও জানান নাই। ফলে যতই সুবিধা দান করা যাউক না কেন, তিনি সর্ব্বদাই বলিতে থাকিবেন, ঠিক মনোমত হয় নাই। তাঁহার ইচ্ছা যে, জাতীয় গভর্ণমেণ্টে অর্দ্ধেক মন্ত্রিপদ মুসলমানদিগকে দিতে হইবে এবং বাঙ্গালা, এমন কি হিন্দু-প্রধান আসামও পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবে কি না সে সম্বন্ধে হিন্দুদের কোন মতামত লওয়া হইবে না। এই সব উক্তি হইতেই বুঝা যায়, স্বরাজ, স্বাধীনতা অথবা মিটমাট লীগের উদ্দেশ্য নহে। বস্তুতঃ, মিষ্টার জিন্না মহাত্মাজীকে এক বিষম ফাঁদে ফেলিয়াছেন। যদি গান্ধীজী মিষ্টার জিন্নাকে সন্তুষ্ট না করিতে পারেন, তবে লোক-চক্ষুতে তিনি (জিন্না) যে হেয় প্রতিপন্ন হইবেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণই নাই। বরং তাঁহার সুবিধাই হইবে। তিনি তখন বলিবেন, গান্ধীজী পাকিস্থান স্কীম স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু মুসলিমদের সুবিধা স্বার্থ বজায় রাখিতে সম্মত হন নাই। বৃটিশরা বলিবে, স্বাধীনতা দানের পথে ভীষণ বাধা, হিন্দু-মুসলিম মনোমালিন্য। যখন এত করিয়াও কোন মিটমাট সম্ভব হইল না, তখন আমাদের ট্রাষ্টিশিপই চলুক। যদি গান্ধীজীর সঙ্গে মিষ্টার জিন্নার মতের মিল হয়, তাহা হইলেই যে বৃটিশ সরকার আমাদের হাতে শাসনযন্ত্র তুলিয়া দিবেন, এইরূপ চিন্তা করাও মূর্খতা। কথায় বলে 'দুরাত্মার ছলের অভাব নাই।' এক জিন্না গেলে তাঁহারা আরও জিন্না সৃষ্টি করিবেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী বলিয়াছেন, ভারত-ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে তাঁহাকে যেন ব্যবচ্ছেদ করা হয়। এই মত স্বীকার করা ভগবানকে অস্বীকার করারই নামান্তর। আজ প্রত্যেক দেশপ্রেমিক যে স্কীমের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন তাহা কেন যে তিনি সমর্থন করিলেন, তাহা বুঝা শক্ত। ইহাতে অনেকের মনেই ধোঁকা লাগিয়াছে। তাঁহার 'ইনসাইড ভয়েসে'র জন্য হিন্দু ভারতবাসীদের ভয়েস রুদ্ধ হইতে বসিয়াছে। রাজাজী অথবা তিনি কি ভাবিয়া দেখেন নাই যে, এই স্কীম কখনই কার্য্যকরী হইতে পারে না? আজ যাঁহারা 'বাকি'স্থানে আছেন, পর-বৎসরই তাঁহারা 'পাকি'স্থানে গিয়া পড়িবেন। বাঙ্গালা দেশকে একেবারে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে হইবে। দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর এবং কুচবিহার বাঙ্গালার বাহিরে চলিয়া যাইবে। ত্রিপুরা ষ্টেট ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশও বাঙ্গালা হইতে বহিষ্কৃত হইবে! হিন্দু বাঙ্গালায় থাকিবে কেবল বর্দ্ধমান ডিভিশন, ২৪ পরগণা ও খুলনা। বাঙ্গালা এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যে জন্য এই মৃত্যুদণ্ড! বাঙ্গালার হিন্দুরা তো এমনই কম্যুনাল ডিসিশনের জন্য অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

ভারতবর্ষে শতকরা ৭২ জন হিন্দু থাকা সত্ত্বেও যদি তাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমদের জন্য কোন নিয়ম-কানুন প্রস্তুত করিবার অধিকারী না হন, তবে শতকরা মাত্র ৫০ জন মুসলিম কি করিয়া বাঙ্গালার হিন্দুদের জন্য তাহা করিবার দাবী করেন? বুদ্ধিভ্রংশ না হইলে এইরূপ পরিকল্পনা কেহ সমর্থন করিতে পারে না।

মিটমাট একমাত্র হিন্দুদের দায়িত্ব নহে। মুসলিমদেরও বাঁচিয়া থাকিতে হইলে উভয় দলের মিলনের প্রয়োজন। কিন্তু তাহার পন্থা 'ইহা নয়। যে দেশে হিন্দু ও মুসলমানকে একত্র বাঁচিতে এবং একত্র মরিতে হইবে, সেখানে এই মনোভাব হীনতার পরিচায়ক। মুসলমান নেতাদের কি এই সরল সত্যটি বুঝিবার ক্ষমতা নাই? অথবা ইহা নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গের ব্যবস্থা। আমাদের মনে হয়, এইরূপে স্বরাজ লাভ করা যায় না এবং এইরূপ নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন লীগপন্থী মুসলিমদের সহিত আপোষ রফার চেষ্টা করা কোন মতেই উচিত নহে।

ব্যর্থতার পরিহাস

আমেরিকার ব্রিটনউডস্ সহরে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রানীতির নব পরিকল্পনা আলোচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের দেনা-পাওনা মিটান এবং আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর কালের জন্য একটি সুব্যবস্থার যে প্রয়োজন আছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র যে ভাবে নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধার দিকে নজর রাখিয়া এই পরিকল্পনা গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে পরাধীন ভারতবাসীর যে কোন সুবিধা হইবে তাহা মনে হয় না। বৃটেনের নিকট ভারতের আজ প্রায় এক হাজার কোটি ষ্টার্লিং পাওনা। ইহার বদলে তাহাদের নিকট হইতে কোন জিনিষপত্র পাওয়া যাইতেছে না। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য সেই পাওনা ডলারে রূপান্তরিত করিয়া আমেরিকা হইতে মাল-পত্র জোগাড় করাও সম্ভবপর হইতেছে না। ভারতের কোটি কোটি লোকের বিরাট স্বার্থত্যাগের উপর এই ষ্টার্লিং পাওনা গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাথমিক পরিকল্পনায় যদিও আমেরিকার পক্ষ হইতে এই পাওনা পরিশোধের একটা স্কীম হইয়াছিল, পরে তাহা ইঙ্গ-মার্কিণ বিশেষজ্ঞদের নূতন পরিকল্পনায় বাতিল হইয়াছে! এই উপেক্ষা সত্যই ক্ষোভজনক এবং নিন্দনীয়। ভারতীয় প্রতিনিধি মিষ্টার এ, ডি শ্রফ বিষয়টি সম্পর্কে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি দাবী করেন যে, ইণ্টারন্যাশনেল মনিটারী ফণ্ডের সাহায্যে এই পাওনা ষ্টার্লিং আদায় ও তাহা প্রয়োজন মত ডলার ও অন্যান্য বিদেশী মুদ্রায় রূপান্তরিত করা সম্পর্কে একটি ধারা আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রানীতি পরিকল্পনায় যুক্ত করা হউক। কিন্তু বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি তোলেন। আপোষের চেষ্টায় মিষ্টার শ্রফ একটা নির্দ্ধারিত অংশ সম্বন্ধে এই সুবিধা দানের জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাও বাতিল হইয়া যায়। বৃটিশ সরকারের অভিরুচির উপর নির্ভর করিতে গেলে ভারতের পাওনা কোন দিনই পুরাপুরি ভাবে আদায় হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারত-বাসীর স্বার্থত্যাগের কোন মূল্যই তাঁহারা দিতে প্রস্তুত নন। এই পাওনা আদায় না হইলে দরিদ্র দেশের যে কি অপূরণীয় ক্ষতি হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা সত্য সত্যই শিহরিত হইতেছি। অর্থ ও যন্ত্রপাতির অভাবে ভারতের শিল্পোন্নতি বাধা পাইবে। বেকার-সমস্যা, অনাহারে মৃত্যু অবাধ গতিতে বাড়িতে থাকিবে। অথচ বিশ্বের দরবারে কি এই অন্যায়ের কোন প্রতিকারের আশা নাই? মুষ্টিমেয় প্রভাব ও প্রতাপশালী জাতির পরাধীন জাতির প্রতি এই অত্যাচার ও অবিচার, স্বৈরাচার ও স্বার্থপরতা কখনও বন্ধ

হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই কি যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা! এই কি ডেমোক্রেসি !!

মিষ্টার এ, ডি, শ্রফ ঠিকই বলিয়াছেন—"ব্যাঙ্কে দশ লক্ষ টাকা জমা থাকিলেও যে লোক নগদ টাকার অভাবে ট্যাক্সি ভাড়া দিতে পারে না—ভারতের অবস্থা তাহারই মত।"

—

ভারতের অচল অবস্থা

'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' বৃটিশ সরকারকে ভারতীয় অচল অবস্থার অবসানের জন্য অনুরোধ করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে ভারতের প্রীতি অর্জ্জন করা না করার মধ্যে নির্ভর করে আমাদের সহিত ভবিষ্যৎ ভারতের সহযোগিতা বা বিরোধিতা।" ভবিষ্যতের কথা যদি ছাড়িয়াও দেওয়া যায়, তথাপি ভারতের প্রাঙ্গণে যে যুদ্ধ তাহাতে জয়ী হইতে হইলে ভারতের সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদীরা মুখে এই সত্য স্বীকার না করিলেও মনে মনে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারণ করা তো দূরে থাক, ভারতের প্রসারিত হস্ত বারংবার উপেক্ষা-ভরে ঠেলিয়া দিয়াছেন। প্রকৃত সহযোগিতার মূলে আছে স্বাধীনতা। পরাধীন জাতি সহযোগী হইতে পারে না। বন্ধুত্ব দৃঢ় করিতে হইলে উভয় পক্ষই সমস্তরের হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভারতবর্ষকে আত্মস্বাতন্ত্র্য অথবা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে সাম্রাজ্যবাদীরা একান্ত নারাজ। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' আরও বলিয়াছেন—"বর্ত্তমানে যাঁহাদিগকে বন্দী রাখা হইয়াছে তাঁহারাই হয়তো ভারতের ভবিষ্যৎ নেতা হইবেন।" সিদ্ধকাম বিদ্রোহীই ভবিষ্যতে দেশভক্ত বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। ফ্যাসিষ্ট শক্তি উৎসাদন করিতে হইলে আজই হউক আর কালই হউক, এই বন্দীনেতাদের সহিত যে বৃটিশ সরকারকে পরামর্শ করিতে হইবেই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে অনেকের লেবু ক্রমাগত কচলাইয়া তিক্ত করিয়া ফেলা অভ্যাস আছে এবং মানুষ অভ্যাসের দাস।

আশ্চর্য্য এই যে, এই ক্রমবর্দ্ধমান খাদ্যসঙ্কট সচিবমণ্ডলীর চোখে কিছুতেই পড়িতেছে না। যাহা দেখিতেই পাইতেছেন না, তাহা দূর করিবার কথা কি করিয়া ভাবিবেন? সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাঙ্গালা দেশের এই অবস্থা হইল কেন? মোটা কথায় উত্তর আছে 'যুদ্ধ', কিন্তু সোজা কথায় উত্তর হইল সচিবমণ্ডলীর অযোগ্যতা। ট্রেনের টানাটানির দোহাই দিয়া কত দিন দায়িত্ব ঠেকাইয়া রাখিবেন? আবার যদি দুর্ভিক্ষ প্রবল ভাবে দেখা দেয়, অদূর ভবিষ্যতে মহামারীর আকারে প্রকাশ পায়, তাহা কি সামরিক প্রচেষ্টার পক্ষে খুব লাভজনক হইবে? না, সচিবমণ্ডলীর পক্ষেই তাহা গৌরবের বিষয় হইবে?

কলিকাতায় আবার একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে,—কোথায় যাই! কোথাও মাথা গুঁজিতে হইবে তো? হোটেলে স্থান নাই, মেসগুলির বারান্দা পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ। বাড়ী তো পাওয়াই যায় না। বড় বাড়ী দেখিলেই সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তাহা দখল করিতেছেন। যাতায়াতেরও সুবিধা বিলক্ষণ! অক্ষতদেহে অক্ষত জামা-কাপড়ে ট্রামে বাসে ওঠা-নামা অসম্ভব। অথচ কলিকাতায় লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। নিত্য নূতন সামরিক অফিস স্থাপিত হইতেছে! আমরা এখন কোথায় যাই? কি বা খাই?

চারি দিকে অভাব। কিন্তু এই অভাবের মধ্যেও প্রাচুর্য্য আছে; 'পারমিট' 'লাইসেন্স' 'কোটা' 'বরাদ্দ' ইত্যাদির বিরাট বহর এবং খবরদারী। যাহা নাই তাহা লইয়া মাথা ব্যথা। কাগজ দুর্লভ, কিন্তু খবরদারী বাহিনী ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। দুই মণ চাউল কিনিতে হইলে দুই ডজন হুকুমদারের পারমিট প্রয়োজন। মাথায় মাখিবার নারিকেল তৈল নাই, কিন্তু তৈলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশটা অফিসার মোতায়েন আছেন। দুধ-ঘি দুর্লভ অথচ নিয়ন্ত্রণের জন্য দপ্তর পরিপূর্ণ। চারি ধারে অফিসার কণ্ট্রোলার ইন্সপেক্টর, আবার তাঁহাদের অ্যাসিষ্ট্যান্ট, সাব-ডেপুটি, ভাইস! এই চক্রব্যূহের মধ্যে পড়িয়া অভিমন্যুর মত প্রাণটাই শেষ পর্য্যন্ত হারাইতে হইবে। কিন্তু প্রতিকার কোথায়? কে প্রতিকার করিবে?

—

কোথা প্রতিকার?

অনাহারে স্বল্পাহারে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য তো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বরাদ্দ চাউলে কাঁকর, আটায় ভূষি। মাছ-মাংস, ডিম, তরীতরকারী অগ্নিমূল্য, গৃহস্থদের দুষ্প্রাপ্য। ফলে উদরী, বেরিবেরি, কলেরা ও ম্যালেরিয়ায় দেশ সাবাড় হইতে বসিয়াছে।

বর্ষাকালে বাজারে পটল ও ইলিশ মাছ সস্তা হইত। পটল ৩।৪ পয়সা ও ইলিশ মাছ ৪।৫ আনা সেরে পাওয়া যাইত। এইবার ঝিঙ্গে চার আনা, ওল আট আনা। আলু, কদু, কাঁচকলা, কচু সবই নাগালের বাহিরে। মাংস আড়াই টাকা, মাছ তিন টাকা সের। ডিম পাঁচ আনা জোড়া। খাই কি? সাধারণ বাঙ্গালীর যা আয় তাহাতে এই বাজারে সংসার চালানো অসম্ভব।

—

'বসুমতী'র বিরাট দান

'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা ইন্দুপ্রভা দেবী তাঁহার পরলোকগত পুত্র-কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ রামকৃষ্ণ মিশনকে তিন লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দশ হাজার টাকা এবং প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের আসবাব-পত্র দান করিয়াছেন। ৺সতীশচন্দ্রের উইল অনুসারে তাঁহার ষ্টেটের একজিকিউটরগণ ঐ সঙ্গে তাঁহার খড়দহের সন্নিহিত রহড়া গ্রামের চারিখানি বাগানবাড়ী মিশনকে দান করিয়াছেন। মিশন কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই ঐ স্থানে অনাথ বালকদিগের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহাদের এই বিরাট দান বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গোষ্ঠবিহার

ভাদ্র, ১৩৫১]

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস

সুফী-ধর্ম্মে বেদান্তের প্রভাব

মনুষ্য-প্রকৃতির দুইটা দিক্ আছে। ইহা তাহার চিত্ত ও বুদ্ধি। চিত্তের কার্য্য অনুভব, বুদ্ধির কর্ম্ম বিচার। চিত্ত ও বুদ্ধির সমবায়ে মানব-জীবন গঠিত। যে শাস্ত্রে বিচারের স্থান প্রধান, যাহা বিচারের অগ্নি-পরীক্ষায় সকল বস্তু পরিশুদ্ধ করিয়া লয়, তাহার নাম দর্শন এবং যাহা মুখ্যতঃ ভাবপ্রধান তাহা ধর্ম্ম। এই দুই উপাদানের আধিক্য বা অল্পতার তারতম্য অনুসারে সত্যানুসন্ধানকারী দার্শনিক বা ধার্ম্মিক নামে অভিহিত হন। কিন্তু উভয় বস্তু সমভাবে বর্ত্তমান থাকিলে এবং উহাদের সামঞ্জস্য সাধিত হইলে mysticism জন্মলাভ করে। যখন বিচার-বুদ্ধি বাস্তবের গণ্ডী পার হইয়া অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যে প্রবেশ ও ভক্তির রূপ গ্রহণ করে কিম্বা ধর্ম্মচিন্তা অন্তর্দৃষ্টির কোঠায় আরোহণ করিয়া যখন চিরাচরিত প্রথা ও নিয়মের বাহ্যিক আবরণ ভেদ করিয়া সত্য নির্ণয়ে সমর্থ হয়, তখন তাহাকে mysticism নামে অভিহিত করা যায়।

মিষ্টিক বলিয়া সুফী মতে ধর্ম্ম ও দর্শন মিলিত হইয়াছে। বেদান্তের সহিত সুফীর কি সম্বন্ধ, তাহা দেখিবার পূর্ব্বে সুফী বলিলে আমরা কি বুঝি, তাহার জন্ম কোথায়—এ সব জানা প্রয়োজন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে "সুফী" গ্রীক্ শব্দ হইতে উদ্ভূত; ইহার অর্থ "জ্ঞানী" বা ইস্লাম ধর্ম্মের জ্ঞানানুসন্ধানকারী। কিন্তু সুফী-গণের মতে ইহার অর্থ "যাহা পবিত্র" অপর ব্যক্তিদিগের মত যে সকল ধার্ম্মিক ভিক্ষুক মস্জিদের উপাসকগণের নিকট ভিক্ষার আশায় মস্জিদের বহির্ভাগে উচ্চ স্থানে উপবিষ্ট থাকিত, তাহাদিগকে সুফী বলা হইত। মোটামুটি বলিতে গেলে যাহারা ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের প্রতি বৈরাগ্য এবং পার্থিব সুখের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ মোটা পশমের পোষাক পরিধান করিত, তাহারাই সুফী নামে পরিচিত হইত। ঐতিহাসিকের চক্ষে দেখিলে হয়ত প্রতীয়মান হইবে যে, ইহা ইস্লাম ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব বা মোহম্মদ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সার বচন বা কোরাণের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা মোহম্মদীয় ধর্ম্ম জন্ম লাভ করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী অধুনাবিস্মৃত কোন ধর্ম্মের শেষ চিহ্ন বা ভারতের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যভাব-প্রসূত ধর্ম্মমত সুফী ধর্ম্মের শান্ত ও স্থৈর্য্য ভাব এবং ইহার মিষ্টিসিজম্ দেখিয়া অনুমান হয় আরব, মিশর, মরোক্কো, ও মোসলেম-জগতের অনার্য্য দেশ সমূহে ইস্লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার সময় হইতে ইহা বর্ত্তমান ছিল।

ইস্লাম ধর্ম্মের উন্নতি ও বিস্তারের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে বৈদেশিক প্রভাবের ছায়া পতিত হইয়া উহার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছিল। পশ্চিম এশিয়ার উর্ব্বর ক্ষেত্রে পৃথিবীর চারিটি প্রধান ধর্ম্ম অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া বিশ্বজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। খৃষ্ট-জন্মের ১৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মুশা, ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে জোরষ্ট্রার এবং ৬০০ শত বৎসর পরে মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম-চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ইস্লাম আরবের মরুপ্রদেশে জন্মলাভ করিয়া বিবিধ ভাব-প্রবাহের সুমধুর বারিসিঞ্চনে পরিবর্দ্ধিত ও সুসংস্কৃত হইয়া বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করিয়াছে। বেষ্টনীর অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নবজাত শিশু যেমন প্রাণ-শক্তি বাড়াইয়া তোলে এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করিয়া নিজেকে পালোয়ানের উপযোগী করিয়া তোলে, মুশা, জোরষ্ট্রার ও খৃষ্ট-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সমূহ হইতে তেমনি উপকরণ গ্রহণ করিয়া ইস্লাম তাহার ক্ষীণ অস্থি-কঙ্কাল বলিষ্ঠ করে। নববলে বলীয়ান্ ইস্লাম আরবের তালতরুর প্রাচীর ভেদ করিয়া বহির্জ্জগতের বিস্তৃত ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইল। বৈদেশিক ধর্ম্মসমূহের সঙ্ঘর্ষে ইস্লাম আপন কূপমণ্ডূকতা বর্জ্জন করিয়াছিল। পারসীক্ প্রভাব তাহার সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দিল। গ্রীক্ সাহিত্যের সুধারস তাহার চিন্তায় ও ভাবে এক নূতন যুগের অবতারণা করিল। আরিস্ততলের দর্শন আরবদিগের দর্শন-চর্চ্চাকে বর্দ্ধিত করিল বটে, কিন্তু প্লেটোর দার্শনিক চিন্তার মধ্যে বৈদেশিক ধর্ম্ম-ভাব সমূহ অনুস্যূত ও গ্রথিত হইয়া যে নূতন ধর্ম্মমত গড়িয়া তুলিল,

তাহা সুফী নামে পরিচিত হইল এবং উহাই ইস্লামের কুক্ষিগত হইয়া তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

প্লেটোর দার্শনিক মত প্রাচ্য জগতে "ইশ্রাকী" নামে পরিচিত। সাহ্রাওয়ারডি ইহার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জোরাষ্ট্রার ধর্ম্মের আলোক-তত্ত্ব প্লেটোর দার্শনিক চিন্তায় সন্নিবেশিত করিয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে এক অপরূপ আশ্চর্য্য তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। তাঁহার এই ধর্ম্মমত পশ্চিম এসিয়ায় তত দূর প্রসার লাভ করিতে সমর্থ না হইলেও ভারতে প্রচারিত হইলে বহু লোক তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মতে আলোক সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম সৃষ্ট পদার্থ। আলোক দুই ভাগে বিভক্ত—পবিত্র আলোক এবং অপবিত্র আলোক। পবিত্র আলোকে অন্ধকার বা ছায়ার বিন্দুও নাই। ইহা পূর্ণ অবিমিশ্র আলোক। অপবিত্র আলোক অন্ধকার বা ছায়ার স্পর্শে কলুষিত। ইহা মিশ্র অপবিত্র আলোক।

সুফী ধর্ম্মের জন্ম-ইতিহাস এত দিন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। প্রাচীন ইস্লাম ও খৃষ্টধর্ম্মে সন্ন্যাস প্রবর্ত্তিত ছিল সত্য, কিন্তু বিভিন্ন দরবেশ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে খাঁটি সুফী ধর্ম্ম প্রচলিত দেখা যায়, তাহা ভারতীয় বেদান্ত দর্শন কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইস্লাম ধর্ম্মের যে সব চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে ধ্যান, ধারণা ও সমাধির আনন্দ অনুভূত হইত, তাহারা দরবেশ নামে পরিচিত হয়। দরবেশগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। যোগে সমাহিত হইয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা কিরূপে শ্রেষ্ঠ অমল আনন্দধারায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে, কি উপায়ে ও কোন্ নিয়মে সংযম অবলম্বন করিয়া মনের প্রসন্নতা উৎপাদন করা যায়, এই সব বিষয় এই সম্প্রদায়ের দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে শিক্ষা দেওয়া হইত। এক সম্প্রদায়ের দরবেশরা উপবাস ও শারীরিক কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করিয়া রুদ্ধ অন্ধকার গৃহে ধ্যানমগ্ন থাকিত। অন্য এক সম্প্রদায় অবিরাম উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সংজ্ঞা হারাইয়া মানসিক বিকারপ্রযুক্ত অপরূপ স্বপ্ন দর্শন করিত। আর এক সম্প্রদায় নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে বাদ্যের তালে তালে সঙ্গীত করিত। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত দরবেশগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও নিয়ম গুহ্য বিষয় বলিয়া সাধারণের তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল।

সুফী ধর্ম্মের গুহ্য তত্ত্বে ও ভারতীয় বেদান্তের মধ্যে যেমন আকারগত বাহ্যিক সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ তাহাদের মধ্যে আভ্যন্তরিক সামঞ্জস্য ও পার্থক্য একাধারে বিদ্যমান। বেদান্ত মতে যৌগিক প্রক্রিয়া ও আসন দ্বারা শ্বাস-নিরোধ করিয়া "তত্ত্বমসি", "ওঁ" প্রভৃতি বাক্য বা শব্দের ধারণা কিম্বা "ব্রহ্ম" শব্দের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা আছে। 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ', 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সোঽহম্' ইত্যাদি বাক্য বেদান্তে সুপরিচিত। মোল্লা সা প্রভৃতি পারসীক দরবেশগণের গ্রন্থে এইরূপ বাক্যের অসদ্ভাব নাই। ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সহিত ব্যক্তির, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য স্থাপন সুফী ও বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। সুফী বলেন, ভগবান্ বিশ্বের সমস্ত অণু-পরমাণুতে বিদ্যমান। জগৎ মিথ্যা না হইলেও নশ্বর। শান্তিলাভ, জাগতিক বস্তুর ত্যাগ, ভগবৎসঙ্গলাভে তীব্র ইচ্ছা ইহার সাধনাংশ। ইহার শিক্ষা pantheism, আদর্শবাদ, বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীনতা, সার্ব্বজনীন উদারতা।

মুসলমান মিষ্টিকগণের মতে—ধর্ম্মজীবনের তিনটি স্তর আছে। যিনি ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট পথের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন তিনি—ভগবানের দিকে অগ্রসর হন। দ্বিতীয়, ভগবৎ অনুসন্ধানের পথ। এই পথের যাত্রী স্বর্গের আনন্দ চান না। তিনি উচ্চতর পুরস্কার অন্বেষণ করেন। তিনি কেবলমাত্র বাহ্যিক নিয়মের অনুবর্ত্তী নহেন। তিনি জীবনের উচ্চতর নিয়ম পালন করিয়া চলেন। তৃতীয়তঃ, যিনি এই বিপদসঙ্কুল ক্ষুরধার পথ অনুসরণ করেন তিনি সত্যের উচ্চতম ও আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।

হুসেন বিন্ মনসুর ভগবানে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত বা মিলিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমিই সত্য" সোঽহং। তিনিই সর্ব্বস্ব। হুসেন জলবিন্দুর ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু সমুদ্র যেমন তেমনই আছে। যে সত্য সকল জীবের জীবন তাহার কণামাত্রও না থাকিলে কোন ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায় টিকিতে পারে না। অমৃত চিরস্থায়ী হয় না। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি সকল প্রকার ধর্ম্ম হইতে কিছু না কিছু শিক্ষা করেন। সকলের এক উদ্দেশ্য, এক গন্তব্য স্থান, সকলই এক বন্ধুর অন্বেষণে তৎপর। প্রিয়তম এক—ভালবাসার লোক বহু।

হাতিফ বলিয়াছেন—তিনি কিরূপে ভগবানকে অনুসন্ধান করেন এবং কিরূপে সকল স্থানে, সকল ধর্ম্মে, সকল অবস্থায় মানুষ তাঁহাকে পাইয়া থাকে। যে কোন পূজা আত্মপূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। ভগবৎ অনুসন্ধানের প্রধান ও প্রথম বস্তু প্রেম। প্রেম ব্যতীত কেহই কিছু করিতে সমর্থ নহে। আত্মবিসর্জ্জনই প্রধান উদ্দেশ্য। আত্মবিসর্জ্জন ব্যতীত অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। উপাসনা, প্রেম, ভক্তি যে পরিমাণে আত্মবিসর্জ্জন ও আত্মবিস্মৃতির সাহায্য করে তাহারা সেই পরিমাণে উপযোগী। চিত্তই পাপ ও যন্ত্রণার প্রধান কারণ।

ভগবানের অস্তিত্বে সন্দেহ সুফীর পক্ষে ধারণার অতীত। তিনি জাগতিক দৃশ্যাবলীর বাস্তব সত্তায় সন্দেহ করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে ভগবান্ কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠতম সত্য নহেন, তিনি একমাত্র সত্য। ভগবান একমাত্র সত্য হইলে জগৎ ও জীব আপেক্ষিক ভাবে সত্য। কিন্তু বেদান্ত Pantheism নহে। বেদান্ত-মতে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। জগৎ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তিনি জগৎ নহেন। বিশ্ব তাঁহাতে, কিন্তু তিনি বিশ্বাতিগ—তিনি বিশ্বের বাহিরে। Pantheism দুই প্রকারের। এক মতে জগৎ ও ভগবান্ এক—যাহা জগৎ তাহাই ভগবান্; অন্য মতে,—একমাত্র ভগবান্ই বিদ্যমান রহিয়াছেন, এই বিশ্ব জগৎ স্বপ্নময়।

সুফী বলেন, তিনিই সর্ব্বত্র এবং সমস্ত বস্তুর মধ্যে। সুফী ধর্ম্মের দুই অংশ—দর্শন অংশ ও ভক্তি অংশ। দার্শনিক ভাবে দেখিলে সুফী ধর্ম্মকে Pantheism বলা যাইতে পারে। ভক্তির দিক্ দিয়া দেখিলে সুফী ধর্ম্মে ঈশ্বরই একমাত্র সৌন্দর্য্য। আকার, চিন্তা, কর্ম্মে যে কোন পার্থিব সৌন্দর্য্য আছে তাহা সেই সৌন্দর্য্যের আভাস মাত্র। আমাদের শান্ত মন অনন্তকে বুঝিতে সমর্থ নহে। একমাত্র তিনিই সুন্দর এবং সমস্ত বিশ্ব-জগৎ তাঁহার সৌন্দর্য্যের বিকাশ ভূমি।

সৃষ্টিতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে সুফী ধর্ম্ম বেদান্তের অনুরূপ। প্রথমে তিনিই ছিলেন এবং তিনি ব্যতীত কেহ ছিল না। বেদান্ত বলিয়াছেন—তিনি অগ্রে বর্ত্তমান ছিলেন। তার পর তিনি আলোচনা করিলেন, 'বহু স্যাম ইয়ায়,' আমি বহু হইব। বহু হইবার ইচ্ছায় সৃষ্টির উদ্ভব। সুফী বলেন, আমি প্রথমে লুক্কায়িত ঐশ্বর্য্য ছিলাম,

আত্মপ্রকাশের ইচ্ছায় আমি জগৎ রচনা করিয়াছিলাম। যখন সময় ছিল না, যখন বহু ছিল না, তখন একমাত্র ভগবৎ-সত্তা অপ্রকাশিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন। আত্মপ্রকাশের ইচ্ছার কারণ অনুমান করা মানববুদ্ধির সাধ্যাতীত। বেদান্ত সৃষ্টিকে লীলা বলিয়াছেন। কোন প্রয়োজন না থাকিলেও শিশু যেমন খেলা করে, ঈশ্বরও তেমনি বিশ্ব-রচনায়—নিজ লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার স্বভাব। সুফী জগৎকে মিথ্যা বলেন নাই—কিন্তু নশ্বর বলিয়াছেন। বেদান্ত বলেন, ভোজবাজী আমাদের কাছে ততক্ষণ সত্য, যতক্ষণ আমরা ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারি, কিন্তু মায়াবী ইহা বুঝেন। অতএব তাঁহার কাছে লীলা নাই।

প্রত্যেক ধর্ম্মের চারিটি বিভাগ আছে—তত্ত্বাংশ, সৃষ্টি-প্রকরণ, আত্মার বিষয় এবং মৃত্যুর পরের অবস্থা। এই চারিটি বিষয় লইয়া মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বেদান্ত বলেন যে, এই ভেদ অজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত যাহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহাই অন্যান্য ধর্ম্মের চরম। সগুণ অর্থে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পৃথক্ জ্ঞান। কিন্তু ইহা ব্যতীত আমাদের আর একটা অবস্থা আছে যাহা অনুভবসিদ্ধ, যাহাতে এই দ্বৈত ভাব স্থান পায় না, যাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় লোপ পাইয়া এক অখণ্ড, শুদ্ধ, দেশ-কাল-কারণাতীত জ্ঞানই থাকে। ইহাকেই বেদান্ত নির্গুণ ভাব বলিয়াছেন। অতএব খৃষ্টান, মুসলমান, শৈব, বৈষ্ণব, জিন ধর্ম্ম পালন করিয়া চলিলেও তিনি বৈদান্তিক হইতে পারেন। যেহেতু, তাঁহার মত বিশুদ্ধ অদ্বৈত ভাবের এক ধাপ নিম্নে। জ্ঞেয় বস্তু প্রাপ্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলে, পরিশুদ্ধ জ্ঞান-সূর্য্যের আলোকরাশি অজ্ঞান অমানিশার অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, তখন জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন মানুষ সত্য-দ্রষ্টা ঋষি—তখন তাঁহার মুখ দিয়া এই পবিত্র স্তোত্র অজ্ঞাতসারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'

তখন বাহিরের এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড মানুষের ক্ষুদ্র মুষ্টির ভিতর আসিয়া পড়ে।

সুফীপ্রবর মনসুরও এই ভাব-প্রণোদিত হইয়া বলিয়াছিলেন, —আমিই সত্য। সুফী-মতে বেদান্তের উদারতা, সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা, বৈরাগ্য, আত্ম ও অনাত্ম বস্তুর বিবেক জ্ঞান প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে। বেদান্তে সন্ন্যাসের প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে। সন্ন্যাসী যেমন বহুবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত, সুফীগণের মধ্যেও তেমনি বহুবিধ সম্প্রদায়ের দরবেশ আছে। তাহারা সুফীগণের ব্যবহৃত কন্থা ব্যবহার করে, পশমের বস্ত্র পরিধান করে, বাহ্যিক আচার বা অনুষ্ঠান মানিয়া চলে না। দরবেশদিগের মধ্যে যথার্থ সুফী দেখিতে পাওয়া যায় অনেক, কিন্তু এদেশে সন্ন্যাসীর গেরুয়ার ন্যায় দরবেশের পোষাক অনেক সময় অসৎ কার্য্যে গোপনতার সহায়তা করে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া যে বৈদান্তিক মত প্রচার করিলেন এবং যাহা ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম্মে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা মোস্‌লেম চিন্তা-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুফী মত গঠনে সহায়তা করে। যে সুফী ধর্ম্ম বেদান্তের উৎসে জন্মলাভ করিয়া মোস্‌লেম চিন্তা-জগতে বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া বসিল, যাহা বৈদেশিক ধর্ম্ম ও দর্শনের আলোক-সম্পাতে বিকশিত হইল, তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের মলয়ানিল প্রবাহে মুখরিত হইয়া সুমধুর সৌরভে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া দিল। প্রাচীন কালে আরবের সুফীগণের বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস ভাব খৃষ্টধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের সুফী ধর্ম্ম ইস্‌লামের শিক্ষা ও নীতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া প্লেটোর নব্য দর্শন ও ভারতীয় ভাব-প্রাধান্যের সহিত সমন্বয় সাধন করে। খৃষ্টধর্ম্মের বৈরাগ্য ইস্‌লামকে ত্যাগ ও সন্ন্যাস ভাবে অনুপ্রাণিত করিলেও ইস্‌লাম বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বেদান্তের উচ্চ শিক্ষা ও আদর্শ আত্মস্থ করিয়া সুফী ধর্ম্মরূপ অপরূপ আকার ধারণ এবং বিভিন্ন দরবেশ-সম্প্রদায় গঠন করিয়া সেই মত প্রচারেই সহায়তা করিয়াছিল।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল (বিদ্যাবিনোদ, এম-এ)

গাহি মানুষের জয়

সমাজ যাদের দূরে ঠেলে রাখে, তারা যে আমার ভাই,—
এক-পৃথিবীতে জনম নিলেম, এক-মায়ে দিল ঠাঁই!
কামার কুমোর তাঁতি ও ছুতোর—আমি সকলের কবি,—
হৃদয়-শোণিতে ভাবের তুলিতে আঁকি স্বরগের ছবি!

তাহারা মানুষ, কর্ম্মী, সুজন তাদের অশুচি বলে?
তাহাদের মাঝে দেবতা নিয়ত মোদেরে সেবিছে ছলে!
হাজার লোকের গঞ্জনা-গালি হাসি-মুখে তারা সয়,—
ড্রেন-নর্দ্দামা সাফ করে ফিরে পঙ্কিল ক্লেদময়!
কেহ করে জুতা, কেহ বা আবাস, কেহ থালা-বাটি গড়ে,
কেহ বা বুনিছে কাপড়-চাদর, কেহ বা সেবিছে করে।
এ সব মানুষে কেশবের বাস—অশুচি তাহারা নয়!
নমি আমি এই নর-দেবতায় সমাজে না করি ভয়।

আজি হতে আমি পণ করিলাম গাবো তাহাদের গান,—
দুঃখ-ব্যথায় সম-সাথী হবো হৃদয় করিব দান।
তাহাদের শিশু হবে মোর শিশু—তাহাদের লবো কোলে,
সমাজ যদি গো দূর করে মোরে, গর্ব্বে আসিব চলে!
অন্যায় আমি সহিব না কভু, মানিব না পরাজয়,—
সব হতে দূরে রবো এক-পাশে, গাবো মানুষের জয়!
দেবতা তাহারা বন্দনা করি—আমি ইতরের কবি,—
হৃদয়-শোণিতে ভাবেরে রাঙায়ে আঁকি তাহাদের ছবি!

কবির বীণায় ধ্বনিয়া উঠিল নব সুর-তান-লয়,—
তার সাথে কবি নির্ভয়ে গাহে—জয় মানুষের জয়!

শ্রীলতিকা ঘোষ

ধাতু-পরিচয়

মহাভারতের যুদ্ধে অষ্টবজ্রের সম্মিলন ঘটিয়াছিল। এবারকারের এ যুদ্ধে বজ্রের হিসাব এখনো লওয়া হয় নাই; তবে ধাতুর হিসাব অত্যন্ত ভারী দেখা যাইতেছে। মূল ধাতুর সবগুলিই এ-যুদ্ধে উপকরণ জোগাইতেছে; তার উপর বহু জাতের মিশ্র ধাতুরও তলব পড়িয়াছে। মূল ও মিশ্র ধাতু লইয়া এ যুদ্ধে রীতিমত শক্তি-পরীক্ষা চলিয়াছে!

সোনা, রূপা, লোহা, ইস্পাত, তামা, পিতলের উপর এলুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, বেরিলিয়াম, টাঙ্গষ্টেন, ভানাডিয়াম, মলিব্‌ডেনাম প্রভৃতি কত নূতন নূতন ধাতুর ব্যবহার এ-যুদ্ধে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হিসাব দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়! বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, এবারকারের এ যুদ্ধ যেন war of many metals

এলুমিনিয়ামে মিশাইবার পূর্ব্বে বোসাইটের স্নান-পর্ব্ব

অর্থাৎ বহু ধাতু লইয়া যুদ্ধ চলিতেছে! এ-সব ধাতুর একটির অভাব ঘটিলে বিজয়-লক্ষ্মী বুঝি মুখ ফিরাইবেন!

জার্ম্মাণীতে অনেক ধাতুতে টান্ পড়িয়াছে। জার্ম্মাণী অন্য জাতের মারফৎ গোপনে যুক্তরাজ্যে অর্ডার পাঠাইতেছে—ধাতু চাই—বেরিলিয়াম ধাতু। এ-ধাতুর শতকরা দু'ভাগ (ওজনে) তামার সঙ্গে মিশাইতে পারিলে অন্য এক নূতন ধাতুর সৃষ্টি হয়! তার বর্ণ লোহিত। সে নূতন ধাতু এমন কঠিন ও মজবুত যে, তাহা দিয়া মোটা ইস্পাত অনায়াসে কাটা যায়।

বেরিলিয়ামের প্রয়োজন এত কাল ভালো করিয়া বুঝা যায় নাই। বেরিলিয়ামে সুইশ ঘড়ির স্প্রিং তৈয়ারী হয়। বেরিলিয়ামের তৈয়ারী বলিয়া তাহাতে 'মরিচা' ধরে না। কস্মিন্ কালে নয়! জল লাগুক, লবণ লাগুক—তামার সহিত বেরিলিয়াম মিশাইয়া যে নূতন ধাতু তৈয়ারী হইতেছে, সে ধাতুর গায়ে এতটুকু ক্ষয়া দাগ পড়িবে না! যুদ্ধে যে-সব অগ্নি-নিবারক যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হইতেছে, সেগুলির জন্য চাই এই নূতন ধাতু—বড় বড় কামান-বন্দুক এবং অন্য অস্ত্রশস্ত্র এই নূতন ধাতুর সংযোগে একেবারে অভঙ্গুর অটুট থাকে। তাছাড়া এরোপ্লেনের মোটরে এঞ্জিনে এই নূতন ধাতু ব্যবহৃত হইতেছে। এ ধাতুর দৌলতে এরোপ্লেনের বহু বিপত্তি রুদ্ধ হইয়াছে।

বেরিলিয়ামের আবিষ্কার হইয়াছে প্রায় একশো বৎসর পূর্ব্বে; কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটিতেছে যোল-সতেরো বৎসর মাত্র। এ ধাতুর ব্যবহার দিনে-দিনে নানা দিকে আশ্চর্য্য প্রসার লাভ করিতেছে। ছ'কোণা বেরিলি পাথর হইতে বেরিলিয়াম পাওয়া যায়। এ পাথরের বর্ণ ফিকা সবুজ অথবা ধূসর। সবুজ বেরিল দেখিতে অনেকটা

এলুমিনিয়ামের তৈয়ারী নৌকা এত হাল্‌কা যে কিশোরীর হাতে যেন প্রসাধনীর কৌটা!

পান্নার মত। বেরিল স্বচ্ছ। একখণ্ড বেরিল পাথর লেন্সের মত চোখের সামনে ধরিয়া রোমান সম্রাট নীরো গ্লাডিয়েটরদের সংগ্রাম-লীলা দেখিতেন।

পৃথিবীর বহু প্রদেশে এ পাথর আছে অজস্র প্রচুর পরিমাণে। এত অজস্র যে বহু-পুরুষ ধরিয়া ব্যবহার করিলেও তার ক্ষয় হইবে না! সকল দেশের খনি-গর্ভেই বেরিল পাথর মিলিবে; শুধু য়ুরোপে বেরিল খনির সংখ্যা খুব অল্প। হিটলার কিছু বেরিল পাইয়াছিলেন অষ্ট্রীয়া হইতে। রাশিয়া যদি আজ জার্ম্মানদের হস্তগত হইত, তাহা হইলে উরাল প্রদেশ হইতে জার্ম্মাণী অজস্র পরিমাণে বেরিল লাভ করিত!

মার্কিন যুক্তরাজ্যে বেরিল সংগ্রহ হইতেছে ব্রেজিল এবং আর্জ্জেন্-টাইন হইতে। তাছাড়া এ পাথর এখন দেশ-বিদেশে চালান

যাইতেছে। পেনসিলভানিয়ায় বেরিলের প্রকাণ্ড ভাণ্ডার আছে। পনেরো বৎসর পূর্ব্বে এক পাউণ্ড বেরিলিয়ামের দাম ছিল ৫০০ ডলার; এখন দাম ৪৭ ডলার।

ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা লিথিয়াম, পোটাসিয়াম এবং সোডিয়াম। এত হাল্কা যে জলে ও তেলে ভাসে। এলুমিনিয়ামের সঙ্গে একটু লিথিয়াম মিশাইলে যে মিশ্র ধাতুর সৃষ্টি হয়, তাহা ইস্পাতের মত মজবুত এবং শক্ত। গলিত অন্য ধাতুতে লিথিয়াম

ইস্পাতের জন্ম

মিশাইলে সে-সব ধাতুর যা কিছু গ্লানি বা আবর্জ্জনা নিমেষে গলিয়া ঝরিয়া বাহির হইয়া যায়। পোটাসিয়াম দেখিতে রূপার মতো ঝক্‌ঝকে সাদা। পোটাসিয়াম ধাতু এমন যে, ভোঁতা ছুরি চালাইলে ছানার মত নিমেষে কাটিয়া যাইবে। জলে একটু পোটাসিয়াম ধাতু ফেলুন, বেগুনি রঙের ধোঁয়া উঠিয়া তখনি তাহা জ্বলিতে থাকিবে। তার পর তাপ কমিবামাত্র বিকট শব্দে ফাটিয়া বেমালুম অদৃশ্য হইবে!

সোডিয়াম ধাতু সাধারণ লবণ হইতে তৈয়ারী। এ ধাতু মোমের মত,—উত্তাপ এবং বিদ্যুতের প্রতিরোধ-কল্পে ব্যবহৃত হয়। সোনা-রূপা এবং তামার শুধু এ গুণ আছে। বিমানপোতের এঞ্জিনে exhaust valve নির্ম্মাণে সোডিয়াম ধাতু অমূল্য। তবে সোডিয়াম ধাতুর গা ঢাকিয়া রাখিতে হয়; নহিলে আর্দ্র বায়ু বা জলকণা লাগিলে মরীচা ধরিয়া অব্যবহার্য্য হইবে।

সাদা খড়ি হইতে ক্যালসিয়াম ধাতু তৈয়ারী হইতেছে। ধাতু-

কড়ার জ্বালে মাঙ্গানীজ্ পরিশুদ্ধ করা হয়

নিচয়ের আবর্জ্জনা দূর করিতে এ-ধাতুর শক্তি অসাধারণ। ইস্পাত সাফ্ করিতে ক্যাল্‌সিয়ামের প্রয়োজন।

ক্যালসিয়াম ধাতু পাওয়া যায় চুন খড়ি শামুকের খোলা এবং পশুপক্ষীর অস্থি হইতে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তর ফ্রান্সে এবং জার্ম্মাণীতেই ক্যালসিয়াম ধাতু প্রস্তুত হইত; এখন মিশিগানে

জলের বুকে তামা মেলে

প্রকাণ্ড কারখানা বসিয়াছে। সে কারখানায় অজস্র পরিমাণে ক্যালসিয়াম প্রস্তুত হইতেছে।

আর একটি নূতন ধাতুর সৃষ্টি হইয়াছে সেলেনিয়াম্। তামার সঙ্গে সালফিউরিক এসিড মিশাইয়া এ ধাতুর সৃষ্টি। বিদ্যুতের কন্‌ডাক্টররূপে ইহার ব্যবহার প্রশস্ত। আমাদের ফাউণ্টেন পেনের নিবের ডগায় আছে অশমিয়াম এবং ইরিডিয়াম। এ দু'টি ধাতু ওজনে খুব ভারী—সীসার মত। এ দু'টি ধাতু প্লাটিনামের জ্ঞাতি—ফাউণ্টেন পেনের নিবের জন্য অশমিয়ামের সঙ্গে ইরিডিয়াম মিশাইয়া মিশ্র ধাতু তৈয়ারী হয় অশমিরিডিয়াম্—নিবের ডগায় অশমিরিডিয়াম দিবার ফলে নিব হয় শক্ত—নিব ভাঙ্গে না, নোয় না।

এক জন মার্কিন বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি মানুষের মাথার খুলি হইতে ভাইটালিয়াম নামে এক নূতন ধাতুর সৃষ্টি করিয়াছেন। খুলিতে কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম এবং নিকেল মিশাইয়া ভাইটালিয়াম তৈয়ারী হইতেছে। মাথা ফাটিয়া বা কাটিয়া ফুটা হইলে ভাইটালিয়াম

তামার সহিত বেরিলিয়াম মিশিলে পাত দেখায় যেন সোনার পাত

দিয়া সে ফুটা সম্পূর্ণ বুজাইয়া দেওয়া চলে। ভাইটালিয়াম দিলে শিরা-উপশিরাগুলির কোন ক্ষতি হয় না—মস্তিষ্কেও এতটুকু জড়তা ঘটে না।

পৃথিবীতে মানুষের নানা কাজে সবচেয়ে বেশী লাগিতেছে

কার্টরিজের জন্য জিঙ্ক গালানো

আজ এলুমিনিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম। এলুমিনিয়াম আছে মাটীতে —আমাদের পায়ের ধূলায়; এবং ম্যাগনেসিয়াম আছে সমুদ্রজলে। ধূলা হইতে এলুমিনিয়াম এবং সাগর ছেঁচিয়া ম্যাগনেসিয়াম সংগ্রহ করা দারুণ কঠিন ব্যাপার। এলুমিনিয়ামের দৌলতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি এরোপ্লেন তৈয়ারী হইতেছে। বোমা-নির্ম্মাণে ম্যাগনেসিয়াম আজ মস্ত সহায়। দু'টি ধাতুই ওজনে খুব হাল্কা—লোহার চেয়ে এলুমিনিয়াম তিন ভাগ এবং ম্যাগনেসিয়াম চার ভাগ হাল্কা। ওজনে এত হাল্কা বলিয়াই আজ এ দুই ধাতুর কল্যাণে আকাশে এত প্লেন উড়িতেছে—সম্পূর্ণ নিরাপদ নির্বিঘ্ন ভঙ্গিমায়।

পৃথিবীতে এলুমিনিয়াম আছে অনেক বেশী—এত বেশী যে অন্য

জলস্পর্শে ম্যাগনেসিয়াম জ্বলিয়া ওঠে

কোনো ধাতু পরিমাণের দিক্ দিয়া এলুমিনিয়ামের কাছে ঘেঁষিতে পারে না।

আর একটি নূতন ধাতুর সৃষ্টি হইয়াছে—ক্রায়োলাইট। এ ধাতুর সৃষ্টি তরুণ বৈজ্ঞানিক হালের বুদ্ধি-কৌশলে। তিনি প্রথমে ব্যাটারিতে বৈজ্ঞানিক প্রবাহ দিতে এলুমিনিয়ামকে electrolyse করেন; কিন্তু তাহাতে সফল হন নাই; তখন এক কাজ করিলেন।

গ্রীনল্যাণ্ড হইতে আসে "বরফ"-পাথর

গ্রীনল্যাণ্ডে এক-রকম পাথর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়—দেখিতে ঠিক বরফের মত—সেই পাথর লইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সাধনা সুরু করেন। এ পাথরের নাম বরফ-পাথর (ice-rock)। এ পাথর গলাইয়া তাহাতে কার্ব্বন এনোড-জাত বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চালন করেন —সেই পাত্রে তার পর দিলেন এলুমিনিয়াম। ফলে কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড গ্যাস বাহির হইল; তার পর দেখা গেল, সর্ব্বগ্লানি-মুক্ত হইয়া

এলুমিনিয়ামের পাত জমিয়া আছে। এ পাত খাঁটী এলুমিনিয়াম নয়, মিশ্র ধাতু। এই মিশ্র ধাতুর নাম ক্রায়োলাইট। এ ধাতু সব চেয়ে হাল্কা এবং নিখুঁৎ। এই এলুমিনিয়াম আজ যুদ্ধের নানা কাজে লাগিতেছে। পূর্ব্বে এক পাউণ্ড ওজনের এলুমিনিয়াম তৈয়ারী

ছ'কোণা বেরিল পাথরে থাকে বেরিলিয়াম্

করিতে চার পাউণ্ড বোসাইট্ লাগিত; আর যে-পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয় হইত তাহাতে একটা বড় অফিসের দু'তিন দিনের কাজ চলিতে পারে। তাছাড়া প্রায় আধ পোয়া ওজনের কার্ব্বন লাগিত। তথাপি বিদ্যুৎ-শক্তির উৎস দীর্ঘস্থায়ী হইত না।

বোসাইটের খনি—সুরিনাম্

এখন ক্রায়োলাইট আবিষ্কার ও তাহার স্পর্শ-ফলে এ কাজের ব্যয় ও পরিশ্রম যেমন অনেকখানি কমিয়াছে, তেমনি বিদ্যুৎ-শক্তি-প্রবাহও ইহার কল্যাণে বহু দীর্ঘ-কালস্থায়ী হইয়াছে।

বোসাইট্ ও এলুমিনিয়াম একই জাতের ধাতু। তবে বোসাইট ধাতু অভিজাত শ্রেণীর। এলুমিনিয়ামকে বিজ্ঞান আজ এ আভিজাত্য দিয়াছে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এলুমিনিয়াম দিয়া সর্ব্বপ্রথম এরোপ্লেন তৈয়ারী হইয়াছিল। এখন যে এলুমিনিয়াম প্লেন-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়—তখনকার সে-এলুমিনিয়ামের সঙ্গে তার বহু প্রভেদ। এ-প্রভেদ ঘটিয়াছে নানা ধাতুর মিশ্রণে এলুমিনিয়ামকে সর্ব্ব-দোষ-মুক্ত করার ফলে। তার পরেও এলুমিনিয়াম লইয়া জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক-মহলে বহু

বালবের টাঙ্গষ্টেন্-তার পরীক্ষা

গবেষণা-সাধনা চলে। আলফ্রেড উইল্‌ম্ এলুমিনিয়ামের সঙ্গে শতকরা চার ভাগ ওজনের তামা ও আট ভাগ মাঙ্গানীজ মিশাইয়া এক নূতন মিশ্র ধাতুর সৃষ্টি করেন। এই ধাতুকে তাতাইয়া নির্দ্দিষ্ট ডিগ্রীতে ঠাণ্ডা করিয়া দেখেন, তাহা ইস্পাতের মত কঠিন কিন্তু

এলুমিনিয়ামে তৈয়ারী হইতেছে হাত-পা

ইস্পাতের চেয়েও মজবুত হইল! এ ধাতুর নাম হইয়াছে ডুরালুমিন। এই ডুরালুমিন ধাতু দিয়া জেপলিন এবং এ-যুগের দুর্ভেদ্য ও অপরাজেয় যুদ্ধপ্লেন তৈয়ারী হইতেছে।

পরে দেখা গেল, ডুরালুমিনে মরীচা ধরে, সে জন্য ইহা ক্ষয় পায়; খাঁটী এলুমিনিয়ামে মরীচা ধরে না। তখন মার্কিন বৈজ্ঞানিকের দল ডুরালুমিনের সঙ্গে খাঁটী এলুমিনিয়াম মিশাইয়া তৈয়ারী করিলেন অক্ষয় অটুট আলক্লাড্-পাত! বড় বড় প্লেনের পাখা এখন এই আলক্লাড্-পাতে তৈয়ারী হইতেছে।

এক-একখানি পেট্রল-বমারে এলুমিনিয়ামের তৈয়ারী ইস্‌ক্রুপ, কবজা, পেরেক লাগে কত, জানেন? দু'লক্ষ সাতাত্তর হাজার।

এলুমিনিয়াম-চূর্ণের সহিত আয়রণ-অক্সাইড মিশাইয়া থার্মাইট তৈয়ারী হইতেছে। Incendiary-বোমা তৈয়ারী করিতে এই থার্মাইট প্রধান উপকরণ। আগুন লাগাইয়া দিবা মাত্র ইহা গলিত লৌহে পরিণত হয় এবং সেই জ্বলন্ত গলিত লৌহের এমন শক্তি যে পাঁচ-সাত-তলা বড় বাড়ীকে চকিতে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেয়।

কোনো কোনো incendiary-বোমার মধ্যে শুধু থার্মাইট ভরিয়া দেওয়া হয়—অপর বোমায় থার্মাইটের ব্যবহার শুধু ম্যাগনেশিয়ামটুকুকে জ্বালাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে। যুদ্ধের বাহিরে ইস্পাত ওয়েল্ড করিতে থার্মাইটের প্রয়োজন।

হাল্‌কা এবং গঠনোপযোগী ধাতু হিসাবে ম্যাগনেসিয়ামকে এলুমিনিয়ামের সমতুল্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ম্যাগনেসিয়াম

টিনের কৌটা—ডিপো

ধাতুতে তৈয়ারী বমারের চাকার ওজন—অনুরূপ-আকারের এলুমিনিয়ামের চাকার চেয়ে দশ আনা পরিমাণ হাল্‌কা। মেক্সিকো উপসাগরের কূলপ্রদেশে এবং টেকশাসে সাগর-জল হইতে ছাঁকিয়া ম্যাগনেসিয়াম সল্ট লওয়া হইতেছে; সেই সল্ট হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈয়ারী করা হইতেছে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু।

সাগর-জলে যে লবণ আছে, তাহা হইতে প্রায় তিনশো বিভিন্ন রকম সামগ্রী তৈয়ারী হইতেছে—গ্যাসোলিনের এথিল হইতে সুরু করিয়া ম্যাগনেসিয়া মিল্ক ও এপসম সল্ট পর্য্যন্ত। সাধারণতঃ গলিত ম্যাগনেসিয়াম সল্টে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত করিবামাত্র উপরে দুধের সরের মত সর ভাসিয়া ওঠে! এ ধাতু আশ্চর্য্য-রকম হাল্‌কা। ম্যাগনেসিয়ামের তৈয়ারী গার্ডার (Girder) এক জন লোক অনায়াসে তুলিতে পারে—কিন্তু এ-গার্ডার ইস্পাতের তৈয়ারী হইলে তাহা তুলিতে চার-পাঁচ জন লোক হিমসিম খাইবে। ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর আর একটি বৈশিষ্ট্য—চূর্ণ করিলে কিম্বা মিহি পাতে পরিণত করিলে আপনা হইতে জ্বলিয়া ওঠে! ইনসেণ্ডিয়ারী বোমায়, অগ্নি-সঙ্কেত-পতাকায় ম্যাগনেসিয়াম যেমন তীক্ষ্ণ শিখায়
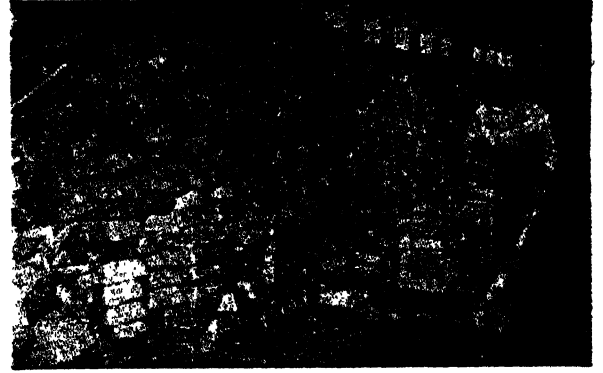
চীন হইতে কাঠের বাক্সে ভরিয়া আমেরিকায় এণ্টিমনি আসিতেছে

জ্বলে, তেমনি ইহার উত্তাপও হয় অসহ্য রকম। ইহাতে সবেগে জল নিক্ষেপ করিলে ফাটিয়া যায়।

জার্ম্মাণরা সাগর-জলের লবণ এবং ম্যাগনেসাইট ও ডোলামাইট হইতে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম সংগ্রহ করিত; তার পর অষ্ট্রীয়া জার্ম্মাণ-হস্তগত হওয়ার পর হইতে জার্ম্মাণীর ম্যাগনেসাইট-ভাণ্ডার প্রায় অফুরন্ত হইয়াছে, মার্কিনের কালিফোর্ণিয়ায় সরকারী আনুকূল্যে প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, সে কারখানায় নেভাডার ম্যাগনেসাইট হইতে অজস্র পরিমাণে

ইস্পাতের টেম্পারেচার পরীক্ষা

ম্যাগনেসিয়াম ধাতু তৈয়ারী হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা আজ প্রাণের জন্য ইজ্জতের জন্য জননী ধরিত্রীর ভাণ্ডার সন্ধান করিয়া এত রকমের ধাতু-উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন যে, এ যুদ্ধে যত অনিষ্টই ঘটুক, যুদ্ধশেষে সে-সব উপাদান মনুষ্যলোকে অসামান্য স্বাচ্ছন্দ্য-সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিবে। জননী ধরিত্রীর কাছ হইতে মানুষ সোনা তামা পাইয়াছে সে-কোন্ আদি যুগে। মায়ের আঁচলে বাঁধা এলুমিনিয়ামের সন্ধান মানুষ পাইয়াছে সে-দিন মাত্র—বৈদ্যুতিক শক্তির সঙ্গে মানুষের পরিচয়-লাভের পর।

লৌহও আমরা বহু প্রাচীনযুগে পাইয়াছি; এবং এই লৌহ

ভিত্তি করিয়াই পৃথিবীর কর্ম্ম-শিল্প, সভ্যতা এবং সমৃদ্ধির পত্তন। ধরিত্রীর স্বাস্থ্য বলুন, বর্ণ বলুন—সকলের মূলে লৌহ। আমাদের রক্ত-কণিকায় যে প্রাণ-শক্তি, সে শক্তি লৌহ হইতে মিলিতেছে—কৃষ্ণার গালে যে রাঙা-আভা, সে আভার উৎস রুক্ত—রুক্তে আছে লৌহ-অক্সাইড। আমেরিকার লৌহ-খনি আজ বিজ্ঞানের দৌলতে যেমন বিরাট বিশাল, তেমনি তাহা সমৃদ্ধি-সম্পদের ভাণ্ডার! নব নব খনির আবিষ্কার এখনো চলিয়াছে।

লৌহ হইতে মানুষ যে-দিন ইস্পাত সংগ্রহ করিল, মানুষের ভাগ্য সে-দিন ফিরিয়া গেল! লৌহ ও কার্বন—উভয়ের মিলনে ইস্পাতের জন্ম। এই ইস্পাত সৃষ্টি করিতে মানুষকে কি অধ্যবসায়, কি সাধনা না করিতে হয়!

বড় বড় কড়া—আকারে যেন দৈত্য-দানবের ভোজ্য-উৎসবের কড়া—তোলা উনুনে গনগনে আগুন—সেই উনুনে পর-পর চাপানো অসংখ্য কড়া—উনুনে অগ্নিতাপ দিতেছে বিদ্যুৎ—কড়ায় কার্বন ও লৌহ মিলিয়া মিশিয়া গলিয়া একাকার—অগ্নিবর্ষী বড় বড় বেশিমার কনভার্টার-যোগে লৌহ ও কার্বন গলিয়া তরল—তার পর সেই জ্বলন্ত তরল মিকশ্চার রোলারের চাপে, অথবা একশো টন ওজনের ভারী হাতুড়ির আঘাতে কঠিন পাতে পরিণত হইতেছে! যন্ত্রাদির সাহায্যে এ যুগে কাজ সহজ হইয়াছে! অথচ প্রাচীন যুগের কর্ম্মকাররা আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে লোহা পিটিয়া ঐ পাত তৈয়ারী করিত। দামাস্কাসের বিখ্যাত ধারালো তলোয়ার প্রাচীন যুগের কর্ম্মকারের হাতের তৈয়ারী—শিল্প-জগতে তাহার আর তুলনা নাই!

ইস্পাতের নানা জাত আছে। কোনো ইস্পাত সম্পূর্ণ বেদাগ; কোনোটা বা নকল। প্রয়োজন বুঝিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের ইস্পাত বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

নব নব ধাতু সৃষ্টি করিতে বৈজ্ঞানিকের দল নানা মূল ধাতুকে উপকরণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এ কয়টি ধাতুর মধ্যে মাঙ্গানীজ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মাঙ্গানীজের নিজস্ব রূপ রূপার মত—সাদা এবং ইহা অত্যন্ত ভঙ্গুর—কাচের মত ভঙ্গুর। এই মাঙ্গানীজকেই বৈজ্ঞানিকেরা আজ ইস্পাতের মত কঠিন মজবুত করিয়া তুলিয়াছেন। গলিত ইস্পাতে মাঙ্গানীজ মিশাইলে অক্সিজেনের মত তাহা উবিয়া যায় এবং সালফারের সৃষ্টি হয়। সালফার হইবামাত্র মাঙ্গানীজ-সালফাইড তৈয়ারী হয়। তামা, এলুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সহিত মাঙ্গানীজ মিশাইলে সেগুলি পরিশুদ্ধ হয়; তাদের শক্তি বাড়ে। এলুমিনিয়ামের যে বাসন-কোশন তৈয়ারী হয়, তাহাতে মাঙ্গানীজ মিশাইতে হয়। এলুমিনিয়ামের সহিত মাঙ্গানীজ না মিশাইলে বাসন-কোশন কঠিন ও মজবুত হইবে না।

এত কাল পাশ্চাত্য সমাজে একটা কথা চলিয়া আসিতেছিল——hard as iron এবং true as steel অর্থাৎ লোহার মত কঠিন, ইস্পাতের মত খাঁটা। এ কথাকে নিরর্থক করিয়াই যেন বিজ্ঞানের নব সাধনায় টাঙ্গষ্টেন্ ধাতুর উদ্ভব হইয়াছে। টাঙ্গষ্টেন সব দিক্ দিয়াই লোহা এবং ইস্পাতকে পরাভূত করিয়াছে। 'টাঙ্গষ্টেন্' কথাটি সুইডিশ্। ইহার অর্থ "ভারী পাথর"। টাঙ্গষ্টেনের ওজন সোনার মতন। এই টাঙ্গষ্টেনের সন্ধানে মার্কিন যুক্ত-রাজ্য আজ পৃথিবী তুঁড়িতেছে। মধ্য-ইদাহোর ইয়েলো-পাইন অঞ্চলে আণ্টিমনির সন্ধান করিতে গিয়া খননকারীরা সহসা টাঙ্গষ্টেনের প্রকাণ্ড খনির দেখা পায়। নেভাডায়, কালিফোর্ণিয়ায় এবং দক্ষিণ-আরিজোনায় টাঙ্গষ্টেনের বহু খনি পাওয়া গিয়াছে।

ইস্পাত পিটিয়া বিশুদ্ধ করা হইতেছে—কারিগরদের মুখে মুখোস-আঁটা,—আগুনের ফুলকি না চোখে-মুখে লাগে!

এই টাঙ্গষ্টেনের প্রকাণ্ড খনি আছে চীনে এবং ব্রহ্মদেশে। য়ুরোপে টাঙ্গষ্টেন্ পাওয়া যায়—তবে তার পরিমাণ খুব অল্প! টাঙ্গষ্টেন্ আজ এ যুদ্ধে লাগিতেছে ইস্পাতকে আরো মজবুত জোরালো করিতে এবং প্রোজেকটাইল্ অস্ত্রাদির নির্ম্মাণে। ইস্পাতের গা ফুঁড়িতে হইলে টাঙ্গষ্টেন্ প্রধান সহায়। বিজলী-বাতির বালবে—ষাট-ওয়াট বালবে চুলের চেয়েও যে মিহি তার আছে—যে-তার বৈদ্যুতিক প্রবাহে তাতিয়া টক্‌টকে লাল হইয়া আলো দেয়, সে-তার এখন টাঙ্গষ্টেনে তৈয়ারী হইতেছে। তাপ সহিবার এমন শক্তি অন্য কোনো ধাতুর নাই।

প্রচণ্ড তাপেও টাঙ্গষ্টেন গলে না বা তারের এতটুকু অপচয় ঘটে না। টাঙ্গষ্টেনের ছুড়ি তাতাইয়া যে-কোনো কঠিন ধাতুর গায়ে রেখা টানুন, কঠিন ধাতু তখনি কাটিয়া যাইবে। এই ছুড়ি তৈয়ারী হয় কারবাইড্-সংযোগে। তৈয়ারীর বিশেষ প্রণালী আছে।

গাড়ী-বোঝাই লৌহচূর্ণ—খনি হইতে তোলা

লোহা এবং ইস্পাতকে আরো জোরালো করিতে আর-একটি ধাতুর আবিষ্কার হইয়াছে। সে ধাতুর নাম ভানাডিয়াম। এ ধাতুর আবিষ্কার করিয়াছেন একজন মেক্সিকান বৈজ্ঞানিক। ভানাডিয়ামের জোরে মোটরের কলকজা এমন মজবুত হইতেছে যে, বিপর্য্যয় আঘাতেও চট করিয়া ভাঙ্গে না। তাছাড়া ভানাডিয়ামে আজ মোটরের চাকা বহু যন্ত্র, রেলোয়ে-ব্যবহারের জন্য পিষ্টন রড প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে। ভানাডিয়াম পাওয়া যায় ধোঁয়া হইতে, ঝুল হইতে। তেল-পোড়ানো ঝুল জড়ো করিয়া তাহা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভানাডিয়াম পেন্টক্সাইড নিষ্কাশিত হয়, তাহা হইতে মিলে ভানাডিয়াম। সুখ-শান্তির দিনে যে নিকেল-ক্রোমিয়াম ধাতু সখের কাজে লাগিত, এখন তাহাতে তৈয়ারী হইতেছে রাডিয়েটরের গ্রিল এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় আরো বহু

লোহার খনি—মিনেসোটা

বাড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ সব ধাতুর কোনটিই নূতন বা তাঁহাদের আবিষ্কার নয়; ধরিত্রী মাতার কোলে এ-সব ধাতু নানা ভাবে বিরাজ করিতেছে সেই সৃষ্টির আদি দিন হইতে। মানুষ লোহা গালাইতে শিখিয়াছে—ক'দিন বা আকাশচ্যুত

উল্কাখণ্ড হইতে প্রাচীন যুগের মানব কঠিন ও অমোঘ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিত।

ক্রোমিয়াম এবং নিকেলের সংযোগে সাধারণ ইস্পাত হয় অসাধারণ ইস্পাত বা supersteel। অসাধারণ ইস্পাতকে ক্ষয় করিবে, এমন তীব্র এসিড বা প্রচণ্ড তাপ এখনো জন্মায় নাই।

আমেরিকার পাহাড়গুলি বহু ধাতুর আকর, আজ যুদ্ধের তাগিদে সে-পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে এবং বিপুল অধ্যবসায়ে সর্বত্র আজ ধাতু-সংগ্রহের কাজ চলিয়াছে। পাহাড়ের গা বহিয়া যে-সব নদী-নির্ঝর নীচে নামিয়া স্রোতোবেগে বহিতেছে, সে-সব নদী-নির্ঝরের জলে প্রচুর তামা মিলিতেছে। মন্টানা সহরের গায়ে যে-নদী, শুধু সেই একটি নদীর জলেই এক বছরে তামা মিলিতেছে ৭৫০০০ মণ! খনিগুলির দোয়ানি-জলে প্রচুর সালফেট পাওয়া যাইতেছে।

ম্যাগনেসিয়ামে আলো

তামার খনির মধ্যে কতকগুলির বর্ণ উজ্জ্বল নীল, কতকগুলি সবুজ। আমেরিকায় অনেকগুলি সীসার খনি আবিষ্কার হইয়াছে। সীসার প্রয়োজনীয়তার সীমা নাই। গুলী-বারুদ সার্পনেলের জন্য চাই সীসা—তার উপর ও-দিকে ছাপিবার অক্ষর তৈয়ারী করিতে সীসার প্রয়োজন।

তার পর জিঙ্ক। কার্টরিজের ব্রাশের (brass) জন্য চাই জিঙ্ক। এই জিঙ্কে তামা আছে ৭০ ভাগ—জিঙ্ক ৩০। গালভানাইজ করিতে জিঙ্কের প্রয়োজন। জিঙ্কে মরিচা ধরে না। জাহাজের গলুই বয়লার প্রভৃতির গা জিঙ্ক-পাত দিয়া না ঢাকিলে ইস্পাত-পাতগুলিকে রক্ষা করা যায় না; তাহা ক্ষয়িয়া যায়। জিঙ্ক যেন দধীচি মুনি—নিজে প্রাণ দেয়, দিয়া ইস্পাতের প্রাণ রক্ষা করে!

টিন। আমেরিকায় টিনের ব্যবহার সব দেশের চেয়ে বেশী অথচ আমেরিকায় টিনের খনি এত কম যে, নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। টিন আনাইয়া সেই টিনে ইস্পাত মিশাইয়া আমেরিকা তৈয়ারী করে ছোট-বড় বালতি এবং নানা গড়নের পাত্র বা আধার। আমেরিকা টিন আনায় মালয় এবং ডাচ্-ইণ্ডিজ হইতে। মার্কিনে এণ্টিমনি যায় এশিয়া হইতে। সীসার সহিত এণ্টিমনি মিশাইলে সীসার দেহ সুদৃঢ় কঠিন হয় এবং তার জোর বাড়ে। সার্পনেল এবং পারদ নির্মাণে, ব্যাটারি-রচনায় এবং ছাপার অক্ষর তৈয়ারী করিতে এণ্টিমনির প্রয়োজন।

তার পর—পারদ ধাতু। পারা সবচেয়ে বেশী মেলে ইতালীতে এবং স্পেনে। তার পর মার্কিন যুক্তরাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধে পারা বা মার্কারির প্রয়োজন বড় সামান্য নয়। বোমার জন্য পারা চাই,—বয়লারে পারা-বাষ্প আলোর সৃষ্টি করে। পারা নহিলে ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে জাহাজ প্রভৃতিকে নিরাপদে চালানো আজ সম্ভব হইত না।

আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে, এ-যুদ্ধে সকল ধাতুই গ্রহণ করিতে হইয়াছে—প্লাটিনাম, সোনা, রূপা হইতে সুরু করিয়া সীসা পর্য্যন্ত। পূর্ব্বযুগের বড় বড় যুদ্ধে লোক-লস্কর, কামান-বন্দুক আর বড় জোর লোভী বিশ্বাসঘাতক দলচ্যুত দেশদ্রোহী পাইলেই বিজয় লাভ ঘটিত,—এ যুগে লোকলস্কর অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতিতে যেমন বিরাট বৈচিত্র্য আছে, তেমনি ধরিত্রীর ধাতু-ভাণ্ডারে মানুষের হাত পড়িয়াছে। নাম-জানা এবং নাম-না-জানা কত ধাতু যে এ যুদ্ধে মানুষের দাস্য করিতেছে,—সে কথা মনে হইলে ভাবি, সৃষ্টি-স্থিতির কাজে যে-সব ধাতুর প্রয়োজনও আমরা অনুভব করি নাই, আজ সংহার-যজ্ঞে সেই সব ধাতু অমূল্য! প্রলয়ের শেষে যাহারা বাঁচিবে, এই সব ধাতুকে সৃষ্টির কাজে লাগাইয়া তারা যেন শুধু কল্যাণ এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করিয়া ধন্য হয়!

রূপসী

সে যদি বারেক দাঁড়ায় তাহার ঘোমটা তুলি
লাজে রাঙা হয় আধ-ফোটা যত গোলাপ-কলি!
রূপেতে তাহার মেঘেতে লুকায় চাঁদিমা রাকা!
খঞ্জনে করে চঞ্চল তার নয়ন বাঁকা!

সে যদি এলায় কুন্তল তার বারেক ভুলে
মলয়ার বুকে ফোটা চামেলীর গন্ধ দুলে!
ধনুর মতন চিত্রিত তার যুগল ভুরু—
গুণ দিলে হবে মদনের জয়-যাত্রা সুরু।

সে যদি ছড়ায় কণ্ঠ তাহার আপন-মনে
জাগে যৌবন নিমেষে নদীর কল-স্বনে।
মুখর পাপিয়া লাজে মুখ ঢাকে পাতার আড়ে,
ময়ূর নীরব আবেশে ঝিমায় সোনার দাঁড়ে।

সে যদি বাড়ায় চরণ বারেক পথের পরে
রক্ত-কমল ফুটে ওঠে তার চরণ-ভরে।
হাসিতে মাণিক, কান্নায় তার মুকুতা ঝরে!
শুভ-চিহ্নিত সিন্দুর শোভে সীঁথির 'পরে।

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ)

স্রোত বহে যায়

[উপন্যাস]

১৭

২রা শ্রাবণ। বিবাহের আর চৌদ্দ দিন বাকী। সারা গ্রাম জাঁকাইয়া আয়োজন শুরু হইয়া গিয়াছে।

গ্রামের আর পাঁচটা গৃহস্থ-পরিবারে নানা কথা হয়। অল্প-বয়সী মেয়েরা বলে—পয়সা খরচ করে' যত জাঁক-জমকই করুন্…সব যেন ম্যাড়্-ম্যাড়্ করছে!…বাড়ীর লক্ষ্মী…জানকীর মতো তিনি রইলেন নির্ব্বাসনে!

প্রৌঢ়ার দল শিহরিয়া জবাব দেয়—কি বলে তিনি এসে নিয়ম-কর্ম্ম করবেন! বিলেত-ফেরত ছেলের বাচ্ছাটাকে নিয়ে মাখা-মাখি করছেন…এক-পাতে তার সঙ্গে খাচ্ছেন অবধি! ধর্ম্ম বলে একটা-কিছু আছে তো!

অল্প-বয়সীরা কোনো মতে আল্‌গোছে বলে—তাহলেও তিনি মা!

প্রৌঢ়ার দল তাতিয়া জবাব দেয়—মা হলেই পীর হয় না। এই যে পেসন্ন চৌধুরীর মা…ছেলের ঘর ছেড়ে জামাইয়ের বাড়ী গিয়েছিল আদিখ্যেতা করে মেয়ের অসুখে মেয়ের সেবা করতে। ছেলের মাথা কাটা গেল না? পেসন্ন চৌধুরী পষ্ট বললে মাকে, আমার মাথা হেঁট করে' যেমন জামাই-বাড়ী গেছ, সেইখানেই তুমি থাকবে—এ বাড়ীতে ঠাঁই হবে না। তোরা এ সবের কি বুঝবি…দেশের এ আচার!

মেয়েদের মধ্যে তরলার বিবাহ হইয়াছে কলিকাতায় ধনী-ঘরে; তার বর ডেপুটি হইয়াছে। সে বলিল—তা যাই বলো বাপু, গাঙ্গুলি-জ্যাঠার এ-কাজ ভালো হয়নি। ঐ গুঁড়োটুকু…তাঁর নাতি তো…পাতানো সম্পর্ক নয়…তাঁরি রক্তে জন্ম! ঠাকুর-মা যদি ও ছেলেকে না নিত, ছেলেটার কি হতো?

মোক্ষদা মালা জপ করিতেছিল,—এ সুযোগ ছাড়িতে পারিল না! হাতের মালা মাথায় ঠেকাইয়া বলিয়া উঠিল—ছেলের বাপের বোঝা উচিত ছিল আগে! শুধু বিলেত যাওয়া? ফিরে এসে যত হাড়ি-ডোম-প্যাওরাকে নিয়ে বাস…মানুষে সইতে পারে?…এত বড় অনাচার! তার ফলে দু'দিন বাঁচতে পারলো না! নাহলে যাবার কি বয়স হয়েছিল তার? না, যাবার মতো জিরজিরে দেহ ছিল!

তর্ক চলে না। তা ছাড়া তর্কে যখন এতখানি তাচ্ছিল্য আর অমর্য্যাদার বিষ ফেনাইয়া ওঠে!

মাখন গাঙ্গুলি সামাজিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন—প্রতি গৃহে একটা করিয়া মাঝারি সাইজের ঘড়া বিতরণ! সুশীল পরামর্শ দিয়াছিল—বাসন-কোশন যদি দেন মামাবাবু তো একটা করে ঘড়া দিন সকলকে…নদীর ঘাট থেকে মেয়েদের জল আনতে সুবিধা হবে। গৃহস্থেরও সুসার। মানুষের নিত্য-কাজে ব্যবহার হবে!

বাড়ীর সামনে মস্ত খোলা জায়গা। সে-জায়গায় হোগলা দিয়া প্রকাণ্ড মেরাপ তৈয়ারী হইতেছে। তৈয়ারীর ভার লইয়াছে নন্দ। উড়িয়া তুলিতেছে, এ অঞ্চলটে তেমন মণ্ডপ কেহ কখনো চক্ষে দেখে নাই! সে-বার কলিকাতার কংগ্রেসে সে নিজের হাতে কাজ করিয়াছিল…সে-প্ল্যান তার মাথায় গাঁথা আছে। বরের বসিবার জন্য করিতেছে বেশ উঁচু পাটাতন…লতা-পাতার ঝালর দুলিবে! আসন হইবে ময়ূর-সিংহাসনের আদর্শে। মাখন গাঙ্গুলি তার আঁকা নক্সা দেখিয়া খুশী হইয়া বলিয়াছেন—সকলে যদি তারিফ করে নন্দ, তাহলে তোকে নগদ পাঁচশো টাকা দেবো। মজুরী যা পাবার তা তো পাবিই, তা ছাড়া!

নন্দ জবাব দিয়াছে—বখশিসের লোভে করছি না, কর্ত্তা বাবু! করছি, শুধু গ্রামের মান হবে বলে'!

এ-বাড়ীর সমারোহ দেখিতে…সেই সঙ্গে মজার আকর্ষণ…গ্রামের লোক এ-বাড়ীতে ভিড় জমাইতে সুরু করিয়াছে! নিষ্কর্ম্মার দল তাসপাশার আসর রাখিয়া এ-বাড়ীতে আসিয়া জোটে…মণ্ডপের গঠন কি করিয়া অগ্রসর হইতেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া দাঁড়াইয়া দেখে। কেহ দালানে উঠিয়া সরকার-গোমস্তাদের প্রশ্ন করিয়া খবর সংগ্রহ করে, যাত্রা হইবে, না, সহর হইতে থিয়েটার আসিবে? বাই-নাচটা হইবে বিবাহের রাত্রে, না, গায়ে হলুদের দিন? বাজি পুড়িবে, সে জন্য মশলা-বারুদ আসিতেছে…নন্দর সহকর্ম্মী কালো আনিয়াছে কলিকাতার মেছুয়াবাজার হইতে গেঁদু মিয়া'কে! গেঁদুর হাতের বাজির নাম-ডাক আছে। সেবারে কুইন-ভিক্‌টোরিয়ার ছেলে রাজা হইলে কলিকাতার গড়ের মাঠে যে-বাজি পোড়ানো হইয়াছিল, সে-বাজি তৈয়ারীর ভার ছিল না কি গেঁদু বলে, তারি উপর!

এ-বাড়ীর দিকে সকলের আকর্ষণ দিনে-দিনে বাড়িতেছে দেখিয়া পরেশ গাঙ্গুলি মুষড়াইয়া পড়িলেন। ভয় হইল, শেষে তাঁর অখিলের সঙ্গে বরযাত্রী যাইতে হয়তো লোক জুটিবে না! গ্রামে বসিয়া যদি দুশো রকমের তামাসা দেখার সঙ্গে কালিয়া-পোলাও চর্ব্বচোষ্য খাইতে পায়, তাহা হইলে কষ্ট করিয়া গাড়ী চাপিয়া তার পর ট্রেন ধরিয়া কে যাইবে সেই বিলাসপুরে? শিবকৃষ্ণকে পাঠাইয়া পরেশ গাঙ্গুলি তাই দিন বদলাইলেন, ১৬ তারিখের বদলে ২৫শে শ্রাবণ। ছেলের জন্ম-নক্ষত্রের সঙ্গে ২৫ শ্রাবণ-তারিখের জন্ম-নক্ষত্রগুলা না কি আশ্চর্য্য রকম মিল্ লইয়া আকাশের বুকে আসিয়া দেখা দিবে! তার উপর মাখন গাঙ্গুলি হন সম্পর্কে বড় ভাই…তাঁর বাড়ীতে ঐ তারিখে বিবাহ…তাঁরো ইচ্ছা, ও-রাত্রিটিতে এখানে থাকিয়া উঁহার দায়-উদ্ধারে সাহায্য করা! এ-কথা না রাখিলে তাঁর অমর্য্যাদা করা হইবে ইত্যাদি, তাই…

ওদিক কন্যা-পক্ষ। টাকা-পয়সায় বড় হইলেও বর-পক্ষের কাছে কন্যাপক্ষকে মাথা নোয়াইয়া থাকিতে হয়! দেশাচার! জয়রাম রায় জবাবে জানাইলেন, তথাস্তু!

পরেশ গাঙ্গুলি বসিয়া তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া ও-বাড়ীর উপর টেক্কা মারিতে পারেন! শিবকৃষ্ণ দু'-চারিটা পরামর্শ দিল। শুনিয়া পরেশ গাঙ্গুলি বলিলেন—বলছো বটে শিবকেষ্ট, কিন্তু ওঁদের কি জানো…মেয়ের বিয়ে…এক-রাত্রের ব্যাপার! আমার হলো ছেলের বিয়ে…যজ্ঞি চলবে দশ-বারো দিন ধরে'! শেষে

কি মাথা বিকিয়ে যাবে! তা নয়…দু'টি এমন বোড়ের চাল্ বাতলাও, যাতে বড় বাড়ী বলে, হ্যাঁ, পরেশ একটা কাণ্ড করেছে, বটে!

শিবকৃষ্ণ সে-চাল বাৎলাইবে কি করিয়া! তার মাথায় যেটুকু বুদ্ধি, সেটুকু শুধু পরচর্চ্চায় বিষ ছিটাইতে জানে! ঠাকুরের মাথায় বেলপাতা চাপায়—নেহাৎ পাথরের দেবতা…ফাঁকিবাজি ধরিতে পারিলেও তাঁর হাত-পা-মুখ…কিছুই নাই, তাই শিবকৃষ্ণ যা-তা পূজা করিয়া পার পাইয়া যাইতেছে!

নিস্তার মাঝে-মাঝে বলে, মন্তর তো তুমি কতই জানো! আমার ভয় করে, বাবুরা যদি কোনো দিন বলে, কি মন্তর বলে পূজো করো, বলো তো শুনি…তাহলে তোমার কি যে হবে, তাই ভাবি!…এত করে বলি, চারটে পয়সা…বেশী নয়, চারটে শুধু…খরচ করে একখানা ঐ শিবপূজোর বই কিনে এনে মন্তরগুলো দেখে-শুনে রাখো…তা সে-কথা গেরাহ্যির মধ্যে আসে না!

ধমক দিয়া শিবকৃষ্ণ বলে—থাম্, থাম্…মন্তর জানি, কি, না জানি, তার এগজামিন্ তোর কাছে দিতে হবে? গলায় দড়ি! বিনা-মন্তরে পূজো করলে ঠাকুর আমাকে আস্ত রাখতো, বটে!

চোখ ঘুরাইয়া নিস্তার জবাব দিল—থামো। ঠাকুরের দোহাই আর পেড়ো না! একে পাথরের ঠাকুর…তার উপর ব্যোম্-ভোলা-নাথ! বলে, চণ্ডাল পূজো করেনি, তপ করেনি, জপ করেনি, তার পুঁটলি-ধোয়া জল না কি একটু পড়েছিল বাবার মাথায়! তার জোরেই সে তরে গিয়েছিল। তুমি তো তবু বামুন…গলায় পৈতের গোছা ঝুলছে!

এ-সব কথা শিবকৃষ্ণ শোনে। যার সঙ্গে ঘর করিতে হয়, তার কথা না শুনিলে ঘরে থাকিবে কি করিয়া?

১২ তারিখের কথা। বেলা দু'টা বাজিয়া গিয়াছে। কেশব ঠাকুরের গৃহে কদম খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া দাওয়ায় একখানা মাদুর পাতিয়া শুইয়াছে—হাতে একখানা বই…বটতলার উপন্যাস। সে-বইয়ে একেবারে মশগুল! এমন সময় কেশবের মেজো ছেলে যুগল আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

ছেলেমেয়েরা ক'দিন ও-বাড়ীতেই খাওয়া-দাওয়া করিতেছে…কেশব ঠাকুরও তাই। ঢালা হুকুম। বাড়ীতে খায় শুধু কদম একা। নিজের ইচ্ছায় নয়। সরো বলিয়াছিল কেশব ঠাকুরকে—কদম একা বাড়ীতে আর রান্নাবান্না করবে কেন? এ-বাড়ীতেই এসে থাকুক…কাজে-কর্ম্মে আমার সাহায্য হবে'খন। তাহার উত্তরে কেশব ঠাকুর মিনতি করিয়া বলিয়াছে—না পিসিমা, এত আগে থেকে তাকে আর আনবেন না। বাড়ীতে থাকলে চৌকি দেওয়াটা হবে তো। তাছাড়া গায়ে-হলুদের দিন থেকে এ-বাড়ীতে পাত তো সকলের পাতাই আছে! সরস্বতী এ-কথার উপর আর দ্বিতীয় কথা বলেন নাই।

যুগল আসিয়া বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিল—ঘুমোচ্ছো? না, জেগে আছো?

উপন্যাসের নায়িকা হৈমবতী তখন স্বামীর লাথি খাইয়া ফুঁশিয়া উঠিয়াছে…কোমরে কাপড় জড়াইয়া স্বামীকে বলিতেছে…

কি কথা…তার জন্য মনে প্রচণ্ড কৌতূহল! এমন সময় রসভঙ্গ করিয়া যুগলের আবির্ভাব!

কদম প্রথমে সাড়া দিল না…নিঃশব্দে বইয়ের পাতা উল্টাইল।

যুগল দেখিল, জাগিয়া থাকিয়া তার কথায় সাড়া দেওয়া হইল না। ঝাঁজালো গলায় বলিল—কথাটা বুঝি কাণে গেল না? নবেল পড়ছেন রাজনন্দিনী!

বলিয়া বইখানা ছোঁ মারিয়া টানিয়া উঠানের প্রান্তে ছুড়িয়া ফেলিল। কদম উঠিয়া বসিল।

মাথার ভিজা চুলের রাশি খোলা ছিল…মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল। পাকাইয়া চুলগুলাকে মুখের উপর হইতে সরাইয়া গুচ্ছাকারে বাঁধিয়া যুগলের পানে চাহিল। বলিল,—ফেললে যে! এর মানে?

যুগল বলিল—মানে, অগ্রাহ্যি করে যেমন আমার কথায় সাড়া দিলে না, তেমনি আমিও শোধ নিলুম অগ্রাহ্যি করে তোমার নভেল ফেলে দিয়ে।

কদমের দু'চোখে যেন আগুন জ্বলিল। কদম বলিল,—পরের বই…বিরাজদির বাড়ী থেকে চেয়ে এনেছি!

যুগল বলিল,—যার কাছ থেকেই চেয়ে আনো, আমি ডোণ্ট কেয়ার!

কদম এ কথায় জবাব দিল না…উঠানে নামিয়া বইখানা কুড়াইতে চলিল।

যুগল বলিল—কোথায় চললেন মহারাণী, শুনি?

কদম বই লইয়া দাওয়ায় ফিরিল। যুগল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া দেখিল। মনে মনে ভাবিল, যে-কাজে আসিয়াছি, কদমকে চটাইলে সে-কাজ হাসিল হইবে না। তাই স্বর একটু নামাইয়া দরদ কাড়াইবার উদ্দেশে বলিল—দেখি, বইখানা ছিঁড়ে গেল কি না।

—থাক্! মশাইকে আর দরদ দেখাতে হবে না।

যুগল বলিল,—সত্যি, জানো তো আমার মেজাজ…চটুলে জ্ঞান থাকে না! তুমি তো সাড়া দিলেই পারতে!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কদম কহিল,—তোমার মাইনে-করা বাঁদী নইতো আমি যে ডাকলেই অমনি 'হুঁ' বলে সাড়া দিতে হবে!

কদম মাদুরে দেহ-ভার লুটাইয়া দিতে উদ্যত হইল। যুগল বলিল—শুয়ো'খন। শুয়ে নিবিষ্ট মনে নভেল পড়ো। তার আগে আমার একটা কাজ করতে হবে…ভয়ঙ্কর জরুরি কাজ।

বিরক্তি-ভরা দৃষ্টিতে কদম চাহিল যুগলের পানে। চাহিয়া প্রশ্ন কহিল—কি কাজ?

যুগল বলিল—জানো তো ও-বাড়ীর বিয়েতে গায়ে-হলুদের রাত্রে আমাদের থিয়েটার হবে। বিনোদ-বিলাস নাট্য সমিতি। বিল্বমঙ্গল প্লে হবে। তাতে আমি সাজবো চিন্তামণি!

থিয়েটারের নামে কদমের চড়া মেজাজ একটু নরম হইল। যুগলের পানে চাহিয়া কদম কহিল—সত্যি?

—সত্যি নয় তো কি তোমার কাছে আমি তামাসা করতে এসেছি! দেখো…বিল্বমঙ্গল সাজবেন জীবেন বাবু…কলকাতা থেকে এসেছেন। সখের থিয়েটারে এমন এ্যাকটর আর জন্মায়নি। গিরিশ ঘোষ…নাম শুনেছো তো? জীবেন বাবুর প্লে দেখে তিনি কত বার খোসামোদ করে জীবেন বাবুকে বলেছেন—পাবলিক থিয়েটারে জয়েন করতে! তা জীবেন বাবু জয়েন করবেন কেন? বড় লোকের ছেলে…মান-ইজ্জৎ আছে!

কথা শুনিয়া কদম চুপ করিয়া রহিল। মনের মধ্যে অনেক কথা

অস্পষ্ট আব্ছায়ায় ভাসিয়া আসিল। থিয়েটার! মনে পড়িল, আট বছর বয়স তখন···কলিকাতায় শ্যামপুকুরে গিয়াছিল মাসিমার বাড়ীতে। সেখান হইতে মাসিমাদের সঙ্গে সকলে গিয়াছিল ষ্টার থিয়েটারে। প্লে দেখিয়াছিল সতী-কি-কলঙ্কিনী আর একাকার! সতী-কি-কলঙ্কিনীর সেই শ্রীরাধা···শ্রীকৃষ্ণ···

যমুনার কূলে ছিদ্র কুম্ভে জল ভরা···একবিন্দু জল পড়িল না··· সখীরা সহর্ষে গান গাহিল

চলো চলো সবে ত্বরায় যাই—
দেখিব কে বলে, অসতী রাই!

সে-গান এখনো মনে আছে! সে সুর বুকের কোটরে এখনো বাজিতেছে···অক্ষয় অমর সুর!

যুগলের কথার সে জবাব দিল না।

জবাব না পাইয়া যুগল চটিল। কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল—আজ আমাদের ফুল-রিহার্শাল হচ্ছে···একেবারে সাজ-পোষাক পরে'···মাইনর স্কুলে। তাই আমি এসেছি তোমার সেই লাল রঙের বেনারসীখানা আর অন্য দু'খানা সাদা শাড়ী নিতে।

কদমের চোখের সামনে তখনো সেই থিয়েটারের যমুনা-পুলিনের দৃশ্য! মন ভরিয়া সেই সুর···

যুগল বলিল,—ভাবে বিভোর হয়ে রইলে যে! শাড়ী দাও··· আমি দাঁড়াতে পারবো না। 'হারি' করো।

কদম বলিল—কি করতে হবে?

যুগল বলিল—কথাটা কাণে গেল না বুঝি?···সাধে মেজাজ চটে!···শাড়ী চাই···শাড়ী নিতে এসেছি। তোমার লাল বেনারসী-খানা···আর ধোপার-বাড়ীর-কাচা এমনি দু'খানা ভালো সাদা শাড়ী!

—শাড়ী কি হবে?

—তিনখানা শাড়ী আমার চাই। ঐ-সব শাড়ী পরে আমি সে-রাত্রে চিন্তামণি সাজবো। মানে, বেনারসীখানা···

কদম মাথা নাড়িয়া বলিল—শাড়ী আমি দেবো না। তাছাড়া লাল বেনারসী তো কিছুতেই নয়। বিয়ের সময় বাপের বাড়ী থেকে ঐ একখানি ভালো শাড়ী পেয়েছি···তোমাকে দিয়ে সে-শাড়ী আমি নষ্ট করবো বৈ কি! বয়ে গেছে আমার শাড়ী দিতে।

যুগল বলিল—দেবে না শাড়ী?

—না।

যুগল বলিল—কোথায় পরের বাড়ী আমি যাবো বেনারসী শাড়ী চাইতে, শুনি?

—আমি তার কি জানি!···হুঁঃ, আবদার দেখে বাঁচি না। উনি করবেন থিয়েটার আর আমি জোগাবো শাড়ী···দামী শাড়ী! তারপর ছিঁড়ে গেলে···?

যুগলের দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। যুগল বলিল,—শাড়ী দেবে না?

—না, দেবো না।

—তোমার বাবা দেবে, সে দেবে···তুমি তো কচি খুকী! বলিয়া বাঘের মতো লাফ দিয়া যুগল কদমের উপর পড়িল···তার আঁচল হইতে চাবি লইতে। কদম আঁচল চাপিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল···যুগল তবু ছাড়িল না; কদমকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া ফেলিয়া আঁচল চাপিয়া ধরিল। আঁচল হইতে চাবির রিং খুলিয়া লইল। টানাটানিতে আঁচল ছিঁড়িয়া গেল, কদমের হাত গেল ছড়িয়া যুগলের নখের খোঁচায়।

রাগে অপমানে কাঁদিয়া কদম লুটাইয়া পড়িল।

যুগল সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিল না···বীর-দর্পভরে ঘরে গিয়া প্যাঁটরা খুলিয়া বেনারসী শাড়ী সেই সঙ্গে একখানা কালাপাড় আর একখানা সবুজ রঙের ভালো শাড়ী লইয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল,—প্যাঁটরা গুছিয়ে রাখো···চাবি খোলা রইলো। এর পরে বলো না, সর্ব্বস্ব চুরি গেছে! তিনখানা শাড়ী আমি নিয়ে যাচ্ছি। এই দ্যাখো।

যুগল চলিয়া গেল···কদম তেমনি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

কাণে বাজিতেছিল কবেকার-শোনা সতী-কি-কলঙ্কিনীর আর একখানি গান

শ্যাম কি বলে জীবন বলো রাখি,
আমার লজ্জা যদি না দাও ঢাকি!

২০

গায়ে-হলুদের আগের দিন। সন্ধ্যা বেলায় সরস্বতী আসিলেন কেশব ঠাকুরের গৃহে। ডাকিলেন,—কদম···

কদম ছিল রান্নাঘরে···উনুনে আগুন দিতেছিল। সরস্বতীর আহ্বানে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পুলকের একটা শিহরণ বহিয়া গেল!

পিসিমার সঙ্গে কথা কহিয়া সে যেন বর্ত্তাইয়া যায়! আর বিন্দুমতী···তাঁর কাছে গিয়া কি শান্তি যে পায়! এখানে বন্দিনীর মতো পড়িয়া আছে। গতর দিয়া শুধু সকলের খিদমত খাটো! মুখের পানে কেহ চাহে না! মনের ব্যথার পানে চাওয়া দূরের কথা, দেহের অসুখেও কেহ একবার 'আহা' বলিয়া একটু দরদ জানায় না!

বিবাহের সমারোহ সুরু হওয়া ইস্তক বাড়ী হইতে বাহির হওয়া এক রকম বন্ধ হইয়াছে। বিবাহ-বাড়ীতে খাইতে যাইবার জন্য তার একটুকু লোভ নাই! ভালো খাওয়ার সাধ বা রুচি তার অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে! শুধু মানুষের মতো পাঁচ জন মানুষকে সে দেখিতে চায়! তাদের সঙ্গে দু'টো কথা কহিতে চায়! সরস্বতী আর বিন্দুমতী···এই দু'জনকেই সে দেখে মানুষের মতো! সে তাঁদের কেহ নয়! তবু তাঁদের কাছে মুখের কথায় যেটুকু পায়, তাহাতেই তার খালি বুক ভরিয়া ওঠে! এমন পাওয়া সে নিজের মা-বাপের কাছেও কখনো পায় নাই!

বয়স বাড়িয়া উঠিতেছিল···বিবাহ হইতেছে না···তার জন্য মা-বাপের কাছে কি লাঞ্ছনা সহিয়াই না ইদানীং বাস করিত! তার পর মা-বাপ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল এই কেশব ঠাকুরের হাতে তাকে ফেলিয়া দিয়া! তাঁদের গলায় সে যেন কাঁটা হইয়া বিঁধিয়া ছিল, কোনো মতে সে-কাঁটা ফেলিয়া দেওয়া···তা সে-কাঁটা গিয়া পড়ুক নালা-নর্দ্দামায় কিম্বা আঁস্তাকুড়ে! এ-কথা কাহাকেও বলিবার নয়! বলিলে মহাপাতক হইবে! ভয় করে। মনে হয়, আর-জন্মে নারী-জন্ম লইয়া বোধ হয় এমনি মহাপাতকই করিয়াছিল! নহিলে কী সে ভাবিয়াছিল নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে···একটি ক্ষুদ্র সংসার···স্বামী··· স্বামীর ভালোবাসা···ছেলেমেয়ে···তার বদলে···

এ-সব কথা লইয়া বিবাহের পরে বড় বেশী ভাবিত! ভাবিতে-ভাবিতে কূল-কিনারা না দেখিয়া নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিত! ভাবিত, নদীর জলে গিয়া ঝাঁপ দিবে!

কিন্তু পারে নাই! পাশাপাশি আর পাঁচটা বাড়ীর দিকে চোখ পড়িত···ক'জন সুখভোগ করিতেছে? সবচেয়ে বড় করিয়া মনে জাগিত বিন্দুমতীর কথা! এত ভালো···এমন দরাজ মন···কোনো পাপ করেন নাই···সকলের উপর কতখানি মায়া-মমতা···কি দরদ! অথচ কিসের জন্য তিনি আজ এ দুর্দশা ভোগ করিতেছেন? সব থাকিয়াও তাঁর কিছুই নাই! তিনি তো জলে ঝাঁপ দেন নাই··· বাঁচিয়া এ-সব সহিতেছেন! তিলে-তিলে দগ্ধ হইয়াও ভিতরকার সে-আগুনের ঝাঁজ সযত্নে চাপিয়া রাখিয়াছেন···কাহারো উপর ও-ঝাঁজের একটি ছিটাও কখনো বর্ষণ করেন না! বিন্দুমতীকে দেখিয়া কদম নিজের মন বাঁধিয়াছে। ভাবিয়াছে, বাঙলা দেশে মেয়ে-জন্ম লইয়া আসিলে এমনিই হয়! মেয়ে-মানুষের সব দিকে বিধাতা খিল আঁটিয়া দেন!···এতটুকু একটু গণ্ডী! সে গণ্ডীটুকুর মধ্যে মেয়েমানুষ যদি ছেঁচিয়া পিষিয়া চূর্ণ হইয়া যায়, তবু তার মুক্তি নাই! বিধাতার কি দুর্লঙ্ঘ্য বিধান এ!

জানিতে সাধ যায়, যারা এই ছোট গণ্ডীর বাহিরে থাকে, তারা কি এমনি করিয়াই বাঁচিয়া থাকে—পরের মনের পানে চাহিয়া··· পরের অনুগ্রহে নির্ভর করিয়া···নিজের মনকে ছেঁচিয়া পিষিয়া চূর্ণ করিয়া?

সরস্বতী বলিলেন—উনুনে আগুন দিচ্ছিলি বুঝি রে?

—হ্যাঁ পিসিমা। আগুন দেওয়া হয়েছে। বলিতে বলিতে কদম বাহিরে আসিল।

সরস্বতী বলিলেন—আজ রাত্রে যেতে হবে আমার সঙ্গে আমাদের ওখানে। তোকেই আমার বেশী দরকার, মা। বৌ-ঠাকরুণের কাছ থেকে আমি আসছি···তোকে দিয়ে তিনি চান বরণের ছিরি গড়াতে।

সরস্বতী আসিয়াছেন কদমকে লইয়া গিয়া তাকে দিয়া বরণের শ্রী গড়াইবার জন্য!···নারী-জন্মে এ যে মস্ত গৌরব! বাঙালী ঘরের মেয়ের কত-বড় সৌভাগ্য! বিবাহের যেটুকু আয়োজন এ-বয়সে দেখিয়াছে, তাহাতে এমনিই দেখিয়াছে!

কদম বলিল—তোমার ছেলেকে এ-কথা বলেছো পিসিমা?

—কেশবকে? বলেছি বৈ কি!···আমি বললে আমার কথায় সে 'না' বলতে পারে কখনো রে?

কদম শুনিল, শুনিয়া বলিল—কিন্তু পিসিমা, বাড়ী-ঘর?

—চাবি দে। সত্যি, তোকে বিয়ে করে এনেছে বলে দরোয়ান রাখেনি যে আমোদ-আহ্লাদ সব ছেড়ে তুই বাড়ী চৌকি দিবি!

কদম জবাব দিল না। করুণ নয়নে শুধু সরস্বতীর পানে চাহিয়া রহিল।

সরস্বতী বলিলেন—ঘরে-দোরে চাবি দে···দিয়ে তুই আয় আমার সঙ্গে।

সরস্বতী চাহিলেন কদমের মুখের পানে। বলিলেন,—মুখখানা কি হয়ে আছে রে! গায়ে সাবান দেওয়া বুঝি বারণ? তা হলেও একটু সর-ময়দা দিয়ে কি ব্যাসম দিয়ে মুখখানা মাঝে মাঝে ঘষে-মেজে সাফ করতে পারিস্ না?···আর চুলের কি ছিরি! এখনো চুল বাঁধা হয়নি?···চুল বুঝি বাঁধিস্ না?

কদম জবাব দিল না।

সরস্বতী বলিলেন—চুলের কি ছিরি করেছিস্! ছিঃ! চুল বাঁধবি রোজ! এয়োস্ত্রী মানুষ···চুল না বাঁধলে স্বামীর অকল্যাণ হয়!

স্বামী! অকল্যাণ!

কদমের চোখ ফাটিয়া যেন শ্রাবণের ধারা ঝরিল! মনকে বার-বার বুঝাইয়াছে···বলিয়াছে, প্রাণ-উৎসর্গ করিলেও তো কিছু আর ফিরাইতে পারিবি না···ভাগ্য বদলাইবে না! তা যখন হইবে না, মিথ্যা দুঃখ গড়িয়া মনকে জীর্ণ করিস্ কেন? যা পাস্ নাই, যা পাইবার নয়, তার জন্য ক্ষোভ করিয়া লাভ নাই! যা চাস্ নাই, তা যখন ভাগ্যে জুটিয়াছে, আর তাহা লইয়াই যখন বাঁচিতে হইবে, তখন অভিমান করিয়াই বা কি করিবি?···কার উপরে অভিমান?···

এ সব কদম জানে। জানিয়াও কত দিন স্ত্রী সাজিয়া কেশব-স্বামীর সামনে গিয়া দাঁড়াইয়াছে···কেশব-স্বামীর চোখের একটু সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি কামনা করিয়া!

কিন্তু···

পরক্ষণে লজ্জায় মরিয়া মন হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে! ওরে এ কি দুর্মতি তোর! অন্ধের কি চোখ আছে যে তুই অন্ধের সামনে গিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াস্!

কদমকে নিরুত্তর দেখিয়া সরস্বতী বলিলেন,—আমার সঙ্গে আয়! ও-বাড়ীতে গিয়ে আমিই তোর চুল বেঁধে দেবো। তার পর হ্যাঁ, তোর বেনারসী শাড়ী আছে? কি গরদ?

কদম বলিল—বেনারসী আছে। কিন্তু···

—কিন্তু মানে?

কদম বলিল—সে-শাড়ী যুগল নিয়ে গেছে পিসিমা। ওরা কাল না কি থিয়েটার করবে। সেই বেনারসী পরে যুগল সাজবে চিন্তামণি।

—হতভাগা ছেলে···এত-বড় বে-আক্কেলে! তাকে তুই শাড়ী দিলি কি বলে?

কদম বলিল—আমি দিইনি পিসিমা। জুলুম করে নিয়ে গেছে ···এই দ্যাখো··· বলিয়া কদম নখে-ছড়া হাতের ঘা দেখাইল।

দেখিয়া সরস্বতী যেন জ্বলিয়া উঠিলেন! বলিলেন—বটে, আমি দেখছি ও কত বড় বেয়াদব! তা, বেনারসীর জন্য আটকাবে না। লাল-পাড় শাড়ী আছে তো? তাই পরিস্‌খন। আর আমি ব্যবস্থা করেছি কদম, বিয়ের শ্রী গড়ার জন্য দাদাকে দিয়ে কিনিয়ে আনিয়েছি···তুই শ্রী গড়বি বলে···তোর জন্য ভালো বেনারসী শাড়ী একখানা, ভালো টাঙ্গাইল শাড়ী, আর-একখানা নীলাম্বরী-ঢাকাই। সে নীলাম্বরী-ঢাকাইয়ে তোকে যা মানাবে, চমৎকার!

কথাটা কদম শুনিল একান্ত মনোযোগে। আনন্দ হইল। কিন্তু আনন্দের চেয়ে মনে ব্যথা বাজিল অনেক বেশী। নিশ্বাসে বুক ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, নীলাম্বরী পরিলে তাকে চমৎকার মানাইবে ···কিন্তু কবে···কার জন্য কদম নীলাম্বরী পরিয়া সাজিবে?··· মেয়েমানুষ সাজগোজ করে···সে কি নিজের সখের জন্য? না, নিজের বাহার দেখিতে?

সরস্বতী বলিলেন—আয় মা···উনুনটায় কাঠ কি কয়লা আর চাপাসনি···আগুন ধুস্ পড়ে নিবে যাবে'খন। তুই চাবি দিয়ে আয় ···আমি এই দাওয়ায় বসছি।

সরস্বতী দাওয়ায় বসিলেন। কদম গেল ঘরে-দ্বারে তাল লাগাইতে।

শ্রাবণের আকাশে ঘন কালো দু'-টুকরা মেঘ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত!···বাতাসে তারা দুরন্ত শিশুর মতো ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে! একাদশীর চাঁদ! চাঁদকে দেখিয়া যড়্‌ করিয়া মিলিয়া-মিশিয়া জোট্ বাঁধিয়া ওরা বুঝি চাঁদকে ঢাকিয়া দিতে চায়!

কদম ঘরে-দ্বারে চাবি দিয়া তৈয়ারী হইয়া আসিল। বলিল—চলুন পিসিমা।

সরস্বতী বলিলেন—আয়। তোর ঘরের জন্য ভাবতে হবে না। গিয়ে আমি কেশবের হাতে চাবি দিয়ে দেবো···বলবো, ছেলেদের কাকেও যেন বাড়ীতে রাখে বাড়ী চৌকি দিতে। এ ক'দিন তুই আমার কাছে থাকবি···আমার কাছে শুবি। কেমন?

কদম বলিল—হ্যাঁ।

তার পর যাইতে যাইতে কদম ডাকিল,—পিসিমা!

সরস্বতী বলিলেন,—কেন রে?

—জ্যাঠাইমা একটি বার বাড়ী আসবেন না? তাঁর মেয়ের বিয়ে!

—না। আমি চেষ্টা করেছিলুম, বৌঠাকরুণ আসতে রাজী হলো না। কেন হবে? তার একটা মান আছে তো। ঘরের গিন্নী! বলতে গেলে তারি সব! দাদার মনেও সুখ নেই। মায়ের পেটের বোন্ আমি···বুঝতে পারি তো, দাদা মনে কি-ব্যথা বইছে!···বড্ড চাপা মানুষ···চিরদিন বাঁধা নিয়ম মেনে চলে আসছেন। পাঁচ জনকেই মানলেন চির-কাল···তাই দুঃখে ভেঙ্গে গেলেও প্রাণপণে নিজেকে খাড়া রাখতে চান! পাঁচ জনের মুখ চেয়ে নিজের সুখ, নিজের লাভ-লোকসান পায়ে চেপে মাড়িয়েছেন···অমন কত ব্যাপারে! চিরটা কাল!

সরস্বতী নিশ্বাস ফেলিলেন।

মাথার উপর আকাশে সেই ছোট মেঘগুলা গায়ে-গায়ে আসিয়া মিশিতেছে···বুঝি, জোট বাঁধিয়া এখনি কি দুরন্তপনার মাতন তুলিবে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অনাগত

পেয়েছি যাহারে সে তো হয়ে গেছে
কত দিন পুরাতন!
পাইনি যাহারে সে চির-নবীন—
তারে সদা চায় মন!
কত এসেছিল, কত গেছে চ'লে,
কত যে আসিবে, কত যাবে ছ'লে—
সকলেরই মাঝে জাগে হে, সতত
তোমারই আকিঞ্চন!
পেয়েছি যাহারে সে তো হয়ে গেছে
কত দিন পুরাতন!

মিলনের মালা বাঁধিতে পারি না—
আজও আছ তুমি দূর!
তোমারে পাবার আশায় এ হিয়া
হয়ে আছে ভরপুর।
তোমার আসার পথ চেয়ে থাকি,
কত সে স্বপন রচিয়া যে রাখি!
আকুল পুলকে করি নিতি নিতি
নব নব প্রসাধন।
পেয়েছি যাহারে সে তো হয়ে গেছে
কত দিন পুরাতন!

ধূলি

ওগো ধরণীর ধূলি-কণা,
তোমায় আমায় এই ধরণীতে
কত দিন জানা-শোনা!

আমার এ পথ চলায়,
কত শত বার হে বন্ধু, তুমি
জড়ায়েছো পায়-পায়!

চরণের স্মৃতি-হার
কত বার সুখে জড়ায়েছো বুকে—
মুছেচো তা বারে-বার।

তবুও তোমার মিতালি,—
আমার প্রাণের স্পন্দনে জ্বালে
মুগ্ধ প্রেমের দীপালি!

তোমার নীরব প্রীতি—
মরমে আমার দুলাইয়া তোলে
অনাদি কালের স্মৃতি!

হে চির-আদিম কায়া
মজ্জায় তব মেশানো সুদূর
অতীতের কত মায়া!

শ্রীবীণা রায়

নাট্যশাস্ত্র

প্রথমাধ্যায়

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(৩)

হে দ্বিজগণ! ভারতী ও সাত্বতী, আর আরভটী বৃত্তিতে আশ্রিত প্রয়োগ মৎকর্ত্তৃক (পুত্রগণের অভ্যাসার্থ) যোজিত হইয়াছিল ॥ ৪১ ॥

অনন্তর ব্রহ্মাকে প্রণাম ও পরিগ্রহপূর্ব্বক আমি (তাঁহাকে উক্ত) বিষয়ের বিজ্ঞপ্তি করিয়াছিলাম। অতঃপর সুরগুরু আমাকে বলিয়াছিলেন—'(ইহাতে) কৈশিকীরও যোজনা কর ॥৪২॥

আর যে দ্রব্য উহার (কৈশিকীর) যোগ্য, হে দ্বিজসত্তম! তাহাও তুমি বল।'—এইরূপে আমি তৎকর্ত্তৃক অভিহিত হইলাম, ও প্রভুকে (উহার) প্রত্যুত্তরও প্রদান করিয়াছিলাম ॥ ৪৩ ॥

'হে ভগবন্! কৈশিকীর সম্যগ্‌রূপে প্রযোজক দ্রব্য প্রদান করুন। নৃত্তাঙ্গহার-সম্পন্না, রসভাব-ক্রিয়াত্মিকা—॥৪৪॥

৪১। বৃত্তি—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ বা পুরুষের প্রয়োজনীয় চতুর্ব্বিধ ফল—সাধ্য। বৃত্তি উহাদের সাধন। বৃত্তি—বর্ত্তমানতা, ব্যাপার, চেষ্টা। চেষ্টা নানাবিধ—বাক্‌চেষ্টা, অঙ্গচেষ্টা, সত্ত্বচেষ্টা ইত্যাদি। বাগঙ্গসত্ত্বের যে সাধারণ চেষ্টা, তাহারই নাম 'বৃত্তি'। কাশী-সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে 'বৃত্তি' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বৃত্তির অপর নাম 'নাট্যমাতৃকা'।

[এ প্রসঙ্গে বিশেষ বিবরণ 'নাট্যমাতৃকা'-শীর্ষক মদীয় প্রবন্ধে মাসিক বসুমতী—দ্রষ্টব্য]

বৃত্তি চতুর্ব্বিধ—কৈশিকী, ভারতী, সাত্বতী ও আরভটী। উহাদিগের মধ্যে কৈশিকীর প্রয়োগ নারীগণই সুষ্ঠুভাবে করিতে পারেন—পুরুষের পক্ষে (একমাত্র অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তি নটরাজ ব্যতীত) উহার প্রয়োগ করা অসম্ভব। এ কথা পরে বলা হইবে (শ্লোক ৪৫-৪৬ দ্রষ্টব্য।)

কবিরাজ রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসায় বলিয়াছেন—বিলাস-বিন্যাস-ক্রম বৃত্তি, অর্থাৎ বৃত্তি হইতেছে নানাবিধ উপায়ে বিলাস (শোভা) সম্পাদন। এ অর্থটি কৈশিকী বৃত্তির পক্ষে বেশ লাগে।

অভিনব বলিয়াছেন—যখনই কোনরূপ কর্ম্ম আরম্ভ করা যায়, তখনই তাহাতে বাক্য-মন-কায়ের ব্যাপার (অর্থাৎ-ক্রিয়া) বর্ত্তমান থাকে। এই সকল ব্যাপার বিভিন্ন প্রকৃতির লোক বিভিন্ন ভাবে সম্পাদন করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তির বাঙ্‌-মনঃ-কায়-ব্যাপারে লালিত্য ও বৈচিত্র্যের অনুপ্রবেশ দৃষ্ট হয়। ইঁহারা উত্তম-প্রকৃতির লোক। উত্তম-প্রকৃতির সকল ব্যাপারই সৌষ্ঠবময় হইয়া থাকে। এই সৌষ্ঠবময় বাঙ্‌-মনঃ-কায়াদি-ব্যাপারের নামই বৃত্তি।

ভারতী—বাগ্‌বৃত্তি বা বাগ্‌ব্যাপার উহা—পুরুষাশ্রিত। সাত্বতী—মনোব্যাপার সাত্বিকী বৃত্তি। 'সৎ'—শব্দের অর্থ—'প্রখ্যা' (জ্ঞান)—সংবেদন। সৎ যাহাতে আছে তাহাই 'সত্ত্ব' বা মন। মনঃসম্বন্ধী ব্যাপার সাত্বতী বৃত্তি। আরভটী—"ইয়র্ত্তি ইতি অরাঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ২০। 'অর' শব্দের অর্থ—সোৎসাহ—অনলস। ভট, ভৃত্য—সৈন্য ইত্যাদি। অনলস ভৃত্যগণের যে কায়-ব্যাপার—উহাই আরভটী বা কায়বৃত্তি। কৈশিকী—কেশ-সম্বন্ধিনী বৃত্তি। কেশ কোন প্রয়োজন সাধন না করিলেও দেহশোভার উপযোগী। অতএব, সৌন্দর্য্যোপযোগী ব্যাপারই কৈশিকী বৃত্তি। অতএব, যাহা কিছু লালিত্যযুক্ত, সে সকলেই কৈশিকীর প্রকাশ। ভরতপুত্রগণের পক্ষে ইহার (কৈশিকীর) প্রয়োগ করা অসম্ভব—ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত মূলে 'তু' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। অতএব, বুঝা গেল যে, ভরতের শতপুত্র দশরূপকের যে প্রয়োগ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈচিত্র্যের অভাব ছিল। এরূপ প্রয়োগে অবজ্ঞা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মূলে 'বৈ'-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে—"প্রয়োগস্ত প্রযুক্তো বৈ ময়া দ্বিজাঃ—।" 'প্রযুক্তঃ'—এই পদটির অর্থ—রঙ্গমঞ্চে প্রযুক্ত—দর্শকগণের সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল—এরূপ নহে। 'প্রযুক্ত' অর্থে অভ্যাসার্থ যোজিত—কেবল রিহার্স্যালে লাগান হইয়াছিল (অভিনবভারতী, পৃঃ ২০—২১)।

৪২। পরিগৃহ্য (মূল)—পরিগ্রহ করিয়া। পরিগ্রহ-শব্দের নানারূপ অর্থ হয়—তন্মধ্যে প্রধান অর্থ—গ্রহণ। কি গ্রহণ? পাদ-গ্রহণ হওয়া সম্ভব। পরিগ্রহের আর এক অর্থ—সম্মান প্রদর্শন, চিত্ত-বিনোদন entertain, honour—এ অর্থটিও এ স্থলে বেশ লাগে। অতএব, "পরিগৃহ্য প্রণম্যাথ"—ইহার অর্থ—অনন্তর পাদ-গ্রহণাদি দ্বারা) সম্মান প্রদর্শন ও প্রণাম করিয়া।

সুরগুরু—ব্রহ্মা।

কৈশিকীরও যোগ কর—ভরত পুত্রগণকে যেরূপ নাট্য-প্রয়োগের শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতী, সাত্বতী ও আরভটী বৃত্তির যোগ থাকিলেও কৈশিকী বৃত্তির অভাব ছিল। অথচ কৈশিকী ব্যতিরেকে নাট্য-প্রয়োগ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। এ কারণে ব্রহ্মা ভরতকে পূর্ব্বোক্ত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

৪৩। ক্ষমং দ্রব্যং (মূল)—প্রয়োগে সমর্থ (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২১)।

এবং তেনাস্‌ম্যভিহিতঃ—আমার বুদ্ধিকৌশল জানিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রত্যুক্তশ্চ ময়া প্রভুঃ—আর (চ) প্রভু মৎকর্ত্তৃক প্রত্যুক্ত হইলেন। 'চ'-কার দ্বারা ভরতের প্রত্যুৎপন্ন-প্রতিভা সূচিত হইতেছে। প্রশ্ন শুনিয়াই তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন। ইহাতেই তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয়। অভিনব বলিয়াছেন—ইহা হইতে বুঝা যায় যে—ঝটিতি কবির হৃদ্‌গত ভাব গ্রহণের যোগ্যতা নাট্যাচার্য্যের অসাধারণ গুণ ("অনেন ঝটিতি কবিহৃদয়গ্রহণযোগ্যত্বং নাট্যাচার্য্যগুণ এব"—অঃ ভাঃ পৃঃ ২১)।

৪৪। দ্রব্য—উপকরণ—কৈশিকী-প্রয়োগের যোগ্য অধিকারী। এ স্থলে অভিনব একটি বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। যে বস্তু অত্যন্ত অপরিদৃষ্ট (অর্থাৎ যাহাকে কোন দিনই দেখা যায় নাই—যাহার জ্ঞান কোনরূপেই পূর্ব্বে জন্মে নাই), তাহাকে উপকরণ বলিয়া নির্ণয় করা অসম্ভব। ব্রহ্মা যখন বৃত্তিবিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন কেবল বাঙ্‌মাত্রে উহার বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা হইতে পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র সম্ভব—প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। অতএব প্রশ্ন উঠিতে পারে—কৈশিকীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হওয়া সত্ত্বেও ভরত কৈশিকী-প্রয়োগের উপযোগী দ্রব্য নিরূপণ করিলেন—কিরূপে, আর দ্রব্য নিরূপণ না করিয়া থাকিলে তিনিই

শ্লক্ষ্ণনেপথ্যা, শৃঙ্গার-রস-সম্ভবা কৈশিকী নৃত্যকারী ভগবান্ নীলকণ্ঠের (প্রয়োগ-বিষয়-রূপে) মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

পক্ষান্তরে, উহা স্ত্রীজন—ব্যতিরেকে পুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রয়োজিত হইতে পারে না।

তদনন্তর মহাতেজস্বী বিভু মনোদ্বারা অপ্সরোগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

উহা ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন কিরূপে?—এই প্রশ্নের উত্তর-দান-প্রসঙ্গে ভরত কিরূপে কৈশিকীর সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন—তাহার বিবরণ দিতেছেন (শ্লোক ৪৫)।

নৃত্তাঙ্গহার-সম্পন্না (মূল) (পাঠান্তর মৃদ্বঙ্গহারসম্পন্না—মৃদু অঙ্গহার-বিশিষ্টা)। নৃত্ত—নর্ত্তন—গাত্রাবয়বগুলির (অঙ্গোপাঙ্গ-সমূহের) সবিলাস বিক্ষেপ। নৃত্তের অঙ্গভূত যে সকল অঙ্গহার, তাহারই নাম নৃত্তাঙ্গহার। অঙ্গহার—অঙ্গের হরণ—অত্রুটিতরূপে সমুচিত স্থানে প্রাপণ। নৃত্তাঙ্গহার—কোন অঙ্গ বা উপাঙ্গের সবিলাস বিক্ষেপ-সহকারে অন্য কোন যথাযোগ্য অঙ্গোপাঙ্গে সংযোজন। যথা—একটি হস্তের সবিলাস বিক্ষেপ-সহকারে কটিদেশে সংযোগ ইত্যাদি। এবংবিধ নৃত্তাঙ্গহার-বিশিষ্টা কৈশিকী। ঐ কৈশিকীর প্রয়োগ শঙ্করের নৃত্তে ভরত-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল। একমাত্র ভগবান্ শঙ্করের নৃত্তে উহার সাক্ষাৎকার সম্ভব। কারণ, তিনি পরিপূর্ণানন্দ-নির্ভরদেহ-ধারী; তাঁহার এই আন্তর আনন্দ অবাধে উচ্ছলিত হইয়া বাহ্য সুন্দরাকারে প্রকাশমান। তিনি যখন অন্য কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া আনন্দ-নৃত্ত-মাত্র আশ্রয়পূর্ব্বক বর্ত্তমান ছিলেন, তখনই তাঁহার প্রয়োগ-বিষয়ের মধ্যে কৈশিকীর স্বরূপ ভরত-কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছিল।

৪৫। এখন প্রশ্ন হইবে—কৈশিকী শঙ্করের নৃত্যে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া নাট্যে উহার উপযোগ কোথায় ও কিরূপে হইতে পারে? উত্তর—যদি শ্লক্ষ্ণ নেপথ্যের সহিত উহার মিশ্রণ হয়, তাহা হইলেই নাট্যোক্ত শৃঙ্গার-রসের অভিব্যক্তিত্ব সম্ভাবনা—অন্যথা নহে। কারণ, ষষ্ঠাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, শৃঙ্গার-রস উজ্জ্বল-বেশাত্মক (নাঃ শাঃ, বরোদা সং, পৃঃ ৩০২)। শ্লক্ষ্ণ—সুসঙ্গত, সমুচিত, উজ্জ্বল, সুকুমার। নেপথ্য বেশ। এ ক্ষেত্রে নেপথ্য-পদ-প্রয়োগ-দ্বারা কেবল যে সুকুমার বেশই গ্রহণ করিতে হইবে—তাহা বুঝাইতেছে না—অধিকন্তু সুকুমার আঙ্গিক—বাচিক—আহার্য্য—সাত্ত্বিক—এই চতুর্ব্বিধ অভিনয়েরই সূচনা করা হইয়াছে। কারণ, সুকুমার চতুর্ব্বিধ অভিনয়ই শৃঙ্গাররসের অভিব্যক্তি হেতু। যদি চতুর্ব্বিধ অভিনয়ের প্রত্যেকটিই সুকুমার না হয়—তাহা হইলে মধুর-মন্থর বলনা—বর্ত্তনা—ভ্রূক্ষেপ কটাক্ষাদি ব্যতীত শৃঙ্গার-রসাস্বাদের লেশমাত্র সম্ভাবনাও হইতে পারে না।

পুনশ্চ প্রশ্ন উঠিতে পারে—কৈশিকী কি একমাত্র শৃঙ্গার-রসের উপযোগী। তাহার উত্তর—রস-ভাব-ক্রিয়াত্মিকা—রস-সমূহের ভাব (বা ভাবনা) অর্থাৎ কবি-নট-সামাজিক (দর্শক)-গণের হৃদয়ে ব্যাপন। তাহার ক্রিয়া অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতা। তাহাই আত্মা অর্থাৎ স্বভাব যাহার। অর্থাৎ কৈশিকীর স্বভাবই হইতেছে—কবি-নট-সামাজিকগণের হৃদয়ে নানাবিধ রস পরিব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া। রৌদ্রাদি-রসের অভিব্যক্তি কালেও যে অভিনয় করা হয়, তাহাতেও যদি অনুপ্রাস-বলনা-বর্ত্তনাদি অভিনয়াঙ্গ বৈচিত্র্য সুসঙ্গত ভাবে প্রযুক্ত না হয়, কিংবা ঐ সকলের যদি একান্ত অভাব থাকে, তাহা হইলে সেরূপ অভিনয় রসাভিব্যক্তির হেতু হইতে পারে না। এ কারণে কৈশিকীকে সকল রসেরই প্রাণভূত বলা চলে। আর শৃঙ্গার-রসের ত নামগ্রহণও কৈশিকী ব্যতিরেকে করা চলে না (অঃ ভাঃ পৃঃ ২১—২২)। অনুপ্রাস—শব্দ-সাম্য (অলঙ্কার-বিশেষ) বলনা (বলন)-ঘূর্ণন। বর্ত্তনা (বর্ত্তন)-আবর্ত্তন। বলনা, বর্ত্তনা ইত্যাদি বলিতে বুঝায়—অঙ্গোপাঙ্গ-সমূহের সবিলাস যথাবিধি ভ্রামণ, আবর্ত্তন ইত্যাদি।

৪৬। স্ত্রী-জনাদৃতে (মূল)—পূর্ব্বে বলা হইল—কৈশিকীই বৈচিত্র্যের প্রাণ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজ হৃদয়ে রস-স্ফুর্ত্তি-বশতঃ চমৎকার-পবিত্রতা না জন্মে (অর্থাৎ যতক্ষণ না রসোদ্রেক হেতু নিজ হৃদয়ের বৈচিত্র্য-জনিত নির্ম্মল আনন্দের অনুভূতি হয়)—ততক্ষণ পর্য্যন্ত শতবার শিক্ষা-দ্বারাও বৈচিত্র্য আহরণ করা সম্ভব হয় না। ভগবান্ শঙ্করের অন্তরে এইরূপ রসোদ্রেক-বশে স্বরূপানন্দানুভূতি হইয়া থাকে, তাই তাঁহার নৃত্যে কৈশিকীরও প্রকাশ হইতে দেখা যায়। কিন্তু ভরতপুত্রগণ যে মুনি; মুনিগণের চিত্তবৃত্তি স্বভাবতঃ বিষয় বিমুখ। অতএব, তাঁহাদিগের পক্ষে রসোদ্রেক হেতু সুখবৈচিত্র্যানুভূতি হওয়া অসম্ভব। যদি বা সমাধি-দ্বারা তাঁহারা অদ্বৈতানন্দানুভূতি করিতে সমর্থ হন, তথাপি দেহ পর্য্যন্ত যে নিম্নসীমা তাহাকে সে আনন্দ স্পর্শ করে না। বরং উহা দেহ হইতে বিমুখ হইয়া থাকে। সে আনন্দ—দেহাতীত—ইন্দ্রিয়াতীত—অদ্বৈতানন্দ। বিভিন্ন রসের উদ্রেকে সুখবৈচিত্র্যের অনুভূতি আর অদ্বৈতানন্দানুভূতি অভিন্ন নহে। পক্ষান্তরে, নারীগণ স্বভাবতঃ বিষয়োন্মুখ বলিয়া তাঁহাদিগের এরূপ বৈচিত্র্যানুভূতি হইয়া থাকে। এই নারীগণের সম্পর্কে যদি ভরতপুত্রগণকে আনা যায়, তাহা হইলে ঋষিগণেরও চিত্ত কথঞ্চিৎ আর্দ্র ভাবাপন্ন হইতে পারে—আর সেই হেতু বৈচিত্র্যোপলব্ধি হওয়াও সম্ভব।—ইহাই ভরতের নিগূঢ় অভিপ্রায় (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২২)।

অপর কেহ কেহ বলিয়াছেন যে—শঙ্করও পুরুষ ও যোগীশ্বর। অতএব বৈচিত্র্যোপলব্ধির অভাবহেতু তাঁহারও কৈশিকী-প্রয়োগের সামর্থ্য নাই। অতএব, মূল পাঠ—"দৃষ্টা ময়া ভগবতো নীলকণ্ঠস্য নৃত্যতঃ" স্থলে—"দৃষ্টো ময়া ভগবতো নীলকণ্ঠস্য নৃত্যতঃ"—পাঠ কল্পনীয়। উহার অর্থ—'উমার সহিত নৃত্যকারী ভগবান্‌কে উপেক্ষা করিয়া ভগবতী যে কৈশিকীর প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে'। ভগবতঃ নীলকণ্ঠস্য—অনাদরে ষষ্ঠী ("ভগবন্তমপ্যনাদৃত্য ভগবত্যা প্রযুজ্যমানা ময়া দৃষ্টা"—অঃ ভা, পৃঃ ২২)।

কিন্তু এ মতের কোন মূল্য আছে বলিয়া অভিনব স্বীকার করেন না। কৈশিকী যে পুরুষমাত্রেরই দ্বারা প্রযুক্ত হইতে পারে না—এ মতের কোন প্রামাণ্য নাই। ঋষিগণ বিষয়-বিমুখ বলিয়া শৃঙ্গার-মূলিকা কৈশিকীর প্রয়োগ না করিতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া যে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শঙ্করও (কেবল পুরুষ বলিয়াই) উহা পারিবেন না—এরূপ কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ, নাট্যশাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় যে—মধুকৈটভের সহিত যুদ্ধকালে ভগবান্ বিষ্ণু বিচিত্র সলীল অঙ্গহার-সহকারে যে শিখাপাশ বন্ধন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই কৈশিকী বৃত্তির উদ্ভব (কাশী সং নাঃ শাঃ ২২।১৩)—

(উহারা) নাট্যালঙ্কারচতুর ; প্রয়োগের নিমিত্ত (উহাদিগকে) আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন।—১ মঞ্জুকেশী, ২ সুকেশী, ৩ মিশ্র-কেশী, ৪ সুলোচনা—। ৪৭।

৫ সৌদামিনী, ৬ দেবদত্তা, ৭ দেবসেনা, ৮ মনোরমা, ৯ সুদতী, ১০ সুন্দরী, ১১ বিদগ্ধা ও ১২ বিপুলা—। ৪৮।

১৩ সুমালা, ১৪ সন্ততি, ১৫ সুনন্দা, ১৬ সুমুখী, ১৭ মাগধী, ১৮ অর্জ্জুনী, ১৯ সরলা, ২০ কেরলা ও ২১ ধৃতি—।৪৯।

২২ পুষ্কলা সহ ২৩ নন্দা, ও ২৪ কলভা—(ইহাদিগকে) আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে, স্বয়ম্ভুকর্ত্তৃক শিষ্যগণ সহ স্বাতি ভাণ্ডে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ।৫০।

আর নারদাদি গন্ধর্ব্বগণ গান-যোগে নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে বেদ-বেদাঙ্গ-কারণ এই নাট্য সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিয়া পুত্র-সকল সহ স্বাতি-নারদ-সংযুক্ত হইয়া আমি প্রয়োগার্থ লোকেশের নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে উপস্থিত হইয়াছিলাম ।৫১—৫২।

'নাট্যের গ্রহণ প্রাপ্ত হইয়াছে, (এখন) বলুন কি করিব' ?

—এই বচন শুনিয়াই পিতামহ প্রত্যুত্তর দিলেন—। ৫৩।

বিচিত্রৈরঙ্গহারৈস্তু দেবো লীলাসমুস্তবৈঃ।

(—লীলাসমন্বিতৈঃ—অভিনব-ধৃত পাঠ)

ববন্ধ যচ্ছিখাপাশং কৈশিকী তত্র নির্ম্মিতা ॥

(ববন্ধ যঃ শিখাপাশং—অভিনব-ধৃত—পাঠ)

যদি পুরুষমাত্রেরই পক্ষে কৈশিকী প্রয়োগ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ভগবান্ বিষ্ণুর পক্ষেও ত কৈশিকী-নির্ম্মাণ অনুচিত হয় (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২২)।

মনসা (মূল)—যথারুচি বিনির্ম্মিত—ইহাই তাৎপর্য্য (অঃ ভাঃ পৃঃ ২২)।

৪৭। নাট্যালঙ্কারচতুরাঃ—নাট্যের যে অলঙ্কার—বৈচিত্র্য-হেতু (অর্থাৎ কৈশিকী), তাহাতে চতুর (অর্থাৎ নিপুণ)। কেহ কেহ নাট্যালঙ্কারের অর্থ করিয়াছেন—লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিহৃত—নারীর এই দশটি স্বভাবজ অলঙ্কার। ইহা ছাড়া—শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, ধৈর্য্য, প্রাগল্‌ভ্য ও ঔদার্য্য— এই সাতটি অযত্নজ অলঙ্কার। (ইহাদিগের লক্ষণ কাশী সং নাট্যশাস্ত্রের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

অপ্সরোগণের সৃষ্টি হইতে বুঝা যায় যে, মুনিকন্যাগণ নাট্যালঙ্কার-চতুরা ছিলেন না—অতএব তাঁহারা অভিনয়ের যোগ্যা বলিয়া গণ্য হন নাই (অঃ ভাঃ, ৩২ পৃঃ)

৪৮। ৫ সৌদামনী—পাঠান্তর। ৮ মনোবতী—পাঠান্তর। ৯ সুরভি। ১২ বিবিধা (কাশী) ; বিবুধা।

৪৯। ১৩ সুমনা। ১৪ লাসিনী। অতিরিক্ত নাম স্মৃতি। কেরলা ও ধৃতি স্থলে কেরলাবতী (কাশী)।

৫০। ২২ 'পুষ্কলা' স্থলে—সুপুষ্পমালা (কাশী)। ২৪ 'কলভা' স্থলে—কপিলা ও সুমনা—দুইটি নাম। পাঠান্তর—সুনন্দা, সুমুখী ও কাকালী ইত্যাদিকে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। কাকালী স্থলে অহল্যা পাঠান্তর।

যে দর্শে (মূল) নাট্যের উপকরণ-সম্ভার (নট-নটী-বৃন্দ) নাট্যাচার্য্যের অধীন হওয়া উচিত—ইহাই সূচিত হইতেছে। মহর্ষি ভরত যে এই সকল অপ্সরাকে যথোচিত শিক্ষাদান-পূর্ব্বক কৈশিকী বৃত্তিরও প্রয়োগ করিয়াছিলেন—ইহা বুঝা যাইতেছে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৩)।

কাশীর পাঠ—"কলভাং চৈব নির্ম্মমে"—কলভাকেও নির্ম্মাণ

বৃত্তি-চতুষ্টয়-সম্পূর্ণ নাট্যের অভ্যাস সমাপ্ত হইবার পর নাট্যোপযোগী গীত ও আতোদ্য (বাদ্য) সহ নাট্যের সংযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্বাতি—ঋষি-বিশেষ। বর্ষাকালে পদ্মপত্রের উপর জলধারার বিচিত্র পতন-শব্দের অনুকরণে তিনি পুষ্কর-বাদ্য (ঢক্কা-জাতীয় বাদ্য) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিনব উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিপুষ্কর-বাদ্যের পূরক—পণব, মৃদঙ্গ ও ঝল্লরী। এই সকল বাদ্যের অধিকার স্বাতির শিষ্যগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।—এইরূপে ভাণ্ডাধিকার নিরূপিত হইয়াছে (অঃ ভাঃ, পৃ ২৩—২৪)

৫১। গানযোগ—এ স্থলে 'গান'-শব্দের অর্থ—তত ও সুষির আতোদ্য। 'গান' অর্থে গান্ধর্ব্ব (অর্থাৎ সঙ্গীত) নহে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৪)। কাশীর পাঠ—নাট্যযোগে।

কাশী সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায়ে আতোদ্যবিধি বর্ণিত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্র-মতে আতোদ্য চতুর্ব্বিধ—(১) তত—তন্ত্রীগত বাদ্য (বীণাদি), (২) অবনদ্ধ—পুষ্কর (ঢাক)-জাতীয় বাদ্য (মৃদঙ্গাদি), (৩) ঘন—তাল-বাদ্য (করতালাদি) ও (৪) সুষির—বংশাদি বাদ্য (বাঁশী ইত্যাদি)। গান্ধর্ব্ব—দেব ও গন্ধর্ব্বগণের বিশেষ প্রীতিকর—তন্ত্রীগত বাদ্য ও নানা আতোদ্য সমন্বিত-স্বরতাল-পদাশ্রিত (নাঃ শাঃ, কাশী সং ২৮।১-১০)।

নিযুক্ত, নিয়োজিত—ইত্যাদি পদ-প্রয়োগ-দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, বাদক গায়নাদি নাট্যাচার্য্যের সম্পূর্ণ অধীনে থাকিবেন (অঃ ভাঃ পৃঃ ২৪)।

৫১-৫২ নৃত্ত-গীত-আতোদ্য-অভিনয়ের সাম্য-রক্ষার নিমিত্ত উহাদের একীভাবে সম্মেলন-পূর্ব্বক প্রয়োগ কর্ত্তব্য—ইহা সূচনার জন্য ৫১ ও ৫২ শ্লোকটির সন্নিবেশ। নৃত্ত-গীত-বাদ্য-অভিনয়ের মেলনিকা হইলে তবে 'ইহাই নাট্য'—এইরূপ এক-বুদ্ধি-গ্রাহ্য নাট্য সম্যগ্‌রূপে সার্থকতা লাভ করে।—ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই মহর্ষি ভরত (নাট্যাচার্য্য) তদধীন স্বাতি-নারদ (বাদ্যাধিকারী), শতপুত্র (অভিনেতা) ও অপ্সরোবৃন্দ (অভিনেত্রী—নৃত্ত-গীতাধিকারিণী) সহ ব্রহ্মার নিকট উপনিমন্ত্রণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৪)।

৫২। বেদ-বেদাঙ্গ-কারণম্ (মূল)—বেদ ও বেদাঙ্গ সমূহের কারণ (অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থান) যাহার (যে নাট্যের)। লোকেশ—লোকগণের প্রভু—পিতামহ—স্রষ্টা।

৫৩। নাট্যস্য গ্রহণং প্রাপ্তম্ (মূল)—গ্রহণ-শব্দের দুইটি অর্থ—(১) গ্রহণ—শিক্ষা ; (২) গ্রহণ—অবলোকন। (১) নাট্যের গ্রহণ প্রাপ্ত হইয়াছে—নাট্য গৃহীত (শিক্ষিত) হইয়াছে—নাট্য-শিক্ষা-দান সমাপ্ত হইয়াছে। (২) নাট্যের অবলোকন প্রাপ্ত হইয়াছে—নাট্য প্রেক্ষাযোগ্য হইয়াছে। মূলে আছে—এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা—তু—এব (ই) ; শুনিয়াই (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৪)।

'প্রয়োগের এই মহাসময় উপস্থিত হইয়াছে। এই যে মহেন্দ্রের শ্রীবিশিষ্ট ধ্বজোৎসব প্রবৃত্ত হইতেছে—। ৫৪।

অনন্তর নিহতাসুর-দানব প্রহৃষ্টামরসঙ্কীর্ণ মহেন্দ্র-বিজয়োৎসবে সেই ধ্বজমহে পূর্ব্বে মৎকর্ত্তৃক আশীর্ব্বচন-সংযুতা, অষ্টাঙ্গপদ-নির্ম্মিতা

ইহাতে ইদানীং এই নাট্য-সংজ্ঞক বেদের প্রয়োগ কর'।

৫৪। ধ্বজমহঃ (মূল)—ইন্দ্রের ধ্বজের মহন (অর্থাৎ পূজা) যাহাতে বর্ত্তমান। ইহারই নাম 'শক্রধ্বজোৎসব'।

৫৫। নিহতাসুর-দানব—ধ্বজমহের বিশেষণ। নিহত হইয়াছিল অসুর ও দানবগণ যাহাতে। অর্থাৎ—অসুর ও দানবগণের নিধন স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে যে শক্রধ্বজ-মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। ইহা অসুর-দানব-বিজয়-স্মরণোৎসব।

৫৬। প্রহৃষ্টামরসঙ্কীর্ণ—ইহাও ধ্বজমহের বিশেষণ। প্রহৃষ্ট অমরগণ সঙ্কীর্ণ (অর্থাৎ) একত্র হইয়াছিলেন যে ধ্বজমহে। দেবগণ পরমানন্দে ঐ বিজয়োৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। মহেন্দ্র-বিজয়োৎসবে —মহেন্দ্র-কর্ত্তৃক অসুর-দানব-বিজয়োপলক্ষে উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বং কৃতা ময়া নান্দী (মূল)—প্রয়োগের ক্রম প্রদর্শিত হইতেছে। নান্দী—মাঙ্গলিক কৃত্য-বিশেষ। নাট্যারম্ভে যে 'পূর্ব্বরঙ্গ' করা হয় (নাঃ শাঃ পঞ্চম অধ্যায়ে পূর্ব্বরঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—উহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে), নান্দী তাহার অন্যতম অঙ্গ। অভিনব বলিয়াছেন—এ প্রসঙ্গে দুইটি প্রাচীন মত দৃষ্ট হয়:—(১) এক মতে 'নান্দী' মুখ্য মাঙ্গলিক কর্ম্ম; উহার উল্লেখে এ স্থলে সমগ্র পূর্ব্বরঙ্গই সূচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে:—পারিভাষিক ভাষায়—এ স্থলে নান্দী সকল পূর্ব্বরঙ্গাঙ্গের উপলক্ষণ। (২) মতান্তরে—পূর্ব্বরঙ্গের সকল অঙ্গের মধ্যে কেবল নান্দীমাত্রই অবশ্য প্রযোজ্য—অন্যান্য অঙ্গ অবশ্য প্রযোজ্য নহে—নাট্যশাস্ত্রের উক্তি এইরূপ সিদ্ধান্তের সূচনা করিতেছে। অভিনব এ প্রসঙ্গে তাঁহার নিজ উপাধ্যায়ের মতের উল্লেখ করিয়াছেন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৈত্যগণ নাট্যাভিনয়ে বিঘ্নাচরণ করে নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিধিপূর্ব্বক কৃত পূর্ব্বরঙ্গের অবকাশ ছিল না। কারণ, পূর্ব্বরঙ্গ মুখ্যতঃ মাঙ্গলিক ব্যাপার—বিঘ্ন-বিনাশের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উহা নাট্য-মণ্ডপের বিবিধ বিভাগে নিয়োজিত দেবতাগণের পরিতোষ-হেতু। দেবগণ উহা-দ্বারা পরিতোষিত হইয়া বিঘ্ন-রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিঘ্ন দেখা দিবার পূর্ব্বে বিঘ্ন-বিনাশ ত সম্ভব নহে। তাই বিঘ্ন-উৎপন্ন হইবার পর হইতে পূর্ব্বরঙ্গের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। কুতপ-বিন্যাস ইত্যাদি পূর্ব্বরঙ্গের অঙ্গ নহে। (কুতপ-orchestra)। অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে—এ স্থলে কেবল নান্দীমাত্রের প্রয়োগ ভরত করিয়াছিলেন। নান্দী-প্রয়োগেরই বা প্রয়োজন কি ছিল এই প্রশ্নের উত্তর সূচিত হইয়াছে—বেদনির্ম্মিতা। বেদ-নির্ম্মিতা—ইহাতে বেদবিহিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োজন; কারণ সকল কর্ম্মই আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধি। এই কারণে এ স্থলে আশীর্ব্বাদরূপে নান্দী প্রযুক্ত হইয়াছিল—পূর্ব্বরঙ্গের অঙ্গরূপে নহে। অষ্টাঙ্গ-পদনির্ম্মিতা—আটটি পদ যাহার অঙ্গভূত। পদ-শব্দের অর্থ কি তাহা লইয়া বিচার-প্রসঙ্গে অভিনব বলিয়াছেন —(১) পদ—সুবন্ত বা তিঙন্ত পদ; অথবা (২) অবান্তর বাক্য—মহাবাক্যের অঙ্গভূত। এই প্রকার অর্থভেদের ফলে নান্দীর রূপ

'রত্নাবলী' নাটিকার নান্দী—"জিতমুড়ুপতিনা, নমঃ সুরেভ্যো, দ্বিজবৃষভা নিরুপদ্রবা ভবন্তু। ভবতু চ পৃথিবীং সমৃদ্ধশস্যাং প্রতিপচন্দ্রবপুর্নরেন্দ্রচন্দ্রঃ।" কোহল দেখাইয়াছেন যে, এ শ্লোকটিও ভরতমতানুসারে 'নান্দী' বলিয়া গণ্য হইতে পারে। মহর্ষি ভরত পঞ্চমাধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"নান্দীপদান্তরেম্বেষু হ্যেবমস্থিতি নিত্যশঃ।

বন্দেতাং সম্যগুক্তাভির্ব্বাগ্‌ভিস্তৌ (বাগ্মিনৌ) পারিপার্শ্বিকৌ।

অর্থাৎ নান্দী-পদসমূহের মধ্যে 'এইরূপ হউক' এই কথা সম্যগ্‌রূপে পুনঃ পুনঃ বলিয়া বাগ্মী পারিপার্শ্বিকদ্বয় বন্দনা করিবেন।

এই শ্লোকে 'নান্দীপদান্তরেষু—অন্তর-শব্দের অর্থ—অবান্তর বাক্যের বিচ্ছেদ (বিভাগ) স্থল। অভিনব বলিয়াছেন—বিবেচকগণের মতে—অষ্টাঙ্গপদসংযুক্তা—এই বিশেষণে 'অঙ্গ' পদ গ্রহণহেতু অবান্তর বাক্য—এই অর্থই বুঝিতে হইবে। অবান্তর বাক্য চতুরস্র-পূর্ব্বরঙ্গে আটটি ও ত্র্যস্র পূর্ব্বরঙ্গে বারটি হইবে। ভরত স্বয়ং পঞ্চমাধ্যায়ে সূচনা দিয়াছেন—"নান্দীং পদৈর্দ্বাদশভিরষ্টাভির্বাপ্যলঙ্কৃতাম্" (৫।১০৯)। এই কারিকার 'অপি'-শব্দ-প্রয়োগের ফলে বুঝা যায় যে, চতুরস্রে—চতুষ্পদা, অষ্টপদা ও ষোড়শপদা এই তিন প্রকার নান্দী। আর ত্র্যস্রে ত্রিপদা, ষট্‌পদা ও দ্বাদশপদা এই ত্রিবিধা নান্দী। 'জিতমুড়ুপতিনা'—রত্নাবলীর এই শ্লোকে চারটি অবান্তর বাক্য বিদ্যমান—অতএব ইহা চতুরস্র-কালানুসারী পূর্ব্বরঙ্গের অন্তর্গত চতুষ্পদা নান্দী (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৫-২৬)।

৫৭। তদন্তে—নান্দ্যন্তে—নান্দীর পরিসমাপ্তির পর।

অনুকৃতি-অনুকরণ অর্থাৎ নাট্য। বদ্ধা (মূল)—যোজিত। কেহ কেহ অর্থ করেন—গুণনিকা (অর্থাৎ প্রস্তাবনা) মাত্র যোজিত হইয়াছিল—সম্পূর্ণ নাট্য-প্রয়োগ যোজিত হয় নাই। অভিনবের মতে ইহা ঠিক নহে; কারণ তাহাতে পূর্ব্বোত্তর-বিরোধ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"এবং নাট্যমিদং সম্যগ্ বুদ্ধা" (১।৫১) ও পূর্ব্বং কৃতা ময়া নান্দী" (১।৫৬) ইত্যাদি, আর পরে বলা হইবে—"ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রয়োগপরিতোষিতাঃ" (১।৫৮)। এই কারণে অপরে বলেন—প্রস্তাবনা-মাত্র নিষ্পাদিত হইয়াছিল—কিন্তু নাট্যপ্রয়োগের যোজনা করা হইলেও নিষ্পাদন করা হয় নাই—তবে প্রস্তাবনাটি অবশ্য প্রযুক্ত হইয়াছিল—এইরূপ অর্থ কর্ত্তব্য। অপরে আবার বলেন—'অনুকৃতি' অর্থে নাট্যের অনুকরণ রূপা প্রস্তাবনা—নাট্য নহে। তাহা হইলে অর্থ দাঁড়ায়—নান্দ্যন্তে প্রস্তাবনা যোজিত হইয়াছিল। এই রীতি অনুসারেই চিরন্তন (প্রাচীন) কবিগণ নিজ নিজ নাট্য-রচনায় "নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ" এইরূপ প্রয়োগ লিখিয়া গিয়াছেন। কিসের প্রস্তাবনা যোজিত হইয়াছিল ইহার উত্তর—যে ভাবে দৈত্যগণ সুরগণ-কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল, ইহা হইতে অনুমান হয়—ডিম-সমবকার-ঈহামৃগ—এই তিন প্রকার রূপকের অন্যতম রূপকের প্রয়োগ প্রস্তাবিত হইয়াছিল। (রূপক বা দৃশ্যকাব্য দশবিধ—নাটক, প্রকরণ, ভান, ব্যায়োগ, সমবকার ডিম,

বিচিত্রা, বেদনির্ম্মিতা নান্দী রচিতা হইয়াছিল! তদন্তে—দৈত্যগণ যেরূপে সুরগণ-কর্ত্তৃক জিত হইয়াছিল, তাহার অনুকৃতি যোজিত হইয়াছিল ।৫৫—৫৭।

(উক্ত অনুকৃতি) সম্ফেট-বিদ্রব-কৃত ও ছেদ্য-ভেদ্য-আহবাত্মক ।৫৮।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

অভিনব বলিয়াছেন—যদ্যপি ভরতের শতপুত্র দশবিধ রূপকেরই অভ্যাস করিয়াছিলেন, তথাপি যুগপৎ সে সকল প্রকার রূপকের প্রয়োগ করার সামর্থ্য তাঁহাদিগের ছিল না, এই কারণে তাঁহারা প্রথমে ডিম-সমবকার-ঈহামৃগ-জাতীয় কোন একখানি রূপকের প্রয়োগ অভ্যাস করিয়াছিলেন। কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন যে, যদি সমবকার বা ডিম শ্রেণীর রূপকই প্রয়োগার্থ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই যুদ্ধাদি উদ্ধত-ঘটনা-বহুল রূপকে কৈশিকী-যোজনার অবসর কোথায়? অতএব, ভরতের পক্ষে কৈশিকী-প্রয়োগের অনুকূল দ্রব্য-প্রার্থনার বর্ণনাত্মক পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাংশ অসঙ্গত হইয়া পড়ে। অভিনব বলেন—এ আপত্তি করা চলে না; কারণ, সমবকারাদির মধ্যেও সৌন্দর্য্যাত্মক বৈচিত্র্যের স্থান নাই—এমন নহে। আর সৌন্দর্য্য-বর্ণনা কৈশিকী-বৃত্তি-জড়িত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। অতএব, সমবকার প্রয়োগার্থ গৃহীত হইলেও তাহাতে কৈশিকী-প্রয়োগের অনুকূল অপ্সরা অভিনেত্রীর প্রয়োজন অবশ্যই আছে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৬)।

৫৮। সম্ফেট—রোষগ্রথিত বাক্য। বিদ্রব—পলায়ন—শঙ্কা-ভয়-ত্রাস-জনিত। ছেদ্যাহব—যাহাতে ছেদন করা হয়—শস্ত্রযুদ্ধ। ভেদ্যাহব—মল্লযুদ্ধ বা বাহুযুদ্ধ। আহব—যুদ্ধ (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৬)।

পথ ও পথিক

নিঃসঙ্গ পথিক,—
গোধূলির ক্ষীণালোকে যাত্রা তার হলো সুরু,
পথ তবু হয় নাই ঠিক!
দিগন্তের ক্লান্ত চরে ঘনীভূত রাত্রি তার—
অভিশপ্ত তন্দ্রা নিয়া নামে,
অনন্ত বিস্তৃত পথে আনাগোনা করে কারা
চুপে চুপে দক্ষিণে ও বামে?
কাহাদের দীর্ঘশ্বাসে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠে
বনানীর ক্লান্ত লতিকারা?
অস্ফুট আলোর মাঝে নিঃসঙ্গ পথিক হেরে
অসীমের পথের ইসারা!

কত রিক্ত ব্যর্থতায়—লিপিবদ্ধ জীবনের
অর্থহীন জীর্ণ ইতিহাস!
বিশাল সাম্রাজ্য আর প্রেমিকার বাহুলতা,
ফাগুনের মৃদুল বাতাস,
অনিত্যের যাত্রাপথে অগ্নিগর্ভ মরুভূর
বালুকার তলে বাঁধে বাসা!
যে পথিক চলেছিল—আজি তার চিহ্ন নাই!
কাঁদে শুধু অতৃপ্ত পিপাসা!

দুর্গম পথের যাত্রী—কত অভিনব রূপ!
কেহ রাজা, রিক্ত ছিল কেহ;
কারো হাতে মানদণ্ড,—কেহ মুক্ত গৃহছাড়া,
কারো সাথে ছিল না পাথেয়।
মোহমুগ্ধ যুগ-যাত্রী চলেছিল আনমনে,
জানে নাই কালের অঙ্কুর,
প্রতি পদক্ষেপে তারে সমতার মানদণ্ডে
ভেঙ্গে ভেঙ্গে করিতেছে চুর।

অতিক্রান্ত সেই পথ সম্মুখে রয়েছে পড়ে,
সঙ্গিহীন নব যাত্রী চলে,
অবিশ্রান্ত মহাকাল জোগায় সমিধ ভার
অতি ক্ষীণ জৈব হোমানলে!
চিনিল না কেহ তারে, চিনিবে না কোন দিন,
সাক্ষী শুধু অনন্ত নিখিল!
নিঃসঙ্গ পথিক—তবু সাথে আছে অন্তহীন
মানুষের মৃত্যুর মিছিল!

শ্রীঅমর ভট্ট

কাব্য ও জীবন

[গল্প]

তৈলহীন গরুর গাড়ীর চাকা যেমন ক্যাঁচ-ক্যাচ শব্দ করিয়া দৈন্যের বেদনা জানায় এবং বেদনা জানাইতে-জানাইতেই যেমন তাহাকে চলিতে হয়, তাহার সে আর্ত্ত রব শুনিয়া কেহ কেহ তাহাকে ছুটী দেয় না, ছন্দার হৃদয়োত্থিত কাতর নিশ্বাসের মাঝে তাহারো বৎসরের চাকা তেমনি একঘেয়ে মন্থর গতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতে থাকে। বৈচিত্র্যহীন অলস গতি—বিশ্রাম নাই, সান্ত্বনা নাই! তৈলহীন শুষ্ক চাকার মতই তাহার হৃদয়ের শুষ্কতাকে উপেক্ষা করিয়া বৎসরের চাকা চলিতে থাকে,—তাহাকে ছুটী দেয় না।

কর্ম্মবিমুখ বিলাসী মেয়ে সে নয়। প্রত্যহ সকাল পাঁচটায় ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া সে সংসারের কাজে লাগিয়া যায়। প্রত্যহই নূতন করিয়া গতকল্যকার কর্ম্ম-পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করিয়া চলে। সকালের ছোট-খাট কাজগুলি সারা হইবার পূর্ব্বেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া পড়ে। স্বামীর প্রভাতী সুখ-নিদ্রায় পাছে ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে ছন্দা ছুটিয়া আসে, তাদের বুকে তুলিয়া লয়—মাণিক আমার, সোণা আমার, কাঁদে না! বাবুর ঘুম ভেঙ্গে যাবে! ওমা, এই যে সোনা হেসেছে! চলো, খাবার খাবে চলো।

এক-একখানা সেঁকা রুটি আর একটু ঝোলা গুড় দিয়া তাহাদের বসাইয়া ছন্দা কলতলায় ছোটে। উনুনে চাপানো হাঁড়ির মধ্যে গরম জল ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি চাল আনিয়া ছন্দা হাঁড়ির মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। গতকালের আনিয়া-রাখা তরকারির চ্যাঙারি নামাইয়া দ্রুত হাতে তরকারি কুটিতে বসে।

ভাত হইয়া গেলে উনুনের উপর চায়ের জল চাপাইয়া সে স্বামীর ঘরের দিকে গেল। দেখে, স্বামীর ক্লান্ত মুখ তখনো নিদ্রায় জড়িত। এ দিকে অফিসের বেলা হইয়া আসে—বাজার আনিতে হইবে। স্বামীকে স্নানাহার করিয়া ন'টার মধ্যে অফিসে ছুটিতে হয়। আর [illegible] ঘুমাইলে হয়তো খাওয়া হইবে না। ছন্দা খাটের দিকে দু'পা আগাইয়া গেল। ভাবিল, স্বামীকে ডাকিয়া তুলিবে! কিন্তু পারিল না; পিছাইয়া আসিল। স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আহা, ঐ রুক্ষ, ব্যথামলিন, শ্রমক্লান্ত রেখাবহুল মুখখানির উপর নিদ্রার কি স্নিগ্ধ প্রশান্তি! কেমন করিয়া স্বামীকে সে রূঢ় বাস্তবে টানিয়া আনিবে! এক দিন ও-মুখ এমন ছিল না।

বিবাহিত জীবনের প্রথম-দিককার কথা ছন্দার মনে জাগিল। আপন-ভোলা সুকুমার-কান্তি এক প্রেমময় যুবকের ছবি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। সেই সুশোভন যুবক আজ এই এমন! কোথায় গেল তাহার সে লাবণ্য? সেই শ্রী? ছন্দা ভাবিয়া দেখিল—শুধু ছন্দার জন্য, ছন্দাকে একটু সুখে রাখিবার জন্য! ছন্দার মুখে একটু হাসি দেখিবার জন্যই সেই যুবক আজ অকাল-বার্দ্ধক্যকে বরণ করিয়াছে! স্বামীকে ঘুমাইবার আরও অবসর দিয়া ছন্দা পা টিপিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে স্বামী জাগিয়া উঠিল। চোখ খুলিয়া স্বামী দেখিল, ছন্দা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। বলিল—"কি দেখছো?"

"দেখ্‌ছি তোমার ঘুম আজ ভাঙবে কি না! এ দিকে যে বেলা

"আটটা! এ্যাঁ!" স্বামী তাড়াতাড়ি উঠিল, বলিল, "দাও গো—মাছের জায়গাটা শীগ্‌গির আমাকে দাও! এঃ, সব মাটী হলো দেখ্‌ছি!"

স্বামীর কাণ্ড দেখিয়া ছন্দা হাসিয়া বলিল, "কিচ্ছু মাটী হয়নি। এখনো যথেষ্ট সময় আছে। আগে হাত-মুখ ধুয়ে এসো, আমি ততক্ষণে চা'টা নামিয়ে ফেলি—জল ফুটছে। ঐ যাঃ—ছোট্টটা আবার কান্না জুড়ে দেছে।" ছন্দা দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

স্বামী বাজারে গিয়াছে—ছন্দা বাটনা বাটিতেছে, গয়লা-বৌ দুধ লইয়া আসিল। বাটনার হাত শাড়ীর আঁচলে মুছিয়া দুধের কড়াখানা গয়লা-বৌয়ের দিকে ঠেলিয়া দিয়া ছন্দা বলিল, "নাও তো বৌ, দুধটা ঢেলে ঐ বাইরের তোলা উনুনটায় তুমিই বাছা একটু জ্বাল দিয়ে রেখে যাও। দেখছো তো আজ আর একেবারে অবসর নেই! আপিসের বেলা হয়ে গেল—এখনো বাজার নিয়ে ফিরলেন না—হয়তো না খেয়েই আপিসে ছুটবেন! আমার বাছা, সব দিকেই জ্বালা!"

গয়লা-বৌ দুধ ঢালিতে ঢালিতে বলিল,—"যা বলেছো মা, সব দিকেই জ্বালা বৈ কি! কাল বিকেল থেকে বাড়ীতে যা কুরুক্ষেত্তোর লেগে আছে, স আর কি বলবো, বলো! যত ঝাল আমার ওপর! আমি বলি, যা না তার কাছে যে তোর টাকা বাকি ফেলে পালিয়ে গেছে! তা নয়, ঘরে এসে তম্বি! দিনে-দিনে তোমাদের গয়লা-ছেলের মেজাজটা মা বড্ড খিট্‌-খিটে হয়ে উঠছে। সব-সময় আমার সঙ্গে খিচ খিচ করবে। তাও বলি, কতই বা সওয়া যায়! গরুগুলোকে এক দিন না খেতে দিলে চলে না। কতই বা বাকি ফেলা যায়! তোমাদের পাগলা ছেলে তাই ক্ষাই হয়ে আছে!"

গয়লা-বৌয়ের এতখানি ভণিতার মূল কোথায়, ছন্দা বুঝিল—তিন মাস দুধের দাম দেওয়া হয় নাই। গয়লা-বধূ তাহারই আভাস দিল।

ছন্দা জোরে জোরে মসলা বাটিতে লাগিল। অভাবের সংসার—দু'মাসের বাড়ী-ভাড়া, ধোপা, মুদির তাগিদ—প্রত্যহই একটা-না-একটা তাহাকে সহিতে হয়। তাহার দম বন্ধ হইয়া আসে! লজ্জায় ঘৃণায় মরিতে ইচ্ছা হয়। তবু স্বামীকে এ-সব কিছুই সে জানিতে দিতে চায় না, অতি-কষ্টে নিজে সব সামলাইয়া চলে।

দুধ জ্বাল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া গয়লা-বৌ বলিয়া গেল, "বাবুকে একবার বলো মা, অন্ততঃ একটা মাসের টাকা যেন ফেলে দ্যান। বুঝতেই পারছো মা, বড় খিটখিটে হয়েছে বটে তোমাদের ছেলের স্বভাব—এক মাসের পেলে এখন এক-রকম বুঝিয়ে রাখতে পারবো তাকে। বলো মা বাবুকে একবার।"

গয়লা-বৌ চলিয়া গেল। খানিক-বাদে স্বামী বাজার লইয়া আসিল। বাজার নামাইয়া দিয়াই রোদে-রাখা তেল একটু মাথায় ঢালিয়া কলতলার দিকে ছুটিয়া গেল। ছন্দা ক'খানা মাছ ভাজিয়া ফেলিল। আজ আর ঝোল করিয়া দিবে, তার সময় নাই।

স্বামীর আহার হইয়া গেলে পাণ-হাতে ছন্দা আসিয়া বলিল, "এ বারে মাইনে পেলে গয়লার হিসেবটা এক-মাসের অন্ততঃ শোধ করা

"কিন্তু তার চেয়েও বেশী দরকার তোমার ওষুধটা!—এ-মাসেও না কিনতে পারলে তোমাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে না।"

"খুব যাবে। যত সব তোমার বাজে চিন্তা!" ছন্দার চোখে জল আসিল, "আমার ওষুধ, না, মাথা! কি হয়েছে আমার, শুনি?"

কথা শেষ না হইতে ছেলে-মেয়েরা ছুটিয়া আসিল—"বাবা আজ কিন্তু আমার লাট্টু নিয়ে এসো।" ছোট মেয়েটাও বাবার কোঁচার খুঁট ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "বাবা বিচ্‌কু।"

অফিস যাওয়ার সময় স্বামীকে এ ভাবে বিব্রত করা—ছন্দা অত্যন্ত বিরক্ত হয়। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-দানে নিজের অক্ষমতার লজ্জায় সে যেন শিহরিয়া ওঠে। বড় ছেলের পিঠে দুম্ করিয়া একটা কিল বসাইয়া দিল। ছোট মেয়েটাকে স্বামী তাড়াতাড়ি ছন্দার হাত হইতে নিজের দিকে টানিয়া লইল।

বিরক্তির সহিত ছন্দা বলিল—"তোমার অফিস যাবার সময় রোজ রোজ ওরা ভারী জ্বালাতন করে। বিচ্ছিরি স্বভাব হয়েছে সব।"

"ওরা কি বুঝবে বলো? ওরা তো জানে না, ওদের বাবা চল্লিশ টাকা মাইনের কেরাণী।"

সনিশ্বাসে স্বামী ছোট খুকীকে ফিরাইয়া দিল ছন্দার দিকে—তাহার পর খাবারের বাটি পকেটে ফেলিয়া অফিস।

•

প্রত্যহ সকাল হইতে যেন কাজের একটা টর্পেডো ছন্দাকে অবিমিশ্র ঘূরপাক খাওয়াইয়া চলিতে থাকে। বেলা ন'টায় স্বামী অফিসে গেলে এ-টর্পেডোর নিবৃত্তি! টর্পেডো সরিয়া যায় কিন্তু দমকা হাওয়ার ঝাপট চলিতে থাকে সমস্ত দিন ধরিয়া। রাত এগারোটার পর ছন্দার মেলে অবসর।

গভীর রাত্রে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ছন্দা দেখিল, ছেলে মেয়ে-গুলি এলোপাতাড়ি পড়িয়া ঘুমাইতেছে। কাহারো পা কাহারো বুকের উপর, কাহারো মাথা কাহারো পায়ের তলায় গড়াইতেছে। সকলকে টানিয়া সরাইয়া ঠিক করিয়া শোয়াইয়া দিয়া ছন্দা একবার জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। আকাশের দিকে তাকাইল। অকস্মাৎ সমস্ত শরীর আবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল—আকাশে পূর্ণ চাঁদ!

হাল্কা মেঘের পথ কাটিয়া চাঁদ যেন আকাশের উপর ছুটাছুটি করিতেছে। নীল আকাশের গায়ে ছোট-ছোট হাজার নক্ষত্রের চুমকি ছিটানো—আর চাঁদের রজত-শুভ্র স্নিগ্ধ কিরণ। ফালি-ফালি হাল্কা মেঘের বৈচিত্র্য চমৎকার! ছন্দার গায়ে চাঁদের জ্যোৎস্না পড়িয়াছে—ছন্দা যেন জুড়াইয়া গেল!

বড় বড় চোখ করিয়া ছন্দা চাঁদের দিকে তাকাইয়া আছে। আবেগে তাহার দেহ টলিতে লাগিল। ছন্দাকে কে যেন আজ মদ খাওয়াইয়া দিয়াছে! ধীরে ধীরে গায়ের জামা ছন্দা খুলিয়া ফেলিল, গায়ের উপর হাত বুলাইয়া চাঁদের জ্যোৎস্না সে গায়ে মাখিতে লাগিল।

মনের উপর ভাসিয়া উঠিল ছন্দার কুমারী-জীবনের কথা। আকাশে এমনি চাঁদ দেখিলে কোন দিনই সে স্থির থাকিতে পারিত না—চাঁদের সঙ্গে তার যেন কি সম্বন্ধ আছে! কত রাত না ঘুমাইয়া কাটাইয়াছে! গভীর রাত্রে প্রদীপটি নিবাইয়া ছন্দা মোটা খাতা লইয়া ছাদে চলিয়া যাইত। চাঁদের আলোয় বসিয়া কবিতা লিখিত—কাগজের পর কাগজে কত ছন্দে কত-কি লিখিত! কখনো হঠাৎ মনে হইত, চাঁদ মলিন হইয়া গিয়াছে! পূর্বগগনে নূতন আলো! মা-বাবা বলিতেন, পাগলী! বান্ধবীরা বলিত, কাব্যি মেয়ে। এই ভাবাবেগের জন্য কম জ্বালাতন তাহাকে সহিতে হয় নাই। তবু সে কিছুতেই নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিত না! গাছের পাতার উপর ঝরা বাদলের টুপ-টাপ শব্দ; পাশের বাড়ীর টিনের চালে দুপুরের রোদে তাতা পট্-পট্ ধ্বনি, ভীষণ ঝড়ের রুদ্ধ গুম্-গুম্ গর্জন, বহু দূর হইতে ভাসিয়া-আসা বিরহী কোকিলের পরম আকুতি, কাঠ-ফাটা রোদে ফেরিওয়ালার ক্লান্ত স্বর কোনটাকেই ছন্দা উপেক্ষা করিতে পারিত না। তার মোটা খাতার সাদা পাতা ক্রমশঃ সংখ্যায় কমিয়া আসিত।

জ্বালাতন যেমন সে অনেকের কাছে পাইয়াছে, তেমনি উৎসাহও পাইয়াছে।

দাদাকে কবিতা পড়িয়া না শুনাইলে ছন্দার তৃপ্তি হইত না! দাদার কাছ হইতে কবিতাগুলির সত্য সমালোচনা শুনিতে পাইত—কোথাও দাদা নিজের হাতে সংশোধন করিয়া দিত। তাহার কবিতার খাতার উপরেই কাটাকুটি করিত। ছন্দা তাহাতে রাগ করিত না। গভীর রাত্রি পর্যন্ত দাদার কাছে বসিয়া অতি ভক্তিমতী শিষ্যার মত সে শিক্ষা গ্রহণ করিত!

এমনি অমৃতময় আনন্দের মধ্যে ছন্দার কুমারী-জীবন যখন পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে বহিয়া চলিয়াছে, তখন একদা তাহার জীবনে এক নূতন অতিথির আবির্ভাব-সম্ভাবনা ক্রমশঃ সুনিশ্চিত রূপ গ্রহণ করিল। বিবাহ-বাড়ীতে আনন্দের স্রোত—কি রকম এক অপ্রকাশ্য আনন্দ-ভাব যেন ছন্দার প্রাণকেও দোলা দিল! একটু বিস্ময়, একটু ভয়-মিশ্রিত কি-রকম এক অননুভূত অবস্থা! যিনি আসিতেছেন, তিনি কেমন হইবেন! ছন্দাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন! ছন্দার ভবিষ্যৎ জীবন কোন্ ধারায় প্রবাহিত হইবে,—সুখাবেশজড়িত এলোমেলো চিন্তা—অল্প ভয়, অনেকখানি কৌতূহল লইয়া ছন্দা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

একবার দাদার কাছে গিয়া বসিল, বলিল,—"এবার দেখছি তোমার দেওয়া এত সস্নেহ যে শিক্ষা—তার সমাধি হতে চললো দাদা। কবিতার খাতা এবার বুঝি বন্ধ করতে হয় জন্মের মত! এ ভারী অন্যায় তোমাদের। তোমরাই তো আমাকে এমন করে বঞ্চিত করেছ, দূরে সরিয়ে দিচ্ছ!"

ভগিনীর মনের মাধুর্য্যময় প্রকাশ দাদার চোখকে প্রতারিত করিতে পারে নাই! দাদা ভালো ভাবেই বুঝিলেন যে, ভগিনীর দেওয়া এই অনুযোগের গভীরতা নাই তাহার অতি সচেতন মন কিন্তু এ ভাবে দূরে সরিয়া যাওয়ার অবস্থাটাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে আকাঙ্ক্ষাই করিতেছে! দাদা উত্তর করিল, "তা হোক, সংসারের কাজে-কর্ত্তব্যে তোর কবিতার খাতা বন্ধ করবার প্রয়োজন যদি ঘটে তাহলে না হয় বন্ধই হবে। কিন্তু জীবন থেকে কাব্যকে একেবারে বাদ দিস্‌নে যেন! যাদের জীবন একেবারে কাব্যহীন, তারা জীবনকে উপভোগ করতে পারে না। তাদের বাঁচা আর মেশিনের চলা—দু'য়ে কোন তফাৎ নেই ছন্দা। কবিতা রচনা বন্ধ হয় ক্ষতি নেই, কিন্তু কাব্যকে বাঁচিয়ে রাখিস্। বছরে একটা দিনও অন্ততঃ খানিকটা সময় শুধু কাব্যের অনুভূতি উপভোগ করবার চেষ্টা করিস্—তাহলেই যথেষ্ট!"

সে দিন কাব্যগুরুর কাছে পরম আগ্রহে এই শেষ শিক্ষাটি গ্রহণ করিয়া ছন্দা বলিল, তাই হবে দাদা। আজকের এই বিশেষ তারিখটি

রইলো লেখা। প্রতি-বছর এই তারিখে একবার অন্ততঃ আমার কাব্যকে আমি স্মরণ করবো। আমার কবিতার খাতায় একটি করে কবিতা সংযোগ করবো।”

ছন্দার মনে পড়িল কুমারী-জীবনের সেই সব বিগত কথা।

বিবাহিত-জীবনে সে মনের মত স্বামী পাইয়াছে। প্রথম বিবাহিত-জীবনে চঞ্চল যুবক স্বামী তাহার যৌবনের উপর দস্যুর আবির্ভাবের মত তাহাকে লজ্জিত শঙ্কিত করিয়া তুলিত! সেই দস্যুকে ছন্দা কোন মতেই বাগ মানাইতে পারিত না! কিন্তু ইহার মধ্যেও জীবনের কাব্যকে সে একেবারে হারায় নাই। একটু অবকাশ করিয়া একটি বিশেষ দিনে অন্ততঃ একটি কবিতা সে রচনা করিয়াছে। প্রকৃতির অবদান—রূপ, রস, গন্ধকে সে একেবারে বিসর্জ্জন দেয় নাই।

কিন্তু তাহার পর?

তাহার পর ক্রমশঃ একটি একটি করিয়া সে পাঁচটি সন্তানের জননী হইয়াছে। সংসারের অভাব-অনটন আর কর্ম্মব্যস্ততার মাঝে কাব্যের ঠাঁই জীবনে আর কোথায়? স্বামীর সে উচ্ছ্বাসও আর আজ নাই! তাহারা যেন দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে! তাহাদের সে জীবন যেন ঝরিয়া গিয়াছে! তাহারা যেন আবার নূতন করিয়া জন্ম লইয়াছে! কোথায় সে কাব্যি মেয়ে ছন্দা? নিজের মধ্যে ছন্দা নিজেকে আর খুঁজিয়া পায় না!

কিন্তু আজিকার চাঁদ ছন্দাকে আবার হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছে! আজিকার দিনটিই ছন্দার সেই বিশেষ দিন—ছন্দা চায় শুধু একটি বিশেষ দিনের অল্প-একটু সময়—তাহাও ছন্দার জুটিবে না? ছন্দা ভাবিল, আজ সে আবার একটি কবিতা রচনা করিবে। এই তো উপযুক্ত সময়—চারি দিক্ নিস্তব্ধ, সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন, সংসারের কর্ত্তব্য সারিয়া আসিয়াছে। সকলেই তৃপ্ত—সুখনিদ্রায় অভিভূত! এ সময়টুকু একান্ত তাহার নিজস্ব—এখন আর কেহ তাহাকে কর্ত্তব্যে আহ্বান করিতে আসিবে না। ছন্দা ভাবিল, এবার সে একটি কবিতা রচনা করিবে। লুকানো কবিতার খাতাখানি সন্তর্পণে সে বাহির করিয়া আনিল—অতি-আদরের খাতাখানির সর্ব্বাঙ্গে হাতের স্পর্শ বুলাইতে লাগিল। পিতার কাছে প্রহৃত গৃহত্যাগী সন্তান বহু দিন পরে গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মা যেমন অর্দ্ধ-শঙ্কায় অর্দ্ধ-আনন্দে সন্তানের গায়ে কল্যাণ-হস্ত বুলাইয়া অভিমানী পুত্রকে সান্ত্বনা দেন, তেমনি করিয়া ছন্দা সাংসারিক কর্ত্তব্যের পেষণে বিতাড়িত তাহার মানসপুত্র পরিত্যক্ত খাতাখানির অভিমান ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একটির পর একটি করিয়া পাতা সে উল্টাইয়া চলিল! চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় কষ্ট করিয়া কবিতাগুলির দু'-একটা পড়ে। মুখে-চোখে প্রতিটি কবিতার সঙ্গে সঙ্গে নব-নব স্মৃতির তরঙ্গ উথলিয়া ওঠে। ছন্দা ধীরে ধীরে তাহার ফেলিয়া-আসা কুমারী-জীবনের মাঝে নামিয়া যাইতে লাগিল!

অকস্মাৎ একটা ক্রন্দন-রবে ছন্দার চমক ভাঙ্গিল। চারি দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া দেখিল—এ সে কোথায় আসিয়াছে! কোন্ অপরিচিত গৃহ! এখানে ক'টি ঐ ছেলেমেয়ে—ও কাহারা শুইয়া আছে? আবার ক্রন্দন-রবে,—একঘেয়ে মা-মা-মা! ধীরে ধীরে ছন্দা বহু দূরের কোন্ অতীত জীবন হইতে নিজেকে টানিয়া আনিয়া আসিতে লাগিল—ক্রমশঃ কল্পলোকের ঝাপ্‌সা কুয়াশা স্বচ্ছ হইয়া প্রখর বাস্তবে প্রকাশিত হইল। ছোট মেয়ে কাঁদিতেছে। হয়তো গলা শুকাইয়া গিয়াছে! কবিতার খাতা ফেলিয়া কন্যার নিকটে সে ছুটিয়া গেল। কন্যাকে স্তন্যদান করিয়া ঘুম পাড়াইয়া আবার উঠিয়া আসিল। কবিতার খাতাখানি লইয়া আবার বসিল—এবার আর শুধু বসা নয়, কবিতা লিখিবার প্রয়াস।

একটা নূতন ধরণের খেয়ালী ছন্দে খাতার উপর ছন্দা একটি মাত্র পংক্তি লিখিতেছে, হঠাৎ স্বামীর কণ্ঠে আহ্বান! স্বামী ডাকিল—ছন্দা।

কোলের খাতা জানলার উপর নামাইয়া রাখিয়া ছন্দা স্বামীর পাশে সরিয়া আসিল। দেখিল, স্বামী অকাতরে ঘুমাইতেছে। বুঝিল, ঘুমের ঘোরে স্বামী তাহাকে আহ্বান করিয়াছে! নিদ্রার মাঝেও ছন্দার প্রয়োজনকে স্বামী ত্যাগ করিতে পারে না—এই অনুভূতি জাগরণে-নিদ্রায়—ছন্দার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

সকল অবস্থাতেই ছন্দা স্বামীর সঙ্গিনী। নিদ্রাতুর স্বামীর রুক্ষ চুলগুলিতে ছন্দা ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। আহা, ঘুমাইয়াও স্বামী তাহার চিন্তা করিতেছে! তাহার উপর স্বামীর এত নির্ভর! এমন বিশ্বাস! ক্ষুদ্র শিশুর মতই স্বামী তাহাকে বিশ্বাস করে—তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকে!

ছন্দার স্পর্শ-লাভে স্বামীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। গভীর রাত্রি, এখনো ছন্দা শয়ন করে নাই—তাহার পরিচর্য্যা করিতেছে! স্বামী শঙ্কিত স্বরে বলিল, “এ কি ছন্দা, এখনও তুমি ঘুমোওনি! কত রাত হয়েছে, খেয়াল আছে? আবার রাত থাকতেই তো উঠতে হবে? সারাদিন খাটুনি। তুমি আমাকে একটা কঠিন রকম বিপদে না ফেলে ছাড়বে না দেখছি! এদিকে শরীর তো হচ্ছে দিন-দিন রূপ-কথার রাজকন্যার মত—ফুঁ দিলে ওড়ে—ছুঁলে ঝরে যায়!

অনেক দিন পরে ছন্দা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিল! ভাবিল, সত্য! রূপকথার রাজকন্যার মতই বটে! চমৎকার বলিয়াছেন উনি। তাহা হইলে স্বামীর জীবনে কাব্য একেবারে ঝরিয়া যায় নাই!

ছন্দার আনন্দ হইল। স্বামী আবার বলিল, “হাসলে যে বড়?”

স্বামীর বুকের উপর হাত দিয়া তাহার পাঁজরের হাড়গুলি টিপিতে টিপিতে ছন্দা ছোট খুকীর মতই বলিল, “গুণে দেবো—ক'খানা! —উনি আবার আমার শরীরকে ব্যঙ্গ করছেন!”

“তা যা খুশী বলো এখন কিন্তু তোমাকে শুতেই হবে।”

খুব কোমল করিয়া ছন্দার হাতখানি ধরিয়া স্বামী আকর্ষণ করিল। স্বামীর নিকট ঘেঁষিয়া ছন্দা শুইয়া পড়িল। স্বামীর মাথা নিজের বুকের উপর টানিয়া ছন্দা গভীর আবেগে চাপিয়া ধরিল। স্বামীর অবয়বকে ছন্দা দেখিতে পাইল না। স্বামীকে আজ ক্ষুদ্র নির্ভরশীল শিশুর মতই ছন্দার মনে হইল। স্বামীর মাথায়, পিঠে, গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ছন্দা তাহার ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা স্বামীর অকল্যাণকে যেন মুছিয়া দিতে লাগিল—ইচ্ছা-শক্তির মঙ্গল-প্রলেপ দিয়া স্বামীর জীবনী-শক্তিকে শক্তি দিতে লাগিল।

স্বামী আপত্তি করিল না—ছন্দার উষ্ণ-কোমল বক্ষে মাথা রাখিয়া শুইতে তাহার ভালো লাগে।

ছন্দার একখানি হাত নিজের মুঠার মধ্যে স্বামী ধরিয়া আছে। ছন্দার বুকে মুখ রাখিয়াই স্বামী ডাকিল, “বৌ!”

বহু—বহু দিন পরে প্রায়-বিস্মৃতির অতল হইতে যেন এ ধ্বনি ভাসিয়া উঠিল! এ আহ্বানের উত্তরও বহু দিন পরে ছন্দার স্মরণে আবার উদয় হইল! ছন্দা উত্তর দিল—"কু-উ।"

ও-দিকে ছন্দার কবিতার খাতা তখন জানলার উপর হিমে ভিজিতেছে। ভিজুক! কবিতার খাতার পৃষ্ঠা নাই বা পূরণ হইল! ছন্দা আজ বুঝিয়াছে, তাহাদের জীবনের কাব্য হারায় নাই, ঝরিয়া যায় নাই! কাব্যগুরুকে স্মরণ করিয়া ছন্দা মনে মনে বিচার করিয়া দেখিল, রচনার অবসর যদিও ছুটিয়া গিয়াছে, কাব্যের অনুভূতি তবু জীবনে এখনো প্রচুর। খাতার আর প্রয়োজন নাই!

আবার সেই প্রথম যৌবনের দস্যু স্বামী ডাকিল, "বৌ!"

লজ্জা-চাপা সুরে নব-বিবাহিতা তরুণীর মতই ছন্দা উত্তর দিল, "কু—উ!"

শ্রীহেমদাকান্ত বন্দোপাধ্যায়

আনন্দমঠ

সাহিত্য হিসাবে আনন্দমঠ বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির মধ্যে হয়ত প্রথম শ্রেণীর নয়। কিন্তু অন্য নানা দিক্ হইতে আনন্দমঠের মূল্য অসামান্য।

উপন্যাস রচনায় যখন দেশগুরু বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত হইলেন, তখন লক্ষ্য করিলেন, এই নূতন শ্রেণীর সাহিত্য দেশে বিশেষরূপ সমাদৃত হইল, তখন তিনি ভাবিলেন, উপন্যাসের মারফতে সহজে স্বদেশ-বাসীকে নব নব ভাব-ভাবনার আদর্শ দান করা যাইতে পারে, এইরূপ উচ্চতর চিন্তায় তাহাদের চিত্তকে প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে, এইরূপ সাহিত্যের মধ্য দিয়া লোকচরিত্র গঠন করা যাইতে পারে—ত্যাগ, তিতিক্ষা, শম দম, শৌর্য্য, তেজস্বিতা ইত্যাদি সত্ত্ব ও রজোগুণাত্মক ধর্ম্মে তমোভাবাপন্ন দেশের লোককে দীক্ষিত করা যাইতে পারে। আনন্দমঠ সেইরূপ একটা উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

স্বজাতি, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশের প্রতি বঙ্কিমের ভক্তি ছিল অগাধ। অধঃপতিত নিশ্চেষ্ট তমোগুণাশ্রিত দেশবাসীর পানে চাহিয়া তাঁহার হৃদয় লজ্জায় অপমানে ও বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িত! তিনি দেশের বীর-গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেন। এই স্বপ্ন তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার চিন্তার সঙ্গী ছিল—এই স্বপ্ন তাঁহার মৃণালিনী ও চন্দ্রশেখরে পূর্ব্বেই একটা রূপ লাভ করিয়াছিল। আনন্দমঠেই তাঁহার সেই স্বপ্ন পরিপূর্ণ বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।

এই স্বপ্ন একেবারে নিরাশ্রয় বা নিরালম্ব নয়। হেষ্টিংসের লিখিত কয়েকখানি পত্র হইতে জানা যায়, তাঁহার রাজত্বকালের প্রথমাবস্থায় উত্তর ভারতে একটি সন্ন্যাসি-বিদ্রোহ হইয়াছিল। অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দলে দলে সন্ন্যাসীরা হিমালয়প্রদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া উপদ্রব করিত এবং কোম্পানীর শাসনে বাধা দিত। ইহাদিগকে যেরূপ ক্ষুদ্র শত্রু মনে করা হইয়াছিল—ইহারা তাহা নহে। ইহাদিগকে দমন করিতে হেষ্টিংসকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। বঙ্কিমের স্বপ্ন এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে আলম্বস্বরূপ আশ্রয় করিয়াছিল। এই সন্ন্যাসিগণ বাঙ্গালী ছিল, এমন কথা সরকারী কাগজ-পত্র বলে না। ইহা হইতেই বঙ্কিমের মনে একটি বিদ্রোহী বাঙ্গালী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের পরিকল্পনা মনে আসিয়াছিল। বঙ্কিম যে-সময়কার ঘটনা বলিয়া উপন্যাসের উপাখ্যানটিকে দাঁড় করিয়াছেন—সে সময় বঙ্গদেশের পক্ষে অত্যন্ত সাংঘাতিক। সে সময়ে সত্য সত্যই বাঙ্গালী জাতির দুর্গতির অবধি ছিল না। মিরকাসেমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান রাজত্ব তখন গিয়াছে—ইংরেজ রাজত্বও তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই—দেশের রক্ষক কেহ নাই, ভক্ষকের অভাব নাই। দেশের শুভাশুভের জন্য দায়ী তখন কেহই নয়। রেজা খাঁ, দেবী সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইত্যাদি রাজস্ব বিভাগের লুণ্ঠকদের অত্যাচারে দেশ প্রায় শ্মশানে পরিণত। তাহার উপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বিদ্রোহের পক্ষে এমন অনুকূল অবস্থা বাংলায় পূর্ব্বে বা পরে কখনও ঘটে নাই। দেশের অবস্থা তখন কি ভীষণ এবং কিরূপ শোচনীয় তাহা আনন্দমঠে অবিকল এবং ঐতিহাসিক যথাযথতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। দারুণ উৎপীড়নে, দুঃখে কষ্টে অন্নাভাবে সে সময় নির্বীর্য্য নিস্তেজ বাঙ্গালীর পক্ষেও বিদ্রোহী হইয়া উঠা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। মরণ যখন অনিবার্য্য, তখন ইতর জন্তুরাও দন্ত-নখরের সাহায্যেও শেষ চেষ্টা করিয়া মরে।

ভবানন্দের মুখ দিয়া বঙ্কিম বলিয়াছেন—"সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে। তাহার চেয়ে নীচ জীব আমি ত আর দেখি নাই—সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা তুলিয়া উঠে। দেখ, যত দেশ আছে—কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উই মাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল কুকুর খায়? মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই? সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই? ঘরে ঝিবৌ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই? ঝিবউএর পেটে ছেলে রাখিয়া সোয়াস্তি নাই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, প্রাণ পর্য্যন্ত যায়।"

ইহা ভবানন্দের কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই ব্যথিত আর্ত্ত হৃদয়েরই উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি।

দেশের যখন এই অবস্থা তখনই বঙ্কিম বাঙ্গালীর চূর্ণবিচূর্ণ পঞ্জরাস্থির উপর আনন্দমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বঙ্কিম বলিতে চাহিয়াছেন—যাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহারা চাহিয়াছিল সুশাসন, দেশের কল্যাণ, দেশের ধর্ম্ম মান প্রাণ রক্ষা। তখন যে অরাজকতা বা সদ্যোমৃত রাজত্বের প্রেতাত্মার শাসন চলিতেছে—তাহার বিরুদ্ধেই তাহাদের বিদ্রোহ। যখনই তাহারা সুশাসনের আশ্বাস লাভ করিল, তখনই তাহারা নিরস্ত হইল। শস্ত্রবলেই তাহারা নিরস্ত হয় নাই—সুশাসনের ও সুবিচারের আশ্বাস পাইয়াই তাহারা নিরস্ত হইয়াছিল। ইহাই আনন্দমঠের ঐতিহাসিক দিক্।

সাহিত্যের দিক্ হইতে ইহা জাতীয় ট্র্যাজিডি। মৃণালিনী ও চন্দ্রশেখরও জাতীয় ট্র্যাজিডি, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ইতিহাসের দিক হইতে। সাহিত্যের দিক হইতে আনন্দমঠই সত্য সত্যই ট্র্যাজিডি। জাতীয় জীবনে যে সহজাত দুর্ব্বলতা আছে তাহাই জাতীয় ট্র্যাজিডির

অন্তর্নিহিত নিদান। এই দুর্ব্বলতা কি? ভীরুতা—প্রাণের ভয়? না, বাঙ্গালী প্রাণ দিতে জানে। প্রাণের চেয়েও যে বড় ভক্তি, তাহারই অভাব? এ অভাব তাহার আছে বটে, কিন্তু চেষ্টা করিলে উপযুক্ত গুরু পাইলে তাহা উদ্বোধিত হইতে পারে। কিন্তু তাহার চেয়েও যে বড়—জ্ঞান (জাতির আত্মসত্তাবোধ)—সেই জ্ঞানের অভাবই এই ট্র্যাজিডির মূল। এই জ্ঞান কর্ম্মের চেয়েও ভক্তির চেয়েও বড়। এই জ্ঞান কি, তাহা বঙ্কিম গ্রন্থশেষে বুঝাইয়াছেন।

গ্রন্থের আরম্ভে বঙ্কিম ভক্তির শ্রেষ্ঠতার কথা এই ভাবে বলিয়াছেন।

—"তোমার পণ কি?"

"পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব।"

"জীবন তুচ্ছ, সকলেই দান করতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল—"ভক্তি।"

জীবন হইতেও—শৌর্য্য ও নির্ভীকতা হইতেও যে বড় ভক্তি—তাহাই বুঝাইবার জন্য আনন্দমঠ প্রধানতঃ রচিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখি—ভারতবাসীরা লক্ষ লক্ষ সৈন্য-সামন্ত লইয়াও বার বার মুসলমান জাতির কাছে পরাস্ত হইয়াছে। এই পরাজয়ের কারণ কি? মুসলমানগণ হিন্দুদের চেয়ে দৈহিক শক্তিতে প্রবলতর ছিল বলিয়া কি? না,—শক্তির প্রাচুর্য্যে নয়। জাঠ, মারাঠা, শিখ, রাজপুত জাতি মুসলমানদের চেয়ে শক্তিতে হীনতর ছিল না। ভারতবাসীর প্রাণের ভয় বেশি বলিয়া? তাহাও নয়—রাজপুত জাতি হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতে পারিত। ভারত-বিজয়ী মুসলমানের বল কোথায়? ইহার সন্ধান করিতে গেলে ভক্তির কথা আসিয়া পড়ে। ইসলামের প্রতি গভীর ভক্তিই তাহাদের বাহুতে শক্তি যোগাইয়াছে,—প্রাণ বিসর্জ্জনেও প্রেরণা দিয়াছে।

ভারতবাসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু দেশের প্রতি গভীর ভক্তি তাহাদের ছিল না—থাকিলে কখনও তাহারা অসংখ্য সৈন্য লইয়া বার বার পরাজিত হইত না। আক্রমণকারীরা ইসলামের দোহাই দিয়া জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে এবং তাহা ব্যর্থ হয় নাই। দেশভক্তির অভাবেই—জাতিপ্রেমের অভাবেই হিন্দুবীরগণ সহীদ ও গাজীদের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারে নাই।

ইংরেজ জাতি বাণিজ্য করিতে আসিয়া এদেশে রাজ্যস্থাপন করিয়াছে; বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হইয়াছে। বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, তাহাদের সামরিক শক্তি বিশেষ কিছু ছিল না। নিজেদের জাতীয়তার প্রতি গভীর ভক্তিই তাহাদের বাহুতে শক্তি ও চিত্তে সাহস সঞ্চার করিয়াছে। ইহাই তাহাদের ধর্ম্ম, ইহাই তাহাদের একনিষ্ঠ সাধনা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, নির্ভীকতার নিদান। প্রাণ ইহার তুলনায় তুচ্ছ—ভাড়া করা, মাহিনা করা লোকেও যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

বঙ্কিম যে ভক্তির কথা বলিয়াছেন—তাহা প্রয়োজন হইলে প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রণোদিত করে, আবার প্রাণ বাঁচাইয়া উচ্চতর ব্রতে প্রাণকে নিয়োগ করিবার জন্যও প্রেরণা দেয়।

যাহার যা ধর্ম্ম তাহার সহিত হৃদয়ের যোগসাধনই ভক্তি।

এই যোগসাধন ভারতবর্ষের সামরিক ইতিহাসে কোন দিন ঘটে নাই। দেবালয় বিদীর্ণ হইয়াছে, দেববিগ্রহ চূর্ণ হইয়াছে—তাহাতেও হৃদয় উদ্দীপিত হয় নাই। কেন? ভক্তির অভাবে। দেবতার প্রতি ভারতবাসীর একটা সকাম ও সভয় ভক্তি ছিল—কিন্তু দেবতা যে দিন মুষলাঘাতে চূর্ণ হইল, সেদিনই তাহার ভক্তিও গেল। যাহাকে জাগ্রৎ দেবতা বলিয়া লোকে মনে মনে ভয় করিত, যাহার চরণে তাহারা বিপন্ন হইলে শরণ লইত, যখন দেখিল, সে নিজেই আত্মরক্ষা করিতে পারে না—আততায়ীকে দণ্ড দিতে পারে না—তখন তাহাকে পাষাণের পুতুল ছাড়া আর কি মনে করিবে? তাহার প্রতি ভক্তি হইবে কেন? তাহার জন্য সুপ্ত শৌর্য্য উদ্দীপিত হইবে কেন?

যে দেশে তেত্রিশ কোটি দেবতা মন্দিরে মন্দিরে ধাতু, দারু ও শিলার মূর্ত্তিতে বিরাজ করিয়াছে, সে দেশে জীবন্ত দেবতা দেশমাতা কোন দিন অর্ঘ্য লাভ করে নাই। দেশকে দেবতারূপে কল্পনা না করিলেও স্বভাবতঃ স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির দেশ-ভক্তি জন্মিতে পারে—কিন্তু দেবভক্ত জাতির তাহাতে ভক্তি জন্মে না। বঙ্কিম তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই—দেশকে জননী ও দেবতারূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া বঙ্কিম নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক—নবভক্তিবাদের প্রচারক—নবযুগের ঋষি। জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভারতবাসীর উপাস্য বঙ্কিমের এই দেশমাতা। এই দেবতার বেদীর পাশেই বঙ্কিম ভারতের সর্ব্বজাতির সম্মেলনে মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আনন্দমঠ বাঙ্গালার নব শ্রীমদ্ভাগবত। আনন্দমঠের প্রধান মূল্য এইখানেই।

যে জাতির আত্মধর্ম্মের প্রতি গভীর নিষ্ঠা আছে, যে জাতির নিজ দেশের প্রতি গভীর ভক্তি আছে, যে জাতির নিজ জাতির প্রতি গভীর মমতা আছে, সে জাতির পক্ষে দেশমাতাকে দেবতা বানাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু অধঃপতিত ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির আত্মশক্তি ও আত্মমর্য্যাদা জাগাইতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই—বঙ্কিম তাহাই ভাবিয়াছিলেন। দেশভক্তির আদর্শ দেখাইতে গিয়া তাঁহাকে সন্তান-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। তাহাদিগকে সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মচারী করিয়া তুলিতে হইয়াছে, তাহাদের ভুল-ভ্রান্তির স্খলন-পতনের কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতে হইয়াছে এবং দেশমাতার দিক্ হইতে সমস্ত দেব-দেবীর নূতন ব্যাখ্যা দিতে হইয়াছে। অন্য জাতির পক্ষে এ সমস্তের কোন প্রয়োজন নাই। অন্য জাতির মধ্যে যাহারা দেশপ্রাণ বা স্বজাতিবৎসল তাহারা স্বভাবতই সন্ন্যাসী—গৃহ-সংসারের বন্ধন কোন দিনই তাহাদিগকে নির্ব্বীর্য্য করে না। যেমন জাতি, তাহার সম্বন্ধে তেমনই ব্যবস্থা।

বঙ্কিমের মতে রাজা যদি সুশাসন করেন—প্রজার কল্যাণসাধন করেন, তাহা হইলে রাজবিদ্রোহ মহাপাপ। তাই যদি হয়, তবে সুশাসিত ইংরেজ রাজত্বে সন্তানের আদর্শ কি জন্য? আনন্দমঠ রচনার প্রয়োজনই বা কি? সাহিত্যের কথা বাদ দিলেও প্রয়োজন এই, জাতি স্বাধীনই থাকুক আর পরাধীনই থাকুক, দেশের প্রতি গভীর ভক্তি মনুষ্যত্বের অঙ্গীভূত। মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে স্বদেশকে ভালবাসিতেই হইবে। বঙ্কিম এ কথা নানা নিবন্ধে বার বারই বলিয়াছেন। আর শৌর্য্য, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, একনিষ্ঠতা ইত্যাদি কেবল ত রাজকীয় কুশাসনের বা অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য নহে—পাপ, অসত্য, কুসংস্কার, সামাজিক উপদ্রব, ধর্ম্মের অনাচার ইত্যাদি সমস্তের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের জন্য। দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ-কামনাই দেশভক্তির প্রধান উপজীব্য।

এই জন্যই আনন্দমঠের সাময়িক বিদ্রোহের পরিকল্পনা একটা অর্দ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার সাহিত্য রূপ মাত্র নয়। ইহার বিবৃতি উপন্যাসচ্ছলে হইলেও জাতীয় জীবনের দিক্ হইতে ইহার একটা চিরন্তন মূল্য আছে।

দেশসেবার প্রসঙ্গে সন্তানধর্ম্মের প্রথম প্রচার হইলেও বুঝিতে হইবে—সকল প্রকার উচ্চতর সাধনার মূলে এই সন্তান-ধর্ম্মের প্রয়োজন আছে। সর্ব্ববিধ মহৎ ব্রতে সন্তানের মত ব্রহ্মচর্য্য চাই—চরিত্র-দৃঢ়তা চাই—নিষ্ঠা চাই, ভক্তি চাই—সংহতি চাই। মনে রাখিতে হইবে—নারীর রূপ লালসা সকল সাধনাতেই—সকল ব্রতেই চিরন্তন অন্তরায়।

যে দেশ সহস্র ভেদের দ্বারা দুর্ব্বল—জাতিভেদ যে দেশে সংহতির বাধা, সে দেশে সত্যানন্দের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি সর্ব্বপ্রকারের মহত্তর ব্রতের পক্ষেই কি প্রযোজ্য নয়?

"তোমরা জাতি ত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই।"

এক মহাজাতিতে পরিণত হওয়াই একটি মহাব্রত।

বঙ্কিম গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছিলেন—প্রাণের চেয়েও ভক্তি বড়। কিন্তু গ্রন্থ শেষে বলিলেন—এ জাতির পক্ষে তাহার চেয়েও বড় আছে—তাহা জ্ঞান। এই জ্ঞানের সাধনা করিতে হইবে ধর্ম্মপথে। সেই ধর্ম্মপথে অর্জ্জিত জ্ঞান কর্ম্মে প্রয়োগ করিলেই সিদ্ধি অনিবার্য্য। সন্তানরা কর্ম্মী; কিন্তু তাহারা অধর্ম্মের সাহায্যে কর্ম্মে সিদ্ধি চাহিয়াছিল। কর্ম্মের সহিত জ্ঞানধর্ম্মের মিলন হওয়া চাই। সে কথা তাহারা ভুলিয়াছিল। অসময়ের কোন প্রতিষ্ঠাই স্থায়িত্বলাভ করে না—অকালের বোধনে দেবীর আবির্ভাব হয় না। সুসময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। তাই অসময়ের প্রতিষ্ঠাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। শান্তি—রজঃশক্তির প্রতীক—কল্যাণী সত্ত্বগুণের প্রতীক। সত্ত্বের দ্বারা উজ্জ্বল না হইলে কোন রজঃশক্তি চরম সিদ্ধি লাভ করে না। বঙ্কিম এই কথাই বলিয়াছেন—

"মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে, কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।"

বঙ্কিম ধর্ম্মমূলক জ্ঞানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন এই ভাবে—"তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম। তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে।

প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক—কর্ম্মাত্মক নয়। সেই জ্ঞান দুই প্রকার—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি তাহা না জানিলে সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না। এখন এ দেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এ দেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই। আমরা লোক-শিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক-শিক্ষায় বড় সুপটু। যখন ইংরেজি শিক্ষার এদেশের লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে, তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন তাহা না হয়, যতদিন হিন্দু আবার জ্ঞানবান গুণবান আর বলবান না হয়—ততদিন ইংরেজ-রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।"

বঙ্কিম বলিতে চাহিয়াছেন,—দেশ এখন অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও পাপে আচ্ছন্ন। যত দিন জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচারে এইগুলি দূর না হয় তত দিন দেশের মুক্তি নাই! তাহা ছাড়া, শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি বিষয়েও পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সহিত সমকক্ষতা অর্জ্জন করা চাই! তবে জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন উঠিতে পারে। জোর করিয়া দেশভক্তি প্রচারেও হইবে না—পশুবলের দ্বারাও হইবে না।

বঙ্কিম বলিয়াছেন—তবু সন্তান-বিদ্রোহও নিষ্ফল হয় নাই। এই বিদ্রোহই ইংরেজকে রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য করিয়াছে। তাহা করুক বা না করুক, সন্তান-বিদ্রোহ নিষ্ফল হউক বা না হউক তাহাকে অবলম্বন করিয়া রচিত এই সাহিত্য নিষ্ফল হয় নাই।

আনন্দমঠের একটি প্রধান ঐশ্বর্য্য 'বন্দে মাতরম্' গানটি। এই গানটির রচনা সৌষ্ঠব ও সাহিত্যিক মূল্য লইয়া মতভেদ আছে। তাহা থাকুক, কিন্তু জাতীয় জীবনে ইহার মূল্য অপরিমিত। সত্যই ইহা—ঋষি বঙ্কিমের প্রবর্ত্তিত মহামন্ত্র-স্বরূপ।

এই গানে আমরা দেশের মাটিকে প্রথমতঃ জননীর মহিমায় পরিমূর্ত্তরূপে পাইতেছি—তার পর তাঁহাকে দেবতার রূপে পাইতেছি—তার পর সর্ব্বদেবময়ী রূপে পাইতেছি সমস্ত দেবতা—দেশমাতায় অবসান লাভ করিতেছে। দেশমাতাকে যে পূজা করে—তাহার আর অন্য কোন দেবতার পূজার প্রয়োজন নাই। লৌকিক মূর্ত্তি-পূজাত্মক ধর্ম্মের চেয়ে দেশমাতার পূজা বড় ধর্ম্ম। দেশমাতা সাক্ষাৎ বাস্তব জাগ্রৎ দেবতা।

এই সকল কথার ইঙ্গিত ঐ গানটিতে আছে। মূর্ত্তিপূজার দেশে বঙ্কিমের এই গান লোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—দেশের রসরূপ তাহারা এই গানেই প্রথম পাইয়াছে। সত্য সত্যই ইহা অভিনব ধর্ম্মমত দেশে প্রচার করিয়াছে। এদেশে দেশ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাই ছিল না—বঙ্কিম ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়াই তিনি দেশগুরু ও ঋষিকল্প মহাপুরুষ!

এই গানটি দেশের সাহিত্যের একটি অলস ঐশ্বর্য্য হইয়াই থাকে নাই—বহু লোকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে এবং দেশের জন্য আত্মত্যাগে প্রণোদিত হইয়াছে।

এখন আর দেশকে কেহ শুধু মাটিমাত্র মনে করিতে পারে না। বঙ্কিমের আগে সকলেই মহেন্দ্রের মত জিজ্ঞাসা করিত—

"সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা, মাতা কে? এ ত দেশ—এ ত মা নয়—"

কিন্তু ইহা ত কবিকল্পনা নয়—দেশ যে সত্যই জননী, সে বিষয়ে আজ আর কাহার সন্দেহ আছে?

দেশমাতা যে শুধু পুরুষেরই পূজ্য নয়—নারীরও পূজ্য,—এই কথাটি বুঝাইতে বঙ্কিম 'শান্তি'-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঘরে বসিয়াও সহধর্ম্মিণী ব্রতপালনে পুরুষকে সহায়তা না করিলে দেশসেবা সম্ভব নয়।

এই ভাবেও নারী দেশের সেবা করিতে পারে—ইহাই বুঝাইবার জন্ত কল্যাণী-চরিত্রের সৃষ্টি। বঙ্কিম এই গ্রন্থে দেশভক্তির একটী পরিপূর্ণ আদর্শ দেখাইয়াছেন এবং আদর্শের দুরারোহ পথে সর্ব্ববিধ বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামও দেখাইয়াছেন।

আনন্দমঠের মুখ্য উদ্দেশ্যের কথা বলিলাম, গৌণ উদ্দেশ্যও যে আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাহাতে দেশের লোক মনোযোগ দেয় নাই।—বঙ্কিম ভ্রান্তপথের সুদীর্ঘ পরিচয় দিয়া শেষে বলিয়াছেন—মুক্তিলাভের পথ ইহা নয়। এ পথ ভ্রান্ত—এতক্ষণ যাহা বলিলাম সমস্তকে নিষ্ফলতার বার্ত্তা বলিয়া জানিবেন। দেশের লোক যে তাঁহার শেষ কথায় মনোযোগ দেয় নাই তাহার একটা কারণ—তাঁহার উপন্যাসে যে প্রয়াসটি ব্যর্থ, তাহাই হইয়া উঠিয়াছে সাহিত্যিক রসবত্তায় প্রাণবন্ত আর যেটিকে মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছেন, ইহাই সত্য, তাহাই হইয়াছে তত্ত্বসার ও সাহিত্যের দিক্ হইতে নির্জ্জীব। তাঁহার সমগ্র গ্রন্থের রসবত্তা, প্রাণবত্তা ও সাহিত্যিক সমারোহকে একেবারে সংহার না করিলেও উপসংহার 'এহো! বাহ্য' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কেহই তাঁহার বক্তব্য শেষ পর্য্যন্ত শোনে নাই। ভবানন্দের যেখানে মৃত্যু হইয়াছে সেইখানেই কোলাহল করিয়া উঠিয়াছে—শেষ কথা কাহারও কানে যায় নাই। ইহার ফলে আনন্দমঠকে জাতীয় জীবনের নবীন গীতা বলিয়া দেশের লোক ঘোষণা করিয়াছে। সত্যই যাহারা দেশভক্ত, তাহারা ইহাতে দেশসেবকের ভারতীয় আদর্শটি লাভ করিয়াছে—যাহারা দেশের কথা কখনও ভাবে নাই—তাহারাও ইহাতে দেশসেবার দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের অনেক সমালোচকই ইহাকে উদ্দেশ্য-মূলক ভাবাদর্শসঞ্চারক রচনা বলিয়া মনে করেন। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থশেষে যে টিপ্পনী করিয়াছেন, যাহারা তাহা অভিনিবেশের সঙ্গে পড়িয়াছে তাহারা উহাকে মুদ্রিত গ্রন্থের রক্ষাকবচ স্বরূপ মনে করেন। এই ভাবে আনন্দমঠ উপন্যাসের পর্য্যায় হইতে এক শ্রেণীর ধর্ম্মগ্রন্থের পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে।

ইহার আর একটি দিক্—যাহা ইহাকে সাহিত্যের পর্য্যায়ে এখনও রক্ষা করিতেছে, তাহা দেশভক্তির কোলাহলে বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। যদি আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠার জন্ত বঙ্কিম আনন্দ মঠ লিখিতেন—তবে বঙ্কিম সত্যানন্দের দুই হস্ত অবশ করিয়া দিলেন কেন অর্থাৎ ভবানন্দ ও জীবানন্দের ব্রতভঙ্গ ঘটাইলেন কেন? সন্তানরা শুধু বিদেশী শত্রুর সহিত সংগ্রাম করে নাই—তাহাদিগকে প্রকৃতির সহিতও সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। বিদেশীর সহিত সংগ্রাম এই সংগ্রামের তুলনায় অনেক সহজ। প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া এই অবাস্তব আদর্শের অনুসরণ করিতে গেলে প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ লইবেই। বঙ্কিম যে সত্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া সকলে মনে করে—তাহার চেয়ে এ সত্য অধিকতর বলবান্। তাই বঙ্কিম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুইটি সন্তানের ব্রতভঙ্গ ঘটাইয়া—প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে পরাজয় দেখাইয়া চিরন্তন সত্যেরই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বলিবার কথা দাঁড়াইয়াছে—এইরূপ অবাস্তব আদর্শবাদের অনুসরণে দেশকে স্বাধীন করা যায় না—প্রকৃতির সহিত সন্ধি করিতে হইবে। প্রকৃতিকে তাহার প্রাপ্য দিয়া তাহাকে প্রসন্ন না করিলে সে অনর্থ ঘটাইবে! কঠোর ব্রহ্মচর্য্য না হইলেও চলিবে, কিন্তু জ্ঞান ছাড়া কিছুতেই চলিবে না। এ জ্ঞান অবশ্য ব্রহ্মজ্ঞান নয়। যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞান ও বিশেষ করিয়া বহির্বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ অপরা বিদ্যার চর্চ্চা, প্রাকৃতিক জ্ঞান। দেশ উদ্ধার করা—দেশ স্বাধীন করা ইত্যাদি আদৌ আধ্যাত্মিক ব্যাপার নয়—ইহা বাহ্য জগতেরই ব্যাপার। অতএব এই ব্রতে বাহ্য জগতের জ্ঞানের প্রয়োজন—চেষ্টাকৃত অস্বাভাবিক ব্রহ্মচর্য্য ইহাতে কোন সাহায্য করিবে না, বরং বাধাই দিবে। বাহ্য জগতের জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া বাহ্য জগতের দিক্ হইতেই বল আহরণ করিতে হইবে। অর্থও একটি বল—প্রকৃতির ঘরে দস্যুতা করিয়া যেমন চিত্তের বল অর্জ্জন করা যায় না—নবাবের খাজনা লুঠিয়াও তেমনি সে বল অর্জ্জন করা যায় না। বহির্বিষয়ক সাধনার দ্বারা সমস্ত জাতিকে ধনবলে বলী করিয়া তুলিতে হইবে। ব্রহ্মলাভের ও স্বাধীনতা লাভের উপায় এক নয়। জন্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ ও অধীনতাবন্ধ হইতে মুক্তি লাভের পথ এক নয়।

শ্রীকালিদাস রায়

নির্মোক

[গল্প]

১

বহু দিন আগেকার কথা, বিলাত হইতে সদ্য তখন ডাক্তারী পাশ করিয়া আসিয়াছি। ভাগ্যক্রমে পশার জমিয়াছে ভালো।

এক দিন ফোনে একটা কল পাইলাম। "ডাক্তার মহলানবিশ?"

"হ্যাঁ, কোথা থেকে ফোন্ করছেন?"

"১৮।৫ বি শ্যাম স্কোয়ার থেকে। আপনাকে এখনই একবার আসতে হবে। জে, সি, গাঙ্গুলির বাড়ী। দয়া করে তাড়াতাড়ি যদি আসেন!"

হাতে কাজ ছিল না, তাড়াতাড়িই গেলাম।

নম্বর দেখিয়া নামিতেই একটা ছোকরা-চাকর পথ দেখাইয়া ভিতরে লইয়া গেল এবং ডাকিয়া বলিল, "মা, ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

লঘু পদশব্দ এবং মিনিট কয়েক পরে একটি মহিলা আসিয়া নমস্কার করিলেন।

তাঁহার বয়স বোধ হয় পঁচিশ-ছাব্বিশ, দীর্ঘাঙ্গী, নাতিস্থূলা, রং বেশ ফর্সা, মুখশ্রী মন্দ নয়, হয়তো ভালোই বলা যাইত, কিন্তু অত্যধিক চিন্তার দরুণ বোধ হয় কেমন যেন অবসাদগ্রস্ত পাণ্ডুর লাগিতেছিল।

আমি প্রতি-নমস্কার করিলে মহিলা বলিলেন, আপনি খুব শীগ্‌গিরই এসেছেন! এখনও আধ ঘণ্টা হয়নি, ফোন করেছি।

হাসিয়া সসৌজন্যে বলিলাম, হ্যাঁ, এ-সময়টা খালি ছিলুম। কি কেস্?

মহিলা সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, হার্ট ট্রাব্‌ল্। ক'দিন থেকে বড্ড বেড়েছে। মধ্যে মধ্যে এমন হয়। আমার

খাওয়া, ঘুম সব বন্ধ হয়ে যায়, অত্যন্ত কষ্ট পান। ডাক্তার চৌধুরী,—পি কে চৌধুরী দেখছেন, কিন্তু কোন দিকে একটুও কমছে না দেখে তাঁর হাতে আর আমার রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তাই আপনাকে আজ ফোন্ করলুম।

কথা বলিতে বলিতে আমরা রোগীর কক্ষ-দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলাম। ঘরে এক বৃদ্ধ শুইয়া ছিলেন। চক্ষু মুদ্রিত দেখিয়া মনে করিলাম, নিদ্রিত! কিন্তু মহিলা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, জাগিয়া আছেন। বৃদ্ধের কাণের কাছে মুখ রাখিয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিলেন,—বাবা!

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চোখ চাহিয়া একবার কন্যার পানে পরক্ষণে আমার পানে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন,—ডাক্তার মহলানবিশ?

মহিলা বলিলেন, হ্যাঁ। খুব শীগ্‌গির এসেছেন উনি।

বৃদ্ধ বলিলেন, বড় যন্ত্রণা ডাক্তারবাবু, আর সহ্য করতে পারি না।

বলিলাম, পরীক্ষা করে দেখি। তার পর যাতে আপনার কষ্ট লাঘব হয়, চেষ্টা করবো। ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়তো শীগ্‌গিরই সেরে উঠবেন।

বৃদ্ধ ডাকিলেন, নিশা, মা—

মুখের কাছে হেঁট হইয়া মহিলা বলিলেনকি বাবা?

বৃদ্ধ নিম্ন স্বরে বলিলেন, আমার পুরোনো প্রেসক্রপশনগুলো বের করে দাও মা।

নিশা বলিলেন, টেবিলে রেখেছি বাবা।

পরীক্ষা হইয়া গেল। নিশাদেবীর দিকে চাহিয়া কি একটা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া লক্ষ্য হইল, তাঁহার সীমন্ত সিন্দুর-বিহীন। অথচ মাথায় গুণ্ঠন। বাঙ্গালি-ঘরের কুমারী কন্যা কখনও মাথায় কাপড় দেয় না! তবে কি বিধবা? কিন্তু বেশভূষা দেখিলে বিধবা মনে হয় না।

রোগী বলিলেন, শীগ্‌গির একটু সুস্থ হতে পারবো ত ডাক্তার-বাবু? এমন করে পড়ে পড়ে আর পারি না।

তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া নিশাদেবীকে রোগীর পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বৈকালে রোগী কেমন থাকেন ডিস্‌পেন্সারীতে খবর দিতে বলিয়া বিদায় লইলাম।

২

পরদিন ডিস্‌পেন্সারীতে একখানি পত্র পাইলাম। নিম্নে স্বাক্ষর নিশা গঙ্গোপাধ্যায়। বুঝিলাম, অনুমান ঠিক, অবিবাহিতাই।

এগারোটা নাগাদ রোগী দেখিতে গেলাম। রোগী এইমাত্র একটু ঘুমাইয়াছেন। নিশাদেবী কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, একটু অপেক্ষা করতে পারবেন ডাক্তারবাবু? এইমাত্র একটু ঘুমিয়েছেন। অবশ্য বেশী দেরী হবে না। একসঙ্গে পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশী উনি ঘুমোতে পারেন না।

বলিলাম, অপেক্ষা করতে পারবো। একটু দেরী হয়, কি আর করা যাবে? ওঁকে ত জাগানো যায় না!

নিশাদেবী বলিলেন, তবে এ ঘরে একটু বসুন। বলিয়া পাশের ঘরের দুয়ারের পর্দাখানা তুলিয়া ধরিলেন।

বসিয়া নিশাদেবীকে প্রশ্ন করিলাম, কত দিনের? কি সূত্রে

একটু মৌন থাকিয়া নিশাদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তার পর বলিলেন, পর-পর কতকগুলো দুর্ঘটনা হতে বাবার শরীর ভেঙ্গে পড়ে। প্রথম একটা ব্যাঙ্ক ফেল হতে অনেক টাকা জলে গেল, তার পরই পেলেন পুত্রশোক, তার পর পত্নীশোক। তিনটে আর সহ্য করতে পারলেন না। বারো মাস অবশ্য এমন থাকেন না, দু'-তিন মাস ভালোও থাকেন। আবার যখন বাড়ে, তখন এই অবস্থা হয়।

পাশের ঘর হইতে মৃদু কণ্ঠ শুনা গেল, নিশা, মা,—

বাবা উঠেছেন। বলিয়া তিনি ক্ষিপ্র-পদে বাহির হইয়া গেলেন; আমিও উঠিয়া রোগীর ঘরে গেলাম।

রোগীর অবস্থা আজ অন্য দিনের চেয়ে একটু ভালো দেখিলাম। পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে নিজেই জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। একটু গল্প করিলেন। বারো মাস শয্যাগত থাকিয়া কন্যার জীবন কি দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

এমনই করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। প্রায় প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিয়া আসিতাম। সুবিধা পাইলে বৈকালেও পনের-কুড়ি মিনিট বসিয়া যাইতাম! বৃদ্ধ অত্যন্ত খুশী হইতেন। নিশাদেবীর গম্ভীর মুখের উপর অন্তরের ছায়া প্রতিফলিত হয় না, কাজেই তিনি খুশী কি অখুশী তাহা বুঝিতে পারিতাম না।

বৃদ্ধ এক দিন গল্প করিলেন, তিনি পূর্ব্বে দ্বারভাঙ্গা ষ্টেটে কাজ করিতেন। তাহার পর একসঙ্গে পত্নী ও পুত্রকে হারাইয়া জীবন এমন হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহার একমাত্র অবলম্বন নিশাদেবী।

কথায় কথায় অনেকখানি বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। বিদায় লইয়া নীচে নামিতেছি, নিশাদেবী সন্ধ্যা দেখাইয়া শাঁখ হাতে ভাঁড়ার হইতে বাহিরে আসিলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—চললেন! আপনি এলে বাবা ভারী খুশী হন। পথ চেয়ে শুয়ে থাকেন।

ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি, তিনি একাই আনন্দ পান? সে আনন্দের অংশ আপনি কিছু পান না? কিন্তু এত দিন আসা-যাওয়া করিলেও নিশাদেবী এবং আমার মধ্যে ব্যবধান একতিল কমে নাই। কাজেই প্রশ্নটা অকথিত রহিল। হাসিয়া বলিলাম, আমাকে উনি খুব স্নেহ করেন কি না। আজ যেন ওঁকে একটু প্রফুল্ল দেখলুম!

নিশাদেবী রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, ও কতটুকুর জন্য? শোকে বাবা জর্জ্জরিত, ওঁকে প্রফুল্ল করা মানুষের অসাধ্য।

আমি বলিলাম, সে কথা সত্যি। তবু আপনি ওঁর একমাত্র অবলম্বন এবং শান্তি। আপনার মুখ চেয়ে উনি মনে বল পাবেন।

নিশাদেবীর চক্ষু দু'টি অশ্রু-আবিল হইয়া আসিল, কাতর স্বরে বলিলেন, না ডাক্তারবাবু, আমিই বাবার জীবনে সবচেয়ে অশান্তি। আমার চিন্তাতেই বাবা সর্ব্বদা ব্যাকুল!

কথাটা সত্য। বৃদ্ধের শরীরের এমন অবস্থা, কন্যা এক-মুহূর্ত্ত কাছে না থাকিলে চলে না, অথচ নিশাদেবীকে পাত্রস্থ করিতে না পারার দরুণ পিতার মনে দুশ্চিন্তার অন্ত নাই! উনি গত হইলে পূর্ণ যুবতী কন্যাটি কাহার অভিভাবকত্বে থাকিবে, তাহাও চিন্তার বিষয়! সত্যই তিনি পিতার একমাত্র শান্তি হইলেও দুর্ভাবনার কারণও বটে!

৩

এমনই করিয়া প্রায় দু'মাস কাটিল। বৃদ্ধের শরীর পূর্ব্বের চেয়ে ভালোই আছে, তথাপি আমি প্রত্যহ যাই। বৃদ্ধ আমার সহিত কথা বলিয়া আনন্দ পান। বিশেষ কারণে যদি এক দিন না যাইতে পারি পরের দিন জিজ্ঞাসা করেন, কাল আসোনি কেন অমিয়? সারাদিন আমি প্রতীক্ষা করেছি।

বেশী কাজের অজুহাত দেখাইলে অপ্রতিভ হাস্যে বলেন, নিশাও সেই কথা বল্লে, কিন্তু বার্দ্ধক্যের মোহ, বুঝেছ তো বাবা!

নিশাদেবীর দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করি, মৃদু হাসিতে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত। যৌবনের চাঞ্চল্য তাহাতে নাই, শান্ত-গম্ভীর প্রকাশ-কুণ্ঠ মূর্ত্তিখানি দেখিয়া মনে মমতা জাগে! এমন তাঁহার স্বর্ণময় দিনগুলি রোগীর পরিচর্য্যায় ও সেবাতেই কাটিয়া যাইতেছে। চিন্তা ও অশান্তি তাঁহাকে যেন প্রৌঢ়ত্বের পদে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়াছে। তথাপি এই সেবাব্রত-ধারিণীর মৌন গম্ভীর প্রতিচ্ছবি হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে গভীর রেখায় অঙ্কিত করিয়া প্রতিদিন খানিকটা সময় তাঁহার সাহচর্য্যে কাটাইয়া দিই, আমার মনের উত্তাপ তাঁহার অজানিত রাখি।

এক দিন বৃদ্ধ বলিলেন, অনেক দিন এখানে রয়েছি অমিয়, তুমি যদি বলো বাবা, তাহলে দিন কতক দেওঘরে যাই।

বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এইটুকু সঙ্গলাভ—তাহাও বন্ধ হইবে! মিনিট-দুই চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, তা যেতে পারেন!

বৃদ্ধ মাঝখানেই বলিলেন, ওখানে থাকলে নিশা একটু আনন্দ পায়। বাগান আছে, ওর নিজের হাতে মনের মত করে করেছে! এখানে যেন খাঁচায়-পোরা পাখী হয়ে আছে। দিন-রাত আমার সেবা আর চিন্তা ওকে পাগল করে দেয়।

বলিলাম, যান, তবে এখানে যে-নিয়মে আছেন, এই রকম থাকবেন, আর মধ্যে মধ্যে চিঠি দেবেন, যদি কিছু অদল-বদল করবার প্রয়োজন হয়, করবো।

বৃদ্ধ বলিলেন, তা তো দিতেই হবে বাবা। যদি সুবিধা করতে পারো, একবার যেয়ো।

সানন্দে এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহারা দেওঘর চলিয়া গেলেন।

ইচ্ছা ছিল, বৃদ্ধের কাছে তাঁহার কন্যার পাণি প্রার্থনা করিব, কিন্তু সে-কথা বলিবার অবসর পাইলাম না।

কলিকাতা মহানগরী অকস্মাৎ অত্যন্ত শুষ্ক ও বিরস লাগিতে লাগিল। দেওঘর হইতে বৃদ্ধের পৌঁছানো সংবাদ পাইলাম। দীর্ঘ পত্র। এবারে দেওঘরে আসিয়া আর ভালো লাগিতেছে না, আমার অভাব সর্ব্বদা অনুভব করেন ইত্যাদি। যদি সুবিধা করিতে পারি যেন নিশ্চয়ই একবার যাই বলিয়া পত্রশেষে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন।

কিন্তু চাকুরে নই যে সুবিধামত ছুটী লইব, কাজেই তখনই যাইতে পারিলাম না। মাস-খানেক পরে নিশাদেবীর পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন, বাবার শরীর খুব খারাপ হইয়াছে। হঠাৎ একটা গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন। এখানে বাবার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন; দু'-তিন দিনের জ্বরে আজ চার দিন হইল তিনি মারা গিয়াছেন। সেই রাত্রি হইতে বাবারও খুব বাড়াবাড়ি যাইতেছে। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতেছি। ওখানে আপনি ছিলেন, ভরসা ছিল! এ যেন চারি দিক অন্ধকার দেখিতেছি! আপনি দয়া করিয়া একবার আসিতে পারিবেন কি?

বিলম্ব করা চলে না! নিশা ডাকিয়াছে! সে বিপন্ন, আমাকে যাইতেই হইবে।

গৃহে ফিরিয়া মাকে বলিলাম, আজই দেওঘর যাবো।

মা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সে কি রে,—কেন?

বলিলাম, ওখানে আমার রোগী আছেন, তাঁর খুব বাড়াবাড়ি অসুখ।

মা বলিলেন, আহা! মেয়ে? না, পুরুষ?

বলিলাম, বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তুমি আমার কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে দাও মা!

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'দিন থাকবি?

বলিলাম, তা বলতে পারি না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তুমি দিন আষ্টেকের মত গুছিয়ে দাও।

সেই দিনই দেওঘর যাত্রা করিলাম।

৪

দেওঘরে গিয়া নিশা-কুটীর দেখিয়া গেটের মধ্যে ঢুকিলাম!

বাহিরের দালানেই নিশাদেবীর সহিত দেখা হইল, গাড়ীর শব্দ পাইয়া তিনি বাহির হইয়া আসিয়াছেন। আমার সহিত চোখো-চোখি হইতেই দুই চোখের জলে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গেল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, বাবাকে আর বুঝি ধরে রাখতে পারবো না, ডাক্তারবাবু!

উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলাম, কেমন আছেন?

চোখ মুছিয়া নিশাদেবী বলিলেন, কাল থেকে আর কথা বলতে পাচ্ছেন না। জ্বরও হয়েছে!

বুঝিলাম, প্রদীপ নিবিতে আর বিলম্ব নাই। নিশাদেবীকে বলিলাম, ভয় কি! এমন ওঁর কত বার হয়। এবারেই বা আপনি এত বেশী ভয় পাচ্ছেন কেন?

নিশাদেবী বলিলেন, কিন্তু কথা বন্ধ কখনও হয়নি ডাক্তারবাবু।

বলিলাম, হয়তো কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, তাই চুপ করে আছেন।

নিশাদেবী বলিলেন, না ডাক্তারবাবু, বাবা কথা বলতে পাচ্ছেন না। জ্ঞান আছে, চারি দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন! মনে হচ্ছে, কিছু বলতে চান কিন্তু বলতে পাচ্ছেন না। বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইল!

কথা বলিতে বলিতে আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম। রোগীর কক্ষে আমি প্রবেশ করিতেই তিনি আমার পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন। মনে হইল প্রীত হইয়াছেন। আমি কাছে গিয়া বসিতেই ধীরে ধীরে কম্পিত হাত-খানি তুলিয়া আমার হাত ধরিলেন। দুই চোখের কোল বহিয়া দু'টি ক্ষীণ জলধারা গড়াইয়া পড়িল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কথা বলতে পাচ্ছেন না?

মৃদু শিরশ্চালনা দ্বারা বুঝাইলেন, না।

পরীক্ষা শেষ করিয়া বলিলাম, ভয় পাচ্ছেন কেন? ভালো হবেন। আমি থাকবো কি না, জানতে চাইছেন? হ্যাঁ, আপনি সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত থাকবো!

বাহিরে আসিলে নিশাদেবী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, কেমন দেখলেন বাবাকে?

কি বলিব ? বৃথা আশা দিয়া লাভ কি ? শুষ্ক স্বরে বলিলাম, কি আর দেখবো ! আপনি বুদ্ধিমতী, বুঝতেই পাচ্ছেন।

কাঁপিতে কাঁপিতে পাশের দেওয়ালটা ধরিয়া নিশাদেবী আর্ত্ত কণ্ঠে বলিলেন, বাবা বাঁচবেন না ?

নির্ব্বাক্ রহিলাম।

নিশাদেবী দেওয়ালে মাথা রাখিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।

একটু পরে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, এত ব্যাকুল হবেন না নিশাদেবি, মানুষের জীবনের এক দিন শেষ আছেই। আপনি বুদ্ধিমতী, আপনার এত কাতর হলে চলে না। তাছাড়া ওঁর রোগের যন্ত্রণাটা একবার ভাবুন।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নিশাদেবী বলিলেন, খুব ভেবেছি ডাক্তারবাবু, কিন্তু বাবা যে আমার আশ্রয়, আমার সব ! পৃথিবীতে যে আমার আর কোথাও কেউ নেই !

এ কথার উত্তর মনে-মনেই দিলাম, এই শোকবিহ্বলাকে সে-কথা বলা যায় না।

এমনই করিয়া সাত-আট দিন কাটিয়া গেল। নিশাদেবী ক'দিনে না খাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন। সর্ব্বক্ষণ রোগীর শিয়রে বসিয়া থাকেন, একবার কোন মতে উঠিয়া গিয়া পাচককে রন্ধনের উপদেশ দিয়া আসেন,—তাও বোধ হয় আমি আছি বলিয়া !

নবম দিনে হঠাৎ এক সময় ক্ষণেকের জন্য বৃদ্ধ বাকশক্তি ফিরিয়া পাইলেন, বিকৃত স্বরে ডাকিলেন, নিশা,—অমিয়—

ঘরের এক পাশে চেয়ারে বসিয়া সে-দিনের সংবাদপত্র পড়িতেছিলাম, ক্ষিপ্রপদে নিকটে গেলাম। নিশাদেবী মুখের উপর ঝুঁকিয়া ডাকিলেন, বাবা !

আমার দিকে চাহিয়া জড়িত অস্পষ্ট স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, নিশাকে তোমায় দিলুম।

নিশাদেবী ডাকিলেন, বাবা,—

বৃদ্ধ এবার অধিক জড়িত স্বরে কি বলিলেন, বুঝা গেল না, শুধু নিশাদেবীর মাথা বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন।

তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া আমি বলিলাম, আপনার দান আমি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলুম।

সে-দিন সন্ধ্যায় তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

রাত্রে দেহ তুলিবার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিলাম না। ভোর বেলা দেহ তোলা হইল। নিশাদেবী একখানি খাম আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, বাবা বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর এখানা আপনাকে দিতে।

পত্রখানা হাতে লইয়া তাঁহার বেদনা-পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কবে বলেছিলেন ?

আরক্ত আঁখি মুছিয়া নিশাদেবী বলিলেন, বলেননি, লিখে দিয়েছিলেন। প্রথম যে-দিন কথা বন্ধ হলো সেই রাত্রেই ওটা লিখেছেন।

খামখানা ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িলাম। আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা।

অমিয়, নিশা আমার মেয়ে নয়, বিধবা পুত্রবধূ। আমার ছেলে বিলাতে মারা গেছে। এগারো বছর বয়সে নিশার বিবাহ হয়েছিল, আট দিন পরে ছেলে বিলাত যায়। ও কুমারী, ওকে তুমি নিয়ো। ইতি জগদীশ গাঙ্গুলী।

বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া নিশাদেবীর পানে চাহিলাম, নিশাদেবী শূন্যদৃষ্টিতে প্রাঙ্গণের দিকে চাহিয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ চিঠিতে তিনি কি লিখেছেন জানেন ?

নিশাদেবী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। খাম বন্ধ করে আমাকে দিয়েছিলেন।

আমি আর কিছু বলিলাম না, খামখানা পকেটে রাখিলাম।

বৃদ্ধের শেষকৃত্য করিয়া দ্বিপ্রহরে সকলে ফিরিয়া আসিলাম।

শরীর ও মন দুই-ই ক্লান্ত অবসন্ন বোধ হইতেছিল। শুইয়া শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। নিশা বালবিধবা, তাহাতে আমার মনে দ্বিধা নাই, কিন্তু মা কি সম্মত হইতে পারিবেন ? অথচ আমি তাঁহাকে অন্তিম সময়ে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছি।···

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ঘরের বাহিরে আসিলাম, পাশের ঘরের পর্দ্দাখানা বাতাসে উড়িতে দেখিতে পাইলাম, নিশা ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতিয়া হাতে মাথা রাখিয়া এ-দিকে পিঠ করিয়া শুইয়া আছেন।

একবার ইতস্ততঃ করিলাম, পরক্ষণে মনে হইল, দ্বিধা-সঙ্কোচের আমার কোন কারণ নাই। তাছাড়া কলিকাতা ছাড়িয়া আজ দশ-এগারো দিন বাহিরে রহিয়াছি, নিদারুণ ক্ষতি হইতেছে, শীঘ্র আমার না ফিরিলে চলিবে না। নিশার সহিত স্পষ্ট আলোচনার আশু প্রয়োজন।

দ্বারের কাছে গিয়া বলিলাম, আসতে পারি ?

ধরা-গলায় নিশাদেবী বলিলেন, আসুন।

নিশাদেবীর মাদুরের একপাশে বসিলাম। কি করিয়া কথাটা আরম্ভ করিব ভাবিতেছি, নিশাদেবী নিজেই কথা বলিলেন। আমার মুখের পানে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিলেন,—বাবা আপনার কাছে লুকিয়েছেন, আমি ওঁর মেয়ে নই, বিধবা পুত্রবধূ।

হাত বাড়াইয়া নিশার একখানি হাত হাতে লইয়া সহজ স্বরে বলিলাম, না লুকোন্‌নি, আমি জানি।

নিশা বিস্ময়ের সহিত বলিল, জানেন ? আমি বিধবা, এ কথা জানেন ? কিন্তু বাবা কখন কারুকে এ-কথা বলতেন না ! বলিয়া সঙ্কুচিত ভাবে হাতখানি টানিয়া লইতে গেল।

আমি ছাড়িলাম না, ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, ও-হাতের ওপর সম্পূর্ণ দাবী আমার, তোমার টেনে নেবার অধিকার নেই নিশা !

নিশার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। মিনিট খানেক স্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল, আমি বিধবা ?

বুঝিলাম, এই একটা জায়গাতেই তাহার কাঁটা ফুটিতেছে ! এই বিধবা শব্দটিতে !

বলিলাম, এগারো বছরের মেয়ের বিয়েই বা কি আর বৈধব্যই বা কি ? যাঁর সবচেয়ে বেশী বাজবার কথা, তিনি তোমায় কুমারী বলে পরিচয় দিয়েছেন। বলিয়া পকেট হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। পাঠান্তে পত্র রাখিয়া দিয়া সে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মিনিট কয়েক পরে তাহার রুক্ষ এলায়িত চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিলাম, নিশা !

নিশা মুখ তুলিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, বলুন।

তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া সস্নেহে বলিলাম, আর আপনি নয়, এবার থেকে তুমি,—কেমন ?

নিশা সলজ্জ মুখ নত করিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল।

তাহার সিক্ত আঁখিপল্লবে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম, আর বেশী দেরী করতে পারি না। অনেক দিন কলকাতা ছেড়ে রয়েছি। কাল-পরশুর মধ্যে যাওয়া চলবে ?

নিশা কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, তা কেন চলবে না ? এখানে মালী আর চাকরই এত দিন ছিল। কিন্তু,—বলিয়া সে একটু থামিয়া বলিল, কি পরিচয়ে আমি আপনার বাড়ী যাবো ?

বলিলাম, কেন ? যে-পরিচয় তোমার বাবা দিয়ে গেছেন। কিন্তু এবার আপনি বললে আমি আর কথা বলবো না।

একটু নীরব থাকিয়া লজ্জিত ভাবে নিশা বলিল, তোমার বাড়ীতে সকলে কি বলবে ?

বলিলাম, সকলের মধ্যে শুধু মা। তিনি বুদ্ধিমতী। বুঝবেন, ছেলের এটি ধ্রুবতারা !

—যাও, তুমি বড় দুষ্টু ! বলিয়া নিশা লজ্জিত মুখখানি আমার বুকে লুকাইল—নিতান্ত বালিকার মত। বুঝিলাম, সেই গাম্ভীর্য্যময়ী নারীর নির্ম্মোক খশিয়া গিয়াছে !

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু

শেষ আশ্রয়

[উপন্যাস]

৩

নিবারণ চা খাইতেছিল। খালি চা নয়, একটা বাটিতে করিয়া মুড়িও—টাট্‌কা মুড়্‌-মুড়ে নয়—বাসি, নরম। চিবাইতে গেলেই আলগা দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়া যায়। এক-ঢোক করিয়া চা মুখে লইয়া জিভ দিয়া টানিয়া টানিয়া মুড়িগুলাকে আয়ত্ত করিয়া লইতেছিল।

নিবারণের খাটিয়ার সামনে বসিয়া জিমিও প্রাতরাশ সারিয়া লইতেছিল, একটা নারিকেলের মালায় কতকটা চা, মুখের কাছে মেঝেয় ছড়ানো কতকগুলা মুড়ি। নারিকেলের মালাটি নিবারণই সংগ্রহ করিয়াছে। প্রতিদিন সকালে নিবারণের চা-মুড়ি আসিলেই জিমি নারিকেলের মালাটি মুখে করিয়া হাজির হয়, খাওয়া হইয়া গেলে মুখে করিয়া আবার ঘরের কোণে তুলিয়া রাখে।

নিবারণ মুড়ি চিবাইতেছিল। মুখের ভাব অত্যন্ত চিন্তাকুল। গত রাত্রি-শেষে নিবারণ তাহার পরলোকগতা পত্নীকে স্বপ্নে দেখিয়াছে—ঠিক আগেকার মতই চেহারা, আগেকার মতই মেজাজ ! যেন তাহারা দুই জনে কোথায় চলিয়াছে ; সামনে একটি ছোট নদী—ঠিক তাহাদের গ্রামের পাশের নদীর মত দেখিতে। নদীর চরের উপর তাহারা দাঁড়াইয়া আছে ; শুধু তাহারাই নয়—আরও অনেক লোক—বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, ছেলে-মেয়ে, কত যে ইয়ত্তা নাই। চরের পাশেই নদী-প্রবাহ, এ-পার হইতে ও-পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত—একটা বিরাট কালো সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহিয়া চলিয়াছে। সবাই হাঁটিয়া পার হইতেছে—কিন্তু নিবারণের ভয় করিতেছে—কিছুতেই সে নামিতে চহিতেছে না। কিন্তু স্ত্রী ছাড়িবে না, পার হইবেই। সে রাগারাগি সুরু করিল, নিবারণকে ধমক দিতে লাগিল ; তাহাতেও নিবারণকে নারাজ দেখিয়া একা নামিয়া পড়িল। অগত্যা নিবারণকেও নামিতে হইল ; পায়ে-পায়ে জল বাড়িতে লাগিল, হাঁটু ছাড়াইয়া কোমর পর্য্যন্ত উঠিল ; শেষে হঠাৎ পা হড়কাইয়া গভীর জলে নিবারণ তলাইয়া গেল। নাকে-মুখে জল ঢুকিয়া নিবারণের দম বন্ধ হইয়া আসিবার জো ; কোন রকমে জল হইতে মাথাটা তাহাকে ডাকিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু গলায় স্বর ফুটিল না। নিবারণ ভাসিয়া চলিল। হঠাৎ দেখিল, জিমি তাহার সামনে ভাসিয়া চলিয়াছে। নিবারণ তাহার লেজটা জাপটাইয়া ধরিল, জিমি পা দিয়া তাহাকে ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু নিবারণ কিছুতেই ছাড়িল না। তখন দুই জনেই ডুবিয়া নাকানি-চোবানি খাইতে-খাইতে—

নিবারণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে নিবারণ মনে-মনে এই স্বপ্ন-সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এত দিন পরে পত্নীর সাক্ষাৎ লাভ, তাঁহার সহিত অভিমান, নদী পার হইবার চেষ্টা ও নাকানি-চোবানি খাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারের অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এদিকে জিমির মুড়ি ফুরাইয়া গিয়াছিল, প্রার্থনা-ব্যাকুল চক্ষে নিবারণের দিকে তাকাইয়া সে লেজ নাড়িতেছিল ; এবং নিবারণের দৃষ্টি-আকর্ষণে অসমর্থ হইয়া কণ্ঠ হইতে একটি বিশেষ করুণ ও কোমল শব্দ বাহির করিতেই নিবারণ মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া কহিল—"ফুরিয়ে গেছে তোর। শুধু মুড়িই খাচ্ছিস্ রে—চা খা।"

জিমি জবাব না দিয়া সজল চক্ষু মেলিয়া জিভ দিয়া ঠোঁট চাটিতে চাটিতে লেজ নাড়িতে লাগিল। নিবারণ আরও কতকগুলা মুড়ি ফেলিয়া দিতেই জিমি হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া খাইতে সুরু করিল।

এক জন ছেলেমানুষ চাকর ঘরে ঢুকিল—হাতে একটি রেকাবিতে গোটা দুই সন্দেশ, একটি কমলালেবু। চাকরটি ঘরে ঢুকিতেই জিমি বাটিতি মুখ ফিরাইয়া কড়া চোখে চাহিয়া মৃদু গর্জ্জন করিয়া উঠিল। চাকরটা সভয়ে পিছাইয়া গিয়া কহিল—"বুড়ো বাবু !"

নিবারণ তাহার দিকে তাকাইয়া কহিল—"কি রে !"

চাকরটা কহিল—"আপনার জন্তে খাবার এনেছি—মা পাঠিয়ে দিলেন।"

রেকাবিটার দিকে চাহিয়া নিবারণের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সাগ্রহে কহিল,—"নিয়ে আয়।"

চাকরটা ভয়ে-ভয়ে কহিল—"জিমি রয়েছে যে, কামড়ে দেবে

নিবারণ সাহস দিয়া কহিল—"না, না, তুই আয় না।"

চাকরটা সন্তর্পণে দুই পা আগাইয়া আসিয়া রেকাবিখানা বাড়াইয়া দিতেই নিবারণ তাহার হাত হইতে সেটি তুলিয়া লইয়া কহিল—"মিষ্টি কোত্থেকে এলো রে?"

চাকরটা যাইতে যাইতে কহিল—"কলকাতা থেকে দাদু-সাহেব এসেছেন যে কা'ল রাত্রে।"

কলিকাতার প্রসিদ্ধ দোকানের তৈয়ারী সন্দেশ দু'টির দিকে তাকাইয়া নিবারণের রসনা সিক্ত হইয়া উঠিল। কলিকাতায় থাকিতে কত রকমের ভাল ভাল সন্দেশের নাম শুনিয়াছিল, কিন্তু খাইবার সুযোগ হয় নাই কখনও। কাজের ভিড়ে সময় হয় নাই, সখও তত ছিল না। বয়স যত বাড়িতেছে, ততই ভাল-ভাল জিনিস খাইবার লোভ বাড়িতেছে। ছেলের বাড়ীতে খাওয়ার তাহার কষ্ট নাই, তবু মাঝে মাঝে মুখ বদলাইতে ইচ্ছা হয়! শুধু তাহাই নয় জিমিরও। জিমি ইতিমধ্যে অত্যন্ত কাছে সরিয়া আসিয়া পিছনের পা দুইটা মুড়িয়া সামনের পায়ে ভর দিয়া খাড়া হইয়া বসিয়াছিল। লোভে তাহার দুই চোখ হইতে জল এবং কষ হইতে লালা গড়াইতেছিল। নিবারণ কহিল—"তুইও খাবি না কি? কলকাতার সন্দেশ-খাসনি বোধ হয় জীবনে।"

জিমি অপরিসীম অধৈর্য্যে লেজ নাড়িতে লাগিল। নিবারণ হাসিয়া কহিল—"তোকেই আগে দি বাপু! যা' ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছিস্! না দিলে পেট কনকন্ করবে।" বলিয়া কতকটা সন্দেশ ভাঙ্গিয়া মেঝেতে ফেলিয়া দিল।

প্রাতরাশ সমাপন করিয়া নিবারণ বিছানা হইতে নামিয়া পোষাক-পরিচ্ছদের কিঞ্চিৎ সংস্কার-সাধনে প্রবৃত্ত হইল। বেয়াই আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত দেখা করিয়া সাদর-সম্ভাষণ জানানো তাহার পক্ষে নিতান্তই কর্ত্তব্য। কেহ স্বীকার না করিলেও সেই তো এ বাড়ীর আসল কর্ত্তা! অবশ্য সে এ-সংসারের কোন বিষয়ে থাকে না—সাংসারিক ব্যাপারে বৈরাগ্যবশতঃ নয়, ছেলে-বৌ তাহাকে থাকিতে দিতে চায় না বলিয়া। তবু সামাজিক কর্ত্তব্যে সে অবহেলা করিবে কেন? কাজেই সে উবু হইয়া বসিয়া খাটের নীচে হইতে তোরঙ্গটি টানিয়া বাহির করিল ও খুলিয়া একটি পরিধান-যোগ্য পরিষ্কার কাপড় খুঁজিয়া বাহির করিল। কোটটিকে ঝাড়িয়া ঘরের বাতাসকে ধূলি সমাকীর্ণ করিয়া তুলিল; গামছা দিয়া জুতা-জোড়াটির অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া একটুখানি নারিকেল তেল লাগাইয়া তাহাদের চেহারা কতকটা চক্‌চকে করিয়া তুলিল। তার পর কাপড় পরিয়া গায়ে কোট চড়াইয়া মাথায় কম্ফর্টার জড়াইয়া জুতা পরিয়া হাত দিয়া মাথার সামনের চুলগুলি একটু গুছাইল; কিন্তু গালে হাত বুলাইয়া কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করিল। তার পর দাড়ি-গোঁফসংলগ্ন দুইটা মুড়ির টুকরার মতই সহসা সঞ্চারিত সঙ্কোচকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দরজার দিকে পা বাড়াইতেই জিমি দুই লাফে আগাইয়া গিয়া দরজায় দাঁড়াইল। নিবারণ কহিল—"তুই আর সঙ্গে যাস্‌নে এখন। একলাই আলাপ করে আসি বেয়াইয়ের সঙ্গে। তুই বরং বিকেলে যাস্।"

জিমি তাহার কথা'য় কাণ দিল না বরং আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। নিবারণ সস্নেহে জিমির গায়ে হাত বুলাইয়া কহিল—"যা একটু শুয়ে আয়, আমি আসছি এখনই।"

প্রত্যুত্তরে জিমি লেজ নাড়িল ও গলা হইতে বিশেষ ধরণের সুর বাহির করিয়া আপত্তি জানাইল এবং নিবারণ চলিতে সুরু করিতেই তাহার সঙ্গ লইল। নিবারণ ধমক দিয়া কহিল—"আবার যাচ্ছিস্ সঙ্গে! যেতে হবে না বলছি যে! যা—যা বলছি।"

জিমি থমকিয়া দাঁড়াইল। নিবারণ কয়েক পা আগাইয়া গিয়া পিছন দিকে তাকাইয়া জিমির ভাব দেখিয়া বোধ করি স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিল। কহিল—"দাঁড়িয়ে রৈলি কেন? যা'—পাড়ায় ঘুরে আয়গে যা—দুপুর বেলায় আসবি আবার।"

বাড়ীর সামনে আসিতেই নিবারণ দেখিল চাপরাশি করিম সেখ চাপরাশ আঁটিয়া অফিস-ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। নিবারণকে দেখিয়া করিম সেলাম করিল। আত্মপ্রসাদের একটি ঢেউ নিবারণের আপাদ-মস্তক দিয়া গড়াইয়া গেল। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, এ বাড়ীর চাকর বাকরদের কেহ দেখিতেছে কি না। দেখিলে এক-জন মানী লোককে যে কেমন করিয়া মান্য করিতে হয়—শিখিতে পারিত। পরম আত্মীয়তার সহিত করিমকে কুশল-প্রশ্ন করিল নিবারণ—"ভাল আছ করিম? দেখিনি অনেক দিন—ছেলে-পিলে ভাল তো?" করিম দুই হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিল—"খোদার মর্জ্জিতে সব ভালই যাচ্ছে।" জিজ্ঞাসা করিল—"হুজুরের জন্তে বাইরে রোদে একটা কুরসি বার করে দেব কি?"

শীত-প্রভাতের কাঁচা-মধুর রৌদ্রে সারা বারান্দা ভরিয়া গিয়াছে; বসিতে লোভ হইল নিবারণের। কিন্তু লোভ সামলাইয়া কহিল—"না হে, থাকগে—বেড়াতে বেরোচ্ছি, তা তোমাদের সাহেব কি এখনও ওঠেনি না কি!"

করিম কহিল—"হাঁ—হুজুর! এইমাত্র উঠলেন। কাল অনেক রাত্রে শুয়েছেন কি না।"

নিবারণ মুদ্রিত চক্ষে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"জানি। বেয়াই মশায় এলেন কি না রাত্রের গাড়ীতে। ওঁকে ষ্টেশনে যেতে হয়েছিল।"

করিম মাথা নাড়িয়া কহিল—"হাঁ হুজুর।"

"নিবারণ কহিল—"বেয়াই মশায় উঠেছেন?"

করিম কহিল—"উনিও উঠেছেন। চা'খাচ্ছেন সব—খবর দেব কি, না, যাবেন উপরে?"

নিবারণ মুখ ও চোখ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—"হায় বাবা! আমার কি ওঠবার ক্ষমতা আছে! প্লেন জমিতেই হাঁটতে কষ্ট হয়। দেখছো না—একতলাতে পড়ে আছি—ওঠ-নামা করতে ডাক্তারের কড়া বারণ! জানো তো সব!" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"আচ্ছা বাবা, আমি একটু ঘুরেই আসি। নীচে নামুন—দেখা হবে এখন।" বলিয়া লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে একটু বেশী করিয়াই খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া বাতের বেদনাকে বিজ্ঞাপিত করিতে করিতে চলিয়া আসিল।

৪

রাস্তায় নামিয়া নিবারণ স্বাভাবিক চাল ধরিল। এ চালটিও খুব সুস্থ ও সুষ্ঠু নয় ডান পা'টা ভাল করিয়া সোজা হয় না; কাজেই চলিবার সময় দেহের ঊর্দ্ধভাগ দোলকের মত দুলিতে থাকে। দেখিয়া পাড়ার ছেলেরা তাহার নাম দিয়াছে—নাচিয়ে নিবারণ।

শুনিয়া নিবারণের মন খারাপ হয়, বলে না কিছুই—বোকার মত হাসে এবং বাড়ী ফিরিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া হাঁটুতে সেক দেয়।

রাস্তার পাশেই রায় বাহাদুর রজনীকান্তের বাড়ী। রায় বাহাদুর এইমাত্র প্রাতর্ভ্রমণ সারিয়া ফিরিয়াছেন। গায়ে গলাবন্ধ, মোটা গরম কোট ও আলোয়ান, গলায় কম্ফর্টার; বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে বসিয়া আছেন। রায় বাহাদুরের বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সরকারী বড় চাকরী করিতেন; বৎসর কয়েক আগে চাকরী হইতে বিদায় লইয়া পেন্সন ভোগ করিতেছেন। ছেলেরা সকলে বয়ঃপ্রাপ্ত, শিক্ষিত ও বিবাহিত এবং বিভিন্ন স্থানে সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত। রায় বাহাদুর ইচ্ছা করিলে ছেলেদের মধ্যে যে কোন এক জনের কাছে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার জন্যই হোক, অথবা হালফ্যাসানী পুত্রবধূদের চাল-চলনের প্রতি অসহিষ্ণুতার জন্যই হোক, এখানে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন। একটি মাত্র ঝি ও জন-দুই চাকর লইয়া সংসার। ঝিটিই না কি সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—রায় বাহাদুরকে পর্য্যন্ত তাহাকে সমীহ করিয়া চলিতে হয়। রায় বাহাদুরের শরীর এখনও বেশ শক্ত-পোক্ত; দাঁত একটিও পড়ে নাই—চোখের দৃষ্টিও বেশ ধারালো; মাথার চুল ও বড় বড় গোঁফ অবশ্য পাকিয়া শনের মত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু মনটি রীতিমত সবুজ। নারী-প্রসঙ্গ অত্যন্ত আনন্দের সহিত আলোচনা করেন এবং যৌন-ব্যাপার-প্রসঙ্গে স্বীয় অভিজ্ঞতা-লব্ধ এমন সব অদ্ভুত তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা করেন যে, সদ্য-বিবাহিত তরুণদের পর্য্যন্ত তাক্ লাগিয়া যায়! রায় বাহাদুর সামাজিক ব্যক্তিও বটেন—সারা দিন পাড়ায় ঘুরা-ফিরা করেন—প্রতিবেশীদের প্রত্যেকের বাড়ীতে যান, প্রত্যেকের বাড়ীর হাঁড়ির খবরটি পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করেন এবং প্রত্যেককেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানাবিধ সুপরামর্শ-দানে বাধিত করেন।

নিবারণকে দেখিয়া রায় বাহাদুর হাঁক দিলেন—"কি মশায়! কোথায় চলেছেন?"

নিবারণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"একটু বেড়িয়ে আসিগে।"

রায় বাহাদুর ভারী গলায় টানিয়া টানিয়া কহিলেন—"এখন আর বেড়াতে গিয়ে কি হবে! এখানেই বসবেন আসুন।"

ঠাণ্ডা কন্‌কনে শীতে নিবারণের বেড়াইতে যাইবার বেশ ইচ্ছা ছিল না; তা'ছাড়া রায় বাহাদুর সিগারেট খান, নিবারণকে দু'-একবার খাইতে দিয়াছেনও; কাছে বসিলে একটা সিগারেট হয়তো মিলিতে পারে! কাজেই নিবারণ দ্বিরুক্তি না করিয়া রায় বাহাদুরের বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিল। রায় বাহাদুর মুরুব্বিয়ানা সুরে কহিলেন—"চা খাওয়া হয়েছে সকালে?"

নিবারণ ঘাড় নাড়িয়া মৃদু হাসিয়া জবাব দিল—"তা হয়েছে বৈ কি।"

রায় বাহাদুর উপরে নীচে ঘাড় নাড়িয়া স্বভাব-সিদ্ধ টানা-টানা সুরে কহিলেন—"শুনেছি, আপনার বৌমাটি না কি ভারী কর্ত্তব্যপরায়ণা! সকলে প্রশংসা করে। আপনাকে সেবা-যত্ন খুবই করেন নিশ্চয়!"

নিবারণ ঢোক গিলিয়া কহিল—"তা করেন বৈ কি।"

রায় বাহাদুর বড় বড় গোঁফের অন্তরালে মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"আপনি সেই নীচের ঘরটাতেই আছেন তো?"

নিবারণ করুণ হাসি হাসিয়া কহিল—"কি করবো বলুন! উঠতে-নামতে কষ্ট হয়, না হ'লে ছেলে-বৌয়ের আগ্রহের অভাব নেই।"

রায় বাহাদুর ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—"তা বটে! তা বটে! সৎ ছেলে আপনার। বৌমাটি তো আপনার মস্ত বড় বংশের মেয়ে! আপনার বেয়াই তো আমার আপনার লোক কি না! আমার সাক্ষাৎ পিসতুতো ভাইয়ের সম্বন্ধীর জামাই! ভাল করেই পরিচয় আছে আমার সঙ্গে।" হঠাৎ ভ্রূ দু'টি নাচাইয়া কহিলেন—"হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ে গেল—আপনার বেয়াইয়ের তো আসবার কথা শুনেছিলাম—এসেছেন?"

নিবারণ কহিল—"এসেছেন কাল রাত্রে।"

রায় বাহাদুর কহিলেন—"কাল আপনার ছেলের কাছে শুনলাম—আসবেন, আবার আজই রাত্রে না কি চলে যাবেন। কাজের লোক তো! মস্ত বড় প্র্যাক্টিস! এক দিন কলকাতা ছাড়া মানে—চার-পাঁচশ টাকা ক্ষতি। তবে এখানটায় না কি একবারও আসেননি—আর আসবার সুযোগও হবে না, তাই তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে যাচ্ছেন!"

নিবারণ বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। রায় বাহাদুরের কথাগুলার অর্থ বিন্দুমাত্র বোধগম্য হইল না তাহার

তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রায় বাহাদুর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"আপনি কি কোন খবর জানেন না?"

নিবারণ লজ্জিত মুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"না।

রায় বাহাদুর স্নেহের সুরে কহিলেন—"কি করে জানবেন আপনি! সারাদিন টো-টো করে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ান! সংসারে থাকতে গেলে সংসারের খবরাখবর রাখতে হয়।"

নিবারণ অপরাধীর মত মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বসিয়া রহিল।

রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন—"ছেলে তো আপনার সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের মস্ত বড় পদ নিয়ে কলকাতা যাচ্ছে—দু'-এক সপ্তাহের মধ্যেই খবর বেরোবে খবরের কাগজে,—আপনার বেয়াইয়ের চেষ্টাতেই হয়েছে—মিনিষ্টাররা তো ওঁর হাত-ধরা?"

পুত্রের উচ্চপদ-প্রাপ্তির কথা শুনিয়া নিবারণের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। কি একটা কথা বলিতে গেল সে, কিন্তু শুষ্ক-কণ্ঠে স্বর ফুটিতে চাহিল না।

রায় বাহাদুর কহিলেন—"আপনার বেয়াই নিজেই মন্ত্রিত্ব পাবেন এক দিন। কাউন্সিলে একটা জায়গা না কি খালি হয়েছে। উনি এ দিক্ থেকে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন—তাই এসেছেন ভোটারদের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে। জামাই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে—অসুবিধা কিছু হবে না। তবে সবাইকে একটু তোয়াজ করতে হবে তো! তাই আজ একটা পার্টি দিচ্ছেন সবাইকে, বাড়ীতে আয়োজন-টায়োজন কিছু দেখলেন না?"

নিবারণ ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইল। রায় বাহাদুর কহিলেন, "আয়োজন প্রায় সব করাই আছে। আপনি কোন খবরই রাখেন না তো! যা বাকী আছে, তা' করতে বেশী সময় লাগবে না।"

নিবারণ অন্য কথা ভাবিতেছিল—রায় বাহাদুরের কথা সব কাণে যাইতেছিল না। রায় বাহাদুর লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিলেন—"অবশ্য আপনার একটু অসুবিধে হবে। ছেলে তো কলকাতায় শ্বশুরের বাড়ীতেই উঠবে—আপনাকে হয়তো দেশে গিয়ে থাকতে হবে।"

নিবারণ অন্যমনস্ক ভাবে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। রায় বাহাদুর কহিলেন—"সেই ভাল! দেশে বাড়ী-ঘর আছে, জমি-জায়গাও আছে নিশ্চয়—সেখানে স্বাধীন ভাবে থাকুন গিয়ে। কি দরকার—এই বয়সে ছেলে-বৌএর সঙ্গে সঙ্গে লট-বহরের সামিল হয়ে টানা-হ্যাঁচড়া সহ্য করবার!"

নিবারণ বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিল। রায় বাহাদুর কহিলেন—"চললেন! আমিও যাব ওবেলায়, আলাপ করে আসব।"

রাস্তায় নামিয়াই আকাশের দিকে তাকাইল নিবারণ। সূর্য্য অনেকটা উপরে উঠিয়াছে—বেলা বোধ হয় এগারোটা পার হইয়া গিয়াছে। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নাই, সদ্য-ধৌত পালিশ-করা সিমেন্টের মেঝের মত পরিচ্ছন্ন, মসৃণ—একটানা—গাঢ় নীল আকাশ। রোদটা একটু কড়া বোধ হইল—কম্ফর্টারটা মাথা হইতে খুলিয়া ফেলিয়া গলায় জড়াইল নিবারণ।

মনটা ভারী হইয়া উঠিয়াছে নিবারণের। ছেলের চাকরীতে উন্নতি হইয়াছে, অথচ তাহাকে একবার মুখে জানায় নাই, তার জন্য নয়! ছেলে যে তাহার একেবারে পর হইয়া গিয়াছে, তাহাকে 'বাবা' বলিয়া সম্মান করা দূরে থাক, আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মান বোধ করে, তাহা সে জানে। তবু নিরাশ্রয়, নিরুপায় ব্যক্তি যেমন আশ্রয়-দাতার করুণাদত্ত কদর্য্য আহার মুখ বুজিয়া গ্রহণ করে, নিবারণও এত দিন পুত্র ও পুত্রবধূর অবহেলা নীরবে সহ্য করিয়াছে। অক্ষম বার্দ্ধক্যের এই স্থির নিশ্চিত আশ্রয় ছাড়িয়া আর কোথাও যাইবার কল্পনা পর্য্যন্ত করে নাই। আর যাই হোক, কুকুর-বিড়ালের মত রাস্তায় ঘাটে মরিতে হইবে না, তাহার মত লোকের পক্ষে ইহাই কি কম প্রাপ্তি! কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সেই আশ্রয় তাহার ঘুচিবে, স্রোতের তৃণের মত এঘাট-ওঘাট করিয়া শেষের দিনগুলা কাটাইতে হইবে—এই চিন্তা তাহার চক্ষে রবিকরোজ্জ্বল শীত-পূর্ব্বাহ্ণকে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে পাংশু সায়াহ্ন ঘনাইয়া তুলিল!

৫

বাড়ীতে ফিরিয়া নিবারণ দেখিল—হৈ-হৈ পড়িয়া গিয়াছে।

অনেক লোক মিলিয়া সামনের বাগানে সামিয়ানা টাঙ্গাইতেছে, কতকগুলা বেঞ্চি, চেয়ার, টেবিল আনিয়া জড়ো করা হইয়াছে—আরও গরুর গাড়ীতে করিয়া আসিতেছে। দুই জন লোক সামনের জায়গাটা পরিষ্কার করিতেছে। এক জন বেঁটে, মোটা ভদ্রলোক—মাথায় বব-করা লম্বা লম্বা চুল, গায়ে লম্বা কোট, পায়ে মোজা ও বুট জুতা—পাণ চিবাইতে চিবাইতে এখানে-সেখানে ছুটাছুটি ও হাঁক-ডাক করিয়া তদারক করিয়া বেড়াইতেছে। নিবারণকে দেখিয়া লোকটা ঘাড় বাঁকাইয়া পাণের-ছোপ-লাগা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া যুক্ত হস্ত বুকে রাখিয়া কহিল—"ভাল আছেন বেশ?'

নিবারণ চিনে ইহাকে; হামেসা এ-বাড়ীতে তাহার যাওয়া-আসা; তাহার ছেলের খুব অনুগত, অন্তরঙ্গ; অন্দরের মধ্যেও প্রবেশাধিকার আছে তাহার। নিবারণ লাঠিতে ভর দিয়া বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"চলে যাচ্ছে এক রকম—ভাল আছ বাবা?"

'হে-হে' করিয়া বিনীত হাস্য করিল ভদ্রলোক—জানাইল, নিবারণের আশীর্ব্বাদে ভাল আছে সে; কহিল—"বাড়ীতে আপনার বিরাট ব্যাপার আজ। আপনার কি বাইরে বাইরে ঘুরলে চলে? যান, বারান্দায় সব বসে রয়েছেন।"

নিবারণ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"তোমরা রয়েছ পাঁচ জন—জোয়ান ছেলে সব—আমরা, বুড়োরা কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব।"

ভদ্রলোক আপ্যায়িত হইয়া কহিল—"সে তো রয়েছিই—তাহলেও ছেলেমানুষ তো আমরা, আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেও অনেক কাজ।"

নিবারণ কহিল—"তা বটে, তা'বটে!" তার পর খ্যাংচাইয়া খ্যাংচাইয়া চলিতে সুরু করিল।

বারান্দায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। নিবারণের ছেলের বন্ধু-বান্ধব, সহকর্ম্মী, অনুগ্রহ-প্রার্থীর দল। দু'টা ঝকঝকে নূতন মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে বারান্দার সামনে। এ্যাডভোকেট সাহেবকে ঘিরিয়া বসিয়া সকলে গল্প করিতেছে। তাহাদের আলাপ, আলোচনা ও হাসির শব্দ নিবারণের কাণে আসিল। বৈবাহিক-সম্ভাষণের মত মানসিক অবস্থা নিবারণের ছিল না। নিজের অন্ধকার ঘরটিতে মলিন বিছানায় শুইয়া এই আসন্ন অবস্থা-বিপর্য্যয়ের গভীরতা ও ব্যাপকতাকে তলাইয়া বুঝিবার জন্য তাহার মন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাছাড়া বৈবাহিকের উপর তাহার অন্তর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কেমন করিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছিল—এই লোকটি ও ইহার কন্যা দুই জনে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে আশ্রয়হীন করিতেছে!

থমকিয়া দাঁড়াইল নিবারণ। পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিতে পাইল—সেই বেঁটে, মোটা লোকটি হন-হন করিয়া আসিতেছে। যাওয়া ছাড়া নিবারণ গত্যন্তর দেখিল না! লোকটি কাছে আসিয়া কহিল, "চলতে কষ্ট হচ্ছে না কি! বাতের বেদনা চাগাড় দেছে বুঝি? শীতকাল কি না! আসুন আমার সঙ্গে।" বলিয়া তাহার ডান হাতটা বগল-দাবা করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

নিবারণ হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"ছেড়ে দাও, বাবা! আমি আপনিই যেতে পারব।"

লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইয়া নিবারণের দিকে ড্যাব-ড্যাব করিয়া তাকাইয়া কহিল—"পারবেন! তাহলে আসুন—আমি চলি, জরুরী কাজ আমার।" বলিয়া হন-হন করিয়া আবার চলিতে সুরু করিল!

নিবারণ বারান্দার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। এ্যাডভোকেট সাহেবের সঙ্গে গল্প-গুজবে সকলে মশগুল হইয়া গিয়াছে। ইঁহাকে অনেক দিন পরে দেখিল নিবারণ। পাতলা লম্বা চেহারা, মুখের গড়নও লম্বাটে! বেশ ধারালো চিবুক, খাড়া নাক, গোঁফ-দাড়ি পরিষ্কার করিয়া চাঁছা, ধবধবে ফর্সা রং, মাথার সামনের চুল উঠিয়া গিয়া টাক পড়িয়াছে! চোখে সোনার ফ্রেমওয়ালা চশমা—পরিধানে পাঁশুটে রংএর ফ্ল্যানেলের ঢিলা-হাতা পাঞ্জাবী ও পায়জামা। একটা ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত হইয়া দামী মোটা চুরুট টানিতে টানিতে গল্প করিতেছেন।

ভারী গলায় গল্প করিতেছেন এ্যাডভোকেট সাহেব; মাঝে মাঝে চুরুট টানিতেছেন। কখনও তাঁহার কপালে ও ভ্রূযুগলের মাঝখানে কুঞ্চন-রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে, কখনও ওষ্ঠের দুই প্রান্ত মৃদু হাস্যে ঈষৎ প্রসারিত হইতেছে: কখনও তিনি দুই চক্ষের দুটি

তীব্র করিয়া কোন শ্রোতার দিকে একাগ্র করিতেছেন ; কখনও বা ভারী গলায় হাসিয়া উঠিতেছেন। শ্রোতারা তাঁহার বাক্য-সুধাধারা পান করিয়া বিগলিত-চিত্ত হইয়া উঠিতেছে। নিবারণ-পুত্র নীরদ এক পাশে একটা চেয়ারে কীর্ত্তিমান্ শ্বশুরের গৌরবে মুখ বিস্ফারিত করিয়া বসিয়া আছে।

নিবারণকে কেহ লক্ষ্য করিল না। করিলেও তাহাকে আহ্বান করিয়া বসানো আবশ্যক মনে করিল না। এ্যাডভোকেট সাহেব গল্প করিতে করিতে একবার তাহার দিকে তাকাইতেই নিবারণ ব লয়া উঠিল—"এই যে! চিনতে পারেন বেয়াই? কিন্তু কথাটা শেষ করিতে না করিতেই এ্যাডভোকেট সাহেব মুখ ফিরাইয়া লইলেন। নিবারণ লজ্জায় মুখ কাঁচুমাচু করিল। নিবারণের কণ্ঠস্বর শুনিয়া অন্ত সকলে মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া মৃদু হাস্তে ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। নিবারণের ছেলেও কটাক্ষে নিবারণকে দেখিয়া ঈষৎ ভ্রুকুটি করিল। শুধু মুসলমান চাপরাশি করিম কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি বসবেন কি? কুরসী এনে দেব?"

নিবারণ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"থাক বাবা, থাক—আমি এখনই চলে যাচ্ছি।"

নিজের ঘরে গিয়া নিবারণ অবাক্ হইয়া গেল। ঘরটা ঝক্‌ঝক্, তক্‌তক্ করিতেছে। বহু দিন-সঞ্চিত ধূলি ও আবর্জ্জনারাশির চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। এমন কি, তাহার নিজের জিনিষ-পত্র, তোরঙ্গ, কাপড়-চোপড়, খাট বিছানা পর্য্যন্ত অন্তর্ধান করিয়াছে। ঘাবড়াইয়া গেল নিবারণ। ইহারা কি আজই তাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে না কি! বাড়ীর এক পাশে বাহিরের লোকের মত মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে—তাহাও ইহাদের সহ্য হইতেছে না! দু'দিন পরে সে তো আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। এমন করিয়া তাড়াইবার কি প্রয়োজন? জিনিষ-পত্রগুলা কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে, কে জানে!

এক জন লোক ঘরে ঢুকিল; সঙ্গে বাড়ীর এক জন চাকর—হাতে এক-বালতি জল ও একটা ঝাঁটা। লোকটার পোষাক-পরিচ্ছদ ভদ্র গোছের—পরনে পরিষ্কার ধুতি—কোঁচাটি দুপাট করিয়া কোমরে গোঁজা। গায়ে জুট-ফ্লানেলের তৈয়ারী ফতুয়া। নিবারণের সম্পূর্ণ অপরিচিত সে। নিবারণের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া লোকটা আদেশের স্বরে চাকরটাকে কহিল—"বেশ করে ঘরটা ধো। কোথাও যেন ময়লা না থাকে!" ছাদের দিকে তাকাইয়া কহিল—"ঝুলগুলো পরিষ্কার করেনি, দেখছি। দাঁড়া একটু তাহলে—ধুসুনি এখন—ঝুলগুলো পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা করি আগে।" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে হইতে কহিল—"এ ঘরে যে মনিষ্যি বাস করতো, তা কে বলবে! আমাদের কুকুরের ঘরও এর চেয়ে পরিষ্কার।"

নিবারণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়াছিল কতক্ষণ। লোকটা যাইতেই চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করিল—"লোকটি কে রে?"

চাকরটা এক গাল হাসিয়া কহিল, "জানেন না, না কি? সরকার মশায়—দাদু সাহেবের খাস চাকর। পনেরো টাকা করে মাইনে। কাপড়-জামা দেখলেন—আপনার চেয়েও ভাল, ভারী মেজাজী লোক! ক্ষান্ত বলছিল—কলকাতার বাড়ীর সবাই ওকে মান্তি করে।" বলিয়া, ডান হাতটা পাতিয়া কহিল—"একটা বিড়ি দেন দিকি, আর দেয়াশালাই—না আসতে আসতে টেনে নিই একবার।"

নিবারণ বিড়ি ও দেশলাই দিয়া কহিল—"আমার জিনিষ-পত্রগুলো কোথায় রেখেছিস্?

লোকটা বিড়িটা ধরাইয়া, টান দিয়া, বিড়ি-শুদ্ধ হাতটা বাড়াইয়া কহিল—"হৈ যে—হৈখানে—মোটরগাড়ীর ঘরে সব জড়ো করে দিয়েছি।"

নিবারণ সঙ্কোচে কহিল—"আমাকে কি ওখানেই থাকতে হবে না কি?"

চাকরটা আশ্বাস দিয়া কহিল—"আজকের রাতটি শুধু। খাওয়ান-দাওয়ান হবে কি না বাড়ীতে! জজ ম্যাজিষ্টর বড় বড় লোক সব খেতে আসবে। দাদু সাহেব খাওয়াচ্ছেন যে! এই ঘরটায় ভাঁড়ার হবে।" চাকরটা মুখে বিস্ময়সূচক ভঙ্গী করিয়া কহিল—"ওঃ! কত রকমের খাবার জিনিষ যে এসেছে—দেখলে নোলা সপ্ সপ্ করবে আপনার।" চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"সবাই খেতে পাবে—কেউ বাদ যাবে না।"

এ-কথা শুনিয়া রাগ হইবার কথা! এক জন সামান্ত চাকর ঘাড়ে হাত দিয়া সম-পর্য্যায়ের লোকের মত শ্রদ্ধাহীন, সঙ্কোচহীন ব্যবহার করিতেছে—গৃহস্বামীর পরম পূজনীয় পিতৃদেবের ইহা সহ্য করিবার কথা নয়, তবু নিবারণের বিন্দুমাত্র ভাব বিপর্যয় দেখা গেল না। ক্ষীণ হাসিয়া কহিল—"বেশ তো! খাবি সব আজ পেট ভরে। আর কোন্ দিনই বা না খাস্! আমার বাড়ীতে কি ভাল খাওয়ার অভাব।" বলিয়া স্থান-ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেই সরকার মশায় আসিয়া হাজির হইল, সঙ্গে এক জন লোক, হাতে একটা লম্বা সরু বাঁশ,—বাঁশটার মাথায় কতকটা শন্ বাঁধা। সরকার কহিল—"বেশ করে পরিষ্কার কর,—এক ফোঁটা ঝুল যেন না থাকে!" নিবারণকে কহিল—"আপনি সরে যান দেখি—এরা ঘরটা পরিষ্কার করুক!"

নিবারণ চলিয়া আসিল। বাড়ীর কম্পাউণ্ডের একপাশে মোটরের ঘর—টিনের ছাউনী—টিনেরই বড় দরজা। নিবারণ উঁকি মারিয়া দেখিল, ঘরের এক কোণে তাহার বাক্স-বিছানা-কাপড়-চোপড় গাদা করা আছে। খাটটি নাই—কাজেই শয়নের আশা ত্যাগ করিতে হইল নিবারণকে। শুধু এখনকার মত নয়, আজিকার রাত্রির মতই। সারা শীতের রাত্রি হয়তো মোটরটার পাশে বাক্স-বিছানার স্তূপের উপর বসিয়া কাটাইয়া দিতে হইবে তাহাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমলা দেবী

সমাপ্তি

কথা যবে যায় থেমে—গানখানি মর্ম্মে গিয়া পশে;
প্রিয়া যবে স'রে যায় দূরে—জলে প্রেম স্মৃতির নিকষে।
সূর্য্য যবে অস্তমিত হয়—ভুবন ভরিয়া উঠে লালে;
চুমা যবে ঝরে পড়ে যায়—আবীর ছড়ায়ে যায় গালে!

ফুল যবে হয় বৃন্তচ্যুত—লুটে গিয়া দেবতার পায়ে;
স্বর্গভ্রষ্ট হয় যবে আলো—পড়ে এসে ধরণীর গায়ে।
কবি যবে শেষ করে গান—জগৎ বরিয়া লয় তারে;
পুরুষ কামনা শেষ হলে—রমণীরে পায় একেবারে!

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম

কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ভগবদ্‌গীতায় তাহা লিপিবদ্ধ আছে। সে উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ একটি কথা বলিয়াছিলেন—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

অর্থাৎ জন্ম হইলেই জীবের মৃত্যু হইবে, ইহা নিশ্চিত—আবার মৃত্যু হইলেই তাহার আবার জন্ম হইবে, ইহাও নিশ্চিত। অতএব নিশ্চিত বিষয়ে শোক করা বিচারবুদ্ধি-সম্মত নয়।

অর্জ্জুন তাঁহার উপদেশে নির্ব্বেদ পরিহার পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু সপ্তরথীর কাপুরুষোচিত সংগ্রামে নিহত হইয়াছিলেন, তখন অর্জ্জুনের অপরিহার্য্যার্থে শোক করা সুবুদ্ধিসম্মত নয়—এ কথা স্মরণ ছিল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে তিনি অকারণ কটু কথা বলিয়াছিলেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও অকারণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সহসা শান্ত করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাই বৈষ্ণবী মায়া! এই মায়ায় সমস্ত জগৎ সম্মোহিত। গৃহযুদ্ধে এবং মহামারীতে প্রভাস তীর্থে প্রায় ৫৬ কোটি যদুবংশীয় ব্যক্তি ধ্বংস পাইলে এই শ্রীকৃষ্ণই মোহগ্রস্ত হইয়া এক নিম্ববৃক্ষোপরি বসিয়াছিলেন! এক ব্যাধ আসিয়া তাঁহাকে পক্ষি ভ্রমে অলক্ষ্যে শরবিদ্ধ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বজন্মের বালিবধ কৃত পাপের হিসাব-নিকাশ এইখানেই হইয়া গিয়াছিল। কারণ, এ জগতে যে যেমন মানুষই হউক না কেন, তাহাকে ইহজন্মে বা পরজন্মে তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হইবে।

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।

ভোগ না হইলে শতকোটি কল্পকালেও কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এক কথায় জন্মান্তর হইলেও প্রাক্তন কর্ম্মফল এড়াইবার উপায় নাই।

পাতঞ্জল দর্শন বলিতেছেন—

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ। ২।১৩, অর্থাৎ জীবের জাতির ভোগ জন্ম মৃত্যু, এই তিনের মূলে রহিয়াছে কর্ম্মবিপাক বা কর্ম্মের পরিণাম ফল। আমাদের দেশে মেয়েলী কথায় বলে,

জন্ম মৃত্যু বিয়ে
বিধাতাকে নিয়ে।

অর্থাৎ মানুষের জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ (সংসারভোগ) বিধাতার বিধান-মতে হইয়া থাকে।—মানুষের ইচ্ছায় তাহা হয় না। ইহা ঐ পাতঞ্জল-দর্শনের উক্তিরই প্রতিধ্বনি।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তির প্রথম অংশ—জন্মিলে মরিতে হইবে, এ কথা কেহ অস্বীকার করে না। ধরাতলে সকল মানুষই অবনত মস্তকে ইহার সত্যতা স্বীকার করে। কারণ, উহা নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু ঐ বচনের শেষে তিনি বলিয়াছেন, মরিলে আবার জন্মিতে হইবে,—এ-কথা সকলে স্বীকার করেন না।

সুখ-দুঃখের মীমাংসা-স্থলে স্বীকৃত অনুমান হিসাবে জন্মান্তর-বাদ—মানুষের সামাজিক এবং প্রকৃতিগত প্রভেদের অতি সুন্দর সমাধান করে। হিন্দুদিগের ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে দ্বিবিধ প্রমাণ—যথা শব্দ (আপ্তবাক্য) এবং অনুমান; ইহার অনুকূল প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ বিষয়ে প্রায় নীরব! কোন কোন মতে প্রত্যক্ষও ইহার অনুকূল। কারণ, সংসারে চিরকাল এবং চিরদিনই জাতিস্মর জন্মায়। হিন্দুর দর্শন-শাস্ত্র পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করিয়া হইয়াছে। সাংখ্যকার বলেন, জীবাত্মা যখন প্রকৃতির সকল গুহ্য রহস্য জানিতে পারেন অর্থাৎ যখন তাহার প্রকৃত জ্ঞান হয়, তখন আর তাঁহার জন্ম হয় না। বেদান্তেও ঐ কথা। গীতাও বলিয়াছেন, জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত আর সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে। সুতরাং জ্ঞানাগ্নি প্রদীপ্তমনা ব্যক্তির আর জন্ম হয় না।

এখন জিজ্ঞাস্য, পুনর্জ্জন্ম প্রত্যক্ষ বিষয় কি না! সাক্ষাৎ ভাবে পুনর্জন্ম প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, আত্মা আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে। তবে মনুষ্য-সমাজে মধ্যে মধ্যে জাতিস্মর জন্মায়। ইহারা পূর্ব্বজন্মের কথা কতকটা স্মরণ করিতে পারেন। এইরূপ জাতিস্মরের কথা সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়। কিছু কাল পূর্ব্বে পায়োনিয়ার পত্রে জনৈক ইংরেজ লিখিয়াছিলেন—যুক্তপ্রদেশের মিরাট অঞ্চলে একটি বালিকার জন্ম হয়। তাহার বাকস্ফূর্ত্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বলিল, আমার বাড়ী অমুক গ্রামে আমার ছেলে আছে, বৌ আছে ইত্যাদি। তাহার জনক-জননী ঐ কথা প্রথমে গ্রাহ্য করিলেন না। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে সেই গ্রামে যাইতে চায়। তাহার পিতা মাতা তাহাকে সেই গ্রামে লইয়া যান। কতক রেলে কতক গাড়ীতে সেই গ্রামে যাইতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার পিতা মাতা—কেহ কখনও সে গ্রামে যান নাই। বালিকাটি দূর হইতে বলে, আমাদের বাড়ী ঐ দিকে। ক্রমে তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিলে সে একটি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয় এবং বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জনৈক মহিলাকে দেখিয়া বলে, "ও বৌ কেমন আছিস্?" মহিলাটি অবাক! ক্রমে সে ঐ বাড়ীর সকলের নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকে। শেষে বলে, "অমুক ঘরের উনানের পাশে আমার টাকা পোতা ছিল, তোরা পেয়েছিস্?" উনানের পাশ খুঁড়িয়া দেখা গেল, টাকা নাই। পরে সকলের মনে হইল যে, উনানটা সরাইয়া পাতা হইয়াছে; এবং মেঝেটি মাটী দিয়া উঁচু করা হইয়াছে। শেষে নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিলে টাকা পাওয়া গেল এবং সে যত টাকা বলিয়াছিল, ঠিক তত টাকাই সেইখানে পোতা ছিল। আমার এক বন্ধুর একটি কন্যা প্রায়ই খোনামুখী খোনামুখী বলিত! তাহার পূর্ব্বজন্মে নাম ছিল 'ভুবনী'; সে পুড়িয়া মরিয়াছিল। বালিকাটি অল্প বয়সে মারা যায়! সুতরাং এ বিষয়ে কেহ অনুসন্ধান করেন নাই। অনুসন্ধান করিলে অনেকে তাহা জানিতে পারিবেন। যাঁহারা উচ্চস্তরের মানুষ বা অবতার, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

হে অর্জ্জুন, আমার এবং তোমার বহু বার জন্ম হইয়াছে, আমার সে সকল কথা মনে আছে কিন্তু তুমি যোগমায়ায় আচ্ছন্ন বলিয়া তাহা ভুলিয়া গিয়াছ। বুদ্ধদেব তাঁহার পূর্ব্বজন্মের অনেক কথা

বলিয়া গিয়াছেন। জাতকগ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ আছে। শুকদেব, শঙ্করাচার্য্য, রামচন্দ্র, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি মহাত্মারা জাতিস্মর ছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিতে পারিতেন। ইহজন্মে চেষ্টা করিলে মানুষ পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে। হিপ্‌নটিজ্‌ম্ বা মায়ানিদ্রা দ্বারা বর্ত্তমান জন্মের স্মৃতি অপসারিত হইলে অনেকের পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ হয়। অধ্যাপক ল্যাঙ্গেলিন নামক জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ঐ সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষাসিদ্ধ ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্মৃতিকে পিছাইয়া লইয়া গেলে অনেকে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে। অধ্যাপক উইলিয়ম ম্যাকডুগাল তাঁহার An Outline of Abnormal Psychology নামক গ্রন্থে এইরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

ইহাতে বলা হইয়াছে, যাদুকৌশলে ঘুম পাড়াইয়া বর্ত্তমান জন্মের সংস্কার লুপ্ত করা যায়; তখন পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। ইহা ঠিক জাতিস্মরের কথা নয়। জাতিস্মরদিগের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি যাদুবিদ্যার দ্বারা মোহ-নিদ্রা ঘটাইয়া জাগাইয়া তুলিতে হয় না। তাহা আপনিই জাগিয়া থাকে। ভারতে এক জন সিভিলিয়ানের মনে হইত যে, পূর্ব্বজন্মে তিনি ফরাসী-বিপ্লবে জড়িত ছিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। অনেক জাতিস্মরের বৃত্তান্ত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিশেষ সাবধানতার সহিত পরীক্ষিত হইবার পর তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও অনেকে পুনর্জ্জন্মবাদ অগ্রাহ্য করেন না। ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাক্সলী তাঁহার Evolution and Ethics নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে—"হঠকারী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই জন্মান্তরবাদকে একেবারে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবে না।" অধ্যাপক লুটোনস্কি পূর্ব্বে এক জন গোঁড়া জড়বাদী ছিলেন। ক্রমে তিনি অভিজ্ঞতার দ্বারা অধ্যাত্মবাদে আস্থাবান্ হন। তিনি বলিয়াছেন—"জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস অটল।" বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গেটে একবার বলিয়াছিলেন,—"হাজার জন্ম ঘুরিয়াছি আরও হাজার বার জন্মিতে হইবে।" হুইফি, স্যর অলিভার লজ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ জন্মান্তরবাদে, সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক ভাবে বিশ্বাসী।

পাশ্চাত্ত্য খণ্ডের বুধগণ যে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে চাহেন না, তাহার একটি কারণ, খৃষ্টধর্ম্ম জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে না। খৃষ্টধর্ম্মমতে জগদীশ্বর প্রত্যেক মানবাত্মাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা পুনর্জন্মের বিরুদ্ধে একটি বড় যুক্তি দেখান। তাঁহারা বলেন, যখন পরজন্মে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি কিছুই থাকে না, তখন পূর্ব্বজন্মের আমি আর পরজন্মের আমির মধ্যে অভেদ স্থাপিত করা যায় কি প্রকারে? স্মৃতি না থাকিলে পূর্ব্বজন্মে যে ব্যক্তি রাম ছিল পরজন্মে সে-ই যে গোবিন্দ হইয়া জন্মিয়াছে তাহা স্বীকার করা যায় কি করিয়া? আপাতবুদ্ধিতে এই যুক্তি সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে এ যুক্তি যে অসার, তাহা বুঝা যায়। পাঁচ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেকার বাল্যস্মৃতি সাধারণ মানুষ যৌবন-অবস্থায় ভুলিয়া যায়। প্রৌঢ় অবস্থায় তাহার কিছুই আর প্রায় মনে থাকে না। কিন্তু তাহা হইলেও সেই শিশু আর সেই প্রৌঢ় যে এক ব্যক্তি ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্মৃতিকেই ব্যক্তিগত অভিন্নতা-স্থাপনের একমাত্র কারণ বলা চলে না। রোগ-বিশেষে মানুষ যা-তা বকে এবং উন্মাদ রোগে মানুষ যাহা করে, সুস্থ হইলে তাহার কিছুই তাহাদের স্মরণ হয় না। নিদ্রিত অবস্থায় জাগ্রত অবস্থার কথা প্রায় স্মরণ করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া একই নিদ্রিত এবং জাগ্রত ব্যক্তির অভিন্নতা সম্বন্ধে কি কেহ সন্দেহ করেন? স্বপ্ন-সঞ্চরণ (Somnambulism) রোগে মানুষ অনেক দুরূহ অঙ্ক কষে এবং অনেক কাজ করে, কিন্তু জাগিলে তাহার আর সে-সব কিছুই মনে থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় সকল সময় আমরা যাহা ভাবি এবং যাহা করি, তাহার সমস্তই কি আমাদের মনে থাকে? অশীতিপর বৃদ্ধ ব্যক্তি কি তাঁহার সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে যাহা করিয়াছিলেন তাহা মনে করিতে পারেন? সকলের স্মৃতি-শক্তিও সমান প্রখর নয়। একই জন্মে স্মৃতির যখন এত গোল ঘটে, তখন স্মৃতি থাকে না বলিয়া জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করা কখন সঙ্গত হইতে পারে না।

দিবালোকে নক্ষত্রগুলি আকাশে বিরাজ করিলেও যেমন উহা দেখা যায় না, সেইরূপ ইহজন্মের স্মৃতির প্রখরতায় পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি যেন লোপ পায়! কিন্তু প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তেজ রাহুগ্রস্ত হইলে সেই নক্ষত্রগুলি দেখা যায়। 'মৃত্যুর পর মস্তিষ্কের কার্য্য বন্ধ হইলে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া ওঠে। ইহার প্রমাণ আছে। হিপনাটিজম্ দ্বারা মস্তিষ্কের কার্য্য কতকটা স্তব্ধ করিলে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া ওঠে। পরীক্ষায় দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে। পরীক্ষাসিদ্ধ তথ্য অস্বীকার করিলে সত্যসন্ধ সন্ধানের মনোভাব প্রকাশ পায় না। সত্যকে স্বীকার করাই বৈজ্ঞানিকের কর্ত্তব্য।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই বিস্মৃতি-বিজড়িত জন্মান্তর মানুষের কাম্য কি না? এ বিষয়ে জে বি এস হলডেনের মত উদ্ধৃত করিব। ইঁহার মনের ঝোঁক জড়বাদের দিকে। ইনি বলিয়াছেন, আমি ইহা অবশ্য বলিব যে বিস্মৃতি-জড়িত অনন্ত জীবনের দিকে আমার আকর্ষণ বেশী নাই। কিন্তু যদি একেবারে ধ্বংস এবং সম্পূর্ণ স্মৃতিহীন স্থিতি—উভয়ের মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণীয় তাহা আমাকে বাছিয়া লইতে দেওয়া হয়, তবে আমি স্মৃতিহীন অনন্ত জীবনই চাহিব। আমার মনে হয় সাধারণে ধ্বংস অপেক্ষা স্মৃতিহীন অনন্ত জীবনই চায়। সেইজন্য মনে হয় দেহাত্মবাদ অপেক্ষা অমর আত্মা লোকের স্পৃহণীয়। যদি কেহ নিজের ব্যক্তিত্বের কিছু মূল্য আছে বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে অনন্ত কালে সে তাহার জীবনে পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে (১)।

হিন্দুরাও বলেন, জন্মান্তরের কথা জীব চিরদিনের জন্য বিস্মৃত হয় না। নিদ্রিত হইলে জীবের যেমন জাগ্রত অবস্থার স্মৃতি মনে থাকে না, জাগ্রত হইলে লোকের নিদ্রিত অবস্থার স্মৃতি যেমন লোপ পায়, সেইরূপ জন্মগ্রহণ করিবার পর জীবের পূর্ব্বাবস্থার স্মৃতি লোপ পায়। কেহ কেহ বলেন, অতি-শৈশবে মানুষের পূর্ব্বজন্মের ক্ষীণ স্মৃতি থাকে; বয়স বৃদ্ধি হইলে তাহা লুপ্ত হয়। নিদ্রার পর মানুষের যেমন জাগ্রত জীবনের স্মৃতি ফিরিয়া আসে, মৃত্যুর পর সেইরূপ তাহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ফিরিয়া আসে। মানুষ এক-জন্মে জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। সেই জন্য তাহাকে বারবার জন্মিতে

(১) Fact and Faith. pp. 62-65.

হয়। কিন্তু দার্শনিকেরা স্পষ্টই বলিয়াছেন, এক জন অভিনেতা যেমন বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সাজিয়া মঞ্চে অবতীর্ণ হয়, সেইরূপ পুরুষ (জীবাত্মা) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি-রূপে জন্মিয়া নিজ পুরুষার্থ সাধন করে। কর্ম্মক্ষয়ে তাহাকে আর জীবলোকে আসিতে হয় না (২)। এক কথায় মানুষ পূর্ণত্ব লাভ না করিলে তাহাকে বার-বার জন্মিতে হয়। সুতরাং পাশ্চাত্য বুধগণ জন্মান্তর সম্বন্ধে যে আপত্তি তোলেন তাহা প্রকৃত জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে।

পাশ্চাত্য জড়বাদীরা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, "১২টি আদি ভূতের (elements) ওড়ন-পাড়নের ফলে এমন একটা অবস্থা হয় যাহাতে চৈতন্য-শক্তি ফুটিয়া ওঠে। চৈতন্য জড়েরই গুণ অর্থাৎ জড়-জাত। উহা যে-জড়দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহার বিনাশ হইলেই ইহা নাশ হয়।" অর্থাৎ বিদেহ আত্মা বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। জড় হইতে চৈতন্যের অভ্যুদয় কি করিয়া হইল, বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং চৈতন্য যে স্বতন্ত্র সত্তা নয়,—এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।

জড়-বিজ্ঞান জীবাত্মার স্থায়ী সত্তা স্বীকার করে না। উহা মানুষের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়। সুতরাং উহা জড়বাদীদিগের পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার মধ্যে আসে না। কিন্তু মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় যে অতি সঙ্কীর্ণ তাহা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। অনেক তির্য্যক্ প্রাণীর স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মানুষের ইন্দ্রিয় নিস্তেজ। শকুনি চিল প্রভৃতির চক্ষুর দূর-দৃষ্টি যত অধিক, মানুষের স্বাভাবিক চক্ষুর দূরদৃষ্টি তত অধিক নয়। উলূক, ছারপোকা, সর্প প্রভৃতি দিবা-ভীত জীবগণ অন্ধকারে যেরূপ দেখিতে পায়, মানুষ তেমন পায় না। সুতরাং মানবের এই সকল সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয় জীবাত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া জীবাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা প্রগলভতা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, সর্ব্বযুগের সর্ব্বদেশের সর্ব্বস্তরের লোক প্রেতাত্মা দর্শন সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দেয়, তাহাকেও অস্বীকার করা যায় না। উহাকে অলীক দর্শন বা ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া বা চিন্তা-সংক্রমণ (telepathy) নামক গোঁজামিলের সঙ্কেত চাপাইয়া নিষ্কৃতি পাওয়া সঙ্গত নয়। বিলাতের লর্ড ক্রুম, অধ্যাপক রোমানিস্, জন এডিংটন সাইমণ্ডস, মিঃ এনড্রু লেশ প্রভৃতিও বলিয়াছেন যে তাঁহারা উহা দেখিয়াছেন। অতএব উহাকে অতি-বিশ্বাসী মূর্খের উক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ইহাকে মিথ্যা বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। পরন্তু তিনি উহাকে সামাজিক অভিব্যক্তির প্রবল গতি-নির্দ্ধারক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহার জন্যই জন-সমাজে ভবিষ্যৎ জীবন, ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রভৃতির সত্তা ও গতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সামাজিক জীবনের উপর যাহার এরূপ প্রভাব তাহা একেবারে মিথ্যা, উৎকট কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কাহারও কাহারও প্রকৃত প্রেতাত্মা-দর্শন ঘটে, ইহা সত্য। অনেক সময় প্রেতাত্মার মুখে অনেক অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ পায়। সাইকিকাল রিশার্চ সোসাইটির কার্য্য-বিবরণে তাহা লিপিবদ্ধ আছে। জীবিত ব্যক্তির আত্মার দর্শন সময় সময় মিলে বলিয়া উহাকে মিথ্যা বলা যায় না। সুতরাং বিজ্ঞানের বিষয়-বহির্ভূত বলিয়া জীবাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা সঙ্গত নয়।

পাশ্চাত্য-খণ্ডের অনেক যুক্তিবাদী জন্মান্তর স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, যে-সকল মানুষ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা আবার নিজ জীবনকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। মনে করুন, কোন লোক কিশোর বয়সে বা যৌবনের প্রারম্ভে বিপাকে পড়িয়া কালগ্রাসে পতিত হইল; সে তাহার জীবনের কোন আশাই চরিতার্থ করিতে পারিল না। এরূপ অবস্থায় কি তাহার মানব-জীবনের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে? যুক্তিসঙ্গত বিচার-বুদ্ধিতে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া তাহার জীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইবে। এই মতটি খৃষ্টীয় এক-জন্মবাদের সহিত যুক্তিসঙ্গত পুনর্জন্ম-বাদের একটা আপোষ বা রফা বন্দোবস্ত বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহারা একটা কথা ভুলিয়া যান যে, এক-জন্মেই মনুষ্যজীবন এই মর্ত্ত্যলোকের সর্ব্ববিধ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়া জীবাত্মাকে বহুবিধ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়। সর্ব্ববিধ অভিজ্ঞতা হইতেই মানব-জন্মের পূর্ণ সার্থকতা ঘটে। সেই জন্যই পুনর্জন্ম স্বীকার করিতে হয়।

পাতঞ্জল দর্শন বলিতেছেন—

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্।

সংস্কারের সাক্ষাৎ হইলে মানুষের পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়। মানুষ যতক্ষণ আপনাকে সংস্কারের সমষ্টি মনে করে, অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার কেবলমাত্র দেহাত্মবোধ থাকে—তাহার ইহজন্ম-জাত সংস্কার বা ধারণাকে সে পৃথক করিয়া দেখিতে পারে না,—অর্থাৎ আপনাকে সংস্কার হইতে পৃথক মনে করিতে পারে না,—ততক্ষণ তাহার সংস্কার-সাক্ষাৎকার হয় না, সে আপনাকে সংস্কার হইতে পৃথক সত্তা মনে করিতে পারে না। সংস্কার-জ্ঞান হইলে সে জাতিস্মর হয়। সেইরূপ অনেক সাধক জাতিস্মর হইয়াছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্কে মগ্ন চৈতন্যের ভিতর সুপ্ত থাকে। যেমন ভাসমান তুষার-গিরির কতকটা জলের উপর,—কিন্তু অনেকটা জলের মধ্যে থাকে। উপরের অংশ কাটিয়া ফেলিলে জলের ভিতরকার আবার কতক-অংশ জাগিয়া ওঠে। হিপনটিজম দ্বারা বা যোগদ্বারা এই বর্ত্তমান সম্বিতের বিলোপ করিলেই পূর্ব্বজন্মের সংস্কার মানুষের মনে উদিত হয়। ইহা আর্য্য ঋষিদের কথা। আধুনিক পাশ্চাত্য মনো-বিজ্ঞানও ইহা পরীক্ষা-সিদ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার করে। তবে তাঁহারা সকলে এই মগ্ন সংস্কারকে পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কার বলিয়া স্বীকার করেন না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

(২) ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত সাংখ্য-কারিকা। ৪২

চোর

[গল্প]

আজ তাহারা গরীব ! কিন্তু বিবাহের সময় তাহাদের সংসারে কোনো টানাটানিই ছিল না। সে আর কত দিনের কথা ! বড় জোর এক বছর।

কর্ম্মক্লান্ত সন্ধ্যা। আঁচল-টানা মুখে সন্ধ্যার ভীরু পাদক্ষেপ সারা সহরকে চকিত করিয়াছে। বাড়ীতে বাড়ীতে প্রত্যাগতের আনন্দ—এ যেন হারাধন ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব ! লোকালয়ের অনেক দূরে একটি ঘরে দীপ জ্বলিল। দীপ রাখিয়া বিনীতা শাঁখে ফুঁ দিল।

নিখিল ততক্ষণে আসিয়া সদর দরজায় পা দিয়াছে। শাঁখের আওয়াজ শুনিয়া সে দাঁড়াইল। বিনীতা আজ একটু বেশীক্ষণ ধরিয়াই শাঁখে ফুঁ দিতে লাগিল। নিখিল পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করে নাই। মঙ্গলধ্বনি মিলাইয়া গেলে সে উঠানের দিকে মুখ ফিরাইতে দেখিল, নিখিল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখে সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, 'ওমা, তুমি এসে গেছ ? আমি দেখতেও পাইনি।'

'সে আর পাবে কি করে বলো ! দম ফুরিয়ে যায়নি তো ?'

বিনীতা কথাটা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'ও, শাঁখ-বাজানোর কথা বলছো ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সবতাতেই খোঁটা দেওয়া চাই। কবে কোন্ দিন একটু বেশী শাঁখ বাজিয়ে ফেলেছি, অমনি তুমি······'

'অ হঃ, তা নয়।' নিখিল ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, 'বাঃ, আজ আবার দেখছি অনেকগুলো পিদিম জ্বালিয়েছ ! তোমার আজ কিসের উৎসব, বিনু ?'

বিনীতা নিখিলের একপাশে আসিয়া বলিল, 'কি আর উৎসব ! কিছুই না।'

'তবে এত পিদিম, এত আলো, এত শাঁখের আওয়াজ !'

'যাও, আর অমন করে না। বুঝতেই তো পেরেছ।' বিনীতা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রদীপের অনস্ত শিখাগুলিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। নিখিল তাহা লক্ষ্য করিল। সে বলিল, 'ও তাই জন্যে ? আমার কি সৌভাগ্য !'

বিনীতা নিখিলের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, 'সৌভাগ্য তোমার নয়।'

'তবে কার ?'

'আমার।'

নিখিল বিনীতার পাশে গিয়া উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার ?'

বিনীতা কোন উত্তর দিল না, দাঁড়াইয়া রহিল। পরে নিখিলের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমায় একটা প্রণাম করবো ?'

'আমায় ? কেন ?

'আমার ইচ্ছে হচ্ছে।' বিনীতা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। নিখিল দুই হাত দিয়া বারণ করিতে করিতে বলিল, 'থাক্, বিনীতা।'

বিনীতা ততক্ষণে কাজ সারিয়া লইয়াছে।

নিখিল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার ছবিখানিতে বেলফুলের মালা দেওয়া হইয়াছে। সে আগাইয়া গিয়া ছবিখানিতে দেখিতে যাইতেই তাহার হাতে চন্দনের শীতল স্পর্শ লাগিল। কাচের উপর একটি চন্দনবিন্দুও দেওয়া হইয়াছে। বিনীতা তাহার পাশে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল।

নিখিল বিনীতাকে বলিল, 'এ-সব কি করেছো ?'

'আবার ওই কথা ?'

'না, না, এ-সবের কোন দরকার ছিল না !'

বিনীতা নিখিলের হাতটি ধরিয়া বলিল, 'তোমার দরকার না থাকলেও আমার তো থাকতে পারে।'

নিখিল বিনীতার দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বিনীতা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'তুমি আমার কাছ থেকে এর জন্যে আর কোনো কৈফিয়ৎ চেয়ো না।'

নিখিল কোনো কথা কহিল না।

'আজ তুমি জন্মেছিলে ! বেশ দিন তো !'

নিখিল যেমন চাহিয়াছিল, তেমনি চাহিয়া রহিল।

'অত কি তুমি ভাবছো ?'

'কিছু না।' পরে যেন তাহার কোনো কথা মনে পড়িল। একটু হাসিয়া নিখিল বলিল, 'এই যা, কথায় কথায় সব ভুলে গেছি ! দাঁড়াও, আবার দেখি, কোথায় গেল।'

তার পর পকেট হইতে একটি বাক্স বাহির করিয়া নিখিল বলিল, 'দেখ দিকি কি আশ্চর্য্য ! আমার যা মন ! তোমাকে একটা উপহার দেবো বিনু।'

বিনীতা নিখিলের দিকে তখনও চাহিয়াছিল।

'এই দুল। খুব কম দামী। আমার যা সাধ্য···'

'বাঃ, সুন্দর দুল তো ! ওগো এটা কম দামী নয়, এর চেয়ে দামী আর কিছু নেই।'

'আমি ভেবেছিলুম, তুমি এতে খুশী হবে না। আমি গরীব···'

'ও কথা থাক্ ! তুমি আমার কাণে পরিয়ে দাও লক্ষ্মীটি।' পরে নিখিলের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, 'তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন ? দাও, পরিয়ে দাও। এ তো গরীব বড়লোককে দিচ্ছে না; দিচ্ছে এক জন গরীব স্বামী তার স্ত্রীকে—'

নিখিল বিনীতার কাণে দুল-জোড়া পরাইয়া দিল। তাহার বুক আনন্দে, গর্ব্বে ভরিয়া গেল।

বিনীতা বলিল, 'তুমি আমায় আজ যেটা দিলে, সেটা সাত রাজার ধন এক-মাণিক।'

নিখিল তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, 'তুমি খুশী হয়েছ, বিনু ! আমার যে কি আনন্দ ! আমার খালি ভয় হচ্ছিল, তুমি খুশী হবে না। তাই—'

বিনীতা স্বামীর কাঁধের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, 'আমি খুশী হবো না ? ও কথা আর বলো না। ওগো, এ দুল-জোড়া পৃথিবীতে

আমার সবচেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ। আর একটা জিনিষ যে তোমার কাছ থেকে চাইবো।'

'কি বিনু?'

'তোমার মুখের আশীর্ব্বাদ; তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ করো।'

নিখিল কি করিবে ভাবিয়া পাইল না! সে বিনীতার মাথা বুকে চাপিয়া ধরিয়া ধরা-গলায় বলিল, 'তুমি আমার লক্ষ্মী!'

জীবনের এক পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। তাহাদের অবস্থা বদলাইয়া গিয়াছে; ভালোর দিকে নয়, খারাপের দিকে!

'অত ভাবলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে।'

'না ভেবে কি করি বল?' নিখিল স্ত্রীর দিকে মুখ তুলিল।

বিনীতা মুখ নীচু করিল।

নিখিল বলিয়া চলিল, 'আজ দশ দিন হলো চাকরিটা গেছে। কতই বা মাইনে পেতুম! তাহলেও ওটা আমাদের কাছে অনেক-কিছু ছিল। আমাদের কেন এমন হলো বিনু?'

'কার কখন্ কি হয়, কেউ বলতে পারে? ভগবানের মার···'

'ও-কথা বলো না বিনু; আমার জন্যই তো চাকরিটা গেল। আমি যদি ঝগড়া না করতুম!'

বিনীতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

'সত্যি, আমার বড্ড ভুল হয়ে গেছে।'

গর্ব্বিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বিনীতা বলিল, 'তোমার একটুও ভুল হয়নি। তুমি ন্যায়ের জন্য লড়তে গিয়ে দুঃখকে বরণ করেছ, এতে তোমার কোন ভুল হয়নি। আমি বলছি, তোমার কোনো ভুল হয়নি।'

নিখিল বিনীতার দিকে চোখ তুলিতেই দেখিল, সে চোখে দারিদ্র্যের মালিন্য বা গ্লানি নাই, আছে আলো! সে স্থির হইয়া বলিল, 'কিন্তু এর জন্য তুমি যে বড্ড কষ্ট পাচ্ছ লক্ষ্মী। আমার মন জ্বলে যাচ্ছে!'

বিনীতা স্বামীর বুকে হাত রাখিয়া বলিল, 'আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না। আমার আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, আমার স্বামী কাপুরুষ নয়।'

'বিনীতা···'

'সত্যি বলছি! আমি যদি এর জন্য আরও বেশী কষ্টও পাই, তাহলেও তোমায় দোষ দেবো না। তুমি কি আমায় কষ্ট দিতে পার?'

নিখিল অবাক্ হইয়া গেল! বলিল, 'আমি তোমায় তো সুখে রাখিনি বিনু!'

'আমার এই সুখই চিরজীবন যেন থাকে।' বিনীতার চোখে জল।

নিখিল ধীরে ধীরে গায়ে জামা দিয়া পা বাড়াইল।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'চাকরি খুঁজতে।'

'এখন নয়, খেয়ে দেয়ে তার পর।'

'এ রকম চললে রোজ, আর খেতেও হবে না।'

'তা হ'লেও তুমি এখন বাইরে যেতে পাবে না।'

নিখিল বসিয়া পড়িল।

'কিন্তু খুঁজলে ভাল হতো বিনু।'

'একদফা খুঁজে এসে, একটু বিশ্রাম করে আবার যেয়ো, আমি মানা করবো না। বাইরে বড্ড রোদ্দুর।'

'গরীবের আবার রোদ-বৃষ্টি কি? আমি যাই, আর একটু ঘুরে আসি।'

বিনীতা বিরক্তি-মিশ্রিত স্বরে বলিল, 'কি করছো? এখন তোমার যাওয়া হবে না।'

'তুমি হুকুম করছো, বিনু?'

'আমি তোমায় অনুরোধ করছি।'

বিনীতা নিখিলের করতলে মুখ লুকাইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া নিখিল ঐ ভাবে বসিয়া রহিল। অনুভব করিল, করতলের উপর উষ্ণ অশ্রুর ধারা—আর মমতাময়ী নারীর কোমল বুকের গভীর ব্যথা।

'কাঁদছ বিনু?' বিনীতা সাড়া দিল না।

'বিনু কেঁদো না। আমি তোমাকে আর কষ্ট পেতে দেবো না।'

বিনীতা মুখ তুলিয়া বলিল, 'আমি কষ্টের জন্য কাঁদছিনে। আমি কাঁদছি ন্যায়ের জন্য তোমার হার হলো বলে।'

বিনীতার মুখ কোলের উপর লইয়া নিখিল গভীর স্নেহে তাহার মাথায় কেশে হাত বুলাইতে লাগিল।

মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল; দীপ জ্বলিল না। নিখিল অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে শুনিল সেই শঙ্খধ্বনি! একে একে তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল পূর্ব্বেকার সব স্মৃতি। সেই মধুর দিন! সে যেন কত দিনের!

হতাশ ভাবে নিখিল বলিল, 'কোথাও চাকরি খালি নেই।'

বিনীতা কোন কথা বলিল না।

'আজ বুঝতে পারছি, মস্ত ভুল করেছি।'

'না, তোমার ভুল নয়!'

'আবার বলছ সেই কথা!'

'হাঁ, চিরদিনই সেই কথা বলব।'

চাঁদ উঠিল। ছোট উঠানে এক-টুক্‌রো জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। ঘরের দালানে বিনীতা ও নিখিল বসিয়া। নিখিল ভাবিতেছিল, চাঁদের এতটুকু কার্পণ্য নাই! গরীবের ঘরেও সে বাতি জ্বালাইয়া দিয়াছে! চাঁদের দিকে একবার চাহিল। চাঁদের দেশে কি কেবল হাসি? না, না। চাঁদের বুকেও কালো দাগ আছে। ঐ দাগগুলোই তো দুঃখ! কান্না!

'বিনীতা—'

'কি বলছ?'

'কত আলো, দেখেছ? চাঁদ আমাদের ভালোবাসে!'

'চাঁদ তো মানুষের মত নয়।'

নিখিল তাড়াতাড়ি বলিল, 'না, না, মানুষের দোষ দিয়ো না।'

বিনীতা উত্তর দিল না। তারা দু'জনে মুখোমুখি বসিয়াছিল। বিনীতা উঠিয়া যাইতেই হঠাৎ নিখিলের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

শুইবার সময় নিখিল বড় অস্থির হইয়া উঠিল। এ যেন নিজের সহিত নিজের যুদ্ধ! নিখিলের অস্থিরতা দেখিয়া বিনীতা বলিল, 'কষ্ট হচ্ছে?'

'না, মাথাটা একটু ব্যথা করছে।'

'টিপে দিচ্ছি।' বিনীতা নিখিলের মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। হঠাৎ নিখিল বলিল, 'বিনু একটু সাবধানে থেকো।'

'কেন, কি হলো?'

'বড্ড চোরের উৎপাত হয়েছে।'

'নাও, তুমি ঘুমোও।' বিনীতা স্বামীর বাহুতে মৃদু চাপড় মারিল।

'না বিনু, তুমি বোঝো না।' পরে মুখ ফিরাইয়া অতি ধীরে বলিল, 'দুল জোড়া ঠিক জায়গায় রেখেছ তো? ঐটেই যা কিছু আমাদের দামী।'

'সে আমি জানি গো জানি! তুমি ঘুমোও।'

'না, না, ঠিক করে রেখো।' নিখিলের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'সে ঠিক আছে। তাকেতে পেয়ালা-চাপা আছে,—কে নেবে আবার?'

'সাবধানে রেখে দিয়ো বিনু, সময় যা পড়েছে।'

বিনীতা হাসি-মুখে বলিল, 'সে জন্ত তোমার ভাবনা নেই! তুমি ঘুমোও, না হলে আমি উঠে যাব।'

'আমি ঘুমোচ্ছি।'

নিখিল ঘুমাইতে পারিল না। বিনীতা ঘুমাইয়া পড়িল।

নিখিল দেখিল বিনীতার ঠোঁটে এক টুকরা হাসি লাগিয়া আছে। আর সে—নিখিল কি করিতে চলিয়াছে? না, না, সে পারিবে না! মরিয়া গেলেও না!

কিন্তু বাঁচিতে হইবে তো! নিখিল এই পর্য্যন্ত ভাবিয়া চোখ বুজিতে যাইতেছিল। তাহার মনে পড়িল, ও দুল-জোড়া বিনীতার প্রাণের জিনিষ, আশীর্ব্বাদ! তাহাই সে চুরি করিবে? বিনীতা বড় দুঃখ পাইবে—এত দুঃখ সে সহ্য করিতে পারিবে না। বিনীতা তাহাকে বলিয়াছিল, তুমি কি আমাকে কষ্ট দিতে পার?

নিখিল তাহাকে কষ্ট দিতে পারে না!

নিখিল শিহরিয়া উঠিল। তাহার চোখের সম্মুখে একবার দুল-জোড়া ভাসিয়া উঠিল। সে ধরিতে যাইতেই তাহার হাত অবশ হইয়া গেল। কিন্তু ও-দুল্ তাহার চাই। সে রাত্রে সে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

কোনো উপায় নাই! নিখিলের সম্মুখে জীবনের কঙ্কাল ফুটিয়া উঠিল। না, তাহা চাই! সে কি করিবে? অনাহারে আর কত দিন চলে! কিন্তু আবার তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল বিনীতার মুখ। ও-দুল গেলে সে বড় দুঃখ পাইবে।

তা পাক্, আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে।

সে মরিয়া হইয়া উঠিল। পেয়ালার উপর হাত দিয়াই সে হাত তুলিয়া লইল। মনে হইল, একসঙ্গে সহস্র অজগর যেন তাহার হস্তে দংশন করিয়াছে। সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—'উঃ।'

কিন্তু…!

সে বিনীতার দুলজোড়া বাহির করিয়া লইয়া পেয়ালাটি তেমনি উপুড় করিয়া রাখিয়া দিল। নিখিলের চোখে জল!

পরের দিন দুপুর বেলা বিনীতা পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া নিখিলের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

'কি হয়েছে?'

'আমার সর্ব্বস্ব গেছে। চোরে আমায় দুল চুরি করেছে।' বিনীতার বুকে অসহ্য ব্যথা, নয়নে অশ্রুধারা।

'কি করে চুরি গেল? তোমায় বললুম ঠিক করে রাখতে।'

নিখিল নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

'আমি তো ঠিকই রেখেছিলুম।' বিনীতা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

'আমি আর কি করবো বল!' নিখিলের কণ্ঠে উত্তেজনা।

'তুমি খোঁজো চোরকে। ওগো খুঁজে এনে দাও আমার দুল—দুল যে আমার সর্ব্বস্ব! তোমার পায়ে পড়ি, এনে দাও।'

'কি আব্দার তোমার! চুরি গেছে, আমি কোথা থেকে পাব?' নিখিল আর যুঝিতে পারিতেছিল না।

বিনীতা নিখিলের বুকে মুখ ঘষিতে ঘষিতে বলিতে লাগিল, 'না, আমার সে দুল চাই-ই। না হলে আমি মরে যাবো। তুমি খোঁজো চোরকে!'

নিখিল বিনীতাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'আমি দেখছি, বিনু, চোরকে! সে-চোরকে খুঁজে আমি বের করবোই।'

বিনীতা স্বামীকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল।

শ্রীসুশীলকুমার দত্ত

পথের দিশা

জাগার সঙ্কেত-ধ্বনি বাজিতেছে দূরে।
সুপ্তির সময় নহে; স্বপন মায়ার
মিথ্যা আবরণ ফেল ছিঁড়ে; আঁখি ঝুরে
ছায়ার মায়ায়; দেখ আসে আঁধিয়ার।

যে আলো ডুবিয়া গেছে স্বাধীন রবির,
যে বাঁশী তুলেছে তান বিষের হাওয়ায়,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফিরে তারা কানন গিরির;
স্বপন মাধুরী নামে কুটীর-ছায়ায়।

উজ্জীবিত করো তারে শক্তি কামনায়;
নহে ক্ষুদ্র প্রাণ-বহ্নি ভারতীর দেশে।
জুলুম-জটায় পথ দিগন্তে দেখায়
শক্রর নিগম-কথা বেদনার বেশে।

নহে তুচ্ছ মুক্ত যাহা; কীর্ত্তি গরিমার
জীবন প্রদীপ্ত করো, পাবে স্বাধিকার।

শামসুদ্দীন

জাতীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের প্রগতি

গত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতে ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রভাবের সহিত মর্য্যাদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে যথেষ্ট পরিমাণে। কিন্তু প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে সমান্তর শ্রেঢ়ীতে (Arithmetical Progression) আর অভাব ও বিপত্তি বাড়িয়াছে সমগুণ শ্রেঢ়ীতে (Geometrical progression)। মুদ্রা-মূল্য হ্রাস ও দ্রব্য-মূল্য-বৃদ্ধি হেতু ব্যয়-বাহুল্যে, যৎকিঞ্চিৎ আয়-বৃদ্ধিও নিত্য-নৈমিত্তিক অভাব-অনটন অতিক্রম করিতে পারে নাই ; পক্ষান্তরে, আইনের নাগপাশে ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিক অষ্টপৃষ্টে বদ্ধ। অতি অকিঞ্চিৎকর ত্রুটি-বিচ্যুতিতে অতি কঠোর শাস্তি বিহিত হইয়াছে। তথাপি জাতীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদিগের মান-মর্য্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রভূত পরিমাণে। পক্ষান্তরে, অ-ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের সংখ্যা ও প্রতাপ হ্রাস পাইয়াছে, প্রায় বিষমানুপাতে (In inverse ratio.)

আমি ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাংবাদিকের বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সংবাদ-পত্রের সেবায় সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে জগতে যে কত বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—তাহা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে রোমাঞ্চকর উপন্যাস অপেক্ষাও প্রীতিপ্রদ সুখপাঠ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারা যায়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারত-সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা! ধনে-মানে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শাসনে-প্রতাপে, বিস্তারে ও বৈভবে বৃটিশ শক্তি ও বৃটিশ সাম্রাজ্য তখন জগতের শীর্ষস্থানীয়। "মহারাণীর রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না"—এই বাক্য তখন প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কালের কুটিল চক্রে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পাঁচ বার সিংহাসনের অধিকারীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। একে একে আমরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র-বৃহৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ লক্ষ্য করিয়াছি। কত রাজ্যে বিপ্লব ঘটিয়াছে, কত রাজত্বের উত্থান ও পতন সংঘটিত হইয়াছে, কত রাজা রাজ্যহীন বিতাড়িত, নির্ব্বাসিত, অথবা শিরশ্চ্যুত হইয়াছে।

কত বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটিয়াছে। হস্তে অক্ষর-বিন্যাসের (Hand Composing) শ্রমসাধ্য ও দীর্ঘ-সময়-সাপেক্ষ প্রথার পরিবর্ত্তে কলে অর্থাৎ "লাইনো ও মনো-টাইপ কম্পোজিং মেসিনে" প্রতি বারে নূতন-নূতন সদ্য-সৃষ্ট অক্ষরে শব্দ ও বাক্য গ্রথিত করিবার অতি দ্রুত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রণ কৌশলেও অচিন্ত্যপূর্ব্ব দ্রুত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। পাদ-পরিচালিত (Treadle) মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাষ্প-পরিচালিত এবং অধুনা তড়িৎ পরিচালিত "রোটারি" (ঘূর্ণায়মান) যন্ত্রে ঘণ্টায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার সংখ্যা সংবাদপত্র ছাপা হইতেছে! শুধু তাহাই নহে। এই আধুনিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রে সংবাদপত্র কাটাছাঁটা এবং পাট-করা অবস্থায় সদ্য বণ্টন ও বিক্রয়োপযোগী হইয়া নির্গলিত হইতেছে। গো-যানের ধীর-মন্থর গতি হইতে ব্যোমপথে বিমানে আমরা মুহূর্ত্তে যোজন [illegible]। বিনা-তারে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে, দেশ ও দেশের দূরত্ব জয় করিয়া নিমেষে সংবাদ আদান-প্রদান করিতেছি।

শিল্পে-কলায় সাহিত্যে-সঙ্গীতে আমরা দ্রুত অগ্রসর হইয়াছি। সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে আমরা বহু অগ্রগতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু জাতিগত ভাবে—সমষ্টিগত ভাবে—আমাদের নৈতিক উন্নতি কতটুকু —কত অকিঞ্চিৎকর! মানুষের আদিম-পাপ লোভ এখনও আমাদের কত প্রচণ্ড,—কত প্রবল! পরস্বাপহরণের প্রবৃত্তি কত তীব্র ও তীক্ষ্ণ! পরশ্রীকাতরতা আমাদের কত প্রখর! আমাদের পশুভাবের প্রচণ্ডতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। ব্যক্তিগত ও জাতিগত মান-মর্য্যাদা সংরক্ষণ অথবা সংবর্দ্ধনের জন্য আমরা হিংস্রপশুর ন্যায় নৃশংস আচরণে নররক্তে বসুন্ধরা কলঙ্কিত করিতেছি। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস নাই ; জাতির প্রতি জাতির মমত্ব বোধ নাই। দস্যুবৃত্তি ও দানব-প্রবৃত্তি আমাদিগকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা কোন অদৃশ্য অতি-ক্রূর দেবতার অভিসম্পাতের ফলে প্রতিহিংসাপরায়ণ যাদুকরের যাদুদণ্ড-স্পর্শে হিংসাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নর-নারায়ণ হইতে নরপশুতে পরিণত হইয়াছি। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা আজ সংজ্ঞা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে! তথাপি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, তত্ত্বে-তথ্যে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে ও বৃত্তি-ব্যবসায়ে আমরা পশ্চাদ্‌পদ হই নাই। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি হইতে পারে! উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টির পরে বিংশ শতাব্দীর ধ্বংস-লীলা বিচিত্র! মাত্র পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে দুইটি পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ এবং জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতা জগতের ইতিহাসে অতি শোচনীয় দুর্ঘটনা!

সাংবাদিকের ঘটনা-বহুল জীবনে এই সকল বিচিত্র ও বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনের চলচ্চিত্র স্তরে স্তরে অঙ্কিত হইয়া তাহার মানস-পটে মুদ্রিত থাকে। যথাসময়ে যথাযথ ভাবে প্রকাশের সুযোগ ও সুবিধার অভাবে পরবর্ত্তী পুরুষপরম্পরার জ্ঞানবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সহায়তা করিতে পারে না। আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে না নিশ্চিত। তথাপি ইহা অতীব সত্য যে, মনীষী সাংবাদিকদিগের আত্মচরিত অথবা জীবনচরিত, জাতীয় মহাপুরুষগণের আত্ম-চরিত অথবা জীবন-চরিত অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপাদান-উপকরণ হিসাবে কোন অংশে ন্যূন নহে। রামগোপাল ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বনামধন্য যুগনেতা সাংবাদিকদিগের জীবনের ঘটনাবলী ও কার্য্যাবলী হইতে আমরা কত না অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারি। লোকশিক্ষার ইহাও একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

সর্ব্বদেশে সর্ব্ব সভ্য সমাজে সাংবাদিকের স্থান অতি উচ্চে ; কারণ, স্বাধীন অথবা স্বায়ত্তশাসনশীল দেশমাত্রেরই রাষ্ট্রে ও সমাজে সংবাদপত্রের প্রতাপ প্রভূত। শক্তিশালী সম্পাদক-পরিচালিত সংবাদপত্রের মতামতে স্বাধীন দেশে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন ঘটে। সেখানে সংবাদপত্রের মতের মূল্য প্রচুর। এই নিমিত্ত বিলাতে সংবাদপত্রগুলিকে (The press) চতুর্থ সম্পত্তি (Fourth estate) বলে। প্রথম তিনটি সম্পত্তি হইতেছে (১) ধর্ম্মযাজকগণ

(Lords Spiritual), (২) অভিজাত সম্প্রদায় (Lords Temporal) এবং (৩) জনসাধারণ (Commons)। এই তিনটি যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্র-সম্পত্তি, অর্থাৎ জাতীয় মহাসভার তিনটি প্রধান অঙ্গ। রাষ্ট্র-পরিচালনায় সমষ্টিগত ভাবে ইহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহাদের পরেই সংবাদপত্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি! সুতরাং সংবাদপত্রগুলি চতুর্থ সম্পত্তি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের চতুর্থ অঙ্গ। পরাধীন ভারতে সংবাদপত্রগুলি ছিল আমলাতান্ত্রিক শাসনের প্রারম্ভে বিষম উৎপাত ও বিরক্তিকর উপদ্রব, আমলাতন্ত্রের চোখের বালি, নিরঙ্কুশ শাসন ও শোষণের অন্তরায়। যে "অমৃত বাজার পত্রিকা" আজ জগদ্বিখ্যাত, যাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ও নির্ভীক মন্তব্যে কত মন্ত্রী, কত রাজপুরুষ, কত শাসনকর্ত্তা, কত ছোট-বড় লাট আজ সর্ব্বদা সশঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত; যশোহর জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে তাহারই প্রথম আবির্ভাব কালে, ঐ জেলার শাসনকর্ত্তা জেম্‌স্ ওয়েষ্টল্যাণ্ড তাঁহার ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত A Report on the District of Jessore পুস্তকে লিখিয়াছিলেন,—

"Magurah or Amrita Bazar, about four miles north of Jingargacha.—It is only a considerable village, but a family of Ghoses, small zemindars, resident in the place, established a Bengali newspaper called the AMRITA BAZAR PATRIKA. It appears once a week, and is conspicuous only for its scurrilous tone and its disregard of truth. Its declared circulation is 500."

সিভিলিয়ান-পুঙ্গবের মতে এই পত্রিকার tone, অর্থাৎ লিখনভঙ্গী ছিল scurrilous, অর্থাৎ জঘন্য; কারণ, "অমৃত বাজার পত্রিকার" মুখ্য ব্রত ছিল,—সরকারী অনাচার-অত্যাচারের তীব্র ও তীক্ষ্ণ আলোচনা। তাঁহার দ্বিতীয় অভিযোগ, সত্যের প্রতি অনাদর; অর্থাৎ সরকারী মতে যাহা "সত্য," "অমৃত বাজার পত্রিকা" তাহাকে সর্ব্বদা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না; এবং নির্ভীক ভাবে যে যথার্থ সত্য প্রচার করিত, আমলাতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে তাহা "মিথ্যা"; নতুবা, তাঁহাদের শাসন ও শোষণ-মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। তখন হইতে বহু দিন পর্য্যন্ত ছিল "অমৃত বাজার পত্রিকা" আমলাতান্ত্রিক শাসনকর্ত্তাদের চক্ষুঃশূল। এখনকার অতি অল্প লোকই জানেন যে, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটনের শাসনকালে দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-খর্ব্বকারী আইন (The Vernacular Press Act) প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল প্রধানতঃ "অমৃত বাজার পত্রিকার" নির্ভীক সমালোচনা এবং তীব্র ও তীক্ষ্ণ মন্তব্যগুলিকে শাসন করিবার নিমিত্ত; কিন্তু এই পত্রিকার স্বনামধন্য ঘোষ-পরিচালকবর্গ আমলাতন্ত্রের কূট-নীতিজ্ঞ কর্ম্মচারী অপেক্ষা কোন অংশে কম চতুর ছিলেন না। তখন "অমৃত বাজার পত্রিকা" কলিকাতার বাগবাজারে সুপ্রতিষ্ঠিত। ঘোষ-ভ্রাতৃগণ এক রাত্রির মধ্যেই দ্বৈভাষিক "অমৃত বাজার পত্রিকাকে" ইংরেজী "অমৃত বাজার পত্রিকা"য় রূপান্তরিত করিয়া সরকারের কূটনীতিপ্রসূত অপচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়াছিলেন। তাঁহারা চিরদিনই বাঙ্গালা, তথা সমগ্র ভারতের বরেণ্য, শরণ্য ও স্মরণীয় মহাপুরুষরূপে অঙ্কিত হইবেন। যে দূরদৃষ্টির পরিচয় তাঁহারা তখন দিয়াছিলেন, আজ সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার সুফল ভোগ করিতেছে। "অমৃত বাজার পত্রিকা" আজ একটি সংবাদপত্র মাত্র নহে; ইহা আমাদের একটি বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠান; স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় স্তম্ভ-স্বরূপ; পীড়িতের আশ্রয়স্থল ও আর্ত্তের অভয় শরণ।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের যশোহর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেমস্ ওয়েষ্টল্যাণ্ড কালক্রমে ভারতের বড়লাটের শাসন পরিষদে অর্থ-সচিবের পদ ও "নাইট" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অর্থ-সচিবরূপে তাঁহার একটি উক্তিতে তাঁহার ইতর মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সরকারী দপ্তরের মুহুরীবৃন্দের যৎসামান্য বেতনের হার-বৃদ্ধি প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—They must check their procreative proclivity, অর্থাৎ তাহারা তাহাদের সন্তান-উৎপাদনের প্রবৃত্তি হ্রাস করুক! মূঢ়তার ও হীনতার ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট উদাহরণ বিরল!

গত পঞ্চাশ বৎসরে কালের চির পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাস্রোতে আমলাতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীদের মনোবৃত্তির বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! দেশীয় সংবাদপত্র এখন তাঁহাদের দিব্য-দৃষ্টিতে Nuisance, অর্থাৎ উৎপাত-উপদ্রব নহে; এখন সেগুলি তাঁহাদের "পয়োমুখ বিষকুম্ভ"-সদৃশ শাসন ও শোষণ-সংস্কার তথাকথিত গুণগ্রামের প্রচারকল্পে অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রস্বরূপ। এখন সংবাদপত্রগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রব রক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদেশে সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন! রাষ্ট্রপতিগণ এখন নিয়মিত ভাবে সাংবাদিকদিগকে দর্শন দিয়া থাকেন; এবং তাঁহাদের সহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের সঙ্কট-সমস্যা ও রাষ্ট্রনীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রদ্ধার সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। অধিকাংশ দেশে বিচক্ষণ সাংবাদিকগণকে রাষ্ট্রকর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত করিয়া সরকার সংবাদপত্র মহলের সহিত হৃদ্যতা রক্ষা করেন। অধিকাংশ রাষ্ট্রের প্রচার-বিভাগের শীর্ষে সাংবাদিক প্রতিষ্ঠিত। মন্ত্রী অথবা উপদেষ্টারূপে মনীষী সাংবাদিকের নিয়োগ বিরল নহে। ব্যক্তিগত ভাবে ইহা আমার বিশেষ গৌরবের বিষয় যে, আমার সমবৃত্তিসম্পন্ন সহকর্ম্মী ও আ-কৈশোর বন্ধু উষানাথ সেন সম্প্রতি "নাইট" উপাধি লাভ করিয়া ভারত সরকারের সংবাদপত্র সংক্রান্ত উপদেষ্টা (Press Adviser to the Government of India)-রূপে দেব-দুর্লভ পদবী ও গুরু দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম লাভ করিয়াছেন। স্বর্গত কেশবচন্দ্র রায়ের (Mr. K. C. Roy) বন্ধুবাৎসল্যে যখন আমরা একত্রে কর্ম্মে ব্রতী হই, তখন এরূপ সম্মান যথার্থই দেব-দুর্লভ ছিল বলিলেও যথেষ্ট হয় না; স্বপ্নের অগোচর ছিল,—অত্যুগ্র কল্পনারও অতীত ছিল বলিলেই ঠিক হয়। সংবাদপত্রের মর্য্যাদা এখন এতই বাড়িয়াছে যে, প্রায় প্রতি রাষ্ট্রেই সরকারের নিজস্ব, অথবা অনুগ্রহ কিংবা বৃত্তিভোগী সংবাদপত্রের অভাব নাই।

অধুনা সংবাদপত্রগুলি প্রতি রাষ্ট্রের শাসন-তন্ত্রের পশ্চাতে প্রবল পৃষ্ঠ-শক্তি, অথবা সতর্ক প্রহরী। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষিগণের সময়ে যাহা উৎপাত-উপদ্রব, অথবা ব্যাঘ্রের পশ্চাতে "ফেউ"-স্বরূপ ছিল, আমাদের সময়ে তাহা ক্রমে সহনীয় হইয়া আসিতেছিল। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পথপ্রদর্শক মনীষিগণ দেশহিতব্রতে অসীম ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার পূর্ব্বক এবং অপরিসীম অধ্যবসায় সহকারে সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেন। কার্য্যক্ষেত্রের প্রসারের সহিত তাঁহাদের সহকারীর প্রয়োজন অনুভূত হইল। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশের মূল্য ছিল; সুতরাং, সচরাচর উপাধি-ধারী, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি

সাংবাদিকের বৃত্তি অবলম্বন করিত না। সরকারী চাকুরী সুলভ ছিল, এবং আইন ও চিকিৎসা প্রভৃতি বৃত্তিব্যবসায়ে তাহারা সহজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। সুতরাং, সাধারণতঃ, "এল-এ অথবা বি-এ ফেল" আখ্যাযুক্ত ইংরেজী লিখিতে পারদর্শী ব্যক্তিরা সরকারী চাকুরীর কিংবা সম্মানার্হ বৃত্তি-ব্যবসায় হইতে বঞ্চিত হইয়া শাসন এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিত। সওদাগরী অফিসের কর্ম্ম তখন অতি নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইত। কারণ, তখন সেখানে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, অর্থাৎ যাহারা "প্রবেশিকা" (Entrance) পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, তাহাদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। বেতনের হারও তখন অত্যন্ত কম ছিল। সৌভাগ্য বশতঃ তখন আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের মূল্যও কম ছিল; বিলাসিতা এত বৃদ্ধি পায় নাই, এবং একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথাই প্রবল ছিল। অভাব অল্প ছিল, সুতরাং অল্প আয়ে কোন প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু বিলাতী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বিলাতী আদর্শের প্রবল অনুকরণেচ্ছা প্রযুক্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক মহলে শাসন ও সমাজ উভয় তন্ত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষবহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল। কারণ, উপাধি লাভ করিলেও সর্ব্বত্র আশানুরূপ উচ্চ কর্ম্ম ও উচ্চ বেতন জুটিত না।

সংবাদপত্র সেবা তখন সম্মানার্হ বৃত্তিরূপে পরিগণিত হয় নাই। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম পুরুষের সাংবাদিকগণ বিভিন্ন বৃত্তি ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া দেশের উন্নতি ও দেশবাসীর কল্যাণ সাধনার্থ সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেন। "অমৃত বাজার পত্রিকা," "হিন্দু পেট্রিয়ট," "ইণ্ডিয়ান মিরর," "বেঙ্গলী," "রেইস্ এণ্ড রায়ট" এবং "ইণ্ডিয়ান নেশন" প্রভৃতি পত্রিকা তখন নিঃস্বার্থ দেশোপকারের নিমিত্ত স্বার্থত্যাগী দেশ-প্রেমিক মনীষিগণ কর্ত্তৃক বহু ক্ষতি ও ত্যাগস্বীকারের বিনিময়ে সুদক্ষ ভাবে পরিচালিত হইত। তাঁহাদের আদর্শ ছিল বিরাট, উদ্দেশ্য ছিল মহৎ এবং যোগ্যতা ও দক্ষতা ছিল প্রচুর। সংবাদপত্রের আয়ের উপর তাঁহাদের পারিবারিক জীবন নির্ভর করিত না। সুতরাং আধুনিক কালের ন্যায় বিজ্ঞাপনদাতাদের মুখাপেক্ষী হইয়া তাঁহাদিগকে পত্রিকা পরিচালন করিতে হইত না। তাহারা স্বাধীন ভাবে অতি তেজস্বিতার সহিত লেখনী পরিচালনা করিতেন। দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও অভাব-অভিযোগ তাঁহারা অকুতোভয়ে বর্ণনা করিতেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের অনাচার-অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। স্বভাবতঃই তাঁহারা তদানীন্তন আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের যথেচ্ছাচারী কর্ম্মচারিবৃন্দের চক্ষুঃশূল হইতেন। সুপ্রসিদ্ধ "অমৃত বাজার পত্রিকা" সম্বন্ধে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের যশোহরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের তীক্ষ্ণ মন্তব্যের ইহাই হইল প্রকৃত কারণ। যাহা হউক, এই সকল মহাপ্রাণ দেশহিতব্রত মনীষী সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত, সংবাদপত্রের প্রচার ও প্রভাবের প্রসারের সহিত সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন অনুভূত হইল। কিন্তু তখনও দেশীয় সংবাদপত্রের অবস্থা স্বচ্ছল হয় নাই, সুতরাং সহকারীদিগের পারিশ্রমিকের হার অত্যন্ত কম ছিল। এই নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রেরা এই বৃত্তিতে আকৃষ্ট হইত না। কখন কখন সখের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা কলা-বিভাগে উপাধি লাভ করিয়া আইন তখনকার দিনে উপাধিধারীদিগের পক্ষে বাড়ীতে ছাত্র পড়াইবার কার্য্য সুলভ ও সহজসাধ্য ছিল। সুতরাং সংবাদপত্রসেবীদিগের দ্বিতীয় পুরুষে ইংরেজীতে দক্ষ "এল-এ ফেল" আখ্যাধারীদের সংবাদপত্রের কার্য্যে প্রায় এক-চেটিয়া প্রতিপত্তি ছিল। সংবাদপত্র সেবীদিগের তৃতীয় পুরুষে বহু উচ্চশিক্ষিত উপাধিধারী ব্যক্তি সংবাদপত্র-সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া দৃঢ় ভাবে সাংবাদিকের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। অধুনা বহু সংবাদপত্রের বহুল প্রচার সত্ত্বেও সাংবাদিকের বৃত্তি যথেষ্ট পরিমাণে অর্থকরী হয় নাই। এই হেতু বহু কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগকে আংশিক ভাবে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কর্ম্মে ব্রতী দেখিতে পাই! আমি সংবাদপত্রসেবীদিগের দ্বিতীয় পুরুষের শেষ পর্য্যায়ের লোক! আমার অগ্রবর্ত্তী অগ্রজতুল্য তিন জন সম্পাদক মাত্র জীবিত আছেন। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সম্পাদকাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এখনও "দৈনিক বসুমতীর" সুযোগ্য কর্ণধাররূপে রঙ্গমঞ্চে অধিষ্ঠিত। স্বনামধন্য লাহোর "ট্রাইবিউনের" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় সম্প্রতি অবসর লইয়া খুলনায় বাস করিতেছেন। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বগ্রাম গোবরডাঙ্গায় অবস্থিত।

আমাদিগের কর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থায় পারিশ্রমিক ছিল অত্যন্ত কম। উঞ্ছবৃত্তি ব্যতীত উদরান্নের সংস্থান হইত না। স্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন কোন বন্ধুবান্ধব সংবাদপত্রসেবীকে ঋণ দিতে কুণ্ঠিত হইত, কারণ, দুঃস্থ ও নিঃস্ব সাংবাদিকেরা কদাচিৎ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিত। আমি যত দিন দেশীয় সংবাদপত্রে কর্ম্ম করিতাম, তত দিন আমার অবস্থাও শোচনীয় ছিল। ইংরেজ-পরিচালিত দৈনিক পত্রিকায় কর্ম্ম-প্রাপ্তির পর আমাকে আর উঞ্ছবৃত্তি করিতে হয় নাই। কিন্তু তখন ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকায় কর্ম্ম-প্রাপ্তি সুদুর্লভ ছিল। তখন কলিকাতায় ঐরূপ তিনটি প্রবল প্রতাপশালী দৈনিক পত্র পরিচালিত হইত:—"ষ্টেট্স্‌ম্যান," "ইংলিশম্যান" ও "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ"। এই তিনটির মধ্যে শেষোক্ত পত্রিকাই সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসীকে আশ্রয় দেয়। স্বর্গত কেশবচন্দ্র রায় (মিঃ কে, সি, রায়) "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজের" সিমলা সংবাদদাতা, অর্থাৎ ভারত সরকারের দপ্তরের সংবাদ-সংগ্রহকর্ত্তা ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনগুপ্ত প্রথমে খেলাধূলার সংবাদদাতা এবং পরে সহকারী সম্পাদকের কর্ম্মে যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্রের মধ্যে তখন এলাহাবাদের "পাইওনীয়ার" প্রভাবে ও প্রতাপে অদ্বিতীয় ছিল। "পাইওনীয়ারের" ভারত সরকারের দপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট সংবাদদাতা হেন্‌স্‌ম্যান সাহেব তখন "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজের"ও সংবাদদাতা ছিলেন। তাঁহার সহকারিরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া কেশবচন্দ্র ভবিষ্যতে "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজের" এই অতি দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদানীন্তন ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্রে তিনিই প্রথম বাঙ্গালী সাংবাদিক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্র মহলের সুরক্ষিত চক্রব্যূহ মধ্যে তিনিই প্রথম সম্মানের সহিত প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই এ বিষয়ে আমাদের অগ্রদূত। তাঁহার সহায়তায় শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনগুপ্ত "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে" প্রবেশ লাভ করেন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের পুলিশ বিভাগে উচ্চপদ লাভের পরে আমি ঐ পত্রিকায় কর্ম্মপ্রাপ্ত

নিউজে" কর্ম্মলাভ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের অনুবর্ত্তী স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল প্রচলন কালে "ইংলিশম্যান" পত্রিকা এক জন বাঙ্গালী সংবাদদাতা নিযুক্ত করেন। তাহার কিছু কাল পরে "ষ্টেটস্ম্যান" পত্রিকাও বাঙ্গালী সংবাদদাতা নিযুক্ত করেন। তাহারও কিছু কাল পরে স্বর্গত প্রিয়নাথ গুহ মহাশয় "ষ্টেটস্ম্যান" পত্রিকায় সম্মানার্হ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কালের অপ্রতিহত গতি-পরিবর্ত্তনে শতায়ু "ইংলিশম্যান" ও "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ" আজ লুপ্ত হইয়াছে। ইহারা ছিল অভিজাত শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মুখপত্র। পাইকপাড়ার রাজবংশের অর্থানুকুল্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ স্বনামধন্ত রবার্ট নাইটের "ষ্টেটস্ম্যান" তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক হস্তান্তরিত হইয়া এখন বাঙ্গালার একমাত্র শ্বেতাঙ্গপরিচালিত দৈনিক পত্র। ইহার সম্পাদকীয় ও সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগে এখন কয়েক জন সুদক্ষ বাঙ্গালী সাংবাদিক সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিতেছেন।

আমরা যখন বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে সাংবাদিকের জীবন আরম্ভ করি, তখন বাঙ্গালী-পরিচালিত এবং শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত সংবাদপত্র মহলের মধ্যে পার্থক্য ছিল প্রচুর। তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না যে, কোন বাঙ্গালী সাংবাদিক শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত কোন দৈনিক পত্রের গূঢ় নীতি-সংরক্ষিত সম্পাদকীয় মন্ত্রণামণ্ডলে স্থান লাভ করিবে। শ্বেতাঙ্গ সম্পাদক ও সংবাদদাতাগণ তখন দেশীয় সম্পাদক ও সাংবাদিকগণকে তাহাদিগের যথোপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদান করিতে সম্মত ছিলেন না; বস্তুতঃ, তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তীব্র তাড়নে এবং বাঙ্গালার রাজনৈতিক আবহাওয়ার গুরু পরিবর্ত্তনে এই রীতি-নীতির ক্রম-পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়; এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজের" তদানীন্তন সম্পাদক মিঃ এভেয়ার্ড ডিগবি, "বেঙ্গলী" পত্রিকার সম্পাদক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাম্রাজ্যিক সংবাদপত্র বৈঠকে যোগদান করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়া বিলাত গমন করিলে, "ইণ্ডিয়ান্ ডেলি নিউজের" স্বত্বাধিকারী ভারতবাসীর প্রতি সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যারিষ্টার মিঃ উইলিয়াম গ্রেহাম এস্, এ, রাজা নামক প্রধানতম মান্দ্রাজী সহকারী সম্পাদককে অস্থায়িভাবে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া "এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান" (পুরাতন পর্য্যায়) মহলে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। তখন মর্লি-মিণ্টোর শাসন-সংস্কারের ফলে বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী এড্ভোকেট জেনারল মিঃ এস্, পি, সিংহ (পরে স্যার ও লর্ড) বড়লাটের শাসন পরিষদে সর্ব্বপ্রথম আইন-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। গ্রেহাম সাহেব স্বজাতিবর্গের তীব্র প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে এই সমীচীন পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ইহার যৌক্তিকতার দ্বারা নিজ কার্য্যের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও, এত ঘোর বিপ্লবপূর্ণ পরিবর্ত্তনের পরেও, দেশীয় সাংবাদিকদিগের প্রতি শ্বেতাঙ্গ সাংবাদিকদিগের মতিগতি বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ভারতবাসীর প্রতি শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের যৎকিঞ্চিৎ অনুকম্পার দৃষ্টি আসিয়াছে; কিন্তু কুসংস্কার—বিশেষতঃ বিজিতের প্রতি বিজেতার অবজ্ঞাসূচক মনোবৃত্তি সহজে বিদূরিত হয় না। তবে এইরূপ পরিবর্ত্তনের একটি প্রকাশ্য ইঙ্গিতের অভাব নাই। তাহার একটি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। এই "প্রকাশ্য ইঙ্গিতের" অন্তরালে অবিশ্বাসের শ্রদ্ধাহীন মনোবৃত্তি এখনও প্রচ্ছন্নরূপে প্রকট।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যখন সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সংক্রান্ত "কমার্স" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ বেরি-ব্রাউন অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক বিলাতযাত্রা করেন, তখন তাঁহার প্রধান সহকারী বর্ত্তমান লেখককে সম্পাদক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু ইংরেজ-পরিচালিত "কমার্সে'র" ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক বাঙ্গালী হইলে উহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ শিল্পী বণিক্ সম্প্রদায় রুষ্ট হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া আমি আমাদের পরিচালক-মণ্ডলীর প্রধান পুরুষ মিঃ টাইটলার সাহেবকে আমার আশঙ্কার কথা নিবেদন করিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

'I am afraid I must differ on one point, viz.—that of prejudice in Clive Street. The present generation have long since learnt that the pigment of a skin can have very little to do with character or brains, and if anything, your name (as Editor) should help in rallying the decent elements of Indian business on the side of "Commerce." As the paper is tied to no group whatsoever, I think you may safely say,—"Without or with offence to friend or foe, I sketch your world exactly as it goes"'

কিন্তু ইহাই কি যথার্থ মনোভাব। তাহা যে নহে, তাহার প্রমাণ আমি কয়েক মাস পরে পাইয়াছিলাম। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ বেরি-ব্রাউন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডন হইতে আমাকে লিখিয়াছিলেন,—

"Both Mr. Allen and Mr. Tyler have requested me to contribute to "Commerce" their reason for doing so being, I anticipate, that they wished to keep alive the European aspect, the European interest of the paper. They were afraid if you were left in sole editorial charge, that you would unknowingly, naturally, instinctively, and yet without fixed purpose, permit the paper to become Indianised,—just, for instance, as the "Amrita Bazar Patrika" would gradually become Europeanised if I became its Editor. Their fears, I felt, were groundless, and I said so; but they would have their way."

মিঃ বেরি-ব্রাউনের যে আমার প্রতি যথার্থই আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, তাহার নিদর্শন তিনি দিয়াছিলেন। যখন "কমার্স" পরে কলিকাতা হইতে বোম্বাইয়ে হস্তান্তরিত ও স্থানান্তরিত হয়, তখন তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন,—

"I have been asked by Mr. Allen in an Air-mail letter to resume my editorship in Bombay and in a cablegram received yesterday from Sir Joseph Kay of Brady & Co, the same request is made. I have declined the offer, but I still hoped that I shall be able to act for the paper as its London correspondent. I have recommended you for either Editorship or Assistant Editorship, and if you go to Bombay in an editorial capacity I hope you will extend to my contributions some generosity of treatment."

আমার সম্পাদকতাধীনে "কমার্স" সাত দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে বোম্বাই-এ স্থানান্তরিত হয়; এবং কলিকাতায় শেষ সংখ্যা প্রকাশিত করিয়া, তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত করিয়া আমি কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় স্থলের কর্ত্তৃপক্ষ এবং বিলাতের কয়েকটি অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রিকা হইতে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তথাপি, বোম্বাইএর নব পরিচালকবর্গ শ্বেতাঙ্গ সম্পাদক কর্ত্তৃক সম্পাদনার মর্য্যাদা হইতে "কমার্সকে" অধিক দিন বঞ্চিত রাখিতে সাহসী হয়েন নাই। তেলে জলে যেমন—সাদায় কালোয়ে-ও তেমনি, বিশেষতঃ বিজিত ও বিজেতা সম্পর্কে মিশ্রণ সম্ভবপর নহে। উভয় সম্প্রদায়ের সম্পাদকদের লইয়া কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানও বহু দিন সম্ভবপর হয় নাই। সম্প্রতি যুদ্ধের অভিঘাতে—স্বার্থের ঐক্যতায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা প্রয়োজনের তাগিদে,—আন্তরিকতার আয়োজনে নহে। এ সম্প্রতি সম্মিলিত সম্পাদকসঙ্ঘের করাচী অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধীর শ্বেতাঙ্গ সাংবাদিকদিগের নিকট অকপট সহযোগিতার আন্তরিক প্রার্থনা যুগোপযোগী। কিন্তু বর্ণের বৈষম্য বড় বিষম বৈষম্য —যেমন রাষ্ট্রনীতিতে, তেমনি সমাজনীতিতে; যেমন ক্রীড়া-কৌতুকে, তেমনি শিল্প-বাণিজ্যে ও বৃত্তি-ব্যবসায়ে। যাহা হউক, জাতীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের প্রগতি প্রতিষ্ঠাপিত।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদ

১৩৪৬ চৈত্রের মাসিক বসুমতীতে মৎসংগৃহীত চণ্ডীদাসের দ্বাদশটি নূতন পদ প্রকাশিত হইয়াছিল। শতবর্ষ পূর্ব্বে লেখা যে পুঁথি হইতে পদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারই কয়েকটি জীর্ণ পৃষ্ঠায় চণ্ডীদাসের এমন আরও তিনটি নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে, যাহা পূর্ব্বপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর কোনও সংগ্রহ-গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। পদগুলি এই—

১

সেরূপ স্বরূপ জানিবে কে।
উপাসন শ্রুতি পায়্যাছে যে।
তাহার উপর মিছিরীর ধারা।
শ্রীরূপমঞ্জরী চন্দ্রের পারা।
চন্দ্রের কিরণ ঝলকে আভা।
মনব্রত লয়্যা করিবেক সেবা।
সেবাতে সন্তুষ্ট করিল যে।
শ্রীরূপ মঞ্জরী পাইবে সে।
সখি দেহ পায়্যা সেবাতে গেল।
রাধাকৃষ্ণ সেই সেবাতে পাইল।
কহে চণ্ডীদাস নিগূঢ় হয়।
রজক আশ্রমে ডুবিয়ে রয়।

২

ভাব প্রেম রসের গুরু রাধা ঠাকুরাণী।
প্রবর্ত্তকালেতে হয় মন্ত্র আচার্য্যাণী।
অষ্টকালি পঞ্চকালি দাসি অভিমান।
কেমনে লিখিল ধাতা ইহার বিধান।
নায়কের পঞ্চরস বিভিন্ন লক্ষণ।
কোন রসে ডুবায় * * রাধিকায় মন।
কোন রসে ডুবিল গোপী নাহি তার রেক।
কোন রসে মুঞ্জরী ডুবে নাহি পয়ডেক।
ডুব পারে ডুবারু হৈয়া গেল তল।
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে বেনা পাতি জল।

৩

জনম অবধি যাহারে না দেখি
তাহারে দেখিনু আজ।
নয়নের পাতি তাহাতে লাগিল
না বুঝি বিধির কাজ।
পশ্চিম পয়ানে ঘরের দুয়ার
আকাশ পয়ান দেখি।
কোন ছায়াবাদি করল টাট
ধান্দাসা লাগালে আঁখি।
তে-মাথা পথের ঠিক পরশিলে
অপদ আসিয়া ঘটে।
পরের পুরুষ পুরুষ লাগিয়া
চিত্ত চমকিয়া উঠে।
মায়ের সমান নাহি কোন জন
এ দেহ পালিত তার।
* * * * * আরতি করিয়ে
গলে গাঁথি দিল হার।
অনেক যতন করিল সে জন
ফটিক কাচের আশে।
কাচের গেঁঠরী কাটিয়ে সে চোর
রহিল তাহার দেশে।
আমি ত না জানি তাহার সন্ধান
পূরবে জেনেছে রাধা।
তাহার বাতাস যাহাকে লেগেছে
সে ভাল গিয়াছে বাঁধা।
এ সব ভজন করয়ে যে জন
সে জন গলার হার।
টুসীর শব্দে কোটি জলনিধি
সে জনা হইবে পার।
চুনি মুনি কহে শুন রামা রতি
আমরা তাহার দাসী।
কাচের লাগিয়া দ্বিজ চণ্ডীদাস
গলায় দিয়াছে ফাঁসি।

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সংগৃহীত

বোকাচিও

য়ুরোপীয় সাহিত্য-জগতে মধ্যযুগের পরে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয় দাঁতে, পেত্রার্ক ও বোকাচিও এই তিনজন ইতালীয় কবিকে লইয়া। রস সাহিত্যের তিনটি প্রধান ধারা ইঁহাদের প্রতিভায় রূপায়িত হইয়া শিল্প-হিসাবে যে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই লক্ষ্যণীয় গুণেই এ-সাহিত্যকে মধ্যযুগ হইতে পৃথক করিয়া আধুনিক চিহ্নিত বলা যায়। মধ্যযুগের ধর্ম্মতত্ত্ব ও দেব-বাদ, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, রূপক সাহিত্যে এবং জনগণের মনের পরিচয় রূপায়িত হইয়াছে দাঁতের "ডিভাইনা কমেডিয়াতে"। পেত্রার্কের "ক্যানজোনিয়ার" দেখি প্রেমের নিগূঢ় রস-মাধুর্য্য এবং প্রভেন্সের নীতি কবিতার চরম-উৎকর্ষ। যে সমস্ত লোক-গাথা বহু শতাব্দী ধরিয়া জনগণের স্মৃতি-জগতে অনির্দেশ্য আকারে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাই প্রত্যক্ষ আকারে বিশিষ্ট শিল্প-রূপ লাভ করিল বোকাচিওর "ডেকামেরন" গ্রন্থে, এবং মহাকাব্যের যুগের পর গল্প আখ্যায়িকার আকারে যে উপন্যাস সাহিত্যের আবির্ভাব, তাহারও সূত্রপাত এইখানে।

ইঁহাদের প্রতিভার উৎকর্ষের মূলে তিনটি লক্ষ্যণীয় গুণ দেখা যায়। প্রথমতঃ নিজ নিজ বিশিষ্ট শিল্প ধারা সম্বন্ধে সচেতনতা এবং সেই ধারায় একনিষ্ঠ অধিকার। দ্বিতীয়তঃ, ইঁহাদের বিশিষ্ট ব্যক্তি-রূপের আবির্ভাব শিল্পকর্ম্মে শিল্পীর সুস্পষ্ট ছাপ। মধ্যযুগের শিল্পকর্ম্মে শিল্পীর পরিচয়ের অভাবেই ছিল লক্ষ্যণীয়। তৃতীয়তঃ, ইঁহাদের অনুভূতির তীক্ষ্ণতা, জীবন-স্পন্দনের সজীবতা, বাস্তবতার পুনরুজ্জীবন এবং সকল বিষয়ে বিশ্লেষণ ক্ষমতা—ভাব-জগতের অস্পষ্টতা হইতে বাস্তব জগতের ভিত্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। ইঁহাদের পূর্ব্বে মধ্যযুগে কোনও শিল্পপ্রতিভা বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে এমন সুস্পষ্ট বিকাশ হইয়া লাভ করে নাই—সেই বিষয়েও ইঁহাদিগকে এক নবযুগের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে।

ইঁহারা তিন জনেই মূলতঃ ফ্লোরেন্স নগরীর সন্তান, এবং সমসাময়িক। দাঁতে (১২৬৫-১৩২১), পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪), বোকাচিও (১৩১৩-১৩৭৪)। যে পর্য্যায়ে ইঁহাদের আবির্ভাব। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, চিন্তাধারা এবং প্রতিভার উৎকর্ষেও সেই পর্য্যায়ক্রম দেখা যায়।

দাঁতে ছিলেন ফ্লোরেন্সের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। দেশের প্রাদেশিক সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া টাস্কানীর যুদ্ধক্ষেত্রে এ-বংশ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। পেত্রার্কের পিতামাতা ছিলেন ফ্লোরেন্সের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক—পূর্ব্বোক্ত প্রাদেশিক সংগ্রামে ইঁহারা স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। এইরূপে বিশেষ কোন নগর বা গৃহের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকার ফলে পেত্রার্কের প্রবণতা ছিল বিশ্ব-মানব-প্রীতির দিকে। বোকাচিও ছিলেন সাধারণ ব্যবসায়ীর সন্তান—ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষরা ছিলেন গ্রাম্য লোক, জন-জাগরণের সম্প্রসারণের ফলে ইঁহারা নগরবাসীর বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

যেমন সামাজিক জীবনের স্তর-পর্য্যায়ে তেমনই চরিত্র-গরিমায় এবং প্রতিভা-মাহাত্ম্যেও দাঁতে ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তার পরে পেত্রার্ক, তার পর বোকাচিও। ইঁহাদের প্রতিভার বিকাশেও তিনটি বিশিষ্ট ধারা লক্ষ্য হয়। দাঁতের সৃষ্টি বা আলোচনার বিষয় ছিল সমষ্টিগত মানব-আত্মা—ব্যাপক ভাবে হইলেও মানবাত্মার অখণ্ড-রূপ পেত্রার্ক আলোচনা করিয়াছেন ব্যক্তিগত মানুষের হৃদয় এবং লইয়া; বোকাচিও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে নামিয়া জীবনের সকল প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এইরূপ উপকরণের এবং দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্যের ফলে দাঁতে সৃষ্টি করিয়াছেন মহা-কাব্য, পেত্রার্ক গাঁথিয়াছেন গীতি-কাব্য এবং বোকাচিও রচনা করিয়াছেন উপন্যাস।

এই তিন প্রতিভার মধ্য দিয়া ক্রম-বিকাশের একটা ধারাও লক্ষ্য করা যায়—দাঁতে হইতে পেত্রার্কের মধ্য দিয়া বোকাচিও পর্য্যন্ত। বিয়াত্রিস হইতে আরম্ভ করিয়া লরার মধ্য দিয়া ফিয়ামেত্তা পর্য্যন্ত—মানুষের চিন্তার মহত্তর রূপ এবং মানবাত্মার পবিত্রতম আকৃতির রূপক-হিসাবে নারী, চিরন্তন আরাধ্য চরম সৌন্দর্য্যের প্রতীক হিসাবে নারী এবং প্রেম ও কামনায় স্পন্দমানা মানুষের প্রণয়পাত্রী হিসাবে নারী 'ডিভাইনা কমেডিয়া' হইতে ক্যানজোনিয়ার মধ্য দিয়া "ডেকামেরন" পর্য্যন্ত। মানুষের মানব-চিত্তের বিচিত্র ভাব-স্পন্দনের কার্য্য-কারণ-ভরা দৈনন্দিন জীবনের মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পরিমিত সময়ের মধ্যে ইতালীয় চিন্তা জগতে এই ক্রম-বিকাশ এবং মধ্যযুগ হইতে নব-যুগের বিস্ময়কর আবির্ভাব।

কিন্তু বোকাচিও তৃতীয় স্থানীয় হইলেও নবযুগের ইতিহাসে নানা কারণে তাঁহারই প্রাধান্য সবচেয়ে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। চিন্তা এবং পরমার্থ চিন্তা জনগণের চিত্তে স্থান পাইল না, সাহিত্যে রূপকের বীর তাহাদের নিকট তাচ্ছিল্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথা এবং সাম্রাজ্যের চিন্তা তাহাদের নিকট অতীতের সামগ্রী হইল; কাজেই দাঁতে তাহাদের নিকট হইল অতীত যুগের সম্ভ্রমের প্রতীক। নারীর প্রতি অত্যতিরিক্ত সম্ভ্রমের ভাব এবং নর-নারীর মধ্যে কামনাশূন্য প্রণয়ের চিন্তা ইঁহাদের নিকট ছিল অচল, কাজেই পেত্রার্ক তাহাদের বিবেচনায় এক জন উৎকৃষ্ট লিপি-কার মাত্র ছিলেন। বোকাচিও ছিলেন তাহাদেরই সমধর্ম্মী। তাঁহারা যে ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন এবং যে জীবন যাপন করিতেন, তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাদের রুচি-প্রবৃত্তি এই সকলের প্রতি ছিল বোকাচিওর সহজ সহানুভূতি এবং এই সকলই ছিল তাঁহার সাহিত্যের প্রধান উপজাত।

মধ্য-যুগের পরে নবযুগ ছিল গণ-জাগরণের যুগ—কাজেই জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় হিসাবে বোকাচিওর কতকটা স্বাভাবিক সুবিধা ছিল; জনগণের জীবনযাত্রা এবং চিন্তা-প্রণালীর ও ভাবধারার সহিত তাঁহার সরল সহানুভূতির ফলে জনগণের চিত্তে তাঁহার স্থায়ী প্রতিষ্ঠার পথও প্রস্তুত হইল। তার উপরে দাঁতে এবং পেত্রার্ক অতীতকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু বোকাচিওর চিন্তাধারার এবং শিল্পধারার মধ্যেও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার ফলে পরবর্ত্তী তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত ইতালীয় সাহিত্যে এবং চিন্তাজগতে বোকাচিওর প্রাধান্য অবিসংবাদিত।

বোকাচিও ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান, মাতৃপরিচয় এবং বাল্য-জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। মূলতঃ এইটুকু বলা যায় যে, সাত বৎসর বয়সে তিনি

লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী লোক। পিতার নির্দ্দেশে তাঁহাকে ব্যবসায়-কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়। তাহাতে তাঁহার মন বসিল না দেখিয়া ছয় বৎসর পরে পিতার নির্দ্দেশেই আরও ছয় বৎসর তিনি আইন শিক্ষায় অতিবাহিত করেন। কিন্তু কোনও প্রকার সাংসারিক কাজ-কর্ম্মেই তাঁহার রুচি বা প্রবৃত্তি দেখা গেল না। এই শিক্ষানবিশীর সময়ের মধ্যেও তিনি যে বিশেষ ভাবে সাহিত্য আলোচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। বোকাচিও নিজে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি সাত বৎসর বয়সেই কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তরুণ বয়সে যখন তাঁহার মন নমনীয় ছিল, তখন সেই স্বাভাবিক রুচি-প্রবৃত্তির পথে পিতা যদি উৎসাহ জোগাইতেন তবে তিনি পরিণত বয়সে পৃথিবীর এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন! বৈষয়িক ব্যাপারে শিক্ষানবিশীর সময়ে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকের সংস্পর্শে বোকাচিও যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, বোকাচিও (বোধ হয় পঁচিশ বৎসর বয়সে) নেপলস্ সহরে এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ কবি ভার্জ্জিলের সমাধির নিকটে আসেন। সমাধির নিকটে দাঁড়াইয়া অমর কবির খ্যাতির কথা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে অনুশোচনা জাগিয়া উঠিল যে, তাঁহার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিষয়-কর্ম্মে চেষ্টা করিতে গিয়া বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে। ইহাতে সচেতন হইয়া তিনি সকল বিষয়-কর্ম্ম ছাড়িয়া কাব্য-সাহিত্য-চর্চ্চায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। পিতাও অগত্যা নিজ সঙ্কল্প হইতে বিরত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। বোকাচিও এক দিন সকাল বেলা সান্ লরেঞ্জো ধর্ম্মমন্দিরের মেরিয়া নামে এক রমণীর দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। বোকাচিওর বয়স তখন পঁচিশ বৎসর। ঐ রমণী ছিলেন বোকাচিও অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় এবং অপরের বিবাহিতা পত্নী—নেপ্‌লসের রাজা রবার্টসের কন্যা। এই রমণীই বোকাচিওর কাব্য-সাহিত্যে ফিয়ামেত্তা নামে খ্যাত—যেমন দাঁতের বিয়াত্রিস্, এবং পেত্রার্কের লরা। পেত্রার্কও লরার প্রথম দর্শন লাভ করেন একটি ধর্ম্মমন্দিরে এবং লরাও ছিলেন বিবাহিতা রমণী। যেমন লরার তেমনি ফিয়ামেত্তারও বাস্তব জীবনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। বাস্তব জগতে লরার সঙ্গে পেত্রার্কের এবং ফিয়ামেত্তার সঙ্গে বোকাচিওর কতটুকু সম্পর্ক ছিল তাহাও অস্পষ্ট। দাঁতের বিয়াত্রিস্, পেত্রার্কের লরা এবং বোকাচিওর ফিয়ামেত্তা—তিন ক্ষেত্রেই অসম্পর্কতার সঙ্গে মানসী কল্পনার সংমিশ্রণ আছে, স্বীকার করিতে হয়—অপর পক্ষে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইঁহারা তিন জনেই বাস্তব জগতের রমণী ছিলেন এবং তিন জনেই নিজ নিজ কবি-প্রণয়ীর চিত্ত এবং মনের উপরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

ফিয়ামেত্তা বোকাচিওর সাহিত্যে অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন—সম্ভবতঃ দাঁতের বিয়াত্রিস্ এবং পেত্রার্কের লরার অপেক্ষাও অনেক বেশী। বোকাচিওর প্রথম রচনা ফিলোকপে ইঁহারই অনুরোধে রচিত; টেসিডী এবং ফিলোষ্ট্রাটো ইঁহারই নামে উৎসর্গিত; ইনিই আমেতো এবং ফিয়ামেত্তার নায়িকা। ইনি আবার দেখা দিয়াছেন আমোরসো সিপানেতে লা কাচিয়া দি ডায়েনা এবং নিনকালে ফাইসোলানোটে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'ডেকামেরন' ইঁহার প্রভাবের অবনত অবস্থায় রচিত হইলেও সেখানেও গ্রন্থকার ইঁহাকেও অর্ঘ্যদান করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে বোকাচিও ইঁহাকেই তাঁহার কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল—কবিগণ প্রত্যেকেই এক-একটি রমণীকে তাঁহাদের কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে গ্রহণ করিতেন। ঐ রমণীকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহাদের চিন্তা ও ভাব দানা বাঁধিয়া উঠিত, তাহার ফলে বাস্তব জগতের ঐ রমণীই তাঁহাদের কল্পনায় মানসীরূপে ফুটিয়া উঠিতেন।

এই ফিয়ামেত্তাকে কেন্দ্র করিয়াই বোকাচিওর সাহিত্য রচনা আরম্ভ হয়। নায়ক এক জন রাজকুমারীর প্রেমে আকৃষ্ট এবং রাজকুমারীর নিকট হইতে যথাকালে প্রেমের প্রতিদান লাভ করেন; কিন্তু পরে রাজকুমারী নায়ককে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তথাপি নায়কের চিত্তে রাজকুমারীর স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। এইরূপ মূল কল্পনাই প্রকারভেদে গদ্যে পদ্যে রচিত পর-পর কতকগুলি গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায়। প্রথম গ্রন্থ ফিলোকপে—ইহার আখ্যান ভাগ হয়তো তুর্কীস্থান হইতে গৃহীত! এ কাহিনী ইতালীতেও সর্ব্বজনপরিচিত ছিল। ফিয়ামেত্তার অনুরোধেই বোকাচিও তাঁহার অতুলনীয় শিল্প-প্রতিভায় মণ্ডিত করিয়া এই আখ্যায়িকাটিকে নব-রূপ দেন। বর্ত্তমান কালের মানদণ্ড হিসাবে এই গ্রন্থের শিল্পরীতি এবং ভাষা হয়তো সমর্থন পাইবে না; কারণ, প্রাচীন আদর্শের, মধ্যযুগের এমন কি সমসাময়িক যুগের রীতিরও অনুসরণ না করিয়া ইহার মধ্যে সকল রীতির সংমিশ্রণ ঘটানো হইয়াছিল। তখনকার মানুষের মন প্রাচীন এবং মধ্য-যুগের আদর্শ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কোন নূতন আদর্শের জন্য যেন অপেক্ষা করিয়াছিল! সুতরাং বোকাচিওর গ্রন্থ সকলকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া দিল—এই গ্রন্থ লইয়াই নবযুগের সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বলা যায়। এই একখানি মাত্র গ্রন্থ রচিত হইলে ইতালীয় সাহিত্যে ইহার স্থায়ী ফল কিছু হইত কি না নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না! কিন্তু বোকাচিওর রচিত এই পর্য্যায়ের সকল গ্রন্থের সমষ্টিগত ফলে ইতালীয় সাহিত্য সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে যে বিশিষ্ট ধারা প্রবর্ত্তিত করিল ইহা অবিসংবাদিত।

ফিলোকপের পরে আমেতো—গদ্যে এবং পদ্যে রচিত একটি প্রেমের উপাখ্যান। বর্ব্বর এবং অসংস্কৃত চিত্ত প্রেমের মোহন স্পর্শে রূপায়িত হইয়া কি করিয়া মানবীয় রূপে উত্তীর্ণ হইতে পারে তাহারই চিত্র। এই পরিকল্পনা ডেকামেরনের একটি গল্পেও অল্পরূপে ব্যঞ্জিত হইয়াছে! এ গ্রন্থের আর একটি বিশেষত্ব, কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা বা ছোট ছোট গল্প একই যোগসূত্রে গ্রথিত হইয়া মূল আখ্যায়িকাকে গড়িয়া তুলিয়াছে! নবযুগের রস-সাহিত্যে বিশেষতঃ কাব্যে ইহা একটি লক্ষ্যণীয় গুণ এবং সাহিত্যের এই বিশিষ্ট ধারা নির্দ্দেশে বোকাচিওর কৃতিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

আমেতোর পরে প্রায় সেই সময়েই রচিত আমোরসো সিপানে কাব্য। ফিলোকপে এবং আমেতোর পরে আবার দেখিতে পাই,

পূর্ব্ববর্ত্তীদের অনুসরণ সেই রূপক সাহিত্য—আমোরসো সিপানে স্পষ্টতঃ দাঁতের এবং পেত্রার্কের সহিত প্রতিযোগিতার চেষ্টা। মানবাত্মার অভিযান—বিদ্যা, খ্যাতি, ধনসম্পদ, প্রেম এবং অদৃষ্টের মধ্য দিয়া জীবনের চরম রসোপলব্ধি। কবি বলিতেছেন, এইখানেই বুদ্ধিবৃত্তির সহিত অধ্যাত্ম শক্তির সম্মেলন। সুখোপলব্ধির চেষ্টায় মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের অভিলাষসমূহ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু এত আড়ম্বর করিয়াও কবি রসোত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই—শেষ পরিণতিতে দেখিতে পাই, কামনার চরম রসোপলব্ধি মাত্র! মধ্যযুগে নারী ছিল পুরুষের নিকট দেবী অথবা মানুষের সেবাদাসী মাত্র, কখনও পুরুষের সমকক্ষ হইয়া তাহার সহচরীরূপে স্থান পায় নাই; নবযুগে আসিয়া কিন্তু তাহার স্বাধীনতা লাভ ঘটিল, পুরুষের সহচরীরূপে স্বস্থানে সহজ অধিকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। অথচ প্রাচীনপন্থী লেখকদের ভাবা এবং শিল্পরীতির প্রভাব অতিক্রান্ত হয় নাই। সে জন্য একটা অসামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যভিচার, এরূপ বিপরীত-ধর্ম্মী বিচিত্রতার সমাবেশ যুগ-সন্ধিক্ষণে বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে।

তার পর নিনকালে কাইসোলানো পদ্যে রচিত একটি গ্রাম্য গাথা—নিঃসন্দেহ ফিয়ামেত্তার প্রভাবাধীনে রচিত। সে হিসাবে এবং বিষয়-বস্তু হিসাবেও আমেত্তোর সঙ্গে ইহার থানিকটা সম্পর্ক আছে। পার্ব্বত্য প্রদেশের এক মেষপালকের সহিত একটি অপ্সরার প্রণয়-কাহিনী—পার্ব্বত্য প্রদেশের বন্য অবস্থা হইতে সভ্য-জগতের সংস্কৃতিতে উন্নতির মূলে রচিত উপন্যাস। এই শিল্পরীতি তাঁহার উত্তর-সাধকদের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করে। এই কাব্যে যে ছন্দ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও ছিল অভিনব। একেবারে নূতন না হইলেও বোকাচিওই এই ছন্দরীতি লোক-গাথার প্রাকৃত ক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়া ইহাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করেন।

এই ছন্দ-রীতিরই অনুসরণে বোকাচিও আরও দুইখানি কাব্য রচনা করেন—লা তেসীডে এবং ফিলোষ্ট্রাটো। দু'খানি কাব্যই ফিয়ামেত্তার সান্নিধ্যে রচিত বলিয়া মনে হয়। ইংরেজের নিকট এই দু'খানি কাব্যেরই বিশিষ্ট মূল্য আছে; কারণ, ইংরেজী সাহিত্যের উপর এই দুইখানি কাব্যের প্রভাব বেশ ব্যাপক। তেসীডে একটি প্রাচীন প্রেম-গাথা বোকাচিও কর্ত্তৃক যুগোপযোগী ভাষায় প্রথম রূপান্তরিত হয়। প্যালামন এবং আরসাইটে বহু কালের পুরাতন বন্ধু—এক দুর্গে বন্দী অবস্থায় এমিলিয়াকে দেখিয়া উভয়েই প্রেমাবিষ্ট হয়। পরস্পরের মধ্যে বন্দোবস্ত হয় যে, সুফল লাভের জন্য তাহারা ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রতিযোগিতা করিবে। আরসাইটে বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভ করে এবং এই সুযোগে বন্ধুর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এমিলিয়ার নিকট প্রেম-নিবেদন করে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে আরসাইটে নিহত হয়। সুতরাং প্যালামনই অবশেষে এমিলিয়াকে পত্নীরূপে লাভ করে। ইংরেজ কবি চসার এই কাহিনীকেই রূপান্তরিত করিয়া **Knights Tale** রচনা করেন। এই কাহিনীই সেক্সপীয়ার এবং ফ্লেচারের হাতে নাট্যরূপ লাভ করে—**The Two Noble Kinsmen.** ড্রাইডেন ইহারই রূপান্তর সাধন করেন তাঁহার অতুলনীয় কাব্য **Palaman and Arcita**-এ। ইংরেজী সাহিত্যে এই কাহিনীর ধারা আরও ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে। এ সকলের পথ-প্রদর্শক হিসাবে সকল কৃতিত্ব বোকাচিওরই প্রাপ্য।

পরবর্ত্তী কাব্য ফিলোষ্ট্রাটোর নিকটও ইংরেজী সাহিত্য ঋণী। ইহারই ভিত্তিতে চসারের ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা এবং ইহাকেই নাট্যরূপ দিয়াছেন সেক্সপীয়র ট্রয়লাস ও ক্রেসিডাতে। মহাকাব্যের আকারে আরম্ভ করিলেও ইহা প্রকৃত পক্ষে পদ্যে রচিত উপন্যাস, ইহার গল্পাংশে পাই এক জন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচনাবলীর কৃতিত্ব এবং মনোবিশ্লেষণ। সমস্ত রচনার মধ্যে আছে কামনার নগ্ন চিত্র; অনেক স্থলে অত্যন্ত বীভৎস ভাবে তাহা চিত্রিত। কিন্তু সেই সকলের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির অসাধারণ শিল্প-কৃতিত্ব এবং তাঁহার দরদী চিত্তের স্বতঃ উৎসারিত উচ্ছ্বাস। প্রকৃত পক্ষে এই কাব্যখানি হইয়াছে কাম-কাহিনীর মহাকাব্য।

ফিয়ামেত্তার প্রভাবাধীনে রচিত এই সকল গ্রন্থকে এক পর্য্যায়ে ফেলা যায়! এই সকল রচনায় যেমন বিশিষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই যথেষ্ট ত্রুটিও লক্ষিত হয়। অনুসন্ধিৎসা আছে, চিন্তায় মৌলিকতা আছে, কল্পনায় প্রাচুর্য্য আছে, বর্ণনায় ঐশ্বর্য্য আছে, প্রকাশভঙ্গীতে প্রখরতা আছে, কিন্তু কাব্য হিসাবে ত্রুটি আছে অনেক। রচনা অনেক স্থলে অশ্লীল; অনেক স্থলে নিদারুণ শিথিলতা, মাত্রাজ্ঞানের দিকেও নজর নাই। কাব্য হিসাবে যে অংশটুকু ভালো তাহাতে যেন কবির নিজের ব্যক্তিগত বাসনা-কামনা স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছে! যে সব স্থলে বাক্যের অবকাশ আছে সে সব অংশের প্রতি কবির সহানুভূতি বা দরদ দেখা যায়, অবশিষ্ট অংশে কবি যেন উদাসীন। কাব্যের প্রত্যেক অংশের যে বিশিষ্ট মূল্য আছে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রচনা করিবার মত দরদের এবং সংযমের অভাব—কোন মতে রচনা সমাপ্ত করিয়া ফেলিবার জন্য অধৈর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়! কাব্যের বর্ণিত সকল ঘটনা এবং ভাবরাশি হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া যে নির্লিপ্ত দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর প্রধান গুণ, তাহার একান্ত অভাব।

এই সকল গ্রন্থের পরে ফিয়ামেত্তার নাম করিয়া রচিত তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস "লামোরোসা ফিয়ামেত্তা"। ফিয়ামেত্তা স্বয়ং এই গ্রন্থের নায়িকা। নায়ক কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে যাইতে বাধ্য হয়। নায়িকা লোকমুখে শুনিতে পায় যে, নায়ক অন্য রমণীতে আসক্ত। তখন সে নৈরাশ্যে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, কিন্তু প্রেমাস্পদের জন্য তাহার ব্যাকুলতা আরও তীব্র হয়। নায়িকা বিগত জীবনের প্রেমপূর্ণ দিনগুলির কথা স্মরণ করে। নায়কের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ তীব্র হইয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু নায়কের প্রত্যাগমনের জন্য নায়িকার ব্যাকুল আবেদনে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটে। নায়ক তাহার জীবন হইতে অস্তমিত বটে, কিন্তু সে আবার ফিরিয়া আসিতে পারে এবং নায়িকাকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারে। এই গ্রন্থের ঘটনার পরিণতি দেখিয়া এবং প্রেমের ব্যাকুলতায় স্বভাবতঃই মনে জাগে যে, ইহাতে গ্রন্থকারের নিজ জীবন-কথার কোন ইঙ্গিত আছে না কি? ব্যাপার বাস্তবিকই একটু জটিল। বাস্তব জীবনে বোকাচিওর সঙ্গে ফিয়ামেত্তার যে সম্পর্ক ছিল, তাহা সেই সময়েও অনেকটা জানাজানি হইয়া পড়িয়াছিল। সেরূপ ক্ষেত্রে ফিয়ামেত্তা এবং তাহার স্বামী বর্ত্তমানে বোকাচিও যে এরূপ আবেগময় প্রেমকাহিনী প্রকাশ করিয়া ফেলিবেন তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সে জন্য অনেকে মনে করেন, গ্রন্থ-রচনার বহু কাল পরে উহা লোক-সমক্ষে প্রকাশিত হয় অথবা এই গ্রন্থ বোকচিওর রচনাই নয়।

কিন্তু এ গ্রন্থ অপরিসীম শিল্পকৃতিত্বের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। অসঙ্গত প্রণয়ের ক্ষণকালের জন্য তৃপ্তিলাভ পরে রোগ-যন্ত্রণা ও আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিজনিত নৈরাশ্য-পরিপূর্ণ অভিশপ্ত জীবন, প্রণয়ে ঈর্ষার রুদ্ধ আবেগ এবং বিগত জীবনের স্মৃতির ব্যথায় এমন পরিপূর্ণ চিত্র—এমন অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য সত্যই অতুলনীয়। এই গ্রন্থে ঘটনার সমাবেশ এবং সমস্যা-সমাধানের প্রতিপদে অদ্ভুত শিল্প-কৃতিত্বের পরিচয়, অপর পক্ষে নারী-হৃদয়ের মর্ম্ম-ভেদী বেদনার প্রখর বিশ্লেষণও অসাধারণ। য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই গ্রন্থই সর্ব্বপ্রথম এবং সার্থক মনোবিশ্লেষণ-মূলক উপন্যাস। নবযুগের কথা-সাহিত্যের উপরেও ইহার প্রভাব ছিল বহুদূর-প্রসারী। বোকাচিও যদি এই গ্রন্থের রচয়িতা হন তবে বলিতে হয় যে, অবশেষে শিল্পের ক্ষেত্রে নিজ সাধনার ধারার সন্ধান পাইয়াছেন।

অবশেষে প্রকাশিত হয় প্রসিদ্ধ গল্প-সংগ্রহ "ডেকামেরন"। এই গ্রন্থ-রচনার সমাপ্তির সঙ্গে বোকাচিওর সাহিত্য-জীবনের বিশিষ্ট গৌরবময় এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে বলা যায়। ইহা বোকাচিওর সাহিত্য-সাধনার কীর্ত্তিস্তম্ভ।

পেত্রার্ক বোকাচিও অপেক্ষা বয়সে তের বৎসরের বড় ছিলেন এবং সাহিত্যে এবং কবি-খ্যাতিতে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। বোকা-চিওর চিত্তে সে জন্য শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। ইঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় সম্ভবতঃ ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে এবং সেই সময় হইতে ইঁহাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়, তাহা সমগ্র য়ুরোপের পক্ষে কল্যাণকর এবং জগতের সাহিত্য ইতিহাসেও সে এক গৌরবময় অধ্যায়।

বোকাচিওর সাহিত্য-সাধনার প্রধান অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছিল পেত্রার্কের প্রভাবে। তাঁহার জীবনের আদর্শ যেমন স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তেমনই সাহিত্য-সাধনাও এক নূতন পথে প্রবাহিত হইল। এই সময় হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়া তিনি পর্য্যায়-ক্রমে পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল, জীবনচরিত—এই সকল বিষয়ে কতক-গুলি গ্রন্থ রচনা করিলেন। বহু অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে রচিত এই সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদর্শ বলিয়া গণ্য না হইতে পারে, কিন্তু সে-সময়কার শিক্ষিত লোকদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের পক্ষে ইহাদের অসামান্য মূল্য ছিল। বর্ত্তমান যুগের পুরাণ এবং জীবনচরিতের যে সকল অভিধান রচিত হয়, বোকাচিওর গ্রন্থমালা তাহারও পথ-প্রদর্শক।

পেত্রার্কের পরামর্শে বোকাচিও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করেন এবং তিনিই য়ুরোপে গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়নের প্রবর্ত্তন করেন। গ্রীক সাহিত্যে অনু-রাগের ফলে বোকাচিও নানা অসুবিধা সত্ত্বেও লিওনটিয়াস পাইলেটাস্ নামে এক ব্যক্তিকে নিজ গৃহে আতিথ্য দান করেন এবং তাঁহার সহযোগিতায় হোমারের কাব্য ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদ খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর না হইলেও পেত্রার্ক অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত ইহা গ্রহণ করেন এবং এই অনুবাদই হোমারের কাব্যকে বর্ত্তমান জগতের নিকট পরিচিত করে।

এই সময়ে বোকাচিওর বয়স যখন চল্লিশ বৎসর পার হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন তিনি এক বিধবার প্রতি আকৃষ্ট হন: কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাচ্ছিল্য এবং অপমান লাভ করেন। ইহার ফলে ল্যাবারিন্টো দা মোরে অথবা ইন্‌কোবাচিও নামে একখানি শ্লেষাত্মক রচনা—এই রচনায় শুধু সেই মহিলাকেই নয়, তিনি সমস্ত নারী জাতিকে তীব্র কশাঘাত করেন।

১৩৬১ খৃষ্টাব্দে একটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, যাহাতে বোকাচিওর চরিত্র সম্বন্ধে খানিকটা আলোক-পাত হয়। এক জন ধর্ম্মযাজক মৃত্যুশয্যায় দিব্যদৃষ্টি এবং তাঁহার সমসাময়িক কয়েক জন প্রসিদ্ধ লোকের সম্পর্কে দৈবনির্দ্দেশ লাভ করেন। সমাধি অবস্থা হইতে জাগরিত হইয়া তিনি এক জন শিষ্যকে ঐ সকল লোকের নিকট প্রেরণ করিলেন এই বাণী পৌছাইয়া দিবার জন্য—যদি তাঁহারা যথাসময়ে অনুতাপ না করেন তবে তাঁহাদের জীবনের পাপরাশি অন্তহীন ধ্বংসের পথে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে বোকাচিও ছিলেন। তিনি এই বার্ত্তা পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং চিন্তামাত্র না করিয়া সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিবেন, নিজের গ্রন্থাগার বিলাইয়া দিবেন, নিজের রচিত কাব্য-উপন্যাস-জাতীয় সমস্ত লঘু সাহিত্য নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবেন এবং নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। সৌভাগ্যবশতঃ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে তিনি পরামর্শ করিবার জন্য পেত্রার্কের নিকট পত্র লিখিলেন। উত্তরে পেত্রার্ক যে পত্র লিখিলেন তাহাতে পরিণত-বুদ্ধির সিদ্ধান্ত ছিল এবং বন্ধুর প্রতি সহানুভূতিও ছিল। তিনি মৃত্যুশয্যায় প্রাপ্ত দৈব-নির্দ্দেশের মূল্য স্বীকার করিলেন না। তিনি লিখিলেন যে, পরিণত বয়সে ধর্ম্ম এবং জীবনের পরিণতির বিষয়ে চিন্তা করা বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তিনি যে কাব্য-সাহিত্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছেন, ধর্ম্মসাধনার সহিত তাহার কোনও বিরোধ থাকিতে পারে না।

বোকাচিও বন্ধুর এই পরামর্শে অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলেন এবং মোটের উপর এই পরামর্শই গ্রহণ করিলেন। লঘু সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা ঘুচিল না। তিনি বন্ধুগণকে নিজের রচিত ডেকামেরন গ্রন্থ পাঠ হইতে বিরত থাকিতে পরামর্শ দিলেন।

যেমন পেত্রার্কের প্রতি তেমনই দাঁতের প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। তিনি সম্ভবতঃ ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে ইতালীর ভাষায় দাঁতের একখানি জীবনচরিত রচনা করেন। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে দাঁতের ডিভাইনা কমেডিয়া কাব্যের নিজ হস্তলিখিত প্রতিলিপি পেত্রার্ককে উপহার দেন। সম্ভবতঃ দেশের শিক্ষিত জনগণের চিত্তে অনুরাগ সঞ্চার সম্পর্কে চেষ্টা হইতেই ফ্লোরেন্স নগরে দাঁতের ডিভাইনা কমেডিয়া কাব্যের অধ্যাপনার জন্য সরকারপক্ষ হইতে অধ্যাপক পদের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বোকাচিওই সেই পদের প্রথম অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হন।

১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে পেত্রার্কের মত বন্ধুর মৃত্যুতে তিনি মর্ম্মান্তিক অভিভূত হইয়া পড়েন। ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে ২১শে ডিসেম্বর বোকাচিও পরলোক গমন করেন।

শ্রীসত্যভূষণ সেন

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

মুখ-কমল

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন যুগ হইতেই কবিরা রমণী-মুখের উপমা দিতে কমলের নাম করিয়াছেন। মুখ-পদ্ম বা কমল-মুখ বলিতে আমরা বুঝি, যে-মুখে কমলের মত দিব্য বিভা, যে-মুখ কমলের মত কোমল, ললিত-সুকুমার! পদ্ম দেখিলে মন যেমন মোহিত হয়, নারীর মুখ হইবে তেমনি রমণীয়-কমনীয়।

১। মুখে সাবান মাখা

সংসারের নানা কাজে, অভাব-অভিযোগের দুশ্চিন্তায় আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের মনে সুখ নাই, আরাম-বিরাম তাঁদের প্রায় স্বপ্নে পরিণত হইতেছে! তার উপর সংসারে স্বচ্ছলতা-সম্পাদনের জন্য আজ বহু কিশোরীকে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইয়াছে। সে জন্য অনুযোগ চলে না। দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচাইবার জন্য মেয়েরা যদি নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামেন, তাহাতে লজ্জা নাই। অন্ন-বস্ত্রের জন্য নিরুপায় হইয়া, দাসী-বাঁদীর মত পরের আশ্রয়ে পড়িয়া থাকাতেই লজ্জা—তাহাতে নারীত্বের অমর্য্যাদা হয়, মনুষ্যত্বও লোপ পায়। সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাব দোষের বলিয়া মনে করি না।

কিন্তু কথা হইতেছে, মেয়েরা মেয়ে থাকুন চাল-চলনে; পুরুষালি-চালে নিজেদের না গড়িয়া তোলেন! পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরা আজ নানা কাজ করিতেছেন—কারখানায় কাজ করিতেছেন—তবু রমণী-সুলভ লালিত্যটুকু বজায় রাখিতে তাঁদের এতটুকু ঔদাস্য নাই। আমাদের দেশে এই অল্প দিনেই যে-সব মেয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া ছুটাছুটি করিতেছেন, তাঁদের পাণ্ডুবর্ণ, অস্থিসার দেহ, শ্রীহীনতা, মলিন কঠিন মুখ দেখিয়া মন ক্ষোভে-দুঃখে ভরিয়া ওঠে। এমন করিয়া নিজেদের হত্যা করিলে চলিবে কেন? আমাদের দেশে কথা আছে, যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না?

অতএব যত কাজ, যত ছুটাছুটিই করুন, দেহখানিকে বজায় রাখিতে হইবে—স্বাস্থ্য যেন না নষ্ট হয়! এবং সর্ব্বোপরি নারীর যা সম্পদ… রূপশ্রী এবং কোমল-লালিত্য, সেটুকু আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখা চাই।

সে জন্য চাই কাজের শেষে নিত্য একটু ব্যায়াম-প্রসাধন। সেই ব্যায়াম-প্রসাধনের কথা বলি! রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্ব্বেও ব্যায়াম-প্রসাধন করিতে হইবে নিত্য, নিয়মিত ভাবে।

১। সাবান-জলে মুখ-হাত বেশ করিয়া ধুইবেন—আজ-কাল বাজারে যে তোয়ালে-রুমাল উঠিয়াছে, সেই তোয়ালে-রুমাল জলে ভিজাইয়া তাহাতে সাবান—ভালো সাবান—মাখাইয়া মুখে-গালে কপালে-ঘাড়ে বেশ জোরে জোরে ঘষুন—১নং ছবির ভঙ্গীতে। এই ঘর্ষণ-মর্দ্দনে মুখে-গালে রক্ত-চলাচল-ক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং শ্রম ও অবসাদজনিত সকল ক্লেদ-গ্লানি দূর হইবে! সাবান মাখা হইলে গরম জলের ঝাপটা দিয়া সাবান ধুইয়া ফেলিবেন, তার পর আবার ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুইবেন।

২। ঘষিয়া ঘষিয়া লোশন্

২। মুখ ধোওয়ার পর শুষ্ক নরম গামছা বা তোয়ালে ঘষিয়া মুখের জল মুছিবেন। তার পর মুখে ঘষিয়া ঘষিয়া মাখিবেন

৩। চোখের উপরে-নীচে

খানিকটা গোলাপ জলে বিশ-পচিশ ফোঁটা গ্লিসারিণ মিশাইয়া সেই লোশন্ ২নং ছবির ভঙ্গীতে। আঙুল দিয়া শান্ত মৃদু ভাবে ঘষিবেন।

৩। এবার ৩নং ছবির ভঙ্গীতে চোখের উপরের পাতা ও নীচের

অংশটুকু দু'টি আঙুলে টিপিয়া ধীরে ধীরে তোলা-নামা করিবেন প্রায় পাঁচ মিনিট।

৪। তার পর ঐ গোলাপ জল ও গ্লিসারিণ-মিশানো লোশন্

৪। চোখের পাতার উপর

লইয়া আঙুলে ঘষিয়া ঘষিয়া চোখের পাতার উপরে ঘষিয়া ৪নং ছবির ভঙ্গীতে লাগাইবেন প্রায় তিন-চার মিনিট ধরিয়া।

অন্ততঃ পনেরো মিনিট-কাল মুখের গালের এবং চোখের উপরকার পাতায় এই লোশন্ মাখানো থাকিবে, তার পর ভিজা নরম তোয়ালে বা স্পঞ্জ ঘষিয়া এটুকু মুছিয়া ফেলিয়া শয্যা গ্রহণ করিবেন।

সকালে উঠিয়া প্রথম কর্ত্তব্য ঈষৎ গরম জলে মুখ ধুইয়া নরম গামছা বা তোয়ালে দিয়া জল মোছা। নিত্য এ ব্যায়াম প্রসাধন করিলে মুখের শ্রী, লালিত্য এবং কোমলতা কোনো দিন নষ্ট হইবে না।

এই সঙ্গে চাই প্রত্যহ আট ঘণ্টা বিশ্রামের ব্যবস্থা। ভোরে উঠিয়া এবং শয্যা-গ্রহণ-কালে এক গ্লাস করিয়া জল পান করিবেন।

স্বামি-স্ত্রী

বিবাহের পর কিছু কাল স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি জমাট-বাঁধা থাকে, দু'-চার বছর পরে সে ভাব প্রায় কেটে যায়। বহু ক্ষেত্রে স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক নিতান্ত "ফর্ম্মাল" দাঁড়ায়! কেন এমন হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ দরকার। মানুষ কি চায়? সঙ্গ সাহচর্য্য; স্নেহ-প্রীতি-মমতা; সম্ভ্রম-রক্ষা; আমোদ-কৌতুক। অজানায় তার বিরাগ, স্তুতিবাদে রুচি। মানুষ আত্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠা চায়; কৌতূহল পরিতৃপ্ত করতে চায়; অবিচারে বা ক্ষতিতে তার বিরক্তি।

বিবাহের পর এ-সবে যদি বিঘ্ন বা বিরোধ না ঘটে, তাহলেই স্বামি-স্ত্রী দু'জনের সম্পর্ক অটুট থাকে। যারা চায় সুখ-শান্তি, তাদের উচিত, যে-স্বামী, যে-স্ত্রী এ সুখ-শান্তি জোগাবেন সেই স্বামি-স্ত্রীর পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা।

পুরুষ চায় নারীর সঙ্গ-সাহচর্য্য—তার জন্যই বিবাহের পর স্ত্রীর মনোরঞ্জন করতে পুরুষ সব-কিছু করতে পারে। ত্রিশির রাক্ষসের শির নিয়ে এলে প্রেয়সী যদি খুশী হন—নব-বিবাহিত স্বামী সে-কাজে অগ্রসর হতে পরাঙ্মুখ হয় না। নারীর দেহ-মন তার কাছে বিপুল রহস্য। কৌতূহল-তৃপ্তির জন্য মনে উগ্রতা স্বাভাবিক। তারি জন্য স্ত্রীর দেহ-মনের সকল রহস্য জানবার উদ্দেশ্যে স্বামী তখন স্ত্রীর জন্য প্রাণোৎসর্গ করতেও কাতর হয় না। কিন্তু সে রহস্য নিত্যকার ঘরকর্ণায় যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে, রহস্য যখন আর রহস্য থাকে না, তখন পড়া-কেতাবের মত স্ত্রী হয় জীর্ণ! স্ত্রীর মধ্যে স্বামী তখন বৈচিত্র্য পায় না বলে তার সম্বন্ধে পুরুষের আর আগ্রহ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—তোমরা থাকবে কতক-জানা, কতক-অজানা—রহস্যের গুণ্ঠনে একটু ঢাকা,—তবেই না আমাদের বিভ্রম, সম্মোহ আর একাগ্রতা!

স্ত্রী-পুরুষ—পরস্পরের উপর পরস্পরের শ্রদ্ধা থাকা দরকার। স্বামী যদি ভাবেন, স্ত্রী নিরেট এবং স্ত্রী যদি ভাবেন, স্বামী অপদার্থ—পাষণ্ড—ভণ্ড—তাহলেই তাঁদের সম্পর্কে আর প্রীতি-মাধুর্য্য থাকে না! যে-স্বামী দিনের শেষে কাজকর্ম্ম চুকলে বাড়ী যাবার জন্য লালায়িত হন্ না, তিনি দুর্ভাগা! যে-স্ত্রীর মনে দিনান্তে স্বামি-দর্শনের বাসনা জাগে না, তাঁর জীবন শূন্য হয়ে গেছে। যেখানে সবচেয়ে ভালোবাসা পাবো, সেখানে যদি তার এক কণা না মেলে, তাহলে জীবনে কি-বা রইলো!

বিলাস-গহনায় বাড়ী-গাড়ীতে মর্য্যাদা মেলে,—কিন্তু মন তাতে পরিপূর্ণ হয় না, হতে পারে না।

মনকে পূর্ণ করতে হলে চাই দরদ স্নেহ ভালোবাসা মমতা মায়া। গৃহে যদি সে বস্তু না মেলে, তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেও পুরুষ থাকে দীন-দুঃখী; সংসারে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসে প্রতিপত্তি লাভ করেও যে-স্ত্রী স্বামীর ভালোবাসা পান না—তাঁর ভাগ্য ভিখারিণীও বোধ হয় কামনা করবে না!

স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কটুকু অনাবিল অক্ষয় অটুট রাখতে হলে চাই দু'জনে মনে-মনে মিল। দোষ-গুণ-সমেত পরস্পরকে সহ্য করে চলতে হবে,—ঝাঁজ-মেজাজ আর খেয়াল স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে চলবে না—চালাতে গেলে দু'জনের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। বিবাহের পর প্রথম দিকে চাই সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য! সহিষ্ণুতা নিয়ে স্বামি-স্ত্রী পরস্পরকে গ্রহণ করবে। সমগ্র বিবাহিত জীবনে যে ধৈর্য্য, সে সহিষ্ণুতা রক্ষা করতে পারলে তবেই জীবন মধুময় থাকবে—শত অভাব-অভিযোগেও সংসার অসহ্য হবে না।

গীতায় ভগবান

সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান ঈশ্বর—নিরাকার, নিষ্কলুষ। দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধের ন্যায় জীব এবং ব্রহ্মও এক অভিন্ন। তাঁহাতে এবং আমাতে প্রভেদ নাই; সোঽহং—তিনি এবং আমি এক।

ঈশ্বরই সত্য, ঈশ্বর ছাড়া আর সবই মিথ্যা; সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের চরম মীমাংসা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ—তাঁহার শরণ লওয়া। গীতার অন্তিম শিক্ষা—আদর্শ অনুপ্রেরণা ঐ ভগবানের বাণী—"পরিহরি সর্ব্বধর্ম্ম লও তুমি একমাত্র শরণ আমার।" ভগবানের প্রকৃতিস্থিত জীব ও জগতের জন্ম, পরিপুষ্টি এবং বিলোপ। তিনিই কর্ত্তা—তিনিই কর্ম্মী।

গীতায় ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই সকলের চেয়ে বড় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মানুষের ইচ্ছার কোনও মূল্য নাই—অর্থও নাই; ভগবানের ইচ্ছাতেই মানুষ পরিচালিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেখিয়া উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।"

(গীতা ১৮শ অধ্যায় ৬১।৬২ শ্লোক)

অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতে সর্ব্বহৃদয়ে বিরাজমান, মায়াবলে ভ্রমণে ঈশ্বরই অধিকারী, তাঁহার শরণ লও, শান্তি পাইবে, সুখ পাইবে।"

এই সংসারে কে আপন, কে পর—সে বিচারের প্রয়োজন কাহারও নাই। কে কাহাকে হত্যা করে? কর্ম্মফল সকলেই ভোগ করিবে। ভগবানের ইচ্ছাতেই জীবের বিনাশ। আত্মা অবিনাশী; আত্মাকে কিছুই বিনষ্ট করিতে সমর্থ নয়। ভগবান তাই অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "কেন তুমি এত বিষণ্ণ হও; জ্ঞানীর মত কথা বলিয়া অ-শোকে কেন শোকান্বিত হও। আমি জন্মি নাই, তুমি জন্ম নাই—নরপতিগণ কেহ জন্মে নাই অথবা জন্মিবে না এমন নহে; মানুষের দেহে জরা-মৃত্যুর সংঘটন হইবেই; দেহান্তরপ্রাপ্তি তাহাও অবশ্যম্ভাবী, ধীর-বুদ্ধি জন তাহাতে বিমুগ্ধ অথবা বিচলিত হয় না।" (গীতা ২য় অধ্যায় ১১।১২।১৩ শ্লোক)

বেদনা পাইয়া সে বেদনা সহ্য করা মহৎ গুণ। সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া আপন আত্মাকে পরব্রহ্মের পদাশ্রিত ভাবিতে হইবে: ভোগাসক্তি হইতে দূরে থাকিতে হইবে, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে; সদা প্রসন্নচিত্ত থাকিতে হইবে—যথার্থ সুখ বাস্তব স্বাচ্ছন্দ্য তাহা হইলেই পাওয়া সম্ভব হইবে—ইহা গীতার শিক্ষা। শ্রীভগবান তাই অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বা স্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি।" (২য় অঃ ৭২ শ্লোক)

জন্মের পর মৃত্যু সে ত অনিবার্য্য; যে মৃত্যুতে পরব্রহ্মের পদাশ্রিত হওয়া যায় সেইরূপ মরণই কামনা করিতে হইবে—ঈশ্বরকেই প্রকৃত বলিয়া ধ্যান করিতে হইবে—অবিনশ্বর বলিয়া মানিতে হইবে।

সংসারধর্ম্ম পালন করাও দেহীর একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাও গীতার শিক্ষা—শ্রীভগবানের আদেশ। কর্ম্ম করিতে হইবে, সন্ন্যাস গ্রহণেই শুধু সিদ্ধিলাভ হয় না। (গীতা ৩য় অঃ ৪র্থ শ্লোক)

কর্ম্ম করিতে হইবে এবং সর্ব্বকর্ম্মের উৎস বলিয়া সেই একমাত্র পরব্রহ্মকেই স্বীকার করিতে হইবে। কর্ম্ম করাই মানুষের ধর্ম্ম, মানুষ কর্ম্ম করিবে; কর্ম্ম করিয়া আমি কর্ম্মকর্ত্তা, ইহা বলিয়া দম্ভ করিবে না—সমস্ত কর্ম্মের মূল, আসক্তির উৎস, অভ্যাসের অঙ্কুর শ্রীভগবান; তিনিই পরমপিতা—পরম ধাতা—আরাধ্য দেবতা। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মানুষ কর্ম্ম করে—যোগান দেন শ্রীভগবান! সমস্ত চিন্তা সমস্ত ভাব শ্রীভগবানের উদ্দেশে। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান বলিতেছেন

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।" (৩য় অঃ ৩০ শ্লোক)

কে তুমি? কে আমি? কিসের দুঃখ? কিসের চিন্তা? সকলই সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের জন্য—তাঁহারই আদেশে—তাঁহারই ইচ্ছায়। জীবের জীবন নিছক কল্পনা—ভোজবাজী। ভগবান বলিতেছেন, "ইন্দ্রিয়ই শ্রেষ্ঠ নহে, মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ; আবার বুদ্ধি মন হইতে এবং পরমাত্মা বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ। এই তত্ত্ব সত্য জানিয়া আত্মা আত্মাতে নিশ্চল করত এই কামরূপ শত্রু ধ্বংস কর।" (গীতা ৩য় অধ্যায় ৪২।৪৩ শ্লোক) পরমাত্মা কি? নিজেকে ক্ষুদ্র জানিয়া মহান্ পরব্রহ্মকে মহৎ জ্ঞান করত তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া অহোরাত্র তাঁহারই ধ্যান করিতে হইবে। সকলই অসত্য—একমাত্র ভগবানই শাশ্বত—সত্য।

ভগবানকে বিশ্বাস করা—সকল কাজের জন্য তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা—তাঁহাকে সর্ব্বলোক, সর্ব্বভূতের মহেশ্বর জ্ঞান করা, সর্ব্ব কর্ম্ম তাঁহার ইচ্ছায় সুসম্পন্ন হইতেছে, এইরূপ মনে করিয়া সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত থাকা গীতার শিক্ষা—গীতার ধর্ম্ম। অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ এই উভয়ের কোন্‌টি শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান উত্তর দিলেন—

"সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে।"

(৫ম অধ্যায় ২য় শ্লোক)

অর্থাৎ কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তিসাধক, পরন্তু উভয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ প্রশংসনীয়। ভোগলালসার মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া ভগবানকে পাওয়ার সাধনাই শ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমান যুগের বিশ্বকবিও তাই বলিতেছেন, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" সর্ব্ববন্ধন ছিন্ন করিয়া সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ভগবানকে পাওয়ার বাসনা ও মুক্তিলাভের ইচ্ছা কোনও মতেই শ্রেয়ঃ নহে। পৃথিবীতে কর্ম্ম করিতে মানুষের জন্ম; কর্ম্ম ভুলিয়া যে কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা ক্ষতিকর। সাম্যভাবে থাকিয়া ইহলোককে স্বর্গ মনে করত পরব্রহ্মের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দেওয়াই জীবনের সার্থকতা। গীতার ধর্ম্ম এবং বাণীও ইহাই। "কোনও কর্ম্মের ফলে স্পৃহা নাই—যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেই; যে ইহা স্মরণ রাখিবে সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী—যথার্থ যোগী।" (গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১ম শ্লোক)

সমস্ত তপস্যার সার—শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে যে নিজকে বিসর্জ্জিত করিতে পারে, কোনও লোকেই তাহার বিনাশ নাই! ভগবান তাই অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, কোনও কিছুর জন্যই ভাবিবার দরকার নাই! যাহা ঘটিবার,

তাহা অভ্যাস বশে ঘটিবেই। অযথা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝখানে থাকিবার কি হেতু আছে? তাঁহাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী হইবার উপদেশ দিতেছেন। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।"
(৬ষ্ঠ অঃ ৪৭শ শ্লোক)

অর্থাৎ—"মম মতে যোগিমধ্যে মদ্গত যাহার মন
শ্রদ্ধায় আমাকে ভজে,—সেই যোগী শ্রেষ্ঠতম।"

সাধনা অনেকেই করে কিন্তু সিদ্ধিলাভ কয় জনের ভাগ্যে ঘটে। এই জগৎসংসারের সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় সেই পরব্রহ্মেরই ইচ্ছাকৃত। পৃথিবীর সকল রসের সার—সর্ব্বভূতের প্রাণ সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান। রাজসিক, তামসিক এবং সাত্ত্বিক যে সমস্ত ভাবধারা প্রত্যেক দেহীর ভিতরে বর্ত্তমান—তাহা কাহারও স্বোপার্জ্জিত নহে, তাহা ভগবান হইতেই আবির্ভূত। পূর্ব্ব নাই পর নাই—অতীত নাই—ভবিষ্যৎ নাই—সমস্তই সেই পরব্রহ্ম; এই আকাশ, জল, বায়ু—ইহাদের কাহারও বিভিন্ন সত্তা নাই—সমস্তই নিয়মের অধীন—সেই নিয়মও আবার তাঁহারই আশ্রিত। এক জন্মে কাহারও ভগবান লাভ হয় না; লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহের পর সমস্তই ভগবান—এই জ্ঞান জন্মায়। তাঁহার জন্মও নাই—মৃত্যুও নাই; তিনি অক্ষয়—অব্যয়। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিতেছেন,

"বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন।" (৭ম অঃ ২৬ শ্লো)

অর্থাৎ 'হে অর্জ্জুন! অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালবর্ত্তী স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতগণকে আমি জানি, কিন্তু কেহই পরমাত্মস্বরূপ আমাকে জানে না।' মৃত্যু সময়ে যে লোক পরব্রহ্মের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া ওঁকার ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে পারে, সেই লোক ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। পুনর্জ্জন্মগ্রহণ নিতান্ত সুখের এবং শান্তির নয়, যে মানব তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়—অশেষ ক্লেশকর পুনর্জ্জন্ম তাহাকে আর গ্রহণ করিতে হয় না। সনাতন ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, আগম নিগম বেদ পুরাণের কর্ত্তা ব্রহ্ম—অহোরাত্র সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণকমল ধ্যান করিয়া—হে দেহি! কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও; কাজ করিয়া যাও। ফলাফল চাহিবার তুমি কে? যাহা সেই পরমপিতার ইচ্ছাকৃত—তাহা অবশ্য ঘটিবে। তুমি যে নিমিত্তমাত্র। গীতায় ঈশ্বরের মহাবাক্য ইহাই।

ভগবান কহিলেন—"হে অর্জ্জুন! আমি সমস্ত। আমিই ধারক, আমিই পালক। সকল কর্ম্ম আমার ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। অমরত্ব, মৃত্যু, সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ্য সমস্তের মূলীভূত কারণ আমি। ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাতে আত্মসমর্পণ কর, আমার শরণ লও, শান্তি পাইবে, সুখ পাইবে" (গীতা ১ম অধ্যায়)

ধী, হ্রী, শ্রী এবং সর্ব্বগুণ ও সর্ব্বভূতের আধার সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের শ্রী পাদপদ্মে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

গীতার "বিভূতিযোগ" নামক অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, যাহা কিছু মহান্ যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাদের সমস্তের মূল তিনি। তাঁহার ইচ্ছা বড়, তাঁহার কর্ম্ম বড়। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বকাল—সর্ব্বঋতু-সর্ব্ববিদ্যা এবং জলচর, বনচর, খেচর সমস্ত সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি তিনিই। যত কিছু ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত শ্রীসম্পন্ন সে সমস্তের নিজস্ব কিছুই নাই; গুপ্তবিদ্যা, অর্থকরী বিদ্যা সমস্তই তিনি—; সকলের সার সেই মহামহিমান্বিত শ্রীভগবান।

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।"
(১০ম অঃ ৪২শ শ্লোক)

অর্থাৎ, হে অর্জ্জুন! এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ জানিয়া ফল কি? আমি এই সমগ্র জগৎ একাংশমাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি।

ভগবান কহিলেন, ভক্তিই সম্পদ; ভক্তিতেই মুক্তি; সগুণ উপাসনাই মহান্! শ্রদ্ধার সহিত যাহারা তাঁহার উপাসনা করে, তাঁহার তত্ত্ব আলোচনা করে—, তাহারাই তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। বুদ্ধি স্থির রাখিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক সমস্ত ভূতের হিত কামনা করত ভগবানকে আরাধনা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। ভগবান স্বয়ং গীতায় অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"সংযমি ইন্দ্রিয়গণ সমবুদ্ধি সমুদায়
সর্ব্বভূত হিতে রত তারাই আমাকে পায়।"
(ভক্তিযোগ ৪র্থ শ্লোক)

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ভগবান্ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন প্রকার গুণের অবস্থা কি, এবং কোন্ গুণ দ্বারা আশ্রিত হইয়া কোন্ ফল লাভ করে।" ভগবান উত্তর দিলেন, "যে মানবের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য দেখা যায়, সে যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা হইলে সে নির্ম্মল লোকে বিনা ক্লেশে প্রবেশ করে; রজোগুণাশ্রিত মানব মৃত্যুর পর কর্ম্মাসক্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করে আর তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তি মৃত্যুর পর মূঢ়যোনি প্রাপ্ত হয়; ইহাই সত্য এবং প্রাঞ্জল।" (১৪ অঃ ১৪।১৫ শ্লোক) অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহাভাগ! কি প্রকার কাজ করিলে এই তিন গুণ অতিক্রম করা সম্ভবপর হয়?' তখন ভগবান উত্তর দিলেন, "যিনি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত নহেন—যাঁহার ভিতরে কামনার লেশমাত্রও নাই—যিনি সদা পরহিতচিন্তায় ব্যস্ত, তিনিই এই ত্রিগুণাতীত; যিনি পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে সমান জ্ঞান করেন, সুখ-দুঃখকে বিভিন্ন না বুঝেন, এই ত্রিগুণের অতীত তিনিই।" (১৪শ অধ্যায় ২৩।২৪ শ্লোক)

আমার আমিত্ব—আমার শ্রেষ্ঠত্ব ইহার কোন মূল্য নাই। আয়ু, মৃত্যু, খাদ্য ও ধনে আমার কোন অধিকার নাই—সমস্তই বিধাতার ইচ্ছাকৃত। তিনি যে ভাবে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবেই চালাইতে পারেন—ইহাতে বাধা দেওয়ার অথবা উচ্চবাচ্য করার অধিকার বাস্তবিক পক্ষে কাহারও নাই। ভোগলালসা বাসনা এবং কামনাকে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র সম্পদরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বাস্তবিক মানুষ নয়; মানুষরূপী অসুর। কামনা—সে ত একটা মোহ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।"
(২১শ শ্লোক ১৬শ অধ্যায়)

অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ—এ তিনটি নরকের ত্রিবিধ দ্বার; এইগুলি আত্মার নীচযোনিপ্রাপক; অতএব এই তিনটি সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে।

সমগ্র গীতা ব্যাপিয়া যে মাহাত্ম্য যে ভাবের সমাবেশ, তাহা লোক-শিক্ষার মহান্ উপকরণ। ধর্ম্ম ও সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ সফলতা গীতার প্রতি শ্লোকে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিজের মনকে সম্পূর্ণ দ্বিধাশূন্য করিয়া—নিজের বলিয়া কিছু নাই—সমস্তই সেই পরমপিতার ইচ্ছাকৃত, এই ধারণা মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়া মহান্ পরব্রহ্ম ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ প্রত্যেক দেহীর একান্ত কর্ত্তব্য।

এম, আলী নওয়াজ চৌধুরী (বি, এ)

—

ভূষণা ও রাজা সীতারাম

বাংলার ইতিহাসে যশোহরের প্রতাপাদিত্য রায়ের নাম এবং তাঁহার স্বাধীনতা-সংগ্রামের বহু বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। বারভূঞা অর্থাৎ বাংলার দ্বাদশটি প্রতাপশালী ভূস্বামীর মধ্যে এই রায়েরা ছিলেন প্রথম। ইঁহাদের পরেই উল্লেখযোগ্য ভূষণার মুকুন্দরাম এবং রাজা সীতারাম রায় প্রভৃতি। তাঁহাদের শৌর্য্য বীর্য্য এবং প্রতাপের বহু খ্যাতি ইতিহাসে বিশেষ স্থান না পাইলেও স্বাধীনতা-সংগ্রামশালী জাতির পক্ষে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত যে অসাধারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মুঘল সম্রাট্ আকবরের সময় সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত ভূষণা নামক স্থানে মুকুন্দরাম বাস করিতেন। ভূষণা সে সময় ছিল বর্ত্তমান ফরিদপুর এবং যশোহর জেলার বহু অংশ জুড়িয়া একটি চাকলা। এখনও যশোহর ও ফরিদপুর জেলার মাঝে মধুমতী নদীর পূর্ব্ব তীরে ভূষণা (অধুনা একটি গ্রাম মাত্র) অবস্থিত। ইহা মধুখালি হইতে চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণে। ভূষণার অপর পারে অর্থাৎ মধুমতী নদীর পশ্চিম তীরে মহম্মদপুর ছিল রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী—ইহা যশোহর জেলার পূর্ব্ব সীমানায়। ভূষণা ও মহম্মদপুর উভয়ই সীতারাম রায়ের কেন্দ্রস্থল ছিল। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জমিদার মুকুন্দরাম প্রথমে ভূষণার এক সামান্য জমিদার ছিলেন। পরে তিনি আপন বীরত্ব, প্রতিভা এবং বুদ্ধিবলে (ভূঞা) ভূস্বামীর শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া স্বাধীন হইবার প্রচেষ্টা করেন। কথিত আছে, আকবরের সময় টোডরমল্ল মুকুন্দরামকে ভূষণার জমিদার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকগণের অনুমান, মুকুন্দরাম প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেকের উৎসবে মুকুন্দরাম এবং তাঁহার পুত্র সত্রাজিৎ যোগ দান করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। মুকুন্দরামের পর সত্রাজিৎ ভূষণার ভূস্বামী হন এবং ভূষণার প্রতাপ তিনি অক্ষুণ্ণ রাখেন। তিনি প্রথমে জাহাঙ্গীরের পরে ঔরঙ্গজীবের এবং পরবর্ত্তী মুঘল সম্রাট্‌দিগের অধীনস্থ ফৌজদারদের সহিত বিবাদ করেন। পরে উভয় পক্ষে সদ্ভাব স্থাপিত হইলে সত্রাজিৎ মুঘলদের হইয়া দুষ্টের দমন এবং বিদ্রোহ দমন প্রভৃতি কার্য্য করিতেন।

মুকুন্দরাম এবং সত্রাজিতের পর প্রায় বহু দিন যাবৎ ভূষণার আর কোন খ্যাতি ছিল না। যে সময় মুঘলপ্রতাপ রীতিমত ম্লান হইয়া আসিয়াছে এবং মুর্শিদকুলী বাংলায় সুবেদার হইয়া বসিয়াছেন। সে সময় ভূষণায় সীতারাম রায়ের অভ্যুদয় ঘটে। সরকার-পক্ষ হইতে ভূষণায় এক জন করিয়া ফৌজদার থাকিতেন—জনৈক ফৌজদারের সাজোয়াল ছিলেন সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ রায়। তিনি ভূষণার নিকটে হরিহর নগরে বাস করিতেন। উদয়নারায়ণ সুবে বাংলার তৎকালীন রাজধানী ঢাকায় প্রায় যাতায়াত করিতেন। পুত্র সীতারাম বিদ্যাশিক্ষা-লাভের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনার রীতিমত চর্চ্চা করিতেন এবং নিজের একটি দলও গঠন করিয়াছিলেন।

সে সময় বঙ্গে দস্যুর অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। শাসক সম্প্রদায় হীনবল হইয়া পড়ায় চুরি ও ডাকাতি প্রায়ই লাগিয়া থাকিত; সীতারাম ও তাঁহার দল প্রথম প্রথম এই সমস্ত দস্যু-দমন করিয়া দেশবাসীর বিশেষ উপকার করেন। তাঁহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া নবাব (শায়েস্তা খাঁ) তাঁহাকে একটি জায়গীর দান করেন। অল্প দিন পরে বিদ্রোহী পাঠান করিম খাঁকে দমন করিবার ভার নবাব সীতারামকে প্রদান করেন। সীতারাম পাঠান বিদ্রোহ দমন করিয়া শায়েস্তা খাঁর নিকট উচ্চ সম্মান লাভ করেন। তাঁহার দলে দুটি বীর যোদ্ধা ছিলেন তাঁহার উপযুক্ত সঙ্গী—রামরূপ ও মুনীরাম। সীতারামের জায়গীর ছিল নলদি পরগণা। তিনি দস্যুদমনে কৃতকার্য্য হইয়া সমগ্র পরগণাটির প্রভুত্ব পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন; নবাবের কৃপা লাভের পর তিনি ভূষণার অপর পারে মধুমতীর পশ্চিম তীরে তাঁহার কল্পিত রাজ্যের রাজধানী মহম্মদপুর স্থাপনা করেন। নলদিতে সীতারাম একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—মহম্মদপুরের নিকট তাহার ধ্বংসাবলী পড়িয়া আছে। ভূষণায় ফৌজদার আবু তোরাপ বাস করিতেন; সীতারাম প্রথমে ভূষণা অধিকার করিতে পারেন নাই। তিনি মহম্মদপুরেই মাটীর প্রাচীর দেওয়া দুর্গ, সেনানিবাস, দেবমন্দির, জলাশয়, অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পিতা উদয়নারায়ণের মৃত্যুর পর সীতারাম ক্রমশঃ তাঁহার জমিদারী অনেকখানি বাড়াইয়া ফেলেন এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে ও বিক্রমে এক জন ভূস্বামীতে পরিণত হন।

পিতা-মাতার আত্মার সদ্গতির জন্য পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে সীতারাম একবার গয়ায় তীর্থ করিতে যান—সেখান হইতে আরও উত্তরে গিয়া একেবারে আগ্রায় উপস্থিত হন। আগ্রায় তিনি মুঘল সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বহুমূল্য উপঢৌকনাদি উপহার দেন। সীতারাম ফার্সীতে কথা কহিতে পারিতেন—তিনি স্বয়ং সম্রাটের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেন। শায়েস্তা খাঁ পূর্ব্বে বঙ্গে সীতারামের দস্যুদমনের বীরত্বের কথা সম্রাটকে জানাইয়াছিলেন। সাক্ষাতে সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া সীতারামকে 'রাজা' উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। সে জন্য সীতারাম রায় জমিদার হইলেও রাজা সীতারাম বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত।

'রাজা' উপাধি লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া সীতারাম স্বাধীন রাজা হইবার আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করিতে লাগিলেন। মুঘল বাদশাহের সুনজরে পড়িয়া বাংলার সুবেদারকেও এক-প্রকার অগ্রাহ্য করিয়াই সীতারাম তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন; এবং তাহা বিস্তার করিতে সত্রাজিৎপুর, মহম্মদসাহী, মহিমসাহী, বেলগাছি প্রভৃতি অধিকার করিলেন। শুনা যায়, তাঁহার এলাকা পদ্মা-নদীর উত্তর হইতে প্রায় বঙ্গদেশের প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুদমনে কৃতকার্য্য হইলে পূর্ব্ববঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল তাঁহার করায়ত্ত হয়।

রাজা সীতারাম স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে ফৌজদার আবু তোরাপকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিলেন। ফলে দু'পক্ষে বিবাদ-বিসংবাদ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে আবু তোরাপ নিহত হন এবং সীতারাম ভূষণা অধিকার করেন।

মহম্মদপুরে রামরূপকে তাঁহার প্রতিনিধি রাখিয়া সীতারাম ভূষণায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং তাহার কিছু-কিছু উন্নতি সাধনে মন দিলেন। কিন্তু ফৌজদার আবু তোরাপ নিহত হওয়ার সংবাদ পাইয়া নবাব মুর্শিদকুলি তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি বক্স আলি খাঁকে নূতন ফৌজদার করিয়া ভূষণায় পাঠাইলেন এবং সীতারামকে ধরিয়া আনিবার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না। বক্স আলি ভূষণার দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। তখন নবাব অন্যান্য জমিদারদের আদেশ দিলেন, যেমন করিয়া হউক সীতারামকে ধরিয়া আনিতে হইবে।

নবাবের সৈন্য-সামন্তের সহিত রীতিমত যুদ্ধ বাধিল। সীতারাম ভূষণা অবরোধে অতি দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু এদিকে মহম্মদপুরে রামরূপকে গুপ্তভাবে নবাব-পক্ষ হঠাৎ হত্যা করিয়া বসিল। সীতারাম এই সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং মহম্মদপুরে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে ভূষণা দুর্গের পতন হইল। মহম্মদপুরে গিয়া সীতারাম ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি শত্রু-কবলে বন্দী হন। সীতারাম সপরিবারে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। মুর্শিদাবাদেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

বিজ্ঞান-জগৎ

কামানের জন্য থলির আসন

শত্রুর কামানের গতি-রোধ-কল্পে নানা স্থানে এ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট কামান বসানোর আবশ্যকতা কতখানি, আমরাও এখানে মর্ম্মে মর্ম্মে

থলির প্রাচীরে কামান

বুঝি। বহু ক্ষেত্রে এ-সব কামান বসাইতে হয় বালির থলির প্রাচীর তুলিয়া সেই উঁচু প্রাচীরের উপর! কিন্তু সাধারণ থলি তেমন মজবুত নয়! জলে কাদায় ও কামানের ভারে থলি ছিঁড়িয়া যায়, ফাঁশিয়া যায়। এ জন্য আমেরিকার বড় বড় কারখানায় বিশেষ ভাবে মজবুত থলি তৈয়ারী হইতেছে। সাধারণ থলির চেয়ে এ-সব থলি আরো জমাট্ আঁট্ এবং এ-সব থলি যেমন খুব শীঘ্র ভরিয়া তোলা যায়, তেমনি অনায়াসে টানাটানি করা চলে। টানা-টানিতে থলির জান্ এতটুকু হায়রাণ হয় না! থলি ভরিয়া থলির মুখের কাছে দড়ি টানিয়া থলি চকিতে বন্ধ করা যায়। চট্, বারলাপ, এবং ওসনাবুর্গ্ নামে এক-জাতের কাপড়—এই তিনটি সামগ্রী একত্র করিয়া রাসায়নিক প্রলেপে এমন ভাবে গড়া হয় যে, বৃষ্টির জলে তাহা ভিজে না; থলির কাপড় হয় ওয়াটার-প্রুফের মত। তৈয়ারী হইলে থলিগুলিতে প্রয়োজনানুরূপ রঙ লাগানো হয়; রঙের জন্য এ-সব থলি বিমানচারী শত্রুর নজরে পড়ে না।

মেয়েরা থলি তৈয়ারী করিতেছে

—

নৌ-ফৌজের আশ্রয়-নীড়

আমেরিকার নৌবাহিনীর জন্য সাগরকূলে বহু স্থানে আশ্রয়-নীড় তৈয়ারী হইতেছে মস্ত করোগেট টিনের আচ্ছাদন পাতিয়া। এক
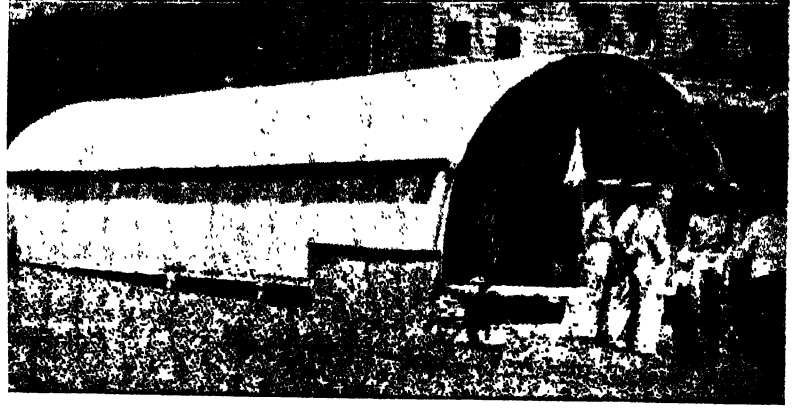
করোগেট-টিনের আশ্রয়

একটি নীড় রচনা করিতে সময় লাগে ন'ঘণ্টা। কুটীরগুলি আয়-তনে এমন যে, প্রত্যেকটির মধ্যে ছত্রিশ জন লোক আস্তানা লইতে পারে—নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয়। সে আশ্রয়ে বসা-দাঁড়ানো, স্নানাহার শয়ন—কোনো কাজেই অসুবিধা ঘটে না। টিনের ছাদে রঙ লাগানো হয়; তার উপর ঘাস-পাতা, খড়, বিচালি, বালুকা-ভরা থলি চাপানো থাকে। তার ফলে বিমানচারী শত্রু যেমন ঠাহর পায় না, তেমনি এ-সব জিনিষ রাখার দরুণ গোলাগুলীর বর্ষণে নীড়গুলি মারা পড়ে না!

—

সর্ব্বশ্রুতি মাইক

হলিউডের শিল্পীরা টকি-ফিল্মের উৎকর্ষ-সাধন-কল্পে এমন সম্পূর্ণ-সার্থক মাইক্রোফোন তৈয়ারী করিয়াছেন যে তাহায় সাহায্যে সুদূর-কথিত

সর্ব্বগ্রাসী মাইক্
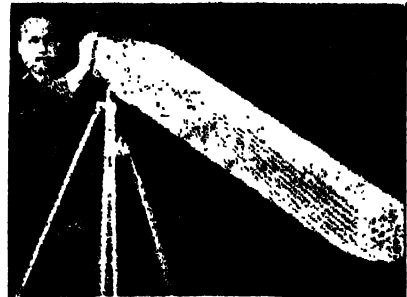
অস্ফুট বাণী এবং মৃদু মর্ম্মর-নিশ্বাসের শব্দটুকুও আমাদের শ্রুতি-মূলে সুস্পষ্ট ভাবে আসিয়া পৌছায়। এই মাইকের 'পিক্-আপ' ৩০ ডিগ্রীর;

া খুশী যে দিকে খুশী—অতি সূক্ষ্ম দিক্‌-স্তর-হিসাবে—এ-মাইককে নো-ফিরানো উঠানো-নামানো চলে। রোলার-যুক্ত ত্রিপদের উপর াইকের আসন নির্দ্দিষ্ট আছে; এবং অতি-দূর-সঞ্জাত মৃদু ধ্বনি ধরিয়া তাহা সুস্পষ্ট রেখায় ব্যঞ্জিত করিবার অমোঘ শক্তির জন্য াঙ্গনেও এ মাইকের বহু সমাদর ঘটিতেছে।

খেলার ট্যাঙ্ক-গাড়ী

জের তাগিদে মোটর গাড়ী, রেলোয়ে ট্রেণ, টেলিফোন, ঘর-বাড়ী, কা-জাহাজের সৃষ্টি; কিন্তু এ-সব কাজের জিনিষের আদর্শে খেলার ত-সংস্করণও অজস্র ভাবে তৈয়ারী হয়! অর্থাৎ সত্যকার এবং কাজের লোয়ে-ট্রেণের আদর্শে ছেলে-মেয়েদের খেলার জন্য রেলোয়ে-ট্রেণ—ন, মোটর-গাড়ী, জাহাজ প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে। দম লে এ-সব খেলার গাড়ী, প্লেন, জাহাজ বেশ চলে। যুদ্ধের য়োজনে এখন ট্যাঙ্ক-নির্ম্মাণে সমারোহ বাধিয়াছে; ছেলেদের

খেলার ট্যাঙ্ক

খেলাঘরেও সে-সমারোহের ছিটা গিয়া লাগিয়াছে। আমেরিকার শিল্পীরা মিলিটারী ট্রাক-ট্যাঙ্কের আদর্শে তৈয়ারী করিতেছে খেলার ট্রাক-ট্যাঙ্ক। এ-ট্যাঙ্কের সামনে আছে খেলার কামান,—ট্যাঙ্কের চাকাগুলিও আসল ট্যাঙ্কের চাকার আদর্শে তৈয়ারী। ট্যাঙ্কে বসিয়া প্যাডেলে পা দিয়া বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত হাতল ঘুরাইয়া এবং কোনো কোনো গাড়ীতে ছোট পেট্রোল-এঞ্জিনের সাহায্যে এ-ট্যাঙ্ক পথে চালানো যায়। আসল ট্যাঙ্কের মত এ-ট্যাঙ্কও খানা-খোন্দোল, নালা-ঢিপি অতিক্রম করিয়া অনায়াসে নিরাপদ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

—

কূল-রক্ষার্থে

মাসাচুসেট্‌সের সামরিক কারখানায় সমুদ্রগামী অসংখ্য হাল্‌কা বোট তৈয়ারী হইতেছে। এ বোটের নাম "শী-স্লেড"। এ বোটগুলিকে যেমন অনায়াসে জল হইতে তুলিয়া ডাঙ্গায় রাখা চলে, তেমনি চকিতে আবার ডাঙ্গা হইতে জলে নামানো যায়। বোট চলে বৈদ্যুতিক এঞ্জিনে। আটলাণ্টিকের কূলপ্রদেশে পাহারা দিবার

শী-স্লেড
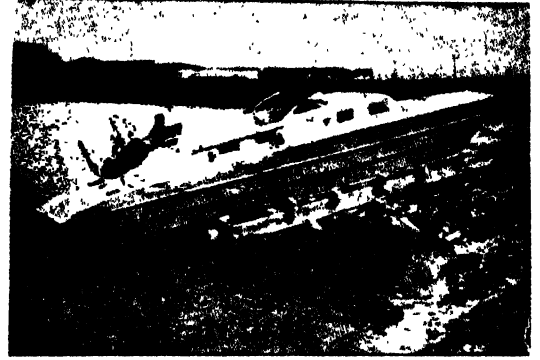
জন্য সেখানকার ফার্ষ্ট ডিভিশন ফৌজ এ-বোটগুলি ব্যবহার করিতেছে। বোট চালাইতে ব্যয় পড়ে খুব অল্প, এবং হালকা বলিয়া গতিও বেশ দ্রুত। সাগর-তরঙ্গে ভাঙ্গিবার বা ডুবিবার আশঙ্কা এ বোটের নাই।

বমার-মার

আমেরিকার সমর-বিভাগে নূতন এক-জাতের এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট্‌ কামান তৈয়ারী হইতেছে। এ কামানে একশো মণ ওজনের গোলা ছোটে। সে গোলা ওঠে আঠারো হাজার গজ ঊর্দ্ধে। মিনিটে

বমার-মারী

মিনিটে গোলা ছুটিবে, এ কামানে এমনি ব্যবস্থা। তার উপর এ কামানে সংলগ্ন আছে আনুবীক্ষণিক ফাইণ্ডার। সেই ফাইণ্ডারে চোখ রাখিয়া ঊর্দ্ধে ও চারি দিকে বহু দূরে লক্ষ্য দেখিয়া শত্রুর শস্ত্র-পরিচালনা করিতে ভুল হয় না, শস্ত্রক্ষেপে খুঁৎ থাকে না।

প্যারাশুট-বাহিনীর হাতে খড়ি

হস্ত-লিখন-শিক্ষার সূচনায় আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের হাতে খড়ি হইত। লিখিতে শিখিবার পূর্ব্বে ছিল লেখা মক্‌সো করার রীতি।

পোষাকের পিঠে হুক্

প্যারাশুট-বাহিনীর শিক্ষা—গোড়ার দিকে এমনি হাতে খড়ির পদ্ধতিতে দেওয়া হয়। প্লেনে বা বেলুনে বসিয়া শূন্যপথে বহু দূরে উঠিয়া তার পর প্লেন বা বেলুন হইতে প্যারাশুট-যোগে ঝাঁপ খাওয়া—তাহাতে আতঙ্কে হৃৎ-স্পন্দন থামিয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে; কাজেই এ-ব্যাপারকে

হাতে খড়ির পোষাক

আগে হইতে রপ্ত বা গা-সহা করিতে হয়। এ জন্য শিক্ষার প্রথম পর্ব্বে শিক্ষার্থীকে দেড় শত ফুট উঁচু মঞ্চে তুলিয়া তার পর ঘোড়ার লাগামের মত তাকে লাগাম দিয়া বাঁধিয়া শূন্যে ঝুলানো হয়। কাম্বেমি পোষাকের পিঠে থাকে মোটা হুক—সেই হুকে তাকে শায়িত ভাবে ঝুলাইয়া যন্ত্রযোগে পাক খাওয়ানো হয়। হুকের সঙ্গে মোটা-তার বাঁধা থাকে—যন্ত্রযোগে শিক্ষার্থীকে একবার উপরে তোলা, পরক্ষণে নীচে নামানো হয়। দোদুল ভাবে এমনি পাক খাওয়ার ফলে শিক্ষার্থীর ভয় ভাঙ্গে—শূন্যপথে শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল শিখে।

পারাবার-পার

ডাঙ্গায় অস্ত্র-শস্ত্র এবং বাহিনী বহিবার জন্য অতিকায় কত না ট্রাক তৈয়ারী হইতেছে! সে-সব ট্রাকে মিত্রপক্ষের সুবিধার অন্ত নাই। অস্ত্রাদি এবং বাহিনী পার করিবার জন্য বৃটিশ সমর-বিভাগ তৈয়ার

পারের বার্জ্জ
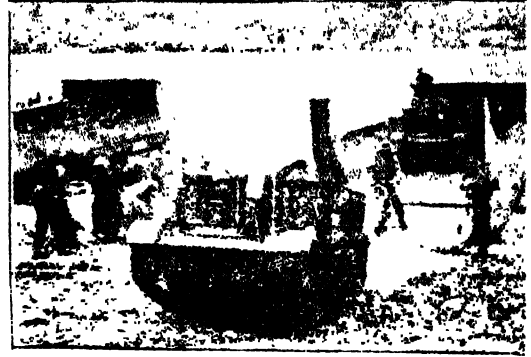
করিয়াছে অসংখ্য ভড় বা 'বার্জ্জ'। এ-সব বার্জ্জে করিয়া ট্যাঙ্ক, ফৌজ দল, মোটর-বাইক-বাহিনী, কামান-বন্দুক প্রভৃতি অনায়াসে পারাপার করা হইতেছে। জার্ম্মাণদের লফোটেন দ্বীপপুঞ্জ অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত করিতে যে ফৌজ ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হইয়াছিল, তারা গিয়াছিল সেই সব বার্জ্জে চাপিয়া।

গামলা-বোট

বোটে টান পড়িয়াছে—মার্কিন ধীবর-সম্প্রদায় বুদ্ধি-কৌশলে অতি সুলভে নূতন বোট তৈয়ারী করিয়াছে। বোট অর্থে স্নানের জন্য স্নানের ঘরে অনেকে যে বাথ-টাব ব্যবহার করেন, সেই বাথ-টাব একটি

টাব্-বোট্

—রবারের মোটা টিউব ফাঁপাইয়া বোটের গলায় কলারের মত আঁটা। এই বোটে বসিয়া হাল্কা দু'খানি কাঠকে করা হয় দাঁড়। বোটের মধ্যে বেতের ছোট মোড়া থাকে—আসন। এই বোটে বসিয়া এক-এক জন লোক জলের বুকে ঘুরিয়া পরম আরামে মৎস্য ধরিয়া ব্যবসা-বৃত্তি করিতেছে।

বি-এ বি-টী

[গল্প]
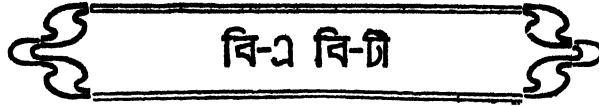
বড়বাজার থেকে হ্যারিসন রোড ধরে হেঁটে আসছি! গায়ে প্রায় ঠেকে ঠেকে ট্রাম-বাসগুলো ছুটে চলেছে। ফাল্গুনের রৌদ্রে শরীর পুড়ে যাচ্ছে! ইচ্ছা করে, পাশের ট্রামখানায় উঠি। কিন্তু পকেট খালি। একটি পয়সাও নেই! ক্লান্ত পায়ে আবার হাঁটি। পায়ের নীচে পীচ্-ঢালা—আগুনে-তাতা রাস্তা; পা পুড়ে যাচ্ছে; তবু হেঁটে যেতে হবে! পথের দু'পাশে শত শত ভিখারী; দুর্ভিক্ষ-পীড়িত! অনাহারে অর্দ্ধ-মৃত। পথের তপ্ত ধূলায় পড়ে আছে—উলঙ্গ, বস্ত্রহীন, অন্নহীন। শুকনো কাঠির মত দেহ—ক্ষুধার অনলে দাউ দাউ করে জ্বলছে—সভ্য সমাজের চোখের সামনে। আধুনিক সভ্যতাকে উপহাস করেই যেন জ্বলছে পথের পাশে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জীবনের চিতা! ট্রাম-বাস-ভর্ত্তি সহরের লক্ষ লক্ষ সভ্য শিক্ষিত-লোক পথের মৃত্যু-দৃশ্য সহজ চোখে দেখেও কিছু না ভেবে অনায়াসে চলে যাচ্ছে! বাংলার ভিখারীরা সত্যই মানুষ কি না, কে তা ভাবে!

—যতীনদা'!

চমকে উঠলাম। কে? চেয়ে দেখি, একখানা টু-সীটার গাড়ী থেকে নেমে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে শৈলেন। দেখে আমার চক্ষু স্থির! বিস্ময়ে স্তব্ধ নির্ব্বাক্! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললাম—এ যে রাজপুত্রের বেশ! শান্তিপুরী জরিপাড় ধুতি! সিল্কের পাঞ্জাবী! সোনার বোতাম! সোনার হাত-ঘড়ি! পায়ে পাম্‌সু। এ দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে এত ঐশ্বর্য্য! লটারির? না কনট্রাক্ট?

লজ্জা-নম্র ম্লান একটু হাসি হেসে শৈলেন পকেট থেকে পেন বের করে এক-টুকরো কাগজে লিখলো, ১নং কর্ণফিল্ড রোড, বালীগঞ্জ।

কাগজের টুকরা আমার হাতে দিয়ে বললে,—এখানে বাসা করেছি। কাল আপনার নিমন্ত্রণ রইলো। কি করি,—অমী যখন স্বীকার হলো না—শেষে এঁকেই পরশু বিয়ে করেছি। বি-এ বি-টী। চমৎকার নম্র স্বভাব। বিদ্যার গর্ব্ব-অহঙ্কার নেই।

এ-কথা বলে টু-সীটারে বসা মেয়েটিকে দেখালো। দেখিয়ে আবার হেসে বললে,—সাকসেশ্‌ফুল ম্যারেজ। কি বলেন? অমী তো আই-এ পড়ে।

কি বলবো ভেবে পেলাম না। শৈলেন বললে, আসবেন তো?

বললাম,—বিয়ে করেছো—বেশ! বেশ! নিমন্ত্রণও করলে! কিন্তু কাল আমার বিশেষ দরকারী কাজ আছে, যেতে পারবো না! আমার ছোট বোন অলকা উয়োম্যান্‌স কলেজে পড়ছে। বোর্ডিংএ আছে! বোর্ডিংএ ভয়ানক বসন্ত হচ্ছে! ওকে অন্য কোন বোর্ডিংয়ে রিমুভ করতে হবে। আর এক দিন তোমার ওখানে গিয়ে খেয়ে আসবো। কিছু মনে করো না! তোমার এমন রাজসিক বিয়েতে নিমন্ত্রণ খাবো না—খাবো কি তবে লঙ্গরখানায় গিয়ে? আচ্ছা, তবে আসি। হাঁ, একটা কথা, বৌকে ভয় করে চলো না। থাক্ তার বিদ্যা! বিদ্যা থাকলে কি হবে। টাকাই সব। বৌয়ের বিদ্যা আছে, তোমার আছে টাকা। মণি-কাঞ্চন যোগ! জীবন-সংগ্রামে অনিবার্য্য জয়!

শৈলেন হেসে নমস্কার জানিয়ে টু-সীটারে মেয়েটির পাশে গিয়ে বসলো। বসে নিজেই ড্রাইভ করে চলে গেল। ওর গাড়ীর চাকার চঞ্চল আবর্ত্তন থেকে ঝড়ের বেগে আমার চোখের সামনে ভেসে এলো পাঁচ বছর আগেকার কাহিনী ওর জীবনের!

তখন রেঙ্গুনে ১৫ নং ক্রকীং ষ্ট্রীটে পাঁচ-ছ' জন বন্ধু মিলে মেস্ করে আছি। সবাই অফিসে কাজ করি। অল্ ইয়ং মেন। মেসের পাশেই এক ভদ্র-পরিবার বাস করেন। হীরালাল বাবু, তাঁর স্ত্রী, আর দু'টি মেয়ে। বড় সমী কলেজে পড়তো; ছোট অমী স্কুলে। আমরা সবাই বাঙ্গালী। সুদূর প্রবাসে পাশাপাশি বেঁধেছি ঘর। একটি মেস—আর একটি ভদ্র-পরিবারের বাসা। দিন-রাত কল-কোলাহলে মুখর অশান্ত চঞ্চল জীবন-উচ্ছ্বাসে ভরা মেস; তার পাশে শান্ত অচঞ্চল স্নিগ্ধ সুনিবিড় জীবনের ছন্দ-ভরা সুন্দর বাসা! দু'টি জীবন-ধারার বাহ্যিক গতি বিভিন্ন হলেও আসলে আমাদের জীবন-ছন্দ ছিল এক। একই মতানন্দময় শান্তি আর সুখ-সম্পদে জীবন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সকলের। কল-কোলাহল-মুখরিত আমাদের জীবন-নদী ওঁদের গভীর অতল জীবন-সিন্ধুনীরে মিশে অসীম গভীর হয়ে যেতো! আমরা ছিলাম যেন ঝরণার জল—সদা-কল-কল সদা-ছল-ছল! ওঁরা ছিলেন মহা-সাগরের বন্যা; আমাদের ক্ষীণ কলকল-ধ্বনি ওঁদের মহা-প্লাবন-ধারায় কোথায় ভেসে যেতো! এমনি করে আমাদের চঞ্চল উন্মত্ত গতি-ধারা ওঁদের শান্ত-সুশীল প্রবাহ-ধারায় মিশে হয়ে উঠলো সৌম্য শান্ত সুন্দর!

আমাদের তরুণ-চঞ্চল প্রাণ সত্যই শেষে ওঁদের পরিমার্জ্জিত সুন্দর শিক্ষিত জীবনের স্পর্শে সুন্দর হলো। আমরা যেন পেলাম নূতন প্রাণ, নূতন মন, নূতন জীবন—জীবনের কল্যাণময় সুচারু অনুভূতি। সুদূর প্রবাসে বাস করে প্রাণে প্রাণে অনুভব করলাম, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর জীবনে কত বড় সম্পদ্!

যৌবন-জীবন-ভরা তরুণদের মেসের পাশে যৌবন-জীবন-ভরা তরুণী মেয়েদের নিয়ে ভদ্রলোকের বাস—বাংলা দেশে—বিশেষ করে কলকাতা সহরে এ একেবারে বজ্রধ্বনি-ভরা বহ্নি কল্পনা যেন! এখানে কোন ভদ্র-পরিবারের বাসার পাশে মেসের অবস্থিতি—হতে পারে না! হওয়া অসম্ভব! ছেলে-মেয়েদের মান-সম্ভ্রমের অরুণোজ্জ্বল আকাশে আষাঢ়ের কালো মেঘ জমে উঠবে।

কিন্তু আমরা ক্রমাগত তিনটি বৎসর মেস আর বাসা পাশাপাশি বেঁধে বাস করছি—ওঁদের অরুণোজ্জ্বল আকাশে কোন দিন বাদল ঘনায়নি! ওঁদের আকাশ আর আমাদের আকাশ একই স্নিগ্ধ-শান্ত আলোয় আলো হয়েছিল। ওঁদের হাসিতে আমাদের অধরে ফুটতো হাসি; ওঁদের অশ্রুতে আমাদের চোখে নামতো বর্ষা! ওঁদের মানে আমাদের মান; ওঁদের গৌরবে আমাদের গৌরব, ওঁদের অপমানে আমাদের অপমান! ওঁদের জীবনে আমাদের জীবনের ছন্দ ছিল মিলানো। এমনি করে ওঁদের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের ছিল ঐক্য তান; ঐক্য ছন্দ; ঐক্য উচ্ছ্বাস: ঐক্য হাসি-কান্না। মেস আর বাসার মিলে এক হয়ে অতি সুন্দর বাস-ভবনে পরিণত হয়েছিল! আমরা যেন একই পরিবারের

ভাই-ভগিনী! পরকে আপন করে পাওয়ায় এই যে অসীম আনন্দ—অজানা অচেনার সঙ্গে পাশাপাশি ঘর বেঁধে, একে অন্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে জীবনকে সহজ করে তোলার যে আনন্দ, তা সেই প্রবাসী-জীবনে অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছি! দেখেছি, প্রবাসী মানুষ অন্তরে অন্তরে একে অন্যের কাছে দেবতার মত। আচারে-ব্যবহারে, আদানে-প্রদানে, মেলায়-মেশায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে পরম কাম্য! কিন্তু আজ কলকাতা সহরে বাসা বেঁধে দেখি, পাশের ঘরের মানুষ চির-ঘৃণিত, অবহেলিত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে ভরা! অজানা! অচেনা! এর কারণ, আমরা এখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড, কপট! প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে ছলনার ছদ্মবেশ-পরা, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত! সর্ব্ব আবরণহীন সরল সুন্দর সুশ্রী মানুষের চেহারা যেন আমাদের কারো নেই! কাজেই কলকাতা সহরে মেসের পাশে বাসা ত দূরের কথা, বাসার পাশে বাসা—ভদ্র পরিবারের পাশে ভদ্র পরিবার পর্য্যন্ত যেন ভীষণ সন্দেহের বোমা-ঘাঁটী! পাশের বাড়ীর লোককে আমরা দেখি সন্দেহের চোখে—যেন তারা স্পাই! আর প্রবাসী বাঙ্গালী প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে কবির ভাষায় :

তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
কত অজানারে করিলে নিকট-বন্ধু
পরকে করিলে ভাই!

এমনি করে মেসে আর বাসায় মিলে-মিশে একত্র আমরা বাস করেছি তিন বৎসর।

এক দিন এই শৈলেন ছেলেটি যেচে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো। সকল অঙ্গে জাহাজের খালাসীর মত কালো পোষাক। কালো রংয়ের ফুল-প্যাণ্ট ; কালো হাফ-শার্ট। কয়লার কালিতে সর্ব্ব অঙ্গ কালিময়। দেখে মনে হলো, এইমাত্র কোন্ কয়লার খনি থেকে উঠে এসেছে যেন! আমাকে বললো,—আপনাদের মেসে আমাকে থাকতে দেবেন?

কি উত্তর দেবো, খুঁজে পেলাম না। ছেলেটিকে অনেক দিন পথে একা ঘুরতে দেখেছি। কে—কোথায় কি কাজ করে জানি না। আজ সব জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, সে সত্যই বিশিষ্ট ভদ্র এবং শিক্ষিত ঘরের ছেলে, লেখা-পড়া শেখেনি। পরিবারের কেউ পছন্দ করে না। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছে সে লাঞ্ছিত—বিতাড়িত। ঘরে বিমাতা তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। বাপ সেই বিমাতার ইঙ্গিতে চলাফেরা করেন। ক্লাসে বার-বার ফেল করে লেখাপড়া ছেড়ে সে ব্যায়াম-চর্চ্চা করেছে। কিন্তু ব্যায়াম-চর্চ্চায় দেহের উৎকর্ষ-সাধন করে অন্নবস্ত্রের অভাব ঘোচাতে পারেনি, বার্থ্যায় এসেছে। গায়ে শক্তি আছে—একটা ফ্যাক্টরীতে শিক্ষানবিশী করতে ঢুকেছে। দিন-রাত লোহাপেটার কাজ ; এই শিক্ষানবিশী অবস্থায় মাসে আঠারো টাকা পায়। তাই একটু আশ্রয় খুঁজছে।

শুনে মায়া হলো! বললাম—বেশ, থাকো। আমাদের মেসে কিন্তু আঠারো টাকায় মেসের খরচ চলবে না। জামা, কাপড়, জলখাবারের জন্ত অন্ততঃ আরো দশ টাকা লাগবে।

শৈলেন বললে—আমি জলখাবার খাবো না। জামা-কাপড়? আমার এই ফ্যাক্টরীর পোষাকেই চলে যাবে। অসুবিধা হবে না।

তথাস্তু! বলে শৈলেনকে থাকতে দিলাম। মেসের অন্ত বন্ধুদের ডেকে বলে দিলাম,—ওর জলখাবারটা আমাদের সঙ্গেই হবে। সে জন্ত আলাদা টাকা আমরা নেবো না। কি করা যায়? বিপদে পড়েছে—ভদ্রঘরের ছেলে!

শৈলেন সকাল আটটায় ফ্যাক্টরীতে যায় ; সন্ধ্যায় ফিরে আসে। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম ; লোহা-পেটা কাজ। কিন্তু মুখে তার হাসি লেগে আছে। ক্লান্তিহীন পরিশ্রম তার মুখে বেদনার রেখা না ফুটিয়ে হাসির রেখাই ফুটিয়ে তোলে। কঠোর পরিশ্রম—তবু ওর সর্ব্ব-অঙ্গে জ্যোতি আর লাবণ্যের শিখা! চোখের দিকে চাইলে মনে হয়, চোখ-ভরা আলো। দুই বাহুর শিরা-উপশিরা যেন রক্তের জীবন্ত-প্রবাহে ভরা। শৈলেন যেন শারীরিক কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে বেঁচে থাকার অনন্ত ঐশ্বর্য্য!

সন্ধ্যায় মেসে ফিরে হাত-মুখ ধুঁয়ে জলখাবার খেয়ে সেই চিরন্তন অবিনশ্বর ফ্যাক্টরীর কালো পোষাকে মেসের বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত। কারো সঙ্গে কথা বলে না। কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে সামান্ত দু'-এক কথায় গম্ভীর জবাব দিয়ে আবার চুপ করে কি ভাবতে থাকে। মেসে যতক্ষণ থাকে, বেশ হাস্য-মধুর মুখ! কিন্তু যেই এসে এ বারান্দায় দাঁড়ায়, কি যেন বিষম ব্যথা ওর বুকে জেগে ওঠে! তখন ওর দিকে চাইলে মনে হয়—কালো পোষাকের ভিতরে হয়তো সত্যই ওর বুকও বুঝি এমনি কালো! কত দিন বলেছি—এ অপরিবর্ত্তনীয় পোষাকটার একটু পরিবর্ত্তন করো। কয়লার মতো কালো আবরণ চোখের সামনে কি সর্ব্বদা ভালো লাগে? গম্ভীর ভাবে সে জবাব দেছে—কয়লার এ কালো আবরণের মধ্যে জ্বলছে সোনার দীপ!

বলি, নতুন এসেছো এ মেসে। পাশের বাড়ীর মেয়েদের হয়তো অসুবিধা হয়! তারা এ সময় তাদের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় তো, তোমাকে এ অবস্থায় দেখলে তারা ভূতের ভয়ে শিউরে উঠবে।

তেমনি গম্ভীর ভাবে শৈলেন উত্তর দেয়—সমস্ত মানব-জীবনটাই ভূতের মতো রহস্যময়! সবাই কালো আবরণে ঢাকা। আমার এমন সুন্দর চেহারা, সুন্দর স্বাস্থ্য, সুন্দর যৌবন, সুন্দর অন্তর-চেতনা—তা সত্ত্বেও নিজকে কালো পোষাকে ঢেকে রেখে ফাঁকি দিচ্ছি সবাইকে। এমনি রহস্যময় সঙ্গোপনে থাকি আমরা সমস্ত মানব। মানুষের আসল রূপ সত্য আর সুন্দর। কিন্তু সেই সত্য সুন্দর মিথ্যার কালো কলঙ্কে ঢাকা। কার সাধ্য মানুষকে খুঁজে পায়?

হেসে ওর পিঠে চড় দিয়ে বললাম,—লোহা-পেটার কাজ করে করে মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞানও বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে, দেখছি!

তার পর হঠাৎ এক দিন রেঙ্গুন সহরে জাপানী বোমা পড়লো। নিমেষে সহরের কায়া গেল ছায়ার মতো হয়ে! আধুনিক সভ্যতার আনন্দ-উৎসবে গড়া বড় বড় ঘর-বাড়ী, সভাগৃহ, কাছারি, আদালত, স্কুল-কলেজ, মঠ-গির্জ্জা মুহূর্ত্তে হলো ধূলি-লুণ্ঠিত। আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে এলো ধ্বংসের বাণী! মানুষ হলো লুণ্ঠিত বিতাড়িত! বিজ্ঞান-প্রসূত বোমার রথ ছুটলো জয়-যাত্রার পথে ; দেবতা হলো মানুষ ; মানুষ হলো দানব ; দানবের রথ-চক্রে দলিত হলো পৃথিবী! নিমেষে জনশূন্ত হলো রেঙ্গুন—কে কোথায় পালালো, কে জানে! কোথায় গেল আমাদের মেস, কোথায় মেসের লোক, আর

কোথায় বা পাশের বাসা! বোমার নীচে কেউ পড়লো না। কিন্তু বেঁচে থেকে কে কোথায় আছি, কারো কোন খবর নেই। মনে হলো, প্রলয়ের বেগে আমরা যেন কোথায় সব হারিয়ে গেছি!

আমি পালিয়ে এলাম কলকাতায়। জাপানী বোমায় আতঙ্কে কম্পিত মানব-সভ্যতার আর এক বিশাল বুকে। এখনো কলকাতায় বোমা পড়েনি; কিন্তু প্রাসাদ সদৃশ সহরের বাড়ীগুলির দিকে চেয়ে মনে হয়, কি যেন ভয়ে সব আড়ষ্ট হয়ে আছে! সুন্দর সুসজ্জিত বাড়ীগুলির দিকে চেয়ে নিশ্বাস ফেলি! ধ্বংসের পৃথিবীতে এদের স্থান আছে না কি? পিছনে-ফেলে-আসা রেঙ্গুনের সেই চঞ্চল মেস, সুখ-শান্ত সেই শান্তির নীড় ভেঙ্গে গেছে। কোথায় গেল মেসের বন্ধুরা সব, মোনা, চিত্ত, শান্ত, খোকা, বুলু, রবি— কোথা বা ফ্যাক্টরীর পোষাক পরা সেই শৈলেন ছেলেটা! আর কোথা বা পাশের বাসার হীরালাল বাবু, তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে সমী আর অমী—সব যেন স্বপ্ন! বিপুল ভাঙ্গা-গড়া দিয়ে ঘেরা এ জীবন শুধু ক্ষণিকের ব্যস্ত আয়োজন!

প্রায় দু' বছর হয়ে গেছে কলকাতায় এসেছি। সে দিন ট্রামে বালীগঞ্জ যাচ্ছি। বসতেই পাশের সীটে চেয়ে দেখি, হীরালাল বাবু! সানন্দে পুলকে শিউরে বুকখানা ভরে উঠলো। যাঁকে নিশ্চিত মরণের মুখে ভেবে রেখেছিলাম তাঁকে ফিরে পেয়ে কি আনন্দ! হীরালাল বাবুকে ট্রাম-ভর্ত্তি লোকের মধ্যে সব চেয়ে ভালো লাগলো। হেসে বললাম, জাপানী বোমা তাহলে দেখছি একেবারেই ব্যর্থ! কবে এলেন? হেঁটে? না, জাহাজে?

হীরালাল বাবুও তেমনি বিপুল আনন্দে আমাকে ফিরে পেয়ে বললেন—হেঁটেই এসেছি। পথে ভয়ানক কষ্ট পেয়েছি। অমী তো এক দিন পথে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল; চোখ উল্টে যায় আর কি! কিন্তু থাক সে কথা—বালীগঞ্জে বাসা করেছি। সমী এবার বি-এ পাশ হয়েছে, এখন সাপ্লাইয়ে কাজ করছে, অমী আশুতোষে আই-এ পড়ছে। চলুন বাসায়—ওদের সঙ্গে দেখা করে আসবেন।

হীরালাল বাবুর সঙ্গে সোজা তাঁর বাসায় গেলাম। সমী অমী দৌড়ে এসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আমাকে অস্থির করে তুললো—কবে এলেন? কি করে এলেন! কেন এলেন? জাপানীদের হাতে পড়লে বুঝতেন, তারা কেমন!

কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে গেল, চলে এলাম।

প্রায় মাসখানেক পরের কথা। মেসে একা চুপ করে বসে আছি, হঠাৎ শৈলেন এসে উপস্থিত। মুখে উইলস্ জ্বলছে! দু'হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বললে,—শুনলাম, আপনি এ মেসে আছেন। দেখা করতে এলাম। ভালো আছেন?

ওর দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম! সেই শৈলেন? ফ্যাক্টরীর কালো পোষাক-পরা—আজ এই মূর্ত্তি! সিগারেট খায়—তাও আমার সামনে? গায়ের সেই মৃত্যুহীন কালো পোষাকটা কি হলো? আজ একেবারে খাঁটি সাহেব! বিলিতী পোষাক! বিস্ময়-নেত্রে ওর দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলাম, শেষে বললাম, তুমি ভালো আছো ত? রেঙ্গুন থেকে কবে এলে? কি করে এলে? হেঁটে, না জাহাজে? তা এখানে এসে নিশ্চয়ই চাকরী-বাকরীর সুবিধা হয়েছে।

এক-গাল হেসে শৈলেন বললে—এখন আর সেই ত্যজ্য-পুত্র নই। ইন্‌ডিয়ান্ আয়রণ ষ্টীল্ ওয়ার্কসের চীফ্ ইন্‌জিনিয়ার। তিনশো টাকা মাইনে পাচ্ছি। হ্যাঁ, যতীন-দা, একটা কথা—আপনার খোঁজে মেয়ে আছে? আমি বিয়ে করবো!

আরো অধিক অবাক্ হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললাম—কলকাতা সহরে আবার মেয়ের অভাব? বিশেষ বালীগঞ্জে!

বালীগঞ্জের কথা বলতেই হীরালাল বাবুর কথা মনে পড়ে গেল। বললাম—হ্যাঁ হে শৈলেন, হীরালাল বাবুও এখানে আছেন। সমী-অমী সবাই। সমী চাকরী করছে, অমী আই-এ পড়ছে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটু মলিন হাসিমুখে বললে—আপনি ওঁদের বাসায় মাঝে মাঝে যান?

বললাম,—হাঁ, প্রত্যেক রবিবার। আসছে রবিবারেও যাবো। কেন, কিছু দরকার আছে?

কোনো উত্তর দিল না। হাতের আধেক-খাওয়া সিগারেটটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিয়ে চোখ বুজে উপরের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে কি যেন রহস্য মনে নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।

ঠিক তার পরের দিন আবার এসে উপস্থিত। এসেই আমার হাত দু'টো চেপে ধরে বিশেষ অনুরোধ করে বললে—আপনাকে আমার একটা কাজ করে দিতেই হবে যতীনদা'। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। কিন্তু আজ আমার লজ্জা-সরম কিছুই নেই! শুনুন, আমি অমীকে ভালবাসি। আমি জানতে চাই, সে আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছে কি না! এই চিঠি। এ-চিঠিখানা দয়া করে অমীকে দেবেন—তার হাতে। আর কেউ না দেখে! অমী যেন চিঠির উত্তর আপনার হাতেই দেয়। আমি তাড়াতাড়ি উত্তর চাই। হ্যাঁ, আপনি এ-চিঠি পড়ে দেখতে পারেন।

আমার সর্ব্বাঙ্গ বয়ে যেন একটা বোমারু-বিমান উড়ছে! সেই সঙ্গে বোমাও পড়ছে যেন! আমার দেহের রক্ত-চলাচল একরকম বন্ধ। সেই শৈলেনের এই কাণ্ড! অমীকে ভালোবাসে! বলে কি? মাথা খারাপ হয়নি তো? রুক্ষ মেজাজে বললাম—তোমার এত দুঃসাহস? আমাকে দিয়ে প্রেমের চিঠি পাঠাবে অমীর কাছে?

বললে—সত্যি যতীনদা', আমি সত্যি অমীকে ভালোবাসি ভয়ঙ্কর ভালোবাসি। আপনি চিঠিখানা পড়ে দেখুন—খারাপ কিছু লিখি নিই; ভদ্রলোকের মতোই লিখিছি।

মৃদু স্বরে বললাম—পাঁচ ক্লাসে পাঁচ বার ফেল করেছো! লেখাপড়ার কি জানো? ভদ্রলোকের মতো চিঠি লিখেছ, বলছো!

বললে—বিশ্বাস না হয়, পড়ে দেখুন। হ্যাঁ,—আর একটা কথা—অমীকে রাজী করাতে পারলে বিয়ের পরেই আমি দশ হাজার টাকার একটা লাইফ-ইনশিওর করবো আপনাদের ইন্‌ডিয়ান অফিসে এবং আপনার এজেন্সীতে।

মনটা পাতলা হয়ে গেল। এজেন্সী করে' মানুষের আয়ু বন্ধক রেখে দু'পয়সা পাই! একেবারে দশ হাজার টাকা! বেশ মোটা কমিশন পাবো। আচ্ছা, পড়েই দেখি না, চিঠিতে কি লিখেছে। চিঠি পড়তে লাগলাম।

স্নেহের অমী,

যতীনদা'র কাছে শুনলাম তোমরা কলকাতায় আছ,—তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে। বিশেষ করে তোমার সঙ্গে।

আমার কথা তোমার মনে আছে কি ? কত রাতের পর রাত রেঙ্গুনের সেই মেসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছি শুধু তোমার অপেক্ষায়। তুমি এসে কখন্ তোমাদের বারান্দায় দাঁড়াবে—সেই আশায়। কোন কোন সময় না এসেছো এমন নয় ! চোখে-চোখে অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু সে কথা ভালোবাসার কথা কি না, জানি না। লেখাপড়া তেমন শিখিনি বলে তোমার সে চোখের কথার মানে বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমার চোখ দিয়ে যে-কথা বলেছি, তার প্রত্যেকটি কথার গভীর অর্থ ছিল। তুমি লেখাপড়া শিখেছো—সে-কথার অর্থ নিশ্চয় তুমি ধরে ফেলেছো এবং যা ধরেছো, তা সত্য। আমার চোখ ভালো-বাসার কথাই বলতো। বলতো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু সে সব কথা থাক,—আমি এখন আর সে খালাসীর কালো পোষাক-পরা ফ্যাক্টরীর ওয়ার্কার নই ! আমি এখন বিলিতী পোষাক পরে কাজ করি। একটা মস্ত ফার্মের এন্জিনিয়ার। আমি তিনশো' টাকা মাইনে পাই। আমি বিয়ে করবো এবং রাতের পর রাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে যাকে আমি ভালোবেসেছি তাকেই বিয়ে করতে চাই। এ বিষয়ে তোমার মত জানতে চাই। যতীনদা'র কাছে তোমার মত জানালে সুখী হবো। ইতি

তোমার পাণিপ্রার্থী
শৈলেন এন্জিনিয়ার।

চিঠি পড়ে হেসে বললাম—মেসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাহলে নীরবে এই কাণ্ড করতে ! বারান্দায় দাঁড়াতে মানা করলে এই জন্যই বুঝি বলতে—কালো আবরণের ভিতরে জ্বলছে সোনার দীপ ! তুমি এত বড় শয়তান ! ভাগ্যে সে মেস ভেঙ্গে গেছে—বাসাও ভেঙ্গে গেছে—নাহলে তুমি কি যে করতে, ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয় ! আচ্ছা, দশ হাজার টাকার ইন্সিওরেন্সের প্রতিশ্রুতি যখন দিলে, একবার চেষ্টা করে আমি দেখবো।

পরদিন শৈলেনের চিঠি নিয়ে হীরালাল বাবুর বাসায় গেলাম ; কিন্তু কি করে সে চিঠি অমীর হাতে দি ? ভাই-ভগিনী সম্পর্ক ওদের সঙ্গে আমার চিরকাল। ভাই হয়ে বোনের হাতে দেবো ঐ শৈলেনের প্রেমপত্র ! বয়ে এনেছি কি করে—আর এখন বোনের হাতে সে চিঠি দিই কি করে ? লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়লো। কিন্তু ওদিকে দশ হাজার টাকার কমিশন। চোখ-মুখ বজে চিঠিখানা পকেট থেকে বার করে অমীকে একটু আড়ালে ডেকে বললাম—মেসের সেই শৈলেন তোমাকে চিঠি দেছে। চিঠি পড়ে আমার কাছেই যা হয় একটা জবাব দিয়ো।

চিঠি পড়ে অমী টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেললে। ছিঁড়ে আমাকে বললে,—এত বড় অসভ্য ! চিঠিখানা আপনার কাছে দিয়েছে,—নিশ্চয় আপনি পড়েছেন ?

অপরাধীর মতো বললাম,—হ্যাঁ।

বললে,—ছি-ছি কি লজ্জার কথা ! আমি সত্যই ওকে ভালোবাসি না কি ? কখ্খনো না। শুনুন তবে—এক দিন দু'জনেই বারান্দায় দাঁড়িয়েছি—আমি অন্য দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে—ওর দিকে আমি সহজে চাইতাম না। ও আমায় ডেকে বললে—অমী, এ দিকে চেয়ে দ্যাখো, কি সুন্দর ফুল ! চেয়ে দেখি, ওর হাতে একটা ক্রীশানথীমাম ! চাইতেই ও ফুলটা বুকে চেপে ঠোঁটে ঠেকিয়ে আমার দিকে ছুড়ে দিলে,—দিয়ে বললে, খোঁপায় পরো। আমি খোঁপায় না পরে ফুলটা কাণে গুঁজে রাখলাম ! এতেও ও বুঝতে পারলো না যে, আমি ওর কথা অমান্য করলাম ? ওকে অপমান করলাম ? কিন্তু থাক সে কথা ! এখন সে তিনশো টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে বিয়ে করতে চায়। টাকা অবশ্য ভালোবাসি। কিন্তু টাকাই সব নয় ! মন বলে একটা বস্তু আছে। আসল কথা মনের ! আমি দু'দিন পরে আই-এ পাশ করবো ! ওর যখন টাকা আছে, পড়াশুনা করে হয়তো পরে বি-এ এম-এও পাশ করবো। শেষে দু'জনের জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটবে। সন্দেহ, সংশয়, শঙ্কা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব—পদে পদে ওকে দেবে বাধা। ও ভাববে, আমি কত বড় ; আর ও কত ছোট ! একটা মস্ত ব্যবধান গড়ে উঠবে দু'জনের মধ্যে। দু'জনের মনকে বিষাক্ত করে দেবে। ও আমার কাছে হারিয়ে ফেলবে ওর স্বামিত্ব। শুধু কাতর ভীত চাহনি নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকবে সসম্ভ্রমে। করুণা-পরবশ হয়ে হয়তো আমি বলবো, ভয় নেই—কাছে এসে পাশে বসো—এই চেয়ারে। ও হয়তো ভুলেই যাবে আমি ওর স্ত্রী, হয়তো বলবে, আপনি বসুন আমি দাঁড়িয়ে থাকি। আপনার কাছে চেয়ারে বসতে আমার লজ্জা করে।···এমনি করে জীবন হয়ে উঠবে পদে পদে বিড়ম্বিত। কে স্বামী, কে স্ত্রী, এ প্রশ্ন মনে জাগবে প্রতি দিন, প্রতি কাজে। ওর টাকা হবে সর্ব্ব-প্রশ্নহীন, সর্ব্ব-অর্থহীন ! তার চেয়ে ওকে বলবেন, আই রিফিউজ।

এসে শৈলেনকে বললাম—অমী রিফিউজ করেছে। দশ হাজার টাকার বীমাটাও ফস্‌কালো হে।

আজ শৈলেন হ্যারিসন রোডের উপর হঠাৎ টু-শীটার থেকে নেমে আমাকে বললে—কাল আপনার নিমন্ত্রণ ! পরশু এঁকে বিয়ে করেছি —বি-এ, বি-টী ! সাক্‌সেশ্‌ফুল ম্যারেজ ! কি বলেন ? অমী ত মোটে আই-এ পড়ে !

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল (এম-এ)

জোনাকি

তমিস্রার আঁধার কক্ষে জোনাকির দীপশিখা,
সৃষ্টির শর্ব্বরী-মাঝে জীবনের প্রথম স্পন্দন ;
বিচ্ছুরিত সীমায় সীমায় দেবতার জ্যোতি লিখা,
পৃথিবীর বক্ষে নামে মানবের আলোক-স্যন্দন।

মুহূর্ত্তের প্রোজ্জ্বল আলো ক্ষণিকে নির্ব্বাপিত হায়,
প্রথম নিশীথ-রাতে আলোকের অস্ফুট সাধনা ;
দুঃখ-সুখের আবর্ত্তনে শতাব্দী ভরিয়া যায়,
মানবের বক্ষে জাগে সীমাহীন অশান্ত কামনা !

অতীতের পুঞ্জীভূত বেদনার যত ইতিহাস,
পুলক-চঞ্চল সেই বসন্তের ফেনিল উৎসব ;
অতন্দ্র-স্মৃতির পথে জাগে আজি তাদেরি প্রকাশ,
চেতনা-গোধূলি শেষে আলো-ছায়া লীলা অভিনব।

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় (এম, এ)

মহিলা যাদুকর

যাদুকর বা যাদুবিদ্যা বলিতেই আমাদের মনে হয়, এ যেন পুরুষ মানুষের ক্রিয়া—স্ত্রীলোকের এখানে প্রবেশাধিকার নাই। অনেক বড় বড় যাদুকর তাঁহাদের সহকারিরূপে কয়েক জন সুন্দরী স্ত্রীলোক রঙ্গমঞ্চে রাখেন। কিন্তু তাঁহারা যাদুকরের সহকারিরূপে মাত্র কাজ করেন, মহিলা যাদুকররূপে নহে। কিন্তু মহিলা যাদুকরও যে যথেষ্ট আছেন বা ছিলেন, আমাদের অনেকেই তাহার খোঁজ রাখেন না। এ দেশে যাদুবিদ্যার অপর এক নাম ভানুমতীর খেলা বা ভানুমতীকা খেল। কথিত আছে, প্রাচীন কালে প্রমার-বংশীয় রাজা ভোজের কন্যার নাম ছিল ভানুমতী। রাজা বিক্রমাদিত্যের মহিষী এই রাণী ভানুমতী তাঁহার পিতার নিকট হইতে যাদুবিদ্যায় জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং এমনও প্রসিদ্ধি আছে যে, যাদুবিদ্যায় তিনি তাঁহার পিতা ভোজরাজ অপেক্ষাও পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই রাণী ভানুমতীর নাম হইতেই যাদুবিদ্যা 'ভানুমতীর খেলা' নামে পরিচিত হইয়াছে। ভোজ রাজার নাম হইতে এই বিদ্যার অপর নাম ভোজবাজী বা ভোজবিদ্যা হইয়াছে। ভারতীয় মহিলা যাদুকরদিগের মধ্যে রাণী ভানুমতীর নামই সম্ভবতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। আধুনিক কালে এদেশীয় হাটে মাঠে ঘাটে যাদুবিদ্যা প্রদর্শনকারীদের মধ্যে অবশ্য অনেক মহিলা যাদুকর দেখা যায়। তাহারা নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া তাহাদিগকে 'মহিলা যাদুকর' না বলিয়া 'স্ত্রীলোক যাদুকর' বলাই সমীচীন। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি ঐ অশিক্ষিত পথের বেদিয়াদের কথা টানিয়া আনিতে চাহি না। আমি বলিতে চাই, শিক্ষিত সমাজের মহিলা যাদুকরদেব কথা ও কাহিনী। ভারতবর্ষে না থাকিলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মহিলা যাদুকরের অভাব নাই। চীন, জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী কোন দেশেই শিক্ষিতা যাদুকরের অভাব নাই। সর্ব্বপ্রথম জাপানের কথা হইতে আরম্ভ করা যাইতেছে। আমি যখন যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের জন্য জাপান গিয়াছিলাম, তখন ওকাশা সহরে, দোতম্বচরির নাকা-জা থিয়েটারে জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা যাদুকর 'সোকিও কুই টেন কাট্সু'কে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করি। টেন কাট্সুর ম্যাজিক দেখিয়া মনে হইল—ইহা সত্যই ম্যাজিক! চক্ষুর সম্মুখে স্বপ্নবৎ কি ব্যাপার হইয়া যাইতেছে কিছুই বুঝি নাই! জীবনে বহু ম্যাজিক দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ কখনও দেখি নাই। কি দৃশ্য, কি রং, কি আলো এবং কি পরিচালনা! এক ষ্টেজ ভর্ত্তি মেয়ে নাচিতেছে—পরমুহূর্ত্তে সমস্ত অদৃশ্য হইয়া গেল এবং সেখানে দেখা দিল একটি সুরম্য উদ্যান। টাকার বৃষ্টি নামিল, জলের ফোয়ারা তাঁহার হাতের অঙ্গুলির উপর, তলোয়ার এবং পাখার উপর নাচিতে লাগিল—সমস্তই অদ্ভুত, অভূতপূর্ব্ব এবং বিস্ময়কর। টেন কাট্সু ইংলণ্ডের যাদুকর-সম্মিলনীর পূর্ব্বতন সভাপতি হোরেস গোল্ডিন সাহেবের কৃতী ছাত্রী। তাঁহার অপূর্ব্ব কার্য্যকৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া গোল্ডিন সাহেব শতমুখে এই মহিলা ঐন্দ্রজালিকের প্রশংসা করিয়াছেন। টেন কাট্সু বর্ত্তমানে বয়সে বৃদ্ধা হওয়াতে তদীয়া কন্যা (বর্ত্তমানে বয়স প্রায় ৩০ বৎসর) টেন কাট্সু জুনিয়ার নাম লইয়া যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতেছেন। জাপানে আরও অনেক মহিলা ঐন্দ্রজালিক আছেন, তন্মধ্যে ম্যাডাম 'টেন কুয়া'র নাম পৃথিবী-বিখ্যাত। টোকিওর যাদুকর-সম্মিলনীতে বহু মহিলা যাদুকর সভ্যা আছেন এবং তাঁহাদের প্রতিপত্তিও কম নহে।

আমেরিকার হাওয়ার্ড থার্সটন সাহেব যাদুবিদ্যায় সমগ্র পৃথিবী চমকিত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া এই শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি কিরূপ হুলস্থুলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা অনেকেরই স্মরণে আছে। বর্ত্তমানে তদীয়া কন্যা 'জেন' (Jane) পিতার অপূর্ব্ব যাদুবিদ্যা সমূহ প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই আমেরিকায় প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন।

বিলাতের যাদুকরদিগের মধ্যে ম্যাডাম প্যাট্রিস অর্থাৎ বিখ্যাত যাদুকর সি, ল্যাং, নীলের স্ত্রী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষিতা নহেন, ছয়টি বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন। এক কালে ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারে তাঁহার খুবই সমাদর ছিল এবং বহু বার সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের সম্মুখে তাঁহার যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। মহিলা যাদুকরদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম যাদুকর ডি, কোল্টা (De Kolta) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত 'Vanishing Lady' খেলাটি রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শনে সমর্থ হন। এই খেলায় তাঁহার এত সুনাম হয় যে, তৎকালে ইংলণ্ডের সম্রাট্ কর্ত্তৃক সার্ডিংহামের বল-রুমে যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের জন্য আদিষ্ট হন। এই সময় প্রখ্যাতনামা ইংরেজ যাদুকর চার্লস বারট্রাম সাহেব তাঁহাকে সাহায্য করেন। এই দিন যাদুবিদ্যা প্রদর্শন কালে প্রিন্সেস অব ওয়েলস্ জানান যে, যাদুবিদ্যা দ্বারা অদৃশ্য হইয়া যেন তিনি তাঁহার রাণীর ড্রয়িংরুম হইতে একটি ফুলের তোড়া আনিয়া দেন। তাঁহাকে একটি সিল্কের কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইল। ওয়ান-টু-থি! তিনি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন! ঠিক দশ সেকেণ্ড পরে দেখা গেল ম্যাডাম প্যাট্রিস ফুলের তোড়া হস্তে ড্রয়িংরুমে উপস্থিত। তিনি জার্ম্মাণী ভাষায় কয়েকটা কথা বলিয়া সেই ফুলের তোড়া প্রিন্সেসের হাতে দিলেন। সার্ডিংহামে এই অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিবার পর ম্যাডাম প্যাট্রিস সমগ্র দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন। এই সময়ে আমেরিকায় অপর এক জন মহিলা যাদুকর যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ম্যাডাম হারম্যান! জার্ম্মাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা ঐন্দ্রজালিক এলেনোর অরলোয়া এই সময়ে বেলজিয়ামের সম্রাজ্ঞী হেনরিয়েটা এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সম্মুখে তাঁহার যাদুবিদ্যা দেখাইয়া সমগ্র য়ুরোপে খ্যাতিলাভ করেন। সমসাময়িক মহিলা যাদুকরদের মধ্যে ফ্রান্সের নিকোলা এবং জাপানের ওকিটা এই দুই জনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা উভয়েই সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

তৎকালে মহিলা এমেচার যাদুকরদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন বেলজিয়ামের সম্রাজ্ঞী হেনরিয়েটা। প্রসিদ্ধ আমেরিকান যাদুকর কার্ল হারম্যান ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অষ্টেণ্ড সহরে আসিলে সম্রাজ্ঞী তাঁহাকে যাদুবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। তদনুযায়ী হারম্যান সাহেব ব্রসেলস্এর রাজপ্রাসাদে ছয় মাস কাল রাজ-অতিথি হইয়া থাকেন এবং রাণী প্রতিদিন চারি ঘণ্টা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিতেন! সম্রাজ্ঞী পরে

যাদুবিদ্যায় এত দক্ষতা অর্জ্জন করেন যে, তৎকালীন ইউরোপীয় যে কোন বড় পেশাদারী যাদুকর অপেক্ষা কৃতিত্বে তিনি কম ছিলেন না। তিনি নিজের প্রাসাদমধ্যে একটি ষ্টেজ বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করাইতেন। সম্রাজ্ঞীর খেলা সমস্তই যে উচ্চশ্রেণীর ছিল সে কথা যাদুকরমণ্ডলী মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। অপরাপর পেশাদার মহিলা যাদুকরদিগের মধ্যে ম্যাডাম কোনোরা, মিস্ লা ব্রেণ্ট, মিস ভায়লেট ডোলস্ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাদুকর উইল গোল্ডষ্টোনের স্ত্রী 'লা ডেভো' নাম লইয়াও কয়েক বার যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করাইয়াছেন। যাদুকর 'সার্ভাস লি রয়'এর স্ত্রী থালমা এবং "টাকার রাণী" টাল্‌মার নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎকালে যাঁহারা যে খেলায় বিশেষজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইতেন, তাঁহারা সেই সেই খেলার রাজা বলিয়া পরিচিত হইতেন। উদাহরণ-স্বরূপ হুডিন হাতকড়ির রাজা, থার্সটন তাসের রাজা, নেলসন king of coins প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সময় টালমা তাঁহার অপূর্ব্ব টাকার খেলা দেখাইয়া সমগ্র পৃথিবীময় 'টাকার রাণী' নামে সুপরিচিতা হন, ইহা তাঁহার এবং মহিলা যাদুকরদের বিশেষ গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে। কাগজের খেলায় বিশেষজ্ঞা হইয়া মহিলা যাদুকর মে হ্যামিলটন "কাগজের রাণী" নামে পরিচিতা হইয়াছিলেন।

আর এক ধরণের যাদুবিদ্যা আছে, যাহা এই যন্ত্রসম্বলিত আধুনিক রঙ্গমঞ্চের যাদুর সঙ্গে তুলনা চলে না। উহা এক প্রকার মানসিক ম্যাজিক। ইহাতে দিব্যদৃষ্টি, সম্মোহন, চিন্তাপাঠ, শক্তিচালনা প্রভৃতি ক্রিয়া এবং কখনও কখনও ভৌতিক ক্রিয়া সমূহও দেখান হয়। এই জাতীয় খেলায় আমেরিকার ফক্স ভগিনীযুগল পৃথিবীময় সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ভৌতিক লেখা প্রভৃতি অনেকগুলি ভূতুড়ে খেলায় মার্গারেট ফক্সের নাম সুপ্রসিদ্ধ। মিস্ আনা ইভা ফে এই জাতীয় খেলা দেখাইয়া পৃথিবীর যাদুকরমণ্ডলীকে চমকিত করিয়া দিয়াছেন। ভূতুড়ে ম্যাজিকে ম্যাদাম ব্লাভাট্স্কি-প্রমুখ কয়েক জনের নামও সুপরিচিত। ম্যাদাম ব্লাভাট্স্কি তিব্বত হইতে অনেক আত্মিক ও ভৌতিক তত্ত্বপূর্ণ খেলা শিখিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আমেরিকার লারসেন-পরিবার এই ধরণের খেলায় প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। লারসেন-পরিবারের সকলে এই জাতীয় মানসিক ম্যাজিকে জ্ঞান দিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সরল ভাষায় বক্তৃতা দিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন। উইলিয়ম লারসেনের স্ত্রী জিরাল্ডিন লারসেন বিগত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে যাদুবিদ্যা-বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা The Genii সম্পাদনা ও পরিচালনা করিতেছেন। এই মহিলা ঐন্দ্রজালিক শুধু যাদুবিদ্যা দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই—নিজে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করিতেছেন এবং বর্ত্তমানে আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুবিদ্যা-প্রতিষ্ঠান The Thayer's Studio of Magic এই লারসেন-পরিবার ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে 'কার্টার দি গ্রেট' নামক যে মার্কিণ ঐন্দ্রজালিক কলিকাতার গ্লোব ও ছায়া রঙ্গমঞ্চে যাদুবিদ্যা দেখাইয়া গিয়াছেন—তাঁহার সঙ্গে মিস্ ম্যাক্সওয়েল নামক এক জন মহিলা যাদুকর ছিলেন। মিস্ ম্যাক্সওয়েল লোকের মনের কথা অনায়াসে বলিয়া দিতেন। তৎকালে কলিকাতায় উক্ত মহিলা ঐন্দ্রজালিক কি চাঞ্চল্যের সৃষ্টিই না করিয়াছিলেন! পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, জর্জ্জিয়া ম্যাগ্‌নেটের কথা—এক জন ক্ষীণাঙ্গী রমণী ষ্টেজে দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং কোন সবল পুরুষই তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া নাড়াইতে পারিতেন না। জর্জ্জিয়া ম্যাগ্‌নেট এই খেলা দেখাইয়া আমেরিকায় বিশেষ হুলস্থুলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও অনেকে আছেন।

মহিলাদিগকে যাদুবিদ্যা শিক্ষাদানের নিমিত্ত লণ্ডনে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে এবং ইতিপূর্ব্বে সেখানে চারি শত জন মহিলা ভর্ত্তি হইয়াছেন। যাদুকর সম্মিলনীর বিবরণীতে প্রকাশ, বার্লিন সহরেও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। আমেরিকাতেও না কি মহিলাদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা আছে—তবে সেখানে পৃথক্ ব্যবস্থা নাই—পুরুষ এবং মহিলা একই সাম্মিলনীতে যোগদান করেন।

যাদুকর পি, সি, সরকার

ব্রত

আমি তো আসিনি হেথা
বাজাইতে বেদনার বাঁশী!
আমারে ফুটাতে হবে ফুল,
আমারে জাগাতে হবে হাসি।

যাদের ব্যথার দিনগুলি
যায় চলি
অন্ধকার হতে অন্ধকারে;
তাহাদের ঘরে ঘরে
ক্ষুদ্র এক দীপ দিব জ্বালি,—
আকাশের আলোর পাথার—
যতটুকু পারি
দিব সেথা ঢালি।

অন্ধ গুহামাঝে যারা মাথা ঠুকে মরে,
সহস্র ধিক্কারে
জর্জ্জরিত জীবন যাদের—
আমি তাহাদের
সন্ধানিয়া দিব পথ—যোগাব পাথেয়।
এ হতে অধিক শ্রেয়
অন্য ব্রত নাহি জানি আমি—
মানুষে সেবিতে চাই, নহি স্বর্গকামী।

শ্রীদুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী

ছোটদের আসর

সঙ্গীত ও সঙ্গত

(গল্প)

৩৩ নম্বর বাস। ভারি গোলমেলে। কখনও দশ মিনিট অন্তর আবার কখনও এক ঘণ্টা অন্তর। নিয়মিত অনিয়ম। তবে একটা নিয়ম মানে—দরকারের সময় লেট হবেই।

পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র রোডের মোড়ে বৃটিশ ওয়েলফেয়ার আপিসের ছোট বাবু ননী ঘোষ প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বাসের জন্য অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন; এমন সময় আমেরিকান ওয়ার আপিসের একটা ডিপার্টমেন্টের ইন-চার্জ্জ ফণী বোস সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন। দু'জনেই অপেক্ষা করছেন বাসের জন্য। আকাশ কালো হয়ে উঠল। কড়্ কড়্ করে মেঘ ডাকতে লাগল। তার পরই মুষলধারে বৃষ্টি।

ফণী বাবু ছাতা খুললেন। ননী বাবুর সঙ্গে ছাতা ছিল না। ফণী বাবু তাঁকে ইনভাইট করলেন। ননী বাবু বৃষ্টির দাপট থেকে বাঁচবার জন্য ফণী বাবুর ছত্রতলে আশ্রয় নিলেন। ননী বাবু ও ফণী বাবুর এই প্রথম সাক্ষাৎ এবং আলাপ।

দূরে ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ। ননী বাবু বললেন—"যাক, বাসটা তাহলে শেষ পর্য্যন্ত এল।" ফণী বাবু বললেন—"তা এল, তবে আর একটু আগে এলে বৃষ্টিতে ভিজতে হতো না। যা হাওয়া, ঝাটে কাপড়-জামা ভিজে ঢোল!" ননী বাবু হেসে বললেন—"যা বলেছেন। বাসের জন্য অপেক্ষা তো নয়, যেন তপস্যা!"

বাস এলো। দু'জনেই উঠে পড়লেন। কি ভীড়! লোক সব ঝুলে চলেছে—যেন বাদুড়-ঝোলা! দু'জনে উঠলেন রীতিমত মারামারি করে। দাঁড়ালেন পাশাপাশি। সমান অবস্থায় এবং কষ্টের অবস্থায় ভাব খুব তাড়াতাড়ি জমে ওঠে। ননী বাবুতে ফণী বাবুতে দিব্য জমে উঠল। দু'জনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধাক্কা খেতে খেতে মন খুলে বাসের কর্ত্তৃপক্ষকে গালাগাল দিতে লাগলেন।

শ্যামবাজারের পাঁচ-মাথা মোড়ে এসে ভীড় অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। একটা সীট খালি হতেই দু'জনে পাশাপাশি বসে পড়লেন। বাস-কণ্ডাক্টর টিকিট চাইতে এল। ননী বাবু ব্যাগ বার করে বললেন—"আলিপুর একখানা। আপনার?" জিজ্ঞাসু নেত্রে ফণী বাবুর দিকে চাইলেন। ফণী বাবুও ততক্ষণে ব্যাগ বার করেছেন। বাধা দিয়ে বললেন—"আমারও আলিপুর। না, না, আমি দিচ্ছি।" ফণী বাবুর হাত চেপে ধরে ননী বাবু বললেন—"না, না, সে কি কথা! আমি দিচ্ছি।" উভয়ে উভয়ের হাত ধরে "না" "না" করতে লাগলেন। বাস-কণ্ডাক্টর আবার বললে—"টিকিট বড়া বাবু।" ননী বাবু তার হাতে একখানা এক টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, "দু'খানা আলিপুর।"

বাস চলেছে, গল্পও চলছে। মধ্যে মধ্যে ষ্টপেজে বাস থামছে, কিন্তু গল্প থামছে না। বিরামহীন, নন-ষ্টপ।

ননী বাবু বললেন,—"ভালই হলো। অনেকক্ষণ একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। আপনি আলিপুরে কোথায় যাবেন?"

ফণী বাবু জবাব দিলেন—"আলিপুর কোর্টের কাছে। আমেরিকান ওয়ার অফিসের আমি সেকসন্যাল ইন-চার্জ্জ। আপনি কোথায় যাবেন?"

"এ্যাণ্ডারসন হাউসের কাছে। বৃটিশ ওয়েলফেয়ার অফিসের আমি ছোট বাবু।"

"যুদ্ধের কি রকম বুঝছেন?"

"আমরাই জয় লাভ করব। জাম্মানরা তো প্রায় কাৎ হয়ে এসেছে।"

এ কথা সে কথা চলতে লাগল।

"আর পারা যায় না। বর্ষাকালে কোথায় ইলিশমাছ খাব, চার পাঁচ আনা সের, তা না, ছোঁয় কার সাধ্য। তিন টাকার কমে পাওয়া যায় না।"

"সে তো বরফের মাছ। টাটকা গঙ্গার ইলিশ, সে দিন বাগবাজারের ঘাটে দর করছিলুম—ব্যাটা বলে কি না আট টাকা।"

"আর ডিম?"

"সে কথা আর বলবেন না। কোথায় দেড় পয়সা দু'পয়সা জোড়া ডিম ছিল, তার জায়গায় হয়েছে কি না পাঁচ-ছ' আনা জোড়া। মানুষ খায় কি?"

আরও কত রকম কথাবার্ত্তা হলো।

ননী বললেন—"আফিস থেকে খেটে-খুটে গিয়ে রাত্রে একটু বিশ্রাম করবো তারও উপায় নেই। পেছনের বাড়ীতে কে এক ভদ্রলোক কালোয়াতি গান গায়। কি চেঁচিয়ে গলা। বাপ্!"

ফণী বললেন—"কাকে বলছেন? আমারও সেই দশা। আমার বাড়ীর পিছনেও কারা এসেছে। তারা আবার রাত্রে তবলা বাজানো প্র্যাক্টিস করে। কি বিশ্রী আওয়াজ! ধাপুস ধুপুস, দ্রুম দ্রাম!"

"সত্যি। ঘুমোবার সময় ভারী খারাপ লাগে। আমার বাড়ীর পিছনের বাড়ীর লোকটা যদি গাইতে পারত, না হয় শোনা যেত। কিন্তু সে তো গান নয়, যেন ষাঁড়ের চীৎকার! গলা ধোপার গাধাকেও হার মানায়।"

"আমার অবস্থাও তদ্রূপ। যে ব্যাটা তবলা বাজায়, তার না আছে লয়-জ্ঞান, না আছে বোলের মিষ্টতা। যেন ছাত পেটে! এ রকম লোককে পুলিশে দেওয়া উচিত।"

"একশো বার।"

বাস-কণ্ডাক্টর চেঁচালো আলিপুর সেণ্টাল জেল। ননী বাবু ও ফণী বাবু দু'জনেই নেমে পড়লেন। খানিকটা পথ একসঙ্গে হেঁটে চললেন।

ননী বাবু জিগ্যেস্ করলেন—"আপনি পাইকপাড়ায় থাকেন তো?"

ফণী বাবু উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ। ঐ যে পাইকপাড়া মেন রোডে নতুন কলোনী হয়েছে, সেইখানে।"

"আমিও যে সেইখানে থাকি! দিন পাঁচেক হলো গেছি। ১১ নম্বর হেমন্ত মল্লিক ষ্ট্রীট।"

"আমি মাত্র দিন সাতেক হলো ও-পাড়ায় গেছি। ৭ নম্বর বসন্ত বিশ্বাস ষ্ট্রীট।"

"তাহলে ফণী বাবু, এক দিন আমার বাসায় পায়ের ধুলো দেবেন।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! সে কথা আর বলতে। পরের সপ্তাহে শুক্রবার ছুটী আছে। সে দিন বিকেলে কি আপনি বাড়ী থাকবেন?"

"থাকব। আমাদেরও সে দিন ছুটী আছে। কি এক মুসলমান-দের পরব।"

"বেশ, সেই দিন যাব। আপনি যদি এর মধ্যে সুবিধা করতে পারেন তো আমার গৃহে পদার্পণ করবেন।"

"সে কথা আর বলতে! যাব বই কি! সময় পেলেই যাব।"

দু'জনে নিজ নিজ পথে চলে গেলেন।

পূর্ণিমার রাত্রি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত। মৃদু-মন্দ দখিণ সমীরণ বইছে। ফণী বাবু সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে ছাদে গেলেন। মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। চাঁদের কিরণ, দখিণ পবন!

মনের সুখে গলা ছেড়ে গান ধরলেন—"সজনী, মো সে না বোলো।"

ননী বাবুর সে দিন তাড়াতাড়ি ছুটী হয়েছিল। তিনিও সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে ছাদে উঠেছেন। তাঁরও মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। চাঁদের কিরণ, দখিণ পবন। চড়া করে তবলা বেঁধে মনের সুখে বাজাতে আরম্ভ করলেন—"ধাগে নাগে তেটে ধিন।"

নিজ নিজ ছাদে উভয়েই নিজ নিজ মনে বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

ফণী বাবু ভাবলেন—এমন গানটা মাটী করে দিলে। তবলা বাজাচ্ছে, দেখ না! দুম দামাদ্দম। ছিঃ ছিঃ!

ননী বাবু ভাবলেন—এমন লয়-তালহীন গাধার মত চেঁচালে কখন তবলা বাজানোয় মন বসে! রাম রাম।

অপরাধীকে দেখবার জন্য দু'জনেই ছাদের আলিসার দিকে এগিয়ে এলেন। চন্দ্রালোকে হলো দু'জনে সাক্ষাৎ।

১৯ নম্বর হেমন্ত মল্লিক ষ্ট্রীটের পিছনেই ৭ নম্বর বসন্ত বিশ্বাস ষ্ট্রীটের বাড়ী। ননী বাবু আর ফণী বাবুর বাড়ী পিঠোপিঠি।

শুনছি, অনেকে বাড়ী পাচ্ছেন না? আমি বাড়ীর সন্ধান দিতে পারি। এই সপ্তাহের মধ্যেই না কি ১৯ নম্বর হেমন্ত মল্লিক ষ্ট্রীটের এবং ৭ নম্বর বসন্ত বিশ্বাস ষ্ট্রীটের বাড়ী দুটি খালি হয়ে যাবে। কিন্তু খবরদার, কালোয়াতী গান গাইবেন না, আর তবলা বাজাবেন না!

লাল মাছ

সখের জন্য লাল মাছ পুষিতে আরাম আছে। তার কারণ, মাছকে লইয়া এতটুকু হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। কুকুর, পাখী, বানর পুষিলে নানা জ্বালা! ক্ষুধা পাইলে তারা চীৎকার করে—অসুখ হইলে চিকিৎসা করাও—এমনি নানা উৎপাত। মাছের এ-সব বালাই নাই! ক্ষুধা পাইলে বা রাগ হইলে এতটুকু চীৎকার তুলিবে না। তাদের গায়ে গন্ধ নাই, পোকার উৎপাত নাই। তার উপর মাছের কোথাও এতটুকু নোংরামি নাই। এ জন্য মাছ পোষায় সৌখীনতায় বাধে না।

তোমাদের অনেকের বাড়ীতে লাল মাছ আছে, নিশ্চয়। কিন্তু লাল মাছ পুষিয়া আমরা অনেকে তাদের বাঁচাইতে পারি না! বাঁচাইতে না পারার কারণ লাল মাছের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞান নাই! খাওয়ানো এবং জল বদলানোর বিষয়ে যে যখন যাহা বলে, তাহাই আমরা শিরোধার্য্য করি! তার ফলে মাছের স্বাস্থ্য হয় ক্ষুণ্ণ এবং মাছ বড় শীঘ্র মরিয়া যায়।

আমেরিকায় বাস করেন ডক্টর চার্লশটন। তিনি মস্ত বড় জীব-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত—মাছ আর পাখী পোষেন—অনেক রকম। মাছের সম্বন্ধে তিনি এক জন বিশেষজ্ঞ। তাঁর বাড়ীর লাল মাছ দু'-চার বছর

এমনি গড়নের পাত্রে লাল মাছ রাখিবে

বেশ সুস্থ দেহে বাঁচিয়া থাকে। কি-নিয়মে তিনি লাল মাছ রাখেন, জানিয়া সেই ভাবে রাখিলে, লাল মাছকে দীর্ঘকাল বাঁচানো যাইবে।

জাতের নাম (উপর হইতে নীচে) রাজপুচ্ছ; সিংহশির; শালচাঁদা, তেলারি

তিনি বলেন, লাল মাছ রাখিবার পক্ষে সব চেয়ে ভালো—চতুষ্কোণ আধার বা পাত্র। পাত্র কাঁচের হইবে। কাঁচের গোল বা গ্লোবের মত পাত্রে অসুবিধা আছে! গোল পাত্রে মাছকে দেখায় কিম্ভূত-কিমাকার; তার উপর গোল পাত্রে লাল মাছ রাখিলে তারা লম্বা-লম্বি ভাবে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না—উপর-নীচে করিয়াই তাদের থাকিতে হয়। তাহাতে অস্বাস্থ্য ঘটে! তাছাড়া গোল পাত্রে উপরকার ও তলাকার জল এক-লেভেলে থাকে না বলিয়া মাছেরা যথানুরূপ বাতাস পায় না—নিশ্বাস লইতে তাদের কষ্ট হয়।

চতুষ্কোণ-পাত্রটি হওয়া চাই rectangular। পাত্রে যে জল দিবে, তার গভীরতা অন্ততঃপক্ষে আট হইতে বারো ইঞ্চি পর্য্যন্ত হওয়া চাই। এক-ইঞ্চি মাপের মাছের জন্য জল প্রয়োজন এক গ্যালন। যে চতুষ্কোণ-পাত্রের মাপ লম্বে-প্রস্থে ৪০০ বর্গ-ইঞ্চি—সে-পাত্রে এক-ইঞ্চি সাইজের মাছ রাখিতে পারো কুড়িটি মাত্র; তার বেশী

নয়। চার-ইঞ্চি সাইজের মাছ হইলে একত্রে পাঁচটির বেশী মাছ ও-পাত্রে রাখিবে না।

যে-পাত্রে লাল মাছ রাখিবে, সে-পাত্রে শ্যাওলা গুল্ম-লতা রাখা চাই; আর চাই বালি। ধপ্ধপে সাদা বালি। বালি থাকিবে পাত্রের নীচে। এক-ইঞ্চি-দু'-ইঞ্চি পুরু করিয়া বালি ঢালিয়া রাখিবে। পিছন দিকে এ বালি রাখিতে হইবে বেশ পুরু করিয়া স্তূপাকারে—সামনের দিকে স্তূপ নয়, পাৎলা করিয়া রাখিবে। এবং এই বালির গায়ে শ্যাওলা ও গুল্ম-লতার প্রান্ত বা শিকড় ঠেকিয়া থাকা চাই। তাহা হইলে বাহার খুলিবে চমৎকার।

কিন্তু শুধু বাহারের জন্যই শ্যাওলা গুল্ম-লতা রাখার প্রয়োজন নয়। শ্যাওলা ও গুল্ম-লতা পাত্রের জলে বাড়িবে। এই শ্যাওলায় ও গুল্ম-লতায় মাছের পরিত্যক্ত যত কিছু ময়লা, নোংরা মিশিয়া যায়—তার বিষে মাছের অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। তার চেয়েও এ গুল্মলতার উপকারিতা এই যে, সেগুলি হইতে মাছ অক্সিজেন-বাষ্প পায়। এ বাষ্পে মাছের প্রাণ! তাছাড়া অক্সিজেন-বাষ্পের স্পর্শে জল নির্দ্দোষ পরিশুদ্ধ থাকে। কোন্ কোন্ জাতের শ্যাওলা এ বিষয়ে বিশেষ উপকারী—যারা লাল মাছের ব্যবসা করে, তারা বলিয়া দিবে।

শ্যাওলা এবং বালি-সমেত চতুষ্কোণ পাত্রে লাল মাছ রাখিলে দু'বছর যদি সে-পাত্রের জল না বদলাও, তবু মাছের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে না—মাছ বাঁচিয়া থাকিবে। শ্যাওলা যে রাখিবে তার শিকড় গজাইলে সে শিকড় পাত্রের তলায় বালির সঙ্গে আটকাইয়া থাকা চাই। লতাপাতা শুকাইয়া মরিয়া গেলে সেগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিবে, যদি ছাখো কোনো লতাপাতা উঠিয়া গিয়াছে—জানিবে, মাছ তাহা খাইয়া সাফ করিয়াছে! কোনো কোনো জাতের লাল মাছ শ্যাওলা খায়।

পাত্রের মধ্যে ছোট গেঁড়ি-শামুক ফেলিয়া রাখিতে পারো ভালো। গেঁড়ি-শামুক রাখিলে পাত্রে ময়লা নোংরা জমিবে না—তারা সে-সব নোংরা আবর্জ্জনা খাইয়া পাত্রের জল নির্ম্মল রাখিবে। যে-পাত্রে এক গ্যালন জল ধরে, তার মধ্যে দু'টি ছোট শামুক রাখা চলে—তার বেশী নয়। পাত্রে যেন ভিড় না জমে, সে বিষয়ে সাবধান! গেঁড়ি-শামুক জমাদারের কাজ করে—নোংরা ময়লা থিতাইতে দেয় না। পাত্রে তাদের ঠাঁই দিলে জল বদলাইবারও প্রয়োজন থাকবে না।

নানা জাতের মাছ

বড় সাইজের এবং ছোট সাইজের লাল মাছ একসঙ্গে এক পাত্রে রাখিবে না—রাখিলে বড় মাছ ছোটকে খাইয়া ফেলিবে।

অতিরিক্ত মমতা করিতে গিয়া আমরা অনেক সময়ে লাল মাছ মারিয়া ফেলি। লাল মাছ খায় খুব কম—তাদের গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলাইবে না। একটি-দুইটি কীট বা ফড়িং চমৎকার খাদ্য। খই, ময়দার খুব ছোট ছোট গুলী খাইতে দিয়ো—তবে খুব কম পরিমাণে দিবে। খাইতে দিবে একবার। বড় মাছ তার দিনের খাদ্য পাঁচ মিনিটে খাইয়া নিঃশেষ করে—ছোট সাইজের মাছ খায় পনেরো মিনিটে। তার পর যা খাইতে দিবে, সে-খাবার হইবে বিষ—এ-কথা মনে রাখিয়ো। যে-খাবার তাহাদের আহারের পরে পড়িয়া থাকিবে, পাত্র হইতে তুলিয়া সেগুলি ফেলিয়া দিবে,—পাত্রে তার কণাও না পড়িয়া থাকে! মাছের দেহের যা-ওজন, তার অর্দ্ধেক ওজনের খাদ্য যদি তারা পায়, তাহা হইলে দু'-চার দিন কোন-কিছু না খাইলেও লাল মাছের স্বাস্থ্য-হানি ঘটিবে না বা কোন ক্ষতি হইবে না।

যখন জল বদল করিবে, তখন একটি বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকিবে। চৌবাচ্ছা বা কল বা নদী-দীঘি-পুকুর হইতে জল আনিয়া সে-জল তখনি মাছের পাত্রে ঢালিয়া বদল করিয়ো না। যে টাটকা জল আনা হইল, সে-জল পাত্রে ভরিয়া যেখানে লাল মাছের পাত্র আছে, তার পাশে এই টাটকা-আনা জলের পাত্র রাখিয়া দাও অন্ততঃ পক্ষে এক ঘণ্টা। এক ঘণ্টা রাখিলে এই টাটকা জলের তাপ বা টেম্পারেচার মাছ-রাখা পাত্রের জলের টেম্পারেচারের সমান হইবে, তখন মাছের পাত্রের জল ফেলিয়া মাছের পাত্রে এই টাটকা-আনা জল ঢালিয়া দিবে। জল ফেলা এবং ঢালা—এ দু'টি কাজ করিতে হইবে রবারের নল-যোগে ধীরে-ধীরে। ছলাৎ করিয়া জল ফেলিয়া পরক্ষণে ঢক্ করিয়া টাটকা জল ঢালা—এমন কাজ কদাচ করিবে না। বদলানো জলের আকস্মিক টেম্পারেচার-বদলের জন্য অনেক সময় লাল মাছ মরিয়া যায়।

আর একটি কথা মনে রাখিয়ো—এমন জায়গায় লাল মাছ রাখিবে, সে জায়গায় সরাসরি রৌদ্র আসিয়া যেন না পড়ে! তাই বলিয়া অন্ধকার কোণে রাখা ঠিক নয়। রৌদ্রের ঝাঁজ যেন পাত্রেনা লাগে। রৌদ্রের তাপ হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য দুপুর বেলায় পাত্রটির গায়ে কাগজ বা কাপড় ঢাকিয়া দিবে।

রাত্রে মাছের পাত্রের পিছনে ১০-১৫ ওয়াটের একটি বিজলী বাতির বাল্ব জ্বালিয়া দিলে চমৎকার বাহার খুলিবে।

লাল মাছ আছে নানা জাতের। এক পাত্রে নানা জাতের মাছ

রাখিতে পারো, তবে আকারে যেন সব সমান হয়। বড়র সঙ্গে ছোট মাছ রাখিলে বড়র হাতে ছোটর মার সুনিশ্চিত—মাছের মনে দয়া নাই, মায়া নাই।

——

পাবলিসিটি

আমি একটা কিছু করছি,—সকলে আমার নাম জানুক—এ প্রবৃত্তি শতকরা আটানব্বই জনের মনে জাগে। যে দু'জনের জাগে না, তারা হয় বৈরাগী, নয় আপন-ভোলা! এ প্রবৃত্তি দোষের, তা বলি না। এ প্রবৃত্তির জন্য অনেকে ইচ্ছা থাকলেও অন্যায় কাজ করতে পারে না। এ প্রবৃত্তির জন্য অনেকে সোৎসাহে কাজ করে কৃতিত্ব লাভ করেছেন, ইতিহাস খুললে সে পরিচয় আমরা পাবো।

তাই বলে কাজের মত কোনো কাজ করবো না অথচ কাগজে আমার নাম ছাপা হবে, এমন যার মনোভাব, তাকে আমরা কৃপার চোখে দেখি।

মাসের পর মাস এই যে দেখি, পাতানো-কাকা নয় পাতানো দিদি-মাসি সেজে ছোটদেব মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় আসর খোলা হয়েছে—আর সে আসরে তোমাদের বয়সের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা কেউ লিখছো—মাসি, আমাদের গাছে খুব লিচু হয়েছে এবার। কেউ লিখছো, আমাদের ছাগলটা ভারী ঢুঁ মারে! আর ঐ লেখা ছাপা হচ্ছে লেখার নীচে তোমাদের নাম-শুদ্ধ—এতে কি লাভ হয়, বলতে পারো? ভালো গল্প কবিতা বা প্রবন্ধ লিখেছো—সে লেখা ছাপা হলো,—কিম্বা ভালো ফটো তুলেছো, ভালো ছবি এঁকেছো—সে ছবি ছাপা হলো তোমাদের নাম-শুদ্ধ—ভালো খেলোয়াড় তুমি—নাম ছাপা হলো—এর মানে আছে,—এতে গৌরব আছে! আর পাঁচ জনে দেখে বলবে, চমৎকার ছবি—চমৎকার লেখা! বাঃ! এ-নাম ছাপার মানে বুঝতে পারি। নাহলে ঐ রকম যা-তা লিখে তলায় ছাপার অক্ষরে নাম—তাতে লজ্জা হওয়া উচিত!

ও-লেখায় কি এমন বৈশিষ্ট্য দেখাচ্ছো? আর পাঁচ জনেও অমনি দু'টি ছত্র লিখে নাম ছাপাতে পারে—সুতরাং ও ছাপা নাম দেখে তোমার সম্বন্ধে অপরে এমন কি ধারণা করবে যে, তোমার নাম সকলে জানবে—তোমার খ্যাতি প্রচার হবে? মাসে মাসে নানা পত্রে এমন কত নাম ছাপা হচ্ছে—সে সব নাম কে মনে রাখছে? এ রকম ছাপানো ক'দিন বাঁচে!

আর বাঁচবেই বা কেন? মাসিক-সম্পাদকের এ বেসাতির আমরা সমর্থন করি না! বরং বলি, এ ভাবে ছেলেমেয়েকে নির্লজ্জ মূঢ় নির্বোধ নিষ্কর্মা করবেন না।

ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। সে উৎসাহ কেন? কোন্ কাজে? নাম ছাপানোয় নয়। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ব্যবস্থা করুন প্রতিযোগিতার। ছবি আঁকা, ফটো তোলা প্রতিযোগিতা। খেলাধুলার প্রতিযোগিতা—ধাঁধা-হেঁয়ালির জবাব দেবে—তাতে তাদের বুদ্ধি হবে শানানো, প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাবে।

তোমাদের বলি, নিজের নাম এ ভাবে ছাপা দেখলে খুশী হও খুব, বুঝি! কিন্তু অপরের নাম এমনি দু'ছত্র লেখার নীচে ছাপা দেখলে তামাসা করে বলো না কি যে, হুঁঃ, ভারী তো খপর দেছেন—এর জন্য নাম ছাপাতে লজ্জা হলো না?

এমন শস্তায় কাগজে নাম ছাপা ফাঁকি! ফাঁকির কারবারে আজ না হয় দু'-একখানা কাগজে গাদার মধ্যে নাম ছাপানো হলো—সে নাম কেউ পড়লো একবার ঐ কাগজ এলে। প্রতি মাসে গাদা-গাদা নামে এত যে সব নাম ছাপা হচ্ছে—তোমার নাম সে গাদার চাপে ঢাকা পড়বে তো—তখন?

এত শস্তায় নাম ছাপিয়ে পাবলিসিটি হয় না। পাবলিসিটি যদি চাও, কাজ করো। এমন কাজ, যে-কাজ আর পাঁচ জনে করতে ছুটবে—এমন কাজ যে-কাজে পাঁচজনে আনন্দ পাবে, উপকার পাবে। নাহলে ও-ভাবে কাকা, দিদি, পিসি বলে নাম ছাপানো—এতে কাজের মানুষ হতে পারবে না—কোনো দিন নয়। ফাঁকি দিয়ে আজ পর্য্যন্ত কেউ এ-সব মাসি-পিসি-দিদি-কাকার মারফৎ নাম কিনতে পারেনি।

সনেট

কুসুম-কাননে যদি না কুসুম ফোটে,
ভ্রমরের কিবা এসে যায় বলো তায়?
বরষায় যদি মেঘ আকাশে না ওঠে
চাতকের তাতে বলো কিবা এসে যায়?

তবু তার মাঝে দু'জনাতে পরিচয়
তারি মাঝে আছে মিলনের এক সুর,—
তোমাতে আমাতে সেই মত পরিচয়
তোমার-আমার মাঝে সেই মত সুর।

তুমি কত বড়, আমি কত ছোট,—জানি,
ভিন্নতা কত তোমার আমার মাঝে;
সেই মত ঠিক প্রভেদ যে কতখানি—
ফুলে ও ভ্রমরে, মেঘে ও চাতকে রাজে।

তবু উহাদের মাঝে যত ভালোবাসা;
তোমার কাছেতে মোর তেমনিই যে আশা!

শ্রীমৃণালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথুর

ব্রজধাম এখন শূন্য। চারি দিকে হাহাকার রব! সবার মুখে "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" ধ্বনি। গোপীগণ বিরহকাতরা, শ্রীরাধা ধূল্যবলুণ্ঠিতা।

শ্রীকৃষ্ণ আর ব্রজধামে নাই। ব্রজধামের সকল মায়া ছিন্ন করিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। তিনি এখন সেখানকার রাজা—ও কুব্জা-প্রণয়ী। এ দিকে শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণ-বিরহে জীবন্মৃত-প্রায় হইয়া আছেন। কখন অচেতন কখনও বা অর্দ্ধচেতন অবস্থায় কাল কাটাইতেছেন। বৃন্দাদেবীর অঙ্গে অঙ্গ দিয়া মথুরার দিকে চাহিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন :—

"হরি কি মথুরাপুরে গেল
আজু গোকুল শূন ভেল।
রোদিতি পিঞ্জর শুকে
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব সোই যমুনার কূলে
গোপ-গোপী নাহি বুলে।
সাগরে তেজব পরাণ
আন জনমে হোয়ব কান।
কানু হোয়ব যব রাধা
তব জানব বিরহক বাধা॥"—বিদ্যাপতি

সখি! আমার সকল সুখ প্রিয়ার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। এখন এ নিদারুণ দুঃখের পশরা কত কাল বহিব রে!

"নয়ানক নিদ্ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুঃখ হাম পাশ"॥—বিদ্যাপতি

শ্রীরাধা এই সব কথা বলিতে বলিতে আকুল আবেশে "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" রবে রোদন করিতেছেন—

"কানু মুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী
ফুকারই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥—বিদ্যাপতি

শ্রীমতী ক্রমে অধীরা হইয়া সঙ্গিনীগণকে বলিলেন, "আর ত' প্রাণে বাঁচি না সখি! আজ আয় সকলে মাধবীতলায় গিয়ে কৃষ্ণ-লীলার চিহ্নগুলি দর্শন করে এ তাপিত প্রাণ কথঞ্চিৎ শীতল করি। এই মাধবীকে সখা আমার বড় ভালবাসিতেন—তাই এর নাম রেখেছিলেন 'মাধবী'।"

এই মাধবীতলায় আসিয়া শ্রীমতী এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া উদাস মনে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বলতে পার মাধবী, আমার কৃষ্ণ কোথায়? কোথায় গেলে তাঁকে পাই? তিনি ত' আমায় বলে গিয়েছেন, আমি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে কোথাও থাকব' না। তোমাদের জন্যই আমার গোলোক ত্যাগ করে গোকুলে আসা।"

"তোমার কারণে নন্দের ভবনে
রাখিয়া ধেনুর পাল
গোলোক ত্যজিয়া গোকুলে বসতি
ইহাই জানিবে ভাল।" —চণ্ডীদাস

শ্রীরাধারাণী ক্রমে উন্মাদিনীর ন্যায় সখীদের লইয়া একবার কদম্ব-মূলে, একবার যমুনার কূলে, একবার তমালতলে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর্ণলতিকার ন্যায় সুকোমল দেহখানি জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তিনি চলিতে চলিতে—"আর বুঝি প্রাণে বাঁচি না রে" বলিয়া টলিতে টলিতে ভূতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তখন ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ ছুটিয়া আসিলেন ও শ্রীমতীর স্পন্দনহীন মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ললিতা সখী সযত্নে শ্রীমতীর দেহ ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। সকলে ভাবিলেন, শ্রীমতীর অন্তিম দশা উপস্থিত, এ অবস্থায় কৃষ্ণনাম বিনা শ্রীমতীকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই। এই স্থির করিয়া সখীগণ মণ্ডলী করিয়া কৃষ্ণনাম-সুধা শ্রীরাধার কর্ণকুহরে ঢালিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সকলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বিহ্বলা হইয়া প্রেমতরঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সুমধুর কৃষ্ণনাম শ্রীরাধার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দেহে আবার স্পন্দন আনিল। তিনি চেতনা পাইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন "কৃষ্ণ—প্রাণনাথ! এত দিনে কি দাসীকে আবার মনে পড়িল। এস নাথ, আমার হৃদয়ে এস!" তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন এই জ্ঞানে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু বাঞ্ছিত নিধিকে বক্ষে না পাইয়া আবার উৎসাহ-হীনা হইয়া পড়িলেন। তখন বৃন্দাদেবী শ্রীমতীকে বলিলেন, "সখি! চল্ গৃহে ফিরি, হয়ত গৃহে গেলে কিছু শান্তি পাবি; তখন শ্রীমতী বলিতেছেন :—

"সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কে দূর করব পিয়াসা॥
চন্দনতরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু ন বরিখব
সুরতরু বাঁঝ কি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে॥"

"সখি! গৃহের কথা কি বলছ—আমার করম-দোষে সিন্ধুর নিকট গিয়াও তৃষ্ণা মিটাইতে পাইলাম না। ভাগ্যদোষে চন্দনতরু সৌরভ বিতরণে বিমুখ হইল, শশধর অগ্নি বর্ষণ করিল এবং চিন্তামণি গুণ প্রদর্শন করলেন না। ঘোর শ্রাবণ মাসে এক বিন্দু বারি বর্ষিত হইল না, কল্পতরু বন্ধ্যা হইয়া গেল। হিমালয়ে আসিয়াও আশ্রয় পাইলাম না।" এই হতাশ ভাবে বিমুগ্ধা হইয়া শ্রীমতী ক্ষণে ক্ষণে নানা দশা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ও তাঁহার দুই নয়ন দিয়া অবিরল-ধারে অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল।

এই ভাবটি শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥"

"হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে এক নিমেষ কাল যেন আমার নিকট যুগ-যুগান্তর বলিয়া মনে হইতেছে—শ্রাবণের জলধারার ন্যায় নয়নধারা বহিয়া পড়িতেছে। হায় হায়! আমার নিকট সমস্ত জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমতী নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। জানিলেন, শুধু কৃষ্ণনামগুণে তিনি পুনরায় জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছেন। তখন

পুনরায় তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও লুণ্ঠিত অঞ্চলে, আলুলায়িত কেশে হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া প্রাণনাথকে অভিমানবশে অভিযোগ করিতেছেন :—

"সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে।"—চণ্ডীদাস

এই কথাগুলির মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব প্রেম-গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান। শ্রীরাধা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অন্য কোন অভিশাপ খুঁজিয়া পাইলেন না। শত সহস্র অভিশাপের মধ্যে তিনি কেবল বলিলেন, "আমার অন্তর যেমন করিছে তাঁহার অন্তরও সেইরূপ করুক।" ঐ এক 'যেমন করিছে' শব্দের মধ্যে কি এক নিদারুণ ব্যথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। "যাঁহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া তাঁহার সামীপ্য কামনা করিতেছি, তিনি অন্যের প্রেমাধীন"—এই ধারণায় শ্রীরাধার হৃদয় ভেদ করিয়া যে অভিসম্পাত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা কোন মানবী প্রেমিকার কণ্ঠ হইতে নিঃসারিত হইত না। যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের অপার্থিবতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, কেবল তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম ও রস উপভোগ করিবেন। শ্রীমতী আবার বলিতেছেন :—

"(হায়) কোন্ প্রেম লাগি নারদ বৈরাগী
মহাদেব যোগী কোন্ প্রেমে?
কি প্রেম কারণে ভগীরথ জনে
ভাগীরথী আনে ভারত ভূমে?
কোন্ প্রেমে হরি বধে ব্রজনারী
গেল মধুপুরী করে অনাথা?
কোন্ প্রেম-ফলে কালিন্দীর মূলে
কৃষ্ণপদ পেলে মাধবীলতা?" —চণ্ডীদাস

শ্রীরাধা এখন বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। চাহিয়া আছেন কিন্তু বাহ্যবস্তু যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহার বদন-কমল বিবর্ণ, পাংশুল হইয়া গিয়াছে—দেহ ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছে। তিনি ললিতাদি সখীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, সখি! এ দীর্ঘ বিরহ আমার মনকে তিক্ত করিয়া দিয়াছে। তোমরা চিতা সজ্জিত করিয়া দাও, আমি বিষ পান করিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিব। গঙ্গাতীরে শরীর ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি সাধন করিলে বিধি অনুকূল হইয়া দুর্ল্লভ প্রভুকে সুলভ করিয়া দিবেন। আমার অন্তিম অবস্থা হইলে সকল বিবাদই মিটিয়া যাইবে।

"কত কত সখি মোহে বিরহে ভৈ গেল তিতা
গরল ভখি মোঞে মরব রচি দেহ মোর চিতা।
সুরসরি তীরে শরীর তেজব সাধব মনক সিধি—
দুলহ নিধি মোর সুলহ হোয়ব অনুকূল হোয়ব বিধি।
কি মোঞে পাঁতি লিখি পাঠাওব তাহে কি কহব সম্বাদে
দশমী দশা পর যব হম হোয়ব টুটব সবহু বিবাদে।"
—বিদ্যাপতি

শ্রীরাধা ক্রমে দশমী দশা প্রাপ্ত হইলেন। কণ্ঠস্বর নাই, অর্থহীন দৃষ্টি, শরীর অবশ ও ক্রিয়াহীন। সেই অবস্থা দেখিয়া সকল সখীগণ শোকে মুহ্যমানা হইলেন। তখন বৃন্দাদেবী বলিতেছেন :—

মাধব জানল ন জীউতি রাহি।
যতবা যকর লেলে ছলি সুন্দরী
সে সবে সোপলক তাহি।
শরদক শশধর মুখরুচি সোপলক
হরিণক লোচন লীলা।
কেশপাশ লয়ে চমরীকে সোপল
পায়ে মনোভাব পীলা।
দশন দশা দাড়িবকে সোপলক
বান্ধুব অধর রুচি দেলি।
দেহ দশা সৌদামিনী সোপলক
কাজর সনি সখী ভেলী।
ভঙ্গু হেরি ভঙ্গ অনঙ্গ চাপ দিহু
কোকিলকে দিহু বাণী।
কেবল দেহ নেহ অছ লওলে
এতবা অএ লাহু জানি।" —বিদ্যাপতি

অর্থাৎ—"মাধব, বুঝিতেছি রাই আর প্রাণে বাঁচিবে না; কারণ সে যাহার নিকট হইতে যাহা যাহা লইয়াছিল তাহা তাহাদেরই প্রত্যর্পণ করিয়া দিয়াছে। নিজের মুখশোভা শারদীয় শশধরকে ফিরাইয়া দিয়াছে, নয়নের দৃষ্টি হরিণকে, ও কেশপাশ চামরীকে সমর্পণ করিয়াছে। দন্তসমূহ দাড়িম্বকে, অধরশোভা বান্ধুলী পুষ্পকে, দেহ-লাবণ্য সৌদামিনীকে ফিরাইয়া দিয়া সখী কজ্জলের ন্যায় কালো হইয়া গিয়াছে। ধনুকের জন্য ভ্রূভঙ্গ অনঙ্গকে এবং বাণী কোকিলকে ফিরাইয়া দিয়াছে। কেবল কৃষ্ণপ্রেম জন্য দেহখানি ধারণ করিয়া আছে; ইহাই বুঝিতেছি।"

তখন বৃন্দা ললিতা ও বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ একযোগে স্থির করিলেন যে, তাঁহারা মথুরায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ব্রজধামে ফিরাইয়া আনিয়া শ্রীরাধাকে প্রত্যর্পণ করিবেন! এই সঙ্কল্প সফল করিবার জন্য সকলে শ্রীশ্রীকাত্যায়নী দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন ও সারারাত্রি যাবৎ তাঁহার পূজা করিলেন। পূজাবসান সময়ে কাত্যায়নী দেবীর শ্রীচরণের ফুল শ্রীরাধার মস্তকে পতিত হইল। সখীরা তখন ইহা অতি শুভ লক্ষণ মনে করিয়া বৃন্দাদেবীকে পুরোভাগে রাখিয়া অন্যান্য গোপীগণ সহ সকলেই মথুরার পথে বাহির হইলেন। ব্রজধামে রহিলেন শ্রীরাধা ও তাঁহার দেহ রক্ষা করিবার জন্য মাত্র কয়েক জন সহচরী। পথে বাহির হইবার পূর্ব্বে বৃন্দাদেবীর অনুরোধ ক্রমে সকল সখীগণ সাধারণ অথচ সুন্দর বেশভূষা ও নানা পুষ্পমাল্যে সজ্জিতা হইলেন। কেন না, সখীদের মলিন বেশ দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ বড় ব্যথা পাইতেন।

গোপীগণ অভিনব বেশে সজ্জিতা হইয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় পথে তাঁহারা এক সাধুকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার পরিধানে কৌপীন, মুণ্ডিত মস্তক, সারা গাত্রে নানাবিধ ছাপ, তিলক ফোঁটা কাটা ও গলায় তুলসীর মালা। ইঁহাকে দেখিয়া এক জন কৃষ্ণভক্তজ্ঞানে গোপীগণ সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধো! আপনি কি কৃষ্ণের লোক? আমরা কোন্ পথে মথুরায় যাব, ও সেখানে গিয়ে কেমন করেই বা তাঁর সাক্ষাৎ পাব বলে দিন।"

সাধু গোপীগণের সেই বেশভূষার পরিপাট্য দেখিয়া অবজ্ঞাভরে

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কে ? কৃষ্ণের সহিতই বা তোমাদের কি সম্বন্ধ ?"

সখীগণ বলিলেন, "আমরা গোপী, বৃন্দাবনে বাস করি। আর কৃষ্ণ আমাদের কে ? আমাদের জীবন-যৌবন সমস্তই তিনি। কৃষ্ণ আমাদের প্রাণ, কৃষ্ণ আমাদের পতি, কৃষ্ণ আমাদের জীবনে-মরণে গতি।" এই কথা বলিয়া গোপীগণ "জয় রাধেকৃষ্ণ, জয় রাধেকৃষ্ণ" রবে নানা ভঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

বিরহিণী গোপীদের সেই অদ্ভুত আনন্দ দেখিয়া সাধু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "অবোধ নারীগণ, তোমাদের বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়েছে, তোমরা একান্ত অজ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ জগতের পতি ; তোমরা সামান্যা গোপী হয়ে তাঁকে প্রাণপতি বলতে চাও ; আর শোকেও তোমাদের এত নৃত্য-গীত ! ছি ছি তোমরা অতি ঘৃণ্য।"

গোপী। সাধো, সত্যই কৃষ্ণ আমাদের পতি। দেহ মন প্রাণ সমস্তই আমরা তাঁকে সমর্পণ করেছি। আমরা বিরহকাতরা বটে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রীতির জন্য আমাদের এই বেশভূষা—এই নৃত্য-গীত। কৃষ্ণ যে আমাদের নৃত্য-গীত বড় ভালবাসেন—

"শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে ?
সব রস সার শৃঙ্গার এ।" —চণ্ডীদাস

সাধু। অবোধিনি ! কৃষ্ণ ওরূপ সহজলভ্য নন। তাঁকে প্রাপ্তির পথ অন্যরূপ। উপবাস, কঠোর তপস্যা, তীর্থ-পর্য্যটন কর, শরীরকে ক্ষীণ করতে ও কষ্ট দিতে শেখো, মস্তক মুণ্ডন কর, কৌপীন পর ; তবে ত' কৃষ্ণকে পাবে।

গোপী। (অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া) ঠাকুর, এখন দেখছি আপনার কৃষ্ণ অন্য জন। আমাদের কৃষ্ণ যে সদানন্দময়, তিনি অন্যের নিরানন্দ ও ক্লেশ আদৌ সহ্য করতে পারেন না। তিনি স্বয়ং নৃত্যগীত করেন ও আমাদের নৃত্যগীত করান। এতেই আমাদের পূর্ণানন্দ। আপনি যে সব ক্লেশ অভ্যাস করতে বলছেন—যদি আমরা ঐ সব আচরণ করি তা'হলে আমাদের কৃষ্ণ অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাবেন। আপনি জানেন না, আমাদের এই বেশভূষা, এই কেশদাম আমাদের প্রাণপতির কত আদরের বস্তু। এই কেশ দিয়া হৃষীকেশের রাঙ্গা চরণ দু'খানি ও এই বসনাঞ্চলে কত বার তাঁর শ্রান্ত দেহের ঘর্ম্ম মুছায়েছি।

বিধিবদ্ধ সাধু গোপীদিগের রাগাত্মিকা শুদ্ধা প্রেমোচ্ছ্বাসের ভাব কিছুই বুঝিলেন না। তিনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ যখন তোমাদের এতই সহজলভ্য, তখন ঐ যমুনা পার হ'য়ে মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে ধরে নিয়ে এস।"

সাধুর ব্যঙ্গোক্তিতে গোপীগণ অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, কৃষ্ণ কাহারও আজ্ঞাধীন নহেন, তবে যাঁরা তাঁর সঙ্গে নিঃস্বার্থ প্রেম করেন, তাঁরাই তাঁর নিজ জন।"

সাধু প্রস্থান করিলে ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণের চরণতরী অবলম্বন করিয়া যমুনা পার হইলেন ও ক্রমে মথুরাপুরে প্রবেশ করিলেন। গোপীরা 'রাধাকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিয়া নৃত্যভঙ্গি করত মথুরার পথ মুখরিত করিতে করিতে চলিলেন। মথুরাবাসীরা রাধাকৃষ্ণ নাম কখনও শুনেন নাই। তাঁহারা গোপীদের বেশভূষা ও অদ্ভুত নৃত্যগীত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহাদের অনেকেই প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা কাহারা—কোথায় যাইবে ?"

গোপীরা উত্তর করিলেন, "আমরা ব্রজবাসী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে এই ব্রজদধি তাঁকে উপহার দিব।"

গোপীরা মথুরা হইতে আগমনকালে প্রত্যেকেই পশরা করিয়া ব্রজদধি মাথায় বহিয়া আনিয়াছিলেন। এই দধি অমৃত তুল্য। শ্রীকৃষ্ণ ইহা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আজিও এই দধি বৃন্দাবনে বিখ্যাত হইয়া আছে।

যাহা হউক, মথুরাবাসিগণ কৃষ্ণকে মহারাজা বলিয়াই জানেন ও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের রাজা শ্রীকৃষ্ণ, চৌদিকে দ্বারবান্-বেষ্টিত সুরম্য সপ্ততল প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ কক্ষে দেবাদিদেব মহাদেব প্রমুখ দেবতাগণ পরিবৃত হইয়া রাজকার্য্য করেন। কেহ বড় একটা তাঁহাকে দেখিতে পান না—বা দেখিবারও সাহস করিতে পারেন না। গোপীদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ও ব্রজদধি উপহার প্রভৃতির কথা শুনিয়া তাঁহারা অবাক্ হইয়া গেলেন। কেহ বা গোপীদের পাগলিনী বলিয়া বিদ্রূপও করিলেন।

ক্রমে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে—"হে প্রাণনাথ, হে প্রাণবঁধুয়া, হে ব্রজনাথ, হে গোপীবল্লভ" ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া "ব্রজডাক" দিতে দিতে রাজবাটীর দিকে চলিলেন, এবং "প্রাণবঁধুয়া দহি লে, ব্রজনাথ দহি লে" বলিয়া সাবিবদ্ধ ভাবে গীত গাহিতে লাগিলেন। ব্রজগোপীরা দধির পশরা মাথায় করিয়া ক্রমে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বাররক্ষিগণ বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইল। তখন গোপীগণ বিনীত ভাবে বলিলেন, "দ্বারি ! আমাদের একবার মাত্র দয়া ক'রে ছেড়ে দাও—তোমাদের রাজাকে একটি বার দর্শন ক'রে ও তাঁকে এই দধি উপঢৌকন দিয়ে ফিরে যাব।"

দ্বারবানেরা দধির ভাগ চাহিল। তখন গোপীরা হাস্য করিয়া বলিলেন, "দ্বারি ! এ দধি সামান্য নহে, এ দধি কেবল তোমাদের রাজার ভোগ্য—এ ব্রজদধিতে তোমাদের অধিকার নাই।" এই বলিয়া গোপীগণ অতি কাতর কণ্ঠে ও উচ্চ রবে "প্রাণনাথ দহি লে, ব্রজনাথ দহি লে" বলিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন হর্ম্ম্যময় উচ্চ অট্টালিকার রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবগণ তাঁহাকে করযোড়ে স্তুতি করিতেছেন। এমন সময় বৃন্দাদি সখীগণের সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর ও সেই সুমধুর কণ্ঠে উচ্চারিত "প্রাণনাথ, ব্রজনাথ" প্রভৃতি প্রেম-সম্বোধন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে অন্তরে ব্রজগোপীদের সকল দুরবস্থার কথা অনুভব করিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ত্রিলোকাধিপতির চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সভাসদ্‌গণ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া প্রধান দ্বারবান্‌কে আদেশ দিলেন, "দ্বারদেশে যাহারা চীৎকার করিতেছে তাহাদিগকে অবিলম্বে রাজসভায় লইয়া আইস।" আদেশ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে স্থির করিলেন—আজ আমি ত্রিজগতে ব্রজবাসিগণের প্রেম-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিব।

ব্রজবালাগণ সভায় উপস্থিত হইলেন ও সেই রাজসভার একপার্শ্বে অতি দীন ভাবে দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের সাধারণ বেশ অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য ও দীন ভাব দেখিয়া সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া গোপীগণের এবং গোপীগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে ভাব-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, কিন্তু স্থান-কাল অনুযায়ী উভয় পক্ষই হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যাদুবিদ্যায় এত দক্ষতা অর্জ্জন করেন যে, তৎকালীন ইউরোপীয় যে কোন বড় পেশাদারী যাদুকর অপেক্ষা কৃতিত্বে তিনি কম ছিলেন না। তিনি নিজের প্রাসাদমধ্যে একটি ষ্টেজ বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করাইতেন। সম্রাজ্ঞীর খেলা সমস্তই যে উচ্চশ্রেণীর ছিল সে কথা যাদুকরমণ্ডলী মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। অপরাপর পেশাদার মহিলা যাদুকরদিগের মধ্যে ম্যাডাম কোনোরা, মিস্ লা ব্রেণ্ট, মিস ভায়লেট ডোলস্ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাদুকর উইল গোল্ডষ্টোনের স্ত্রী 'লা ডেভো' নাম লইয়াও কয়েক বার যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করাইয়াছেন। যাদুকর 'সাভান লি রয়'এর স্ত্রী থালমা এবং "টাকার রাণী" টাল্মার নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎকালে যাঁহারা যে খেলায় বিশেষজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইতেন, তাঁহারা সেই সেই খেলার রাজা বলিয়া পরিচিত হইতেন। উদাহরণ-স্বরূপ হুডিন হাতকড়ির রাজা, থার্সটন তাসের রাজা, নেলসন king of coins প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সময় টালমা তাঁহার অপূর্ব্ব টাকার খেলা দেখাইয়া সমগ্র পৃথিবীময় 'টাকার রাণী' নামে সুপরিচিতা হন, ইহা তাঁহার এবং মহিলা যাদুকরদের বিশেষ গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে। কাগজের খেলায় বিশেষজ্ঞা হইয়া মহিলা যাদুকর মে হ্যামিলটন "কাগজের রাণী" নামে পরিচিতা হইয়াছিলেন।

আর এক ধরণের যাদুবিদ্যা আছে, যাহা এই যন্ত্রসম্বলিত আধুনিক রঙ্গমঞ্চের যাদুর সঙ্গে তুলনা চলে না। উহা এক প্রকার মানসিক ম্যাজিক। ইহাতে দিব্যদৃষ্টি, সম্মোহন, চিন্তাপাঠ, শক্তিচালনা প্রভৃতি ক্রিয়া এবং কখনও কখনও ভৌতিক ক্রিয়া সমূহও দেখান হয়। এই জাতীয় খেলায় আমেরিকার যক্ষ ভগিনীযুগল পৃথিবীময় সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ভৌতিক লেখা প্রভৃতি অনেকগুলি ভুতুড়ে খেলায় মার্গারেট ফক্সের নাম সুপ্রসিদ্ধ। মিস্ আনা ইভা ফে এই জাতীয় খেলা দেখাইয়া পৃথিবীর যাদুকরমণ্ডলীকে চমকিত করিয়া দিয়াছেন। ভুতুড়ে ম্যাজিকে ম্যাদাম ব্লাভাট্স্কি-প্রমুখ কয়েক জনের নামও সুপরিচিত। ম্যাদাম ব্লাভাট্স্কি তিব্বত হইতে অনেক আত্মিক ও ভৌতিক তত্ত্বপূর্ণ খেলা শিখিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আমেরিকার লারসেন পরিবার এই ধরণের খেলায় প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। লারসেন-পরিবারের সকলে এই জাতীয় মানসিক ম্যাজিকে অনেক কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সরল ভাষায় বক্তৃতা দিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন। উইলিয়ম লারসেনের স্ত্রী জিরাল্ডিন লারসেন বিগত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে যাদুবিদ্যা-বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা The Genii সম্পাদনা ও পরিচালনা করিতেছেন। এই মহিলা ঐন্দ্রজালিক শুধু যাদুবিদ্যা দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই—নিজে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করিতেছেন এবং বর্ত্তমানে আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুবিদ্যা-প্রতিষ্ঠান The Thayer's Studio of Magic এই লারসেন-পরিবার ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে 'কার্টার দি গ্রেট' নামক যে মার্কিণ ঐন্দ্রজালিক কলিকাতার গ্লোব ও ছায়া রঙ্গমঞ্চে যাদুবিদ্যা দেখাইয়া গিয়াছেন—তাঁহার সঙ্গে মিস্ মাক্সওয়েল নামক এক জন মহিলা যাদুকর ছিলেন। মিস্ মাক্সওয়েল লোকের মনের কথা অনায়াসে বলিয়া দিতেন। তৎকালে কলিকাতায় উক্ত মহিলা ঐন্দ্রজালিক কি চাঞ্চল্যের সৃষ্টিই না করিয়াছিলেন! পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, জর্জ্জিয়া ম্যাগ্‌নেটের কথা—এক জন ক্ষীণাঙ্গী রমণী ষ্টেজে দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং কোন সবল পুরুষই তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া নাড়াইতে পারিতেন না। জর্জ্জিয়া ম্যাগ্‌নেট এই খেলা দেখাইয়া আমেরিকায় বিশেষ হুলস্থূলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও অনেকে আছেন।

মহিলাদিগকে যাদুবিদ্যা শিক্ষাদানের নিমিত্ত লণ্ডনে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে এবং ইতিপূর্ব্বে সেখানে চারি শত জন মহিলা ভর্ত্তি হইয়াছেন। যাদুকর সম্মিলনীর বিবরণীতে প্রকাশ, বার্লিন সহরেও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। আমেরিকাতেও না কি মহিলাদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা আছে—তবে সেখানে পৃথক্ ব্যবস্থা নাই—পুরুষ এবং মহিলা একই সম্মিলনীতে যোগদান করেন।

যাদুকর পি, সি, সরকার

ব্রত

আমি তো আসিনি হেথা
বাজাইতে বেদনার বাঁশী!
আমারে ফুটাতে হবে ফুল,
আমারে জাগাতে হবে হাসি।

যাদের ব্যথার দিনগুলি
যায় চলি
অন্ধকার হতে অন্ধকারে;
তাহাদের ঘরে ঘরে
ক্ষুদ্র এক দীপ দিব জ্বালি,—
আকাশের আলোর পাথার—
যতটুকু পারি
দিব সেথা ঢালি।

অন্ধ গুহামাঝে যারা মাথা ঠুকে মরে,
সহস্র ধিক্কারে
জর্জ্জরিত জীবন যাদের—
আমি তাহাদের
সন্ধানিয়া দিব পথ—যোগাব পাথেয়!
এ হতে অধিক শ্রেয়
অন্য ব্রত নাহি জানি আমি—
মানুষে সেবিতে চাই নহি স্বর্গকামী।

শ্রীদুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী

ছোটদের আসর

সঙ্গীত ও সঙ্গত

(গল্প)

৩৩ নম্বর বাস। ভারি গোলমেলে। কখনও দশ মিনিট অন্তর আবার কখনও এক ঘণ্টা অন্তর। নিয়মিত অনিয়ম। তবে একটা নিয়ম মানে—দরকারের সময় লেট হবেই।

পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র রোডের মোড়ে বৃটিশ ওয়েলফেয়ার আপিসের ছোট বাবু ননী ঘোষ প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বাসের জন্য অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন ; এমন সময় আমেরিকান ওয়ার আপিসের একটা ডিপার্টমেন্টের ইন-চার্জ্জ ফণী বোস সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন। দু'জনেই অপেক্ষা করছেন বাসের জন্য। আকাশ কালো হয়ে উঠল। কড়্ কড়্ করে মেঘ ডাকতে লাগল। তার পরই মুষলধারে বৃষ্টি।

ফণী বাবু ছাতা খুললেন। ননী বাবুর সঙ্গে ছাতা ছিল না। ফণী বাবু তাঁকে ইনভাইট করলেন। ননী বাবু বৃষ্টির দাপট থেকে বাঁচবার জন্য ফণী বাবুর ছত্রতলে আশ্রয় নিলেন। ননী বাবু ও ফণী বাবুর এই প্রথম সাক্ষাৎ এবং আলাপ।

দূরে ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ। ননী বাবু বললেন—"যাক, বাসটা তাহলে শেষ পর্যন্ত এল।" ফণী বাবু বললেন—"তা এল, তবে আর একটু আগে এলে বৃষ্টিতে ভিজতে হতো না। যা হাওয়া, ঝাটে কাপড়-জামা ভিজে ঢোল!" ননী বাবু হেসে বললেন—"যা বলেছেন। বাসের জন্য অপেক্ষা তো নয়, যেন তপস্যা!"

বাস এলো। দু'জনেই উঠে পড়লেন। কি ভীড়! লোক সব ঝুলে চলেছে—যেন বাদুড়-ঝোলা! দু'জনে উঠলেন রীতিমত মারা-মারি করে। দাঁড়ালেন পাশাপাশি। সমান অবস্থায় এবং কষ্টের অবস্থায় ভাব খুব তাড়াতাড়ি জমে ওঠে। ননী বাবুতে ফণী বাবুতে দিব্য জমে উঠল। দু'জনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধাক্কা খেতে খেতে মন খুলে বাসের কর্ত্তৃপক্ষকে গালাগাল দিতে লাগলেন।

শ্যামবাজারের পাঁচ-মাথা মোড়ে এসে ভীড় অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। একটা সীট খালি হতেই দু'জনে পাশাপাশি বসে পড়লেন। বাস-কণ্ডাক্টর টিকিট চাইতে এল। ননী বাবু ব্যাগ বার করে বললেন—"আলিপুর একখানা। আপনার?" জিজ্ঞাসু নেত্রে ফণী বাবুর দিকে চাইলেন। ফণী বাবুও ততক্ষণে ব্যাগ বার করেছেন। বাধা দিয়ে বললেন—"আমারও আলিপুর। না, না, আমি দিচ্ছি।" ফণী বাবুর হাত চেপে ধরে ননী বাবু বললেন—"না, না, সে কি কথা। আমি দিচ্ছি।" উভয়ে উভয়ের হাত ধরে "না" "না" করতে লাগলেন। বাস-কণ্ডাক্টর আবার বললে—"টিকিট বড়া বাবু।" ননী বাবু তার হাতে একখানা এক টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, "দু'খানা আলিপুর।"

বাস চলেছে, গল্পও চলছে। মধ্যে মধ্যে ষ্টপেজে বাস থামছে, কিন্তু গল্প থামছে না। বিরামহীন, নন-ষ্টপ।

ননী বাবু বললেন,—"ভালই হলো। অনেকক্ষণ একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। আপনি আলিপুরে কোথায় যাবেন?"

ফণী বাবু জবাব দিলেন—"আলিপুর কোর্টের কাছে। আমেরিকান ওয়ার অফিসের আমি সেক্সন্যাল ইন-চার্জ্জ। আপনি কোথায় যাবেন?"

"এ্যাণ্ডারসন হাউসের কাছে। বৃটিশ ওয়েলফেয়ার অফিসের আমি ছোট বাবু।"

"যুদ্ধের কি রকম বুঝছেন?"

"আমরাই জয়লাভ করব। জাপানীরা তো প্রায় কাৎ হয়ে এসেছে!"

এ কথা সে কথা চলতে লাগল।

"আর পারা যায় না। বর্ষাকালে কোথায় ইলিশমাছ খাব, চার পাঁচ আনা সের, তা না, ছোঁয় কার সাধ্য! তিন টাকার কমে পাওয়া যায় না।"

"সে তো বরফের মাছ। টাটকা গঙ্গার ইলিশ, সে দিন বাগ-বাজারের ঘাটে দর করছিলুম—ব্যাটা বলে কি না আট টাকা।"

"আর ডিম?"

"সে কথা আর বলবেন না। কোথায় দেড় পয়সা দু'পয়সা জোড়া ডিম ছিল, তার জায়গায় হয়েছে কি না পাঁচ-ছ' আনা জোড়া। মানুষ খায় কি?"

আরও কত রকম কথাবার্ত্তা হলো।

ননী বললেন—"আফিস থেকে খেটে-খুটে গিয়ে রাত্রে একটু বিশ্রাম করবো তারও উপায় নেই। পেছনের বাড়ীতে কে এক ভদ্রলোক কালোয়াতি গান গায়। কি হেঁড়ে গলা। বাপ্!"

ফণী বললেন—"কাকে বলছেন? আমারও সেই দশা। আমার বাড়ীর পিছনেও কারা এসেছে। তারা আবার রাত্রে তবলা বাজানো প্র্যাক্‌টিস করে। কি বিশ্রী আওয়াজ! ধাপুস ধুপুস, ড্রুম ড্রাম!"

"সত্যি। ঘুমোবার সময় ভারী খারাপ লাগে। আমার বাড়ীর পিছনের বাড়ীর লোকটা যদি গাইতে পারত, না হয় শোনা যেত। কিন্তু সে তো গান নয়, যেন ষাঁড়ের চীৎকার! গঙ্গা ধোপার গাধাকেও হার মানায়।"

"আমার অবস্থাও তদ্রূপ। যে ব্যাটা তবলা বাজায়, তার না আছে লয়-জ্ঞান, না আছে বোলের মিষ্টতা। যেন ছাত পেটে! এ রকম লোককে পুলিশে দেওয়া উচিত।

"একশো বার।"

বাস-কণ্ডাক্টর চেঁচালো আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল। ননী বাবু ও ফণী বাবু দু'জনেই নেমে পড়লেন।" খানিকটা পথ একসঙ্গে হেঁটে চললেন।

ননী বাবু জিগ্যেস্ করলেন—"আপনি পাইকপাড়ায় থাকেন তো?"

ফণী বাবু উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ। ঐ যে পাইকপাড়া মেন রোডে নতুন কলোনী হয়েছে, সেইখানে।"

"আমিও যে সেইখানে থাকি! দিন পাঁচেক হলো গেছি। ১১ নম্বর হেমন্ত মল্লিক ষ্ট্রীট।"

"আমি মাত্র দিন সাতেক হলো ও-পাড়ায় গেছি। ৭ নম্বর বসন্ত বিশ্বাস ষ্ট্রীট।"

"তাহলে ফণী বাবু, এক দিন আমার বাসায় পায়ের ধুলো দেবেন।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! সে কথা আর বলতে! পরের সপ্তাহে শুক্রবার ছুটী আছে। সে দিন বিকেলে কি আপনি বাড়ী থাকবেন?"

"থাকব। আমাদেরও সে দিন ছুটী আছে। কি এক মুসলমানদের পরব।"

"বেশ, সেই দিন যাব। আপনি যদি এর মধ্যে সুবিধা করতে পারেন তো আমার গৃহে পদার্পণ করবেন।"

"সে কথা আর বলতে! যাব বই কি! সময় পেলেই যাব।"

দু'জনে নিজ নিজ পথে চলে গেলেন।

পূর্ণিমার রাত্রি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত। মৃদু-মন্দ দখিণ সমীরণ বইছে। ফণী বাবু সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে ছাদে গেলেন। মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। চাঁদের কিরণ, দখিণ পবন!

মনের সুখে গলা ছেড়ে গান ধরলেন—"সজনী, মো সে না বোলো।"

ননী বাবুর সে দিন তাড়াতাড়ি ছুটী হয়েছিল। তিনিও সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে ছাদে উঠেছেন। তাঁরও মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। চাঁদের কিরণ, দখিণ পবন। চড়া করে তবলা বেঁধে মনের সুখে বাজাতে আরম্ভ করলেন—"ধাগে নাগে তেটে ধিন।"

নিজ নিজ ছাদে উভয়েই নিজ নিজ মনে বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

ফণী বাবু ভাবলেন—এমন গানটা মাটী করে দিলে। তবলা বাজাচ্ছে, দেখ না! দুম দামাদ্দম। ছিঃ ছিঃ!

ননী বাবু ভাবলেন—এমন লয়-তালহীন গাধার মত চেঁচালে কখন তবলা বাজানোয় মন বসে! রাম রাম।

অপরাধীকে দেখবার জন্য দু'জনেই ছাদের আলিসার দিকে এগিয়ে এলেন। চন্দ্রালোকে হলো দু'জনে সাক্ষাৎ।

১৯ নম্বর হেমন্ত মল্লিক স্ট্রীটের পিছনেই ৭ নম্বর বসন্ত বিশ্বাস স্ট্রীটের বাড়ী। ননী বাবু আর ফণী বাবুর বাড়ী পিঠোপিঠি।

শুনছি, অনেকে বাড়ী পাচ্ছেন না? আমি বাড়ীর সন্ধান দিতে পারি। এই সপ্তাহের মধ্যেই না কি ১৯ নম্বর হেমন্ত মল্লিক স্ট্রীটের এবং ৭ নম্বর বসন্ত বিশ্বাস স্ট্রীটের বাড়ী দুটি খালি হয়ে যাবে। কিন্তু খবদ্দার, কালোয়াতী গান গাইবেন না, আর তবলা বাজাবেন না!

—

লাল মাছ

সখের জন্য লাল মাছ পুষিতে আরাম আছে। তার কারণ, মাছকে লইয়া এতটুকু হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। কুকুর, পাখী, বানর পুষিলে নানা জ্বালা! ক্ষুধা পাইলে তারা চীৎকার করে—অসুখ হইলে চিকিৎসা করাও—এমনি নানা উৎপাত। মাছের এ-সব বালাই নাই! ক্ষুধা পাইলে বা রাগ হইলে এতটুকু চীৎকার তুলিবে না। তাদের গায়ে গন্ধ নাই, পোকার উৎপাত নাই। তার উপর মাছের কোথাও এতটুকু নোংরামি নাই। এ জন্য মাছ পোষায় সৌখীনতায় বাধে না।

তোমাদের অনেকের বাড়ীতে লাল মাছ আছে, নিশ্চয়। কিন্তু লাল মাছ পুষিয়া আমরা অনেকে তাদের বাঁচাইতে পারি না! বাঁচাইতে না পাবার কারণ লাল মাছের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞান নাই! খাওয়ানো এবং জল বদলানোর বিষয়ে যে যখন যাহা বলে, তাহাই আমরা শিরোধার্য্য করি! তার ফলে মাছের স্বাস্থ্য হয় ক্ষুণ্ণ এবং মাছ বড় শীঘ্র মরিয়া যায়।

আমেরিকায় বাস করেন ডক্টর চার্লশটন। তিনি মস্ত বড় জীব-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত—মাছ আর পাখী পোষেন—অনেক রকম। মাছের সম্বন্ধে তিনি এক জন বিশেষজ্ঞ। তাঁর বাড়ীর লাল মাছ দু'-চার বছর

এমনি গড়নের পাত্রে লাল মাছ রাখিবে

বেশ সুস্থ দেহে বাঁচিয়া থাকে। কি-নিয়মে তিনি লাল মাছ রাখেন, জানিয়া সেই ভাবে রাখিলে, লাল মাছকে দীর্ঘকাল বাঁচানো যাইবে।

জাতের নাম (উপর হইতে নীচে) বাজপুচ্ছ, সিংহশির; লালচাঁদা; তেলাপি

তিনি বলেন, লাল মাছ রাখিবার পক্ষে সব চেয়ে ভালো—চতুষ্কোণ আধার বা পাত্র। পাত্র কাঁচের হইবে। কাঁচের গোল বা গ্লোবের মত পাত্রে অসুবিধা আছে! গোল পাত্রে মাছকে দেখায় কিম্ভূত-কিমাকার; তার উপর গোল পাত্রে লাল মাছ রাখিলে তারা লম্বা-লম্বি ভাবে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না—উপর-নীচে করিয়াই তাদের থাকিতে হয়। তাহাতে অস্বাস্থ্য ঘটে! তাছাড়া গোল পাত্রে উপরকার ও তলাকার জল এক-লেভেলে থাকে না বলিয়া মাছেরা যথানুরূপ বাতাস পায় না—নিশ্বাস লইতে তাদের কষ্ট হয়।

চতুষ্কোণ-পাত্রটি হওয়া চাই rectangular। পাত্রে যে জল দিবে, তার গভীরতা অন্ততঃপক্ষে আট হইতে বারো ইঞ্চি পর্য্যন্ত হওয়া চাই। এক-ইঞ্চি মাপের মাছের জন্য জল প্রয়োজন এক গ্যালন।

যে চতুষ্কোণ-পাত্রের মাপ লম্বে-প্রস্থে ৪০০ বর্গ-ইঞ্চি—সে-পাত্রে এক-ইঞ্চি সাইজের মাছ রাখিতে পারো কুড়িটি মাত্র; তার বেশী

নয়। চার-ইঞ্চি সাইজের মাছ হইলে একত্রে পাঁচটির বেশী মাছ ও-পাত্রে রাখিবে না।

যে-পাত্রে লাল মাছ রাখিবে, সে-পাত্রে শ্যাওলা গুল্ম-লতা রাখা চাই; আর চাই বালি। ধপ্‌ধপে সাদা বালি। বালি থাকিবে পাত্রের নীচে। এক-ইঞ্চি-দু'-ইঞ্চি পুরু করিয়া বালি ঢালিয়া রাখিবে। পিছন দিকে এ বালি রাখিতে হইবে বেশ পুরু করিয়া স্তূপাকারে—সামনের দিকে স্তূপ নয়, পাৎলা করিয়া রাখিবে। এবং এই বালির গায়ে শ্যাওলা ও গুল্ম-লতার প্রান্ত বা শিকড় ঠেকিয়া থাকা চাই। তাহা হইলে বাহার খুলিবে চমৎকার।

কিন্তু শুধু বাহারের জন্যই শ্যাওলা গুল্ম-লতা রাখার প্রয়োজন নয়। শ্যাওলা ও গুল্ম-লতা পাত্রের জলে বাড়িবে। এই শ্যাওলায় ও গুল্ম-লতায় মাছের পরিত্যক্ত যত কিছু ময়লা, নোংরা মিশিয়া যায়—তার বিষে মাছের অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। তার চেয়েও এ গুল্মলতার উপকারিতা এই যে, সেগুলি হইতে মাছ অক্সিজেন-বাষ্প পায়। এ বাষ্পে মাছের প্রাণ! তাছাড়া অক্সিজেন-বাষ্পের স্পর্শে জল নির্দোষ পরিশুদ্ধ থাকে। কোন্ কোন্ জাতের শ্যাওলা এ বিষয়ে বিশেষ উপকারী—যারা লাল মাছের ব্যবসা করে, তারা বলিয়া দিবে।

শ্যাওলা এবং বালি-সমেত চতুষ্কোণ পাত্রে লাল মাছ রাখিলে দু'বছর যদি সে-পাত্রের জল না বদলাও, তবু মাছের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে না—মাছ বাঁচিয়া থাকিবে। শ্যাওলা যে রাখিবে তার শিকড় গজাইলে সে শিকড় পাত্রের তলায় বালির সঙ্গে আটকাইয়া থাকা চাই। লতাপাতা শুকাইয়া মরিয়া গেলে সেগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিবে, যদি দ্যাখো কোনো লতাপাতা উঠিয়া গিয়াছে—জানিবে, মাছ তাহা খাইয়া সাফ করিয়াছে! কোনো কোনো জাতের লাল মাছ শ্যাওলা খায়।

পাত্রের মধ্যে ছোট গেঁড়ি-শামুক ফেলিয়া রাখিতে পারো ভালো। গেঁড়ি-শামুক রাখিলে পাত্রে ময়লা নোংরা জমিবে না—তারা সে-সব নোংরা আবর্জ্জনা খাইয়া পাত্রের জল নির্ম্মল রাখিবে। যে-পাত্রে এক গ্যালন জল ধরে, তার মধ্যে দু'টি ছোট শামুক রাখা চলে—তার বেশী নয়। পাত্রে যেন ভিড় না জমে, সে বিষয়ে সাবধান! গেঁড়ি-শামুক জমাদারের কাজ করে—নোংরা ময়লা থিতাইতে দেয় না। পাত্রে তাদের ঠাঁই দিলে জল বদলাইবারও প্রয়োজন থাকবে না।

নানা জাতের মাছ

বড় সাইজের এবং ছোট সাইজের লাল মাছ একসঙ্গে এক পাত্রে রাখিবে না—রাখিলে বড় মাছ ছোটকে খাইয়া ফেলিবে।

অতিরিক্ত মমতা করিতে গিয়া আমরা অনেক সময়ে লাল মাছ মারিয়া ফেলি। লাল মাছ খায় খুব কম—তাদের গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলাইবে না। একটি-দুইটি কীট বা ফড়িং চমৎকার খাদ্য। খই, ময়দার খুব ছোট ছোট গুলী খাইতে দিয়ো—তবে খুব কম পরিমাণে দিবে। খাইতে দিবে একবার। বড় মাছ তার দিনের খাদ্য পাঁচ মিনিটে খাইয়া নিঃশেষ করে—ছোট সাইজের মাছ খায় পনেরো মিনিটে। তার পর যা খাইতে দিবে, সে-খাবার হইবে বিষ—এ-কথা মনে রাখিয়ো। যে-খাবার তাহাদের আহারের পরে পড়িয়া থাকিবে, পাত্র হইতে তুলিয়া সেগুলি ফেলিয়া দিবে,—পাত্রে তার কণাও না পড়িয়া থাকে! মাছের দেহের যা-ওজন, তার অর্দ্ধেক ওজনের খাদ্য যদি তারা পায়, তাহা হইলে দু'-চার দিন কোন-কিছু না খাইলেও লাল মাছের স্বাস্থ্য-হানি ঘটিবে না বা কোন ক্ষতি হইবে না।

যখন জল বদল করিবে, তখন একটি বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকিবে। চৌবাচ্ছা বা কল বা নদী-দীঘি-পুকুর হইতে জল আনিয়া সে-জল তখনি মাছের পাত্রে ঢালিয়া বদল করিয়ো না। যে টাটকা জল আনা হইল, সে-জল পাত্রে ভরিয়া যেখানে লাল মাছের পাত্র আছে, তার পাশে এই টাটকা-আনা জলের পাত্র রাখিয়া দাও অন্ততঃ পক্ষে এক ঘণ্টা। এক ঘণ্টা রাখিলে এই টাটকা জলের তাপ বা টেম্পারেচার মাছ-রাখা পাত্রের জলের টেম্পারেচারের সমান হইবে, তখন মাছের পাত্রের জল ফেলিয়া মাছের পাত্রে এই টাটকা-আনা জল ঢালিয়া দিবে। জল ফেলা এবং ঢালা—এ দু'টি কাজ করিতে হইবে রবারের নল-যোগে ধীরে-ধীরে। ছলাৎ করিয়া জল ফেলিয়া পরক্ষণে চক্ করিয়া টাটকা জল ঢালা—এমন কাজ কদাচ করিবে না। বদলানো জলের আকস্মিক টেম্পারেচার-বদলের জন্য অনেক সময় লাল মাছ মরিয়া যায়।

আর একটি কথা মনে রাখিয়ো—এমন জায়গায় লাল মাছ রাখিবে, সে জায়গায় সরাসরি রৌদ্র আসিয়া যেন না পড়ে! তাই বলিয়া অন্ধকার কোণে রাখা ঠিক নয়। রৌদ্রের ঝাঁজ যেন পাত্রেনা লাগে। রৌদ্রের তাপ হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য দুপুর বেলায় পাত্রটির গায়ে কাগজ বা কাপড় ঢাকিয়া দিবে।

রাত্রে মাছের পাত্রের পিছনে ১০-১৫ ওয়াটের একটি বিজলী বাতির বাল্‌ব জ্বালিয়া দিলে চমৎকার বাহার খুলিবে।

লাল মাছ আছে নানা জাতের। এক পাত্রে নানা জাতের মাছ

রাখিতে পারো, তবে আকারে যেন সব সমান হয়। বড়র সঙ্গে ছোট মাছ রাখিলে বড়র হাতে ছোটর মার সুনিশ্চিত—মাছের মনে দয়া নাই, মায়া নাই।

— —

পাবলিসিটি

আমি একটা কিছু করছি,—সকলে আমার নাম জানুক—এ প্রবৃত্তি শতকরা আটানব্বই জনের মনে জাগে। যে দু'জনের জাগে না, তারা হয় বৈরাগী, নয় আপন-ভোলা! এ প্রবৃত্তি দোষের, তা বলি না। এ প্রবৃত্তির জন্য অনেকে ইচ্ছা থাকলেও অন্যায় কাজ করতে পারে না। এ প্রবৃত্তির জন্য অনেকে সোৎসাহে কাজ করে কৃতিত্ব লাভ করেছেন, ইতিহাস খুললে সে পরিচয় আমরা পাবো।

তাই বলে কাজের মত কোনো কাজ করবো না অথচ কাগজে আমার নাম ছাপা হবে, এমন যার মনোভাব, তাকে আমরা কৃপার চোখে দেখি।

মাসের পর মাস এই যে দেখি, পাতানো-কাকা নয় পাতানো দিদি-মাসি সেজে ছোটদের মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় আসর খোলা হয়েছে—আর সে আসরে তোমাদের বয়সের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা কেউ লিখছো—মাসি, আমাদের গাছে খুব লিচু হয়েছে এবার। কেউ লিখছো, আমাদের ছাগলটা ভারী ঢুঁ মারে! আর ঐ লেখা ছাপা হচ্ছে লেখার নীচে তোমাদের নাম-শুদ্ধ—এতে কি লাভ হয়, বলতে পারো? ভালো গল্প কবিতা বা প্রবন্ধ লিখেছো—সে লেখা ছাপা হলো,—কিম্বা ভালো ফটো তুলেছো, ভালো ছবি এঁকেছো—সে ছবি ছাপা হলো তোমাদের নাম-শুদ্ধ—ভালো খেলোয়াড় তুমি—নাম ছাপা হলো—এর মানে আছে,—এতে গৌরব আছে! আর পাঁচ জনে দেখে বলবে, চমৎকার ছবি—চমৎকার লেখা! বাঃ! এ-নাম ছাপার মানে বুঝতে পারি। নাহলে ঐ রকম যা-তা লিখে তলায় ছাপার অক্ষরে নাম—তাতে লজ্জা হওয়া উচিত!

ও-লেখায় কি এমন বৈশিষ্ট্য দেখাচ্ছো? আর পাঁচ জনেও অমনি দু'টি ছত্র লিখে নাম ছাপাতে পারে—সুতরাং ও ছাপা নাম দেখে তোমার সম্বন্ধে অপরে এমন কি ধারণা করবে যে, তোমার নাম সকলে জানবে—তোমার খ্যাতি প্রচার হবে? মাসে মাসে নানা পত্রে এমন কত নাম ছাপা হচ্ছে—সে সব নাম কে মনে রাখছে? এ রকম ছাপানো ক'দিন বাঁচে!

আর বাঁচবেই বা কেন? মাসিক-সম্পাদকের এ বেসাতির আমরা সমর্থন করি না! বরং বলি, এ ভাবে ছেলেমেয়েকে নির্লজ্জ মূঢ় নির্বোধ নিষ্কর্ম্মা করবেন না।

ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। সে উৎসাহ কেন? কোন্ কাজে? নাম ছাপানোয় নয়। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ব্যবস্থা করুন প্রতিযোগিতার। ছবি আঁকা, ফটো তোলা প্রতিযোগিতা। খেলাধূলার প্রতিযোগিতা—ধাঁধা-হেঁয়ালির জবাব দেবে—তাতে তাদের বুদ্ধি হবে শানানো, প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাবে।

তোমাদের বলি, নিজের নাম এ ভাবে ছাপা দেখলে খুশী হও খুব, বুঝি! কিন্তু অপরের নাম এমনি দু'ছত্র লেখার নীচে ছাপা দেখলে তামাসা করে বলো না কি যে, হুঁঃ, ভারী তো খপর দেছেন—এর জন্য নাম ছাপাতে লজ্জা হলো না?

এমন শস্তায় কাগজে নাম ছাপা ফাঁকি! ফাঁকির কারবারে আজ না হয় দু'-একখানা কাগজে গাদার মধ্যে নাম ছাপানো হলো—সে নাম কেউ পড়লো একবার ঐ কাগজ এলে। প্রতি মাসে গাদা-গাদা নামে এত যে সব নাম ছাপা হচ্ছে—তোমার নাম ও গাদার চাপে ঢাকা পড়বে তো—তখন?

এত শস্তায় নাম ছাপিয়ে পাবলিসিটি হয় না। পাবলিসিটি যদি চাও, কাজ করো। এমন কাজ, যে-কাজ আর পাঁচ জনে করতে ছুটবে—এমন কাজ যে-কাজে পাঁচজনে আনন্দ পাবে, উপকার পাবে। নাহলে ও-ভাবে কাকা, দিদি, পিসি বলে' নাম ছাপানো—এতে কাজের মানুষ হতে পারবে না—কোনো দিন নয়। ফাঁকি দিয়ে আজ পর্য্যন্ত কেউ এ-সব মাসি-পিসি-দিদি-কাকার মারফৎ নাম কিনতে পারেনি।

সনেট

কুসুম-কাননে যদি না কুসুম ফোটে,
ভ্রমরের কিবা এসে যায় বলো তায়?
বরষায় যদি মেঘ আকাশে না ওঠে
চাতকের তাতে বলো কিবা এসে যায়?

তুমি কত বড়, আমি কত ছোট,—জানি,
ভিন্নতা কত তোমার আমার মাঝে;
সেই মত ঠিক প্রভেদ যে কতখানি—
ফুলে ও ভ্রমরে, মেঘে ও চাতকে রাজে!

তবু তার মাঝে দু'জনাতে পরিচয়
তারি মাঝে আছে মিলনের এক সুর;—
তোমাতে আমাতে সেই মত পরিচয়
তোমার-আমার মাঝে সেই মত সুর।

তবু উহাদের মাঝে যত ভালোবাসা;
তোমার কাছেতে মোর তেমনিই যে আশা!

শ্রীমৃণালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথুর

ব্রজধাম এখন শূন্য। চারি দিকে হাহাকার রব! সবার মুখে "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" ধ্বনি। গোপীগণ বিরহকাতরা, শ্রীরাধা ধূল্যবলুণ্ঠিতা।

শ্রীকৃষ্ণ আর ব্রজধামে নাই। ব্রজধামের সকল মায়া ছিন্ন করিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। তিনি এখন সেখানকার রাজা —ও কুব্জা-প্রণয়ী। এ দিকে শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণ-বিরহে জীবন্মৃত-প্রায় হইয়া আছেন। কখন অচেতন কখনও বা অর্দ্ধচেতন অবস্থায় কাল কাটাইতেছেন। বৃন্দাদেবীর অঙ্গে অঙ্গ দিয়া মথুরার দিকে চাহিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন :—

"হরি কি মথুরাপুরে গেল
আজু গোকুল শূন ভেল।
রোদিতি পিঞ্জর শুকে
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে।
অব সোই যমুনার কূলে
গোপ-গোপী নাহি বুলে।
সাগরে তেজব পরাণ
আন জনমে হোয়ব কান।
কানু হোয়ব যব রাধা
তব জানব বিরহক বাধা।"—বিদ্যাপতি

সখি! আমার সকল সুখ প্রিয়ার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। এখন এ নিদারুণ দুঃখের পশরা কত কাল বহিব রে!

"নয়ানক নিদ্ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুঃখ হাম পাশ"।—বিদ্যাপতি

শ্রীরাধা এই সব কথা বলিতে বলিতে আকুল আবেশে "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" রবে রোদন করিতেছেন—

"কানু মুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী
ফুকারই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী।—বিদ্যাপতি

শ্রীমতী ক্রমে অধীরা হইয়া সঙ্গিনীগণকে বলিলেন, "আর ত' প্রাণে বাঁচি না সখি! আজ আয় সকলে মাধবীতলায় গিয়ে কৃষ্ণ-লীলার চিহ্নগুলি দর্শন করে এ তাপিত প্রাণ কথঞ্চিৎ শীতল করি। এই মাধবীকে সখা আমার বড় ভালবাসিতেন—তাই এর নাম রেখেছিলেন 'মাধবী'।"

এই মাধবীতলায় আসিয়া শ্রীমতী এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া উদাস মনে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বলতে পার মাধবী, আমার কৃষ্ণ কোথায়? কোথায় গেলে তাঁকে পাই? তিনি ত' আমায় বলে গিয়েছেন, আমি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে কোথাও থাকব' না। তোমাদের জন্যই আমার গোলোক ত্যাগ করে গোকুলে আসা।"

"তোমার কারণে নন্দের ভবনে
রাখিয়া ধেনুর পাল
গোলোক ত্যজিয়া গোকুলে বসতি
ইহাই জানিবে ভাল।" —চণ্ডীদাস

শ্রীরাধারাণী ক্রমে উন্মাদিনীর ন্যায় সখীদের লইয়া একবার কদম্ব-মূলে, একবার যমুনার কূলে, একবার তমালতলে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর্ণলতিকার ন্যায় সুকোমল দেহখানি জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তিনি চলিতে চলিতে—"আর বুঝি প্রাণে বাঁচি না রে" বলিয়া টলিতে টলিতে ভূতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তখন ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ ছুটিয়া আসিলেন ও শ্রীমতীর স্পন্দনহীন মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ললিতা সখী সযত্নে শ্রীমতীর দেহ ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। সকলে ভাবিলেন, শ্রীমতীর অন্তিম দশা উপস্থিত, এ অবস্থায় কৃষ্ণনাম বিনা শ্রীমতীকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই। এই স্থির করিয়া সখীগণ মণ্ডলী করিয়া কৃষ্ণনাম-সুধা শ্রীরাধার কর্ণকুহরে ঢালিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সকলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বিহ্বলা হইয়া প্রেমতরঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সুমধুর কৃষ্ণনাম শ্রীরাধার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দেহে আবার স্পন্দন আনিল। তিনি চেতনা পাইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন "কৃষ্ণ—প্রাণনাথ! এত দিনে কি দাসীকে আবার মনে পড়িল। এস নাথ, আমার হৃদয়ে এস!" তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন এই জ্ঞানে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু বাঞ্ছিত নিধিকে বক্ষে না পাইয়া আবার উৎসাহ-হীনা হইয়া পড়িলেন। তখন বৃন্দাদেবী শ্রীমতীকে বলিলেন, "সখি! চল্ গৃহে ফিরি, হয়ত গৃহে গেলে কিছু শান্তি পাবি; তখন শ্রীমতী বলিতেছেন :—

"সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কে দূর করব পিয়াসা।
চন্দনতরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি।
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু ন বরিখব
সুরতরু বাঁঝ কি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে।"

"সখি! গৃহের কথা কি বলছ—আমার করম-দোষে সিন্ধুর নিকট গিয়াও তৃষ্ণা মিটাইতে পাইলাম না। ভাগ্যদোষে চন্দনতরু সৌরভ বিতরণে বিমুখ হইল, শশধর অগ্নি বর্ষণ করিল এবং চিন্তামণি গুণ প্রদর্শন করিলেন না। ঘোর শ্রাবণ মাসে এক বিন্দু বারি বর্ষিত হইল না, কল্পতরু বন্ধ্যা হইয়া গেল। হিমালয়ে আসিয়াও আশ্রয় পাইলাম না।" এই হতাশ ভাবে বিমুগ্ধা হইয়া শ্রীমতী ক্ষণে ক্ষণে নানা দশা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ও তাঁহার দুই নয়ন দিয়া অবিরল-ধারে অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল।

এই ভাবটি শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।"

"হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে এক নিমেষ কাল যেন আমার নিকট যুগ-যুগান্তর বলিয়া মনে হইতেছে—শ্রাবণের জলধারার ন্যায় নয়নধারা বহিয়া পড়িতেছে। হায় হায়! আমার নিকট সমস্ত জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমতী নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। জানিলেন, শুধু কৃষ্ণনামগুণে তিনি পুনরায় জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছেন। তখন

পুনরায় তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও লুণ্ঠিত অঞ্চলে, আলুলায়িত কেশে হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া প্রাণনাথকে অভিমানবশে অভিযোগ করিতেছেন :—

"সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে।"—চণ্ডীদাস

এই কথাগুলির মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব প্রেম-গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান। শ্রীরাধা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অন্য কোন অভিশাপ খুঁজিয়া পাইলেন না। শত সহস্র অভিশাপের মধ্যে তিনি কেবল বলিলেন, "আমার অন্তর যেমন করিছে, তাঁহার অন্তরও সেইরূপ করুক।" ঐ এক 'যেমন করিছে' শব্দের মধ্যে কি এক নিদারুণ ব্যথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। "যাঁহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া তাঁহার সামীপ্য কামনা করিতেছি, তিনি অন্যের প্রেমাধীন"—এই ধারণায় শ্রীরাধার হৃদয় ভেদ করিয়া যে অভিসম্পাত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা কোন মানবী প্রেমিকার কণ্ঠ হইতে নিঃসারিত হইত না। যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের অপার্থিবতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, কেবল তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম ও রস উপভোগ করিবেন। শ্রীমতী আবার বলিতেছেন :—

"(হায়) কোন্ প্রেম লাগি নারদ বৈরাগী
মহাদেব যোগী কোন্ প্রেমে ?
কি প্রেম কারণে ভগীরথ জনে
ভাগীরথী আনে ভাবত ভূমে ?
কোন্ প্রেমে হরি বধে ব্রজনারী
গেল মধুপুরী করে অনাথা ?
কোন্ প্রেম-ফলে কালিন্দীর মূলে
কৃষ্ণপদ পেলে মাধবীলতা ?" —চণ্ডীদাস

শ্রীরাধা এখন বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। চাহিয়া আছেন কিন্তু বাহ্যবস্তু যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহার বদন-কমল বিবর্ণা, পাংশুল হইয়া গিয়াছে—দেহ ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছে। তিনি ললিতাদি সখীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, সখি! এ দীর্ঘ বিরহ আমার মনকে তিক্ত করিয়া দিয়াছে। তোমরা চিতা সজ্জিত করিয়া দাও, আমি বিষ পান করিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিব। গঙ্গাতীরে শরীর ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি সাধন করিলে বিধি অনুকূল হইয়া দুর্ল্লভ প্রভুকে সুলভ করিয়া দিবেন। আমার অন্তিম অবস্থা হইলে সকল বিবাদই মিটিয়া যাইবে।

"কত কত সখি মোহে বিরহে ভৈ গেল তিতা
গরল ভখি মোঞে মরব রচি দেহ মোর চিতা।
সুরসরি তীরে শরীর তেজব সাধব মনক সিধি—
দুলহ নিধি মোর সুলহ হোয়ব অনুকূল হোয়ব বিধি।
কি মোঞে পাঁতি লিখি পাঠাওব তাহে কি কহব সম্বাদে
দশমী দশা পর যব হম হোয়ব টুটব সবহু বিবাদে।"
—বিদ্যাপতি

শ্রীরাধা ক্রমে দশমী দশা প্রাপ্ত হইলেন। কণ্ঠস্বর নাই, অর্থহীন দৃষ্টি, শরীর অবশ ও ক্রিয়াহীন। সেই অবস্থা দেখিয়া সকল সখীগণ শোকে মুহ্যমানা হইলেন। তখন বৃন্দাদেবী বলিতেছেন :—

মাধব জানল ন জীউতি রাহি।
যতবা যকর লেলে ছলি সুন্দরী
সে সবে সোপলক তাহি।
শরদক শশধর মুখরুচি সোপলক
হরিণক লোচন লীলা
কেশপাশ লয়ে চমরীকে সোপল
পায়ে মনোভাব পীলা।
দশন দশা দাড়িমকে সোপলক
বান্ধুব অধর রুচি দেলি।
দেহ দশা সৌদামিনী সোপলক
কাজর সনি সখী ভেলী।
ভঙ্গু হেরি ভঙ্গ অনঙ্গ চাপ দিহু
কোকিলকে দিহু বাণী।
কেবল দেহ নেহ অছ লওলে
এতবা অএ লাহু জানি।" —বিদ্যাপতি

অর্থাৎ—"মাধব, বুঝিতেছি রাই আর প্রাণে বাঁচিবে না; কারণ সে যাহার নিকট হইতে যাহা যাহা লইয়াছিল তাহা তাহাদেরই প্রত্যর্পণ করিয়া দিয়াছে। নিজের মুখশোভা শারদীয়া শশধরকে ফিরাইয়া দিয়াছে, নয়নের দৃষ্টি হরিণকে, ও কেশপাশ চামরীকে সমর্পণ করিয়াছে। দন্তসমূহ দাড়িম্বকে, অধরশোভা বান্ধুলী পুষ্পকে, দেহ-লাবণ্য সৌদামিনীকে ফিরাইয়া দিয়া সখী কজ্জলের ন্যায় কালো হইয়া গিয়াছে। ধনুকের জন্য ভ্রূভঙ্গ অনঙ্গকে এবং বাণী কোকিলকে ফিরাইয়া দিয়াছে। কেবল কৃষ্ণপ্রেম জন্য দেহখানি ধারণ করিয়া আছে; ইহাই বুঝিতেছি।"

তখন বৃন্দা ললিতা ও বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ একযোগে স্থির করিলেন যে, তাঁহারা মথুরায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ব্রজধামে ফিরাইয়া আনিয়া শ্রীরাধাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। এই সঙ্কল্প সফল-করিবার জন্য সকলে শ্রীশ্রীকাত্যায়নী দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন ও সারারাত্রি যাবৎ তাঁহার পূজা করিলেন। পূজাবসান সময়ে কাত্যায়নী দেবীর শ্রীচরণের ফুল শ্রীরাধার মস্তকে পতিত হইল। সখীরা তখন ইহা অতি শুভ লক্ষণ মনে করিয়া বৃন্দাদেবীকে পুরোভাগে রাখিয়া অন্যান্য গোপীগণ সহ সকলেই মথুরার পথে বাহির হইলেন। ব্রজধামে রহিলেন শ্রীরাধা ও তাঁহার দেহ রক্ষা করিবার জন্য মাত্র কয়েক জন সহচরী। পথে বাহির হইবার পূর্ব্বে বৃন্দাদেবীর অনুরোধ ক্রমে সকল সখীগণ সাধারণ অথচ সুন্দর বেশভূষা ও নানা পুষ্পমাল্যে সজ্জিতা হইলেন। কেন না, সখীদের মলিন বেশ দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ বড় ব্যথা পাইতেন।

গোপীগণ অভিনব বেশে সজ্জিতা হইয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় পথে তাঁহারা এক সাধুকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার পরিধানে কৌপীন, মুণ্ডিত মস্তক, সারা গাত্রে নানাবিধ ছাপ, তিলক ফোঁটা কাটা ও গলায় তুলসীর মালা। ইঁহাকে দেখিয়া এক জন কৃষ্ণভক্তজ্ঞানে গোপীগণ সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধো! আপনি কি কৃষ্ণের লোক? আমরা কোন্ পথে মথুরায় যাব, ও সেখানে গিয়ে কেমন করেই বা তাঁর সাক্ষাৎ পাব বলে দিন।"

সাধু গোপীগণের সেই বেশভূষার পরিপাটী দেখিয়া অবজ্ঞাভরে

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কে? কৃষ্ণের সহিতই বা তোমাদের কি সম্বন্ধ?"

সখীগণ বলিলেন, "আমরা গোপী, বৃন্দাবনে বাস করি। আর কৃষ্ণ আমাদের কে? আমাদের জীবন-যৌবন সমস্তই তিনি। কৃষ্ণ আমাদের প্রাণ, কৃষ্ণ আমাদের পতি, কৃষ্ণ আমাদের জীবনে-মরণে গতি।" এই কথা বলিয়া গোপীগণ "জয় রাধেকৃষ্ণ, জয় রাধেকৃষ্ণ" রবে নানা ভঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

বিরক্তিনী গোপীদের সেই অদ্ভুত আনন্দ দেখিয়া সাধু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "অবোধ নারীগণ, তোমাদের বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়েছে, তোমরা একান্ত অজ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ জগতের পতি; তোমরা সামান্যা গোপী হয়ে তাঁকে প্রাণপতি বলতে চাও; আর শোকেও তোমাদের এত নৃত্য-গীত! ছি ছি তোমরা অতি ঘৃণ্য।"

গোপী। সাধো, সত্যই কৃষ্ণ আমাদের পতি! দেহ মন প্রাণ সমস্তই আমরা তাঁকে সমর্পণ করেছি। আমরা বিরহকাতরা বটে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রীতির জন্য আমাদের এই বেশভূষা—এই নৃত্য-গীত। কৃষ্ণ যে আমাদের নৃত্য-গীত বড় ভালবাসেন—

"শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে?
সব রস সার শৃঙ্গার এ।" —চণ্ডীদাস

সাধু। অবোধিনি! কৃষ্ণ ওরূপ সহজলভ্য নন। তাঁকে প্রাপ্তির পথ অন্যরূপ। উপবাস, কঠোর তপস্যা, তীর্থ-পর্য্যটন কর, শরীরকে ক্ষীণ করতে ও কষ্ট দিতে শেখো, মস্তক মুণ্ডন কর, কৌপীন পর; তবে ত' কৃষ্ণকে পাবে।

গোপী। (অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া) ঠাকুর, এখন দেখছি আপনার কৃষ্ণ অন্য জন। আমাদের কৃষ্ণ যে সদানন্দময়, তিনি অন্যের নিরানন্দ ও ক্লেশ আদৌ সহ্য করতে পারেন না। তিনি স্বয়ং নৃত্যগীত করেন ও আমাদের নৃত্যগীত করান। এতেই আমাদের পূর্ণানন্দ। আপনি যে সব ক্লেশ অভ্যাস করতে বলছেন—যদি আমরা ঐ সব আচরণ করি তা'হলে আমাদের কৃষ্ণ অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাবেন। আপনি জানেন না, আমাদের এই বেশভূষা, এই কেশদাম আমাদের প্রাণপতির কত আদরের বস্তু। এই কেশ দিয়া হৃষীকেশের রাঙ্গা চরণ দু'খানি ও এই বসনাঞ্চলে কত বার তাঁর শ্রান্ত দেহের ঘর্ম্ম মুছায়েছি।

বিধিবদ্ধ সাধু গোপীদিগের রাগাত্মিকা শুদ্ধা প্রেমোচ্ছ্বাসের ভাব কিছুই বুঝিলেন না। তিনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ যখন তোমাদের এতই সহজলভ্য, তখন ঐ যমুনা পার হ'য়ে মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে ধরে নিয়ে এস।"

সাধুর ব্যঙ্গোক্তিতে গোপীগণ অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, কৃষ্ণ কাহারও আজ্ঞাধীন নহেন, তবে যাঁরা তাঁর সঙ্গে নিঃস্বার্থ প্রেম করেন, তাঁরাই তাঁর নিজ জন।"

সাধু প্রস্থান করিলে ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণের চরণতরী অবলম্বন করিয়া যমুনা পার হইলেন ও ক্রমে মথুরাপুরে প্রবেশ করিলেন। গোপীরা 'রাধাকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিয়া নৃত্যভঙ্গি করত মথুরার পথ মুখরিত করিতে করিতে চলিলেন। মথুরাবাসীরা রাধাকৃষ্ণ নাম কখনও শুনেন নাই। তাঁহারা গোপীদের বেশভূষা ও অদ্ভুত নৃত্যগীত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহাদের অনেকেই প্রশ্ন করিলেন,

গোপীরা উত্তর করিলেন, "আমরা ব্রজবাসী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে এই ব্রজদধি তাঁকে উপহার দিব।"

গোপীরা মথুরা হইতে আগমনকালে প্রত্যেকেই পশরা করিয়া ব্রজদধি মাথায় বহিয়া আনিয়াছিলেন। এই দধি অমৃত তুল্য। শ্রীকৃষ্ণ ইহা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আজিও এই দধি বৃন্দাবনে বিখ্যাত হইয়া আছে।

যাহা হউক, মথুরাবাসিগণ কৃষ্ণকে মহারাজা বলিয়াই জানেন ও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের রাজা শ্রীকৃষ্ণ, চৌদিকে দ্বারবান্-বেষ্টিত সুরম্য সপ্ততল প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ কক্ষে দেবাদিদেব মহাদেব প্রমুখ দেবতাগণ পরিবৃত হইয়া রাজকার্য্য করেন। কেহ বড় একটা তাঁহাকে দেখিতে পান না—বা দেখিবারও সাহস করিতে পারেন না। গোপীদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ও ব্রজদধি উপহার প্রভৃতির কথা শুনিয়া তাঁহারা অবাক্ হইয়া গেলেন। কেহ বা গোপীদের পাগলিনী বলিয়া বিদ্রূপও করিলেন।

ক্রমে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে—"হে প্রাণনাথ, হে প্রাণবঁধুয়া, হে ব্রজনাথ, হে গোপীবল্লভ" ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া "ব্রজডাক" দিতে দিতে রাজবাটীর দিকে চলিলেন, এবং "প্রাণবঁধুয়া দহি লে, ব্রজনাথ দহি লে" বলিয়া সারিবদ্ধ ভাবে গীত গাহিতে লাগিলেন। ব্রজগোপীরা দধির পশরা মাথায় করিয়া ক্রমে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বাররক্ষিগণ বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইল। তখন গোপীগণ বিনীত ভাবে বলিলেন, "দ্বারি! আমাদের একবার মাত্র দয়া ক'রে ছেড়ে দাও—তোমাদের রাজাকে একটি বার দর্শন ক'রে ও তাঁকে এই দধি উপঢৌকন দিয়ে ফিরে যাব।"

দ্বারবানেরা দধির ভাগ চাহিল। তখন গোপীরা হাস্য করিয়া বলিলেন, "দ্বারি! এ দধি সামান্য নহে, এ দধি কেবল তোমাদের রাজার ভোগ্য—এ ব্রজদধিতে তোমাদের অধিকার নাই।" এই বলিয়া গোপীগণ অতি কাতর কণ্ঠে ও উচ্চ রবে "প্রাণনাথ দহি লে, ব্রজনাথ দহি লে" বলিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন হর্ম্ম্যময় উচ্চ অট্টালিকার রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবগণ তাঁহাকে করযোড়ে স্তুতি করিতেছেন। এমন সময় বৃন্দাদি সখীগণের সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর ও সেই সুমধুর কণ্ঠে উচ্চারিত "প্রাণনাথ, ব্রজনাথ" প্রভৃতি প্রেম-সম্বোধন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে অন্তরে ব্রজগোপীদের সকল দুরবস্থার কথা অনুভব করিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ত্রিলোকাধিপতির চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সভাসদ্‌গণ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া প্রধান দ্বারবান্‌কে আদেশ দিলেন, "দ্বারদেশে যাহারা চীৎকার করিতেছে তাহাদিগকে অবিলম্বে রাজসভায় লইয়া আইস।" আদেশ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে স্থির করিলেন—আজ আমি ত্রিজগতে ব্রজবাসিগণের প্রেম-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিব।

ব্রজবালাগণ সভায় উপস্থিত হইলেন ও সেই রাজসভায় একপার্শ্বে অতি দীন ভাবে দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের সাধারণ বেশ অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্য ও দীন ভাব দেখিয়া সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া গোপীগণের এবং গোপীগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে ভাব-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, কিন্তু স্থান-কাল অনুযায়ী উভয় পক্ষই হৃদয়াবেগ

সভাস্থ সকলেই নীরব। সকলেই অপলক দৃষ্টিতে গোপীদিগের প্রতি চাহিয়া আছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় আগন্তুকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমণীগণ, তোমরা কাহারা? কি চাও?"

তখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব বুঝিয়া উত্তর দিলেন—"মহারাজ, আমরা গোয়ালিনী, বহু দূর হ'তে আপনাকে দর্শন ক'রতে এসেছি। শুনেছি আপনি বড় সাধু—তাই আপনার নিকট এক নালিশ করতে ইচ্ছা করি।"

শ্রীকৃষ্ণ। কি অভিযোগ বল।

গোপী। কোন চোর আমাদের যথাসর্ব্বস্ব চুরি ক'রে এই দেশে পালিয়ে এসেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। আমার রাজ্যে চোর? সে চোরের আকৃতি কিরূপ ও তোমাদের কি কি দ্রব্য চুরি ক'রে এনেছে বলতে পার?

গোপী। মহারাজ! সে চোরের বর্ণ চিকণ কালো। তার বাঁকা চাহনিতে চৌর্য্যবৃত্তি ভরা। বলিতে কি, তার হাব-ভাব ও আকৃতি সম্পূর্ণ আপনারই মত।

এই কথায় সভাসদগণ সকলেই ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি এত দূর স্পর্দ্ধা—আমাদের মহারাজাকে প্রকারান্তরে চোর বলা! মহারাজ, আদেশ করুন, এখনই উহাদিগকে শৃঙ্খলিত করে কারাগারে প্রেরণ করা হোক।"

শ্রীকৃষ্ণ। (গোপীদিগের প্রতি) তোমরা কি উন্মাদিনী? তোমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করে বল।

গোপী। মহারাজ! যথার্থই বলছি, সে চোর ঠিক আপনারই মত। তবে আপনি রত্ন-সিংহাসনে বসেছেন, রাজবেশ পরেছেন ও রাজদণ্ড ধারণ করেছেন, কিন্তু আমাদের সেই চোর পীতধড়া মোহন চূড়া পরিত, বাঁশী বাজাইত ও গরু চরাইয়া বেড়াইত। এখন ব্রজগোপীদের কুল-মান সকলই চুরি করে আমাদের কাঙ্গালিনী সাজিয়েছে। মহারাজ! সেই চোর ব্রজগোপীদের হৃদয়-সিংহাসনে বসিত—আর তাঁদের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান,—যাঁর নাম শ্রীরাধা রাণী, তিনি ছিলেন তাঁর রাণী। শ্রীরাধার হৃদয়বল্লভের নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণ, আর শুনছি আপনার নামও শ্রীকৃষ্ণ। আমরা সেই শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে মধ্য করে অবিরত কত রঙ্গ-কৌতুক করতাম। সেই চোর আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এখানে এসেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ। তোমাদের সে রাজা ত' বড় নিষ্ঠুর। তোমরা যাঁকে হৃদয়নাথ করলে, তিনি তোমাদের ফেলে এলেন!

গোপী। হ্যাঁ মহারাজ, এই তাঁর রীতি! সেই চোর রাখাল, নিত্য নূতন পিরীতি করিয়া বেড়ান, পুরাতনে তাঁর মন বসে না। তাঁকে যাঁরা যত চান্ তিনি তাঁদের তত কষ্ট দেন্। যাঁরা কেবল তাঁর বৈভব চান্ তাঁদের তিনি প্রচুর দেন্।

তখন এক জন সখী আর থাকিতে না পারিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে রে কালিয়া
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পিরীতি করিতে
মনে যদি এত ছিল॥
ধিক্ ধিক্ বঁধু লাজ নাহি বাস
না জান লেহের লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ॥
অগাধ জলের মকর যেমন
না জানে মিঠা কি তিত।
সুরস পায়স চিনি পরিহরি
চিটিতে আদর এত॥" —চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা পাগলিনী অথচ দেখি বেশ সুরসিকা।

সভাসদ্গণ। মহারাজ! আপনি কেমন করে স্ত্রীলোকগুলির ঐ সমস্ত বিদ্রূপ সহ্য করছেন? এখনই উহাদের বধ করা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) হা রে বিষয়মুগ্ধ মথুরাবাসিগণ, ব্রজগোপীদের অন্তরের নিগূঢ় প্রেমতত্ত্ব তোমরা কি বুঝবে? (প্রকাশ্যে) তোমরা সকলে বল, কি করা কর্ত্তব্য।

গোপী। মহারাজ আর একটু শুনুন। আমাদের রাধারাণী সেই চোরকে অতি যত্নে পালন করতেন বলে তাঁর নাম রেখেছিলেন শ্যাম শুক পাখী।

"শ্যাম শুক পাখী সুন্দর নিরখি
(রাই) ধরিনু নয়ান ফান্দে।
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখিল সাদরে
মনোহি শিকলে বান্ধে॥
তারে পুষি পালি ধরাইল বুলি
ডাকিত রাধা বলিয়ে।
(এখন) হয়ে অবিশ্বাসী কাটিয়া আকুসি
পলায়ে এসেছে পুরে॥
সন্ধান করিতে পাইনু শুনিতে
কুবুজা রেখেছে ধরে।
আপনার ধন করিতে প্রার্থনা
রাই পাঠাইল মোরে॥" —চণ্ডীদাস

সঙ্গে সঙ্গে অপর এক গোপী গাহিলেন—

"কিংবা কুব্জা নামে কুবুজিনী
তেঞি সে লেগেছে মনে।
আপনি যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারি
বিধি মিলায়েছে জেনে॥" —চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণ। কি বল্লে—কুব্জা সেই পাখী ধরে রেখেছে? কুব্জা ত' আমারই রাণী। তোমাদের কুব্জা কে?

গোপী। ওহে কুব্জাপতি। এই কুব্জা অতি কুরূপা ছিল; আমাদের রাখালরাজার গায়ে এক ফোঁটা চন্দন ছিটাইয়া দিতেই আমাদের পতিতপাবন রাজা বরদানে কুরূপা কুব্জাকে পরমাসুন্দরী করে দেন—আর তাঁকেই নিজের রাণী করেন।

শ্রীকৃষ্ণ। (একটু চমকিত হইয়া) ইহা ত' আমিই করেছি। তোমরা দেখছি আমাকেই পাকেচক্রে চোর সাজাতে চাও; কিন্তু জান, আমি মথুরার রাজা। আমাকে দেখে তোমাদের কি ভয় হচ্ছে না?

গোপী। ভয়-টয় আমাদের নাই মহারাজা! আর আমরা কখনও মিথ্যা বলি না।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ, তোমাদের কথার কিছু প্রমাণ আছে ?

গোপী। বিশেষ আছে। এই দেখুন।

শ্রীকৃষ্ণ। কি ও ?

গোপী। এখানি দাস-খৎ। এই দাস-খৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের রাধারাণীকে দিয়েছেন। ইহা কি আপনারই হস্তাক্ষর বলে মনে হয় না ?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ, আমার লেখার মত অনেকটা মনে হয় বটে, কিন্তু ইহা জাল খৎ। যাহা হউক, এই খতের বৃত্তান্ত সভাসদ্‌গণকে বল।

গোপী। হে সভাসদ্‌গণ! হে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর! আপনারা সকলে শুনুন:—আপনারা যে মথুরার রাজাকে স্তব স্তুতি, অর্চনা বন্দনা করে থাকেন, যাঁর কৃপা ও ঐশ্বর্য্য পাবার জন্য আপনারা দিবানিশি ব্যাকুল, তিনি আমাদের প্রধানা শ্রীমতী রাধারাণীর নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। তিনি ও শ্রীমতী এক আত্মা—অভিন্নহৃদয়। উভয়ে উভয়কে এক মুহূর্ত্ত না দেখলে মূর্চ্ছিত হতেন। প্রেমিকা রাধা যখন মান করতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ নানা সাধনা ও কাতরোক্তি ক'রে শ্রীরাধার মান ভঞ্জন করতেন। এক দিন রাসলীলার সময় তিনি রাধারাণীকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ রাসমঞ্চ থেকে অন্তর্দ্ধান হন। আমরা ব্যাকুলা হ'য়ে সারারাত্রি তাঁর সন্ধান করি। পরে দেখি, শ্রীমতীরও আমাদেরই মত দশা। তিনি শ্রীমতীকেও মধ্যপথে ফেলে কোথায় চ'লে গিয়েছেন। তার পর যখন আমরা "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলে উন্মাদিনীর ন্যায় পথে পথে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি—যখন আমাদের প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা, তখন তিনি কোথা থেকে হঠাৎ এসে ঈষৎ হাস্য করে আমাদের সম্মুখে দাঁড়ালেন। সেই অবধি আমাদের ভয়, পাছে তিনি আবার আমাদের অনাথা করে কোথাও পালিয়ে যান। এই ভয়ে—শুনুন সভাসদ্‌গণ! আমরা স্থির করলাম যে শ্রীমতী মান ক'রে, অঞ্চলে বদন ঢেকে ব'সে থাকবেন, পরে যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এসে রাধার মান-ভঞ্জনের জন্য নানা চেষ্টা করবেন সেই সময় আমরা বলব যে, সখা, যদি তুমি আমাদের এইরূপ একটা দাস-খৎ লিখে দাও যে তুমি চিরকালের জন্য শ্রীমতী রাধারাণীর নিকট প্রেম-ঋণে আবদ্ধ থাকবে তবেই রাধারাণী আবার তোমার সঙ্গে কথা কইবেন—নচেৎ নয়। এর সুফল হ'ল। রাধারাণী কপট মান করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেদিন কিছুতেই তাঁর মান ভঞ্জন করতে পারেন না। তখন আমরা তাঁর কাছে উক্ত দাসখতের উল্লেখ করলাম। তখন শ্রীকৃষ্ণ দাসখৎ লিখতে স্বীকৃত হলেন ও বললেন—

"সুন্দরী তেজহ দারুণ মান।
সাধয় চরণে রসিকবর কান।
আজু যদি মানিনি তেজবি কন্ত।
জনম গমাওবি রোই একন্ত।"—বিদ্যাপতি,

যখন আমাদের রাখাল রাজা উক্ত ভাবে নানা অনুনয় বিনয় দেখাইলেন, তখন শ্রীমতীর মানভঞ্জন হইল, তাঁহার নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি অবগুণ্ঠন খুলিয়া বঁধুয়াকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন! তখন রাখালরাজা আট জন সখীকে সাক্ষী করিয়া এই দাসখৎ লিখিয়া দেন।

শ্রীকৃষ্ণ। দাসখৎ পাঠ কর।

গোপী। (দাসখৎ পাঠ)

ইয়াদিকিদ্‌, গুণ সমুদ্র, সৎসাধু শ্রীরাধা।
সম্বদারস্ত চরিতস্ত পুরাও মনেরি সাধা।
তস্য খাতক, হরি নায়ক বসতি ব্রজপুরী।
কস্য কর্জ্জ, পত্রমিদং লিখিলাম সুকুমারী।
ঠামহি তব, প্রেম দুর্ল্লভ, লইনু কর্জ্জ করিয়া।
ইহার লভ্য, পাইবে ভব্য, প্রেম অখিল ভরিয়া।
কহে চন্দ্রশেখর, লিখনী ধরিয়া, লিখিলাম করুণা করি।
শ্রীরাধে বলিয়া, খত লিখি দিলা, লেহত শ্রীকর ধরি।"

খৎ পাঠ শেষ হইলে সভাসদ্‌গণ স্তম্ভিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তদবস্থায় দেখিয়া বৃন্দাদূতী বলিলেন—"মহারাজ! নীরব কেন? আমরা না উন্মাদিনী? আমরা না জালিয়াৎ? তা এক কাজ করুন। আপনি কুব্জাকে নিয়ে চিরদিন মথুরায় রাজাধিরাজ হয়ে থাকুন, কিন্তু ব্রজবাসিগণ আপনাকে যে যে সম্পত্তিগুলি দিয়েছিল, সেগুলি সমস্ত আমাদের ফেরত দিন। আমাদের দেওয়া সেই বাঁশরী, সেই মোহন চূড়া, সেই পীতধড়া, চরণের সেই নূপুর ও সেই বনমালা ফিরিয়ে দিন।"

বৃন্দার কথাগুলি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে শেলের মত বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া বৃন্দাদি গোপীগণের নিকট দাঁড়াইলেন ও তাঁহাদের হস্ত ধারণ করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "সখিগণ! আর থাক্, প্রচুর হ'য়েছে, এখন বল, ব্রজের কুশল ত'? মা যশোদা ও পিতা নন্দ কেমন আছেন? ছিদাম, সুদাম, বসুদাম ও সুবোল প্রভৃতি সখাগণের দিনগুলি তেমনি আনন্দে কাটিছে ত'? আমার সেই ধেনুর পাল পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে ত'? আর আমার পরাণ-প্রিয়া শ্রীরাধারাণী প্রাণে বাঁচিয়া আছেন ত?"

"কেমন গোপের রমণী যতেক
কেমন বালক সখা।
কেমন আছেন সে নন্দ যশোদা
পুন সে নাহিক দেখা।
কেমন নগর চাতর বাজার
কেমন আছয়ে রীতি।
সে হেন যমুনা পুলিন কানন
পুরবাসিগণ যতি।
কহ সেই বলি বচন উত্তর
শুনিতে পিয়ার বাণী।
কি আর কহিব সুধাইয়া দেখ
চণ্ডীদাস ভাল জানি।"

তখন বৃন্দাদেবী ব্রজপুরের হাহাকার রব ও দুরবস্থার কথা একে একে সমস্ত বর্ণনা করিলেন ও ক্রমে শ্রীরাধার কথা উঠিলে বলিলেন—

"যখন হইনু যমুনার পার
দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে রাধে অন্তর্জলে
রাই দেহ হরি বলি।
দেখিতে যদ্যপি সাধ থাকে তব
ঝট্ চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডীদাস বিলম্ব হইলে
আর না দেখিবে রাই।"

সখা। রাই এখনও বাঁচিয়া আছেন কি না সন্দেহ! আমরা যখন যমুনা পার হইয়া আসি, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি—তিনি যমুনার জলে নিজ দেহ অন্তর্জলি করিবার জন্য অর্দ্ধ নিমগ্ন করিয়া "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেছেন।

বৃন্দার মুখে শ্রীরাধার অন্তিম দশার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বৃন্দে! আমি অতি নিষ্ঠুর সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি চিরদিনই তোমাদের।"

"তোমার নামের মধুর মাধুরী
নিরবধি করি গান।
রাধা বিনে সব সুখের বৈভব
মনেতে নাহিক আন।" —চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে যেন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। আপন হৃদয়াবেগ আর ব্যক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। তখন বলিলেন, "সখিগণ! চল আমি এখনই ব্রজধামে যাব।"

এইখানে বৈষ্ণব গ্রন্থে মতানৈক্য দেখা যায়! কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়াছিলেন, কেহ বলেন, তিনি মথুরায় গিয়া আর ব্রজধামে ফিরেন নাই। শেষোক্ত অভিমতই অধিক নির্ভরযোগ্য। বৃন্দাবন লীলার পর শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের আর কখনও সাক্ষাৎকার হয় নাই। তবে বিরহের আতিশয্যে শ্রীরাধা ভাবচক্ষে দেখিতেন শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন, আবার উভয়ে মিলন ও বিহার হইতেছে। বৈষ্ণব কবিগণ ইহার নাম দিয়াছেন···"ভাবসম্মিলন।" শ্রীরাধা ভাবাবেশে দেখিতেছেন :—

"স্বপনে আওল সখি মধুপিয়া পাসে।
তখনুক কি কহব হৃদয় হুলাসে।
ন দেখি অ ধনুগুণ ন দেখি সন্ধানে।
চৌদিশ পর এ কুসুম শর বাণে।
বঙ্ক বিলোকন বিকসিত থোরা।
চাঁদ উগল জনি সমুদ্র হিলোরা।
উঠলি চেহাই আলিঙ্গন বেরী।
রহলি লজাএ শুনি সেজ হেরি।"—বিদ্যাপতি

"সখি! স্বপ্নাবেশে দেখি প্রিয়া আমার নিকট আসিলেন। তখন আমার হৃদয়ের উল্লাসের কথা কি বলিব? মদনের ধনুর্গুণ অথবা সন্ধান কিছুই দেখিলাম না, কেবল চারি দিকে কুসুম শর নিক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিলাম। বঙ্কিম নয়ন ঈষৎ বিকশিত—যেন চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র-হিল্লোল। আলিঙ্গনের সময় চমকাইয়া উঠিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই শূন্য শয্যা দেখিয়া লজ্জিতা হইলাম!"

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সন্ধি?

শুনা যাইতেছে, জার্ম্মাণ প্রচার বিভাগের ডাঃ শ্মিট, সহঃ অর্থ সচিব ডাঃ কার্লশ্রুর, ব্যারণ ফন গ্রুয়েনেফ এবং ডাঃ হান্স্ ফ্রিট্স্ সোভিয়েট য়ুনিয়নের সহিত পৃথক্ সন্ধির ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন।

জার্ম্মাণীর চিরাচরিত প্রথাই এই যে, সে আপন দেশে কাহারও সহিত লড়াই করে না। এই প্রথা ও সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই হয়ত জার্ম্মাণ নায়কগণ সন্ধির চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু মিষ্টার রুজভেল্ট জোর-গলায় বলিয়াছেন যে, জাপান ও জার্ম্মাণী জয় না করিয়া মিত্রপক্ষ ছাড়িবে না।

জাপানের বণিক্‌দলও না কি দেশকে রণমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা না কি জাপ-সম্রাট্‌কে পরামর্শ দিতেছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরে অধিকৃত কতকটা স্থান ছাড়িয়া দিয়া মিত্রপক্ষের সহিত মিটমাট করাই ভাল।

জার্ম্মাণীর নূতন মারণাস্ত্র—

১২ই ভাদ্র পর্য্যন্ত দক্ষিণ-ইংলণ্ডের উপর মোট ৭৭০০ উড়ো বোমার আক্রমণ হইয়াছে। আমেরিকায় বসিয়া লর্ড হ্যালিফাক্স হিসাব দিয়াছেন যে, যুদ্ধের প্রথম ৪ বৎসরে ইংরেজ পক্ষের ৪ লক্ষের অধিক লোক হতাহত হইয়াছে। আজ সেই সংখ্যা নিশ্চয় প্রায় ১০ লক্ষ হইবে।

মার্কিণ অর্থ-সচিব মিঃ হেনরী মর্গেনথ লণ্ডন হইতে এক বেতার বক্তৃতায় আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, উড়ন্ত বোমা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর ও সর্ব্বধ্বংসী যন্ত্র শত-সহস্র মাইল দূর হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। উড়ন্ত বোমা এই নূতন মারণাস্ত্রের অগ্রদূত মাত্র। জার্ম্মাণদের এই গোপন অস্ত্রের নাম "দি ভি টু"। ১৮ই আগষ্ট ইংরেজ বৈমানিকরা প্যারিস ১৫ মাইল উত্তরে ভূগর্ভস্থ এই অস্ত্রের ডিপোতে বোমা ফেলে।

জার্ম্মাণরা উড়ন্ত বোমার আক্রমণ শিথিল করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই বোমার আক্রমণ বাকিংহাম প্রাসাদের উপরেও হইয়াছে। ইংলণ্ডের দক্ষিণ অঞ্চল নিত্য এই আক্রমণের ফলে শঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

রাশিয়ার নূতন ফন্দী—

সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীকে ক্ষিপ্রগতিতে পোলাণ্ড পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ-অধিকার পুনরধিকার করিতে দেখিয়া জগৎ বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু ওয়ার্‌সর দেশভক্ত পোলদিগকে উত্থিত হইতে দেখিয়াও রুশগণ তাহাদের গতি অব্যাহত রাখে নাই। রুশসৈন্যকে ওয়ার্‌সর দ্বারদেশে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। মাত্র ওয়ার্‌সর যুদ্ধক্ষেত্রে নহে, এ সময় রুশ-সীমান্তের সকল রণাঙ্গনেই সোভিয়েট রণবাহিনীর আপাতঃ নিষ্ক্রিয়তা দেখা যায়। ইহা যেন নূতন প্রবল আক্রমণের পূর্ব্বাভাষ।

গত এক মাসে দক্ষিণ পোলাণ্ডে ১ লক্ষ ৪০ হাজার জার্ম্মাণ নিপাত করিয়া রুশ-প্রচেষ্টার মন্দাভাব দেখিয়া মনে হয় যেন সোভিয়েট রণ-নেতৃবৃন্দ অভিনব কোন আক্রমণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

বল্কান অঞ্চলই প্রধান লক্ষ্য—

বল্কান দেশসমূহে রুশ-প্রভাব বিস্তারের আভাষ আমরা গত সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে দিয়াছি। সকলেই বিশেষ ভাবে আশা করিতেছেন যে, রুশরা বল্কান অঞ্চলেই প্রধান আক্রমণ করিবে। বুলগেরিয়া নিরপেক্ষ রহিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ১১ ডিভিসন বুলগার সৈন্য বল্কান ক্ষেত্রে জার্ম্মাণদের সাহায্য করিতেছিল। তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

রুমানিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ট্রান্‌সিলভেনিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য অস্ত্রধারণ করিলে রুশিয়া রুমানিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। রুমানিয়ার নূতন প্রধান মন্ত্রী সেনাটেস্কু বুখারেষ্ট অবরোধের অবস্থা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

রুম্যানিয়ার সহিত রুশ যুদ্ধ-বিরতির সন্ধির সর্ত্তগুলি এই—(১) জার্ম্মাণীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রুম্যানিয়ার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য রুশসৈন্যের সহিত একত্রে রুম্যানীয় সৈন্যকে জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, (২) রুশ ও অন্যান্য মিত্রশক্তির সৈন্যদিগকে রুম্যানিয়ায় অবাধে সৈন্যচালনের সাহায্য করিতে হইবে, (৩) সামরিক কারণে রুম্যানিয়ার ক্ষতি রুশিয়া পূরণ করিবে। (৪) রুম্যানিয়া রুশ ও মিত্রপক্ষীয় সকল বন্দীকে ফিরাইয়া দিবে। (৫) রুশিয়া ভিয়েনা চুক্তি বাতিলের প্রস্তাব স্বীকার করিবে ও ট্রান্‌সিলভেনিয়া পুনরুদ্ধারে রুম্যানিয়াকে সাহায্য করিবে, (৬) ১১৪০ খৃষ্টাব্দের চুক্তি অনুসারে রুশ-রুম্যানীয় সীমান্ত নির্দ্ধারণ হইবে। রুম্যানিয়ার নূতন জেনারল সেনাটেস্কু সরকার এই সর্ত্তগুলি গ্রহণ করিয়াছেন।

তুর্কি বেতার-কেন্দ্র হইতে প্রচার করা হইয়াছে যে, এলবেনিয়ার ডুরাজ্জো নামক স্থানে মিত্রপক্ষের সৈন্য অবতরণ করিয়াছে।

তুরস্কের মনোভাব পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। সে মিত্রপক্ষকে প্রত্যক্ষ কি সাহায্য করিতেছে জানা যায় নাই। তবে জার্ম্মাণরা বল্কান অঞ্চল ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। রুমানিয়ান ও বুলগেরিয়ান বন্দর এবং কনষ্টান্‌জা ও ভার্ণা তাহারা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ রক্ষা-গণ্ডীর মধ্যে সকল জার্ম্মাণকে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

পোল উত্থান ও রাশিয়া—

ফিনল্যাণ্ড, রুম্যানিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া জার্ম্মাণীর তাঁবেদারী ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেও পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে রুশরা না কি ভিন্ন মনোভাব অবলম্বন করিতেছে। বৃটিশ পত্র 'ইকোনমিষ্ট', 'ডেলি-মিরার' ও 'ট্রিবিউন' অভিযোগ করিয়াছেন যে, সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ ওয়ার্‌সতে পোল-উত্থানকে সাহায্য করিতেছেন না। অনেকে বলিতেছেন যে, ওয়ার্‌সয় পোল-উত্থান সোভিয়েট বিরোধীদলের কাজ। এই দল পোল প্রধান-মন্ত্রীর সহিত সোভিয়েট মিত্রতার কথাবার্ত্তা যেন পণ্ড করিতে চাহে। ইংলণ্ডের সাহায্য পাইলেও পোল অভ্যুত্থানকারীদের অস্ত্রাভাব অত্যন্ত।

ইটালীতে মন্দাযুদ্ধ—

ইটালীতে ফ্লোরেন্স ও এপিনাইনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জার্ম্মাণ সৈন্য প্রতিরোধ করিতেছে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, মার্শাল বাডোগলিওর পুত্রকে জার্ম্মাণরা রোমে গ্রেপ্তার করিয়া জার্ম্মাণ-অধিকৃত উত্তর-ইটালীর এক বন্দিশালায় চালান দিয়াছে। সম্প্রতি আবহাওয়া মন্দ থাকায় ইটালীয় রণাঙ্গনের যুদ্ধও অপেক্ষাকৃত মন্দা চলিতেছে।

ফ্রান্সের মুক্তি-যুদ্ধ

গত দুই বৎসর ধরিয়া ইংরেজ ও তাহার মিত্র আমেরিকা ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডি উপকূল, দক্ষিণ উপকূল এবং ইটালী আক্রমণের তোড়-জোড় করিতেছিল, জার্ম্মাণরা এ সকল স্থান সুরক্ষিত করিবার যথেষ্ট অবসর যে না পাইয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যাইতেছে, তাহারা কোন দিকে আক্রমণ অভিযানকে বাধা দিবার যথেষ্ট আয়োজন করিয়া উঠিতে পারে নাই।

উত্তর-ফ্রান্সে মিত্রসৈন্যগণ বহু দূর অগ্রসর হইয়া প্যারিস দখল করিয়াছে। মার্কিণের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি জেনারল আইজেন-হাওয়ার সদলবলে ও সমারোহে প্যারিতে প্রবেশ করিয়াছেন। ডি-গলও প্যারিতে পৌঁছিয়াছেন। সেখানে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়।

ভিসি সরকারের মন্ত্রিগণ (লাভাল, দাঁর্ল্যা ডাব্রিনোন) এবং মার্শাল পেঁতা ভিসি ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জার্ম্মাণ গোয়েন্দা পুলিস মসিয়ে লাভাল, মার্শাল পেঁতা, এডমিরাল ডিকো এবং জেনারল ব্রিডোকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখিয়াছে। দেশভক্ত ম্যাকুই দল ভিসি অধিকার করিয়াছে।

দক্ষিণ-ফ্রান্সে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যে, বহুসংখ্যক জার্ম্মাণসৈন্য কতকটা ফাঁদে পড়িয়াছে। যদি তাহারা ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করে তাহা হইলে তাহারা দলে দলে বন্দী হইতে পারে।

৩১শে শ্রাবণ মার্কিণ ও ডিগলদলীয় ফরাসী সৈন্যগণ দক্ষিণ-ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করে। ক্যানে ও ক্রাসে দখল করিয়া মার্কিণ সৈন্যরা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

ফরাসী তরুণদের প্রচেষ্টা

ফ্রান্সে এংলো-স্যাক্সন অভিযান সফল হইত না—যদি না দেশের অভ্যন্তর হইতে সুসংগঠিত দেশভক্তদল সাহায্য না করিত! এ দলের নাম ম্যাকুই, ইহার প্রধান সেনাপতি জেনারল কোয়েনিগ। ইংলিশ চ্যানেলের উপকূল হইতে ভূমধ্যসাগরের তট পর্য্যন্ত সমগ্র ফ্রান্সের প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ নিপুণ যোদ্ধা এই দলে অবিরাম চেষ্টা করিতেছে। দেশভক্তদলের সৈনিকরা অধিকাংশই কিশোর ও যুবক, কাহারও সামরিক পোষাক আছে, কাহারও নাই। ইঁহাদের আয়ুধ রাইফল, সাব মেসিন গান, জার্ম্মাণ মেশিন পিস্তল ও ছোরা। ইহারা রেলওয়ে লাইন কাটিয়া, সাইনপোষ্ট উল্টাইয়া, ভূতলস্থ প্যারি-বার্লিন টেলিফোন লাইন নষ্ট করিয়া চোরাগোপ্তা আক্রমণ করিয়া জার্ম্মাণদিগকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ইহাদের এক প্রিয় কৌশল হইল—রেলওয়ে এঞ্জিন অপহরণ করিয়া সৈন্ত ও অস্ত্রাদি বোঝাই ট্রেনের উপর উহা ছাড়িয়া দিয়া ট্রেন ধ্বংস করা। জেনারল কোয়েনিগের এই দেশভক্ত দলের সহিত জেনারল ডি গলের যোগাযোগ আছে।

মিত্রপক্ষের আক্রমণের আশঙ্কায় এবং ফরাসী দেশভক্তদিগের আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টাকে বাধা দিবার জন্ম জার্ম্মাণরা প্রসিদ্ধ ম্যাজিনো লাইনের কামানগুলির নালীক ফ্রান্সের দিকে উদ্যত করিবে বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন।

জাপান কিরূপ প্রস্তুত ?—

প্রাচ্যখণ্ডে জাপান যেন কুম্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাহারা মার্কিণ সৈন্তদিগকে এক প্রকার কোনই বাধা দিতেছে না। প্রচার করা হইয়াছে যে, ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরেও জাপানীরা নৌ-আক্রমণ করিতে ভীত হইতেছে। কিন্তু ১০ই ভাদ্র মাদ্রাজে গভর্ণরের সভাপতিত্বে এক জনসভায় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ভাইস্-এডমিরাল জে এইচ গর্ড্‌কে বলেন—এখনও ভারত মহাসাগরে সাবমেরিণ-উৎপাতের আশঙ্কা আছে। জার্ম্মাণ ও জাপ সাবমেরিণ প্রায়ই এ অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ায়। এ সাবমেরিণগুলির ঘাঁটী পেনাং বা ঐরূপ কোন বন্দরে। জাপানীদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ ইঙ্গ-মার্কিণ দল বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য নিউগিনিতে এবং অন্যান্য দুই চারিটি ক্ষুদ্র দ্বীপে অবাধ অবতরণ করিলেও জাপানকে জার্ম্মাণীর ন্যায় প্রচণ্ড আঘাত করিবার কোন চেষ্টা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। অবশ্য ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ জাপ-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে।

খোদ জাপ-দ্বীপপুঞ্জেও মাঝে মাঝে বিমান আক্রমণ হইয়াছে।

ফরমোজা প্রায় ৫০ বৎসর জাপানের অধিকারে। এই দ্বীপ আজ জাপানের বন্দিশালা। হংকং, মালয়, ফিলিপাইন প্রভৃতি অধিকৃত স্থান হইতে এংলো-স্যাক্সন দলের বন্দীদিগকে আনিয়া এখানে রাখা হইয়াছে (বর্ত্তমানে এখানে প্রায় ২৫০০ বন্দী আছে)। সম্প্রতি এই ফরমোজারও উপর বোমা-বর্ষণ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ফরমোজার উপর বোমা ফেলিয়া চীনকে জানান হইয়াছে যে, কায়রো বৈঠকে চীনকে যে মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, পেসকা ডোরস্ দ্বীপপুঞ্জ এবং ফরমোজা জাপানের নিকট হইতে কাড়িয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহা চীন বন্ধুদের মনে আছে।

১ই ভাদ্র এক সংবাদে জানান হয় যে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে জাপানীরা ইংরেজের যে সকল সমর-সরঞ্জাম ও রসাদি অধিকার করে তাহা ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাতেই না কি এ রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের রসদাদি সরবরাহের সমস্যার সমাধান হইয়াছে। উত্তর-ব্রহ্মের প্রায় ১০ হাজার বর্গ-মাইল স্থান পুনরধিকৃত হইয়াছে এবং প্রায় ২০ হাজার জাপ সৈন্ত নিহত হইয়াছে। গত ৩রা ভাদ্রের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, টিড্ডিম রোড অঞ্চলে মিত্রপক্ষ ভারত-সীমান্ত হইতে জাপানীদিগকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করিয়া ব্রহ্মদেশের এক মাইল স্থান দখল করিয়াছে। এবার প্রাচ্যখণ্ডে মিত্রপক্ষের নূতন কি রণ-পরিকল্পনা দেখা দিবে, তাহার প্রতীক্ষাই সকলে করিতেছে।

শ্রীতারানাথ রায়

কবির ব্যথা

আর কত কাল এমনি বন্ধু কাটিবে প্রহর গণি'
জীবন-যামিনী-অন্তে মিলে কি মালার মধ্যমণি ?
মরুর মাঝারে বহে ক্ষীণ ধারা, ফোটে কি গো রাঙা ফুল ?
কাক-জ্যোৎস্নায় বৃথা পিক গায়—এমনি মনের ভুল !
অতীতের কত মৌন বেদনা হারানো কত না দিন—
অশ্রু-হাসির মুক্তা ঝরায়ে হয়ে গেছে উদাসীন !
জীবনের দিবা, যৌবন-বিভা,—স্মৃতি সম ছায়াময়
এই ধরণীর স্বপন-পসরা অতি-বড় বিস্ময় !
ছায়া-গোধুলির সোনার রাগিণী, আধখানি চাঁদ বাঁকা
কিশোর-কালের মুগ্ধ-প্রণয় ঠেকে বড় ফাঁকা-ফাঁকা !
জীবনের দামে কিছুই মিলে না, শুধু রঙ, শুধু রূপ—
কুটিল আঁখির তীক্ষ্ণ শায়ক করে শুধু বিদ্রূপ !
কারে কি দিয়েছি, কিবা হারায়েছি, কত লাভ, ক্ষতি, ক্ষয়—
হায় গো বন্ধু, তারি তরে প্রাণে জাগে কত সংশয় !
যেন মনে হয়, কবে কে দিয়াছে এ মোর পরাণে দুখ—
তার করপুটে উজাড়িয়া দিই বনফুল যৌতুক !
দূরে দূরে থেকে ভালো নাহি লাগে, অভিমানে গেছে চলে
সুখ-চন্দ্রিকা অসময়ে মোর ঢলেছে অস্তাচলে !
প্রাণের পিপাসা মিটে নাই, শুধু মরণের আঁধিয়ার—
ব্যথার ভুবনে তারে লয়ে তবু দুরন্ত অভিসার !
বাল্য-প্রণয়ে কাঁটা শুধু বাজে, সুধা নাই, হলাহল !
বিদায়ের বেলা যবনালে নেহারি মুখে হাসি, চোখে জল !
ব্যথা নাই কোথা ? জীবন-সিন্ধু ব্যথার লহরে দোলে,
কাঁটা পেয়ে কেউ ফুল করে দান, কেউ ফুল নিয়ে ভোলে !
মুনিমনোলোভা ধরণীর শোভা যত দিতে পারে সুখ,—
তত অকরুণ বেদনার ভারে ভেঙ্গে দিয়ে যায় বুক !
ঊর্দ্ধ আকাশে নীলিমা-আড়ালে অন্ধ কে মালাকর
চিকণিয়া গাঁথে পরতে-পরতে নানা কুসুমের স্তর—
কত নব আশা, কিছু বা নিরাশা, অপরূপ ছায়া-ছবি—
সব-হারানোর ব্যথাটুকু বুকে আমার রয়েছে কবি !
শ্রান্ত পথিক চলি আর ভাবি, ভালো যেন বাসিতাম !
গানের খাতার শেষ পাতাটিতে লেখা কার মধু-নাম !
অনিপুণ হাতে ভুলে-ভরা লিপি—ঝাপসা ভুষোর কালি—
কাজল-আঁখির সজল মিনতি প্রাণের প্রদীপে জ্বালি !
ধ্যানের কেতন ওড়ে চিরকাল—জীবনের জ্বর-জ্বালা
জ্যোৎস্না বলিয়া ভুল করি গাঁথে অন্ধকারের মালা !

শেলী দত্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ

সিনেমা-শ্লাইড

বাঙ্গালা দেশে সিনেমা শ্লাইড শিল্প বেশী দিনের নয়। বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার ইহা একটি কার্য্যকরী প্রচেষ্টা। চিত্ত-বিনোদনের সহিত বিজ্ঞাপন সহজেই দর্শকের মনের উপর রেখাপাত করে। সরকারও সিনেমা শ্লাইডের দ্বারা প্রচারকার্য্য করিয়া থাকেন। কাগজ-নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে বিজ্ঞাপন প্রচার সঙ্কুচিত হইয়াছে। সম্প্রতি সরকার প্রেক্ষাগৃহে শ্লাইড প্রদর্শন সম্পূর্ণ বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন। এক কথায় প্রচারকার্য্য বন্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছেন। বিজ্ঞাপন আধুনিক যুগের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। ব্যবসা বাণিজ্য সাহিত্য প্রোপাগাণ্ডা সবেতেই বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন। এই আইনের ফলে সেগুলির তো ক্ষতি হইলই, সঙ্গে সঙ্গে একটি শিশু প্রতিষ্ঠানেরও মৃত্যু হইল। অনেকের অন্ন-সংস্থান বন্ধ হইল। বহু শিল্পী, ডিজাইনার ও লিপিকারের জীবিকা উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইল। প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের প্রচুর ক্ষতি হইল। এক হুকুমে শুধু নিয়ন্ত্রণ নহে, একেবারে ঐ নূতন শিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়া সরকার নিশ্চয়ই খুব বুদ্ধির পরিচয় দেন নাই!

সরকার বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার সঙ্কোচন করিতে চান। যুদ্ধের সময় হয়ত' ইহার প্রয়োজনীতা আছে। কিন্তু সিনেমা শ্লাইডে কতটুকু বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয় এবং ইহা বন্ধ করিয়া দিলে কতটুকুই বা সুবিধা হইবে? কলিকাতা ও হাওড়ায় মোট প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ৩৮টি। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি 'শো'তে চার পাঁচ মিনিট করিয়া শ্লাইড প্রদর্শন করা হইত। যুদ্ধের জন্য ইদানীং নয় দশ মিনিট করিয়া দেখান হয়। এই শ্লাইড বিজ্ঞাপনের মধ্যে সরকারী ও সামরিক বিজ্ঞাপনের পরিমাণ কম নহে।

সরকার কি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এক দিনে একটি ইংরেজী হোটেলে সান্ধ্য ভোজনে আলো এবং পাখাতে কতখানি পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয়িত হয়। তাহা যদি দেখিতেন তবে শ্লাইড বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার পূর্ব্বে সেই ব্যয় বন্ধ করাও নিশ্চয়ই প্রয়োজন মনে করিতেন। আমাদের বক্তব্য যে, যুদ্ধের জন্য সরকার যদি এই নূতন শিল্পটিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চান করুন, কিন্তু একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে।

প্রচার ও অপপ্রচার

যদিও ব্রহ্ম পুনরধিকৃত হয় নাই, তবুও সিমলায় বৃটিশের ব্রহ্ম সরকার আছে। এক জন 'ডিরেক্টর অব পাবলিক রিলেসন্স'ও আছেন এবং তাঁহার তাঁবে 'বর্ম্মা টু-ডে' নামক একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—"প্রচারকার্য্য পরিচালন করা বিশেষ প্রয়োজন—নহিলে অতীতে বহু বার যেমন আমাদের বিষয় লোককে না জানানোয় আমাদিগের ক্ষতি হইয়াছে—আবার তেমনই হইবে।" প্রচারকার্য্যের প্রয়োজন আছে বই কি! কিন্তু বৃটিশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা প্রচারকার্য্যের অভাবে নহে, প্রচারকার্য্যের দোষে, অপব্যবহারে। ব্রহ্মের এক জন বৃটিশ কমিশনার বলিয়াছিলেন—ব্রহ্মের মন্ত্রীরা অসাধু এবং কংগ্রেসীরা বিপ্লবী। ইহা প্রচার-কার্য্যের অভাব নহে, অপব্যবহার। ইহাতে ক্ষতিই হয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আজ জনসাধারণ জানিতে চায়—ব্রহ্ম পুনরধিকৃত হইলে বৃটেন সে দেশে কি ব্যবস্থা করিবে? উত্তর—নিরুত্তর! মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভাড়াটিয়া প্রচারকের সাহায্যে বৃটেন যে ধরণের প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন তাহাতে ভারতবাসীর মনে কি ভাবের উদ্ভব হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য!

সত্যমপ্রিয়ম্

মিষ্টার বার্ণার্ড শ' কাহারো খাতির না রাখিয়া অপ্রিয় সত্য কথা বলিবার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। সম্প্রতি জার্ম্মাণীর সাম্রাজ্য-লিপ্সা সম্বন্ধে 'সানডে পিক্টোরিয়ালের' এক জন প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—"বৃটিশ সাম্রাজ্যের মালিকরা যেরূপ সম্পূর্ণরূপে প্রভুত্বমদ-প্রমত্ত, পৃথিবীতে তদপেক্ষা অধিক প্রমত্ত কোনও দেশ নাই। এমন কি, সাম্রাজ্য শব্দের পরিবর্ত্তে যৌথরাজ্য শব্দটি উচ্চারণ করিতে মিষ্টার চার্চ্চিলের গলায় বাধে।" নাৎসী শাসন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—"নাৎসীদল এবং জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত মিত্রবর্গের নীতির মধ্যে আপনি যে পার্থক্যের কথা বলিতেছেন সেই পার্থক্যের অস্তিত্ব আদৌ নাই। আজকাল আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর ন্যাশনাল সোশালিষ্ট। অবৈধ কার্য্য? যুদ্ধে অবৈধ কিছুই নাই। যুদ্ধের মূলে যত বড় মহত্ব, স্বদেশপ্রেম, বীরত্ব এবং কল্যাণ কামনাই থাকুক না কেন, বস্তুতঃ যুদ্ধ এবং যুদ্ধকালীন কার্য্য দুর্ব্বৃত্ত-সুলভ কার্য্য, উহা সভ্যতার নামে সভ্যতার বিঘাতক।"

ভাগ্যে বিলাতে 'বৃটেন রক্ষা' আইন নাই, তাই মিষ্টার শ' বাঁচিয়া গেলেন। এ দেশের লোক ঐ কথা বলিলে কি আর রক্ষা ছিল! কিন্তু তাঁহার সত্য কথা শুনিবে কে? মিষ্টার চার্চ্চিল এণ্ড কোম্পানী তো কানে তুলা গুঁজিয়া আছেন। উড়ন্ত বোমার ভয়ে না সত্য কথা শুনিবার ভয়ে, তাহা অবশ্য সঠিক জানা নাই।

হুকুম বটে

শুনা যাইতেছে, বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি ১০ হাজার মণ আটা আটক করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাহা নষ্ট করিবার আবেদন করিয়াছেন। কারণ, সেই আটা মানুষের অখাদ্য। আরও কয়েক স্থানে এই শ্রেণীর আটা ও চাউল নষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট এই ব্যবস্থা বাতিল করিবার আদেশ দিয়াছেন। ফলে অখাদ্য খাদ্য হইয়া গেল! হুকুমের তারিফ করিতে হয়। তার পর যখন এই অখাদ্য খাইয়া মহামারীতে জন-সাধারণ আক্রান্ত হইবে তখন কি তিনি হুকুম দিয়া মহামারীকেও তাড়াইয়া দিতে পারিবেন? অবশ্য মহামারী হইতেছে না বলিলে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। মৃতপ্রায় বাঙ্গালা দেশকে এই ভাবে মরণের পথে ঠেলিয়া দিবার কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝা কঠিন। শুধু বহরমপুর কেন, কলিকাতায় যে চাউল খাদ্য হিসাবে বিক্রি করা হয় তাহাই কি মানুষের খাদ্যোপযোগী? বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য যে, আজ দুর্দ্দিনের সহিত দুর্ব্বুদ্ধিও মিশিয়া গিয়াছে। এই সংযোগের ফলে সন্দেহ হয়, পুনরায় সুদিন আসা পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জাতি কি টিকিয়া থাকিতে পারিবে।

গান্ধী-ওয়াভেল সমাচার

গান্ধী-ওয়াভেল পত্রাবলী সম্পর্কে 'লণ্ডন টাইমস' বলিতেছেন যে, 'ইহা দ্বারা অচল অবস্থা দূরীকরণে কোন সাহায্য হয় নাই। কারণ, গান্ধীজী এখনও কংগ্রেসী দলের বাহিরে জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষকে দেখিতে পাইতেছেন না। গান্ধীজীর প্রস্তাব একমাত্র কংগ্রেসের লাভের জন্য দর-কষাকষির নীতি মাত্র। কিন্তু ভারতবর্ষে যে অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও রহিয়া গিয়াছে, গান্ধীজী তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন।' কথাটি মন্দ নয়, তবে গান্ধীজীর অবস্থা শোচনীয়। সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। সে চেষ্টার ফলে দেশের লাভ-ক্ষতির কথা আলোচনা করিব না। কিন্তু তিনি যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভুলিয়া আছেন এ অপবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা! আর দর-কষাকষি তিনি করিতেছেন না, বৃটিশ সরকারের দ্বারা সৃষ্ট এবং পুষ্ট মিষ্টার জিন্নাই তাহা করিতেছেন। এই ধরণের উক্তির উদ্দেশ্য জনসাধারণের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা। ভারতবর্ষে আজ যে সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল এবং মনোমালিন্য, তাহার জন্য দায়ী বৃটিশ সরকার। Divide and Rule তাঁহাদের নীতি। তাঁহারা কি সহজে আপোষ রফা করিতে দিবেন? নিত্য নূতন ফ্যাকড়া বাহির করিয়া এক দলকে আর এক দলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকিবেন। তবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই! স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের নামে ধাপ্পাবাজী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান অস্ত্র। সে অস্ত্র প্রয়োগে তাঁহারা বিরত হইবেন কেন? তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবার জন্য যে কতখানি সচেষ্ট, তাহা কাহার না জানা আছে?

বিড়ম্বনা

ভারতবর্ষে খাদ্যাভাব সম্বন্ধে 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, বিদেশ হইতে যে পরিমাণ খাদ্য ভারতবর্ষে পাঠাইবার কথা ছিল, জাহাজের অভাবে না কি তাহা পাঠান যায় নাই। লেখক বলেন যে, মিষ্টার আমেরীর এই বাজে কৈফিয়তে ভারতবর্ষের লোক শান্ত হইবে না। কারণ, তাহারা জানে যে, ভারতবর্ষ হইতে যখনই বৃটেনে খাদ্য পাঠাইবার প্রয়োজন হইয়াছে তখনই জাহাজগুলিকে অন্যান্য কাজ ফেলিয়া ঐ কাজে লাগান হইয়াছে। সুতরাং বৃটেন হইতে ভারতে খাদ্য পাঠাইবার বেলায় 'জাহাজ পাওয়া যায় না'—এই কথা বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? লেখক ঠিকই বলিয়াছেন। ভারতবর্ষে কোন ব্যক্তিই এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট নন। কেহই এই মিথ্যা অজুহাত বিশ্বাস করেন না! কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়। আমরা পরাধীন জাতি—পরমুখাপেক্ষী দাস। প্রভুদের খাওয়া না হইলে আমাদের খাওয়া শোভা পায় না! উদ্বৃত্ত এবং বাতিল অংশ হইতে আমাদের খাওয়া-পরা চলে। আমাদের দ্বারা উৎপাদিত আমাদের দেশের খাদ্যশস্য আমরা খাইতে পাই না; ইহার অধিক বিড়ম্বনা জীবনে আর কি থাকিতে পারে?

মজার খবর

একটি মজার খবর শুনা যাইতেছে। বাঙ্গালা সরকারের খাদ্য-নিয়ামক বিভাগ কলিকাতার বে-সরকারী দোকানগুলিকে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য খাদ্য সরবরাহ করিয়া দশ বারো লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন, আর সরকারী দোকানগুলি চালাইয়া আট দশ লক্ষ টাকা লোকসান দিয়াছেন! এক যাত্রায় পৃথক্ ফল কি করিয়া সম্ভব হইল? এ যেন বিচিত্র এবং ঘনীভূত রহস্য! একমাত্র সরকারই এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন। জনসাধারণকে হিসাব দেখাইতে হয়! কিন্তু তাহা করিবেন কি? না ভারতরক্ষা আইনের অন্তরালে আত্মগোপন করিবেন? আরও একটি মজার ব্যাপার চোখে পড়িতেছে। পরিষদে সচিবদলের সমর্থকের সংখ্যা কমিতে দেখিয়া মিষ্টার কেসী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সে ভয় নাই; অতএব অধিবেশন এখনও দিব্য চলিতেছে। সরকারী কার্য্যে নীতির অভাব এবং খামখেয়ালী আদেশ-প্রাচুর্য্য বড়ই দৃষ্টিকটু। নিজের পাতে সকলেই ঝোল টানেন, কিন্তু একটু ভদ্রতা রক্ষা করিয়া সেই কার্য্য সমাধান করিলে অতটা দৃষ্টিকটু হয় না। এখানেও এক যাত্রায় পৃথক্ ফল!

নিছক বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছেন কি—ছোলায় মাংস অপেক্ষা বেশী প্রোটিন আছে? মাংসের পরিবর্ত্তে ছোলা খাইলে দেহের পুষ্টি অধিকতর হইবে। ছোলা ভিজা, ছোলা সিদ্ধ খাওয়া, ছোলার ডাল রাঁধা, ছোলা পিষিয়া ছাতু বেসম প্রস্তুত করা আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম, ঘি, মাখন চিনি, গুড় দিয়া ছোলার উৎকৃষ্ট পরমান্ন, হালুয়া ইত্যাদি তৈয়ারী করা যায়, তাহাও এক্ষণে জানিতে পারিলাম। কিন্তু জানিয়া লাভ হইল কি? ছোলা না হয় কোন মতে জোগাড় করা গেল, কিন্তু ঘি এবং চিনি মিলিবে কোথা? যদি এই দুইটি দ্রব্য সুলভ মূল্যে পাওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে এইরূপ বিজ্ঞাপন দিবার সার্থকতা কি? মানুষ যখন অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, অর্থাভাবে পিষ্ট, সেই সময় এইরূপ বিদ্রূপ সত্যই অশিষ্ট।

'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে'র প্রস্তাব

অবিলম্বে "অর্থাৎ সামরিক অবস্থা অবরুদ্ধ কংগ্রেস নেতৃবর্গকে মুক্তি-প্রদানের পক্ষে নিরাপদ হইবামাত্র"—ভারতীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সঙ্গত নহে কি না, তৎসম্পর্কে 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' এক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। ঐ পত্রে বলা হইয়াছে—"ক্রীপস প্রস্তাবে যুদ্ধ শেষ হইবার পরেই নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত করিবার এবং তাহার পর একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিবার ও কতকগুলি বিষয়ে বৃটেনের সহিত মীমাংসার কথাবার্ত্তা চালাইবার নিমিত্ত এই সকল ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক একটি গণ-পরিষদ গঠন করিবার ব্যবস্থা ছিল।

মিঃ গান্ধী ও বড়লাটের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান হইতে বুঝিতে পারা যায়, যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে—কোন 'জাতীয় সরকার' গঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যুদ্ধের অবসান নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া একটি গণ-পরিষদের কার্য্য চলিতে পারিত এবং যে সকল নেতা হিন্দু-মুসলমান-শিখ সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ তাঁহারা বৃটিশ সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতে ও শান্তি আলোচনায় (কারণ যথারীতি কোন শান্তি-সম্মিলন না হইতে পারে) ভারতের পক্ষে কথা বলিবার জন্য প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিতেন।

সর্ব্বোপরি যাহা প্রয়োজন তাহা এই যে, বিফলতাপূর্ণ এবং ক্ষমতা ও দায়িত্বহীন মনোভাব হইতে ভারতীয় রাজনীতিকদিগকে মুক্ত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের অগোচরে যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত ইতঃপূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে, কেবল তৎসম্পর্কে তাঁহাদিগের বক্তব্য বলিবার ও পরামর্শ দিবার জন্যই যে তাঁহারা আমন্ত্রিত হইতেছেন—এই সন্দেহ হইতেও তাঁহাদিগকে মুক্ত করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে বুঝিতে দিতে হইবে যে, ভারতের ভবিষ্যৎ গঠন করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাঁহাদিগের আছে। তাঁহাদিগকে এখন বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য করিতে হইবে।

আবার হাওড়া

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং বাঙ্গালা সরকারের অন্যতম সচিব বরদাপ্রসন্ন পাইনের বিরুদ্ধে আনীত কয়েকটি অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। কমিটির কার্য্য তাঁহাদের রিপোর্টেই প্রকাশিত হইবে। আমরা আশা করিয়াছিলাম, হাইকোর্টের রায়ের পর বাঙ্গালার গভর্ণর অন্ততঃ প্রধান-সচিব, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের সচিব এবং বরদাপ্রসন্ন এই তিন জনকেই পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দিবেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। এখনও ফেডারেল কোর্ট, প্রিভী কাউন্সিল বাকী আছে। সুতরাং এখনই ইহার শেষ হইয়াছে মনে করা অসঙ্গত হইবে। আরও কতকগুলি গুরুতর বিষয়ের তদন্তের প্রয়োজন রহিয়াছে। একটি রিকুইজিশন সভা অনুষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটি বাতিল করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল কি না এবং এক জন সচিবকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যেই উহা করা হইয়াছিল কি না এবং উক্ত সচিবের প্ররোচনায় বা অনুরোধে পড়িয়াই কর্ত্তৃপক্ষ উহা করিয়াছিলেন কি না, আমরা ইহারও তদন্তের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

উচিত বটে!

সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"যুদ্ধের পর বৃটেনের রপ্তানী-বাণিজ্য যুদ্ধের আগে যাহা ছিল তাহার সবটা এবং তদুপরি আরও অর্দ্ধেক যদি বৃটেন না পায়, তাহা হইলে সে যুদ্ধের আগেকার মত স্বচ্ছলতা বজায় রাখিতে পারিবে না, কাজেই বিশ্বের শান্তি স্তম্ভ-স্বরূপ থাকিতে পারিবে না। সুতরাং বিশ্বের শান্তি যাহাদের কাম্য তাহাদের বৃটেনের বৈষয়িক স্বচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।"

নিশ্চয়ই উচিত। স্তম্ভ মজবুত না হইলে শান্তিরূপী অট্টালিকা যে ধ্বসিয়া যাইবে? কিন্তু যে সাম্রাজ্যগুলি সেই স্তম্ভের বনিয়াদ সেগুলির প্রতি নেকনজর না দিলে স্তম্ভ দাঁড়াইবে কিরূপে? বৃটেনের রপ্তানী-বাণিজ্য দেড়গুণ করা প্রয়োজন, কিন্তু কিনিবে কে? শান্তি-বৈঠকে সকল কথারই আলোচনা হয়, শুধু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকলেই নিরুত্তর থাকেন কেন? বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষ মুকুটের মধ্য-মণির সমান। কিন্তু ক্রমাগত অযত্নের এবং অবহেলার ফলে মণি যে কাচ হইয়া পড়িতেছে, সে কথা কি তাঁহারা চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করেন না? বাঙ্গালার উপর দিয়া যে ঝড় বহিতেছে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কম্যুন্যাল ডিসিশনের ফলে দেশ যে মরিতে বসিয়াছে সে দিকে কেহই দৃক্‌পাত করিতেছেন না। সাম্রাজ্যবাদীদের মুখে বিশ্বশান্তির কথা শোভা পায় না। পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা দিয়া তবে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার পাণ্ডা বলিয়া ঘোষণা করিতে হয়। নচেৎ সমস্ত ব্যবস্থা নিছক ধাপ্পাবাজীর ঢক্কা-নিনাদ হইয়া দাঁড়ায়।

বিরাট দান

এটর্ণী শ্রীযুত সুশীলচন্দ্র সেন তাঁহার স্বগ্রাম গুপ্তিপাড়া গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার জন্য হুগলী জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ৬০ হাজার টাকার অধিক মূল্যের ইমারত ও যন্ত্রপাতি দান করিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গত পিতা সতীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নামানুসারে উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের নামকরণ হইবে। দাতব্য চিকিৎসালয়টি পরিচালনার জন্য ৪০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। হুগলী জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক চিকিৎসাগারটি পরিচালিত হইবে।

শ্রীযুত সুশীলচন্দ্র সেন

স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ

১০ই ভাদ্র গুঁড়ায় স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ (পূর্ব্বাশ্রমে ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ৬৩ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ১১০৪ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া পাটনা ও কটকের মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বিহার ও উড়িষ্যার সর্ব্বত্র তাঁহার চিকিৎসার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ১১১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া তিনি ডাক্তারী আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই অপূর্ব্ব যশের অধিকারী হন। দরিদ্র রোগীদের তিনি কেবল বিনা পারিশ্রমিকেই দেখিতেন না, উপরন্তু ঔষধ-পথ্যাদি পর্য্যন্ত যোগাইতেন। তিনি আহম্মদপুরে, বাঁকুড়ায়, গঙ্গাজলঘাটিতে ও পুরীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বেঙ্গল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ১১৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন।

গত বৎসরের দুর্ভিক্ষের সময় আহম্মদপুরের আশ্রমে তিনি চারি মাস যাবৎ প্রত্যহ দুই হাজার নিরন্নকে অন্ন দিতেন। তাঁহার অকাল তিরোভাবে আমরা মর্ম্মান্তিক বেদনানুভব করিতেছি।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শারদাগমনম্

(১)

মাতস্ত্বামাদিসর্গে মহিষবিমথিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ সহেন্দ্রা
বন্দিত্বা বিশ্ববন্দ্যে স্তুতিভিরবিরতং ত্রাণমাপুঃ পরাভিঃ।
শোদ্দণ্ডং দুর্গনাখ্যং যুধি নিহতবতী দেবকার্য্যার্থমীশে
দুর্গেতি জ্ঞায়সে ত্বং ত্রিভুবনজননি শ্রৌতমার্গেষু নিত্যম্ ॥

মা বিশ্বপূজ্যে! সত্যযুগে মহিষাসুর-মথিত ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ তোমাকে উত্তম স্তুতিদ্বারা অবিরত বন্দনা করিয়া বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। হে জগদীশ্বরি! তুমি যুগান্তরে দেবকার্য্য-সাধনের জন্য যুদ্ধে শোদ্দণ্ড দুর্গম নামক অসুরকে বধ করিয়াছিলে, হে ত্রিলোক-জননি! তাই তোমার দুর্গা নাম বেদমার্গে বিশ্রুত। ১

(২)

দুর্গে ত্বজ্জগতামতীব-মহতাং রক্ষাবিধৌ স্বেচ্ছয়া
কালানাং কলনে যুগাদিগণনৈঃ সত্যাদয়ঃ স্থাপিতাঃ।
ষট্ তেষামৃতবো বসন্তসহিতাস্তন্মধ্যবর্ত্তী শরৎ-
কালশ্চৈষ সমাগতস্তব কৃপানুপ্রেরণাপ্রেরিতঃ ॥

হে দুর্গে! তোমার অতিমহৎ অসীম জগতের সুশৃঙ্খলায় পালনের জন্য নিজের ইচ্ছায় যুগাদি গণনাদ্বারা সময়ের এক একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছ। সেই সময়-গণনার পর্য্যায়ে পর পর আপেক্ষিক স্থূলতর মন্বন্তর, যুগ, বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, দিন, দণ্ড প্রভৃতি হইতে কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্তাদি সূক্ষ্মতর সময় নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই-দুই মাসে এক এক ঋতু গণনা করিয়া বসন্তসহ শরৎ ঋতুর পরিমাপ করিয়াছ। মা! তুমি শরৎ-বসন্ত এই দুই ঋতুতেই ক্ষিতিতলে আগমন করিয়া থাক। তাই এই ঋতুদ্বয়ের এত সম্মান। মা! তোমার প্রেরণা পাইয়া আজ তোমার সেবার জন্য তোমার স্নেহের শরৎ সমাগত। ২

(৩)

রম্যশ্রীঃ কুসুমাকরঃ স ঋতুরাট্ প্রাজ্ঞৈরিতি প্রোচ্যতে
নাতাস্ত্যস্তু ততোঽধিকং হি শরদস্ত্বৎপাদপদ্মাশ্রয়াৎ।
মাতস্ত্বং কৃপয়া সমেষ্যসি শরৎ জ্ঞাত্বেতি ভক্ত্যাধুনা
শক্ত্যা বিম্বদলং সুনির্ম্মলজলং কহ্লার-শেফালিকে ॥

(৪)

কুন্দেন্দীবরপঙ্কজানি কুসুমানীত্থঞ্চ সূপায়নৈ-
র্বন্যৈশ্চাপি মনোহরৈঃ ফলভরৈঃ পত্রৈশ্চ পুষ্পৈস্তথা।
সম্ভারৈশ্চ সুসম্ভৃতঃ স নিয়তং ত্বৎপাদসেবাশয়া
ত্বামাপ্যায়য়িতুং বরঞ্চ বরিতুং সংবীক্ষতে ত্বৎপদম্ ॥

প্রাজ্ঞগণ বলেন—ঋতুরাজ বসন্তের কান্তি অতীব রমণীয়; কিন্তু আজ জগদম্বার পাদপদ্মাশ্রয়ে বসন্ত ঋতু অপেক্ষা শরতের সম্মান-গৌরব অধিক হইয়াছে। কারণ, তুমি কৃপা করিয়া পৃথিবীতে আসিতেছ—তোমার সাড়া পাইয়া শরৎ যথাশক্তি ভক্তি সহকারে বর্ষার পঙ্কিল জল নির্ম্মল ও বিম্বদল বিকাশ করিয়া তুলিয়াছে; কুমুদ, কহ্লার, শেফালিকা কুন্দ ও পদ্মাদি পুষ্প ফুটাইয়াছে; এবং গ্রাম্য আরণ্য মনোহর ফল, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি উত্তম উপায়ন সমূহের সংগ্রহ করিয়া তোমার পাদপদ্ম-সেবাশয়ে তোমাকে আপ্যায়িত করিয়া বর পাইবার জন্য তোমার আগমনে তোমার পাদপদ্মের দিকে তাকাইয়া আছে। ৩।৪

(৫)

অস্মাভির্জগদম্বিকে ত্বকৃতিভিস্ত্বৎপাদপদ্মার্চ্চনাং
বিঘ্নৌঘৈঃ প্রতিবিম্বিতৈ-রলমহো এবংবিধে সম্ভৃতে ।
সন্তানৈশ্চিরশান্ত-পূতপথগৈঃ কর্ত্তুং ন শক্তং মুদা
হা হন্তাতিবিভীষিকাময়রণে জাতান্মহাসাধ্বসাৎ ॥৫

অহো! শরৎ কর্ত্তৃক এইরূপ পূজা-সম্ভার সম্পন্ন হইলেও হে জগন্মাতঃ! তোমার অকৃতী সন্তান আমরা—চির-শান্ত চির-পবিত্র

পথে চালিত আমরা—বিভীষিকাময় বর্ত্তমান মহাসমররূপ মহাসঙ্কট-সমুত্থিত বিবিধ বিপদে পতিত আমরা অতিশয় প্রতিহত হইয়া সানন্দ হৃদয়ে তোমার পাদপদ্মের পূজা করিতে পারিতেছি না।৫

(৬)

'বোমা'খ্যবহ্ন্যস্ত্রবিঘাতশঙ্কয়া
দুর্ভিক্ষদাবানলদাহচিন্তয়া।
রোগস্য ভোগেন চ মৃত্যু-ভীতিত:
পূজা কথং স্যাদবিশুদ্ধচেতসা॥

(৭)

সুসন্ততিভীতিমুপেক্ষ্য শশ্বৎ
করোতি সেবাং বিধিবিদ্ জনন্যা:।
তদাশিষা তস্য তু সর্ব্ববাধা
দূরং প্রয়াতীতি ন সংশয়োঽত্র॥

(৮)

সম্ভৃত্য বস্তূনি শুচীনি শক্ত্যা
বিহায় শঙ্কামপি বিত্তশাঠ্যম্।
দত্ত্বা চ দুর্গাভয়পাদমূলে
প্রপূজ্যতাং সাতিবিশুদ্ধভক্ত্যা॥

(৯)

পূজামেবং সমাপ্যৈব প্রার্থ্যতাং ভক্তিভাবত:।
"ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥"

বোমা-নামক বিষম অনলতুল্য অস্ত্রের আঘাতভয়, দুর্ভিক্ষ দাবানলের দাহ-ভীতি, রোগভোগে প্রাণনাশের আশঙ্কা—এই সকল বিপদের মধ্যে চঞ্চল-চিত্ত ব্যক্তি কেমন করিয়া পূজা করিবে? যাঁহারা মায়ের সুসন্তান, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বাধা বিভীষিকায় উপেক্ষা করিয়া যথাবিধি জননীর পূজা করিয়া থাকেন; তাহাতে হয় এই যে—তাঁহার আশীর্ব্বাদে নিঃসংশয় সর্ব্ববিধ বাধা দূর হইয়া যায়। অতএব শঙ্কা ও বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূজার পবিত্র বস্তুজাত শক্তি অনুসারে সংগ্রহ করিয়া মা দুর্গার পাদমূলে অর্পণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পূজা কর। এইরূপে পূজা সমাপন করিয়া ভক্তিভরে মায়ের চরণে প্রার্থনা কর—মা! সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে পরিত্রাণ কর; তোমাকে নমস্কার।

শ্রীশ্রীরাম শাস্ত্রী

দেবী-দুর্গা

শরৎকালে, আশ্বিন মাসে, অম্বিকারূপে যাঁহার দশভুজা অসুর-বিনাশিনী মূর্ত্তি আমরা অর্চ্চনা করি, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, অনাদি ও অনন্ত, অক্ষয় ও অব্যয়, নিরাকার ও নির্ব্বিকার।

জীবাত্মা পরমাত্মা চ আত্মা তনু-বিবর্জ্জিতা॥

তিনি লোকমাতা, দেশমাতৃকা এবং জগন্মাতা। তিনি প্রসূতি, ধাত্রী ও বিধাত্রী। তিনি জননী, জন্মভূমি ও জগদ্ধাত্রী। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্রী। এই চরাচর বিশ্ব তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহাতেই স্থিত আছে এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে।

জন্ম ও মৃত্যু লইয়াই জীবন। "জলের বুদ্বুদ যেমন জলে হয় লয়" তদ্রূপ জন্ম হইতে মৃত্যু এবং মৃত্যু হইতে জন্ম।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

জীবের ধ্বংস নাই। দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে জীবাত্মা অন্য দেহে গমন করে। এই দেহান্তর-গমনই মৃত্যু। যুগ-প্রারম্ভে জীব-জন্তু এবং অন্যান্য সমস্ত পদার্থ স্ব স্ব আকার ও স্বভাব পরিগ্রহ করে। একবার প্রলয় এবং পুনর্ব্বার উৎপত্তি ও স্থিতি;—এইরূপে সংসার-চক্র নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণ্যমান হইতেছে। এই নিমিত্ত আদ্যাশক্তি মহামায়া সর্ব্ব-কালক্ষয়করী, সর্ব্বকাল-বিলাসিনী, সর্ব্বকালোদ্ভবপ্রীতা, সর্ব্বকালোদ্ভবাত্মিকা, সর্ব্বকালোদ্ভবোদ্ভাবা সর্ব্বকালোদ্ভবোদ্ভবা।

জন্মের জন্য প্রসূতি. পালনের জন্য ধাত্রী এবং মুক্তির জন্য মৃত্যুর প্রয়োজন। জন্মের সময় জননী, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জন্মভূমি এবং মৃত্যুর সময় মুক্তিদাত্রী। আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গার এই তিন রূপ। এই নিমিত্ত তিনি ত্রিগুণময়ী, এই হেতুই তিনি ত্রিনয়না। রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন এবং তমোগুণে নাশ। তিনি নাশ করেন না। আত্মার বিনাশ নাই। তিনি মৃত্যুর দ্বারা দুষ্কৃতি দুষ্প্রবৃত্তির নাশ করেন। কারণ, তিনি সকলের পক্ষেই সমান, তাঁহার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই। মৃত্যুর পথে তিনি মুক্তির সুযোগ দেন। তিনি সদানন্দময়ী, সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী।

জন্মহেতু বীজ, পালনজন্য শস্য এবং মুক্তির নিমিত্ত ধর্ম্ম প্রয়োজন। সেই আদ্যাশক্তি দুর্গাই সকলের বীজস্বরূপা! তিনি—

মহাবীজা বীজকরী সর্ব্ববীজস্বরূপিণী।
জগতী জগতাং মাতা জগন্মাতা জয়াবতী।

তিনি জনয়িত্রী,—জনক-জননীর জননী। তিনি ত্রিজগজ্জননী—

মাহেশ্বরীং মহামায়াং মাতরং সর্ব্বমাতরম্।

বীজ হইতে শস্য। তিনি যেমন বীজ, তেমনিই শস্য। তিনি—

শাকম্ভরী শস্যরূপা শান্তা শান্তা মনোরমা! তিনি শস্যপ্রসবিনী বসুমাতা—

ধনিষ্ঠা ধনদা ধন্যা বসুধা সুপ্রকাশিনী। তিনিই শরৎকালে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহাকে নমস্কার—

সম্পত্ত্যধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ মহাদেব্যৈ নমো নমঃ।
শস্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ শস্যায়ৈ চ নমো নমঃ॥

তিনি বিশ্বপ্রকৃতি।

নানা-ঋতুময়ী দেবী নানা ঋতুবিনির্ম্মিতা।

তিনি বাসন্তী। বসন্তে তাঁহার আবির্ভাব। নিদাঘে তাঁহার অভ্যুদয় পুষ্টি ও পরিণতি। প্রাবৃটে তাঁহার অভিষেক মাতৃরূপের বিকাশ, এবং শরতে তাঁহার মাতৃত্বের প্রকাশ—দিকে দিকে, পত্রে-পুষ্পে, শস্যে তাঁহার অভিব্যক্তি ও অভিব্যাপ্তি। এই নিমিত্ত আমরা শরৎকালে তাঁহার আবাহন ও অর্চ্চনা করি।

বর্ষার অবসানে শরতের আবির্ভাব। শরতে বঙ্গদেশের শোভার তুলনা নাই। এই সময় আকাশ নির্ম্মল হয়। কুয়াসা অথবা মেঘ থাকে না। কদাচিৎ নীল নভোবক্ষে যে দুই-এক-খণ্ড সাদা মেঘ ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তাহাতে আকাশের শোভা আরও বর্দ্ধিত হয়। দিবাভাগে সূর্য্যদেব উজ্জ্বল কিরণ দান করেন এবং নিশাকালে চন্দ্রমা নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় সমগ্র প্রকৃতিকে প্রফুল্লতা দান করেন। মাঠে মাঠে সবুজ ধানের ক্ষেত্র শোভা বিস্তার করে। স্থানে স্থানে পদ্ম, যূঁই, শেফালী, কামিনী, গোলাপ, অপরাজিতা প্রভৃতি কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে দশ দিক্ আমোদিত করে। কাশ-ক্ষেত্রে শুভ্র কাশ ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া নয়ন মন মুগ্ধ করে। প্রভাতে শিশির-বিন্দু বিভূষিত শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর নবোদিত সূর্য্যের কিরণ সম্পাতে এক অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ হয়। গ্রীষ্ম-বর্ষার অবসানে, হেমন্তের আগমনে প্রকৃতির নাতিশীতোষ্ণতা মানবমনে পুলক সঞ্চার করে। এই নিমিত্ত শরৎ ঋতুই আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব—দুর্গোৎসবের পক্ষে রমণীয় সময়। এই সময়ে আমরা দেবীকে দেশমাতৃকার ধনধান্য-প্রদায়িনী মূর্ত্তিতে অধিকতর অনুভব উপভোগ ও উপলব্ধি করি। তখন সেই বিশ্বপ্রকৃতি—বিশ্বপ্রসূতি—বিশ্ববিভূতি যথার্থই—

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

তিনিই জননী জন্মভূমি—

জন্মভূমিঃ সুজন্মা চ জন্মদ্বারবিনাশিনী।

তিনিই—

জনয়িত্রী জগন্মাতা জন্মভূমিকৃতালয়া।

তিনিই—

লোকমাতা লোকধাত্রী লোকানুগ্রহকারিণী।
বিশ্বম্ভরী বিশ্বমাতা ব্রহ্মাণ্ডপ্রতিপালিনী॥

জননী, জন্মভূমি এবং এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই অবস্থিত।

তিনি—

স্থিতিরূপা স্থিরা শান্তা স্থিতিসংসারপালিনী।

তিনি সৃষ্টিস্থিতিবিধায়িনী—

জগদ্ধাত্রী জগৎকর্ত্রী জগদ্বীজ-স্বরূপিণী।
জগদ্ধিতা জগৎ-পূজ্যা জগদাধাররূপিণী॥
জয়ঙ্করী জগন্মাতা জয়দা জয়কারিণী।
জয়প্রদা জয়া লক্ষ্মীর্জননী লোকপালিনী॥

পালন করিতে হইলে, যেমন শস্য প্রয়োজন; রোগ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত তেমনই ঔষধ প্রয়োজন। এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বারোগ্যপ্রদায়িনী।—

ঔষধী বৈদ্যমাতা চ চিকিৎসা চ চিকিৎসকা।

কেবল আহার্য্য-প্রদানে আরোগ্য বিধানে সন্তান প্রতিপালিত হয় না। দুর্ব্বল হইলে,—তাহাকে সবল হইতে—শত্রু হইতে রক্ষা করিতে হয়। এই নিমিত্ত, দুর্গা দশভুজা; দশ হস্তে দশ প্রহরণ ধারণ করিয়া দশ দিক্ রক্ষা করিতেছেন। তাই তিনি সিংহবাহিনী, অসুরবিনাশিনী। তিনি সর্ব্বশত্রুপ্রশমনী। কখন অষ্টভুজা, কখন দশভুজা, কখন অষ্টাদশভুজা এবং কখনও বা সহস্রভুজা হইয়া, যুগে যুগে, আমাদের শত্রু সংহার করিতেছেন। তিনিই মধুকৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্য বিনাশ করিয়াছিলেন—

হরিকর্ণ-মলোদ্ভূতং মহাবীর্য্যং মদোদ্ধতম্।
উভয়াসুর-সংহন্ত্রী হরিণা পরমেশ্বরী।
জঘান মহিষং সংখ্যে নিশুম্ভ-শুম্ভনাশিনী।
বিন্দুম্ভবৈর্দ্ধ্যদশাভিস্তথাক্ষৌহিণীভিঃ শুভে॥
জঘান দিতিজং সংখ্যে শতসংস্থিতকোটিভিঃ।

এই বৈরিবিমর্দ্দিনী দেবীই আবার সংসার-বন্ধন-বিমোচন হেতুভূতা—

ধাত্রীং সমস্তজগতাং ভবিতাপহন্ত্রীম্।

মুক্তির নিমিত্ত—তিনিই ধর্ম্মের বিধান করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মদা, ধর্ম্মাধাক্ষা—ধর্ম্মাধিকারিণী দেবী ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশারদা। যেমন সকলে স্বাস্থ্য সম্পদে সবল হয় না; তেমনি সকলেই ধর্ম্ম সম্পদে প্রবল হয় না। কেহ কেহ অধর্ম্মের পিচ্ছিল পথে পদার্পণ করিয়া পাপাচারী হয় কিন্তু, মা—

পতিতোদ্ধারিণী পুণ্যা প্রবীণা ধর্ম্মপাবনী।
পুণ্যালয়া পুণ্যদেহা পুণ্যশ্লোকা চ পাবনী॥

তিনি জ্ঞানদায়িনী—

সিদ্ধিদা বুদ্ধিদা বুদ্ধিঃ সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বদায়িনী।

তিনি ভক্ত-ভক্তি-প্রিয়া, ভক্তমঙ্গলদায়িনী। তিনিই—

পরাশক্তিঃ পরাভক্তিঃ পরমানন্দদায়িনী।
চৈতন্যরূপিণী দেবী চিত্তচৈতন্যদায়িনী॥
পরমাত্মস্বরূপা চ চিদানন্দস্বরূপিণী।
সদানন্দময়ী নিত্যা সর্ব্বানন্দস্বরূপিণী॥

সেই ধনধান্যপ্রদায়িনী, সর্ব্বশোকবিনাশিনী, সর্ব্বভয়হারিণী, সর্ব্বদা জয়দায়িনী, মহামোক্ষপ্রদায়িনী, সর্ব্ব-তত্ত্বে বৎসলা, সর্ব্বতত্ত্বে সংস্থিতা, ঋদ্ধিদা, বুদ্ধিদা, শক্তিদা মুক্তিদা, লোকমাতা, দেশমাতা এবং জগন্মাতাকে কোটি কোটি প্রণাম। তিনি আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং গৌরীং সর্ব্বার্থসাধিনীম্।
প্রণমামি মহামায়াং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্॥

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামুনি ভরত-কৃত

নাট্যশাস্ত্র

প্রথম অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

• ৪

অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রয়োগে পরিতোষিত হইয়া—। ৫৮ ।

আমার পুত্রগণকে সকল উপকরণ প্রদান করিয়াছিলেন।

৫৮। অভিনব বলিয়াছেন—কাহারও কাহারও সিদ্ধান্ত এই যে, প্রভুর পরিতোষের উদ্দেশ্যে কখনও কখনও নাট্যে প্রভু-চরিতের বর্ণনা করিতে হয়—ইহাই—'যে ভাবে দৈত্যগণ সুরগণ-কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল'—নাট্যশাস্ত্রের এই উক্তি হইতে সূচিত হইয়াছে। কিন্তু অভিনব এ মতের পরিপোষক নহেন। কারণ, ঐ সিদ্ধান্ত দশরূপকের লক্ষণ ও প্রয়োগের বিরোধী। দশরূপকের লক্ষণ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে মহর্ষি ভরত দেখাইবেন (কাশী সং, বিংশ অধ্যায়) যে দশবিধ রূপকের কয়েক প্রকার রূপক প্রসিদ্ধ চরিত অবলম্বনে রচিত হওয়ার প্রয়োজন, আর অবশিষ্ট কয় প্রকার রূপক কবি-কল্পিত চরিত অবলম্বনে রচিত হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। বর্ত্তমান চরিত অবলম্বনে রচিত রূপক হৃদয়গ্রাহী হয় না—রূপকে বর্ত্তমান-চরিতের অনুকরণও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, নাট্য-প্রয়োগ-দর্শনে যে দর্শকবৃন্দ নাট্য-বর্ণিত চরিত-সমূহ হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তাঁহারা বর্ত্তমান-চরিতগুলির প্রতি রাগ-দ্বেষ-ঔদাসীন্য-বশতঃ সেই সকল চরিত্রকে আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রাচীন যুগের কোন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিতকে আমরা যত অনায়াসে অতি উচ্চ আদর্শ অথবা অতি নিন্দিত আদর্শ বলিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারি, বর্ত্তমানের কোন অকল্পিত চরিতের প্রতি (তা সে চরিত যতই মহান্ ও উচ্চ অথবা নিকৃষ্ট হউক না কেন) আমাদের সেরূপ মনোভাব আসে না। কেন না, বর্ত্তমান-চরিতগুলি আমাদিগের চাক্ষুষ পরিদৃষ্ট—আমাদিগেরই সমকালবর্ত্তী। আমাদিগের অপেক্ষা যে এই সকল সমকাল-বর্ত্তী চরিতের কোনরূপ বৈশিষ্ট্য আছে—ইহা স্বীকার করিতে আমাদিগের আত্মাভিমানে যেন আঘাত লাগে। এই কারণে বর্ত্তমানের চরিতগুলির গুণ-দোষাদি সকল বৈশিষ্ট্যের যথাযথ মূল্য প্রদানে বিরত থাকিয়া আমরা সাধারণতঃ এগুলিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দর্শন করি। ইহাই হইল বর্ত্তমান-চরিতের প্রতি ঔদাসীন্য। ইহা ত গেল এক কথা। অপর কথা—প্রত্যেক বর্ত্তমান-চরিত অনেক সময় আমাদিগের মনোভাবের অনুকূল বা প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় তিনি প্রসিদ্ধ-চরিত হইলে আমাদিগের কেহ কেহ তাঁহার অনুগামী অন্ধ স্তাবক ভক্ত হইয়া পড়ি, আবার কেহ কেহ বা তাঁহার বিরোধিতাও করি। তিনি আমাদিগের সমকালবর্ত্তী বলিয়া তাঁহার চরিত্রের অপক্ষপাত যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করি না বা করিতেও চাহি না। কেবল তাঁহার মতের সহিত আমাদিগের মতের মিল হইলে তাঁহার অনুগামী ও অন্যথায় তাঁহার বিপক্ষ-পক্ষভুক্ত হইয়া থাকি। এইরূপ অযথা অন্ধ অনুরাগ বা অন্ধ বিদ্বেষ—এই দুইটিই বর্ত্তমান-চরিতের যথাযথ বিশ্লেষণের অন্তরায় বলিয়া গণ্য হয়।

এই কারণেই অভিনব বলিয়াছেন—দর্শকগণ বর্ত্তমান-চরিতের প্রতি অযথা অনুরাগ বিদ্বেষ বা ঔদাসীন্য-বশতঃ বর্ত্তমান-চরিতের প্রতি তন্ময়তা লাভে সমর্থ হন না। ফলে বর্ত্তমান-চরিতের নাট্যে প্রয়োগে ব্যুৎপত্তি বা রসসৃষ্টি হওয়ার বাধা জন্মিয়া থাকে।

আর একটি কথা। বর্ত্তমান-চরিতে ধর্ম্মাদি কর্ম্ম ও তৎফলের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হয় ; অতএব নাট্যপ্রয়োগ-দ্বারা কৃত কর্ম্ম ও ফলের সম্বন্ধ প্রদর্শন করার আর কোন সার্থকতাই থাকে না।

ভবিষ্যৎ-চরিতে কর্ম্ম ও ফলের সম্বন্ধ যে দৃষ্ট হইবে—তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব ; অতএব ভবিষ্যৎ-চরিতের নাট্যে প্রয়োগ-দ্বারা কর্ম্ম ও ফলের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষবৎ প্রদর্শন করার কিছু সার্থকতা আছে—কিন্তু উহা অনিশ্চিত বলিয়া অধিক সার্থকতা নাই। পক্ষান্তরে, অতীত-চরিতে কর্ম্ম ও ফলের সম্বন্ধ নিশ্চিতরূপেই দৃষ্ট হইয়াছে—সে বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই! অথচ, বর্ত্তমানে উহা দৃষ্টির অগোচরে বিদ্যমান। এই হেতু নাট্য-প্রয়োগ-দ্বারা অতীত-চরিতকে বর্ত্তমানবৎ প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করার পূর্ণ সার্থকতা আছে।

বর্ত্তমান-চরিত প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ; এ কারণ, উহার নাট্যে প্রয়োগ পুনরুক্তি-দোষদুষ্ট—নিরর্থক। অতীত-চরিত সেরূপ নহে—কারণ, উহা প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় না—অতএব, নাট্যে উহার প্রয়োগে পুনরুক্তি হয় না—বরং পরোক্ষকে প্রত্যক্ষ রূপ দান করা হয়। আবার ভবিষ্যৎ-চরিত যেরূপ অনিশ্চিত—তাহাতে তাহার যথাযথ রূপের প্রত্যক্ষ হওয়া সম্বন্ধে প্রমাণাভাব। অতএব ভবিষ্যৎ-চরিতের নাট্যে প্রয়োগ-দ্বারা বর্ত্তমানবৎ প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করা সকল সংশয়-সীমাকে অতিক্রম করিতে পারে না। এই দুইটি কারণে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ চরিত অপেক্ষা অতীত-চরিতই নাট্যে প্রয়োগের সমধিক উপযোগী—ইহাই অভিনবের সিদ্ধান্ত (অঃ ভাঃ পৃঃ ২৬-২৭)

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—দেবগণের সমক্ষে বর্ণনযোগ্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অতীত-চরিত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? দেবগণ ত অমর—অতীত পরোক্ষ ইতিহাস বলিয়া ত তাঁহাদিগের কিছুই নাই—অতীত কাল হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত তাঁহারা সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অতএব, কোন ঘটনাই তাঁহাদিগের নিকট অতীত পরোক্ষ ইতিহাস নহে—সবই বর্ত্তমান ; এই কারণে অভিনব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—বর্ত্তমানে দেবগণের সমক্ষে পরোক্ষ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিতের বর্ণনা অসম্ভব বলিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কল্প-মন্বন্তরের দেবাসুরাদি-চরিত-কীর্ত্তন মহর্ষি ভরত উপজীব্য বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রদৃষ্টিতে সংসার অনাদি—সৃষ্টি ও প্রলয় ধারাবাহিক ক্রমে একের পর এক চলিয়াই আসিতেছে। এক মন্বন্তরের পর অপর মন্বন্তর। এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে হয় এক কল্প। এক কল্প ব্রহ্মার এক দিন। এক কল্পের পর আসে আর এক কল্প। তন্মধ্যে এক কল্পে সৃষ্টি, পর কল্পে প্রলয়, আবার সৃষ্টি-কল্প, আবার প্রলয়-কল্প—এই ভাবে চিরন্তন অনাদি-প্রবাহ-ক্রমে সংসারে সৃষ্টি-লয়ের খেলা চলিতেছে। সৃষ্টিকল্পে দেবগণের উৎপত্তি—প্রলয়কল্পে দেবগণেরও বিলয় ঘটিয়া থাকে। আবার প্রলয়ের পরবর্ত্তী সৃষ্টিকল্পে দেবগণের পুনরুৎপত্তি হয়। শ্রুতি এই কথাই বলিয়াছেন—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা-পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—ইত্যাদি।

অতএব, বর্ত্তমান কল্পের দেবগণ—কল্পকাল-মধ্যে (কেহ বা

প্রীত হইয়া ইন্দ্র প্রথমে স্বীয় শুভধ্বজ প্রদান করিয়াছিলেন ।৫৯।

ব্রহ্মা (দিয়াছিলেন) কুটিলক, আর বরুণ শুভ ভৃঙ্গার। সূর্য্য ছত্র, শিব সিদ্ধি, ও বায়ু ব্যজন। ৬০।

বিষ্ণু সিংহাসন, আর কুবের মুকুট। (প্রেক্ষাযোগ্য বিষয়ের শ্রাব্যতা দান করিয়াছিলেন দেবী সরস্বতী)।

অবশিষ্ট যে সকল দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগ—।৬১।

সেই সকল স্বর্লোকবাসিগণ প্রহৃষ্ট হইয়া সেই সভামধ্যে অভিপ্রেত, নানা জাতি-গুণাশ্রিত অংশানুরূপ ভাষণ, ভাব, রস, রূপ, ক্রিয়া ও বল আমার পুত্রগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৬২।

মন্বন্তরমধ্যে) অমর—এই কল্পের (বা এই মন্বন্তরের) অন্তর্গত কোন ঘটনাই তাঁহাদিগের পরোক্ষ না হইতে পারে, কিন্তু এই কল্পের পূর্ব্বে সুদূর অতীতে যে প্রলয়কল্প ও তাহারও পূর্ব্বে যে সৃষ্টিকল্প বর্ত্তমান ছিল, কিংবা তাহারও পূর্ব্বে, তাহারও পূর্ব্বে, তাহারও পূর্ব্বে যে যে সৃষ্টিকল্প ছিল (কারণ প্রবাহ-রূপে ত সৃষ্টিকল্প অসংখ্য—অনাদি) —সেই সকল অতীত কল্প বা মন্বন্তরের ঘটনা ত বর্ত্তমান কল্প বা মন্বন্তরের দেবগণেরও নিকট অতীত ইতিহাস-রূপে গণ্য হইতে পারে।

এই সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত, তদ্বিষয়ে আর একটি প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে। শ্রুতি বা তদনুগামিনী স্মৃতিতে যে দেবাসুরাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা সম্ভব হয় কিরূপে? কারণ, শ্রুতিও নিত্য—সৃষ্টি-কল্পের আদিতে অভিব্যক্ত হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকেন। প্রলয়কল্পে শ্রুতি অব্যক্তভাবে অবস্থান করেন। পুনরায় সৃষ্টিকল্পে উহার আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু কল্পাদিতে অভিব্যক্ত শ্রুতি কল্পমধ্যে উৎপন্ন দেবাদির উল্লেখ করেন কিরূপে? যাহা পূর্ব্বকালীন তাহা পরবর্ত্তী কালে উৎপন্ন পদার্থের অভিধায়ক হইতে পারে না। এ কারণে শ্রুতি (ও তদনুবাদিনী) স্মৃতির পক্ষে দেবাসুরাদির উল্লেখ করা অসম্ভব। ইহার সমাধান এই যে—শ্রুতি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কল্পের দেবাসুর-গণের উল্লেখ করিয়া থাকেন। ঐ সকল পুরাকল্পীয় চরিত বর্ত্তমান কল্পের চরিতাবলীর ঠিক অনুরূপ। তাই পূর্ব্ব ও পরকল্পের ঘটনা-বলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শ্রুতিতেও অতীত ও ভবিষ্যতের উল্লেখ সম্ভব হইয়া থাকে।

ঠিক এই ভাবে পূর্ব্বকল্পের দেবাসুরাদির চরিত বর্ত্তমান কল্পের দেবাসুরাদির নিকট অতীত প্রসিদ্ধ ইতিহাস বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে (অ: ভা:, পৃ: ২৭)

এই কারণে মহর্ষি ভরত পূর্ব্বকল্পের দেবাসুরাদি-চরিত প্রসিদ্ধ অতীত ইতিহাস-রূপে গ্রহণ করিয়া তন্মূলক নাট্য-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু অতীত কল্পের দেবাসুরাদি-চরিত বর্ত্তমান কল্পের দেবাসুর-চরিতের ঠিক অনুরূপ বলিয়া বর্ত্তমান কল্পের অসুরবৃন্দ বুঝিতে পারেন নাই যে, উহা অতীত কল্পের সজাতীয় অসুরগণের পরাজয়ের ইতিবৃত্ত। অতীত কল্পে স্ব-সজাতীয় অসুরগণের যে পরাজয় ঘটিয়াছিল, বর্ত্তমান কল্পের অসুরগণ সেই পরাজয়কে আপনা-দিগেরই পরাজয় বলিয়া ভ্রম করার ফলে অযথা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কারণ, বস্তুত:, উহা বর্ত্তমান কল্পের অসুরগণের পরাজয়ের ইতিবৃত্ত নহে—অতএব বর্ত্তমান কল্পের অসুরগণের উহাতে ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন কারণ ছিল না—তথাপি পুরাকল্পীয় অসুরগণের সহিত আপনাদিগের সাদৃশ্যবশত: ভ্রম-প্রতারিত অসুরবৃন্দ পুরাকল্পীয় অসুর-পরাজয়কে বর্ত্তমানকল্পীয় অসুর-পরাজয়ের আখ্যান মনে করিয়া ক্রোধ-বিহ্বল হইয়া উঠিয়া নাট্য-বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—ইহা পরে বলা হইবে (অ: ভা:, পৃ: ২৭)

দেবগণ কিন্তু এইরূপ ভ্রমে পতিত হন নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, দেবগণও অসুরগণের মত ভ্রমান্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নাট্যে তাঁহাদিগের বিজয়-গৌরব প্রদর্শিত হওয়ায় তাঁহারা কোপের পরিবর্ত্তে হর্ষই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার উত্তর এই যে—পুরাকল্পীয় দেবগণের বিজয়ের প্রয়োগ-দর্শনে বর্ত্তমান কল্পীয় দেবগণের হৃষ্ট হইবার কারণ ছিল না। কারণ, পুরাকল্পীয় দেবগণ ও বর্ত্তমানকল্পীয় দেববৃন্দ সজাতীয় ও সদৃশ হইলেও অভিন্ন ত ছিলেন না। অতএব সজাতীয়-গৌরবে যতটুকু আনন্দ হওয়া সম্ভব, ততটুকু আনন্দমাত্র তাঁহাদিগের হইতে পারে। কিন্তু সজাতীয় গৌরবকে স্বীয়-গৌরব বলিয়া ভ্রম করিয়া অযথা আনন্দ দেবগণ উপভোগ করেন নাই। তবে তাঁহারা আনন্দ-বিহ্বল হইয়া দান আরম্ভ করিলেন কেন?

ইহার উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন—তাঁহারা যে স্বীয় চরিতের বর্ণনা হইতেছে ভাবিয়া আনন্দে দান করিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু প্রয়োগের নৈপুণ্য-দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া দান করিয়াছিলেন। তাই মূলে উক্ত হইয়াছে—"দেবাঃ প্রয়োগপরিতোষিতাঃ" (অ: ভা:, পৃ: ২৭)

প্রদহৃষ্টমনসঃ (কাশী পাঠ); মৎসুতেভ্যস্ত (বরোদা)

৫৯। ধ্বজ—ইহাই শক্রধ্বজ বা ইন্দ্রধ্বজ। বিঘ্ন-শান্তির উদ্দেশ্যে পূজার্থ ইহার উপযোগ ভবিষ্যতে হইবে—ইহাই সূচিত হইয়াছে (শ্লোক ৬৮-৭৫)।

৬০। কুটিলক—সর্পাকৃতি বক্রদণ্ড—উহা ব্রহ্মার আয়ুধ। দণ্ড-জাতীয় বলিয়া উহা অতি ভীষণ আঘাত-দায়ক। উহা বিদূষকের উপযোগী।

ভৃঙ্গার—গাড়ু। পারিপার্শ্বিকের (সূত্রধারের সহকারীর) উপযোগী। ছত্র—এস্থলে চন্দ্রাতপ (বিতান), চাঁদোয়া। মেঘগুলি সূর্য্যতাপে উত্থিত বলিয়া—মেঘাকৃতি ছত্র। সিদ্ধি—সিদ্ধি দ্বিবিধ—মানুষী (মানবের প্রযত্নসাধ্য) ও দৈবী (দেবপ্রসাদ-জনিতা) তবে উভয় সিদ্ধিই দৈবায়ত্ত। সিদ্ধির কথা মধ্যস্থলে বলা হইল—দৈবী সিদ্ধি যে সর্ব্বব্যাপিনী—উহা যে আদিতে মধ্যে ও অন্তে বিদ্যমান—ইহা বুঝাইবার—উদ্দেশ্যে।

ব্যজন—ঘর্ম্মাপনোদনের উপযোগী।

৬১। সিংহাসন, মুকুট—রাজার ভূমিকার উপযোগী।

প্রেক্ষণীয় বিষয়ের শ্রাব্যতা দান করিয়াছিলেন দেবী সরস্বতী—"শ্রাব্যত্বং প্রেক্ষণীয়স্য দদৌ দেবী সরস্বতী" (মূল)—এই অংশটি সকল পুস্তকে দৃষ্ট হয় না। ইহার অর্থ, নাট্য-প্রয়োগ যাহাতে সকলেরই কর্ণগোচর হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বাগ্‌দেবী। পাশ্চাত্ত্য পরিভাষায়—তিনি acousticsএর শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগগণ—সকলেই নহেন—কেবল যাঁহারা নাট্যের তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারাই (অ: ভা:, পৃ: ২৭)।

৬২। সভামধ্যে—সদসি (মূল); মহেন্দ্র-বিজয়োৎসব উপলক্ষে সম্মিলিত দেবগণের সভায়। অভিপ্রেতান্ (মূল)—অতিপ্রীতাঃ (পাঠান্তর)। অভিপ্রেত—অভীষ্ট, মনোমত। নানাজাতি-গুণাশ্রয়ান্ (মূল)—ইহা 'ভাষিতান্', 'ভাবান্' ও 'রসান্'—ইহাদিগের বিশেষণ।

এইরূপে দৈত্য-দানব নাশাত্মক (নাট্য-) প্রয়োগ প্রারব্ধ হইলে পর—। ৬৩ ।

যে সকল দৈত্য তথায় সমাগত হইয়াছিল, (তাঁহারা) সকলেই ক্ষুভিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা বিরূপাক্ষ-প্রমুখ বিঘ্নগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ৬৪ ।

'এই প্রকার এই নাট্য আমরা ইচ্ছা করি না,—ইহা নিশ্চিত স্থির করুন (অথবা, সকলে চলিয়া আসুন)'। তখন সেই অসুরগণের সহিত বিঘ্নগণ মায়া আশ্রয় করিয়া—। ৬৫ ।

নৃত্যকারিগণের বাক্, চেষ্টা ও স্মৃতি পর্য্যন্ত স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। দেবরাজ সূত্রধারের এইরূপে বিধ্বংসন দেখিয়া—।৬৬।

—'কি হেতু এই প্রয়োগের বৈষম্য (উৎপন্ন হইল)' ?—

এই বলিয়া ধ্যানে নিবিষ্ট হইলেন। অনন্তর (তিনি) সভাস্থল চারিদিকে বিঘ্নসমূহ-দ্বারা পরিবৃত দেখিতে পাইয়াছিলেন।৬৭। অপরের সহিত সূত্রধারকে নষ্টসংজ্ঞ ও জড়ীকৃত (দেখিলেন)—

সর্ব্বরত্নোজ্জ্বলতনু, কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্তলোচন সেই দেবরাজ শক্র সত্বর উত্থান-পূর্ব্বক উত্তম ধ্বজটি গ্রহণ করিয়া রঙ্গপীঠ-গত সেই বিঘ্ন ও অসুরগণকে জর্জ্জরদ্বারা জর্জ্জরীকৃত-দেহ করিয়াছিলেন।৬৮-৭০।

দানবগণ সহ সকল বিঘ্ন নিহত হইলে পর—।৭০।

সকল স্বর্গবাসী (দেবতা) সম্যগ্‌রূপে প্রহৃষ্ট হইয়া বাক্য বলিয়াছিলেন—'অহো ! তুমি এই দিব্য প্রহরণ প্রাপ্ত হইয়াছ'।৭১।

যদ্দ্বারা এই দানবগণ জর্জ্জরীকৃত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়াছে। যেহেতু ইহা দ্বারা ঐ বিঘ্নগণ অসুরগণ সহ জর্জ্জরীকৃত হইয়াছে।৭২।

সেই হেতু ইহা নিশ্চিত 'জর্জ্জর'—এই নাম-(যুক্ত) হইবে।

আর অবশিষ্ট যে সকল হিংসক হিংসার্থ উপগত হইবে,—।৭৩।

জর্জ্জর দেখিয়াই তাহারাও এইরূপ ভাবেই গমন করিবে। অনন্তর শক্র সেই সুরগণকে বলিয়াছিলেন—'এইরূপই হউক।৭৪।

এই জর্জ্জর সকলের রক্ষার (হেতু)ভূত হইবে'।

বিভিন্ন জাতির ও বিচিত্র গুণের অনুযায়ী বাক্য (ভাষণ), ভাব ও রস প্রদান করিয়াছিলেন। অংশাংশৈঃ ভাষিতান্ (মূল)—তত্তৎ ভূমিকার উপযোগী বাচিকী শিক্ষা বা বাগভিনয় (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৭)। ভাবান্ (মূল)—বিভাবাদি। সাধারণতঃ রক্ত-মাংসাদি ভয়-জুগুপ্সার বিভাব-স্বরূপ—কিন্তু রাক্ষস যক্ষাদির নিকট উহা হর্ষোৎসাহের বিভাব-রূপে প্রতীত হয়—ইহা যক্ষ-রাক্ষসাদির উপদেশ হইতেই জ্ঞাতব্য—অন্যের উপদেশ হইতে এ জ্ঞান জন্মিতেই পারে না। রসান্—স্বোচিত স্থায়িভাবের সহিত যথাযথ ভাবে সম্বদ্ধ তত্তৎ রসের উপযোগী বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাবাদির শিক্ষাও তাঁহারা মদীয় পুত্রগণকে দিয়াছিলেন। রূপম্—মুখরাগের বর্ণ-বিশেষের শিক্ষা। ক্রিয়া—ব্যাপার, চেষ্টা, অঙ্গাভিনয়। বল—প্রত্যেক ভূমিকা অনুযায়ী আঙ্গিকের প্রয়োগ-শক্তি (অঃ ভাঃ পৃঃ ২৮)

এই সকল উপকরণ ব্যতীত আরও বহু অনুক্ত উপকরণ প্রীত দেব-যক্ষাদিগণ প্রদান করিয়াছিলেন, যথা আহার্য্য-শোভার জ্ঞান, আতোদ্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

৬৩। দত্তবন্তঃ প্রহৃষ্টাস্তে মৎসুতেভ্যো দিবৌকসঃ—প্রদত্তূর্মৎ-সুতেভ্যস্ত চিত্রমাভরণং বহু—পাঠান্তর। বিঘ্ন-প্রশমনের নিমিত্ত রঙ্গারম্ভের প্রথমে যে জর্জ্জর-পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহা প্রদর্শনার্থ মহর্ষি এস্থলে একটি ইতিহাসের অবতারণা করিয়াছেন।

দৈত্য-দানব-নাশাত্মক প্রয়োগ—পুরাকল্পীয় দৈত্যগণের বিনাশের উপাখ্যানই ছিল এই নাট্য-প্রয়োগের বিষয়-বস্তু।

৬৪। অভবন্ ক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে দৈত্যা যে তত্র সঙ্গতাঃ—অথাসুরাশ্চ ক্ষুভিতা যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ, অথাসুরাশ্চাভিতোয্য যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ (পাঠান্তর)। "বিরূপাক্ষপুরোগাংশ্চ বিঘ্নানুৎপাদয়ন্তি তে" (মূলপাঠ)—'উৎপাদয়ন্তি' পাঠ অপেক্ষা 'উৎসাহয়ন্তি' পাঠান্তরটি বেশ সঙ্গত মনে হয়—তদনুযায়ী ভাষান্তরই প্রদত্ত হইয়াছে। কাশীর পাঠ···বিঘ্নান্ প্রোৎসাহ্য তেহব্রুবন্—এ পাঠও বেশ ভাল।—বিরূপাক্ষ-প্রমুখ বিঘ্নগণকে প্রকৃষ্টরূপে উৎসাহিত করিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন।

৬৫। আগম্যতাং—স্থির নিশ্চয় (অবধারণ) করুন, অথবা —সকলে মিলিয়া চলিয়া আসুন (walk out)— অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৮

মায়া—অদৃশ্যতা (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৮)।

৬৬। চেষ্টা—আঙ্গিকী।

স্মৃতি—স্মৃতি স্তম্ভিত হইলে বাক্-চেষ্টা ইত্যাদি সকলই স্তম্ভিত হইয়া যায়—ইহা সত্য বটে, তথাপি তত্তৎ বিভিন্ন বিষয়ক অভিনয়ের (অর্থাৎ বাগভিনয়, অঙ্গাভিনয় ইত্যাদির) প্রাধান্য দেখাইবার উদ্দেশ্যে বাক্-চেষ্টা ইত্যাদির পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে (অঃ ভাঃ পৃঃ ২৮)।

সূত্রধারস্য (মূল)—কেবল সূত্রধারের একার নহে—সপরিবার অর্থাৎ নট-নটী-বৃন্দ সহ সূত্রধারের ধ্বংস (স্তব্ধাবস্থা) দেখিয়া ইন্দ্র ধ্যানালম্বন করিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সূত্রধারের ভূমিকাটুকু পর্য্যন্ত দৈত্যদানবগণ নির্ব্বিঘ্নে অভিনীত হইতে দেন নাই—অর্থাৎ 'প্রস্তাবনা' প্রয়োগের মধ্যভাগেই বিঘ্নের উদয় হইয়াছিল (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৮)। ধ্যান অবলম্বন করিলেন—কারণ, ধ্যানের উপর মায়ার প্রভাব থাকিতে পারে না (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৮)।

৬৭। সদঃ (মূল)—সভা, ৬২ শ্লোকে উল্লিখিত দেবসভা—যথায় উক্ত নাট্যপ্রয়োগ প্রদর্শিত হইতেছিল। সাদতি অস্মিন্নিতি সদঃ —যথায় উপবেশন করা যায়—বসিবার স্থান (অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৮)।

৭০। জর্জ্জর—অতিশয় জরাগ্রস্ত—এইরূপ ব্যুৎপত্তি-লব্ধ অর্থ ! জর্জ্জরীকৃতদেহ—অতিশয় জীর্ণীকৃত হইয়াছে দেহ যাহাদিগের। অভিনব বলিয়াছেন—এইরূপে সিদ্ধি-বিঘাতকগণ নৃপতি-কর্ত্তৃক দণ্ডনীয়—ইহা সূচিত হইতেছে।

৭১। প্রহরণ—ইন্দ্রধ্বজ—যাহার নাম হইল 'জর্জ্জর'।

৭২। যস্মাদনেন তে বিঘ্নাঃ সাসুরা জর্জ্জরীকৃতাঃ (বরোদার পাঠ)

নাট্য-বিধ্বংসিনঃ সর্ব্বে যেন তে জর্জ্জরীকৃতাঃ (কাশীর পাঠ); জর্জ্জরীকৃত-দেহাস্ত দানবা যেন তে কৃতাঃ (পাঠান্তর)। কাশীর পাঠের অর্থ—ঐ সকল নাট্যবিধ্বংসী যদ্দ্বারা (অথবা যে হেতু) জর্জ্জরীকৃত হইয়াছে।

৭৪। গমিষ্যন্ত্যেবমেব তু (মূল)—এই ভাবেই গমন করিবে—অর্থাৎ এই ভাবেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। গমিষ্যন্তি—গমন করিবে। কোথায় গমন করিবে ?—উত্তর—পরলোকে—ইহাই বুঝিতে হইবে

পুনরায় শক্র-মহ স্ফীত হইলে ও প্রয়োগ (পুনরায়) প্রস্তুত হইলে পর—॥৭৫॥

অবশিষ্ট বিঘ্নগণ কিন্তু নৃত্যকারিগণের ত্রাস জন্মাইতে লাগিলেন। আমার উদ্দেশ্যে অপমানজনক তাঁহাদিগের প্রযত্ন দর্শন করিয়া—॥৭৬॥

আমি সকল পুত্রসহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম (ও বলিয়াছিলাম—) "হে ভগবন্! বিঘ্নগণ এই নাট্যের বিনাশে দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়াছে। ৭৭।

হে সুরেশ্বর! ইহার রক্ষা-বিধানের (বিষয়ে) সম্যগ্‌রূপে আজ্ঞা প্রদান করুন!' আর তদনন্তর ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে প্রযত্ন-সহকারে বলিয়াছিলেন— ॥ ৭৮ ॥

'হে মহামতে! লক্ষণ-যুক্ত নাট্যগৃহ (নির্ম্মিত) করুন।'

তার পর সেই বিশ্বকর্ম্মা অচিরকাল-মধ্যে সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মহৎ শুভ নাট্যগৃহ (নির্ম্মিত) করিয়াছিলেন। আর (তিনি) সভাস্থলে দ্রুহিণের (সমীপে) গমন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়াছিলেন ॥৭৯-৮০॥

'দেব! নাট্যগৃহ সজ্জিত হইয়াছে—তাহা দেখিতে আজ্ঞা হয়'।

অনন্তর মহেন্দ্র ও অন্যান্য (গন্ধর্ব্বাদি) ও সকল সুর সহ দ্রুহিণ সত্বর নাট্যমণ্ডপ দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন।

নাট্যগৃহ দর্শনপূর্ব্বক অতঃপর ব্রহ্মা সুর-সকলকে বলিয়াছেন— ॥৮১—৮২॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

৭৫। শক্রমহ—ইন্দ্রধ্বজ-মহোৎসব। স্ফীত হইলে—বেশ জমিয়া উঠিলে। প্রয়োগ প্রস্তুত হইলে—নাট্য-প্রয়োগ পুনরায় আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করা হইলে।

৭৬। শেষাঃ (মূল)—অবশিষ্ট; যাহাদিগের শরীর জর্জ্জরীকৃত হয় নাই—এরূপ অর্থ করা চলে। অভিনব বলিয়াছেন—যাহারা জর্জ্জরী-কৃতদেহ হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত অপরে—"জর্জ্জরীকৃতদেহশেষা অপি"। 'অপি' শব্দটির সঙ্গতি বেশ থাকে না বলিয়া কেহ কেহ অভিনবের পঙ্‌ক্তিটির অর্থ করেন—তাহাদিগের শরীর জর্জ্জরীকৃত হইলেও—জর্জ্জরীকৃত-দেহাবশিষ্ট হইলেও, তাহারা ত্রাস উৎপাদনে পরাঙ্‌মুখ হয় নাই। আবার পরবর্ত্তী একটি বাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে বলিতে হয়—পূর্ব্বোক্ত অর্থই সঙ্গত। এই পঙ্‌ক্তিটিতে অভিনব বলিয়াছেন—'জর্জ্জরীকরণ-কালে ইহারা তৎস্থানের সন্নিকটে ছিল না (তাই ইহাদের দেহ জর্জ্জর হয় নাই—এ কারণে ইহাদের বিঘ্নোৎপাদন-সামর্থ্য ছিল'—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩০)

ত্রাস—এই অবশিষ্ট বিঘ্নগণ কেবল ত্রাসোৎপাদনই করিয়াছিলেন—সর্ব্বথা নাট্যনাশে তাঁহাদের শক্তি ছিল না (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩০-৩১)।

ব্যবসিতং (মূল)—অধ্যবসায়, প্রযত্ন। মদর্থে বিপ্রকারকম্ (মূল)—আমার বিরুদ্ধে অপমান-জনক। মদর্থে—আমার উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে)। অথবা—এরূপ অর্থও হয়—মদর্থে—মৎপ্রয়োজনে। অর্থ—প্রয়োজন। আমার প্রয়োজনে—নাট্য-প্রয়োগে। বিপ্রকার—অপমান, নিন্দা, কুবাক্য-প্রয়োগ।

৭৭। রক্ষাবিধিং সম্যগাজ্ঞাপয়—রক্ষাবিধান-বিষয়ে সম্যগ্‌রূপে নির্দ্দেশ প্রদান করুন।

৭৮-৭৯-৮০। ততশ্চ বিশ্বকর্ম্মাণং ব্রহ্মোবাচ প্রযত্নতঃ। কুরু লক্ষণ-সম্পন্নং নাট্যবেশ্ম মহামতে! "ততোঽচিরেণ কালেন বিশ্বকর্ম্মা মহচ্ছুভম্। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং নাট্যবেশ্ম চকার সঃ" বরোদার পাঠ। কাশীর পাঠ—ততঃ······প্রযত্নতঃ। কুরু লক্ষণসম্পন্নং নাট্যবেশ্ম চকার সঃ। [এই পাঠের সরল ভাবে যোজনাই করা যায় না—বরং "গুরুলক্ষণসম্পন্নং নাট্যবেশ্ম চকার সঃ"—এই পাঠান্তর ধরিলে কোনরূপে একটা অর্থ করা যায়—তাহাও তত ভাল হয় না।] কৃত্বা যথোক্তমেবং তু গৃহং পদ্মোদ্ভবাজ্ঞয়া। প্রোক্তবান্······কৃতাঞ্জলিঃ ॥৮১॥ (পাঠান্তর—ততোঽব্রবীদ্বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মাণং প্রযতাঞ্জলিঃ)।

৭৮। বিশ্বকর্ম্মা—দেবশিল্পী। অভিনবের সিদ্ধান্ত—বাস্তুবিদ্যা-তত্ত্ববিৎ নাট্যমণ্ডপে স্থপতির কার্য্য করিবেন—ইহাই সূচিত হইতেছে।

৮০। দ্রুহিণ—ব্রহ্মা।

৮১। সুরৈঃ সর্ব্বৈশ্চ সেতরৈঃ—সুরগণ সহ ও অন্যান্য (গন্ধর্ব্বাদিগণ) সহ। ইতর—বিদ্যাধর-গন্ধর্ব্বাদি (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১)।

অনাশ্রিত

মহা নিস্তব্ধতা মাঝে তারে মনে হয়,
মুছে যায় আশা নিয়ে লিখেছিনু যে-সঙ্কল্প লেখা,
দূরের দুষ্প্রাপ্য হয়ে রহিল সে—নাহি তার দেখা!
নিরালায় বসে একা ভাবি নিরাশ্রয়।
আত্ম-সঙ্কোচের রেখা আঁকা চক্রবালে,
না-বলা কথাটি কেন বারে-বারে জাগে স্মৃতি-দ্বারে!
দীর্ঘ দগ্ধ বেলা মোর গোধূলির অর্দ্ধ অন্ধকারে
প্রাণের প্রাঙ্গণ হতে যায় অন্তরালে।

ভোরের বাসরে ম্লান তারকার মত
আমার বাসনা কাঁপে গোপনে যা' রেখেছি হৃদয়ে—
রাতের স্বপন সম সংসারের সাথে পরিচয়ে
মেঘলা দিনের ছবি লভিলাম শত।
রহস্য-বিস্ময়ভরা পৃথ্বী আয়তন,
অনন্ত-বিস্তৃত নভে রঙে রঙে মেঘেদের খেলা,
সীমাহীন পারাবারে যাত্রী চলে ভাসাইয়া ভেলা,
চেয়ে দেখি,—চোখে জল, শূন্য হলো মন।

প্রভাতী মল্লিকা আর পাই নাকো মোর পথ-মাঝে,
রজনীগন্ধাও মোরে ভুলিয়াছে,—সে'ও নাহি কাছে!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শেষ আশ্রয়

[উপন্যাস]

৬

মোটর-ঘরের পিছনে বাহিরের দেওয়ালে ছোট একটা দরজা! নিবারণ সেই দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। এ-পাশটায় কোন বস্তি নাই। সামনে যত দূর দৃষ্টি যায়, মাঠের পর মাঠ—দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ধান কাটা হইয়া গিয়াছে—মাঠের মধ্যে নানা রকমের পাখীর দল শস্যকণা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে। কতকটা দূরে একটু বাঁ-দিক ঘেঁষিয়া একটা তাল-গাছ-ঘেরা দীঘি—তাহারই আশে-পাশে রবিশস্যের মাঠ; একটানা ধূসরতার মধ্যে খানিক সবুজ ছোপের মত দেখাইতেছে।

মাঠের মধ্য দিয়া পায়ে-চলা একটি আল-পথ—অনতিদূরে বাউরীদের বস্তি হইতে আঁকিয়া বাঁকিয়া দীঘির ঘাট পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। বাউরীদের মেয়েরা ঐ দীঘিতে সকালে-সন্ধ্যায় স্নান করে, গা ধোয়, কলস ভরিয়া জল লইয়া ঘরে আনে। সারা বর্ষায় সতেজ সবুজ ঘাসে পথটা ঢাকিয়া যায়—আবার শীতকালে মাটী শুকাইয়া আসিলে পায়ে-পায়ে জাগিয়া ওঠে। দিনের পর দিন পায়ের স্পর্শে আলের কর্কশ মাটী মসৃণ হইয়া ওঠে—রং হয় চন্দনের মত সাদা—রাত্রের অন্ধকারেও পথটি শ্বেত, সুবঙ্কিম, লরেখার মত দেখায়।

দীঘিটা বড়। প্রায় দশ-বারো বিঘা জল-কর। চারি দিকে উঁচু পাড়—পাড়ে সহস্রাধিক তাল গাছ। দীঘিটায় বিস্তর মাছ আছে। এক জন জেলে দীঘির মালিকের কাছ হইতে দীঘিটা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া মাছের কারবার করে। দীঘির এক দিকের পাড়ের জমি কতকটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া সে একটা কুঁড়ে ঘর তুলিয়াছে! সেখানে দিবারাত্র থাকিয়া মৎস্য-শিকারীদের হাত হইতে মৎস্য-কুলকে রক্ষা করিবার জন্য পাহারা দেয়।

প্রতিদিন বিকাল বেলায় নিবারণ জিমিকে লইয়া এই দীঘিতে বেড়াইতে আসে। জেলেটা নিবারণকে খুব খাতির করে। যাইবামাত্র বসিবার জন্য ছোট দড়ির খাটিয়াটি কুঁড়ে হইতে বাহির করিয়া পাতিয়া দেয়। নিজে মাটীতে বসিয়া জাল বুনিতে বুনিতে নিবারণের সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করে। নিবারণ বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে গম্ভীর চালে দেশে নিজের জমিদারীর আয় ও আয়তন, পুকুরের মাছের দৈর্ঘ্য, বাগানের আম-কাঁটালের স্বাদ, ছেলের বিদ্যা-বুদ্ধির বহর ও পদ-গৌরব, ছেলের সংসারে তাহার শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রাচুর্য্য—ইত্যাদি বিষয়ের গল্প করে। জানায় যে দেখা-শুনার অভাবে দেশে তাহার এত বড় জমিদারীটা পাঁচ ভূতে লুঠিয়া খাইতেছে—অথচ সব জানিয়া-শুনিয়াও শুধু ছেলে-বৌয়ের স্নেহের ও ভক্তির বাঁধন কাটিতে না পারিয়া এখানে পড়িয়া আছে! ছেলে-বৌকে অনেক বুঝাইয়াছে সে; তবু তাহারা বুঝিতে চাহে না, এক দণ্ড এই অথর্ব্ব বুড়াকে চোখে না দেখিলে অস্থির হইয়া ওঠে।

জেলেও গল্প করে। তাহার সংসারের গল্প। সংসারে এক বিন্দু শান্তি নাই তাহার। ছেলেগুলি ভালো, কিন্তু বৌগুলা ছোটলোকের মেয়ে। শাশুড়ীর সঙ্গে তাহাদের একদম বনে না—ডাহিনে যাইতে বলিলে বাঁয়ে যায়, উঠিতে বলিলে বসে। ঘরে সারাদিন হরদম ঝগড়া লাগিয়াই আছে—চালে কাক-পক্ষীর বসিবার জো নাই। তিতি-বিরক্ত হইয়া সে সব ছাড়িয়া দিয়া সহরে আসিয়া এই দীঘির ধারে বাসা বাঁধিয়াছে।

ঘাটের পাশে শুইয়া সামনে প্রসারিত দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া জিমি পড়িয়া থাকে; মাঝে মাঝে গলা হইতে বিচিত্র রকমের শব্দ বাহির করে। বোধ করি, সে-ও নিজের কোন কাহিনী বলিতে চায়—কেহ কর্ণপাত করে না।

গল্প করিতে করিতে কোনো দিন রাত হইয়া যায়। ফিরিবার সময়ে জেলে বলে—"চলুন, মাঠটা পার করে দিয়ে আসি।" জেলে কাচের ঘের-দেওয়া চৌকোণো লণ্ঠনটি জ্বালিয়া নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে চলে। মাঝে মাঝে সতর্ক করিয়া দেয়—"বেশ পা টিপে টিপে চলেন—পা হড়কে যদি জলে পড়েন তো একেবারেই সাবাড়! ভারী খাদাল দীঘি—এক পা বাড়ালেই ডুবন-জল।" নিবারণ সাবধানে লাঠি ঠুকিয়া ঠুকিয়া চলে; তাছাড়া জিমি পথ দেখায়—জিমির গলার চামটিতে একটা দড়ি বাঁধিয়া তার একটা প্রান্ত বাঁ হাতের মুঠায় শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে নিবারণ।

জেলে ও নিবারণের মধ্যে একটা সৌহার্দ্দ্যের বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছে। বাড়ীতে ক্ষান্তমণি তীব্র সমালোচনা করে, রায় বাহাদুর অনুযোগ করেন, পরিচিত ভদ্রলোকেরা ও ছেলের বন্ধুবান্ধবের দল হাসি-ঠাট্টা করে, কিন্তু নিবারণ কাহারও কথা শুনে না। পৃথিবীতে যে একমাত্র ব্যক্তি তাহার সম্মান ও শ্রদ্ধার ন্যায্য পাওনা পূরাপূরি দেয়, তাহার অতৃপ্ত কামনার কল্পিত বিচিত্র কাহিনী অ-স্নিগ্ধ চিত্তে শুনে, তাহার সহিত না মিশিয়া নিবারণ পারে না।

নিবারণ আল-রাস্তা ধরিয়া দীঘির দিকে চলিল।

৭

নিবারণ যখন বাড়ী ফিরিল—তখন প্রায় তিনটা বাজিতেছে। জেলে আজ দীঘির পাড়ে ছিল না, সহরে গিয়াছিল। নিবারণ কুঁড়ের সামনে বাবলা গাছের তলায় পাতা খাটিয়ায় শুইয়া নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছিল। ঘাটে স্নান-রতা মেয়েদের হাসি ও গল্পের শব্দ, অন্য পারে ক্রীড়ারত রাখাল ছেলেদের তর্ক ও কলহের শব্দ, মাঠে কর্ম্মরত চাষীদের আলাপ-আলোচনার শব্দ কাণে আসিতে-ছিল। কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল নিবারণ। বেলা দুইটার পর জেলে ফিরিয়া নিবারণকে উঠাইল, এবং নিবারণ স্নানাহার করে নাই জানিয়া তাগাদা দিয়া বাড়ী পাঠাইল। না হইলে নিবারণের বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। শ্রদ্ধাহীন, স্নেহহীন, বিচার-বিবেচনাহীন সংসারের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা তাহার মনকে প্রতিকূল নদী-প্রবাহের মত অনবরত পিছন-দিকে ঠেলিতেছিল।

বাড়ী ফিরিতেই চাকরটা হৈ-হৈ করিয়া উঠিল—"কোথায় ছিলেন এতক্ষণ! আপনার জন্যে এতক্ষণ বসেছিলাম সব—শেষে গিন্নিমা বললেন—তোরা নেয়ে-খেয়ে নি' গে—ভাত ঢাকা দিয়ে কোথাও রেখে দে। বাড়ীতে এত কাজ আর আপনি কোথায় পুকুর-ধারে গিয়ে বসে রইলেন। যেমন কাণ্ড!"

নিবারণ আমতা-আমতা করিয়া কহিল—"দেরী হয়ে গেছে, সত্যি! তা' তোরা খেয়েছিস্ তো?"

চাকরটা কহিল—"খেয়ে নিবেন চলুন।" যাইতে যাইতে কহিল—"রান্নাঘর ধোয়া-মোছা হয়ে উনুনে আবার আগুন দেওয়া হয়ে গেছে। রাত্রে কত লোক খাবে—দু'জন বাবুর্চি এসেছে, এখন থেকে রান্না চাপবে! আফিস-ঘরে আপনার ভাত ঢাকা দেওয়া আছে।"

বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতে যাইতে ক্ষান্তমণির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দোতলার জানলা হইতে ইহাদের দেখিতে পাইয়া হাঁক দিয়া কহিল—"ওরে এই যেদো!"

চাকরটির নাম যাদব—পৃথিবীতে তাহার ধন নাই, মান নাই, বংশ ও পদমর্য্যাদা নাই, শুধু নামটিই সম্বল। সেই নামের এই বিকৃতিতে তাহার ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক। যথা-মাত্রা ক্রোধের সহিত দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া জানলার দিকে চাহিয়া কহিল—"কি?" বলিতে যাইতেছিল—"কি গো খেঁদারাণী!" কিন্তু ক্ষান্তমণির অন্তরালে গৃহিণীর শাড়ীর জরি-দেওয়া ঝক্‌ঝকে পাড় চোখে পড়িতেই জিহ্বা সংবরণ করিল।

ক্ষান্ত কহিল—"কুকুরটা যে বাড়ীর সামনে মরে পড়ে রৈলো! তোলাবার ব্যবস্থা কর্‌গে যা।"

ক্ষান্তমণির নিজের কথা নয়—তাহার মুখ দিয়া গৃহিণীর আদেশ, তবু অগ্রাহ্যের সুরে যাদব কহিল—"হচ্ছে, হচ্ছে—নিজে তো ঘাড়ে করে ফেলতে পারবো না—মেথর আসুক।"

ক্ষান্তমণি কহিল—"আসুক বলে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোস্‌নে যেন—না এলে নিজে গিয়ে তাকে ধরে আন্‌বি।"

নিবারণ যেন পাথর হইয়া গেল। কোন্ কুকুরটা মরিয়াছে? তাহার জিমি নয় তো?

যাদব কহিল—"আসুন।" চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল—"মাগীটা গিন্নীর বাপের বাড়ীর ঝি বলে ধরাকে যেন সরা দেখে! কাউকে গেরাহ্যি করে না। যেন ওই এ-বাড়ীর গিন্নী—এমনি ভাব! এ বাড়ীতে আবার চাকরি করে! ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো। চাকরির আবার ভাবনা। আমার ভাই মদের দোকানে বড় সাহেবের পিয়নের চাকরি করে—চব্বিশ টাকা মাইনে—তাছাড়া চাল-ডাল-নুন-তেলের রাশন! পিয়নের চাকরি করব মশায়—না হলে যুদ্ধে চলে যাব।" দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিল—"যেদো! মাগী ছোটবেলায় আমার নাম রেখেছিল! দেখুন দেখি আস্পর্দ্ধা!"

নিবারণ কহিল—"কোন্ কুকুরটা মরেচে রে?"

যাদব অগ্রাহ্যের সুরে কহিল—"সে আপনি চিনবেন না—পাড়ার একটা কুকুর—সরকারের পা কামড়ে দিয়েছিল—শুনে বাবু গুলী করে মেরে ফেললেন!"

নিবারণ শঙ্কিত কণ্ঠে কহিল—"আমার জিমি নয়তো রে!"

যাদব সাহস দিয়া কহিল—"পাগল! জিমি আজ সকাল থেকে এ তল্লাটে নেই। ও পাড়ার একটা কুকুর। চলুন, খেয়ে নেবেন চলুন।"

৮

খাওয়া-দাওয়ার পর নিবারণ মোটর-ঘরের দিকে যাইতেছিল, যাদবের সহিত দেখা হইল। যাদব জিজ্ঞাসা করিল—"খেলেন?"

নিবারণ কহিল—"হ্যাঁ বাবা! তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

যাদব ঝাঁজের সহিত কহিল—"আর বলেন কেন? ঐ যে হুকুম হোল শুনলেন না, তাই তামিল করতে গেছলাম। তা' ছোটলোকের যা' গরব হয়েছে আজকাল! হাঁকিয়ে দিলে প্রথমে—অনেক ধরাধরি করে মদ খাবার পয়সা কবুল করে বেটাকে ডেকে আনতে হয়েছে। গুরুঠাকুরকে আনতে অত তোষামোদ করতে হোত না।"

নিবারণ কহিল—"চলো তো দেখি, কোন্ কুকুরটা! পাড়ার সব ক'টাকেই তো চিনি আমি।"

নিবারণ যাইতে যাইতে চিন্তিত মুখে কহিল—"আমার জিমিটা কিন্তু এখনও এল না। এমন তো করে না কোনো দিন। যেখানেই থাক, ঠিক সময়ে আসে!"

যাদব ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"তা' এসেছিল তো। ঠিক সময়েই এসেছিল। সময়ের জ্ঞান একবারে টন্‌টনে ছিল কি না! আপনাকে দেখতে না পেয়ে চলে যেতে হলো বেচারাকে!"

নিবারণ কহিল—"কোথায় গেছে বলো দেখি?"

যাদব কহিল—"তা' ঠিক জায়গাতেই গেছে!" একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া পরম আধ্যাত্মিকতার সহিত কহিল—"পৃথিবীতে কেউ চিরকাল থাকতে আসেনি বুড়ো বাবু! সবাইকে এক দিন যেতে হবে!"

নিবারণ উদ্বেগের সহিত কহিল—"তা' বটে! তবে জিমি তো—"

যাদব বাধা দিয়া কহিল—"কথায় বলে পদ্মপত্রে জল! আমাদের জীবনও তেমনি! এই আজ আপনি চলছেন ফিরছেন, খাচ্ছেন-দাচ্ছেন—কালই হয়তো ফরসা!" বলিয়া দুই হাত চিৎ করিয়া দিল।

এই চিরন্তন পরম সত্যের আকস্মিক অবতারণায় নিবারণের বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল; কোনো মতে কহিল—"সত্যি!"

যাদব সোৎসাহে কহিল—"আর কুকুর তো দেশের রইলো না, মশায়! রোজ বাজার যাবার সময় রাস্তার ধারে দেখি, একটা না একটা মরে দাঁত বার করে পড়ে আছে! মিলিটারী লরী নয় তো, কুকুরের মড়ক!"

বাড়ীর সীমানা পার হইয়া রাস্তায় পড়িল নিবারণ। অদূরে রাস্তার পাশে মৃত কুকুরটাকে দেখা গেল—ঠিক যেন জিমি। এ পাড়ায় ঘোষেদের কুকুরটা জিমির মত দেখিতে—সেইটা না কি? কাছে আসিতেই নিবারণের ভুল ভাঙ্গিল—জিমিই বটে! পা'গুলা মেলিয়া দিয়া কাত হইয়া পড়িয়া আছে, মাথাটা উপরের দিকে টান হইয়া বাঁকিয়া আছে, মুখটা ফাঁক হইয়া দাঁতগুলা বাহির হইয়া আছে। নিবারণ আর্ত্ত কণ্ঠে কহিল—"এ যে আমার জিমি রে! হায়! হায়!"

যাদব কহিল—"তা' কি করবেন, বলুন! বললাম যে—পদ্মপত্রে জল!"

নিবারণ জিমির পাশে উবু হইয়া বসিয়া পড়িল। জিমির বুকের কাছে একটা রক্তাক্ত ফুটা হইতে রক্তধারা বহিয়া বুকটা ও কাছে কতকটা রাস্তার ধুলা ভিজাইয়া দিয়াছে। নিবারণ শোকার্ত্ত কণ্ঠে কহিল—"আগেভাগেই চলে গেলি!"

যাদব কহিল—"নিজের দোষেই গেল কি না! ঘরটা এত করে পরিষ্কার করা হোল তার পরে গিয়ে দেখি, জিমি যেয়ে শুয়ে আছে! তাড়াতে গেলাম তো দাঁত খিঁচিয়ে গোঁ-গোঁ করে উঠলো। মরে গেছে, বলতে নাই—ভারী বজ্জাত ছিল তো! সরকার মশাইকে ডাকলাম। একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে এল সরকার মশায়; জিমি একেবারে লাফিয়ে এসে কস্ করে দাঁত বসিয়ে দিল সরকার মশায়ের পায়ে; তার পর ভোঁ দৌড়! হৈ-হৈ পড়ে

গেল! দাদু সাহেব অস্থির হয়ে উঠলেন; ভারী পেয়ারের চাকর কি না! ডাক্তার ডাকা হলো, ইনজাক্সান হলো, হুলস্থুল ব্যাপার! বাবু তো রেগে আগুন! হুকুম দিলেন—কুকুরটাকে বাড়ীর সীমানায় দেখতে পেলেই যেন খবর দেওয়া হয়—বলে' বন্দুক বার করতে গেলেন। আমি তো ভাবলাম—যেটার যা বুদ্ধি, দিনের আলো থাকতে আর পা দেবে না বাড়ীতে। তা' জানোয়ারের বুদ্ধি কি না! ঘণ্টাখানেক পরেই এসে হাজির! আমাদের চোখে পড়লে হয়তো তাড়িয়ে দিতাম—পড়লো একেবারে ক্ষেন্তির' চোখে। চেঁচিয়ে পাড়া সোরগোল করে দিলে। ব্যাপার দেখে জিমি সরে পড়বার চেষ্টা করলো, তা পড়লো একেবারে বাবুর সামনে। মারলেন গুলী—বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। জিমি চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল—আর এক গুলী লাগালেন বাবু। তার পরেই এসে দেখি, এখানে পড়ে আছে।

নিবারণ জিমির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বসিয়াছিল। কহিল—"তোদের মনিবকে বলগে—আমাকেও গুলী করে মেরে দিতে।"

যাদব কহিল—"তা, বাবু যা রেগেছিলেন আপনার ওপর, আপনি থাকলে কি হোত, বলা যায় না! বন্দুক নিয়ে বাঘের মত ঘুরছিলেন—কাছে এগোতে আমাদের সাহস হচ্ছিল না!"

অসহ্য ক্ষোভের সহিত নিবারণ কহিল—"বেশ তো, আমিই না হয় যাই তোদের বাবুর কাছে, দিক্ আমাকে মেরে, আপদ চুকে যাক্!"

যাদব হাই তুলিয়া, গা-মোড়া দিয়া কহিল—"আর হাঙ্গামা বাড়িয়ে কাজ নাই, চলুন। অনেক কাজ পড়ে আছে। মেথর বেটাকে এত করে আসতে বললাম, এখনও দেখা নাই!" নিবারণকে তাগাদা দিয়া কহিল—"আসুন, আর এখানে বসে থেকে কি হবে? পাড়ার লোক দেখলে বলবে কি?"

নিবারণ উঠিয়া আসিল। যাদবের সঙ্গে যাইতে যাইতে কহিল—"লোকটা কি খুব জখম হয়েছে?"

যাদব অগ্রাহ্যের সুরে কহিল—"জখম না আর কিছু! দাঁতটা একটু বসিয়েছিল—রক্ত একটুখানি পড়েছে কি পড়েনি, তা'তেই এত! পেয়ারের চাকর কি না! আমাদের টুটিটা ছিঁড়ে দিলেও এর আদ্ধেকও হতো না!" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"ক্ষেন্তির যদি লম্ফ-ঝম্প দেখতেন, যেন ওরই সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে! মাগীটা বদমাস্!"

বাড়ীর কাছে আসিয়া যাদব নিবারণকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাবেন?"

নিবারণ করুণ কণ্ঠে কহিল—"কোথায় যাব, বল দেখি? একটু বসবারও তো জায়গা নেই!"

যাদবের দয়া হইল, কহিল—"আমাদের ঘরে খাটিয়াতে একটু গড়িয়ে নেবেন, আসুন।"

শুধু গড়ানো নয়, নিবারণ রীতিমত ঘুমাইল। এইটি নিবারণের ভগবদ্দত্ত একটি বিশেষ গুণ। চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেই তাহার ঘুম পায়। চিন্তনীয় বিষয় যত গভীর হয়, ঘুমও তত গাঢ় হয়। এমনি করিয়া জীবনের অনেক ঝড়-ঝাপটা সে অবলীলাক্রমে কাটাইয়া চলিয়াছে। আজও জিমির অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুকে ঘিরিয়া অনেক জটিল আধ্যাত্মিক সমস্যা—জীবনের জরুরী পার্থিব সমস্যাকেও পিছে ফেলিয়া তাহার মনের দুয়ারে হানা দিয়াছিল—কিন্তু নিদ্রার নিবিড়কৃষ্ণ পর্দ্দার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া সে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিতেই জিমির কথা মনে হইল নিবারণের। জিমি আজ নাই—তাহারই ছেলের হাতে প্রাণ দিয়াছে। নির্ব্বোধ প্রাণী—নিজের অধিকার সহজে ছাড়িতে চাহে না। কাজেই যে অধিকার-চ্যুতিকে সে নিজে নীরবে সহ্য করিয়া লইয়াছে, জিমি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিল এবং জগতে প্রবলের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের প্রতিবাদ করিবার অসহনীয় স্পর্দ্ধার যাহা বিহিত শাস্তি, তাহাই সে পাইয়াছে!

চা-এর পিপাসা প্রবল হইয়া উঠিল নিবারণের। অন্য দিন তাহার ঘরে চাকরেরা চা দিয়া যায়। আজ বোধ হয় তাহাদের সময় হয় নাই, হয়তো স্মরণও হয় নাই। একটা বিড়ি ধরাইয়া টানিতে টানিতে বাহিরে আসিল নিবারণ। বাড়ীর সামনে প্রাঙ্গণে হৈ-হৈ ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। এ-পাশটায় সারিবন্দী হইয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গণ্য-মান্য অতিথিদের আগমন সুরু হইয়াছে, বোধ হয়। এখন চাকর-বাকরদের এদিকে আবির্ভাবের আশা দুরাশা! নিবারণ সামনের দিকে আগাইয়া চলিল।

সামনে আসিয়া নিবারণ অবাক্ হইয়া গেল। সমস্ত স্থানটা অত্যুজ্জ্বল আলোতে ঝলমল করিতেছে। প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে সুবিন্যস্ত চেয়ার ও টেবিল; সুবেশ ও সুবেশা অভ্যাগত অভ্যাগতারা একে একে আসিয়া চেয়ার অধিকার করিতেছেন। বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহার বৈবাহিক—পরিধানে দামী স্যুট—মুখে চুরুট; উজ্জ্বল আলোকে মাথার টাকটা পালিশ-করা ব্রোঞ্জের পাত্রের মত চক্চক্ করিতেছে। তাহার ছেলেরও সাহেবী-পোষাক—চমৎকার মানাইয়াছে তাহাকে। নিবারণের ছেলে বলিয়া তাহাকে মনে হয় না। তাহার পুত্রবধূ হাল-ফ্যাসানে সজ্জিতা হইয়া হাই-হিল জুতা পরিয়া খট্খট্ করিয়া এখানে-সেখানে ঘুরিয়া অতিথিদের আপ্যায়ন করিতেছে।

নিবারণ ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। ঐ যে ছেলে-বৌ-বেহাই, ঐ যে নিমন্ত্রিতের দল, উহাদের সহিত নিবারণের কি কোন যোগসূত্র আছে? উহাদের হাব-ভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, কথা-বার্ত্তা নিবারণের সম্পূর্ণ অপরিচিত। উহারা যে জগতে বাস করে, সেখানে নিবারণের স্থান কোথায়? নিবারণের মনে হইল, সে যেন বহু দিন আগে মরিয়া গিয়াছে! তাহারই প্রেতাত্মা পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া বহু-পরবর্ত্তী কোনো বংশধরের ক্রিয়া-কাণ্ড দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে!

একটা মোটর নিঃশব্দে আসিয়া কখন পিছনে দাঁড়াইয়াছে—নিবারণ বুঝিতে পারে নাই। সে দেখিল—তাহার ছেলে ও তাহার পিছু-পিছু অনেকে মরি-কি-মারি করিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! তাহারই কাছে আসিতেছে না কি? সে দাঁড়াইয়া একটু দেখিতেছে—ইহাও উহাদের সহ্য হইতেছে না, বোধ হয়। নিবারণ সামনে আগাইয়া যাইবার চেষ্টা করিল—কিন্তু পাড়ার বাউরীদের ছেলে-মেয়ে ও পুরুষেরা এমনি ভিড় করিয়াছে সে-ভিড় ঠেলিয়া যাওয়া দুঃসাধ্য মনে হইল। কাজেই নিবারণ ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিল। কিন্তু দুই পা আগাইতে না আগাইতেই এক জন

যণ্ডামার্ক গোছের লোক আসিয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দিল। নিবারণ উল্টাইয়া পড়িতে পড়িতে কোন মতে লাঠির সাহায্যে পতনের হাত হইতে রক্ষা পাইল। তাহার ছেলেও তাহাকে দেখিতে পাইল, বোধ হয়—কিন্তু চিনিল না। নিবারণ সামলাইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, এক জন লম্বা-চওড়া টক্‌টকে ফর্সা রংএর সাহেব-বেশী বাঙ্গালী দামী একটা প্রকাণ্ড মোটর হইতে নামিতেছেন। তাহার ছেলে তাঁহার করমর্দ্দন করিল। সাহেবের পিছনে নামিলেন একটি তরুণী। ছবির মত সুন্দর দেখিতে, ছবির মতই বেশভূষা। তাহার ছেলে সসম্মানে তরুণীটিরও করপীড়ন করিল। তার পর সকলে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সভা-মণ্ডপের দিকে চলিল।

এত দিন এত দুঃখে, এত অবহেলায় নিবারণ যা করে নাই, আজ তাই করিল—নিবারণ কাঁদিয়া ফেলিল।

৯

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিবারণ চলিয়া আসিল। চায়ের পিপাসা তাহার কখন বাষ্প হইয়া মিলাইয়া গেছে! এই মুহূর্তে এই স্থান ত্যাগ করিবার এক অদম্য আগ্রহ তাহাকে প্রচণ্ড শক্তিতে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

নিবারণ দীঘির দিকে চলিল। ওখানে ছাড়া এখন আর তাহার যাইবার স্থান কোথায়? কালই সে এখান হইতে চলিয়া যাইবে। ছেলেকে বলিয়াই যাইবে। কলহ করিবে না, তর্ক করিবে না, অনুযোগ করিবে না। বলিবে, আমাকে লইয়া তোমাদের আর সুবিধা হইবে না—আমার সরিয়া যাওয়াই ভালো। দেশেই সে যাইবে। লাঞ্ছনা এখানকার চেয়ে কি আর বেশী হইবে সেখানে? পৈতৃক ভিটাটুকু সে রাখালকে দান-পত্র করিয়া দিবে। পৈতৃক যৎসামান্ত জমি-জায়গা রাখালই এত দিন ভোগ করিয়া আসিতেছে। তাহার বদলে তাহাকে দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন দিতে বোধ হয় সে অস্বীকার করিবে না। বেশী দিন দিতেও হইবে না, হয়তো। সে বার এক মাসের মধ্যেই যে রকম কঠিন রোগে তাহাকে ধরিয়াছিল, আর একবার তেমনি ধরিলে তাহাকে শেষ না করিয়া ছাড়িবে না। তবু মরণের উদ্যোগ-পর্ব্বের সেই দারুণ দুঃখের দিনগুলি! কে কাছে থাকিবে? কে সেবা করিবে? কাহার অশ্রু-সজল চোখের স্নেহ-কোমল দৃষ্টিটুকু পাথেয় করিয়া সে তিমিরাচ্ছন্ন দুর্গম যাত্রাপথে বাহির হইবে?

শুক্লা-তৃতীয়ার ক্ষীণ-শীর্ণ চাঁদ অস্ত যাইতেছিল। মাঠের মধ্যে অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। আকাশে মেঘের আভাস; উত্তর দিক্ হইতে তীক্ষ্ণ-শীতল বাতাস সির-সির করিয়া বহিতেছিল। নিবারণ আলোয়ানটা ঘনতর ভাবে গায়ে জড়াইয়া লইল।

দীঘির পথ নিবারণের সুপরিচিত। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও লাঠি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সে যাইতে পারে। ভয় শুধু দীঘির পাড়ে উঠিবার সময়—খাড়া উঁচু পাড়; পায়ে-চলা রাস্তা আছে; তবু সাবধানে উঠিতে হয়। নিবারণ দীঘির ঘাটের কাছে আসিয়া জেলের নাম ধরিয়া বার-কয়েক ডাকিল; কিন্তু সাড়া না পাইয়া প্রায় হামা-গুড়ি দিয়া পাড়ের উপর উঠিল। তার পর অতি সাবধানে পা ফেলিয়া কুঁড়ের সামনে আসিয়া হাজির হইল।

জেলে কুঁড়েতে ছিল না। কোন-কোন দিন সে থাকে না। বাউরীপাড়ায় তাহার এক রক্ষিতা আছে—সেইখানে রাত্রিযাপন করে। বাবলাতলায় সে-খাটটাও পড়িয়া নাই।

নিবারণ বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। পিছন দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইল—একটানা কালো আকাশের মধ্যে কতকটা অংশ আলোর প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল নিবারণ, ওখানে আজ ভাগ্যবানদের উৎসব-সভা জমিয়া উঠিয়াছে—ওখানে তাহার মত অভাগাদের স্থান নাই। সামনের দিকে তাকাইল নিবারণ; এখানেও এই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে বোধ হয়—এক বিরাট জলসার যেন আয়োজন হইয়াছে—মানুষের নয়, অন্ধকারচারী প্রেতের! সারা দীঘির বুক জুড়িয়া কালো ভেলভেটের আস্তরণ পাতিয়া আসর করা হইয়াছে! তালগাছগুলা উষ্ণীষ-ধারী দীর্ঘকায় প্রহরীর মত চারি দিক্ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া অবাঞ্ছিত কোন আগন্তুক পাছে অনধিকার প্রবেশ করে—এই ভয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে পাহারা দিতেছে। ঝিঁঝিঁপোকার দল ঐক্যতান বাদন সুরু করিয়া দিয়াছে। অতিথিরা একে একে হয়তো আসিতে সুরু করিয়া দিয়াছে—দূর-দূরান্তর লোক হইতে! হাওয়ার চেয়ে হাল্কা তাহাদের দেহ—আস্তরণের উপর একে একে আসন গ্রহণ করিতেছে! এর পর সুরু হইবে তাহাদের পরস্পরের সহিত পরিচয়, তার পর রাত্রি যখন আরও গভীর হইবে—মানুষ নিদ্রার মায়াদণ্ডে অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, তখন আরম্ভ হইবে তাহাদের উৎসব; নৃত্যের ধ্বনিতে, গীতের মূর্চ্ছনায় এই ঘন-কালো অন্ধকার মথিত মুখরিত হইয়া উঠিবে।

নিবারণ ভাবিল, এখানেও তো তাহার স্থান নাই। তাহার এখানে উপস্থিতি কেহ হয়তো এখনও বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিবামাত্র এই অনধিকার-প্রবেশের জন্য ঐ প্রহরী ও প্রেতের দল হয়তো ক্ষুব্ধ রোষে একসঙ্গে গর্জ্জন করিয়া উঠিবে!

নিবারণের ভয় করিতে লাগিল। এখানে আসাটা ভালো হয় নাই। জিমিকে মনে পড়িল নিবারণের—জিমি থাকিলে এতটা ভয় করিত না! কিন্তু এই অন্ধকারে এখন যদি জিমি লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাহার কাছে আসিয়া গা ঘেঁষিয়া দাঁড়ায়? তাহা হইলে নিবারণ বোধ করি মূর্চ্ছা যাইবে! মানুষ মরিলে ভূত হয়—কুকুর মরিলেও ভূত হয় নিশ্চয়ই—অবশ্য কুকুর-ভূত। তাহা হইলেও ভূত তো! আর এই অন্ধকারের মধ্যে যে দুই-চারিটা ভূত আশে-পাশে দাঁড়াইয়া নাই, কে বলিবে? অদৃশ্য-চারী উহারা—হয়তো অন্ধকারে মিলাইয়া আছে—দেখিতে দেখিতে ঘন অন্ধকার ঘনতর হইয়া বিরাট বিকট মূর্ত্তি চোখের সামনে প্রকট হইয়া উঠিবে!

নিবারণ ভয়ে চোখ বুজিল! সহসা উত্তর দিকের মাঠ হইতে একটা দমকা হাওয়া ছুটিয়া আসিল। তালগাছগুলা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। দীঘির বুক হইতে প্রেতের দল কৌতুকে করতালি দিতে লাগিল; দীঘির ও-পার হইতে ছোট ছেলের কান্নার মত একটা একটানা তীক্ষ্ণ-তীব্র শব্দ উঠিয়া ক্রমে তীক্ষ্ণতর ও তীব্রতর হইয়া অন্ধকারের বুক চিরিয়া চিরিয়া সারা দীঘির উপরে পাক খাইতে লাগিল! নিবারণের পিছন-দিকে মাঠের মধ্যে একটা খেঁকশেয়ালের ক্রুদ্ধ চীৎকার শোনা গেল—পরক্ষণেই দুইটা প্রাণীর দ্রুত পদশব্দ! দূরে মাঠের মধ্যে একটা ফেউ ক্রমাগত ডাকিতে সুরু করিল এবং ডাকটা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

নিবারণের বুকের ভিতরটা ভয়ে জমাট হইয়া উঠিল—সমস্ত দেহ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। নিবারণ কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—নারায়ণ! মধুসূদন! তার পর টলিতে টলিতে লাঠি দিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে চলিতে সুরু করিল।

বাতাসের বেগ ক্রমে প্রবলতর হইয়া উঠিল। অসমতল পাড়ের উপর নিবারণের পা দৃঢ় আশ্রয় পাইতেছিল না। একটা গর্ত্তের মধ্যে পা পড়িতেই নিবারণ উলটিয়া পড়িয়া গেল। খাড়া ঢালু পাড়ে গড়াইতে গড়াইতে তাহার অচৈতন্য দেহ দীঘির জলে আসিয়া পড়িল।

ভিজা জামা ও আলোয়ানের ভারে এক রাত্রি ও অর্দ্ধেক দিন পঙ্ক-শয্যায় কাটাইয়া নিবারণের দেহ ভাসিয়া উঠিল—তার পর ঢেউয়ের দোলায় দুলিতে দুলিতে দীঘির মাঝখানে যেখানে কতকটা স্থান শালুকের পাতায় একেবারে ছাইয়া গিয়াছে, সেইখানে গিয়া ভাসিতে লাগিল।

জীবনে নিবারণের এক মুহূর্ত্তেরও আশ্রয় ছিল না; মরণের হিম-শীতল বক্ষে সে চিরকালের আশ্রয় লাভ করিল।

শ্রীঅমলা দেবী

শেষ

নীলাম্বরী

[গল্প]

একমাত্র পুত্র নীলাম্বরকে রাখিয়া পীতাম্বর মিত্তির অকালে পরপার-যাত্রা করিলেও পুত্রকে অকূলে ভাসাইয়া যায় নাই। নগদ অর্থ এবং বিষয়-সম্পত্তি যাহা রাখিয়া গিয়াছিল, সে-কালে তাহার ওজন বেশ ভারী বলিয়াই গণ্য হইত। দেড় শত বিঘা ধান-জমি, পুকুর, বাগান, নগদ টাকার সুদ প্রভৃতিতে প্রায় সাত-আট হাজার টাকা বার্ষিক আমদানি ছিল। তাহার উপর বর্ত্তমানে নীলাম্বর আরও কিছু বাড়াইয়াছে এবং কলিকাতায় দুইখানা বাড়ী কিনিয়া, গ্রাম ত্যাগ করিয়া একখানায় নিজে বাস করিতেছে এবং অপরখানা ভাড়া খাটাইতেছে।

নীলাম্বরের সম্পত্তি আছে, কিন্তু সুখ নাই; যেহেতু, সম্প্রতি তাহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিয়াছে। স্ত্রীকে হারাইয়া এই ছয় মাস নীলাম্বর যেন জগতের সকল সম্পত্তি হারাইয়াছে। সংসার তাহার চক্ষে মরুভূমিতুল্য হইয়াছে। কিছুই আর তাহার ভালো লাগে না। বাহিরের দেহ সচল বটে, কিন্তু ভিতরের মনটা স্ত্রীর সঙ্গেই যেন সহমরণ করিয়াছে! বয়স চল্লিশের উপর। সংসারে বামুন-চাকর ছাড়া আর কোন লোক নাই। তাই অনেক দিক্ বিবেচনা করিয়া স্ত্রীর মৃত্যুর দুই মাস পরে শ্যালক কামিনীকান্তকে তাহার দেশ হইতে আনাইয়া নীলাম্বর নিজের বাটীতে রাখিয়াছিল।

কামিনীর বয়স ত্রিশ-বত্রিশ; লেখাপড়া তেমন না শিখিলেও খুব চালাক-চতুর। দেশে কামিনী কোন কাজ-কর্ম্ম করিত না। পিতা জীবিত এবং পেন্সন-প্রাপ্ত। এত দিন ধরিয়া পিতার অন্ন ধ্বংস করিয়া আসিতেছিল; তাহার পর ভগিনীপতির আমন্ত্রণে ছোট ভাই যামিনীর উপর পিতা এবং সংসারকে ছাড়িয়া দিয়া সে কলিকাতায় ভগিনীপতির গৃহে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছে। যে মাসে কামিনী আসিল, তাহার পরের মাসে তাহার ছেলে দুইটিকেও আনাইয়া লইল এবং তাহার পরের মাসে স্ত্রীটিকেও কাছে আনাইয়া বেশ ভাল করিয়া ভগিনীপতির সংসারে চাপিয়া বসিয়াছে।

ভগিনীপতির মনের অবস্থা শোচনীয়। আহারে রুচি নাই, চোখে নিদ্রা নাই, কোন-কিছুতে মন বসাইতে পারে না। পূর্ব্বে যে-সব জিনিসের উপর খুব সখ ছিল, এখন সে সব অযত্নে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কথায়-কথায় সকলের কাছে বলে—'যার স্ত্রী নেই, জগতে তার কেউই নেই! কিছুই নেই!'

ভগিনীপতির মৃত অন্তরকে সজীব করিবার শুভ ইচ্ছায় শ্যালক কামিনীকান্ত স্থানীয় লাইব্রেরী হইতে নানা প্রকার গল্প-উপন্যাসের বই আনিয়া নীলাম্বরকে পড়িবার জন্য দিতে লাগিল। 'কলঙ্কিনী', 'হিতে বিপরীত', 'জীবন-সমস্যা', 'সুলেখার পরিণয়', 'ঋণ শোধ'—প্রভৃতি নানা প্রকার বই আসিতে লাগিল; কিন্তু নীলাম্বর মন বসাইয়া কোন বই-ই পড়িতে পারে না। কোন বই-ই তাহার ভালো লাগে না। দু'-এক পাতা পড়িবার পরেই বই বন্ধ করিয়া ফেলিয়া রাখে। কিন্তু দশ-পনের দিন পরে হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, নীলাম্বর অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে একখানা বই পড়িতেছে। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—সর্ব্বদাই সে বইখানা নীলাম্বরের হাতে। বইখানা 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'। সে-দিন দুপুর বেলা কামিনী দেখিল, নীলাম্বর তাহার শয্যার উপর চিৎ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; তাহার বুকের উপর 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম', সেই দিন মনে মনে ভাবিল, এইবার ভগিনীপতির অসুস্থ মনটা বোধ হয় একটু ভালোর দিকে ফিরিবে।

কিন্তু ফল হইল বিপরীত। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' পড়িবার ফলে নীলাম্বরের মন আরও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। অবস্থা আরও খারাপ হইল। আগে তবু দু'বেলা দু'মুঠা খাইত, এখন সে-খাওয়া পর্য্যন্ত তাহার ত্যাগ হইল। আগে দু'-এক ঘণ্টার জন্যও ঘুম হইত, এখন সারা রাত্রের ভিতরও তাহার চোখের পাতা বোজে না। আগে যাহাই হোক, সামান্য-কিছুক্ষণের জন্য এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইত, এখন নিজের শয়নগৃহ—অর্থাৎ শয়ন মন্দির—সেই 'শয়ন-মন্দির'—সেই চির-আদরের, চির-আকাঙ্ক্ষিত, সহস্র স্মৃতি-বিজড়িত শয়ন-মন্দির ছাড়া আর কোথাও বাহির হয় না।

ক্রমে নীলাম্বরের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল; ডাক্তারের সাহায্য লওয়া ছাড়া আর উপায় রহিল না। ডাক্তার আসিয়া ভালো করিয়া রোগীকে দেখিলেন; কিন্তু রোগ-নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তবে পরাভব মানিলেন না; বলিলেন—'হার্ট' ঠিক 'য়্যাক্ট্' করচে না, লিভারও বেশ একটু বেঁকে বোসেচে! 'ইউরিন্'-এরও

বোধ হচ্ছে যেন একটু গোলযোগ দাঁড়িয়েছে। ওটা একবার 'এগ্‌জামিন' করানো দরকার।"

অতঃপর 'ইউরিন্‌' এগ্‌জামিনের বন্দোবস্ত করিয়া ডাক্তার প্রেস্‌ক্রপশন লিখিয়া দিলেন।

ডাক্তার প্রত্যহ আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন এবং উঠিয়া-পড়িয়া নীলাম্বরের রোগের সহিত লড়াই করিতে লাগিলেন, যদিও রোগটা কি, তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই। যথাসময়ে 'ইউরিন্‌' পরীক্ষার রিপোর্ট আসিল; তাহাতে দোষের কিছু পাওয়া গেল না। 'ইউরিনে'র পর থুতু, গয়ের, রক্ত ও মল একে একে সবই পরীক্ষার জন্য পাঠানো হইল এবং একে একে সকলেরই রিপোর্ট যাহা আসিল, তাহা হইতে এমন কিছুই পাওয়া গেল না, যদ্দারা রোগের কোন কিনারা করিতে পারা যায়। তখন ডাক্তারবাবু কহিলেন যে, দাঁতগুলা সব তুলিয়া ফেলিতে হইবে; সম্ভবতঃ দাঁত হইতেই যত কিছু হইতেছে। কিন্তু নীলাম্বর দাঁত তুলিতে কিছুতেই রাজী হইল না। কামিনীর স্ত্রী কামিনীকে আড়ালে ডাকিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—"নন্দাইয়ের হৃদয়টা যদি এগ্‌জামিনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সব জানা যেতে পারবে।"

কিন্তু দুই-চারি দিন পরে নীলাম্বরের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে সুরু করিল। এখন সে তাহার 'শয়ন-মন্দিরে' দিন-রাত পড়িয়া থাকিয়া হা-হুতাশ করে না; এখন দিনের বেশীর ভাগ সময় সে বাহিরে-বাহিরেই কাটায়। এখন 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'খানাকে হাতে লইয়া ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে না। এখন তাহার পূর্ব্বেকার সেই অর্থহীন শূন্য-দৃষ্টির পরিবর্ত্তে তাহাতে যেন কিসের একটা তীব্র লালসা সদাসর্ব্বদা উছলিয়া পড়িতেছে। আহারে এখন তাহার খুবই রুচি এবং ঝোঁক এবং সেই অনুযায়ীই আহার-দ্রব্যের আয়োজন হয়! সাজ-সজ্জার পারিপাট্যও তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা বহুলাংশে উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু.........

কিন্তু......কামিনীকান্ত লক্ষ্য করিল, এক রোগ তাহার সারিয়াছে বটে, কিন্তু অন্য রোগে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। এ রোগ একটু গুরুতর! অর্থাৎ বাসে-ট্রামে কোন তরুণীকে বসিয়া থাকিতে দেখিলে, নীলাম্বর আবশ্যক না থাকিলেও সেই বাসে বা ট্রামে উঠিয়া পড়ে এবং টিকিট কিনিয়া সেই তরুণীর দিকে গোপন চাহনি হানিতে থাকে। বৈকালের দিকে 'লেডিজ পার্ক'এর আশে-পাশে অনাবশ্যক ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়! সিনেমায় কোন অভিনেত্রীর অভিনয় দেখিয়া মাথা খারাপ করিয়া বাড়ী ফেরে ও সেই অভিনেত্রীর খোঁজ-খবর লয়। নিজের কোন সন্তানাদি না থাকিলেও চারি দিক্‌কার 'গার্ল্‌স স্কুলে' গিয়া কন্যাকে ভর্ত্তি করিবার অছিলায় তথাকার মিষ্ট্রেসদের সহিত বসিয়া বসিয়া নানারূপ আলোচনা করে। এই সব দেখিয়া কামিনী বুঝিল,—ব্যাপার গুরুতর। সে মহা-চিন্তায় পড়িল।

কামিনীর দুর্ভাবনার দুইটি কারণ ছিল। একটি তাহার নিজের সম্বন্ধে, অপরটি নীলাম্বরের সম্বন্ধে। নীলাম্বরের সম্বন্ধে তাহার দুশ্চিন্তা এই যে, মেয়েদের পিছনে সর্ব্বদা এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে, কবে হয়তো কোথাও ঘোরতর অপমানিত হইয়া পড়িবে। আর তাহার নিজের সম্বন্ধে যে দুশ্চিন্তা, তাহা একটু গভীর! কামিনীর মনে বরাবর আশা ছিল যে, অপুত্রক ভগিনীপতির সম্পত্তি ও অর্থ ভবিষ্যতে এক দিন তাহারই অধিকারে আসিবে। কিন্তু এখন তাহার দুশ্চিন্তা হইল যে, যদি নীলাম্বর মেয়েদের পিছনে এই প্রকার লোলুপ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোন সধবা-বিধবা অথবা অধবার পাণিগ্রহণান্তর তাহাকে গৃহ-জাত করিয়া ফেলে এবং ভবিষ্যতে তাহার সন্তানাদি হয়, তাহা হইলে......

ইহার পর কামিনী আর ভাবিতে পারে না,—একেবারে নিরাশায় মুস্‌ড়াইয়া পড়ে। কিন্তু মুস্‌ড়াইয়া পড়িলে চলিবে না। কামিনী ঠিক করিল, যেমন করিয়া হউক, এ পথ হইতে নীলাম্বরকে ফিরাইতেই হইবে! এ ঝোঁকটা তাহার ঘুরাইয়া দিতেই হইবে। কিন্তু কি উপায়ে তাহা করা যায়? অন্য কোন্‌ পথে তাহার মনটাকে ফিরানো যায়? কামিনী দিবারাত্র ইহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় উপায় আপনা হইতেই আসিয়া পড়িল। রায় বাহাদুর সারদা ভট্টাচার্য্য এই পাড়ারই এক জন অধিবাসী। কয় বৎসর হইল বাটী নির্ম্মাণ করিয়া এ-পাড়ায় তিনি বাস করিতে-ছেন। সন্ধ্যা হয়-হয়; নীলাম্বর লেডিজ পার্ক-এর দিক্‌ হইতে দ্রুতপদে বেড়াইয়া আসিয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গেই সারদা ভট্টাচার্য্য তাহাকে তাড়া করিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন; কহিলেন—"আপনাকে এক জন ভদ্রলোক বলে জানতুম! কিন্তু এ-সব আপনার কি রকম স্বভাব মশাই! আমার ভাইঝিটি রোজ এসে আমাকে...। বেহায়ার মত তাঁর পেছনে পেছনে... ...আপনার জ্বালায় দেখছি......!"

কামিনী তখন ঘরের মধ্যে উপস্থিত ছিল। ব্যাপারটা আভাসে কিছু বুঝিলেও সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না,—"কি হোয়েচে মশাই?"

চোখ দুইটা পাকাইয়া রায় বাহাদুর বলিলেন—"কি হোয়েচে, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন। দেখুন, এ-সব ভদ্রলোকের কাজ নয়! পরের মেয়েছেলের দিকে......।"

বাকী কথাগুলো রাগে রায় বাহাদুরের মুখ হইতে আর বাহির হইল না। শুধু মিনিট-খানেক ধরিয়া এক-দৃষ্টিতে তিনি নীলাম্বরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে কহিলেন—"ফের যদি কখনো আপনার এ-রকম ভাব দেখি, তাহলে এই বোলে যাচ্চি, আপনাকে ভালো রকম ঘোল খাইয়ে তবে আমি ছাড়বো! আমার নাম রায় বাহাদুর সারদা ভট্‌চাজ্জি!"

তার মুখের কথাগুলা ঘরের স্তব্ধ বাতাসে যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া ঘুরিতে লাগিল—'রায় বাহাদুর সারদা ভট্‌চাজ্জি!'

রায় বাহাদুর চলিয়া গেলে নীলাম্বর একটু যেন গর্জ্জনের সুরে কহিল—"ওঃ! ভারি আমার রায় বাহাদুর! ঘোল খাইয়ে ছাড়বেন! মগের মুল্লুক আর কি! ঘোল-খাওয়ানোটা অত..."

কামিনী জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি দাদাবাবু?"

"ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়!" একটু চুপ করিয়া ফের নীলাম্বর কহিল—"হাঁ, ব্যাপার যে কি, তা তো জানি না। কে ওঁর ভাই-ঝি, কি তাঁর হোয়েচে, উনিই বা কে,—কিছুই জানি না! বোলে ত গেলেন খুবই!"

"ওঁর ভাই-ঝি বুঝি রোজ পার্কে বেড়াতে যায়?"

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া নীলাম্বর কহিল—"যায়, কি না-যায়, তা কে জানে! রূপে ত তিনি একেবারে অপ্সরা! তার দিকে আবার

কেউ……ওঃ! ভারি ভয় দেখিয়ে গেলেন! রায় বাহাদুর! ইচ্ছে করলে আমিও অমন রায় বাহাদুর হ'তে পারি।"

কামিনী দেখিল, অন্ত দিকে নীলাম্বরের মনকে ফিরাইবার এই উপযুক্ত পন্থা! কহিল—"লোকটার ত ভারি কটু-কটে কথা! রায় বাহাদুর হোয়ে ধরাকে সরা-জ্ঞান করচেন আর কি!"

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া নীলাম্বর কহিল—"আরে, আমি একটু চেষ্টা করলেই ও-রকম রায় বাহাদুর অক্লেশে হোতে পারি। হাজার-কতক টাকা খরচ—এই যা, আর তদ্বির। আর……"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! আপনার মত লোকের পক্ষে রায় বাহাদুরী পাওয়া বিশেষ-কিছু কঠিন কাজ নয়, দাদাবাবু! ভারী উনি রায় বাহাদুরী দেখিয়ে গেলেন! বাড়ী বোয়ে এসে অপমান! জগতে যেন উনি ছাড়া আর কেউ রায় বাহাদুর নেই!"

বাঁ হাতের তালুর উপর ডান হাতের একটা মুষ্টি আঘাত করিয়া নীলাম্বর কহিল—"রায় বাহাদুর আমি হবোই কামিনী! এই দ্যাখ্ হোতে পারি কি না!"—বলিয়া রাগে গব্-গব্ করিতে করিতে নীলাম্বর উপরের ঘরে চলিয়া গেল।

* * * *

প্রাতঃকাল।

বৈঠকখানার ঢালা ফরাস-বিছানার উপর নীলাম্বর বসিয়া ছিল। তাহারি সামনের একখানা চেয়ারে কামিনী উপবিষ্ট। নীলাম্বর মুখ তুলিয়া কামিনীর দিকে চাহিয়া কহিল—"কামিনী, আজ একবার দত্ত-সাধুর কাছে গিয়ে একটু তাড়া দিয়ে আয় ভাই। দু'মাস আড়াই মাস হোয়ে গেল; এদিকে টাকাও প্রায় হাজার দুই আড়াই বেরিয়ে গেল।"

কামিনী কহিল—"আপনি উতলা হবেন না! রায় বাহাদুরী আপনার নিশ্চয় ঘটবে। আজ আমি গিয়ে দেখা করব এখন।"

"আমিই না হয় আজ একবার যাবো! একটু ভালো কোরে তাড়া দিয়ে আসবো।"

বিশেষ চঞ্চল হইয়া কামিনী কহিল—না, না, আপনার গিয়ে দরকার নেই! আপনার সম্ভ্রম তাহলে নষ্ট হোয়ে যাবে। আজ বাদে কাল আপনি এক জন রায় বাহাদুর হবেন, আপনার বেশী খেলো হওয়া ঠিক নয়! আমিই আজ যাব এখন।"

মাস-তিন আগে রায় বাহাদুর হইবার যে উৎকট জিদ নীলাম্বরের মাথায় চাপিয়াছিল, ক্রমে-ক্রমে তাহা বেশ পাক ধরিয়া আসিয়াছে। কামিনীই তাহার এই জিদকে ঝাঁক দিয়া পাকাইয়া তুলিয়াছে। সে দত্ত-সাধু নামক এক গৃহী-সন্ন্যাসীকে আবিষ্কার ও হস্তগত করিয়াছে এবং নীলাম্বরকে জলের মত বুঝাইয়া দিয়াছে যে, দত্ত-সাধুর সঙ্গে বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীর ঘনিষ্ঠ প্রণয়; দত্ত-সাধু চেষ্টা করিলেই অতি সহজে নীলাম্বরের রায় বাহাদুরী লাভ ঘটিবে। তবে দত্ত-সাধুকে একটু তোয়াজ করিতে হইবে। সেই অনুযায়ী কামিনীর মারফতে দত্ত-সাধুকে বেশ ভালোরূপেই তোয়াজ করা হইতেছে। তবে তোয়াজের চার-আনা অংশ দত্ত-সাধুর পিছনে ব্যয় হইয়া বাকী বারো আনা কামিনীর পকেটে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

কামিনী কহিল—"দত্ত-সাধু যখন চেষ্টা করচেন, তখন হবেই। দশ লাখ টাকা সাধারণের হিতের জন্ম দান কোরে দিয়ে উনি সাধনার এই পথ আশ্রয় কোরেচেন। আপনার বরাত ভালো যে…"

বাধা দিয়া নীলাম্বর কহিল—"আরে, বরাত ভালো যে, তা কি কোরে বলব! হয় যদি তবে তো! তবে, রায় বাহাদুর আমাকে হতেই হবে, কামিনী, নইলে আমি বাঁচবো না।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

হাসিতে হাসিতে নীলাম্বর কহিল—"কি, নিশ্চয়? বাঁচবো না?"

"আরে, নিশ্চয় বাঁচবেন; অর্থাৎ নিশ্চয় রায় বাহাদুর হবেন। এর জন্মে আর আপনি ভাববেন না। মনে করুন যে, হোয়েই গেছেন। হ্যাঁ, একটা কথা, ওঁর স্ত্রীকে যে নেকলেশটা দেওয়া হোয়েছিল সেটা তো ওঁদের চুরি হোয়ে গেল! আমি বলি কি ব্যাপার তো তিনশোটা টাকার—আর একছড়া দিতে পারলে ভালো হয়। আপনি কি বলেন, দাদাবাবু?"

দাদাবাবু খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"তা, দিলে যদি ভালো হয়, দিস্। আজ যাবার সময় তিনশোটা টাকা নিয়ে যাস্। কিন্তু একটু বিশেষ কোবে ধরবি; যাতে শীগ্‌গির……"

"আপনি কিচ্-ছু ভাববেন না; শীগ্‌গিরই হবেন।…কে রে? ভজা? আজ চা করতে এত দেরী হোল কেন?"

ভৃত্য ভজহরি দুই কাপ চা লইয়া আগাইয়া আসিল এবং তাহা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কামিনী চা পান করিতে করিতে হর্ষোৎফুল্ল মনে ভাবিতে লাগিল, 'কেল্লা ফতে কিয়া! ঘুঁটি একেবারে উল্টে দিয়েছি! নইলে মেয়ে-মানুষের পেছনে পেছনে যে-রকম ছুট কাটতে সুরু করেছিল, একটা বিয়ে-টিয়ে ঠিকই কোরে ফেলতো। তার পর দু'-একটা ছেলে-পিলেও ঠিক হোত। সম্পত্তিগুলো পাবার আর আমার কোন আশা থাকতো না। যাক্ —এখন আমিই বা কে, আর রাজা রাজবল্লভই বা কে?'—কামিনী এক-এক চুমুক চা যেন সুধাস্বরূপ উদরস্থ করিতে লাগিল।

চা পান করিয়া গড়্-গড়াতে তামাক টানিতে টানিতে নীলাম্বর তাহার রায় বাহাদুরী স্বপ্নে বিভোর হইয়া অনেক-কিছু ভাবিতে লাগিল। তাহার মনের উপর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—সাধারণে তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি, সরকারী-মহলে মান-সম্ভ্রম, সারা দেশে নাম-ডাক, সভা-সমিতিতে উচ্চাসন—এইরূপ আরো কত-কি। আর চেয়ারে বসিয়া কামিনী ভাবিতে লাগিল—'আজকের তিনশো টাকার মধ্যে দত্ত-সাধুকে শ'খানেক না দিয়ে উপায় নেই! ওকে এঁটে উঠতে পারা যাবে না! গভীর জলের মাছ! কিন্তু উপযুক্ত লোককে আমি সন্ধান কোরে বা'র কোরেছি!'

সন্ধ্যার পর কামিনী বেহালা-বড়িসায় দত্ত-সাধুর ওখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া হর্ষ-গদ্‌গদ স্বরে নীলাম্বরকে কহিল—"রায় বাহাদুর হবার আর কোন সন্দেহই নেই! মনে করবেন যে হয়েই গেছেন। মিষ্টার শারক্রুকের সঙ্গে ওঁর কাল অনেক-কিছু কথা হোয়ে সব এক-রকম ঠিক-ঠাক হোয়ে গেছে। নতুন হার ছড়াটা কিছুতেই নিতে রাজী নন্! অনেক সাধ্যি-সাধনা কোরে পায়ের তলায় রেখে দিয়ে এসেছি।"

সংবাদ শুনিয়া নীলাম্বর লাফাইয়া উঠিল; উৎফুল্ল অন্তরে কহিল —"বলিস্ কি রে! সব ঠিক-ঠাক্?"

"হ্যাঁ। মনে করুন, হোয়েই গেছেন।"

"মনে করুন—তাই-ই।" তার পর একটু উচ্চ কণ্ঠে কহিল—"রায় বাহাদুর আপনি হবেনই হবেন,—একেবারে ধ্রুব।"

আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিন মাস পূর্ব্বের সেই সে-দিনকার মত বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের একটা ঘুষি মারিয়া নীলাম্বর কহিল—"রায় বাহাদুর আমি হবই হব, কামিনী।"

সে-রাত্রে নানারূপ আনন্দের স্বপ্নে নীলাম্বরের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল।

পরদিন নীলাম্বর কামিনীকে না জানাইয়া দত্ত-সাধুর সঙ্গে দেখা করিতে বেহালায় গেল। বাহিরের ঘরখানাতে তিনি বসিয়াছিলেন। হাতে একছড়া তুলসীর মালা ছিল এবং ঠোঁটদুটি অল্প অল্প নড়িতেছিল; সম্ভবতঃ তিনি নারায়ণের নাম জপ করিতেছিলেন।

নীলাম্বর মুক্ত দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই দত্ত-সাধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে কহিলেন—"আসুন রায় বাহাদুর, —আসুন আসুন। শরীর ভালো আছে তো?—নারায়ণ! নারায়ণ!"

নীলাম্বর ভক্তিভরে তাঁহার পায়ে প্রণাম করিয়া কহিল—"আপনি তো আগে থেকেই আমাকে রায় বাহাদুর কোরে দিলেন।"—বলিয়া হি-হি করিয়া একটুখানি হাসিল।

অতঃপর উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল,—জ্ঞানের কথা, ধর্ম্মের কথা, সাধক-সাধনার কথা, নশ্বর জগৎ-সংসারের কথা, ইত্যাদি। সেই সঙ্গে দত্ত-সাধু এ-কথাটাও জোরের সঙ্গে জানাইয়া দিলেন যে, তাহার মুখ দিয়া যখন রায় বাহাদুর সম্বোধন বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তখন উহা নীলাম্বরের লাভ হইবেই হইবে!

নীলাম্বরের অন্তর আশায় ভরিয়া উঠিল। কহিল—"শুনেচি আপনি শ্রেষ্ঠ সাধক! লোক-হিতে সর্ব্বস্ব দান কোরে……"

বাধা দিয়া দত্ত-সাধু কহিলেন—"ও-সব কথা বলবেন না; আমার শুনতে নেই। আমি এক জন সামান্য লোক, নরাধম। তবে নারায়ণের কৃপায়, সরকারী মহলে যা'কে যা' বলবো, তা' কেউ ঠেলতে পারবে না।"—সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার দুই চক্ষু মুদ্রিত হইল এবং ঠোঁট দুইটি নড়িতে লাগিল; অর্থাৎ নারায়ণের নাম জপিতে লাগিলেন।

নীলাম্বরের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল! সেই নৃত্যের তালে-তালে দেয়ালের ঘড়িটায় ঠং-ঠং করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল। দত্ত-সাধু ভিতরের দরজার দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ-গলায় ডাকিলেন—"পদ্ম! পদ্ম!'

দরজা ঠেলিয়া একটি ৩০।৩২ বৎসর বয়সের বিধবা যুবতী ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। দত্ত-সাধু তাহাকে কহিলেন—"দু' কাপ চা কোরে আনো, মা।"

যুবতী চলিয়া গেলে নীলাম্বরের দিকে ফিরিয়া দত্ত-সাধু কহিলেন—"আমার ভাগ্নী পদ্মরাণী। ওর বাবা কাল এসে এখানে রেখে গিয়েচে। ১২ বছর বয়সেই ওর বাবা ওর বিরে দেয়; বছর তিন-চার পরে জামাইটি গেল মারা!—নারায়ণ! নারায়ণ!"

অতঃপর পদ্মরাণী-সংক্রান্ত আরো অনেক কথা হইল। পরিশেষে দত্ত-সাধু কহিলেন—"ভগবানের ধ্যান-ধারণাতেই জীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু আমার মতে. ও-জিনিবটা ঠিক এ-বয়সের নয়। সংসার-ধর্ম্ম করাও একটা মস্ত সাধনা। এ-বয়সে ওটারও প্রয়োজন আছে। আমার ইচ্ছে……।"

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। দুই হাতে দুই কাপ লইয়া পদ্ম প্রবেশ করিল ও সতরঞ্চের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

* * *

পরের দিন।

আবার দত্ত-সাধুর সেই বাহিরের ঘর।

"একটু চা কোরে আনো মা।" দত্ত-সাধু পদ্মরাণীর দিকে চাহিলেন।

"থাক্, থাক্; আর কষ্ট কোরে চা করবার দরকার নেই। —আচ্ছা, এ আসনখানাও কি আপনার ভাগ্নীর হাতের বোনা? বড় সুন্দর ত!"—নীলাম্বরের চোখে-মুখে আনন্দের একটা ঝলক খেলিতে লাগিল। "এ রুমালখানা?"

"সব—সব। সেলাইয়ের কাজে ও একেবারে পাকা।"

আত্মপ্রশংসা শুনিয়া পদ্ম উঠিয়া পড়িল এবং চা তৈরী করিবার অভিপ্রায়ে ভিতরে চলিয়া গেল। নীলাম্বর পদ্মর সেলাই ও বোনার কাজগুলি একে একে দেখিতে লাগিল।

* * *

"তোমার সেই গানটা একবার গাও পদ্ম, সেই—'তুমি আর একটি দিন থাকো'।"

"ও গানখানা আপনার খুব ভালো লাগে; না?"

"বড্ড।"

আরো এক সপ্তাহ পরের কথা। তবে দত্ত-সাধুর বাহিরের সেই ঘরখানা নয়; ভিতরের একখানা ঘর। ঘরের মধ্যে নীলাম্বর আর পদ্ম।

পদ্মরাণী হার্ম্মোনিয়ম-সহযোগে গান ধরিল

'তুমি আরেকটি দিন থাকো।
হে চঞ্চল! যাবার বেলায় মোর মিনতি রাখো।
ভালো ছিলুম আমি একা,
কেন নিঠুর দিলে দেখা?
তুমি ঝরা-ফুলে গাঁথলে মালা, গলায় দিলে নাকো।'

নীলাম্বর পদ্মর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া তন্ময় চিত্তে গান শুনিতে লাগিল।

* * * *

নীলাম্বর আবার অসুস্থ। আবার তাহার আহারে রুচি নাই, ক্ষুধা নাই, নিদ্রা নাই, উৎসাহ নাই। আবার সারা দিন-রাত বিমর্ষ হইয়া থাকে। চোখে-মুখে সে প্রফুল্লতা নাই; আবার যেন ভিতরে ভিতরে তাহার কোন ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে! দ্বিপ্রহরে কোন দিনই আর বাড়ীতে থাকে না। কেহ জানে না কোথায় যায়। হয় কোন পার্কে কিম্বা পথের ধারে কিম্বা আর কোথাও গিয়া কাটাইয়া আসে। কামিনী এক দিন কহিল—"দাদাবাবু, ডাক্তার ডাকবো কি? একটু ওষুধ-পত্তর……

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া নীলাম্বর কহিল—"না, না। আর ডাক্তার-ওষুধের দরকার নেই।"

"এবার খালি একটা অজানা উদ্বেগের জন্যেই আপনি শরীরটাকে

অসুস্থ কোরে তুলচেন! এত কোরে বলচি যে, রায় বাহাদুর আপনি হবেন—হবেন—হবেন! তার আর······"

ভয়ানক একটা ধমক দিয়া নীলাম্বর চেঁচাইয়া উঠিল—"দুত্তোর রায় বাহাদুর। রায় বাহাদুরীর জন্ম তো আমার ঘুম নেই! যত সব বাজে······আমি রায় বাহাদুর হতে চাই না।"

আশ্চর্য্য হইয়া কামিনী কহিল—"চান্ না?"

"মোটেই না" বলিয়া মুখখানা নীলাম্বর অন্য দিকে ফিরাইল!

কামিনী অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল; আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। কামিনী নীলাম্বরের ব্যাপার লইয়া অনেক দিকে অনেক কিছু চিন্তা করিল:—"আবার দেখচি দাদাবাবুর কিছু একটা হোয়েচে! এবার বোধ হয় 'ব্রেণ য়্যাফেক্‌ট্' কোরেচে! ডাক্তারের কথা বলতে গেলুম, যেন তেড়ে মারতে এলো! যাক্ গে, আমারই মঙ্গল! পাগল হোয়ে গেলে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আমি দেখা-শুনা করব। আর একেবারে যদি পটল তোলে, তা হোলে তো আমার একেবারে পোয়া-বারো। তখন সেই পটলের 'দোরমা' বানিয়ে 'পোলাও' খাবো! কিন্তু ও যায় কোথা? কোথায় বা ঘুরে-ঘুরে বেড়ায় সন্ধান নিতে হবে এক বার।"

নীলাম্বরের রায় বাহাদুরী উপলক্ষ্যে প্রায় হাজার দুই টাকা ইতিমধ্যে কামিনীকান্তের হস্তগত হইয়াছে। সুতরাং বন্ধু-বান্ধব এবং 'ইত্যাদি' লইয়া সে দিবারাত্র এত ব্যস্ত যে, নীলাম্বর কোথায় ঘোরে, কোথায় যায়, দিন-পনেরর মধ্যে সে-সংবাদ লইবার তাহার সময় হইয়া উঠিল না।

পনেরো দিন পরে কামিনী তাহার এক বন্ধুর ভাইপোর বিবাহে বরযাত্রী হইয়া বীরভূম যাত্রা করিল। দিন-চারেক পরে বাড়ী ফিরিলে নীচের দালানে তাহার স্ত্রীর সঙ্গে তাহার প্রথম দেখা হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"দাদাবাবু কেমন আছে?"

স্ত্রী মানদা কহিল—"খুব ভালো। ওপরে গিয়ে দেখগে যাও!"

কথার ভাবে কামিনীর যেন কি-রকম একটা ধাঁধা লাগিল! নিঃশব্দ-পায়ে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল এবং উঁকি দিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল! দেখিল, নীলাম্বর আর দত্ত-সাধুর ভাগ্নী পদ্ম মুখোমুখী বসিয়া আছে। পদ্মরাণীর সীঁথিতে সিন্দূর জ্বল-জ্বল্ করিতেছে, আর নীলাম্বরের সারা মুখে আনন্দের তরঙ্গ খেলিয়া বেড়াইতেছে। তেমনি ভাবে পা টিপিয়া টিপিয়া নীচে নামিয়া আসিলে মানদা তাহার হাতে একখানা ছাপানো কাগজ দিল। কামিনী দেখিল, বিয়ের একখানা 'প্রীতি উপহার'। মনে মনে সেখানা পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল:—

শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মিত্রের সহিত দিদিমণির বিয়েতে মনের কথা

দাদাবাবু—
নীল অম্বর ছেড়ে তুমি
পরলে রাঙ্গা বিয়ের চেলি।
রাঙ্গা বধূর মধুর হস্ত
ধরলে আজি হস্ত মেলি'॥
ওগো মিত্র মহাশয়,
তুমি প্রবীণ অতিশয়—
বৃদ্ধ মনের শুদ্ধ আলোক
তোমার দেহে উছলে ওঠে!
তা'রি লোভে আজকে সাঝে
পদ্মরাণীর মুখটি ফোটে।
ভগবানে জানাই—দোঁহে
সারা জীবন সুখে থেকো—
জীবন-সঙ্গিনী কোরে
পদ্মটিকে পাশে রেখো।

তোমার ছোট শালী
অসীমা

কাগজখানা হাতে করিয়া কামিনী থপ্ করিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

দুর্গতি-মাঝে এস মা দুর্গে

প্রলয়ঙ্করী তিমির রাত্রি নেমেছে ধরণীতলে,
বিশ্ব ব্যাপিয়া সৃষ্টিবিনাশী প্রলয়-বহ্নি জ্বলে।
এবার সবার মরণোৎসব, আর্ত্তকণ্ঠে ওঠে কলরব;
আজি এ শ্মশানে বোধনের দিনে জাগো মাতা দশভুজা,—
শবসাধনায় তুষিব তোমায় সঁপিয়া ব্যথার পূজা।

হস্তে তোমার বরাভয় ল'য়ে এস মা গো অম্বিকা,
দুর্গত তব ভক্তের ভালে এঁকে দাও জয়টীকা।
মঙ্গল কর পরশে তোমার, ঘুচাও অশুভ অশিব সবার;
মহামারী আর অন্নাভাবের অসুরে করিয়া জয়,—
দুর্গতি-মাঝে এস মা দুর্গে নাশিতে দৈত্য-ভয়।

শ্রীনীলরঞ্জন দাশ (বি-এ)
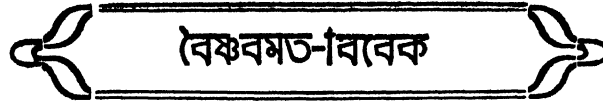
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

প্রথম অধ্যায়

শ্রীবৃন্দাবনের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক গোস্বামিগণের **জীবন-কথার আলোচনা** করিবার পরই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর **জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা** করা সঙ্গত। কারণ, তাঁহারই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থরচনার দ্বারা গোস্বামিগ্রন্থের সার সাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহারাও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া গোস্বামি-সিদ্ধান্তের সহিত সুপরিচিত হইতে পারেন। লীলা ও সিদ্ধান্তের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ যে প্রকারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে আর কোনও গ্রন্থে তাহা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং সংস্কৃতে লিখিত মুরারিগুপ্তের করচা (শ্রীচৈতন্যচরিতং) বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ হইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের শেষলীলা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ। বিশেষতঃ রসসিদ্ধান্ত, দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও ভক্তিশাস্ত্রাদির সার এই গ্রন্থে যেরূপ সংক্ষেপে ও সুললিত ভাষায় সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে নহে, সমগ্র জগতের মধ্যে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। লীলা-গ্রন্থ হিসাবে ইহাকে একরূপ চৈতন্যভাগবতের উত্তরভাগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু লীলাগ্রন্থ হিসাবে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ইহার একটু বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের লীলা সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা শ্রীজগদীশ্বরের লীলা, আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লীলা নিখিল ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যের শিরোমণি সর্ব্ব-অবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা। শ্রীরূপ-সনাতনের প্রতিপাদিত পরতত্ত্বরূপে শ্রীচৈতন্যদেবকে গ্রহণ করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যাঁহার পদে আপনার প্রাণমন উৎসর্গ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন—তাঁহার সেই অভীষ্টদেবের তত্ত্ব ও লীলা তিনি এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৃত্তি-সহিত শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের করচা, শ্রীল কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, শ্রীল রঘুনাথ দাসের শ্রীচৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ, শ্রীল রূপ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যাষ্টকত্রয়, শ্রীল মুরারিগুপ্তের করচা— শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী সংগ্রহের ব্যাপারে এই সমস্ত গ্রন্থই গ্রন্থকারের মূল অবলম্বন। ফলতঃ, অদ্যাবধি যে সমস্ত লীলাগ্রন্থ পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ তাহার শিরোমণিরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত লীলা বর্ণনা বিষয়ে কোনও প্রামাণিক গ্রন্থের সহিত এই মহাগ্রন্থের কুত্রাপি বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় না। পরন্তু, এই গ্রন্থে সমসাময়িক সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধেও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য উপাদান পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ হিসাবেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সর্ব্ববৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের সার সমুদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীল রামানুজের পরম গুরু শ্রীল যামুনাচার্য্যের ভাগবততত্ত্ব সিদ্ধান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ইহাকে ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্, গীতা ও শ্রীভাগবতপ্রমুখ সর্ব্বশাস্ত্রের সার সমাহৃত হইয়াছে। শ্রীভাগবতের সিদ্ধান্ত বিশেষতঃ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের "বৈষ্ণবতোষণী" নামক সিদ্ধান্তপূর্ণ দশমস্কন্ধের টীকা, শ্রীজীব গোস্বামীর সমগ্র ভাগবতের টীকা ক্রমসন্দর্ভ, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, শ্রীরূপ গোস্বামীর লঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীবিদগ্ধমাধব, শ্রীললিতমাধব, শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ ও সর্ব্বসম্বাদিনী, গোপালচম্পু, শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর স্তবমালা, মুক্তাচরিত ও দানকেলি-চিন্তামণি শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীপাদ সনাতনরচিত দিগ্‌দর্শিনী টীকা প্রমুখ যাবতীয় গোস্বামিগ্রন্থের সার কোথাও বিস্তৃত ভাবে, কোথাও সূত্রাকারে এই মহাগ্রন্থে সুরক্ষিত হইয়াছে। এই জন্যই এই গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পর হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

ভক্তিরত্নাকরে ও নরোত্তমবিলাসে এই প্রামাণিক গ্রন্থের বহু স্থল প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। বহু বৈষ্ণবগ্রন্থের কর্ত্তা সুবিখ্যাত লেখক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই মহাগ্রন্থের একটি সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। (১) বাঙ্গলা গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা—এই সর্ব্বপ্রথম। সুপণ্ডিত, সুরসিক ভক্ত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর এই টীকা-প্রণয়ন হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বজনপূজ্য গ্রন্থ। যখনই এই গ্রন্থে কোনও মত বা সিদ্ধান্ত উপস্থিত করা হইয়াছে, তখনই তাহা ছয় গোস্বামীর কাহারও গ্রন্থ হইতে মূল উদ্ধারের দ্বারা প্রমাণিত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ইহা সর্ব্বজন-বিদিত অবিসম্বাদিত মহাসত্য যে—শ্রীচৈতন্যদেব নিজে কোনও গ্রন্থ লিখিয়া স্বীয় মত লিপিবদ্ধ করেন নাই; পরন্তু, তাহা তাঁহারই নিজাঙ্গস্বরূপ ছয় গোস্বামীর দ্বারা করাইয়াছেন এবং এই ছয় গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত ভাবে প্রচার করিয়াছেন।

যে কালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখিত হয়, তখন ব্রজধামে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত গোস্বামিগণ—বর্ত্তমান মহাপ্রভুর পার্ষদ ও সঙ্গী মহাপ্রভুর লীলা-প্রত্যক্ষকারী বহু বৈষ্ণব এই গ্রন্থের লিখিত বিষয়াবলী শ্রবণ করিয়া—অনুমোদন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন। অতএব এই গ্রন্থ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লিখিত হইলেও ইহা তাৎকালিক ব্রজবাসী ঋষিকল্প শ্রীল হরিদাস গোস্বামিপ্রমুখ বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণের আজ্ঞায় লিখিত এবং তাৎকালিক সর্ব্ববৈষ্ণবেরই অনুমোদিত। গ্রন্থকার বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা পাইয়া শ্রীমদ্ গোপালদেবের সমীপে তাঁহার আজ্ঞা ভিক্ষা করেন—শ্রীভগবদাজ্ঞা ভক্তের আজ্ঞায় অনুমোদন করিলে তবে গ্রন্থকার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলেন—যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

(১) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাখনলাল দাস বাবাজীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্করণে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের নাম দিয়া একটি সংস্কৃত টীকা প্রকাশিত হয়, কিন্তু ঐ টীকা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বনাথের কি না, তদ্বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া থাকেন।

"আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সভার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া।
তা সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাইয়া চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাম আজ্ঞা মাগিবারে?
দর্শন করিয়া কৈলুঁ চরণ বন্দন।
গোসাঞি দাস পূজারী করে চরণ সেবন॥
প্রভুর চরণে যবে আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সর্ব্ববৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল॥
আজ্ঞামালা পাঞা মোর হইল আনন্দ।
তাঁহাই গ্রন্থের তবে করিল প্রবন্ধ॥
এ গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
যেই লিখি মদনগোপাল মোরে যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুতুল যৈছে কুহকে নাচায়॥

—আদি, ৮ম

কিরূপ নিরপেক্ষ ভাবে এই গ্রন্থ লেখা উচিত মনে করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিতেছেন—

* * * *

প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে॥
নাহি কাঁহাসো বিরোধ নাহি কাঁহা অনুরোধ
সহজ বস্তু কবি বিবেচন।
যদি হয় রাগ দ্বেষ তাঁহা হয় আবেশ
সহজ বস্তু না যায় লিখন॥

* * * *

স্বরূপ গোসাঞির মত রূপ রঘুনাথ জানে যত
তাহি লিখি নাহি মোর দোষ॥

—মধ্য, ২য়

এতাদৃশ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জীবনকথা জানিবার জন্য ভক্তগণের মধ্যে ঐকান্তিক আগ্রহ থাকিলেও তাঁহার জীবনকথা সংগ্রহ করিবার মত উপাদান নিতান্তই বিরল। তথাপি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাসপ্রমুখ গ্রন্থে যাহা কিছু উপাদান পাওয়া যায় তাহার সাহায্যেই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার জীবনকথা আলোচনা করিয়া তৎপরে তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ঝামটপুর নামে একটি গ্রাম বিদ্যমান। ঐ গ্রাম অজয় নদের উত্তরে এবং ভাগীরথীর পশ্চিম পারে কাটোয়া হইতে উত্তরে তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ নবহট্ট বা নৈহাটির সন্নিকটে অবস্থিত। ঐ গ্রামে কোনও বৈদ্যজাতীয় (২) সম্পত্তিশালী গৃহস্থের বংশে কৃষ্ণদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কৃষ্ণদাসের পিতৃগৃহে শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীল রাধামদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ পূজারীর দ্বারা ঐ বিগ্রহের সেবার বন্দোবস্ত ছিল। (৩) যাঁহার গৃহে এই প্রকারে ব্রাহ্মণ পূজারীর দ্বারা বিগ্রহের সেবার বন্দোবস্ত ছিল—তাঁহাকে কোন ক্রমে দরিদ্র বলা যায় না। সম্ভবতঃ কবিরাজ গোস্বামীর বংশ ব্রাহ্মণ হইলে তাঁহারা স্বহস্তেই ঠাকুরসেবা করিতেন। কবিরাজ গোস্বামীর শৈশবে গুণার্ণব মিশ্র নামক এক জন পূজারী ঐ বিগ্রহের সেবা করিতেন। ১৫০৩ শকে বা উহার কাছাকাছি সময়ে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত হয়; ঐ সময়ে গ্রন্থকার বৃদ্ধ ও জরাতুর। অতএব ঐ সময়ে তাঁহার প্রায় সপ্ততি বৎসর বয়স হইয়াছিল ধরিয়া লইলেও আনুমানিক ১৪৩৫।৩৬ শকে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ কবিরাজ গোস্বামী হইতে নিশ্চয়ই বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কারণ, কবিরাজ গোস্বামী বহু স্থানেই শ্রীজীব গোস্বামীর বন্দনা করিয়াছেন। ইনি শ্রীরূপ-সনাতনের উপদেশানুসারে শ্রীজীবের নিকট শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এই জন্য শ্রীচরিতামৃতে ইঁহাকে শিক্ষাগুরু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীর এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। অনুমান হয়, অল্পবয়সে কৃষ্ণদাসের পিতা ও মাতা উভয়েই পরলোক গমন করেন। তথাপি ধনবান্ গৃহস্থের পুত্র বলিয়া শৈশব হইতে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাঁহারা উভয় ভ্রাতাই সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

সম্পন্ন বৈষ্ণবকুলে জন্ম হইলেও কৃষ্ণদাস শৈশবকাল হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তাঁহার পার্ষদগণের অলৌকিক কীর্ত্তিকাহিনীর সহিত বোধ হয় বিশেষ পরিচিত হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহাদের নাম উভয় ভ্রাতাই শুনিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণদাস শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উভয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার শ্রীমন্মহাপ্রভুতে বিশ্বাস থাকিলেও শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুতে তাদৃশ বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ছিল না। সম্ভবতঃ পুরীধামে মহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার পূর্ব্বেই কোনও উৎসব উপলক্ষে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর গৃহে অষ্টপ্রহরব্যাপী সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। ঐ সময়ে মহা প্রভাবশালী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সেবক শ্রীল মীনকেতন রামদাস কবিরাজ গোস্বামীর গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই

---

(২) কেহ কেহ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহার "কবিরাজ" উপাধি দেখিয়া তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়াই মনে হয় এবং তাঁহার লিখিত পুস্তকাদির মধ্যে বা অন্য কুত্রাপি তাঁহার ব্রাহ্মণ-জাতিত্বসূচক কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৩) বহু দিন পূর্ব্বে জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের একটি সংস্করণ সম্পাদিত করিবার সময় ইঁহার যে জীবনী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কবিরাজ গোস্বামীর পিতার নাম ভগীরথ এবং মাতার নাম সুনন্দা এবং তাঁহার ভ্রাতার নাম শ্যামদাস বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায় যে তিনি এই নামগুলি প্রাপ্ত হইলেন তাহার কোনও সমর্থক প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের গ্রন্থকার ৺দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট মহাশয় অবিচারিত চিত্তে প্রমাণ অনুসন্ধান করিয়াও ঐ নামগুলি কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে পান নাই।

অলৌকিক প্রেমময় মহাপুরুষকে চিনিতে না পারিয়া ঠাকুরের সেবক গুণার্ণব মিশ্র তাঁহাকে সম্ভাষণ বা প্রত্যুদ্‌গমন করেন নাই—ইহাতে শ্রীবলরামের সেবক অভিমানী শ্রীল মীনকেতন রামদাস তাঁহার দোষ দেখাইয়া দিলেও তিনি অসন্তুষ্ট হন নাই। কিন্তু কৃষ্ণদাসের ভ্রাতা তাঁহার সহিত তর্ক-বিতর্ক ছলে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি যে তাঁহার শ্রদ্ধা নাই ইহা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে কৃষ্ণদাসই তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

"দুই ভাই একতনু সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটীর ন্যায় তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা দুই না মানিয়া হও ত পাষণ্ড।
একে মানি আর না মানি—এই মত ভণ্ড॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৫ম

কিন্তু কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতার এই প্রকারে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি বিশ্বাসহীনতা দেখিয়া মীনকেতন রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের হস্তস্থিত বংশী ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস বলিতেছেন যে, এইরূপ বৈষ্ণবাপরাধের ফলে তাঁহার ভ্রাতার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণদাস যে মীনকেতন রামদাসের পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি পরম দয়াল নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভ করিলেন। স্বপ্নে নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণদাসের নিকট আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ, শ্যামচিক্কণ কান্তি ও মহামল্ল বীরের ন্যায় প্রকাণ্ড শরীর ও সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় রূপ দেখিয়া কৃষ্ণদাস বিস্মিত হইলেন। কৃষ্ণদাস আরও দেখিলেন—

"সুবলিত হস্ত পদ কমল নয়ান।
পট্টবস্ত্র শিরে পট্টবস্ত্র পরিধান॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা॥
চন্দন লেপিত ভালে তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি মদ মন্থর প্রয়াণ॥
কোটিচন্দ্র জিনি মুখ, উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ব বীজ-সম দন্ত, তাম্বূলচর্ব্বণ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাইনে বামে দোলে।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বোলে॥
রাঙ্গা যষ্টি হস্তে, দোলে যেন মত্ত সিংহ।
চারি পাশে বেড়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ॥
পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে সবে সপ্রেম আবেশ॥
শিঙ্গা-বংশী বাজায় কেহো, কেহো নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বূল চামর ঢুলায়॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা—অলৌকিক সব॥
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥
'অরে অরে কৃষ্ণদাস! না কর ত ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্বলভ্য হয়॥'
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাথসানি দিয়া।
অন্তর্ধান কৈলা প্রভু নিজগণ লৈয়া॥"

—চৈঃ চঃ, আদি, ৫ম

অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, কবিরাজ গোস্বামী যদি শ্রীল মহাপ্রভু, শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর প্রকটকালে আবির্ভূত হইতেন, তবে তিনি কোনও না কোনও প্রকারে এই তিন প্রভুর দর্শন লাভের জন্য ব্যগ্র হইতেন এবং তাঁহাদিগের দর্শনলাভ না করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিতেন না। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, কবিরাজ গোস্বামী যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বংশ বৈষ্ণববংশ হইলেও তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিলেন না। থাকিলে কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার নিত্যানন্দ প্রভুতে বিশ্বাসের অভাব হইত না। অবশ্য সে সময়ে গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা সুপ্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু যাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীল চৈতন্যদেবের বা নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। এই জন্য কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতা শ্রীল নিত্যানন্দের মহিমা বা তত্ত্ব অবগত ছিলেন না। পূর্ব্ব সুকৃতির বলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় মহাপুরুষের হৃদয়ে সেই তত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছিল এবং তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তি মাত্র আর কোনও প্রকার বিচার না করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াই শ্রীরূপ-সনাতনের মধুময় আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিজে যে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে তিনি দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, এ কথা কোথাও নাই। বিশেষতঃ স্বপ্নে দীক্ষা শিষ্টজনসম্মত বা আগমসম্মত বিধান নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসদীক্ষার পূর্ব্বে স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়াছিলেন—তখনও গুরু শ্রীল কেশব ভারতীপাদকে সেই মন্ত্র পূর্ব্বে বলিয়া পরে তৎকর্ত্তৃক ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর পার্ষদ বা পরিকরের মধ্যে কাহারও স্বপ্নে দীক্ষা পাওয়ার কথা শুনা যায় না এবং পরবর্ত্তী বৈষ্ণব মহাজনের কেহও স্বপ্নে দীক্ষা লাভ বৈধ বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। এরূপ অবস্থায় শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত যখন কবিরাজ গোস্বামীর প্রকট দেহে সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট হইতে তাঁহার দীক্ষার কথা উঠিতেই পারে না। অতএব শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া যখন তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি হইবে বলিয়া নিত্যানন্দ প্রভু স্বপ্নে আদেশ দিয়াছিলেন, তখন শ্রীবৃন্দাবনেই তাঁহার দীক্ষালাভ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই দীক্ষাগুরু কে? কবিরাজ গোস্বামী ছয় গোস্বামীর কথার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ,
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তা সভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।"
—আদি, ১ম

দীক্ষাগুরু যিনি তিনিও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন, অতএব এই ছয় গোস্বামীর মধ্যে কোনও এক জন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর গুরু হওয়া সম্ভব। কারণ, শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তিনি যখন ইঁহাদের আশ্রয় পাইয়াছিলেন তখন ইঁহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার গুরু হইয়াছিলেন, যথা—

"জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হইতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়।
যাঁহা হইতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হইতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয়।"
—আদি, ৫ম

এই স্থানে বুঝা গেল—শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ও শ্রীস্বরূপের আশ্রয় তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বরূপ-দামোদরের সহিত তাঁহার জীবনে সাক্ষাৎ হয় নাই, তবে কি প্রকারে তিনি স্বরূপের আশ্রয় পাইলেন? আর এই রঘুনাথ মহাশয়ই বা কোন্ রঘুনাথ? রঘুনাথ ভট্ট না রঘুনাথ দাস? রঘুনাথ দাস-গোস্বামীই স্বরূপ-দামোদরের প্রিয়তম শিষ্য বলিয়া তিনি "স্বরূপের রঘুনাথ" নামে খ্যাত ছিলেন। এই রঘুনাথ দাস-গোস্বামীই যদি কৃষ্ণদাসের গুরু হন, তবেই সেই গুরুকে অবলম্বন করিয়া পরম গুরু হিসাবে তাঁহার স্বরূপ-দামোদরের পারমার্থিক আশ্রয় মিলিতে পারে। এই আশ্রয় পাওয়া অর্থে প্রকট দেহের লৌকিক আশ্রয় বুঝিতে হইবে না।

পুনশ্চ কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাস আর শ্রীজীব চরণ।
শিরে ধরি বন্দোঁ নিত্য করোঁ তার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।"
—আদি, ১৭শ

কবিরাজ গোস্বামী অন্যত্র বিশদ ভাবে বর্ণনার দ্বারা তাঁহার শ্রীগুরুদেবের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, যথা—

"মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সর্ব্ব ত্যজি কৈল প্রভুর পদতলে বাস।
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাথে।
প্রভুর গূঢ় সেবা কৈল স্বরূপের সাথে।
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া।
এই ত' নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে।
আসি রূপ-সনাতনের বন্দিলা চরণে।
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল।
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর।
অন্নজল ত্যাগ কৈল অনন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা(৪) করেন ভক্ষণ।
সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম।
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানসসেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন।
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন-মান।
সার্দ্ধসপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে।"

এইরূপে দাস-গোস্বামীর কথা বলিতে বলিতে যেন আত্মহারা হইয়া বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"তাঁহার সাধন-রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার।"
—আদি, ১০ম

পুনশ্চ :—শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইঁহ সভার শ্রীচরণ শিরে বন্দি নিজধন
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস।

এখানে স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী, রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বন্দনা কবিরাজ গোস্বামী করিতেছেন—কিন্তু এ স্থলে দুই ভট্ট গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামীর বন্দনা নাই। সমস্ত বন্দনার মধ্যে রঘুনাথের নাম যখন আছে তখন সেই নামটি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর হওয়াই সম্ভব। কারণ, তাঁহাকে একবার "আমার প্রভু" বলিয়া বিশেষিত করিতেছেন এবং অন্যত্র "শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ" (অন্ত্য, ২০শ) এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। অতএব এই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীরই তাঁহার দীক্ষাগুরু হইবার সম্ভাবনা সমধিক। (৫)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অন্যত্রও বলিতেছেন—

"চৈতন্য লীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইয়া রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিল তাহা ইঁহা বিচরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে। —মধ্য, ৩য়

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, তিনি কি প্রকারে স্বরূপের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। গুরু রঘুনাথ (যিনি স্বরূপের রঘুনাথ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন)—তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই তিনি রঘুনাথের গুরু স্বরূপের পারমার্থিক আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন।

---

(৪) মাঠা—যে দুগ্ধ হইতে নবনীত তুলিয়া লওয়া হয় নাই, সেই দুগ্ধের দ্বারা দধি প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা যে ঘোল হয় তাহাকে "মাঠা" বলে।

(৫) প্রেমবিলাসের অষ্টাদশ বিলাসে দাস-গোস্বামীর কথা বর্ণনা করিবার সময়ে স্পষ্টই বলা হইয়াছে :—

"হেন বৈরাগ্য রাধিকার প্রিয় কে বা আছে?
কবিরাজ শিষ্য যাঁর রহিলেন কাছে।"

সম্ভবতঃ কবিরাজ গোস্বামীর অধ্যয়নাদি শেষ হইলে শ্রীরূপ তাঁহাকে ভজন-পথের উপযুক্ত গুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিজেই বলিতেছেন—

"পাদারবিন্দভৃঙ্গেণ শ্রীরূপরঘুনাথয়োঃ।
কৃষ্ণদাসেন গোবিন্দলীলামৃতমিদং চিতম্‌॥"

অর্থাৎ শ্রীরূপ ও শ্রীল রঘুনাথ দাসের চরণকমলের ভৃঙ্গস্বরূপ আমি কৃষ্ণদাস এই 'গোবিন্দলীলামৃত চয়ন করিলাম। ইহাতেও কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীরূপ গোস্বামীর ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আনুগত্য প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিরাজ গোস্বামী যখন শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীরূপ, সনাতন ও গোপালভট্ট গোস্বামী— এই তিন গোস্বামীর গ্রন্থরাজি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এবং যে গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহারও অনেক অংশ লিখিত হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবার পূর্ব্বেই সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, লৌকিক সৎক্রিয়াবিধি বা ধর্ম্মশাস্ত্র ও উপযুক্ত শিক্ষা শেষ করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপ-সনাতনের আশ্রয় লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রে অতি অল্প কালেই ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া শ্রীরূপের স্মরণ-মননের প্রক্রিয়ানুসারে "শ্রীগোবিন্দলীলামৃত" প্রণয়ন করেন। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বে শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াই তিনি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে পারদর্শিতা লাভ করেন! যখন শ্রীগোবিন্দলীলামৃত সম্পূর্ণ হয়, তখন ছয় গোস্বামীই শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজমান। তথাপি ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ হিসাবে শ্রীজীবই অতুলনীয় গ্রন্থরচনায় বিশেষ ভাবে আনুকূল্য করিয়াছিলেন, এ কথা "শ্রীগোবিন্দলীলামৃত" হইতেই সহজেই অনুমিত হইতে পারে। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের সকল অধ্যায়ের শেষেই এই জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপশ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীল রঘুনাথ দাস কৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীল রঘুনাথভট্টবরজে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—

* * * *

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ী ভ্রমরস্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবার ফলে এবং শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গপ্রভাবে এবং শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বরপ্রভাবেই শ্রীগোবিন্দলীলামৃত কাব্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ফলতঃ, শ্রীজীব যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরুগণের অন্যতম, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু অবৈষ্ণব এবং ইতিহাসানভিজ্ঞ লেখকগণ এই মধুর সম্বন্ধের কোনও সংবাদ না রাখিয়াও শ্রীজীবের ভুবন-পাবন চরিত্রে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা সম্পর্কে কল্পিত কলঙ্ক-কালিমা অর্পণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। পরলোকগত জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে কবিরাজ গোস্বামীর এক সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে তাহাতে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার একাংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"রাধাকুণ্ডতীরে গ্রন্থ-প্রণয়ন পরিসমাপ্ত হইলে, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য কৃষ্ণদাস অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তৎকালের নিয়মানুসারে গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্ব্বে স্থানীয় প্রধান প্রধান মান্যব্যক্তির অনুমতি লইতে হইত। তাঁহারা গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করিতেন, তবে গ্রন্থশেষে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতেন; তখন সে গ্রন্থ সাধারণে লিখিয়া লইতে পারিত। তৎকালে জীব গোস্বামী বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব সমাজের অধিনেতা ছিলেন। বৃদ্ধ কবিরাজ গ্রন্থখানি সঙ্গে লইয়া জীবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ইহা পাঠ করিতে ও প্রকাশের অনুমতি দিতে অনুরোধ করিলেন। জীব গোস্বামী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের গূঢ় রহস্য ও চৈতন্যোপদেশ সকল বঙ্গ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে; তাহা অবলীলাক্রমে সাধারণের আয়ত্তাধীন হইবে, অথচ রূপ, সনাতন ও তাঁহার রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অপ্রচারিত থাকিবে, কেহ আর সে সকল আদর করিবে না। এই আশঙ্কা করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী কোপাবিষ্ট হইয়া যমুনার জলস্রোতে ঐ গ্রন্থ নিক্ষেপ করিলেন। বর্ণিত আছে যে, উহা ভাসিতে ভাসিতে মদনমোহনের ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছিল। তখন জীব গোস্বামী তাহা তুলিয়া আনিয়া গোস্বামীদিগের অপরাপর গ্রন্থের সামিল একটি কুঠরীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, সাধারণ গ্রন্থের আশ্চর্য্য মহিমা প্রতিপন্ন করিবার জন্য জীব গোস্বামী এই কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বৃদ্ধ বয়সের বহু যত্নের ধন গ্রন্থের এই দশা দেখিয়া কৃষ্ণদাস মর্ম্মাহত হইয়া শোকাকুল চিত্তে যমুনায় গমন করিলেন, এবং আহার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা এই খেদ করিতে লাগিলেন যে, সাধারণে পড়িবে বলিয়া তিনি বহু যত্নে যে গ্রন্থ রচনা করিলেন তাহা প্রকাশিত হইল না ও শ্রীচৈতন্যের শেষ লীলা অপ্রচারিত রহিয়া গেল।

"এই সময় মুকুন্দ দত্ত(৬) নামে জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জানাইলেন যে, যখন চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইতেছিল তাহার এক এক পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইলে, তিনি (মুকুন্দ) উহা লইয়া এক এক গ্রন্থ নকল করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে সমস্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি তাঁহার নিকট রহিয়াছে। ইহা শ্রবণে বৃদ্ধ কবিরাজের আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি ঐ প্রতিলিপিখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সংশোধনান্তে তাহা গোপনে রাখিয়া দিলেন; ইত্যবসরে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর(৭) বঙ্গদেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবন আসিয়া উপনীত হইলেন এবং কৃষ্ণদাসের বাচনিক গ্রন্থ-বিবরণ আদ্যোপান্ত অবগত

(৬) মুকুন্দ দত্ত নামে কবিরাজ গোস্বামীর কোনও শিষ্য ছিল না। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গী যে কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দ দত্তের পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি কবিরাজ গোস্বামীর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। বোধ হয়, লেখক এখানে রাধাকুণ্ডবাসী কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য মুকুন্দ কবিরাজের কথা বলিতেছেন।

(৭) কবিকর্ণপুর কবিরাজ গোস্বামীর অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ হিসাবে তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার চরিতামৃতের অনেক স্থলে এই গ্রন্থদ্বয় হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কবিকর্ণপুর কবিরাজ গোস্বামীর বিশেষ পূজনীয়। তিনি চরিতামৃতের কোনও টীকা লিখেন নাই

হইয়া শ্রীজীবকে তাহা জানাইলেন এবং ঐ গ্রন্থের টীকা করিয়া দিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। জীব গোস্বামী অগত্যা কবিকর্ণপূরের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়া কুঠরী হইতে গ্রন্থ বাহির করত অনুমোদন স্বাক্ষর করিলেন এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে চৈতন্ত-চরিতামৃত পর্য্যন্ত লিখিত ছিল, তিনি "কহে কৃষ্ণদাস" ভণিতা বসাইয়া দিলেন।

"তখন বৃন্দাবনবাসিগণ সকলে ঐ গ্রন্থ লিখিয়া লইলেন এবং ব্রজধামে উহা প্রচলিত হইয়া গেল। কিন্তু জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ এ গ্রন্থ বঙ্গদেশে পাঠাইতে কিছুতে সম্মত না হওয়ায় কৃষ্ণদাস মুকুন্দ দ্বারা পূর্ব্বে লিখিত নকলটি নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি উহা ক্রমে ক্রমে এ দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল।"(৮) গুপ্ত মহাশয় কোথা হইতে এই সংবাদ সংগ্রহ করিলেন তাহার অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, "বিবর্ত্তবিলাস" নামক একখানি সহজিয়া গ্রন্থই এই কাহিনীর মূল ভিত্তি। তবে শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের মহিমা খ্যাপন করিবার জন্ত 'বিবর্ত্তবিলাসের' যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছিল জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের বোধ হয় সে মূল কাহিনীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। বোধ হয় তিনি কাহারও নিকট শুনিয়া এই বিকৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীজীবের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিবার চেষ্টা করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মনে কষ্ট প্রদান করিয়াছেন। 'বিবর্ত্তবিলাসে' আছে যে, শ্রীজীব গোস্বামী কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ যে অলৌকিক শক্তিবিশিষ্ট, তাহা দেখাইবার জন্তই গ্রন্থখানি যমুনার জলে নিক্ষেপ করেন এবং পরে কুঠরীতে বহু পুস্তকের মধ্যে রাখিলেও গ্রন্থখানি না কি সমগ্র গ্রন্থস্তূপের শীর্ষদেশে বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী কখনও অলৌকিক বিভূতি দেখাইয়া লোকের মন আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠাকে সযত্নে বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের অকলঙ্ক চরিত্রের সহিত বিবর্ত্তবিলাসের উপাখ্যানের কোনওরূপে সামঞ্জস্ত সাধন করা অসম্ভব। 'বিবর্ত্তবিলাসের' কথার প্রামাণিকতা বিচার করিবার পূর্ব্বে অত্যন্ত দুঃখের সহিত একটি কথার উল্লেখ করিতে হইল। এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্তদেবের, শ্রীনিত্যানন্দের, বৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্য্যের এবং যাঁহারা গৌড়ের স্বাধীন সম্রাটের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় ভিখারী হইয়াছিলেন, সেই রূপ-সনাতনের,—এমন কি, যিনি ইন্দ্রের সমান ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরার সমান বিবাহিতা স্ত্রীরত্ন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন—সেই রঘুনাথ দাস গোস্বামীর এবং আকৌমার ব্রহ্মচারী গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীজীব গোস্বামীর—ইঁহাদের প্রত্যেককেই পরকীয়া জুটাইয়া দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। অতএব 'বিবর্ত্তবিলাসের' কথা অনালোচ্য। কিন্তু "বিবর্ত্তবিলাস" চরিতামৃত সম্পর্কে শ্রীজীবের চরিত্রের উপর স্বার্থমূলক হীন অভিসন্ধির আরোপ করেন নাই। জগদীশ্বর গুপ্ত ও তদনুগামী বটব্যাল মহাশয় তাহাও করিয়াছেন।

ছয় গোস্বামীর চরিত্র সর্ব্বপ্রকার কলঙ্কের অতীত বলিয়া তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের আদি-গুরু। বিশেষতঃ, চিরকুমার শ্রীজীব যিনি পিতৃব্যদ্বয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য, বিনয় এবং ভক্তি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া বৃন্দাবনে ও মথুরায় সর্ব্বজনের নিকট আদর্শরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রে এইরূপ অমূলক হীনতামূলক অভিসন্ধির আরোপ করিয়া গুপ্ত মহাশয় মহা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। তথাপি তাঁহার অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। [ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)

এবং লেখাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। পরবর্ত্তী কালে মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর চরিতামৃতের একখানি সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

(৮) জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত এই চৈতন্যচরিতামৃতের অপ্রামাণিক ভূমিকার উপর নির্ভর করিয়া বৈষ্ণবমতাসহিষ্ণু পরলোকগত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর প্রতি আক্রমণ করিয়া "নব্যভারত" পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, সকল প্রবন্ধের মূলে বিন্দুমাত্র সত্য নাই—তাহা প্রতিবাদের অযোগ্য।

বন্ধন-মাঝে

বন্ধন-মাঝে মুক্তির বাণী, আঁধার বক্ষে আলো,
কুসুম-কুঁড়ির বন্ধনে রূপ লেগেছে আমার ভালো!
শূন্যের মাঝে পূর্ণের বাসা,
নীরব বক্ষে অপরূপ ভাষা,
মৃত্যুর মাঝে জীবন-বহ্নি জ্বলিছে সমুজ্জ্বল,
বিরহের মাঝে মিলনের ছবি সুন্দর শতদল!

বেদনা-যাতনা দাহন-তাড়না যতই থাক্ না তব,
শত বেদনার অশ্রু-অনলে ফোটে রূপ অভিনব।
তৃষাতুর বুক ক্ষুধাতুর প্রাণ
যতই করুক চির-ম্রিয়মাণ;
সুধার সাগর অকূল প্রবাহে ছুটিছে তোমার কাছে,
প্রলয় রজনী অবসানে জেনো সোণার আলোক নাচে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল (এম-এ)

নচিকেতা

পাঠ্যাবস্থায় ফরাসী বীর-বালক কাসাবিয়াঙ্কার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতা হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। নিয়মানুগ বালক মৃত্যুর সম্মুখে কি অচল অটল দাঁড়াইয়া! ঋষি-যুগে এমনি এক তরুণের পরিচয় পাই, যাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, অসীম সাহস এবং আত্ম-সংযম অসম্ভবের অধিকারে সম্ভবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল! এই তরুণের নাম নচিকেতা।

নচিকেতা বাজশ্রবা ঋষির পুত্র। পিতা বিরাট বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ করিতেছিলেন। পবিত্র তপোবনের শ্যাম-স্নিগ্ধ পট-ভূমিকায় এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। মহাতপা ঋষিগণ এই বিরাট যজ্ঞে আহূত। বৈদিক মন্ত্রের পরিশুদ্ধ উচ্চারণে, ঋষিকুমারগণের সুললিত সাম-গানে, পবিত্র হোমানলে যজ্ঞের পরিসমাপ্তি ঘটিল। কিন্তু যজ্ঞ-দক্ষিণার জন্য সংগৃহীত গাভীগুলিকে দেখিয়া নচিকেতার মনে সংশয় জাগিল—এই জরাজীর্ণ দুগ্ধহীন গাভী-দানে পিতার যজ্ঞ-ফল কি সম্পূর্ণ হইবে? সর্ব্বদক্ষিণক বিশ্বজিৎ যজ্ঞে যজমানের সর্ব্বস্ব-দান বিধি। এ যে দানের নামে পরিহাস! পিতার যজ্ঞ-কামনা কল্যাণপ্রসূ করিবার জন্য নচিকেতা পিতাকে বলিলেন, "পিতা, আমি আপনার জীবন-সর্ব্বস্ব। আমাকে কোনো ঋত্বিক্‌কে দান করুন।"

"স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ন্তং হোবাচ"

বার-বার এই অনুনয়! পুত্রের এই অনুনয় শিষ্টতার পরিচায়ক নহে ভাবিয়া পিতা কুপিত স্বরে বলিলেন, "মৃত্যবে ত্বা দদামীতি" (তোমায় মৃত্যুদেবতার উদ্দেশে দান করিলাম)। পুত্রের প্রতি পিতার কি দারুণ আদেশ! কি অকল্যাণকর বাক্য! নির্ভীক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সত্যাশ্রয়ী পুত্র পিতৃ-বাক্যের সম্মানরক্ষার্থে অজানার রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মনে দুর্ব্বলতা নাই, ভয়ের লক্ষণও নাই! জীবন-সর্ব্বস্বদানে পিতার সর্ব্বদক্ষিণক যজ্ঞ পূর্ণ হইল।

নচিকেতা মৃত্যুরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। মৃত্যুদেবতা তখন অন্যত্র ছিলেন। নচিকেতা তাঁহার অপেক্ষায় তিন রাত্র অনশনে রহিলেন। পূত ঋষিজীবনের তপ ও যোগশক্তি, ঋষিগণের পবিত্র শিক্ষা ও আদর্শ এবং তপোবনের সুষ্ঠু পরিবেশ ঋষিকুমারের সত্যানু-ভূতির অনুরূপ দেহ-মন গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই নিরাহার সংযমের সময় সত্যস্বরূপের ধ্যানে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে নচিকেতার দেহ উদ্ভাসিত! তাই ধর্ম্মরাজের আগমনে ধর্ম্মরাজ-পত্নী ও অমাত্যগণ অতিথিকে সাক্ষাৎ বৈশ্বানর বলিয়া পরিচিত করিলেন এবং অতিথি-পরিচর্য্যায় মৃত্যু দেবতাকে যত্নবান হইতে বলিলেন। অতিথি নারায়ণ। অতিথির সেবা নারায়ণের সেবাতুল্য। মৃন্ময় দেবতা, পাষাণ দেবতা, ও অন্যান্য জড়দেবতার পূজায় আন্তরিকতার অভাব ও প্রাণহীনতা মিথ্যা আড়ম্বরের আবরণে ঢাকা যায়; কিন্তু প্রাণবন্ত দেবতার পূজায় সদা-জাগ্রত চেতনা সক্রিয় চেষ্টা, আন্তরিকতা ও প্রগাঢ় অনুরাগের প্রয়োজন। প্রাণহীন অনুষ্ঠান, কৃত্রিমতা, হৃদয়হীনতা, অমনোযোগ ও অশ্রদ্ধা জীবন্ত দেবতার দৃষ্টি অতিক্রমে সমর্থ হয় না। তাই অতিথি-সৎকার আর্য্য জাতির পূজাধর্ম্মের বিশিষ্ট অঙ্গ। অতিথি-সৎকারে ত্রুটি হইলে গৃহস্বামীর সুখ-আশা, সাধুসঙ্গফল, সত্যের ফল, যজ্ঞফল, পুণ্যকর্ম্মফল, পুত্র ও পশু সমস্তই বিনষ্ট হয়।

আশা প্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতা-
ঞ্চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্।
এতদ্‌বৃঙক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে।

ধর্ম্মরাজ পাদ্যাসন দিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। নিজ-ত্রুটি স্বীকার করিয়া অতিথির তুষ্টির জন্য এবং নিজ-হিত-কামনায় ত্রিরাত্র-উপবাসের জন্য তিনটি বর-দানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব॥

সবিনয় উক্তি। দেবতার যোগ্য অযাচিত বিরাট দানের প্রস্তাব! বাহিরের কঠোর আবরণের মধ্যে কতখানি কোমল প্রাণ। কর্ত্তব্য-পালনের জন্য ধর্ম্মরাজকে কঠোর এবং রুক্ষ হইতে হইলেও তাঁহার অন্তর করুণায় ভরা।

ব্রাহ্মণকুমারের প্রথম বর প্রার্থনা—"আমার পিতা যেন শান্ত-সঙ্কল্প ও প্রসন্নচিত্ত হন। আমার প্রতি তাঁহার রোষভাব যেন প্রশমিত হয়। এখান হইতে গৃহে ফিরিলে আমাকে যেন চিনিতে পারেন।"

পিতা আরুণি চিরদিনই উপশান্তচিত্ত। পিতার চিত্তবিক্ষেপে পুত্র কাতর হইয়াছিল। পিতামাতার সন্তোষ-সাধন পুত্রের প্রধান কর্ত্তব্য। পিতার রোষ ও মনঃকষ্ট পুত্রের জীবনে অভিশাপস্বরূপ হয়। ইহা পুত্রের শিক্ষা ও সাধন-পথের অন্তরায়। তাই আর্য্য সন্তান পিতামাতার পূজা শ্রেষ্ঠ পূজা বলিয়া মনে করে।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

বৈবস্বত সানন্দে এ বর দান করিলেন।

মানবের দুঃখময় জীবন করুণ-হৃদয় ঋষিকুমারকে বড়ই ব্যথা দিয়াছিল। করাল ব্যাধির প্রকোপে কত অমূল্য জীবন কীটদষ্ট কুসুম-কলিকার ন্যায় ঝরিয়া পড়ে! জরার তুষার-শীতল হস্ত কত বুদ্ধিমানের ধীশক্তি লোপ করিয়া বিনাশের পথে প্রেরণ করে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার প্রবল প্রভাব কত না রূপবান্ স্বাস্থ্যবানের দেহ-মনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হরণ করিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মম পশুবৎ করিয়া ফেলে! শোকের তীব্র জ্বালা কতখানি অন্তর্দাহী হয়! সমস্ত মর্ত্ত্যলোকে অহরহ এই করুণ দৃশ্যের অভিনয় হইতেছে। কিন্তু স্বর্গলোকে ইহার বিপরীত; সেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, ক্ষুৎপিপাসার জ্বালাও নাই। যিনি সাধন-বলে স্বর্গবাসী, দেবত্বলাভ করিয়াছেন, নচিকেতা সেই শক্তিসাধন অগ্নিতত্ত্ব-বিজ্ঞান দ্বিতীয় বররূপে প্রার্থনা করিলেন।

সমগ্র মানবের কল্যাণ-কামনায় কত বড় হৃদয়বানের প্রার্থনা!

বৈবস্বত সানন্দে শিষ্যকে এই সাধন-রহস্য-বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিলেন। বীর্য্যবান শিষ্য উপদেশ-বাক্যগুলি অপূর্ব্ব মেধায় যথাযথ ভাবে প্রত্যুচ্চারণ করিলেন। বিদ্যা যথার্থভাবে গৃহীত হইলে আচার্য্যের আনন্দের সীমা থাকে না। ধর্ম্মরাজ প্রীতি-সহকারে

প্রতিশ্রুত তিনটি বর ব্যতীত অন্য একটি বরও দান করিলেন এবং বলিলেন, এই অগ্নি জগতে নচিকেতা-অগ্নি নামে পরিকীর্ত্তিত হইবে। যমরাজের প্রীতি-উপহার স্বরূপ এক বিচিত্র রত্নময়ী মালা প্রদত্ত হইল।

নচিকেতার শেষ বর প্রার্থনা—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্য-
হস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।

কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুর পর আত্মা পরলোক গমন করে! আবার কাহারও মতে আত্মার পরলোক গমন নাই। সংশয় চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। ইহার স্বরূপ কি? এই তত্ত্ব আপনার নিকট জানিতে চাই।

নচিকেতার এই তৃতীয় বর-প্রার্থনা মৃত্যুদেবতাকে বিচলিত করিল। এ যে আত্মবিজ্ঞান প্রশ্ন! ব্রহ্মবিদ্যানুসন্ধান প্রশ্ন! আশ্চর্য্য এই তরুণ!

মৃত্যুদেবতা এই ঋষিকুমারের সংযম, নির্ভীকতা ও প্রশ্নপরম্পরায় হৃদয়, বুদ্ধি ও অপূর্ব্ব মেধার পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার পরীক্ষা চলিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছ, সুরগণও এ বিষয়ে সংশয়াপন্ন। ইহা অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব। সাধারণ মানব ইহা শুনিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অতএব তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।"

নচিকেতা আত্মসঙ্কল্পে অটল। এই জ্ঞানলাভের জন্য অদম্য উৎসাহ ও তীব্র আবেগ তাঁহার চিত্তে বর্ত্তমান। সৌভাগ্যক্রমে এমন সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত! উপযুক্ত আচার্য্য ও অনুকূল ক্ষেত্র সম্ভব হইয়াছে। ঋষিকুমার অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না।

মৃত্যুদেবতা তাঁহাকে শতবর্ষজীবী পুত্র ও পৌত্র, গজ, অশ্ব প্রভৃতি বহু পশু, হিরণ্য, সাম্রাজ্য ও যদৃচ্ছ আয়ু দান করিতে চাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরসুন্দর পট-ভূমিকায় আবির্ভূত হইল সুসজ্জিত পুষ্পক রথে দেববাদিত্রসহ সৃষ্টির প্রলোভনময়ী অপরূপ রূপযৌবন-সম্পন্না অপ্সরার দল। তাহাদের সুন্দর সুঠাম দেহভঙ্গী, চঞ্চল চটুল চাহনি, বিলাসবহুল বেশভূষা, উদ্দাম রূপলাবণ্য কত কঠোর কৃচ্ছ্র তপস্যাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে! কত দেবতা দেবত্ব বিসর্জ্জন দিয়া এই সব অপ্সরার রূপমাধুরী আকণ্ঠ পান করিয়াছেন! দেববাদিত্র-সহযোগে অপ্সরা-কণ্ঠে সুললিত সঙ্গীত, দেববালাগণের নৃত্যের লাস্যলীলা এক ভোগ-উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। এই সব বিলাস উপকরণ মৃত্যুদেবতা নচিকেতাকে প্রদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু সেই নির্ম্মল অবদানে কোন ভোগমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল না, তৎপরিবর্ত্তে বিকশিত হইল মনোরম ঊষার শিশিরস্নাত নির্ম্মল কমলকোরক তুল্য সর্ব্ব প্রলোভনবিজয়ী বীর্য্যবন্ত ব্রহ্মচারি-মূর্ত্তি।

ব্রাহ্মণকুমার সবল কণ্ঠে মৃত্যুদেবতাকে বলিলেন, "দূর কর দেবতা তোমার রথ, ঐ নৃত্যগীতকুশলা অপ্সরার দলকে। জগতে অনর্থের হেতু ও শক্তিক্ষয়কারী এই সব ভোগ উপকরণ! অর্থে, ভোগে দীর্ঘ জীবনে প্রয়োজন নাই। আমায় দাও আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান। অন্য কোন

এই উপনিষদ্ যুগেই এক রমণী পার্থিব ধনরত্ন উপেক্ষা করিয়া পতিদেবতাকে বলিয়াছেন,

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম্"

নচিকেতার নির্ম্মল বুদ্ধি আজ প্রেয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ বরণ করিয়াছে। কঠোর পরীক্ষায় নচিকেতা আজ উত্তীর্ণ। শিষ্যের যোগ্যতার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া ধর্ম্মরাজ ব্রহ্ম প্রতীক ওঁ মন্ত্রে তাঁহার দীক্ষা দিলেন। আজ "জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়তত্ত্বমালাবিভূষিত" গুরুর কৃপা অজস্র ধারে শিষ্যের উপর বর্ষিত হইল। ধর্ম্মরাজ বজ্রদৃঢ় স্বরে বলিলেন—

সর্ব্ববেদ যাঁর নাম করে বিঘোষণ,
যাঁর লাভ তরে হয় তপ আরাধন,
ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান যাঁর তরে হয়,
"ওঁ" এই মহামন্ত্র তাঁর পরিচয়।
"ওঁ" এই মহাক্ষর ব্রহ্মের প্রতীক,
এই শব্দ আরাধনে সব হয় ঠিক,
সব অভিলাষ তার পরিপূর্ণ হয়,
ব্রহ্মলোক লভে জীব করিয়া আশ্রয়।
জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, শাশ্বত অক্ষয়
অবিকারী পরমাত্মা চিদানন্দময়,
হৃদ্গুহা মাঝে তার সদাই প্রকাশ,
দেহের বিনাশে তার নাহিক বিনাশ।
অণুরও অণু তিনি মহতো মহান্,
হৃদয়গহ্বর মাঝে সদা যার স্থান,
কামনার লেশ নাহি রহে যার চিতে
আত্মার স্বরূপ সেই পায় যে দেখিতে।
বেদপাঠে পরমাত্মা নাহি লভ্য হয়
মেধাবলে, শাস্ত্রজ্ঞানে কভু জ্ঞেয় নয়,
আপনি করেন যারে হইয়া সদয়,
তাঁহার স্বরূপ সেই পায় পরিচয়।

ভগবানের অপরিসীম করুণা!

যাঁহার দয়ার নাহিক পার
অবিরত স্রোত বহিছে তার।

কিন্তু অপরিশুদ্ধ আধারে তাঁহার কৃপার আলোক প্রতিফলিত হয় না। কামনাশূন্য উপশান্তচিত্তে আত্মার মহিম-জ্ঞান হয়। হৃদয় হইতে সমস্ত কামনা বিদূরিত করিয়া মানব যখন অকাম, নিষ্কাম ও আত্মকাম হয়, তখন অমৃতত্ব লাভ করে। আত্মার বিরাটত্ব সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না। বরং এই আত্মার আলোকে এই সব দীপ্তিমান্ বস্তু প্রকাশ পায় (তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি)। এই পরমাত্মা আকাশে সূর্য্যরূপে, বায়ুরূপে, ব্যোমরূপে, চৈতন্যরূপে অবস্থিত। সত্যে, গগনে, বিদ্যুতে, অগ্নিতে—সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপিরূপে অবস্থিত ব্রহ্ম। আবার এই বিরাট কত ক্ষুদ্র, কত সূক্ষ্ম! অণুর অণু।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ পুরুষ অন্তরাত্মারূপে প্রাণিগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি ধৈর্য্যসহকারে আত্মাকে স্বীয় দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া উপলব্ধি করে। আত্মাকে লাভ করিবার বহু উপদেশ ও সঙ্কেত মৃত্যু

দেবতা নচিকেতাকে প্রদান করিলেন। মোক্ষ পথের পথিক সেই সমস্ত উপদেশরূপ পাথেয় লইয়া অমৃতের পথে অগ্রসর হন্।

বস্তুতঃ সত্যলাভের পথ কুসুমাকীর্ণ নয়। ইহা অতীব দুর্গম, নিশিত ক্ষুরধারতুল্য পথ। এ পথের পথিক পথ অতিক্রমকালে কত কঠোরতাই না অনুভব করে! কত বাধা কত বিপদ পথে ঘনীভূত হয়! কিন্তু করুণাময় ভগবান্ কল্যাণকামীকে অনন্ত শক্তি দান করেন। অসীম শ্রদ্ধায় নির্ভীক্ চিত্তে যাত্রী যখন সত্যলাভের পথে অগ্রসর হয়, তখন ভগবৎ-প্রসাদে তাহার মধ্যে একাগ্রতা, অসীম ধৈর্য্য ও অফুরন্ত প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠে। শ্রদ্ধা তাহাকে কল্যাণী জননীর মত পালন করে এবং বাধা ও বিপত্তির মধ্যে বীর্য্য জাগাইয়া আনন্দ প্রদান করিয়া তাহার পথের ক্লেশ ও শ্রান্তি অপনোদন করে। বিশ্বনিয়ন্তার অভয়-বাণী বেদমন্ত্র :—

উদীর্ধ্বং জীবো অসুর্ন অগাদপ
প্রাগাত্তম আজ্যোতিরেতি।
আরৈক্ পন্থাং যাতবে সূর্য্যায়াগন্ম
যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ।

উঠ উদ্ধন্তরে। ঐ যে উষা মহা জ্যোতির্ম্ময়ী, জ্যোতির পুলকে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছে। অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। ঐ তোমার গন্তব্য পথ, আয়ুবৃদ্ধিকর অমৃতের পথ।

নচিকেতার ন্যায় সত্যসন্ধ ও নির্ভীক্ তাপস আবার কবে ভারতভূমে অবতীর্ণ হইবেন? ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত, জ্ঞানের দিব্য জ্যোতিতে জ্যোতিষ্ময়, দিব্যানুভূতির অনুপ্রেরণায় প্রবুদ্ধ ভারতের তরুণ কবে মৃত্যুর পার হইতে অমৃত সংগ্রহ করিয়া এই মৃতকল্প জাতির প্রাণে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করিবে? কবে এই শতধা-বিচ্ছিন্ন জাতি অমৃতের স্পর্শে প্রাণবন্ত হইয়া হিংসা-দ্বেষ-বিরোধ ভুলিয়া বজ্রকণ্ঠে আকাশ-পবন-প্রান্তর মুখরিত করিয়া গাহিবে সেই মহামিলন-সঙ্গীত,—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্
দেবা ভাগং যথা-পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্॥

শ্রীভুবনমোহন মিত্র

প্রাচীন কালে রাজ-পুরোহিত

প্রাচীন হিন্দুরাজগণের শাসন যন্ত্রে রাজ-পুরোহিতের পদ উচ্চ এবং অপরিহার্য্য ছিল। ইনি ধর্ম্মের দিক হইতে রাজশক্তি নিয়ন্ত্রণের এক জন বিশিষ্ট নিয়ামক ছিলেন। এই পুরোহিতের পদটি অত্যন্ত প্রাচীন। ঋগ্বেদেও ইহার প্রাচীনত্বের যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। পুরোহিতের আর একটি নাম পুরোধা। পুরোহিত শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ—যাহাকে অগ্রে স্থাপনা করা হয়। ব্রাহ্মণগণই পুরোহিত হইতেন। ইহার নিয়োগ বা নির্ব্বাচন কালে বৃহস্পতি সভা করা হইত। ক্ষত্রিয়গণের বেদাধিকার থাকিলেও তাঁহারা পৌরোহিত্য কার্য্যে যোগ্যতা প্রকটন করিতে পারিতেন না বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ক্ষত্রিয়গণ ক্রোধ-প্রধান। ক্রোধ-প্রধান ব্যক্তিরা নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ক্ষত্রিয় কখন রাজ-পুরোহিত হইতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে অনেক অনাবশ্যক বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্বন্তর নামক এক জন রাজা পুরোহিতের সাহায্য না লইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বেদে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদাধিকার সম্পর্কে ক্ষত্রিয়গণ নিজ যজ্ঞকার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিতে পারিতেন ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ যজমানের হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না।

অতি প্রাচীন কালে রাজ-পুরোহিতগণ নির্ব্বাচিত হইতেন কি মনোনীত হইতেন তাহা বুঝা কঠিন। তবে বৃহস্পতি-সভার নাম শুনিয়া মনে হয়, হয়ত তাঁহারা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। সেই সভা উপলক্ষে যজ্ঞ ও পশুবলিও হইত, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই রাজ-পুরোহিতের পদ যজ্ঞে ব্রতী ঋত্বিক্গণ হইতে বিভিন্ন। ইনি যজ্ঞাদির পরিদর্শক ছিলেন। ধর্ম্মের দিক্ দিয়া ইনি রাজ-কর্ত্তব্যের নির্দেশ দিতেন। রাজার শাসননীতি এবং বিশেষ রাজনৈতিক কার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেন এবং রাজাকে উৎপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইতেন—শাসন বিষয়ে কোন কার্য্য বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুমোদিত হইতেছে কি না সে বিষয়েও ইনি পরামর্শ দিতেন। মন্ত্রীরা রাজসভায় রাজার সিংহাসনের পার্শেই বসিতেন এবং সকল বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু পুরোহিত রাজ-সভায় সর্ব্বসমক্ষে বসিতেন। তিনি ইচ্ছা করিলে রাজসভায় না বসিতেও পারিতেন। সময় বারিবর্ষণ না হইলে তিনি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা বারিবর্ষণের ব্যবস্থা করিতেন। মন্ত্রের উচ্চারণে এবং মন্ত্রের প্রয়োগে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক ছিল। কারণ, মন্ত্রের উচ্চারণে এবং যথাস্থানে প্রয়োগে একটু ব্যতিক্রম হইলেই সব কার্য্য পণ্ড হইত এবং যজমানের বিশেষ বিপত্তি ঘটিত বলিয়াই তখনকার লোকের ধারণা ছিল। পুরোহিত দৈব বাধা খণ্ডন করিতেন এবং দেবতার অনুগ্রহ রাজার এবং প্রজার পক্ষে আকর্ষণ করিতেন বলিয়া পুরোহিতের স্থান সকলের উপরে স্থাপিত ছিল। ঋগ্বেদে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে। বৈদিক শব্দের রূঢ়ার্থ গ্রহণ করা হইত না, যৌগিক অর্থই গ্রহণ করা হইত। সেই জন্য মহর্ষি যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে বৈদিক শব্দের নির্ব্বচন বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের আগ্নেয় সূক্তের প্রথম ঋকে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে যে, অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্ব্বা

অন্তা-দেবতাঃ। অর্থাৎ অগ্নিই সকল দেবতার অবম বা প্রথম এবং বিষ্ণুই সকলের পরম বা উত্তম। আর সকল দেবতা তাঁহাদের পরে। আত্মবিদ্‌রা বলিয়া থাকেন, অগ্নি আত্মা। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে আছে—একই আত্মা বা ব্রহ্মের অগ্নি যম এবং মাতরিশ্বা ইত্যাদি বহু নাম। অগ্নিই জ্ঞানের দেবতা। কারণ, আত্মার লক্ষণই জ্ঞান। সেই আত্মা বা জ্ঞানকে যজ্ঞের প্রথমে স্থাপিত করিতে হয়, সেই জন্ত তাঁহাকে পুরোহিত বলা হইয়াছে।

যুদ্ধে নিযুক্ত উভয় পক্ষের রাজপুরোহিতই স্ব স্ব পক্ষের জয় কামনা করিয়া যজ্ঞ করিতেন। অনেক সময় পুরোহিত রাজাকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ভরদ্বাজ ঋষি দিবোদাসকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র সূর্য্যবংশীয় রাজা সুদাসের বিরুদ্ধ পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং বশিষ্ঠ সুদাসের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। এ কোন্ বিশ্বামিত্র? রাজা দশরথের সময় ও রামচন্দ্রের সময় যে বিশ্বামিত্র ছিলেন তিনি হইতে পারেন না। কারণ, সুদাস হইতে রামচন্দ্রের রাজত্বকাল ১১ পুরুষ পরবর্ত্তী। কোন লোকের পক্ষে এত অধিক কাল জীবিত থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

আবার রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময় এক বিশ্বামিত্র ছিলেন, তিনি কি তাঁহার ৫৭ পুরুষ পরবর্ত্তী দশরথের রাজত্বকালে ছিলেন? ইহাও অসম্ভব মনে হয়।

এই পুরোহিতের পদ কোন্ সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত অকুতোভয় য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের চেষ্টার বিরাম নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তই তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যে প্রাগৈতিহাসিক তথ্য বিস্মৃতির ঘন কুহেলিকায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা লোক-লোচনের সম্মুখে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা অসম সাহসের কার্য্য। তাহা হইলেও তাঁহাদের চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। বৈদিক সময়ে জাতিভেদ ছিল কি না তাহা লইয়াও তর্ক তোলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের ১২ ঋকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের উল্লেখ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা অনেকে বলেন যে, উহা প্রক্ষিপ্ত। প্রমাণ, বৈশ্য শব্দ ঋগ্বেদের অন্ত কুত্রাপি প্রযুক্ত হয় নাই। উহা মানবসমাজে জাতিভেদ কি দেবসমাজে জাতিভেদ সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সুতরাং পুরোহিত কোন্ সময়ে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা কঠিন। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন যে, আর্য্যগণ যখন পঞ্জাবের বাহিরে ছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে জাতি-ভেদ ছিল না। ভারতে আসিয়া বসবাস করিবার পরই তাঁহারা কর্ম্ম অনুসারে জাতিভেদ প্রচলিত করিয়াছিলেন।

পুরোহিতের ক্ষমতা অবশ্য অসাধারণ ছিল। সেই জন্ত জন কয়েক পাশ্চাত্য পণ্ডিত তর্ক তুলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের যখন এত প্রভাব ছিল তখন তাঁহারা রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই কেন? জেমস মিল তাঁহার বৃটিশ-শাসিত ভারতের ইতিহাস গ্রন্থে এ কথা উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, কেন যে এমন হইল তাহা এত কাল পরে ঠিক বুঝা যায় না। একটা কিছু ঘটিয়া থাকিবে যাহার জন্ত ব্রাহ্মণরা রাজ্যশাসন করিতেন না। সার উইলিয়ম হাণ্টার তাঁহার প্রণীত 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার' নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকটা ঠিক। তিনি বলিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণদিগের নেতৃবর্গ বুঝিয়াছিলেন যে যদি তাঁহাদিগের জাতিকে আধ্যাত্মিক গুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পার্থিব জাঁকজমক ত্যাগ করিতে হইবে। পৌরোহিত্য কার্য্য গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহাদিগকে নিশ্চিতই রাজকীয় কার্য্য পরিহার করিতে হইবে। ভগবান তাঁহা-দিগকে জাতির নিয়ন্তা এবং রাজার মন্ত্রিত্ব করিবার ভার দিয়াছেন, —কিন্তু তাঁহারা কোন মতেই স্বয়ং রাজা হইতে পারিবেন না। আসল কথা, রাজকার্য্যে বা রাজ্যশাসন কার্য্যে যাঁহাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হয়, তাঁহারা সর্ব্বক্ষেত্রে সাত্ত্বিক ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন না। রাজ্যশাসন করিতে হইলে অনেক সময় সরলতা ও অকপটতা রক্ষা করা সম্ভবে না। কূট রাজনীতির গর্ভে প্রতারণার জন্ম। রাজাকে কূট রাজনীতির আশ্রয় লইতে হয়, তাহার ফলে ব্রাহ্মণ্য গুণ সকল সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কঠিন। তাই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি এই চারিটিই সকল দ্বিজাতিকে শিখিতে হইত সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে আন্বীক্ষিকী (আধ্যাত্মিক দর্শন) ও ত্রয়ী বিশেষ ভাবে শিক্ষণীয় ছিল। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, ত্রয়ী (বেদ) এবং দণ্ডনীতি আর বৈশ্যের পক্ষে বার্ত্তা ও বেদ শিক্ষণীয়। ব্রাহ্মণ যাহাতে সত্ত্বগুণ হইতে বিচ্যুত না হন সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সেই জন্য ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ্যের হানিকর রাজ্য-শাসন কার্য্য গ্রহণ করিতেন না। হরিশ্চন্দ্রের নিকট হইতে বিশ্বামিত্র পৃথিবী দান লইয়া তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন,—পরশুরাম ২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া লব্ধ রাজ্যগুলি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। পরে ব্রাহ্মণরা নূতন ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়া তাহা তাঁহাদের সৃষ্ট ক্ষত্রিয়দিগকে দিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদ রাজার অর্দ্ধেক রাজ্য লইয়া তাহা অধিক দিন রাখেন নাই।

ব্রাহ্মণ বিচারকার্য্যের অধিকারী হইলেও রাজ-পুরোহিত বিচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন না। তবে কোন ব্রাহ্মণ যদি নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য পালন না করিতেন, তাহা হইলে রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইলে রাজা তাহার বিচারভার পুরোহিতের উপর দিতেন। রাজা ঐ সকল বিষয়ের স্বয়ং বিচার করিতেন না। পরবর্ত্তী কালে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে।

রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূর্য্যবংশের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবই রাজার ধর্ম্মকার্য্যের নিয়ামক ছিলেন। বশিষ্ঠ শব্দটি নাম-বাচক নহে, উপাধিবাচক। ইহার অর্থ নানা জনে নানারূপ করেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ সূর্য্যবংশের পৌরোহিত্য করিতে যান নাই ইহা নিশ্চয়, অধিকন্তু দিলীপ বা রঘুরাজের সময় যে বশিষ্ঠ রাজপুরোহিত ছিলেন, দশরথ বা রামের রাজ্যকালে তিনিই যে ঐ বংশের কুল-পুরোহিত ছিলেন ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ, যিনি দিলীপ রাজার সময়ে ছিলেন তিনি যে রামচন্দ্রের সময়েও থাকিতে পারেন, ইহা মনে হয় না। বশিষ্ঠ রাজা দশরথের জন্ত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন এবং যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ উপদেশ করেন। পাণ্ডবদিগের পুরোহিত ধৌম্য সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব-বিষয়ে পাণ্ডবদিগের অগ্রণী ছিলেন। কেবল অজ্ঞাত বাসকালে উঁহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। গর্গ ছিলেন যদুবংশের পুরোহিত

তিনি কৃষ্ণ ও বলরামের নামকরণ করিয়াছিলেন। ভাগবতপুরাণে দেখা যায় যে, শুক্রাচার্য্য হিরণ্যকশিপুর পুত্রগণকে শিক্ষাদান করেন। রাজপুরোহিত অনেক সময়ে দূতের কার্য্য করিতেন। মহাভারতাদিতে তাহার প্রমাণ আছে। বৌদ্ধযুগের সময় পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

অনেক সময় মন্ত্রি-পরিষদ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন,—তাহা রাজার পক্ষে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না, রাজা তাহা জানিবার জন্ত উহা রাজ-পুরোহিতের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। ইহার কারণ, বিশিষ্ট ঋষি তুল্য লোকরাই রাজ-পুরোহিত হইতেন। দেশের সকল লোক অবনত মস্তকে তাঁহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতেন। রাজ-পুরোহিত পক্ষপাতশূন্য হইয়া যত দিন কার্য্য করিতেন, তত দিন জনসমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন থাকিত। কাজেই রাজ-পুরোহিতের কার্য্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। তিনি রাজার নিকট হইতে বেতন লইতেন না। ব্রাহ্মণের পক্ষে ভৃতিজীবী হওয়া পাপ। সুতরাং তিনি স্বীয় স্বাধীনতা এবং সম দম তপঃ শৌচ ক্ষমা সারল্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই সকল গুণ রক্ষা করিয়া সমাজে চলিতে পারিতেন।

পুরোহিত আবশ্যক গুণসম্পন্ন না হইলে অথবা সেই সকল গুণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে রাজা ও দেশের লোক তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিতেন।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ১০৪ অধ্যায়ে ১৮—২০ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, "ঋষিরা নিত্য সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন বলিয়া দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হইতেন, অতএব পূর্ব্ব (প্রাতঃ) এবং পশ্চিম (সায়ং) সন্ধ্যাকালে বাগ্‌যত হইয়া থাকিবে। যে সকল ব্রাহ্মণ প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা না করে, ধার্ম্মিক রাজা তাহাদিগকে শূদ্রের কর্ম্ম করাইবেন।" সুতরাং আচারহীন অব্রতী ব্রাহ্মণগণকে রাজা পুরাকালে দণ্ড দিতেন। তবে বধ-দণ্ড দিতেন না।

পরবর্ত্তী কালেও রাজারা কিরূপ লোককে রাজ-পুরোহিত নিযুক্ত করিবেন, গৌতম তাহা বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, রাজা বিদ্বান্, কুলীন, বাগ্মী, রূপবান, বয়স্থ, সুশীল, সর্ব্বদা ন্যায়পথাবলম্বী এবং তপস্বী ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবেন। (গৌতম ১১ অ)

কেবল ব্রাহ্মণ হইলেই রাজ-পুরোহিত হইতে পারিতেন না। তাঁহাকে সর্ব্বদা ন্যায়পথাবলম্বী ও তপস্বী হইতে হইত। সুতরাং এই সব লোক কর্ত্তব্যপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেন না। সে জন্ত পুরোহিতকে পদচ্যুত করিবার জন্ত কি করিতে হইত তাহা কুত্রাপি বিবৃত নাই। তবে ইনি রাজার কার্য্যের যে এক জন বিশিষ্ট নিয়ামক ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাড়কানাম্নী অসুরীর উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া বিশ্বামিত্র তাড়কাবধার্থ দশরথের নিকট রাম-লক্ষ্মণকে চাহিয়াছিলেন। দশরথ একটু ইতস্ততঃ করিলে রাজ-পুরোহিত বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্মত হইতে বলেন। বিশ্বামিত্র তাড়কাবধান্তে ঐ দুই ভ্রাতাকে মিথিলায় লইয়া যান। পুরাণাদিতে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যায়। ফলে পুরোহিত রাজার এক জন বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। সাধারণ পুরোহিতের কার্য্যও অত্যন্ত কঠিন। দুর্ভাগ্যক্রমে অধুনা যজমানদিগের ঔদাসীন্তে পুরোহিতের অবনতি ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিভারত্ন)

ঢক্কা-নিনাদ

ডাক্তারী পাশ করে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে অশোক একটা জাহাজে চাকরি পেয়ে গেল; ভাগ্য বলতে হবে! কারণ, পাশ করলেই চাকরি পাওয়া অথবা প্রাক্‌টিস জমানো সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। কলকাতা ত্যাগ করবার আগে তার একমাত্র জীবিত আত্মীয়া পিসিমা তার বিবাহ দিয়ে দিলেন তাঁরি জানা-শুনা একটি মেয়ের সঙ্গে। বধূর নাম কৃষ্ণা। ধনী বাপের একমাত্র কন্যা। দেখতেও রূপসী। অতএব অশোককুমার যে ভাগ্যবান্, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে বিবাহ করবার পরেই যদি কোনও যুবককে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জাহাজে করে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে হয়, তাহলে সে ভাগ্য-দেবতাকে মনে মনে গাল-মন্দ দেয়। বেচারা অশোক,—রোজ নিয়মমত দশ পাতা করে চিঠি লেখে বটে, এবং প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণাও এমন উত্তর দেয় যে, অনেক সময় অশোককে চিঠির জন্ত একস্ট্রা মাশুল দিতে হয়। কিন্তু 'চিঠিতে কি ভোলে মন, বিনা দরশনে!' দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্মের পর বেচারা অশোক একলা ডেকে বেড়ায় আর সুদূর প্রিয়ার মুখ-সরোজ স্মরণ করে যে ভাবে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, তাতে অনেকের মনে হয়, বুঝি বা ডাক্তারের হাঁপানির ব্যামো আছে! অথচ চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়াও ভালো দেখায় না—লোকে কি বলবে! এমন সময় বুদ্ধিমতী পিসিমা দেহত্যাগ করলেন। অশোক তখনই ছুটী নিয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করলো। মনে পিসিমার জন্ত দুঃখ, অথবা তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দ—কোন্‌টা বেশী ছিল, বলা শক্ত।

পিসিমার কাজকর্ম্ম চুকে যাবার পর কৃষ্ণা এবং শ্বশুর-কুলের সকলে বললেন—"আর জাহাজে চাকরি করা ঠিক নয়। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ালে কৃষ্ণাকে দেখবে কে? এখন জেনারেল প্র্যাক্‌টিস করা উচিত।"

অনেক ভেবে অশোক দেখলে, কলকাতা সহরে প্র্যাক্‌টিস জমানো অত্যন্ত শক্ত। তার চেয়ে কাছাকাছি কোন একটা ছোট জায়গায় গেলে কিছু সুবিধা হতে পারে। সে ঠিক করলে, শ্রীরামপুরে ডিস্পেন্সারী করবে। কৃষ্ণার দাদা ললিতকে মনের ইচ্ছা জানিয়ে বললে—"আমি চললুম দাদা ছোট-খাট একটা ভালো বাড়ী শ্রীরামপুরে ঠিক করতে। তলায় ডিসপেন্সারী করবো আর ওপরে থাকবো। সব গোছ-গাছ হলে আপনি কৃষ্ণাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।"

ললিত সম্পূর্ণ ভাবে অশোকের মতে সায় দিল।

অশোকের বরাত ভালো। একটু চেষ্টা করতেই একেবারে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে দিব্য ছোট দোতলা বাড়ী বেশ কম ভাড়ায় পেয়ে গেল।

নতুন ঘর-সংসার—নতুন ডিস্‌পেন্সারী। মনের আবেগে ঘর আর দোকান সুসজ্জিত করতে লাগল। আর্টিষ্টিক ডিজাইনের একটা সাইনবোর্ড লট্‌কে দিল—"কৃষ্ণা ফার্ম্মাসি।" মনে মনে ভগবানকে বলতে লাগল, সব গোছগাছ করে তোলবার আগে যেন কোন রুগী এসে জ্বালাতন না করে। এ দিকে যত দেরী হবে ততই কৃষ্ণার আসার দেরি হবে। দিন-রাত এক করে বেচারা মনোমত করে সব একেবারে ফিট-ফাট করে তুলতে লাগলো।

অশোকের কথা ভগবান শুনলেন। ঘর-দোর গোছানো হলো, কৃষ্ণা এলো।

তার পর আরও অনেক দিন কেটে গেল কিন্তু রুগী আর আসে না! বেচারা একেবারে মনমরা হয়ে গেল! এ রকম হলে প্র্যাক্‌টিস জমবে কি করে আর আয়ই বা হবে কোত্থেকে। ললিতকে বললে—"দাদা, এ তো ভারী মুস্কিলে পড়েছি। যে জন্ম কলকাতা ছাড়লুম, এখানেও যে সেই অবস্থা! চার মাসের উপর হয়ে গেল এখনও একটা রুগীর চুলের টিকি পর্য্যন্ত দেখলুম না!"

ললিত গম্ভীর ভাবে বললে,—"ভাবনার বিষয় বটে! কিন্তু ধৈর্য্য হারালে চলবে না।"

কৃষ্ণা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে—"কিছু ভেবো না, আমি এর বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। তোমরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসো। আমি এখনি আসছি।"

কৃষ্ণা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অশোক আর ললিত বিস্মিত হয়ে দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে রইলো।

অশোক জিজ্ঞাসা করলো—"ব্যাপারটা কিছু বুঝলেন দাদা?"

ললিত হেসে বললে—"ও একটা পাগলী! সব সময়েই মাথায় নতুন নতুন প্ল্যান খেলে।"

অতঃপর দু'জনে 'ফিউচার ক্যাম্পেনে'র পরামর্শে মনোনিবেশ করলে।

এমন সময় ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে কৃষ্ণা বললে—"আর তোমাদের ভাবতে হবে না। এই ভাখো। আমি পড়ছি—তোমরা মন দিয়ে শোনো—

অন্তর ভরিয়া যদি থাকে নিরাশায়—
ডাক্তার-বৈদ্যতে বলে, বাঁচা হবে দায়।
আত্মীয়-স্বজন সবে করে হায়-হায়,
তখন করিয়ো মনে ডাক্তার এ, কে, রায়।

এই "অ্যাডভারটিজ্‌মেন্টটা সব বড় বড় কাগজে দিয়ে দাও। দেখবে, রোগীর ভীড়ে পাবলিকের শান্তিভঙ্গ হবে। নাইবার-খাবার ফুরসৎ মিলবে না।"

অশোক আর ললিত দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে রইলো! একটু পরে ললিত হো-হো করে হেসে উঠলো। কৃষ্ণা রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে হাসির বেগ প্রশমিত হলে ললিত বললে—"তুমি কিছু ভেবো না অশোক। একটা-না-একটা উপায় মাথা থেকে বেরোবেই। এত দিন হাইকোর্টে প্রাকটিস করছি, মিথ্যা কথা বলে বলে পোক্ত হয়ে গেছি। হয়কে নয়, নয়কে হয় করাই আমাদের পেশা। দিব্যি পেট ভরে আজ রাত্রে লুচি আর মাংস খাওয়াও। কাল সকালে প্ল্যান বাৎলে দেবো। অবশ্যই সুফলপ্রদ হবে।"

বলা বাহুল্য, রাত্রে আহার বেশ জোরালো রকমেরই হলো। সমস্ত রাত অশোকের ঘুম হলো না। বেচারার মনটা ভয়ঙ্কর দমে গেছে। চার মাসের ওপর ডিস্‌পেন্সারীতে বসছে অথচ একটা রুগী এলো না! শ্যালক-প্রবর কি এমন প্ল্যান বাৎলাবেন যে হঠাৎ পিল্‌ পিল্‌ করে রুগীর দল তার ডিস্‌পেন্সারীতে এসে হাজির হবে!

সকালে উঠেই অশোক শ্যালক-মহাশয়কে জিজ্ঞেস্‌ করলে—"কি দাদা, কোন উপায় ঠাওর করতে পারলেন?"

ললিত হেসে উত্তর দিলে—"উপায় একটা বার করেছি বই কি। তোমার লুচির দিস্তে আর এক-হাড়ী মাংস কি অমনি ধ্বংস করেছি। ধীরে ব্রাদার-ইন-ল, ধীরে! চা খেতে খেতে সব খুলে বলবো।"

অধীর আগ্রহে অশোক চায়ের টেবিলে গিয়ে বসলো। কৃষ্ণার রাগ এখনও পড়েনি। অত্যন্ত গম্ভীর মুখে সে চা পরিবেষণ করতে লাগলো। অশোক চা খেতে খেতে বললে—"দাদা, আর দেরী করবেন না। বলে ফেলুন কি মন্ত্রে শুষ্ক মরুভূমিতে ফুল ফুটবে, শূন্য ডিস্‌পেন্সারীতে রুগীর দল জুটবে এবং আপনার ভগিনীর অঙ্গে নিত্য নতুন গহনা উঠবে!"

ললিত বললে—"বেশ, প্ল্যানটা বলছি কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে পারবে না! নির্বিচারে আদেশ পালন করতে হবে। এবং একটু ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে হবে।"

অশোক উত্তর দিলে—"আপনার প্রত্যেকটি কথা শুনতে রাজী আছি।"

ললিত বললে—"উত্তম। প্রথম এবং এখনকার মত একটি মাত্র কাজ হলো, আজই তুমি শ্রীরামপুর ত্যাগ করে চলে যাও। শিমুলতলায় আমাদের বাড়ীতে গিয়ে অজ্ঞাত-বাস করো। যত দূর সম্ভব কারো সঙ্গে মিশবে না। বিশেষ করে তুমি যে ডাক্তার, সে-পরিচয় কাউকে দেবে না। আমার চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই থাকবে। আসতে লিখলে তবে আসবে। এসে দেখবে, ফীল্ড রেডী!"

অবিশ্বাসের হাসি হেসে অশোক বললে,—"কিন্তু—"

বাধা দিয়ে ললিত বললে—"এতে কিন্তু নেই। নিজের মুখেই স্বীকার করেছো প্রত্যেক কথা শুনতে রাজী আছো। এখন আর কিন্তু চলবে না। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।"

সেই দিনই বিকেলের গাড়ীতে অশোক শ্রীরামপুর ত্যাগ করলে। যত দিন না সে ফেরে, ললিত তার বাসাতেই থাকবে কৃষ্ণাকে আগলাবার জন্য। হাইকোর্টের ছুটি রয়েছে। অশোকের ভাববার কিছু নেই।

পরদিন সকালেই ডাক্তার রায়ের ডিস্‌পেন্সারীর সামনে একটা বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।—"ডাক্তার রায়কে ভারত সরকারের এক জন অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর চিকিৎসা সংক্রান্তে দিল্লী যেতে হয়েছে। ক'দিনের জন্য তাঁর ডিস্‌পেন্সারী বন্ধ থাকবে।" লোকেরা আপসে বলাবলি করতে লাগলো—"আর ক'দিন পরে ক'দিনের জন্য কেন, চিরদিনের জন্যই ডিস্‌পেন্সারী বন্ধ থাকবে।'

তার পর দু'-এক দিন অন্তর-অন্তর কলকাতা থেকে গাড়ী করে লোক আসতে লাগলো ডাক্তার অশোক রায়ের খোঁজে। প্রত্যেকে ভুল ঠিকানায় গিয়ে ডাক্তার রায়ের বাড়ীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন। বলা বাহুল্য, এঁরা সবাই ললিতের হাইকোর্টের বন্ধু। তারাই

শেখানো-মত তাঁরা অন্যত্র গিয়ে অশোকের বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেছেন। অবশ্য প্রত্যেক বন্ধুকেই ললিত পেট পুরে খাইয়ে তবে ছাড়ে। শ্রীরামপুরে একটা চাঞ্চল্য জাগলো। তবে কি ডাক্তার রায় বর্ণ-চোরা আম! সত্যই এক জন বড় ডাক্তার! অনেকটা আধো-আলো আধো-ছায়া ভাব! কেউ বিশ্বাস করছে, কেউ বা অবিশ্বাস করছে। যাই হোক, নিন্দা অথবা সুখ্যাতি দুই-ই যশের অঙ্গ।

শ্রীরামপুরের লোকেরা যখন এই ভাবে সন্দেহ-দোলায় দুলছে, ঠিক সেই সময় খবরের কাগজে ছাপার হরফে বার হলো :—

"শ্রীরামপুর-নিবাসী সুবিখ্যাত ডাক্তার অশোককুমার রায়ের বাড়ীতে চুরি। ডাক্তার রায় বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দিল্লী গিয়াছেন। গৃহে তাঁর স্ত্রী ও শ্যালক ছিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় গভর্ণরের চায়ের পার্টিতে যোগ দিতে গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময় বাড়ীতে চোর প্রবেশ করে। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ডাক্তার রায়ের লাইব্রেরী-ঘরের আলমারী খোলা ও টেবিলের কয়েকটা দেরাজ ভাঙ্গা। অপহৃত দ্রব্যাদির সম্পূর্ণ তালিকা তাঁহারা দিতে পারেন নাই, তবে কয়েকটি দুর্ম্মূল্য উপহার এবং অমূল্য পত্রাবলী খোয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ব্যাংককের রাজমন্ত্রীর প্রশংসা-পত্র, ডাক্তার সান্ ইয়াতসেনের পৌত্র চুংলিংসানের ও ডাক্তার রায়ের একত্র ছবি, টোকিওর মাৎসুআকার ভাইয়ের চিঠি, সারওয়াকের রাজার প্রদত্ত একটি সনদ ইত্যাদি বহু মূল্যবান্ দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশে খবর দেওয়া হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।"

চুরির চেয়ে বড় পাবলিসিটি আর নেই! কারণ, কার কাছে কি আছে, চুরি না গেলে এবং কাগজে ছাপা না হলে লোকে জানতে এবং বিশ্বাস করতে চায় না।

ফল ভালোই হলো। শ্রীরামপুরের লোকেদের মনে যেটুকু দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা ছিল, তা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হলো।

অশোকের কাছে তার গেল—"ফিল্ড রেডী। কাম্ ব্যাক্।"

অশোক যে দিন ফিরলো, তার পরের দিন তার ডিসপেন্সারীতে এত ভীড় হয়েছিল যে, বেচারী নাইবার-খাবার পর্য্যন্ত সময় পায়নি। আজ সে শ্রীরামপুরের এক জন বিখ্যাত ডাক্তার। তাকে চেনে না এমন লোক সে অঞ্চলে নেই। সেই জন্যই বলতে ইচ্ছে করে—"পাবলিসিটি ইজ্ দি ম্যান্!"

নিশাকর

বরাত

[বসবার ঘর। একটা টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজানো। ক্যাপ্টেন জে, পি, গাঙ্গুলী আই, এম, এস, (রিটায়ার্ড) চা খাচ্ছেন আর খবরের কাগজ পড়ছেন। তাঁর শিকারের খুব সখ, ঘরের দেওয়ালে অস্ত্রশস্ত্র টাঙানো। এক ধারে শেলফে কতকগুলো বই। তিনি বিবাহ করেননি। তাঁর একমাত্র ভাগিনেয়, পণ্টু মুখার্জ্জী তাঁর ওয়ারিশ। তাকে তিনি ভয়ানক ভালোবাসেন। পণ্টুর ভালো নাম পরিতোষ। পিতৃ-মাতৃহীন; মামার কাছেই মানুষ।]

(পণ্টুর প্রবেশ)

প। কি মামা, কোন নতুন খপর আছে না কি?

জে, পি। (খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই) না।

প। (একটা টোষ্ট খেতে খেতে) তার পর স্যর বি, কে, কোথায়?

জে, পি। তিনি চা খেয়ে বাগানে একটু বেড়াচ্ছেন।

প। ভালোই হলো। তোমার সঙ্গে একটু প্রাইভেটে কথা ছিল। আমি বলছিলুম কি—(খানসামা আব্দুর ট্রেতে কোরে চা দিয়ে চলে গেল) হ্যাঁ, আমি বলছিলুম কি, মানে, তুমি যদি কিছু মনে না করো—

জে, পি। তোমাকে আরও গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিতে হবে, কেমন?

প। তোমার ডাক্তারী-বিদ্যা অসাধারণ মামা। লোকের মনের কথা চমৎকার ধরে ফেলতে পারো! আমি ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলুম—তবে পঞ্চাশ নয় চল্লিশ, অবশ্য চল্লিশের চেয়ে পঞ্চাশই ভালো শোনায়।

জে, পি। চল্লিশই হোক্ আর পঞ্চাশই হোক—আমার জবাব একই। তোমাকে আমি এ-মাসে আর-একটি পয়সা দেব না। কারণ, বাজে খরচের একটা সীমা আছে।

প। মাই ডিয়ার মামা, কারণ জানবার কোন দরকার নেই। মামার কাছ থেকে ভাগনে আবার কারণ জানবে কি? লোকে কথায় বলে মামা-ভাগনে। তুমি শুধু বলবে—"বাবা পণ্টু, জানো তো বাবা আমি তোমায় কত ভালোবাসি, স্নেহ করি—কিন্তু তোমাকে আর আমি টাকা দিতে নারাজ।" ব্যস্—আমি তখনি বুঝে নেবো।

জে, পি। বেশ—তবে তাই। হ্যাঁ শোনো, আজকে একটা চিঠি পেলুম, বুধবার-নাগাদ মন্মথ আসছে।

প। কোন্ মন্মথ? আমাদের আলু?

জে, পি। আলু আবার কি?

প। নারী-রক্ষা-সমিতি, বেঙ্গল ফিশারি, হিন্দু মহাসভা, প্রাচ্য-নৃত্য, ভারতীয় লবণ প্রতিষ্ঠান, নারিকেল গাছ সমবায় সমিতি—কোথায় তিনি নেই! তাই লোকে ভালোবেসে তাঁর নাম দিয়েছে আলু! তিনিই তো?

জে, পি। আজকালকার ছেলেরা ভারী ফাজিল হয়ে পড়েছে।

প। আজ সোমবার আর দু'দিন পরেই তিনি এসে পড়বেন! তবে তো ভারী মুস্কিলের কথা।

জে, পি। মুস্কিল কেন?

প। কারণ, স্যর বি, কে, এই তো মাত্র দিন পাঁচেক হলো এসেছেন। দু'দিন বলে উনি প্রত্যেক বার দু'হপ্তা কোরে থাকেন। এ বা-

যখন হু'হপ্তা বলেছেন, তখন সেক্‌নী দু'মাস ধরা যেতে পারে। বুধবারের আগে তো ওঁকে এখান থেকে সরানো অসম্ভব।

জে, পি। সরাবার দরকার কি! এখানে জায়গার অভাব নেই। আমরা তিন জন একসঙ্গে প্রেসিডেন্সীতে পড়েছি—আর ওদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বও বিলক্ষণ আছে।

প। আছে ঠিক নয়—ছিল। আর বন্ধুত্বর পরে শত্রুতা হলে তা একটু জোরালো রকমেরই হয়। এখন এক জন আর-এক জনের নাম শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন্। সাপে-নেউলের অবস্থা।

জে, পি। কেন? কি করে হলো?

প। ঘোড়া নিয়ে।

জে, পি। কি যে ঘোড়ার ডিম যা-তা বলো কিছু বুঝতে পারি না।

প। ঘোড়ার ডিম নয়, মামা—ঘোড়া। জানো তো, দু'জনেই আজ-কাল ট্রেবল করেছে—রেস-হর্স পুষছে। স্যর বি, কেকে মন্মথ বাবু তাঁর একটা ঘোড়া বিক্রী করেছেন!

জে, পি। বেশ তো! তিনি বেচলেন—স্যর বি, কে পয়সা দিয়ে কিনলেন। এর মধ্যে রাগারাগির কি আছে?

প। মন্মথ বাবু বল্লেন—"এই যে ঘোড়াটা দিচ্ছি ব্রাদার, খাস আরেবিয়ান। ভাইসরয়-কাপ এবার তোমার। গ্রেগরী খুব ট্রেনিং দিয়েছে। স্যর বি, কে বল্লেন—"বেশ ব্রাদার; তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।" কিনে এনে ট্রেনিং দিতে গিয়ে দেখা গেল, ঘোড়াটা দৌড়ুতেই পারে না। ডাক্ ভেটেরিনারী সার্জ্জন মিষ্টার ডেভিসকে। তিনি পরীক্ষা করে বল্লেন—"ঘোড়ার পায়ে বাত আছে। রেসে দৌড়ুতে পারবে না।" ব্যস্! দু'জনের মুখ-দেখাদেখি বন্ধ। কথাবার্ত্তা নেই। শ্রেফ পত্রাঘাত। তার পর থেকে একটা চিঠিতে কত গালি-গালাজ দেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে ওরা রেকর্ড-স্থাপনের চেষ্টা করছেন।

জে, পি। একেবারে ছেলেমানুষী! অবিলম্বে মিটমাট করে ফেলা উচিত।

প। উচিত তো বটেই—কিন্তু হয় কি করে?

জে, পি! বি, কে ঘোড়া ফেরত দিক—আর মন্মথ টাকা refund করুক।

প। স্যর বিজয় ঘোড়া ফেরৎ দিতে খুব রাজী কিন্তু মন্মথ বাবু টাকা ফেরৎ দিতে একেবারে নারাজ।

জে, পি। নারাজ! কেন?

প। তিনি বলেন, তাহলে নাকি নিজের দোষ স্বীকার করে নেওয়া হয়।

জে, পি। তাই তো, এখন কি করা যায়? দু'জন এখানে একসঙ্গে থাকলে ভারী বিশ্রী ব্যাপার হবে তো! হয় তো কেউ কারুর সঙ্গে কথাই বলবে না।

প। উল্টে বরং দু'জনের কথা থামানো মুস্কিল হবে। এত দিন দু'জনের কটূক্তির একটা সীমা ছিল—দু' পয়সার খামে দু' তোলার বেশী যেত না। এখন সেই বাঁধা-ধরা নিয়ম উঠে গেলে দু'জনে মনের সুখে প্রাণ খুলে বলে নেবে। Extra বলার জন্য মাশুল লাগবে না।

জে, পি। ... তো কি করা যায়? ... অনেক কিছ

পরে আসতে চেয়েছে—ওকে বারণ করা যায় না। আবার স্যর বি, কে নিজে থেকে না গেলে যেতে বলা যায় না!

প। আর তিনি যে নিজে থেকে যাবেন, তাও মনে হয় না।

জে, পি। সেই তো মুস্কিল! বাবা পল্টু, তোমরা আজকালকার ছেলে চালাক-চতুর আছো! এ রকম ক্ষেত্রে বুধবারের আগে ওকে সরাবার কি উপায় করা যায়···বলো তো?

প। শুধু চালাক-চতুর বললে চলবে না। তার চেয়ে এই রকম ভাবে বলো—"বাবা পল্টু, জানো তো বাবা তোমায় আমি কত ভালোবাসি, স্নেহ করি। তুমি এই কাজটা উদ্ধার করে দাও বাবা। হ্যাঁ, কত টাকা চাইছিলে? পঞ্চাশ? বেশ তো, ওকে বুধবারের আগে এখান থেকে সরাতে পারলেই পাবে।" ব্যস্! কাজ হাসিল করে দেবো।

(স্যর বি, কে'র প্রবেশ)

বি, কে। এই যে পল্টু, ঘুম ভাঙ্গলো?

প। (উঠে দাঁড়িয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

বি, কে। আরে বসো বসো—খাও। আমি উঠেছি সেই ভোর পাঁচটায়, ব্রেকফাষ্ট সেরে বাগানে বেড়িয়ে ফিরলুম। তা তোমার সঙ্গে টু কাপ কম্প্যানি আর এক-কাপ চা খাওয়া যাক্।

প। আমি তৈরী করে দিচ্ছি। (চা করে এগিয়ে দিল)

বি, কে। (চা খেতে খেতে) টোষ্ট নেই?

প। আব্দুর এখুনি আনছে। এই যে!

(আব্দুর টোষ্ট আনলে)

বি, কে। (দুটো টোষ্ট নিয়ে) মাখন নেই?

আ। আজ্ঞে, আপনার জামার হাতার তলায় রয়েছে।

বি, কে। ওঃ, তাই তো! (অনেকটা মাখন লাগিয়ে খেতে লাগলেন। আব্দুর চলে গেল)

জে, পি। বিজয়—আমাদের রাম বাবুর ছেলের বিয়ে কালকে, তুমি কি ভাগলপুর যাবে? যাও তো আজই রাত্রে কিংবা কাল সকালে চলে যেতে হয়। অনিল যে রকম তোমাকে ভক্তিমান্ত করে, তার বিয়েতে তুমি না গেলে সে ভয়ঙ্কর ক্ষুণ্ণ হবে।

বি, কে। না, অতখানি রণ্‌টানো এই বুড়ো শরীরে সহ্য হবে না। বিয়ের পর সুবিধামত এক দিন ওদের আশীর্ব্বাদ করে আসবো। মারমালেডের পটটা কোথায়?

প। এই যে! (এগিয়ে দিল)

বি, কে। (টোষ্টে গাদাখানেক মার্‌মালেড লাগিয়ে খেতে খেতে) তোমাদের মার্‌মালেডটা বেশ। কালকে যে-জেলীটা খেয়েছিলুম—সেটাও বেশ লেগেছিল। কই, দেখছি না তো!

প। সেটা কালই ফুরিয়ে গিয়েছিল। আজকে আর একটা আনতে দেবো।

জে, পি। কাল বিকেলে নার্সারী থেকে নতুন ফুলগাছগুলো এসেছে, দেখতে যাচ্ছি। তুমি যাবে না কি বিজয়?

বি, কে। না—সমস্ত সকালটাই তো বাগানে ছিলুম—আর এখন যাব না।

(জে, পি বেরিয়ে গেলেন।)

প। আপনার কি এখানটা বোরিং লাগছে।

বি, কে। না, না।

(আব্দুর টেবিল পরিষ্কার করতে এল)

বি, কে। আর একটু গরম দুধ হলে হতো।

(নিঃশব্দে দুধের জাগ নিয়ে আব্দুর বেরিয়ে গেল)

প। চাকর বাকরদের নিয়ে জ্বালাতন!

বি, কে। তা-ঠিক! ওদের নিয়ে আমার যে কি কষ্ট, তা তুমি ধারণা করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের কোন কমপ্লেন করা উচিত নয়। তোমার মামার এ বিষয়ে ভাগ্য ভালো! ধরো, আব্দুর তোমাদের এখানে প্রায় দশ বছর রয়েছে—যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি কাজের। একেবারে রত্ন!

প। এই রত্নদের নিয়েই ত হয়েছে মুস্কিল। যারা টেঁকে না, তাদের উপর টানও থাকে না—নির্ভরতাও হয় না। কিন্তু এরা একেবারে আমাদের অসহায় কোরে তোলে।

বি, কে। তবে এরা যদি মনের মত কাজ করে—

প। ঐখানেই তো আরও অসুবিধা, এই ধরুন আব্দুরের কথা!

বি, কে। আব্দুর! এমন চাকর লাখে একটা মেলে।

প। সে কথা ঠিক। মামা ওকে ছাড়া এক দিনও চালাতে পারবে না। তা সত্ত্বেও ওর অনেক গণ্ডগোল আছে।

বি, কে। কেন? কেন? হাত-টান? স্বভাব-চরিত্র?

প। না, না, সে সব নয়। আচ্ছা ধরুন, একটা লোক দিনের পর দিন বাঁধা রুটিনে কাজ করে যাচ্ছে। কোন রকম অদল-বদল নেই। দশ বছর পরে তার অবস্থা কি হবে?

বি, কে। সে পাগল হয়ে যাবে।

প। ঠিক বলেছেন, পাগল হয়ে যাবে।

(আবদুর দুধের জাগ দিয়ে চলে গেল। দু'জনেই তার দিকে চাইলেন)

বি, কে। কিন্তু আব্দুর—

প। দেখলে বোঝা যায় না বটে—কিন্তু মধ্যে মধ্যে এমন করে যে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। পাগল ছাড়া আর-কেউ তা করতে পারে না। বিশেষ করে মুস্কিল হয় ওর ভ্রান্তি নিয়ে!

বি, কে। (আর এক কাপ চা খেতে খেতে) ভ্রান্তি! তার মানে?

প। জানেন তো, মামা ওকে লড়াই থেকে জোগাড় করে। ও একটু-আটটু লেখাপড়া জানে। ইতিহাসটা খুব সড়গড়। মধ্যে মধ্যে সে সম্বন্ধে আমায় দু'-একটা প্রশ্ন করে। ওর ভ্রান্তি হয় ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে।

বি, কে। (আর একটা টোষ্ট খেতে খেতে) ভারী মজার ব্যাপার তো!

প। বিপদ হয় এই কারণে যে, ভ্রান্তিগুলো বেড়ে ওঠে কোনো অতিথি বাড়ীতে থাকলে। এই সে-বার গোয়ালপাড়ার জমীদার দেবেন্দ্র বাবু আসতে এক মহা হাঙ্গামা। তাঁর দাড়ি দেখে আব্দুরের মনে এক খেয়াল হলো যে উনি মহম্মদ তুগলক—পাগল রাজা! ব্যস্—আর যাবে কোথা? তাঁকে ও খেতে শুতে আগলে থাকতে লাগলো। এক দিন এক মোটা শেকল নিয়ে তাঁর ঘরে গিয়ে হাজির। তাঁকে বেঁধে রাখবেই। দেবেন্দ্র বাবু বুদ্ধিমান লোক। ব্যাপার দেখে আমরা তো খুবই ভীত হয়ে গেছি, তিনি কিন্তু ঠিক ধরে ফেললেন। বল্লেন—"ও কিছু না—ডিলিউশন। দু'দিন আমাকে না দেখলেই সব ভুলে যাবে। আমি ওর সামনে থেকে সরে যাই।" হলোও তাই।

বি, কে। কিন্তু আমি হলে চলে যেতুম না। ওকে ওর ভুলটা দেখিয়ে দিতুম।

প। দেখাতেন কাকে? ও তো তখন বদ্ধ পাগল। পাগলদের ঘাঁটানো ঠিক নয়, কি করতে কি করে বসে!

বি, কে। আব্দুরকে ভয় করবার কোন কারণ ঘটেছে না কি?

প। ঘটেনি—কিন্তু ঘটতে কতক্ষণ! অতিথি দেখলেই ও কি রকম ক্ষেপে ওঠে! সেই জন্যই তো আমরা বড় ভাবনায় পড়েছি।

বি, কে। কেন? আমাকেও কিছু একটা কল্পনা করে বসে আছে না কি?

প। হ্যাঁ। কাল রাত্রে জানতে পেরেছি।

বি, কে। কি? কি? শুনি। আমায় ও কি মনে করেছে?

প। রামকান্ত কামার।

বি, কে। রামকান্ত কামার! হাউ ফানি! কিন্তু এতে ভয়ের কি আছে?

প। ইতিহাস তার সম্বন্ধে কি বলে, জানেন?

বি কে। কি বলে?

প। তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছিল।

বি কে। (সিগার ধরিয়ে) আমাকে কি তাঁর প্রেতাত্মা মনে করে?

প। প্রেতাত্মা কেন? প্রেতাত্মা কি টেবিলে বসে চা খায়, না, সিগার ফোঁকে! আপনাকে খোদ্ রামকান্ত মনে করে এবং সেই জন্যই আরও চটে যাচ্ছে।

বি, কে। কেন?

প। আপনাকে কেউ খুন করছে না বলে!

বি, কে। তার জন্য ওর রাগবার কি আছে?

প। কিছুই না। তবে আর পাগল বলেছে কেন? কাল রাত্রে দেড়টা নাগাদ আপনার ঘরের সামনে দিয়ে আমি একবার বসবার ঘরে যাচ্ছিলুম একখানা বই আনতে। ঘুম হচ্ছিল না—পড়বো বলে। দেখি, আপনার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আব্দুর বিড়-বিড় করে কি ব'লছে। তখনই আমার সন্দেহ হলো। চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলুম। দু'-একটা কথা যা কাণে গেল তাতে বুঝলুম, ও বলছে—"কেন বেঁচে থাকবে? কেউ না খুন করে, আমি খুন করবো।"

বি, কে। কি ভয়ানক! তোমার মামাকে এখনি জানানো উচিত।

প। মিথ্যে বলা! মামা আব্দুরের againstএ কোন কথা বিশ্বাস করবেন না।

বি, কে। কিন্তু একটা পাগল খুনী চাকরকে নিয়ে এক-বাড়ীতে বাস করবো! ডেঞ্জারাস!

প। এ তো সাময়িক পাগলামী! আপনি যদি কিছু দিন ওর চোখের আড়ালে যান, তাহলেই সেরে উঠবে।

বি, কে। না, সে ঠিক হবে না। আমি এখান থেকে যাবো না। ভয় পাবো কেন? তার চেয়ে তোমরা বরং ওকে একটু চোখে চোখে রেখ। আচ্ছা, আমি এখন আমার ঘরে যাই—দু'-একটা দরকারী চিঠি লেখবার আছে। সকালের ডাকে পাঠাতে হবে।

[প্রস্থান

প। আচ্ছা ছিনে জোঁক!

(ব্যস্তভাবে ক্যাপটেন্ গাঙ্গুলীর প্রবেশ)

জে, পি। হটনের নার্সারীর যে ক্যাটালগটা কাল এসেছে সেটা কোথায় যে রাখলুম, খুঁজে পাচ্ছি না। (শেল্‌ফ খুঁজে) এই যে। তার পর পল্টু, কত দূর এগুলো।

প। একচুলও না! কিছুতেই বাগে আনতে পারা গেল না। ভস্মে ঘি ঢালা।

জে, পি। আমি আগেই জানতুম। এ শ্রেফ সোনার হরিণের পিছনে ধাওয়া করা!

(আব্দুর টেবিল পরিষ্কার করতে লাগল)

প। নড়লে তবে তো ধাওয়া করবো। এ একেবারে নট্-নড়ন-চড়ন নট্-কিচ্ছু।

জে, পি। ওর অনিচ্ছায় ওকে নড়ানো শিবেরও অসাধ্য।

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

(পল্টু একটা সিগারেট ধরিয়ে গুন্-গুন্ করে গান গাইতে লাগলো)

তারে পারবে না নড়াতে!
কত শত কায়দা জানে সবার হাত এড়াতে!
শোনে না কথা ভয় না পায়—
তারে নিয়ে হলো বিষম দায়!
একচুলও সে সরে না'ক ছুমো বাঘের তাড়াতে!
বুড়ো যেন বাপ ছিনে জোঁক,
যাবার মোটে নাইকো' ঝোঁক!
মুখেতে নুণ না ঢাললে বেগ পেতে হয় ছাড়াতে!
ছোরা নিয়ে করলে তাড়া

ঠিক হয়েছে! ইউরেকা!

(চেয়ার ছেড়ে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল। আব্দুর চমকে গেল)

আব্দুর। হুজুর কিছু বলছেন?

প। ঐ ছোরাখানা নিয়ে এসো তো।

আব্দুর। (একটা ছোরা দেখিয়ে) এইটে?

প। হ্যাঁ। (আব্দুর ছোরা নিয়ে এল)

প। (ছোরা নিয়ে) স্যর বি, কে কোথায়?

আ। ওঁর ঘরে।

প। শোনো। এই ছোরাখানা উনি একবার দেখতে চাইছিলেন। ওঁকে দিয়ে এসো তো! [আব্দুর ছোরা নিয়ে যাচ্ছিল)

প। শোনো। (আব্দুর ফিরে এল)

প। খাপটা খুলে শুধু ছোরাখানা নিয়ে যাও। দেখি। হ্যাঁ, এই রকম ভাবে ধরে—

(যেন মারতে যাচ্ছে ছোরাটা এই রকম ভাবে আব্দুরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে)

ঠিক এই রকম ভাবে যাবে। উনি ছোরা-ধরা-অবস্থায় তোমার একটা ছবি তুলে নিতে চান। Snap-shot! বুঝলে! ঠিক এই ভাবে।

আ। আজ্ঞে, হ্যাঁ। (সেই ভঙ্গীতে প্রস্থান)

[পল্টু ঘরের এক কোণে বইয়ের শেলফের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়াল। নেপথ্যে "পল্টু—পল্টু—জিতেন—" বলতে বলতে ছুটে স্যর বি, কে ঘরে ঢুকলেন। কাউকে না দেখতে পেয়ে "কই, এরা সব গেল কোথায়" বলতে বলতে আর এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।]

(পল্টু আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ছোরা হাতে আব্দুর ঢুকলো।)

আ। উনি আমার ছবি তুললেন না! ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন! বোধ হয়, আমায় দেখতে পাননি।

প। তা হবে। তুমি ছোরাটা যেখানে ছিল, রেখে দাও। ছবির কথা হয় তো ভুলে গেছেন। আমি পরে বলবো।

(আব্দুর ছোরাটা যথাস্থানে রেখে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে চলে গেল)

(এক জন চাকরের প্রবেশ)

চা। বিজয় বাবু টাইম-টেবিল চাইছেন।

প। (ছুটে শেল্‌ফ থেকে টাইম-টেবিল নিয়ে পাতা বের করতে করতে) কলকাতার ট্রেন—১টা ৫ মিনিট। এখনও আধ ঘণ্টা সময় আছে। এই পাতাটা খুলে নিয়ে যা।

[টাইম-টেবিল নিয়ে চাকরের প্রস্থান

প। আব্দুর—আব্দুর—

(আব্দুরের প্রবেশ)

আ। হুজুর! আমায় ডাকছিলেন?

প। হ্যাঁ। সোফারকে গাড়ী বের করতে বলো। স্যর বি, কে এখনি ষ্টেশনে যাবেন। জরুরী কাজ।

আ। আজ্ঞে, বলছি।

[প্রস্থান

(আর এক জন চাকরের প্রবেশ)

চা। বিজয় বাবুর দু'টো বই?

প। (শেল্‌ফ থেকে একগাদা বই নিয়ে) এই নে, সব নিয়ে যা।

[বই নিয়ে চাকরের প্রস্থান

(আব্দুর ঢুকল)

আ। গাড়ী বার করছে।

প। আচ্ছা, তুমি যাও। আমি স্যর বি, কেকে খবর দিচ্ছি।

[আব্দুরের প্রস্থান

প। মামা—মামা— [পল্টুর প্রস্থান

(হর্ণ-ধ্বনি এবং মোটর চলে যাওয়ার আওয়াজ)

(একটু পরে জে, পি ব্যস্ত ভাবে ঢুকলেন)

জে, পি। পল্টু—পল্টু—

(সঙ্গে সঙ্গে পল্টুও "মামা—মামা" বলতে বলতে ঢুকল)

প। মামা—কেল্লা ফতে!

জে, পি। মানে?

প। আসন্ন বিপদের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করেছি। স্যর বি, কে এখনি চলে যাচ্ছেন। এখন একবার বলো—"বাবা পল্টু, জানো তো বাবা, আমি তোমায় কত ভালোবাসি, স্নেহ করি, এই কাজটা উদ্ধার করে দিয়েছ, এর জন্য খুশী হয়ে তোমাকে বাবা পঞ্চাশ টাকা Present করছি।"

জে, পি। (হেসে) কোন দরকার নেই। মন্মথর কাছ থেকে এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলুম, তার ছেলের অসুখ—আসতে পারবে না।

প। (হতাশ ভাবে চেয়ারে বসে) আমার বরাত!

শ্রীমতী মাধবী দেবী

ক্ষীরোদপ্রসাদের অপ্রকাশিত রচনা

প্রস্তাবনা

নাম্নুরের এই বনে রে, নাম্নুরের এই বনে।
চলতে চলতে যা রে পথিক একটা কথা শুনে।
একটি কথা শুনে যা রে একটি কথা শুনে,
একটি ফুল ফুটেছিল নাম্নুরের এই বনে।
নাম্নুরের এই বনের মাঝে ফুটলো যেমন ফুল
গন্ধ গেলো বিশ্ব ভরে',
শুষ্ক তরু মুঞ্জরে,
দেবতা, মানুষ, পশু, পাখী হ'ল রে আকুল।
দুকুল ভাঙ্গা বানের কথা শুনিস্ যা সব কাণে,
গোড়ার কথা এইখানে রে নাম্নুরের এই বনে।

—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিত্যা ও বাশুলী

নিত্যা। হাঁ রে বাশুলী, সই, ক'দিন ধরে' আর ঝুমুর-গান শুনতে পাচ্ছি না কেন?

বাশুলী। কেমন করে' শুনবে দেবি, সে ঝুমুর মেয়েগুলো ত আর তোমার মন্দিরে আসে না।

নিত্যা। কেন আসে না তারা? আমি তাদের কাছে কি অপরাধ করেছি?

বাশুলী। করেছ বই কি দেবি, নইলে তারা আসে না কেন? তারা মাঠে, বনে, দীঘির ধারে গান গায়, তবু তোমার মন্দিরে আর আসে না।

নিত্যা। কি অপরাধ, আমি ত বুঝতে পারছি না বাশুলি!

বাশুলী। অপরাধ? তুমি যে তোমার সন্তানদের প্রসব করবার সঙ্গে জাতি-বর্ণও প্রসব করে' ফেলেছ।

নিত্যা। ও! বুঝতে পেরেছি। গ্রামের উচ্চবর্ণের লোকেরা আর তাদের আমার মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয় না।

বাশুলী। কেমন করে দেবে। তারা যে নীচ, অস্পৃশ্য বাউরি চণ্ডাল! তারা তোমার মন্দিরে প্রবেশ করলে তোমার মন্দির শুধু অপবিত্র হবে না দেবি, তুমি শুদ্ধ অপবিত্র হয়ে যাবে। বামুন ছত্রী—এই সব বড় বড় জাতি—তারা তাহলে কেমন করে' তোমার পায়ে ফুল দেবে?

নিত্যা। বলিস্ কি রে সই, আগে ত এ রকম ছিল না!

বাশুলী। আগে জাতি ছিল ধর্ম্মের ভিতরে, এখন যে ধর্ম্ম জাতির ভিতরে প্রবেশ করেছে!

নিত্যা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এদের ভিতরেও ত আমার অনেক ভক্ত আছে! তারা কি বাউরি, চাঁড়ালের ভিতর আমাকে দেখতে পায় না? আমি যে ওই ঝুমুর মেয়েগুলোর ভিতরে নাচি রে!

বাশুলী। তুমি ত নাচ, তারা দেখতে না পেলে কি হবে! কখনো তুমি ঝুনোর মেয়ে, কখনো তুমি চাঁড়ালের বেটি—আমি দেখি, তারা ত দেখতে পায় না! তাদের অপরাধ কি? তুমি তাদের দেখিয়ে দিলে তবে ত তারা দেখবে!

নিত্যা। কিন্তু আমি ত জাতির ভিতরেও আছি সই!

বাশুলী। ভিতরে আছ, উপরে ত ভেসে নেই! জাতি-অভিমানের পরকোলা চোখে দিয়ে তারা তাদের দৃষ্টিকে এমন রঙীন করে' ফেলেছে যে, তারা তোমার ধর্ম্মরূপ আর দেখতে পায় না।

নিত্যা। তবে কি ভগবানের নরলীলা-কাহিনী আর আমি শুনতে পাবো না?

বাশুলী। তুমি শুনতে ইচ্ছা করলে কে বাধা দিতে পারে দেবি!

নিত্যা। দে বাশুলী, রাধা-কৃষ্ণলীলার গান শোনাবার উপায় করে' দে।

বাশুলী। অন্যায় কথা বল কেন দেবি, উপায় তুমি নিজেই করবে—তুমি যন্ত্রী। আমি তোমার যন্ত্র মাত্র।

নিত্যা। উত্তম, আমিই করবো সহচরী। লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, জাতি, অভিমান—এই সকল পাশ উচ্চবর্ণের নরনারীদের আড়ষ্ট করে' ফেলেছে। তারা ত ওই সকল ঝুমুর মেয়েগুলোর মত নাম-গানে মত্ত হয়ে, বাহু তুলে উদ্দণ্ড নাচতে পারবে না! আমি এমন এক নিম্নজাতির নারীদেহ আশ্রয় করবো, যে জন্মাবধি পবিত্র, কামগন্ধসম্পর্কশূন্য—অথচ লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়—কোনও পাশ আজও পর্য্যন্ত যাকে আড়ষ্ট করতে পারেনি।

বাশুলী। এমন মেয়ে আছে। কিন্তু তাকে নাচাবে কে?

নিত্যা। এমন পুরুষ আছে। সই! তুই তাকে খুঁজে বার কর্।

নিত্যার গীত

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি যে জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে।
পিরীতি পিরীতি তিনটি আঁখর
জানিবে ভজন সার।
রাগমার্গে যেই ভজন করয়ে
প্রাপ্তি হইবে তার।

বাশুলী। আর বলতে হবে না রাণী, বুঝেছি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে চললুম। কিন্তু দেবি, এই রাগমার্গে যে ভজন করবে, সে ব্যক্তি কোন্ বর্ণের হবে?

নিত্যা। সহজ—সহজ! সাধন সহজ—সাধ্য সহজ—সাধক সহজ—তার জাতি নাই, তার বর্ণ নাই।

সুরে

এ তিন ভুবনে ঈশ্বর গতি।
ঈশ্বর ছাড়িতে কার শকতি?
ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়
মানুষ ভজন কেমনে হয়!
ঈশ্বরে যে জন করেছে রতি,
তার কোথায় বরণ কোথায় জাতি?

বুঝতে পারলি বাশুলী সই?

বাশুলী। তোমার কৃপায় আমি ত বুঝলুম দেবি, কিন্তু মানুষে কি এ প্রেম-রহস্য বুঝতে পারবে ?

নিত্যা। মানুষ হ'লেই পারবে সই !

সুরে

সজনি গো শুন মানুষের কাজ।
এ তিন ভুবনে সে সব বচনে
কহিতে বাসি যে লাজ।
কমল উপরে জলের বসতি
তাহাতে বসিল তারা।
তা'দের তা'দের রসিক মানুষ
পরাণে হয়েছে হারা।
সুমেরু উপরে ভ্রমর পশিল
ভ্রমর ধরিল ফুল।
তা'দের তা'দের রসিক মানুষ
হারায়েছে জাতি কুল।
হরিণ দেখিয়া বেয়াধ পলায়
কমল দেখিয়া ভৃঙ্গ।
যমের ভিতরে আলয় বসতি
রাহুকে গিলিছে চন্দ্র।

বাশুলী। সুমেরু উপরে ভ্রমর পশিল
এ কথা বুঝিবে কে ?

নিত্যা। ভয় নাই সখি রসিক হইলে
বুঝিতে পারিবে সে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চণ্ডিদাস

(ধূমপান করিতে করিতে গীত)

শ্যামা-ধন যে পেতে হবে। (পেতেই হবে পেতেই হবে)
নইলে রে মন যখন তখন পাঁচ জনে পাঁচ কথা কবে।
পথটা কিন্তু নাইকো জানা
চোখ দু'টো যে থাকতে কাণা
খুঁজতে সে ধন তবে কি রে মন বৃথাই জীবন যাবে।
তবে, কেন এলাম, কেন এলাম, কেন এলাম ভবে।

(চন্দ্রকান্তের প্রবেশ)

চন্দ্র। হাঁ রে চণ্ডী—থাক্, থাক্—হুঁকো ফেলতে হবে না, তুই প্রচণ্ড গুড়ুকখোর এ কথা গাঁয়ের কচি ছেলেটি পর্য্যন্ত জানে। হুঁকো হাতে রেখে শোন্।

চণ্ডি। (হুঁকা রাখিয়া) কি দাদামশাই ?

চন্দ্র। একটা কাজ করতে পারবি ?

চণ্ডি। কি কাজ, বল।

চন্দ্র। সেটা তোরই হবে উপযুক্ত। বাশুলী মায়ের পূজারি হ'তে পারবি ?

চণ্ডি। আমি ?

চন্দ্র। পূজারি হবার নাম শুনে চম্‌কে উঠ্‌লি কেন ? সে কাজ তোকেই সাজবে ভাল। সদ্‌ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিস্, দুর্গাদাস বাকৃচির ছেলে তুই। তোর বাপ এক জন সাধক লোক ছিল, মায়ের নাম করতে না করতে তার গণ্ড বেয়ে ধারা পড়তো। এ কাজ তোরই উপযুক্ত। পারবি ? দেখ্, তাহ'লে সব ব্যবস্থা করে' দিই।

চণ্ডি। কেন, দাদামশাই, তারাচরণ বড়ুর কি হ'ল ?

চন্দ্র। তাঁর বড় অসুখ—এক মাস যাবৎ শয্যাগত তিনি—বোধ হয় এ যাত্রা আর রক্ষা পাচ্ছেন না। মায়ের এক জন পূজারির বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে।

চণ্ডি। কেন, তার ভাগনে নকুল ?

চন্দ্র। একে সেটা গণ্ডমূর্খ—তার উপর ছোঁড়াটার স্বভাব ভালো নয়, গ্রামের লোক তাকে দিয়ে পূজো করাতে রাজি হচ্ছে না। বিশেষত: বিজয়নারাণ—সে হচ্ছে গাঁয়ের মাতব্বর—তার অমতে ত কাজ করা যায় না। তাই আমি তোর নাম করেছি ভাই।

চণ্ডি। আমিই বা কি দাদামশাই ? আমিও ত গণ্ডমূর্খ।

চন্দ্র। তা হ'ক। নকুলো আর তুই—দুই কি সমান! তুই হচ্ছিস্ এক জন সাধকের বেটা। কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে। তোর মূর্খতা আর তার মূর্খতায় ঢের তফাৎ। মূর্খ হ'লেও আজও পর্য্যন্ত কেউ ত তোর স্বভাবের নিন্দে করতে পারে না। পূজা-পদ্ধতি জানতে তোর বেশি দিন লাগবে না। কি করবি ? বিজয়কে বলবো ? আবার মাথা চুলকুতে লাগ্‌লি কেন ?

চণ্ডি। তাইত—তাইত ঠাকুরদা!

চন্দ্র। আবার তাইত কেন ? চিরকাল ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াবি ?

চণ্ডি। মায়ের পূজো—কঠিন পূজো দাদামশাই!

চন্দ্র। (ব্যঙ্গস্বরে) কঠিন পূজো—দাদামশাইও জানে।

চণ্ডি। যদি না জেনে শুনে পূজোয় ত্রুটি করে' বসি!

চন্দ্র। পারবি না ?

চণ্ডি। মা বাশুলী জাগ্রত দেবতা! পূজোয় যদি বিঘ্ন হয়!

চন্দ্র। বিঘ্ন হয়—তুই নিজেই মরবি—আর পাঁচটাকে জড়িয়ে ত মরতে হবে না! হতভাগা! চণ্ডিদাস নাম—তোর মা ওই বাশুলীর মানত করেই তোকে পেয়েছিল—যদি মায়ের পূজো করতে তোর সাহস নেই, তবে বিপ্রকুলে জন্মেছিস্ কেন ?

চণ্ডি। তুমি অনুমতি করছ ঠাকুরদা ?

চন্দ্র। এতে আর অনুমতি কিসের ভাই ? জন্মে মা খেয়েছিস্, বাপ খেয়েছিস, তিন কুলে মরবার আর কাউকে রাখিস্ নি। পূজোয় বিঘ্ন হয়, মা বাশুলী তোকেই মেরে ফেলবে—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—আর পাঁচটাকে জড়িয়ে ত মরতে হবে না তোকে!

চণ্ডি। তা বটে!

চন্দ্র। মরবার ভয়ে তুই বাশুলীর পূজা করতে পেছিয়ে যাবি—দুর্গাদাস বাকৃচির ছেলে হয়ে ? ধিক্ তোকে।

চণ্ডি। ঠিক বলেছ ঠাকুরদা।

চন্দ্র। (ব্যঙ্গস্বরে) এই যে গান গাইছিলি—শ্যামাধন যে পেতে হবে! শ্যামাধন কি খোকার হাতের মোয়া—দেখলে আর ছিনিয়ে নিয়ে গালে পুরে দিলে! শ্যামাধনকে পেতে হ'লে কঠোর সাধন

চাই। সাধন করতে করতে তাঁর কৃপা যদি হয় তবেই তাঁকে পাওয়া যায়।

চণ্ডি। ঠিক বলেছ ঠাকুরদা—একবারে বেদ পুরাণের মত কথা।

চন্দ্র। মরতে কি ভয় পাস্?

চণ্ডি। কিছু না।

চন্দ্র। তাহলে' বিজয়কে বলি?

(চণ্ডিদাস কলিকা তুলিয়া ফুৎকার দিতে লাগিল)

ফুঁ এর পরে দিস্।

চণ্ডি। (ফুৎকার দিতে দিতে) তবে কি না—

চন্দ্র। আবার 'তবে কি না' কেন?

চণ্ডি। তবে কি না—

চন্দ্র। কলকে রেখে বল—আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো? শালার এমন তামাকের নেশা যে, মাতালের মদের নেশাকেও হার মানিয়ে দিয়েছে।

চণ্ডি। আমাকে—অনেকে—ঠাকুরদা—চণ্ডে মাতাল বলে—

চন্দ্র। তাদের অপরাধ কি! তামাকের ওপর এত ঝোঁক, দেখা দূরে থাক্, কেউ কখন শোনেও নি।

চণ্ডি। তবে কি না!

চন্দ্র। আরে মর্ শালা, একবার কি বলবার বলে,—সারাদিন ধরে' কলকেয় ফুঁ দে।

চণ্ডি। তবে কি না—আমার যেমন বিদ্যে আমি সেই রকম পূজো করব। তাতে কেউ কিছু—বলতে পারবে না।

চন্দ্র। কেউ কিছু বলবে না।

চণ্ডি। ও সব পাঁজি, পুঁথি, তন্তর, মন্তর—ও সব আমা হ'তে হবে না। আমার উড়োখই—গোবিন্দায় নমো—ঠাকুরদা। আমি মাতালের মতনই পূজো করবো।

চন্দ্র। সে ত ভালই রে—মা অত সব তন্তর মন্তর চান না—শুধু ভক্তি চান। সকলেরই তোর মত বিদ্যে—

চণ্ডি। তাহ'লে—দূর ছাই, আগুনটো নিবে গেল।

চন্দ্র। এর পর মালসা মালসা আগুন দিয়ে যত কলকে পারিস্ তামাক পোড়াস্। তাহ'লে মায়ের পূজা করতে তোর আর কোনো আপত্তি নেই।

চণ্ডি। আমার সে পাগলের পূজোয় গাঁয়ের লোক রাজি হবে?

চন্দ্র। খুব হবে—কেউ কিছু বলবে না। আমি যখন তোর পিছনে আছি, তখন তোর ভয় কি! গাঁয়ের লোক-সকলকে একমত করেছি।

চণ্ডি। আমার উপর তোমার এত দয়া কেন দাদা?

চন্দ্র। 'কেন', এ কথার জবাব দেওয়া কঠিন রে চণ্ডিদাস! ভবঘুরের মত এর বাড়ী তার বাড়ী খেয়ে খেয়ে বেড়াস্, এক জন মহতের ছেলে হয়ে, এটা আমার কেমন ভালো লাগে না।

চণ্ডি। তা যা বলেছ ঠাকু'দা, আমারও আর সেটা ভালো লাগছে না। যদিও শুধু শুধু লোকের খাই না, তবু লোকের বাড়ী খেতে কেমন বাধো বাধো ঠেকে।

চন্দ্র। তবে আর ইতস্ততঃ করছিস্ কেন? তোর একটা স্থিতি দেখলে আমি যেন নিশ্চিন্ত হই।

নেপথ্যে রামীর গীত

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যামরায়।

'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী ও 'মাসিক বসুমতী'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দপ্তরে পরলোকগত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অপ্রকাশিত রচনা পাওয়া গেল। রচনাটির কোনো শিরোনামা নাই। পাণ্ডুলিপি যেরূপ ভাবে দপ্তর হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাই প্রকাশিত হইল।

—সম্পাদক

বিয়োগ-সূত্র

ভারতের হাতে যত দিন না শাসনভার সমর্পিত হইতেছে, তত দিন যে অচল অবস্থা দূরীভূত হইবার নহে, তাহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। ভারতের প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশবাসীর হাতে না আসিলে, দেশে গণশাসন প্রবর্ত্তিত না হইলে কোনো সমস্যারই সমাধান হইতে পারে না। বিদেশী সরকার সাম্প্রদায়িক সমস্যার অজুহাত তুলিয়া ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে অসম্মত, কিন্তু কূটবুদ্ধি ইংরেজ রাজনীতিকগণ কি এ কথা বিশ্বাস করেন না যে, ক্ষমতা পরিত্যাগ না করিলে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূর হওয়া অসম্ভব? ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আরম্ভ হইয়াছে, বৃটিশ এবং ভারত সরকার তাহা কি নিবারণ করিতে পারিয়াছেন? হয় প্রতিকারের ইচ্ছার, নয় ক্ষমতার অভাব। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মানুন আর নাই মানুন কিন্তু এ কথা প্রত্যেক [illegible] বর্ত্তমান [illegible] পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সাম্রাজ্যবাদীর ছলনা তো দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। স্বেচ্ছান্ধ ছাড়া সকলেই তাহা দেখিতে পাইতেছে। সরকারকে এই অচলায়তন ভাঙ্গিবার জন্য প্রণোদিত করিতে যথাসাধ্য, এমন কি, সাধ্যাতীত সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিবার জন্য জনমত গঠন করা দেশহিতৈষী প্রত্যেক ভারতবাসীর এখন প্রধান কর্ত্তব্য। স্বাধীনতা চাহিয়া পাওয়া যায় না, জোর করিয়া আদায় করিতে হয়, এ কথা উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে।

ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার ইচ্ছা বৃটিশ গবর্মেণ্টের নাই, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ—সম্প্রতি বড়লাটের হাত হইতেই বাহির হইয়াছে। গান্ধীজীর পত্রোত্তরে বড়লাট যে জবাব দিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের চিরন্তন অনড় মনোভাবের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম প্রদর্শিত হয় নাই। বড়লাটের প্রতিকূল

মনোভাব স্বয়ং গান্ধীজীর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই দেখা যায়। তিনি বলিয়াছেন :

"প্রকাশিত পত্রাবলী হইতে দেখা যাইবে যে আমি বড়লাটের সর্ত্ত পূরণের জন্ম কোনো চেষ্টাই বাকী রাখি নাই। গবর্মেণ্টের শেষ উত্তরে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, বৃটিশ গবর্মেণ্টের মনে জন-সমর্থন লাভ করিবার কোনো অভিপ্রায় নাই।...তাঁহারা নৈতিক সমর্থনকে অবজ্ঞার চোখে দেখিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। সোজা কথায় বড়লাটের বক্তব্যের অর্থ এই যে, যতক্ষণ না সমস্ত প্রধান দল ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে একমত হয় এবং বৃটিশ গবর্মেণ্ট ও প্রধান দলগুলির মধ্যে মতৈক্য হয়, ততক্ষণ শাসনতান্ত্রিক অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন হইবে না। বর্ত্তমানে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা যেরূপ আছে সেইরূপই চলিবে।"

গান্ধীজী ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, প্রধান দলসমূহের যে ঐক-মত্যের উল্লেখ বড়লাটের পত্রে আছে তাহা একটি সুচিন্তিত কৌশলের অংশমাত্র। প্রধান দলের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বড়লাট যে কয়েকটি দলের নাম করিয়াছেন, যে কোন মুহূর্ত্তেই তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, যাদুকরের থলি হইতে আরও অনেক কিছু বাহির হইবে, ইহাতে তাঁহার সংশয়মাত্র নাই। গান্ধীজী স্পষ্টই বুঝিয়াছেন,

"চল্লিশ কোটি লোকের উপর যে আধিপত্য বৃটিশ গবর্মেণ্টের রহিয়াছে, তাহা ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। এই চল্লিশ কোটি লোক যতক্ষণ না বৃটিশ রাজশক্তির হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার মত শক্তি সৃজন করে, ততক্ষণ বৃটিশ গবর্মেণ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে না।"

গান্ধীজীর এই উক্তি সুদৃঢ় যুক্তি ও সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বৃটিশ গবর্মেণ্টকে মর্ম্মে মর্ম্মে চিনিয়াছেন বলিয়াই তিনি এ কথা বলিয়াছেন,—কাড়িয়া না লইলে বৃটিশ গবর্মেণ্ট কখনো ক্ষমতা ছাড়িবে না। চল্লিশ কোটি ভারতবাসীও তো সেই কথাই বলে। এ বিষয়ে গান্ধীজীর সহিত কাহারও মতবিরোধ নাই। আমরাও বারংবার এই কথাই বলিতেছি, বৃটিশ গবর্মেণ্টের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার জন্মই জনমত গঠন করিতে হইবে। ভারতবর্ষের ইষ্টসাধনাই যাঁহাদের অভিপ্রেত তাঁহারা কেহই গান্ধীজীর এই মতের বিরোধিতা করেন নাই। তবে গান্ধীজী রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন কেন? জিন্না সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যদি রাজাজীর ভারতগণ্ডন প্রস্তাবে তাঁহাকে রাজী করাইতে পারেন তাহা হইলেই বা সুবিধাটা কি হইবে? জিন্না সাহেবের সহিত চুক্তি হইলেই অমনি বৃটিশ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের পদতলে রাজমুকুট এবং তরবারিটি রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিবে? তাহা যে করিবে না ইহা গান্ধীজী ভাল ভাবেই জানেন। উল্লিখিত উক্তিগুলিই তাহার প্রমাণ।

রাজাজীর প্রস্তাব যদিই গৃহীত হয় তাহা হইলে বাংলা দেশে উহার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। রাজাজীর সূত্র গৃহীত হইলে বঙ্গদেশেই পাকিস্থানের প্রবর্ত্তন সর্ব্বাগ্রে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং মধ্যবঙ্গের কিয়দংশ লইয়া মুসলমান-রাজ্য গঠিত হইবে। গণভোটের কথা আছে বটে, কিন্তু সে গণভোটের অর্থ কি? যে সকল জেলায় মুসলমানরা সুস্পষ্ট-সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে অনুকূল হইবার কোনো সুদূর সম্ভাবনার কথাও কেহ চিন্তা করিতে পারে? সমগ্র বাংলা দেশের গণভোট নয়, শুধু মুসলমান-প্রধান অঞ্চলের গণভোটের ভোট লইয়া রাজাজী জিন্না সাহেবের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। জিন্না সাহেব করুণাবিমিশ্রিত একটু মৃদু হাস্য করিয়া প্রথমে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সে কথা দেশবাসীর মনে আছে। বঙ্গভূমির পৃষ্ঠদেশে রাজাজী এমন একখানি শাণিত ছুরিকা তুলিয়া ধরিলেন, তাহাতেও জিন্না সাহেবের মন যদি না উঠিয়া থাকে তবে তিনি আরও কি চান, তাহা ভাবিবার বিষয়।

মহাত্মাজীর নিকটে বাংলা দেশের শুধু বাংলার কেন সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু-সমাজ কি পাইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রাম করিয়াছে, ভারতে স্বাধীনতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া যাহারা দলে দলে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, মাতৃভূমির নামে যাহারা সুখ-সুবিধা, মান-সম্মান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, জীবনের সর্ব্ববিধ ঐহিক ঐশ্বর্য্য হাসিমুখে পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে, সেই হিন্দুরা এই ঘোর দুর্দ্দিনে কোথায় তাঁহার সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিবে তাহা না করিয়া পাইল নির্মম ঔদাসীন্য। ভারতের রাজনৈতিক সমুদ্রে যখনই ঝড় উঠিয়াছে, গান্ধীজীর তরণী তখনই তুফান ঠেলিয়া পারে যাইবার ব্যাকুল আগ্রহে ডাহিনে বাঁয়ে যাত্রীদের জলে ফেলিয়া হালকা হইয়াছে। শুধু হিন্দু নয় জাতীয়তাবাদী মুসলমানকেও বাদ দেয় নাই। তবে কি ঐ দুই চারি জন ক্ষমতাবিলাসী উচ্চাশা পরায়ণ মুসলমানকে লইয়াই ভারতবর্ষ? তাহাদেরই স্বার্থের দাঁড় বাহিয়া মহাত্মাজী এই মহাসমুদ্রে উত্তীর্ণ হইতে চাহেন? রাজনীতিক ভাঙা নৌকাটা কূল পাইলেই বা লাভ কি? মানুষকে পার করাই নাবিকের উদ্দেশ্য, শুধু নৌকাটা পার করা নয়।

রাজাজীর সূত্র সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা হইল। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিরোধী দলের মত শুনিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। আমার বক্তব্য তিনি মনোযোগ সহকারে শুনিয়াছিলেন। এ কথাও তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মন এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু সেই মুক্ত মনের পরিচয় আমরা এখনও পাই নাই।

জিন্না-গান্ধী-আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। গান্ধীজীর মুক্ত মনে এই আলোচনার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে তাহা এখনও সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত হয় নাই। যদি জিন্না সাহেব পরম বদান্যতা সহকারে রাজাজীর সূত্রই সম্পূর্ণ মানিয়া লন তাহাতে বা লাভ কি? একমাত্র লাভ পাকিস্থান। গান্ধীজী এবং জিন্না সাহেব স্বকপোল-কল্পিত ভারত-ভাগ্যবিধাতার আসনে বসিয়া ভারত-জননীর দুই সন্তান হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চিরদিনের জন্য ভেদবুদ্ধির বিদারণরেখা টানিয়া দিতেছেন কেন?

পাকিস্থানের নীতির মূলেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা পার্থক্য ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্য প্রদেশের কথা যেমনই হউক, বাংলা দেশে সত্যকার কোনো পার্থক্য নাই। বাংলার হিন্দু হইতে বাংলার মুসলমানদের আলাদা করিয়া দেখিব কেন? বাংলার মাটিতে ইহাদের উদ্ভব, বাংলা ইহাদের মাতৃভাষা, বাংলার ইতিহাস ইহাদের ইতিহাস, বাংলার সংস্কৃতি ইহাদের সংস্কৃতি, বঙ্গজননীর কোলে ভূমিষ্ঠ

ইহারা পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় লয়। বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য যদি কিছু থাকে তো সে কেবল ধর্ম্মে। সেই প্রভেদকেই ভিত্তি করিয়া বাংলাকে পাকিস্থানে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া রাজাজী প্রস্তাব দাখিল করুন, কিন্তু গান্ধীজীও তাহাতে সম্মতি দিলে বাংলা দেশ ক্ষুব্ধ হইবে না? পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলও পাকিস্থানের পাকে পড়িবার জন্য প্রস্তুত নয়, ক্রমবর্দ্ধমান জনমতের বিরোধিতায় তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তথাপি রাজাজীর ভিক্ষাপাত্র প্রত্যাহৃত হইল না।

বাঙ্গালী হিন্দুর মনে সত্যের গৌরব, আদর্শের মর্য্যাদা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে অন্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ইহাদের এক অপরাধ—ভিক্ষার ঝুলি কখনো ধরিতে পারিল না। যাহা চাহিবার তাহা জোর করিয়া চাহিয়াছে, প্রাপ্য বলিয়া দাবি করিয়াছে, মরিয়াছে তবু দাবি প্রত্যাহার করে নাই। তাহারা জানে—'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।' তাই চিরবিরূপ রাজশক্তির রক্তচক্ষুর সম্মুখে তাহারা কোন দিন মাথা নত করিল না। ফলে শাস্তি তাহারা কম পায় নাই। কিন্তু মানুষের নিষ্ঠুরতায় তাহারা বিচলিত হয় নাই, বিধাতার অভিশাপেও তাহারা অটল রহিয়াছে।

গত বৎসর দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণে বাংলা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। অন্নাভাবে মানুষ হাজারে হাজারে মরিয়াছে। ঘরে-বাহিরে পথে-ঘাটে নিরন্নের মৃতদেহ,—সৎকার করিবার পর্য্যন্ত লোক নাই। মুমূর্ষু জীবন্ত মানুষের দেহ লইয়া শিয়াল-কুকুরে টানাটানি করিয়াছে। মন্বন্তরের সেই যে সূচনা হইল, আজও তাহার শেষ হয় নাই। রোগে শোকে অভাবে অনটনে উদ্ভ্রান্ত হইয়া আজও অধিকাংশ বাঙ্গালী মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে।

এই দুর্ভিক্ষের বিশদ বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, ইহার প্রসঙ্গ লইয়া জনসভায় আলোচনা হইয়াছে, বিলাতে পর্য্যন্ত এ বিষয় লইয়া আন্দোলন উঠিল, কিন্তু বাঙ্গালীর দুঃখ-দুর্দ্দশার সত্য রূপ তাহাতেও প্রকাশ পায় নাই। যাহারা খাইতে না পাইয়া পথে বাহির হইয়াছে, তাহাদেরই আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু যে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায় জাতির প্রধান অবলম্বন; শিক্ষাবিস্তারে, সংস্কৃতিরক্ষণে, স্বাধীনতা আন্দোলনে, জাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতিবিধান-কল্পে যাহাদের দান অবিস্মরণীয়; বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, ত্যাগে তিতিক্ষায় যাহারা সর্ব্বাগ্রগণ্য, সেই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের কথা কয় জন চিন্তা করিয়াছেন? যাহারা উদরে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিয়াও আত্মমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, প্রাণ দিয়াছে তবু মান ত্যাগ করে নাই, দণ্ড পাইয়াও যাহারা সত্যভ্রষ্ট হয় নাই, সেই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ আজ হীনবল। যাহারা জীবন দিয়াছে তাহাদের জন্য শোক করিবার অবসর পরে পাওয়া যাইবে, কিন্তু যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের দিকেই বা দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে কোথায়? কেহ অভুক্ত, কেহ অর্দ্ধভুক্ত, ঔষধ নাই, পথ্য দুষ্প্রাপ্য, গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে অথচ কুইনাইন নাই। আজও যাহারা মরে নাই, অন্নহীন বস্ত্রহীন শক্তিহীন ব্যাধি-ক্লিষ্ট সেই সব নরনারীর কঙ্কালসার জীবন্মৃত দেহে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের শ্মশানভূমি সমাকীর্ণ। এই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের গতকল্যকার চিন্তাই আজিকার ভারতের মনে নূতনতর চিন্তার প্রেরণা জোগাইয়াছে। মানবিকতার কথা যদি ভুলিয়াও যাই, অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার দিকটা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু হায়, রাজাজী বোধ হয় তাহাও বিস্মৃত হইয়াছেন।

বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজকে ইঙ্গ-মুসলিম চক্রান্ত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব শুধু বঙ্গের নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের। রাজাজী সে দায়িত্বের কথা ভুলিয়া বিরোধী দলের শক্তিবৃদ্ধিরই সহায়তা করিয়াছেন। ভারত-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব করিবার অধিকার রাজাজীকে কে দিল? হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার নাই, এ কথা নিজের মুখে স্বীকার করিয়া গান্ধীজীই বা সে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন কোন্ যুক্তিতে? যাঁহারা প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারী নহেন তাঁহাদের ক্ষতি করিবার চেষ্টা কি সঙ্গত হইয়াছে? তিনি যাই বলুন, সমস্ত পৃথিবী তাঁহার কথাকে দেশের মত বলিয়া মনে করিতে পারে, এ আশঙ্কা আছে। তাঁহার খ্যাতি ও ক্ষমতার প্রভাবে সম্প্রদায়-বিশেষ বিপন্ন না হয়, সে দিকে দৃষ্টিপাত করা কি তাঁহার উচিত ছিল না?

গান্ধীজী এবং রাজাজী জিন্না সাহেবের মনোরঞ্জন করিবার জন্য সাধ্য সাধনা ঢের করিয়াছেন, আরও করিতে পারেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলা দেশকে যূপকাষ্ঠে লগ্ন না করিলে বাঙ্গালীর আক্ষেপের কারণ কিছু কম হইত। ভারতীয় হিসাবেই এই তোষণ-নীতির সমর্থন বাঙ্গালী হিন্দুর নাই। বাঙ্গালী হিসাবে যে থাকিতে পারে না সে কথা বলাই বাহুল্য। তবু যদি এই প্রস্তাবের মধ্যে কিছু সংগতি থাকিত, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবিধানের কোনো সুনির্দ্দিষ্ট পন্থার নির্দ্দেশ থাকিত, উভয় সম্প্রদায়ের সদিচ্ছা ও সৎপরামর্শের উপর নির্ভর করিয়া নীতি নির্ব্বাচিত হইত তাহা হইলেও এক কথা ছিল। কিন্তু রাজাজীর সূত্রে তেমন কিছুই নাই। যে পাকিস্থান-নীতি তিনি স্বীয় প্রস্তাবে সমর্থন করিয়াছেন সে পাকিস্থানের ভিত্তি কোথায়? ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনেই পাকিস্থান প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিন্তু ঐ সঙ্গে ইহাও স্থির হয় যে, পাকিস্থানের নীতি বিশ্লেষণ এবং উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া একটি খসড়া দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইবে। কিন্তু জিন্না সাহেব এ পর্য্যন্ত তাহা করেন নাই, অথচ অজ্ঞাতনীতি এবং অবিদিতরহস্য পাকিস্থান রাজাজী সানন্দে স্বীকার করিয়া লইলেন।

ফলে এই হইল, জিন্না সাহেব রাজাজীর প্রস্তাবকে সোপানরূপে ব্যবহার করিয়া অপূরণীয় দাবির উচ্চশৃঙ্গের পথে আর এক ধাপ উঠিবার সুযোগ পাইলেন। লুব্ধ শিশু এক হাতে মোওয়া পাইলে অসংকোচে অন্য হাত বাড়াইয়া দেয়। জিন্না সাহেব বরাবর হাত বাড়াইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দোষ কি? হাত বাড়াইলে নাড়ু পাইবার আশা গান্ধীজীই তো তাঁহাকে দিয়াছেন। কিন্তু শিশুর আবদার দীর্ঘকাল সহ্য করিলে সে উদ্ধত ও অবিনয়ী হইয়া উঠে। তখন সে আর নাড়ু লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না, সিন্দুকের চাবি চাহিয়া বসে।

রাজাজীর কি স্মরণ নাই যে, কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশ সমূহে মুসলমানের প্রতি অবিচার অত্যাচারের ধুয়া তুলিয়াই পাকিস্থান আন্দোলনের সৃষ্টি করা হয়? ইহার যথাযথ প্রতিবিধানের চেষ্টা না করিয়া, বেত্রাঘাত-শঙ্কিত নিরীহ বালক হাতে বেত পড়িবে জানিয়াও যেমন গুরুমহাশয়ের আদেশে তাঁহার সম্মুখে হাত পাতিয়া

দাঁড়ায়, রাজাজী জিন্নার কাছে তেমনি করিয়াই দাঁড়াইয়াছেন। গুরুমহাশয় হাত পাতিলেও মারিবেন, না পাতিলেও মারিবেন। তবে পড়ুয়ার হাত পাতাইয়া মারায় তাঁহার আত্মাভিমানটা একটু বিশেষরূপে চরিতার্থ হইবার সুযোগ পায়। যে মার খায় তাহার আঘাতটা অবশ্য সমানই লাগে। হাতে না পড়িয়া পিঠে পড়িলে গুরুমহাশয়ের বেত হয়তো এতটা গুরুতর নাও হইতে পারে। কিন্তু জিন্না সাহেবের পাকিস্থান হাতেও যেমন পিঠেও তেমন।

ভেদনীতির উপর যাহার প্রতিষ্ঠা তাহার উপর ঐক্যের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। পাকিস্থান নীতি মানিয়া লইলেই সাম্প্রদায়িক মিলন সম্ভব হইবে, এ কথা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়াছেন! রাজাজীর সূত্র যোগের পথ প্রশস্ত করিবে না, বিয়োগের পথ চিরকালের জন্ম উন্মুক্ত করিয়া রাখিবে।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধর্ম্মের মূল্য

মানবের পরিবর্ত্তনশীল মূল্যমানে বহু অপ্রত্যাশিত তারতম্য ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যাহা অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হইত, এখন তাহার মূল্যের হ্রাস হইয়াছে; আবার পূর্ব্বে যাহা অতি অকিঞ্চিৎকর ছিল, এখন তাহা মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। এক সময়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ধর্ম্মের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বিবেচিত হইত।

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মঃ মরণেঽপ্যনুযাতি যঃ।

ধর্ম্মের জন্ম মৃত্যু বরণ করিতেও লোকে কুণ্ঠিত হইত না। ধর্ম থাকিলে সব থাকিল, ধর্ম গেলে সবই গেল। শিখগুরু সে দিনও হাসিতে হাসিতে তাঁহার ধর্ম্মের নিদর্শন শিখার সঙ্গে শির দিয়াছিলেন। ধর্ম্মের জন্ম নির্য্যাতন সহ্য করাও লোকে শ্লাঘার বিষয় মনে করিত! শুধু এ দেশে নহে; প্রতীচ্যেও এই নির্য্যাতন চরম সীমায় উঠিয়াছিল এবং শত শত লোক ধর্ম্মের জন্ম অনলকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়াছে। পশ্চিমের এই নির্য্যাতনের নৃশংসতা বর্ব্বরতার যুগকেও হার মানাইয়াছিল। যাহারা প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরোধী ছিল, তাহাদের বিচার করিতেন ধর্ম্মযাজকেরা। ধর্ম্মযাজকগণ অধর্ম করিতে পারেন না, তাঁহারা বিচারে অপরাধীর অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া বৈষয়িক বিচারকদের উপর দণ্ড দিবার ভার দিতেন! এই সকল বিচারকেরা আবার ধর্ম্মযাজকদের দয়াপ্রবৃত্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দণ্ড দিতেন অর্থাৎ বিনা রক্তপাতে বধ করা হইত। তখন জল্লাদেরা অপরাধীর গাত্রত্বক্ উন্মোচন করিয়া তাহার মৃত্যুবিধান করিত! বলা বাহুল্য, ইহা অপেক্ষা ভীষণ মৃত্যু কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ কঠোর শাস্তির নৃশংসতাও ধর্ম্মনিষ্ঠগণকে ধর্ম্মের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। খৃষ্টজন্মের অল্প কাল মধ্যেই খৃষ্টানদের উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস এখনও রোমের মৃত্তিকা-গহ্বরে নিহিত আছে। খৃষ্টানরা ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের জন্ম রোমের অদূরে সুড়ঙ্গ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতেন। দুই হাজার বৎসর ধরিয়া সেই সকল ক্যাটাকোম্‌স্ (Catacombs) প্রাচীন খৃষ্টান সমাজের ধর্ম্মানুরাগের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ঐ সকল সুড়ঙ্গের মধ্যে যাইতে হইলে দিবাভাগেও মশাল জ্বালিয়া যাইতে হয়। সুড়ঙ্গের গাত্রে কুলুঙ্গী আছে, তাহাদের মুখ প্রস্তর দিয়া ঢাকা। এখনও সে প্রস্তর সরাইলে নরকঙ্কালের অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টানরা অতি সঙ্গোপনে ঐ সব কুলুঙ্গীতে মৃতের কবর দিতেন, নিভৃত অন্ধকার কক্ষে বাতি জ্বালিয়া উপাসনা সমর্থ হইয়াছিলেন। এখন সে নির্য্যাতনও নাই, ধর্ম্মের প্রতি সে অনুরাগও আর নাই। বাধা পাইলে প্রবহমান জলরাশি যেমন ফুলিয়া উঠে, অনুরাগের গতিও তাহার অনুরূপ; বাধা পাইলে বর্দ্ধিত হয়।

পশ্চিম জগতে ধর্ম্মের মূল্য যে অনেক কমিয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। রাশিয়ায় লেনিন্‌ত ধর্ম্মকে জাতীয় জীবনের মূল্য-তালিকা হইতে বিদায় করিয়াছিলেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কৃত্রিম বৈষম্য, তাহার বনিয়াদ ধর্ম্মই পাকা করিয়া দিয়াছে, এই ধারণা হইতে ধর্মকে সমাজ-জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করিবার সংকল্প হয়। পৃথিবীতে যে দারুণ অন্নসঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহা দূর করিতে হইলে, সাম্যবাদীদের মতে, সমস্ত বৈষম্যকে বর্জ্জন করিবার প্রয়োজন হয়। ধর্ম যে কতকটা সামাজিক বৈষম্যের জন্য দায়ী নয়, তাহা বলা যায় না। কিন্তু আর্থিক বৈষম্য যে ধর্ম্মের জন্য হইয়াছে, এ কথাও ঠিক নয়। বরং অন্য কারণে সমাজে যে আর্থিক বৈষম্য ঘটে, ধর্ম্মের প্রভাবে সুবণ্টন ও দানের ব্যবস্থার দ্বারা তাহা কতকটা দূর করিবার চেষ্টাই মনুষ্য সমাজের সর্ব্বত্র দেখা যায়। ধর্ম্মের উপর বিপ্লবীদের রাগের হেতু এই যে, সমাজে যতই অত্যাচার, অবিচার বা অপমান থাকুক না, ধর্ম পরলোকরূপ জুজুর ভয় দেখাইয়া তাহার প্রতিবিধানে লোককে পরাঙ্মুখ করিয়া তুলে। অতএব জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব না থাকিলেই 'অদৃষ্টের ফের' ভাঙিবার আর কোনও বাধা রহিল না। বর্ত্তমান রাশিয়ায় ষ্টালিনের প্রভুত্বে ধর্মজ্ঞান কিছু কিঞ্চিৎ প্রবেশ করিতে পারিয়াছে; নিরীশ্বরবাদীর (Bezbozniks) সংখ্যা কমিতেছে। তবে রাশিয়ায় রাষ্ট্রজীবন খোলাখুলি ভাবে ধর্মকে এখনও বরণ করিয়া লয় নাই।

জার্মাণী এবং ইটালীতেও ধর্ম অনেকটা কোণ-ঠাসা হইয়া পড়িয়াছে। হিটলার ও মুসোলিনি রাষ্ট্রকেই ধর্ম্মের শূন্য আসনে বসাইয়াছিলেন। কলোনের বিখ্যাত ক্যাথিড্রাল, মিলানের অনিন্দ্য-সুন্দর ধর্ম্মমন্দির, ভিনিসের বহুমূল্যরত্নখচিত সাঁমার্কো, রোমের সাঁপিয়েত্রো (St. Peter) প্রভৃতি অতীত যুগের কৃষ্টির বাহকরূপে অনাগত কালের দিকে শূন্যনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। হিটলার ধর্ম্মযাজকদিগকে পদচ্যুত করিয়াছেন, তাহাদিগের স্কুল-কলেজ ভাঙিয়া দিয়াছেন এবং যে সকল ছাত্র ঐ সব ধর্ম্মযাজকদের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে, তাহাদেরও সমস্ত রাজদত্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। স্পেনের গৃহকলহের (Civil War) সময় পাদরীদের

গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে এবং ধর্মপ্রাণা রমণীদিগকে (Nuns) রাজপথে উলঙ্গ করিয়া বেত-মারা হইয়াছে! ধর্মের গ্লানি এমন আর কখনও বোধ হয়, হয় নাই।

এই সব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে ধর্মের দিন ফুরাইয়াছে। ভারতের পক্ষে এই সকল দৃষ্টান্ত হিতকর কি না, সে বিচারে প্রয়োজন নাই। কারণ, ভারতের সমাজ-জীবন এক বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। কোনও সমাজ হয়ত ধর্মকে বিদায় দিতে চাহে, আবার কোনও সমাজ নূতন করিয়া আদিম যুগের ধর্মোন্মত্ততা বরণ করিতেছে। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া যাহারা শান্তিতে বাস করিতে পারিয়াছিল, আজ তাহাদের জীবনে কোথা হইতে এক আকস্মিক ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া সমস্ত জাতীয় কল্যাণ-প্রচেষ্টাকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। ইহার প্রতীকার কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তবে আমরা দেখি যে, ধর্মের মূল্যদানে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য আছে। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে যেমন পাশাপাশি চঞ্চলতা ও অচঞ্চলতা দেখা যায়, ভারতের জাতীয় জীবনেও তেমনি যুগপৎ উদাসীনতা ও অধীরতা দেখা দিয়াছে। মূল্যের এই তারতম্য উন্নতির পথে যে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। অধীরতা ও উদাসীনতা উভয়ই অনিষ্টকর। যাঁহারা ধর্মের নামে বা নিজ সম্প্রদায়ের নামে উন্মত্ত আগ্রহ এবং অন্য ধর্ম এবং অন্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশের ও বিশালতর প্রভেদময় সমাজের পক্ষে একেবারেই যোগ্যতা রাখেন না, এ কথা অকুণ্ঠিত ভাবেই বলা যাইতে পারে।

সে যাহাই হউক, মানবজীবনের আলোচনায় দেখা যায় যে, কতকগুলি মূল্যমান নিরপেক্ষ, আবার কতকগুলি আপেক্ষিক বা সাপেক্ষ। যেমন জীবনে সঙ্গীতের যে মূল্য আছে, অথবা শিল্পের যে মূল্য আছে অর্থাৎ এই সকল যে আদরের বস্তু বা সাধনার সামগ্রী, তাহা অন্য কোনও কিছুর উপর নির্ভর করে না। অন্য জিনিষের মূল্যও ইহাদের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু ধর্ম সেরূপ নহে। মানুষের জীবনে ধর্মের প্রতি আস্থা, ঈশ্বরে ভক্তি অন্য অনেক মূল্যের ভিত্তি। যেমন, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলে, পাপ-পুণ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে, চারিত্রের মূল্য কমিয়া যায় এবং সমাজ-বন্ধনের মূলে এমন ভাঙন ধরে যে, তাহাকে স্থির রাখা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

ধর্মকে জীবন হইতে বিদায় দিলে অনেক জিনিষে টান পড়ে। সংস্কৃতির যাহা গোড়ার কথা তাহারই প্রতি অনাস্থা আসিয়া পড়ে। সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে একটি শাশ্বত সত্য এবং তাহা হইতেছে এই যে, মানবের আত্মা অবিনশ্বর। আত্মা যদি বিনাশশীল হয়, এই পার্থিব জীবনই যদি সমস্ত কর্মচেষ্টার পরিসমাপ্তি হয়, তাহা হইলে মানুষ প্রজাপতিরই মত দু'দিনের আনন্দ কুড়াইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে পারে। অসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া, প্রাণপাত শ্রম করিয়া, নিরলস সাধনা করিয়া যে সম্পদ সঞ্চয় করিবার জন্য, যে সত্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য মানুষ পাগল হইয়া ছুটিয়াছে, তাহার কোনই সার্থকতা থাকে না। আহার বিহার ও যৌন পরিতৃপ্তির জন্য যে মানুষ পৃথিবীতে আসে নাই, এই বিশ্বাসই সমস্ত সাংস্কৃতিক সাধনার মূল। ব্যক্তিগত ভাবেই হউক, জাতি বা সমষ্টিগত ভাবেই হউক, মানবের জীবন-প্রবাহ অনন্তের দিকে প্রসারিত হইতেছে এবং কাল-সাগরে মানুষের জীবন-তরণীর কম্পাসস্বরূপ ধর্মকে বর্জ্জন করিলে আবার কোন্ নূতন যন্ত্র জীবনের জয়যাত্রাকে সুপরিচালিত করিবে, কে জানে?

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

দেবী চৌধুরাণী

দেবী চৌধুরাণী বঙ্কিমের প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগুলির অন্তর্গত নয়।

ইহার মধ্য দিয়া বঙ্কিম নারীত্ব সম্পর্কে একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। ইহার প্রধান চরিত্র প্রফুল্লের কতক অংশ বাস্তবাত্মক (Realistic), কতক অংশ আদর্শাত্মক (Idealistic)। প্রফুল্ল কতক শরীরিণী কতকটা ভাবকল্পনা,—'বাক্য মাত্র', মূর্ত্তিমতী বাণী। বলা বাহুল্য, দেবী চৌধুরাণীর বহু অংশে উৎকৃষ্ট কথা-সাহিত্য রসের প্রাধান্য আছে,—বহু অংশই অবিমিশ্র রসসৃষ্টির জন্যই পরিকল্পিত।

দেবী চৌধুরাণী লিখিবার আগে বঙ্কিম আনন্দমঠ লিখিয়াছিলেন। আনন্দমঠে যে ভাবাদর্শ তিনি রসমূর্ত্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে অঙ্গহানি ছিল। তাহাতে তাঁহার পরিপূর্ণ তৃপ্তি হয় নাই—দেবী চৌধুরাণীতে তাহার সম্পূর্ণাঙ্গতা দিতে চাহিয়াছিলেন।

সবল দুর্ব্বলকে পীড়ন করে—তাহাদের যথা-সর্ব্বস্ব ছলে বলে কৌশলে হরণ করিয়া প্রবলতর হইয়া উঠে—দুর্ব্বল অন্নাভাবে মারা যায়—অজ্ঞতা বশতঃ অদৃষ্টকে দায়ী করিয়া বক্ষে করাঘাত করে। কবির কথায়—

> "এ জগতে হায় আরো বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
> রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"

ইহা মানবসমাজের চিরন্তন রীতি। সহৃদয় সুবিবেচক মহাপ্রাণ যাঁহারা, চিরদিন তাঁহাদের এ জন্য ক্ষোভ ও অশান্তির বিরাম নাই। মহাপ্রাণ বঙ্কিম ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। এই বেদনাই বঙ্কিমকে এমন একটা শক্তির পরিকল্পনায় প্রণোদিত করিয়াছে—যাহার ব্রতই হইতেছে এইরূপ দুর্ব্বল নির্য্যাতনের প্রতিকার।

এই শক্তিকে তিনি স্বরূপ দান করিয়াছেন আনন্দমঠে। এই জন্য ব্রহ্মচারী সন্তান-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এই শক্তি চাহিয়াছিল, যে বঙ্গদেশে প্রবলের অত্যাচার অবিচার একেবারে অসহ্য—সে বঙ্গদেশকে শুভঙ্কর শাসনের অধিকারে আনিয়া সর্ব্বপ্রকার অন্যায়ের প্রতিকার

সাধন। এ জন্য প্রয়োজন ঐ শক্তির সাধকদের সংহতি, ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, শক্তিসঞ্চয়, দেশকে দেবী ও জননীর মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

বঙ্কিম দেখিলেন, এই পরিকল্পনাতেও অঙ্গহানি থাকিয়া যাইতেছে—অনেক নব নব সমস্যার উদয় হইতেছে। প্রথমতঃ জ্ঞানের ভিত্তির উপর ঐ শক্তির প্রতিষ্ঠা না হইলে সমস্তই নিষ্ফল, গড্ডলিকা প্রবাহে কোন মন্ত্রে দলে দলে দীক্ষা লইলেই এ সমস্যার সমাধান হয় না—শক্তিও সংহত হয় না। উপদ্রুত দেশকে প্রবলের কবলমুক্ত অত সহজে করা চলে না। এই কার্য্য কতকগুলি লোকের আত্মত্যাগের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে না। সমগ্র দেশ যদি বহু যুগ হইতে এ জন্য সাধনা না করে বহু যুগ ধরিয়া যদি প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে এই শক্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়।

এ পথে যত বাধা আছে, তাহাদের মধ্যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদিই প্রধান। নারীরূপের মোহও একটা মস্ত বড় অন্তরায়। কেবল পুরুষ নয়, নারীকেও সাধনা করিতে হইবে এবং নারীত্বেরও সম্পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তির প্রয়োজন। মুক্তি-সাধনায় দুষ্টের দমনের দিকেই দৃষ্টি সংহত হয়, শিষ্টের পালনের দিকে দৃষ্টি থাকে না! এমনই অনেক কথাই বঙ্কিমের মনে উদিত হইয়াছিল।

চিরন্তন অন্যায় অবিচারের প্রতিকারের বাসনা বঙ্কিমের চিত্তে আর একটি পরিকল্পনা উন্মেষিত করিল। বঙ্কিম তাহা দেবী চৌধুরাণীতে রূপায়িত করিলেন। ইহাতে তিনি গীতার আদর্শকে ঐ শক্তি-প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন। দেশব্যাপী জ্ঞানপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার বা দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দিক হইতে প্রতিকারের কল্পনা ইহাতে করেন নাই।

দেবী চৌধুরাণীর কল্পনায় তিনি দুষ্টের দমনের সহিত শিষ্টের পালন, নিরীহ দুর্ব্বলের পরিত্রাণ ইত্যাদির আদর্শের যোগ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু পাপের প্রতিকার করিতে গেলেও অনেক পাপ করিতে হয়। এক পাপের সহিত সংগ্রামের জন্য অন্য পাপকে আমন্ত্রণ করিতে হয়। ইহা কিরূপে বর্জ্জন করা যায়? এ বিষয়ে গীতাই বঙ্কিমের স্বপ্নকে সহায়তা করিয়াছে। —সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিলে আর পাপ-ভাগী হইতে হয় না—পুণ্যেরও দাবি নাই পাপেরও দায়িত্ব নাই—কেবল কর্ম্মেই দাবি আছে। সে কর্ম্ম ধর্ম্মাত্মক হউক—আর পাপাত্মক হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, রঙ্গরাজ, নিশি ইত্যাদি চরিত্রে তিনি এই সত্যটিকে রূপদান করিতে চাহিয়াছেন। ইহাও ত মুখের কথামাত্র নয়। এ জন্যও সাধনার আবশ্যক। দেবীর জীবনে বঙ্কিম সেই সাধনার অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন! নারীত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা লাভের যে সাধনার সূত্রপাত বঙ্কিম দেখাইয়াছিলেন—আনন্দমঠের শান্তি-চরিত্রে, দেবী চৌধুরাণীতে তাহার পূর্ণ পরিণতি দেখাইয়াছেন।

দেবী চৌধুরাণী যে রক্তমাংসের মানুষ নয়—একটা ভাবাদর্শ মাত্র, বঙ্কিম গ্রন্থশেষে তাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—

"এসো প্রফুল্ল, একবার সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি—আমি নূতন নহে,—পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র। কত বার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ—তাই আবার আসিলাম—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

বলা বাহুল্য, দেবী চৌধুরাণীতে শক্তির তিনি যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাও আনন্দমঠের স্বপ্নের মত বঙ্কিমের একটা স্বপ্ন মাত্র।

এই স্বপ্নকে রূপদান করিতে গিয়াও বঙ্কিম দেখিলেন—নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। সে সকল সমস্যার সমাধান মানুষের হাতেই নয়। সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারেন তিনিই—যিনি বলিয়াছিলেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।"

সে দিনের জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। মানুষের শক্তি ত সীমাবদ্ধ,—জগতের দুঃখবেদনা, আর্ত্তনাদ, হাহাকার ভগবানের আসন যে দিন উত্তপ্ত করিবে, সে দিনই সকল অন্যায়ের প্রতিকার হইবে। মানুষ যাহা পারে—তাহা চিরন্তনও নয়, যথেষ্টও নয়!

দেবী চৌধুরাণীর মুখ দিয়া বঙ্কিম বলিয়াছেন—"তোমরা যাহাকে পরোপকার বল, সে বস্তুতঃ পরপীড়ন—ঠেঙ্গা লাঠির দ্বারা পরোপকার হয় না। দুষ্টের দমন রাজা না করেন ঈশ্বর করিবেন! তুমি আমি কে? শিষ্টের পালনের ভার লইও—কিন্তু দুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপর রাখিও।"

বঙ্কিম দেখিলেন—নারীর মধ্যে মনুষ্যত্বের পূর্ণাভিব্যক্তি দেখাইতে গিয়া তিনি নারীর নারীত্বকে বিদায় দিতে বাধ্য হইতেছেন। নারীকে পুরুষ করিয়াই তুলিতেছেন! তিনি শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন—নারীর পূর্ণাভিব্যক্তি প্রেমে—তাহার সাধনার ক্ষেত্র আশ্রম নয়, আখড়া নয়, বনজঙ্গল নয়—তাহার সাধনার ক্ষেত্র গৃহসংসার। নারী যদিই বা অন্যত্র ত্যাগধর্ম্ম, সন্ন্যাসধর্ম্ম, কল্যাণধর্ম্ম অনুশীলন করে তবে তাহার প্রয়োগক্ষেত্র সংসারই, অন্যত্র নয়।

"প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিল। কিন্তু প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তাহার কোন কামনা ছিল না—সে কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা, কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্ম্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী।" সাগর বৌকে প্রফুল্ল বলিতেছে—

"এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্ম এই সংসার-ধর্ম্ম। ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ কতকগুলি নিরক্ষর স্বার্থপর অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কাহারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়—সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর উপরে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।"

সপত্নী-কণ্টকিত সংসারে এ তপশ্চরণ প্রফুল্লের পক্ষে সহজ হয় নাই। এখানে কথা উঠিতে পারে—ইহা প্রফুল্লের কৈফিয়ৎ মাত্র। সে যতই যোগসাধনা করুক—যতই নিষ্কাম ধর্ম্মের অভ্যাস করুক—তাহার জীবনের ব্রত ছিল পতিসঙ্গলাভ ও গৃহসুখ। এই তৃষ্ণা প্রফুল্ল ভুলিতে পারে নাই। সংসারে ফিরিয়া তাহার কৈফিয়ৎ প্রফুল্ল এই ভাবেই দিয়াছে। তাই যদি হয় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তাহাতে বঙ্কিমের স্বপ্নে ও আদর্শে কোন অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে না। বঙ্কিম ভাগবতী ভক্তি ও নিষ্কাম ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে পতিপ্রেমের

সামঞ্জস্য সাধন করিয়া বলিয়াছেন, "ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অসান্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা।"

তবে এ কথা ঠিক,—প্রফুল্লকে তাহার সংসারে প্রতিষ্ঠা করাইবার জন্যই তাঁহার এত আয়োজন নয়—তাহা আরও সহজে হইতে পারিত। তাঁহার একটি স্বপ্নকে এই প্রসঙ্গে তিনি রূপদান করিতে পারিয়াছেন, রসসৃষ্টিই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

দেবী চৌধুরাণীর পক্ষ হইতে এ সকল কথা গেল। এখন প্রফুল্লের পক্ষ হইতে কিছু বলিবার আছে।

বঙ্কিম তাঁহার সমাজের চারি পাশে চাহিয়া দেখিতে পাইতেন—আমাদের সমাজে নারী বড়ই অসহায়,—লাঞ্ছিতা, নিগৃহীতা। পুরুষের খেয়ালের উপর তাহার জীবন-মরণ শুভাশুভ নির্ভর করে। যে সমাজে পুরুষ অশিক্ষিত, অবিবেচক, কুসংস্কারে অন্ধ, সহস্র প্রথা-পদ্ধতি ও বিধিবিধানের দাস—সে সমাজে পুরুষের পক্ষ হইতে নারী সম্বন্ধে কোন বিচার-বিবেচনার আশা নিষ্ফল—সে সমাজে নারীর দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। এ সমাজে নারী স্বভাবতঃ অসহায়—তাহার সহিত দারিদ্র্য, অশিক্ষা ইত্যাদির সংযোগ হইলে তাহার দুর্গতির অবধি থাকে না। প্রফুল্লের জীবনে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। প্রফুল্লের জননী দরিদ্রা,—দুই বেলা পেটের ভাতেরও তাহার সংস্থান নাই। এমনই অসহায়—মা ও মেয়ে,—যে দুই মুঠা অন্নাঞ্জনেরও তাহাদের সুযোগ নাই—সুবিধা নাই! যে সমাজে তাহারা বাস করে—সে সমাজে কোন করুণা নাই। অনায়াসে সে সমাজের লোকে প্রফুল্লের সমস্ত নারী-জীবনটাই ধ্বংস করিয়া দিল। সপত্নীর সংসারে সে দাসী হইয়া থাকিতে চাহিল—দুটি অন্নও—তাহার পক্ষে দুর্লভ। সমাজ-শাসনে তাহাও তাহার ভাগ্যে জুটিল না।

প্রফুল্লের শ্বশুর এমনই কুসংস্কারে অন্ধ ও নিষ্করুণ যে, অনায়াসে পুত্রবধূকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইয়া দিতে বলিল।

ব্রজেশ্বর এমনই অসহায়, অক্ষম ও পিতার অন্নদাস যে, নিজের ধর্মপত্নীকে ভালবাসিয়াও বাড়ী হইতে দূর করিতে বাধ্য হইল।

প্রফুল্লের মাতা তথাকথিত ভদ্রপল্লীতে বাস করিয়াও অন্নাভাবে ও চিকিৎসার অভাবে মরিয়া গেল। প্রফুল্ল এমনই অসহায়া, যে তাহাকে অনায়াসে জমিদারের নায়েব ভদ্রপল্লীর বুক হইতে হরণ করিয়া লইয়া গেল। এইরূপ দারুণ দুঃখে পড়িয়া বহু নারী সতীত্ব বিক্রয় করিয়া থাকে—ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার জন্য নয়; দু'মুঠা পেটের ভাতের জন্য ফুলমণির কথাগুলি পরম সত্য—"একবার নিয়ে যেতে পারলেই হলো, যার তিন কুলে কেউ নেই, যে অন্নের কাঙাল, সে খেতে পাবে, কাপড় পাবে, গয়না পাবে, টাকা পাবে, সোহাগ পাবে, সে আবার থাকবে না?"

মহাষ্টমীর বলির ছাগের অবস্থাও ইহার চেয়ে ভাল। বঙ্কিম গ্রন্থারম্ভে যে এই চিত্র অতি সযত্নে দেখাইয়াছেন—তাহা বিনা অভিপ্রায়ে নয়—কেবল প্রফুল্লের দুঃখময় এই জীবন লইয়া সাহিত্যের রসলীলা দেখাইবার জন্য নয়।

প্রফুল্লের অসহায়তা ও তাহার প্রতি অবিচারের চিত্র বঙ্কিম প্রাণের দরদ দিয়াই অঙ্কন করিয়াছেন। তিনি কি নারীর দুঃখে গভীর বেদনা অনুভব করেন নাই? প্রফুল্লকে দেবী চৌধুরাণী বানানো সেই দুঃখেরই সান্ত্বনা, সেই ক্ষোভের প্রতিশোধ, মানব সমাজের বিরুদ্ধে বঙ্কিমের দরদী-চিত্তের বিদ্রোহ মাত্র।

তাই সুদ দিয়া—যাহাকে আধপেটা খাইতে হইত—যে শ্বশুর-বাড়ীতে দাসীপনা করিয়া শুধু দুই মুঠা ভাত চাহিয়াছিল, তাহাকে বঙ্কিম দিলেন বিশ ঘড়া সোনার মোহর। শুধু তাহাই নয়, সেই গৃহ-বিতাড়িতা বধূই ৫০ হাজার টাকা দিয়া হরবল্লভকে কয়েদ হইতে বাঁচাইল।

যে প্রফুল্লকে অবলা পাইয়া জমিদারের নায়েব হরণ করিয়া লইয়া গেল তাহাকে বঙ্কিম দেহে-মনে প্রভূত বলশালিনী করিয়া তুলিলেন, পাঁচ শত ডাকাতের অধীশ্বরী করিয়া ক্ষোভ মিটাইলেন।

সমাজ-শাসনে যে শ্বশুর প্রফুল্লকে গ্রহণ করেন নাই—সেই শ্বশুরই ডাকাতিনীকে বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরের গৃহিণী করিলেন। হরবল্লভের উপর প্রতিশোধ না লইয়া বঙ্কিমের চিত্ত শান্তিলাভ করে নাই। প্রফুল্লের দ্বারা সে কাজ সম্ভব হয় নাই বটে—নিশির দ্বারা ও কতকটা দৈবের সাহায্যে বঙ্কিম তাহার প্রতিশোধ লইয়াছেন। প্রফুল্লের দ্বারা সে কাজ করাইলে প্রফুল্লের আদর্শ চরিত্রের অঙ্গহানি হইত।

নিষ্কাম ধর্ম্ম, শাস্ত্রজ্ঞান ইত্যাদি প্রফুল্লের উপরি পাওনা। প্রফুল্লকে সর্ব্ববিষয়ে বলীয়সী করিতে গিয়া ইহাও আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার নারীত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি দেখাইবার জন্য বঙ্কিম তাহাকে ঐহিক, দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ববিধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়া তুলিয়াছেন।

বঙ্কিম আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশকাল-পাত্র বাছিয়া লইয়াছেন। জগতে বিশেষতঃ এ দেশে নারী চিরদিনই নিগৃহীতা হইয়া আসিয়াছে। নারীর অসহায়তা পরিপূর্ণ ভাবে দেখাইবার জন্য বঙ্কিম একটি এমন যুগ নির্ব্বাচন করিয়াছেন—যে যুগে নারীনিগ্রহ চরমে উঠিয়াছিল। কৌলীন্যের প্রতাপ এ সময় খুব বেশি—ব্রাহ্মণ পুরুষ বিশেষতঃ কুলীন পুরুষ যতগুলি খুসী বিবাহ করিতে পারিত—কন্যা ছিল গরু-বাছুরের মত জীবন্ত সম্পত্তি। দুহিতার মূল্য দোহার মূল্য হইতে বেশি ছিল না। দেশে শিক্ষা-দীক্ষার প্রচার হয় নাই—সমাজ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন—ঘরে ঘরে দারিদ্র্য—অসহায়া নারীর পক্ষে দারিদ্র্য হইতে অব্যাহতির কোন উপায় ছিল না—সমাজে দয়া-মমতার বালাই ছিল না—এক কথাতেই অতি সহজে নারীর ইহকাল পরকাল নষ্ট করা সম্ভব হইত—সমাজের লোক যে কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইলে কলঙ্ক রটাইয়া নারীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিত। অসহায়া নারীকে প্রবল লোকেরা অনায়াসে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিত—রাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই—রাজপুরুষের ভয় ছিল না। ভদ্রঘরের নারীর খাটিয়া খাইবারও উপায় ছিল না। নীচ জাতির নারীগণ এত দূর অসহায়া কোন দিনই নয়—কিন্তু ভদ্রঘরের নারীদের চারি দিকেই বিপদ। সমাজ-শাসন ছিল যেমন অকরুণ—সমাজভয় ছিল তেমনি নিদারুণ। অতি অল্প পরিসরের মধ্যেই প্রত্যেকের সামাজিক আবেষ্টনী পরিচ্ছিন্ন। বাহিরে যাইবার পথও নাই—বাহিরে গিয়া কোন প্রতিকারের সুবিধা নাই।

দেশে তখন রাজকীয় শাসন শিথিল, কিন্তু সামাজিক শাসন ও জুলুম অত্যন্ত প্রবল। গ্রামের লোকেরা সমবেত হইয়া যে কোন ব্যক্তিকে শাসন করিতে পারিত—অবশ্য সে শাসন তাহাদের মতিবুদ্ধি,

আদর্শ ও খেয়ালমত। অনেক সময় সে শাসনের অর্থ অবিচার, স্বার্থসিদ্ধি ও অত্যাচার। 'হরবল্লভের' মত পরাক্রান্ত কুলীনশ্রেষ্ঠ জমিদারও এই সমাজকে ভয় করিতেন।

পারিবারিক ব্যবস্থা তখন ছিল রীতিমত Patriarchal Government. গৃহকর্ত্তাই সর্ব্বেসর্ব্বা। তাহার রোষ-তোষের উপর পারিবারিক দুঃখ-সুখ নির্ভর করিত। গৃহের অন্য কোন পরিজনের কোন বিষয়ে কোন প্রকার ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের অধিকার বা সুযোগ ছিল না!

সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। সপত্নী-বিদ্বেষ ছিল অনেক সংসারের একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। এইরূপ সংসারে যে বধূ অম্লান বদনে সপত্নীদের সহ্য করিতে পারে—সদ্ব্যবহারে ও সখীবৃত্তির দ্বারা অনেক সময় দাসী-বৃত্তির দ্বারা যে সপত্নীদের বশ করিতে পারে—স্বামীর সোহাগের অংশ তাহাদের অম্লান বদনে দান করিতে পারে,—সেই আদর্শ বধূ।

নিম্নলিখিত অংশ হইতে সে কালের সমাজের আভাস পাওয়া যাইবে—"প্রফুল্লর মা বরযাত্রীদের লুচিমণ্ডায় দেশকালপাত্র-বিবেচনায় উত্তম ফলাহার করাইল। কিন্তু কন্যাযাত্রীদের কেবল চিড়া এবং দই! ইহাতে প্রতিবাসী কন্যাযাত্রীরা অপমান বোধ করিল। তাহারা খাইল না, উঠিয়া গেল। তাহারা একটা বড় রকম শোধ লইল। এক জন লোক গিয়া পাকস্পর্শের দিন হরবল্লভকে বলিয়া আসিল, যে কুলটা জাতিভ্রষ্টা তাহার সঙ্গে হরবল্লভ বাবুর কুটুম্বিতা করিতে হয় করুন। বড়মানুষের সবই শোভা পায়। আমরা কাঙ্গাল গরিব ইত্যাদি। ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লর মা জ্বরে পড়িল। প্রথমে জ্বর অল্প, কিন্তু বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে, বামুনের ঘরের মেয়ে, তাতে বিধবা, প্রফুল্লর মা জ্বরকে জ্বর বলিয়া মানিল না। তার উপরে দুই বেলা স্নান, জুটিলে আহার চলিতে লাগিল।

ক্রমে রোগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। শেষে প্রফুল্লর মা শয্যাগত হইল। সেখানে সেই গ্রাম্য প্রদেশে চিকিৎসাপত্র বড় ছিল না—বিধবারা প্রায়ই ঔষধ খাইত না—বিশেষ প্রফুল্লর এমন লোক নাই যে, কবিরাজ ডাকে, কবিরাজও দেশে না থাকার মধ্যে। জ্বর বাড়িল—বিকার প্রাপ্ত হইল, শেষে প্রফুল্লর মা সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন।"

এই ত গেল সামাজিক অবস্থা। দেশের সাধারণ অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর।

—"তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে। ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হ'ল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশ ছারখার হইয়া গিয়াছে। তার পর আবার দেবীসিংহের ইজারা। এডমাণ্ড-বার্ক (Edmund Burke) সেই দেবীসিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন—পর্ব্বতোদ্গীর্ণ অগ্নিশিখাময় বাক্যস্রোতে বার্ক দেবীসিংহের দুর্ব্বিবহ অত্যাচার অনন্ত কালসমীপে পাঠাইয়াছেন। সেই ভয়ানক অত্যাচার বরেন্দ্রভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্য্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার নাই—তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই এখন দলে দলে গ্রামে গ্রামে চোর ডাকাত। কাহার সাধ্য শাসন করে?"

এই অবস্থায় স্বভাবতঃই ডাকাতির কথা আসিয়া পড়িয়াছে। এই যুগে ডাকাতেরাই দেশের মালিক। বঙ্কিম তখনকার দেশের মালিকদের কাছেই লাঞ্ছিতা প্রফুল্লের প্রতি অবিচারের প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছেন।

ডাকাত যখন দেশভরা, তখন ডাকাত ঠিক এক প্রকারেরই ছিল না নিশ্চয়ই। সব ডাকাতই সমান নয়। সে কালে জমিদাররাও ডাকাতি করিত। এ কথা বঙ্কিম চন্দ্রশেখরে বলিয়াছেন। বঙ্কিম তাঁহার আদর্শ চরিত্র প্রতাপকেও ডাকাত বানাইয়াছেন। বঙ্কিম বলিয়াছেন—"এ সকল অরাজকতার সময়ে ডাকাতিই ক্ষমতাশালী লোকের ব্যবসা ছিল। যাহারা দুর্ব্বল বা গণ্ডমূর্খ, তাহারাই ভাল মানুষ হইত। ডাকাতিতে তখন কোন নিন্দা বা লজ্জা ছিল না।"

ডাকাতি শুধু অর্থার্জ্জনের উপায় ছিল না—প্রতিহিংসা লওয়ারও উপায় ছিল—দুর্বৃত্তকে দমন করিবারও উপায় ছিল—প্রবলকে পদানত করিবার ও দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্যও ডাকাতির প্রয়োজন ছিল। যাঁহারা বলবান্ অথচ সাধু প্রকৃতির লোক, তাঁহাদিগকেও শিষ্টের পালন বা দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে হইলেও ডাকাতি করিতে হইত। নিঃস্ব দীন-দরিদ্রকে অন্ন যোগাইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। ডাকাতি ছাড়া সে অর্থ সংগ্রহ করিবার উপায় কি? বঙ্কিমের শিষ্টজনপালক ডাকাতের দলের কথা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। Robin Hoodএর আদর্শ বিলাতেরই একচেটিয়া নয়। ভবানী পাঠকের কথা একেবারে অবিশ্বাস্য কেন হইবে? ভবানী পাঠক দেবীকে বলিয়াছিলেন, "যে ধার্ম্মিক সে সৎপথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জন করে, তাহার ধনহানি হইলে ভরণ-পোষণের কষ্ট হইবে, আমরা কখনও তাহার এক পয়সাও লই না। যে জুয়াচোর দাগাবাজ পরের ধন কাড়িয়া বা ফাঁকি দিয়া লইতেছে, আমরা তাহাদের উপর ডাকাইতি করি। ডাকাতি করিয়া এক পয়সা লই না, যাহার ধন বঞ্চকেরা লইয়াছিল তাহাকেই ডাকিয়া দিই। দেশ অরাজক, দেশে রাজশাসন নাই, দুষ্টের দমন নাই, যে যার পায় কাড়িয়া খায়। তোমার নামে আমরা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র যে অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন—প্রকৃত পুরুষের অন্তরাত্মা তাহাতে হুঙ্কার দিয়া না উঠিয়া পারে না।

"কাছারীর কর্ম্মচারীরা বাকিদারের ঘর-বাড়ী লুণ্ঠন করে, লুকানো ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া মেঝে খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে। বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে। ঘর জ্বালাইয়া দেয়। প্রাণ বধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়। শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে। যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া ডলে। বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে—যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। * * * এই দুরাত্মাদের আমিই দণ্ড দিই, অনাথা দুর্ব্বলকে রক্ষা করি।"

স্বভাবতঃই ডাকাইতের এই সুবুদ্ধি আসিতে যে পারে না তাহা নয়। বঙ্কিম কিন্তু কেবলমাত্র স্বভাবের উপরই নির্ভর করেন নাই। তিনি মর্ম্মভেদী অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া তাহাকে এই সুবুদ্ধির প্রেরয়িতা ও উদ্বোধকা করিয়া বুঝাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, তিনি ভবানী পাঠককে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জ্ঞানী ও পরম ভাগবত পুরুষ করিয়া তুলিয়াছেন অর্থাৎ ভবানী বহু দিনকার সাধনায় এই শুভঙ্করী বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এত বড় জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ডাকাতির সাহায্য গ্রহণ করেন কেন? বস্তুতঃ ইহা সাধারণ ডাকাতি নয়। ভবানী

পাঠক ডাকাতি করিতেন, কিন্তু নিজে পরস্ব গ্রহণ করিতেন না বা ভোগ করিতেন না। ইহাকে তিনি ভাগবত কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। দেশের অবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থা ধনবণ্টনে যে অবিচার করিত, তিনি তাহারই সংশোধন করিতেন মাত্র। এই কার্য্য বিচারাসনে বসিয়া দেশের ন্যায়নিষ্ঠ রাজাই করিতে পারেন। যে দেশে রাজা নাই, সে দেশে তাহার অনুকল্প Substitute সৃষ্টির প্রয়োজন। ভবানী পাঠক সেই অনুকল্পের ভার লইয়াছিলেন। সুবিচার করিতে হইলে বিচারকের শক্তির পশ্চাতে বাহুবলের প্রয়োজন। এই বাহুবল অন্য ভাবে অর্জ্জন করিতে না পারিয়া সেকালের প্রথামত ভবানী পাঠক ডাকাতদল গঠন করিয়াছিলেন। যে মনোভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভবানী পাঠক একটি প্রতিকারযোগ্য শক্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন সে মনোভাব সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগেই ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের মনে বিরাজ করিতেছে। এই মনোভাবই য়ুরোপে জনশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ ও শেষ পর্য্যন্ত বিজয়ী করিয়া তুলিয়াছে! এই মনোভাব সক্রিয় হইবার সুযোগ সুবিধা সর্ব্বক্ষেত্রে লাভ করে না বটে, কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ মানব-মনে ইহা যে বিরাজ করে, তাহার নানা ভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়। যখনই কেহ শোনে, দুষ্ট দণ্ড পাইয়াছে, তাহার বলাহৃত সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, শিষ্ট তাহার প্রাপ্য লাভ করিয়াছে, তখনই সে আনন্দ অনুভব করে। তাহার সহজাত ন্যায়বুদ্ধি (Sense of justice) পরিতৃপ্তি লাভ করে। ন্যায়নিষ্ঠ বঙ্কিমের মনের সেই মনোভাবই ভবানী পাঠকে রূপলাভ করিয়াছে।

ভবানী পাঠকের চরিত্রে তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান ও দস্যুবৃত্তির মধ্যে বঙ্কিম একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন গীতার সাহায্যে। ভবানী পাঠক গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুসারক। সে সমস্ত কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিতেছে—ফলাফলের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে না। কর্ম্মেই তাহার অধিকার, ফলের দাবি বা দায়িত্ব তাহার নাই। সে জন্য তাহাকে পাপ স্পর্শ করিতেছে না। বঙ্কিমের সময়ে তখনও ব্যক্তিমন বর্ত্তমান যুগের মত এতটা প্রবুদ্ধ হয় নাই—ধর্ম্মাধর্ম্মের আদর্শ-বোধ তখনও শাস্ত্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত—সে জন্য বঙ্কিমকে সতর্ক হইতে হইয়াছিল।

বঙ্কিম গীতার উপর ভার দিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই—লোকধর্ম্মের পানে চাহিয়া তাহার সহিত গীতা-ধর্ম্মের একটা রফা তাঁহাকে করিতে হইতেছে। কেবল লোকধর্ম্ম নয়—আদর্শ মনে না করিলেও পরে যে রাজকীয় শাসন বিচারের নিজে এক জন পরিচালক হইয়া উঠিয়াছিলেন—তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে রফা করিতে হইয়াছে—

ইংরেজ রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের (সত্যানন্দের মত) কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানী ডাকাইতি বন্ধ করিলেন। তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিলেন—'আমার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।' এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস।" ভবানী পাঠক প্রফুল্ল চিত্তে দ্বীপান্তরে গেলেন।

কবি এই 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' ধর্ম্মের আদর্শ ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের Chivalric Legends হইতে পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। য়ুরোপের মধ্যযুগের Knightরাই বঙ্কিমের রচনায় আদর্শবাদী ডাকাইতের রূপ ধরিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কেবল তাহাই নয়—Knightরা তাহাদের শৌর্য্যের প্রেরণা লাভ করিত আদর্শ নারী-শক্তি হইতে। সেই নারী-শক্তিই কি বঙ্কিমের রচনায় দেবী চৌধুরাণীর রূপ ধরিয়াছে?

বঙ্কিম ইহার ভারতীয় দিক হইতে একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন ভবানী পাঠকের মুখে—"তুমি রূপে যথার্থ রাজরাণী, গুণে যথার্থ রাজরাণী। অনেকে তোমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া জানে। কেন না, তুমি সন্ন্যাসিনী—মা'র মত পরের মঙ্গল কামনা কর—অকাতরে ধন দান কর—আবার ভগবতীর মত রূপবতী। তাই আমরা তোমার নামে রাজ্যশাসন করি—নইলে আমাদের কে মানিত?"

শক্তি সঞ্চারের জন্য মহাশক্তিরূপা নারীর প্রয়োজন। বঙ্কিম রূপ-লাবণ্যকে এই শক্তির একটা অঙ্গস্বরূপ মনে করিয়াছেন—ইহার সহিত তপ, তেজ, করুণা, মাতৃমমতা, শুভঙ্করী বুদ্ধি এমন কি লক্ষ্মী-শ্রী পর্য্যন্ত সম্মিলিত হইলে পরমা শক্তির আবির্ভাব ঘটে। অনেক হিন্দুই শাক্ত—শক্তির উপাসক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী তাহার ধর্ম্মগ্রন্থ। মহাশক্তিকে সে পাষাণ-বিগ্রহে বা মৃন্ময়ী প্রতিমাতেও উপাসনা করে—রক্ত-মাংসের জীবন্ত দেহে এই মহাশক্তিকে পরিমূর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করিয়া লইলে তাহার শাক্তহৃদয় উদ্দীপিত ও সবল হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

বাঙ্গালী জাতি তাহার জাতীয় গৌরব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে নাই—সে জন্য বঙ্কিমের চিত্তে অভিমান, গ্লানি, লজ্জা ও ক্ষোভ যথেষ্টই ছিল। পক্ষান্তরে তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠ চিত্ত যাহা অনিবার্য্য, অবশ্যম্ভাবী ও সম্পূর্ণ স্বভাবসঙ্গত, যুক্তি দিয়া তাহাকে স্বীকার করিয়া একটা সান্ত্বনাও লাভ করিয়াছিল। তিনি বাঙ্গালীকে ভীরু কাপুরুষের জাতি বলিয়া মনে করিতেন না। শৌর্য্য-বীর্য্যে ইংরেজরা যে বাঙ্গালীর চেয়ে বলবান্ সে কথা তিনি বার বারই বলিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমের একটা বিশ্বাস ছিল—ইংরেজ কেবল শৌর্য্যবীর্য্যেই বাঙ্গালীকে পদানত করিতে পারে নাই—অর্থবলে ও কৌশলে বাঙ্গালীর শৌর্য্যকে তাহারা মুহ্যমান করিয়াছিল। আর একটি বল—উন্নতশ্রেণীর অস্ত্রবল।

ইংরেজরা বিজ্ঞানবলে যে উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিল—তাহার সম্মুখে বাঙ্গালীর শৌর্য্য একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমের লাঠি-মহিমায় এই ভাব আক্ষেপের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে—

"হায় লাঠি, তোমার দিন গিয়াছে, তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে না করিতে পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ। লাঠি! তুমি বাঙ্গালার আবরু পর্দ্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধন রাখিতে, ধান রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। হায়, এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে।"

এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া বঙ্কিম শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, 'বহির্বিষয়ক জ্ঞান' লাভ না করিলে শুধু ভক্তি, আত্মত্যাগ, শৌর্য্যবীর্য্য বা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা দেশকে প্রবলের কবল হইতে রক্ষা করা যায় না—কেবল লাঠির জোরে মাটির দখল রাখা যায় না।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীকালিদাস রায়

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

সুকুমার গঠন

লেখাপড়ার চাপে এবং আরো নানা কারণে আমাদের ঘরের মেয়েদের দেহের গঠন বিশ্রী বিকৃত হইতেছে! বার-বার আমরা বলিতেছি, রুজ-রু্ম-পাউডরে আর লিপষ্টিকে রূপশ্রীর দেখা মিলিবে না! রূপশ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-সুষমা নির্ভর করে দেহের স্বাস্থ্যের উপর। দেহের গঠন স্বাস্থ্যের উপরে সবটুকু নির্ভর না করিলেও গঠনকে সুকুমার করিতে হইলে নিয়মিত ব্যায়ামের প্রয়োজন।

সুকুমার গঠন বলিতে বুঝিতে হইবে, মুখ-চোখের কমনীয়তা; হাত পা, ঘাড়, গলা, বুক, জঘন দেশের সুঠাম ভঙ্গী। অর্থাৎ সর্ব্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সামঞ্জস্য থাকিবে। হাত-পায়ের গড়ন ভালো কিন্তু আঙ্‌লগুলা বিশ্রী, বুক-পেট কদর্য্য—এমন দৃশ্য পথে-ঘাটে নিত্য দেখা যায়! এ কি ঠিক?

১। সিধা খাড়া দাঁড়ান ২। শুধু দুই গোড়ালি তুলিয়া

মেয়েরা রূপশ্রীর 'কেয়ার' করেন না, তা নয়। রূপশ্রী, সুষমা-সৌষ্ঠব—এ সবের দিকে মেয়েদের বিলক্ষণ লক্ষ্য আছে। নহিলে চাকরির জন্য যাঁরা ছুটাছুটি করিতেছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীতে সোনার রেখা টানিতে যাঁরা উৎসুক, বেশেভূষায় পারিপাট্য সাধন করিয়া রূপশ্রী-বিকাশে তাঁদেরও মনোযোগী দেখি। কিন্তু রূপশ্রী বেশেভূষায় মিলিবে না। গোলাপ বা চাঁপার বর্ণ ব্যায়ামে মিলিবে না—সত্য; তবে দেহ যাঁর সুগঠিত, বেশেভূষায় তাঁকে যে সুন্দরী দেখাইবে, সে সম্বন্ধে ভুল নাই। দেহের গঠনকে সুকুমার করিয়া তোলা সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তাধীন। সেজন্য চাই কয়েকটি ব্যায়াম-সাধন।

আজ সেই ব্যায়াম-সাধনের কথা বলিব:

৩। শুইয়া

১। সিধা খাড়া দাঁড়ান—দুই পায়ে পায়ে ঠেকাইয়া দুই হাত দু'দিকে লম্বমান রাখিয়া ১নং ছবির মত। তার পর বেশ ধীর ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলুন পাঁচ মিনিট। দেহ থাকিবে সুদৃঢ়—এতটুকু নড়িবে না, টলিবে না, হেলিবে না।

৪। দুই হাত দু'দিকে প্রসারিত

২। এবার দুই পায়ের গোড়ালি তুলিয়া আঙ্‌লগুলির উপর ভর দিয়া ২নং ছবির ভঙ্গীতে দাঁড়ান। গোড়ালি নামান। এমনি করিয়া এক-বার গোড়ালি তুলিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইবেন এবং পরক্ষণে গোড়ালি নামাইবেন—প্রায় পাঁচ মিনিট।

৫। হাঁটু গাড়িয়া

৩। চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ুন—দুই হাত দু'দিকে প্রসারিত থাকিবে,—তার-পর ৩নং ছবির ভঙ্গীতে হাঁটুর নীচে হইতে দুই পা ধীরে ধীরে তুলিবেন আর নামাইবেন—দুই পায়ের পাতা থাকিবে ঠিক ঐ ৩নং ছবির মতন। এ ব্যায়াম করিবেন পাঁচ মিনিট।

৪। এবার দু'পা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দাঁড়ান—দু'হাত দুদিকে প্রসারিত করিয়া দিন ৪নং ছবির ভঙ্গীতে—এবার দুই হাত এমনি ভাবে প্রসারিত

রাখিয়া নামান—নামাইলে দু'হাতের করতল আসিয়া উরৎ স্পর্শ করিবে। তার পর আবার সজোরে দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করুন। এমনি ভাবে দু'হাত প্রসারিত করা এবং পরক্ষণে নামানো—এ ব্যায়াম করা চাই চার-পাঁচ মিনিট।

৫। মাটাতে হাঁটু গাড়ুন—হাঁটু হইতে দেহের উর্দ্ধ ভাগ থাকিবে সিধা খাড়া—দু'হাত দু'পাশে থাকিবে ঝুলানো! এবার ৫নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত তুলুন উর্দ্ধে—ধীরে ধীরে। তার পর হাত নামান; নামাইয়া আবার তুলিবেন। হাত এমনি তোলা-নামা করিবেন তিন-চার মিনিট।

৬। এবার হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করিবার ভঙ্গীতে মাথা ঠেকান মেঝেয় এবং দুই হাত ৬নং ছবির ভঙ্গীতে সামনের দিকে প্রসারিত

৬। প্রণতির ভঙ্গী

করিয়া দিন। তার পর দুই হাত তুলিয়া হাঁটু গাড়িয়া সিধা হইয়া বসুন। বসিবার পর আবার এমনি প্রণামের ভঙ্গী। এ ব্যায়ামও তিন-চার মিনিট করিতে হইবে।

৭। এবার সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া ৭নং ছবির ভঙ্গীতে দুই পা ঠেকাঠেকি ভাবে রাখিয়া কোমরের কাছ হইতে সামনের দিকে দেহকে আনত করুন—দুই হাত সামনের দিকে এই ছবির ভঙ্গীতে প্রসারিত করিয়া দিন। তার পর আবার সিধা খাড়া দাঁড়াইবেন। সিধা দাঁড়ানোর পর আবার এমনি ভাবে আনত হওয়া—এ ব্যায়ামও করা চাই তিন-চার মিনিট।
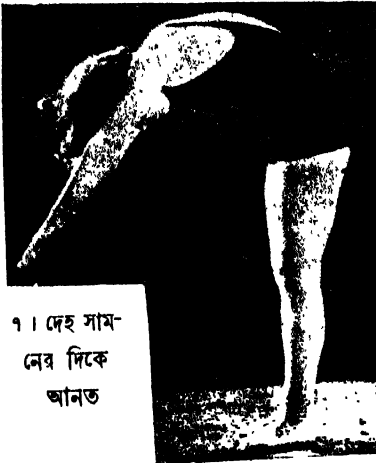
৭। দেহ সামনের দিকে আনত

নিত্য এ কয়টি ব্যায়াম-সাধনে দেহের গঠন হইবে সুকুমার—মেদ জমিয়া দেহ বিশ্রী মোটা হইবে না—হাড় লিকলিকে রোগা নয়; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিটোল পরিপুষ্ট এবং কমনীয় হইবে।

সহযাত্রিণী

যুদ্ধের দৌরাত্ম্যে নানা দিকে নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে আমাদের পর্দ্দাতেও ঘটেছে বিপত্তি। আমরা—যারা গাড়ী-বিনা পথে বেরুতে পারতুম না, এখন গাড়ীর চড়া-ভাড়ার জন্য এবং অনেকে বাড়ীর মোটর-গাড়ীতে পেট্রোলের টান থাকায় ও টায়ারে "নট এসেন্সিয়াল" কুঠার পড়ায় ট্রাম-বাসের শরণ নিতে বাধ্য হয়েছি। মোটর ত্যাগ করে যাঁরা ট্রাম-বাসে চড়ছেন, তাঁদের হয়তো কষ্টভোগই সার হয়েছে; আমাদের কিন্তু ও-কষ্টের সঙ্গে লাভ হয়েছে এই যে কালীঘাট থেকে শ্যামবাজার যেতে গাড়ী-ভাড়া লাগতো আগে দেড় টাকা দু'টাকা, এখন এতে সাড়ে চার আনা মাত্র খরচ হচ্ছে। বাসে-ট্রামে ভয়ঙ্কর ভিড় —সে ভিড় তত গায়ে লাগে না, যত লাগছে পুরুষ-মানুষদের অশিষ্ট অভদ্র ব্যবহার! সকলের সম্বন্ধে এ-কথা বলছি না—ট্রামে-বাসে আমাদের স্বদেশী যে-সব পুরুষের দর্শন লাভ করছি, তাঁদের মধ্যে শতকরা মাত্র দশ জনের কাছে যদি ভদ্র শিষ্ট ব্যবহার পাই তো অভদ্র ব্যবহার পাই বাকী নব্বই জনের কাছে!

প্রথম অভদ্রতার পরিচয়—ট্রামে দু'খানি মাত্র বেঞ্চে 'for ladies' লেখা আছে। মেয়ে-যাত্রী নেই, পুরুষ-যাত্রী লেডিস্ সীটে বসে যাচ্ছেন, যেমনি আমরা এসে ট্রামে উঠলুম, অমনি আমাদের শুনিয়ে মন্তব্য উঠলো, "এই এলেন!" এ মন্তব্য করে কেউ এমন ভাবে দাঁড়িয়ে উঠলেন, যে সীটে বসতে গেলে ধাক্কা লাগে! কেউ বা মুখে-চোখে যে ভঙ্গী করেন, সে ভঙ্গীর কাছে কোথায় লাগে চিড়িয়াখানার গাব্বে হাউসের অধিবাসীদের মুখ-ভঙ্গী!

দু'নম্বর অভদ্রতা—কোনো কোনো রসিক—এ দলে ৫০।৬০ থেকে ১৮।১৯ বছরের বালকও আছে—রসালো গল্প সুরু করেন। কেউ-বা সিনেমার বাছাই-করা গান ধরেন চাপা গলায়! রাগ ধরে, সেই সঙ্গে হাসিও পায়! ভাবি, এই সব রসিক কি ভাবেন? ঐ রসালো গল্পে, ঐ মজার গানে আমরা ভদ্রলোকের মেয়েরা মজে' গিয়ে ওঁদের নিমন্ত্রণ করবো—আরব্য উপন্যাসের নায়িকার মত? হায়, এমন পোড়া কপাল এ দেশের মেয়ে-জাতের এখনো হয়নি!

তিন নম্বরের অভদ্রতা—ওঠবার সময় আর নামবার সময় বহু রসিক পুরুষ এমন ভাবে পথ আটকে দাঁড়ান,—মনে হয়, ওঁরা চান যেন একটু আঁচলের হাওয়া বা অঙ্গের পরশ! কথাটা অভদ্র শোনাবে—না হলে এঁদের মুখে—যাতে করে এঁরা সিগারেট ধরান, তাই দিতে ইচ্ছা করে! এঁদের বলি, এ যুগে স্পর্শদোষ বলে কোনো-কিছু নেই। তাঁরা যে কাবলির কাছ থেকে টাকা ধার করেন, সে কাবলির সঙ্গে ছোঁয়ালেপা করছেন স্বার্থের জন্য! তাছাড়া চাকরি, ব্যবসার জন্য কার না পদ স্পর্শ করছেন? সুতরাং সে স্পর্শ-দোষে তাঁদের জাত যদি অটুট থাকে, তবে তাঁদের অশুচি স্পর্শে মেয়ে-জাত কেন কলুষিত হবে? তাছাড়া আমরা কুকুর ছুঁয়ে রান্না ঘরে ঢুকছি—অতএব ট্রাম-বাসের ও-ছোঁয়াকে আমরা কুকুর-ছোঁয়া মনে করে বাড়ী এসে গা ধুয়ে কাপড় কেচে শুদ্ধ হই!

চার নম্বর অভদ্রতা—কিশোরী যাত্রী ট্রামে-বাসে চাপলে বই-খাতা হাতে কলেজের ছেলেরা যে-সব টীকা-টিপ্পনী কাটে, হাঁড়ি-গলায় গান ধরে, তাতে মনে হয়, উঠে গিয়ে তাদের মুখে পায়ের স্যাণ্ডাল-শ্লিপার খুলে মারি। এদের পরিচয় কি শুধু নায়িকার সঙ্গে? ভাবি, এ-সব যুবকের মা নেই? বোন নেই? ছি ছি! এই সব ছেলের উপর আমরা কিসের নির্ভর রাখি? কিসের জন্য পয়সা খরচ করে এদের কলেজে পাঠাচ্ছি? ট্রামে-বাসে বিদেশী যাত্রীদের কাছে কখনো এ-রকম অশিষ্ট অভদ্র ব্যবহার পাই না তো! এই সব রসিকের বাঁদরামী টিট্ করতে দেখে এমন তরুণ নেই, যাঁরা স্কোয়াড গর্হ্ন করে এ-সব লোকের নিরেট মাথা ঠুকে শায়েস্তা করতে পারেন?

বিজ্ঞান-জগৎ

চলন্ত কারখানা

এ যুদ্ধে নিত্যদিন প্রায় হাজার হাজার মোটর-ট্রাক, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি চলিয়াছে—চলিয়াছে দেশ ছাড়িয়া, সহর ছাড়িয়া কোন্ অনির্দ্দেশ তেপান্তরের প্রান্তে! সেখানে গাড়ীর কলকব্জা যদি বিগড়ায়, সারাংশ যদি ভাঙ্গচুর হয়—এমনি নানা বিপত্তির আশঙ্কা আছে! সে-সব বিপত্তি ঘটিলে মেরামতীর বিশেষ এবং আশু প্রয়োজন। কিন্তু

চলন্ত কারখানা

মেরামত করিতে পথে-প্রান্তরে কারখানা মিলিবে কোথায়? তাই এ বিপত্তির মোচন-কল্পে বৃটিশ সমর-বিভাগের ব্যবস্থায় এই সব রণমুখী ট্যাঙ্ক-ট্রাক প্রভৃতির সঙ্গে চলে রেল পাতিয়া সেই রেল-লাইন বহিয়া চলন্ত মেরামতী কারখানা এবং অভিজ্ঞ মিস্ত্রী-কারিগরের দল। যে-ক্ষেত্রে যে-রকম মেরামতীর প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে তাহা সংসাধিত হয়। এ সব চলন্ত কারখানায় মোটরের বাড়তি অংশসমূহ অজস্র ভাবে মজুত রাখা হয়।

পরো পরো মা গহনা পরো

একালে আমাদের দেশের মেয়েদের গহনা পরার ফ্যাশন সহরাঞ্চলে ও সৌখীন মহলে অবশ্য বদলাইয়াছে। নাক-কাণ ফুঁড়িয়া নোলক নাকছাবি নথ মাকড়ি পরার রেওয়াজ আর নাই। নাক-কাণ ফুঁড়িতে বেদনার সীমা থাকিত না; চুড়ি-বালা পরিতেও হাতের নিম-ছাল ছিঁড়িত; তাই গহনা পরার সময় মা-দিদিমার স্তোক-বাক্যকে শ্লেষ করিয়া চল্তি কথার সৃষ্টি হইয়াছে—পরো পরো মা গহনা পরো! এখনকার সৌখীন ফ্যাশন-দুরস্ত সমাজে নাক-কাণ ফুঁড়িয়া গহনা পরার রীতি না থাকিলেও প্রসাধনের যে নব নব রীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতেও পীড়নের অন্ত নাই! যেমন, এই সাধারণ কেশরাশিকে কুঞ্চিত করা, গালের ঝিক সারানো, আসল রূপ ঢাকিয়া নকল রঙে নিজেদের রঙানো! কুৎসিতকে সুশ্রী সুরূপ করিয়া তুলিতে যে সব যন্ত্র আছে, সৌখীন মেয়েরা কি করিয়া নিজেদের কেশ-সজ্জায় সে-যন্ত্রযূপে সমর্পণ করেন, তার একটু নমুনা দেখুন ঐ ছবিতে। [illegible] সকাল? ও-মুকুটে আছে অসংখ্য বৈদ্যুতিক 'ল্যাম্প'! ঐ ল্যাম্প মাথায় আঁটিয়া থাকিতে হইবে দিনে ছ'ঘণ্টা করিয়া মাসাবধি কাল! ঐ মুকুট পরিয়া নিদ্রা ভোগ করিতে হইবে; তবেই কেশ হইবে দ্রাক্ষাগুচ্ছের মত ঘন-কুঞ্চিত। তার পর আঙুলে ঐ আঙুস্ত্রা আঁটা। নিত্য শয়নকালে ঐ আঙুস্ত্রা আঙুলে আঁটিয়া সতর্ক ভাবে নিদ্রায় নিশিযাপন করিতে করিতে আঙুলের ও নখের

সজ্জা-প্রসাধন

গঠন হইবে চম্পককলিবৎ! মুখে ঐ মুখোস আঁটিয়া কিছু-কাল রুটিন ধরিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ ভোগ করিতে পারিলে মুখের টিপি-টাপা সারিবে; খাঁদা বোঁচা নাক সারিয়া নাক হইবে "তিলফুল জিনি" নাসা!

ক্ষিপ্রগতি টর্পেডো

সমুদ্র-কূলের দুর্গ, বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রভৃতিকে অতর্কিত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাজ্য যে চলন্ত ফৌজের ব্যবস্থা

টর্পেডো-বোট

করিয়াছে, সে ফৌজ সমুদ্র-বক্ষে দ্রুত এবং সুদীর্ঘ পাড়ির পাহারা অনায়াসে দিতে পারিবে বলিয়া মার্কিণ সমর-বিভাগ পীটা ৬ নম্বরী

নূতন টর্পেডো-বোট তৈয়ারী করিয়াছে। এ টর্পেডো চলে ১২৫০ অশ্ব-শক্তিযুক্ত মোটর-এঞ্জিনে। টর্পেডোর গতিবেগ ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল। টর্পেডো-বোটগুলি লম্বে একাশী ফুট। বোটে দশ জন করিয়া সশস্ত্র রক্ষী থাকে; দীর্ঘ এক-পাড়িতে দু'হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিতে বাধে না। মেশিন-গান প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে এ টর্পেডো-বোট সুসজ্জিত।

—

জলের বুকে বন্ধু

জলমগ্ন বিপন্ন বোট তুলিয়া সে-বোটকে কূলে আনিবার জন্য মার্কিণ নৌবিভাগ এক অতিকায় ফ্রেম তৈয়ারী করিয়াছে। ভারী ভারী চাকায় চালাইয়া এই অতিকায় ফ্রেমকে সমুদ্রকূলে আনিয়া দাঁড়
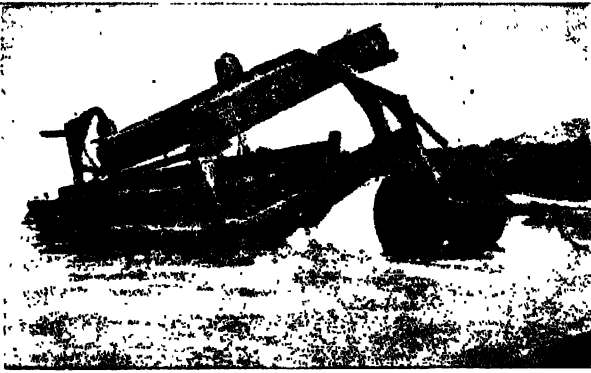
অতিকায় ফ্রেম্

করানো হয়; তার পর বৈদ্যুতিক-শক্তিসাহায্যে ঐ ফ্রেমকে সঞ্চালন করিয়া ক্রেনের ভঙ্গীতে জলবক্ষঃস্থিত অকর্মণ্য বোটকে তুলিয়া তীরে আনিয়া নামাইয়া দেয়। এই অতিকায় ফ্রেমের সাহায্যে ডাঙ্গা হইতে বোট তুলিয়া সে-বোটকে জলের বুকে ভাসাইয়া দেওয়ার কাজও এখন বেশ সহজে নিষ্পন্ন হইতেছে।

—

লোণা জলের নুন ঝরানো

সমুদ্রবক্ষে জাহাজে যাদের বাস, পিপাসায় সব সময়ে তাদের পক্ষে বিশুদ্ধ নির্ম্মল জল পাওয়া কঠিন! অথচ পানীয় জল না পাইলে প্রাণ বাঁচিবে না। এ ক্ষেত্রে ঐ সমুদ্র-জল পান করা ভিন্ন উপায় থাকে না। কিন্তু লোণা জল মানুষ কি করিয়া পান করিবে? সে জন্য লোণা জল তুলিয়া সে-জলের লবণ নিঃশেষে ঝরাইয়া তারা তাহা পান করে। লবণ ঝরাইবার জন্য বড় পাত্রে সাগরের লোণা জল ধরিয়া পাত্রের মধ্যে দেয় 'স্টিল' বা ফিলটার-পাত্র। এ-পাত্রের সঙ্গে রবারের পাইপ দিয়া একটি হীটার-যন্ত্র সংলগ্ন আছে। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি ঐ হীটারটি তলপেটে চাপিয়া ধরে। লোণা জলের পাত্রে থাকে ফিলটার-যন্ত্র বা 'স্টিল'। দেহের তাপে হীটার তপ্ত হয় এবং সে-তাপ ঐ নল বহিয়া আধারের লোণা জলকে তাতাইয়া তোলে। সে-তাপে লবণ আটকাইয়া থাকে স্টিলের গায়ে, বাহিরে; আর ফিলটার-পাত্রে লবণ-ঝরা জল প্রবেশ করে। এক আউন্স লোণা জলকে এ ভাবে বিশুদ্ধ নির্ম্মল করিতে এক ঘণ্টা সময়

তলপেটে "হিটার" চাপিয়া

লাগে। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগ এই বিশেষ 'স্টিল'-যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে।

—

জ্বলন্ত জাহাজ হইতে পরিত্রাণ

গত সিসিলি-যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষীয় "লী-বীজ" জাহাজ গোলার আঘাতে জ্বলিয়া ওঠে। জাহাজে বহু সেনা ছিল। অদূরে কূলের কাছে প্রকাণ্ড ফৌজবাহী একখানি বোট ছিল। সে-বোটে বহু ফৌজ। তারা তাড়া-

পোন্‌টুন্

তাড়ি ছোট ছোট একশোখানি বোট গায়ে-গায়ে লাগাইয়া সেই সব বোটের উপর তক্তা পাতিয়া পোন্‌টুন বা ভাসমান সেতু গড়িয়া তোলে। জ্বলন্ত জাহাজ হইতে নব্বই জন লোককে এই সেতু বহিয়া আনিয়া তারা অগ্নি-গর্ভ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

—

সেলাইয়ের কলে

রুমালে, বালিসের ওয়াড়ে 'হেম্' তুলিবার সময় সেলাইয়ের কল লইয়া অন্তঃপুরিকাদের অনেক সময় বিভ্রাটে পড়িতে হয়। কাপড় সরিয়া যায়, তা'ছাড়া ভারী-জাতের সংক্লথ প্রভৃতি কাপড়ে পিন আঁটিয়া

ক্লিপে আঁটা

তার ভাঁজকে ঠিক সোজা রাখা যায় না! এ বিপত্তি ঘটে না যদি হেম্ তুলিবার সময় পিনের পরিবর্তে ক্লিপ্ দিয়া কাপড়ের ভাঁজ এই ছবির ভঙ্গীতে আটকাইয়া রাখেন।

পাখীর পালক ঝরানো

ক্ষমা করিবেন, "নিষিদ্ধ পক্ষী" বহু গৃহে এযুগে ভোজের পাত্র অলঙ্কৃত করিতেছে! তা'ছাড়া অনিষিদ্ধ পক্ষীর মাংসে অনেকের অনুরাগ বেশ প্রবল। কিন্তু পাখীর পালক ছাড়ানো—তাহাতে বিষম হাঙ্গামা। এই পালক খশাইয়া নিঃশেষে ঝরানোর সহজ-উপায়—

পালক ছাড়ানো

বড় বড় পালকগুলি ছাড়াইয়া পাখীর চঞ্চু, পা এবং মাথা কাটিয়া [illegible] মাখিয়া দিবেন খানিকটা গলিত প্যারাফিন। এই প্যারাফিন শুকাইয়া পক্ষিদেহে অচিরকালমধ্যে জমাট বাঁধিবে পাতের মত। তখন আঙুল দিয়া খুঁটিয়া সেই প্যারাফিনের পাত খুলিয়া ফেলিবেন—দেখিবেন, প্যারাফিনের সঙ্গে লাগিয়া পক্ষি-দেহের অতি-সূক্ষ্ম ছোট পালকগুলিও নিঃশেষে খশিয়া গিয়াছে।

চলতি এয়ার-ক্রাফট্-কামান

বৈমানিক শত্রুর গতি-প্রতিরোধকল্পে স্থাণু এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফট্ কামান পাতিয়াই মার্কিণ সমর-বিভাগ ক্ষান্ত হয় নাই—চলন্ত কামানেরও ব্যবস্থা করিয়াছে। অসংখ্য ট্যাঙ্ক তৈয়ারী করিয়া সেই সব ট্যাঙ্ক তারা এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফট্ কামানে সজ্জিত করিয়া পথে
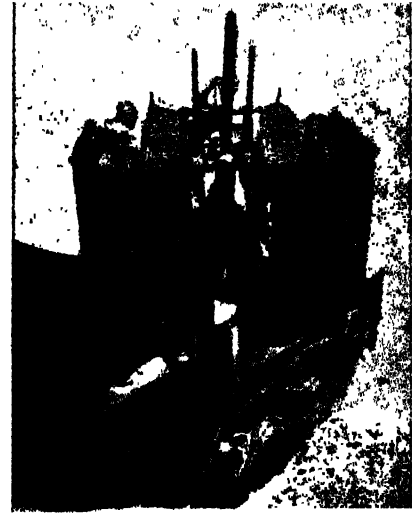
এ্যাক্-এ্যাক্ গান্

ছাড়িয়া দিয়াছে। এ কামানের নাম দিয়াছে হিট্রান্ এ্যাক্-এ্যাক্ গান্ (Hitrun Ack-Ack Gun)। আফ্রিকার মিত্রপক্ষীয় কামানের গোলা-বর্ষণে বৈমানিক শত্রু হটিয়া পলাইতে গিয়া এই চলন্ত কামানের গোলার অভ্যর্থনা-লাভে প্রথমে বিস্ময় চমকিত হইয়াছিল এবং সে চমক ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই হয় তাদের পতন এবং মৃত্যু! এ ট্যাঙ্কে বিভিন্ন শক্তির কামান সংলগ্ন করা হইতেছে।

করাতীর কেরামতি

করাত দিয়া দু'জন লোক অনায়াসে বড় গাছ কাটিতে পারে—তবে তাহাতে একটু কেরামতির প্রয়োজন। গাছের গোড়ার দিকে প্রথমে ধারালো কুঠার মারিয়া ছুব্‌লাইয়া দিয়া নীচের দিকের খানিকটা কাটিয়া বাদ দিন—মাথার দিকে কাটিবেন না। তার পর মোটরের একটি জ্যাক আনুন। কঠিন একখণ্ড মজবুত কাঠের উপর জ্যাকটি রাখুন—এমন ভাবে রাখিতে হইবে যেন জ্যাকের মাথা ঠেকিয়া থাকে কুঠারে কাটা কাণ্ডের ঠিক মাথায়। ছবি দেখিলে জ্যাকের অবস্থান বুঝিতে পারিবেন! তার পর ঐ কাটা দাগে সোজা ভাবে করাত আঁটি- গাছের দু'দিকে দু'জনে বসিয়া করাত চালাইয়া যান। খুব মোটা বা অশথের গোড়ায় এ-ভাবে করাত চালানো সঙ্গত হইবে না; কা- গাছকে ঠিক নির্দ্দেশিত বাঞ্ছিত দিকে ফেলা না যাইতে পারে

জ্যাকটিকে কাঠের উপর বসাইতে হইবে ; মাটিতে বসাইবেন না। মাটিতে বসাইলে জ্যাকেট মাটির মধ্যে পুঁতিয়া যাইবে।

আহত সৈন্যের কূলাবতরণ

[illegible] বড় জাহাজ [illegible] কূলে নামাইয়া হাসপাতালে [illegible] নিরাপদ জ্যাকেটের সৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] সমর-বিভাগ। এই জ্যাকেট পরাইয়া আহত ব্যক্তিকে ট্রলির সাহায্যে জাহাজ হইতে নামানো হয়। এ জ্যাকেট পরাইয়া আহতকে নামানো—বে-সামরিক ডীফেন্স ভলান্টিয়ার দলের ডিউটি। জ্যাকেটের আবরণ থাকার

কূলে নামানো

দরুণ নামানোয় বা টানাটানিতে আহত ব্যক্তিকে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য বা যাতনা সহিতে হয় না।

ছোটদের আসর

দার্জ্জিলিঙ পর্ব্ব

মিষ্টার ও মিসেস্ সেন [illegible] অলঙ্কারের কথা নিয়ে চারি দিকে হৈচৈ পড়ে গেল। [illegible] দার্জিলিঙে পৌছেই বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। [illegible] মিষ্টার সেনের খ্যাতি চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। [illegible] তো দার্জ্জিলিঙ যায়—কিন্তু এ রকম তো কারো [illegible] না। অর্থাৎ ক'দিন পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক কাগজেই একটি [illegible] বেরিয়েছিল—দার্জ্জিলিঙ মেলে দুর্ঘটনা।

"গত ২৫শে [illegible] দার্জ্জিলিঙ মেলে [illegible] ভীষণ দুর্ঘটনা হয়। মিষ্টার এ, সি, সেন প্রথম শ্রেণীর একটি কামরা রিজার্ভ করিয়া সস্ত্রীক দার্জ্জিলিঙ যাইতেছিলেন। [illegible] মিসেস সেনের অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ছিল। [illegible] কাছাকাছি লাইন সারানো হইতেছিল ; কাজেই ট্রেনের গতি মন্দীভূত করা হয়। সেই সুযোগে মুখোস-পরিহিত দু'জন ব্যক্তি মিষ্টার সেনের কামরায় ওঠে। মিষ্টার ও মিসেস সেন উভয়েই জাগিয়া ছিলেন। ব্যক্তিদ্বয় মিষ্টার সেনকে আক্রমণ করে। মিসেস্ সেন উপস্থিত-বুদ্ধি না হারাইয়া ট্রেনের সাঙ্কেতিক শিকল ধরিয়া টানেন। দস্যুদ্বয় সেই ফাঁকে নামিয়া পলায়ন করে। মিষ্টার সেন সামান্য আঘাত পাইয়াছেন। দস্যুরা কিছুই চুরি করিতে পারে নাই।"

মিসেস্ সেন স্বামীকে বললেন—"এত গহনা সঙ্গে করে না আনলেই ভালো করতে! দস্যুদের দল যখন সন্ধান পেয়েছে, তখন গহনাগুলি কাছে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। গহনা তো যাবেই, সেই সঙ্গে প্রাণ যেতে পারে। এক কাজ করো। ওগুলোকে কোনো ব্যাঙ্কে জমা করে দাও।"

মিষ্টার সেন উত্তর দিলেন—"না, না, সে ভালো হবে না। চোরেরা মনে করবে আমি তাদের ভয় করি। এতে তারা আরও নাই পেয়ে যাবে। আর এ রকম চুরি-ডাকাতি তো নিত্য হচ্ছে। এ নিয়ে মাথা ঘামানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে বলো তো গহনাগুলি খুব বেশী করে ইন্সিয়োর করিয়ে রাখি।"

"বেশ, তাই করো। আমার তো বাবু ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।"

তাই করা হলো। দু'তিনটে কোম্পানীতে বেশ মোটা টাকার বীমা। কোম্পানীর লোক দিন-রাত পাহারা দেবার জন্য দু'জন প্রাইভেট গোয়েন্দা নিযুক্ত করে দিলে। গরজ অবশ্য তাদের, কিন্তু সেন-পরিবারের হলো সুবিধা। বিনা পয়সায় দরোয়ানী। নিজেও

তিনি বাড়ীর প্রত্যেক জানলায় ও দরজায় বার্গলার-অ্যালার্ম ফিট করে নিলেন। সাবধানের মার নেই।

এক দিন মিষ্টার আর মিসেস্ সেন এক বিরাট পার্টির আয়োজন করলেন। দার্জ্জিলিংয়ের কোন বেই-শিষ্ট্ বাদ পড়লেন না। ঠিক হলো তাঁরা সে-দিন সকলকে তাঁদের অলঙ্কারের কলেকশন দেখাবেন। বাড়ীর বাহিরে বিকেল থেকেই পুলিশ মোতায়েন হলো। প্রাইভেট গোয়েন্দা দু'জন খুব সতর্ক হয়ে রইল। মিষ্টার সেনের সেক্রেটারী চিরঞ্জীব গুপ্ত ব্যস্ত ভাবে চারি ধারে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

সন্ধ্যা থেকেই লোক-সমাগম সুরু হলো। মহারাজা, প্রিন্স, সার, রায় বাহাদুর—সব বড় বড় লোকেরা। পার্টির মত পার্টি বটে। খাওয়া-দাওয়া না হলেও, বিড়ি সকলে ধন্য-ধন্য করতে লাগলেন। মিষ্টার ও মিসেস সেন অতিথি-সৎকারে যেন মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। আর মিষ্টার গুপ্ত ? তিনি যেন চরকি-বাজীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন

খাওয়া-দাওয়া নির্ব্বিঘ্নে চুকে গেল। এবার অলঙ্কারের প্রদর্শনী। অতিথিরা উৎসুক। মিষ্টার সেনের সেক্রেটারী মিষ্টার গুপ্ত আবার কলকাতা থেকে এক রাজমুকুট এনেছেন। বেয়ার জিনিষ। আফ্রিকায় যখন মিষ্টার সেন দেশভ্রমণে গিয়েছিলেন, সেই সময় এক জঙ্গলী সর্দ্দারের কাছ থেকে তিনি সেটি কিনে আনেন। অবশ্য অল্প দামে। কিন্তু সেই মুকুটটি খাঁটি সোনার আর তার মধ্যে যে হীরে বসানো আছে, তার সাইজ প্রায় একটা হাঁসের ডিমের মত।

হল-ঘরে সকলে জমা হলেন। গ্লাস-টপ টেবিলে অলঙ্কারগুলি সুদৃশ্য মখমলের কেসে সাজানো। আর-একটি কাচের আলমারীতে রাজমুকুট। ঘরে তীব্র বৈদ্যুতিক আলো। হীরকখণ্ডগুলির উপর সেই আলো পড়ে চারি দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে এক অপূর্ব্ব মায়ালোক সৃষ্টি করেছে! দর্শকরা অবাক হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে সেই শোভা নিরীক্ষণ করছেন। এ যেন আলিবাবার গুহা। আলাদিনের প্রাসাদ! রূপকথার মায়াপুরী! কি বিপুল ঐশ্বর্য্য এই সেন-পরিবারের! মুগ্ধ দৃষ্টির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার, সুপ্ত প্রলোভনের ইঙ্গিত।

হঠাৎ ক্রিং-ক্রিং করে এ্যালার্ম বেজে উঠলো। দপ্ করে বৈদ্যুতিক আলোগুলি নিবে গেল। অতিথিরা ভয়ে কাঠ! মহিলারা চীৎকার করে উঠলেন। মিষ্টার সেনের হাত ধরে মিসেস্ সেন প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন—"আমাদের সর্ব্বনাশ হবে, দেখছি!" মিষ্টার সেন অবিচলিত কণ্ঠে বললেন—"যে যেখানে বসে আছেন, থাকুন। নড়বেন না। ঘরে বাইরে দু'জন গোয়েন্দা আছে। বাড়ীর চারি ধারে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। চোরের প্রবেশ অসম্ভব।"

ততক্ষণে বীমা কোম্পানীর দু'জন গোয়েন্দা আর মিষ্টার সেনের সেক্রেটারী মিষ্টার চিরঞ্জীব গুপ্ত টর্চ্চ-হাতে ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মিষ্টার গুপ্ত উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞেস করলেন—"কি হলো স্যর?"

গোয়েন্দারা সমস্বরে বলে উঠল—"চোর-টোর কেউ—"

বাধা দিয়ে মিষ্টার সেন বললেন—"সে সব কিছু নয়! ভয়ের কোন কারণ নেই। বোধ হয় মেন্ ফিউজ হয়ে গেছে। চিরঞ্জীব, একবার গিয়ে দ্যাখো তো।" চিরঞ্জীব বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। গোয়েন্দারাও চলে যাচ্ছিল, মিষ্টার সেন তাদের ডেকে বললেন—"ঘরটা অন্ধকার। মহিলারা বড্ড ভয় পেয়েছেন। যতক্ষণ না আলো জ্বলে, টর্চ্চ নিয়ে এই ঘরেই অপেক্ষা করুন।"

মহিলা প্রায় অজ্ঞান হয়ে সোফায় শুয়ে আছেন। মিসেস সেন সিঁটিয়ে মিষ্টার সেনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখ রক্তহীন, বিবর্ণ, শাদা কাগজের মত ফ্যাকাশে। সকলের মুখে-চোখে ভীতিব্যঞ্জক ভাব। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। অবস্থা দেখে মনে হয়, যেন কি একটা ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেল। শুধু মাত্র এক জন লোকের মুখে ভয় ভাবনা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। তিনি মিষ্টার সেন।

আলো জ্বলতেই সকলে গ্লাসকেসগুলির দিকে তাকালেন। এক জন বলে উঠলেন—"নাঃ, সবই ঠিক আছে, দেখছি। কিছু যায় নি।" কথার ভঙ্গীতে তৃপ্তি বা নিরাশা বোঝা গেল না; তবে বিস্ময় ছিল! সকলেই ভেবেছিলেন, ব্যাপারটা চোর-ডাকাতের, এ ছাড়া অন্য কোন যুক্তি ভেবে পাওয়া যায় না।

ততক্ষণে চিরঞ্জীব বাবু এসে পড়েছেন। মিষ্টার সেন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে চাইতে তিনি বললেন—"মেন্ ফিউজ হয়েছিল, তার বদলে দিয়েছে।" এক জন প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু ঘণ্টা? বার্গলার এ্যালার্ম?" চিরঞ্জীব বাবু উত্তর দিলেন—"একটা বেরাল জানলা দিয়ে লাফাতে গিয়ে তারে জড়িয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় সেই-জন্যই লাইন ফিউজ হয়েছিল।"

যাই হোক, ব্যাপারটা বিনা দুর্ঘটনাতেই মিটে গেল, কিন্তু পার্টি আর জমলো না। সকলেই যেন তখন পালাতে পারলে বাঁচেন। কে জানে, আবার কি ঘটে। শেষে পুলিশ-হাঙ্গামায় পড়তে হবে। অতিথিরা কিছুক্ষণের মধ্যে বিদায় নিলেন। বাড়ীর সকলে একে একে শুতে গেলেন। বীমা-কোম্পানির গোয়েন্দারা পালা করে সমস্ত রাত বাড়ীর চারি ধারে টহল দিতে লাগলো।

রাতটুকু নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল। ভোরের বেলা যে হল-ঘরে অলঙ্কার মুকুট ইত্যাদি রক্ষিত ছিল, সেই ঘরে গোয়েন্দারা ঢুকে যা দেখলো, তাতে তাদের চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কাচের আলমারী, কাচের টেবিল অক্ষত অবস্থায় রয়েছে বটে, কিন্তু সবই শূন্য। অলঙ্কার মুকুট প্রভৃতির কোন চিহ্ন নেই। উভয়ে ভীত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সারা রাত তারা জেগে। বাড়ীর ত্রিসীমায় কেউ আসেনি। বার্গলার-এ্যালার্মও বাজেনি। তবে? কোন এক্সপ্লেনেশনই তারা ভেবে উঠতে পারলো না।

যথাসময়ে মিষ্টার সেনকে আড়ালে ডেকে তারা সব কথা তাঁকে জানালো। স্তব্ধ হয়ে তিনি শুনলেন এই দুঃসংবাদ। প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করলেন অদ্ভুত ধৈর্য্যসহকারে। মুখমণ্ডল হয়ে গেল রক্তশূন্য। কম্পিত ওষ্ঠদ্বয় চেপে রইলেন—পাছে কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ে তাঁর অন্তরের বেদনা। তাঁর সংযম দেখে গোয়েন্দারা অবাক! কিন্তু মনের সঙ্গে এই তীব্র সংগ্রাম তাঁকে অভিভূত করে ফেললে কাঁপতে কাঁপতে তিনি একটি চেয়ারে বসে পড়লেন। দেখে মনে হলো, তিনি যেন ধৈর্য্য হারাবেন না! কিন্তু এই অসমান যুদ্ধ কতক্ষণ সম্ভব! হঠাৎ তিনি দু'হাতে মুখ ঢেকে বালকের মত কেঁদে উঠলেন। সকল সংযমের বাঁধ তখন ভেঙ্গে গেছে।

একটু পরেই সম্বিৎ ফিরে পেলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে লজ্জিত ভাবে গোয়েন্দাদের মুখের দিকে চাইলেন। হাসবার এক ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। তার পর দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। গোয়েন্দারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

[illegible] মিষ্টার চিরঞ্জীব গুপ্ত এসে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গ

ব্যাপার শুনে বললেন—"মিষ্টার সেনকে খবর দিন।" গোয়েন্দারা বললে—"দিয়েছি।"

"শুনে তিনি কি বললেন?" চিরঞ্জীব বাবু প্রশ্ন করলেন।

"কিছু না। অদ্ভুত সংযম।" এক জন গোয়েন্দা বললে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চিরঞ্জীব বাবু বললেন—"সেই জন্যই তো ভয়। অভিব্যক্তিতে শোক অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়। উনি ভয়ানক চাপা লোক! বুক ফাটলেও মুখ ফুটবে না।"

ঠিক সেই সময় বাহিরে মোটর ষ্টার্ট করবার শব্দ। তিন জনেই ছুটে জানালায় গেলেন। দেখলেন, 'ব্রেকনেক স্পীডে' মোটর হাঁকিয়ে মিষ্টার সেন ফটক ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। গোয়েন্দা দু'জন ও চিরঞ্জীব বাবু পরস্পরের মুখ-চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন। একটু পরেই দরজা ঠেলে এক জন বেয়ারা ঘরে ঢুকলো। হাতে একটি চিঠি—খামে পোরা। চিরঞ্জীব জিগোস্ করলেন—"কি? কার চিঠি।" বেয়ারা জবাব দিলে—"আপনার! সাহেব বেরিয়ে যাবার সময় আপনাকে দেবার জন্য আমায় দিয়ে গেলেন।"

খাম বন্ধ। শিরোনামা—'টু দি পুলিস ইন্সপেক্টর।'

তখনই থানায় টেলিফোন করা হলো। মিনিট দশেকের মধ্যে পুলিশ ইন্সপেক্টর এসে হাজির। সঙ্গে দু'জন কনষ্টেবল। তাঁকে চিঠি দেওয়া হলো। খুলে পড়লেন—

"অনন্যোপায় হয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। রেসে এবং শেয়ার মার্কেটে বিস্তর টাকা লোকসান গেছে। এখন আমি একেবারে পপার। ভেবেছিলুম, ভালো দামে আমার অলঙ্কারাদির কলেকশন বিক্রী করতে পারবো। পারতুমও। কিন্তু—

যাবার আগে আমার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সাহস হলো না। তাঁকে জানাবেন, আমি অপরাধী হতভাগ্য। তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করছি।"

মিসেস সেনকে দুঃসংবাদ জানানো হলো। অলঙ্কারাদি, মান, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি এবং স্বামীকে হারিয়ে তিনি শোকে মৃতপ্রায় হয়ে পড়লেন। চারি দিকে খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেল। চোর, কিম্বা মিষ্টার সেন কারো সন্ধান পাওয়া গেল না।

—১০ই সেপ্টেম্বর—দার্জ্জিলিঙ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, অদ্য ভোরে ঘুমের নিকট বাতাসিয়া লুপের ধারে এক মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। কোন উচ্চ স্থান হইতে পতনের ফলে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মাথা এবং মুখ এমন ভাবে গুঁড়াইয়া গিয়াছে যে চিনিবার উপায় নাই। সন্দেহবশতঃ স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে মিসেস সেনকে লইয়া যায়। হাতের উপর একটি উল্কির চিহ্ন হইতে তিনি সনাক্ত করেন, মৃতদেহ তাঁহার স্বামীর। তিনি সেইখানেই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। মোটরে তাঁহাকে বাসায় লইয়া যাওয়া হয়। ডাক্তারের পরামর্শানুসারে তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিবেন।"

কলকাতায় ফিরে বীমা কোম্পানীদের সমস্ত ঘটনা জানিয়ে মিসেস সেন চিঠি লিখলেন। অভাবের কথাও উল্লেখ করলেন। তদন্তের পর তিনি বীমার দরুণ যা টাকা প্রাপ্য, সমস্তই পেলেন দিন পনেরোর মধ্যে। সাধারণতঃ, এত তাড়াতাড়ি এ-সব ব্যাপার মেটে না। বোধ হয় মিসেস সেনের করুণ কাতর লাবণ্য, সুন্দর মুখ সজল চোখের জন্য এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা চুকলো। সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।

ক' দিন পরেই মিসেস সেন কলকাতা ত্যাগ করলেন। হঠাৎ কোথায় গেলেন, কেউ বলতে পারলো না। বাসা ছেড়ে দিয়ে গেছেন।

কাঞ্চনপুর। মহারাজার প্রাসাদ। সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে মহারাজা, তাঁর কন্যা সবিতা ও জামাতা সলিল আর তাঁর সেক্রেটারী গগন গুপ্ত। সিন্দুকের মধ্যে শোভা পাচ্ছে অলঙ্কারাদি ও মুকুট। যেন চেনা-চেনা ঠেকছে! চেনা বই কি! দার্জ্জিলিঙে এইগুলিই তো চুরি গিয়েছিল! সলিল সেন আর তার স্ত্রী সবিতা দেবীই তো মিষ্টার এণ্ড মিসেস্ সেন।

তাঁদের সেক্রেটারী চিরঞ্জীবই তো গগন গুপ্ত।

মহারাজা হেসে বললেন—"উপযুক্ত জামাই বটে! সিন্দুকের জিনিষ সিন্দুকেই ফিরে এল। দার্জ্জিলিঙ-ভ্রমণও হলো। মাঝে থেকে ব্যাঙ্কের খাতায় অঙ্ক বেড়ে গেল ষাট হাজার টাকা। ধন্য!"

সলিল তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—"সবই আপনার আশীর্ব্বাদে!"

মহারাজা প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা, মৃতদেহের ব্যাপারটা কি করে করলে বলো তো।"

সলিল উত্তর দিলে—"দার্জ্জিলিঙে তখন এপিডেমিক চলছে! তা ছাড়া বৃষ্টি। অনেক সময় মড়া পড়ানো হয় না! সেই একটা মড়া নিয়ে এসে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিলুম।"

মহারাজা শিউরে উঠলেন—"কি দুঃসাহস! বাহাদুরী আছে।"

সলিল সেন হেসে বললেন—"বাহাদুরী আমার নয়, আপনার কন্যার। তিনি কোথাও একটু ভুল করলেই পুলিশ আমাদের সন্দেহ করতো। উল্কি দেখে মৃতদেহ সনাক্ত করলেন অথচ আমার হাতে কোন দিন উল্কি ছিল না! কতখানি উপস্থিত বুদ্ধি, বলুন তো!"

গগন বলে উঠলো—"অদ্ভুত মিলন। রাজযোটক!"

শ্রীযামিনীমোহন কর

—

যাকে রাখো

আমাদের দেশে যে চলিত-কথা আছে—যাকে রাখো সেই রাখে, এ-কথা কত খাঁটী, আজ যুদ্ধের বাজারে ছুঁচ সুতো আলপিন বোতামের দারুণ অভাবে আমরা তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি। অদরকারী বাজে চিঠিপত্র আমরা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিই—অথচ আজ ঐ ছেঁড়া চিঠিপত্রে কত গৃহস্থ ঘরে উনুন-ধরানোর কাজ হইতেছে। দায় তো সহজ নয়! যাঁদের গৃহে বিজলী বাতি—কেরোসিনের অভাব হয়তো তাঁদের তেমন গায়ে লাগে না। কিন্তু সহরের বাহিরে যেখানে বিজলী-বাতি নাই, সেখানে আর কেরোসিনের অভাবে দুর্দ্দশা-দুর্গতির সীমা নাই! যে বাড়ীতে যতটুকু কেরোসিন দরকার, পয়সা দিলেও আজ তাহা মিলে না। বাজেই ছেঁড়া চিঠিপত্রে আর কোন কাজ না হোক, উনুন ধরানো হইবে। যে আলপিনকে তুচ্ছ-বোধে আমরা পথে ফেলিয়া দিয়াছি, আজ তারি জন্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। বাবলা-কাঁটায় দু'-চারখানা কাগজ বিঁধিয়া আটকাইয়া রাখা চলে, একগাদা কাগজ বাবলার কাঁটায় আঁটিয়া অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না।

পরিচিত দু'-চার পরিবারে দেখিয়াছি, মশলা-বাঁধা দড়িটুকুও তাঁরা ফেলিয়া দেন না—সঞ্চয় করিয়া রাখেন। নিত্যদিনের কাজ-কর্ম্মে প্যাকেট বাঁধিতে দড়ির কত প্রয়োজন। প্রয়োজন ঘটিবামাত্র ছুটিয়া বাজারে গিয়া ক'গজ দড়ি কিম্বা টোন্ সুতা কিনিয়া আনা সহজ ব্যাপার নয়! বোতাম, পেরেক, ছুঁচ-সুতা—

পথে-কুড়ানো ছেঁড়া ন্যাকড়া প্রভৃতি পরিশুদ্ধ করা

এ-সব নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী—এগুলিকে যত্ন করিয়া রাখা চাই। ফেলিয়া দিলে দুঃখভোগ করিতে হইবে। আজ না হয়, দু'দিন পরে।

এ-সব তো কাজের জিনিষের কথা! যে-সব জিনিষের কাজ ফুরাইয়াছে, সে-সব জিনিষও আবর্জ্জনা-স্তূপে ফেলিয়া দেওয়া চলে না। সে সবেরও প্রয়োজনীয়তা ফুরাইবার নয়। ছেঁড়া ন্যাকড়া, ছেঁড়া কাগজ, ভাঙ্গা পুতুল, ফাটা-ফুটা বাসন-কোশন,—কোনো বস্তুই তুচ্ছ নয়। ভাঙ্গা মরিচা-ধরা খুন্তি, বেড়ি, চাটু, কড়া আমরা ফেলিয়া দিই—কিন্তু বাজারে সে-সবেরও দাম আছে!
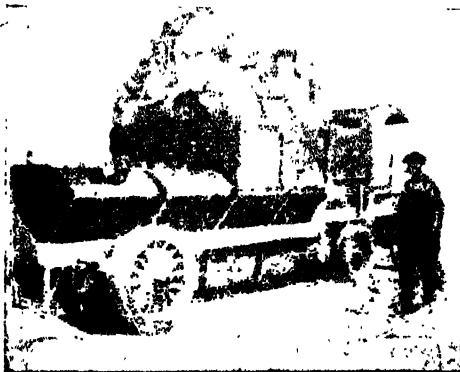
ময়লা গাড়ীর বুকে ডাষ্টবিন থেকে তোলা অকেজো সামগ্রী

টুটা-ফাটা লোহা তামা পিতল টীন—এ সব তো আজ অগ্নিমূল্য। আজ এ-সবের দাম চড়িয়াছে অনেক। যুদ্ধ যখন ঘটে নাই, তখনো এ সবের দাম ছিল—তবে সে-দাম এখনকার চেয়ে কম।

য়ুরোপে-আমেরিকায় ডাষ্টবিন হইতে পুরানো টুটা-ফাটা ভাঙ্গা সব জিনিষ লইয়া তাহা বিক্রয় করা হয়। ছেঁড়া ন্যাকড়া, ছেঁড়া কাগজ কেনে কাগজের মিলওয়ালারা। ভাঙ্গা শিশি বোতল কেনে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রয়োজনীয় কত না নব নব সামগ্রীর সৃষ্টি হইতেছে!

আমেরিকার নিউ ইংলণ্ড প্রদেশে ছেঁড়া কাগজ বিক্রয় হয় বছরে তিন কোটি টাকা দামের। বোষ্টনে প্রত্যহ ছেঁড়া কাগজ বিক্রয় হয় ৩০।৪০ টন করিয়া। তাছাড়া রবারের টুকরা, টুটা-ফাটা লোহা তামা পিতল টীন এলুমিনিয়মের কুচিও সেখানে ফেলা যায়

ডাষ্টবিন থেকে নেওয়া ভাঙ্গা পুতুল মেরামত হয়, রূপান্তরিত করা হয়

না। বাজারে বেশ ভালো দামে এ-সব বিক্রয় হয়। এ-সব জিনিষ 'অকেজো' বলিয়া তারা ফেলিয়া দেয় না; বেচিয়া তাদের লাভ হয় বড় অল্প নয়।

আমাদের এখানে পুরানো খবরের কাগজ এখন দেড় টাকা সেরে বিক্রয় হইতেছে। আর এখন ভাঙ্গা শিশি বোতল, টিন, সোডা-

টর্চের শিখায় ভাঙ্গা-লোহার কাটা
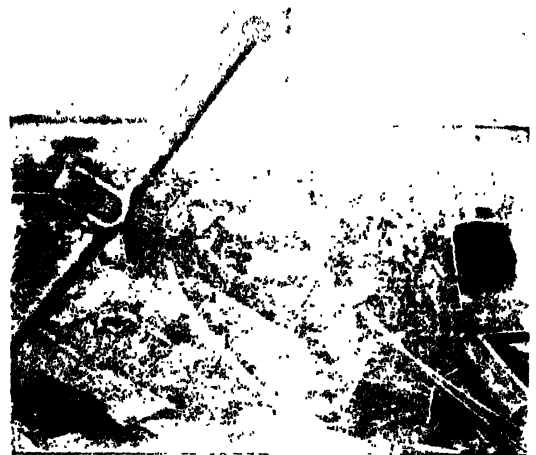
লিমনেডের বোতলের ছিপি, ভাঙ্গা চীনাবাসন—এ সবের রীতিমত দাম আছে। চায়ের পেয়ালা ভাঙ্গিলে যাঁরা তাহা ফেলিয়া দেন, তাঁরা সেই সঙ্গে লক্ষ্মীর আঁচল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন বলিলে সে-কথা

'কাব্য' বা অত্যুক্তি হইবে না—বিষয়-বুদ্ধিতে দেখিলে, কথাটা সত্য বলিয়া মনে হইবে।

এই জন্য তোমাদের বলি, কোনো সামগ্রীকে তুচ্ছ বলিয়া ফেলিয়া দিয়ো না। ইংরেজীতে সেই যে একটি চলিত কথা আছে—একটি পয়সার যত্ন করিয়ো, তাহা হইলে দশটা টাকার সাশ্রয় হইবে। পরিত্যক্ত এমন বহু সামগ্রী বেচিয়া অনেকে শুধু ও-দেশে নয়, এ-দেশেও লক্ষপতি হইয়াছেন!

সার্ট-কোটের বোতাম ছিঁড়িলে অবজ্ঞাভরে কত অমন ফেলিয়া দিয়াছি। আজ বাজার ঘুরিয়া বেড়াও, কটা বোতাম পাও, দেখি। ছুঁচ সুতা প্রায় ভাত-ডালের মতন প্রয়োজনীয় সামগ্রী—তার অভাবও আজ কতখানি অনুভব করিতেছি।

দার্শনিকেরা বলিয়াছেন—সব-কিছুরই সার্থকতা আছে! এ কথার মর্ম্ম যদি বুঝিতে পারো, তাহা হইলে বুঝিবে Waste not want not—এ কথার মর্ম্ম, এবং বুঝিলে অভাব-জনিত কষ্ট-অসুবিধাও অনেকখানি কমিবে।

ছুটির দিনে

বছর-পরে আবার সেই পূজার ছুটি! কিন্তু আমোদ নেই,—মনে হচ্ছে? কোথাও যাবে—নানা ভিড়, ট্রেনে জায়গা মিলবে কি? তাছাড়া যেখানে যাবে, সেখানে খেতে পাবে, কি, পাবে না—এমনি গোলযোগ-সংশয়ের আর অন্ত নেই।

অথচ এত দিন লেখাপড়া, এগজামিনের আতঙ্ক—এই নিয়েই দিন কেটেছে! ছুটির দিনে মন চায় একটু বিরাম, একটু বৈচিত্র্য!

দুঃখের কারণ নেই। সুখ-দুঃখ আমাদের মনে! বাইরে কোথাও না যেতে পারো, ঘরে বসেই বিরাম আর বৈচিত্র্য-সৃষ্টির ব্যবস্থা করো। তোমার মত তোমার অনেক বন্ধুবান্ধবও মনে এমনি সংশয় নিয়ে চিন্তিত হয়েছে! তাদের সঙ্গে যোগ দাও। দিয়ে খুব সহজে জীবনে একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করবে কি করে—বলবো?

সকালে উঠে কজনে মিলে খুব খানিকটা বেড়িয়ে এসো—আজ এ-পথে গেলে, কাল ও-পথে—পথ বদলাও। সেই সঙ্গে মনের চাবি খুলে মনকে দাও মুক্ত করে। লেখাপড়া আর এগজামিনের কথা আদৌ কেউ মুখে আনবে না—প্রতিজ্ঞা করো। বেড়াতে বেড়াতে দেশের নানা কথার আলোচনা করো। লেখাপড়ার চাপে যে মনকে কোনো দিন প্রকৃতির বিচিত্র মাধুরীর দিকে দিতে পারোনি, আজ ছুটির দিনে সে-মনকে দাও বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে। গ্রীষ্ম বর্ষা গেল, শরৎ এসেছে—এ তিন ঋতুর মধ্যে কতখানি বৈচিত্র্য—আকাশের বর্ণে, ফুল-ফলের বৈচিত্র্যে—সে কথার আলোচনা করো। ঋতু-বৈচিত্র্যে মনে যে ভাবান্তর ঘটে, তার বিশ্লেষণ করো। এ আলোচনায় প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হবে। প্রকৃতির রাজ্যে বাস করে প্রকৃতির সঙ্গে যদি পরিচয় না হলো, তাহলে জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে! মানুষ শুধু এগজামিন পাশ আর পয়সা-রোজগার নিয়ে বাঁচতে পারে না কি? পারে! কিন্তু সে-বাঁচার সঙ্গে পশুপক্ষীর বাঁচার তফাৎ কোথায়, বলতে পারো? বিজ্ঞানে সাহিত্যে শিল্পে জগৎকে যাঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে নিবদ্ধ করার সঙ্গে নিজেদের অমর করে গেছেন, তাঁরা শুধু খাওয়া-দাওয়া বেশ-ভূষা আর পয়সা-রোজগার নিয়ে ছিলেন না। তাঁরা প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়কে করেছিলেন নিবিড়। তার ফলে মন হয়েছিল উদার মুক্ত, চিন্তা-শক্তি হয়েছিল প্রখর এবং বুদ্ধিবৃত্তি সূতীক্ষ্ণ! এগজামিন-পাশ আর পয়সা-রোজগার—শুধু এতে নিমগ্ন থাকলে মানুষের বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়।

এই যে পূর্ণিমার পর থেকে আকাশের চাঁদ রাত্রে একটু দেরী করে উঠতে-উঠতে অমাবস্যার রাতে একেবারে উবে যায়; আবার অমাবস্যার পরের দিন থেকে সন্ধ্যার গোড়ায় এসে আকাশে দেখা দেয়—ক'জন তা লক্ষ্য করেছো? সেদিন এক জন প্রবীণ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছিলুম, শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে সন্ধ্যার দিকে আকাশে চাঁদ ওঠে, না, বেশী রাত করে' ওঠে? প্রবীণ ব্যক্তিটি ব্যবসা-বাণিজ্যে অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করছেন, বিদেশের নানা সাম্রাজ্যের মুদ্রার দাম আমাদের দেশের মুদ্রায় কত হয়, চকিতে বলে দিতে পারেন; কিন্তু চাঁদ ওঠা সম্বন্ধে আমার ও-প্রশ্নটির তিনি জবাব দিতে পারেননি!

আকাশে এই যে নানা দিকে নানা রকমের মেঘ দেখা দেয়, তার কোনটায় বৃষ্টি হবে, কোনটায় একবিন্দুও বৃষ্টি হবে না—ঐ বিরাট আকাশ-গ্রন্থ পাঠ করো শেখো। পাঠ্য-গ্রন্থ পড়ে এগজামিন পাশ করে মেডেল পাওয়া যায়, স্কলারশিপ পাওয়া যায় সত্য—কিন্তু প্রাকটিকাল জ্ঞান শুধু বই মুখস্থ করে লাভ করা যায় না। সে জন্য চাই বাহিরের সঙ্গে পরিচয়। ছুটির দিনে অন্ধকূপ ছেড়ে বাহিরে নিজেদের মুক্ত করে দাও। তাতে যে-শিক্ষা পাবে, স্কুল-কলেজের শিক্ষার চেয়ে সে-শিক্ষার দাম অনেক বেশী। ছুটির দিনে বই-খাতা ফেলে সেই শিক্ষায় মনকে ভরিয়ে তোলো, অপরিসীম আনন্দ পাবে।

তবু

জ্বলছে বুকে দুখের আগুন, চলতে হবে তবু?
এই কি তোমার বিচার ওগো, এই কি আদেশ প্রভু?
পায়ে যদি ফোটে কাঁটা,
হবে না তায় বন্ধ হাঁটা—
ক্লান্তি নাহি—শ্রান্তি নাহি—নাই অবসর কভু?
পথের মাঝে ছেড়ে যদি যায় গো পথের সাথী,
ঘনিয়ে আসে নিখিল জুড়ে কৃষ্ণ অমারাতি;
বজ্র যদি মাথায় পড়ে,
তরাস জাগায় বাদল-ঝড়ে,
তবু কি হায় দিতেই হবে আমার এ বুক পাতি?

প্রাণের মাঝে কান্না জাগুক—গাইতে হবে গীতি?
চক্ষে ভরি' অশ্রু-ধারা হাসতে হবে নিতি?
জীবন সে তো যন্ত্রণাময়!
নাইকো সুখ—সব অভিনয়!
নিজেরে হায়, দিচ্ছি ফাঁকি—এই দুনিয়ার রীতি!
লুকিয়ে রেখে সঙ্গোপনে মনের গভীর ক্ষত
উঠতে হবে, ছুটতে হবে, খাটতে হবে কত!
মিলতে হবে সবার সাথে,
ধরতে হবে হাতে হাতে—
বিশ্ব-নিখিল যখন জাগে দগ্ধ মরুর মত!

শ্রীআশুতোষ সান্যাল (এম্-এ)

মেঘ-রৌদ্রে

[গল্প]

এক জনকে ছাড়িয়া আর-এক জন থাকিতে পারে না,— তবু কি যে হয়···কেমন করিয়া হয়···নিত্য বিরোধ···নিত্য অশান্তি! আর-পাঁচটা সংসারেও এমন হয়? কে জানে!

ছেলেমেয়ে লইয়া দিদি সৌদামিনী আসিয়াছে কলিকাতায়। কালীঘাটে তীর্থ সারিয়া সিনেমা-থিয়েটার দেখিবে। আসিয়া সে উঠিয়াছে ছোট বোন মন্দাকিনীর গৃহে।

থিয়েটার দেখিয়া সৌদামিনী ফিরিল রাত্রি প্রায় বারোটার পর।

তার পর খাওয়া-দাওয়া চুকিল।

সকলে শুইয়াছে। দুই বোনে বারান্দায় বসিয়া সুখ-দুঃখের কথা হইতেছিল। কাল সৌদামিনী চলিয়া যাইবে···বসিরহাট। সৌদামিনীর স্বামী কাশীশ্বর সেখানে মুন্সেফী করে। কাজেই মনের কথা আজ রাত্রে কহিতে না পারিলে হয়তো আর বলা হইবে না!

মন্দা বলিল—সত্যি দিদি, এক এক সময় মনে হয় তোর কাছে গিয়ে দু'দিন থাকি···তাহলে যদি একটু শান্তি পাই!

সৌদামিনী বলিল,—পাগল হয়েছিস! ঘর করতে গেলে এমন খিটিমিটি কোন্ সংসারে না হচ্ছে! তা বলে কেউ বৈরাগ্য নেয়?

মন্দা বলিল—রোজ এমনি শ্যাল-কুকুরের মতো···

বাষ্পভারে মন্দার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সৌদামিনী বলিল,—কি রকম, শুনি?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মন্দা বলিল,—এই আজকের ব্যাপারই বলি তবে দিদি···শুনে যদি বলিস আমার অন্যায় হয়েছে, আমায় দু'ঘা জুতো মারিস্!···মানে, তোরা তো থিয়েটারে গেলি···তোদের গোছগাছ করে দিতে আমার সময় ছিল না, তাই চুল বাঁধা হয়নি, গা-ধোওয়া বা কাপড়-কাচা হয়নি। তোরা চলে গেলে আমি গেলুম গা ধুতে···রাত তখন সাড়ে আটটা। উনি এলেন···এসে বললেন, এত রাত্রে গা ধোওয়া! সে-দিন না ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছো! বলতে বলতে তেলে যেন বেগুন পড়লো! জামা-গায়ে কল-ঘরে ঢুকে তখনি মাথায় হুড়-হুড় করে জল ঢালতে লাগলেন!

সৌদামিনী বলিল—সত্যি?

মন্দাকিনী বলিল—এর একটি বর্ণ আমি বাড়িয়ে বলছি না, ভাই।

—তুই বুঝিয়ে বললি না কেন?

—তার সময় পেলুম কি, ছাই!···ঐ তো মজা! কোনো কিছু শোনবার আগেই দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে!

সৌদামিনী বলিল—তোর ভালোর জন্যই রাগ করে। সত্যিই তো, সে-দিন জ্বর থেকে উঠেছিস্, আবার পাছে জ্বরে পড়িস।

মন্দাকিনী বলিল—তা বলে জামা-জোড়া গায়ে মানুষ অমন করে গায়ে-মাথায় জল ঢালে?

—ছেলেমানুষী! সৌদামিনী হাসিল।

মন্দাকিনী বলিল—হাসির কথা নয় ভাই দিদি। এ তো একটা! নিত্যি এমন কত হচ্ছে···দু'বেলা। পাণ থেকে চুণ খশবার দরকার হয় না! পাণটি হাতে নিয়ে চুণের ভাঁড়ে হাত দাও··· অমনি ক্ষেপে উঠবে!·· এক দিন এমন কথাও বলেছি যে ওগো, এমন রাগ তো তোমার ছিল না···ডাক্তারের কাছে যাও একবার··· নিশ্চয় কোনো অসুখ করেছে! তাতে আমায় কি বললে, জানিস্?

সৌদামিনী বলিল,—কি?

মন্দাকিনী বলিল—বললে, তুমি দোষ করে রাগিয়ে দেবে, সে-দোষ স্বীকার করবে না আর বলবে, আমার অসুখ হয়েছে! বটে!··· তার পরে যা নয় তাই···কত কথা যে বলে গেল! সত্যি ভাই, দাসী-চাকরদের কাছে পর্য্যন্ত আমার আজ মাথা তোলবার উপায় নেই! এই কাল···তুই চলে গেলি ছেলেমেয়ে নিয়ে তোর ননদের বাড়ী···বাইরে থেকে আমাকে বলে পাঠালেন, শীগগির দু'পেয়ালা চা···বাইরে কে বন্ধু এসেছে···জলদি করে'। আমি ভাই তখন চপ ভাজছি···আর খান-আষ্টেক বাকী। চপ তৈরী করে চায়ের জল চাপিয়ে দিলুম···তার পর দু'পেয়ালা চা তৈরী করে বাইরের ঘরে পাঠাচ্ছি···সেজে-গুজে উনি নামছিলেন উপর থেকে···চাকরের হাত থেকে পেয়ালা দু'টো না নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন ঐ উঠোনে। ভয়ে আমি একেবারে কাঁটা! আমার পানে চেয়ে বললেন, দোকান থেকে চা আনিয়ে খেয়েছি তোমার সময় ছিল না বলে'। বাইরের ভদ্রলোক তেষ্টায় আকুল হয়ে চা চেয়েছেন, তাঁকে বসিয়ে রাখতে পারি না তো!

তার পর একটা নিশ্বাস! নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল—দীনু কি ভাবলে, বল্ তো?

চাকরের নাম দীনু!

শুনিয়া সৌদামিনী চুপ করিয়া রহিল। দুঃখ হয়, যখনি দেখা হইয়াছে, শুধু অভিযোগ···দু'পক্ষের মুখেই!

সে-দিন ভগ্নীপতি সুবোধ বলিল—ওকে একটু মানুষ হতে বলুন দিকিনি দিদি···

সৌদামিনী তার জবাব দিয়াছিল,—কেন ভাই, ও তো অমানুষ নয় কোনো দিন!

মন্দাকিনী বলিল—এই যে সিগারেট খাওয়া! মুখে সব সময়ে সিগারেট লেগে রয়েছে! পয়সা-খরচের জন্য বলি না···ওঁর পয়সা যেমন খুশী খরচ করবেন, তাতে আমার কি বলবার আছে! তবে ডাক্তার পই-পই করে মানা করেছে—গলা খারাপ···গলার অসুখ নিত্যি লেগে আছে···ডাক্তার বলে, দিনে চারটি সিগারেট—ব্যস্! তা কে শোনে সে কথা!

সৌদামিনী চাহিল সুবোধের পানে। হাসিয়া সুবোধ জবাব দিল,—ডাক্তারদের কথাই অমনি! ওদের সব কথা শুনতে গেলে বাঁচা চলে না!···সিগারেটে গলার অসুখ হবে, না, হাতী হবে! রাজা-রাণীতে সেই রবিবাবু লিখে গেছেন না, এ শুধু বিজ্ঞের অতি-সাবধান হওয়া? এও তাই।

মন্দাকিনী বলিল,—তার উপর মুখ থেকে কথা যদি খশলো এটা চাই, এটা করতে হবে—তখনি যদি সে-কথা না রক্ষা করা হয়

তো একেবারে তেলে বেগুনে হয়ে ওঠেন! আর সে-সময় কি অকথা কুকথা না বলেন! আমি বাড়ীর গিন্নী···চাকর-বামুনের কাছে আমার মান আছে তো।

মলিন মুখ···মন্দাকিনী নিশ্বাস ফেলিল।

সুবোধ বলিল—একটা দৃষ্টান্ত দাও।

মন্দাকিনী বলিল—সে-দিন ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি এলো···বাইরের ঘরে এঁদের তাসের আড্ডা জমেছে। হুকুম করে পাঠালেন—ফুলুরি-বেগুনি, পাঁপর ভেজে দাও···আর সেই সঙ্গে বেশ মচ্‌মচে লঙ্কা মুড়ি চাই গোটা মেখে! হুকুম শুনে তখনি দীনুকে বাজারে পাঠালুম, কাঁচা-পাঁপর আর মুড়ি কিনতে। ঝীকে বললুম, তু'টি ডাল বেটে দে ভাই ক্ষান্ত··· নিজে বসলুম বঁটি আর আনাজের চুবড়ি নিয়ে···ঠাকুর ধরালে গেল তোলা উনুন।···তা সময় লাগবে তো, ভাই। বাইরের ঘর থেকে ঘন-ঘন হাঁক আসতে লাগলো,—হলো? হলো?···বলে পাঠালুম, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে সব হয়ে যাবে!···এইতেই মেজাজ আগুন! দীনু যেমন বাড়ী ঢুকেছে মুড়ি আর কাঁচা পাঁপর কিনে, তার হাত থেকে সেগুলো ছোঁ মেরে টেনে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলেন! ফেলে দীনুকে টাকা দিয়ে হোটেলে পাঠালেন কতকগুলো চপ-কাটলেট আর পচা ডিম কিনতে!

সৌদামিনী বসিয়াছে 'আরবিট্রেটর'···মন্দার কথা শুনিয়া সুবোধের পানে চাহিল, বলিল,—এ তোমার খুব অন্যায় সুবোধ, সত্যি!

সুবোধ বলিল—কি করবো দিদি? বাইরের ঘরে তাদের কথা যদি শুনতেন!···আমার লজ্জা হলো! সবাই বলবে, সুবোধের বৌটা কাজের মানুষ নয় মোটে! তাই ভেবে হলো রাগ। যত বলি, একটু চটপটে হও···

হাসিয়া সৌদামিনী বলিল—তা বলে যে কাজে সময় না লাগে, তার আগে তা কি করে হয়? তুমি তেল মেখে স্নান করতে যাচ্ছো, তোমাকে যদি কেউ তখন বলে এখনি আপিস যেতে হবে, তুমি কি অমনি সেই তেল মেখেই আপিসে ছুটবে?

সুবোধ এ কথার জবাব দিল না।···

নানা খুঁটিনাটী লইয়া দু'জনে এমনি অনুযোগ-অভিযোগ লাগিয়া আছে সর্ব্বক্ষণ। ভালোবাসা নাই, তা নয়। সে-বারে কলতলায় পা পিছলাইয়া সুবোধ পড়িয়া গিয়াছিল···মন্দার কি উদ্বেগ! কত-খানি দুশ্চিন্তা! ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধ আনাইয়া সেবা-পরিচর্য্যার কি সমারোহ! এক্স-রে পর্য্যন্ত করাইয়া ছিল! তার পর তিন দিন তিন রাত্রি সুবোধকে সে বিছানা হইতে উঠিতে দেয় নাই। নিজেও তার কাছ ছাড়িয়া নড়ে নাই! গল্প বলিয়া, গান গাহিয়া সুবোধের মনোরঞ্জন করিয়াছে!

আবার মন্দার সে-দিন পায়ে গরম দুধ পড়িয়াছিল—ভাবনায় সুবোধের আহার-নিদ্রা কাজ-কর্ম্ম সব বন্ধ। তার পর সে কিনিয়া আনিয়াছে ইলেকট্রিক হীটার এবং এক-রাশ এলুমিনিয়ামের বাসন। মন্দার রান্নাঘরে যাইতে মানা—খবদ্দার! সে-দিন রান্নাঘরে ঢুকিবে···সুবোধ যদি শোনে···তাহা হইলে সারা রাত—তখন শীত-কাল—খালি-গায়ে সে ছাদে পড়িয়া ঘুমাইবে!

বন্ধুরা মন্দার কত সুখ্যাতি করে। বলে, সুবোধকে কি ফিটফাট রাখিয়াছে! বিবাহের পূর্ব্বে সুবোধ কী ছিল···যেন স্কেয়ারক্রো! স্নান করিয়া কোনো দিন মাথায় বাশ চালাইল, কোনো দিন মাথা যেন ঝড়ো কাকের বাসা হইয়া রহিল! তাছাড়া কি রকম বেহু'শিয়ার! মন্দা না থাকিলে সুবোধ যথাসময়ে অফিস করিতে পারিত কি না, সন্দেহ! টাকা হাতে পাইলে সুবোধ চকিতে নানা ভাবে অপব্যয় করিয়া বসে! মন্দা আছে, তাই! নহিলে সংসার-খরচ চালাইবার জন্ম সুবোধকে হয়তো কাবলী-ব্যাঙ্কের শরণ লইতে হইত! অফিসে সুবোধ যায় স্যুট পরিয়া···সে-দিন ধোপদোস্ত স্যুট পরিবে, সেই দিনই দু'ঘণ্টার মধ্যে ট্রাউজারে পাঁচটা ভাঁজ ফেলিয়া ধূলা-কালি মাখাইয়া তার যে ছুরৎ করে, বলিবার নয়! ঘরে মন্দা নিত্য তার ট্রাউজার কাচাইয়া দেয়। সকালে নিজের হাতে সেই কাচা ট্রাউজার ইস্ত্রী করিয়া রাখে।··· টাই? সুবোধ আজো নিজের হাতে টাই বাঁধে না। টাই বাঁধিতে গেলে টানিয়া এমন জোট্‌ পাকাইয়া বসে কার সাধ্য সে জোট্‌ খোলে! তার উপর গলায় যে ঐ পৈতা ঝুলিতেছে, সে পৈতার গ্রন্থি বাঁধিয়া দেয় মন্দা!

মন্দার প্রশংসায় বন্ধুরা পঞ্চমুখ! খাবার-দাবারে নিত্য কি বৈচিত্র্য! এক-খাবার সুবোধ রোজ খাইতে পারে না! উপর্য্যুপরি যদি দেখে, এক···ধোৎ বলিয়া উঠিয়া যায়। মন্দা তাই নিজের হাতে তার জন্ম মুখরোচক বিচিত্র রকমের জল-খাবার তৈরী করে নিত্য।

সুবোধের কাছে বন্ধুবান্ধব আসে প্রত্যহ। আসিলে কোনো ফরমাশ করিবার পূর্ব্বেই বাহিরের ঘরে প্লেট গিয়া হাজির হয়, রকমারি ভোজা—শিকা কাবাব, বেগুনের কাটলেট, ফিশটোষ্ট, চন্দ্রপুলি···গোকুল-পিঠা, মায় হংস-ডিম্ব-ভোজা পর্য্যন্ত। বন্ধুরা খাইয়া তারিফ করে। বলে, বৌকে দিয়ে যদি একটা কাফে খোলো সুবোধ, তাহলে তার রোজগারে তুমি দু'দিনে লাল হয়ে যাবে হে!

মন্দার মনে সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, এ-সব রকমারী খাবার কত রকমে শিখিয়া পড়িয়া সে তৈয়ারী করে, বন্ধুরা খাইয়া এত ভালো বলে···সুবোধও এ-সব খায়···কিন্তু খাইয়া নির্বিকার থাকে। মুখের কথায় কখনো বলে না, চমৎকার হয়েছে গো!

তার উপর গৃহে সে একা। একটি মেয়ে···বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর সেই যে স্বামীর ঘর করিতে গিয়াছে, সে-ঘর হইতে এক-মিনিট বাহির হইয়া আসিয়া মাকে দেখিয়া যাইবে, তার অবকাশ নাই! তাছাড়া জামাই থাকে লক্ষ্ণৌয়ে···আসাও একটুখানি কথা নয়!

মায়ের মন আপনা হইতে সান্ত্বনা খুঁজিয়া লয়। যার জিনিষ, তার কাছেই থাকুক! তবে মায়ের মতো বরাত যেন তার না হয়! তা মেয়ে-জামাইয়ে খুব ভাব···মেয়ের মত না লইয়া জামাই কোনো কাজ করে না।···আর মন্দা?

সুবোধ তাকে মানে না, তা নয়। তবু কি দুর্জ্জয় গোঁ সুবোধের! আর সব-তাতে কি-রকম তাড়া দেয়। মন্দা বসিয়া মাফ্‌লার বুনিতেছে, আর বিশ-পঁচিশ মিনিট বুনিলে কাজটা শেষ হয়···হঠাৎ সুবোধের কি খেয়াল হইল, আসিয়া বলিল—পাঁচ মিনিট সময়···এর মধ্যে তৈরী হয়ে নাও···মোটর ট্রিপ···এখনি··· আসানসোল! মন্দা যদি বলে, আধ ঘণ্টা সময় দাও···লক্ষ্মীটি···ব্যস! অমনি সুবোধের মুখ হইবে হাঁড়ি···রাগিয়া বকিয়া তখনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইবে!

সে-দিন বিবাহের বার্ষিকী···আগে হইতে সুবোধকে বলিয়া কহিয়া রাজী করাইয়াছে দু'জনে সিনেমায় যাইবে···সুবোধ বলিয়াছে, বেশ। কিন্তু সে-তারিখে সন্ধ্যায় অফিস হইতে সুবোধ বাড়ী ফিরিল না···চিঠি পাঠাইয়া দিল, এক বন্ধুর সঙ্গে সে চলিয়াছে বেনারস! এমন তাড়া যে বাড়ী ফিরিয়া কাপড়-চোপড় গুছাইয়া লইয়া যাইবে, তার অবকাশ নাই। লিখিয়া পাঠাইয়াছে, এই লোকের হাতে আমার কাপড়-চোপড় আর বিছানা—হোল্ড-অলে ভরিয়া পাঠাইবে!

এমন কি একটি ঘটনা! বিবাহ হইয়াছে আজ ষোল বছর···! এই ষোল বছরের একশো নিরানব্বই মাসের কোন্ দিনটিতে না দু'জনের মনের মেঘে-মেঘে ঠুকিয়া বজ্র-বিদ্যুতের সৃষ্টি হইয়াছে!

এক দিন সহিয়া আসিয়াছে—নিঃশব্দে। কিন্তু আর পারে না। মনে হয়, সুবোধের চাহিবার আগে নিজেকে এমন নিঃশেষে তার হাতে সঁপিয়া দিয়াছে বলিয়াই সুবোধ তার দাম বুঝিল না···কোনো দিন না। তাই এখন মনে হয়, দু'দিনের জন্যও যদি একবার এ-বাড়ী ছাড়িয়া, সুবোধকে ছাড়িয়া আর কোথাও গিয়া থাকে···

কিন্তু যাইবে কোথায়? মা বাবা ইহলোকে নাই! আছে শুধু এই দিদি···

তাই দিদিকে ধরিয়া বসিল—তোর সঙ্গে আমাকে বসিরহাটে নিয়ে চ' ভাই···দু'দিন সেখানে ঘুরে আসি।

দিদি বলিল—যাবি, চ'! কিন্তু যে-রোগ সারাবার জন্য যেতে চাইছিস, তাতে তো এ রোগ সারবে না ভাই!

মন্দাকিনী বলিল,—তবু···

দিদি বলিল—চ'···

কিন্তু যাওয়া হইল না। এ-দিকে দিদি যাইবে, ও-দিকে সুবোধ আসিয়া বলিল, অফিসের কাজে দু'দিনের জন্য তাকে যাইতে হইবে এলাহাবাদ!

দিদি বলিল—মন্দাকে নিয়ে যাও। ওরও ঘুরে আসা হবে।

সুবোধ বলিল—পাগল হয়েছেন! আমি যাচ্ছি সাহেবের সঙ্গে···

সুবোধ গেল এলাহাবাদ···দিদি বসিরহাট।

দিদির সঙ্গে মন্দার যাওয়া হইল না। কার হাতে বাড়ী ফেলিয়া যাইবে?

সন্ধ্যার সময় কাজ নাই। সব যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে!

পাশের বাড়ীর রেডিয়োতে গান···

তুমি মোর পাও নাই পরিচয়।

তুমি যারে জানো সে-যে কেহ নয়, কেহ নয়॥

নিশ্বাস ফেলিয়া মন্দা খুলিয়া বসিল এ-মাসের 'ধরিত্রী' মাসিক কাগজ। মহিলা-মজলিসের পাতাগুলায় চোখ পড়িল। এ মজলিসে কে-এক সর্ব্বজ্ঞ মহিলা লেখেন স্বামি-স্ত্রীর মনের কথা! সংসারের খুঁটিনাটি কত কথার আলোচনা করেন। কি করিয়া মন-ভাঙ্গা বাঁচানো যায়, পরস্পরের মনের বিরাগ কাটানো যায়···কি করিলে স্বামি-স্ত্রীর মনের অতি-সূক্ষ্ম বিরোধ-ব্যাধিকে ঘোচানো সম্ভব হয়··· এমনি সব কথা।

পড়িতে পড়িতে মনে হইল, এই মজলিসের পরিচালিকা শ্রীমতী অরুন্ধতী সেনকে মনের দুঃখ জানাইয়া বেনামীতে একখানা চিঠি লিখিলে কি হয়? সব কথা লিখিয়া প্রশ্ন করিবে, আমার এ দুঃখ কিসে যায়, দয়া করিয়া বলিয়া দিবেন?···

বসিয়া বসিয়া অনেক কথা ভাবিল। তার পর কাগজ আনিয়া লিখিতে বসিল নিজের মর্ম্মবেদনার সুদীর্ঘ বিবরণ:

লিখিল···

স্বামী দুশ্চরিত্র নন্, বেকার নন্, অমানুষ নন্! আমাকে ভালোবাসেন না কিম্বা অযত্ন করেন, তাও নয়! দুঃখ আমার এই যে তিনিই আমার সব···তাঁর জীবনেই আমার জীবন···তাঁকে দুঃখ দিয়া এক-তিল সুখ আমি কোনো দিন কামনা করি নাই···তাঁকে ছাড়িয়া কোনো দিন আমি এতটুকু সুখ পাই নাই···তবু কেন যে তিনি আমাকে চিনিলেন না। ষোল বছর পাশাপাশি থাকিয়া তাঁর মনে নিজের মন মিশাইয়া এক হইতে গিয়াও তাঁর নাগাল পাইলাম না ইত্যাদি···

লিখিতে লিখিতে লেখা আর থামিতে চায় না! মহাভারতে পড়িয়াছিল, দ্রৌপদীর শাড়ী···মন্দার মনের বেদনা তেমনি লেখনীর মুখে বহিয়া চলিয়াছে অফুরান! চলিয়াছে তো চলিয়াছেই···অবাধে ···বিরামহীন···বিশ্রামহীন···

লিখিতে লিখিতে আঙুল, হাত বেদনায় টনটন্ করিতেছে! ঠাকুর আসিয়া তিন বার তাগাদা দিয়া গিয়াছে, খাবার দেবো না? ঝি ক্ষান্ত আসিয়া বলিয়াছে, ওমা, করছো কি বলো তো? এগারোটা বেজে গেছে। খেয়ে এসে লেখা লিখো গো···

তখন দায়ে পড়িয়া লেখা রাখিয়া মন্দাকে উঠিতে হইল।

খাইয়া উপরে আসিয়াছে, ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। ঘুমে দু'চোখ বুজিয়া আসিতেছে! মন্দা আর লিখিতে বসিল না,— শুইয়া পড়িল।

পরের দিন সংসারের নানা কাজে···সব ধোওয়া-মোছা করানো··· এ-দেওয়ালের ছবি খুলিয়া ও-দেওয়ালে···ও-কোণ হইতে সোফা-কৌচ টানিয়া এ-কোণে···এমনি ভাবে কাজ তৈয়ারী করিয়া সেই কাজে নিজেকে নিমগ্ন করিল। সুবোধ কাছে নাই···সে-শূন্যতা মনে কাঁটার মত বিঁধিয়া আছে।

সন্ধ্যার পর সেই লেখা পড়িতে লাগিল। যেন গল্প পড়িতেছে। এমন করিয়া নিজের দুঃখ গুছাইয়া লিখিয়াছে, আশ্চর্য্য! এত কথাও মনে জমিয়া ছিল···

যেটুকু লেখা হইয়াছে, পড়িল। পড়া শেষ হইলে ভাবিল, এবার? লেখার জের কোথা হইতে ধরিবে, ভাবিতে বসিল। হঠাৎ বাহিরে দুপদাপ শব্দ···

দীনু আসিয়া দেখা দিল···তার মাথায় হোল্ড-অল।

চমকিয়া মন্দা চাহিল দীনুর পানে।

দীনু বলিল—বাবু···

মন্দা বলিল—এসেছেন?

—হ্যাঁ।

আশ্চর্য্য! লেখা রাখিয়া মন্দা উঠিল। ঘরে প্রবেশ করিল সুবোধ। শুষ্ক মলিন মূর্ত্তি।

সুবোধ বলিল—মোটরে করে দিব্যি যাচ্ছিলুম···আসানসোলে এ্যাকসিডেণ্ট! একখানা লরির ধাক্কায় আমাদের গাড়ী অচল

…আমরা খুব বেঁচে গেছি। সাহেব, আমি আর ড্রাইভার। সাহেব বললে, যাত্রা বদলানো উচিত। ট্রেণে চড়ে তাই ফেরত এসেছি…

মন্দা শিহরিয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, বাঁচিয়ে অক্ষত দেহে তুমি ফিরিয়ে এনেছো ঠাকুর, তোমার অনন্ত কৃপা!

স্নান করিয়া সুবোধ বসিয়া আছে—ঘরে ফিরিল মন্দা। গিয়াছিল বামুনকে তাড়া দিয়া খাবার তৈরী করাইতে।

নিজে খাবার আনিয়া সুবোধকে বলিল,—নাও, খেতে বসো!

সুবোধের হাতে মন্দার লেখা মনোবেদনার বিবরণ।

সুবোধ বলিল—এ কি, মন্দা?

মন্দা বলিল—ও কিছু নয়।…রেখে দাও তো! রেখে খেতে বসো।

সুবোধ বলিল—না, আগে বলো, এ কি লিখেছো!

মন্দা বলিল—মাসিকের মহিলা-মনস্তত্বজ্ঞ অরুন্ধতী সেনকে লিখেছি!

সুবোধ বলিয়া উঠিল—ধ্যেৎ তেরি অরুন্ধতী সেন! এ-পাগলামির মানে?

গভীর দৃষ্টিতে মন্দা চাহিয়া রহিল সুবোধের পানে।

সুবোধ বলিল—আমার একখানা ডায়েরি আছে। পড়ে দেখো। তোমার দাম আমি বুঝি না? খুব বুঝি। আমার এত বকুনি এত পীড়ন তুমি সহ্য করো…অথচ এ-লেখায় আমার দোষ দাওনি… নিজের ভাগ্যের নিন্দা করেছো তুমি!

মন্দা ডায়েরি পড়িল…ডায়েরির একটা পাতায় স্বামী লিখিয়াছে,—মন্দা দেবী। এত ভালোবাসা আর কেউ তার স্বামীকে বাসতে পারে না। তবু আমার কি যে স্বভাব! অকারণে রাগ করি…বকি! মন্দা যদি আর পাঁচ জনের মতো উঁচু-গলায় আমার সঙ্গে ঝগড়া করতো, তাহলে আমার এ দোষ হয়তো শোধরাতো। তা সে কোনো দিন করে না। বেচারী নিঃশব্দে আমার এ-পীড়ন সহ্য করে। তার জন্য আমার কি যে মনে হয়… লজ্জায় আমি তার পাশে ঘেঁষতে পারি না! মন্দা এত বড় যে তার পাশে নিজেকে আমার অতি-ছোট মনে হয়! বন্ধুদের দলে মিশে তাই হল্লা করে কোনো মতে সময় কাটাতে ছুটি…

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া মন্দা চাহিল সুবোধের পানে।

সুবোধ তার পানেই চাহিয়া ছিল!

মন্দা কহিল—এ-সব যা লিখেছো…সত্যি?

সুবোধ বলিল—Beauty and the Beast পড়োনি? তোমাদের পেয়ে আমরা পুরুষ ধন্য হয়ে আছি! তোমরা না থাকলে আমরা না পারতুম বাঁচতে, না পারতুম কোনো কাজ করতে…কস্মিন্ কালে মানুষ হতে পারতুম না! অথচ সে জন্য কৃতজ্ঞতা নেই, মমতা নেই…তোমাদের মনের পানে আমরা তাকাই-ও না। তবু সংসার যে চলেছে…সে শুধু তোমরা সহিষ্ণুতাময়ী, মমতাময়ী বলে'! নাহলে আজ এ পৃথিবীর অস্তিত্বও থাকতো না হয়তো মন্দা!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বেকার

মাথা নীচু করে' পথ দিয়ে চলি, তাকাই না কারো পানে—
ছেড়ে দিছি ভাই উঁচু-মুখে কথা বলা—
সে যবে আমার এলো নাকো হায়, আশা রাখি কোন্ প্রাণে!
(প্রেম মানে কি রে শ্রেফ বিরহেতে জ্বলা?)

মনে করেছিনু, শিক্ষিত আমি, পিছনে কেজুড় আছে
ঠোঁটে-মুখে আছে ভয়াবহ বাগ্মিতা—
তাই দেখে' তার তাক্ লেগে যাবে, প্রেম এসে যাবে কাছে,
আপ্‌সে সে মোর ঘরে হবে উপনীতা!

আশায় আশায় রহি বহু দিন, উহু, সে কি যন্ত্রণা,
নিষ্ঠুরা তবু এলো নাকো মোর কাছে,
'রাইভ্যাল্' কেউ 'রাই' বলে' হেসে' দিয়েছে কুমন্ত্রণা;
নহিলে সে কেন আজ-ও দূরে রহিয়াছে?

'আয়' বলি তারে ডাকি স্নেহভরে—'এসো' কহি শ্রদ্ধায়,
'আসুন, আসুন' ডাকি কভু সমাদরে,
তবু তো তাহার মান ভাঙে নাকো, প্রাণ জাগে না'কো হায়,
আমি যে এ দিকে কেঁদে মরি ঘরে-পরে।

চিঠির ওপর চিঠি লিখি রোজ 'মধু ভাষা' ঝেড়ে-ঝুড়ে'
গণ্ডাদশেক চিঠি গেল তার পায়ে—
স্বপনে গোপনে মান ভাঙি—তার পায় মাথাখানা খুঁড়ে
তবু সে আমায় নিল না তো স্নেহ-ছায়ে!

মাথা নীচু করে পথ দিয়ে চলি তাকাই না কারো পানে
ছেড়ে দিছি ভাই উঁচু মুখে কথা বলা—
শ্রীমতী চাকুরী মেরে দিল মোরে চাতুরীর চোখা-বাণে,
কে জানিত তার ছিল এত ছলাকলা!

যুবা-'সুন্দর' 'বিদ্যা'লয়ের বহিরঙ্গনে বাঁধি
মালা-আশে নিতি বাড়ায়ে বক্র গলা—
বিদ্যা আমার মরীচিকাসম তৃষ্ণাতে বাদ সাধি,
শূন্যে সরিল আগায়ে পাক্ কলা!

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায় (এম-এ)

আধুনিক নাটক

আধুনিক নাট্যকার হতে যদি চাও
ষ্টেজ করিতে যদি, চাও ক্যাপ্‌চার
সীকরেট বলে দিই শুন মন দিয়া
দর্শক দেখিবে যাহা উইথ র‍্যাপ্‌চার !

বাংলা নাটকে দাও ইংরেজী বুলি
ফরাসী ল্যাটিন্ হলে আরও ভালো হয় !
সাজগোজ হাব-ভাব সকলই বিলাতী—
সিগারেট, ককটেল ; গড়গড়া নয় !

আমাদের যাহা কিছু সকলই খারাপ
সাবেক-সমাজ ধর্ম্ম সব যাচ্ছে তাই !
ভারতীয় রীতি-নীতি সিলি ! টু ওল্ড।
ডিসকার্ড না করিলে উপায় যে নাই !

যেথা যত ধর্ম্মনিষ্ঠ—দেখাও তাদের
বোকা ন্যাকা হাবা—মানে, স্রেফ ফুলিশ !
সংযম, চরিত্র, ত্যাগ,—গাল-ভরা নাম
কিছু নয়, বুদবুদ ! সকলই র‍্যাবিশ !

নায়িকা রূপসী হবে এবং বিত্তবী
টাকাকড়ি কত তার নাহি অবধি !
সংসার-কাজ সে করিবে না কিছু—
মীটিং, পার্টি লেগে আছে নিরবধি !

স্বামি-সেবা, রন্ধন, সন্তান-পালন
এখনও করিতে হবে ? গ্যাড, ছিঃ ছিঃ !
নারীর নাহি কি কোনো সেল্‌ফ্‌-রেসপেক্ট—
সে তো নহে পুরুষের কেনা বাঁদী ঝি।

ক্ষুদ্র সংসার-গণ্ডী বাঁধিবে না তারে
বিরাট জগৎ আজ দেয় হাতছানি—
ধর্ম্মঘট, ভলান্টিয়ার, নার্স, অ্যাকট্রেস—
কত স্কোপ, কেন রবে সমাজেরে মানি ?

স্বামী শুধু ভারবাহী গর্দ্দভস্বরূপ
খরচ জোগাবার নন টঁাক-যন্ত্র !
এ ছাড়া তাহাদের নাহি অধিকার—
লভিয়াছে নারী এবে নবযুগ-মন্ত্র।

ডেয়ারিং ড্রেস চাই নূতন ফ্যাশন
শিঙ্গল্‌ড্ কেশ আর মুখে সিগারেট—
শ্যাম্পেন, ককটেলস্, ক্যাবারে, রেস্তো
নাইট-ক্লাবে ঘোরাফেরা এই এটিকেট।

স্বামী অতি গোবেচারা নহেক' সে হীরো
নাটকের মাঝে তার পার্ট অতি অল্প—
বস্তা-পচা সেকালের হাবভাব নিয়ে
চলিতে পারে না কভু আধুনিক গল্প।

নাটকে জোগাবো শুধু হাসির খোরাক
এ ছাড়া আর কোন নাহি প্রয়োজন !
স্রেফ বাকুন নহে কোর্ট-ডক্টার
ক্যাবলা চলার ভঙ্গী কথোপকথন।

স্ত্রীর মন বোঝে নাক' একেবারে ক্যাড—
কোন দিন পড়ে নাই ফ্রয়েড, এলিস—
বাঁধো-বাড়ো বলে,—বলে ঘর ঝাঁট দাও !
শুনিবে শ্বশ্রূর কথা ? এতেই ফুলিশ !

পুরাতন যুগে যারা আছিল ভিলেন্
নবযুগে তারা সব বনে গেছে হীরো !
পরদ্রব্য লভিবারে সদাই প্রচেষ্ট—
কারণ তাদের নিজ-রোজগার জীরো !

পরদার তরে মন অতীব চঞ্চল
অবৈধ প্রেম ক্রিয়া রয়েছে ঠৌটস্থ—
কন্টিনেন্টাল প্যাশনেতে মন ভরপুর
আদব-কায়দা সব কেতাব-দুরস্ত !

ঘর থেকে মেয়েদের বরিয়া বাহির
দেখাইয়া দাও সবে স্বাধীনতা-আলো !
এক-পতি নিয়ে থাকা অতীব সেকেলে—
ফ্লার্টেশন ছাড়া দেশ হবে নাক' ভালো !

রিয়েলিজম্ দরকার ভুলাইতে মন
আজিকার আধুনিক দর্শকজনের ;
দান, ত্যাগ, মহত্ত্ব, চীপ সেন্টিমেণ্ট
উন্নতি হয় না কভু তাহাতে মনের !

ওয়াইন্, ওমেন্ অ্যাণ্ড নাচ, গান,
পিচগলা রাস্তা, লাল ঝাণ্ডা, কাস্তে,
মীটিং, ধর্ম্মঘট, ভিখিরীর দল,
গুণ্ডামী, রাহাজানি জমাবার ওয়াস্তে !

ভাসাও করুণ রস প্যাশনের তোড়ে
সম্ভব হয় যদি মেরে ফেল সবারে
বিষ দিয়ে, দড়ি দিয়ে অথবা ছোরাতে
বেটার আত্মহত্যা পিস্তল-ফায়ারে !

যতগুলো পারো দাও চিতাগ্নি সাজায়ে
জুৎসই ষ্টাণ্ট দিয়ে বই কর শেষ—
স্বামী ছেড়ে স্ত্রী মরে লভারের ক্রোড়ে—
বলিবে দর্শকগণ—বেশ ভাই, বেশ !

বিবাহ-মঙ্গল

বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের প্রাণ-সর্ব্বস্ব মাসিক বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা এবং সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত কালে তাঁহার দুই কন্যা— তৃতীয়া কল্যাণীয়া শ্রীমতী ভক্তি এবং চতুর্থী কল্যাণীয়া শ্রীমতী আরতির শুভ-বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন— প্রসিদ্ধ লৌহ-ব্যবসায়ী চন্দননগর-নিবাসী ৺কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মেসার্স কে সি ঘটক এণ্ড সন্স) মহাশয়ের মধ্যম পুত্র ৺আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নির্ব্বাণীতোষের সহিত কল্যাণীয়া শ্রীমতী ভক্তির ; এবং চতুর্থ পুত্র (৺সতীশচন্দ্রের পরম-সুহৃদ্) শ্রীযুক্ত ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ প্রাণতোষের সহিত কল্যাণীয়া শ্রীমতী আরতির বিবাহ। আমাদের দুর্ভাগ্য, বাঁচিয়া থাকিয়া তিনি এ-বিবাহ দিয়া যাইতে পারেন নাই। সম্প্রতি তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা ইন্দুপ্রভা দেবী স্বামীর সে অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। ১০ই শ্রাবণ তারিখে শ্রীমান্ নির্ব্বাণীতোষের সহিত শ্রীমতী ভক্তির এবং ১২ই শ্রাবণ তারিখে শ্রীমান্ প্রাণতোষের সহিত শ্রীমতী আরতির শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমান্ নির্ব্বাণীতোষ এবং শ্রীমান্ প্রাণতোষ— দু'জনেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্র।

পরিণয়-সূত্রে এই দুই সম-প্রাণ মিত্র-পরিবারে যে শুভ-মিলন— এ-মিলনে আমরা যেমন তৃপ্তি লাভ করিয়াছি, ৺সতীশচন্দ্রের স্বর্গীয় আত্মাও যে তেমনি পরিতোষ লাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে এতটুকু সংশয় নাই। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপাসিদ্ধ ৺উপেন্দ্রনাথ এবং ৺সতীশচন্দ্র— ইঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ-ধারায় এই তরুণ দম্পতি-গণের জীবন শান্তি-সুখময় হোক— আয়ু দীর্ঘ-নিরাপদ হোক! তাঁহাদের মিলিত সেবায় বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির মহিমায় মণ্ডিত হোক, ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল হাসপাতাল

[স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত]

বসুমতীর স্বত্বাধিকারী ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদরিণী বিদুষী কন্যা প্রীতি দেবী তরুণ বয়সে নিদারুণ টাইফয়েড্ রোগে অকাল-মৃত্যুর কবলে পতিত হন। ইহারই কিছু কাল পরে তাঁহার একমাত্র পুত্র বাঙ্গালার কৃতী সন্তান সর্ব্বগুণান্বিত রামচন্দ্র মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে ঐ দুর্দ্দান্ত টাইফয়েড রোগেই বংশ-দীপ নির্ব্বাপণ করিয়া মহাপ্রয়াণ করেন।

পুত্রকন্যার দুঃসহ শোকে কাতর সতীশচন্দ্র এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী সে দিন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, টাইফয়েড্ রোগ-আরোগ্যকর ঔষধ আবিষ্কারার্থে বিশেষ গবেষণার জন্য তাঁহারা এক অনুশীলনাগার স্থাপন করিবেন এবং টাইফয়েডে আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য একটি পৃথক্ হাসপাতালও ঐ সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করিবেন।

সন্তানগতপ্রাণ সতীশচন্দ্র মর্ম্মান্তিক পুত্রশোক সহ্য করিতে পারেন নাই। অল্প দিনের মধ্যে তিনিও অসময়ে স্বর্গত পুত্রকন্যার অনুবর্ত্তী হন। আপনার মনের মহৎ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইবার অবকাশ তাঁহার হয় নাই।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্রের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা ইন্দুপ্রভা দেবী পরলোকগত স্বামীর অপূর্ণ অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। শুঁড়ার বেঙ্গল মেডিকাল ইনষ্টিটিউট্ হাসপাতালটিকে আনুমানিক ছয় লক্ষ টাকা দান করিয়া তিনি তাঁহার পূজ্যপাদ শ্বশুর ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামে তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ৺সতীশচন্দ্রের পুত্র ৺রামচন্দ্র ও কন্যা ৺প্রীতি মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-রক্ষার্থে এই উপেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতালে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য একটি টাইফয়েড্-ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মারাত্মক টাইফয়েড্ রোগের প্রতিষেধক (টীকা) আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার আরোগ্যকর ঔষধ আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই ঔষধ আবিষ্কারের জন্য ঐ হাসপাতালে বিশেষ ভাবে একটি রিসার্চ্চ ল্যাবরেটরী থাকিবে।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থ-পরিবারের পক্ষে টাইফয়েড্ রোগের ব্যয়বহুল চিকিৎসা ও শুশ্রূষা প্রায় সাধ্যাতীত। বিপদে তাঁহাদের সাহায্য-কল্পেই এই হাসপাতালে টাইফয়েড্ রোগীদের বিনামূল্যে বিশেষ যত্নে শুশ্রূষা, চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার ইন্‌জেক্শন ও ঔষধাদির ব্যবস্থা থাকিবে।

সাধারণতঃ হাসপাতালে রোগী পাঠাইতে অনেকেই ভীত হন! হাসপাতালে বিনা ব্যয়ে অবস্থিত রোগীদের যথোপযুক্ত যত্ন ও চিকিৎসা হয় না ইহাই অনেকের ধারণা। উপেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতালে বিনা ব্যয়ে অবস্থিত রোগিগণ যাহাতে সর্ব্বপ্রকার যত্ন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসায় থাকিতে পারেন, তাহার সুব্যবস্থা হইবে। আশা করি, এই হাসপাতালে সর্ব্বশ্রেণীর বাঙ্গালী ভদ্র-পরিবার রোগী পাঠাইতে দ্বিধা করিবেন না। তাঁহাদের সহযোগিতায় হাসপাতাল স্থাপনের সদুদ্দেশ্য সফল হইবে।

এই আরোগ্য-ভবন হইতে বাঙ্গালার কয়েকটি কিশোর প্রাণও যদি দুরন্ত টাইফয়েডের গ্রাস হইতে রক্ষা পায়, কয়েকটি পরিবারেও যদি নিদারুণ শোকের অন্ধকার ঘনীভূত না হয়, তাহা হইলেই আরোগ্যভবনস্থাপয়িত্রীর চেষ্টা ও দান সার্থক হইবে এবং তাঁহার দুঃসহ শোকে তিনি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিবেন আশা করা যায়।

রহস্যময়ী প্রকৃতি ও বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান

আমরা নিত্য দেখছি জগতে জীব জন্ম নিচ্ছে—ধীরে ধীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পূর্ণতা লাভ করছে। প্রত্যেক জীবের জীবনে দেখি শৈশব, তার পর কৈশোর; অঙ্গে অঙ্গে অপূর্ব্ব লালিত্য, গতি-ভঙ্গিমায় চাঞ্চল্য, মনে-প্রাণে পুলকের হিল্লোল। তার পর কৈশোরের চাঞ্চল্য মন্দীভূত হয়ে আসে, দেহে-মনে আসে বিপুল পরিবর্ত্তন। দেহের দুকূল ছাপিয়ে জাগে যৌবনের পূর্ণ জোয়ার। কিশলয়ের মত লীলায়িত তরুণীর তনু কোমল অথচ কঠিন, নিটোল, সুঠাম। অঙ্গে-অঙ্গে যৌবনের অপূর্ব্ব দীপ্তি। রক্ত-মাংসের মানবীকে দেখে মনে হয় নিপুণ ভাস্করের রচিত মর্ম্মর-মূর্ত্তি! তার পর আসে তার ফোটবার দিন, সৌরভ-বিকিরণের সেই পরম লগ্ন। ষোড়শ বসন্তের স্পর্শে দেহের কানায়-কানায় পরিপূর্ণ পরিপুষ্ট যৌবন—তার মাধুর্য্যে পুলকিত হয় কত নর-নারী, রূপায়িত হয় কত শিল্পীর স্বপ্ন, প্রেরণা পায় কত কবি। তার চোখের চাহনির আশায় চেয়ে থাকে কত ব্যাকুল দৃষ্টি, মুখের একটি কথা শোনবার জন্য আকুল কত তরুণের কাণ, তার কবরীর কেশ-গন্ধ উতলা করে তোলে কত যুবককে।—সে কি থাকবে চিরদিন এমনি সুন্দর, এমনি পাগল-করা রূপ-যৌবনের অধিকারিণী? না। ফুলের সৌরভ বিকিরণের পর আসে তার বিদায়ের বেলা। মৃদু-মন্দ হাওয়ায় একটি দুটি করে ঝরে পড়ে তার পাপড়িগুলি ধূলির উপর! যার একটু সুগন্ধে পাগল হয়ে ছুটে আসতো কত মুগ্ধ পথিক, আজ তার ম্লান পাপড়ি ধূলায় বিলুণ্ঠিত, নিষ্পেষিত তাদেরই পায়ের তলায়! ফিরেও কেউ একবার সে দিকে তাকায় না। তরুণীর রূপের জোয়ারে পড়ে ভাঁটা, সৌরভ যায় দিনে দিনে লুপ্ত হয়ে। যৌবনের লালিমা ও দীপ্তি দিনে দিনে যায় মুছে, "মদালস-গামিনীর" গতিতে দেখা দেয় অসংলগ্ন শৈথিল্য! তৈলহীন দীপশিখার মত মনের সমস্ত পুলক, আশা, উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা আসে দিনে-দিনে ম্লান হয়ে; প্রৌঢ়ত্ব এসে দেখা দেয় যৌবনের স্থানে। লোলচর্ম্মে দেখা দেয় অসংখ্য কুঞ্চন, কেশে দেখা দেয় রৌপ্যের শুভ্রতা। এক দিন যারা তার কাছে প্রার্থী হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে,—আজ তারা উপেক্ষা-ভরে চলে যায়। তার পর আসে অন্ধকারময় এক বিরাট অবসর—তার বিচিত্র প্রলেপে মুছে যায় পৃথিবীর সমস্ত উপেক্ষা, অনাদরের ক্ষত, তার মায়া-কাঠির স্পর্শে মায়ের ক্রোড়ে শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়ে সমস্ত শক্তি! থাকার মধ্যে থাকে শুধু অতীতের জরা-জীর্ণ খোলস,—পৃথিবীতে যার সমস্ত প্রয়োজন গেছে শেষ হয়ে।

জন্ম, যৌবন ও মৃত্যু—এ তিনটি জিনিস এত সাধারণ ও স্থির যে, সকলেই এ-তিনটিকে প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার বা নিয়তি বলে ধরে নিয়েছে। সকলেরই ধারণা, এই নিয়তির উপর কলম চালাবার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা এ ধারণার মূলে বেশ কঠিন কুঠারাঘাত করেছেন এবং বহু পরীক্ষায় তাঁরা প্রমাণ করেছেন,—জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বলে মানব অনেক ক্ষেত্রে নিয়তি-প্রকৃতির উপর কলম চালাতে পারে। তবে জন-সাধারণ এখনও নির্ব্বিবাদে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি।

তার কারণ একাধিক। জনসাধারণ বলতে যা বোঝায় তাতে অনেক শ্রেণীর লোক আছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিজ্ঞানের জ্ঞানবঞ্চিত। তাই তাদের কাছে বৈজ্ঞানিকের ভাষা দুর্ব্বোধ্য। অথচ এই জগতের চলা-ফেরার প্রত্যেক পদে, প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণে, একটির পর একটি কথার সুসম্বদ্ধ সংস্থানে আগাগোড়া রয়েছে বিজ্ঞান। শিশুর অর্থহীন শব্দোচ্চারণ, তার পর প্রথম আধ-আধ উচ্চারিত কল-কাকলি, তার পর সু-উচ্চারিত কচি মুখের স্পষ্ট মিষ্ট কথা; হামাগুড়ি টানতে টানতে অনেক ওঠা-পড়ার পর দাঁড়াতে শেখা—এ সবের মূলে আছে বিজ্ঞান। এ বিশ্বে প্রতিনিয়ত যা কিছু হচ্ছে, তার কার্য্য-কারণের মূলে যে সত্য নিহিত রয়েছে, সে হলো বিজ্ঞান। জ্ঞানের দ্বারা ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক সত্যের কার্য্য-কারণ নির্ণয় এবং সম্যক্‌রূপে এর উপলব্ধির নাম বিজ্ঞান। এক কথায়—বিজ্ঞান হলো সুসম্বদ্ধ জ্ঞান (Systematised knowledge)। সাধারণ মানুষে আর বৈজ্ঞানিকে পার্থক্য এই যে, সাধারণ মানুষ প্রাকৃতিক সত্য সম্বন্ধে নিজের প্রত্যক্ষ-লব্ধ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে দৈনন্দিন জীবন যাপন করে। গায়ে ঘাম হলে বাতাস পেলে গা বেশ ঠাণ্ডা হয়,—কাজেই গরম বোধ হলে বাতাস চাই। এই হলো সাধারণ লোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে পার্থিব-জ্ঞান। বৈজ্ঞানিক বললেন, বাষ্পীয় ভাব (Evaporation) বশতঃ যে অংশ হতে জল বাষ্পীভূত হয়, সেই ক্ষেত্র ঠাণ্ডা হয়। তিনি এই সত্য প্রয়োগ করে বরফ তৈয়ারীর উপায় উদ্ভাবন করলেন। এ দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রত্যেক লোকই বৈজ্ঞানিক। তবে তাতে আর প্রকৃত বৈজ্ঞানিকে পার্থক্য এই যে, বৈজ্ঞানিক শুধু তথ্য আবিষ্কার করেন, তাঁর উদ্ভাবনীশক্তি প্রয়োগ করে একের সঙ্গে আর এক যোগ করে কিম্বা এক হতে আর এক বিয়োগ করে নতুন অজ্ঞ সত্য আবিষ্কার করেন। সাহিত্যই বলুন, দর্শনই বলুন আর কাব্যই বলুন, সবের মূলে বিজ্ঞান অন্তর্লীন রয়েছে। বিজ্ঞান ব্যতীত কোন-কিছু সৃষ্টিই সম্ভব নয়। চিত্রকরের বা কবির কল্পনা যতক্ষণ মনের গহনে ভাব-রাজ্যে থাকে, ততক্ষণ তা কল্পনা, কিন্তু চিত্রকর তুলি ধরে মনের কল্পনা চিত্রে, মাটির উপর রং দিয়ে যখনই বাস্তব জগতে ফুটিয়ে তুলতে শুরু করেন, তখনই তিনি নিলেন বিজ্ঞানের সাহায্য। বিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত তাঁর পক্ষে নিজেকে প্রকাশ করা অসম্ভব। কবিও ঠিক এমনি তাঁর কল্পনা কাগজ-কলম ধরে যেই লিখতে শুরু করলেন, অমনি তিনি হলেন বিজ্ঞানের শরণাপন্ন। কাব্যের সুসম্বদ্ধ ছন্দ মাত্রা—সবই হলো বিজ্ঞানের আবিষ্কার। সঙ্গীতের যে সুসংবদ্ধ লয়, তান—তাও হলো এই বিজ্ঞান-প্রসূত। কাজেই বিজ্ঞান জগতের বহির্ভূত একটা বিচিত্র কিছু নয়; জীব-জগতের প্রত্যেক কার্য্য-কারণে বিজ্ঞান রয়েছে ওতপ্রোত হয়ে।

নির্দ্দিষ্ট একটি বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন,—অভিপ্রেত বস্তুটি যতক্ষণ তিনি না পান, ততক্ষণ চলে তাঁর গবেষণা। অনেক সময় বৈজ্ঞানিক অভিপ্রেত বস্তুটির পরিবর্ত্তে পান সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত অন্য বস্তু। অনেক সময় অভিপ্রেত বস্তু পাওয়ার পরেও অপরাপর বস্তু আবিষ্কৃত হয়। আবার অনেক সময় আদৌ তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। আবিষ্কার করেই বৈজ্ঞানিক আনন্দ পান,—কোথায় কোন্ নরাধম তাঁর অতি মূল্যবান আবিষ্কার কোন মারণ-অস্ত্র-নির্ম্মাণে ব্যবহার করবে, তা ভেবে তিনি নিরস্ত থাকেন না;

বা এই রকম অপপ্রয়োগের জন্য তিনি দায়ী নন। এখন হিটলারের দেখাদেখি বিশ্বের প্রত্যেক শক্তিই চলেছে স্ব স্ব মারণাস্ত্র নির্ম্মাণ করে'; এটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। প্রকৃতির ধর্মই হলো, যে যেমন দেখাবে তাকে তেমনি দেখতে হবে। "Every action has a reaction." "Non-violence বলে প্রকৃতির কোথাও কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। আপনি মাটিতে পদাঘাত করুন—যত জোরে আপনি আঘাত করবেন, মাটীও তত জোরে আপনার পায়ে প্রত্যাঘাত করবে। জড়েরই যদি ধর্ম্ম হয় এই, জীব-জগতের তাহলে কথাই নেই। একটি বিছুটী গাছকে খোঁচা দিতে গেলে, আঙ্গুলে অতি সূক্ষ্ম সিলিকার (silica) কাঁটা ফুটে যাবে, ভগ্ন কাঁটা থেকে ফরমিক্ য়্যাসিড বেরিয়ে দেহে তীব্র জ্বালার সৃষ্টি করবে। কোমল-দর্শন কচুর একটি ডাঁটা ভাঙ্গতে যান, তার রস থেকে 'র‍্যাফাইড্ (raphide) ও স্ফিয়্যাফাইড (sphaeraphide crystal) ক্রিষ্টাল আঙ্গুলে ফুটে চিড়-বিড় করবে। লজ্জাবতী লতা,—যে লজ্জাশীলা নারীর আঙুলের কোমল স্পর্শেও লজ্জায় নুয়ে পড়ে—তারও আচরণ দেখুন—লজ্জায় নুয়ে পড়লেও সে কাঁটার আঘাত দিতে ছাড়ে না। আমরা যাদের নিতান্ত অসহায় জড় তরুলতা বলি, তাদের আচরণ এই; জীব-জগতের অতি ক্ষুদ্র পিপড়ের বাসায় আঘাত করলে এক মুহূর্ত্তে অজস্র পিপড়ে বেরিয়ে এসে আততায়ীকে তীব্র দংশনের জ্বালায় অস্থির করে দেয়; মৌচাকে একটু হানা দেওয়া যাক, নিমেষে অসংখ্য মৌমাছি এসে দংশনে ক্ষতবিক্ষত করে বিষ-জ্বালায় জর্জ্জরিত করে দেবে,—কাজেই একটা জাতিকে লাঞ্ছিত, অপমানিত, নিপীড়িত করলে সেই বা কেন স্থির হয়ে আঘাত সয়ে বসে থাকবে? সমগ্র জগতেই যখন আঘাতের প্রত্যাঘাত আছে,—এখানেও তখন তার ব্যতিক্রম কেন হবে? স্বার্থপর হিটলার শত সহস্র নর-নারীকে ধ্বংস করে তার মারণাস্ত্র চালিয়ে দেশের পর দেশ, নগরের পর নগর, গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে অধিকার করে চলে, তার মারণাস্ত্রের প্রত্যুত্তর দিতে আত্মরক্ষা করতে অপর জাতিরাই বা কেন মারণাস্ত্র নির্ম্মাণ করবে না? "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই যদি হয় সৃষ্টির নিয়ম, তাহলে আত্মরক্ষার জন্য যে জাতি বিজ্ঞানের শক্তি প্রয়োগ করে মারণাস্ত্র নির্ম্মাণ করছে তাদের আদৌ দোষ দেওয়া চলে না। দানবের গ্রাস থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে এ প্রচেষ্টা চলবে,—যত দিন না হবে সেই নর-দানবের বিনাশ। কাজেই তার জন্য বৈজ্ঞানিককে কোন মতেই দোষ দেওয়া চলে না। প্রথম যে শঠ, সুবিধাবাদী নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য করেছে বৈজ্ঞানিক সত্যের অপপ্রয়োগ, অপমান—এ দোষ তার, বৈজ্ঞানিকের নয়। এক জন নরাধম পাষণ্ডের জন্য সমস্ত বিশ্বের বৈজ্ঞানিককে দোষী করা মোটেই সঙ্গত নয়।

বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের কল্যাণে আজ সুদূর ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে যা হচ্ছে, আমরা ঘরে বসে রেডিও-যোগে তা জানতে পাচ্ছি, —টেলিভিশনের কল্যাণে সেখানকার নেতাদের চিত্র, রাসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষু জার্ম্মাণ সৈনিকদের মুখের সামনে 'মাইক' (Mike) ধরে তাদের গৃহের স্ত্রী, মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যাদিগকে তার শেষ বাণী শোনাবার ও বলবার ইচ্ছা জানানোর ব্যবস্থা আছে। কোন এক নিরাপদ স্থান হঠাৎ শত্রুর করলে পড়বার উপক্রম হলে সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেন-যোগে দেশের বড় বড় নেতা, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, কবিদের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুরক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে দেশকে সমূহ ক্ষতির হাত থেকে অনেকখানি বাঁচানো সম্ভব। বিজ্ঞানের কল্যাণে দুর্গম, জনমানবশূন্য শ্বাপদসঙ্কুল বন, জঙ্গল, বিরাট মহাসাগর অতিক্রম,—কত কত মাসের পথ,—মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্ভব হয়েছে। এ দিকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিকে চেয়ে দেখুন,—যক্ষ্মা টিউবারকুলসিসের মত মারাত্মক ব্যাধি,—এক্স-রে (x-ray) প্রয়োগে আজ ভালো হচ্ছে। দুর্ব্বল ফুসফুসবিশিষ্ট সমূহ লোককে artificial respiratonয়ের সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। যারা আজন্ম বামন, তাদের হরমোন্ (Hormone) প্রয়োগে স্বাভাবিক মানষে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে। যারা জন্ম-নির্ব্বোধ, তাদের বিশেষ হরমোন্-প্রয়োগে স্বাভাবিক করে তোলা হচ্ছে। বিজ্ঞান বন্ধ্যাকে প্রজনন-শক্তি দিতে সমর্থ হয়েছে, গ্রন্থি-সংযোজন দ্বারা বৃদ্ধকে নব-যৌবন দিতে সমর্থ হয়েছে। ভাঙ্গা অস্থিতে লোকের সুস্থ অস্থি সংযোগ করে অঙ্গ স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়েছে। দুর্ঘটনায় দেহের কোন স্থান থেকে মাংস নষ্ট হয়ে গেলে,—সেখানে মাংস জোড়া সম্ভব হয়েছে। এক জনের দেহ থেকে অপরের দেহে রক্ত সঞ্চারের (Blood transfusicn) যুগান্তকারী উপায় আবিষ্কারের কল্যাণে আজ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শত শত মুমূর্ষু সৈনিক পুনর্জীবন লাভ করছে।

জীবনের প্রতি পাদক্ষেপেই আছে পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়া বা না হওয়া নিয়ে চলেছে জীবনের গতি। ছাত্র একবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হলে ফিরে-বার সে কৃতকার্য্য হতে পারে,—কিন্তু জীবের হৃদ্-যন্ত্র এমন যে, একবার 'ফেল' করলে চিরদিনের জন্যই সে 'ফেল' হয়। তাকে আর কেউ "পাশ" (pass) করাতে পারে না! কিন্তু মানুষের এ বদ্ধমূল ধারণাও আজ শিথিল হতে বসেছে। ক'জন বৈজ্ঞানিক এই রকম ফেল-হওয়া হার্টকেও 'পাশ' করাতে বা তার স্থলে নতুন হৃদ্‌যন্ত্র সংযোগ করে মানুষকে আবার বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন! আশা হয়, পরবর্ত্তী শতাব্দীতে বাহির থেকে গ্রন্থি-সংযোজনা (gland grabbing) অস্থি-সংযোজনা (bone grabbing), একের দেহ থেকে অপরের দেহে রক্ত-সংক্রমণ (blood transfusion) প্রভৃতির মত, বাহির থেকে নতুন হৃদ্‌যন্ত্র সংযোগের বহুল প্রচলন হবে। টিসু-কালচার (tissue-culture) পরীক্ষায় দেখা গেছে, দেহ থেকে পৃথক্ করে তুলে নেওয়া একটি হৃদ্‌যন্ত্রের পেশীর টুকরো, (a piece of heart tissue) বা ফুসফুসের (lung) বা যকৃতের (liver) টুক্‌রো সুদীর্ঘ কাল ধরে বাঁচিয়ে রাখা যায়। শুধু ঐ টিসুর' (tissue) টুকরো বাঁচিয়ে রাখাই সম্ভব হয়নি, জীবন্ত দেহে সংলগ্ন থাকার মত তার কোষসমূহ পুনঃ পুনঃ নিজ দেহ ভাগ করে 'টিসুর' পিণ্ডটিকে আয়তনে বাড়িয়ে চলে। দশ বছর ধরে এমনি এক টুকরো টিসুকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। আজ যেমন করে টিসু কাল্‌চার এক্‌স্‌পেরিমেন্টে নানা রকম 'টিসুকে' বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে, তেমনি করে সদ্য-মৃত লোকের দেহ থেকে নেওয়া হৃদ্‌যন্ত্রকেও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। আজ যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষু রোগীর প্রাণরক্ষার জন্য সুস্থ লোকের দেহ থেকে রক্ত নিয়ে সঞ্চয় করে রাখা হচ্ছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তা দিয়ে শত শত মুমূর্ষু সৈনিকের প্রাণ-রক্ষা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে এমন এক দিন আসবে, যখন দুর্ঘটনা

ফলতঃ যারা যাচ্ছে—শরীরে কোনো রোগ নেই—এমন সুস্থ লোকের দেহ থেকে হৃদ্‌যন্ত্রগুলি তুলে নিয়ে মোটর-গাড়ীর spare-parts-এর মত সযত্নে 'টিসু-কালচার' যন্ত্রের রেফ্রিজারেটরে (refrigerator) সংরক্ষিত থাকবে এবং সেগুলি রোগ-গ্রস্ত হৃদ্-যন্ত্র বা আকস্মিক দুর্ঘটনায়-বন্ধ-হওয়া হৃদ্‌যন্ত্র তুলে তার স্থানে সংযোগ করে রোগীকে পুনর্জীবন দেওয়া সম্ভব হবে। এ দিন অবশ্য অচিরাগত। করোনেট্ (Coronet) নামক একখানি অতি আধুনিক পাশ্চাত্য পত্রিকায় ক'বছর আগে একটি সন্দর্ভে দেখেছিলাম, মৃত্যুর ক'মিনিট পর বৈজ্ঞানিকেরা মানুষের হৃদ্‌যন্ত্র আবার চালাতে পেরেছেন, তারই বর্ণনা। হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হওয়ার দশ মিনিট পরেও তাকে চালান সম্ভব হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, জীব মাত্রেরই পরমায়ু বাড়ানো সম্ভব। দেহের প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতির প্রতি যত্নবান হলে প্রত্যেক যন্ত্রের প্রয়োজনীয় খাদ্য অনুরূপ মাত্রায় পেলে, পরিবেশের আলো, বাতাস, রোদ, জল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির মাত্রা বর্দ্ধিত হলে দেহের প্রত্যেক যন্ত্রের প্রয়োজনীয় খাদ্যে খাদ্যপ্রাণ-বস্তু (vitamin) বাড়িয়ে বাহির থেকে প্রয়োজনীয় হরমোন্ (hormone) প্রয়োগ করে এবং সর্ব্বোপরি দেহের প্রত্যেক যন্ত্রের কার্য্যের সীমার প্রতি নজর রেখে,—অর্থাৎ যে পেশী বা যে যন্ত্র যতখানি কাজ করতে পারে, তাকে তার বেশী কাজ করিয়ে অতিরিক্ত ক্ষয় না করে এবং উপযুক্ত বিরাম দিয়ে পরমায়ু বাড়ানো যেতে পারে। প্রয়োজনীয় খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ (vitamin) বাড়িয়ে যে মধুমক্ষিকার স্বাভাবিক পরমায়ু ছ'মাস—তাকে ছ'বছর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে; যে মৌমাছির দৈর্ঘ্য দেড় সেন্টিমিটার, এ পরীক্ষায় তার দৈর্ঘ্য হয়েছে প্রায় সওয়া দুই সেন্টিমিটার। এই রকম বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার ফল মানুষে প্রয়োগ করলে যে তারও আঙ্গিক পরিমাপ (proportion) ও পরমায়ু বর্দ্ধিত হবে, সে বিষয়ে সংশয়ের কি কারণ থাকিতে পারে?

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা উচ্চ স্তরের জীব-দেহে কতকগুলি গ্রন্থি আবিষ্কার করেছেন; এগুলির নাম "নালী-বিহীন গ্রন্থি" বা এনডোক্রিন্ গ্লাণ্ড (Ductless gland or Endocrine gland)। সমগ্র দেহের যাবতীয় জটিল কাজ মুখ্যভাবে বা গৌণভাবে এরা প্রভাবিত করে থাকে। প্রাণিদেহে নিত্য যে ক্রম-পরিণতি, পূর্ণতা, যৌবনের বিকাশ, যৌবনের তিরোধান ও বার্দ্ধক্যের আগমন—এ সবই নির্ভর করে এই নালীবিহীন গ্রন্থিগুলির রস-ক্ষরণের তৎপরতার উপর। স্ত্রী ও পুরুষের লিঙ্গ-নির্ণয়েও (Sex determination) ইহাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। আমাদের ধারণা, পুরুষ হয়ে যে জন্মেছে, সে আজন্মকাল পুরুষ এবং নারী হয়ে যে জন্মেছে, সে আজীবন নারীই থাকবে এ ধারণা আজকাল শিথিল হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সীমারেখা টানা আদৌ সহজ নয়।

স্ত্রী-শিশু ও পুরুষ-শিশু বাহির থেকে দেখতে বিভিন্ন রকমের হলেও কৈশোর পর্য্যন্ত তাদের উপর স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গেরই (Sex) প্রভাব থাকে প্রবল এবং উভয় লিঙ্গের সমস্ত লক্ষণগুলি পাশাপাশি বিরাজ করে। তার পর প্রথম যৌবন (Puberty) বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে লিঙ্গের গ্রন্থিরসের ক্ষরণ বেশী হয়, সন্তানের আকার অবয়ব মানসিক বৃত্তি হয় সেই লিঙ্গের মত। এ ক্ষেত্রে জনৈক বৈজ্ঞানিকের উক্তি উদ্ধৃত করতে বা'ধ্য হলাম,—"A person who has distinctively male organs externally can have the gland balance of a female and developes the 'secondary sexual characters' of a woman' দুই জাতীয় বিপরীত ধর্ম্মে গ্রন্থিরসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। যে রসের মাত্রা প্রাধান্য লাভ করে, সন্তান সেই লিঙ্গের যাবতীয় লক্ষণ পরিগ্রহ করে।

সে দিন আমেরিকায় গ্রেট্‌না বলে একটি মেয়ে,—বয়স প্রায় এগার-বারো—হঠাৎ রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ে; তার পর হাসপাতালে ডাক্তার তার দেহে অস্ত্রোপচার করবার জন্য তাকে নিরাবরণ করেই অবাক! মেয়েটি সম্পূর্ণরূপে ছেলেতে পরিণত হয়েছে! এ রকম ঘটনার কথা আজকাল প্রায় শোনা যায়। আগে লোকে এ জাতের কথা শুনলে বিশ্বাস করতো না, কিন্তু আজকাল লোকে বিশ্বাস ত করেই এবং এতে খুব বেশী আশ্চর্য্যও হয় না! কয়েক বছর পূর্ব্বে পাটনায় এক বিবাহিতা মেয়ে হঠাৎ রাতারাতি ছেলে হয়ে গিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে মারপিট আরম্ভ করেছিল।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বেসিল্‌কা-ষ্টায়ানফ নামে বুলগেরিয়ার এক ব্যাঙ্কের মেয়ে-কেরাণী—বয়স প্রায় ষোল, দেহে ও মনে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন অনুভব করে। ডাক্তারকে লক্ষণের কথা খুলে জানালে ডাক্তার তার দেহে "অপারেশান্" করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে যায় ছেলে "ব্যাসিল্‌কো"। ব্যাসিলকা মেয়ের পেটিকোট গাউন ছেড়ে পুরুষের টাউজার-সার্ট পরে নিয়মিত ভাবে গোঁফদাড়ী কামিয়ে দিব্যি যুবা হয়ে অফিসে বেরুতে লাগলো, ব্রিচেস (breaches) পরে ঘোড়ায় চড়তে লাগল, পূর্ণমাত্রায় পুরুষের খেলাধূলায় যোগ দিতে লাগল। দীর্ঘ চার বছর ধরে সে পুরুষের পোষাক-পরিচ্ছদ পরে পুরুষের জীবন যাপন করলো; তার পর হঠাৎ এক দিন কেমন মানসিক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। বাইরে পুরুষের জীবনই শুধু সে যাপন করেনি, একটি মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিয়েও করেছিল। ডাক্তারের কাছে গিয়ে সে বল্লে,—"ডাক্তার, ক'দিন পর একটি কি বিশ্রী মানসিক অস্বস্তি বোধ করছি,—আমার সার্টের তলায় মেয়েদের সেই উৎপাত দু'টো আবার দেখা দিচ্ছে। আর পুরুষের পুরুষালি ভাবে মন ভরে গ্যাছে।" ডাক্তার বল্লেন—"আমার মনে হয়, তোমার পক্ষে আবার মেয়ে হয়ে যাওয়াই ভালো। কি বলো?" এই বলে তিনি ব্যাসিল্‌কোকে রাজী করিয়ে তার দেহে অস্ত্রোপচার করলেন এবং ব্যাসিলকো অকস্মাৎ যেমন পুরুষ হয়েছিল তেমনি অকস্মাৎ আবার নারী হয়ে গেল,—অর্থাৎ আবার সে হয়ে গেল "ব্যাসিল্‌কা"। দু'বছর সে মেয়ে হয়ে রইলো। এই সময়ে সে একাধিক ছেলেকে বিয়ে করতে চায়। বাইশ বছর বয়সে ব্যাসিলকা আবার এক দিন হঠাৎ তার দেহে পুরুষালী ভাবের লক্ষণ দেখতে পেলো। মুখে আবার গোঁফ-দাড়ির রেখা; "অপারেশন"-দ্বারা সে আবার পুরুষ অর্থাৎ "ব্যাসিলকো" হলো। পূর্ব্বে সে একাধিক ছেলেকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কেউ তাতে রাজী হয়নি, এবার সে ছেলে হয়ে আগেকার মত আবার একাধিক মেয়ে-বন্ধুর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে। কিন্তু সকলেই তাকে প্রত্যাখান করলো। বেচারী! তার ডাক্তার তাকে বলেছিলেন,—"ব্যাসিলকা, তুমি যা আরম্ভ করেছ, ভাগ্যিস্ কেউ তোমার বিয়ে করেনি। তোমাকে যে-

বিয়ে করবে সে নিশ্চয় পাগল হয়ে যাবে।" আজকাল পৃথিবীর নানা স্থান থেকে এ-জাতের ঘটনার কথা নিত্য শোনা যাচ্ছে।

য়্যাডরেণাল গ্লাণ্ডের (adrenal gland) বাহিরের অংশে "টিউমর" (tumor) হওয়ায় আমেরিকার এক ত্রিশ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীলোক হঠাৎ এক দৃঢ় বিরাট-তনু কঠিন-পেশীমণ্ডিত পুরুষে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছেন। ঐ টিউমরটি অস্ত্রোপচার দ্বারা তুলে ফেললে আবার পূর্ব্বাবস্থা ফিরে পান।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই দেখে থাকবেন,—এক-জাতের পুরুষ আছে, যাদের আঙ্গিক গঠন বেশ স্ত্রীসুলভ—মুখে শ্মশ্রুগুম্ফ খুব সামান্য, গলার স্বর স্ত্রীলোকের মত সরু তীক্ষ্ণ। এদের আচরণ-ব্যবহারও অনেকটা স্ত্রীলোকের মত। বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন, অণ্ডকোষ (Testis) নিঃসৃত রসের (Hormone) অপ্রাচুর্য্য বশতঃই এ রকম হয়। স্বাভাবিক মানুষ বা বন-মানুষের অণ্ডকোষ সংযোজনা করলে এরূপ মানুষের দেহে ও মনে স্বাভাবিক পুরুষের পৌরুষ-লক্ষণ দেখা যায়। অনেক মেয়েদের দেখি, মুখে পুরুষের মত ঘন লোম পুরুষের মত গলার স্বর ভারী, পুরুষের মত পেশীমণ্ডিত বলিষ্ঠ হাত-পা। এদের ভাব-ভঙ্গিতে পুরুষের মত য়্যাডরেনল গ্রন্থিরসের (Adrenal secretion) আধিক্য বশতঃ এরূপ হয়।

ডক্টর ভরণফ এ বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করেন। কোন অস্থ-দন্তহীন জন্তুর দেহে সতেজ জোয়ান জন্তুর অণ্ডকোষের টুকরো সংযোগ করে তিনি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখেন। লোলচর্ম্ম, স্খলিতপদ, অস্থিচর্ম্মসার বৃদ্ধ জীব কেবল পুনর্যৌবনই ফিরে পায় না, তার মনের যুবার মত উৎফুল্লতা ও কাম-বাসনা জাগে এবং প্রজনন-শক্তিও ফিরে আসে। স্বভাবতঃ মেষেরা চোদ্দ পনেরো বছর বাঁচে। ভরণফ এক আস্তাবলে অস্থিচর্ম্মসার একটি চোদ্দ বছর বয়সের মেষের সন্ধান পান। ভেড়াটি দাঁড়াতে পারতো না এবং তার সমস্ত দাঁত ও দেহের লোম পড়ে যায়। ভরণফ তার উপর গ্রন্থি-সংযোজনার পরীক্ষা সুরু করলেন। গ্রন্থি-সংযোজনার পর ভেড়াটি জোয়ান ভেড়ার মত বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে কামনা-বাসনা দেখা দেয়। আর একটি এইরূপ স্খলিতপদ ভেড়া গ্রন্থি-সংযোজনার পর সন্তানের পিতা হতে সমর্থ হয়। এ ভেড়াটি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু ঘোড়ার চেয়ে ছ'বছর বেশী বেঁচেছিল। এর পর পুরুষ-বন-মানুষ, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতির গ্রন্থি সংযোজনা দ্বারা তিনি বহু গণ্য-মান্য লোকের পূর্ণ যৌবন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। একবার গ্রন্থি-সংযোজনা করলে, সংযোজিত গ্রন্থি টুকরার রস প্রায় পাঁচ-ছ' বছর বেশ জোয়ানের মত বলিষ্ঠ থাকে; এর পর আবার নতুন গ্রন্থি সংযোগ করতে হয়।

আজকাল আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে অস্ত্রোপচার করে গ্রন্থি-সংযোজনও করতে হয় না, কেবল গ্রন্থিরস (Hormone) ইন্‌জেক্‌শান (injection) করলেই চলে।

পুরুষের মত ওভারি (ovary) সংযোগ করে বা ওভারির-রস ইনজেক্‌শন্ (injection) করে নারী-দেহে পুনর্যৌবন আনা সম্ভব হয়েছে।

গিনিপিগ, ইঁদুর ও মুরগী নিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পুরুষ গিনিপিগ বা ইঁদুরের অণ্ডকোষ (testis) তুলে নিয়ে তার জায়গায় ডিম্বাশয় বা ওভারি (ovary) সংযোগ করে দিলে ঐ জীবে স্ত্রী-জীবের মত দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। আবার মেয়ে গিনিপিগ বা ইঁদুরে ডিম্বকোষের স্থানে অণ্ডকোষ সংযোগ করলে সম্পূর্ণ পুরুষ-জীবের আকার ও কামনার পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। মুরগীর ডিম্বকোষের স্থানে অণ্ডকোষ সংযোগ করলে স্ত্রী-মুরগীর মাথায় ও কাণের পাশে মোরগের মত বড় রক্ত রঙিন ফুল ও চূড়া দেখা দেয়। সে মুরগী গলা ফুলিয়ে পুরুষ-মোরগের মত আস্ফালন করে। পুরুষ মুরগীর দেহে ডিম্বকোষ যোগ করে স্ত্রী-মুরগীর মত তাকে ডিম্ব প্রসব করতেও দেখা গেছে। গ্রন্থি-সংযোজনা দ্বারা একটি মোরগকে একাধিক বার পিতা ও মাতা করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক আজ প্রকৃতিকেও বুদ্ধি-বলে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন!

মৃত্যুর পরেও বৈজ্ঞানিকেরা জীবকে আজ বাঁচাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করছি—

ডেজী এ্যালেন নামক জনৈক অক্সফোর্ড-নিবাসী মহিলা মারা যান। ইন্‌জেক্‌শনে ও কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করায় তিন মিনিট কাল পরে আবার বেঁচে ওঠেন। মৃত্যুকালে তিনি কি প্রত্যক্ষ করেন, জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেন—"আমি একটি অস্পষ্ট সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি···আর চতুর্দ্দিকে গভীর শান্তি ও নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করি। মনে হচ্ছিল যেন আমি শূন্যে ঝুলছি।···কোন যন্ত্রণা বা ভয়ের কোন চিহ্ন দেখলাম না—কেবল শান্তি ও বিশ্রাম। পুনর্জ্জীবন লাভ না করাই আমার পক্ষে ভালো ছিল।"

নিয়তিকে ও প্রকৃতিকে বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে পরাস্ত করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে। বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে উপভোগ্য করছে এবং ভবিষ্যতে আরও আরামদায়ক ও উপভোগ্য করবে, বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং পরমায়ু বর্দ্ধিত হবে। ভবিষ্যতে মানুষের অভিজ্ঞতার মূল্যও অনেক বর্দ্ধিত হবে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনুষ্য-সমাজের কল্যাণের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করবেন।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস।

প্রকৃতির মাঝে

[বায়রন্]

মানবের পদচিহ্ন পড়ে না যে বনে,
সেখানেও রয়েছে উল্লাস,
নির্জন সমুদ্র-তটে তরঙ্গ-প্লাবনে,
হেরি মোরা আনন্দ উচ্ছ্বাস।
সঙ্গীত শুনিতে পাই সমুদ্র-গর্জনে,
কোথাও নিঃসঙ্গ নাই বনে কি ভবনে।

শ্রীকালিদাস রায়

খল নদী হোয়াংহো

আমাদের দেশে দামোদর নদ—এমন চপল চঞ্চল দুরন্ত খেলা পদ্মা-মেঘনাও খেলিতে জানে না! দামোদরের এক দোশর আছে আমেরিকায়—তার নাম মিসিশিপি; এবং দামোদরের চেয়েও দুরন্ত নদী আছে চীনে। চীনের এ নদীর নাম 'ইয়েলো' বা হোয়াংহো। হোয়াংহোর মত ছল-ভরা খল নদী পৃথিবীতে আর দু'টি নাই! এ নদী বন্যা আনে, মড়ক আনে, দুর্ভিক্ষ আনে। চিরদিন তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু এ-যুগে চীনারা বহু আঘাতে পোক্ত হইয়াছে। চীনের চীনা জাতি আজ বিজ্ঞান-সাধনার ফলে এই দুরন্ত হোয়াংহোকে অনেকখানি বশ করিয়াছে। এমন বশ যে, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে বাঁধ বাঁধিয়া খাল কাটিয়া হোয়াংহোর চলার পথ ঘুরাইয়া পাঁচশো বর্গ-মাইলব্যাপী যে হোনান প্রদেশ, সেই প্রদেশকে শুধু সুস্নাত উর্ব্বর করিয়া তোলে নাই, হিংস্র নৃত্য করিতে থাকে! কত বার চীনের বুকে হোয়াংহো প্রলয় বহিয়া আনিয়াছে, তার আর সংখ্যা নাই! কিন্তু কথা আছে, যে 'মাটিতে পড়ে লোক, সেই মাটী ধরিয়াই আবার ওঠে। মার খাইয়া খাইয়া চীনা জাতি শেষে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এবং বিরাট সাধনায় ও অধ্যবসায়ে শক্তি সংগ্রহ করিয়া নদীর দুরন্ত শক্তিকে তারা কতক খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ-কাজে প্রসিদ্ধ মার্কিণ এঞ্জিনীয়ার অলিভার টড হইয়াছেন চীনা জাতির মন্ত্রী ও সহযোগী। এই টড সাহেবই বহু অধ্যবসায়ে আমেরিকার মিসিশিপি-নদীকে অনেকখানি বশ করিয়াছেন। তিনি আজ বিশ বৎসর হোয়াংহো-বশীকরণের ভার লইয়াছেন।

টড সাহেব হোয়াংহোর একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। সে বিবরণটুকু গল্প-উপন্যাসের মতই উপভোগ্য।

পাহাড় কাটিয়া পাথর-সংগ্রহ

তিনি বলেন, চার-পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া চীনের উপর হোয়াংহোর দৌরাত্ম্যের সীমা নাই! হোয়াংহোকে চীনা জাতি বলে চীনের অশ্রু-নির্ঝর। কিন্তু এই অশ্রু-নির্ঝরই ক'বৎসর পূর্ব্বে জাপানীর আক্রমণ রোধ করিয়া চীনের অধরে বিজয়-হাস্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের কথা। হোনান-প্রদেশের রাজধানী কাইফেঙ অধিকার করিয়া জাপানীরা বিপুল উৎসাহে পশ্চিম-মুখে অগ্রসর হইতেছিল—হোয়াংহোর ক'মাইল দক্ষিণে রেলোয়ে-সেতু; সেই সেতু অধিকার করিয়া একেবারে চেঙচিঙের রেলোয়ে-কেন্দ্রের বুকে চাপিয়া বসিবে, ইহাই ছিল জাপানীর উদ্দেশ্য! চীনা জাতি প্রমাদ গণিল! উদ্ধার-লাভের একটিমাত্র উপায়। সে-উপায় সেতুর পূর্ব্বে নদীর কূলে যে বড় বাঁধ, সেই বাঁধ যদি ভাঙ্গিয়া দিতে পারে তাহা হইলে হোয়াংহোর প্রবল বন্যায় জাপানী ভাসিয়া যাইবে! তখনি বিপুল অধ্যবসায়ে সাহসী চীনা ফৌজ গিয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল—বাঁধ ভাঙ্গিবামাত্র নদী ফুলিয়া ফুঁশিয়া অজগরের ফণার মত লক্ষ তরঙ্গ-ফণা তুলিয়া ছুটিয়া গিয়া সমগ্র মালভূমি প্লাবিত করিয়া দিল। মালভূমিতে তখন আসিতেছিল হাজার হাজার জাপানী ট্যাঙ্ক, কামান-গাড়ী আর ফৌজ! নিমেষে সমগ্র মালভূমি ব্যাপিয়া তিন ফুট উঁচু জল। সে-জল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল না, প্রমত্ত উল্লাসে বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ফুঁশিয়া ছুটিল। বহু ট্যাঙ্ক, কামান, ফৌজ সে উন্মত্ত জাপ-শত্রুকে এমন বিধ্বস্ত করিয়াছিল যে, রণে ভঙ্গ দিয়া কোনো মতে পলাইয়া জাপ-শত্রু প্রাণ বাঁচায়!

উত্তর-তিব্বতের তুঙ্গ গিরি-শিরে হোয়াংহোর জন্ম। গিরিশিখর বহিয়া নীচে নামিয়া প্রায় আড়াই হাজার মাইল পথ আসিয়া হোয়াংহো মিশিয়াছে প্রশান্ত মহাসাগরের পাশে যে পীত-সাগর (Yellow Sea) সেই পীত-সাগরের বুকে।

জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বিরাট চীনের বুকে নামিয়াই হোয়াংহোর দুরন্তপনা উচ্ছল হইয়াছে! বিরাট ভূখণ্ড পাইয়া নদী যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! ক্ষ্যাপামি যখন বাড়ে, সারা চীন ভরিয়া চীনা জাতি আতঙ্কে নীল হইয়া যায়! এ ক্ষ্যাপার দৌরাত্ম্যে ঘর-বাড়ী, জায়গা-জমি, [illegible] পায় না—এমনি প্রলয়-রঙ্গে মহাকালরূপিণী নদী

জলপ্লাবনে ধুইয়া ভাসিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল—দূর-স্থিত ফৌজ রশদ-পত্র ফেলিয়া পলায়ন করিল। সে বাঁধ আর বাঁধা হয় নাই—বিপুল বেগে প্রচণ্ড আবর্ত্ত তুলিয়া সুবিস্তীর্ণ নদী আজ চীনের ও-দিকটা জাপানীর পক্ষে দুর্গম অনতিক্রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

নদীর তীরে উইলোর ডালপালা বহিয়া আনে

টড সাহেব বলেন, নদীর পানে চাহিলে বিস্ময়ানন্দের সীমা থাকে না—এমন বিপুল-কায়া বেগবতী শক্তিমতী নদী পৃথিবীতে আর নাই! বৈচিত্র্য-হিসাবে নদী দেখিতে গেলে নিরাশ হইতে হইবে—একটানা একঘেয়ে দৃশ্য—মাঝে মাঝে সুবিস্তীর্ণ চড়া—বর্ষা ও শরৎকাল ভিন্ন নৌকা বড় একটা চলে না। তবু এই নদীর কল্যাণে দিগন্ত-ব্যাপী কূলপ্রদেশে যে উর্ব্বরতা, সে-উর্ব্বরতার ফলে চীনের পাঁচ কোটি লোক অন্ন-লাভ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে। হোয়াংহোয় যখন বন্যা নামে, তখন তার ফল হয় সাংঘাতিক—মিসিসিপির বন্যা তার সিকি অনিষ্ট বা ক্ষতি ঘটায় না। শাণ্টুঙ প্রদেশে হোয়াংহোর প্রাণ্ড কেনাল বিভাগের প্রধান কেন্দ্র, এ বিভাগের কাজ শুধু হোয়াংহোকে চৌকি দেওয়া। শাণ্টুঙের একশো মাইল আগে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অনুশীলনে শিক্ষা লাভের প্রচুর অবকাশ আছে।

চড়ার বুকে ঠ্যালা-গাড়ীতে পাথর বহা

হোয়াংহো দৈর্ঘ্যে আড়াই হাজার মাইল। এই আড়াই হাজার মাইলের মধ্যে পাঁচশো মাইল বেশ উঁচু। সেই উচ্চ খাতে নদী নিজের প্রবাহ-পথ রচনা করিয়া লইয়াছে। একটু জল বাড়িলে কূল উপছাইয়া নিমেষে চারি দিককার জমি পরিপ্লাবিত হয়; সেই সঙ্গে আশপাশের নীচু জমিগুলি রক্ষা পায়। এই পাঁচশো মাইলের মধ্যে কানসু ও কোন্‌সি-পাহাড়ের মাথা হইতে গ্রীষ্মকালে গলিত তরল কর্দ্দমের অবাধ-ধারা নিঃসৃত হইয়া হোয়াংহোর যত খাল ও শাখা-প্রশাখা বুজাইয়া দেয়; তার ফলে নদীর জলপ্রবাহ বাধা পাইয়া তীরের জমিতে উঠিয়া বিপুল বন্যায় মাঠ-বাট ঘর-বাড়ী গ্রাম-নগর মানুষ-জন—সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া লইয়া যায়। কোনো-কিছুর

চিহ্ন রাখে না। চীনের প্রায় সাড়ে তিন কোটি একর-পরিমিত আবাদী জমির বুকে হোয়াংহোর এই সাংঘাতিক আঘাতের চিহ্ন চিরমুদ্রিত আছে।

এই নদীর উত্তর-মুখে চীন-সভ্যতার লালন-ভূমি। তুংকোয়ানের পশ্চিমে এবং উত্তরে হোয়াংহোর দু'টি প্রধান শাখা ওয়েনহো এবং কেন্‌হো। এই শাখা-নদীর কূলে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ, সে-ভূভাগে আজ দুই শত বৎসর ধরিয়া প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতেছে; সে শস্যে বিরাট চীন বাহিনীর খোরাকের সংস্থান হইতেছে।

বন্যায় যারা গৃহ-হারা, মাটীর কুটীরে তাঁরা আশ্রয় লয়

কথিত আছে, প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে পূর্ত্তবিদ্যা-নিপুণ চীন সম্রাট ইয়ু পূর্ব্ব-চীনের উপত্যকা-ভূমিকে নদীর আক্রোশ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নানা উপায় উদ্ভাবনে উদ্যোগী ছিলেন। সে উদ্যোগের ফলে বাঁধ বাঁধিয়া হোয়াংহোর গতি-পথকে তিনি দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দেন এবং নদীর বুক খুঁড়িয়া নদীকে অতল গভীর করিয়া কূল-রক্ষায় কিয়ৎপরিমাণে সমর্থ হন।

বাঁধ বাঁধিবার কাজে ফৌজ ও কুলি-মজুর একজোট

তাঁহার পরে চীনের রাজ-শক্তি পূর্ত্ত-শিল্পীদের লইয়া হোয়াংহোর শক্তি খর্ব্ব করিতে কোনো দিন ত্রুটি রাখেন নাই। চার হাজার বৎসর ধরিয়া হোয়াংহোর সঙ্গে চীনা জাতির যুদ্ধের বিরাম নাই। বাঁধাবাঁধির এত প্রয়াস সত্ত্বেও হোয়াংহো দড়ি-ছেঁড়া দুরন্ত গরুর মত বন্যার গুঁতায় চীনা জাতিকে বিধ্বস্ত করিতেছে।

বন্যার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দেয়। তার পর বন্যার জল নামিয়া গেলে যে পলিমাটী পড়ে, তাহাতে জমি এমন উর্ব্বর হয় যে, দিকে-দিকে ফসলের বিরাট সম্পদ গড়িয়া ওঠে। চীনা জাতি তাই বন্যার আতঙ্কে সারা হইলেও আশা রাখে, বন্যার জল কাটাইয়া প্রাণ রাখিতে পারিলে মা-লক্ষ্মীর প্রচুর কৃপা মিলিবে। এই আশায় ঘর-বাড়ী জমি-জমা ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া ছারখার হইতেছে, সে-দিকে লক্ষ্যমাত্র না রাখিয়া সপরিবারে পলাইয়া সকলে প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করে। দুর্ভিক্ষের সময় ঘটী-বাটি জমি-জমা ফেলিয়া পলাইতে এতটুকু কাতর হয় না! ভাবে, যেমন করিয়া হোক প্রাণগুলাকে যদি বাঁচাইতে পারি, নিমেষে মা-লক্ষ্মীর কৃপায় চতুর্গুণ সম্পদ ফিরিয়া পাইব। এই ভাবে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বন্যায় বা

দুর্ভিক্ষে তাদের আতঙ্ক ক্রমে কমিতেছে। বন্যা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে পলায়নে সকলে তৎপর হয়—মাটীর বা আবাদের মায়া রাখে না।

নদীর কাছে যারা বাস করে, তারা জমিতে করে প্রধানতঃ পাটের চাষ। এই পাট হইতে কাছি-দড়ি তৈয়ারী হয়। আর করে বেতের চাষ; বেতে ঝোড়া বুনিবে। বাঁধ-মেরামতীর কাজে দড়ির এবং মজবুত ঝোড়ার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। তার পর কাওলিয়াঙের চাষ। এ গাছ দেখিতে আখ গাছের মত। পাতাগুলা গরু-বাছুরে খায়—গাছের শির চেঁচিয়া ও কাটিয়া তাহা দিয়া ঘরের চাল ছাওয়া হয়। বন্যার জলে এ গাছ ভাসিয়া বা মরিয়া যায় না। জল নামিয়া গেলে গাছ ঠিক মজুত থাকে। পল্লী অঞ্চলে নদীর কূলে যত দূর দৃষ্টি চলে, এই কাওলিয়াঙের ঘন ঝোপে-ঝাড়ে ভরিয়া আছে। এ সব জমিতে নীলের চাসও বেশ হয়।

ধান ছাঁটাই—উত্তর-চীন

পল্লীগ্রামে রাঙা আলুর ফশলও পর্য্যাপ্ত ভাবে ফলানো হয়। বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময় রাঙা আলুই পল্লীর লোক-জনের একমাত্র খাদ্য; রাঙা আলু জন্মায় প্রচুর অজস্র পরিমাণে—পুষ্টিকর খাদ্য এবং দামেও শস্তা। তবে ধনী ও অভিজাত পরিবারেরা রাঙা আলু স্পর্শ করে না,—অবজ্ঞা-ভরে বলে,—কুলির খাবার!

নদীর আক্রোশে এই বিপত্তি যেন রুটিনে বাঁধা। বহু-পুরুষ ধরিয়া এ বিপত্তি ভোগ করিয়া করিয়া পল্লী-অঞ্চলের নিরক্ষর জনসাধারণ বন্যা-দুর্ভিক্ষের নামে প্রায় নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারা জানে, ইহা নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধান—ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ফল নাই!

বন্যার জল বা ট্যাক্স-পেয়াদা ছাড়া আর কেহ তাদের ধুমাতা ধরিত্রীর (Good Earth)* বক্ষচ্যুত করিতে পারে না।

চীনে ধান ও গমের চাষ হয় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। ক্ষেতের কাজে সকলে সপরিবারে মিলিয়া কাজ করে। তার উপর মেয়েরা ধান ঝাড়ে, গম ভাঙ্গে, খড়ের টুকরি বোনে, ঝুড়ি তৈয়ারী করে। চাষের মধ্যে প্রধান মূলা, শস', শাক, পেঁয়াজ; তরী-তরকারীর ফশলও অজস্র ভাবে ফলায়। চাষের কাজে কাহারো ঔদাস্য নাই। এত পরিশ্রমের ফশল—বন্যায় সব নষ্ট হইবে, সে ভয় মনে জাগিলেও এ-কাজে কাহারো বিরাগ বা বিমুখতা নাই।
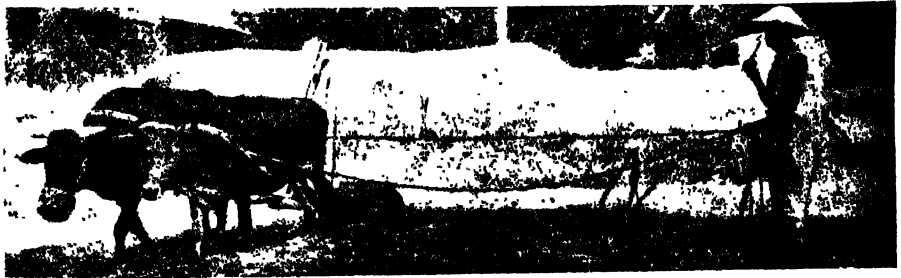
তরমুজ খাইয়া তরমুজের বীচিগুলি সকলে সযত্নে রক্ষা করে। শীতের দিনে বরফে মাঠ-বাট ঢাকিয়া যাইবে, ফশলের অভাব ঘটিবে—

কোদাল-হাতে চড়া কাটিয়া সাফ করা—মোঙ্গোলিয়া-সীমান্ত

তখন শুধু তরমুজের বীচি হইবে খাদ্য! এখানে সিনেমা-হলে যেমন সল্ট-বাদাম বিক্রয় হয়—সৌখীন নর-নারী সে বাদাম দাঁতে কাটেন—চীনের হোটেলে এবং থিয়েটারগুলিতে তেমনি তরমুজের বীচি বিক্রয় হয়। সৌখীন অভিজাত নর-নারীর দল মহা-সমাদরে তাহা কিনিয়া খায়।

চীনে রশুনের খুব আদর। তার গন্ধ চীনাদের খুব ভালো

* এ কথাটি কলা-শিল্পী শ্রীমতী পার্ল বাকের নিজস্ব সৃষ্টি নয়। চীনা জাতি মাটীকে বলে Good Earth অর্থাৎ কল্যাণময়ী ধরিত্রী জননী।

লাগে। তার উপর রশুন বিশিষ্ট টনিক! উত্তর-চীনের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য বীন এবং আটা-ময়দা; দক্ষিণ-চীনে প্রধান খাদ্য ভাত।

টড সাহেব বলেন, হোয়াংহোর বাঁধ ও গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিবার জন্য চীনে জল-পুলিশ বিভাগের ব্যবস্থা আছে
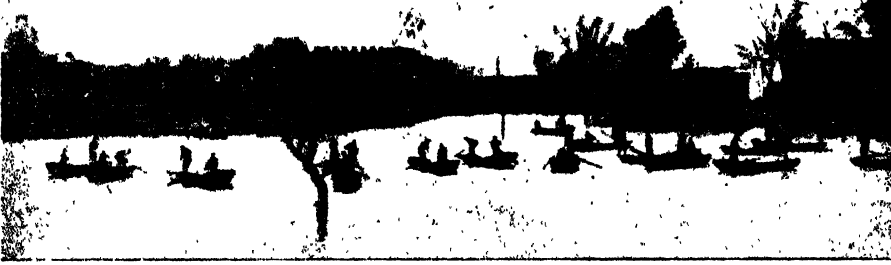
বন্যার ফলে চাষারা বনিয়াছে ধীবর!

প্রাচীন কাল হইতে। শানটুঙ, হোপে এবং হোনানে জল-পুলিশের তিনটি প্রধান অফিস আছে। এই তিন অফিসের অধীনে আছে গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে বিভিন্ন থানা। বোটে চড়িয়া জল-পুলিশ দিবারাত্র চৌকিদারী করে। বাঁধে যদি কোথাও ফাট ধরে, যদি দেখে কোনো বাঁধের মাটী খশিয়া ধুইয়া বা পাথর সরিয়া

কাঠ ও পাথর বাঁধিয়া বাঁধের ফাট-ভরাট

যাইতেছে, তখনি তারা কাওলিয়াঙের ঝাড় আনিয়া গুচ্ছে-গুচ্ছে ফেলিয়া সে-ফাট বুজায়। এ কাজের দরুণ নদীর উভয়-কূলে ১৪ বর্গফুট করিয়া কাওলিয়াঙের তাগাড় পুঞ্জিত থাকে। যে বাঁধ সম্বন্ধে আতঙ্ক জাগে, সে বাঁধ রক্ষা করিতে নিমেষে কাওলিয়াঙ আনিয়া জড়ো করে অজস্র প্রচুর পরিমাণে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে টড সাহেব বন্যার আশঙ্কা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—নদীর মোহনার দিকে প্রায় ১৫ মাইল জুড়িয়া বাঁধে প্রকাণ্ড ফাট দেখা দেয়। তখনি জল-পুলিশের চেষ্টায় অসংখ্য লোক আসিয়া বালির বস্তা, কাওলিয়াঙের ঝাড়, বড় বড় পাথর ফেলিয়া সে-ফাট ভরাট করিয়া তুলিতে লাগিয়া যায়। কিন্তু জল-পুলিশের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া প্রখর বেগে বন্যা আসিল—ফাঁপিয়া ফুলিয়া নদীর স্রোতে গ্রাম-নগর মাঠ-বাট ডুবিয়া প্রায় আড়াই লক্ষ লোক হইল গৃহহীন নিঃস্ব সর্ব্বহারা। এই সব দুঃস্থ নিঃস্বেরা গিয়া দূরে বাসা বাঁধিয়া উপনিবেশ গড়িয়া সাহায্যের প্রত্যাশায় রহিল।

লোক-জন লইয়া যে-চিকিৎসক এই সব আর্ত্ত দুঃস্থের সাহায্যে গিয়াছিলেন, টড সাহেব ছিলেন তাঁর সহযাত্রী। টড সাহেব লিখিয়াছেন, চীনা নববর্ষ তখন আসন্ন—আর্ত্ত দুঃস্থ পল্লীবাসীরা নববর্ষের উৎসব-আয়োজনে বিরত হয় নাই। আমরা তুষারময় খাল ধরিয়া নৌকা চালাইয়া সন্ধ্যা-নাগাদ আসিয়া পৌঁছিলাম লোকাউ গ্রামে। এই গ্রামের পরেই খাল গিয়া অথৈ অতল হোয়াংহোর বুকে মিশিয়াছে।

মাঝি বলিল—রাতের বেলায় বড় নদীতে যাওয়া ঠিক হবে না। আঁধার রাতে নদীতে দত্যি-দানারা জেগে দৌরাত্ম্য করে বিপদ ঘটাতে পারে।

আমরা বলিলাম, তা হয় না। দেরী করিলে সেখানে কত অভাগা প্রাণে মরিবে!

মাঝি কিছুতেই রাজী হয় না, আমরাও ছাড়িব না। রাগ করিয়া মাঝি বলিল,—বিদেশী লোকের পাল্লায় পড়িয়াছি! কিছুতে বুঝিবে না তো!

তবু আমরা পণ ছাড়িলাম না। নিরাশ হইয়া মাঝি বলিল,—তাহলে নোট পুড়াইয়া দোষ কাটান্—দত্যি-দানার উদ্দেশে পূজা দিন!

নিরক্ষর চীনাদের বিশ্বাস, গাছ-পালা নদী-পাহাড় বন-জঙ্গল—এ-সবের উপর নানা জাতের দৈত্য-দানব আধিপত্য করে। প্রসন্ন হইবার জন্য তারা পূজা চায়। দৈত্য-দানবের পূজায় টাকা পয়সা দেওয়া নয়, নোট পুড়াইতে হয়।

মাঝির কথায় আমরা বলিলাম,—নোট তো নাই—মুদ্রা আছে। ভাঙাইয়া তুমি নোট আনো।

মাঝিকে দেওয়া হইল এক পাউণ্ড দামের মুদ্রা। মুদ্রা লইয়া মাঝি তীরে উঠিল এবং ঘণ্টাখানেক পরে কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিয়া নোট দিল। বাজার হইতে মাটীর একটি ঠাকুরও কিনিয়া আনিয়াছিল। সেই মাটীর ঠাকুরকে নৌকায় বসাইয়া
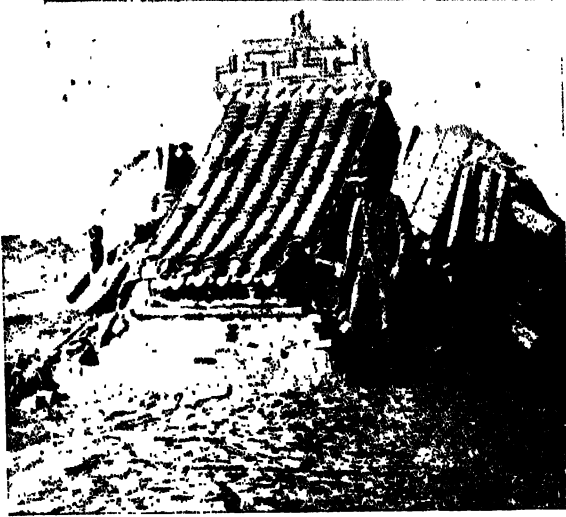
বন্যা-দানবের মন্দির (জীর্ণ)

তার সামনে নোট পুড়াইয়া কি মন্ত্র উচ্চারণ করিল, তার পর বলিল—নৌকা তাহলে ছাড়ি সাহেব।

জ্যোৎস্না রাত্রি। আকাশে এতটুকু মেঘ ছিল না। সেই জ্যোৎস্নায় আমাদের নৌকা গিয়া হোয়াংহোর বুকে পড়িল। মাঝি পাল তুলিয়া দিল—অনুকূল বাতাসে স্রোতের মুখে নৌকা ছুটিল তীরের বেগে।
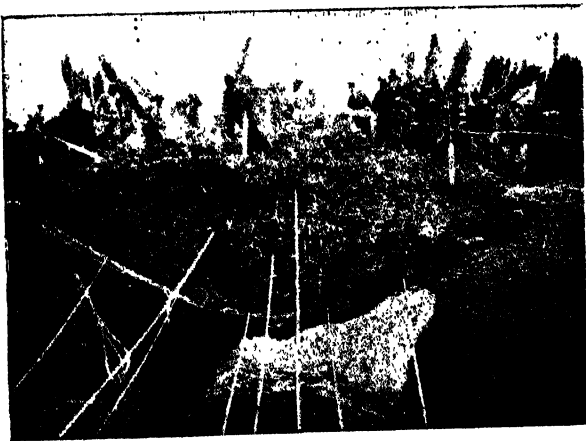
দড়ির জাল নামানো

মাঝি বলিল—বিদেশী লোকের পাগলামি!

আমি বলিলাম—মানুষের প্রাণের সম্বন্ধে এমন উদাস তোমরা! ও-দিকে সত্তর-আশী মাইল দূরে আড়াই লক্ষ লোক অন্নাভাবে মরে—তাদের বাঁচাইতে হইবে তো!

চিকিৎসক আমাকে বুঝাইলেন, হাজার হাজার বছরের সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ায় নিয়তির হাতে সব ছাড়িয়া দিয়া জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে ইহারা আজ এমন নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার হইয়া উঠিয়াছে।

তার পর প্রায় পঁচিশ বৎসর কাটিয়াছে। এ পঁচিশ বৎসরে
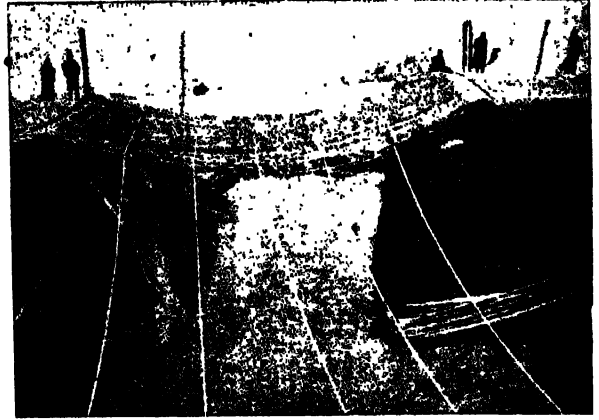
যেখানে ফাঁক কম—দু'দিকে পাতা হয় দড়ির জাল

চীনার মনোভাবও প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। লেখাপড়ায় তাদের অনুরাগ হইয়াছে; নিরক্ষরতা ঘুচাইতে আজ বিপুল সাধনা চলিয়াছে। বুঝিয়াছে, মানুষের শক্তি অসাধারণ—নিয়তির সহিত দ্বন্দ্বে মানুষের জয় অনিবার্য্য—যদি চেষ্টা হয় অন্তরের, সাধনা হয় অকৃত্রিম!

গাধার লাঙ্গল

বাঁধ বাঁধিতে তারের জাল অপরিহার্য্য। চীনে তার মিলিত না। জাপান হইতে বিশ বৎসর পূর্ব্বে চীন তার আনাইতে লাগিল। টড সাহেব পরামর্শ দিলেন, তারের সঙ্গে চাই প্রচুর পাথর—বড় বড় পাথর। পাথর আনা সুকঠিন—নদীর বুকে মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ চড়া—জল কোথাও এত অল্প যে নৌকা চলিতে পারে না।

তখন ঠ্যালা-গাড়ীতে করিয়া চড়া বহিয়া ছোট ডিঙ্গিতে করিয়া পাথর আনা হইল।

পাহাড় কাটিয়া পাথর আনিবার ব্যবস্থা ছিল। একশো মাইলের মধ্যে যেখানে পাহাড় নাই, সেখানে পরিশ্রমের আর অন্ত রহিল না! তবু খাটিবার জন্য লোক মিলিল সংখ্যাতীত। ঘর-বাড়ী বাঁচিবে, ফশল বাঁচিবে, প্রাণ বাঁচিবে—এত-বড় লাভ! সে-লাভের জন্য দেহের কষ্টকে কষ্ট বলিয়া কেহ মনে করিল না—গরীব চাষা-ভূষারা খোরাকি এবং নাম-মাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিজেদের দেহ-মন এ-কাজে সঁপিয়া দিল—নিঃশেষে নিজেদের নিংড়াইয়া উজাড় করিল!

এক বৎসর ধরিয়া চলিল বিপুল উদ্যোগে বিস্তীর্ণ বাঁধ গড়ার কাজ! পরের বৎসর গ্রীষ্ম আসিল, বর্ষা চলিয়া গেল—হোয়াংহো

থলি ফেলিয়া বাঁধ উঁচু করা

আক্রোশে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া তরঙ্গের ফণা তুলিল, কিন্তু কঠিন বাঁধে সে ফণা ছোবল দিতে পারিল না। নিষ্ফল গর্জ্জনে নদী ছুটিল সহজ গতি-পথে—প্রখর বেগ প্রখরতর করিয়া যেন সাগরের কাছে নালিশ জানাইতে!

এ সাফল্যে চীনা জাতির উৎসাহ বাড়িয়া গেল! আড়াই হাজার মাইল ব্যাপিয়া নদীর দুই কূল শৃঙ্খলিত করিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু কাজ বড় কঠিন—অনেকখানি সময়-সাপেক্ষ!

তবু কাজে উৎসাহ ঢিলা পড়িল না। কিন্তু বারো বৎসর পরে নদী রন্ধ্র পাইল—পুঞ্জিত আক্রোশে সেই রন্ধ্রমুখে সে আসিয়া আবার হানা দিল।

মানুষের সঙ্গে নদীর বিপুল সংগ্রাম চলিল। পাথর আনিয়া ফেলা—তার উপর চীনা কর্ম্মীর দল উইলো গাছ কাটিয়া তার গায়ে মোটা শণের কাছি দিয়া বড় বড় পাথর বাঁধিয়া—সেগুলা আনিয়া ফেলিতে লাগিল বাঁধের গায়ে স্রোতের মুখে। বাঁধগুলি এধারে করা হইল ২৫।৩০ ফুট চওড়া। বালি এ তল্লাটে কোথাও পাওয়া যায় না। বালি অনেক দূরে—আনিতে গেলে সময় লাগিবে। তখন এই কাছি বেশ শক্ত করিয়া পাকাইয়া বাঁধিয়া যেখানে একটু ফাঁক কম, সেইখানে আনিয়া দু'দিক্কার ডাঙ্গায় আটকাইয়া ঐ দড়ির জাল টাইট্ করিয়া টাঙ্গানো হইল—তার পর দড়ির জালের উপর বড় বড় ভারী থলি এবং কাওলিয়াঙের বাঁধা ঝাড় আনিয়া চাপানো হইল—তার পর দুই কূলের বাঁধন-দড়ি শিথিল করিয়া বিপুল ভারসমেত এই দড়ির জাল ধীরে ধীরে নামাইয়া বাঁধের ফাট বুজানো হয়। প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে বড় বড় পাথরের ভারসমেত এ জাল ফেলা হইল। বাঁধের ফাট বুজিল; রন্ধ্র হারা নদী রাগিয়া কূল হারাইয়া অন্য দিকে ছুটিল।

কাওলিয়াঙের ঝাড় বাঁধা

তার পর ১১৩৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বনাশা হোয়াংহো করিল বন্ধুর কাজ। জাপানী শত্রুকে স্রোতের বেগে ভাসাইয়া হোনানকে রক্ষা করিল।

বাঁধ ফাটিলে কিম্বা কোনো কারণে বন্যার আশঙ্কা জাগিবামাত্র জল-পুলিশের সাইরেন বাজে। জল-পুলিশের বিভিন্ন এলাকা ভাগ করিয়া দেওয়া আছে। সাইরেনের এ-সঙ্কেত জাগিবামাত্র নিমেষে তাহা মহল্লায়-মহল্লায় ব্যক্ত করা হয়। এ সঙ্কেতে সজাগ হইয়া চীনারা মাটী-বাটী রক্ষা করিতে না পারিলেও প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হয়।

টড সাহেব বলেন, শেনসী এবং শান্সী—এ দুই পাহাড়ে যে জলপ্রপাত দেখিয়াছি—হুকো প্রপাত—তার গরিমা-মহিমা বর্ণনাতীত। শীতকালে পাহাড়ে বরফ জমিয়া একাকার হইয়া থাকে। অন্য সব ঋতুতে জল পড়ে এক অবিচ্ছিন্ন মোটা ধারায় ৬৫ ফুট নীচে—সেখান হইতে শতধারায় ফাটিয়া আরো ৪৫ ফুট নীচে

পড়িয়া এক-মাইল কুণ্ডে সে জল পুঞ্জিত হইয়া বিপুল পরিসরে তীরের বেগে মালভূমি বহিয়া ছোটে।

যোগ্য বিশেষজ্ঞ আসিয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির সাহায্যে এ জলকে যদি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন, তাহা হইলে জলের শক্তি হইবে

প্রাচীর-পরিখায় সুরক্ষিত গ্রাম

পঞ্চাশ হাজার হইতে এক লক্ষ অশ্ব-শক্তির সমান! এ প্রপাতের পথে আজ পর্য্যন্ত বড় বেশী লোকের পদচিহ্ন পড়ে নাই; তার কারণ পথ অত্যন্ত দুর্গম। কাছাকাছি যে সহর আছে, সেখান হইতে প্রপাতের কাছে আসিতে অন্ততঃ একটি দিন সময় লাগে। আসিতে হইলে পায়ে হাঁটিয়া আসিতে হইবে। গাড়ী চলিবে, এমন উপায় নাই।

চীনের উত্তরাঞ্চলকে যেমন নদীর আক্রোশ এতটুকু স্পর্শ করিতে পারে নাই, তেমনি সেখানে জলের অভাব খুব বেশী। উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি নদী আছে—সেই সব নদীর বুকে জলচক্র (Water-wheels) বসাইয়া ৪০।৫০ ফুট উঁচুতে জল তুলিয়া ঐ জল লইয়া চাষ-বাস প্রভৃতি সর্ব্বকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। জলের অভাবে উত্তর-চীনে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই থাকিত। বহু লোক এবং গো-মেষ-মহিষাদি বিনষ্ট হইত। এ-অঞ্চলে সারা বছরে বৃষ্টি হয় ছ'ইঞ্চি মাত্র! এখন বহু খাল কাটানো হইতেছে।

নদীতে খুব বেশী চড়া পড়ে—প্রায় কোদাল ধরিয়া চড়া কাটিয়া জলের পথকে মুক্ত করিবার প্রয়োজন ঘটে। চীনের পূর্ব্ব-বিভাগে বিচক্ষণ অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ আনাইয়া এ জলকষ্ট নিবারণের জন্য বিপুল আয়োজন চলিতেছে।

লোক-জনের নিত্য কাজে কিন্তু কখনো বিরাম নাই। জাপানের সঙ্গ সর্ব্বস্ব-পণ করিয়া যুদ্ধ—মিত্রপক্ষে মিলিয়া-মিশিয়া বিচক্ষণতার সহিত সংগ্রাম। যারা যুদ্ধে যায় নাই, তারা করিতেছে চাষ-বাস, নদীর বাঁধের মাঝে তেমনি মন দিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্য সাধন।

টড সাহেব বলেন, নদীর তীরে বা কাছাকাছি যাহাদের বাস, তাহাদের সাহস, অধ্যবসায় এবং চরিত্র-দৃঢ়তা সত্যই অসাধারণ। অতি বড় বিপাকেও কেহ দমিতে জানে না। জয়ে যেমন উল্লাসে আত্মহারা হয় না, পরাজয়েও তেমনি হতাশভরে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে না। বন্যায় দুর্ভিক্ষে যখন খাদ্য মেলে না, তখন কীট-পতঙ্গ, গাছের পাতা, কাদা এবং জল খাইয়া প্রাণগুলাকে রাখিবার জন্য প্রয়াস করে। চীনা জাতি বাঁচিতে চায়—বাঁচার এই বাসনাতেই তারা দেহ-মনে দুর্জ্জয় শক্তি পায়।

হোয়াংহোর পশ্চিমোত্তরে পশ্চিম-হোনানে চাষাভূষারা বাস করে পাহাড়ের গুহায়। সেই গুহায় গো মেষ মহিষ প্রতিপালন করে। গুহার বুকে রন্ধ্র রাখে; সেগুলি জানলা। জীবিকার জন্য ইহাদের সম্বল কাস্তে কুঠার, শাবল কোদাল, আর হাল লাঙ্গল। চাষ করে বলদ, গাধা, ঘোড়া দিয়া। পর্ব্বত-অঞ্চলে কোথাও কল-কারখানা বা যন্ত্র-তন্ত্রের দেখা মিলিবে না। মালপত্র বহিতে মামুলি ঠ্যালা-গাড়ী আর বাঁকই একমাত্র অবলম্বন।

চীনে সকলেরই নৌকা আছে—নানা আকারের নৌকা। যদি বন্যা হয়, সকলে চকিতে তখন নৌকায় ওঠে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। বন্যার জল যত কাল না নামিয়া যায়, নৌকাতেই ঘরকন্না পাতিয়া বাস করে। দুর্দ্দিনের সহায়রূপী এ-সব নৌকা ডাঙ্গায় তোলা থাকে—সভ্য সমাজের আস্তাবলে-গেরাজে গাড়ী-মোটরের মত। এ দৃশ্য দেখা যায় শুধু হোয়াংহোর উভয় তীরে পল্লী-অঞ্চলে।

প্রাচীন সংস্কারাদি আজো তারা ত্যাগ করে নাই। পবন-দৈত্য এবং বন্যা-দানবের বিরাগ দূর করিতে তাদের পূজার্থে বহু মন্দির এবং বিগ্রহ আছে। পুরোহিত দিয়া এ সব দৈত্য-দানবের নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। সাপকে চীনাজাতি পূজা করে—বন্যার দানব-দেবতাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য। বিচিত্র নক্সা-করা বাক্সের মধ্যে জীবন্ত সাপ

চীনা মায়ের কোলে ছেলে

ভরিয়া সে বাক্স রাখে বাঁধের কাছে মন্দির তৈয়ারী করিয়া সেই সব মন্দিরে। বড় বড় চীনা রাজ-কর্ম্মচারীরাও পালে-পার্ব্বণে এ সব মন্দিরে আসিয়া নতজানু হইয়া সর্পদেবতাকে প্রণতি জানাইতে অবহেলা করে না।

দুর্ভিক্ষ ঘটিলে দস্যুর উপদ্রব ভীষণ রকম বাড়িয়া ওঠে। তার

কারণ, যারা কুলিমজুরের কাজ করিত, মাঠ চষিত, অন্নের জন্য তাদের লইয়া দু'-দশ জন দুরন্ত ব্যক্তি দস্যুদল গড়িয়া তোলে এবং যাহাদের ধন-ধান্য থাকে, তাদের উপর এই সব দস্যুর দৌরাত্ম্যের সীমা থাকে না। এ সব দস্যুকে দমন করিতে জেলের কয়েদীদের লইয়া সৈন্য লইয়া রীতিমত অভিযান বাহির হয়।

আজ ত্রিশ বৎসর হইল, চীনের বুক চিরিয়া বহু ধারায় রেলোয়ে-লাইন পাতা হইয়াছে। রেলোয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মনে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। জ্ঞান-লাভের বাসনা জীবন্ত হইয়াছে। এঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকেই চীনা যুবকের অনুরাগ বেশী। পথ-ঘাট পাকা হইয়াছে—পথ-ঘাট নিত্য তৈয়ারী হইতেছে এবং এ-সব পথে রিকশর অন্ত নাই। মোটর-গাড়ীও চলিতেছে আজ প্রায় ২০।২২ বৎসর। পথঘাট-পরিদর্শনের জন্য বহু বিভাগ, বহু কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে। পল্লী-অঞ্চলে অবশ্য পথঘাট এখনও পাকা হয় নাই।

দূরত্ববোধ সম্বন্ধে চীনা-জাতির উপর নির্ভর রাখা চলে না। ধরুন, যদি প্রশ্ন করেন—এরশিলহিঙ্গ কত দূরে? উত্তর মিলিবে—১৮ লি (ক্রোশ-রশি-মাইলের অনুরূপ দূরত্বের পরিমাপ-জ্ঞাপক)! আসলে কিন্তু দেখা যাইবে ১৮র পরিবর্ত্তে ১১৮ লি!

বিশ-পঁচিশ বৎসরে চীনে যে সংস্কার সাধিত হইয়াছে, তাহাতে তার চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। আচারে-ব্যবহারে, শিক্ষায়-দীক্ষায়—সব দিকেই প্রভূত সংস্কার। ম্যাজিষ্ট্রেটদের জন্য রীতিমত শিক্ষালয় আছে। সে শিক্ষালয়ে আইন-কানুন, অধ্যায়-বিজ্ঞান প্রভৃতি শিখিতে হয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন হয় সেনাপতি মোঙ্গ ইউশিয়াঙের আমোলে। মেয়েরা অবশ্য ছেলেদের সঙ্গে এক-স্কুলে পড়িত না। এখন এ বিভেদ দূর হইয়াছে মাদাম চিয়াং কাইশেকের চেষ্টায়। সকল কুসংস্কারের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চীনে তিনি জ্ঞানের আলো বিতরণ করিতেছেন সর্ব্ব দিকে। চীনা মেয়েরা এখন নানা বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিতেছেন। তাঁরা দেশ-শাসনের কাজেও আজ বেশ তৎপর।

বিবাহ-ব্যাপারে বর ও কন্যা-নির্ব্বাচনে ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তবে এ সংস্কার ঘটিয়াছে নগরে এবং শিক্ষিত সমাজে। পল্লী-অঞ্চলে এখনো বহু স্থানে দেখা যাইবে প্রাচীন কুসংস্কার—সেখানকার চীনা নর-নারী চার হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার আচার-রীতি পালন করিতেছে, মেয়েরা পায়ে কাঠের কঠিন জুতা আঁটিয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছে—সংসারে-সমাজে সেই পুরুষের একাধিপত্য!

চীনের মালবাহী বোট

কিন্তু মাদাম চিয়াংকাইসেক আশা রাখেন, সঙ্কট শেষ হইলে চীনের সর্ব্বত্র জ্ঞান-জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে; চীনে দারিদ্র্য বা মূঢ়তার চিহ্ন থাকিবে না; জাতির সম্মিলিত উদ্যোগে চীন হইবে আবার সেই আদি-যুগের আদর্শ সাম্রাজ্য!

মৎস্য ও মানুষ

বঁড়শীতে টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে জলে
একরাশ মাছ ধরে' বাবু বাড়ী চলে।
রাত্রে খাওয়ানোর ধূম—আসে বন্ধুজন।
বিজয়-গরবে বাবু সবে ডেকে ক'ন—
বঁড়শীতে টোপ গেঁথে মাছ ধরে লোকে
মান্ধাতার যুগ থেকে! টোপের কুহকে
মাছ তবু ভোলে আজো! কভু বুঝিল না
এ টোপ খাবার নয়—মৃত্যুর নিশানা!
মাছেদের জ্ঞান-বুদ্ধি হলো না কো হায়,
আজো ভুলে প্রাণ দেয় এ মৃগ-মায়ায়!
মাছ-জাত ভারী বোকা—ঘটে বুদ্ধি নাই!
টোপে মাছ ধরে মোরা মজা করে খাই!

বন্ধুরা কহিল—শুধু মাছ বোকা নয়!
মানুষও এমনি বোকা—করিবে প্রত্যয়!
অতিলোভে ব্যবসায়ী জ্বালে লাল-বাতি;
মোসাহেব-টোপে মরে কত রাজ-নাতি!
মোটর, এ্যাকট্রেশ, বেশ, বাবু-গিরি-ছাঁদ—
দুনিয়ার চারি দিকে পাতা টোপ-ফাঁদ!
রূপ-যৌবনের টোপ, খেতাব, কেতাব—
—কি টোপে না মরে লোক! তবু কি স্বভাব,
এ-টোপ গিলিতে ছোটে বিরামবিহীন!
গলায় বঁড়শী বিঁধে খায় হিমশিম!
তবু দাদা, টোপ দেখে কার নাই লোভ!
মানুষের বোকামিতে জাগে না কি ক্ষোভ?

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

স্রোত বহে যায়

[উপন্যাস]

২১

গায়ে-হলুদের দিন···

বাড়ীতে ধূমধামের যেমন অন্ত নাই, ওদিকেও চলিয়াছে তেমনি দলাদলির অগ্নি-পরীক্ষা!

বুদ্ধি খাটাইয়া পরেশ গাঙ্গুলি ছেলের বিবাহের দিন বদলাইয়া বাহিরে সাধু সাজিয়াছে···ভিতরে কিন্তু শিবকৃষ্ণকে উস্‌কাইয়া দিয়াছে, —সাবধানে মিলে-মিশে থাকো হে শিবকেষ্ট, ও-বাড়ীতে কারা যায়, কারা না যায়!

বেলা বারোটা নাগাদ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে শিবকৃষ্ণ আসিয়া জানাইল,—বড় বাড়ীর নেমন্তন্ন—দু'-তিন দিন ধরে' কষে সব খাবে··· এ লোভ কাকেও তো সামলাতে দেখলুম না, সেজ বাবু!

সেজ বাবু পরেশ গাঙ্গুলি শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—হুঁ!

মন বলিল, সরিয়া থাকা উচিত হইবে না। ও-বাড়ীর জোর বেশী···সরিয়া থাকিলে তাহাকেই হয়তো সকলে সরাইয়া দিবে! তার চেয়ে বদান্যতা দেখাইয়া···

শিবকৃষ্ণকে বলিল—তুমি ও-বাড়ীতে গিয়েছিলে?

শিবকৃষ্ণ বলিল—আজ্ঞে না, আপনি না বললে যেতে পারি কি?

পরেশ গাঙ্গুলি বলিল—কিন্তু তোমার মন্দিরের চাকরি! বড় কর্ত্তা সে দিন তার একটু ইঙ্গিত দিয়েছিল!

—তা দিয়েছিলেন! দিলেও···মানে···

পরেশ বলিল—মানে, তুমি ওঁর আদুরে ভাগনে সুশীলের নামে যে সব কথা রটনা করেছো, তাতে তোমার উপর ওঁর মন বেশ চটে আছে শিবকেষ্ট!···তাছাড়া জানো তো, ঐ সুশীলের বাপের কাছে বড় কর্ত্তা মানখানি পরগণা বন্ধক রেখে বিশ-হাজার টাকা ধার করেছিলেন। সে টাকার সব এখনো শোধ হয়নি!

মহাদর্পে আস্ফালন করিয়া শিবকৃষ্ণ বলিল—ও-কথা আমাকে আর নতুন করে বলবেন কি! আমি ও-কথা জানি···ঐ জন্যই তো সুশীলকে বড় কর্ত্তা এতখানি মেনে চলেন। নাহলে এমন অনাচার করে ভাগনে কখনো মামার কাঁধে বসে এ-সব লীলাখেলা করতে পারতো?··· এই যে বড় গিন্নীকে আলাদা করে রেখেছেন···নিজে সেখানকার জল-মাটী স্পর্শ করেন না। আর ঐ ভাগনে···তবে গিয়ে সরস্বতী সেখানকার মাটী কামড়ে পড়ে আছে···ঐ জন্যই একটা কথা তাদের বলতে পারেন না। তাছাড়া ঐ খৃষ্টানী মাষ্টারণীও এখন বড় গিন্নীর ওখানে হামেশা যাতায়াত করছে। আর বলেন কেন সেজ কর্ত্তা, সে-নিষ্ঠা কি আর দেশে আছে···যে-নিষ্ঠায় এক দিন বড় কর্ত্তা ছেলেকে ত্যাগ করেছিলেন···হুঁ।

পরেশ বলিল—টাকার জোর বড় জোর শিবকেষ্ট!

চাদরের খুঁটে কপালের ঘাম মুছিয়া শিবকৃষ্ণ বলিল—আপনারা যাচ্ছেন ও-বাড়ীতে?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পরেশ বলিল—যেতে হবে দেখছি! গাঁশুদ্ধ লোক যখন যাচ্ছে···আমি একলা যদি না যাই, শেষে অখিলের বিয়ের সময় গোলমাল হতে পারে। তাই ভাবছি, মনকে চোখ ঠেরে একবার···

—সেজ গিন্নী যাচ্ছেন?

পরেশ বলিল—তিনি গেছেন। সরো নিজে এসে তাঁকে নিয়ে গেছে। তুমি···

শিবকৃষ্ণ বলিল,—আমার কথা তো জানেন। বুঝতেই পারছেন ···পাঁচ বাড়ীর গোলাম আমি,—পাঁচ সরিকের ঠাকুর নিয়ে যখন আমার কারবার, তখন পাঁচটি সরিকের কাকেও ত্যাগ করা চলে না!

পরেশ হাসিল, বলিল—এত যদি বোঝো, তাহলে জিভকে একটু সামলে রাখতে পারো না! সুশীলের নামে খামোকা ও-সব কথা বলে বেড়াও! বোঝো তো, জোর যার মুল্লুক তার। ওরা হলো একালের ছেলে···তার উপর টাকার জোর আছে। ওরা যা করবে, তাতেই পার পেয়ে যাবে!

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শিবকৃষ্ণ বলিল—অন্যায় অনাচার দেখলে চুপ করে থাকতে পারি না সেজ বাবু···ঐটি আমার মহৎ দোষ যে!

মৃদু হাস্যে পরেশ গাঙ্গুলি বলিল—ও-দোষ ত্যাগ করো!

—হুঁ!

পরেশ গাঙ্গুলি আসিল মাখন গাঙ্গুলির গৃহে···বেলা তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে।

বাড়ী একেবারে লোকে লোকারণ্য! কুটুম্‌-বাড়ীর তত্ত্ব আসিয়াছে —হুলস্থূল ব্যাপার! গ্রামের লোক কেহ আর আসিতে বাকী নাই।

পরেশের বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটিতে লাগিল। আজ তো গায়ে-হলুদ···আজিকার দিনেই এই···বিবাহের রাত্রে না জানি এ সমারোহ আরো কত বেশী হইবে!

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—এসো পরেশ, এতক্ষণে সময় হলো? —তোমাদেরি সব দেখবার কথা। এ বয়সে আমার কি আর দেখবার সামর্থ্য আছে, না, সে-মন আমার আছে!

পরেশ এ-কথায় খুশী হইল। বলিল—শরীরটা ভালো ঠেকছিল না।···ভালো কথা, বড় বৌঠাকরুণ আসেননি?

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—অনেকের মত হলো না···বললেন, কুটুম-বাড়ীর লোকেরা যদি তা নিয়ে কোনো কথা তোলে!

সুশীল ছিল কাছে, বলিল—কুটুম-বাড়ীর তরফ থেকে কথা উঠতে পারে না মামা-বাবু। জমিদার বাবুর ভগ্নীপতি অমন মজলিশী···তিনি তো কোনো জাতই মানেন না!

পরেশ গাঙ্গুলি বলিল—ঘরে বসে আলাদা যে যা করে, করুক সুশীল। তা বলে পাঁচ জনের সমাজ···

সুশীল বলিল—আলাদা-আলাদা পঞ্চাশখানা ঘর নিয়েই তো সমাজ, সেজ মামা।

পরেশ এ-কথার জবাব দিল না···জবাব জানা নাই!

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—এত দিন এক-রকম চলে যাচ্ছিল··· কিন্তু বাড়ীর কাজ···নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছে পরেশ! ভাগ্যে সরো এখানে এসে রয়েছে!···তা অখিলের বিয়ের দিন ঠিক করলে কবে?

পরেশ বলিল—পঁচিশ তারিখ।

—গায়ে-হলুদ ?

—তার আগের দিন।

শিবকৃষ্ণ আসিয়া দেখা দিল···ব্যস্ত ভাব।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—খপর কি শিবকেষ্ট ?

গামছায় গায়ের ঘাম মুছিয়া শিবকৃষ্ণ বলিল—কুটুম-বাড়ীর লোকদের খাওয়া চুকলো।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—বটে !···রামরতন ওখানে আছে তো ?

শিবকৃষ্ণ বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বলিয়া শিবকৃষ্ণ ফরাশের এক কোণে বসিল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া সুশীল বলিল—একটা বাজে। একটা পনেরো মিনিটে হবে মেয়ের গায়ে হলুদ ছোঁয়ানো।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—হ্যাঁ। তুমি বাবা একবার ভিতর-বাড়ীতে গিয়ে মেয়েদের হুঁশ করিয়ে দিয়ে এসো।

—যাই···

সুশীল যাইতেছিল···বসিবার ঘরের বাহিরে পা দিতেই দেখা আলিসের সঙ্গে। আলিসকে সরস্বতী নিমন্ত্রণ করিয়াছে। আলিস বলিয়াছিল—আমি দেখবো মাসিমা, গায়ে-হলুদ। বাঙালীর মেয়ে হয়ে এ-সবের কিছু জানি না···দেখিওনি কখনো ! এ কথায় সরস্বতী আদর করিয়া বলিয়াছিল—এসো মা···নিশ্চয় আসবে। তুমি এলে আমরা খুব খুশী হবো। ঐখানেই তুমি সে দিন খাবে।

সরস্বতীর এ নিমন্ত্রণ আলিস সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছে।

আলিসকে দেখিয়া সুশীল বলিল—আসুন। ঠিক সময়ে এসেছেন কিন্তু···

স্মিত হাস্যে আলিস বলিল—মাসিমা আমাকে বলেছিলেন একটা-নাগাদ আসতে !···কিন্তু আমি আমাদের একটি বন্ধুকেও সঙ্গে এনেছি। ডেজি···আমাদের জর্ডান সাহেবের মেয়ে···ঐ যে।

আলিসের পিছনে একটু দূরে ফ্রক-পরা ইংরেজের মেয়ে ডেজি··· সস্মিত মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। আলিসের কথায় সুশীল তার পানে চাহিল।

আলিস পরিচয় করাইয়া দিল।

ডেজি বলিল—আলিসের কাছে শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছি,··· বিনা-নিমন্ত্রণেই।

সুশীল বলিল—আমাদের সকলের অন্তরের ধন্যবাদ। আপনার উপস্থিতিতে আমরা সত্যই আনন্দ বোধ করিতেছি।

এ-কথা বলিয়া সুশীল তাদের লইয়া অন্দরের দিকে চলিল। যাইতে যাইতে বিবাহ-পদ্ধতির বিবরণ সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল, গায়ে-হলুদ কি বস্তু···ইত্যাদি

অন্দরে মেয়েদের জমজমাট ভিড়। শাড়ী আর অলঙ্কারের বিচিত্র ঐশ্বর্য্য অঙ্গে ধরিয়া প্রতিযোগিতায় পরস্পরে যেন ধুম বাধাইয়া দিয়াছে।

সুশীলের সঙ্গে গাউন-পরা মেমের মেয়েকে দেখিয়া অন্দরে যেন চমক লাগিল ! কৌতূহলের সীমা-পরিসীমা নাই !—ওরে ও পুঁটি, ও টুনি···দিদি, পিসিমা···জ্যাঠাইমা···এমনি নানা সম্বোধনে যে যার আপন-জনকে ডাকিতে লাগিল···আসিয়া মেম-সাহেবকে দেখিয়া সকলে কৌতূহল চরিতার্থ করিবে।

আলিস ও ডেজিকে লইয়া ভিড়ের মধ্য দিয়া রোয়াক-দালান পার হইয়া সুশীল বড় ঘরের সামনে আসিল। এই ঘরে কন্যা মেনকাকে বসানো হইয়াছে। দ্বারের কাছে আসিয়া সুশীল ডাকিল,—মা···

সরস্বতী ছিল ঘরে। কদমকে দিয়া মেনকার কাপড়-চোপড় গুছাইয়া রাখিতে ছিল। নিজে মেনকার কোনো জিনিষ আজ স্পর্শ করিবে না ! করিতে নাই ! বিধবা মানুষ···স্নেহ যতই গভীর হোক, বিধবা বলিয়া তাঁর স্পর্শে শুভ কাৰ্য্যে যদি কিছু অকল্যাণ ঘটে !

সুশীলের আহ্বানে সরস্বতী চাহিল দ্বারের দিকে। কদমও চাহিল। চাহিয়া যা দেখিল···কদম একেবারে লাফ দিয়া দ্বারের সামনে আসিল।

আলিসের পানে চাহিয়া কদম প্রশ্ন করিল—ইনি ?

আলিস বলিল—আমার একটি বন্ধু···ডেজি। আমাদের যে বড়-সাহেব আছেন জর্ডান্ সাহেব, তাঁর মেয়ে। বাপের সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছে। আমি আসছি বিয়ের নিমন্ত্রণে···ডেজিও বিয়ে দেখতে চাইলো, তাই নিয়ে এলুম।

সরস্বতী শুনিল···বলিল,—বেশ করেছো মা, নিয়ে এসেছো। এই যে, কনে দেখবে, এসো···

বলিয়া সরস্বতী সাদরে তাদের ঘরের মধ্যে আনিল। সুশীলও আসিল। ইংরেজীতে অনেক কথা বুঝাইয়া দিল।

মেয়ের দল—ঘরে যারা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল···মেম দেখিয়া গুরুজনের ভর্ৎসনা বাঁচাইতে কোনো মতে পাশ কাটাইয়া বাহির হইতে পারিলে যেন বাঁচে, এমনি ভাব···অথচ মেম-সাহেবকে দেখার বাসনাও প্রবল।

সুশীল বলিল—তোমরা তৈরী হও মা···একটা বেজেছে। আর পনেরো মিনিট পরে গায়ে হলুদ দিতে হবে।

সরস্বতী বলিল—মনে আছে রে। এয়োদের তৈরী হয়ে নিতে বল্ মা কদম। বেলা বড় অল্প হলো না ! মেয়েটা শুকিয়ে রয়েছে···

ওদিকে বরণ···কলাতলায় স্নান···স্ত্রী-আচার···

ডেজি দেখিতে লাগিল···চোখে তার পলক পড়ে না !

সুশীল আসিল বাহিরে।

পরেশ গাঙ্গুলি বলিল—মেম-সাহেব সব দেখছে ?

—দেখছে বৈ কি !

পরেশ গাঙ্গুলির মুখ গম্ভীর। পরেশ গাঙ্গুলি বলিল—হুঁ···

সুশীল বলিল—মেয়েদের মধ্যে ক'জনকে দেখলুম, সিঁটিয়ে রয়েছে ···পাছে জাত যায়, সেই ভয়ে যেন আকুল !

২২

রাত্রি ন'টায় থিয়েটার···গ্রামের বিনোদ-বিলাস নাট্য-সমিতির অভিনয়।

সরস্বতীর দেওয়া শাড়ী পরিয়া কদম আসিয়া মেয়েদের আসরে বসিয়াছে ; তার মা অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীও আসিয়াছে। পাড়ার অল্পবয়সী মেয়েরা আসিয়া আসরে বসিয়াছে। আলাপ-আলোচনার অন্ত নাই। সে আলোচনায় যেমন মধু ক্ষরিতেছে, তেমনি বিষ।

কদমের আদর দেখিয়া এক-দল বৌ-ঝি হিংসায় যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল ! সব কাজে সরস্বতী চায় কদমকে ! কেন ? প্রধান এয়ো

হইবার যোগ্য মেয়ে কি আর দেশে ছিল না ? লতা আছে···চারুশীলা আছে···নবো আছে···তাদের ত্যাগ করিয়া ভট্টচাযি-বামুনের দ্বিতীয়-পক্ষের বৌ কদমকে করা হইল এয়োতির সেরা !

পাঁচি বলিল—জানিস, আমার শাশুড়ী বলে, দোজপক্ষের তেজ-পক্ষের বৌয়েদের দিয়ে বিয়ের কোনো কাজ হয় না ! বিয়ের কাজ করতে পারে শুধু প্রথম-পক্ষের বৌয়েরা। আমার শাশুড়ী বলে, দোজপক্ষের বৌ বৌ-ই নয় !

বনলতা হাসিয়া একেবারে ফাটিয়া পড়িল ! বলিল—যা বলেছিস্ ভাই, কথাটা কিন্তু সত্যি। দ্বিতীয়-পক্ষের বিয়ে বিয়েই নয়।

সাবিত্রীর বিবাহ হইয়াছিল দোজপক্ষের বরের সঙ্গে। কথাটা কাণে পৌঁছিবামাত্র সে ফোঁশ করিয়া উঠিল, বলিল—কেন নয়, শুনি ? তোমাদের মতো কুঁজড়ো নয়, ভিস্তুটে নয়, স্বামীকে দাঁতে চিবোয় না বলে' দ্বিতীয়-পক্ষের বৌ বৌ হবে না ? বটে ! তোমাদের চেয়ে হু'টো মন্তর কি তারা কম পড়েছে ? না, তাদের বিয়েয় নারায়ণ-শিলা আনা হয়নি ? হোম হয়নি ?

মুখ টিপিয়া পাঁচি বলিল—কি জানি ভাই ও-সব তত্ত্ব। বুড়ীরা বলে, শুনি।

আর এক দিকে মধ্য-বয়স্কাদের আসর। সেখানেও আলাপ-চক্র জমিয়াছে। সে-আলাপ ঐ আলিস আর ডেজিকে কেন্দ্র করিয়া।

বেণুর মা বলিল—শেয়াখালার খুড়ী কিছু খায়নি এ-বাড়ীতে। বললে, খিষ্টানবী নিয়ে ছিষ্টি একাকার ! মেলেচ্ছোপনায় গা ঘিন্‌ঘিন্ করে বসে, শুভ কাজে ওদের আনায় কি মঙ্গল হবে ?

কথাটা বলিয়া বেণুর-মা দারুণ দুশ্চিন্তাভরে কপাল কুঁচকাইলেন।

ঘোষাল-গৃহিণী বলিল,—আমি শুধু ভাবছি, কি রঙটাই না বিধাতা ঢেলে দেছে ঐ মেমসাহেবদের গায়ে। আমার নস্কর জন্ম বৌ খুঁজছি···অমনি রঙের একটি বৌ পাই যদি···

হাসিয়া বেণুর-মা বলিল,—তোর পা ধুয়ে জল খাবে না কি ! হুঁ তোর যেমন কথা ! এত রঙ কি বাঙালীর ঘরে হয় ! আঁতুড় ঘরে ওদের মদ ঢেলে চান করায় যে !···

তরঙ্গিণীর মা বলিল, সত্যি !···তা হোক, কিন্তু আমি বলি ! খিষ্টানী এনে এত মাখামাখি হচ্ছে···আর যত দোষ বুঝি গিন্নীর বেলায় ! মা···তাকে একবার আনলো না···সে এলেই বুঝি জাত যেতো ! হাজার হোক, মেয়ের মা তো !

বেণুর মা বলিল—মেনি গিয়ে মাকে নমস্কার করে' এসেছে··· সরো-ঠাকুরঝি নিয়ে গিয়েছিল···মাকে নমস্কার করে এসে তবে মেনিকে খাওয়াতে বসালো !

উৎকট একটা মুখভঙ্গী করিয়া বিধুমুখী বলিল—ঢং ! দে তো বেণুর মা তোর পানের বাটাটা এগিয়ে···

ক্যামাখ্যা চাটুয্যের বোন বলিল—তোরা কেউ যাস না তো গাঙ্গুলি-জ্যাঠাইমার কাছে···আমি যাই ! মাসে আমাকে দশটি করে টাকা দিত, এখনো দেয়। লক্ষ্মী যদি বলতে হয় তো ঐ গাঙ্গুলি জ্যাঠাইমাকে। ভাবি, এত ভালো হয়েও এত দুঃখ ভোগ তার কপালে ছিল !

তার পর বিধুমুখীর পানে চাহিল, কহিল—তোর পিসি আসবে না থিয়েটার দেখতে ? থিয়েটারের নামে পাগল···

বিধুমুখী বলিল,—থিয়েটার দেখতে আসবে বৈ কি। এ-বাড়ীতে খাবেই না, তা বলে থিয়েটার দেখতে আসবে না কেন !

কথায় শ্লেষ ভরিয়া কামাখ্যা চাটুয্যের বোন বলিল—কি জানি, মেম-সাহেবের হাওয়া লেগেছিল বাড়ীতে···সে-হাওয়ায় যদি জাত যায় !

বিধুমুখী কহিল—তা'ও বলবো বাবু, ওদের নেমন্তন্ন করেছিল, সরো পিসি। সরো পিসির ছেলে সুশীল···দেখলে না, ও তাদের মাথায় করে যেন নেচে বেড়াতে লাগলো ! হাজার হোক সোমত্ত ছেলে তুই···ওরাও সোমত্ত মেয়ে !

চারি দিককার আলোচনা কদমের কাণে যাইতেছিল। কদম গুম্ হইয়া শুনিতেছিল। মন এক-একবার ফুঁশিয়া উঠিতেছিল। ভাবিতেছিল, একবার ফণা তুলিবে না কি ?

এমনি চিন্তার মধ্যে হঠাৎ শুনিল বেণুর মার কথা। বেণুর মা বলিল—শিবকেষ্ট যা বলছিল, কথা ঠিক ! বলছিল, মেম-সাহেবকে নেমন্তন্ন করেছো, না হয় করেছো—তা বলে নিৎ-কর্ম্মের মধ্যে তাদের নিয়ে গিয়ে দাঁড়া-করানো কেন ? এ-সব হলো শুভকর্ম্ম··· আচারে কতখানি সাবধান হতে হয়।

কদম আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল,—তোমার মেয়ের বিয়েয় জামাই তার চট-কলের মনিব সাহেবদের এনে যে বাড়ীতে মহোৎসব করেছিল খুড়িমা। তখন তো এত জাতের এত কথা ভাবোনি !

দু'চোখে আগুন জ্বালিয়া বেণুর মা চাহিল কদমের পানে, বলিল— আ মর,—সেদিনকার ছুঁড়ি—তুই আমার মুখের উপর এত-বড় কথা বলিস্ !

কদম বলিল—তোমরা অত-বড় কাজ করতে পারলে, আর তার চেয়ে আমার কথাটা কি আরো বড় হলো খুড়িমা ?

কথা শেষ করিয়া কদম হাসিল।

সে-হাসি বেণুর মায়ের গায়ে যেন বিষ ছড়াইয়া দিল ! বেণুর মা মস্ত একটা পাণ মুখে পুরিয়া এক-মুঠা দোক্তা মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

হাসিয়া কদম কহিল—এত যদি তোমার গায়ে লেগেছিল, সে কথা পিসিমাকে তখন বলোনি কেন ? তাছাড়া শুনেছি, ঐ খিষ্টাননীরা থিয়েটার দেখতেও আসবে !

বেণুর মা এ-কথায় কোন জবাব দিল না। মুখ ফিরাইয়া আপন-মনে বলিল—নাঃ, এরা কখন্ পালা শুরু করবে, বুঝছি না। আমি আবার কোলের বাচ্ছাটাকে মুংলির মার কাছে রেখে এসেছি !

কদম বলিল—বেণুদা'র কচি বাচ্ছাকেও রেখে এসেছো খুড়িমা ?

—না। একালের বৌ তার মা···থিয়েটার দেখতে ছাড়বে না, আবার ছেলে ছেড়েও আসতে পারবে না ! তাকে নিয়ে বৌ-মা এসেছে এখানে থিয়েটার দেখতে ! আমি বললুম, ভালো করছো না বাছা—ছেলেটার অসুখ হতে পারে···বললুম, আমার বাচ্ছাকে আমি যদি রেখে আসতে পারি মুংলির মার কাছে, তুমিই বা কেন পারবে না ? তা রাজী হলো না, মুখখানা হাঁড়ি করে সরে গেল ! কাজ কি আমার কথা কয়ে, বাপু ! সোয়ামী রোজগার করে···আমাকে মানবে কেন ? এ হলো কালের দোষ···বুঝলে ঘোষাল-ঠাকরুণ ! আমাদের আমোলে শাশুড়ীর কথায় আমরা উঠতুম-বসতুম। আর একালের এঁরা···

কথা শেষ হইল না। ওদিকে চেঁচামেচির মধ্যে কন্সার্টের

ভেঁপু তুলিল বাক্-ফুটের প্রথম আর্ত্ত রব! মেয়েরা বলিল,—ঐ রে —চুপ কর্!

এদিককার গুঞ্জন কতক থামিল—ওদিকে তীব্র তীক্ষ্ণ ধ্বনিতে ধ্বনিয়া উঠিল বিনোদ-বিলাস নাট্য-সমিতির কনসার্ট।

বিবাহের দিন···

আলিস আর ডেজিকে লইয়া দু'-এক জনের মুখে যে আলোচনা-চক্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা থিতাইতে পারিল না। এ-বাড়ীর এমন সমারোহ···তার চাপে সব আলোচনা গেল বন্ধ হইয়া।

মস্ত ষ্টীমারে করিয়া বর-পক্ষ আসিয়া গ্রামের বাঁধা ঘাটে নামিল সন্ধ্যার সময়। সঙ্গে তিন দল গোরার বাজনা···এক-দল সানাই···আর অসংখ্য বরযাত্রী···তাছাড়া খাশগেলাস, আসাশোটা···সে কি সমারোহ!

ঘাট হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত পথের দু'ধারে চুণি-গ্লাশে দীপের মালা গাঁথিয়া পথ একেবারে আলোয় আলো করা হইয়াছে। বর-পক্ষের পৌঁছানোর সংবাদে বিবাহ-বাড়ী হইতে বোমা ফুটিল। তুবড়ি··· রকেট বাজি···এবং সুশীল চলিল বরকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে।

আলোর ফুলের-মালায়, রঙীন কাগজের নিশানে চতুর্দোলা সাজানো হইয়াছে। সে চতুর্দোলায় সাটিনের গদি পাতা বরের আসন। আসনের দু'পাশে দু'টি ইহুদী ছেলেকে ফ্রক পরাইয়া মেয়ে সাজানো হইয়াছে···তাদের হাতে চামর।

বর আসিল···বরকর্ত্তা···বরযাত্রীরা।

বাজনা-বাদ্য লোক-জনের কোলাহল-কলরবে গ্রাম যেন আনন্দে গর্ব্বে দুলিতে লাগিল।

মাখন গাঙ্গুলি আয়োজন যা করিয়াছেন, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছেন! মনে হয়, ইহার পর···?

রাত্রি এগারোটায় লগ্ন। মাখন গাঙ্গুলি বসিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তার পর স্ত্রী-আচার···বাসর।

বরকন্যা বাসরে গিয়া বসিয়াছে···হঠাৎ বিন্দুমতীর নিকট হইতে ভৃত্য আসিয়া সুশীলের সঙ্গে দেখা করিল।

যে-সংবাদ দিল, শুনিয়া সুশীল স্তম্ভিত! তার জ্ঞানবুদ্ধি যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল!

তাড়াতাড়ি সে গিয়া সরস্বতীকে সংবাদ জানাইল। সরস্বতী ছিলেন কাজে ব্যস্ত। সংবাদ শুনিয়া তাঁর হাত-পা কাঁপিয়া অবশ··· তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন! দু'চোখ কপালে তুলিয়া বলিল,—উপায়?

সুশীল বলিল—তুমি এ সব ফেলে এখনি মাসিমার কাছে যাও মা। আমি ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি। এতটুকু দেরী নয়।

সরস্বতী বলিল—সারা দিনে একটি বার বৌ-ঠাকুরুণের কাছে যেতে পাইনি। ভেবেছিলুম, এদিককার সব কাজ চুকিয়ে তার কাছে যাবো। তার···

সুশীল বলিল, কথা কবার সময় নেই মা। আমি চললুম ডাক্তারের কাছে। তুমিও একটুও দেরী করো না।

—না।

সুশীল ছুটিল ডাক্তারের উদ্দেশে।

এখানকার হাসপাতালের ডাক্তার বঙ্কু বাবু নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। সুশীল তাঁকে নিজে বসাইয়া খাওয়াইয়াছে। তাঁর কাছে ছুটিল।

মাখন গাঙ্গুলিকে কোনো কথা না বলিয়া এখানকার ডিউটি অপরকে বুঝাইয়া সরস্বতী যাইতে উদ্যত হইল।

দেখিয়া কদম আসিয়া বলিল,—কোথায় যাচ্ছো পিসিমা?

—বৌঠাকরুণের বড্ড অসুখ রে কদম। এইমাত্র লোক এসেছিল খপর দিতে। আমি সেখানে যাচ্ছি।

—আমিও যাবো পিসিমা, তোমার সঙ্গে।

—তুই যাবি?

—হ্যাঁ। সেবা করবার লোক চাই তো!

—তা বটে। তা হলে আয় মা।

—কি অসুখ পিসিমা?

—কলেরা।

—এঁ্যা!

কদম শিহরিয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

হায় রে হায়!

কত কি যে ভেবেছিলেম—হলো নাকো কিছু তার!
রঙীন ফানুশ যত গড়ি—ফেঁশে যায় তা বারংবার।

ব্যবসা করে' সবাই দেখি ব্যাঙ্কে জমায় দেদার টাকা!
আমার বেলায় মাথায় চাটি—সিন্দুকটি হলো ফাঁকা!
বিয়ে করে' রূপসী বৌ আনছে ঘরে রাম-শ্যামা—
আমার ভাগ্যে কৃষ্ণ-কালী—এলেন রণচণ্ডী বামা!
রেশে গিয়ে টিকিট কিনে সবাই দিব্যি পাচ্ছে ঘোড়া—
আমার ভাগ্যে রেশের মাঠে কেবল দাদা, কচুপোড়া!
বর্ষা দেখে দোকানে যাই নগদ-দামে কিনি ছাতা—
বেরিয়ে দেখি, বৃষ্টি কোথায়? ছাতার বোঝা হাতে গাঁথা!
হি-হি শীতে চড়া দামে কিনে আনি ওভারকোটে!
সূর্য্যি ঠাকুর হলেন প্রখর—শীত সে পালায় তাঁর দাপোটে!
ট্রাম ধরতে যেমনি ছুটি 'রোখো' 'রোখো' বলি থেয়ে—
দাঁড়ায় না ট্রাম—ছুটে পালায়—যেন আমি ফেলবো খেয়ে!

জরুরি কাজ—ট্রামেতে নয় উঠবো তীরের গতি বাসে—
কূর্ম্ম-গতি অমনি সে-বাস—নয়তো বাসের টায়ার ফাঁশে!
সবাই দেখি মোটর হাঁকায়—গড়গড়িয়ে পথে চলে।
আমার মোটর চললে পথে পথের মানুষ পড়ে তলে!
বাড়ী ভাড়া করি দেখে সদ্য-নূতন কী কর্‌কার!
বর্ষাতে তার ফুটো ছাদে অঝোর-ধারে বৃষ্টি ঝরে!
হচ্ছে নীলেম—ছুটে গেলাম কিনবো জিনিষ শস্তা দামে—
যেটা ডাকি, 'রেকারিডে' দাম চড়ে তার—নাহি থামে!
চশমা আমার নিত্য হারায়—নিত্য আমার ছেঁড়ে জুতো—
ম্যাচের মাঠে সবাই ঢোকে—আমি রে খাই রুলের গুঁতো!
ভাবি, এত দুষ্ট গ্রহে বেঁচে আমি আছি যে সে
এত ভোগান্ ভুগবো বলে—নয়তো কবে যেতেম টেঁশে!

শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

দশ বৎসর পূর্ব্বে—

দশ বৎসর পূর্ব্বে প্যারির 'ভূ' পত্রে সাংবাদিক জ্রঁ-লা-রোশেল তৎকালীন আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম 'মাসিক বসুমতীর' পাঠকদিগকে বণ্টন করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। সাংবাদিক লিখিয়াছিলেন—

"পাঁচ বৎসরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী পরস্পরকে আক্রমণ করিবে। ফ্রান্সের পরাজয় সুনিশ্চিত। অপর জাতিরা হস্তক্ষেপ করিবে। য়ুরোপে জার্ম্মাণ-বিজয়কে তুচ্ছ করিবার মত শক্তি একাকী ইংলণ্ডের হইবে না। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা বহু দূরে, তাহাদের অপর কর্ত্তব্যও আছে। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপ-বিস্ফোরণ এবং ভারতে অনিবার্য্য বিদ্রোহের ফলে ইংলণ্ডকে সম-বিপন্ন আমেরিকার সহিত মিত্রতা করিতে হইবে। জাপানের নির্ম্মম আত্মপ্রসারের ফলে বিশ্ব-সংগ্রামের উদ্ভব হইবে। য়ুরোপীয় যুদ্ধ এই সংগ্রামেরই ফল মাত্র। ইটালী বুঝিবে জার্ম্মাণীর তাঁবেদার হইয়া থাকা চলিবে না। আগামী যুদ্ধে রুশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক চাই না করুক, সে হিটলারী জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্টদিগের অর্দ্ধ-সমাজতন্ত্রবাদের সহিত রুশ কম্যুনিষ্টদিগের অর্দ্ধ-ফাসিবাদের বিরোধ ঠিক প্রাচীন রুশ-জার ও জার্ম্মাণ-কাইজারদিগেরই বিরোধ। উভয় পক্ষে একই মূল জাতীয়তা-বোধ, একই প্রকারের প্রচার ও বিশ্বজয়ের লিপ্সা। এই যুদ্ধের জন্য রুশিয়া তাহার সকল শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিবে।

"রুশিয়া জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে অভিযান করিবেই, পোল্যাণ্ড জার্ম্মাণীর সপক্ষই হউক বা বিরুদ্ধেই যাউক, রুশিয়া পোলরাজ্য আক্রমণ করিবে। মিত্রভাবেই হউক বা শত্রুভাবেই হউক, রুশিয়া পোল্যাণ্ড এবং রুশ-সীমান্তবর্ত্তী শ্লাভ দেশগুলির সীমান্ত অতিক্রম করিবে। এ সকল দেশে সোভিয়েট শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে।

"রুশিয়া অনায়াসে রুমানিয়ায় প্রবেশ করিবে। পোল্যাণ্ড ও রুম্যানিয়া, তথা পূর্ব্ব-য়ুরোপের বুর্জ্জোয়া সমাজ রুশ-কম্যুনিষ্ট প্রভাব অপেক্ষা জার্ম্মাণ-ফাসিষ্ট প্রভাবই পছন্দ করিবে। এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, জার্ম্মাণী পোল্যাণ্ড ও রুম্যানিয়া সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করিতে পারিবে না। তখন তাহার মনে হইবে, ভার্শাইল সন্ধিই ভাল ছিল। এই সন্ধির ফলে কম্যুনিষ্ট রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে কয়েকটি প্রাচীর-রাষ্ট্র স্থাপিত হয়।

"কিন্তু বুর্জ্জোয়া য়ুরোপ ক্রমবর্দ্ধনশীল অগ্রযায়ী প্রভাবের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীকেই রক্ষা-কবচ বলিয়া মনে করিবে। ইহারই জন্য য়ুরোপের সর্ব্বত্র, এমন কি ফ্রান্সে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণপন্থীদল গড়িয়া উঠিবে!

"আগামী য়ুরোপীয় যুদ্ধ মাত্র ধনিক-শ্রমিকের সংগ্রাম নহে, উহা এক বিরাট আন্তর্জ্জাতিক সংগ্রামে পরিণত হইবে। গত মহাযুদ্ধ ছিল মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যগুলির মধ্যে সংগ্রাম। এই সংগ্রামের ফলে কয়েকটি গণতন্ত্রের উদ্ভব হইয়া মধ্য-য়ুরোপের প্রাচীন অভিজাত ও রাজবংশগুলির প্রভাব নষ্ট হয়। আগামী যুদ্ধ হইল, কম্যুনিজমের সহিত ফ্যাসিজমের মরণপণ যুদ্ধ! যদি পাশ্চাত্য বুর্জ্জোয়ারা জার্ম্মাণীকে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে রুশিয়ারও জয় হইবে। পশ্চিমের বুর্জ্জোয়া সৈন্যবাহিনী জার্ম্মাণীতে পদার্পণ করিয়া দেখিবে যে, রুশিয়ার লাল ফৌজ তথায় অগণিত সোভিয়েট স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছে!

"কিন্তু জার্ম্মাণ-বিতৃষ্ণার জন্য পশ্চিমের জাতিগুলি সোভিয়েট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, ইহা অসম্ভব। মিত্রপক্ষগণ জয়ী হইলে কি হইবে? জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্টদিগের বিরুদ্ধে ফরাসী বুর্জ্জোয়ারা রুশ কম্যুনিষ্টদিগের সহিত ভাব করিবে। ফরাসী বুর্জ্জোয়ারা এই মিত্রতা না করিলে পরিণামে হয়ত জার্ম্মাণীর সহিতই তাহাদিগকে মিত্রতাবদ্ধ হইতে হইবে। ইহার ফলে জার্ম্মাণী মিত্র-ফ্রান্সের গলা টিপিয়া মারিবে। যাহা হউক, ফ্রান্সে জার্ম্মাণপন্থী ও সোভিয়েট-পন্থী দুই দল হইবে। ফরাসী কম্যুনিষ্টরা অধিকতর জাতীয়তা ভাবাপন্ন হইবে।

"জার্ম্মাণদিগকে এড়াইবার জন্য হয় রুশপন্থী হওয়া, অথবা রুশদিগকে এড়াইবার জন্য জার্ম্মাণপন্থী হওয়া—মাত্র ফ্রান্স নহে, ইংলণ্ড এবং ইটালীতে পর্য্যন্ত একই প্রকারের সমস্যার উদ্ভব হইবে। ইহার ফলে জার্ম্মাণ ও রুশ-বিদ্বেষী এক তৃতীয় দলের উদ্ভব হইতে পারে। এই দলে রহিবে— ক্ষুদ্র শ্লাভ ও বাল্টিক জাতিগুলি এবং কম্যুনিজ তথা জার্ম্মাণ-প্রভাবভীত ইংলণ্ড ফ্রান্স ও ইটালী (জার্ম্মাণ মৈত্রী অপেক্ষা ফরাসী মৈত্রীতে ইটালী বেশী লাভ আছে মনে করিবে)। কিন্তু এ জন্য ফ্রান্সকে রুশ মৈত্রী পরিহার করিতে হইবে, এবং ইংলণ্ড ও ইটালীকে অনিশ্চিত মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

"আপাতঃ-দৃষ্টিতে পৃথক্ তিনটি রাজনীতিক মতবাদের—ফ্যাসিজম, কম্যুনিজম ও ডিমোক্রাসীর মধ্যে যুদ্ধ চলিবে। রুশ-কম্যুনিষ্টরা গণতন্ত্র বিরোধী, সুতরাং ফ্যাসিষ্টদিগের সহিত ইহাদিগের কতকটা মিল আছে। রোম ও বার্লিনের ফাসিষ্টরা ষ্টেট ক্যাপিটালিজমের পক্ষপাতী। সুতরাং আর একটু অগ্রসর হইলেই তাহাদিগের সহিত সমাজতন্ত্রীদিগের মতের কোন অমিল থাকে না।

"মনে হইতেছে, পরিণামে এই যুদ্ধে ইটালী জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে, ফ্রান্স রুশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। মহা ধ্বংসের মধ্য হইতে প্রবলতম রাষ্ট্রের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। গত যুদ্ধের ফলে য়ুরোপে ব্যক্তি-স্বাধীনতা যেরূপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আগামী যুদ্ধের ফলে সেরূপ জাতীয় স্বাধীনতাও নষ্ট হইয়া যাইবে।"

দশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী সাংবাদিক যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনা কালে পাঠকগণ আশা করি তাহা স্মরণ রাখিবেন।

সাত দিকে আক্রমণ—

বর্ত্তমানে জাপ-জার্ম্মাণ শক্তিসঙ্ঘকে সাত দিক্ হইতে আক্রমণ করা হইতেছে—

১। আটলাণ্টিক উপকূল হইতে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের উপর।

২। ফরাসী উপকূল হইতে বার্লিন পর্য্যন্ত এবং ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল হইতে বল্কান অঞ্চল পর্য্যন্ত মার্কিণ বিমানের আক্রমণ।

৩। উত্তর-ইটালীতে পরাজিত জার্ম্মাণ সৈন্যদিগের পশ্চাদ্ধাবন।

৪। রুশিয়ার পূর্ব্ব-প্রুশিয়ায় অভিযান।

৫। রুম্যানিয়া বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে রুশ-প্রভাব বর্দ্ধিত হইবার ফলে জার্ম্মাণ সামরিক শক্তির ধ্বংস-প্রচেষ্টা।

৬। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপ অধিকৃত দ্বীপগুলির উপর, এমন কি খাস জাপ-দ্বীপপুঞ্জের উপর মার্কিণ আক্রমণ।

৭। ভারত-ব্রহ্ম তথা চীন-ব্রহ্ম সীমান্তে জাপশক্তি খর্ব্ব করিবার চেষ্টা।

ফ্রান্স কে শাসন করিবে?—

সেপ্টেম্বর মাস পড়িতেই রুশিয়া যেমন পূর্ব্ব-প্রুস্রিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে, তেমনি উহার প্রায় এক সপ্তাহ পর মার্কিণ সৈন্য জার্ম্মাণীর পশ্চিম সীমান্তে সিগফ্রিড লাইনের ৫ স্থানে আক্রমণ করিয়া জার্ম্মাণ-এলাকার উপর অগ্নিবর্ষণ করিয়াছে। অন্য দিকে বৃটিশ সৈন্য বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুশেলস এবং হল্যাণ্ডের এণ্টোয়ার্প জার্ম্মাণ-কবলমুক্ত করিয়াছে। জেনারল ডি'গল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের ৬ ভাগের ৫ ভাগ স্থান জার্ম্মাণ-কবলমুক্ত হইয়াছে।

এংলো-স্যাক্সন সৈন্য এবং ডি'গলপন্থী ফরাসী দেশপ্রেমিক দল এরূপ সাফল্য লাভ করিলেও ফ্রান্স সম্বন্ধে মার্কিণ মনোভাব সুস্পষ্ট নহে। ডি'গল সম্বন্ধে একটা খটকা কোথাও যেন রহিয়া গিয়াছে। ফ্রান্স সম্বন্ধে মিঃ রুজভেল্টের নীতি হইল—ফ্রান্সের বর্ত্তমান শাসনভার মিত্রপক্ষের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে রহিবে। ডি'গলের ইহা মনোমত নহে। তিনি বলিয়াছেন এই পরিকল্পনা—"is not acceptable to us, and it might provoke in France incidents which must be avoided."

জার্ম্মাণীর পিতৃভূমি বিপন্ন—

জার্ম্মাণীর যে মহা সঙ্কট উপস্থিত, তাহা জার্ম্মাণরাও আজ অস্বীকার করিতেছে না। জার্ম্মাণী রণক্লান্ত, মিত্রপক্ষের অবিরাম বিমান আক্রমণ ও বোমা প্রহারে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জীব; তবু জার্ম্মাণদের অতি তীব্র দেশপ্রাণতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই বলিয়া আজিও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। তাহারা এখনও এ কথা ভাবিতে পারিতেছে না যে, তাহাদের পিতৃভূমির (Vaterland) সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত। এখনও হিটলারের প্রতি তাহাদের আস্থা ও আকর্ষণ হ্রাস পায় নাই। মার্কিণ সাংবাদিকগণ তাই লিখিয়াছেন—"Through Switzerland came reports that Hitler still ranked first in German affections. The oft-repeated statement that the Fuhrer would know precisely when to order a crushing counter offensive still had power to persuade. The invaders in the west, the Russian armies in the east still had to break into the Germans' last fortress, their will to survive."

মিত্রপক্ষ অবগত হইয়াছেন যে, জার্ম্মাণীকে রক্ষা করিবার জন্য যাহাতে রুশিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর একটা রফা হয়, তজ্জন্য জাপান এখনও অত্যন্ত চেষ্টা করিতেছে। এ চেষ্টা সফল হইলে রাষ্ট্রনৈতিক এক মহা বিপ্লবের উদ্ভব হইবে।

পোল্যাণ্ড—

৫ই সেপ্টেম্বর সংবাদ প্রচারিত হয় যে, জার্ম্মাণী ওয়ার্‌সর "ওল্ড টাউন" মহল্লা দখল করিয়াছে। সহরের মধ্য-অঞ্চলে অবিরাম বোমাবর্ষণ হইতেছে। পোলাণ্ড এখনও রুশ-সাহায্য পাইতেছে কি না জানা যায় নাই।

বল্কান অঞ্চলে—

পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া যায় যে, বুলগেরিয়া রুশিয়ার সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ৫ই সেপ্টেম্বরে সংবাদ পাওয়া যায় যে, রুশিয়া বুলগেরিয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। ইহার ৪ দিন পরেই উভয় পক্ষের দ্বন্দ্বের অবসান হয় এবং বুলগেরিয়া জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্ম্মাণরাও সোফিয়ার উপর বোমাবর্ষণ করে।

রুম্যানিয়ায় জার্ম্মাণ-কবল হইতে রুশ-রুম্যানীয় সৈন্য অনেক স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানে মধ্য-য়ুরোপের দ্বারস্বরূপ সিবিউ সহর হইতে জার্ম্মাণরা বিতাড়িত হইয়াছে।

রুশ সৈন্য বুলগেরিয়া অতিক্রম করিয়া ইজিয়ান সাগরের উপকূলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বোধ হয়, এ জন্যই বল্কান এবং সন্নিহিত দ্বীপগুলি হইতে জার্ম্মাণ সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইতেছে। ইজিয়ান সাগরের উত্তর ভাগের দ্বীপগুলি, এমন কি ক্রীট হইতেও তাহারা সরিয়া যাইতেছে।

জাপানের হাল—

ইঙ্গ-মার্কিণ দাবী এই যে, তাহারা ব্রহ্মের দশমাংশ দখল করিয়াছে। তাহারা মিটকিনা হইতে মান্দালয় পর্য্যন্ত ৫০ মাইল রেলপথ দখল করিয়াছে। মৌলমিন-ব্যাঙ্কক রেলপথের উপর বোমা আক্রমণ চলিতেছে। ইম্ফল হইতে দক্ষিণে প্রায় ১১০ মাইল স্থান হইতে জাপ-সৈন্য বিতাড়িত হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।

চীনে কিন্তু জাপশক্তির সহিত আঁটিয়া উঠা যাইতেছে না; তাই সামরিক পর্য্যবেক্ষণ-বিশেষজ্ঞগণ আশঙ্কা করিতেছেন—"On this front especially there was danger of enemy gains that might prolong the war for months, even years,

জাপান পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতা প্রদান করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে! শুনা যাইতেছে যে, এ অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য কুইবেকে চার্চ্চিল ও রুজভেল্ট জাপ-দ্বীপপুঞ্জও আক্রমণের বিষয় আলোচনা করিতেছেন। জাপ প্রধান-মন্ত্রী তথা স্বয়ং জাপ-সম্রাট্ জনসাধারণের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন যে, অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর, এই সঙ্কটে সমগ্র জাতিকে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। কুইবেক বৈঠকে জাপানের বিরুদ্ধে এংলো-স্যাক্সন আক্রমণের যে সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা মাথা পাতিয়া লইয়া জাপান আত্ম-সমর্পণের সিদ্ধান্ত করিয়া আত্মরক্ষার যুদ্ধ করিবে কি না, এখন হইতে তাহা কিছুই বলা যাইতেছে না।

শ্রীতারানাথ রায়

বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বিবরণ

[নক্সা]

কাগজকে সরকার যতই কণ্ট্রোল করুক, বঙ্গ-সাহিত্যের অগ্রগতির আর মার নাই ! বৃষ্টির জল পড়িলে আগাছার ঝাড় যেমন সব বাধা ঠেলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, বঙ্গ-সাহিত্য তেমনি আজ এযুগের সিনেমা-থিয়েটার, মাসিক-ত্রৈমাসিক-বার্ষিক পত্রিকার ধারা বর্ষণে সতেজে প্রগতিশীল কয়েক জন প্রতিভাধরের মগজ ফুঁড়িয়া মাথা তুলিয়া খাড়া হইতেছে। এ সাহিত্য আজ নানা দিক্ দিয়া অজস্র স্তুতি-গুঞ্জিত কনটিনেণ্টাল সাহিত্যের মুখে নুড়া জ্বালিয়া দিবার সামর্থ্য-শক্তি লাভ করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না !

কিন্তু কনটিনেণ্টাল সাহিত্যের সহিত আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের তুলনা সমালোচকের দল করিবেন; আমরা বঙ্গ-সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবরণ মাত্র সংগ্রহের প্রয়াস পাইব।

আমাদের দেশে অনেকের মনে বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা আছে। সে ধারণা এই যে, বঙ্গ-সাহিত্য না কি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই কাশীরাম-কৃত্তিবাসের আমোলে। এ কথা সত্য নয়। "আদেখ্‌লের কাঙ্‌লাপনা" ! আজো অনেকে ঐ ইলেকট্রিক্ ট্রাম দেখিয়া বলেন, প্রাচীন যুগে ও-গাড়ী ছিল ! আকাশে প্লেনের রকমারি বৈচিত্র্য দেখিয়া অনেকে বলেন, প্রাচীন যুগে আমাদের দেশে প্লেন ছিল—সে প্লেনের নাম ছিল পুষ্পক-রথ—সেই রথে চড়িয়া রাজা-রাজড়ারা না কি স্বর্গে যাইতেন—যুদ্ধ করিতে, উর্ব্বশী-মেনকার নাচ দেখিতে এবং এমনি বহুবিধ নিমন্ত্রণ-রক্ষার উদ্দেশ্যে ! এ কথা শ্রেফ গাজুরি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা ঐতিহাসিক—আমরা প্রমাণ ব্যতিরেকে কোনো কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। ইঁহাদের কথা যদি সত্য বলিয়া মানিতে হয় যে, ঐ প্লেনই সে যুগে ভারতের আকাশে পুষ্পক রথ নামে বিচরণ করিত, তাহা হইলে সে প্লেনের একখানা ভাঙ্গা চাকা কিম্বা কোনো অংশ (part) মৃত্তিকাগর্ভ হইতে প্রত্নতাত্ত্বিকের দল খুঁজিয়া পাইতেন না ? ডায়োনেসোরাস প্রভৃতি প্রাচীন যুগের অতিকায় জানোয়ারের অস্থি-কঙ্কাল মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে পাওয়া যাইতেছে বলিয়াই না তাদের অস্তিত্ব আজ আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য—তেমনি পুষ্পক-রথের পার্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যয় রাখা মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণ ভিন্ন কোন-কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলে সে-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হইবে, এ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থাকিতে পারে না।

এই ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে গেলে বঙ্গ-সাহিত্য ছিল বলিয়া সাবেকী ছাপা যে কয়েকখানি "বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস" বইয়ের দোকানে বা লাইব্রেরীতে আমরা দেখিতে পাই, সেগুলিকে নিছক কল্পনা বলিয়া মনে করিতে হইবে। কাজ না থাকিলে সেকালের মেয়েরা যেমন খই ভাজিত এবং পুরুষরা করিত বুড়া খুড়ার গঙ্গাযাত্রা, তেমনি এ যুগের কিছু কাল পূর্ব্বে যে আধো-আলো আধো-আঁধার যুগ আবির্ভূত হইয়াছিল, সে যুগের অনেকে তেমনি লেখায় হাত পাকাইবার বাসনায় যা-তা লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের উপন্যাস বা বিবরণ লিখিত; এবং কনটিনেণ্টের জ্ঞানবুদ্ধির সংস্পর্শ বিরহিত থাকার দরুণ সেই সব যা-তা লেখাকে সাহিত্য বলিয়া ভুল করিত। সেই ভুলের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশ, অমৃতলাল, হেম-নবীনকে সাহিত্য-স্রষ্টা বলিয়া অনেকে চূড়ান্ত পাগলামি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা আজ ধূলিসাৎ করিয়া দেওয়া বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত ভক্তজনের একান্ত আবশ্যক।

একটি প্রাচীন কথা সকলেই জানেন 'রাম না হতে রামায়ণ।' তেমনি বাস্তব জগতে দেখি, বড় বড় অনুষ্ঠান যখনই দেখা দিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে চলিয়াছে প্রচার বা প্রোপাগাণ্ডা বা পাবলিসিটি। এই যে নির্ব্বিকার বাঙ্গালার মিনিষ্ট্রী—আত্মরক্ষার জন্য তাহাকেও খুলিতে হইয়াছে পাবলিসিটি বিভাগ। বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ মায় রেলোয়ে—সর্ব্ববিধ বৃহৎ ব্যাপারে পাবলিসিটি বিভাগ চাই সর্ব্বাগ্রে। এত বড় বঙ্গসাহিত্য—যাহাকে কনটিনেণ্টের সঙ্গে পাল্লা দিতে হইবে, তাহার পাবলিসিটি বিভাগ থাকিবে না ?

পূর্ব্বযুগে বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যাঁহাদের লেখা বহু গ্রন্থ দোকানে লাইব্রেরীতে দেখা যায়,—সেগুলির প্রচার-কল্পে পাবলিসিটি বিভাগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; অতএব তাঁহাদের গ্রন্থকে গ্রন্থমাত্র বলা চলে। সেগুলিকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। সেদিন একখানি গ্রন্থের—তাও অনুবাদ-গ্রন্থ—সমালোচনায় এক জন লেখক লিখিয়াছেন, আর কেহ ভালো অনুবাদ করিলে তাহা অনুবাদ মাত্র হইত—সাহিত্য হইত না। অর্থাৎ 'আর কেহ'র বেলায় ঢাকের পাবলিসিটি নাই তো, কাজেই তাহা হইত অনুবাদ মাত্র; সাহিত্য হইত না! তথা-কথিত অনুবাদ-গ্রন্থখানি পাবলিসিটির কল্যাণ-স্পর্শ পাইয়াছে বলিয়াই সাহিত্য হইয়াছে।

কিন্তু সে কথা যাক।

বহু গবেষণায় আমরা দেখিতেছি, বঙ্গ-সাহিত্যের পত্তন হইয়াছে পারস্পরিক স্তুতিবাদসঙ্ঘ সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে—আজ প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে 'প্রগতিবাদী' নাম দিয়া এক দল অপূর্ব্ব প্রতিভাধর এবং সবল্যস্বাস্থ্য তরুণ লেখনী-হস্তে দেশের মুণ্ডে বসিয়া বঙ্গ-সাহিত্য সৃষ্টি-কল্পে যেদিন কোমর বাঁধিলেন—তখন হইতেই অকৃত্রিম বঙ্গসাহিত্যের জন্ম !

'কর-খল' পাঠ অক্ষর পরিচয়মাত্র সকলেই পড়িতে ও বুঝিতে পারে, নামতা মুখস্থ করিয়া অঙ্কে-অঙ্কে গুণ করা অনেকের সাধ্যায়ত্ত; কিন্তু ঐ 'কর-খল' বা bla ব্লে cla ক্লে'র দল সেক্সপীয়র, বেকন বুঝিতে পারে না।—আলডুস্ হাক্সলির নাম বানান করিতে পারে না। নামতা-মুখস্থকারীরা Statics Dynamics বা Higher Mathematics-এ যেমন দন্তস্ফুট করিতে পারে না—যেহেতু উচ্চ-ভাবের অঙ্ক বা পাঠ পরিণত-শিক্ষিত মনের আয়ত্তাধীন—ইহা বিশেষ সাধনায় আয়ত্ত করিতে হয়; তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখা সকলে জলবৎ বুঝিতে পারে বলিয়া তাহাকে সাহিত্যপদবাচ্য করিলে সাহিত্যকে লঘু করা হয়। সাহিত্য মানে সেই ধর্ম্মস্য তত্ত্বং

নিহিতং গুহায়াং-বৎ ; অতি-বুদ্ধির মাত্র অতিক্রমণীয় এবং এই তৌলে পরিমাপ করিয়াই সাহিত্যের বিচার করিতে হইবে।

এ তৌলে বিচার করিলে দেখিব, সাহিত্য হইবে জটিল, কঠিন দুর্ব্বোধ্য ; সাধারণে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না। কালিদাসকে বুঝিবার জন্য যেমন চাই মল্লিনাথকে, তেমনি সাহিত্যকে বুঝিতে চাই মল্লিনাথের মতো টীকাকার। এই টীকাকারের আমরা সাক্ষাৎ পাই প্রগতিবাদী-আখ্যাধারী সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে—এক বোঁটায় যেমন দু'টি বেগুন তেমনি ভাবে সাহিত্যস্রষ্টাদের সঙ্গে টীকাকারের উদয় হইয়াছে—আজ বিশ-পঁচিশ বৎসর মাত্র।

এই প্রগতি-যুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে যমজের মত উদয় হইলেন সাহিত্য-স্রষ্টা এবং টীকাকার। কিন্তু একটু পার্থক্য ঘটিল অর্থাৎ যিনি টীকাকার, তিনি শুধু সাহিত্যের টিপ্পনী কাটিয়াই নিবস্ত রহিলেন না ; যিনি সাহিত্য-স্রষ্টা তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না ; উভয়ে যোগসূত্র রচনা করিলেন অঙ্গাঙ্গি মিলনের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ব্যবস্থা—সাহিত্য-স্রষ্টা যখন সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন, টীকাকার তখন করিবেন সে সাহিত্যের টিপ্পনী পাবলিসিটি এবং টীকাকার যখন সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন তখন সাহিত্য-স্রষ্টা হইবেন তাঁহার টীকাকার বা পাবলিসিটি-মিনিষ্টার। আমাদের এ-কথা কত খানি সত্য, প্রগতি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিলেই মতিমান্ লোক তাহা বুঝিবেন।

ইতিহাস পর্য্যালোচনায় দেখা যায়, সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রগতিবাদীরা সাহিত্য-সৃষ্টির সম্বন্ধে কয়েকটি মূল-সূত্র নির্দ্ধারণ করিলেন।

১। সাহিত্যকে রাখিতে হইবে সর্ব্বজনের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য-জটিল। তাঁহাদের সার্টিফিকেটেড্ টীকাকার ভিন্ন সাহিত্যে কাহারও দন্তস্ফুট হইবে না।

২। সাহিত্যসৃষ্টিতে সর্ব্বদা নজর রাখিতে হইবে বিরাট্ বিশাল কনটিনেণ্টের দিকে ! দেশের দিকে চাহিয়াছ কি মরিয়াছ ! অর্থাৎ সাহিত্যে এমন সব ভাব আমদানি করিতে হইবে, যে সব ভাবের সঙ্গে দেশের নাড়ীর এতটুকু যোগ থাকিবে না। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নামে এক জন ভদ্রলোক সেই যে লিখিয়া গিয়াছেন•••

আমরা বিলাতী ধরণে হাসি
ফরাসী ধরণে কাশি—

তেমনি যে-সব নর-নারীর কথা প্রগতি-সাহিত্যে লিখিত হইবে, তাহাদের হাব-ভাব, ঢং-ঢাং, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-অভাব—সব হইবে বিদেশী ছাঁদের।

৩। টীকাকার ঠিক করিয়া তবে সাহিত্য রচনা করিতে হইবে ; নহিলে সাহিত্য হইবে অত্যন্ত অসহায় গোবেচারা ! দাঁড়াইবার জন্য সে সাহিত্য পায়ে জোর পাইবে না।

৪। প্রগতিবাদী ভিন্ন অপরে যদি সাহিত্য-রচনার প্রয়াস করে, তাহা হইলে সে প্রয়াস দেখিয়া যতই নিজের টিঁকিয়া থাকা সম্বন্ধে হতাশ হও না কেন,—খবর্দ্দার, বাক্যে বা আচরণে তাহা যেন প্রকাশ না পায় ! সে সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়া কিছুতে মানিবে না—সে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবে ভাশুর-ভাদ্রবৌ-বৎ—অর্থাৎ তার দিকে চাহিয়াও চাহিবে না !

৫। স্বদলকে চটাইবে না, ঘাঁটাইবে না। কথামালার গল্প ভুলিয়ো না—Union is strength.

৬। থাকিয়া থাকিয়া নিজেদের জয়-জয়ন্তী উৎসব করা চাই—পাঁজি খুলিয়া জন্ম-তারিখ দেখিয়া। ক' পেয়ালা চা, ক'টা সিঙ্গাড়া-কচুরি, কিছু ঝুরিভাজা আর ক' ছড়া ফুলের মালা বৈ তো নয় ! এ ব্যয় করিতে কার্পণ্য কদাচ করিবে না।

৭। একখানি করিয়া মাসিক পত্রিকা—তাহার ব্যয় জোগানো সম্ভব না হইলে দ্বৈমাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক অথবা বার্ষিক পত্রিকা বাহির করিতে ক্রটি যেন না ঘটে। এ-সব পত্রিকায় নিজেদের জয়গান লিখিয়া ছাপানো চাই—সে সঙ্গে স্বদলের অজস্র সুখ্যাতি করিতে হইবে। ঢাকের আওয়াজে প্রচার—এ ব্যবস্থা সনাতন—শ্রীবৈষ্ণবের নাম সঙ্কীর্ত্তন আর মালপো-ভোগে সারা দেশ যেমন বৈষ্ণব-ধর্ম্মে মনপ্রাণ সঁপিয়া দিয়াছিল, তেমনি ঢাকের আওয়াজে দিশাহারা হইয়া লোকে তোমাদের দলের পানে হাঁ করিয়া তাকাইবে। ঢাকের বাদ্য থামিলেই গিয়াছ—এ কথা মনে রাখিয়া সাহিত্যের আসরে নামিতে হইবে।

৮। সাহিত্যে সর্ব্বদা novelty ঢুকাইতে হইবে। 'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ' ! এ-কথা গোটুহেল করিতে হইবে। নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখী নয়। মহেন্দ্র, আশা, বিনোদিনী নয়—মেশের ঝী, বস্তীর আমিনা, কাদের—শেঠবাগানের ডালিম, গোলাপ—তাদের কথা সাহিত্যে ঢুকাইতে হইবে। কবিতায় চাঁদ নয়, জ্যোৎস্না নয়, ফুল নয়, নদী-গিরি নয়—নালা-নর্দ্দমা বা ডাষ্টবিন উপুড় করিয়া দিতে হইবে। মানুষ চিরদিন noveltyর কাঙ্গাল, এই তত্ত্ব বুঝিয়া সাহিত্যের দুর্গপ্রবেশ—ব্যস।

৯। দলের বাহিরে—সামনে নাক উঁচু করিয়া চলিতে হইবে।

১০। মনকে ডাষ্টবিন্ করিয়া রাখিতে হইবে।

১১। স্ত্রী-জাতিকে দেখিবে শুধু ভোগের বস্তু—তোমার জন্যই স্ত্রীলোকের জন্ম। মা, বোন, মেয়ে—নারীর এ-রূপ ভুলিয়া যাওয়া চাই।

এই কয়টি সূত্রে নির্ভর করিয়া আমরা যদি সাহিত্যের রাজ্যে বিচরণ করি, তাহা হইলে দেখিব—বঙ্গসাহিত্য সত্যই প্রগতিবাদীদের হাতে পড়িয়া বিচিত্র ঢঙে বিচিত্র রঙে এমন সাজিয়াছে যে, তার কাছে কোথায় দাঁড়ায় জেলেপাড়ার সং !

কিরূপ রচনা 'সাহিত্য' বলিয়া পরিগণিত হয়, দুই-চারিটা নমুনা দিই,—

১। ধ্বংসের কালিমাক্লিষ্ট নগ্ন নিঃস্ব বৈধব্য গোপন।
২। উর্দ্ধশ্বাস মিলন-উল্লোল।—(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)
৩। ভাবিবো মহৎ বুঝি নিরিন্দ্রিয় বন্ধ্যার সংযম।
৪। •••হাসলো যেন তার শ্রান্তিকেই চিহ্নিত করতে;
৫। তব শিল্পবনে রমি ; চিত্ততুরঙ্গমি ধাইল ভাবতী ; বর্ণব্রতী এসো কাব্যরথে তব শুনি অগৌরব নিম্ন হৃদে ফলি উর্দ্ধরতি।
৬। ঝামার মত ঝাঁঝাঁ রোদ চোখে ঝাল লাগে।
৭। ছুটবে বাতাস, শুকনো বাতাস, কাঁপাবে আকাশ
পূবের সবুজে দেখা যাবে লাল চাঁদের আভাস।
(বুদ্ধদেব বসু)
৮। কাহারে করিব ধন্য মোরা
প্রেম দিয়ে ? নির্ব্বোধ নারীর পাল, স্থূল, মাংসস্তূপ
(বুদ্ধদেব বসু)

ভাব দেখিতেছেন ?

শ্রীঅনর্গল রায়

সাময়িক-প্রসঙ্গ

মার্কিণে ভারত-কথা

আমেরিকার তরফ হইতে যে ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব আসিতে পারে সে ভয় বৃটেনের চিরকালই ছিল, তাই বহু অর্থব্যয়ে কালা ও ধলা ভাড়াটিয়া প্রচারকের সাহায্যে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে তাহারা মার্কিণবাসীদের কাণ ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতেছে। গত যুদ্ধে মার্কিণ-সাহায্য না পাইলে বৃটেনের যে দুরবস্থা ঘটিতে পারিত তাহা সর্ব্বজনবিদিত। এ বারেও তাহাদের সাহায্যেই ভারতে জাপানী আক্রমণ প্রহত করিতে হইতেছে। অতএব যুদ্ধোত্তর শান্তি-পরিকল্পনা বিষয়ে তাহাদের মতামত জানাইবার অধিকার অস্বীকার করা চলে না। এ স্থলে মার্কিণ অর্থে শুধু প্রেসিডেণ্টকেই বুঝায় না, মার্কিণ জাতিকে বুঝায়।

আটলাণ্টিক চার্টার প্রকাশের সময় যখন প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহা ভারতেও প্রযোজ্য কি না, তখন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট নিরুত্তর ছিলেন, কিন্তু মিষ্টার চার্চ্চিল উত্তর দিয়াছিলেন যে, তাহা ভারতে প্রযোজ্য নহে। এই নিরুত্তরে তাঁহাকে মিষ্টার চার্চ্চিলের সমর্থক বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। যদি এই চার্টার ভারতে প্রযোজ্য না হয়, যুদ্ধের পরও যদি ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম পরাধীনই থাকিয়া যায় তবে চতুর্ব্বিধ স্বাধীনতার কোন অর্থই থাকে না। মার্কিণ বলিতেছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহারা কেবল গণতন্ত্রের জন্য অকাতরে অর্থ ও জীবন ব্যয় করিতেছেন। এ উক্তিরও কোন সার্থকতা নাই।

মিষ্টার ওয়েণ্ডেল উইলকী লিখিয়াছেন যে, তিনি রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের নিষেধের জন্য ভারতে আসিতে পারেন নাই। কিন্তু চীনের বিজ্ঞতম ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, ভারতের সমস্যা সমাধান না হইবার জন্য লোকে মার্কিণকেও দায়ী করিতেছে।

মিষ্টার ফিলিপসকে ভারত সরকার গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দেন নাই।

আজ ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা মার্কিণের নিকট হইতে গোপন রাখা আর সম্ভবপর নয়। বৃটিশ সরকারের 'টকিং পয়েণ্টস'—'ফিফটি ফ্যাক্টস' ইত্যাদির চর্ম্মবর্ম্ম-পরিহিত ভাড়াটিয়া প্রচারকদের কেহ আর বিশ্বাস করিতেছে না। যুদ্ধের জন্য এত মার্কিণবাসী এ দেশে আসিয়াছে যে, সকল গুপ্ত রহস্যই চিচিং ফাঁক হইয়া গিয়াছে। মিষ্টার ফিলিপসের অপরাধ, তিনি ভারতবর্ষের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া ভারতীয় স্বাধীনতার দাবীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। ভারত সরকার তাঁহাকে "অবাঞ্ছনীয় লোক" বলিয়া মার্কিণ সরকারকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন। কিন্তু মার্কিণ ভারতবর্ষ নহে, সেখানে ভারতরক্ষা আইন চলে না।

মিষ্টার চ্যাণ্ডলার বলিয়াছেন, বৃটেন যদিও বলিতেছে, ভারতের ব্যাপারে মার্কিণের কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি বলা যায়—ভারতের ব্যাপার মার্কিণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ, প্রশান্ত মহাসাগর যুদ্ধে মার্কিণই প্রধান কাজ করিতেছে—প্রধান ভার বহন করিতেছে। ভারতবর্ষ কেবল যে ব্রহ্ম ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মার্কিণের প্রয়োজনীয় ঘাঁটী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ তাহাই নহে; পরন্তু, ভারতবর্ষ যদি পূর্ণোদ্যমে সাহায্য করে, তবে জাপানে উপনীত হইবার পথের দৈর্ঘ্য হ্রাস পাইবে এবং বহু মার্কিণীর জীবননাশ নিবারিত হইতে পারিবে। আমি এ বিষয়ে মিষ্টার ফিলিপসের সহিত একমত যে, বৃটেনের ব্যবহারের জন্য জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতবাসীর আগ্রহ প্রবল নহে।

ইহাতেই বুঝা যায় যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কিণ উদাসীন নহে। শুধু স্বায়ত্ত-শাসনই নহে, ভারতের সহিত অন্য কোন দেশের বাণিজ্য-সম্পর্কও বৃটেন চাহে না। ভারত কেবল তাহাদের মালের মার্কেট! ভারতের অর্থে কেবল তাহাদের ভাণ্ডারই পূর্ণ হউক! ভারতবর্ষ বৃটেনের নিকট হইতে যে অর্থ পাইবে তাহা কিন্তু ভারতবর্ষের ইচ্ছানুসারে তাহাকে প্রদান করা হইবে না। ইহার পর কি করিয়া মনে করা যায় যে, বৃটেন ভারতবর্ষের স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের দাবী স্বীকার করিবে?

আজ মার্কিণের এক শ্রেণীর রাজনৈতিক ভারতবর্ষেও গণতন্ত্রের মূল নীতি প্রযুক্ত করিয়া তাহাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করিতে চাহেন। সমগ্র মার্কিণের লোকমতকে অগ্রাহ্য করিবার শক্তি কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না। ঘন-তমসাবৃত আকাশে ইহাই একমাত্র সিলভার লাইনিং!

অযোগ্যতার চূড়ান্ত

বাঙ্গালার ইতিহাসে বোটানিক্যাল গার্ডেন এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। সেখানে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মুমূর্ষু বাঙ্গালীদের বাঁচাইবার জন্য খাদ্যদ্রব্যের ঘাঁটী প্রস্তুত করা হইয়াছিল! সেই ঘাঁটীর বিবরণ ঘাঁটিয়া অনেক রকমের নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে বাঙ্গালায় প্রায় ৩০ লক্ষ লোক অনাহারে মরিয়াছে, সেই বাঙ্গালায় নিরন্নদের জন্য বাহির হইতে নীত খাদ্যদ্রব্যের কতকাংশ অনাচ্ছাদিত অবস্থায় কলিকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনে বিকৃত ও পশুর খাদ্যেরও অনুপ-যুক্ত করিয়া সার প্রস্তুত করিবার জন্য জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালা সরকারের প্রচারপত্রে প্রকাশ যে, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের অনুরোধে গভর্ণর সেখানে যাইয়া নৌকায় খাদ্যদ্রব্য বোঝাই দেখিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য যে পচিতেছে তাহা কি তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল? আশ্চর্য্য যে, দুর্গন্ধ পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুভব করিতে দেওয়া হয় নাই। অথবা এমনও হইতে পারে যে, দুর্গন্ধের কারণ জানিবার তাঁহার কৌতূহল হয় নাই।

বিকৃত খাদ্যশস্য ও দ্রব্যের পরিমাণ সরকারী স্বীকৃতি হিসাবে প্রায় ২০ হাজার মণ। সামরিক বিবৃতিতে দেখা যায়, বিকৃত মালের কতকাংশ ব্যবসায়ীদিগের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছিল, তাঁহারা তাহা লন নাই। আর বেসামরিক বিবৃতিতে দেখা যায়, বিকৃত মালের অধিকাংশই ব্যবসায়ীদিগের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছিল, উভয় উক্তিই সত্য হইতে পারে না। একবার বলা হইয়াছে ৯০ হাজার টন 'সন্দেহজনক বা মন্দ' খাদ্যদ্রব্য বাগানে গাদা করা হইয়াছিল। আবার এ-ও বলা হইয়াছে, উহার শতকরা ৫ ভাগেরও কম মন্দ! সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। আমরা কোন্‌টা বিশ্বাস করিব?

সামরিক কৈফিয়তে প্রকাশ—অনাচ্ছাদিত স্থানে এক সময়ে ৯০ হাজার টন খাদ্যশস্য ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। গুদামের ব্যবস্থা

না করিয়া এই ভাবে খাদ্য নষ্ট করা কি জ্ঞানকৃত অপরাধ নয়? আমরা জানি, পঞ্জাবে যে গম বাঙ্গালা সরকারের জন্ম ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহাকে বাঙ্গালা সরকারের মোট এক কোটিরও অধিক টাকা লাভ হইয়াছে। সেই লাভের মাত্রা এবং গতি বৃদ্ধির জন্মই কি গুদাম ঠিক না করিয়াই মাল আনান হইয়াছিল?

জানিতে ইচ্ছা হয়, এই পচা মালের জন্ম যে টাকা নষ্ট হইয়াছে তাহা কি বাঙ্গালার মন্ত্রিবর্গকে দিতে বাধ্য করা হইবে? আর এই স্বেচ্ছাকৃত গাফিলতির জন্ম কত অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট হইল, তাহার দায়িত্ব কাহার বা কাহাদের উপর পড়িবে? এই অপরাধের শাস্তি কি? মিষ্টার কেসী কি এইরূপ অপচয়ের কোন প্রতিকার করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না?

চণ্ডীচরণ নায়েক

২৫শে শ্রাবণ রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় প্রসিদ্ধ রঙ্-ব্যবসায়ী চণ্ডীচরণ নায়েক পরলোক-গমন করেন। তাঁহার নিষ্ঠা ও সাধুতা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি নীরব দাতা ও দীন-দুঃখীর পরম সহায় ছিলেন। গত দুর্ভিক্ষের সময় তিনি বহু ক্ষুধিতকে অন্নদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল বিয়োগে আমরা এক জন সহৃদয় দেশ-প্রেমিককে হারাইলাম।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৬শে ভাদ্র বেলা ১১টার সময় স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবিত ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সন্ন্যাস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালা সরকারের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে কাজ করিতেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ডিষ্ট্রীক্ট সাব-রেজিষ্ট্রারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। শচীশচন্দ্র আজীবন বাঙ্গালা সাহিত্যের পূজারী ছিলেন। তিনি 'বঙ্কিম-জীবনী', 'বীরপূজা', 'রাজা গণেশ' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ এক জন প্রবীণ সাহিত্যিককে হারাইল।

রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭ই ভাদ্র সকাল সাতটায় বীরভূমের খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-বি-ই, নাট্যভারতী, মহাশয় তাঁহার সিউড়ীর বাটীতে অকস্মাৎ পরলোক-গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। বীরভূমের অভিজাতগণের অন্যতম যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইনি তৃতীয় পুত্র। নির্ম্মলশিব বাবু ধনীর সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজীবন ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত। কিন্তু সহৃদয় ও অমায়িক সদালাপী সুরসিক হিসাবে তিনি কেবল বীরভূম নহে—বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নানা কারণে তাঁহার স্কুল-কলেজের শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু নিজের চেষ্টায় ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

কিশোর বয়সেই তিনি অভিনয়ের দিকে আকৃষ্ট হন এবং তখন হইতেই কবিতা ও গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার রচিত 'বীর রাজা' ও 'নবাবী আমল' নাটক, 'বাহাদুর' গীতিনাট্য, 'রাতকানা', 'মুখের মত', 'ভুলের খেলা', 'রূপকুমারী' প্রভৃতি প্রহসন কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে ও বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে বহু বার অভিনীত হইয়াছে। 'প্রভাত স্বপ্ন' নামে তাঁহার একখানি গল্পের বইও আছে। নির্ম্মলশিব বাবু নিজে এক জন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন এবং অভিনয়-শিক্ষক হিসাবেও তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। তাঁহার বিয়োগে বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মণীন্দ্রনাথ মিত্র

২৪শে ভাদ্র সকাল ১টা ৪০ মিনিটে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক মণীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পরলোক-গমন করিয়াছেন।

মণীন্দ্রনাথ মিত্র

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ তিনি যশোহরের বিখ্যাত মিত্র-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাঃ এল, ভি, মিত্র বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বি, এ পাশ করেন এবং পরে এটর্নীশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি পাঠদশায় সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কন্যা কল্যাণী নীহারবালাকে বিবাহ করেন। যৌবনকাল হইতেই মণীন্দ্র বাবু নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সদালাপী, নিরলস একনিষ্ঠ সমাজসেবক মণীন্দ্রনাথ কলিকাতায় বসবাস করিলেও জন্মভূমির কথা কোন দিন বিস্মৃত হন নাই। নিজ জিলায় শিক্ষা বিস্তার এবং সামাজিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। দুর্গতের দুঃখমোচনে তাঁহার নীরব প্রচেষ্টা তাঁহার কর্ম্মময় জীবনকে অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। বাঙ্গালার অবস্থা আজ সঙ্কটজনক। এই দিনে তাঁহাকে হারাইয়া হিন্দু মহাসভা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল।